প্রবাসী

সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

ষোড়শ ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড
১৩২৩ সাল, কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রবাসী কার্য্যালয়
২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মূল্য তিন টাকা ছয় আনা

প্রবাসী ১৩২৩ কার্ত্তিক—চৈত্র

১৬শ ভাগ ২য় খণ্ড,

বিষয়-সূচী

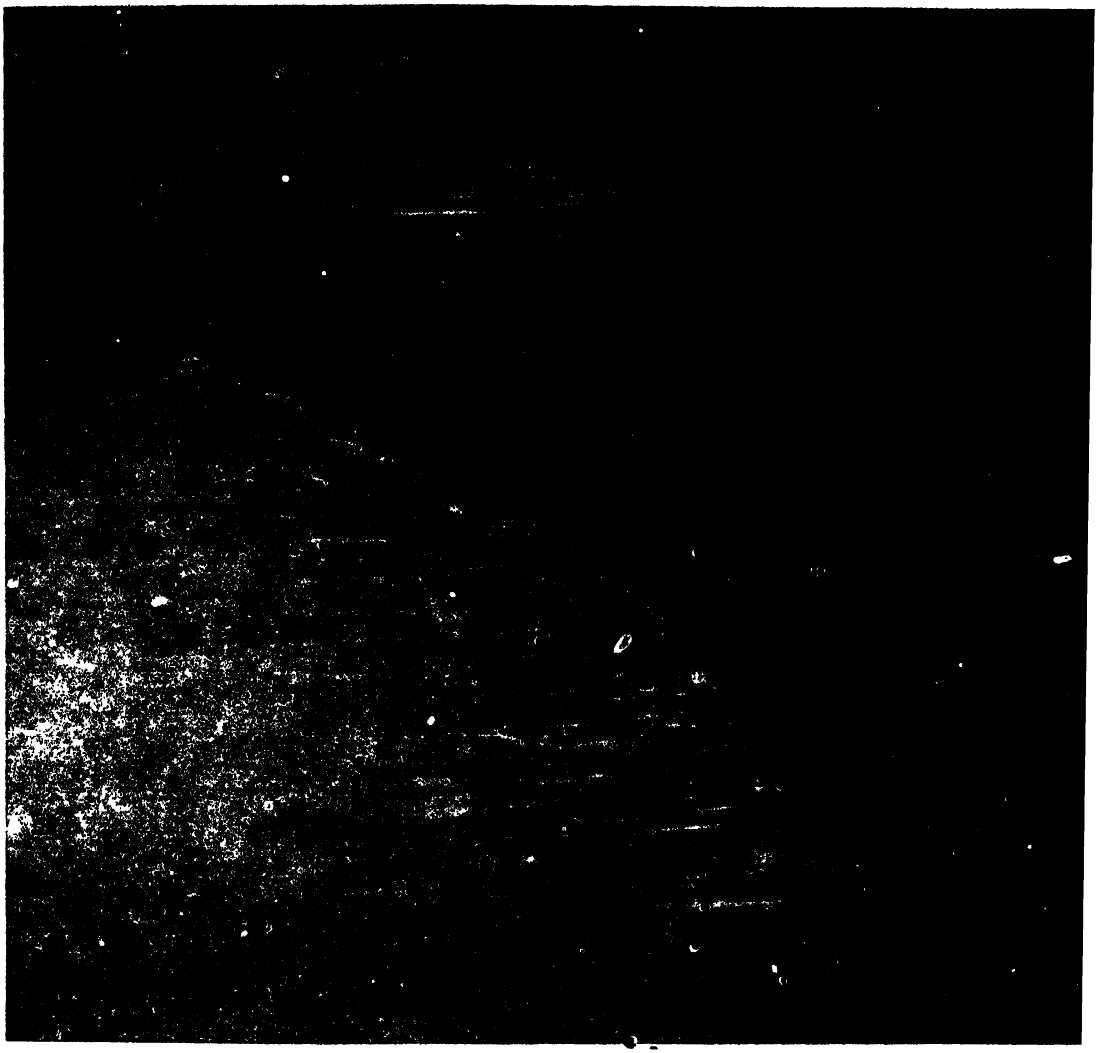
সূচীপত্র।

চিত্র-সূচী

সূচী পত্র।

লেখক ও তাঁহাদের রচনা

সূচীপত্র।



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩২৩

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সাধারণ লোক।

"এক যে ছিল রাজা। তার ছিল এক রাণী।" রাজা ও রাণীদের সম্বন্ধে এই রকমের অগুন্তি উপকথা নানা দেশে আছে। বড়-বড় কাব্য মহাকাব্য নাটকের নায়ক-নায়িকারা রাজা রাণী রাজকুমারী। অন্য লোকদের সম্বন্ধে কোন কাব্য যে লেখা হয় নাই তাহা নয়। হইয়াছে; যেমন মৃচ্ছকটিক, যেমন মুকুন্দরামের চণ্ডী। কিন্তু উপকথার ও কাব্যের নায়কনায়িকা প্রধানতঃ রাজা রাণী রাজকুমারীরাই হন। পুরাকালে যেমন এখনও তেমনি, সাধারণ লোকদেরও জীবনে আলো ও ছায়া, সুখদুঃখ, নানা বিচিত্র রস আছে; কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি প্রথম হইতে ভাল করিয়া পড়ে নাই।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে, গ্রীসে, রোমে সাধারণতন্ত্র ছিল, রাজতন্ত্রও ছিল। উভয়প্রকার শাসনপ্রণালীই এখনও পৃথিবীতে আছে। কিন্তু তথাপি, মোটের উপর, এখনও অসংখ্য লোকের ধারণা এই যে, দেশে একজন রাজা না থাকিলে দেশের কাজ চলিতে পারে না, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতে পারে না; অরাজক কথাটিতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান, প্রভৃতি দেশে রাজার নিয়মিত-কর্ত্তৃত্বে যেমন দেশগুলি প্রবল, সমৃদ্ধ ও সভ্য হইয়াছে, আমেরিকা, ফ্রান্স, প্রভৃতি সাধারণতন্ত্রেও লোকেরা তেমনি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও সভ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে রাজতন্ত্র ইংলণ্ড অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র ফ্রান্সের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য কম দেখা যাইতেছে না।

রাজা, রাজবংশ, রাজপরিবার, ইহারাই সব, জনসাধারণ কিছু নয়, এইরূপ ধারণাবশতঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস মানে ছিল, রাজাদের জন্মমৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ, সিংহাসন-আরোহণ, সিংহাসনচ্যুতি, এক রাজবংশের উচ্ছেদ এবং তাহার জায়গায় অন্য বংশের অভ্যুদয়, ইত্যাদি বিষয়ের সমষ্টি। দেশের লোকেরা কেমন করিয়া জ্ঞানে ধর্ম্মে, পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থায়, শিল্প-বাণিজ্যে, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনে, দৈহিক ও মানসিক বলে, রাষ্ট্রীয় শক্তিতে ও অধিকারে, এবং সভ্যতায়, উন্নত বা অধঃপতিত হইতেছে, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা ঐতিহাসিকের কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না।

রাজাকে ও রাজবংশকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখায় মানুষ ধর্ম্মজগতেও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে নাই। তাহার একটা দৃষ্টান্ত যীশুখৃষ্টের জন্মবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সূত্রধরের সন্তান; কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব বাড়াইবার জন্য তাঁহাকে রাজা দাউদের বংশধর বলিয়া প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এক বংশতালিকা সৃষ্ট হইল। অথচ ইহা সকলেরই বুঝা উচিত, যে, মানুষের মহত্ত্ব বংশের জন্য হয় না; নিজের চরিত ও চরিত্র হইতেই হয়।

সে-কালের যুদ্ধের বর্ণনা পড়িলেই মনে হয়, যেন সেনাপতি মহারথীরাই সব, সাধারণ সৈনিকেরা বেশী কিছু নয়। একজন মহারথী আহত হইলেন, বা মারা পড়িলেন, আর অমনি অনুচরেরা সকলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। একজন দিগ্বিজয়ী দস্যু যদি কোন দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজাকে বন্দী বা হত্যা করিতে পারিল, তাহা হইলে দেশও অধিকৃত হইয়া গেল। আজকালকার দিনেও যুদ্ধে জয়লাভ সেনাপতির বুদ্ধি, কৌশল, কর্ম্মিষ্ঠতা ও সাহসের উপর নির্ভর করে বটে, কিন্তু, পুরাকালের কাব্যের বর্ণনার মত, সেনাপতির মৃত্যুতেই কোন পক্ষের সর্ব্বনাশ হয় না।

মানবজীবনের সকল বিভাগেই সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষে বড় বেশী প্রভেদ কল্পনা করা হইয়াছে; এবং তাহাতে এই কুফল ফলিয়াছে যে সাধারণ মানুষেরা, দৈহিক স্বাস্থ্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অধিকার, মানসিক শক্তি, রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং আধ্যাত্মিকতা, সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অত্যন্ত হীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও নিজ নিজ হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসও অমূলক, এবং এই প্রকার সন্তোষও মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের অন্তরায়। তজ্জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় নাই।

রাজবংশের অশোক, রাজবংশের আকবর, রাজবংশের ভিক্টোরিয়া, রাজবংশের মুৎসুহিতো, ইঁহাদের মত লোকদের যশ ম্লান করিবার কোন ইচ্ছা নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষদের মাঝখান থেকে এব্রাহাম লিঙ্কনের মত লোক যে জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে রাষ্ট্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভেদ শক্তির মাত্রা বা বিকাশের প্রভেদ মাত্র। মেষ ও মানুষের মধ্যে যেমন প্রভেদ আছে, সাধারণ ও অসাধারণ মানুষে তদ্রূপ কোন প্রভেদ নাই। আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রমণ্ডলে (U. S. A.), ফ্রান্সে, এবং অন্যান্য সাধারণতন্ত্রে দু পাঁচ বৎসর অন্তর-অন্তর নূতন দেশপতি (president) নির্ব্বাচিত হইতেছেন; কিন্তু কার্য্যক্ষম লোকের অভাব হইতেছে না। সাধারণ লোকদের দল হইতেই যোগ্য মানুষ পাওয়া যাইতেছে। রাজবংশের লোকেরাও ত প্রথম হইতেই রাজা ছিলেন না। যে-সকল রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস আছে, তাহাদের আদিপুরুষ জনসাধারণের দল হইতে উদ্ভূত দেখা যায়।

বড় বড় যোদ্ধারাও অধিকাংশ স্থলে সাধারণ লোকদের বংশ হইতে উদ্ভূত। অনেক বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ, মন্ত্রী, বৈজ্ঞানিক, কবি, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সাধারণ পরিবারের সন্তান।

আমার মধ্যে বীজরূপে যাহা নাই তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না। অন্যে কেবল বীজকে অঙ্কুরিত হইয়া পরে পত্রপুষ্পফলবান্ বৃক্ষে পরিণত হইতে সাহায্য করিতে পারেন। কবি আমাকে তাঁহার কবিতা শুনাইয়া আনন্দ দিতে পারেন এই জন্য যে তাঁহার আত্মা ও আমার আত্মা একই রকমের। তাঁহার চিন্তা, ভাব, স্বপ্ন, আনন্দ এই কারণে আমারও হইতে পারে; তিনি যে রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহা আমিও করিতে পারি। তিনি কিন্তু গোরুকে নিজের আনন্দ দিতে পারেন না, নিজের স্বপ্ন দেখাইতে পারেন না; কারণ গোরু একটা স্বতন্ত্র রকমের জীব। কবিকে খুব ভালবাসি, খুব সম্মান করি, কিন্তু অতিমানুষ কোন গুণ তাঁহাতে আরোপ করিতে পারি না। তিনি মানবসমাজ হইতে রসসংগ্রহ করেন, মানবসমাজে বাস তাঁহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ।

দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সকলের সম্বন্ধেই এই সব কথা প্রযুজ্য। তাঁহারা খুব সম্মানার্হ, কিন্তু অতিমানুষ কিছু নহেন।

কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতির শক্তির প্রকৃতি কিরূপ, মূল কোথায়, বিকাশ কেমন করিয়া হয়, তাহা সভ্যতার উৎকর্ষ সহকারে মানুষ যত জানিতে পারিবে, এবং শৈশব হইতে শিক্ষার আয়োজন যে পরিমাণে এই জ্ঞানের অনুযায়ী হইবে, সেই পরিমাণে আরও অধিকসংখ্যক এবং অধিকতর শক্তিশালী কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি, সাধারণ মানুষদের মধ্য হইতেই পাওয়া যাইবে। হইতে পারে যে, এক এক জন মানুষ কেমন করিয়া অসামান্যশক্তিসম্পন্ন হয়, তাহার সমস্ত কারণ আমরা কোন কালেই জানিতে পারিব না; যাহাকে জ্ঞানের অভাবে "দৈব" বলা হয়, এরূপ কিছু কারণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই "দৈবের"ও লীলাক্ষেত্র সাধারণ মানুষদেরই আত্মা, সাধারণ মানুষদেরই হৃদয়মন।

আর সকল রকম অসাধারণ মানুষকে সাধারণ লোকদের আত্মীয় ও জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইলেও, ধর্ম্মজগতে যাঁহারা মহাপুরুষ বা অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন, মানবমন এখনও তাঁহাদিগকে সাধারণ লোক-দের জা'ত ভাই বলিয়া মানিতে রাজী হয় নাই। এইজন্য বুদ্ধ যীশু প্রভৃতি কোন কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের জন্ম পর্য্যন্ত অলৌকিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে আমরা ভক্তি করি; তাহা একটুও কমাইতে চাই না। কিন্তু আমরা যে তাঁহাদের জা'তভাই তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মধ্যে যাহা বীজরূপে নাই, তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না। ধর্ম্মজগতের অসাধারণ মানুষেরা অন্য মানুষকে আধ্যাত্মিকতা দিতে পারেন, ধার্ম্মিক করিতে পারেন, এইজন্য, যে, এই-সব অন্য-মানুষের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম্মপ্রবণতা সুপ্ত ভাবে রহিয়াছে। বাঘকে তাঁহারা আধ্যাত্মিকতা ও সত্ত্বগুণ দিতে পারেন না, কারণ বাঘ আর-এক রকমের জানোয়ার; গাছপাথরকে ত পারেনই না।

একটা ঘরের মধ্যে বাতাস আছে বলিয়াই, উহার একদিকে বেহালা বাজাইলে অন্য দিকের লোকেরা শুনিতে পায়। কিন্তু একটা বাক্সের মধ্যে বেহালা রাখিয়া তাঁহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বায়ুশূন্য করিয়া যদি বৈদ্যুতিক উপায়ে তাহার তন্ত্রীগুলি ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কোন শব্দই আমরা শুনিতে পাইব না; কারণ শব্দতরঙ্গের আশ্রয়ভূত বায়ু বাক্সে নাই। তেমনি, সাধারণ মানুষ অসাধারণ মানুষ আমরা সবাই যেন আত্মাসাগরে বিচরণ করিতেছি, একের আত্মিক তরঙ্গ অপরে সঞ্চালিত ও সংক্রামিত হইতেছে।

ধর্ম্মজগতের অসাধারণ মানুষদের মধ্যে যে সাধুতা, প্রেম, পবিত্রতা, আত্মোৎসর্গ, সাহস, নিষ্ঠা, অন্তর্দৃষ্টি, প্রভৃতি দেখা গিয়াছে, সেই রকমের জিনিষ যে অনেক অপ্রসিদ্ধ অজ্ঞাতকুলশীল নরনারীর মধ্যেও ছিল, আছে, ও দেখা গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক রাজবংশের আদিপুরুষ যেমন সাধারণ পিতামাতার সন্তান, তেমনি অনেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকও সাধারণ পিতামাতার সন্তান। অন্য-দিকে, আবার, তাঁহাদের ও আমাদের সম্বন্ধ রহিয়াছে পর-ব্রহ্মের সহিত। খৃষ্টিয়ানেরা ঈশ্বরকে "our Father" (আমাদের পিতা) বলেন, আমরা বলি "পিতা নোঽসি," অদ্বৈতবাদী বলেন "সোঽহম্।" কোন দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া বলিতে পারা যায় যে এই সমুদয় উক্তির মধ্যেই সত্য আছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা একাত্ম; সুতরাং সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষ সবাই এক পরিবারের লোক। একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ রাত্রিকালে আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতি দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন, "হে প্রভু, আমি তোমার চিন্তার অনুসরণ করিতেছি" (I am thinking thy thoughts)। ঋষির সত্য দেখা পরব্রহ্মেরই দেখার মত, কবির আনন্দ তাঁহারই আনন্দের মত, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান তাঁহারই জ্ঞান, দার্শনিকের মনন তাঁহারই মনন।

অসাধারণ ধার্ম্মিকেরা বাস্তবিকই মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু আমরাও তুচ্ছ নহি; আমরাও "অমৃতস্য পুত্রাঃ", "অমৃতের পুত্র।" আমরা যেন অল্প জ্ঞানে, অল্প পবিত্রতায়, অল্প প্রেমে, অল্প শক্তিতে, অল্প বিশ্বাসে, অল্প সাহসে, অল্প কৃতিত্বে সন্তুষ্ট না হই; এমন যেন মনে না করি, যে, "আমরা তুচ্ছ সাধারণ মানুষ, অতএব আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। না, আমাদেরও অধিকার, আমাদেরও সম্ভাব্যতা অসীম।

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে একজন ভাল রাজা বা ভাল মন্ত্রী যেমন দেশের কাজ চালাইবার ও দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার সুপন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন, তেমনি জনসাধারণও পরামর্শ করিয়া সদুপায় ও সুপ্রণালী নির্ণয় করিতে পারেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কখন কখন ভুল হয় বটে, কিন্তু বড় বড় রাজাদের এবং মন্ত্রীদেরও ভুল হয়।

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দশের প্রতিষ্ঠা যেমন হইয়াছে, ধর্ম্মক্ষেত্রে এখনও ততটা হয় নাই; কিন্তু তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। দশজনে সুসংকল্প লইয়া পরামর্শ করিলে যেমন রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সুপন্থা ও সুনীতি আবিষ্কৃত হয়, আধ্যাত্মিক জগতেও তেমনি সাধু অভিপ্রায়ে দশজন মিলিত হইলে তাঁহারা তত্ত্বদর্শী এবং ধর্ম্মপথের আবিষ্কর্ত্তা হইতে পারেন। কারণ, সকলেরই আত্মা এক রকমের, সকলেরই সত্য দেখিবার চিনিবার মানিবার ক্ষমতা আছে। প্রজাতন্ত্র প্রণালী অনুসারে শাসিত দেশে অতীত কালের ব্যবস্থাপক-দের নীতি, জ্ঞান ও ব্যবস্থার সাহায্য লওয়া যায়

তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হয় না। তেমনি, ধর্ম্মজগতেও, স্বতন্ত্র পথের পথিকেরা কোন শাস্ত্র, কোন সাধুবচনকে অবজ্ঞা করিবেন না, সমস্তই শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিবেন; কিন্তু সাধারণ অসাধারণ সব মানুষের আত্মাতেই পরব্রহ্ম প্রকাশিত, ইহাও কখনই বিস্মৃত হইবেন না। দশজনের ভোট লইয়া ধর্ম্মবিষয়ক সত্য নির্ণয় উপহাসের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহাও ঠিক্ যে যতক্ষণ কোন শাস্ত্রীয় উক্তি বা সাধুবচনে আমাদের অন্তরাত্মা সায় দিতেছে না, ততক্ষণ উহা আমাদের পক্ষে সত্য নহে। আমরা যন্ত্রের মত উহার অনুবর্ত্তী হইতে পারি; কিন্তু তখনই উহাকে মানুষের মত মানা হয়, যখন আমাদের অন্তরাত্মা, বুঝিয়া সুজিয়া, উহাতে আনন্দের সহিত সায় দেয়।

অসাধারণ মানুষদিগকে প্রণাম করি। কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয় হইবার উপযুক্ত হইতে চাই। সেই অধিকার দাবী করিতেছি। কলের মত অনুচর হইতে ও থাকিতে চাই না, সহধর্ম্মী, সহমর্ম্মী, সহযোগী, ও সহকর্ম্মী হইতে চাই। ইহা আস্পর্দ্ধা নয়; ইহাকেই আমরা প্রকৃত প্রীতি, প্রকৃত ভক্তি মনে করি।

সাধারণ মানুষের প্রয়োজন।

জগতের দিগ্বিজয়ী বীরেরা এবং বড় বড় সেনাপতিরা খুব শক্তিশালী লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাধারণ সৈন্য তাঁহাদের জয়লাভের জন্য প্রাণ দেয়, তাহারা অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা হইলেও তুচ্ছ লোক নয়। সেনানায়ক ব্যতিরেকে যুদ্ধ চলে না বটে, কিন্তু সাধারণ সিপাহী ভিন্নও ত যুদ্ধ চলে না। সেনাপতি ২।৪ জন মারিলে সাধারণ সৈন্যদের মধ্য হইতে বরং লোক বাছিয়া তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করা চলে, কিন্তু হাজার হাজার মৃত সৈনিকের স্থান পূরণ সেনানায়কেরা করিতে পারেন না।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা মহৎ ও ক্ষমতাবান্ লোক সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের শিষ্য ও অনুশিষ্যেরাও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বপ্রকার উপহাস, ক্লেশ, উৎপীড়ন, ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া এবং বহু স্থলে প্রাণ দিয়া কত আত্মোৎসর্গ, বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও শৌর্য্য প্রদর্শন করেন নাই। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক একা সব কাজ করিতে পারেন না। দলের লোকদের উপর সাফল্য বেশী নির্ভর করে। তাঁহার কথা ও কার্য্য যেমন তাঁহার দলের লোকদিগকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি তাঁহার মণ্ডলীর লোকদের কথা ও কার্য্যও তাঁহাকে নূতন আলোক দেয় ও উৎসাহিত করে।

বড়-বড় আড়তদার, বড়-বড় কারখানার মালিক মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিষ জোগান বটে, কিন্তু অগণ্য কৃষক, কুলী, মজুর, মিস্ত্রীকে বাদ দিলে তাঁহাদের কোন সামর্থ্য, কোন কৃতিত্বই থাকে না। "চাষা" কথাটা প্রয়োগ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করা সোজা, কিন্তু "বাবু"র চেয়ে চাষার দরকার সংসারে খুব বেশী।

নানাপ্রকারের গৃহ, প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির, গির্জ্জা, মসজিদ, কবর, রাস্তা, ঘাট, সেতু সভ্যতার বহিরঙ্গ। এগুলির উপর নামের ছাপ পড়ে বড়-বড় ধনীর, বড়-বড় এঞ্জিনীয়ারের, কিন্তু সাধারণ মিস্ত্রী মজুর ভিন্ন তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না।

অনেক কবিতায় এরূপ লেখা আছে যে কবিরা আপন মনে নিভৃতে বসিয়া আপনার আনন্দে বিভোর হইয়া গান করেন। এই কল্পনাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব না হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক একটি মহাকবিকে বাল্য বা যৌবনকাল হইতে একটি নির্জ্জন দ্বীপে রবিন্সন ক্রুসোর মত রাখিয়া দিলে তিনি কেমন আনন্দে বিভোর হইয়া আপন মনে গান করিতেন দেখা যাইত। মানবসমাজ, গৃহপরিবার, আত্মীয় প্রতিবেশী আছে বলিয়াই মহাকবিরও কাব্য সম্ভব হয়। মানুষের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া, হর্ষশোক, পদস্খলন ও উত্থান, চারিত্রিক সংগ্রাম জয় পরাজয়, প্রভৃতি কবির কাব্যের উপাদান। কবি নিজের আনন্দ অপর মানুষের সহিত উপভোগ করিতে চান ও করিতে পারেন বলিয়াই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কবি একা বিশেষ একটা কিছু নহেন, অপর দশজনকে লইয়া কবি।

ধনীলোকেরা এক শ দু শ, দু-দশ হাজার, বিশ-পঁচিশ লক্ষ, দু-এক কোটি টাকা দান করেন; তাহাতে মানুষ অবাক্ হইয়া যায়, তাহাদের গুণে মোহিত হয়। কিন্তু তাহাদের প্রশংসা করিবার সময় ইহাও মনে রাখা দরকার

যে ঐ-সব টাকা গরীবের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন; অনেক স্থলে গরীবকে উপযুক্ত মজুরী না দেওয়াতেই ধনীর ধনবান্ হওয়া সম্ভব হইয়াছে, কখন-বা গরীবকে ঠকাইয়া ধনী ধন লাভ করিয়াছে। ধনীর টাকা ব্যতীত বড় কাজ যে হয় না, তাহা নয়। তীর্থস্থানের কোন কোন জলাশয়, ধর্ম্মশালা আদি মুষ্টিভিক্ষা ও এক আধ পয়সা ভিক্ষা দ্বারা কোন কোন সন্ন্যাসীকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতার বড় বড় বেসরকারী কলেজ প্রধানতঃ গরীব ছাত্রদত্ত বেতন হইতে চলিতেছে। মহারাষ্ট্রের তালেগাঁও কাচের কারখানা "পয়সা-ফণ্ড" হইতে স্থাপিত হইয়াছে। সমুদ্রের উপর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য গরীবের আত্মদানকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাহারও শুভকামনা, কাহারও উপকার, "কায়মনোবাক্যে" করার কথা বহু গ্রন্থে আছে। "কায়মনোবাক্যে" ভগবানের ইচ্ছার অনুগত হওয়া, তাঁহার সেবা করা যাইতে পারে। কায়, মন ও বাক্য এই সংস্কৃত কথা তিনটির যেমন ঐরূপ একত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তেমনি হিন্দীতে "তন মন ধন" অর্থাৎ তনু (দেহ), মন ও ধনেরও সম্মিলিত প্রয়োগ প্রচলিত আছে। যিনি পরম ভক্ত, তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয়, যে, তাঁহার "তনমনধন" ভগবৎচরণে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। জগতে কেহ বা বাক্যমনের দ্বারা, কেহ বা ধনের দ্বারা, কেহ বা মন ও ধনের দ্বারা, কেহ বা শুধু বাক্যের দ্বারা হিতসাধনের চেষ্টা করেন। ইঁহারা কেহ কবি, কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বাগ্মী, কেহ বা দানবীর বলিয়া যশস্বী হয়েন। কিন্তু যে-সকল লক্ষ-লক্ষ কোটিকোটি মানুষ কায় দ্বারা, "তনু" দ্বারা, দেহ দ্বারা, হাত পায়ের দ্বারা, সমাজের সেবা করে, যাহারা না থাকিলে লোকস্থিতি অসম্ভব হইত, তাহাদের এই দৈহিক দেবপূজা, এই দৈহিক মানবসেবা, অখ্যাত এবং কবির কাব্যে অকীর্ত্তিত হইলেও, কখনই তুচ্ছ নহে। তাহারা জানে না, জানিয়া অহঙ্কৃত হয় না, যে, তাহারা কত বড় কাজ করিতেছে এবং সেই কাজ ব্যতিরেকে সংসার কিরূপ অচল হয়। এই অজ্ঞানকৃত সেবা ভগবান্ কি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না? প্রাসাদের যে অংশ মাটীর উপর দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার সৌন্দর্য্যে ও তাহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের উপযোগিতায় আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু নয়নগোচর সমস্তটাই যে মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত অসুন্দর ভিত্তির উপর খাড়া হইয়া আছে, তাহা ভুলিয়া যাওয়া ঠিক্ নয়। গাছের ডালপালা ফলফুল সুশোভন এবং নানা প্রকারে হিতকর ও আনন্দদায়ক; তাহার শিকড়-গুলি তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু শিকড়গুলি ব্যতিরেকে কোন শোভা, কোন হিত সম্ভব হইত না। মানুষের সমাজ প্রাসাদের মত, পত্রপুষ্পফলে সজ্জিত বৃক্ষের মত। ইহার ভিত্তি, ইহার মূল, চাষা মুটে মজুর কুলি কারিগর।

এই সত্যটি উপলব্ধি করা সকল দেশের সকল জাতির পক্ষে একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহা আমাদের দেশে যত দরকার, এত, বোধ করি, আর কোথাও নয়। ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদের জীবনকে, আমাদের কায়মন ও বাক্যের ক্রিয়াকে, তাহার অনুরূপ করিতে না পারিলে আমাদের উদ্ধার নাই।

এব্রাহাম লিঙ্কন ঠিক্ বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ নিশ্চয়ই সাধারণ লোকদিগকে ভালবাসেন, তাহা না হইলে তিনি এত বেশী করিয়া সাধারণ লোকের সৃষ্টি করিতেন না।"

সাধারণ লোকের দায়িত্ব।

সাধারণ লোকদের অধিকার, সাধারণ লোকদের শক্তি, সাধারণ লোকদের দাবী, এবং সাধারণ লোকদের গৌরবের কথা বলিলাম। কিন্তু ইহা বৃথা আস্ফালন করিবার জন্য নয়। যেখানে অধিকার সেইখানেই তাহার অনুরূপ দায়িত্ব; শক্তি এক পিঠ, শক্তির অনুযায়ী কাজ উল্টা পিঠ। একটাকে বাদ দিয়া অন্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা বৃথা। আমরা সাধারণ লোকেরা এইজন্য উদ্বুদ্ধ হইতে চাই যে আমরা আমাদের দায়িত্ব বুঝিয়া শক্তি বুঝিয়া তাহার মত মানুষ হইব, তাহার মত কাজ করিব, এবং তাহার মত অধিকার জিনিয়া লইব। আমরা প্রকৃত নেতাকে পদচ্যুত করিতে চাই না, অসাধারণ মানুষের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিতে চাই না। কিন্তু, কে কবে নেতা হইবেন, কখন কোন্ মহাপুরুষ আসিবেন, কখন কোন্ অবতারের আবির্ভাব হইবে, আমরা তাহার অপেক্ষায় আলস্যে কাল কাটাইতে পারি না। ভগবান্

নানা শক্তিরূপে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছেন। আমাদের কাজ আমরা করিব। যাহার চোখ আছে, তাহাকে বিশ্বের চমৎকারিত্ব বুঝিবার জন্য হিমালয়ে যাইতে হয় না, পথের ধূলাতেও তাহা তাহার নিকট জাজ্বল্যমান। অসাধারণে ভগবানের মহিমা, ভগবানের শক্তি আছে বটে, কিন্তু সাধারণেও আছে। সাধারণের আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। সাধারণ জাগুন, এবং তাঁহার যাহা হইবার সম্ভাবনা তাহা হউন, তাঁহার যাহা করিবার তিনি করুন। সূর্য্য চন্দ্র আলোক দেয় বলিয়া নক্ষত্রেরা ত আলো দিতে বিরত হয়ই না, জোনাকিও বিরত হয় না। জমীকে উর্ব্বরা করিবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু স্মরণাতীত কাল হইতে কেঁচোও আঁধারে লোকচক্ষুর অগোচরে জমীকে চাষের উপযোগী করিয়া আসিতেছে।

অহঙ্কারের ঔষধস্বরূপ দীনতা অকিঞ্চনতা ভাল; কিন্তু উহা যখন মানুষের হাত পা ও আত্মাকে অবশ ও জড়তাপন্ন করে, তখন উহা বিষ, উহা বর্জ্জনীয়। ভগবানের কাছে আমরা অতি ক্ষুদ্র ইহা সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে আমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ," আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা মরিব না; আমরা মহৎ ও শক্তিশালী।

নমঃশূদ্রের উচ্চশিক্ষা।

ভাদ্রমাসের "নমঃশূদ্র-হিতৈষী"তে দেখিয়া সুখী হইলাম, ৪ জন নমঃশূদ্র ছাত্র বি-এ, ২ জন আই-এ, ১ জন আই-এস্‌সী, এবং ২ জন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

শিক্ষিত নমঃশূদ্রদের প্রতি নিবেদন,—তাঁহারা অন্য জাতির শিক্ষিত হিন্দুদিগকে "রাজদ্রোহী" ইত্যাদি যেন না বলেন। তাঁহারা এযাবৎ অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা পাইয়া আসিতেছেন বটে; কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ভাল নয়; ক্ষমা ও প্রীতিই ভাল।

একালে স্বয়ম্বর।

আশ্বিনের "কায়স্থ-পত্রিকা" নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশ করিয়াছেন।

"জেলা সাজাহানপুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মুন্‌শী প্যারীলাল শ্রীবাস্তব মহাশয়ের পৌত্রী আগামী বর্ষে স্বয়ম্বরা হইবেন। শ্রীবাস্তব মহাশয়ের তিন পুত্র। (১) শ্রীযুক্ত অবধ বিহারী, বদাউন জিলাস্কুলের শিক্ষক; (২) শ্রীযুক্ত আনন্দ বিহারী, মেম্বর্ রয়েল্ গার্ডেন (লণ্ডন) এবং লক্ষ্ণৌ সীড্‌ষ্টোরের স্বত্বাধিকারী; (৩) শ্রীযুক্ত রাম বিহারী বেদতীর্থ, বি-এ, এল্-এল্‌বি, উকিল, লক্ষ্ণৌ জুডিশিয়াল কমিশনার কোর্ট। অবধবিহারী বাবুর কন্যার বয়স ১৪ বৎসর, সুন্দরী গৃহকার্য্যনিপুণা এবং কলিকাতা সংস্কৃত-পরীক্ষা বোর্ডের আদ্য পরীক্ষা উত্তীর্ণা। ইনিই স্বয়ম্বরা হইবেন।

যে দিন স্বয়ম্বর হইবে, সেই দিন বিবাহার্থী যথাকালে (অন্যূন ৫ জন) বিবাহসভায় উপস্থিত হইবেন। কন্যা তাঁহাদের মধ্যে যাহাকে মনে হয়, তাঁহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিবেন। অতঃপর যথাশাস্ত্র বৈদিক বিধানে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে। স্বয়ম্বরের পূর্ব্বে তিলক দান (পাকা দেখা) হইবে না। বিবাহার্থী যুবক বৈদিক আচারনিষ্ঠ যে কোন শ্রেণীর কায়স্থ হইলেই হইবে। ২০—২৫ বৎসর বয়সের এবং অন্যূন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বিবাহার্থীগণ স্বীয় বংশপত্রীসহ উপরের ঠিকানায় প্যারীবাবুকে পত্র লিখিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন। স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ পাথেয়াদি খরচ পাইবেন। (Awaza-i-Kalk, 23 August).

বাস্তব্য কায়স্থগণ অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বহুকাল উপবিষ্ট থাকিয়া রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বাস্তব্য ক্ষত্রিয়গণই শিষ্টকৃদ্‌যাগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাই আবার বৈদিক রীত্যনুসারে স্বয়ম্বর বিবাহের পুনঃ প্রবর্ত্তনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছি। ইহাতে যদি বিবাহের দাবী দাওয়া ক্রমে উঠিয়া যায়।"

নূতন ব্যাপার বটে, কিন্তু ইহা ঠিক্ সেকালের স্বয়ম্বরের মত নহে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইতে ইহা জানা যায়, যে, যদিও প্রথমে দ্রুপদ রাজা "রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ," তথাপি শেষ পর্য্যন্ত দ্রৌপদীর মনোনয়ন ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। প্রথম প্রথম,

"পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর-স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয়-সকলে॥"

কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কেহ লক্ষ্য বিঁধিতে না পারায়,

"পুন ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥"

দ্রোণ, দ্রৌণি ও কর্ণ লক্ষ্যবেধ করিতে না পারায়,

"ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি কহে দ্রুপদকুমার॥
দ্বিজ হৌক ক্ষত্র হৌক বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিলেক যদি॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন॥"

জানকীর স্বয়ম্বরেও দৃষ্ট হয় যে ব্রাহ্মণ পরশুরাম, রাক্ষস রাবণ, এবং বহু ক্ষত্রিয় রাজা হরধনু ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাতির জন্য কাহারও সম্বন্ধে কোন আপত্তি উঠে নাই।

বঙ্গের হোম-রুল লীগ্‌।

বাংলা দেশে একটি হোম-রুল লীগ বা স্বরাজলাভ চেষ্টার জন্য সমিতি গঠিত হওয়া সুখের বিষয় বটে, কিন্তু যেভাবে উহা স্থাপিত হইয়াছে তাহার অনুমোদন করিতে পারি না। প্রকাশ্য সভা করিয়া উহা স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা বোধ করি হয় নাই। আমরা সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন দেখি নাই, কোন চিঠিও পাই নাই। যে জন-ত্রিশ লোক এই সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মত বা তাঁহাদের অনেকের চেয়ে বেশী স্বরাজলাভ-প্রয়াসী লোক কলিকাতা সহরে ও বাংলা দেশে আছে।

জাপানে সংস্কৃতের চর্চ্চা।

জাপান হইতে জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত হেরাল্ড্‌ অব্‌ এশিয়া নামক একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের বাহিরে জাপানের মত এত দীর্ঘ কাল ধরিয়া এবং এত বিস্তৃতভাবে আর কোনও দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা হয় নাই। জাপানে ঠিক কখন সংস্কৃত অধীত হইতে আরম্ভ হয় বলা যায় না। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে ইহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত জাপানে আগমন করে। সপ্তম শতকের মাঝামাঝি চীনে "বৌদ্ধ-অনুবাদ-প্রতিষ্ঠানে" বিখ্যাত পর্য্যটক য়ুআন চ্যাং ও তাঁহার শিষ্যদের অধীনে কয়েকজন জাপানী পুরোহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিত। ৭৩৫ অব্দে বোধিসেন এবং ফাত্রিয়েৎ (Fattriet)* নামক দুজন ভারতীয় বৌদ্ধ যখন জাপানে পৌছেন, তখন হইতেই সংস্কৃতের চর্চ্চা বিশেষভাবে আরম্ভ হয়।

রেইসেন (Raisen) নামক সংস্কৃতজ্ঞ একজন জাপানী পণ্ডিত ৮০৪ অব্দে চীন যাত্রা করেন এবং কালক্রমে তথাকার বৌদ্ধ-অনুবাদ-প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রাজ্ঞ নামক একজন ভারতীয় পুরোহিতের সহিত একযোগে তিনি একটি বৌদ্ধ সূত্রের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। তাহার জাপানী নাম শিঙ্কি কোআঙ্গ্যো; ইহা এখনও তত্রত্য বৌদ্ধদের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। আরও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিত চীনদেশে গিয়া কাজ করেন ও তথায় দেহ-ত্যাগ করেন। কঙ্গো নামক একজন ৮১৪ অব্দে চীন হইতে রওনা হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং এখানে কিছু-দিন থাকিয়া, নিঃসন্দেহ নানা মূল্যবান্‌ তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, চীনে ফিরিয়া যান। সেই পুরাকালে জাপানী সম্রাট সাগার পুত্র কুমার তাকাওকা জাপান হইতে ভারতবর্ষ রওনা হন, কিন্তু কোচিন-চীনের অন্তর্গত লাওস নামক স্থানে পীড়িত হইয়া মারা যান।

জাপানে সংস্কৃতশিক্ষার প্রারম্ভ হইতে তোকুগাওা আমল পর্য্যন্ত মোটামুটি ১২০০ বৎসরে নাম করিবার যোগ্য তিনশত জন সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা নিশ্চয়ই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি যুদ্ধ ও অন্য নানাকারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন প্রায় ১৫০ খানি পুঁথি অবশিষ্ট আছে। তা ছাড়া, সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ হইতে কিম্বা চীনের মধ্য দিয়া আনীত বিস্তর সংস্কৃত পুঁথি, লিপি ও তক্তি জাপানে রক্ষিত আছে। প্রাচীন লিপির নমুনাস্বরূপ সে-সবগুলিই মূল্যবান্‌; তা ছাড়া অনেকগুলির বৈজ্ঞানিক গুরুত্বও আছে।

শেষোক্ত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে হোর্যুজি মন্দিরে রক্ষিত তাল-পাতার পুঁথির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডক্টর মোক্ষমুলর ইহা সম্পাদন করিয়া অক্সফর্ডে প্রকাশ করেন। এই জাতীয় গ্রন্থের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন নমুনা। অল্পদিন হইল ইহারই মত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আর-একটি তাল-পাতার পুঁথি ক্যোতোর চিওন্‌-ইনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় ইহাদেরই মত মূল্যবান্‌ পুরাতন উপাদান য়ামাতোর হোর্যুজি, কোকিজি ও কৈয়ু-ওজি মন্দির-সকলে ও মির মিইদেরা ও সৈক্যোজি মন্দিরে, এবং কোয়াসানে রক্ষিত আছে। জাপানীদের সংস্কৃত পুঁথি ও অন্যবিধ লিপির ভাণ্ডার আচার্য্য জুঞ্জিরো তাকাকুসু এবং বৌদ্ধ শ্রমণ একাই কাওাগুচির আনীত সংগ্রহ দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। এই সকল উপাদান এখন জাপানের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অগ্রণী আচার্য্য তাকাকুসুর তত্ত্বাবধানে পরীক্ষিত ও অধীত হইতেছে। তাঁহার পরিশ্রমের ফল শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

* ভারতীয় নাম এরূপ হয় না; বোধ হয় কোন ছাপার ভুল হইয়া থাকিবে। কিম্বা ভারতীয় নামটি জাপানী ভাষায় এই প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে। প্রবাসী-সম্পাদক।

—১৮৬৮ অব্দে সম্রাটের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হইবার পর সংস্কৃতের প্রতি নূতন করিয়া লোকের দৃষ্টি পড়ে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন পদ্ধতি শিক্ষা করিবার জন্য গত ৪০ বৎসরে ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জাপানী যুবককে পাঠান হইয়াছে। ফলে এখন জাপানে অনেকগুলি ইউরোপে-শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম, বুন্যু নাঞ্জো, জুঞ্জিরো তাকাকুসু, আচার্য্য ওগিহারা, অধ্যাপক আনেসাকি, আচার্য্য সাকাকি, এবং আচার্য্য ওতানাবে। তোকিয়ো ও কিয়োতো রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে, এবং নানা বৌদ্ধসম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত সাতটি কলেজে সংস্কৃত শিখান হয়। উক্ত দুটি রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৬০ জন ছাত্র সংস্কৃত পড়ে; বৌদ্ধ কলেজগুলিতে অনেক শত ছাত্র সংস্কৃত শিখে। সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার সহকারে জাপানীরা ভারতবর্ষের নিকট নিজেদের ঋণের পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছে, এবং জাপানী ও ভারতবর্ষীয়দের প্রকৃতি ও সভ্যতার সাদৃশ্য বুঝিতে পারিতেছে।

আমাদের দেশের ও জাপানের সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে পরিচয় হওয়া কর্ত্তব্য। জাপানে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি, লিপি, তক্তি যাহা আছে, সমুদয়ের প্রতিলিপি আমাদের দেশের বড় বড় লাইব্রেরীর জন্য আনীত ও তথায় রক্ষিত হওয়া উচিত।

বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ।

বেসরকারী অনেক সমিতি এবং গবর্ণমেণ্ট এখনও বিস্তর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোককে সাহায্য করিতেছেন। মধ্যে চাউল সামান্য সস্তা হইয়াছিল, এখন আবার কিছু দর বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আরও একমাস সাহায্য করিবেন। বেসরকারী অনেক সমিতিও তাহাই করিবেন। কত দিন পর্য্যন্ত সাহায্য করা দরকার? এপ্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, বস্তুতঃ বাঁকুড়া জেলায় এবং অন্য অনেক জেলায় সুবৎসরেও বিস্তর লোক একবেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সুতরাং ঠিক্ কথা বলিতে গেলে এসব লোকের বারোমাসই সাহায্যের প্রয়োজন। যাহা হউক, আপাততঃ পাঠকেরা জানিয়া রাখুন অক্টোবর মাসের শেষ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষক্লিষ্টলোকদিগ সাহায্য করিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যশিক্ষা।

আমাদের দেশে যে-সব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া ও হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুযায়ী। বি বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশ্চাত্য প্রাচীন আদর্শ এই যে তথ কেবল এরূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, এবং হৃদয়ের সদ্বৃত্তি-সকলের উৎব সাধিত হয়। সাক্ষাৎভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কো বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া এই আদর্শের অন্তর্ভূত নহে; যদি যাহারা এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পায়, তাহারা অনেে তাহাদের শিক্ষাকে অর্থ-উপার্জ্জনের উপায়ে পরিণত করিয় থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আধুনিক অনেক বিশ্ববিদ্যাল ঠিক্ এই আদর্শ অনুসৃত হইতেছে না; তাহারা কল কারখানায় যে-সব শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তু করিতে, এবং জাহাজাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখাইতেছে বাণিজ্যও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতেও কোথাও কোথাও সাক্ষাৎভাবে অর্থকরী বিদ্য শিখান হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও চিকিৎসা বিদ্যা, ওকালতী-বিদ্যা, শিক্ষাদান-বিদ্যা এবং এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখান হয়। এগুলি বৃত্তি-শিক্ষা। সুতরাং অর্থকরী-বিদ্যা বলিয়া বাণিজ্য শিখাইতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু বি-এ পর্য্যন্ত শিখিবার মত বাণিজ্যে কিছু আছে কিনা, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। যাঁহারা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যের বি-এ পরীক্ষার বিষয় ও পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে, এবং তাহা সাধারণ বি-এ পরীক্ষার অন্য অনেক বিষয়ের মত কঠিন। বই পড়িয়া বাণিজ্য শিখা যায় কিনা, সে প্রশ্নও উঠিতে পারে। কতক দূর নিশ্চয় শিখা যায়; বাকী অর্থাৎ পাকা ব্যবসাদার হওয়া অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অন্যান্য বৃত্তি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। আইনের পরীক্ষা পাশ করিলেই উকীল হয় না; আদালতে কাজ করিতে-করিতে পাকা উকীল হয়।

ডাক্তারী পাশ করিলেই চিকিৎসায় পারদর্শিতা জন্মে না। রোগী দেখিতে দেখিতে বিচক্ষণতা জন্মে। অতএব, শুধু বই পড়িয়া বণিক হওয়া যায় না বলিয়া বাণিজ্য শিক্ষা দিয়া তাহার উপাধি দিবার প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলা চলে না। বোম্বাই বাণিজ্যপ্রধান জায়গা; সেখানে অনেক দেশী সওদাগরের আফিসে কার্য্যতঃ বাণিজ্য শিখিবার কতকটা সুবিধা আছে। তথাপি সেখানে বাণিজ্যের কলেজ স্থাপিত হইয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা লইয়া ব্যাচিলার্ অব্ কমার্স্ উপাধি দেন। বাণিজ্যে বাঙালীরা অগ্রসর নহেন। এখানে বোম্বাইয়ের মত দেশী বড় বড় সওদাগর নাই। ইংরেজদের আফিসে সামান্য কেরানীগিরি ছাড়া বাঙালীরা আর কোন কাজ বড় পায় না। এখানে বাণিজ্য শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। শিক্ষা দিবার পর পরীক্ষা লইয়া উপাধি দেওয়াও দরকার। কারণ উপাধি দিলে বাণিজ্য-শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদিগকে অন্য বি-এদের সমকক্ষ বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে, এবং তাহাদের তদনুরূপ আদর হইতে পারে।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন।

ভারতসাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় এবং ভিন্ন-ভিন্ন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানেরা আপনাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা অনুসারে যতজন প্রতিনিধি তাঁহারা পাইতে পারেন, তদপেক্ষা বেশী প্রতিনিধি তাঁহারা নির্ব্বাচন করেন। তাঁহারা বলেন, মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাওয়া উচিত। আমরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথার বিরোধী। উহা কোন শক্তিশালী উন্নত সভ্যদেশে প্রচলিত নাই; এবং শক্তিশালী হইবার পথও উহা নহে। একমাত্র অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বাস্নিয়া-হের্জেগোবিনা প্রদেশে উহা প্রচলিত আছে। সেখানে কিন্তু শুধু মুসলমান নয়, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই, আপন-আপন সংখ্যা-অনুসারে, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। তথাপি ফল যাহা হইয়াছে তাহা ইংরেজী বিশ্বকোষ এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার ৪র্থ খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে।

"Considerable bitterness prevails between the rival confessions, each aiming at political ascendancy but the government favours none."

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করায়, প্রতিদ্বন্দ্বী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বিদ্বেষ আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কাহারও প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন না।"

রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আমাদের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরই এক। সাধারণ আইন সকলেরই জন্য এবং ট্যাক্স সকলকেই সমভাবে দিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্ম-অনুসারে প্রতিনিধি চাওয়া উচিত নয়। বাংলা দেশে মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে বেশী। তাঁহারা চেষ্টা করিলে শীঘ্রই শিক্ষাতে হিন্দুদের সমান হইতে পারিবেন। তখন দেশ হিতৈষী শিক্ষিত মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা ব্যবস্থাপক সভায় যথেষ্ট হইবে। মিউনিসিপালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডে তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রের অভাব হইবে না। বঙ্গে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন নাই। কয়েক বৎসর ধৈর্য্যসহকারে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা করিলে যে ফল লাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহার জন্য জাতীয় ঐক্যনাশক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনক একটি কুপ্রথা প্রচলিত করিতে চাওয়া স্বদেশানুরাগের পরিচায়ক নহে।

যিনি যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন, তাঁহার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে অনুগ্রহলব্ধ অধিকার থাকিলেই বা পাইলেই শক্তি-শ্রীবৃদ্ধি হয় না। হিন্দুরাজত্বের অবসান হয় হিন্দুর অযোগ্যতায়, মুসলমানরাজত্বের অবসান হয় মুসলমানের অযোগ্যতায়। একটি সম্প্রদায় কতকগুলি প্রতিনিধিত্ব পাইলেই দেশের বা তাহাদের সুদিন ফিরিবে না। সমুদয় এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় যোগ্য না হইলে দেশ শক্তিশালী হইবে না। আবার, সমুদয় জাতি শক্তিশালী না হইলে কোনও সম্প্রদায়েরই সম্পূর্ণ উন্নতি হইবে না।

ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের আর-একটি ভাবিবার কথা এই আছে, যে, কোন একটি সম্প্রদায়ের দ্বারাই দেশের সর্ব্ববিধ অভাব দূর হইতে পারে না, এবং সর্ব্ববিধ গৌরব প্রতিষ্ঠিত ও শক্তি পুনর্লব্ধ হইতে পারে না। এমন কোন্ সম্প্রদায় ভারতে আছে যাহা হইতে সমুদয় শ্রেষ্ঠ ঋষি, সাধু, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সমাজসংস্কারক, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, শিল্পী, দেশপ্রেমিক বীরযোদ্ধা, কারখানা

পরিচালক, সওদাগর, নাবিক, কৃষক, শ্রমজীবী, জন্মিয়াছে বা জন্মিতে পারে? সকলের ঐক্য ও সহযোগিতা ভিন্ন একজনেরও পূর্ণ উন্নতি এবং পূর্ণ শক্তিলাভ ঘটিতে পারে না। এই জন্য সকলের একযোগে কাজ করা উচিত। সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে আসুন; কিন্তু যোগ্যতা দ্বারা আসুন, সাম্প্রদায়িক টিকিট দেখাইয়া নহে। আমরা অযোগ্য হিন্দুও চাই না, অযোগ্য মুসলমানও চাই না, অযোগ্য খৃষ্টিয়ানও চাই না; যোগ্য লোক চাই,—তা তিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন।

প্রবাসীর পাঠিকাদিগের প্রতি।

নিম্নলিখিত আবেদন-পত্রটি পাঠ করিয়া যথাসাধ্য অর্থ-সাহায্য করিতে আমরা প্রবাসীর পাঠিকাদিগকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

ওঁ

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে স্মৃতি-মন্দির।

সমগ্র নারীজাতির প্রতি আবেদন।

সবিনয় নিবেদন,

যিনি একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক, মানবমনের বিচিত্র ভাবরাশির মূলে সত্যের যে অখণ্ডস্বরূপ বিদ্যমান, ভগবৎকৃপালব্ধ সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সেই স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া যিনি ধন্য হইয়াছিলেন, যে ক্ষেত্রে নিত্যকাল আপনা আপনি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় হইয়া রহিয়াছে, ধর্ম্মসমন্বয়ের জন্য যেখানে মানবচেষ্টার অপেক্ষা নাই, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য আত্মার সেই বিশুদ্ধ স্বরূপই যাঁর জীবনের একমাত্র প্রতিষ্ঠাভূমি, এবং সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যিনি সমগ্র জগতের নরনারীকে এক অভেদ মিলনক্ষেত্রে আহ্বান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ভারতের চিরন্তন ইষ্টদেবতা আত্মার মহামহিমান্বিত ভাবকে পরিস্ফুট আকারে লোকসমক্ষে প্রচারিত করিয়া বর্ত্তমান যুগে ভারতকে যিনি স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাঁর আত্মার অমোঘ শক্তির প্রভাবে ভারতের তৎকালীন বিক্ষিপ্ত ও আচ্ছন্ন দৃষ্টি নিজের লক্ষ্যস্থানকে দেখিতে বা চিনিতে পারিয়াছে, অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী মানব-শিক্ষার ফল একাধারে যাঁহাতে ফলবান বলিলেই হয়, সেই সামঞ্জস্যের অবতার, আত্মার স্বাধীনতা ঘোষণাকারী, পরম জ্ঞানী, সাধকশ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদিকর্ত্তা, নিরভিমান, নির্ভীক, উন্নতশীল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দেশবাসীরা তাঁহার জন্মস্থান হুগলীজেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে একটি মন্দির নির্ম্মাণ ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থাবিধানে উদ্যোগী হইয়াছেন।

বিরাট পুরুষের স্মৃতিচিহ্নস্থাপনের বিরাট আয়োজনে উদ্যোক্তা মহাত্মাগণ নারীজাতিকে বাহিরে রাখা দূরে থাকুক, একার্য্যে নারীর অধিকারই তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই মহাপুরুষের কার্য্য নারীর যোগ ব্যতীত একান্ত অসম্ভব।

রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যে নরনারীর অধিকার তুল্যরূপে স্বীকৃত হইলে রাজার স্মৃতি সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এই বিবেচনায় তাঁহারা যাহাতে নারীজাতিকে উচ্চস্থান দান করিয়া, শুধু বাক্যে নয়, ভাবে নয়, পরন্তু কার্য্যে রাজার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন। এই ব্যাপারে দেশমধ্যে যে একটি নব শক্তি উদ্বোধন অনুভূত হইতেছে তাহাতে আর ভুল নাই। রাজার অশরীরী আত্মার শক্তি যেন আজ এই কার্য্যের কর্ণধার হইয়া এই কর্ম্মতরীকে কূলে উত্তীর্ণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছে। কে জানে পরিণামে ইহা কি ফল প্রসব করিবে?

যিনি দেহ ধারণ করিয়া একসময় সমগ্র ভারতকে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন আজ দেহমুক্ত হইয়া তাঁহার অদৃশ্য শক্তি যে আবার কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কে তাহা জানে? দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায়ের আত্মাতে পরমাত্মার যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল সেই ইচ্ছা আজ রাজার স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়া আবার কোন্ অভূতপূর্ব্ব মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কে তাহা জানে? পরমাত্মার লীলা বুঝিতে মানবের সাধ্য কোথায়? রাধানগর যে শীঘ্রই ভারতের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইবে তাহাতে আমাদের আদৌ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান যুগে নরদেবতার পূজা বোধ হয় এই রাধানগরেই প্রথম আরম্ভ হইবে। যাঁহাকে আমরা যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া সম্মান করিতেছি তাঁহার পূজার উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে যে অর্থের অভাব হইবে তাহা মনে হয় না।

এক্ষণে রাজার কার্য্যে সমগ্র নারীজাতিকে আহ্বান করিবার জন্য এই আবেদন-পত্র লিখিত হইতেছে; হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পার্সী, জৈন, য়িহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের নারীগণ রাজার কার্য্যে অগ্রসর হউন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। অর্থ, সামর্থ্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, যিনি যাহা দিয়া পারেন, রাজার কার্য্যের সহায়তা করুন। রাজার স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গৌরব রক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

অখণ্ড আত্মার পূজায় অসমর্থ জ্ঞানে চিরদিন পশ্চাদপদা নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে আত্মার স্বাধীনতায় অধিকারিণী হইয়াছেন, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অনধিকারিণী নারী আজ যাঁহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন, সেই মহাত্মার প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই মহা সুযোগ উপস্থিত। এই শুভ মুহূর্ত্ত সকলের জীবনে আসে না। রাজার কার্য্যে সহায়তা করিয়া নারীজাতি এক্ষণে আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকারিণী রূপে সমগ্র জগতের সম্মুখে স্বীকার করুন। যিনি যাহা দিতে পারেন তিনি তাহাই দিন, যিনি যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন তিনি ততটুকুই প্রয়োগ করুন, এই আমাদের নিবেদন। এই কার্য্যের সহায়তায় একটি পয়সা হইতে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, যিনি যাহা প্রদান করিবেন, সমান আদরে গৃহীত হইবে।

বিনা অর্থে এতবড় মহৎ অনুষ্ঠান কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে না; অতএব আমাদিগের ভরসা আছে যে ভারতরমণীগণ আমাদিগের এই আবেদন-পত্র একেবারে অগ্রাহ্য করিবেন না। যে কোন মহৎ-অন্তঃকরণা মহিলা যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাধিত করিবেন।

বিনীতা

শ্রীহেমলতা দেবী,

হেড আপিস:— পোঃ অঃ...শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

৭১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীঅবলা বসু,

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৬। ৯৩নং, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস,

৪নং উইলিয়ম লেন, কলিকাতা।

বাঙালী সৈন্যের সমাদর।

যে-সকল বাঙালীর ছেলে সিপাহী হইতেছে, তাহাদিগকে সমাদর করিয়া হাবড়া ষ্টেশন হইতে বিদায় দেওয়া হইতেছে এবং পথেও নানা স্থানে তাহাদের অভ্যর্থনা হইতেছে। কলিকাতার একটি নারীসভা সিপাহীদের প্রত্যেককে নানা-প্রকার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যে পূর্ণ একটি করিয়া ব্যাগ উপহার দিতেছেন। সৈন্যদের প্রতি এই-প্রকার প্রীতি প্রদর্শন করিয়া নারীরা মাতৃজাতির কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। কিন্তু উপহারের ব্যাগগুলিতে সিগারেট থাকায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের দেশী শিষ্টাচার পালন করিতে হইলে মাতৃস্থানীয়া নারীদিগের পক্ষ হইতে সন্তানস্থানীয় বালক ও যুবকগণকে সিগারেট উপহার দিবার প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, সিগারেট বালক ও যুবকদের পক্ষে হানিকর; সকল বালক ও যুবক যে ধূমপান করে, তাহাও নয়; করিলেও জননী ও ভগিনীরা এই অনিষ্টকর জিনিষ তাহাদিগকে উপহার দিবেন কেন? তাহারা অল্পবয়স্ক; বেঙ্গলী বলেন:—All of these boys were under-graduates and still students...... except Kumar Adhikram Mazumdar...and another..।

বেঙ্গলীতে পড়িয়া আরও দুঃখিত হইলাম যে সৈনিক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ছেলেদিগকে মাথাপিছু যে হাত-খরচা আড়াই টাকা করিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর "the Committee added Rs. 2-8 per head as cigarette money।" কি আশ্চর্য্য! অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ধূমপান নিবারণের জন্য বিলাতে ও অন্য কোন কোন দেশে আইন আছে, পঞ্জাবে এই-প্রকার আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ঐ প্রদেশে বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে ধূমপান শিক্ষা-বিভাগ নিষেধ করিয়াছেন; আর আমাদের কয়েকটি ছেলে, যাহাদের অধিকাংশ কাল ছাত্র ছিল, আজ সিপাহী হইবামাত্র তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট হইতে সিগারেট উপহার প্রাপ্ত হইল! যে দেশে প্রাচীনপন্থী ভদ্রসমাজে প্রৌঢ় পুত্র বৃদ্ধ পিতার নিকট ধূমপান করে না, সেদেশে, কমিটিতে অনেক বিবেচক লোক থাকিতে কেন এমন হইল জানি না। সেকেলে রীতি অনুসারে ছেলেদিগকে মিঠাই খাইতে টাকা দেওয়া হইত। সভ্যতার উন্নতি সহকারে মিঠাইয়ের জায়গা কি সিগারেট্ দখল করিবে? ধূমপান না করিলে বা মদ না খাইলে যে যোদ্ধা হওয়া যায় না, তাহাও নয়। শিখেরা তামাক খায় না; অনেক ইংরেজ সৈন্য মদ খায় না। তাহারা কম বীর নয়।

বিদেশী সুপ্রথা গ্রহণ এবং দেশী কুপ্রথা বর্জ্জন করায় দোষ নাই; বরং তাহা করাই উচিত। কিন্তু বিদেশী কুপ্রথার অনুকরণ অপকারী ও অতীব লজ্জাকর।

আনন্দের বিষয় দেশীয় প্রথা অনুসারেও জননী পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জাতীয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। বেঙ্গলীতে দেখিলাম:—

"Mrs. J. N. Mazumdar, mother of Kumar Adhikram Mazumdar, a distinguished graduate of the Calcutta University and a Vakil of the High Court, who was among the recruits, then garlanded the boys and blessed them with *chandan* and *durba*. The mother of another recruit, Atal Behary Mukherjee, also did the same. These ladies of the orthodox community came with their relations all the way for the express purpose of pouring forth mother's blessings on the lads."

তাৎপর্য্য। "শ্রীমান কুমার অধিক্রম মজুমদার ও শ্রীমান অটল বিহারী মুখোপাধ্যায় নামক দুজন সৈনিকের জননীরা চন্দন দূর্ব্বা দিয়া সৈন্যগণকে আশীর্ব্বাদ করেন। এই নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলাদ্বয় আশীর্ব্বাদ করিবার জন্যই দূর হইতে আত্মীয়দের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।"

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদল।

সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন:—

কতিপয় সম্পাদক বড় লাটের সহিত দেখা করিয়া ছাপাখানার সংক্রান্ত আইনের কঠোরতা হ্রাস করাইতে বাঞ্ছা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, কে কে দেখা করিতে যাইবে তাহাদের নাম দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করিয়া যাহাদিগকে যাইতে অনুমতি দিবেন, তাহারাই কেবল যাইতে পারিবে। সম্পাদক-সভা এই সর্ত্ত শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে রাজি হইয়াছেন। সম্পাদক-সভার সহিত আমাদের সংশ্রব নাই।

আমরা প্রথম হইতে বরাবর সম্পাদক-সভার সভ্য আছি। কয়েকমাস পূর্ব্বে যখন বড়লাটের কাছে কয়েকজন সম্পাদককে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইবার কথা প্রথম উঠে, তখন তাঁহাদের মধ্যে আমাদের নামও ছিল। তাহার পর যখন (সঞ্জীবনীতে উল্লিখিত) প্রতিনিধিত্বের সর্ত্ত সম্বন্ধে সভা হইতে আমাদের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমরা লিখিয়াছিলাম যে ঐ সর্ত্ত আমাদের অনভিপ্রেত নহে, এবং প্রতিনিধির তালিকায় যেন আমাদের নাম দেওয়া না হয়।

প্রেস-আইনের কড়াকড়িতে মুসলমানদের মুখপত্র কয়েকখানি উঠিয়া গিয়াছে। এইজন্য প্রতিনিধি সম্পাদকদের মধ্যে মুসলমান সম্পাদক দু একজন থাকিলে ভাল হইত। প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া কয়েক মাস পূর্ব্বে যে-সব সম্পাদকের নাম বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে লাহোরের মুসলমানদের ইংরেজী কাগজ অব্‌জার্ভারের সম্পাদকের নাম ছিল।" এখন কি কারণে তাঁহার নাম দেখা যাইতেছে না বলিতে পারি না।

আমাদের আয় ও কয়েদীদের ব্যয়।

জেলের কয়েদীদিগকে কোন দেশেই রাজার হালে রাখা হয় না; ভারতবর্ষে ত নহেই। যেরূপ খাদ্য, যেরূপ কাপড় ও বিছানা এবং রোগের সময় যেরূপ চিকিৎসা না হইলে তাহারা বাঁচিতে পারে না, তাহাদের জন্য তাহার বেশী কিছু ব্যবস্থা করা হয় না। সুতরাং জেলে এক একজন কয়েদীর জন্য গড়ে যত খরচ হয়, তাহার কম আয়ে জেলের বাহিরে একজন মানুষ সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এখন দেখা যাক্ ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশে ১৯০৫ সালে কয়েদীদের জন্য মাথা-পিছু খাদ্য, কাপড় ও বিছানা, এবং চিকিৎসায় কত ব্যয় হইয়াছিল। অন্যান্য ব্যয়ও আছে, যেমন পানীয় জলের বন্দোবস্ত, পায়খানার বন্দোবস্ত, প্রভৃতির জন্য; কিন্তু তাহা ধরিব না। কারণ আমাদের দেশে পল্লীগ্রামের লোকদের এসকল বাবতে কোন খরচ হয় না।

১৯০৫ সালে প্রত্যেক কয়েদীর গড় বার্ষিক খরচ।

প্রদেশ	খাদ্য	বিছানা ও কাপড়	চিকিৎসা	মোট
মধ্যপ্রদেশ	৩১।৯	৪৵১১	২/৪	৩৭॥/০
আগ্রা-অযোধ্যা	৪১৶/০	৪।৶৩	২॥৶৮	৪৮৵/১১
বিহার-ওড়িশা	৪৭॥/৯	৪॥৵১০	৬৸/১	৫৫/৮
বাংলা	৪৭৶/০	৬৵৩	৭॥৵১০	৬১।১

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কয়েদীদের জন্য সরকারের যত রকম খরচ হয়, সমস্ত ধরা হয় নাই। যে-সব নির্দ্দোষ মানুষ জেলে যায় নাই, জেলের বাহিরে বাস করে, খাওয়া পরা শোওয়া চিকিৎসা ছাড়া তাহাদের আরও অনেক রকম ব্যয় আছে। তাহাদিগকে গৃহ নির্ম্মাণ ও মেরামত করিতে হয়, সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হয় বা দেওয়া উচিত, জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি পারিবারিক ঘটনা উপলক্ষে নানা ক্রিয়াকলাপ করিতে হয়, এবং প্রতিবেশীদিগকে ভোজ দিতে হয়, ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে নানা পূজাপার্ব্বণ ও উৎসব উপলক্ষে ব্যয় করিতে হয়, তীর্থ দর্শন বা অন্যপ্রকার ভ্রমণের জন্য খরচ করিতে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এ-সব না ধরিয়া কেবল কয়েদীদের যে তিনরকমের ব্যয়ের ফর্দ্দ উপরে দেওয়া হইয়াছে, সেই-খরচ করিবার মত আয় ভারতবাসীদের আছে কিনা দেখা যাক্।

ভূতপূর্ব্ব বড়লাট কার্জ্জন একটা আন্দাজ করিয়াছিলেন যে ভারতবাসীদের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ৩০৲ টাকা। ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞ দাদাভাই নওরোজী প্রভৃতি, এবং ডিগ্‌বীপ্রমুখ ইংরেজ অর্থনীতিজ্ঞেরা মনে করেন যে কার্জ্জন ভারতবাসীদের আয় বেশী ধরিয়াছেন। সার রবার্ট গিফেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ সম্পাদক, অর্থনীতিজ্ঞ ও রাজস্ব-তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা ব্রিটিশ এসোসিয়েশ্যানের সম্মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশের বার্ষিক আয় এবং মোট পুঁজির একটি তালিকা উপস্থিত করেন। তাহাতে তিনি সমুদয় ভারতবাসীর এক বৎসরের মোট আয় ষাট কোটি পাউণ্ড ধরিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা মোটামুটি ৩০ কোটি ধরিলে, এক একজন ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয় ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০৲ টাকা হয়। এই অনুমানটা আমরা প্রকৃত আয় অপেক্ষা বেশী মনে করি। যাহা হউক, ইহাই প্রকৃত আয় বলিয়া ধরিলেও ইহার মানে কি দাঁড়ায়, বুঝা চাই। মনে রাখিতে হইবে যে ইহা গড়পড়তা মাত্র। সুতরাং অনেকের আয় ইহা অপেক্ষা যেমন বেশী আছে, তেমনি অনেকের আয় ইহা অপেক্ষা কমও আছে। বার্ষিক আয় একশ দুশ, এক হাজার দু হাজার, বিশ পঞ্চাশ হাজার, অনেক লক্ষ, কতকগুলি লোকের আছে। সুতরাং বার্ষিক ত্রিশ টাকা অপেক্ষা কম আয়ও বিস্তর লোকের আছে; একেবারে আয়শূন্য ভিক্ষুকও ভারতবর্ষে হাজার হাজার আছে। এই সমস্ত তথ্য বিচারের মধ্যে না আনিয়া যদি ধরা যায় যে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় অন্যূন ত্রিশ টাকা, তাহা হইলেও দৃষ্ট হইবে, যে, অন্যান্য সমুদয় ব্যয় বাদ দিয়াও কেবল খাই-

খরচও ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের নাই। কয়েদীদের জন্য সর্বাপেক্ষা কম খরচ হয় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে। কিন্তু সেখানেও কেবলমাত্র খাইখরচই হয় বার্ষিক ৩১।৯। আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশদ্বয়ে খাইখরচ ৪১১/০, বিহার-ওড়িশা-ছোটনাগপুরে ৪৩৷৵৯ এবং বঙ্গে ৪৭।৶০। বার্ষিক ত্রিশ টাকা আয় হইতে এই ব্যয়ের সঙ্কলন হইতে পারে না। সঙ্কলন হয় অনাহার, পরান্নভোজিতা, ভিক্ষা বা চুরি দ্বারা। খাইখরচের উপর অন্য খরচও আছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে ভারতবর্ষের কোটিকোটি-লোক আধপেটা খাইয়া জীর্ণ কুঁড়েঘরে বাস করিয়া প্রায় নগ্ন থাকিয়া অশিক্ষিত অবস্থায় সমস্ত জীবনটা নিরানন্দে কাটায়। রোগ হইলে অধিকাংশ লোকেরই যে চিকিৎসা হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই যে ঘোর জাতীয় দুর্দ্দশা, ইহার জন্য কাহার প্রাণ কাঁদিতেছে? দারিদ্র্যের প্রতিকারের জন্য সচ্ছল অবস্থার শিক্ষিত দেশবাসীরা কি করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টই বা কি করিতেছেন? যে দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া বিদেশী কত জাতির ধনদৌলতের কারণ হইয়া আসিতেছে, তাহার সন্তানেরা অশিক্ষিত, অভুক্ত, নগ্ন, রুগ্ন, নিরাশ্রয় অবস্থায় কালযাপন করে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু ইহার জন্য দোষী প্রধানতঃ আমরাই।

গতানুশোচনা না করিয়া এখন কিরূপে দেশে ধন বাড়িতে পারে এবং তাহা কয়েকটি লোকের বাক্সে বা ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা না থাকিয়া পরিশ্রমী সমুদয় দেশবাসীর মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিভক্ত হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা দেশের মনস্বীদের কর্ত্তব্য। পরের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মূর্খতা, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিলেও চলিবে না। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মীঃ, দৈবেন দেয়ম্ ইতি কাপুরুষা বদন্তি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আয়।

ভারতবাসীদের আনুমানিক আয়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সার রবার্ট গিফেন ভারতবাসীদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় ৩০৲ টাকা ধরিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের লোকদের আয় কিরূপ ধরিয়াছিলেন দেখা যাক্। বিলাতের লোকদের মোট আয় ধরিয়াছিলেন ১৭৫ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ২৬২৫ কোটি টাকা। বিলাতের লোকসংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চারিকোটি। সুতরাং প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় দাঁড়াইতেছে ৫৮৩।/৪। তার পর কানাডাবাসীদের মোট আয় ১৯০৩ সালে ধরিয়াছিলেন ২৭,০০,০০,০০০ সাতাইশ কোটি পাউণ্ড। ১৯০১ সালে কানাডার লোকসংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৩১৫। সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় দাঁড়াইতেছে ৫০পাউণ্ডের অর্থাৎ ৭৫০৲ টাকার উপর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের লোকদের আয়ও এইরূপ বেশী বেশী। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উল্লেখ অনাবশ্যক। এই তুলনা হইতে আমাদের দারিদ্র্য যে কিরূপ তাহা বুঝা যাইবে।

দারিদ্র্যের ফল।

দারিদ্র্যের ফল অনাহার ও অল্পাহার, দুর্ব্বলতা, দেহের নগ্নতা, গৃহহীনতা বা জীর্ণগৃহে বাস, অসুস্থতা ও রোগ, ভীরুতা, অজ্ঞতা, অকালমৃত্যু। দারিদ্র্যের অন্য ফল, আজীবন ঋণে জড়িত থাকা ও তাহার জন্য মনুষ্যত্বলোপ; আজীবন পরের গলগ্রহ থাকা বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন এবং তাহার জন্য মনুষ্যত্ব লোপ; চুরি, ডাকাতি, প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা, এবং এই প্রকারে জীবনকে ব্যর্থ ও কলঙ্কিত করা। ইহার উপায় কে করিবেন? কেবল কতকগুলি কথা বলিলে, কেবল ভাবের উচ্ছ্বাস দেখাইলে প্রতিকার হইবে না। দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, রাষ্ট্রীয় শক্তি ও অধিকার লাভের, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির যে-সব যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া অন্যান্য অনেক দেশের লোকেরা আপনাদের আর্থিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিয়াছে, আমাদিগকেও ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারে পরিবর্ত্তিত আকারে, তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অন্য সব দেশ সম্বন্ধে বহি পড়িতে হইবে, অন্য সব দেশে গিয়া অনুসন্ধান করিয়া নানা তথ্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু মাছি-মারা কেরাণীর মত নকল করিলে চলিবে না। বুদ্ধি খাটাইয়া ভারতবর্ষের উপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে।

বাঁকুড়ার গরুর গাড়ী।

স্থানীয় অভাব অভিযোগের কথা সাধারণতঃ মাসিক পত্রে আলোচ্য নহে; কিন্তু যে কারণে আমরা বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের কথা বৎসরাধিক কাল লিখিয়া আসিতেছি, সেই কারণে ঐ জেলার আর একটি কথা লিখিতেছি। বঙ্গদেশ-প্রবাসী ইংরেজ বণিক্‌দের স্বার্থ রক্ষার্থ কমার্স নামক একটি বাণিজ্যিক সাপ্তাহিক কাগজ আছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে, বাঁকুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সম্প্রতি ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে গোরুর গাড়ীর চাকা সম্বন্ধে যে হুকুম জারী করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। বোর্ড বলিয়াছেন, যে-গাড়ীর চাকার লোহার হাল ২ ইঞ্চির কম চৌড়া, সে গাড়ী জেলার রাস্তায় চলা ফিরা করিতে পারিবে না। ফল এই হইবে যে উৎপন্ন শস্য প্রয়োজন-মত নানাস্থানে নীত হইবে না; তাহাতে প্রজাদের ক্ষতি, বাণিজ্যের ক্ষতি, এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণে বাধা। এখন লোহার দাম তিন চার গুণ বাড়িয়াছে। এখন এক জোড়া হা'লের দাম ১২ টাকা বা ততোধিক। জেলায় প্রায় পাঁচ লক্ষ গাড়ী আছে। ষাট লক্ষ টাকা খরচ করিয়া প্রজারা নূতন হা'ল দিবে কেমন করিয়া? তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্যই দেশময় চাঁদা উঠাইতে হইতেছে। এইরূপ অনেক কথা কমার্স লিখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় এরূপ হুকুম এখন চালান ভাল নয়। যুদ্ধ থামিবার পর লোহার দাম পূর্ব্ববৎ হইলে তখন শহরের পাকা রাস্তা সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ করা না করা সম্বন্ধে বিবেচনা হইতে পারে। গ্রাম্য জংলী রাস্তা সম্বন্ধে এরূপ হুকুমের কোন প্রয়োজন নাই। কমার্স বলেন:—

The Calcutta Corporation issued a similar order some time ago; but they were compelled to withdraw it, as it was found quite unworkable. If Calcutta, the first city of India, found it unworkable how much more must this be the case in a small moffusil district?

বাস্তবিক যদি এরূপ হুকুম করিয়া তদনুসারে কাজ করান সোজা নহে বলিয়া কলিকাতা মিউনিসিপালিটী তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি ছোট দরিদ্র মফঃস্বলের জেলায় ইহা চালান যে দুঃসাধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

বঙ্গের মন্ত্রিসভার বর্ত্তমান দেশী সভ্য নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা ঐ কার্য্য হইতে অবসর লইবার তাঁহার স্থানে সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে কার্য্য করি[illegible] জন্য গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এমন একটি ব্যাপ[illegible] কি প্রকারে ঘটিল, বুঝিতে পারিলাম না। সিংহ মহা[illegible] ইহার পূর্ব্বে কিছুদিন বড় লাটের মন্ত্রিসভার কাজ করি[illegible] ছিলেন; তাহাও স্বেচ্ছায়, কার্য্যকাল সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ত্যাগ করেন। তাঁহার তখনকার মাসিক বেতন ৬৬৬৬৷৵ তাঁহার ব্যারিষ্টারীর আয় অপেক্ষা অনেক কম ছিল[illegible] এখন বঙ্গের মন্ত্রিসভার সভ্যরূপে যে মাসিক ৫৩৩৩৷৴ বেতন পাইবেন, তাহা আরও কম। সুতরাং তি[illegible] আয়ের জন্য এই কাজ লন নাই। বড় লাটের মন্ত্রিসভা[illegible] সভ্যের পদগৌরব বঙ্গের মন্ত্রিসভার পদগৌরব অপেক্ষ[illegible] অনেক কম। সুতরাং পদগৌরবের জন্য তিনি এই কা[illegible] গ্রহণ করেন নাই নবাব সাহেব মন্ত্রী হইবার আগে একজ[illegible] সাধারণ রকমের হাইকোর্টের উকীল ছিলেন; সিংহমহাশ[illegible] হাইকোর্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা অন্যতম প্রধান ব্যারিষ্টার এব[illegible] এড্‌ভোকেট জেনারেল। সুতরাং নবাব সাহেবের পদে নিযুক্ত হওয়াও তাঁহার কোন সম্মানবৃদ্ধির বা লোভের কারণ হইতে পারে না। বেশ বুঝা যাইতেছে যে তিনি নিজে এই পদের প্রার্থী হন নাই। কোন অজ্ঞাত কারণে, গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি এই কাজ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এরূপ অনুরোধ করা উচিত হয় নাই। অবশ্য যদি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পরে কোন প্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে তাঁহার পদগৌরবের লাঘব হইল, তাহার ক্ষতিপূরণ হইবে। আর্থিক ক্ষতি পূরণ হইবে না।

তিনি মন্ত্রিসভায় গিয়া, ইচ্ছা থাকিলেও, দেশের বিশেষ কোন উপকার করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না। রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের প্রণালী না বদলান পর্য্যন্ত, দেশবাসী যিনি যত বড় কাজেই নিযুক্ত হউন না, আমরা অসামান্য কোন হিতের প্রত্যাশা করিতে পারি না। অবশ্য যতদিন স্বরাজ-লাভ না হইতেছে, ততদিন বড় বড় রাজকার্য্যে দেশবাসী

নিযুক্ত হওয়া ভাল। কিন্তু যে-কাজ একজন ৬০০০ টাকা বেতনের ইংরেজ করে, তাহার জন্য একজন ১৫।২০ হাজার টাকা রোজগারী ভারতবাসী চাই, ইহা বড় অসঙ্গত আবদার। ইংরেজকে মন্ত্রিসভার সভ্য হইবার জন্য কোন স্বার্থত্যাগ করিতে হয় না; যাঁহারা ঐ কাজ গ্রহণ করেন, তাঁহারা অর্থের জন্যই করেন; ঐ পদের বেতনে তাঁহাদের বেশ পোষায়। ভারতবাসীদের মধ্যেও এমন লোক লওয়া উচিত, যাঁহাদের ঐ টাকায় পোষায়। ১৫।২০ হাজার টাকা উপার্জ্জক ভারতবাসী ৬ হাজার টাকা উপার্জ্জক ইংরেজের সমান, কার্য্যত এই দৃশ্য জগতের সম্মুখে উপস্থিত করা আমরা অন্যায় মনে করি। অবশ্য যদি মন্ত্রিসভার সভ্য হইয়া দেশের বিশেষ মঙ্গল করিবার ক্ষমতা কোন দেশবাসীর জন্মিত, তাহা হইলে আমরা মনস্বীলোকদিগকে ত্যাগস্বীকার করিতে অনুরোধ করিতাম। তাহা যখন হয় না, তখন বৃথা অগৌরব ও অর্থনাশ সহ্য করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

হিন্দু বিধবা ও সধবার সংখ্যা

হিন্দু সকল-জাতির মধ্যেই বিধবা অপেক্ষা সধবার সংখ্যা বেশী। ইংরেজী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে বাংলা দেশের কয়েকটি জাতির সধবা ও বিধবার সংখ্যা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

জাতি	সধবা	বিধবা
বাগদি	২০০৪৭৬	১১১৫৭৪
বৈদ্য	১৫৮১০	৭৫৩১
বারুই	৩১৩৯৬	১৫৭৯৫
বাউরী	৬৬৬২৩	২৩২৯৪
ভূঁইমালী	১৫৭২২	৮৯২২
ব্রাহ্মণ	২৫২৭৮৭	১৪০৫৭৪
চামার	১৯৭২১	৫৯৯১
ডোম	৩২৭৭৯	১২৯৭২
গন্ধবণিক	৫৯৮৭	২৬৩২
কায়স্থ	২২৫৪৮৫	১৪৫৫৮৯
নমঃশূদ্র	৩৮৭৭৬৯	২২৮৬৪২

সর্ব্বভুক্ ইংরেজী সাহিত্য।

কোথাও বাণিজ্য কোথাও বা প্রভুত্ব ও বাণিজ্য করিতে ইংরেজের আগমন হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে ধন আহরণ করিয়া ইংরেজ ধনী হয়। কিন্তু অন্য প্রকারের ধনও ইংরেজ আহরণ করে। পৃথিবীতে উন্নত, অনুন্নত, বিশাল বা স্বল্পায়তন এমন কোন সাহিত্য নাই, যাহার কোন না কোন বহি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত না হইয়াছে। এই প্রকারে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে পৃথিবীর অপর সমুদয় সাহিত্যের কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপীয় অপর সমুদয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশের অনুবাদ ইংরেজী সাহিত্যে আছে।

যে-সকল অসভ্য-জাতির কোন লিখিত সাহিত্য নাই, ইংরেজ তাহাদের গান, উপকথা, কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে।

এই-সব কারণে ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির চিন্তা ভাব ও কল্পনায় পুষ্ট হইয়াছে, এবং ইংরেজ জাতির বুদ্ধি প্রতিভা ও কল্পনার বিকাশের সাহায্য করিতেছে। ইংরেজের তুলনায় পৃথিবীর নানা দেশে বাঙালীর গতিবিধি অতি সামান্য। কিন্তু আমরা যে-পরিমাণে বিদেশে যাই, সে-পরিমাণেও তথাকার সাহিত্যের রত্নরাজি মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতে চেষ্টা করি না। ইংরেজী ও ফরাসী হইতে কিছু অনুবাদ হইয়াছে, বাকী অন্য কোন আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা হইতে কিছু অনুবাদ হয় নাই। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভাষার মধ্যে মূল গ্রীক হইতে বোধ হয় দুখানির বেশী গ্রন্থের অনুবাদ হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ভাষার মধ্যে হিন্দী গুরুমুখী ও ওড়িয়া হইতে কিছু অনুবাদ হইয়াছে। মরাঠী, গুজরাতী, তামিল, কানাড়ী, প্রভৃতি হইতে হয় নাই। মডার্ন রিভিউয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতির ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া ইউরোপের ডচ, এবং ভারতের মরাঠী, গুজরাতী, কানাড়ী, প্রভৃতি ভাষায় উহা অনুবাদ করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়া আমাদের নিকট অনেক পত্র আসিয়াছে, এবং তৎসমুদয় যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে। অন্য ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনুবাদ করিবার চেষ্টা আমাদের মধ্যেও থাকিলে ভাল হয়।

সাহিত্যপরিষদের গ্রন্থাবলীর সস্তা দাম।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি মহাশয় সম্প্রতি উহার সভ্যগণকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে—

পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি যে-সকল সঙ্কল্প করিয়াছি, সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করার জন্য আপাততঃ পরিষদের আয় বৃদ্ধি একান্ত আবশ্যক। কেবল ভিক্ষার দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে যে সর্ব্বত্র সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, এই প্রকার আশা করা যায় না; পক্ষান্তরে উহার দ্বারা আপনাদের প্রত্যেকের গৌরব ম্লান হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। পরিষদের সদস্যেরা যদি সমবেত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। আপনাদের অল্প আয়াসেই পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া পরিষদের আয় বাড়িতে পারে। আমার অনুরোধ যে, আপনারা প্রত্যেকে অন্ততঃ ৫ পাঁচ জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া পরিষদের মঙ্গল বিধান করিবেন। আশা করি, আপনার-বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতাকাঙ্ক্ষী পাঁচ জন মাত্র ব্যক্তি নিশ্চয় থাকিবেন।

এত দিন বহু ব্যয়ে ও অশেষ যত্ন সহকারে পরিষৎ অনেক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে সাধারণো এই-সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয়, অন্ততপক্ষে যাহাতে পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের পুস্তকাগারে এই গ্রন্থগুলি স্থানলাভ করিতে পারে ইহার জন্য সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। সেই অভিপ্রায়ে ইহার সহিত প্রেরিত তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলি (সাধারণের পক্ষে যাহার মূল্য ৩২।৶০ টাকা তাহা) তিন মাস কাল পর্য্যন্ত ৫৲ পাঁচ টাকা মূল্যে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে পরিষৎ প্রস্তুত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আপনার কোন আত্মীয়কে এক সেট লইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। এইরূপে আপনাদের সাহায্যে সাহিত্য-প্রচার এবং পরিষদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং হাজার বছরের প্রাচীন বাঙ্গালায় বিরচিত বৌদ্ধ গান দোহা নামক তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আপনাদের জন্য উহাদের মূল্য যথাক্রমে ১৲, ২৲ ও ২৲ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করা সকল সভ্যেরই কর্ত্তব্য।

অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী মহাশয় ত্রিশ বৎসর শিক্ষাদানকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন, এবং গবেষণাকার্য্যেও তাঁহার নৈপুণ্য আছে, তাহা তাঁহার ছাত্রেরা জানেন। তদ্ভিন্ন তিনি যে ফলিত রসায়নে অর্থাৎ রসায়নী বিদ্যার সাহায্যে নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন কার্য্যে, বঙ্গদেশে একজন কৃতী অগ্রণী তাহাও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁহার একটি প্রেসিডেন্সী কলেজে রক্ষা করিবার জন্য এবং ফলিত রসা যাঁহারা অনুশীলন করিবেন তাঁহাদিগকে উৎসাহদ একটি ফণ্ড স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার কয়েক জন ছাত্র উদ্যোগী হইয়াছেন; যথা, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপা এম্-এ, রসিকলাল দত্ত ডি-এস্সী, রাজশেখর বসু এম সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ, যতীন্দ্রনাথ সেন এম্-এ পি-হ এস্, প্রিয়ব্রত সরকার এম্ এ বি-এস্সী। তাঁহাদের উদ্দেশ্যের আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সমর্থন করি। তাঁহা আবেদন-পত্র হইতে জানা যায় যে বেঙ্গল কেমিক্যাল এ ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কসের বিস্তৃত কারখানার গন্ধকদ্রা প্রভৃতি উৎপাদনের বিস্তৃত আয়োজনের মূলে তি ঐ কারখানার অন্যান্য নানা উন্নতিও তিনি করিয়াছিলে বেঙ্গল মিসেলেনী নামক আর-একটি রাসায়নিক কা খানারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক। না প্রকার ঔষধ ও অন্যবিধ নানা প্রয়োজনীয় রাসায়নি দ্রব্য উৎপাদনে সুরাসার আবশ্যক হয়। কিন্তু ভাল সুরাস বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ভাদুড়ী মহাশয় এক একটি সুরাসার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিবা উদ্যোগ করিতেছেন। এরূপ লোককে সম্মান প্রদর্শ অবশ্যকর্ত্তব্য। তাঁহার ছাত্রেরা উদ্যোগী হউন।

বর্ত্তমান কার্ত্তিক-সংখ্যা কেন ১০ই আশ্বিন বাহির হইল না।

আমরা আশ্বিনের কাগজে বলিয়াছিলাম যে কার্ত্তিকে প্রবাসী ১০ই আশ্বিন গ্রাহকদিগকে ডাকে পাঠাইব। তাহ করিতে না পারার কারণ গত ৫ই আশ্বিনের ঝড় প্রবাসীর রঙীন মলাট ও রঙীন ছবি ছাপিবার প্রেস বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয়। ঝড়ের দরুন বৈদ্যুতিক কারখানার সহিত ঐ প্রেসের সংযোগ নানাস্থানে নষ্ট হওয়ায় তার মেরামত করিতে সময় লাগিয়াছে। এইজন্য ২।৩ দিন বিলম্ব ঘটিল। অবশ্য, আমাদের সাধারণ নিয়ম অনুসারে কাগজ বাহির হইবার তারিখ যে ১লা কার্ত্তিক,



তিব্বতরাজ্যে তিনবৎসর

(জাপানী শ্রমণ এক'ই কাওাগুচির ভ্রমণবৃত্তান্ত)

প্রথম অধ্যায়।

বিদায়-উপহার।

১৮৯৭ সালে মে মাসে আমি বিদেশ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এই বিপদসঙ্কুল যাত্রার পূর্ব্বে আমি তোকিওর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিদায়ের পূর্ব্বে কত যে আমার প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল, কত যে প্রিয়জনের আন্তরিক শুভ-কামনা প্রাপ্ত হইলাম, কত চক্ষে যে আমার জন্য অশ্রু দেখা দিল, তাহা আর বলিবার নয়। আমাকে সকলেই বিদায়কালীন কিছু-কিছু উপহার দিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। আমি বলিলাম "পার্থিব কোন উপহার লইতে পারি না। আমার জন্য যদি কেহ কোন মানস কর, আমার জন্য যদি কেহ কিছু ত্যাগ কর, তবে সেই বহুমূল্য উপহার আমি লইতে প্রস্তুত।" যাহা হউক এই-প্রকার বহুমূল্য উপহার আমি পাইলাম। যাহাকে অতিরিক্ত সুরাসক্ত বলিয়া জানিতাম তাহাকে বলিলাম "আমার বিদায়কালীন যদি কিছু উপহার দিতে চাও তবে আমাকে ঐ সুরাপাত্র উৎসর্গ কর; আর সুরা স্পর্শ করিও না।" ধূম-সেবনে যাহার বড় আসক্তি তাহাকে বলিলাম "বন্ধু, আমার খাতিরে আর ঐটি মুখে তুলিও না।" এই-প্রকারে যাহার যে কু-অভ্যাস এবং পাপাসক্তি আছে জানিতাম তাহার নিকট তাহাই আমার বিদায়কালীন উপহার বলিয়া চাহিলাম। তোকিও হইতে ওসাকায় গিয়া এইপ্রকার আরও অনেক উপহার সংগ্রহ করিলাম; অনেকেই তাহা দিয়া আবার ফিরাইয়া লইয়াছেন,—অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু আজ বড় গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করিতেছি, যে, এতদিন পরে আজও অনেকে প্রাণগত যত্নে সেই বিদায়দিনের প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছেন। তাঁহারা আমায় যে অমূল্য-উপহার দিয়াছেন তাহা আমি অন্তরে গাঁথিয়া রাখিয়াছি। আমি যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়িয়া আজও অক্ষত দেহে বাঁচিয়া আছি, সে কেবল তাঁহাদের শুভ-কামনার অদৃশ্য শক্তির গুণে। আর এই সকল উপহার আমার প্রাণে কত যে বল আনিয়া দিয়াছে, দুর্দ্দিনে কত শক্তির সঞ্চার করিয়াছে তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নয়। আমাকে বিদায়কালীন উপহার দিতে গিয়া, কত লোক দারিদ্র্য-বরণ করিয়াছে;—কারণ প্রাণী-হত্যা যাহার ব্যবসা ছিল,—মৎস্য বিক্রয় করিয়া যে পরিবারের সংস্থান করিত,—তাহাদিগকেও আমি জীবহিংসা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন হইতে বিরত করিয়াছি। আজ আমার কি শান্তি! কি আনন্দ! আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির চেষ্টায় আজ জলে কত ক্ষুদ্র জীব সুখে বিহার করিতেছে, কত অবোধ পশু দারুণ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। এই সাধু চেষ্টার গুণে আমি হিমানীমণ্ডিত হিমালয়-শিখরে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, তিব্বতে ভীষণ-সঙ্কট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি, আমার পরম দয়াল ভগবান বুদ্ধ শত-শত বিপদ হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন।

এইপ্রকারে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। যাত্রার সকল আয়োজন প্রস্তুত; কিন্তু দেখি যে একশত ইয়েন ছাড়া আমার আর অর্থসম্বল নাই। কিন্তু মুক্ত-হস্ত বন্ধুগণের কৃপায় ত্বরায় ৫৩০ ইয়েন পাইলাম। প্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য ক্রয় করিয়া ৫০০টি মুদ্রা হাতে লইয়া—সাগর-বক্ষে পাড়ি দিলাম।

বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে তিব্বত-ভ্রমণরূপ দুঃসাধ্য-কার্য্য হইতে বার বার প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি যে কেন এই নিশ্চিত মৃত্যুর কূপে ঝাঁপ দিতেছি ইহা ভাবিয়া অনেকে ব্যথিত হইলেন। ওসাকা-নিবাসী বন্ধু মাকি বলিলেন "তোমার মত সাধু নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ পুরোহিতের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া লাভ কি, তুমি দেশে থাকিলে জাপানের অনেক কল্যাণ হইবে।" কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা অবিচলিত দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইয়া অনুরোধ উপরোধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। অবশেষে তাঁহারা বিষাদপূর্ণ অন্তরে সমুদ্র-তীরে আমায় বিদায় দিতে আসিলেন। বন্ধুদের বিদায়কালীন অভিবাদনের মধ্যে আমাকে বক্ষে লইয়া অর্ণবতরণী-সুন্দরী ইজুমি পশ্চিমমুখে যাত্রা করিল। ক্রমে আমার দেশের চিরপরিচিত পর্ব্বত-

শিখর কনগো শিগি ও ইকোমা সমুদ্রপারে অদর্শন হইল। যথাসময়ে মোজি পৌঁছিলাম; তৎপরে গেনকাই প্রণালী পার হইয়া আমাদের পোতখানি সোজা হংকং যাত্রা করিল। হংকংএ মিষ্টার টমসন নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের জাহাজে আরোহণ করিলেন। তাঁহার আগমন আমার একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রার নিরানন্দ ভাব দূর করিয়া একটু নূতনত্ব আনিয়া দিল। তিনি বলিলেন যে তিনি ১৮ বৎসর জাপানবাসী,—দেখিলাম যে ভদ্রলোকটি অতি চমৎকার জাপানী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। খৃষ্টধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা, সুতরাং আমার সহিত তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে খুব আলোচনা চলিত। জাহাজের সকলেই উৎসুক হইয়া আমাদের তর্কযুদ্ধ শুনিতেন; কিন্তু আমরা ইহাতে কখনও সুখী বই অসুখী হই নাই। আমি ত বৌদ্ধ শ্রমণ, আমার ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতে আমিও ক্ষান্ত ছিলাম না। কতবার জাহাজের সমুদয় লোক সমুদয় কর্ম্মচারীর নিকট আমার ধর্ম্মের কথা বলিয়াছি।

ক্রমে ১২ই জুলাই আমাদের জাহাজ সিঙ্গাপুর বন্দরে প্রবেশ করিল। আমি ফুজোকওান হোটেলে আশ্রয় লইলাম।

আমি সিঙ্গাপুরের জাপানী কনসালের সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমাদের জাহাজের কাপ্তেনের নিকট আমার সমুদায় কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আমায় দেখিয়াই বলিলেন "শুনিলাম তুমি নাকি তিব্বতে যাইতেছ। আমি জানিতে চাই তুমি কি করিয়া এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করিবে। কর্ণেল ফুকুসিমা তিব্বতযাত্রার সংকল্প করিয়া দারজিলিং-পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। সেই কাজ তোমা দ্বারা কেমন করিয়া সম্পন্ন হইবে তা জানি না। তুমি কি জান না তিব্বত প্রবেশ করা অসাধ্য ব্যাপার। দুরকম উপায়ে প্রবেশ করা যাইতে পারে,—হয় এক প্রকাণ্ড বাহিনীর আগে আগে; না হয় ভিক্ষুকের বেশে। এই দুই পন্থার মধ্যে কোন্‌টি তুমি গ্রহণ করিবে শুনি--" আমি উত্তর করিলাম "আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু, প্রথম উপায়টি আমার সাজে না, দ্বিতীয় উপায়টি আমায় গ্রহণ করিতে হইবে। তবে আমি কোন পন্থা ঠিক করি নাই—ঘটনাচক্রে যেমন ঘটিবে তেমনি করিব।" কনসাল সাহেব গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন।

আমি এখানে এক সপ্তাহ বাস করিলাম। এ ত্যাগের পুর্ব্বদিনে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটে, অতি আশ্চর্য্যরূপে আমি মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পা আমি বৌদ্ধ প্রচারক, ধর্ম্মপ্রচারই আমার কাজ। ত যেখানে যাই সুবিধা এবং সুযোগ পাইলে ধর্ম্মপ্রচার হইতে বিরত থাকি না। এখানেও সেই নিয়ম অনুস কাজ করিতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমার এই প্রচারের দ্বারাই আমি ত্বরায় সেই হোটেলের অ মহাশয়ের সুনজরে পড়িলাম। তিনি আমার প্রতি প্র হইয়া প্রতিদিন স্নানাগারে গরমজলে সর্ব্বাগ্রে অবগা করিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিতেন। উষ্ণজ অবগাহন জাপানী-মাত্রেরই কি প্রিয়!—আমিও আগ্র সহিত তাঁহার এই অনুগ্রহ ভোগ করিতাম। যাত্রার প দিন আমি ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠে মগ্ন ছিলাম—অধ্যক্ষ মহা ক্রমান্বয়ে দুইবার আসিয়া আমায় স্নান করিতে অনুর করিলেন—আমি পুস্তক ছাড়িয়া সেদিন আর উঠি পারিলাম না। আমার ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, সহ ভীষণ পতনের শব্দ হইল, সমুদয় বাড়ীখানি কাঁপিয়া উঠি শুনিলাম আমাদের স্নানাগারটি অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়াছ সেই সময়ে একজন জাপানী রমণী গৃহে স্নান করি ছিলেন, তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সমুদয় আবর্জ্জনার নী পড়িয়াছেন। মহিলাটির বাঁচিবার আশা ছিল না; স্থান হাঁসপাতালে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল বটে, বি আমার এই কষ্ট হইল যে আমি স্নান করিতে যাই ন বলিয়া ইনি মারা গেলেন। কেন আমি এই নিশ্চিত মৃ হইতে রক্ষা পাইলাম?

আমার মনে আশা হইল যে তিব্বতগমনরূপ সৌভা হইতে আমি কখন বঞ্চিত হইব না। ১৯এ জুলাই ঠি এই দুর্ঘটনার দিবস—আমি ইংরেজ জাহাজ লাইটনি চড়িয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। পথে পিনাং হই আমি ঐ মাসের ২৫এ তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিলাম কলিকাতার মহাবোধি সভায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম মহাবোধির সম্পাদক বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষা করিলাম। তিনি আমায় দারজিলিং যাইতে পরাম দিলেন। সেই সময় তিব্বত-প্রত্যাগত রায় শরৎচন্দ্র দা

দারজিলিংএ বাস করিয়া তিব্বতী-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন করিতেছিলেন। আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। শরৎবাবুর নিকট তাঁহার পরিচয়পত্র লইয়া আমি ২রা আগষ্ট যাত্রা করিলাম। এবং পরদিন দারজিলিংএ পৌছিয়া শরৎবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দারজিলিংএ একবৎসর।

১৮৯৭ সালের পূর্ব্বভারতের ভীষণ ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই আমি দারজিলিংএ যাই। দারজিলিংএর সর্ব্বত্র ঘরবাড়ী দেখিয়াই বুঝিলাম যে ভূমিকম্পের প্রকোপ এখানেও বড় কম হয় নাই। শরৎবাবুর বাড়ীখানির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলাম তাঁহার বাড়ী মেরামত হইতেছে। কিন্তু অবস্থা নানারকমে প্রতিকূল হইলেও শরৎবাবু আমায় আদরযত্নে আপ্যায়িত করিলেন। সেইদিন বিকালে কথাবার্ত্তার পর তিনি আমার দারজিলিং আগমনের কারণ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। এবং পরদিনই গুমপালের বৌদ্ধ মন্দিরে লইয়া গেলেন। সেই মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিত সেরাব গ্যাম্‌ৎসোর (অর্থাৎ বিদ্যার সাগর) সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার নামের "একাই" কথাটির অর্থও বিদ্যার সাগর। উভয়ের নামের মিল দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় বড় আনন্দিত হইলেন। ইনিই আমায় তিব্বতী ভাষা শিক্ষা দিবেন স্থির হইল। শরৎবাবু আমাদের উভয়ের মধ্যস্থতা করিতেছিলেন, আমার ইংরেজী ভাষার জ্ঞান অতি সামান্য ছিল, সুতরাং অতি কষ্টে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপাদি করিলাম। সেই দিনই পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে তিব্বতের বর্ণমালা শিখিলাম। সেইদিন হইতে প্রতিদিন তিন মাইল পাহাড় ভাঙ্গিয়া আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট গিয়া তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিতাম। এইপ্রকারে মাসাবধি চলিল। একদিন শরৎবাবু আমাকে বলিলেন "মিষ্টার কাওাগুচি, আমি আপনাকে তিব্বত যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করার পরামর্শ দি। যে কাজ সাধ্যাতীত তাহার জন্য চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নয়। তিব্বতযাত্রা নিতান্ত অসাধ্য ব্যাপার। তিব্বতী ভাষা ভাল করিয়া শিখিয়া দেশে ফিরিয়া যান, সেখানে আপনার যথেষ্ট খ্যাতি হইবে।" আমি বলিলাম "খ্যাতি আমি চাই না, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য।" শরৎবাবু আমার উদ্দেশ্যের গুরুত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু বলিলেন "যাওয়া অসম্ভব এবং গেলেও প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসা একপ্রকার অসম্ভব।" আমি ত ছাড়িবার পাত্র নই বলিলাম "মহাশয়ও গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন আমিই বা পারিব না কেন?" শরৎবাবু উত্তর করিলেন "এইখানেই আপনার ভ্রম, সেদিন আর নাই। তিব্বতের দ্বার বিদেশীয়ের নিমিত্ত আরও শক্ত করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, এখন সাধ্য কি আমি আবার যাই। আমি সৌভাগ্যক্রমে উত্তম রাহাদানি (Pass) পাইয়াছিলাম, আপনার সে সুযোগ ঘটিবে না। আপনি এ দুঃসাধ্য কাজে হাত দিবেন না। তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া যান।" শরৎবাবুর উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু তিনি আমাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না। শরৎবাবুকে বলিলাম "বৌদ্ধ পুরোহিতের নিকট আমার ভাষা শিক্ষা সন্তোষজনক হইতেছে না। তিনি আমায় ভাষাশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য অধিক মনোযোগী।" শরৎবাবুকে অনুরোধ করিলাম আমায় চলিত তিব্বতী ভাষা শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিতে। শরৎবাবু স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্যের গুণে আমায় পুঁথিগত এবং চলিত তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার সুযোগ করিয়া দিবেন বলিলেন। শরৎবাবুর বাড়ীর নীচেই সবদুং নামে এক তিব্বতী লামা বাস করিতেন, তাঁহার বাড়ীতে আমার বাসের বন্দোবস্ত হইল। সেই তিব্বতীয় লামার উপর এই জাপানী লামার শিক্ষার ভার ন্যস্ত হইল। সবদুং লামা আনন্দের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। এই সঙ্গেসঙ্গে দারজিলিং হাই স্কুলে ভাষা শিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হইলাম। সেখানে তিব্বতী ভাষার প্রধান শিক্ষকের নিকট পড়িতে লাগিলাম। এইপ্রকারে গৃহে চলিত এবং বিদ্যালয়ে লিখিত ভাষা শিখিতে লাগিলাম। আমি যখন দারজিলিংএ পদার্পণ করি তখন আমার হস্তে ৩০০ ইয়েন ছিল। আমি মাষ্টারের বেতন, স্কুলের মাহিনা, আমার নিজের টাকা হইতে ব্যয় করিতে লাগিলাম, কিন্তু শরৎবাবুর গৃহে আহার করিতাম। তিনি আমার আহারের জন্য খরচ করিতে

দিতেন না, বলিতেন "তোমার মত সাধু লোকের জন্য এতটুকু করিতে পারিলে আমার বড়ই সুখ হইবে।" শরৎবাবুর সৌজন্যেই ১৭ মাস আমি দারজিলিংএ বাস করি, নতুবা অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমাকে চলিয়া আসিতে হইত।

দারজিলিংএ এই কয় মাস যেন আমি আবার দ্বিতীয় বাল্যদশা প্রাপ্ত হইলাম। বিদ্যালয়ে গমন এবং গৃহে পাঠাভ্যাস এই হইল আমার কাজ। সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া পড়া মুখস্থ করিতাম। এতদিন জানিতাম বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সেই ভাষায় যাহারা কথাবার্ত্তা কয় তাহাদের সহিত বাস করিলে শীঘ্র শেখা যায়, এখন দেখিলাম যে শিশুদের ন্যায় নূতন ভাষার শিক্ষক আর নাই। সবহুং লামার ছেলেরা আমায় যেমন শিক্ষা দিত, এমনতর কেহ দিতে পারিত না—এই শিশু শিক্ষকগুলি, শিক্ষা দিবার জন্য ভারি উৎসুক, কিছু শিখাইতে পারিলে তাহাদের গর্ব্ব কত, আমি ভুল করিলে আর রক্ষা নাই, তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিত। বাড়ীর মেয়েরাও কম শিক্ষয়িত্রী ছিলেন না। আমার এই শিক্ষা হইল যে শিশু এবং রমণী নূতন ভাষার উৎকৃষ্ট শিক্ষক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ৬।৭ মাসের মধ্যে আমি তিব্বতী ভাষায় সুন্দর কথাবার্ত্তা বলিতে শিখিলাম। শিক্ষাবিষয়ে আমারও আগ্রহ এবং মনোযোগের ত্রুটি ছিল না। যতই তিব্বতী ভাষায় অধিকার লাভ করিতে লাগিলাম, তিব্বতের সমুদায় বস্তু ততই আমার আগ্রহের বিষয় হইল। সবহুং লামাও বড় সদালাপী ছিলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট বসিয়া কত যে তিব্বতের গল্প শুনিতাম। বলিতে তাঁহার অপার আনন্দ এবং শ্রোতাও মুগ্ধ হইয়া গল্প শুনিত।

শ্রীহেমলতা দেবী।

কানু ও হনূ

(বৃন্দ কবি)

উঁচা যদি কিছু উঁচিয়ে বা করে কভু,—
তবু সে ওঁছাই, উঁচা সে হয় না তবু।
গন্ধমাদন হনূ তো ধরেছে শিরে,—
গিরিধারী তবু তারে কেউ বলে কি রে?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

এ দেশে রাজর্ষি রামমোহনের আদর

একজন দীর্ঘকায় আজানুলম্বিতবাহু প্রশস্তবক্ষ উন্নত-ললাট "তিল ফুল জিনি নাসা" জগতের কল্যাণে উৎসৃষ্ট-দেহমনপ্রাণ মহাপুরুষ কলিকাতার পথ দিয়া চলিয়াছেন, একদল বালক 'সে সুই মেলের কুল, বাড়ী খানাকুল, ওঁ তৎসৎ বলে এক বানিয়েছে স্কুল; ও সে স্লেতের দফা করলে রফা মজালে তিন কুল' বলিয়া তাঁহার গায়ে ধূলি নিক্ষেপ করিতে-করিতে অগ্রসর হইতেছে। রাজা রাম-মোহন রায় যখন সশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন, তিনি স্বদেশ-বাসীর নিকট এইরূপ অভ্যর্থনাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন শুনিতেছি, এ দেশে তাঁহার আদর নাকি বাড়িয়াছে। যদিও আমাদিগকে এই প্রাচীন বাক্য স্মরণ রাখিতে হইবে, 'All that glitters is not gold,' তথাপি উহা স্বীকার করিয়া লইতে আমাদিগের কোন আপত্তি হইত না, যদি এরূপ সন্দেহের অবসর না থাকিত, যে, ইহাকে একটি সত্য-রূপে উপস্থিত করা হইতেছে এই জন্য যে উহাকে আর একটি (premise) উপনয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটি অভীষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ মিলিবে। ত্র্যবয়বী-ব্যাপ্তি বাক্যটি (Syllogism) এই:—দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমিতেছে; সুতরাং প্রমাণ হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের পথ হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। ঐ দুই উপনয় হইতে এই সিদ্ধান্ত আসে কি না নৈয়ায়িকগণ অবরোহপ্রণালী (Deductive method) অনুসারে তাহার বিচার করিবেন। আমরা আরোহপ্রণালী (Inductive) দ্বারা উপনয় দুটির সত্যতার আলোচনা করিব। ব্রাহ্মসমাজ এ দেশে কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। রাম-মোহনের বা তৎপরবর্ত্তী কালের যাঁহারা এই-সকল প্রস্তা-বের বিরোধী ছিলেন তাঁহাদের বংশধর বা স্থলবর্ত্তীগণের অনেককে সেই-সকল সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিতে দেখিতেছি। ইহাতে দেশের উপর ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমিতেছে, আর রামমোহনের আদর বাড়িতেছে প্রমাণ হয় কি? কিসের দ্বারা বুঝিলাম, দেশে রাজা রামমোহন

রায়ের প্রভাব বাড়িতেছে? রাজার নামে যে-সকল উৎসব হয় তাহাতে খুব লোকের ভিড় হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের লোকও তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উৎসবেও তো খুব লোকের ভিড় হয়। ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যে সময়ে যত লোকের ভিড় সেইরূপ সময়ে রামমোহনের উৎসবে তাহার দশমাংশ লোক হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং যে যুক্তিতে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে, সেই যুক্তিতে ব্রাহ্মসমাজের আদরও বাড়িতেছে বলিতে হয়। যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহকে হিন্দু ব্যবস্থাপক দেশের জনসাধারণের আইনসঙ্গত বিবাহ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন দেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমিতেছে এই কথাটাকে পল্লবগ্রাহী শত্রুপক্ষীয় সমালোচকের অর্থহীন বাক্য (cant) ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

রামমোহনের আদর বাড়িতেছে! কথাটা সত্য হইলে দেশের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মঙ্গল-সমাচার আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু মৃতের প্রতি দুটি মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ কি আদর? মানুষ মরিলে তাহার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব চলিয়া যায়। কোনও রকমে তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিতে পারিলে, তিনি যতই অতীতের কুয়াসায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যান ততই তাঁহার মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিবার অবসর হয়। এইরূপে অনেক দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহাদের জীবন-কথা জানি না বলিয়া তাঁহাদের পূজা করি, জানিলে দেবতার আসন হইতে নামিয়া যান। একজন লেখক বলিয়াছেন, যাহারা "For Thy Son's Sake" বলিয়া যীশুর নামে দিনে সাতবার ভগবানের নিকট উপস্থিত হ'ন, সেই "Son" যদি তাঁহার সেই পূর্ব্বেকার পোষাক পরিয়া নাম ধাম গোপন করতঃ তাহাদেরই নিকটে আসিয়া সেই পূর্ব্বেকার ভাবে সেই-সকল পূর্ব্বেকার উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে যীশু তাঁহার উপাসকগণের দ্বারাই দ্বিতীয় বার ক্রুশবিদ্ধ হইবেন। বাস্তবিক, মৃতের জন্য বার্ষিক সভা করা আমাদের জাতীয় জীবনের একটা মস্ত ক্ষয়-রোগে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। বক্তা বা শ্রোতা কেহই যে-সকল সংস্কারকের জীবনের মূলতত্ত্ব পসন্দই করেন না অথবা অনুসরণ করিতে আদৌ ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদেরই স্মৃতিসভায় ঘন ঘন করতালি উত্থিত হইবে, আর আমরা মনে করিব যে আমরা একটা বেজায় আদর করিয়া ফেলিলাম। এই স্মৃতিসভাগুলির মত এমন অসত্য-প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় নাই। যাঁহারা জীবদ্দশাতে বিদ্যাসাগরের জীবনকে পণ্ড করিবার জন্য ন্যায় অন্যায় শত উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই যখন স্মৃতিসভায় দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া টিকি নাড়েন তখন এই সভাকে কাপট্যের জীবন্ত মূর্ত্তি ছাড়া আর কি বলা যায়! কিছুতেই বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যিনি আজ গোপনে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল এক করিতেছেন তিনিই কাল বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় সভাপতিরূপে অশ্রু বর্ষণ করিলেন আর আমরা হাততালি দিলাম। মহাপুরুষের আদর আমরা এইরূপেই করিতেছি। বিদ্যাসাগর ছিলেন মনুষ্যত্বের জীবন্ত মূর্ত্তি। আমরা আমাদের কুসংস্কার ও দুর্ব্বলতার জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করিতে না পারিয়া যদি তাঁহার স্ত্রীজনসুলভ দু'একটি গুণের উল্লেখ করতঃ অশ্রুবর্ষণ করিয়া মনে করি যে বিদ্যাসাগরকে খুব আদর করিয়া ছাড়িয়া দিলাম, তাহা হইলে, আমরা যে আবহমানকাল শুনিয়া আসিতেছি, মানুষের বুদ্ধিনামক একটা বৃত্তি আছে, তাহার অনস্তিত্বই প্রমাণিত হইবে। সেদিনও ভক্ত নগেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় দেখিলাম জীবদ্দশায় তাঁহার কার্য্যের সঙ্গে যাঁহারা ঘুণাক্ষরেও সহানুভূতি করিতে পারেন নাই,—কেন না, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ,—তাঁহারাও স্মৃতিসভায় অশ্রুবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। ইহাই আমাদের মনুষ্যত্বের আদরের মাপকাঠি। এই স্মৃতিসভাগুলি একটি গ্রাম্য প্রবাদের সাক্ষী—"থাকতে মা দেয় না ভাত, মরলে করে দানসাগর!"

১। এখন দেখা যাক্, দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে এই উপনয়ের মধ্যে কি সত্য বর্ত্তমান। উহা কি মৃতের প্রতি সম্মান না জীবনের আদর? সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন রাজার জীবনের একটি কাজ। আমরা কি এই কাজটির আদর করিয়াছি। তাঁহার জীবিত কালে তো লোকে মনে করিয়াছে, তিনি দেশকে এক মহা

সুকার্য্য ও সুনাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মনের ভাব এ বিষয়ে কি ছিল? সতীদাহ নিবারণের জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে তিনি হিন্দু-নারীদিগের জীবনরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন এবং জাতীয় চরিত্রকে নারী-হত্যাকারী ও নারীর আত্মহত্যার সাহায্যকারী এই গভীর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন।* তিনি মনুষ্যত্বের উচ্চ আসনে আসীন ছিলেন, জাতীয় অহমিকার কর্দ্দম-প্রাচীর তাঁহার পথ রোধ করিতে পারে নাই। আমরা কি এবিষয়ে রাজার ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিতে সম্যক্ পারগ হইয়াছি যে বলিব তাঁহাকে আদর করিতেছি? সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে রাজার আইনে, আমাদের হৃদয়ের আবেগে নয়। রাজা আইন উঠাইয়া লইলে আমরা যে কি করিব তাহা ভগবানই জানেন। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আমাদের মনের ভাব রাজার ভাবের বিপরীতমার্গগামী। সেদিনও নিমতলার ঘাটে আত্মহত্যা সদর্পে মানুষের মাথায় পা তুলিয়া দিল। কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার একখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক নারীর এইরূপ আত্মবিনাশের চেষ্টাকে আত্মহত্যা ("Suicide") নাম দেওয়াতে আর-একখানি প্রসিদ্ধ দৈনিক যিনি আপনাকে অর্থদক্ষ সমাজের মুখপত্র বলিয়া মনে করেন, উঁহার প্রতি বয়কটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন দেখি পূর্ব্বোক্ত দৈনিকটি আর "Suicide" বলিতে সাহস করেন না, "Suttee"ই বলেন। আমরা আদর করিতে শিখিতেছি বেশ।

২। দেশের লোক সামাজিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ একেবারেই অনুমোদন করেন না। অনেকে আছেন, যাঁহারা সামাজিক দুর্গতি-সকল দূরীভূত হয় ইহা ইচ্ছা করেন, কিন্তু এ-সকল ব্যাপারে রাজপুরুষগণের সাহায্য লওয়া একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। তাঁহারা ভুলিয়া যান, সরকার আইনের বাঁধুনিতে আমাদের সচল সমাজযন্ত্রকে যেমন স্থানে-স্থানে আটকাইয়া ফেলিতেছেন, তাহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ আইনই আবার অচল অংশকে সচল করিয়া দিবে। এ-কাজ আর কাহারও দ্বারা সংসাধিত হইবে না। যাহা হউক, এ বিষয়ে রাজার মনোভাব কি আমরা ইতিপূর্ব্বেই টের পাইয়াছি। আইনের দ্বারা সতীদাহনিবারণের জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তাহাতে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে প্রবল ব্যক্তিগত কারণ বর্ত্তমান ছিল। দিল্লীর সম্রাট্-প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি নামঞ্জুর করিয়া সরকার বাহাদুর রামমোহনকে যে-পত্র লেখেন তাহা সেই দিনই তাঁহার হস্তগত হয়। তবুও অতি আগ্রহের সঙ্গে তিনি সরকারের স্তুতিবাদে যোগ দিলেন। এবিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তই বর্ত্তমান আছে। রাজা বহুবিবাহের (Horrible polygamy) ঘোর বিরোধী ছিলেন। স্ত্রীবর্ত্তমানে কেহ বিবাহ করিতে চাহিলে যে স্ত্রীর অনুমতি লইতে হইবে এবং আরও যে-সব নিয়ম শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা প্রতিপালিত হইতেছে কি না, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত যাহার অনুমতি না হইলে কেহ পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে না এরূপ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার জন্য রাজা সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন।* ইহাতেই বুঝা যায়, আইনের সাহায্যে সমাজ-সংস্কারে রাজার অমত ছিল না।

৩। দেশের লোককে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবে —আহা আমাদের দেশের নারীজীবন যেমন সুখের যেমন উন্নত, এমন আর কোথায়ও নয়। কথায় কথায় তাহারা সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত দিবে। তাহারা ভুলিয়া

* "To offer personally our humble but warmest acknowledgments for the invaluable protection which your Lordship's government has recently afforded to the lives of the Hindu female part of your subjects, and for your humane and successful exertions in rescuing us for ever, from the gross stigma hitherto attached to our character as wilful murderers of females and zealous promoters of the practice of suicide."

* "Had a Magistrate or other public officer been authorised by the rulers of the empire to receive applications for his sanction to a second marriage during the life of a first wife, and to grant his consent only on such accusations as the foregoing (such as barrenness, drunkenness, etc.) being substantiated, the above Law might have been rendered effectual, and the distress of the female sex in Bengal, and the number of suicides (which when compared with those of any other provinces, is almost ten to one) would have been necessarily very much reduced,

যায়, যে অবস্থায় সীতা সাবিত্রী উৎপন্ন হইয়াছিল, সে অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বর্ত্তমান অবস্থায় সাবিত্রী দময়ন্তী যে অসম্ভব, ইহা তাহাদের বুদ্ধির অনধিগম্য। রাজা রামমোহন রায় প্রাচীনকালের নারীদিগের উন্নতাবস্থার কথা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভুলিয়া যান নাই যে বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। তিনি দেখাইয়াছেন যে বর্ত্তমান নারী-সমাজ আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব এবং সুখসুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত দৈন্যদশায় পতিত হইয়াছেন।* সুতরাং তাহাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি নানারূপ সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। রাজা নারীজাতিকে সামাজিক সুখসুবিধাবিধানের বা বংশ অপ্রতিহত রাখিবার যন্ত্ররূপে দর্শন করেন নাই। নারীও যে পুরুষের ন্যায় স্বাধীন জীব, সেও যে ঈশ্বর-প্রদত্ত বৃত্তি-সকলের বিকাশের দ্বারা স্বাধীনভাবে আপনার জীবনের পূর্ণত্বসাধনের অধিকারী—এই ভাব হৃদয়ে লইয়াই তিনি নারীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, দেশের কয়জন লোক রাজার এই মহৎ ভাব ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, নারীকে পুরুষের মুঠার ভিতর হইতে বাহির করিয়া স্বাধীন ভূমির উপর দাঁড় করাইয়া দিতে না পারিলে তাহার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। পরমুখাপেক্ষীর কোন উন্নতি নাই। স্বাবলম্বন সকল উন্নতির মূল। নারীকে দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পুরুষ নারীর স্বাবলম্বনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই পথ খুলিবার জন্য তিনি বিপুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নারীজাতির সংস্কারসম্বন্ধীয় সকল প্রস্তাবই পণ্ড হইয়া যাইবে যদি তাহাকে আর্থিক স্বাধীনতা দিবার কোন ব্যবস্থা না হয়। নারীকে যে বিবাহ করিতেই হয়, নহিলে যে অবশ্য প্রয়োজনীয় খোরাকপোষাকও তাহার মিলিবে না। বিবাহে নারী পুরুষের সঙ্গিনী হয় না, দাসী হয়। পুরুষ নারীকে সহায়রূপে গ্রহণ করে না, নারী পুরুষকে আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হয়। রাজা দেখাইয়াছেন, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি পাপ, নারীর এই অসহায় অবস্থার সুযোগে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পুরুষ যদি জানিত যে তাহার স্ত্রী মাত্রই তাহার সম্পত্তিতে ভাগ বসাইবে তবে তাহার বহুবিবাহের বাসনা সঙ্কুচিত হইত। স্বামীর অবর্ত্তমানে তাহার যখন পুনরায় বিবাহের সম্ভাবনা নাই—হয় তাঁহাকে অন্যের গলগ্রহ হইতে হইবে না, হয় জীবিকার্জ্জনের জন্য পাপ পথ অবলম্বন করিতে হইবে * সেইজন্য সে প্রথম শোকের আবেগে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত। তাই তিনি নারীর দায়াধিকার সমর্থন করিয়াছেন। আজ যদি তিনি সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বলেন, "মাতা চ পিতরি প্রেতে পুত্রতুল্যাংশহারিণী", বা "তুরীয়াংশাস্তু কন্যকাঃ" অথবা "অনূঢ়াশ্চ দুহিতরঃ পুত্রভাগানুসারাঃ" তাহা হইলে যাঁহারা রামমোহনকে আদর করিতেছি বলিয়া অভিমান করিতেছেন তাঁহারা কি "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" এই ন্যায়ের অনুসরণ করিবেন না? আর স্মৃতিসভায়

* With a view to enable the public to form an idea of the state of civilization throughout the greater part of the empire of Hindustan in ancient days, and of the subsequent gradual degradation introduced into its social and political constitution by arbitrary authorities, I am induced to give as an instance, the interest and care which our ancient legislators took in the promotion of the comfort of the female part of the community ; and to compare the laws of female inheritance which they enacted, and which afforded that sex the opportunity of enjoyment of life, with that which moderns and our contemporaries have gradually introduced and established, to their complete privation, directly or indirectly, of most of those objects that render life agreeable." * * *

* "It is not from religious prejudices and early impressions only, that Hindu widows burn themselves on the piles of their deceased husbands, but also from their witnessing the distress in which widows of the same rank in life are involved, and the insults and slights to which they are daily subjected, that they become in a great measure regardless of their existence after the death of their husbands."

"To these women there are left only three modes of conduct to pursue after the death of their husbands. 1st. To live a miserable life as entire slaves to others. 2ndly. To walk in the paths of unrighteousness. 3rdly. To die on the funeral pile of their husbands, loaded with the applause and honour of their neighbours."

তাঁহাদের টিকি দেখিতে পাওয়া যাইবে না—তাঁহারা বিরোধী সভার প্রতিষ্ঠা করিবেন। তখন রামমোহনের পশ্চাতে দাঁড়াইবার জন্য থাকিবে কয়েকজন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মভাবাপন্ন ব্যক্তি। ব্রাহ্মেরাও যে সকলে রাজার কথায় সায় দিবে তাহাও নহে। দেশের আব্-হাওয়ার কুপ্রভাব কোন কোন বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপরেও সমানভাবেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

৪। এ দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রচলনে রামমোহনের কি হাত, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমাদের ধারণা ছিল, রাজার এই কাজটি সকলেরই শ্রদ্ধার জিনিস। এখন দেখিতেছি আমাদের সে ধারণা ভুল। রাজা পাশ্চাত্য শিক্ষা সমর্থন করিতে যাইয়া 'টুলো' শিক্ষাকে যে-ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন তাহাতে নাকি আমাদের জাতীয় অহমিকা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। এমনও অনেক পল্লবগ্রাহী আছেন যাঁহারা ইহাতে রামমোহনের অসঙ্গতিও দেখিয়া থাকেন, তিনি যে-সময়ে 'টুলো' বেদান্তের নিন্দা করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়েই নিজে বেদান্ত প্রচারে অক্লান্ত শ্রম করিতেছিলেন, ইহাতে সহজলভ্য অসঙ্গতি দোষটা না দেখিয়া অভিনিবেশ সহকারে ইহার অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বটার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই ভাল হইত। 'টুলো' বেদান্ত আমাদিগকে যেরূপ আধ্যাত্মিক করিয়া গড়িতেছিল তাহাতে যে আমাদের জাতীয় জীবন প্রায় নির্ব্বাণের কাছাকাছি আসিয়া পৌছাইয়াছিল তাহার তো সন্দেহই নাই। ইহার জীবনরক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ মুষ্টিযোগের প্রয়োজন ছিল, তাহারই ব্যবস্থা রামমোহন করেন। আধ্যাত্মিকতা নাম্নী একটি গাভী যে আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যতক্ষণ গরু বাঁচিয়া থাকে ততক্ষণই তাহা ধন। কিন্তু আমাদের সকল ব্যবস্থাই উহাকে মারিয়া ফেলিবার দিকে ছিল। তাই রামমোহন উহাকে বাঁচাইবার আয়োজন করিলেন। বাঁচাইতে যাইয়া দেখিলেন, যে গোষ্ঠে সে ছিল, সে গোষ্ঠে রাখিলে তাহার প্রাণ বাঁচান দায়। সুতরাং গাভীটিকে অন্য গোশালায় স্থাপন করিলেন। সেই গোষ্ঠই পাশ্চাত্য শিক্ষার গণিত বিজ্ঞান। "আমরা আমাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ঘরে ঢুকিবার জন্য দ্বারে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শম-দম-তিতিক্ষার যে সম্পদলাভ করিতেছিলাম বা ঘর ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইয়া যে উপরতি সমাধান অভ্যাস করিতেছিলাম তাহাতে আমরা আধ্যাত্মিক হইতেছিলাম বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক বল লাভ করি নাই। বস্তু ছাড়িয়া তাহার ছায়া ধরিয়া মানুষ গড়ে না। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় দেখিলাম তাহার সাহায্যে মানুষের আত্মা সবল হয়। রসায়ন, জড়-বিজ্ঞান, শরীর-সংস্থান-বিদ্যার একএকটি সত্য নির্ণয়ে যে ধ্যানধারণার প্রয়োজন হয়, যে সত্যনিষ্ঠা গড়িয়া উঠে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া নিজে সত্যটাকে প্রত্যক্ষ না করিয়া না-ছাড়িবার যে প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে কোন ব্রহ্ম-যোগীর ঝুলিতে ততবড় শিক্ষা ছিল না। এরূপ কথিত আছে রামমোহন নিজ হস্তে Chemistryর Experiment করিতেন। ইহা কেবল কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। ইহার মধ্যে কুম্ভক প্রাণায়াম অপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীর যোগাভ্যাস রহিয়াছে। "একটি অতি ক্ষুদ্র প্রজাপতির পাখার অতি ক্ষুদ্র অংশ, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধন মুক্ত করিয়া; পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করিতে হইলে যে ধীরতা ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়, কোন কৈবল্যলাভের যোগচর্চ্চায় তাহা হয় না।" * অনেকে ভাবেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে, সুতরাং অন্নবস্ত্রের জন্যই কেবল এ শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন। সুবিধা পাইলেই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতার দুর্গে ফিরিয়া যাইব। এই পার্থিব শিক্ষার পরিণতি তো পরস্পরের রক্তপানে! ইহা যদি বাজে লোকের কথা হইত তবে না হয় উপেক্ষা করা যাইত। জ্ঞানে-গুণে যাঁহারা বড় তাঁহাদের মুখেও আজকাল এ কথা শুনা যায়। অথচ তাঁহারাই বলেন দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে। আচ্ছা আমরা যে আধ্যাত্মিক জাতি, আমরা কি চিরদিনই আধ্যাত্মিক রক্তের ব্যবসা করিয়াছি, নররক্তে কি ধরণী সিক্ত করি নাই? ভুষণ্ডী কাকের সাক্ষি অগ্রাহ্য করা যায় না। সত্যযুগের দেবীযুদ্ধে তিনি সম্বরণ করিতে করিতেই রক্ত পান করেন। লঙ্কাযুদ্ধে অতটা নয়, তবে ঠোঁট মাটিতে ঠেকাইতে হয় নাই।

* ১৩২৩ বৈশাখের "প্রবাসী"তে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "নূতন শিক্ষা ও প্রাচীন অধ্যাত্মিকতা" দ্রষ্টব্য।

বুকফেটে রক্ত বাহির হইতে থাকিলে যাইয়া তাহার ঠোঁটের কিয়দংশ-লাল হইয়া যায়। পৃথিবী অধম হইয়াছে বলিয়া রক্তের অল্পতায়। কলির কথা জানি না, বোধ হয় রক্তের অল্পতা-হেতু তাহার সমস্ত শরীরই কৃষ্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখা যাইতেছে, সত্যযুগ হইতে কলির দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই কম রক্তপাতে ধর্ম অধর্মের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু চিরদিন রক্তপাতের দ্বারাই ধর্মকে অধর্মের উপর জয় লাভ করিতে হইয়াছে। তবে আমরা কেবলই আধ্যাত্মিক হইলাম কিরূপে? আর উহাদেরই শিক্ষা জাহান্নমে গেল কেন? আমরা যতই আধ্যাত্মিকতার বড়াই করি না কেন, রামচন্দ্র যদি কেবলই আধ্যাত্মিক হইতেন, পশুবলেও যদি রাবণ হইতে শ্রেষ্ঠ না হইতেন, তবে যে আমরাও তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে। সে যাহাই হোক কেবল পার্থিব উন্নতির জন্যই রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে বরণ করিয়া লন নাই, ইহার সাহায্যে আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক সভ্যতাটাও পূর্ণতা লাভ করিবে, তাহারই জন্যই রাজার এই বিপুল প্রয়াস। রাজার চেষ্টার পশ্চাতের এই মূল তত্ত্বটা যতই ধরিতে অসমর্থ হইয়া তাহার বিরুদ্ধভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেছি আমরা ততই জোর গলায় রাজার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছি। দেশ যতই তাঁহার পথ হইতে দূরে যাইতেছে, ততই দেশে তাঁহার আদর বৃদ্ধি পাইতেছে! সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ যে রাজার পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে, 'লজিকের' এই অকাট্য মীমাংসাটা যে স্বীকার করিবে না তার মত অহিন্দু আর ভূভারতে নাই।

৫। রাজা রামমোহন রায় একপ্রকার হিন্দুবিবাহ প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহা কেবল ব্রাহ্মসমাজই গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিবাহে "বয়স ও জাতি ইহার বিচার নাই"। অর্থাৎ যদি নৈকষ্যকুলীন ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিবাহ করেন তবে তাহাও হিন্দু বিবাহই হইবে। অবশ্য ইহা সত্যযুগের কথা নয়, এই কলিকালেরই কথা। এই বিবাহের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় যে পাত্রী 'কেবল সপিণ্ডা সভর্তৃকা না হয়'। যে যুক্তির বলে তিনি এই বিবাহ সমর্থন করিয়াছেন তাহা এই :—এই বিবাহের দ্বারা বিবাহিত যে স্ত্রী সে 'বৈদিক' বিবাহের স্ত্রীর ন্যায় অবশ্যগ্রহণীয়। বৈদিক বিবাহের স্ত্রী জন্ম হইবামাত্রই পত্নী হইয়া সঙ্গে ছিল এমত নহে, বরঞ্চ দেখিতেছি, যাহার সঙ্গে কন্যা কোন সম্বন্ধ ছিলনা সেই স্ত্রী যদি ব্রহ্মার কথিত মন্ত্রবলে আজ পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হয়, তবে মহাদেবের প্রোক্ত মন্ত্রের দ্বারা গৃহীতা যে স্ত্রী সে কেন পত্নীরূপে গ্রাহ্য হইবে না? জানিতে চাই, আজ যদি রাজা সশরীরে বিদ্যমান থাকিয়া এইরূপ এক হিন্দুবিবাহবিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন তবে যাঁহারা তাঁহার স্মৃতিসভায় প্রশংসাধ্বনিতে গগন মেদিনী বিকম্পিত করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ রাজার পথ হইতে দূরে পড়িয়াছেন বলিয়া অনুযোগ দেন, তাঁহাদের কয়জনকে রাজার সমর্থকরূপে প্রাপ্ত হইব। সমর্থন তো দূরের কথা, তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে সভা আহ্বান করিয়া রামমোহনকে সমাজচ্যুত, এমন কি পূর্ব্বেরই ন্যায় তাঁহার দেহকে প্রাণচ্যুত করিবার পরামর্শ করিবেন এবং জগতের কাছে সাক্ষ্য দিবেন যে দেশে রামমোহনের "আদর" বেজায় বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামমোহন এই মুহূর্ত্তে দেহ ধারণ করিলে তাঁহার ক্রুশবিদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য। কেননা, যাঁহারা তাঁহাকে শিক্ষা-কমিটি হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশ নির্ম্মূল হয় নাই। সেই অবস্থা এখনও পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। রাজার প্রস্তাবিত বিবাহের এক সামান্য অংশমাত্র প্রচলিত করিতে যাইয়া ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথের যে লাঞ্ছনা হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া কোন্ সত্যবাদী ব্যক্তি মনে করিবে যে দেশ রামমোহনকে আদর করিতে শিখিয়াছে।

৬। দেশে যদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিত তবে যে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা কেবল প্রচার নহে কিন্তু কার্য্যগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেশের লোক এতদিন ভুলিয়া যাইত। কেননা, তাঁহার স্মৃতিসভায় ইহার উল্লেখ প্রতিষিদ্ধ। একবার একজন বক্তা উহা উল্লেখ করিতে যাইয়া বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। অথচ উহা যে

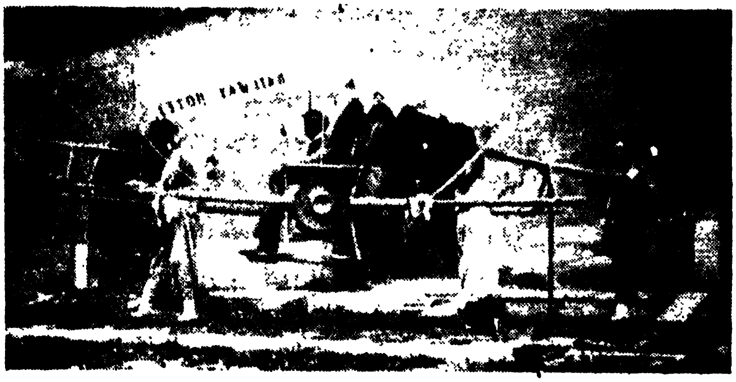
তাঁহার জীবনের কেবলমাত্র একটি প্রধান কার্য্য তাহা নহে, তাঁহার বিরাট-জীবনের সকল কার্য্যের উহাই মূল উৎস। অথচ এইটিই বাদ দিয়া আমরা তাঁহার স্তুতিবাদ সমাপন করি এবং ভাবি দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে। আসল কথাটা এই, যদি একথা সত্যই হয় যে ব্রাহ্মসমাজ রামমোহনের নিশান সোজা করিয়া এখনও তুলিতে পারে নাই, তথাপিও সে নিশান যে কেবল একমাত্র ব্রাহ্মসমাজেই আছে তাহা আরও সত্য। যিনি ব্যক্তিগতভাবে সে নিশান স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তাঁহাকে কোন রকমের ব্রাহ্মই হইতে হইবে। যদি সমবেতভাবে কেহ সে নিশান লইয়া অগ্রসর হইতে চান তবে তাহাও কোন আকারের ব্রাহ্ম-সমাজই হইবে, গত্যন্তর নাই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

মিঙ্ সম্রাট্‌দিগের গোরস্থান

পারস্য, চীন, ল্যাটিন, আমেরিকা ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্র নিতান্ত অনুন্নত। এই সকল দেশের গবর্মেণ্ট স্থানীয় ভূগোলতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ। এই জন্য যুক্ত-রাষ্ট্রের কার্ণেগি ইন্‌ষ্টিটিউশন তাঁহাদের ভূগোল-শাখার সাহায্যে এই সমুদয় অনুন্নত জনপদের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। চীনপর্য্যটক পাত্রী মহাশয় বিগত বার বৎসর চীনের প্রত্যেক প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। এক্ষণে মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান, তিব্বত-সীমান্ত ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, য়ুন্নান প্রদেশ ইত্যাদি দর্শনে বাহির হইয়াছেন। অন্ততঃ ছয় মাস লাগিবে। এই যাত্রায় ইনি একাকী নন। ইয়ারকিস্থান হইতে কয়েকজন পুরুষ ও রমণী ইঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিবার জন্য চীনে আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের অনুসন্ধান ও পর্য্যটন ভারতবাসীর মধ্যে এখনও আরম্ভ হয় নাই। অবশ্য কথায়-কথায় আমরা তিব্বতপর্য্যটক শরচ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি।

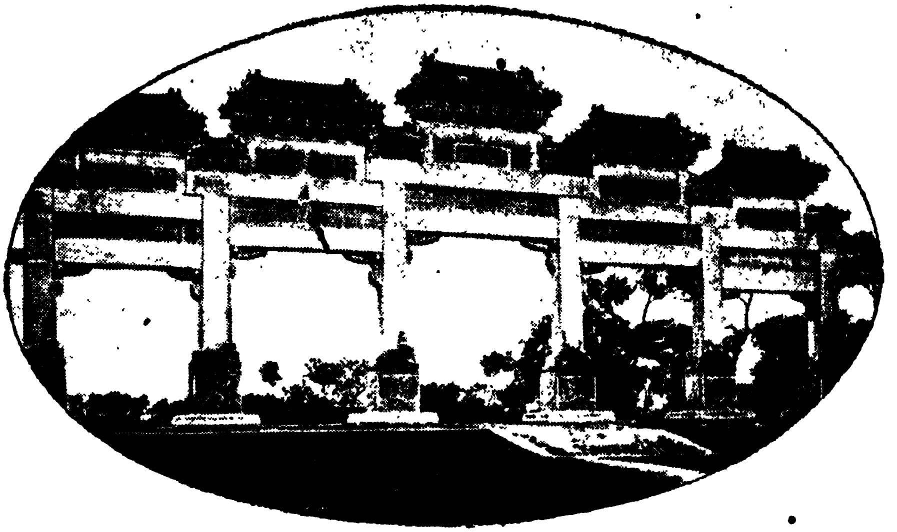
ভৌগোলিক মহাশয় মঙ্গোলিয়া-যাত্রার উদ্যোগ করিতে থাকিলেন। আমি অদূরে ১১ মাইল মাত্র সফরের জন্য বাহির হইলাম। গর্দ্দভপৃষ্ঠে যাইবার আয়োজন ছিল। কিন্তু পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখিয়া পাল্কী-সদৃশ চেয়ার-যান ভাড়া করা গেল। দোভাষী গর্দ্দভই পছন্দ করিলেন। মিঙ্ সম্রাটগণের কবর দেখিতে চলিয়াছি। মোগলদের পর এবং মাঞ্চুদিগের পূর্ব্বে মিঙ্‌বংশীয় সম্রাটগণ চীনে রাজত্ব করেন। ১৩৬৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৪৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ইঁহাদের রাজত্ব কাল। মোগল ও মাঞ্চু-আমলে চীনারা পরাধীনভাবে জীবন যাপন করিত - মিঙেরা চীনের স্বদেশী রাজা। এই জন্য চীনা-সমাজে ইঁহাদের আদর অত্যধিক। ১৯১১ সালে সান-ইয়ৎ-সেন প্রবর্ত্তিত বিপ্লবের ফলে মাঞ্চুদের সিংহাসন-চ্যুতি হয়। তাহার দ্বারা চীনে পরাধীনতা বিলুপ্ত হয় সঙ্গে-সঙ্গে প্রজাতন্ত্র-শাসনও প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদেশীয় রাজগণের শাসন নষ্ট করিয়া বিপ্লবের ধুরন্ধরগণ মিঙ্‌সম্রাট্‌-দিগের কবরে স্বাধীনতা-লাভের উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নব্য রিপাব্লিক যেন মিঙ্‌বংশের ধারাই বহন করিতে চলিল।



চীনের চেয়ার-যান।

প্রান্তরের ভিতর দিয়া চলিতেছি। সুপরিচিত চষা জমি; শাক, আলু, তিল, জাওয়ার ও ভুট্টা ছাড়া মাইলের পর মাইল অন্য কোন উদ্ভিদ দেখা যায় না। বামদিকে ও সম্মুখে অনতিদূরে নীল পর্ব্বতমালা। সম্মুখস্থ পর্ব্বত-মালার পাদদেশেই কবরসমূহ অবস্থিত।

দু-একটা পল্লী পথে পড়িল। ইটের ঘরবাড়ী ও প্রাচীর। ইটগুলি রৌদ্রে শুকান আগুনে পোড়ান নয়। দুই-একটা বালুকাময় এবং শিলাখণ্ডবহুল ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইতে হইল। গর্দ্দভের পৃষ্ঠে মাল চালান হইতেছে। শুনিলাম অন্য সময়ে উষ্ট্র-যানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।



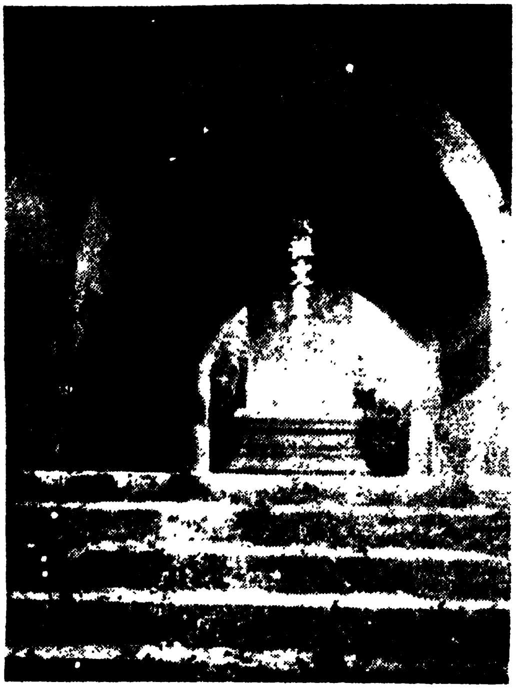
চীনের মিং সম্রাটদিগের গোরস্থানে বিজয়-তোরণ।

জাপানের যে-কোন স্থানেই যাই না কেন সর্ব্বত্রই দেখিবার বুঝিবার সুযোগ পাওয়া যায়। পর্য্যটকগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং ব্যবসাদারেরা নানা প্রকার আয়োজন করিয়াছেন। ছবি, ছাপা, হোটেল, সরাই ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গায়ই প্রচুর। এই হিসাবে জাপানীরা ইয়াঙ্কিদের সমান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চীনের কোথাও পর্য্যটকগণের জন্য কোন প্রকার সুবিধা নাই। ছবি ছাপা ইত্যাদি ত দূরের কথা—অতি রমণীয় দৃশ্যসমূহও যত্নাভাবে সংস্কারাভাবে মলিন রহিয়াছে। সুদূর Great Wall, মিঙ-কবর ইত্যাদির ত কথাই নাই পিকিঙ্ সহরের মধ্যেই প্রসিদ্ধ দর্শনযোগ্য বস্তুসমূহ লোকজনকে দেখাইবার জন্য কোন আয়োজন নাই। চীনাপ্রদর্শক এবং দোভাষী মহাশয়গণও নিতান্ত অপটু ও কাঁচা লোক।

পাঁচ ছয় মাইল আসিয়া একটা সুশ্রী তোরণ দ্বার দেখিতে পাইলাম। আগাগোড়া শ্বেতমর্ম্মরে এইটি গঠিত। ছয়টি স্তম্ভের মধ্যে পাঁচটা প্রবেশ পথ আছে। ফটকগাত্রে সুন্দর-সুন্দর নক্‌সা দেখা গেল। ড্রেগন-চিত্রের প্রভাব নাই কোথায়? অধিকন্তু এইখানে দুই সিংহের লড়াই কতকগুলি প্রস্তরগাত্রে দেখিতে পাইলাম। ফটক প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ এবং ৮০ ফুট প্রশস্ত। দ্বিতীয় মিঙ্ সম্রাট ইহা প্রস্তুত করেন—একজন আধুনিক মাঞ্চুরাজ ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। সমগ্র চীনদেশের বাস্তুশিল্পে এই মর্ম্মরতোরণ বিশেষ উচ্চস্থান অধিকার করে।

মর্ম্মর ফটক হইতে আরও পাঁচ ছয় মাইল দূরে কবর-পল্লী পর্ব্বতমালার পাদদেশে। ইহার পর একটা লালবর্ণ ফটক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম। এখান হইতে সমতল ক্ষেত্রের প্রায় সকলদিকেই পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতেছি। কিয়ৎকাল পরে একটা দ্বিতল ফটকসদৃশ গৃহের ভিতর কূর্ম্মের উপর স্মৃতিফলক দেখিলাম। ইহাতে প্রথম মিঙ সম্রাটের গুণ কীর্ত্তিত আছে। এই গৃহের চারিদিকে চারিটা গোলাকার মর্ম্মরস্তম্ভ দণ্ডায়মান। স্তম্ভগুলির গাত্রে বিচিত্র সর্পসদৃশ জন্তুর মূর্ত্তি খোদিত। শিরোদেশে কুক্কুরজাতীয় জীব পথের প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছে। স্মৃতি-ফলকের উপর মাঞ্চুসম্রাট মিঙ বংশীয় নরপতিগণের সাক্ষ্যবংশীয় নরপতিগণের চরম প্রশংসা উৎকীর্ণ করাইয়াছেন।

এইবার এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। মিশরে মন্দিরাদির প্রবেশ-পথে স্ফিংসের সারি দেখিয়াছিলাম। চীনা মিঙ্ কবরের প্রবেশ পথে প্রায় সেই ধরণের প্রস্তরমূর্ত্তি-সমূহের শ্রেণী দণ্ডায়মান। প্রথমে দুইটা স্তম্ভ। ইহাদের গাত্রে মেঘ খোদিত হইয়াছে। তাহার পর চারিটা করিয়া সিংহ, মেষ, উষ্ট্র, হস্তী, ইউনিকর্ণ এবং অশ্ব। জন্তুগুলির



চীনের মিং-সম্রাটদিগের গোরস্থানে স্মৃতিফলক।

ছুইটা করিয়া উপবিষ্ট ছুইটা করিয়া দণ্ডায়মান। তাহার পর চারিজন করিয়া মন্ত্রী (বা ম্যাণ্ডারিন) এবং সশস্ত্র সুসজ্জিত সেনাপতি। মানবমূর্ত্তিগুলি সবই দণ্ডায়মান।

মূর্ত্তিসমূহ সুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত,—কিন্তু স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ এইগুলিতে লক্ষ্য করিলাম না। সকলগুলিই যেন নির্জ্জীব, নিরেট, স্পন্দন-হীন—কোথাও ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। উষ্ট্র মূর্ত্তিগুলি চলনসই বলা যাইতে পারে।



চীনের মিং-সম্রাটদিগের গোরস্থানে মেঘ-লাঞ্ছন স্তম্ভ।

সিংহমূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে দোভাষী এক কাহিনী বলিলেন। এই জনপদের এক কৃষক কয়েক দিন রাত্রিকালে সিংহের স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয়। তাহার ধারণা জন্মে যে, সিংহের মুখ তাহার ঘরের দিকে বলিয়া তাহার পরিবারে অমঙ্গল ঘটিতেছে। একদিন প্রাতঃকালে আসিয়া সে সিংহগুলিকে ভাঙ্গিতে চেষ্টিত হয়। অবশ্য পুরাপুরি ধ্বংস সাধিত হয় নাই।

আবার কৃষিক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিতেছি। খিলান-বিশিষ্ট প্রস্তর সেতুতে দু-একটা স্রোতস্বতী পার হওয়া গেল। অবশেষে প্রাচীর-বেষ্টিত কবরমন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

ফটক, প্রাঙ্গণ, কাঠের কাজ, ইত্যাদি সবই চীনের অন্যত্র যেরূপ এখানেও সেইরূপ। ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত—মর্ম্মরের ব্যবহার প্রচুর দেখিতেছি। চীনের স্বদেশী গৌরব পীত টালি এবং অন্যান্য বর্ণের এনামেলও আছে।

প্রথম প্রাঙ্গণের উপর একটা সুবৃহৎ অট্টালিকার ভিতর সম্রাটের গুণ কীর্ত্তিত রহিয়াছে। ছাদ দ্বিতল। সুদৃঢ় কাষ্ঠস্তম্ভ এই ভবনের বিশেষত্ব।

ইহার পর আর-একটা প্রাঙ্গণ। তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত ফুলদান, বাতিদান ইত্যাদি রক্ষিত। ইহার পর শেষ অট্টালিকা। নিম্নতলস্থ পথ দিয়া ঊর্দ্ধে উঠিলাম। দ্বিতলে একটা স্মৃতিফলক। এই অট্টালিকার পশ্চাতে পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ। ইহাই কবর। সিউলে ও মুকডেনে এই ধরণের কবরই দেখিয়াছি।

তৃতীয় মিঙ্ সম্রাট্ এই কবরে শায়িত। এই কবরের চীনা নামের অর্থ "বিরাট কবর।" সম্রাটের নাম ইয়ুঙ্‌লু। এই ধরণের আরও বারটা কবর এই স্থানে আছে। সকলগুলির প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা একই ধরণে বিন্যস্ত।

এই বিরাট কবর সকলগুলির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ১৯১১ সালে সান্‌-ইয়াৎ-সেন এই কবরেই স্বরাজপ্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন করেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ব্রহ্ম পল্লী-চিত্র

(গল্প)

"We are trying to teach the Burmans our ideals, to show them how far superior is our civilization. When we shall have succeeded we shall have spoilt the pleasantest country and the most delightful people in the world."—Sir Herbert Thirkell White, K.C.I.E. Lieutenant Governor of Burma.

স্থান—মুথিট্। ব্রহ্মদেশের একখানি গণ্ডগ্রাম।

পাত্র-পাত্রী ঃ—

কো-মং-গ্রে—গ্রামের প্রধান—মা-মী তাঁহার কন্যা।

মং-লেট্ — মধ্যবিত্ত কৃষক— { মা-সে তাঁহার স্ত্রী। কো-লোন্ ঐ পুত্র।

মং-ব্যু — ঐ — { মা-হেন্ — স্ত্রী। মা-পান্ — প্রথমা কন্যা। মা-নু — দ্বিতীয়া কন্যা।

মং-মৌ — সূত্রধর। মং-পো-খিন্ — দারোগা।

মং-শোয়েটুন্ — দরিদ্র যুবক। বো-তা — দস্যু-সর্দার।

উ-বু-না — বৃদ্ধ জ্যোতিষী ও চিকিৎসক। মা-পিন্ — বেসিনের ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী।

[বর্ম্মী নাম — বাংলা অর্থ

কো-মং-গ্রে — শ্রীল কুম্ভ।

মং-লেট্ — শ্রীযুক্ত বাহু।

মং-কো-লোন্ — শ্রীমান রেশমী গোলা।

মা-মী — শ্রীমতী অধীনী।

মা-হেন্ — শ্রীমতী বিলাসিনী। ইত্যাদি।]

১

ব্রহ্মদেশের ধানজমী। পার্ব্বত্যভূমি হইলেও অত্যন্ত উর্ব্বর। মানুষভোর উঁচু সোনার ঢেউএর মত সুবৃহৎ ধান-ক্ষেতের তিনদিকে ঈষৎ হরিৎ-স্বর্ণের সুপুষ্ট জঙ্গল। উত্তরে, শাখানদীর ক্রোড়ে ক্ষুদ্র কৃষক-পল্লী মুথিট্। সেই ধানক্ষেতের মধ্যে গোলপাতায় ছাওয়া একটি সুউচ্চ মাচা বা টৌঙ্। অনেকটা নহবৎখানার মত।

তখন রাত হইয়াছে। শুক্লপক্ষের রাত্রি। ফুরফুরে বাতাস। প্রকৃতি নীরব। দূরের গ্রাম্য কুকুরের ঘেউ-ঘেউ চীৎকার পর্য্যন্ত শোনা যায় না। টৌঙের দাওয়ায় বসিয়া মং-কো-লোন্ অন্যমনে চুরুট টানিতেছে। তাহার দৃষ্টি—জ্যোৎস্নারাশির মধ্য দিয়া ওই অস্পষ্ট জঙ্গলটার দিকে; কিন্তু মনটি—কৃষক-পল্লীর সুউচ্চ বাঁশের বেড়া ভেদ করিয়া, জ্যোৎস্নাস্নাত কুটীর-কক্ষের মধ্যে একটি চঞ্চল-লোচনার মধুর অপাঙ্গের কোণে! সমস্ত দিনমানটা বিরহের গান গাহিয়া, পাখী তাড়াইয়া, সে মাঠের মধ্যে কাটাইয়াছে—রাত্রেও এই কারাগারের মধ্যে থাকিতে হইবে—আর এই চাঁদিনী নিশীথে এতক্ষণ, ফুলের-মালা লইয়া, তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মং-মৌ হয়ত তাহার প্রিয়তমা মা-পানের গৃহে উপস্থিত হইয়াছে।

ধান কাটার দিনকটাও যে কাটে না! তাই কি ছাই রাত্রে একবার গ্রামে যাবার যো আছে—আলের উপরে সাপের ভয়, জঙ্গলের মধ্যে ভূতের বাস!

কত কথা, কত ঈর্ষাযন্ত্রণা, কত ভবিষ্যৎ সুখ-কল্পনার তরঙ্গই না কৃষক-যুবকের চিন্তা-সমুদ্র আলোড়িত করিতে লাগিল! তাহার হাতের চুরুট হাতেই রহিয়া গেল—ছেঁচা বাঁশের ছিটে-বেড়া ঠেসান দিয়া সে আকাশ-পানে তাকাইয়া রহিল।

মাচা নড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ঘর-থেকে একজন জড়িত-কণ্ঠে কহিল—"কিহে এখনও শোওনি?"

চুরুট নামাইয়া কো-লোন্ উত্তর করিল—"ঘুম পায়নি।"

প্রথম লোকটি কহিল "এখন কি ঘুম পায়? এই হচ্ছে প্রণয়-ভিক্ষার সময়। হ্যাঁ হে তুমি বসে-বসে কি ভাবো?"

কো-লোন—"মং-মৌ হয়ত মা-পানের সঙ্গে বসে ফুর্ত্তি করছে।"

কো-লোন "আমারও তাই বিশ্বাস।"—হাই তুলিয়া প্রথম ব্যক্তি কহিল—"ভয় কি হে ধান কাটা হোক্‌না, আমিই তোমাকে নিয়ে রোজ-রোজ মা-পানের ওখানে যাবো।—এখন শোবে এসো।"

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। সকলেই নিদ্রিত। দূর জঙ্গলে অশ্রান্ত করুণ ঝিল্লিরব। কয়টি হরিণ ও শূকর ক্ষেত্রমধ্যে আসিয়া ধান খাইতেছে। অধিকাংশ ধান কাটা হইয়াছে, তথাপি ক্ষেত্রে যথেষ্ট শস্য ছিল। দুইটি শূকরশাবক তুমুল কলহ করিতে লাগিল। ফলে, মাচার নীচে প্রহরী কুকুরটা জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার করিলে বনবাসীরা পলাইয়া গেল। বিরক্ত-কণ্ঠে কো-লোন্ কুকুরকে স্থির হইতে আজ্ঞা করিয়া পুনরায় ঘুমে অচেতন হইল।



বর্ষার নৌকা।

প্রত্যূষে উঠিয়া ফো-লোন্ দেখিল প্রান্তর কুয়াসায় ঢাকা। চাল হইতে বৃষ্টিধারার মত শিশির পড়িতেছে। কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করাই সমীচীন কিন্তু শীতে স্থির থাকা অসম্ভব। নিম্নে একস্থানে ভিজা ছাইএর মধ্যে কাঠের আগুন মন্দ-মন্দ জ্বলিতেছিল। ফো-লোন্ গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়া সেই অন্তর্গূঢ় অগ্নিস্তূপের সম্মুখে গিয়া উবু হইয়া বসিল। এইবার এক-আঁটি খড়ের সাহায্যে ভাল করিয়া আগুন জালিবার পালা। অর্থাৎ চক্ষু বুজিয়া ফুৎকারের সাহায্যে ভিজা-কাঠের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ।

ফো-লোন নির্ব্বিকার-চিত্তে আগুন পোহাইতেছে। কম্বল গায়ে দিয়া শোয়েটুন্ আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

"বেশ যা-হোক্! আমি মরি রোজ আগুন ধরিয়ে আর তোমরা এসে মজা করে আগুন পোহাও!"

"আর দাদা— ওহে আগুন হয়েছে নেমে এসো।"

দ্বিতীয় প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া ফো-লোন্‌কে প্রশংসা করিয়া বলিল, "এত সকালে আগুন জালা বাস্তবিক একটা যে-সে কর্ম্ম নয়।" বক্তার মুখে এক-গাল পান। সুতরাং তাহারা কখন্ জাগিয়াছিল ফো-লোনের বুঝিতে বাকী ছিল না। ফো-লোন্ নির্ব্বাক্।

ক্রমে ধূসর প্রান্তরে সোনালি রং ধরিলে, সুবর্ণকান্তি ধান্যশীর্ষগুলি হীরার মুকুট খুলিয়া ভূতলাসনে রাখিয়া দিল। এক-ঝাঁক টিয়াপাখী তীরবেগে ক্ষেত্র-মধ্যে আসিয়া বসিল।

"এয়েছে রে—। ফো-লোন্ একবার কেনেস্তারাগুলো বাজিয়ে দে ভাই।"

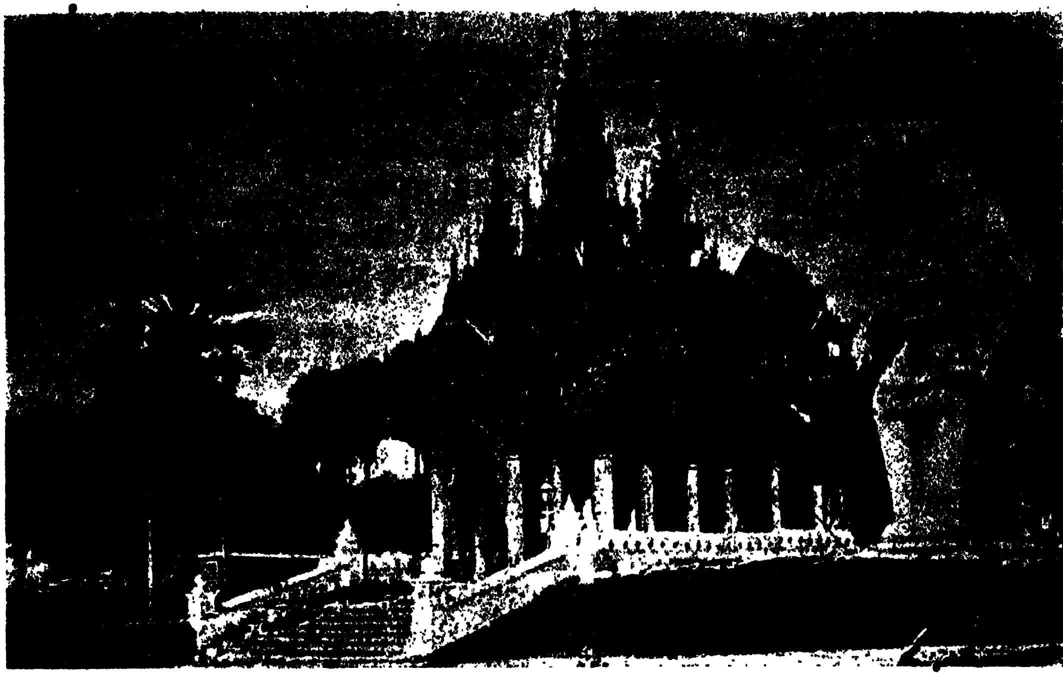
"তা যাচ্ছি, কিন্তু আজ আমি রাঁধতে পারবো না।"

আহারান্তে পানচুরুট খাইতে খাইতে কতকগুলি গরুর-গাড়ীর-চাকার শব্দ শুনিয়া ফো-লোন্ কহিল, "আজ বোধ হয় অনেকেই আসছে, অনেকগুলো চাকার আওয়াজ না?"

মৃদু-হাস্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল "হ্যাঁ, মং-মৌ ছাড়া সকলেই আসছে।"

গ্রামের পাঁচজনের নৌকা মেরামত করিতে মং-মৌ ইদানী বড়ই ব্যস্ত। কয়খানি নৌকা সারিয়া ইতিমধ্যে নদীতে ভাসানো হইয়াছে। বাকী কয়খানি মেরামত হইলে, ধান বোঝাই করিয়া মহাজনেরা ধান বেচিতে বেসিনে যাইবে। মং-ব্যু মহাশয়ের নৌকাখানা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেইটি মেরামত করিতেই মং-মৌ-এর অনেক দিন লাগিবে। মা-পান্, মং-ব্যু মহাশয়েরই জ্যেষ্ঠা কন্যা।

ধূলিপটলে জঙ্গল অন্ধকার করিয়া একসারি গরু-মহিষের



বর্ম্মার মন্দির।

গাড়ী ক্ষেত্র-মধ্যে উপস্থিত হইল। ছেলে-মেয়েদের হাস্য-কোলাহলের সঙ্গে-সঙ্গে চালকেরা গাড়ী খুলিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। ঠুং-ঠুং ঘণ্টা দোলাইয়া পশুগুলি ঝুঁটি-বাঁধা ছেলেদের নেতৃত্বে খালধারে চরিতে গেলে, স্ত্রীলোকেরা তামেইন জামা, ও লুঙ্গী গোছাইয়া চালা ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

চালার একধারে ফো-লোন্ বসিয়া গল্প করিতেছিল। সহচরী সহ মা-পান্ তাহাদের নিকটে গিয়া বসিল। ফো-লোন্ তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যায় নাই। সেও দেখাইতে চায়, যেন সেও ফো-লোন্‌কে দেখে নাই।

মা-পান্—"মা-মী, একবার দেশলাইটা দে, চুরুট ধরাই।"

ফো-লোন্ তাড়াতাড়ি দেশলাই দিয়া কহিল, "আজ বোধ করি গাঁয়ের সকলে এসেছে।"

মুচ্‌কি হাসিয়া মা-পান্ তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিল। ফো-লোন্ তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল।

আজ মা-পানের চেহারা বড় সুন্দর। নিটোল গড়নের উপর কাঁচা সোনার মত রং—গোলাপী তামেইন্—বেগুনে লুঙ্গী—ফুলের তোড়ার মত কেশগুচ্ছের উপর তিনটি আধফোটা গোলাপ ফুল—দুই কানে খুব বড় ছিদ্রের মধ্যে কাঁচের চোঙা বা নাডোয়ং। তাহার প্রিয় সহচরী মা-মী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি কো-মং-গ্নে মহাশয়ের একমাত্র কন্যা বটে, কিন্তু সে তত সৌখীন নয়। তাহার চেহারাও মা-পানের মত নয়। দোষের মধ্যে তার নাকটা মেয়েদের মত সুচল।

"রোজ রোজ তুমি এখানে থাকো কেন?"—মা-পান্ প্রশ্ন করিল।

ফো-লোনের দৃষ্টি তখন তাহার চুরুট খাওয়ার দিকে। শশব্যস্ত হইয়া বলিল "তুমি তো জানোই বাবার জন্য। আমি না এলে তাঁকে এসে রাতে পাহারা দিতে হবে। ঠাণ্ডা লাগ্‌লে তাঁর অসুখ করে। আমি কি সাধ করে—"

"আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করি না। তুমি কুড়ের বেহদ্দ, তুমি আর আমাকে দেখতে পারো না।"

ফো-লোন্ যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া মা-পান্ পশ্চাতে ফিরিয়া ধূম পান

করিতে লাগিল। কো-লোন্ আর কি করে? [illegible] অন্যত্র গিয়া বসিল।

মাত্রাবী তুলিয়া আনিলে কো-ম-রে মহাশয় বলিলেন "ওঠ হে, আর গল্প করে না, কালাবা* এসেছে।"

সকলেই উঠিল। কো-লোন্ বিলম্ব করিয়া দেখিতেছিল মা-পান্ যদি কথা কয়। মা-পান্ সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিল না।

মধ্যাহ্নে কো-লোন্ চাল্লাঘরে আসিয়া মা-পানের নিকটে বসিল। [illegible] তাহাকে [illegible] মা-কীকে বলিল—"বাবা [illegible] বলেছেন বেসিনে যাবার সময় তিনি মং-মোকে নিয়ে যাবেন।"

মা-[illegible]—"সে কেন? তোমাদের দাঁড় টান্তে যাবে?"

হাসিয়া মা-পান্ কহিল "এ বছর তাই ঠিক হয়েছে!"

"তুমিও বোধ হয় যাবে?"

"দেখি কি হয়।"

সত্য বলিতে কি মা-পানের যাইবার স্থিরতা নাই। তাহার পিতা মহাশয় তিন চার বার যাতায়াত করিবেন। জুয়া খেলিয়া সব টাকাগুলি না নষ্ট করিয়া বসেন তাই বেসিনে তাহার মাতা মা-হেন্ সঙ্গে থাকিবেন।

"তোমার মা খুব সেয়ানা। আচ্ছা, অত টাকা জমিয়ে তিনি কি করবেন?"

"তাঁর ইচ্ছা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।"

"হ্যা—লাগ্লোএর চওং টাগার (মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার) সঙ্গে যে তার বোয়ের ঝগড়া চল্‌ছিলো তার কি হলো জান?"

"টাগা নিজের ছেলেটা ও টাকাকড়ি জমিজমা বুঝেপড়ে নিয়ে পরিবার ত্যাগ করেছে। সেও নিজের বিষয়-আশয় ও মেয়েদের নিয়ে আলাদা হয়েছে। বোধ করি মং-গিওকেই বিয়ে করবে।"

বেলা পাঁচটা। স্ত্রীলোকেরা শস্যগুলি স্তূপাকারে [illegible] করিতেছে। নিঃশব্দে কো-লোনের পশ্চাতে আসিয়া মা-[illegible] বলিল—"তুমি আজ খুব খেটেছো।"

আর একটু হইলেই সে [illegible] দিত। [illegible] বলিল "[illegible] মোটা [illegible] কো-লোনকে [illegible] না [illegible] সে তাহা জানিত।

"এ বছর তুমি কাদের নৌকো চালাবে?"

কো-লোন্ নিঃশব্দে কাজের [illegible] করিতে লাগিল।

"বাবা এরই মধ্যে কজন দাঁড়ী ঠিক করেছেন—তিনি যদি তোমাকে চান্, যাবে?"

আর চুপ করিয়া থাকা অসম্ভব। কো-লোন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল সে তখন "দেখা যাবে।"

"আমি তোমার জন্য তাঁকে বল্‌বো। আমিও সেই নৌকায় যাবো।"

গাড়ীগুলি আল, উঁচু নীচু মাঠ, নালা ও [illegible] অতিক্রম করিয়া ধূলা উড়াইতে-উড়াইতে চলিল। খড়ের গাদার উপরে বসিয়া বালক-বালিকারা উচ্চস্বরে গান জুড়িয়া দিল। পথ হইতে তাহাদের পিতা ও ভ্রাতারা সেই সঙ্গে যোগদান করিল।

ঙা ত্থি যেহঃ সাঃ ক্রচ্ সো ঙ্খিও্ঙং সঞ্।
অঙ্ মতঙ্ হ পা তঙ্ তয়্ পা রে। ইত্যাদি।
[পঠনকালে 'ত্থি' 'দো' বলিয়া উচ্চারিত হয়
'পা' 'বা' — —
'রে' 'য়ে' — —]

আমাদের জন্মভূমি অতীব সুন্দর।
শ্যামল ধানের ক্ষেত অতি মনোহর॥
এমন বিচিত্র দেশ আর নাকি আছে।
যেথায় প্রকৃতি হাসে মনোহর সাজে॥
কোথাও নাহিকো সুখী মোদের সমান।
আমাদের ধর্ম্মপিতা বুদ্ধ ভগবান।

গ্রাম-প্রান্তে খামার-বাড়ীর উঠানে আসিয়া চালকেরা পশুগুলি মুক্ত করিয়া দিল। বালকেরা তাহাদের লইয়া নদীজলে স্নান করাইতে সন্ধ্যার আঁধারে মিলাইয়া গেল। সেদিনকার শস্যগুলি কোলোনের পিতা মং-লেট মহাশয়ের। বলা বাহুল্য, তাঁহার অংশটি পাঁচ জনের অংশ হইতে স্তূপাকারে পৃথক রক্ষিত হইল।

* [illegible] হইতে যাহারা আসিয়াছে, মুরোপীয় অথবা ভারতীয় [illegible] নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।—লেখক।

২

মুথিট্ একখানি গণ্ডগ্রাম। এক পোয়া আন্দাজ রাস্তার দুই ধারে বিশ পঁচিশখানা মাচার মত বাড়ী। মাঝে মাঝে বাঁশঝাড়। রাস্তার উভয় প্রান্তে জঙ্গল, বামদিকে শাখানদী—দক্ষিণে খানিকটা পতিত জমীর পরে ধান ক্ষেত।

নদীতে তখন ভরা জোয়ার। নৌকাগুলি রাস্তার সঙ্গে প্রায় সমতল। বর্ষাকালে কূল ছাপাইয়া গ্রামের মধ্যে দুই হাত আন্দাজ জল দাঁড়ায়। গৃহস্থেরা নৌকাযোগে এবাড়ী সেবাড়ী যাতায়াত করে।

সে দিন গ্রামে খুব কাজ পড়িয়াছে। মুগুর পিটিয়া কেহ রাস্তার ধারে বাঁশ পুঁতিতেছে—কেহ খড় মাথায় করিয়া আনিতেছে - কেহ বা বাখারি কাটিতেছে। মরাই তৈয়ারী হইবে।

ফোলোন্ মা-পানুদের বাড়ীতে চলিল। সে তখন তাঁতে বসিয়া খট্-খট্ করিয়া কাপড় বুনিতেছিল। তাদের বাড়ীটা খুব বড়। সম্মুখে নিম্নতলে একটা বারাণ্ডা। বারাণ্ডা হইতে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। নীচে মা-পান্ ছাড়া অন্য কেহই ছিল না। বারাণ্ডার যে কোণে বসিয়া সে বয়ন করিতেছিল তাহার উপরেই তার শয়ন ঘর। তাহারা দুই ভগিনীতে বারাণ্ডার অন্য কোণে চুরুট রুমাল প্রভৃতি গৃহজাত দ্রব্য লইয়া অবকাশমত বিক্রয় করিতে বসে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ উভয়ে হিসাব করিয়া ভাগ করিয়া লয়।

ফোলোন্ মা-পানের সম্মুখে উঠানে গিয়া বসিল। দ্বিতলে তাহার মাতা চলাফেরা করিতেছিলেন। নচেৎ বারাণ্ডায় বসিলে ক্ষতি ছিল না। মাথার উপরে স্ত্রীলোক থাকা অমঙ্গলের চিহ্ন। ফোলোনের দিকে একবার চক্ষু ফিরাইয়াই মা-পান্ নিজকর্মে মন দিল। সে একজন খুব বড় শিল্পী। মা-হেন্ বলেন তাঁহার মেয়ের মত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে বুদ্ধা মা-টু ছাড়া অপর কেহ পারে না। চুরুট ও হাঁড়িকুড়ি গড়িতে সে অদ্বিতীয়। একে সুন্দরী, উপরন্তু এমন শিল্পী; সুতরাং সমবয়সীরা তাহার প্রতি বিশেষ সদয় নয়।

গুন গুন সুরে গান গাহিতে-গাহিতে মা-পান্ মাকু টানিতেছিল। চুরুট-হাতে ফোলোন্ তন্ময় হইয়া দেখিতেছিল। সহসা মা-পান তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ফোলোন্ কহিল, "আজ থেকে ধান মাড়াই হবে?"

মা-পান পানের রসে রাঙা ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি মাখাইয়া বলিয়া উঠিল "তাই নাকি?"

ফোলোন্ হতভম্ব। দূরে বাঁশ পোঁতা হইতেছে। সেও যেন সেই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ধরণীগর্ভে বসিয়া যাইতেছে। মা-পানের বেসিনে যাইবার খবর লইতেই তাহার আসা। অথচ তাহার উদ্দেশ্য সে যেন না বুঝিতে পারে। নখে করিয়া সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

"তুমি আজ মাঠে যাওনি মা-পান্?"

"মাথা ধরেছে।"

ফো-লোন্ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিল। কাজে বিঘ্ন হইবার ভয়ে অধিক কথা কহিতেও সাহস করিল না। দেয়াল ঠেসান দিয়া, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মা-পান্ তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল।

"তুমি কো-মং-গ্রে মশায়ের নৌকোতে যাবে নাকি?"

"যাবো কি না তার ঠিক হয়নি।"

"আমি চল্লুম।"

ফো-লোন্ চলিয়া গেল। অচিরে মা-পানের গানের সহিত তাঁতের শব্দ উঠিল। পথিমধ্যে মা-মীর সহিত ফোলোনের সাক্ষাৎ। কলসীকক্ষে জল লইয়া সে ঘরে ফিরিতেছিল। কলসী নামাইয়া কহিল,—"কি হলো ফো-লোন্? আজ তার মন পেলে?"

আদ্যোপান্ত শুনিয়া মা-মী বলিল "মেয়েটা বড় ঠেকারে।"

"তার বেজায় দেমাক হয়েছে। মনে করে বুঝি আমি তার ভেঁতো। কোনো একটা মতলবের ঠিক নেই, আজ এক কথা, কাল এক কথা।"

"রগড় দেখছে, বেশী সেয়ানা কি না।"

আবেগভরে ফো-লোন্ বলিল "তুমি যত পার তার জন্য করে মর কিন্তু একদিনের জন্যও তার মন পাবে না। ঢের ঢের লোক দেখেছি কিন্তু এমন ভেতর-গোঁজা মানুষ কখন দেখিনি। এ জন্মে আমায় যেমন কষ্ট দিচ্ছেন, আর জন্মে তেমনি বেঙ্ হয়ে সাপের মুখে পড়বেন।"

ক্রমে মা-মী বলিল, তাহার পিতার সহিত মা-পানের যাইবার কথা আদৌ উঠে নাই। তাহাদের নৌকার লোক ঠিক হইয়াছে। সুতরাং তাহার স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব।

শেষে গলা চড়াইয়া বলিল "তোমার একটা বড় দোষ এই যে লোকে যে যা বলে তুমি তাই ধ্রুব বিশ্বাস করো।"

নিরুপায় ফো-লোন তর্জ্জনীর নখ কামড়াইতে লাগিল। ক্ষণপরে বলিল "মং-মৌএর উপর তার খুব টান দেখ্‌তে পাই।"

"কেন হবে না? সে ত তোমার মত আহাম্মক নয়। কাল আমরা বসেছিলুম, মা-পান্ আর আমি। মং-মৌ আস্‌তেই মা-পান্ বল্লে, আজ তুমি যাও। সেও তখনি চলে গেল। একটু পরেই মা-পান্ চেঁচিয়ে বল্লে, শুনে যাও, আমার মাথা খাও।—সে ফিরেও তাকাল না। তুমি কি মনে কর সে আর আসবে? যদিই বা আসে মা-পান্ আর কক্ষণও বল্‌বে না চলে যাও।"

"মং-মৌ নিশ্চয় তাকে তুক-গুণ করেছে। একখানা চিঠি দিলুম তার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না।" *

"তা জানিনে। তুক-গুণ করলেও পচবার ভয়ে সে কাউকে জানাবে না। তবে এটা জানি যে মা-পান্‌কে চার টাকা দামের একটা আঙটি সে দিয়েছে।"

"আমিও ত তাকে ৩৲ টাকা দিয়ে হার কিনে দিয়েছিলুম। কিন্তু এক-দিনও পরতে দেখিনি।"

"তোমাকে সে তার ভেড়ো ভাবে। তুমি মরদ নও, মিন্‌মিনে খোকা। মেয়েমানুষে তোমার মতন লোককে ভালবাসতে পারে না।" মা-মী বিরক্তভাবে কলসী তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

এক বৃহদাকার প্রাঙ্গণে আটটি মহিষ ধীরে-ধীরে প্রদক্ষিণ করিয়া ধান মাড়াই করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা নূতন আঁটি আনিয়া মহিষদের পদতলে ভূমির উপর রাখিতেছে। পুরুষেরা গান গাহিতে-গাহিতে খড়গুলি তুলিয়া লইতেছে। ফো লোন্ গম্ভীরভাবে আসিয়া কাজে যোগদান করিল।

বাটী ফিরিবার কালে প্রধান (কো-মং-মে) মহাশয় বলিলেন—"অকারণ তোমরা আজ দেরী কর্‌লে। আমার সবগুলো আজ না করলেই হত—বাকীটা কাল ধরা যেত। খেতে কত দেরী হবে।"

মং-মৌ ফোলোন্‌কে বলিল "কাল তোমাদেরটা ধরা যাবে।"

ফো-লোন্—"যদি প্রধান মশায় অনুমতি করেন।"

"তা ত নিশ্চয়ই। এখন মা-পানের ওখানে যাবার নিমন্ত্রণ আছে। আজ রাত্তিরে তুমি আমার ওখানে এসো, দুবাজী খেলা যাবে। শোয়ে-টুন্‌রাও যাবে।"

ঈর্ষায় ফুলিয়া উঠিয়াও ফো-লোন্ তাহাকে উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। মং-মৌ অসীম বলশালী। মৌনভাবে ভাবিতে-ভাবিতে সে গৃহমুখে চলিল। "নাঃ আর সহ্য হয় না। কাল সকালেই ক্যাথেইঙ্‌এ গিয়ে উ-বৃ-নার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে আস্‌বো। দেখি সে আমার বশ হয় কি না।"

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন জাতক সম্বন্ধীয় কথকতা শুনিতে যাইবার কালে ফোলোনের জননী পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়। ফোলোন্ তখন এক বছরের। তদবধি রন্ধনাদি কোনও-প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে তিনি অক্ষম। বাটী ফিরিয়া ফোলোন্ উঠানের এক ধারে উনুন ধরাইয়া দিল। ঘরের মধ্যে রন্ধন করা নিষিদ্ধ। প্রথমতঃ গৃহদাহের ভয়, দ্বিতীয়তঃ মাছভাজার গন্ধ অসহ্য। তবে বর্ষাকালের কথা স্বতন্ত্র।

পিতা পুত্রের ভোজন হইয়া গেলে, মাতার জন্য ভাত বাড়িয়া রাখিয়া, দ্বিতলে গিয়া আলো জ্বালাইয়া, ফোলোন্ বেশভূষায় মনোনিবেশ করিল। উপরে দুইটি ঘর। একটি তাহার। ঈষৎ অন্ধকারময় ঘরটির ক্ষুদ্র জানালার পার্শ্বেই ঘন বাঁশঝাড়। আসবাবের মধ্যে হাত-খানেক উচ্চ একটি তক্তাপোষ, একটি সেগুন কাঠের বাক্স, দর্পণ হিসাবে বিস্কুটের টিনের ডালা, মাদুর, বিলাতী কম্বল, কাঠের বালিশ ও মশারি। তক্তাপোষের নীচে বোঁটাওয়ালা বিলাতী কুমড়ার

* পত্রখানি এই:—

"দাস ফোলোন্ সর্ব্বান্তঃকরণে মা-পানের সর্ব্ববিধ মঙ্গল কামনা করি। সমাচার এই আমি যে দিন মা-পান্‌কে দেখেছি সেদিন থেকেই আমি মরে গেছি। বেশী আহার পেটে যায় না। মা-পান্‌কেই খালি খালি ভাবছি। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল সত্য সত্যই আছে নচেৎ মা-পান্‌কে দাস এত ভাল বাসিতে যাইবে কেন। বলি মা-পান্ দাসের প্রতি এত বিমুখ কেন। কি করিলে দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হইবে বল। মং-মৌই দাসের এই দুঃখের কারণ দেখিতেছি। দাস ফোলোন্ মা-পান্ মহাশয়ার পত্রের আশায় রহিলাম। শীঘ্র শীঘ্র উত্তর লিখিয়া সুখী করিও।

১২৭৭খৃঃ। তাব্বুডায়ে লাছান্ ১৩ য়াক্।

সন ১২৭৭ মঘী। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী।"

মত একটি বার্ণিস-করা কাঠের ডাবর বা বাক্স। বাক্সের মধ্যে—উপরের থাকে, অর্থাৎ কানাওয়ালা থালের মত গেবেতে, পানের সরঞ্জাম; নিম্নতলে গোটা পাঁচেক চুরুট ও কয়েকটি টাকা পয়সা।

পান চিবাইতে চিবাইতে কাঠের সিঁড়ি ধরিয়া ফোলোন্ নীচে নামিয়া আসিল। মাতা তখন বারাণ্ডায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন।

"আমি, মা-পানের ওখানে যাচ্ছি মা।"

"যাও বাবা, বেশী রাত কোরো না।"

ফো-লোনের মত সুন্দর যুবা গ্রামের মধ্যে নাই। মা-পান্ও তাহার তুলনায় কালো। মোটের উপর সুশ্রী হইলেও মং-মৌ যেন গুণ্ডার মত। ফো-লোনের পরিধানে লাল রেশমী লুঙ্গি, বকের পালকের মত সাদা জামা, সোনালি রংএর রুমাল মাথায় বাঁধা। বাহারি চাদরের খোঁটে এক তাড়া চাবি—যেন তাহার কতগুণ্ডী বাক্স দেরাজে কত ধনরত্নই সঞ্চিত?

ফোলোন্ একাই চলিল। কিন্তু সেটা নিয়ম নয়। একজন বন্ধু গিয়া বাহিরে থাকা উচিত।

নিজের ঘরে বসিয়া মা-পান্ কনিষ্ঠা সহোদরা মা-নুকে রাজকন্যার উপকথা শুনাইতেছিল। গল্পটি সবে মাত্র শেষ হইয়াছে, ফোলোন্ উপস্থিত হইল।

মা-নু উঠিয়া গেল।

"দাঁড়াও আলোটা জ্বালি।" মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা ওয়াল-ল্যাম্প জ্বলিয়া উঠিল। মা-পানের বেশ-ভূষাও চমৎকার। কবরীর গোলাপ-দুইটির সুবাসে ঘর ভরপুর। মাদুরে বসিয়া ফো-লোন্ কাঠের রেকাবি হইতে এক খিলি পান তুলিয়া লইল। হাঁড়ির মত অন্য একটা পাত্রে গোটা দশেক চুরুট ছিল—'শালে' চুরুটগুলি কলার বাসনায় মোড়া, দেখিতে ঠিক দুআনা দামের কুল্পী বরফের খোলের মত।

ফো-লোন্ কহিল "এবার খুব ধান হয়েছে। অনেক বছর এমন হয়নি।"

"বাবাও সন্ধ্যের সময় তাই বলেছিলেন। আজ সকালে লাডৌ গাঁয়ের কজন নৌকোয় যেতে তাঁকে বলেছে তাদের ওখানেও খুব ধান হয়েছে। তবে অনেক মোষ গরু মরে যাওয়াতে অনেকের বড় কষ্ট হয়েছে।"

"হ্যাঁ, গেল বরষায় তাদের অনেক গরুটরু মরে গেছে বটে।"

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। কথাও খুঁজিয়া পাওয়া দায়। তৎপরে, মা-পানের পিতা একমাস পরে বেসিন থেকে কি কি দ্রব্য তাহার জন্য ক্রয় করিয়া আনিবেন ইত্যাদি কথোপকথনে আরও পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

মা-পান্ একটা চুরুট তুলিয়া লইতেছে, ফো-লোন্ সহসা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। হাত ছিনাইয়া লইয়া মা-পান্ ধাক্কা দিয়া ফো-লোন্‌কে ফেলিয়া দিল। "দূর হও—এখনি দূর হও বলছি।"

রাস্তা হইতে উপরের বারাণ্ডার দিকে ফোলোন্ দেখিল, মা-পান্ সরোষ ইঙ্গিতে তাহাকে প্রস্থান করিতে বলিতেছে। সভয়ে অস্ফুট স্বরে, করজোড়ে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। মা-পান্ পর্দ্দা ফেলিয়া দিল।

অন্যদিন মাতাঠাকুরাণী অন্তরালে থাকিয়া পাণিপ্রার্থী যুবকের সহিত স্বীয় কন্যার কথোপকথণ শ্রবণ করেন। আজ তিনি নিদ্রিত।

পুত্রের অপেক্ষায় জননী বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন। চোরের মত পুত্র তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি হ'ল বাবা। আজ ভাল করে কথা কইলে?"

নিকটে বসিয়া ফোলোন্ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

ফোলোন্—"কো-মং-গ্যের কাছে ওর বাবা বোধ হয় আমার নামে নালিশ করবে।"

"তা পরিবে না। পাঁচজনে শুন্‌লে ওর মেয়েকেই দুষবে। অনেকেই মেয়েটার ওপর চটা।"

"কি করবো এখন কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

"ভেবে কি হবে ঘুমুগে যা। আরও অনেক মেয়ে আছে, তাদের কাউকে বিয়ে করিস।"

রাত্রে সে স্থির করিল পরদিন প্রত্যুষেই উ-বু-নার কাছে যাইবে। সাতটার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। গ্রামের সকলে তখন মা-পানের পিতা মং-ব্য মহাশয়ের বাটীতে। আজ তাঁহার ধানমাড়াই হইবার দিন। এত বেলায় পলায়ন বড় শক্ত। বাড়ীতে আহার করিয়া কাজে যাওয়াই স্থির হইল।

শোয়েটুন্ আসিয়া নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে তাহার অনুপস্থিতির

কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফোলোন বলিল, অধিক রাত্রে শয়ন নিমিত্ত শরীর ভাল নহে। তাছাড়া অপর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াও কি রকম ধাতে সয় না।

শোয়েটুন্ বলিল, "মং-ব্যু মশাই তোমাকে খুঁজ্‌ছিলেন। তোমার বাবা আমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন।"

আত্মহারা হইয়া ফোলোন্ বলিয়া উঠিল "দাদা, তুই ততক্ষণ চলিকটা ধুয়ে ফেল ভাই, আমি ওপর থেকে ঘুরে আস্‌ছি!"

৩

কাক কোকিলও টের পাইল না, ফোলোন বশীকরণের ঔষধ লইয়া আসিল এবং পবননন্দনের মৃত্যুবাণ অপহরণের মত কৌশল করিয়া মা-পানের পানীয় জলে কিয়দংশ মিশাইয়া দিল। অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাঁচজনে শুনিল, মাতার ঔষধ আনিতে সে উ-বৃ-নার কাছে গিয়াছিল। চণ্ড নামানো ও কবিরাজি চিকিৎসায় অনেক অর্থব্যয় হইল অথচ কি ছাই পাঁশ হইল তার ঠিক নাই। অগত্যা এই শেষবার তাঁহার শরণ লওয়া। মা ব্যতীত তাহার প্রাণের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে না। শুনিলে সব পরিশ্রম পণ্ড হইবে।

দারুণ উদ্বেগে ফোলোন্ দিনমানটা কাটাইয়া দিল। সন্ধ্যাকালে শোয়ে-টুন্ আসিয়া বলিল "চল হে, জুবাজি খেলে আসা যাক্!"

একথা মন্দ নয়। দু পয়সা আসিতে পারে। প্রায় সব জমাটাই ঔষধ কিনিতে খরচ হইয়াছে। ফো-লোন স্বীকৃত হইল।

বড় ভুল করিয়া ফো-লোন্ পকেটে ঔষধ লইয়া জুয়া খেলিতে গিয়াছিল, শয়ন-ঘরের চালে গুঁজিয়া রাখে নাই।

"হরিণ আমার" "মুরগী" "এবারও কুকুর ধল্লুম মোদ্দাৎ ঠিক করে চেলো" ইত্যাদি কলরবে জুয়ার আড্ডা পূর্ণ জোয়ারে প্রবাহিত হইতেছিল, এমন সময় বন্ধুদ্বয় সেখানে অবতীর্ণ হইলেন।

"বস' ওখানে—"

"হেই ঐ কুকুর পড়েছে—বেঁচে থাক্ মোর কুকুর!"

পয়সা বাহির করিবার সময় ফোলোন্ শিহরিয়া পকেটে হাত গুঁজিয়া উপরে দৃষ্টিপাত করিল। মং-মৌএর চোখে তাহা এড়াইল না।

পান চুরুট ও একটি মাটীর পিকদানি ব্যতীত দুই ভাঁড় তাড়ি, এক বোতল মদ ও ভ্রমণশীল একটি কাঠের গ্লাস আসরে রক্ষিত। মংমৌ যতবার পরাজিত, তাহার নেশার মাত্রা ততই বর্দ্ধিত। পরবর্ত্তী খেলায় ফো-লোন্ জয়লাভ করিল। সকলের নিকট হইতে সাত আনা সংগৃহীত হইল।

"কেন বাবা মদ খেতে দোষ কি? কাল তোমার বাবা মং-লেট এসে হরদম টেনেছিলো, আর আজ তুমি সাধু বন্‌ছ সোনার চাঁদ!"

"আমি ওসব খাই না বল্‌ছি—মিছিমিছি বিরক্ত করো না, যাও।"

ফোলোন্ পুনরায় পকেট পরীক্ষা করিল।

"এ বাজি মঞ্জুর নয়, ও আগে কুকুর ধরেছিল।"

"কুকুর—ধ-রে-ছিলো! রাস্কেল, তখন যে ঘুঁটি গড়ায় নি, সঙ্গে সঙ্গেই ত তখুনি বলেছিলুম পায়রা আমার।"

"মুখ সাম্‌লে কথা ক'—"বক্তা ঘুসি পাকাইল।

দুই হাতে দুই জনকে ধরিয়া মং-মৌ বিবাদ মিটাইয়া দিল।

রুমালে টাকা পয়সা বাঁধিয়া ফো-লোন্ বলিল "শোয়েটুন্, আমি ভাই উঠি, রাত হয়েছে, একটু দরকারও আছে।"

"জিতে যাওয়া হচ্ছে না চাঁদ, খেলো—"

"দাদার আজ পোয়া বার। কেমন পয়া জায়গায় বসেছে!"—আধ গ্লাস মদ নিঃশেষ করিয়া, আস্তে ফোলোনের কাঁধ চাপড়াইয়া মং-মৌ পুনরায় বলিল—"কোন্ বেটা আজ তোরে হারায় দেখি, তুই কত বড় চালাক্!"

আরও কয় বাজি হইল! সত্যই ফোলোনের পোয়া বার। অন্যূন আট টাকা জিতিয়াছে। মং-মৌ মদ খাইতেছিল, ফোলোন বিদায় প্রার্থনা করিল।

"দাঁড়াও ভাই"—লাফাইয়া মংমৌ বলিল—"তোমাকে একটা মজা দেখাই"—আলোটা উস্কাইয়া—"ওই দেখ।"

চড়াই পাখীর বাসা বুজাইবার জন্য ফোলোনের মাথার উপরে চালের বাতায় গোঁজা খানিকটা নেকড়া ছিল।

"ওটা কি জানো—আঁতুড়ঘরের কাপড়! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ যাদু, ভায়ার আজ সব তুকগুণ মাটী। এইবার আর কি, পকেট থেকে ওষুধ-পত্তর ফেলে দাও।"

ফোলোনের মাথা ঘুরিতে লাগিল। পয়সা বাঁধা রুমালের খোঁট ধরিয়া, সজোরে মং-মৌর নাকের উপর মারিয়া, বারাণ্ডা হইতে ঝম্পপ্রদানে, প্রাণপণে সে দৌড়াইতে লাগিল।

"আজ তোর রক্ত দর্শন করবো দাঁড়া শুয়োর"—হোঁচট খাইয়া মং-মৌ সশব্দে পড়িয়া গেল। উঠানে একস্থানে রাশীকৃত পাথরকুচি ছিল। ফোলোন্ তখন বহুদূরে। মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া, দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, অট্টহাস্যে নীরব রজনী কম্পান্বিত করিয়া বলিল "বশ করবে শুয়োর—কেয়া মজা! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—খালি খালি ওপর দেখা হচ্ছে! ওরে তুই ভারি ওস্তাদ, মনে করিস কেউ ধর্‌তে পারছেনা।"

অবশিষ্ট তাড়িটুকুর সৎকার হইল। তখন সেস্থানে জনপ্রাণী নাই।

সকালে আগুন পোহাইবার সময় মাতাপুত্রে কথা হইতেছে:—"কাল পালাবার সময় পকেট থেকে পড়ে গেছে, না হলে আজ মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তার গুণ ফিরিয়ে আনতুম। বেটার জন্য সব মাটি হল।"

"তুই একটা আস্ত গাধা। ভয়কি, আগেকার ওষুধেই কাজ হবে। মা-পান্ জল খেয়েছেত?"

"হ্যাঁ তা খেয়েছে।"

"তবে আর কি? ওঝা মহাশয়ের কথামত আজ খামারবাড়ীতে কাজ করবার সময় বরাবর তার কাছে-কাছে থাকিস্।

"আমার বড় ভয় করছে, বেটা নিশ্চয় আমাকে মেরে ফেল্‌বে।"

"ধরতে এলে পালাস্। তুই ত বলিস তুই তার চেয়ে দৌড়ুতে পারিস্।"

"তার মতন চারটের চেয়ে জোরে দৌড়ুতে পারি। কিন্তু আমায় ধর্‌তে পারলে মেরে ফেল্‌বে।

"আচ্ছা কাউকে বলিস তাকে আমার কাছে ডেকে দিতে।"

একটা কুকুর আসিয়া আগুনের কাছে বসিল।

"আর মা পানের কাছে থেকে কোনো ফল হবে না। মং-মৌ নিশ্চয় তাকে বলে দেবে।"

"দূর পাগল! আঁতুড়-ঘরের নেকড়ার নীচে বসে সকলেরই অপমান হয়েছে।"

"ঠিক বলেছো মা, আমি সে কথা একদম ভাবিনি।"

"ঐ মং-মৌ,—বোধ হয় শোয়েটুনের বাড়ীতে যাচ্ছে। লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে হাঁটছে—বেশ হয়েছে, তোকে আর মারতে পারবে না।"

"আমি একদম ভয় খাইনি"—তাহার উদ্দেশে ঘুসি ছুড়িয়া—"ঐ দেখ কুত্তা যাচ্ছে—কুত্তা—কুত্তা।"

"ভয় খেয়েছে দেখ্‌চিস না, ফিরে দেখারও সাহস হ'ল না।"

"দেখো'না ওকে মজা দেখাচ্ছি, আগে রাত হোক্। ইট ছুড়ে ওর মাথা ভাঙবো।"

দূর হইতে মং-মৌ তাহার আস্ফালন শুনিতে পায় নাই বটে, কিন্তু পাশের বাড়ীর পাঁচজনের কর্ণকুহরে সেকথা আঘাত করিয়াছিল। একজন, কোমংগ্যে মহাশয় স্বয়ং। "কুত্তা বলে কে চেঁচাচ্ছিল—তুই? মংমৌ কুত্তা?"

ফোলোনের মুখ সাদা হইয়া গেল। "খুব আস্তে বলেছি, সে শুনতে পায়নি।"

"তুই ঘুসি দেখাচ্ছিলি কেন?"

ফোলোনের ইচ্ছা হইল বলিয়া দেয় গতরাত্রে সে তাহার কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। মুখে আসিয়াও কথা সরিল না। থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল "ভুল হয়েছে—আর কর্‌বো'না।"

"পরশু বুড়ী তোকে গাল দিয়েছিলো বলে তুই আমার কাছে তাকে ডাইনী বলে নালিশ করেছিলি। তার দশ রেক জরিমানা হয়েছে। আজ যদি মংমৌ নালিশ করে তোর ত্রিশ রেক জরিমানা করব।"

ফো-লোন্ তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে সাবধান করিয়া প্রধান মহাশয় বাটী ফিরিলেন।

প্রধান মহাশয়ের বাটীতে সকলে আহার করিতেছে, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে ফোলোন্ গিন্নি ঠাকরুণকে পুষ্টিবেষণে সাহায্য করিতেছে। মং-মৌকে একজন কহিল, "ফোলোন্

তোকে কুত্তা বলে গালি দিলে, ঘুসি দেখালে, আর তুই মুখ বুজে চলে গেলি !"

"কখন—কোথায় ?"

সব শুনিয়া মং-মৌ মিনিট খানেক ভাতের গ্রাস হাতে লইয়া ফোলোনের দিকে তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া রহিল।

"যদি শুনতে পেতুম ওর পিণ্ডি চট্‌কাতুম। আমার কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না—ফের যদি বলে ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো।"

মা-মীর হাত থেকে 'ঙাপ্পির' পাত্রটা লইয়া ফোলোনের পরিবেষণ করিবার কিঞ্চিৎ ইচ্ছা হইয়াছিল। উপস্থিত সে সাধ মিটিয়া গেল। মা-পান মং-মৌএর কাছে গিয়া আদর জানাইয়া বলিল—"তুমি কাল আমার কাছে যাওনি—কেন যাওনি ?"

সর্ব্ব-সমক্ষে মা-পানের এরূপ স্পর্দ্ধাসূচক প্রশ্নের উত্তর দিতে মং-মৌ ইচ্ছুক নয়। পায়সান্নে পিঠা ডুবাইয়া বলিল "ইচ্ছা হয়নি ?"

যুবতীরা হাসিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে মা-পানের কর্ণমূল আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণপরে ফোলোনকে ডাকিয়া, অনুরাগের অভিনয় করিয়া মা-পান কহিল "তুমি সকাল থেকে চুপ করে আছো, কারুর সঙ্গে কথা কইছ না কেন।"

মং-মৌর দিকে নেত্রপাত করিয়া ফো-লোন কহিল "না, এই কাজকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলুম।"

"আমার সঙ্গে আগেকার মত তুমি আর সেধে সেধে কথা কয়োনা।"

আহারাদির পর সকলের সঙ্গে মং-মৌ কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। ঔষধের ফল ফলিল। গতরাত্রির জুয়া খেলার কথা সাবধানে অবতারণা করিয়া মা-পানকে ফোলোন জানাইল, তাহার অনুমতি হইলেই টাকা আটটির সাহায্যে সাতনর আসিতে পারে। তবে বেসিন ভিন্ন ভাল গহনার সুবিধা হইবে না।

নিশ্বাস ফেলিয়া মা-পান বলিল "এখনও একমাস !"

পুনশ্চ প্রধান মহাশয়ের বাড়ীতে সরগরম পড়িয়া গেল। কি সমাচার ? না, দারোগা মাং-পো-থিন্ মহাশয় আসিয়াছেন। বারাণ্ডায় মাদুরের উপর তিনি উপবিষ্ট। পথে যাতায়াতের কালে পথিক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে তাঁহাকে বন্দনা করিতেছে—কিন্তু সেদিকে তিনি বীতস্পৃহ। পাখা হস্তে একজন তাঁহার পশ্চাতে বায়ু সঞ্চালনে রত।

দ্রুতপদে কর্ত্তামহাশয় আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। গ্রামের কথা উত্থাপিত হইলে, প্রধান মহাশয় বলিলেন, গ্রামের অবস্থা উপস্থিত ভাল। পুলিশের কঠোর শাসনে কোনওরূপ গোলমাল বা ডাকাতির নাম গন্ধ নাই। 'রিপোর্টবুক' ও দোয়াত কলম আসিল। কলম সরিল না। কলম ছুঁড়িয়া দারোগা মহাশয় বলিলেন "আমি লিখ্‌বো—সরকারি জিনিসপত্রে যত্ন করা হয় না।"

লেখনীটা প্রধান মহাশয়ের নিজস্ব। তাহা দারোগা মহাশয়েরও অবিদিত ছিল না।

প্রধান মহাশয়—"এবার আস্‌বার সময় গোটাদুই টাকা দিয়ে—দয়া করে একটা ভাল কলম যদি আন্‌তে পারেন—অনুমতি হয় ত টাকা দুটো—"

পকেটে টাকা রাখিয়া দারোগা বলিলেন "রাজকার্য্যের বেজায় ঝঞ্ঝাট, তবে যদি মনে থাকে ত' কলম আস্‌বে। আর দামটাও ঠিক জানিনা—বোধ করি এতেই হবে, কিছু বেশী যদি লাগে পরে দিলেও চলবে।"

প্রধান মহাশয়ের গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন "দু পয়সায় একজোড়া কলম পাওয়া—"

কর্ত্তার ধমকে গৃহিণী চুপ করিলেন।

প্রধান মহাশয় দারোগাকে বলিলেন "অনুমতি হয় ত আপনার কথামত আমি একবার লিখতে চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি।"

সেই কলমে হৃষ্টপুষ্ট ভুট্টার দানার মত স্পষ্টাক্ষরে লেখা হইল :—

"বারটার সময় ম্যুথিটে আসিলাম। প্রধান মহাশয় বলিলেন গ্রামে ডাকাতি হয় নাই। দুইটার সময় গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম।

মং-পো-থিন্।"

চুরুট ধরাইয়া তিনি বলিলেন "শুন্‌লুম জুয়া খেলে গ্রামটা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে। যারা জুয়া খেলায় জিতেছে এমন দুএকজনের নাম বলুন।"

শুষ্কভাবে হাসিয়া প্রধান মহাশয় বলিলেন "অতি সামান্য

মাত্র জুয়া খেলা হয়। হুজুরের দয়ায় সকলেই গরীব, হার জিত বিশেষ হয় না।"

কর্ম্মচ্যুতির ভয় প্রদর্শন হইল। অন্ততঃ একজনেরও নাম বলা চাই।

"তা হলে ফো-লোন্, মং-লেটের ছেলে। বেচারা কিন্তু বড়ই গরীব।"

অচিরে মং-লেটের আবাসে ফো-লোনের অস্বীকারের ক্রন্দনধ্বনির সহিত তাহার মাতার গালিবর্ষণ হইতে লাগিল। আধঘণ্টা পরে ফো-লোনের সিল্কের লুঙ্গী বগলে করিয়া শান্তিরক্ষক মহাশয় বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পকেটে ফোলোনের টাকার থলি। প্রধান মহাশয়ের সঙ্গে তিনি তাঁহার গৃহে আহার করিতে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে প্রধান মহাশয় বারাণ্ডার উপরে বসিয়া আছেন। উঠানে চাটাইএর উপরে গ্রামের সকলে উপবিষ্ট। ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে শান্তিরক্ষক মহাশয় ঘুম হইতে উঠিয়া গ্রামান্তরে গিয়াছেন। কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন, তাঁহার সাধ্যমত তিনি করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে ফো-লোনের নাম করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। তবে ভগবান বুদ্ধের কৃপায় ও তাঁহার বিশেষ অনুরোধে ফো লোন্ সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, নতুবা জেলে যাইতে হইত। তাঁহার বার বার নিষেধ সত্ত্বেও সকলেই প্রায় জুয়া খেলে। অতীব অন্যায়।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল।

ফো-লোনের থলিতে ৯/১৫ ছিল। রাজকোষে সে অর্থ জমা হইবে। আসিবার সময় ফো-লোন নিজের লুঙ্গীটি স্বেচ্ছায় দারোগাকে পুরস্কার দিয়াছে তাই তিনি তাহা লইয়াছেন।

পরদিন প্রাতে প্রধান মহাশয়ের বাটীতে সকলের নিমন্ত্রণ হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দূরের পাল্লা

ছিপ্‌খান্ তিন্-দাঁড়্,
তিন্ জন্ মাল্লা
চৌপর্ দিন্-ভোর
দ্যায় দূর পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপ্ ঝাড়্,
জঙ্গল্,—জঞ্জাল্,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বনহাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ্ চুপ্—ওই ডুব্
দ্যায় পান্‌কৌটি;
দ্যায় ডুব টুপ্ টুপ্
ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক্ কল্‌সীর
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক্ বয়,
মন উন্মন্ গো।

তিন-দাঁড় ছিপ্‌খান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান্ গাচ্ছে?

* * *

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

মুখ্‌খানি মিষ্টিরে,
চোখ্ দুটি ভোম্‌রা,
ভাব্-কদমের—ভরা
রূপ্ দ্যাখো তোমরা।

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগ্‌রী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হল গোখ্‌রী!

ডাক্‌পাখী ওর লাগি
ডাক্‌ ডেকে হদ্দ,
ওর তরে সোঁত্‌-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম।

ওর তরে মন্থরে
নদ্‌ হেথা চল্‌ছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল্‌ বুঝি বল্‌ছে।

দুই তীরে গ্রামগুলি
ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকো সে
ওর মুখই চাইছে।

আট্‌কেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পর্শ,
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ।

পান বিনে ঠোঁট্‌ রাঙা
চোখ্‌ কালো ভোম্‌রা
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোম্‌রা।

* * *

পান সুপারি! পান সুপারি!
এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শীর্ণি মেনে
চল্‌রে টেনে বইঠা হেনে;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে,
বাঁয় বাঁচিয়ে; ডাইনে রুখে,
বুক্‌ দে টানো বইঠা হানো
সাত সতেরো কোপ্‌ কোপানো।

হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনি যেন ঝামর-চুলো
নাচ্‌তেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল।
জমজমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল।
ঝাপ্‌সা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কা'রা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল গাছে।

* * *

আর জোর দেড় ক্রোশ,
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্‌ ভাই টান্‌ সব
নেই উৎকণ্ঠা।

চাপ্‌ চাপ্‌ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বইঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়ছে।

ওই মেঘ জমছে
চল্‌ ভাই সমঝে,
গাও গান দাও শিশ্‌
বক্‌শিস্‌! বক্‌শিস্‌!

খুব্‌ জোর ডুব্‌ জল
বয় স্রোত্‌ ঝিরঝির্‌
নেই ঢেউ কল্লোল্‌
নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা
চল্‌ সব ফুর্ত্তি
বকশিস্‌ টঙ্কা
বকশিস্‌ ফুর্ত্তি!

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়
ঝাউগাছ দুল্‌ছে
ঢোল-কল্‌মীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে।

লক্‌লক্‌ শর-বন
বক্‌ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ্‌ চার্‌দিক্‌
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক নিঃসাড়্‌
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌খান তিন্‌ দাঁড়্‌
চার জন যাত্রী।

*　*　*

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝিঁঝিঁর গানে
স্বপন পানে পরাণ টানে।

তারায় ভরা আকাশ, ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধূলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র ভরে।

*　*　*

কেবল তারা! কেবল তারা!
শেষের শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথাই চাহি।

কোথায় এল নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হইরে কাণা
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে!

জ্বলছে তারা নিব্‌ছে তারা
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,—
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা-হারা।

তারায় আজি ঝামর হাওয়া
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুণ্‌তি অফ্‌রান্‌ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক্‌-বাতি।

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্পতরুর কুঞ্জ কিরে ?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে।

বিনা হাওয়ায় ঝিল্‌মিলিয়ে
পাপ্‌ড়ি মেলে মাণিক-মালা,
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা।

চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাঁধা
লাগ্‌ছে যেন কেমন পারা—
তারাগুলোই জোনাক হল
কিম্বা জোনাক হল তারা।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখ্‌ছে আকাশ-ভরা তারায়
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায়।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্‌ দেশেরে ?—
মরা গাঙ্‌ আর সুর-সরিত্‌
এক হয়ে যেথায় মেশেরে!

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় সুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ্‌ যে আলা রতন উঁছে।

*　*　*

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জ্বল্‌ছে নিবে নিব্‌ছে জ্বলে
উল্কোমুখী জিব্‌ মেলিয়ে
চাট্‌ছে বাতাস আকাশ-কোলে!

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা,
একলা ছোটে বনবাদাড়ে
ল্যাম্পো হাতে লকুড়ি ঘাড়ে।

সাপ মানেনা বাঘ জানেনা
ভূতগুলো তার সবাই চেনা
ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে
রন্‌রনিয়ে হন্‌হনিয়ে।

বাঁশের ঝোপে জাগছে সাড়া
কোল্-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগছে হাওয়া জলের ধারে
চাঁদ ওঠেনি আজ আঁধারে।

শুকতারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্ চলেছে নিঝুম স্রোতে।

ফিরছে হাওয়া গায়-ফুঁ-দেওয়া
মাল্লা মাঝি পড়ছে থকে,
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছগুলোকে।

চল্‌ছে তরী চল্‌ছে তরী
আর কত পথ? আর ক'ঘড়ি?
এই যে ভিড়াই ওই যে বাড়ী
ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা বট ওর পিছনে
দেখ্‌ছ আলো? ঐতো কুঠি,
ঐখানেতে পৌছে দিলেই
রাতের মতন আজকে ছুটি।

ঝপ্ ঝপ্ তিনখান
দাঁড় জোর চল্‌ছে
তিন্‌জন মাল্লার
হাত সব জ্বল্‌ছে;

গুরগুর মেঘ-সব
গায় মেঘ-মল্লার,
দূর পাল্লার শেষ
হাল্লাক মাল্লার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বর-পণ

টিপ্পনী।

শ্রাবণের প্রবাসীতে সম্পাদক-মহাশয় বর-পণ লাঘবের একটা প্রতিকার কল্পনা করিয়াছেন। এখন বিবাহের হাটে ইংরেজী-শিক্ষিত বরের দর চড়া। কিন্তু কালে যখন পাশ-করা যুবা অনেক হইবে, তখন যেমন অন্য দ্রব্যের বহু উৎপাদন-হেতু দরে সাচিব্য হয়, বরের দামও কমিয়া যাইতে পারে।

বর-পণ বলিলে বরের দাম বুঝায় না বটে, কিন্তু যে প্রতিজ্ঞা টাকার পরিমাণ-অনুসারে রক্ষা করা হয়, তাহা প্রায় কেনা-বেচার তুল্য হইয়া দাঁড়ায়। সে যাহা হউক, গত কয়েক বৎসরে অনেক বি-এ, এম-এ পাশ হইয়াছে। বরের বাজার মন্দা পড়িয়াছে কি? বোধ হয়, পড়ে নাই। কারণ পূর্বে যে কন্যার পিতা পাশ-করা জামাই খুঁজিতেন না, এখন তিনি খুঁজিতেছেন। উৎকল ও বিহারে বর পণ ছিল না, বঙ্গের মতন ছিল না, এখন সে সে প্রদেশেও আরম্ভ হইয়াছে।

বর-পণ যোগাইতে গিয়া অনেক কন্যার পিতাকে কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, ধনাঢ্য ব্যতীত অন্যের পক্ষে ত্রাসের কারণ হইয়াছে। সে বৎসর স্নেহলতার মৃত্যুর পর কাগজে মজলিশে বক্তৃতা-মঞ্চে একটা ধিকার পড়িয়াছিল। অনেকে মনে করিয়াছিলেন সমাজ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গেল, এখন পুণ্যের উদয় হইবে। সাত বৎসর পূর্বে আমি "বঙ্গদর্শনে" বর-পণ এড়াইবার পথ খুঁজিয়াছিলাম। হিন্দু-সমাজের পূর্বের বিবাহরীতি রাখিয়া এক পথ দেখিয়াছিলাম, সেটা যুবাদের হাতে। ইচ্ছা করিলে ইহারা বর-পণ-বিধি ভাঙ্গিতে পারে, আর কেহ পারে না। স্নেহলতার মৃত্যুর পর যুবাদিগকে মাতাইয়া বর-পণ উঠাইয়া দেওয়ার বহু কল্পনা চলিয়াছিল।

যুবারা কিন্তু সে উত্তেজনা ভুলিয়া গিয়াছে। বর-পণ যেমন ছিল, তেমনই আছে।

বরং একটা কুফল ফলিয়াছে। যিনি পণ গ্রহণ না করিয়া শিক্ষিত পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তিনি স্বয়ং না হউন তাঁহার আত্মীয় স্বজন কাগজে-কলমে ঢাক-ঢোল

পিটিয়া গগন ফাটাইতেছেন, অমুকের বিবাহে বর-পণ চাওয়া কিংবা লওয়া হয় নাই। "হে মূঢ়, দেখ, বর-পণ না লইয়া কেমন হরষিত মনে নির্ব্বিবাদে বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়াছে!"

কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যোগ্য ঘরে পুত্রের বিবাহ হইয়াছে, যে ঘর হইতে বর বহু টাকা নিজের ঘরে আনিয়াছে। এখানে পণ-প্রার্থনা অনাবশ্যক হইয়াছিল। তথাপি শ্লাঘা জুটিয়া বিপন্নের ক্ষতে লবণ-প্রক্ষেপ করিতেছে। পাপ যায় নাই; পাপ ঢাকিতে গিয়া আর পাপ করা হইতেছে। পূর্বকালে আত্ম শ্লাঘা ও আত্ম-হত্যা সমান বিবেচিত হইত। এমন দানধর্ম্ম পুণ্যকর্ম্ম কদাচিৎ গোপনে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অত কথায় কাজ কি, যেখানে দানপুণ্য কিছুই নাই, গ্রন্থ ছাপাইয়া গ্রন্থকার নিজের প্রতিমূর্তি জুড়িয়া আত্ম ঘোষণা করিতেছেন।

এমন কালে বর-পণ কেহ উঠাইয়া দিতে পারে কি? ইয়ুরোপের "সভ্যতা" যেটা আমাদের চোখে নিত্য প্রতিভাত হইতেছে, সেটা ভোগের সভ্যতা। এই সভ্যতা আমাদের সমাজ-দেহের মর্ম্মে-মর্ম্মে প্রবেশ করিতেছে। বিভব-প্রদর্শন ইহার বাহ্যবিকাশ। আমরা জনে-জনে মনে করি এক-এক রাজা। রাজার পক্ষে যাহা সাজে কিংবা সহজে জোটে আমরাও তাহা চাই। আমরা পুত্রের বিবাহে স্বর্গের অপ সরা চাই, সুবর্ণে ও রত্নে আপাদ-মস্তক-মণ্ডিতা চাই, পুষ্পক-রথও একটা চাই। সঙ্গে সঙ্গে টাকাও চাই, নচেৎ রাজভোগ চলে না। বর-পণে বিবাহের ঘটা হইতেছে; জাঁকে বিবাহের কারণে বর-পণ বাড়িয়াছে। নিত্য আহার-ব্যবহারে জাঁক; বিবাহে জাঁক আর আশ্চর্য কি?

বর-পণ অত্যাচারের ইহাই একটী কারণ নহে। কন্যার পিতামাতা উত্তম-কুলজাত সুশীল বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ধনাঢ্য জামাই আকাঙ্ক্ষা করেন। ইহা স্বাভাবিক। একটা সংস্কৃত শ্লোকে আছে, কন্যা বরের রূপ, মাতা বিত্ত, পিতা বিদ্যা, বন্ধুজন (আজিকালির ভাষায় কুটুম্ব) কুল, এবং অন্যজন মিষ্টান্ন চায়। এরূপ জামাই জোটা বহু ভাগ্যের ফল বই কি? ইহার নিমিত্ত অর্থ-ব্যয় অপ ব্যয় নহে। পিতার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্র হয়, কন্যা হয় না। সে কন্যার সুখ-বিধানের নিমিত্ত বিষয় সম্পত্তির কিছু দান অকর্ত্তব্য কি?

আমরা পুত্রের শিক্ষা ও শীলতার প্রতি যত মনোযোগী, কন্যার প্রতি তত নই। ফলে যোগ্য পাত্র যত মেলে, যোগ্য পাত্রী তত মেলে না। ইহার উপর পাত্রী যদি তেমন সুরূপা না হয়, তাহা হইলে বিবাহ-সম্বন্ধ দুর্ঘট হইয়া উঠে। এখন বরের পিতাকে টাকার তোড়া দেখাইয়া ভুলাইতেছি। বর-পণ না থাকিলে এমন কন্যার গুণান্বিত বর পাওয়া যাইত না। মনে করুন, বিবাহে টাকা-পণ উঠিয়া গেল। আপনি কন্যার পিতা; তেমন আরও অনেক পিতা আছেন। অন্যকে কন্যা-দায় হইতে উদ্ধার না করিয়া আপনাকে কেন করা হইবে? ইহার এক উত্তর, টাকা। টাকা অপেক্ষা প্রেয় দেখান, সুলভ প্রেয় দেখান। টাকাই যে পুরুষার্থ।

দানে পুণ্য, একথা সর্ব ধর্মেই আছে। হিন্দুধর্ম্ম বলে, দানের মধ্যে কন্যা-দান শ্রেষ্ঠ। ইহা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দেহ না থাকিলে, যাহাতে সে আশ্রমের স্থিতি, তাহাতে সন্দেহ আসিতে পারে না। পরাক্রম দ্বারা বিবাহযোগ্য কন্যা লাভ হইতে পারে। কিন্তু তাহা অসুর-সমাজে, আমাদের সমাজে নহে। আমাদের সমাজে কন্যার পিতা কন্যা দান না করিলে, বিবাহে সম্মতি না দিলে, বিবাহ হইতে পারে না। রূপবতী গুণবতী সুশীলা সালঙ্কৃতা কন্যাদানই দান। যে দ্রব্যের আদর নাই, তাহার দানে পুণ্যও নাই। কারণ তাহা সুলভ। কন্যার প্রতি আদর-মমতা পিতামাতার যেমন, অন্যের তেমন নহে। পিতা সে মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেও মাতা পারেন না। কন্যা যে মাতৃ-সরূপা; সে যে মেয়ে। এমন মেয়েকে যথাসাধ্য সালঙ্কৃতা না করিয়া কোনো মাতা পরের ঘরে যাইতে দিতে পারেন না। কারণ কন্যা নিরাভরণা গেলে মাতার সম্মান-লাঘব হয়; শ্বশুর বাড়ীতে কন্যাকে দুর্বাক্য বা অনাদর সহিতে হইবে, এই আশঙ্কা নহে; কন্যা আদরের, পূজার যোগ্যা বলিয়াই কন্যাকে মাতা সাজাইয়া পাঠান। মায়ের বাড়ীতে ঝী স্বচ্ছন্দে কুবেশে থাকিতে পারে; কিন্তু শ্বশুর-ঘরে সেখানে লক্ষ্মী-সরূপা হইতে হইবে সেখানে অলক্ষ্মীর বেশ কিছুতেই সাজে না। সাজা-না-সাজা লোকের কথা নয়; মাতৃত্বের কথা। কুৎসিৎ-বেশা নিরাভরণা কন্যাদান অসম্ভব।

ঠিক এই কারণে কন্যাকে যৌতুক দিতে হয়। অন্যের ঘরে, যাহাকে জানে না তাহার ঘরে, যে গৃহলক্ষ্মী হইতে যাইতেছে, তাহাকে গৃহস্থের যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য নিশ্চয়ই চাই। এই যে দ্রব্য-সম্ভার যাহা পিত্রালয় হইতে কন্যা লইয়া যায়, তাহাতে তাহারই অধিকার, শ্বশুরালয়ের কাহারও নহে। অতএব ইহা যৌতুক। কন্যার অলঙ্কার যেমন যৌতুক, অপর দান-সামগ্রী যেমন যৌতুক, যাহা বর-পণ নামে দান বা উৎসর্গ করা হয়, তাহাও তেমন যৌতুক মনে করিতে পারিলে বর-পণের অত্যাচার থাকিত না। কন্যার সংসারযাত্রার সম্বলের নাম যৌতুক। কন্যাকে যৌতুকদান হিন্দুধর্মে প্রসিদ্ধ আছে।

বাধা এই, বরের পিতা পণ বলিয়া গ্রহণ করেন, যৌতুক স্বীকার করেন না। পণের টাকা তাঁহার। মূলে বরের; কিন্তু বর পায় না, পিতা আত্মসাৎ করেন, আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করেন, হয়ত স্বীয় কন্যার বিবাহের ব্যয় পুত্রের পণ হইতে নির্বাহ করেন। এইটাই কু। বরের পণ, না বরের পিতার পণ? বর ধনুক-ভাঙ্গা পণ করিতে পারে; কিন্তু সে পণে পিতার অধিকার কোথায়? পিতা পুত্রের বিবাহ নির্বাহ করিবেন। না করিলে তাঁহার ধর্মহানি হইবে, বংশের পিণ্ড লুপ্ত হইবে। পিতা পুত্রের ভরণপোষণ করিবেন, পুত্রকে শিক্ষিত করাইবেন, বিবাহিত করাইবেন। পুত্রের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে যত কিছু কার্য, পিতার কার্য, পিতার কর্তব্য। খাওয়াতে-পরাইতে ঋণ করিতে হয়, পিতা করিবেন; বিবাহে চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা জ্ঞাতিকুটুম্ব বন্ধুবান্ধবকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইতে হয়, তিনি করাইবেন; বিয়াল্লিশ বাজনা বাজাইতে হয়, তিনি করাইবেন। ইহার নিমিত্ত ঋণ করিতে হয়, ঋণের দায় তাঁহার, পুত্রের নহে। কারণ বিবাহের ঘটায় তাঁহার সন্তোষ, তাঁহার খ্যাতি; পুত্রের নহে। এ স্থলে যে পিতা পুত্রের অর্জিত পণ আত্মসাৎ করেন, তিনি পিতৃধর্মে বঞ্চিত। তাঁহাকে কুপিতা বলিতে পারা যায়।

তিনি কুপিতা; কারণ তিনি পুত্রকে বিক্রেয় দ্রব্য মনে করেন। তিনি পুত্রের ভক্তি-প্রীতির মর্যাদা রক্ষা করেন না। তাঁহার ইচ্ছায় পুত্র বিবাহ করে, পুত্রের কর্তব্য তাই। কিন্তু পিতা নিজের ধর্ম পালন করেন না; তিনি অধার্মিক। পুত্রের অর্জিত ধনে পিতার অধিকার আছে নাই, থাকিতে পারে না।

কন্যার পিতা কন্যা-দান করেন; বর সে দান গ্রহণ করে, বরের পিতা করেন না। পিতৃহীন বরের বিবাহ হয়; কন্যার পিতা বর্তমান না থাকিলে কন্যার মাতা কিংবা অন্য অভিভাবক কন্যা দান করিতে পারেন। অতএব দান, দাতা, ও গ্রহীতার মধ্যে বরের পিতার স্থান নাই। অথচ তিনি যে বর-পণ আদায় করেন, সেটা তাঁহার দালালি; পুত্রসম্বন্ধে দালালি পিতার গর্হিত।

কন্যার পিতা উপবাসী ও শুচি হইয়া পিতৃপিতামহাদির শ্রাদ্ধ করিয়া নারায়ণ সাক্ষী রাখিয়া বরকে কন্যা দান করেন; এমন দান করেন যে কন্যার আলয়ে গিয়া দান-প্রতিগ্রহের আশঙ্কায় অন্ন পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। বরও শুচি হইয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে। দাতা বড়, না গ্রহীতা বড়? নিশ্চয়ই গ্রহীতা বড়। যে-সে ভাল মন্দ দান করিতে পারে। কিন্তু যে-সে গ্রহণ করিতে পারে না। অতএব, "হে বর, হে শ্রেষ্ঠ, হে বরেণ্য, তুমি কন্যাগ্রহণ করিয়া তোমার পিতাকে চরিতার্থ কর, তুমি তাঁহার ধর্ম-পালনের সহায়; তুমি পূজ্য, উদার-চরিত, তোমাকে নমস্কার।" এহেন বর, যাহাকে কন্যা বরণ করিয়াছে, তাহাকে অদেয় কি আছে? কন্যার সহিত আরও কিছু প্রার্থনা করিলে কন্যার পিতার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। যাহার গৃহে অতিথি উপস্থিত হয়, তিনি যেমন শ্লাঘ্য, অতিথিও তেমন পূজার্হ। অতিথি পূজা গ্রহণ করিয়া গৃহীকে ধন্য করেন; কন্যা গ্রহণ করিয়া বর কন্যার পিতাকে তেমনই ধন্য করেন। অতিথি এক দিনের; কন্যার পতি নববধূকে চিরদিনের তরে পত্নীত্বে বরণ করেন।

বড় কে? দাতা না গ্রহীতা? লোকে ব্যাপারটা তলাইয়া বোঝে না। বুঝিলে দেখিত, কন্যা ব্যতীত অর্থ প্রার্থনা করিয়া বর নিজেকে কতখানি অপদস্থ করে। অতিথি কি কিছু চাহিতে পারে? যাহার আত্মসম্ভ্রম আছে, তিনি কি তাহা সহজে খর্ব করিতে পারেন?

আর, যাঁহার সে জ্ঞান নাই তিনি অতিথি নন, বরও নন। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কে বড়, তাহা বলা অসাধ্য।

এহেন সম্বন্ধকে বরের অধার্মিক পিতা বুঝিতে পারিবেন কি? তিনি পুত্রের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করেন কি? যে পুত্র বধূকে অর্দ্ধাঙ্গিনী করিতে প্রস্তুত, যাহাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, সুখে দুঃখে যে চিরসঙ্গিনী, যে কর্ম্মে বধূর মনে কষ্ট হইতে পারে, সে কি সে কর্ম্ম করিতে পারে? স্বীয় পিতামাতার অপমানে যেমন দুঃখ, পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর অপমানেও বরের তেমন দুঃখ। যদি দুঃখ বোধ না করে, তাহা হইলে সে পত্নীর পতি হইতে পারে নাই। পতিত্ব-স্বীকার কি যেমন-তেমন কর্ম্ম? আর পত্নীত্ব-স্বীকারই কি যেমন-তেমন কর্ম? স্বামী বড়, না জায়া বড়? স্বার্থত্যাগে কে বড়? এ প্রশ্নের উত্তর নাই।

কথাটা যদি এমন, তবে যুবারা, শিক্ষিত যুবারা, পণগ্রহণে আপত্তি করে না কেন?

ইহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে একটা প্রধান। মানুষে দেবত্বের বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু পশুত্ব একেবারে লুপ্ত হয় নাই। লুপ্ত হইতে পারে না; কারণ লুপ্ত হইলে মানুষ-সৃষ্টিও লুপ্ত হইবে। পশু-সমাজে দ্বিবিধ বিবাহ দেখা যায়; কন্যা স্বয়ম্বরা হয়, অন্যত্র বর বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করে। বলপূর্ব্বক কন্যা-বিবাহ আসুর-বিবাহ নামে খ্যাত। দানব-সমাজে এই বিবাহ ছিল। ইহা বীরোচিত বিবাহ। দয়া-দাক্ষিণ্যহীন মনুষ্য-সমাজে অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হইতেছে। যেখানে কন্যা স্বয়ং পতি বরণ করে, সেখানে বরং বরয়িতে কন্যা, সেখানে প্রকৃতির গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। কারণ, কন্যা স্বয়ংবরা হইলে কাপুরুষের বিবাহ অসম্ভব হয়; কদাকার গুণহীন মূর্খের, বিকলাঙ্গের, রুগ্নের, বিবাহও অসম্ভব হয়। ইয়ুরোপে কন্যা স্বয়ম্বরা হয়; সে দেশে সৈনিক বীরের বিবাহ না কি সহজে সম্পন্ন হয়। আমাদের দেশে কন্যা স্বয়ম্বরা হয় না, বীরেরও সমাচার পাওয়া যায় না। কিন্তু তা বলিয়া বিবাহের আসুরিক ভাব লুপ্তও হয় নাই। "বঙ্গদর্শনে" তাহা দেখাইয়াছি। ইহারই একটা বিকাশ, কন্যার পিতার নিকট বরের পণ-প্রার্থনা। যে-সে পণ চাহিতে পারে না। শৌর্য্য বীর্য যাহার আছে, সেই পারে। অ-কৃতি অধমকে কন্যা ক্রয় করিতে হয়; কৃতীকে কন্যা-সহ অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে হয়।

কথাটা আর একটু বিস্তারিত করা যাউক। যৌবন-কাল বিবাহের কাল। কত বয়স পর্য্যন্ত যৌবন, সে বিচারে কাজ নাই। যৌবনের বহু দোষ ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু বহু গুণও আছে। যৌবনের বিকাশে মানুষ নিজেকে অনুভব করিতে আরম্ভ করে। আত্ম-প্রকাশ ইহার প্রধান লক্ষণ। তখন বাহ্যপ্রকৃতির সহিত বোঝা-পড়া সুরু হয়। মনে কবিত্ব আসে, ধর্ম্মজ্ঞান প্রখর হয়, উৎসাহ ও তেজ চোখে ফুটিতে থাকে। যুবার তুল্য সদাশয়, প্রেমিক, ও বীর অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

এমন যুবা যে পরের তরে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে, সে ভাবী শ্বশুর পীড়ন করিয়া পণ আদায় করিতে পারে কি? সে নব-বধূর খেদের কারণ হইতে পারে কি? যদি না পারে, তবে পণের নামে বাঁকিয়া বসে না কেন? বিবাহের পূর্ব্বে মাতাকে বলে না কেন? স্নেহলতার আত্মহত্যা তাহার মনে জাগে না কেন?

ইহার অনেক কারণ আছে। যুবা গুরুজনকে ভক্তি করে; তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু বলিতে কিংবা করিতে পারে না। নিজের বিবাহের কথায় লজ্জা বোধ করে; কারণ সে যুবা, অবিবাহিত। কেহ কেহ বর-পণ লইতে দেখিয়া দেখিয়া উহার দোষ উপলব্ধি করিতে পারে না। কেহ হয়ত নিজের ভগিনীর বিবাহে অত্যাচার সহিয়াছে, এখন প্রতিশোধের সুযোগ ছাড়িতে পারে না। হয়ত সংসার সচ্ছল নহে, উপস্থিত অর্থ-লোভ ত্যাগও করিতে পারে না। আর ইহাও সত্য যুবা হইলেই যৌবনোচিত সারল্য সকলের থাকে না।

কিন্তু একটা গুরুতর কারণ আছে। যুবা সংসারের গণনায় উদার-চেতা, করুণ-হৃদয়, পৌরুষ বটে; কিন্তু যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠায় বাধা হয় সেখানে নহে। যৌবনের ধর্ম্মই এই। সে যে এত পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে; হর্ষ একটু আসিবে বই কি। তাহাকেই যে বর করিতে চাহিতেছে, কন্যা লইতে টাকা লইতে সাধিতেছে, সাধিবার কথাই ত বটে। তাহার তুল্য যোগ্য বর আর কে আছে। শ্বশুর-টশুর কে জানে; ইনি তাহার গৌরব না বোঝেন, উনি বুঝিবেন।

যুবা আত্মাভিমানী। মিথ্যা হউক সত্য হউক, অপমানের লেশ সহিতে পারে না। কারণ সে যুবা; সে-ই পৃথিবীর রাজা। প্রকৃতিদ্বারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।

যুবার কৃতকর্ম্মের বিচারের সময় বৃদ্ধ মনে করেন, সে তাঁহার তুল্য বৃদ্ধ, শিষ্ট, শান্ত। তাঁহার তিতিক্ষা আছে, যুবার না থাকা দোষ। সে বৃদ্ধ বিজ্ঞ নহেন, নিজের যৌবন দশা ভুলিয়া গিয়াছেন। বালক চঞ্চল, যুবা দুর্দান্ত, প্রৌঢ় সংযত, বৃদ্ধ শ্লথ,—প্রকৃতির নিয়তিই এই; নতুবা নূতন সৃষ্টি আবশ্যক।

বিজ্ঞ জানেন, যুবাকে দুর্দান্ত রাখিলে তাহার অহিত হইবে। মহাবেগ, প্রচণ্ডতা কুত্রাপি হিতকর নহে। যৌবনের প্রাবল্য-দমন কর্ত্তব্য। সেকালে যুবাকে কায়েন মনসা বাচা ব্রহ্মচারী করিয়া রাখা হইত। ব্রহ্মচর্যের পর দার-পরিগ্রহ। তখন যৌবনের আত্মাভিমান নাই; আত্মকাম দশা অতীত হইয়া পরকাম দশার উদয় হইয়াছে। শাস্ত্রে কন্যাদানের ও বধূগ্রহণের তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়াছে।

একালে ঘরে বাহিরে কত অলক্ষিত সামাজিক রীতি যৌবনকে সংযত করিতেছে। যে যুবা কলেজে ঢুকিয়াছে, সে অদৃশ্য সূত্র-জালে বদ্ধ হইয়া, দুর্দান্ত অশ্ব যেমন শিক্ষিত হয়, তেমন সংযতগতি হইতেছে। কিন্তু এই পর্যন্ত। বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষার একটা মহৎ দোষ এই যে ইহা মনের কর্ষ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সংবীজ বপন করে না। বন ভাঙ্গিয়া আবাদ করে, কিন্তু কি-সে সোনা ফলিবে, তাহার উপদেশ করে না। বুদ্ধি মার্জ্জিত হয়, কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান-দানের চেষ্টা করা হয় না। যুবা সব শেখে; শেখে না গৃহী হইতে! ইহাতেও যে যুবারা এক রকম মানুষ হইতেছে, ইহা পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির ফল।

এমন অবস্থায় যুবাদিগের দ্বারা সামাজিক সমস্যার কি সমাধান হইতে পারে? যুবা হইলেও বালক, যাহার বুদ্ধি স্থির হয় নাই, ধর্ম্মাধর্ম্মবিনিশ্চয়ে দৃঢ় হয় নাই। বিবাহ করে, কিন্তু চোখ-কান বুজিয়া করে; কি করিতেছে, কেন করিতেছে তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া করে। একটা অস্পষ্ট আব্‌ছায়া মনে ভাসিতে থাকে; একটা স্বপ্নরাজ্য কল্পনা করে, সেটা দুই দিনের জাগরণে অদৃশ্য হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবৃত্তির বিরোধে সমাজ-দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে। এক স্থানে নহে, দুই স্থানে নহে। যাহার বহু স্থানে ক্ষত সে ত আর্ত্তনাদ করিবেই। কন্যাপিতাকে উৎপীড়িত করিয়া মনে করিতেছি কুলধর্ম্ম রক্ষা করিলাম; ধনেই কুলীন হইতেছি নবধা কুললক্ষণ অস্বীকার করিতেছি; সহস্র-বিষয়ে অ-হিন্দুর ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দু ও আর্য নামের পতাকা উড়াইতেছি। কাহার সাধ্য এই স্রোত প্রতিরোধ করে। যাহার মূলে ভোগ লালসা, স্কন্ধে অর্থনীতি, শাখায় বিভব-প্রদর্শন, তাহার ফলেও নিঃসার কিন্তু স্ফীত পীতবর্ণ বিলাতী কুষ্মাণ্ডই হইবে।

বর-পণের বিশ্লেষণ করিলাম; উহার পরিবর্ত্তনের কৌশলপ্রদর্শন আমার কর্ম্ম নহে। হিন্দুর বিবাহ পূর্ব্ব পথে চালাইতে কেহ পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বর-পণের অত্যাচার-নিবারণ সভা-সমিতি করিতে পারে না। এক পারেন প্রবল রাজা; আর কেহ পারেন না। সংসারে দুঃখের অভাব নাই। কন্যা দায়ও একটা দুঃখ থাকিবে।

আশা এই, দুঃখটা অধিক কাল থাকিবে না। কন্যা-দায় অর্থে কন্যা-দান, কন্যাকে যৌতুক দান। যদি ইহা দুঃখ বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ কন্যার বিবাহ দিবে না, দিতে পারিবে না; কেহ বা বিবাহ করিবে না, জনক হইয়া কন্যা-দায়-দুঃখে পড়িবে না। অর্থাৎ সমাজে অনূঢ়া নারী কিছু থাকিবে, অনূঢ় নরও কিছু থাকিবে। হিন্দু-সমাজ প্রায় যাবতীয় পুত্রকন্যার বিবাহ বিধান করিয়াছিল। ইহার অভিপ্রায় স্পষ্ট। সে বিধান ভঙ্গ হইলে সমাজ কি রকম দাঁড়াইবে, তাহার বিচারে কাজ নাই।

কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতেছে। কন্যা-শিক্ষাও কিছু চলিতেছে। কিশোরীর বিবাহে ভাবী বর-সম্বন্ধে কন্যার মতামত জানাও আবশ্যক হইতেছে। পূর্ব্বে বর-পক্ষ কন্যা দেখিত; কন্যা-পক্ষ বর দেখিত, কিন্তু কন্যা স্বয়ং বর দেখিত না, স্বয়ংবরা হইত না। বোধ হয়, এখন ইহার একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। যাহাতে কন্যাও বর দেখিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য হইয়াছে। ইহার অন্য ফল যাহাই হউক, একটা এই হইবে যে-সে যুবা, শিক্ষিত হইলেই, নির্ব্বাচিত হইবে না। তখন যুবামাত্রেই বর সাজিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, বরের পিতার বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে।

হিন্দুসমাজের বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ, স্বয়ম্বর বিবাহ নহে। স্বয়ম্বর বিবাহ ও গান্ধর্ব বিবাহ প্রায় এক। গান-বাদ্যে রত গান্ধর্ব সমাজে যে প্রকার বিবাহ ছিল, তাহা গান্ধর্ব বিবাহ। ইয়ুরোপের বিবাহ গান্ধর্ব বিবাহ। আমাদের দেশে কোল সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে আছে। নৃত্যগীতের সময় কিশোর কিশোরীর, ইয়ুরোপে যুবক যুবতীর, বিবাহ-প্রসঙ্গ হয়। হিন্দুর বিবাহের অভিপ্রায় প্রজা-বৃদ্ধি, বিশেষতঃ পুত্র-লাভ। ইহা সিদ্ধ করিতে যে সকল বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচনা এখানে অনাবশ্যক।

এখন সে উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হওয়াতেই বর পণ অত্যাচার-বিশেষে গণ্য হইতেছে। নতুবা বর-পণ থাকিত না, থাকিলেও সে জন্য কাতরোক্তি শোনা যাইত না। তথাপি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার তুল্য হিন্দু-সমাজেই আর এক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত সমাজে বাল-বিবাহ নাই, কিশোর-বিবাহও নাই, যুবা-বিবাহ চলিতেছে। কলেজে পঠদ্দশায় যুবার বিবাহ হইতেছে। কিন্তু ইহারও অতিক্রম আরম্ভ হইয়াছে। পাঠ সাঙ্গ করিয়া অর্থোপার্জনে সমর্থ না হইলে যুবা আর বিবাহে সম্মত হইতেছে না। এটা শুভ লক্ষণ। কারণ যে যুবা সংসারের কঠোরতা উপলব্ধি করিয়াছে, ভবের হাটে নিজের দর যাচাই করিয়াছে, সে আর কোন্ মুখে রাজকন্যা ও অর্দ্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করিবে, কোন্ বুদ্ধিতে বাবার দালালি মানিতে পারিবে? যে পিতা কন্যার বিবাহে দুই পাঁচ হাজার খরচ করিতে পারেন, তাঁহার ধন-কড়ি আছে, কন্যাও যত্নে ও অভিমানে লালিতা হইয়াছে। সে কন্যা বধূরূপে আনিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে হইবে। বরের নিঃস্ব পিতা এত মূর্খ হইলেও পুত্রের বোধশক্তি ভবিষ্যৎ বুঝাইয়া দিবে। বুঝাইয়া দিবে, যে বধূ স্বামী গৃহে অনাদরে পণ্যসরূপ আসে, সে গৃহের মঙ্গল নাই। সে বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীকে আপনার মানুষ, পূজ্য দেবতা মনে করিতে পারে না। স্বামীকেও পারে কিনা, সন্দেহ। যে শাশুড়ী হেলায় বউ পাইয়াছে, সে শাশুড়ী সে বউকে হেলা করিবেই। দুই পক্ষে যেখানে এমন ভাব, সেখানে গৃহের সুখশান্তি অচিরে পলায়ন করিবে।

আরও কথা আছে। যে যুবা বিবাহ করিতে টাকা লইয়াছে, তাহার কন্যার বিবাহের সময় আগত। পূর্ব্বে কুলীনের পণ ছিল, এখন ইংরেজী পাশের পণ। এই পণ দুই পুরুষে পা দিতেছে। সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনে বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতা বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার দুঃখে দুঃখী পাওয়া যায়। কিন্তু একথা ঠিক, তাঁহার দৌহিত্রীর বিবাহের সময় পাওয়া যাইবে না। তখন জামাইএর পিতা চিন্তিত হইবেন, না জামাই নিজেই হইবেন? ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া এই খানে হইবে।

আর এত চিন্তার প্রয়োজনই বা কি? বর ক্রমশঃ সাচিবা হইবেই। ফোড়া উঠিবার সময় ব্যথা হয়, পরে শুখাইয়া কিংবা ফাটিয়া যায়, ব্যথা থাকে না। পাশ্-করা বর খুঁজিতেই হইবে, এমন কথা কি আছে? পাশ করিলেই যুবা সাধু হয় না, সুশীল হয় না। কন্যার চিরাগতির নিমিত্ত টাকারও প্রয়োজন হয় না।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পরগাছা

(৩২)

নারাণদাসীর বাক্যযন্ত্রনায় অস্থির হইয়া যখন রাখাল একটা চাকরীর জন্য দেশবিদেশের পরিচিতদের খোসামোদ করিয়া চিঠির পর চিঠি লিখিতেছিল, তখন একদিন সুযোগ তাহার ঘরের দ্বারে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন একখানা বজরা আসিয়া গোসাঁইগঞ্জের ঘাটে লাগিল, তাহার চড়নদার একজন ইংরেজ। একে বজরা, তায় ইংরেজ সওয়ারী, দেখিবার জন্য ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ গঙ্গার ঘাটে মেলা লাগাইয়া তুলিল। কেবল যায় নাই মণিমালা—তাহার বাপের অমন কত বজরায় সে নদীতে নদীতে বেড়াইয়াছে, কত ইংরেজ তাহার বাপের দরবারে আসা-যাওয়া করিয়া থাকে। আর যায় নাই রাখাল—পাহাড়পুরে শ্বশুর-বাড়ীতে সে বজরা ও ইংরেজ দেখিয়াছেও বটে, আর তাহার সামান্য বিষয়ে চঞ্চল হইয়া উঠা স্বভাব নয় বলিয়াও বটে। পাড়ার লোকেদের কাছে

ইহা কিন্তু অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। সকলে যখন দেখিল যে তাহারা দুজন ছাড়া সবাই আসিয়াছে তখন কাঙালী-বলিয়া উঠিল—রাজাগিরির গরম!

ইংরেজটি বজরার সামনে দাঁড়াইয়া ডাঙার লোকদের জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের এখানে ফার্সী-জানা লোক আছে?

ফার্সী? নিজের ভাষা বাংলাই পড়িতে জানে না কেহ, তার আবার কোন্ সাত সমুদ্র তের নদীর পারের ভাষা ফার্সী পড়িতে পারিবে কে? সকলে ভাবিয়াই খুন। কেনারাম একটু ভাবিয়া বলিল—দুর্গাগতি জান্ত বটে, কিন্তু সে ত মরে গেছে!

কাঙালী পিছন হইতে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া খুব লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—হাঁ হুজুর, আছে একজন। রাখাল ফার্সী জানে।

অমনি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ! রাখাল-জানে বটে!

ইংরেজটি বলিল—আমাকে কেউ অনুগ্রহ করে রাখাল-বাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারেন, আমার একটা জরুরি চিঠি পড়াতে হবে।

কাঙালী আবার সেলাম করিয়া বলিল—হুজুর কেন কষ্ট করে যাবেন, আমি গিয়ে রাখালকে ডেকে আনছি। খবর পেলেই সে আসবে।

ইংরেজটি ঠোঁটে একটা চুরুট চাপিয়া দেশালাই জ্বালিয়া ধরাইতে লাগিল। কাঙালী রাখালকে ডাকিতে ছুটিল।

বিন্দি মণিমালার কাছে গিয়া যখন গাহিতেছিল—

আজগুবি এক সং এসেছে নদের বাজারে,
টুপির ওপর চৈতন তার নাইকো কাছারে।

—তখন কাঙালী শশব্যস্তে আসিয়া রাখালকে বলিল—রাখাল, রাখাল, তোমাকে একজন সাহেব ডাকছেন, ঝপ করে এস।

রাখাল বসিয়া পড়িতেছিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া পরম নিশ্চিন্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—আমার কাছে সাহেবের কি দরকার? সাহেব কোথায়?

কাঙালী রাখালের উদাসীনতায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সাহেব গঙ্গার ঘাটে, বজরায়! ডাকছেন! চট করে এস!

রাখাল বলিল—তাঁর দরকার থাকে তাঁকেই এখানে আসতে বলগে। আমার দরকার থাকলে আমি যেতাম।

কাঙালী ভয়ে আধমরা ও অবাক হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল—রাখালকে লইয়া যাইতে পারিল না বলিয়া যদি সাহেব রাখালকে হাতের কাছে না পাইয়া তাহাকেই বুটসুদ্ধ লাথি কষাইয়া দ্যায়! কাঙালীর মারীচের দশা উপস্থিত। সে ভয়ে-ভয়ে গিয়া শুষ্ক মুখে সাহেবের সম্মুখে একটু তফাতে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল-বাবু আসছেন?

ঠোঁট চাটিয়া আমতা-আমতা করিতে-করিতে ব্যাপারটা নিজের পক্ষে যথাসম্ভব নিরাপদ করিয়া লইয়া কাঙালী বলিল—আজ্ঞে সে একটা আকাট গোঁয়ার! বলে কিনা যে সাহেবের দরকার থাকে সে আসবে, আমার ত দরকার নয় যে আমি তার কাছে যাব! তার এই গোঁয়ার্তুমি আর দেমাকের জন্যে আমাদের কারো সঙ্গে তার বনে না হুজুর।

ইংরেজটি হাসিয়া বলিল—আমাকে তাঁর কাছে আপনি অনুগ্রহ করে নিয়ে চলুন।

সাহেব রাখালকে এতলোক হইতে একটু স্বতন্ত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু কাঙালী মনে করিল সাহেব রাখালকে দেখিতে চাহিতেছে তাহাকে মজা দেখাইয়া দিবার জন্য!—সে ভয়ে জড়সড় হইয়াও মনের মধ্যে আনন্দে ফুলিতেছিল, এইবার রাখালের সকল অহঙ্কার সকল লোকের সাক্ষাতে সাহেবের বুটের আঘাতে ধূলায় চূর্ণ হইয়া পড়িবে!—এ যে তাহার অসহ্য আনন্দ! সে মনে মনে মানত করিতেছিল—হে ঠাকুর! হে রাধাকান্ত! হে দর্পহারী মধুসূদন! রাখালের যেন উপযুক্ত শিক্ষা হয়! আমি তোমায় ঘৃত-পরমান্ন ভোগ দিব। হরিরলুট দিব!

কাঙালী পথ দেখাইয়া আগে-আগে চলিল এবং অনেক লোক ভিড় করিয়া সাহেবের পিছু লইল। গ্রামে ঢুকিতেই অপরিচিত পোষাকের লোক দেখিয়া কুকুরগুলা ঘেউঘেউ শব্দ জুড়িয়া দিল। এবং পথের দুধারে লোক খুব নত হইয়া হইয়া তাহাকে সেলাম করিতে লাগিল।

কাঙালী ইংরেজটিকে বৃন্দাবন গোসাঁইর সদর দরজায়

দাঁড় করাইয়া পুনরায় আসিয়া রাখালকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল—কি রকম লোক বল দেখি তুমি রাখাল! সাহেব আসছে তা তুমি একটু বাইরে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারনি। এই অহঙ্কারে তুমি বিপদে পড়বে দেখছি। এস, এস, ঝপ্ করে এস...

বৃন্দাবন গোসাঁইর বাড়ীর সম্মুখে সাহেবকে দেখিয়া গাঁয়ের সকল লোক জড়ো হইল; সাহেবের আগমনের কারণ যাহারা জানে না, শুধু রাখালের সন্ধানে সাহেব আসিযাছে শুনিয়াই তাহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিল-রাখাল খবরের কাগজে লেখে বলিয়া সাহেব তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। ইহা কল্পনা করিয়া অনেকে বেশ একটু খুসী হইয়া উঠিয়াছিল।

বাহিরে আসিয়া রাখাল খুব সহজভাবে সাহেবের দিকে হাত বাড়াইয়া দিল। সাহেবও খুব প্রীতির সহিত তাহার হাত ধরিয়া শেকহ্যাণ্ড করিল। এতক্ষণ এত লোক দূর হইতে ঝুঁইয়া ঝুঁইয়া তাহাকে সেলাম করিতেছিল; আর এই একটা লোক তাহার নিকটে আসিয়া তাহার সমান হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল; ইহাতে সাহেব রাখালকে ভালো করিয়া জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

রাখাল বিনীতভাবে ইংরেজিতে বলিল—আমার কাছে আপনার কাজ আছে শুনলাম; আমি সাধ্যমত আপনার সাহায্য করতে পারলে সুখী হব।

সাহেব বলিল—আমি শুনলাম আপনি ফার্সী জানেন। আমার কাছে একখানা উর্দু চিঠি এসেছে, জরুরি; মুন্সি আমার সঙ্গে নেই। আপনি যদি অনুগ্রহ করে পড়ে দ্যান একটু।

—নিশ্চয়; খুসী হয়েই পড়ে দেবো। আপনি অনুগ্রহ করে বাড়ীর ভিতরে এসে বসুন।

রাখাল সাহেবকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া নিজের মেটে-ঘরের দাওয়ায় একটা মোড়া পাতিয়া বসাইল। তারপর তাহাকে চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাখাল সেই চিঠি হইতে বুঝিল সাহেবের নাম রাইলী। ইনি উনাউ জেলার মাজিষ্ট্রেট।

রাখালকে রাইলী অনেক ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল —আপনি কি কাজ করেন?

—আমি কোনো কাজই করি না।

—ও! আপনার জমিদারী আছে বুঝি?

রাখাল খুব স্বচ্ছন্দে হাসিয়া বলিল—জমিদারী থাকলে কি এই রকম বাড়ী হয়? আমার কোনো সঙ্গতিই নেই।

রাইলী লজ্জিত হইয়া বলিল—আমাকে মাপ করবেন, আমি কথাটা না ভেবেই বলে ফেলেছিলাম। আমি শুনছিলাম যে গোসাঁইগণের ব্রাহ্মণেরা গুরুগিরি করে। গুরুরা প্রায়ই বড়লোক হয়, আমি তাই ভেবে বলেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন।

রাখাল হাসিয়া বলিল—এতে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? দারিদ্র্য স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা নেই।

গাঁয়ের মধ্যে কাঙালী একটু ইংরেজি বুঝিত। কাঙালী তাড়াতাড়ি বলিল—হুজুর, ওর শ্বশুর পাহাড়পুরের রাজা!

রাইলী আশ্চর্য্য হইয়া রাখালকে বলিল—তবে আপনি সেখানে থাকেন না কেন?

—আমি তাঁর মেয়েকেই বিয়ে করেছি, তাঁর জমিদারীকে ত করিনি। শ্বশুরের জমিদারীর চেয়ে নিজের দিনমজুরীর সম্মান ঢের বেশী আমার কাছে।

রাখালের প্রতি শ্রদ্ধায় রাইলীর মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—তবে আপনি নিজে কোনো কাজকর্ম্ম করেন না কেন?

—পাইনি বলে। পাবার চেষ্টা করছি।

—আমাকে যদি অনুমতি করেন ত আমি একটা কথা বলতে চাই।

—কি বলুন।

—আমি উনাউ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট......

—তা আমি চিঠি থেকেই টের পেয়েছি।

একটা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট! তাহার সহিত রাখাল এমন নির্ভয়ে সমানী হইয়া কথা কহিতেছে দেখিয়া কাঙালীর হৃৎকম্প হইল। এবং কাঙালী যখন সেই কথাটা প্রভুপাদ-দিগকে বাংলা করিয়া বুঝাইয়া দিল তখন তাঁহারা মধুসূদন নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

রাইলী বলিতে লাগিল—আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে ছুটি নিয়ে নদীতে-নদীতে বেড়াচ্ছি।

আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আমি কলকাতা গিয়েই উনাউ ফিরব। মাসখানেক পরে আপনি যদি অনুগ্রহ করে উনাউ গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন ত আমি বিশেষ খুসী হব। আপনি আজ আমার যে উপকার করেছেন তার সামান্য একটু প্রতিদান আপনার গুণমুগ্ধ বন্ধুর কাছে থেকে নিতে আপনি অস্বীকার করবেন না আশা করি।... ..এই আমার নামের কার্ড।

রাখাল কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত চিত্তে ধন্যবাদ জানাইয়া উনাউ যাইতে স্বীকার করিল। তারপর হাসিতে-হাসিতে বলিল—আমাদের নিয়ম, বন্ধু বাড়ীতে এলে তাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় দিতে হয়।

রাইনী হাসিয়া বলিল—আমার শরীর খারাপ, আমি কিছু এখন খাব না। আপনি কিছু ফল দিলে আমি সঙ্গে করে বজরায় নিয়ে যেতে পারি।

রাখাল রবয় দুলেকে ডাকিয়া এক কাঁদি কলা ও এক কাঁদি ডাব পাড়িয়া সাহেবের বজরায় পৌঁছাইয়া দিতে বলিল। এবং এবার সে নিজে সাহেবের সঙ্গে-সঙ্গে কথা কহিতে-কহিতে বজরা পর্য্যন্ত গেল।

গ্রামময় রাষ্ট হইয়া গেল—রাখাল কি রকম সস্তায় কিস্তি পাইয়া গেয়াছে! আজকালকার এই মহার্ঘ চাকরীর বাজারে এমন সহজে চাকরী বাগানো বড় কম সৌভাগ্যের কথা নয়। সাহেবের সুনজরে যখন পড়িয়াছে তখন অন্তত ত্রিশ চল্লিশ টাকার একটা কেরানীগিরি ত পাইবেই! কিন্তু ইহাতে কেহই আশ্চর্য্য হইল না, কারণ সকলেরই বিশেষ রকম জানা ছিল লোকটার কি রকম পাতাচাপা কপাল! রাজার বাড়ী বিবাহ হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কাঙালীর ভারি আপশোষ হইল যে সেই রাখালের খবর দিল, পরিচয় দিল, পথ দেখাইয়া লইয়া গেল, অত করিয়া হুজুর হুজুর করিয়া সেলাম করিল, কিন্তু সাহেব তাহাকে একবার পুছিলও না। ইংরেজদের এমনিই অবিচার বটে! বাঁচিয়া থাকিত দুর্গাগতি খুড়ো, ত সে দেখিয়া লইত রাখাল কেমন করিয়া এমন ফাঁকি দিতে পারিত! দুর্গাগতি খুড়োর কাছেই সে সাহেবকে লইয়া যাইত! কাঙালী আপশোষ করিয়া সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—

মোগল পাঠান হদ্দ হল ফার্সী পড়ে তাঁতি,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেলেন শল্য সেনাপতি,
আর সূর্য্য তারা চন্দ্র গেল জোনাকির পিছে বাতি!—

এযে তাই হল দেখছি: আগে সাহেবকে দেমাক করে খাতিরই করা হল না; আর যাই দেখলে যে ম্যাজিষ্ট্রেট, অমনি খাতির দেখে কে! চাকরীটি বাগিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে হেঁইগো হেঁইগো করতে করতে সাহেবের বজ্‌রা পর্য্যন্ত যাওয়া হল, কিন্তু আগে বাড়ীর বাইরে এসেও একটু অভ্যর্থনা করতে পারেন নি!

একটা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে এমন-একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ লোককে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া গেল ইহাই সব চেয়ে কাঙালীর কাছে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

তখন স্বামীর গর্ব্বে উৎফুল্ল মণিমালার কাছে হাসিতে-হাসিতে বিন্দি কৃত্তিবাস-পণ্ডিতের রামায়ণ হইতে সুর করিয়া বলিতেছিল—

"পরম দয়ালু রাম গুণের নাহি সন্ধি।
যাঁর গুণে বনের বানর হয় বন্দী॥
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ।
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা করিবে খণ্ডন।
বানরের মিতালিতে বদ্ধ নারায়ণ॥"

নারাণদাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া মণিমালার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল—হাজার হোক রাজার মেয়ে, সতীলক্ষ্মী ভাগ্যিমানী! তোমার পয়েই আমার রাখালের এমন কল্যেণ হল নাতবৌ! আহা নাতবৌ, দেখছ না, ভূপাল যে ধূলো ঘাঁটছে! ষাট ষাট বাছারে!—বলিয়া ভূপালকে কোলে তুলিয়া নারাণদাসী আঁচল দিয়া তাহার গায়ের ধূলা মুছাইতে লাগিল।

মণিমালা উঠিয়া নারাণদাসীর পায়ের ধূলা লইয়া হাসিভরা ছলছল চোখে বলিল—রাঙা দিদি, আশীর্ব্বাদ কর ওঁর যেন ভাবনা ঘোচে।

—তা তুমি বলবে তবে আশীর্ব্বাদ করব নাতবৌ? নিত্যি রাধাকান্তর কাছে মানত করি যে আমার রাখালের বাড়বাড়ন্ত হোক, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। আমার

গৌর আর রাখাল ত ভিন্ন নয়, বরং আগে রাখাল পরে গৌর।......কিন্তু বলে রাখছি নাতবৌ, পেরথম মাসের মাইনে থেকে আমার গৌরকে একখানা সোনার কিছু গড়িয়ে দিতে হবে বাছা।

—উনি যে খরচ পাঠাবেন তা গোসাঁইদাদার কাছেই পাঠাবেন; সব তোমাদেরই ত রাঙা-দিদি! তোমরাই আমার ভূপালকে দেখো। ভূপাল আমার বড় গরিব!—মণিমালার স্বর অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

নারাণদাসী ভূপালকে বুকে চাপিয়া বলিল—বালাই-বালাই ষাট! ও রাজার নাতি! আমাদের বক্ষের ধন, চক্ষের মণি! তবে গৌর দাদা, এ ভাই।

বিন্দি সমস্ত আঁচলটা মুখে গুঁজিয়া দিয়া এক ছুটে প্রসাদীর কাছে গিয়া লুটাইয়া পড়িল।

প্রসাদী বলিল—আ মর! কি হল তোর?

বিন্দি একটু দম লইয়া গাহিল—

সোনা-ব্যাং আর সোনা-পোকার যখন নামই দামী
সোনা-ব্যাঙের হার করিব সোনা-পোকার থামি!
কনক-ধুতরা কনক-চাঁপা
হবে আমার হারের ঝাঁপা,
সোনা রূপো নইলে সবই তুচ্ছ করি আমি!

(৩৩)

রাখাল পশ্চিমে গিয়াছে।

মণিমালার কাছে যে কয়েকখানা রূপার বাসন, মোহর, পুরানো টাকা ছিল তাহা বেচিয়া তাহা হইতে এক শত টাকা নারাণদাসীর হাতে দিয়া রাখাল বলিয়াছিল—রাঙা-দিদি, আমি যতদিন না সেখানে বেশ গুছিয়ে বসছি, ততদিন এই টাকাতে তোমাদের খরচ চলবে, তারপর আমি মাসে মাসে খরচ পাঠিয়ে দেবো। মণি আর ভূপাল রইল, ওদের তুমি দেখো।

নারাণদাসী টাকাগুলি বাক্সয় রাখিতে রাখিতে বলিয়াছিল—তুমি বলবে তবে দেখব, নইলে দেখব না? ওরা যে আমার মাথার মাণিক; তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, ওদের যেখানে ঘাম পড়বে আমার রক্ত সেখানে পড়বে জেনো।

রাখাল এমনি করিয়া প্রসাদী ও বিন্দিকেও মণিমালা ও ভূপালের খবরদারী করিতে বলিয়া পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছে।

একদিন নারাণদাসী ও মণিমালা খাইতে বসিয়াছে, বিন্দি আসিয়া দূরে বসিল। বসিয়া-বসিয়া দেখিল মাত্র কাঁচা-কলা সিদ্ধ, সজনের শাক শড়শড়ি, কলায়ের ডাল ও কুলের অম্বল রান্না হইয়াছে। বিন্দি মণিমালার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—

কচু-সেদ্ধ কলা-পোড়া
খাচ্ছ তুমি আগা-গোড়া,
আছ আনন্দে।
তার সঙ্গে জলপানিটে
ঝাল কথা আর কালসিটে,
নিত্য ত্রিসন্ধ্যে!

নারাণদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—দেখ্ বিন্দি পোড়ারমুখী, তুই যদি ফের আমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোবি ত তোকে ঝাঁটাপেটা করব! বেরো আমার বাড়ী থেকে...

বিন্দি হাসিয়া বলিল—রাঙা-দিদি-ঠাকরুণ—

গেরস্ত মারে কোস্তা ঝাঁটা।
বেরাল ভাবে মাছের কাঁটা!

তুমি ঝাঁটা মারবে, আমি মনে করব আমায় আদর করছ। আমায় কি তুমি তাড়াতে পারবে মনে করেছ?

'মারো আর ধরো আমি পিঠে বেঁধেছি কুলো।
বকো আর ঝকো আমি কানে দিয়েছি তুলো॥'

এই অপ্রিয় ঘটনায় মণিমালা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার যে কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে ইহা সে কাহাকেও জানাইতে চায় না।

তাহাকে অব্যাহতি দিয়া প্রসাদী একখানি রেকাবিতে করিয়া কতকগুলি তরকারি আনিয়া নারাণদাসীর পাতের কাছে রাখিয়া বলিল—রাঙা-দিদি, মা তোমাকে এই তরকারি পাঠিয়ে দিলে।

মণিমালা ও বিন্দি বুঝিল যে ইহা প্রসাদীর মা রাঙা-দিদিকে পাঠান নাই, পাঠাইয়াছেন মণিমালাকে।

নারাণদাসী বলিল—ও আর এঁটো করিসনে পেসাদী, রান্নাঘরের তাকে তুলে রেখে দে, বিকেল বেলা গৌর খাবে।

প্রসাদী বলিল—এত তরকারী কি গৌর খেতে পারবে, তোমাদেরও একটু-একটু দি—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া প্রসাদী নারাণদাসীকে অল্প ও মণিমালাকে বেশী-বেশী করিয়া দিয়া অল্প-কিছু রান্নাঘরের তাকে তুলিয়া রাখিয়া দিল। নারাণদাসী মুখ গোঁজ করিয়া খাইতে লাগিল, কাহারো সহিত আর একটি কথাও বলিল না।

মণিমালা আঁচাইয়া ঘরে আসিয়া প্রসাদী ও বিন্দিকে বলিল—তোমরা ভাই আমাকে যত্ন আত্তি কর কেন, ওতে রাঙা-দিদি যে বিরক্ত হন।

বিন্দি সুর করিয়া শ্রীধর কথকের গান ধরিল—

"যতনে যাতনা দিবে আগে সখী জানি না।
যাতনা হবে জানিলে যতন করিতাম না॥"

মণিমালা বিষণ্ণ হইয়া বলিল—না ভাই, হাসির কথা নয়। আমার জন্যে শুধু-শুধু তোমরা সুদ্ধু গাল খাও। তোমাদের হাতে ধরে বলছি, তোমরা যখন-তখন আমার কাছে এস না।

বিন্দি গাহিয়া উত্তর দিল—

"কি করে লোকেরি কথায় ?
সে যে আত্মার প্রাণধন, মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেমনিধি
নিষেধ না মানে বিধি,
মনপ্রাণ নিরবধি তারি গুণ গায়॥"

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোকে পারবার জো নেই।

ক্ষণিকের বিষণ্ণতা কাটিয়া গেল। তিন সখীতে আবার হাসি গল্পে গানে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় বৃন্দাবনের নামে এক মনিঅর্ডার ও চিঠি এবং মণিমালার নামে এক পত্র আসিল। রাখাল পাঠাইয়াছে। রাখাল বৃন্দাবনকে লিখিয়াছে, সেখানে গিয়া সে মুন্সরিমের পদে নিযুক্ত হইয়াছে, এক বৎসর পঞ্চাশ টাকা মাইনেতে থাকিতে হইবে, পরে একটা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে একশত টাকা হইবে। বেতন বৃদ্ধি হইয়া চারি শত পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। সাহেবকে সে উর্দ্দু পড়ায়, তাহার জন্য সাহেব তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে চাহিয়াছিলেন, সে লইতে অস্বীকার করিয়াছে। ত্রিশ টাকা পাঠাইতেছে; পনর টাকা বৃন্দাবন লইয়া বাকী পনর টাকা যেন মণিমালাকে দ্যান।

নারাণদাসী চিঠি শুনিয়া ত চটিয়া আগুন!—এমন সায়েবের মুখে আগুন। বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেল, আমরা মনে করলাম পাঁচ সাত শ টাকার একটা চাকরীই দেবে বা! ওমা, এ দেখছি—

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে
তার মাইনে চোদ্দসিকে!

আবার আমাদের রাখাল-বাবু রাজার জামাই কিনা, তার আবার এমনি বড়মানুষী যে সায়েব টাকা দিতে চায় কিন্তু তাঁর নেওয়া হয় না! মাইনে ত মোটে পঞ্চাশটি টাকা! তার কুড়ি টাকা রাখলেন নিজে, বৌকে দেবার হুকুম হল পনর, আর এতবড় সংসারটার খরচ দেওয়া হল পনর! এইতেই আবার পাড়ার পোড়াকপালীরা বলতে আসে যে বৌকে কচু-সেদ্ধ কলা-পোড়া খাওয়াও কেন? ঐ যে পায় সেই ঢের!

বিন্দি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—হ্যাঁ রাঙা-দিদি ঠিক বলেছ! তুষ্টু গয়লাও বলছিল, আমরা জল-দেওয়া দুধ বেচি বলে' লোকে দাম দিতে চায় না, আর কলকাতায় খদ্দেরকে শুধু একবার দুধ দেখিয়ে গয়লা দুধের দাম নিয়ে চলে যায়।

নারাণদাসীর বিবিধ ছন্দের গালাগাল বিন্দির পিছনে ধাওয়া করিল, কিন্তু নাগাল ধরিতে পারিল না।

নারাণদাসী মণিমালাকে টাকা পনরটা দিল—উপায় নাই, নিশ্চয় রাখাল চিঠিতে তাহাকে লিখিয়াছে। বৌ ত সোনার বৌ, মুখে রা নাই, পাড়াকুঁদুলিরা বাড়ী বহিয়া আসিয়া উহাকে উস্কাইয়া দিয়াই ত মুস্কিল বাধাইতে চায়। আজকাল কোনো চোখখাকী কি পরের ভালো দেখিতে পারে ছাই! নারাণদাসী জিজ্ঞাসা করিল—নাতবৌ, পনরটা টাকা নিয়ে তুমি কি করবে?

—উনি এ টাকা সবাইকে দিতে লিখেছেন রাঙা-দিদি। প্রথম উপার্জ্জনের টাকা—পাঁচ টাকা দিয়ে মাকে প্রণাম করতে বলেছেন, এক টাকা বিন্দির মাকে, এক টাকা আবদারকে, দুটাকা খোঁড়া নিস্তারিণীকে, এক টাকা বোঁদী বষ্টমীকে দিতে বলেছেন; পাঁচ টাকা আমায় দিয়েছেন।

নারাণদাসী বিরক্ত হইয়া বলিল—

ভাগাড়ে গরু পড়ে,
শকুনির মাথায় টনক নড়ে।

রাখালের চাকরী হতে না হতে অমনি সকলের বুঝি দুঃখু জানানো হয়েছে? সকলকে মনে পড়েছে কিন্তু এ ত মনে পড়ল না যে রাঙা-দিদি রয়েছে, গৌর রয়েছে, তাদের কিছু হাতে তুলে দি! মনিঅর্ডার এল, মনে করলাম রাখাল না জানি রাঙা-দিদিমাকে কতই দিয়েছে!—

শাঁখা-হাতী শাঁখা নাড়ে,
বেরাল ভাবে আমার ভাত বাড়ে!—

আমার হয়েছে তাই। রাখাল আবার বড়াই করে বলেছিলেন—চাকরী হলে আমায় বাউটি সুট গয়না দেবেন! আরে আমার পোড়া কপাল!

মণিমালা লজ্জিত হইয়া বলিল—পনর টাকা ত তোমাকেই দিয়েছেন রাঙা-দিদি!

নারাণদাসী ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—আমাকে দিয়েছে! তা হলে তোমরা মায়ে পোয়ে গিলবে কি?

কুণ্ঠিত হইয়া মণিমালা বলিল—সংসারখরচের টাকা ত ক মাসের মতন একেবারে দিয়ে গিছলেন।

নারাণদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওমা! সে কি নাতবৌ! সে কটা টাকা! এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে তাতে কদিন যায়? জমাখরচ লেখা আছে, তুমি দেখো বরং।

মণিমালা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—সে কি কথা রাঙা-দিদি, আমি কি তোমার কথা অবিশ্বাস করতে পারি কখনো। এ মাসের সংসারখরচের টাকা আমি দেবো। ও পনর টাকা তোমার প্রণামি, তুমি নিয়ো।

নারাণদাসী খুসী হইয়া বলিল—তা দেবে বৈ কি, তোমরা না দেবে ত দেবে কে! রাখাল আমার রাজা হোক, আমার মাথার চুলের মতন পেরমাই পাক, তুমি পতি পুত্তুর নিয়ে পাকা মাথায় সিঁদুর পর, হাতের নো ক্ষয় যাক!......

মণিমালার অধরপ্রান্তে আনন্দের একটু ক্ষীণ আভা দেখা গেল এই ভাবিয়া যে, রাখাল তাহাকে লিখিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তাহার চার পাঁচ শত টাকা বেতন হইবে, বুড়া বয়সে ঘরে বসিয়া দুইশত টাকা পেন্সন পাইবে; তাহার পর ভূপাল লেখাপড়া শিখিয়া পণ্ডিত হইয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহার লোভ তাহারা করিবে না, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা দুজনে স্বাধীনভাবে নিজের খাইয়াই যাইতে পারিবে। এই ভবিষ্যৎ সুখের আনন্দ আর মুক্তামালার সমস্ত মন ছাইয়া সমস্তই তাহার কাছে মধুময় সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল, আজ তার কোথাও কিছু অপ্রচুর ছিল না।

(৩৪)

রাখালের উপার্জ্জন যেন গ্রামের সকল গরীব দুঃখী ও আত্মীয়ের জন্য; যাহাদিগের নিতান্ত অভাব আছে বলিয়া সে জানে, যাহাদিগের নিকটে সে কখনো এতটুকু উপকার বা সাহায্য পাইয়াছে, যাহারা তাহাকে নিজের অভাব জানায়, তাহারা সকলেই রাখালের উপার্জ্জনের অংশীদার। ইহাতে যে-পরিমাণে নারাণদাসী চটে, সেই পরিমাণে গ্রামের সকল লোক রাখালকে আপনার বলিয়া জানিয়া ধন্য-ধন্য করে। স্বামীর প্রশংসায় মণিমালার বুক সুখে পরিপূর্ণ, সে অক্লেশে হাসি-মুখে নারাণদাসীর সকল অত্যাচার ও সকল গঞ্জনা ও বঞ্চনা সহ্য করিতে পারিতে-ছিল। তাহাকেও গ্রামের সকলে ভালো বাসে—বিন্দি ও প্রসাদী ত তাহার সহোদরার ও অধিক।

এমনি সুখে দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন চিঠি আসিল মণিমালার বাবা রাজা ধনেশ্বর ছয় মাস হইল মারা গিয়াছেন। রাণী জগদ্ধাত্রী সেই বিপুল জমিদারী লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন, রাখাল শীঘ্র গিয়া যেন তাঁহাকে রক্ষা করে।

এই অকস্মাৎ দুঃসংবাদ পাইয়া মণিমালা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল; তাহার পিতৃবিয়োগের দুঃখ প্রবলতর বোধ

হইতেছিল এই ভাবিয়া যে পিতা মরিবার সময়ও তাহাদের ক্ষমা করিয়া যাইতে পারিলেন না, মাতা এই ছয় মাসেও কন্যাকে তাহার পিতৃবিয়োগের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই, কন্যাকে কাছে ডাকিবার মমতা অনুভব করেন নাই, বিপদে পড়িয়া উদ্ধার করিবার জন্য জামাইকে মাত্র ডাকিয়াছেন! মণিমালার এতদিনের পুঁজি-করা সকল দুঃখ এই উপলক্ষ্য পাইয়া কান্নার স্রোতে বাহির হইতে লাগিল।

প্রসাদী ও বিন্দি রাতদিন মণিমালার কাছে-কাছে থাকে। মণিমালার দুঃখে ত তাহারা ম্রিয়মাণ, আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাহাদের মন আরো ব্যাকুল ভারাক্রান্ত। বিন্দি যে বিন্দি তাহারও মুখের হাসি আর গান থামিয়া গিয়াছে।

রাজা ধনেশ্বরের মৃত্যুতে নারাণদাসী পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। সে আপন মনে গজগজ করিয়া বকিতেছিল—বাবা! মিন্সের কি, দুর্জ্জয় কোরোধ গো! মোলো তবু একবার মেয়েটার দিকে ফিরে চাইলে না! রাগ করে ছিলি বেশ ছিলি, সাত তাড়াতাড়ি মরা কেন? একটুখানি সংসারটা গুছিয়ে তুলছিলাম, পোড়া বিধির আর সইল না। রাখাল ত এইবার স্ত্রীপুত্তুর নিয়ে শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে রাজা হয়ে বসবে—তখন কি আর আমরা একটা পয়সা নাড়াচাড়া করতে পাব?...পাড়ার সর্ব্বশতেকখোয়ারীদের নজর লেগেই ত এমন হল!......

রাখাল মণিমালার চিঠি পাইয়া মহা সমস্যায় পড়িয়া গেল। সদ্য সে অনায়াসে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছে; এমন অবস্থায় সেই স্বাধীন উপার্জ্জনের পথ ছাড়িয়া আবার পরাধীন হইতে যাওয়া তাহার উচিত কি না। পিতার মৃত্যুতে জমিদারী মণিমালার মাতাতে বর্ত্তিয়াছে; তাঁহার মৃত্যুর পর ভূপালের হইবে; কিন্তু তাহাতে রাখালের কি? কিন্তু ঐ জমিদারী ভূপালের জন্য রক্ষা করাও ত তাহারই কর্ত্তব্য। অধিকন্তু রাণী জগদ্ধাত্রী লিখিয়াছেন, জমিদারী হাতে লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন, রাখাল সত্বর গিয়া যেন তাঁহাকে রক্ষা করে।

রাখাল রাইলিকে সমস্ত জানাইয়া পরামর্শ চাহিল। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে আপাতত ছুটি লইয়া যাইতে বলিলেন।

সভ্যতা ভদ্রতা বিদ্যানুরাগ পরোপকার প্রভৃতি গুণে রাখাল প্রবাসেও সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিল। সকলকে দুঃখিত করিয়া দুঃখিত হইয়া সে দেশে ফিরিয়া আসিল।

মণিমালাকে লইয়া রাখাল পাহাড়পুরে যাইবে স্থির হইয়াছে। মণিমালার ইহাতে সুখের চেয়ে দুঃখই বেশী বোধ হইতেছিল। যে জন্মনীড় হইতে তাহাকে দুঃখ পাইয়া দূর হইয়া আসিতে হইয়াছিল, সেখানে সে ফিরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিনা আহ্বানে; সেখানে গিয়া সে তাহার অমন স্নেহময় অথচ অতি-তেজস্বী বাবাকে দেখিতে পাইবে না; তাহার মায়ের স্নেহকোল সে ফিরিয়া পাইবে, কিন্তু যে মাকে সে দেখিয়া আসিয়াছিল সে মাকে সে পাইবে না—তাঁহার সে রাণীর বসনভূষণ ঘুচিয়া বিধবার দীনবেশ হইয়াছে; এই কয়দিনের বিচ্ছেদ মেয়েকে মায়ের মন হইতে না জানি কতখানি দূরে সরাইয়া দিয়াছে—যে জায়গা হইতে ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল সে জায়গায় পৌঁছিতে কখনো পারিবে কি না কে জানে! আর এই যে এখানে অল্পদিনের প্রবাসে নূতন পরিচয়ে কতগুলি নূতন প্রাণের সঙ্গে প্রণয়গ্রন্থি বাঁধা হইয়াছে, এইখানে যে প্রীতির লতা শত শত কোমল বাহু মেলিয়া কত লোককে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, এ সমস্ত খুলিয়া ছাড়াইয়া যাওয়া কি অমনি কথার কথা! হয়ত কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত হৃদয়ে বেদনা বাজিবে, প্রীতির লতাকে আশ্রয়হীন করিয়া এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় চারাইয়া রোপণ করাতে তাহার হয়ত এমন নধর ঢল-ঢল তাজা ভাব থাকিবে না, হয়ত বা একেবারেই শুকাইয়া যাইবে!

প্রসাদী আজ কদিন থেকে শুধু কাঁদিতেছে আর মণিমালার গলা জড়াইয়া বলিতেছে—আমি আবার বিধবা হলাম! তোকে পেয়ে যে আমি সংসারে সুখ পেয়েছিলাম, তুই আমার সব সুখ সব আনন্দ কেড়ে নিয়ে চল্লি!

বিন্দি আর এমুখো হয় না। সে আপনাকে বাড়ীতে বন্দী করিয়াছে।

যাইবার দিন মণিমালা বিন্দিকে বারবার ডাকাইয়া পাঠাইল, সে কিছুতেই আসিল না। বিন্দির বাড়ী পাড়া-অন্তর বলিয়া বৌমানুষ মণিমালা তাহার বাড়ী কখনো

যায় নাই। আজ সে বিন্দির কাছে বিদায় লইতে তাহার বাড়ী গেল। মণিমালাকে তাহার কুঁড়ে-ঘরে পদার্পণ করিতে দেখিয়াই বিন্দি চোখের জল চাপিয়া হাসি-মুখে গাহিয়া উঠিল—

"এস যাদু আমার বাড়ী তোমায় দিব ভালো বাসা।"

মণিমালা ম্লান মুখে বলিল—বিন্দি ঠাকুরঝি, আমরা যাচ্ছি ভাই। তুমি ত আমাদের ছায়া মাড়াও না, তাই আমিই এলাম বিদায় নিতে।

বিন্দি আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিমালার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল।

বিন্দি দেখিয়া দেখিয়া বলিল—বিন্দি পোড়ারমুখীর জন্যেও লোকে কাঁদে দেখছি!

মণিমালা বিন্দির হাত ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল—ঠাকুরঝি, একেবারে ভুলে যাসনে ভাই, মাঝে-মাঝে মনে করিস। তোদের আমি কখনো ভুলতে পারব না।

বিন্দি হঠাৎ হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া গোপাল-উড়ের যাত্রার নকলে গাহিতে লাগিল—

"ভোলা সে কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা।
শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা।"

মণিমালা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বিন্দির হাত ধরিয়া বলিল—তবে যাই ভাই ঠাকুরঝি। বেঁচে থাকলে আবার কখনো না কখনো দেখা হবে।

বিন্দি আবার হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

"তোমারি বিরহ সয়ে বাঁচি যদি দেখা হবে।
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে সকলি সবে॥"

মণিমালা চোখ মুছিতে-মুছিতে ফিরিল। মণিমালা চোখের আড়াল হইতেই বিন্দি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিয়া মাটিতে আছড়াইয়া পড়িয়া আকুল ক্রন্দনে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোজাগর-লক্ষ্মী

ওগো কোজাগরের লক্ষ্মী তুমি,
(তোমায়) ক্ষণিক দেখার লাগি
চিরজীবন-রাত্রি তোমার প্রতীক্ষাতে জাগি;
নিমেষ-বিহীন আঁখির পাতে,
নিমেষ দেখার প্রতীক্ষাতে
অনুক্ষণই করতে আমায় হয় যে কতই ছল,
হতাশ মনে গাঁথি মালা দিয়ে আঁখির জল!

ওগো দুর্লভ সে একটি নিমেষ বারেক শুধু আসে,
স্বাতীর বিন্দু মুক্তা হয়ে হৃদয়-পাতে হাসে;
সকল-অঙ্গে-পুলক-দেওয়া
কোন্ মলয়ার দখিন হাওয়া
হৃদয় ভরে চন্দনেরি সুরভি নিশ্বাসে;
কোন্ বকুলের বনে জাগে বসন্ত উল্লাসে!

ওগো কোন্ শরতের শিশির তুমি, বসন্তেরি হাওয়া,
ক্ষণে-ক্ষণে করছ হৃদয়-কুঞ্জে আসা যাওয়া;
তোমার সরস পরশ তরে
ফুটছে যে ফুল হরষ ভরে,
শরৎ-জ্যোৎস্না-মাখা তুমি বসন্ত-পূর্ণিমা,
সুষমার যে অন্ত নাই গো, নাই গরিমার সীমা!

ওগো অশ্রুসাগর মথন করে পূর্ণচাঁদের সাথে
পূর্ণিমাতে উদয় তোমার সুধার পাত্র হাতে;
তোমার প্রসাদ বিন্দু পিয়ে
বিষ-আহত উঠুক জীয়ে,
অমর হয়ে স্বর্গলোকে হোক সে অপলক,
চির-যুবন মনে জাগুক পারিজাত-পুলক!

তুমি কোন্ সাগরের অতল গভীর অন্তরেরি যত্ন,
সূর্য্য শশী তারকারি টুকরা মহা রত্ন,
আলোর মালা সাজিয়ে ধরে'
আরতি তাই তোমায় করে,
তারি আভা হাস্য তোমার, ঝরছে মুখে চক্ষে,
সাত রাজার ধন মাণিক
সে যে গোপন তোমার বক্ষে!

ওগো হৃদয় আমার লোহার মতন কঠিন ও কুৎসিত,
মর্চেপড়া আঘাত-খাওয়া সব ধনে বঞ্চিত ;
নয়ন তোমার স্পর্শমণি
এক নিমেষে করবে ধনী ;
সোনার খনি হবে যে মোর হৃদয় অন্ধকার,
ধূলার মাঝে সোনার কুচি হাসবে যে দেদার !

তুমি প্রবালদ্বেরা কল্পনারি আনন্দ-মন্দির,
বন্দনা গান নিত্য সেথা তোমার এ বন্দীর,
শ্রদ্ধা প্রীতি হৃদয়-থালে
তোমারি পায় অর্ঘ্য ঢালে,
অপারদুঃখ-শতদলে পূজার আয়োজন,
উঠছে বেজে পরাণ ভাঙা রোদন নিবেদন !

হে কোজাগর লক্ষ্মী, এস আমার রিক্ত ঘরে,
রক্ত-রেখায় আলুপনা যে আঁকছি হৃদয়-পরে ;
চরণপদ্ম ধুয়ে ধুয়ে
সকল ব্যথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
একটি নিমেষ পূর্ণ করে দাঁড়াও আঁখির আগে ;
চির জীবন-রাত্রি যেথায় এই বিরহী জাগে !

শ্রী—

২০ আশ্বিন ১৩২২
রাত্রি ১২টা

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়

ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর আমি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু পত্র পাইয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তরের বন্ধু শ্রীযুক্ত দীক্ষিতের পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীক্ষিত মহাশয় দত্তরের ২৭ মাইল দৌড়ের বিবরণ ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠাইয়াছেন। দত্তর তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যমে ঘণ্টায় ১১ মাইল দৌড়াইতে পারিবেন বলিতেছেন, এবং যদি তিনি ঘণ্টায় ১০ মাইল হিসাবেও দৌড়াইতে সক্ষম হন, তিনি পূরা ২৷৷০ ঘণ্টায় ২৫ মাইল অনায়াসে দৌড়াইয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়ের সম্মান নিজস্ব করিবেন। আমরা দত্তরকে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছি, আশা করা যায় যে তাঁহার দ্বিতীয় চেষ্টার পর আমরা তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর করিতে পাইব।

দত্তর যে একজন খুব উঁচুদরের খেলোয়াড় তাহা বলা বাহুল্য। তিনি অন্য কাহারও সাহায্য না পাইয়া নিজ বুদ্ধিতে এতদূর উন্নতি করিয়াছেন, কেতাবী বিদ্যা না থাকিলেও যে তিনি খুব বুদ্ধিমান তাহা তাঁহার দৌড় অভ্যাসের প্রণালী হইতে জানিতে পারা যায়। আমাদের অসীম দুর্ভাগ্য যে তাঁহাকে আরও শিক্ষা দিবার মত শিক্ষক এদেশে নাই ; তিনি যদি দক্ষিণ-আফ্রিকার স্প্রিংবক ওস্তাদ অথবা বিলাতের অন্য কোনও ওস্তাদের দ্বারা শিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে প্রথম উদ্যমেই যে তিনি ম্যাক-আর্থারের দৌড়ের কৃতিত্ব খর্ব্ব করিতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে আমরা এমন একজন খেলোয়াড় পাইয়াও হারাইতে বসিয়াছি,—প্রথমতঃ প্রতিযোগিতার অভাব, দ্বিতীয়ত দত্তরের দারুণ অর্থাভাব, হয়ত শীঘ্রই তাঁহাকে দৌড়ান হইতে অবসর লইতে বাধ্য করিবে।

পুণা হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণে সাংলি গ্রামে সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তর ১৮৮৭ সালে দরিদ্র অথচ ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দত্তরের পিতা উক্ত গ্রামে সামান্য ভাবে একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেই সময় শিক্ষাবিস্তারের অত্যন্ত হীন অবস্থা হওয়ায় বিদ্যালয়ের আয় হইতে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন কায়ক্লেশে চলিত। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সদাশিব বাল্য হইতেই অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও দুষ্ট হইয়াছিল। মাত্র দশবৎসর বয়সে সদাশিবের দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতার এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় দত্তরের প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিলেও তাঁহাকে সংসারের ভার লইতে হয়। সংসারে এক বিধবা মাতা ব্যতীত তাঁহাকে সাহায্য করিবার আর কেহই নাই। সুতরাং লেখাপড়া ছাড়িয়া তিনি কাজকর্ম্মে মনোনিবেশ করেন ও একটি ছোট-খাট পিতলের কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্যাবধি তাহা চালাইতেছেন।

বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার শারীরিক উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছা হয়, ও সেই ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া প্রথমে কুস্তী লড়িতে

আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে দৌড়ান সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়া তাহাই অভ্যাস করিতে আরম্ভ করেন। ১৫ বৎসর বয়স হইতে তিনি দৌড়ান আরম্ভ করিয়া শীঘ্রই ২ মাইল পথ ১৫-২০ মিনিটে দৌড়াইতে সক্ষম হন; বৎসর অতীত হইলে পর তাঁহার আরও বেশী দৌড়াইবার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি সাংলি হইতে ২½ মাইল দূরবর্ত্তী সঙ্গমেশ্বর শিবমন্দির পর্য্যন্ত দৌড়াইতে আরম্ভ করেন, ইহাতে তাঁহার দেবার্চ্চনা ও দৌড় উভয়েরই সুবিধা হওয়ায় আজ দশ বৎসর প্রত্যহ নিয়মমত সেই পথ দৌড়ান অভ্যাস করিতেছেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি আত্মশক্তি উপলব্ধি করেন; সেই সময় তিনি ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী এক তীর্থস্থানে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে দৌড়াইয়া গিয়া নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া যান, পুনর্ব্বার সেই পথ সেইটুকু সময়ের মধ্যে দৌড়াইয়া নিজ শক্তিতে অত্যন্ত প্রীত হন। ১৯১৫ সালে মার্চ্চ মাসে তাঁহার বন্ধুরা দাক্ষিণাত্য জিমখানার ক্রীড়া সম্মিলনীতে তাঁহার দৌড়ের বন্দোবস্ত করেন, তিনি ২৭½ মাইল, ৩ ঘণ্টা ৮ মিনিটে দৌড়ান, ও সেই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ২৭ মাইল ২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ২⅘ সেকেণ্ডে দৌড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

দত্তরের দৌড়াইবার পোষাক অত্যন্ত সাধাসিধা, তিনি একটি কামিজ, ধুতি ও টুপি ব্যবহার করেন। দৌড়াইবার পূর্ব্বে কামিজ জলে ভিজাইয়া লন। জুতা তিনি ব্যবহার করেন না। রাত্রিশেষে দৌড়াইতে হয় বলিয়া তিনি জীব-জন্তুর ভয়ে লাঠি ব্যবহার করেন।

দত্তরের কৃতকার্য্য হইবার মূল কারণ সংযম, অধ্যবসায়, ও প্রাত্যহিক অভ্যাস। তাঁহার চালচলন ও খাদ্য অত্যন্ত সাদাসিধা। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি মদ্য মাংস মৎস্য প্রভৃতির ব্যবহার জানেন না প্রত্যহ তিনবার তিনি বাজরার রুটি, ভাত, তরকারী, শাকশবজী আহার করেন। তিনি ময়দার রুটি, ফলমূল, বাদাম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত নন। তিনি আধসেরের বেশী দুগ্ধ পান করেন না। নিয়মিত আহার ও ব্যায়াম করায় তিনি গত পনের বৎসর কখনও অসুস্থ হন নাই। তিনি চা বা কফি পান করেন না। মধ্যে-মধ্যে ধূমপান করিলেও তিনি তাহাতে অভ্যস্ত নন। দত্তর অবিবাহিত।

সাধারণের সমক্ষে দৌড়াইবার পূর্ব্বে দত্তর সাংলি গ্রামে নিজ অদ্ভুত সন্তরণ-বিদ্যা দেখাইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মত সন্তরণ করিতে সাংলি প্রদেশে আর কেহই পারিত না। বর্ষাকালে দত্তর স্ফীতদেহ নদীবক্ষে সন্তরণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁহার সন্তরণ দেখিবার জিনিষ। গভীর রাত্রে দত্তর একাকী কৃষ্ণানদীতেও সন্তরণ করিতে অভ্যস্ত। সাঁতার এবং দৌড়ান উভয়েতেই দত্তর অত্যন্ত স্থির; তাঁহার দম এবং শক্তি কখনও তাঁহাকে কার্য্যকালে পরিত্যাগ করে না।

দত্তরের শরীরের মাপ :—

দৈর্ঘ্য	৫ ৩½″	
ছাতি	৩৩½″	(সাধারণ)
”	৩৫½″	(ফুলান)
গর্দ্দান	১৩″	
হাতের গুলি	১০½″	
কোমর	২৮½″	
উরু	১৯½″	
পায়ের ডিম	১৩″	

ইউরোপীয় খেলোয়াড় অপেক্ষা তাঁহার দৈর্ঘ্য কম হওয়াতে দত্তরকে বিস্তর অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহা ছাড়া, তিনি কখনও কাহারও দ্বারা শিক্ষিত হন নাই, ও দৌড় অভ্যাস করিবার সঙ্গী পান নাই। খেলোয়াড় মাত্রেই এইসব অভাবের অসুবিধা বুঝিতে পারিবেন।

ইহাই দত্তরের খেলোয়াড়-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। শ্রীযুত দীক্ষিতের অন্য এক পত্র হইতে জ্ঞাত হইয়াছি যে দৌড়ান অভ্যাস করিতে দত্তরের অত্যন্ত আর্থিক ক্ষতি হয়; কেননা তাঁহাকে অভ্যাস করিতে হইলে নিজ কারখানা বন্ধ রাখিতে হয়। সামান্য ক্ষতিও তাঁহার পক্ষে খুব বেশী এই কারণে তাঁহার দৌড়ান অভ্যাস যতদূর হওয়া উচিত ততদূর হয় না। এই দারুণ জীবনসংগ্রামের দিনে অনেক-স্থলে অর্থোপার্জ্জনই চরম লক্ষ্য, বিশেষ দরিদ্র দত্তরের পক্ষে কারখানা বন্ধ করিয়া অর্থের ক্ষতি করা একেবারেই অসম্ভব; সুতরাং অর্থাভাবে দত্তরকে শীঘ্রই দৌড়ান পরিত্যাগ করিতে হইবে। উপস্থিতক্ষেত্রে তাঁহাকে সাহায্য করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে উচিৎ কারণ আমাদের দেশে



শ্রীযুক্ত সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তর।

শিক্ষা ও প্রতিযোগিতার অভাবে এক ত উঁচু দরের খেলোয়াড় একান্ত বিরল। যদিই বা কখনও দুইএকজন দৈবাৎ সেই সম্মান প্রাপ্ত হন, আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁহাদের শক্তিটুকু নষ্ট করা নিতান্ত নিন্দনীয়। দাক্ষিণাত্য জিমখানা দত্তরকে তাঁহার দৌড়ের জন্য একখানি স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন! সে পুরস্কার খুব সম্মানার্হ হইলেও সাহায্য হিসাবে যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা বলা বাহুল্য। দত্তর আগামী শীতকালে কলিকাতা অথবা এলাহাবাদে দৌড়াইতে সম্মত আছেন; নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে সেজন্য কোনও বন্দোবস্ত হইতে পারে না, কারণ উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বাংলাদেশের জনসাধারণ ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলায় যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের ও সমগ্র ভারতবাসীর নিকট আমার ইহাই সানুনয় নিবেদন যে তাঁহারা সামান্য দানের দ্বারাও দত্তরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়ের কৃতিত্ব খর্ব্ব করিতে সুযোগ দিবেন। যদি দত্তরকে নিতান্ত অর্থাভাবেই দৌড়ান ত্যাগ করিতে হয়, তাহার চেয়েও দুঃখের বিষয় আর নাই। যে কেহ অনুগ্রহ করিয়া অর্থসাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

(১) Treasurer. The Allahabad Sporting Club. 36, Goods Shed Road, Allahabad.

(২) Treasurer. The Students' Sporting Club. 5A. Stanley Road, Allahabad.

(৩) Mr. K. N. Dikshit M.A. 235 Budhwar, Poona City.

যদি উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা হইলে আমি দত্তরকে কলিকাতা লইয়া যাইয়া প্রবাসী ও মডার্ন-রিভিউ আফিসে সমস্ত স্থির করিব। দত্তর যদি পৃথিবীর দৌড়ের কৃতিত্ব খর্ব্ব করিতে সক্ষম হন ও এলাহাবাদ কিংবা কলিকাতায় দৌড়ান, তাহা হইলে এলাহাবাদ হইতে তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। আশা করি Calcutta Walking Association-এর সম্পাদক মহোদয় এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন। অন্য কোন ব্যক্তি অথবা উক্ত সম্পাদক মহাশয় দৌড়ের বন্দোবস্তের জন্য আমার সহিত পত্রব্যবহার করিবেন আশা করি।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার।

পঞ্চশস্য

যুদ্ধে তরল আগুন—

বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রাচীনকালের যত রকম যুদ্ধরীতি পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার মধ্যে তরল আগুন ছড়াইয়া শত্রুকে কাবু করার উপায় অন্যতম। ইউরোপে বারুদ আবিষ্কারের পূর্ব্বে বৈজান্তীন সাম্রাজ্যের যোদ্ধারা এই উপায়ে যুদ্ধ করিত; বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহাই আবার বারুদের সহকারীরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দি সায়েন্টীফিক আমেরিকান পত্রে তরল আগুন নিক্ষেপের যন্ত্র ও উপায় সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় জল দিবার নলের মতন একটা নলের ভিতর দিয়া সহজে জ্বলনশীল একটা তরল পদার্থ জোরে দূরে নিক্ষেপ করা হয় এবং সেই তরল ধারাকে প্রজ্বলিত করিয়া শত্রুর মধ্যে অগ্নিবৃষ্টি করা হয়। এই কৌশল জারম্যানদের উদ্ভাবন। ইহা এই যুদ্ধের সময় দায়ে ঠেকিয়া তবে উদ্ভাবিত হইয়াছে এমন নহে, যুদ্ধের বহুপূর্ব্ব হইতেই ইহার উদ্ভাবন, পরীক্ষা ও উন্নতিসাধন হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে একটা বাঁধা চৌবাচ্ছা হইতে নল লাগাইয়া সহজদাহ্য তরল পদার্থ



তরল আগুন নিক্ষেপের বহনক্ষম কল।

A কার্ব্বনিক এসিড।
G গ্যাস।
P গ্যাসোলিন।
R ভাল্ভ্।
I আগুন জ্বালাইবার চকমকি।
J অগ্নিশিখা।

ছড়ানো হইত এবং সেই নলের মুখে যেখান হইতে তরল পদার্থ বাহির হইত ঠিক সেইখানে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগানো থাকিত যাহা তরল পদার্থের নির্গমনের তোড়ে সেই তরল পদার্থের ধারায় আগুন লাগাইয়া দিত। এই যন্ত্রে ৪০।৪৫ গজ দূরে অগ্নিধারা বর্ষিত হইতে পারিত, তাহার বেশী দূরে যাইবার পথেই তরল পদার্থটা জ্বলিয়া শেষ হইয়া যাইত। অধিকন্তু তরল পদার্থ নলের মুখেই জ্বলিয়া উঠিত বলিয়া যে লোক সেই নল হইতে অগ্নিবর্ষণ করিত অতিতাপে তাহার অসুবিধা ত হইতই, তাহার বিপদেরও সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল। তখন চেষ্টা হইতে লাগিল এমন উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে যাহাতে দহনশীল তরল পদার্থ লক্ষ্যস্থানে পড়ার আগে প্রজ্বলিত হইবে না। ইহাতে দাহ্য তরল-পদার্থের অনাবশ্যক দাহন নিবারণ হইবে। ইহার জন্য একটা দোনলা তরল-আগুন-দাগার বন্দুক তৈয়ারী করা হইল। তাহার একটা নল আরেকটার উপরে এবং উপরের নলটা নীচের নলের চেয়ে ছোট। বন্দুকটা একটা তেপায়ার উপর এমনভাবে বসানো যাহাতে তাহা চারিদিকে ঘুরাইতে পারা যায়। এই বন্দুকের দুই নল হইতেই একসঙ্গে তরল দাহ্যপদার্থ ছোড়া হয়, কিন্তু কেবল উপরের নলের ধারা আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠে। উপরের ছোট নলের এই সরু জ্বলন্ত ধারা বড় নলের বড় ধারার সহিত ইচ্ছামত-স্থানে যোগ করিবার উপায় থাকাতে ইচ্ছামত-স্থানে বড় ধারাটিতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছে। বড় ধারায় আগুন ধরিয়া গেলেই সরু ধারাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বড় ধারার অগ্নিস্রোত সম্মুখের দিকেই বহিয়া যায়, স্রোতের উজান ঠেলিয়া নলের মুখপর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠে না। এই অগ্নিধারা মাটিতে পড়িয়া আগুনের পর্দ্দার মতন ছড়াইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত তরল পদার্থ খোরাক পায় ততক্ষণ জ্বলিতে থাকে। নল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আগুনের পর্দ্দা নানানদিকে অবিচ্ছেদে ছড়াইয়া দেওয়া চলে। অনেক সময়, কিছুক্ষণ ধরিয়া শত্রুর সীমানায় দাহ্য-তরলপদার্থ বর্ষণ করা হয়, তারপর নলের মুখ হইতে উৎক্ষিপ্ত তরলধারা যেখানে মাটি স্পর্শ করিতেছে ঠিক সেইখানে ছোট নল হইতে অগ্নিধারা নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত ভিজা জায়গা জ্বালাইয়া তুলিয়া মহামারী-কাণ্ড বাধাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে যখন বাঁধা-চৌবাচ্ছা হইতে তরল পদার্থ নিক্ষিপ্ত হইত তখন কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বা অপর কোনো গ্যাসের চাপে তরলধারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইত। কিন্তু গ্যাসের অধিকাংশই দাহ্য তরল পদার্থে শোষিত হইয়া যাইত বলিয়া চাপ কম হইত এবং তরলে গ্যাসে মিশিয়া যাওয়াতে তরল পদার্থ ফেনিল হইয়া উঠিত এবং তাহাতে সর্ব্বত্র সমানভাবে জ্বলিত না। এই-সমস্ত অসুবিধা দূর করিবার জন্য এখন পাম্প ব্যবহার করা হয়। এই তরল আগুন সৃষ্টির জন্য আলকাতরার তেল ব্যবহার করা হয়। এই তেলে আগুন লাগিলে খুব ঘন পাঁশুটে রঙের ধোঁয়া হয়; তাহাতে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া ত যায়ই, অধিকন্তু তাহার দুর্গন্ধে তাহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এখন বহিয়া বেড়াইতে পারিবার মতন ছোট ছোট কলও নির্ম্মিত হইয়াছে।

*

অপরাধীর মন পরীক্ষা—

আজকাল সকল বিষয়ে মনোবিজ্ঞান আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। অপরাধীরা অন্যায় অপকর্ম্ম করে, সমাজ-স্থিতির জন্য তাহাকে ধরিয়া তাহার প্রতি নানাবিধ শাস্তি বিধান করিয়া সমাজ-রক্ষকেরা এতদিন নিশ্চিন্ত হইতেছিলেন। এখন মনোবিজ্ঞান বলিতেছে অপরাধীরাও ত সমাজের অঙ্গ, তাহারা সমাজ-দ্রোহিতা কেন করে তাহাদের সেই মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তদুচিত ব্যবস্থা করা সমাজের কর্ত্তব্য। অনেক সময় অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে চুরি, খুন, ঘরে আগুনলাগান প্রভৃতি অপকর্ম্ম করিবার ঝোঁক সেই-সেই অপরাধীর সেই ব্যাধির চিকিৎসায়, তাহাকে কয়েদ করিয়া শারীরিক কষ্ট দিয়া বা ফাঁসি দিয়া নহে। এইজন্য বহু মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের অভিমত যে পুলিশ-থানা ও আদালতের সঙ্গে একএকটি মনস্তত্ত্ববিচারের শাখা-বিভাগ থাকা আবশ্যক এবং প্রত্যেক অপরাধী আসামীর মন তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়া তবে তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা করা উচিত। অপরাধীদের মন পরীক্ষার জন্য নিউইয়র্কের পুলিশ-বিভাগের সহিত একটি মনস্তত্ত্ববিভাগ যোগ করা হইয়াছে। এই বিভাগে মনস্তত্ত্বজ্ঞেরা অপরাধীর মন পরীক্ষার বিবিধ উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, অপরাধী আসামীকে সেই-সকল উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়—তাহাদের মন সুস্থ স্বাভাবিক অথবা অসুস্থ ব্যাধিগ্রস্ত।

(১) বিচারাধীন ব্যক্তিকে নিম্নলিখিতরূপ কতকগুলি শব্দ দিয়া চটপট তাহার উল্টা শব্দ বলিতে বা লিখিতে বলা হয়

ভালো	বাহির	শীঘ্র
লম্বা	বড়	জোরে
সাদা	আলো	সুখী
মিথ্যা	পছন্দ	ধনী
অসুস্থ	খুসি	পাতলা
খালি	যুদ্ধ	বন্ধু

(২) তাহাদিগকে কতকগুলি বাক্য দেওয়া হয়, তাহার মধ্যে-মধ্যে একএকটি শব্দ উহ্য থাকে। সেই স্থানে বিচারাধীন ব্যক্তিকে চটপট একএকটি উপযুক্ত শব্দ বসাইতে বলা হয়।

(৩) একটা তক্তার গায়ে কতকগুলি ছবি আঁকা থাকে এবং



মন পরীক্ষার যন্ত্র।

একখানি তক্তার গায়ে কতকগুলি ছবি আঁকা আছে এবং ছবির পাশে পাশে একএকটা চৌকা খাঁজ কাটা আছে। কতকগুলি কাঠের ব্লকে ভিন্ন ভিন্ন ছবি আঁকা আছে। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে তক্তার খাঁজের মধ্যে এমন ব্লক বাছিয়া বসাইতে হইবে যাহাতে তক্তার ও ব্লকের ছবি মিলিয়া একটা মানে হয়। তক্তার মাঝখানে দুজন ছেলে যে-ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে তাহাতে বুঝা যায় যে তাহারা ফুটবল খেলিতেছে। তাহাদের মধ্যেকার খাঁজে ফুটবলের ছবি না বসাইয়া অন্য কিছুর ছবি বসাইলে মানে হইবে না। এবং তাহাতে সেই ব্যক্তির অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। অবশ্য ব্যক্তির পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার উপর সফলতা ও বিফলতা নির্ভর করে।

একএকটা ছবির কাছে একএকটা চৌকা ঘর কাটা থাকে; কতকগুলি চৌকা কাঠের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছবি আঁকা থাকে; বিচারাধীন ব্যক্তিকে বলা হয় তক্তার গায়ে আঁকা ছবির ভঙ্গির সহিত খাপ খাওয়াইয়া মানে হয় এমনভাবে ছবি-আঁকা চৌকা কাঠগুলি তক্তার গায়ের খাঁজে খাঁজে বসাইয়া দিতে। এই কার্য্যে যে যত ভুল করে তাহার মন তত অপরিণত বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৪) বিচারাধীন ব্যক্তিকে একটা কোনো নক্সা নকল করিতে দেওয়া হয়; সেই নক্সা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তাহার সামনে একখানা আয়না খাড়া থাকে তাহার মধ্যে সেই নক্সা প্রতিফলিত দেখে, সেই আয়নার ছায়া দেখিয়া তাহাকে নকল করিতে হয়; সে যে-কাগজে নক্সা আঁকে সে-কাগজও সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তাহার হাতের উপর একটা ডালা আড়াল থাকে, তাহাতে সে আপনার আঙুল ও পেনসিলের নড়াচড়া দেখিতে পায় না, কেবল দেখিতে পায় আয়নার ছায়াতে। যে-ব্যক্তি যতশীঘ্র নির্ভুলভাবে ঐ নক্সার নকল করিতে পারে সে তত বুদ্ধিমান ও তাহার মন তত সুস্থ বলিয়া নির্ণীত হয়; যে বার দশেকেও নকল করিয়া উঠিতে না পারে তাহার মন অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া ধরা হয়।

মানুষের বাড়তির-বয়স—

স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরা লম্বা। এই পার্থক্য তাহাদের জন্মের সময় হইতেই থাকিতে দেখা যায়। খোকারা সাধারণত খুকিদের চেয়ে ½ ইঞ্চি বড়। পূর্ণ বয়সে এই পার্থক্য প্রায় ৪ ইঞ্চিতে দাঁড়ায়। জার্মানীতে মানুষের বাড়ের নিয়ম সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানে নিম্নলিখিত ফল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শিশুরা প্রথম বৎসরে বেশ গোলগাল মোটাসোটা থাকে; তৃতীয় চতুর্থ বৎসরের শেষে সে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং সেইজন্য রোগা দেখায়; তারপর কিছুদিন একটু থমথমে থাকিয়া আট হইতে এগার বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার হঠাৎ বাড়িতে থাকে। এইরূপে একবার বাড়িয়া কিছুদিন বাড় স্থগিত থাকে, তারপর আবার বাড়ে। বাড় স্থগিত থাকিবার সময় দেহ মোটা হয়, আবার বাড়িবার সময় রোগা হইয়া যায়। ষ্ট্রাট্‌স্ নামক একজন গবেষকের অনুসন্ধানের ফল এইরূপ—

(১) প্রথম মোটা হওয়ার বয়স	২ হইতে ৪ বৎসর
(২) প্রথম লম্বা হওয়ার বয়স	৬ হইতে ৮ বৎসর
(৩) দ্বিতীয়বার মোটা হওয়ার বয়স	৯ হইতে ১১ বৎসর
(৪) দ্বিতীয়বার লম্বা হওয়ার বয়স	১২ হইতে ১৬ বৎসর
(৫) পূর্ণতার বয়স	১৭ হইতে ২৫ বৎসর

ভাইসেনবার্গ-নামক আর-একজন অনুসন্ধানকারীর মতে মানুষের দেহের পরিণতি ও অবনতির বয়স এইরূপ—

(১) প্রথম মোটা হওয়ার বয়স — ২ থেকে ৪ বৎসর
(২) প্রথম লম্বা হওয়ার বয়স — ৫ থেকে ৭ বৎসর
(৩) বৃদ্ধি স্থগিত—
বালক—৮ থেকে ১২ বৎসর
বালিকা—৮ থেকে ১০ বৎসর
(৪) দ্বিতীয়বার লম্বা হওয়ার বয়স—
বালক—১৩ থেকে ১৮ বৎসর
বালিকা ১১ থেকে ১৫ বৎসর
(৫) স্থগিত বৃদ্ধি—
যুবক—১৯ থেকে ২৬ বৎসর
যুবতী—১৬ থেকে ১৯ বৎসর
(৬) স্থগিত বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়বার মোটা হইবার বয়স—
২৬ বা ১৯—হইতে ৫১ বৎসর পর্য্যন্ত।
(৭) অবনতির বয়স — ৫২ হইতে ৭৬ পর্য্যন্ত।

লম্বার বাড় পূর্ণ হয় স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসরে এবং পুরুষের ২৫ বৎসরে। কোনোকোনো জাতি ইহার পরও একটু বাড়ে। ২৬ হইতে ৫১ বৎসরের মধ্যে শরীরের দৈর্ঘ্য সমান থাকে, তারপর বার্দ্ধক্যের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অল্প অল্প কমে। জন্ম হইতে পূর্ণ পরিণতির বয়স পর্য্যন্ত শরীরের ওজন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং লম্বা হইয়া ওঠার বয়স পার হওয়ার অনেকপরে মানুষ ওজনের চরমে উঠে—সাধারণত পুরুষ ৪০ বৎসরে এবং স্ত্রীলোক ৫০ বৎসরে সবচেয়ে বেশী ভারী হয়। তারপর আবার ওজনে কমিতে থাকে। অবশ্য বিশেষ কোনো কারণে বা অবস্থায় মানুষ মোটা হইয়া পড়িলে ইহার ব্যত্যয় ঘটে। ১০ বৎসরের পর মেয়েরা চট করিয়া ছেলেদের মাথায় ছাড়াইয়া উঠে, কিন্তু ১৬ বৎসর বয়সে ছেলেরা মেয়েদের নাগাল ধরিয়া ছাড়াইয়া যায়।

শীতের চেয়ে গ্রীষ্মকালে দৈর্ঘ্য ও ওজন বেশী হয়। শিশুরা সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাড়ে না বলিলেই হয়; ফেব্রুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত একটু বাড়ে; সবচেয়ে বেশী বাড়ে জুলাই ও আগষ্ট মাসে। মানুষের ওজন সবচেয়ে বেশী হয় আগষ্ট হইতে জানুয়ারীর মধ্যে। অন্য সময় হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।

চারু।

বেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচার্য্য

দ্বিতীয় স্তবক—অগ্নিমন্ত্র গ্রহণ।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

"The particular kind of matter forming as it were the body of the Logos, Heraclitus believes to be Fire."

অগ্নি পদার্থটা কি—তাহা ভাবিয়া দেখা যা'ক্। অগ্নি যে, ঘর্ষণ-ক্রিয়া'র রূপান্তরিত পরিণাম, তাহা সকলেরই দেখা কথা। ঘর্ষণ-ক্রিয়া হইতে সর্ব্বপ্রথমে তাড়িৎক (electricity) উৎপন্ন হয়; তাহার পরে তাড়িৎক ক্রোড়ে করিয়া তাপ উৎপন্ন হয়; তাহার পরে তাড়িৎক এবং তাপ ক্রোড়ে করিয়া দীপ্তি উৎপন্ন হয়। এই যে, তাড়িৎক-এবং-তাপ-গর্ভ দীপ্তি, ইহারই নাম অগ্নি। ঘর্ষণ-ক্রিয়া হইতে অগ্নিকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া দর্শক যদি বলেন যে, উৎপদ্যমান অগ্নি উৎপাদিকা ঘর্ষণ-ক্রিয়ার পূর্ব্বে ছিল না, তবে তাঁহার সে কথা শাস্ত্রানুমোদিত নহে;—শাস্ত্রে বলে যে, কাষ্ঠ-ঘর্ষণ হইতে অগ্নি-যাহা যখন উৎপন্ন হয়—ঘর্ষণ-ক্রিয়ার পূর্ব্বে তাহা ঘৃষ্য কাষ্ঠে অব্যক্ত শক্তি-রূপে অন্তর্নিগূঢ় থাকে; আর সেই যে অব্যক্ত-শক্তিরূপী অগ্নি তাহা সমস্ত জগতের গোড়া-ঘ্যাঁসা ক্রিয়াশক্তি—তাহা সেই সর্ব্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি যাহার পৃষ্ঠে সর্ব্ববিষয়গত জ্ঞান সংযুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বস্তবকে আমরা ধারাবাহিক পদ্ধতি-অনুসারে দেখিয়াছি যে,

(১) Logos = Word = বাণী

(২) = বিদ্যাবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতী

(৩) = জগৎসুদ্ধ সমস্ত জীবের বোধাবোধাত্মিকা সমষ্টি-বুদ্ধি

(৪) = সমষ্টিবোধ + অবোধ অধ্যবসায়

(৫) = সর্ব্ববিষয়গত জ্ঞান + সর্ব্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি।

এক্ষণে দেখিতেছি এই যে, সেই যে সর্ব্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি, যাহার মূলে রহিয়াছে সর্ব্ববিষয়গত জ্ঞান, তাহা সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদিকা এবং নিয়ামিকা জ্ঞানগর্ভা ক্রিয়াশক্তি যাহার যাবনিক নাম Logos—শাস্ত্রীয় নাম হিরণ্য-গর্ভ—আট-পহুরিয়া নাম অগ্নি এবং বৈজ্ঞানিক নাম আদি-সূর্য্য। এ যাহা আমি বলিলাম, ইহার একটি কথাও আমার নিজের বানানো বা সাজানো বা টানিয়া বুনিয়া ঘটাইয়া দাঁড় করানো কথা নহে—সমস্তই পুরাতন বৈদিককালের ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিদিগের হৃদ্গত কথা। যদি বল,—"তাহার প্রমাণ কি?" তবে নিম্নে প্রণিধান কর।

কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ১৫শ শ্লোকে আছে—

"[যমো] লোকাদিমগ্নিং তমুবাচ তস্মৈ [নাচিকেতসে]" (বাংলা) "যমরাজা নচিকেতাকে সেই লোকাদি অগ্নির বিষয় বিবরিয়া বলিলেন।" এই লোকাদি অগ্নির অর্থ শাঙ্করভাষ্যে ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ;— "লোকাদিং লোকানাং আদিং প্রথম-শরীরিত্বাৎ।" [বাংলা] "লোকাদি কিনা ভূলোক দ্যুলোকাদি সমস্ত লোকের আদি—প্রথম শরীরী।"

আবার কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ১০ম শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে আছে—

"অব্যক্তাৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং" [বাংলা] "হৈরণ্যগর্ভতত্ত্ব, অথবা যাহা একই কথা—হিরণ্যগর্ভ, অব্যক্তের প্রথম-জাত সন্তান।"

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১ম সূক্তে ৭ম ঋকে আছে—

"দক্ষস্য (অর্থাৎ অগ্নেঃ) জন্মন্ অদিতেরুপস্থে (অর্থাৎ অদিতে গর্ভে)। • • • অগ্নির্হি নঃ প্রথমজা।" [বাংলা] "অগ্নির জন্ম অদিতির গর্ভে আদিত্যরূপে—অগ্নি আমাদের মধ্যে প্রথম জাত।"

তবেই হইতেছে যে, অগ্নি = সূর্য্য; লোকাদি অগ্নি = আদি সূর্য্য। এই-সকল বেদোপনিষদের বাক্য একঠাঁই জড়ো করিয়া আমরা পাইতেছি—

লোকাদি অগ্নি = সর্ব্ব লোকের আদি প্রথম শরীরী = প্রকৃতির প্রথম জাত সন্তান হিরণ্যগর্ভ = আদি সূর্য্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয় দ্রষ্টব্য এই যে, কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ১৩শ এবং ১৯শ এই দুইটি শ্লোকে উপরিউক্ত লোকাদি অগ্নিকে বলা হইয়াছে "স্বর্গ্য (অর্থাৎ স্বর্গীয়) অগ্নি।" বেদে আবার এ-কথাও লেখে যে, এই যে লোকাদি স্বর্গীয় অগ্নি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ইনি মধ্যে মধ্যে নর-লোকে আগমন করিয়া হোতাগণের পূজা গ্রহণ করেন; তার সাক্ষী:—

"আজগন্বান্ অগ্নি ব্রহ্মা নৃষদনে বিধর্ত্তা। আ যং হোতা যজতি বিশ্ববারং।" ইতি ঋগ্বেদ। ৭ম মণ্ডল। ৭তম সূক্ত। ৫ম ঋক্। [বাংলা] বিশ্ব-বিধারক অগ্নি ব্রহ্মা নর-সদনে আগমন করিয়াছেন; ইনি সেই বিশ্ববরণীয় দেবতা যাঁহাকে হোতারা উপাসনা করেন।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন—

"The following are the most important of Heraclitus' theological fragments:

প্রথম Fragment।

"There is but one Wisdom [তাহা বেদান্ত]

দ্বিতীয় Fragment।

"This world-order, the same in all things, no one of Gods or men has made: but it always was, is, and shall be ever-living fire, kindled in due measure and extinguished in due measure."

এই দ্বিতীয় Fragment সম্বন্ধে

মন্তব্য।

দেশীয় শাস্ত্রে বলে—

(১)

World-order = জগৎব্যাপারের অখণ্ডনীয় বিধান = **বিধি** = ব্রহ্মা = লোকাদি অগ্নি।

(২)

সৃষ্টিকালে **বিধি**, সকলের আগে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হ'ন—লোকাদি অগ্নি kindled হ'ন; প্রলয়কালে তিনি সকলের শেষে অব্যক্তের ক্রোড়ে নিলীন হ'ন—লোকাদি অগ্নি extinguished হ'ন; সৃষ্টিকালে **বিধি** অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হন, প্রলয়কালে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হন, **এই মাত্র কেবল**, তা বই, তিনি জন্মেনও না—মরেনও না; **বিধি** always was, is, and shall be ever-living Fire, kindled in due measure and extinguished in due measure. "বিধি জন্ম-মৃত্যু-বিহীন" এ কথাটির একটু টীকা করা আবশ্যক।

[টীকা] অব্যক্ত প্রকৃতির এ পিঠে ব্রহ্মা বা অপর-ব্রহ্ম, ও-পিঠে পরব্রহ্ম; পরাপর ব্রহ্ম **একই** ব্রহ্ম, সুতরাং জন্ম-মৃত্যু-বিহীন।

তৃতীয় Fragment।

God is day and night, winter and summer, war and peace, satiety and hunger [বেদান্ত মূর্ত্তিমান্]. But he is changed, just as fire, when mingled with different kinds of incense, is named after the flavour of each.

এই তৃতীয় Fragmentএর
শেষের কথাটির সম্বন্ধে
মন্তব্য।

ঠিক এই কথাটি কঠোপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ৯ম শ্লোকে প্রাচীরের আড়াল-বর্জ্জিত প্রমুক্ত ভাবে বলা হইয়াছে এইরূপ:—

"অগ্নি যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব। এক স্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥" [বাংলা] এক অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করিয়া যেমন রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়, অর্থাৎ যেমন-যেমন রূপের সঙ্গে মেশে তেম্নি তেম্নি রূপ ধারণ করে, সেইরূপ এক যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ হ'ন; আবার, রূপের সংস্রব হইতে বাহিরেও থাকেন, অর্থাৎ রূপে-রূপে প্রতিরূপিত হওয়া সত্ত্বেও স্বরূপে ভর করিয়া অলগ্ন থাকেন—পদ্মপত্র-স্থিত জলবিন্দুর ন্যায় নির্লিপ্ত থাকেন। "নির্লিপ্ত থাকেন" এ কথাটি আরো স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া বলা হইয়াছে **১১শ শ্লোকে**; যথা; "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈ র্বাহ্য দোষৈঃ। এক স্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।" [বাংলা] সূর্য্য যেমন সর্ব্বলোকের চক্ষু হইয়াও চক্ষুগোচর বিষয়-সকলের কোনো-প্রকার দোষে লিপ্ত হয় না, তেম্নি

একমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি লোকদুঃখে লিপ্ত হ'ন না।

James Adam মহোদয় তাহার পরে বলিতেছেন—

"In the second of the fragments cited above, Heraclitus identifies the cosmos with this element (অর্থাৎ with fire). 'This cosmos * * * * * always was, is and shall be ever-living Fire, kindled in due measure and extinguished in due measure. Taken strictly, of course, these words involve a contradiction. When Fire is extinguished, it must cease to be; and if it ceases to be, we cannot justly say that it always is. But in saying that Fire is extinguished, Heraclitus means only that it passes into something else; and we must suppose that the other substances into which Fire passes were declared by Heraclitus to be themselves particular forms or manifestations of that element. In other words, Heraclitus maintained that all things are Fire, because Fire is transformed into all things."

ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপরে দ্যৌ, অন্তরীক্ষে পর্জ্জন্য, নীচে পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ নর-নারী, সবই অগ্নি; তা'র সাক্ষী :—পঞ্চম অধ্যায়ের ৪র্থ খণ্ডে আছে [প্রবাহন রাজা গৌতম'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন] "অসৌ বাব লোকো গৌতম অগ্নিঃ।" [বাংলা] "ঐ লোক (অর্থাৎ দ্যুলোক), গৌতম, অগ্নি।" ৫ম খণ্ডে আছে—"পর্জ্জন্যো বাব গৌতম অগ্নিঃ।" [বাংলা] "পর্জ্জন্য, গৌতম, অগ্নি।" ৬ষ্ঠ খণ্ডে আছে—"পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ।" [বাংলা] "পৃথিবী, গৌতম, অগ্নি।" ৭ম খণ্ডে আছে—"পুরুষো বাব গৌতম অগ্নিঃ।" [বাংলা] "পুরুষ, গৌতম, অগ্নি।" অষ্টম খণ্ডে আছে—"যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ।" [বাংলা] "স্ত্রী, গৌতম, অগ্নি।"

এটা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, অগ্নির এই পঞ্চ মূর্ত্তির ভিতরেই তাহার ত্রিমূর্ত্তি সম্ভুক্ত রহিয়াছে। ত্রিমূর্ত্তি সে—ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র। এ যাহা আমি বলিলাম, এ কথা সত্য কি মিথ্যা—নিম্ন-প্রদর্শিত আগম-প্রমাণ-দৃষ্টে সুবিদ্বান্ পাঠক মহোদয়ের তাহা জানিতে'বাকি থাকিবে না।

ঋক্‌বেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৫১তম সূক্তে ৫ম ঋকে আছে—"দ্যৌষ্ পিতঃ, পৃথিবী মাতর্ অধ্রুক্, অগ্নে ভ্রাতর্, বসবো, মৃড়তা (অর্থাৎ সুখয়ত—সুখী কর) নঃ। বিশ্বে আদিত্যা, অদিতে, সজোষাঃ (অর্থাৎ সবাই মিলিয়া) অস্মভ্যং শর্ম্ম বহুলং বিয়ন্ত [বিয়মু—নিয়ম—বিধান ;—"বিয়ন্ত"—বিধান কর]" [বাংলা] "হে পিতা দ্যৌ,* হে মা অন্নদা পৃথিবী,† হে ভাই অগ্নি, হে বসু'রা সবে, আমাদিগকে সুখী কর। হে আদিত্য সবে, হে অদিতি, তোমরা সবাই মিলিয়া আমাদিগকে বহুল কল্যাণ বিধান কর (অর্থাৎ প্রদান কর)।"

এমতে পাইতেছি—দ্যৌ=পিতা, পৃথিবী—মাতা।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের নর-নারীরূপী পিতৃমাতৃগণ'কে বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডের দ্যৌঃ-পৃথিবীরূপী পিতা-মাতা'র ক্রোড়ীভূত করিয়া লইয়া পাইতেছি :—

অগ্নির প্রথম মূর্ত্তি।

জগৎ-সুদ্ধ সমস্ত নরজাতি ক্রোড়ে-করিয়া-বিরাজমান দ্যৌষ্ পিতা।

দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

জগৎ-সুদ্ধ সমস্ত নারী-জাতি ক্রোড়ে-করিয়া-বিরাজমানা পৃথিবী-মাতা।

তৃতীয় মূর্ত্তি।

জনগণের শাসন-কর্ত্তা অন্তরীক্ষ-চর পর্জ্জন্য রাজা।

প্রথম মূর্ত্তির (অর্থাৎ অগ্নির ব্রহ্মামূর্ত্তির) গুণবাচক নাম চারিটি :—

ব্রহ্মা—দ্যৌ-অগ্নি—পিতা-অগ্নি—আদি-সূর্য্য—লোকাদি অগ্নি।

কঠোপনিষদে একস্থানে যাহাকে বলা হইয়াছে "লোকাদি" অগ্নি, আর-একস্থানে তাহাকেই "নাচিকেত" নামে নির্দ্দেশ করিয়া তাহার গুণ-কীর্ত্তন করা হইয়াছে যথেষ্ট; বলা হইয়াছে যে, এই অগ্নিই মুখ্যরূপে যজমানদিগের স্বর্গ-লাভের সেতু, এবং গৌণরূপে মুমুক্ষুদিগের ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সেতু। তার সাক্ষী :—কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর ২য় শ্লোকে লেখে—যম-রাজা নচিকেতা'কে বলিতেছেন "যঃ সেতু রীজানানাং অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ং তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেমহি।" [বাংলা] "যিনি যজমানদিগের স্বর্গ-লাভের সেতু, সেই (লোকাদি)

* দ্যৌষ্ পিতা=দ্যুলোকরূপী পিতা—দ্যু-পিতর্—দ্যু-পিতৃ—দ্যু-পিতর্—যু-পিতর্—Jupiter।

† ধ্রুক্ শব্দের অর্থ ভাষ্যে লেখে "দোহনশীলা"। পৃথিবী মাতা অধ্রুক্=অদোহনশীলা=অমৃদ্দা=শস্যদা=অন্নদা।

নাচিকেত অগ্নিকে আমি চয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি, আর, সংসার-সমুদ্র-তরণেচ্ছু-গণের অভয় পার যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, তাঁহাকেও জানিতে সমর্থ হইয়াছি।"

দ্বিতীয় মূর্ত্তির (অর্থাৎ অগ্নির বিষ্ণু-মূর্ত্তির) গুণবাচক নাম তিনটি :—

বিষ্ণু—পৃথিবী-অগ্নি—মাতা-অগ্নি—বৈশ্বানর অগ্নি। লোকাদি অগ্নি বা আদি সূর্য্য যেমন সৃষ্টির মূল, বৈশ্বানর অগ্নি তেমি স্থিতির মূল। লোকাদি অগ্নি স্বর্গ্য অগ্নি—বৈশ্বানর অগ্নি পার্থিব অগ্নি। সাধকের ইষ্ট-সিদ্ধির জন্য মস্তিষ্কের স্বর্গ্য অগ্নিতে ধ্যানান্নের আহুতি-প্রদান যতই আবশ্যক হউক্ না কেন—জঠরাগ্নিতে পার্থিব অন্নের আহুতি-প্রদান তাহা অপেক্ষা কম আবশ্যক নহে। বৈশ্বানর অগ্নি শেষোক্ত-জাতীয় অগ্নি। এই অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে থাকিয়া জল বায়ু মৃত্তিকাদি'কে জীবন-যাত্রার পাথেয় সম্বলে—ধান্যাদি শস্যে—পরিণত করে, এবং নরনারীগণের জঠরে থাকিয়া ভুক্ত অন্ন'কে রস-রক্তাদি প্রাণের উপকরণে পরিণত করে; তার সাক্ষী :—ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৫ম সূক্তে ৯ম ঋকে আছে "নাভি রগ্নিঃ পৃথিব্যাঃ।" [বাংলা] "অগ্নি পৃথিবীর নাভি।" বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ৯ম ব্রাহ্মণে আছে "অয় মগ্নি র্বৈশ্বানরো যোঽয়ং অন্তঃপুরুষে, যেনেদং অন্নং পচ্যতে যদিদং অদ্যতে।" [বাংলা] "পুরুষের অন্তরে এই যে অগ্নি—যাহা দ্বারা ভুক্ত-অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়—ইনি বৈশ্বানর।" ইহারই কল্যাণে গৃহস্থ সাধু-সজ্জনেরা অন্ন ভোজন করিয়া, প্রিয় দর্শন করিয়া এবং ব্রহ্মতেজে জ্বলমান হইয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকেন। তার সাক্ষী :—

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের একাদশাদি খণ্ড-পরম্পরায় লেখে যে; রাজা অশ্বপতি ছয়জন অভ্যাগত অসম্যক্ জ্ঞানী বৈশ্বানরবাদীকে একে-একে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "অত্তি অন্নং—পশ্যতি প্রিয়ং—ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চ্চসং কুলে—য এতমেবং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে।" [বাংলা] "এরূপ [অসম্যক্‌জ্ঞান-সুলভ একাঙ্গ] বৈশ্বানর আত্মাকেও যিনি উপাসনা করেন—ভোজন করেন তিনি অন্ন, দর্শন করেন তিনি প্রিয়, কুলে তাঁহার হয় ব্রহ্ম-তেজ দেদীপ্যমান।"

তৃতীয় মূর্ত্তির (অর্থাৎ অগ্নির রুদ্র মূর্ত্তির) গুণবাচক নাম তিনটি :—

রুদ্র—আন্তরীক্ষ্য বজ্রাগ্নি—রাজ-অগ্নি—পর্জ্জন্য অগ্নি। এ অগ্নি আশুতোষ মহাদেব। ইনি প্রসন্ন হইলেন যদি—তবে তাঁহার বদান্যতা দেখে কে? অচিরাৎ অমৃতোপম রসবর্ষণ করিয়া পৃথিবী-মাতাকে অন্নপূর্ণা করিয়া তোলেন। ক্ষেপিলেন যদি তবে আর রক্ষা নাই! সেই দণ্ডে ঝঞ্ঝা-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুহুর্মুহু লেলায়মান বিদ্যুৎ-রসনায় এবং গগন-বিদারক বজ্র-হুঙ্কারে পৃথিবী-মাতাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কালী করালী নৃমুণ্ডমালিনী করিয়া তোলেন। James Adam সাহেব অগ্নির এই তৃতীয় মূর্ত্তির—রুদ্র মূর্ত্তির—ছোটো খাটো একটি ছবি Heraclitusএর পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এইরূপ :—"Fire is the thunder-bolt which steers all." এই অগ্নিরই, বজ্রাগ্নিরই একটা বিরাট ছবি কঠোপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্লোকে আঁকিয়া দেখানো হইয়াছে এইরূপ :—

২য় শ্লোক॥ "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। মহদ্ ভয়ং বজ্র মুদ্যতং য এতদ্বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি।" [বাংলা] "নিঃসৃত হইয়াছে এইসব যাহা কিছু—সমস্ত জগৎ—প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মে (Logosএ) স্পন্দিত হইতেছে। এই মহদ্‌ভয় উদ্যত বজ্র'কে যাঁহারা জ্ঞানে উপলব্ধি করেন তাঁহারা অমর হ'ন।" তৃতীয় শ্লোক॥ "ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ, মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥" [বাংলা] "এই উদ্যত বজ্রের ভয়ে, অগ্নি তাপিয়া উঠিতেছে—সূর্য্য তাপিয়া উঠিতেছে—মেঘ বায়ু এবং মৃত্যু দৌড়িয়া চলিতেছে।" এই অগ্নি বেদে স্তুত হইয়াছে এইরূপ :—

"আ বো রাজানং অধ্বরস্য রুদ্রং হোতারং সত্যযজং রোদস্যোঃ। অগ্নিঃ পুরা তনয়িত্নোঃ অচিত্তাৎ (অচিত্ত=অচেতন-ভাব=মৃত্যু;—পুরা অচিত্তাৎ=মৃত্যোঃ পুরা) হিরণ্যরূপং অবসে কৃণুধ্বং॥" ঋগ্বেদ। ৪র্থ মণ্ডল। ৩য় সূক্ত। ১ম ঋক্॥ [বাংলা] "বজ্রের ন্যায় সহসা আগমন-শীল মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমরা—স্বর্গ মর্ত্ত্যের ও যজ্ঞের যিনি রাজা, যিনি অমোঘ-ফলদাতা হোতা—সেই হিরণ্যমূর্ত্তি

রুদ্র অগ্নি'কে ভজনা কর।" ঋগ্বেদের আর-এক স্থানে আছে—"ত্বং অগ্নে রুদ্রঃ। ত্বং বাতৈর্ অরুণৈ র্যাসি॥" ৪র্থ মণ্ডল। ৩য় সূক্ত। ১ম ঋক্॥ [বাংলা] "তুমি, অগ্নি, রুদ্র। তুমি অরুণ-বর্ণ বায়ুতে করিয়া গমনাগমন কর।" [টীকা॥ বায়ু ধূলি-ধূসরিত হইলে যেরূপ বিবর্ণ হয়, তাহাকেই এখানে বলা হইয়াছে অরুণবর্ণ—তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে।]

James Adam মহোদয় তাহার পরে বলিতেছেন—

"Fire, according to Herachtus, is the ever-changing substance to which alone reality belongs."

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় তৃতীয় খণ্ডের গোড়াতেই আছে "সদেব সৌম্য ইদং অগ্রে আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ং। * * * তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। তৎ তেজোঽসৃজত।" [বাংলা] "সৎই, সৌম্য, অগ্রে ছিলেন একমাত্র অদ্বিতীয়। তিনি দেখিলেন—'আমার বহু হওয়া চাই—প্রজায়মান হওয়া চাই'; তাই তেজ সৃষ্টি করিলেন।"

এইটি এখানে বিশেষমতে বুঝিয়া দেখা চাই যে, যিনি স্বরূপত একমাত্র অদ্বিতীয় never-changing substance কিনা **সৎ**, তিনি **বহু** হইবার মানসেই তেজ সৃষ্টি করিলেন; কাজেই তেজ বহুরূপী—ever-changing; আর এই যে ever-changing তেজ—এই ever-changing তেজ never changing **সৎ** হইতে—Reality-itself হইতে—টাট্‌কা-টাট্‌কি বাহির হইয়াছেন বলিয়া ইহার (অর্থাৎ এই ever-changing তেজের) realityর তুলনায় আর-আর বস্তুর reality realityই নহে। এই বেদোপনিষদের অভিপ্রায়-সঙ্গত সৃষ্টির গোড়া'র রহস্যটি Heraclitusএর না-জানা ছিল এমন নহে, তাই তিনি বলিয়াছেন "Fire is the ever-changing substance to which alone reality belongs." James Adam মহোদয় তাহার পরে কি বলেন দেখা যা'ক;—একি দেখি! আমাদের শাস্ত্রে যাহা বলে—এযে দেখি সেই **কথাটি** অবিকল! তিনি বলিতেছেন

"The path of change he (অর্থাৎ Heraclitus) calls the 'way up and down.' Fire sinks through water into earth; and earth rises through r into fire."

এযে দেখি সাংখ্যের অনুলোম-প্রতিলোম পদ্ধতি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী। Heraclitusএর এই সংক্ষিপ্ত বচনটির গাত্র হইতে ইংরাজি কোর্ত্তা পায়জামা ছাড়াইয়া লইয়া উহাকে এ দেশীয় দুকূল-বস্ত্র পরিধান করাইলে উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহজ মূর্ত্তি ধারণ করে কেমন দেখ চমৎকার! ☞ অনুলোম ক্রমে—অগ্নি জলে—জল পৃথিবীতে পরিণত হয়। প্রতিলোম ক্রমে—পৃথিবী জলে—জল অগ্নিতে বিলীন হয়।

জিজ্ঞাসু॥ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড হইতে আপনি যাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন, তাহাতে কেবল পাইতেছি—সৎ হইতে তেজ বা অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু Heraclitusএর পুস্তকের খণ্ড-পত্র হইতে (fragment হইতে) Adam সাহেব যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পাইতেছি—অগ্নি জলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করে। এ দুই কথার মধ্যে ঐক্য তো কিছুই আমি দেখিতে পাইতেছি না।

প্রবোধয়িতা॥ ও দুই কথার মধ্যে ঐক্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে তাহা ঐক্যের পূর্ব্বাভাস মাত্র—অরুণোদয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে তোমার মনের ক্ষোভ না মিটিবারই কথা। ঐক্য কাহাকে বলে—তাহার যদি একটি সেরা নমুনা দেখিতে চাও, তবে নিম্নে প্রণিধান কর।

ছান্দোগ্য উপনিষদের যে স্থানটির শিরোভাগ মাত্র একটু পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে, তাহার সমগ্র অবয়বের অপরাপর অংশ বাদে শুদ্ধ কেবল প্রদর্শনীয় অংশগুলির মালা গাঁথিয়া পাইতেছি আমরা এইরূপঃ—

(১) "সৎ ঐক্ষত বহু স্যাং। তৎ তেজোঽসৃজত। (২) তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং। তদপোঽসৃজত। (৩) আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম। তা অন্নং অসৃজন্ত (পৃথিবী-লক্ষণং ইতি শাঙ্করভাষ্যে)।" [বাংলা] "**সৎ** দেখিলেন—আমার বহু হওয়া চাই, তাই তেজ সৃজন করিলেন। **তেজ** দেখিলেন—আমার বহু হওয়া চাই, তাই জল সৃজন করিলেন। **জল** দেখিলেন—আমার বহু হওয়া চাই," তাই পৃথিবী-লক্ষণাক্রান্ত অন্ন সৃজন করিলেন।

বেদশাস্ত্রে এই যাহা বলা হইয়াছে **বেদোচিত** ভাষায়, দর্শনশাস্ত্রে ঐ কথাটিই বলা হইয়াছে দর্শ-

নোচিত ভাষায়; বলা হইয়াছে—অনুলোম-ক্রমে অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ঐ কথাটিই, আবার, Heraclitus বলিয়াছেন **যবনোচিত** ভাষায়; বলিয়াছেন "Fire sinks through water into earth." ঐক্য তো আর গাছে ফলে না—ঐক্য ইহারই নাম। ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত।

স্পষ্ট এই তো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বেদোপনিষদের অভিপ্রায়-মতে ভূর্ভুবঃস্বঃ, হরিহর ব্রহ্মা, **সবই** অগ্নি। কিন্তু হায়—পণ্ডিতবর James Adam অমন-একটা জলজ্যান্ত ঐতিহাসিক সত্য ঘুণাক্ষরেও দেখিতে পাইলেন না! আর, তাহা দেখিতে **না-পাওয়ার** গুণে (বা দোষে) নিমীলিত-চক্ষু শা-মোরোগের ন্যায় ভয়-শূন্য হইয়া Heraclitus-এর অসামান্য মৌলিকতা সমর্থন করিবার চেষ্টায় বক্তৃতা'র ফোয়ারা ছুটাইয়াছেন **এমি উচ্ছৃঙ্খল বেগে** যে, তাহার তোড়ের মুখে অকৃত্রিম সত্য-কথার দাঁড়াইতে পারা অসাধ্য হইত—যদি **সত্য** বালি'র বাঁধ হইত। কিন্তু **সত্য** বজ্রের বাঁধ! **সত্য** অটল এবং অজেয়। উক্ত ইংরাজ মহোদয়ের প্রবল প্রতাপান্বিত বক্তৃতার তোড়ের মুখে, দেখুন তবে, আমি দুইটি অকৃত্রিম সত্য-কথা দাঁড় করাইতেছি **আড়ম্বর-শূন্য বিনীত বেশে**; দুইটির কোনোটিকে যদি তিনি তিল মাত্রও নড়াইতে পারেন তবে আমার কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা! সত্য কথা-দুটি বিষয়টাই বা কি, আর তাঁহার সন্ধান পাইলামই বা আমি কেমন করিয়া—সমস্তই খোলাসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন।

ভারতান্ধ শ্রেণীর পুরাতত্ত্ব-বেত্তাদিগের দোকান-সাজানিয়া কথায় **আর যিনি** ভোলেন ভুলুন, **আমি** কিন্তু তাহাতে ভুলি না এইজন্য—যেহেতু উঁহাদিগকে **আমি** যেমন চিনি, এমন আর কেহই না। তাই উঁহাদের কথায় আদবেই কর্ণপাত না করিয়া—যে-কথাটির প্রতি মিনিট্‌ দশেক ঠাহর করিয়া দেখিয়া আমার মন বলিল "এইটিই সম্ভবে", সেই কথাটির সমুচিত প্রমাণ সংগ্রহ করিবার মানসে—করিলাম আমি একটি-অতি সুবুদ্ধির কার্য্য:—আমার একজন শ্রদ্ধেয় পরম বন্ধু*, যিনি শান্তিনিকেতনের ক্রোড়স্থিত ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক এবং যাঁহার মতো বেদবিদ্যা-বিশারদ সুপণ্ডিত আর একজন খুঁজিয়া পাওয়া ভার, তাঁহাকে বিহিত সৎকারের সহিত পথপ্রদর্শক পদে বরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রের দেবতাধিষ্ঠিত নিভৃত গুহায় খালি-পায়ে ভক্তিনম্র শরীরে সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কী? দেখিলাম যে অগ্নির প্রভাব-মাহাত্ম্যের সম্বন্ধে এমন একটিও নূতন কথা Heraclitus বলেন নাই যাহা বেদে বলে না। তখন আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বেদবিত্তম সাধু মহাত্মাটিকে বলিলাম "দেখিলেন তো ব্যাপারটা! এখন Heraclitus-এর প্রকল্পিত অগ্নিব্রহ্ম-বাদের গোড়ার বৃত্তান্তটির সম্বন্ধে আপনার বিচারে যাহা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহা আমাকে ব্যক্ত করিয়া বলুন।" তিনি বলিলেন "Heraclitus আমাদের দেশের বৈদিক অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।" এই গেল প্রথম সংখ্যক অকৃত্রিম সত্য-কথাটির বিবরণ বার্ত্তা। দ্বিতীয় সংখ্যক সত্যকথাটির বিবরণ-বার্ত্তা ইহা অপেক্ষা আরো আশ্চর্য্য;—তাহা বলিতেছি প্রণিধান করুন।

কতিপয় সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি একদিন আনমনে ছান্দোগ্য উপনিষদের পাতা উল্টাইতেছি, আর, সময়ে-সময়ে চক্ষের সামনে যাহা পাইতেছি তাহার কতক কতক খণ্ডাবয়ব হেলা-ক্রমে আওড়াইতেছি;—হঠাৎ "প্রত্যঙ্ অগ্নিং আচমেৎ ন নিষ্ঠীবেৎ তদ্‌ব্রতং" [বাংলা] "ব্রত এই—(সাধক) অগ্নির প্রত্যভিমুখে আচমন করিবেন না (আঁচাইবেন না), নিষ্ঠীবন করিবেন না (অর্থাৎ থুতু ফেলিবেন না)" এই বচনটি যেই আমার চক্ষে পড়িল, আর অমি Archimedes-এর ন্যায় আহ্লাদে গদগদ হইয়া "পাইয়াছি" বলিয়া লাফাইয়া উঠিলাম।†

পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে এটা জানেন সকলেই—যে, "অগ্নির প্রত্যভিমুখে কেহ নিষ্ঠীবন করিবেন না" এই নিষেধ-বচনটি পিথাগোরীয় বিধান-শাস্ত্রে বেদবাক্যের

* সংস্কৃত ভারতীর কাণ্ডারী এবং কবীর-ভারতীর ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন।

† ছান্দোগ্য উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১২শ খণ্ডের সর্ব্বশেষের বচনটি দেখ।

মতো অলঙ্ঘনীয়; এটা কিন্তু জানেন না উঁহাদের **এক ব্যক্তিও** যে, ঐ নিষেধ-বচনটি "বেদবাক্যের মতো" শুধু না—উহা **বেদবাক্য**-ই। কিযে শুভক্ষণে আমি ছান্দোগ্য উপনিষদের একখানি জরাজীর্ণ পুরাতন পুঁথি হাতে লইয়া বিশেষ-কোনো-কারণ ব্যতিরেকে, শুধু-শুধু, তাহার পাতার পর পাতা উল্টাইতে বসিয়া গেলাম—দৈবের এ লীলা বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য! যাহাই হো'ক্ না কেন—এখন-আর আমি পুরাতত্ত্ববেত্তাদিগের সভার মাঝখানে একথা বলিতে একটুও ভয় করি না যে, পিথাগোরীয় শাস্ত্রের ঐ নকল বেদবাক্যটি আসল বেদবাক্যেরই **প্রতিধ্বনি**। আমার বেদবিদ্যা বিশারদ শ্রদ্ধেয় বন্ধু-মহাত্মাটির মুখের প্রতি সহাস্যবদনে চাহিয়া তাঁহাকে আমি বলিলাম "এইবার পিথাগোরাস্ বমাল-সুদ্ধ ধরা পড়িয়াছেন! আপনার কী মনে হয়?" তিনি বলিলেন "দেখিতেছি—অ্যাকা কেবল Heraclitus নহে—Heraclitus এবং Pythagoras উভয়েই বৈদিক অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—ইহা একটুও মিথ্যা নহে।" সাধু-মহাত্মাটির এই কথা শুনিয়া আমার উৎসাহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল **এমি** যে, আমি বলিলাম, "পিথাগোরীয় শাস্ত্রে আর-একটি নিষেধবচন আছে—সেইটি যদি আপনি বেদের মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিতে পারেন, তবেই আমি বলিব যে, আপনি যথার্থই কাশীতে দশবারো বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন—না যদি পারেন, তবে বলিব যে, আপনার বেদাধ্যয়ন কেবল অধ্যয়নই সার! নিষেধ বাক্যটি সে—আর কিছু না 'কেহ মাষ-ভক্ষণ (bean-ভক্ষণ) করিবেন না' **এইমাত্র**।" বেদবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক-মহাত্মা বলিলেন "যে-নিষেধবাক্যটির কথা আপনি বলিতেছেন—তাহা যজুর্বেদের অমুক অমুক স্থানে আছে ইহা আমি নিশ্চিত জানি; দুঃখের বিষয় এই যে, যজুর্বেদের পুস্তকখানি আমার কাছে নাই। খুব সম্ভব যে, কলিকাতার কোন-না-কোনো সুবিখ্যাত-পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া যাইতে পারে।" আমি বলিলাম "তবে শুভস্য শীঘ্রং।" অধ্যাপক মহাত্মা দিন-চারপাঁচ পরেই কলিকাতায় রওনা হইলেন, আর তাহার দুই দিন পরেই তাঁহার থলির মধ্য হইতে দুইটি বেদোক্ত নিষেধ-বচন বাহির করিয়া আমার হর্ষোৎফুল্ল বিস্মিত নয়নের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। সে-দুটি বেদ-বচন এই:—

"ন মাষাণাম্ অশ্নীয়াদ্ অযজ্ঞিয়া বৈ মাষাঃ।"
মৈত্রায়ণী সংহিতা (যজুর্বেদ)
১ম অধ্যায়। ৪র্থ স্থানক। ১০ম বচন।

[বাংলা] "সাধক মাষ ভক্ষণ করিবেন না—মাষ অযজ্ঞীয় অর্থাৎ দেবতার্থে ব্যবহার-যোগ্য নহে।"

পুনশ্চঃ

"ন মাষাণাম্ অশ্নীয়াদ্ অমেধ্যা বৈ মাষাঃ।"
কাঠক সংহিতা (যজুর্বেদ)।
যজমান ব্রাহ্মণ। ৩২শ স্থানক। ৭ম বচন।

[বাংলা] "সাধক মাষ ভক্ষণ করিবেন না—মাষ অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র।"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া ও ওঠা-নামা

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

গোড়া হইতেই আমি পাঠককে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, যে,—বর্ণভেদপ্রণালীর গঠনের কাঠামটা অপরিবর্ত্তনীয়, উহা অলঙ্ঘ্য ছোট-ছোট বেড়ার ঘেরে রুদ্ধ, বেশ সুবিবেচিত ও সুসমঞ্জসীভূত অংশে বিভক্ত—যাহার অক্ষুণ্ণ অখণ্ডতা সুনির্দ্দিষ্ট মানমর্য্যাদার দ্বারা চিররক্ষিত—এই যে একটি ভ্রান্ত ধারণা ইহা যেন কদাপি মনোমধ্যে পোষণ করা না হয়। আমি এই বিষয়ের আলোচনায় পুনরায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে স্থিরনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষণের বর্ণনা করায় পাঠকের ধারণা ভ্রান্তপথে নীত হইবার আশঙ্কা আছে, তাই অন্তত এমন কতকগুলি তথ্যের ক্রিয়া-ফল দেখান আবশ্যক, যাহা এই বর্ণভেদতন্ত্রের বিশাল গঠনের মধ্যে,—একটা বৈচিত্র্যের, একটা সচলতার, একটা জীবনের পরিচয় দেয়। একদিকে নবীকরণের একটা আন্দোলন এই জাতের গঠনটিকে অনবরত নাড়া দিতেছে,—পরিবর্ত্তিত করিতেছে; আবার অপরদিকে নির্দ্দিষ্ট মর্য্যাদা-সোপান-বিন্যাসের যে তত্ত্বটি জাতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে,

তাহা উহার সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ববিধানে সহায়তা করিতেছে। এই দুই বৃহৎ প্রবাহ, জাতের উপর দিয়া, পরস্পর উল্টা দিকে চলিয়াছে।

যাহারাই হিন্দুসমাজকে নিকট হইতে নিরীক্ষণ করিয়াছে তাহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, ভিতরের গঠন-সম্বন্ধে, পরম্পরাসম্বন্ধে ব্যবসায়সম্বন্ধে একটা "যাওয়া-আসা" নিয়ত চলিয়াছে। একজন সূক্ষ্মদর্শী এমন কথাও বলিয়াছেন যে, উত্তরাধিকারিত্বই যদি পরবর্ত্তী বংশের বিশেষাধিকার লাভের অনুকূলে একটা যুক্তিসঙ্গত অনুমানের হেতু হয়, তবে ইহা একটা সামান্য অনুমানমাত্র বলিতে হইবে; অশেষ প্রকার অবস্থা এই অনুমানকে একটু রূপান্তরিত করে, অশেষ প্রকার অবস্থা এই অনুমানের মধ্যে অবরুদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যে-সকল দলিলপত্র আমাদের হস্তাধিগত, তাহার মধ্যে যে-কোন দলিল খুলিয়া দেখিলেই, প্রমাণস্বরূপ এমন-সকল তথ্য, নিদর্শন বা উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে করিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, এই পাশাপাশি ও জড়াজড়ি ভাবে অবস্থিত জাতের জগৎটায় একটা যুগল-আন্দোলন অবিরাম চলিয়াছে—একটা 'ভাঙ্গন', আর একটা 'পুনর্গঠন'।

ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাট এই জাতি-সাধারণ নামে পরিচিত বড় বড় জাতগুলা, আসলে ধরিতে গেলে, কতকগুলা জাতের সমষ্টি; বাস্তবিক একতা যাহা দেখা যায় তাহা উপবিভাগগুলির মধ্যে, উপ-জাতদিগের মধ্যে, গোষ্ঠীদের মধ্যে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই কথাটা স্মরণে রাখা আবশ্যক।

রাজপুত নামটা একটা সম্মানসূচক নামমাত্র—উহার অন্তর্ভূত এরূপ অসংখ্য শাখাজাতি, ও জাত রহিয়াছে,—যাহারা উৎপত্তির সম্বন্ধে, ব্যবসায়সম্বন্ধে, প্রথাসম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পঞ্জাবের জাঠেরা যে খুব ভিন্ন দেশীয় লোকের সংমিশ্রণ, ইহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কোন জাঠকে জাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তার উত্তরে সে তার গোত্রের পরিচয় দেয়। এরূপ উত্তর দেওয়া জাটের পক্ষে অসঙ্গত নহে, কেননা গোত্রই তাহার প্রকৃত দেশ।

এই উপবিভাগগুলির আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া থাকে। নামগুলা ভিন্ন হইয়া যায়, ভেদবুদ্ধি নিজকার্য্য চালাইতে থাকে। এইরূপেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে, "দল", "সমাজ", "মেল" এই-সব নামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়িয়া উঠিয়াছে; কোন স্থান-বিশেষের নিকটে গোড়ায় আসিয়াছিল বলিয়াই হউক অথবা কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি উহাদের মধ্যে কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল বলিয়াই হউক, ঐ-সকল জাত এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়, এই দলের লোকদিগের জাতের দিগন্তসীমাটা শীঘ্রই রুদ্ধ হইয়া যায়। এই ছোট ছোট দলের মধ্যেই সংস্কারকের, নব প্রবর্ত্তকের একটা উপাদান রহিয়াছে—এই উপাদানের মধ্যবর্ত্তিতা-যোগে, ধীরে ধীরে সাবধানে, নূতন আচার-ব্যবহারগুলা ক্রমশঃ ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ও সেই সঙ্গে পুরাতন সংস্কার ও পুরাতন অভ্যাসগুলা ক্রমশঃ স্বস্থানচ্যুত হয়। ইত্যবসরে ইহার প্রথম পরিণামেই উপবিভাগগুলা জাতগুলা আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ কতকগুলা উপবিভাগ গড়িয়া উঠে, কিন্তু সংখ্যার হিসাবে উহারা বড়ই দুর্ব্বল; সকলরকম ছোটখাটো পরিবর্ত্তনের দ্বার এতটা মুক্ত ও বিস্তৃত যে, এরূপ উপবিভাগস্থাপনের পক্ষে কোন এক ক্ষুদ্র দলের মতামতই যথেষ্ট।

কোন একটা বিশেষ আচার-ব্যবহার হইতে একটা নূতন জাতের উদ্ভব হইতে পারে। উহার মধ্যে অন্য উপাদানও আছে। প্রথমেই, ভৌগোলিক ভাগ-বণ্টন। উত্তর ভারতের জৈনগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, উহারা ছয় জাতে গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যে ব্যবসায়-গত কোনপ্রকার ভেদাভেদ লক্ষিত হয় না। স্থানান্তরযাত্রা-কালে, আদিম গুঁড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন এক শাখা প্রায়ই একটা বিশেষ-জাতে পরিণত হয়।

স্বকীয় উৎপত্তিসম্বন্ধে যাহারা কতকগুলি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট স্মৃতিকথা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ-দিগের মধ্যে এই তথ্যটির যেরূপ স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এমন-আর কোথাও না। সোপানের সকল ধাপেই ইহা সপ্রমাণ হয়।

ধর্ম্মও ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। যদিও ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তিত বিরুদ্ধ চেষ্টাকে জাত ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, তথাপি

ইহা নিশ্চিত,—ভারত-আক্রমণ করিয়া ইস্লামধর্ম্ম, যে সব স্থানে পাকা-রকম আড্ডা গাড়িয়াছে, সেইসব স্থানে, ইস্লামধর্ম্ম এই সম্বন্ধে কতকটা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে, অনেক ব্যবসায়ী-শ্রেণী, কতকগুলি হিন্দুজাতিতে এবং কতকগুলি মুসলমানজাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কেবল শুচিতা বিষয়ক ধারণার পার্থক্য—ভিন্নধর্ম্মগুলীর বিশিষ্টতাকে একেবারে রহিত করিতে না পারুক, তাহার বন্ধন কতকটা শিথিল করিয়া দিয়াছে, উহার ভিতরে সত্যকার কতকগুলি বিচ্ছেদ উৎপাদন করিয়াছে। আর, এটা বেশ মনে হয় যে মুসলমানের ভারত-বিজয়, জাতের বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে যোদ্ধার জাতকে সাদাসিধা শাখা জাতির অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। শিখের ধর্ম্মপ্রচারও অনেকগুলি জাতের ক্রমবিকাশে সহায়তা করিয়াছে। শিখ-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া, কোন কোন জাত স্বকীয় সামাজিক পদমর্যাদা উন্নত করিবার উপায় লাভ করিয়াছে। তাহাদের এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক, কেননা, শাস্ত্রতঃ শিখ-ধর্ম্মের ভিতর বর্ণচ্ছেদের কোন প্রকার ধারণা নাই। তা ছাড়া স্পষ্ট দেখা যায়, জাতের উচ্চতম সোপানে এইরূপ আরোহণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে, যাহা নীচ ও মর্য্যাদাহানিকর বলিয়া খ্যাত এইরূপ কতকগুলা কাজ একেবারেই পরিত্যাগ করা হয়। অবশ্য কতকটা ন্যায্য বলিয়া ইহা সমর্থিত হইতে পারে। অনার্য্য জাতিগণের কতকগুলা উপধর্ম্মেরও প্রভাব এইক্ষেত্রে দেখা যায়। সত্য কি না বলিতে পারি না, কিন্তু কতকগুলি সুযোগ্য বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেন ওঝা-পুরোহিতের কতকগুলি বিভাগকে ব্রাহ্মণ উপাধি দিয়া ব্রাহ্মণমণ্ডলীভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যেমন মনে কর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ওঝা-ব্রাহ্মণ, আরো অন্যান্য ব্রাহ্মণ; উহাদের উৎপত্তিস্থানটা উহা অপেক্ষা বেশী গৌরবোজ্জ্বল নহে।

প্রকৃতপক্ষে যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যায়, সেই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত অনেকগুলি জাত ও উপজাত, ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক কলা বিচ্ছেদ হইতে স্বকীয় বিশেষত্ব ও নিজত্ব লাভ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়েৎরা শৈবসম্প্রদায়ের লিঙ্গপূজার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এক বিশেষ-শ্রেণী গড়িয়া তুলিয়াছে। লিঙ্গায়েৎরা যে কারণেই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হউক না কেন, প্রধান বিভাগ জঙ্গমেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হেতুবশতই, পৌরোহিত্যের কার্য্য উপলক্ষেই, পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও স্বীয় প্রাধান্য দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বহুকাল হইতেই ভারতে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রচুর বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। এই উদ্ভিজ্জ-সুলভ প্রাচুর্য্য রহিত হওয়া দূরে থাক, প্রায় বৎসরে-বৎসরেই নূতন সম্প্রদায় গজাইয়া উঠিতেছে। তবে একথা ঠিক্, ঐ-সকল নূতন সম্প্রদায়কে, আবার হিন্দুধর্ম্মই উদরসাৎ করিয়া লয়। হিন্দুধর্ম্মটা বহু উপাদানে নির্ম্মিত হইলেও, সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া খ্যাত। সাধারণতঃ অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবিশিষ্ট এই-সকল ধর্ম্মান্দোলন হইতে শুধু কতকগুলা সন্ন্যাসীর দল উৎপন্ন হয়। কঠোর তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য তাহাদের জীবনের ব্রত হওয়ায়, জাতের প্রধান নিয়ম যে কুলক্রমিকতা, তাহা বর্জ্জিত হয়। স্বেচ্ছাব্রতী লোকের দ্বারাই এই-একল সম্প্রদায়ের দলপুষ্টি হয় এবং অন্যজাতের লোকদিগকেও গ্রহণ করা হয়। তথাপি এইরূপ কতকগুলি সম্প্রদায়ের ভিতর স্ত্রীপুরুষ উভয়ই থাকায় খুব সীমাবদ্ধ হইলেও উহারা কতকগুলি কৌলিক জাতে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত যথা:—পুনায় "অরাদি" ও "ভারাদি"। "বৈরাগী" দলের লোকও অনেক; উহারা প্রকৃত জাতের মতো কতকগুলি উপ-বিভাগে বিভক্ত; কিন্তু এখনো ঠিক কৌলিক জাতে পরিণত হয় নাই।

গোসাঁইদের ভিতর জাতের ক্রমবিকাশটা আর-একটু বেশী অগ্রসর হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা থাকায় উহারা এক্ষণে রীতিমত আনুষ্ঠানিক জাতে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা:—পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিকানীয়ারের এক রাজপুত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্জাবের "বিষ্ণবী" সম্প্রদায়ের ন্যায় অন্য কতকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন লক্ষণ বা নিয়ম আদৌ নাই। কোন নূতন মতের আধিপত্য-প্রভাবে, কতকগুলি লোক স্বকীয় পুরাতন দলকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবসায়সম্প্রদায় গড়িয়া তুলে, তাহারই এক দৃষ্টান্ত উক্ত সম্প্রদায়গুলি হইতে পাওয়া যায়।

জাতের ভিতর, এই যেসব আন্দোলন উৎপন্ন হইয়া জাতের বর্ত্তমান অবস্থাকে ক্রমাগত বদলাইয়া তুলে,

ঐ-সব আন্দোলন হয় ব্যক্তিগত নয়, সমাবেতচেষ্টা-প্রসূত। শক্তিশালী লোকের আশ্রয়ের জোরে, অথবা ছলে কৌশলে, মিথ্যাবাদ বা উৎকোচদানে কতকগুলি লোক বিভিন্ন জাতের মধ্যে কোন্-প্রকারে ঢুকিয়া পড়ে; যেখানে জাতের নিয়মের ততটা কড়াক্কড়ি নাই, ভারতের সেই সীমান্ত দেশে বিশেষরূপে এইরূপ ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কোন সর্দ্দারের খেয়াল অনুসারে সকল জাতের মধ্য হইতেই কতকগুলি লোককে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ কোন জাত—যাহার ভিতর নিয়মের ততটা আঁটাআঁটি নাই—অবস্থা-বিশেষে, নব-আগন্তুককে আপনাদের মধ্যে লইবার জন্য সহজেই দ্বার খুলিয়া দেয়। এইরূপ কতকগুলা যাযাবর বা দুর্দ্দান্ত শাখাজাতি, কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই স্বীয় সহচরদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লয়।

ন্যূনাধিক দৃঢ়বদ্ধ লোকসমষ্টির দ্বারাই এই-সকল লাক্ষণিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

এই-সকল পরিবর্ত্তন দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক মর্য্যাদা-সোপানের উচ্চতর ধাপে উঠিয়া কোন কোন জাত গড়িয়া উঠিয়াছে; আরও অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক জাত যাহারা ঘটনাচক্রে পড়িয়া কয়েক ধাপ নামিয়া পড়িয়াছে, তাহারা স্বকীয় অবনতি মাথা পাতিয়া অগত্যা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যিক প্রণালী-অনুসারে, যেসকল নিয়মে জাত নিয়মিত হয়, সেই শুদ্ধাচারের নিয়ম, পারিবারিক নিয়ম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যেই জাতিরূপ যাঁতার কেন্দ্রকীলকটি অবস্থিত—সেই কীলককে বেষ্টন করিয়াই জাতিঘটিত সমস্ত আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চলিয়া থাকে।

স্বল্প-সভ্য আদিমনিবাসী লোকেরা ক্রমশ হিন্দু হইয়া পড়িতেছে। উহারা যে প্রকরণ-অনুসারে হিন্দুধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর আস্তে-আস্তে প্রবেশ লাভ করে তাহা লায়াল সাহেব বেশ নিপুণভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। আবার রিজলীও বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের চারি আদর্শ-ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন। কতকগুলি দলপতি,—ভূসম্পত্তি ও তৎসংলগ্ন প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়া, ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেরা উহাদের জন্য একটা বংশাবলী ও একটা পৌরাণিক উৎপত্তি-স্থান রচনা করিয়া দেয়। অথবা কতকগুলি আদিমবাসী স্বকীয় আদিম নাম পরিত্যাগ করিয়া, কোন হিন্দুধর্ম্মসম্প্রদায়ের ক্রোড়ে আপনাদিগকে নিঃক্ষেপ করে। অথবা কোন সমগ্র শাখা-বংশ, হিন্দুধর্ম্মের পতাকাতলে আসিয়া একটা নূতন জাত গড়িয়া তুলে; অথবা ক্রমবিকাশটা ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, এবং নাম পরিবর্ত্তনের দ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। সব ক্ষেত্রেই, হিন্দু উৎসব, হিন্দুধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত ও বিবাহের অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ এবং স্বীয় বংশের দীক্ষাগুরু ও পুরোহিতরূপে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করা—এই-সমস্তই উচ্চতর ধাপে উঠিবার সুস্পষ্ট নিদর্শন। চারিদিক হইতেই ইহার রাশিরাশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্য-ভারতের "মিনা"রা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের "বাগ্রি"রা, উড়িস্যার "গোঁদ" ও "সান্তিয়া"রা—আরও কত আছে কে জানে। অনেকগুলি রাজপুত-গোত্র কি করিয়া অনার্য্য-শাখাজাতির নাম গ্রহণ করিল, এইরূপে তাহার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; নিশ্চয়ই এইরূপেই উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূসম্পত্তিলাভে সামাজিক মর্য্যাদাবৃদ্ধির সঙ্গে, পঞ্জাবের অনেক রাজপুত, গোত্র ও জাতের ধ্বংসাবশেষে যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

হিন্দুদের মধ্যে থাকিয়া যে সকল জাত বহুকাল যাবৎ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ "আহিরে"রা প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া, কতকগুলা সমাজসংস্কার সাধন করিয়া, রমণী-দিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিয়া ও বিধবাবিবাহ রহিত করিয়া, একটা বিশেষ জাতে পরিণত হইয়াছে। যে-সকল চামার হীন চামড়ার কাজ পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রবয়নের কাজ ধরিয়াছে তাহারা "জোলা-চামার" হইয়াছে। তারা উত্তম জোলার সমস্ত অধিকার পূর্ণরূপে উপভোগ করে। কতকগুলি শুভ্র মেতরের কাজ ছাড়িয়া "মৌরল্লি" জাতে পরিণত হইয়াছে। আর অধিক দৃষ্টান্ত নাই।

আবার অধিকাংশস্থলে ইহার গতি উল্টাদিকেই দেখা যায়। উড়িষ্যায় করণ-জাতের জারজ সন্তানেরা একটা বিশেষ গোষ্ঠীরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐ উড়িষ্যা প্রদেশেই "চত্তর খাই" নামে এক জাত আছে যাহারা দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী সাহায্য-পাকশালায় অন্নগ্রহণ করিয়া নিজের

মানমর্য্যাদা খোয়াইয়াছিল, সেই বিভিন্ন জাতের লোক এই চত্তর থাই জাতের অন্তর্ভুক্ত। নবাগতদিগের পূর্ব্ব-স্বাত-অনুসারে উহারা শীঘ্রই আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যজ্ঞসূত্রের অধিকার ও ব্যবহার সমস্ত বজায় রাখিয়া যে-সকল ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য শ্রেণীদিগের পৌরোহিত্য করে তাহারাও নিন্দনীয় হয়। অন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে স্পর্শসংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর ন্যায় পৃথক করিয়া রাখে। লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে কম মারাত্মক ব্যাপার নহে। দেখা যায়, "ঠাভি", 'ধুনসার' ও ধুনসারেরা যে-উপাধির বলে বহুদিন সম্মান ভোগ করিয়া আসিয়াছিল, এই-সকল নিয়ম লঙ্ঘন করায় তাহারা সেই উপাধি পর্য্যন্ত হারাইয়াছে। পঞ্জাবের "টাগা"রা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করে, তাহাদের রমণীদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখে, উপবীত ধারণ করে—এ-সব সত্ত্বেও তাহারা চোরের জাত ছাড়া আর কিছুই নহে। রাজপুত বনিয়া ও অন্যান্য জাতের মধ্যেও এইরূপ অধঃপতন যে সহজেই ঘটে তাহা বেশ কল্পনা করা যায়। আর তালিকা বাড়াইয়া কোন ফল নাই।

যে-সকল উপকরণে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দলের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা হইতে বুঝা যায় কি-কি প্রধান নিয়মে ব্রাহ্মণ্যিক শাসনতন্ত্র নিয়মিত হইয়া থাকে। এই শাসনতন্ত্র ছোটখাটো বিষয়েও খুব কড়াক্কড়। তবে ইহা তেমন অপরিবর্ত্তনীয় নহে। কোন-কোন প্রদেশে গোড়ায় যে শ্রেণীর উৎপত্তিস্থান অন্যরূপ ছিল, কোন বিশেষ অবস্থা, বিশেষত ঐতিহাসিক ঘটনা সেই শ্রেণীর কোন অগ্রণীকে শক্তিমান করিয়া তুলিয়া, সেই শ্রেণীকে উচ্চতর ধাপে উঠাইয়া দিয়া, সাধারণ নিয়ম-সামঞ্জস্যের একটু ব্যতিক্রম করিতেও পারে। এমন কি পুণার কুনবীরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

কুনবী জাতের অন্তর্ভূত শিবাজি, যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাকার্য্যে মহা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, তিনি ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান রাখিতেন। কিন্তু সমস্ত ধরিতে গেলে,—বিবাহ, বাহ্যশুচিতা, ব্যবসায় ও আনুষঙ্গিক আচার অনুষ্ঠানসম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের যে অনুশাসন, সেই অনুশাসন যে-জাত যে-পরিমাণে পালন করিয়া চলে, সেই পরিমাণে সেই জাতের শ্রেষ্ঠতা। সর্ব্বোপরি, ব্যবসায় ও আহারাদি সম্বন্ধীয় অশুচিতাই কোন নীচ জাতের নীচত্বের মুখ্য হেতু; এই জন্যই উহারা অস্পৃশ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। নীচ অস্পৃশ্য জাতের সহিত কোন-প্রকার সম্পর্ক রাখিবে না প্রতিপদে এই নিষেধ নিয়মটা রক্ষা করিয়া চলায়, প্রত্যেক জাতের সঙ্কোচ-বোধটা খুবই সজাগ রহিয়াছে।

একটা বিশেষ লক্ষণ এই দেখা যায়,—বিভিন্ন জাতির ভিতর সাধারণতঃ একটা অসার গর্ব্বের ভাব রহিয়াছে;—সকলেই ব্রাহ্মণ্যিক প্রণালীর অন্তর্ভূত ক্ষত্রিয়ের সহিত, বৈশ্যের সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনের দাবী করে। অথচ এই বন্ধন-সূত্রের (অন্তত বর্ত্তমানকালে) কোন-প্রকার বাস্তবতা নাই। ইহার মূলে, প্রাচীন প্রথাগত কোন খাঁটি রক্তমের প্রামাণিকতা নাই। সমগ্র পুরোহিত ও শাসনতন্ত্রের ন্যায়, ইহা পৌরোহিতিক মতবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও গঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের প্রাধান্যই যে সমস্ত-অনুশাসনের চূড়ান্ত কথা, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্রাহ্মণেরাই যে সর্ব্বপ্রকার অধিকারের সুবিধা উপভোগ করে, অনেক সময় অযথা ও অসঙ্গত সম্মান লাভ করে, তাহা অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-জাতের আধিপত্য ও মানসম্ভ্রমই যে হিন্দুধর্ম্মের সুনিশ্চিত পরিচায়ক লক্ষণ তাহা অতিশয়োক্তি না করিয়া জোরের সহিত বলা যাইতে পারে। এই ভাবটা এত প্রবল যে, যে-সকল জাতের বিরুদ্ধে অনেক রকম কুসংস্কার আছে, যে-সকল জাত বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার পাত্র, তাহারাও এই ভাবটি পোষণ করিয়া থাকে; কেননা তাহারাই সব-চেয়ে ব্রাহ্মণের আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কতকগুলি জাত, যতই নীচ হউক না কেন, তাহারা যদি ব্রাহ্মণের নিকট যাতায়াত করে, যদি তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে,—যাহারা ব্রাহ্মণের সহিত কোন কারবার রাখে না, তাহাদিগের অপেক্ষা উহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ এই নামটাই একটা উচ্চ রকমের উপাধি। যে সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগকে, উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণেরা অবজ্ঞা করে, তাহারাও

শুধু এই ব্রাহ্মণ নামের দরুন, জনসাধারণের নিকট হইতে গভীর সম্মান লাভ করিয়া থাকে।

"ভূদেবতাদের" প্রতি এই যে সম্মান প্রদর্শিত হয় একমাত্র উঁহারাই ধর্ম্মগুরু—এই বলিয়া নহে। এই ভক্তি এমন সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিও প্রযুক্ত হয়—যাহাদের নিত্য-কর্ম্ম বা ব্যবসায় তাহাদিগকে এরূপ কোন-প্রকার উচ্চ অধিকারের উপাধি প্রদান করে না। এই সম্মান,—ঠিক-মতো বলিতে হইলে—এই ভক্তি সকল-রকমের সন্ন্যাসী, ও পণ্ডিত, আচার্য্য প্রভৃতির প্রতি প্রদর্শিত হইয়া থাকে অথচ উঁহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ নহে। ইহার বিপরীতে, যে বিধর্ম্মী সম্প্রদায় অনায়াসেই ব্রাহ্মণদিগের হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, যাহাদের জাত সম্বন্ধে কোন প্রকার অন্ধসংস্কার নাই,—সেই জৈনেরাও এমন-কি মুসলমানেরাও সেই ব্রাহ্মণকে ভক্তি-ভাবে প্রণাম করে। উঁহারা নিজের ধর্ম্মানুষ্ঠানে উঁহাদিগকে পুরোহিত করিতে চাহে। বৈষ্ণব ও শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ, ব্রাহ্মণের উচ্চাধিকার সেই বিরোধের বহু ঊর্দ্ধে বিচরণ করে। ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাক্রমে এই-সকল বিভাগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।

এই সমস্ত জটিলতার মধ্যে, ঊর্দ্ধদেশ হইতে এক নজরে প্রকৃত দিক্-নির্ণয় করা সহজ নহে; অভিজ্ঞতার দ্বারা ভুলটুক ক্রমাগত সংশোধন না করিলে চলে না। আমার এই নক্সাটা শীঘ্রই পুরাতন হইতে বাধ্য। আমি যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি তাহারও উপর হয়ত কতকগুলা আঘাত লাগিয়াছে। প্রাচ্যদেশসুলভ বক্ষণশক্তি ও জড়তা যতই প্রবল হোক্ না কেন, পাশ্চাত্য সংস্কার, ও পাশ্চাত্য অভ্যাসের প্রভাবের দ্বারা ভারতের প্রাচীন সমাজ আক্রান্ত হইয়াছে। ভারতের ইংরেজ সরকার ভারতের সুশাসন-কল্পে যে-সকল সুবিধাজনক উপায় বাছিয়া লইয়াছেন, তাহার মধ্যে জাতকে ও জাতসংক্রান্ত কুসংস্কারকে একেবারেই আমলে আনেন নাই। ইংরেজ-সরকার কেবল ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। সৈন্যবিভাগ ও শাসনবিভাগ, সকল শ্রেণীর লোককেই ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পরের সংস্পর্শে আনিয়াছে। এরূপ ঘনিষ্ঠতা ইতিপূর্ব্বে অসহনীয় ছিল। প্রাচীন প্রথার খানিকটা যে ভাঙ্গিয়াছে, সে কেবল মতামতের জোরে, কাজের গতিকে ও ঘটনাচক্রে।

যে ম্লেচ্ছদিগকে হিন্দুরা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করে, সেই ম্লেচ্ছদের প্রতি অতিমাত্র ঘৃণাসত্ত্বেও, সেই প্রবল-প্রতাপ প্রভুদিগের প্রতি একটা ভীতিমিশ্র ভক্তির ভাব অন্তরে অনুভব না করা হিন্দুদের পক্ষে খুবই কঠিন। ইহারই দরুন তথা-কথিত ম্লেচ্ছদিগের অসাধারণ প্রতাপ প্রতিপত্তি। সভ্যতায় অধিকতর সমুন্নত এই ম্লেচ্ছদিগের সর্ব্বপ্রকার সংস্রবে হিন্দুদিগকে প্রায়ই আসিতে হয়; শুধু তাহা নহে, হিন্দুরা ইহা একটা সম্মানের বিষয়, গৌরবের বিষয় মনে করে। অনুকরণের অসার গর্ব্ব, উঁহাদের চিরাগত সংস্কার ও সঙ্কোচকে ভিতরে ভিতরে ধসাইয়া দিতেছে। অনেক ব্রাহ্মণের আহার্য্যের মধ্যে মাংস প্রবেশ করিয়াছে। "কালাপানি" পার হইবার দরুন, ও তজ্জনিত বিবিধ অনাচার ও নিয়মভঙ্গের দরুন, যে অশুচিতা উৎপন্ন হয় সে অশুচিতা এখন আর তেমন মারাত্মক বলিয়া গৃহীত হয় না। সকল বিষয়েই নিয়মের শিথিলতা হইয়াছে, প্রথা নিরস্ত হইয়াছে, এবং অল্পেঅল্পে একদল হইতে দলান্তরে সংক্রমণ করিয়া ক্রমাভিব্যক্তির কাজ ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে। ইংরেজের প্রণালীবদ্ধ প্রবল শাসনের সম্মুখে, অগত্যা জাতের চলৎশক্তি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তারের-হিসাবে, সুনির্দ্দিষ্টতার হিসাবে, প্রামাণিকতার হিসাবে—সকল হিসাবেই জাত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

সর্ব্বত্রই এই অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার কার্য্যফল অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। ইহার প্রবণতা ও অব্যবহিত পরিণাম সম্বন্ধে ভুল-বুঝা অসম্ভব। যদি "জগন্নাথের" জাতটাকে পাকড়াও করিয়া উপস্থিত কাজে কর্ম্মে তাকে দেখিতে চাও, তাহার আলোচনা করিতে চাও, তাহা হইলে এই তার সময়। অবশ্য, এই যে য়ুরোপীয় ভাব, য়ুরোপীয় অনুকরণ হিন্দু সমাজের মধ্যে ভিতরে-ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে ইহা নিতান্তই বাহ্যিক; অবশ্য সুবিস্তৃত জনসাধারণের গভীর অন্তস্তলে ইহা প্রবেশ করে নাই। কিন্তু উচ্চ বর্ণগুলি যে নাড়া পাইয়াছে, তাহা হইতে অচিরাৎ সমস্ত প্রণালীটাই

বিগলিত হইয়া উঠিবে। সমস্ত গঠনটার "কৌণিক প্রস্তর" হইতেছে—ব্রাহ্মণশ্রেণীর মানসম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি। উহারই দরুন সমস্ত জটিলতা একটি একতায় আসিয়া পর্য্যবসিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকর্ম্ম অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণের আধিপত্যে, এই গোলযোগের মধ্যে একটা সঙ্গতি, একটা সামঞ্জস্য আনীত হইয়াছে।

কিন্তু ইহা কি সেই আদিনকালের একতা? ব্রাহ্মণদের এই জাতরূপ গঠনটা কি সমস্ত ব্রাহ্মণ্যিক গঠনপ্রণালীর মূলস্বরূপ না, উহার শেষকালীন একটা রূপ মাত্র? এই প্রশ্নটিই সব-চেয়ে প্রধান। এই প্রশ্ন সমাধানের পূর্ব্বে যে-সব খুটিনাটি বিবরণ প্রদত্ত হইবে, এই আলোচনার জন্য প্রস্তুত হওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ও একমাত্র ওজোর।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রিয়-স্মৃতি

(গল্প)

[নিম্নলিখিত গল্পটি আরমানীর জাতীয় লেখক রাফির গল্প হইতে অনূদিত; তিনি অনেকগুলি উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁর অধিকাংশ লেখা এখনও অপ্রকাশিত। তাঁর লেখাতে আরমানী জীবনের নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। নবীন আরমানীদিগকে গড়িয়া তুলিতে তিনি অনেক সাহায্য করিয়াছেন। জন্ম ১৮৩৭—মৃত্যু ১৮৮৮।]

তেহারান হইতে একটা নির্জ্জন পথ দক্ষিণে গিয়া এক মরু-প্রান্তরে মিশিয়াছে। সেইখানে সমুচ্চ প্রাচীরে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ ভূমি। সে যেন একটা মায়াপুরী—যেখানে চোখ পড়ে সেখানে কেবল প্রাচীর, তাহার ভিতরে কি আছে কিছুই জানিবার উপায় নাই; গৃহের ছাদ, স্তম্ভ বা মিনার কিছুই দ্যাখা যায় না। প্রবেশের পথও নাই।

বৃদ্ধ পারসীকদের মুখে এই স্থান সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায়। দিনের বেলা প্রাচীরের ওপারে শব্দের লেশমাত্র নাই, রাত্রে সেইখানেই নানা ভয়াবহ শব্দ সমুত্থিত হয়! প্রেতের দল সারা রাত প্রাচীরের ধারে-ধারে ঘুরিয়া ব্যাড়ায়, জটল্লা করে। প্রভাতের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে তারা সব অদৃশ্য হয়, তখন ধূ ধূ মরু-প্রান্তরে শুষ্ক প্রাচীরগুলা কেবল প্রহরীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে।

দিনের আলোতেও কোনো পারসীক প্রাচীরের ধারে যায় না, আশেপাশে কোথাও জনমানবের চিহ্নমাত্রও নাই। দেখা যায় কেবল উর্দ্ধ আকাশে শকুনির দল ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে; তারাই যেন সেই প্রেতের দল রজনীর অন্ধকারে যাদের বীভৎস চীৎকার লোকের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করে!

এই জনহীন পুরী হইতে কিছু দূরে মাটির তলে একটা-ছোট স্যাঁতা ঘর, কবরের ন্যায় নিরানন্দ ও আলোক বর্জ্জিত; এক কোণে একটা উনুন, তার মধ্যে কয়েকখানা কাঠ একটুখানি আলো জাগাইয়া রাখিয়াছে।

এই অতি সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে যিনি বাস করেন তাঁর পরিচ্ছদের একান্ত অভাব। সর্ব্বক্ষণই তিনি আগুনের ধারে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত পুস্তক পাঠে রত। তাঁহাকে দেখিলে মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও করুণার উদ্রেক হয়। মনে হয় যেন অধ্যয়ননিরত ব্যক্তিটি দুঃখ-দুর্দ্দশার অবতার—জগতে যাহার সব আশা ফুরাইয়াছে, যে কেবল শেষ আহ্বান শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া কান পাতিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম এই জন-বিরল মরুপ্রান্তরে তাঁর অবস্থানের কারণ কি? আর এই প্রাচীরের ধারে যেখানে প্রতিরাত্রে প্রেতের মেলা বসে, সেখানেই বা তিনি দিন কাটাইতেছেন কেন?

তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া কয়েকটা কথা উচ্চারণ করিলেন, তার মধ্যে কেবল একটা কথা কানে লাগিল—"শরাবানি।"—

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তার মানে?"

তিনি তাড়াতাড়ি সেই সঙ্কীর্ণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে এস।"

সেই প্রাচীরের দিকেই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আমিও সঙ্গে চলিলাম। নিকটে একখানা লম্বা মই পড়িয়া ছিল, সেই মইখানা প্রাচীরের গায়ে দাঁড় করাইতে বলিলেন। মই বাহিয়া আমরা উপরে উঠিলাম। তিনি বলিলেন "দ্যাখ।"

সে দৃশ্য দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের মধ্যে সমস্ত স্থানটি শবের অরণ্য, হাজার হাজার নরকঙ্কাল

এবং অর্দ্ধগলিত শব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে-সমস্তই নগ্ন।

মনে হইল এ যেন একটা মন্ত্রমুগ্ধ জগৎ, যা আমার সঙ্গী যাদুকর নিমেষের মধ্যে চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিলেন। কঙ্কালগুলি দেখিতে পাইলাম স্পষ্ট—ঘেঁষাঘেঁসি দাঁড়াইয়া আছে। আমার অনতিদূরেই অসংখ্য নগ্ন শবের মাথার উপর শিকারী পাখীর দল বীভৎস চীৎকার করিয়া উড়িতেছে। মাঝে-মাঝে তারা হুস্ করিয়া নীচে নামিয়া তীক্ষ্ণধার চঞ্চু ও নখের আঘাতে খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া লইয়া আবার আকাশে উড়িয়া যাইতেছে।

আমার সঙ্গী অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ নড়িতেছিল, বোধ হইল যেন তিনি প্রার্থনা করিতেছেন।

দেখিলাম কঙ্কাল ও শবগুলির মুখ পূর্ব্বদিকে ফেরানো আর প্রত্যেক কঙ্কালের বাহুর তলায় একটি করিয়া খুঁটি মাটির মধ্যে পোঁতা। খুঁটিগুলির উপর ভর দিয়া কঙ্কাল-গুলি শূন্যে ঝুলিতেছে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন দাঁড়াইয়া আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "এর মানে কি?"

তিনি বলিলেন "শরাবানি।" তারপর বলিলেন "এটি মানুষের বিশ্রামস্থান।"

"সমাধিভূমি?"

"হাঁ।"

তিনি বলিতে লাগিলেন "ঐসব মৃতদেহ ঐ খুঁটির উপর ভর দিয়া ঝুলিতে থাকিবে। শিকারী পাখীর দল ক্রমে-ক্রমে উহাদের সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলিবে। অবশেষে উহাদের অস্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া তলদেশের গর্ত্তের মধ্যে পড়িবে। প্রত্যেক মৃতদেহ এইরূপে মাটির সঙ্গে মিশিতে যতদিন সময় লাগে তাহা দেখিয়া পরলোকে উহাদের গতি কি হইবে বলা যায়।"

দেখিলাম একটা বন্যশৃগাল পিছনের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া একটি মৃত মনুষ্যের হাত খাইতেছে। আমার সঙ্গী বলিলেন "ঐ মৃতদেহটা সম্প্রতি আসিয়াছে। ঐ হাত, যা এখন শৃগালের খাদ্য হইয়াছে, উহা এক নির্দ্দোষ মানুষের রক্তে কলুষিত।" নিকটেই একটা মৃতদেহ, তার ডান কাঁধের উপর একটা প্রকাণ্ড দাঁড়কাক বসিয়া চঞ্চু দিয়া মৃতের চোখ দুটি ঠোকরাইয়া খাইতেছিল। আমার সঙ্গী কহিলেন "ও চোখ কাহারো উপর কখনো সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নাই।" এইরূপ অনেক মৃতদেহের বৃত্তান্ত তিনি বলিলেন। অবশেষে আমার সঙ্গীর দৃষ্টি একটি কঙ্কালের উপর পড়িল। সূর্য্যালোকে শ্বেত অস্থিগুলি উদ্ভাসিত। এবার আমার সঙ্গী কথা কহিলেন না, তাঁর ম্লান চোখে জল দ্যাখা দিল, তিনি আমাকে ইসারা করিলেন—"সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যাও।"

তারপর আমরা তাঁর দ্বারে গিয়া বসিলাম। সূর্য্য তখন অস্তগামী। মরুর দারুণ উত্তাপ কতকটা সহনীয় হইয়া আসিয়াছে। যে-কঙ্কালটি দেখিয়া তিনি এত বিষাদগ্রস্ত হইলেন তাহার ইতিহাস শুনাইবার জন্য আমি তাঁহাকে বারবার মিনতি করিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি বলিলেন—

"কুড়িবার শীতের তুষার দেখিয়া, কুড়িবার বসন্তের প্রাণহিল্লোল অনুভব করিয়া আমি বিদ্যালাভের জন্য আমার গুরুর গৃহে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকে বলিত তিনি জ্ঞানের প্রস্রবণ, তাঁর মুখ দিয়া জ্ঞানের কথা মধু ও দুধের ধারার মত ক্ষরিয়া পড়িত। তাঁর কন্যার নাম গামার শরাবানি। তিনি পদ্মের চেয়েও কোমল এবং গোলাপের চেয়েও সুন্দর। আমার গুরুর গৃহ যেন স্বর্গ, সেখানে কেবল সুখ আর শান্তি। কিন্তু গোলাপের কাছেই কাঁটার উদ্ভব হয় এবং সূর্য্য-সমুজ্জ্বল দিনের মধ্যেই কখনো কখনো আঁধার-করা মত্ত ঝঞ্ঝা ছুটিয়া আসে। আমার গুরুর গৃহেও সেইরূপই ঘটিল।

"নওরোজের উৎসবের দিন বালিকার দল পাহাড়ের উপর ক্রীড়া কৌতুকে উৎসব যাপন করিতেছিল। সহরের সর্দ্দার সেদিন শীকারে গিয়াছিলেন, ফিরিবার পথে ক্রীড়া-মত্ত বালিকাদের উপর চোখ পড়িল, এবং গামারের সুন্দর মুখ এবং দেহের লাবণ্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল।

"কয়েক দিন পরে সর্দ্দারের দুর্গ হইতে দূত আসিল। সর্দ্দার সংবাদ পাঠাইয়াছেন—গামারের রূপে তিনি মুগ্ধ, তাই তাঁর পাণি প্রার্থনা করেন। গুরুগৃহে যেন বজ্রপাত হইল। প্রথমে গুরু বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন, পরে সাহস করিয়া বলিলেন, বিধর্ম্মীর হাতে তিনি কন্যাকে দিবেন না।

"এই কথা শুনিয়া সর্দ্দার প্রতিহিংসার বিষে জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসার সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইল। কে একটা গুজব রটাইল যে সেই শহরের গাব্‌র্* সম্প্রদায় মুসলমানের ধর্ম্মমন্দির অপবিত্র করিয়াছে। রাত্রে নাকি তাহারা একটা কুকুরের মৃতদেহ মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়াছে।

"বলা বাহুল্য কথাটা একেবারেই মিথ্যা। কিন্তু তা হলে কি হয়, মুসলমানের দল সত্য মিথ্যার বিচার না করিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সর্দ্দার নিজে এবং মোল্লারাও তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন।

"গাবরেরা যে পাড়ায় বাস করিত সে পাড়া একদিন অন্ধকার রাত্রে মত্ত তুর্কের দলে ভরিয়া উঠিল। নির্ম্মম আগুন ও তরবারির সাহায্যে দলে দলে নির্দ্দোষীদের হত্যা চলিতে লাগিল। সেই ভয়ানক মুহূর্ত্তে গামারের কথা আমার মনে পড়িল। গুরুর গৃহের দিকে উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিলাম। আগুনের শিখায় স্থানটি দিনের মত আলোকিত। গুরুগৃহে পৌঁছিয়া দেখি গৃহ পুড়িয়া ছাই হইতেছে, আর সেই গৃহের সম্মুখে রক্তাক্তদেহে গুরু পড়িয়া আছেন। চারিদিক হইতে অসহায় নিপীড়িত মেয়েদের কান্নার শব্দ আসিতেছিল, কিন্তু তার মধ্যে গামারের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম না।

"হঠাৎ একস্থানে দেখি আহত অজ্ঞান গামারকে একটা লোক টানিতে-টানিতে সর্দ্দারের কেল্লার অভিমুখে লইয়া যাইতেছে। কোমর হইতে চট্ করিয়া ছোরাখানা টানিয়া লইয়া লোকটার ঘাড়ে বসাইয়া দিলাম; তারপর গামারকে বুকে টানিয়া লইলাম।

"কেমন করিয়া তাকে বাঁচাইলাম সে কথা নিজেই জানি না। কেবল মনে পড়ে যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি শহর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে প্রভাত হইতেছে। সেই প্রথম বুঝিতে পারিলাম আমিও কয়েক স্থানে আহত হইয়াছি, কিন্তু কোথায় কেমন করিয়া আহত হইলাম তা মনে পড়িল না। পাশে চাহিয়া দেখি গামার অচৈতন্য; তখন নিজের বেদনা ভুলিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

"সব কথা তোমায় বলা শক্ত, আমার এ কাহিনী সুদীর্ঘ; যদিও কোনো কথাই আমার মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। একজন দরিদ্র পলাতকের কথা ভাবিয়া দ্যাখ; মাসের পর মাস জনহীন মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছে, লোকালয়ের কাছে ঘেঁসিতে পারে নাই, আর তার সঙ্গে এক ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর অবসন্ন তরুণী!

"তুর্কেরা ভাবে গাবরেরা অশুচি, তাই তারা তাদের ঘৃণা করে, তাদের কাছে ঘেঁসিতে দ্যায় না। আমরা কোনো রাখালের গৃহেও স্থান পাইলাম না, যারা সকলেরই আতিথ্য করে। দিনের বেলা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম, রাত্রে চলিতাম। প্রায়ই মরুজাত ফল খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করিতাম; হঠাৎ কোনো দিন কোনো সদয় আরমানীর সঙ্গে দ্যাখা হইলে কিছু ভিক্ষাও মিলিয়া যাইত।

"এমনি করিয়া ইস্পাহান, ধুম ও কাশান শহর অতিক্রম করিয়া গেলাম। প্রথম-প্রথম আমার সঙ্গিনীর মনে সাহস ছিল, তখন সে আমার সঙ্গে হাঁটিত; তারপর যখন সে অচল হইয়া পড়িল তখন সেই অমূল্য নিধিকে আমি পিঠে লইয়া চলিতাম। সে কাঁদিয়া বলিত—'কবে আমায় ভগবান ডাকিয়া লইবেন, তোমার এ কষ্ট আর আমি দেখিতে পারি না।'

"তেহারানের পথে চলিয়াছি, শা'র পদতলে গিয়া পড়িব, এই অত্যাচারের বিচার প্রার্থনা করিব! আমার সঙ্গিনী দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন তাহার প্রবল জ্বর হইল, আমার সামর্থ্যে যতদূর সম্ভব সব করিলাম, কিন্তু বৃথা!

"আর কয়েক দিনের পথ বাকী। এক গ্রামের ধারে এক শস্যক্ষেত্রে রাত্রের মত বসিয়া পড়িলাম। মাথার উপরে নীল আকাশে চাঁদ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা, আমার কোলে মাথা রাখিয়া তরুণী দারুণ যন্ত্রণায় অধীর।

"হেমন্তের প্রভাতের যখন সবেমাত্র উন্মেষ হইতেছে, নবীন তৃণের মাথায় শিশিরবিন্দু চোখের জলের মত টলমল করিতেছে, তখন সে চোখ মেলিয়া আমার পানে চাহিল। ধীরে ধীরে বলিল—'তবে আসি, পরলোকে আমার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা কোরো।' জগৎ যখন জাগিল তখন চিরদিনের জন্য তার জাগার শেষ হইল!

* সূর্য্যউপাসক। এই শব্দ হইতে কাফের শব্দের উৎপত্তি।

"এই অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি তার কথামত তারই জন্য প্রার্থনা করিতেছি, দিনরাত তার ঐ কবরের পাশে থাকিয়া। প্রিয়মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছি—ক্রমেই অগ্রসর হইতেছি!"

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচনা

ঙ ঞ অক্ষরের উচ্চারণ।

সংস্কৃতে ঙ ঞ বর্ণের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। ক খ গ ঘ বর্গের সহিত ঙ, এবং চ ছ জ ঝ বর্গের সহিত ঞ, যুক্ত হইত। সংস্কৃতে এমন শব্দ পাওয়া যায় না, যে শব্দে ঙ ঞ বর্ণ অন্য ব্যঞ্জনের তুল্য পৃথক স্থান পাইয়াছে। তিঙন্ত, লুঙ, লিঙ প্রভৃতি কয়েকটা শব্দ আছে; কিন্তু সে-গুলা সংজ্ঞার নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল, ভাষার ও সাহিত্যের শব্দ নহে। সে-গুলা সাঙ্কেতিক অক্ষর। তন্ত্র শাস্ত্রে ঙ ঞ বর্ণ পৃথক পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানেও সাঙ্কেতিক।

বাঙ্গালায় ঙ ঞ অক্ষরের কি উচ্চারণ, তাহাই এখানে বিবেচ্য। প্রাচীন বাঙ্গালায় ঙ ঞ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যতীত অসংযুক্ত ব্যঞ্জন রূপেও লিখিত হইত। পরে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। দেখা যাইবে, চন্দ্রবিন্দুযুক্ত স্বরবর্ণ প্রকাশের নিমিত্ত ঙ ঞ লেখা হইত।

বাঙ্গালায় অদ্যাপি ঙ-অক্ষরের নাম উঁঅ। ক-এর উচ্চারণ যেমন ক-অ, ঙ-এর উচ্চারণ তেমন উঁ-অ। উচ্চারণ উঁ তুল্য না হইলে নাম উঁ-অ হইত না। যে অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারিত হয় না, সে অঞ্চলে নাম উ-অ বা উ-মা।

কয়েকটা ক্রিয়াপদ দেখা যাউক। প্রাচীন বাঙ্গালায় করোঙ জাঙ হঙ প্রভৃতি পাওয়া যায়। কি রকম পড়া হইত? কিংবা, কি ধ্বনিপ্রকাশের নিমিত্ত ঙ লেখা হইত? করোঙ জাঙ হঙ প্রভৃতি ক্রিয়াপদের সময়ে করোঁ প্রণমহোঁ বা প্রণমহুঁ বানানও প্রচলিত ছিল। জয়ানন্দ (চৈতন্যমঙ্গলে) লিখিয়াছিলেন, কান্ধে চড় নিঞা জাঙো গঙ্গাতীরে-তীরেণ এখানে জাঙ লিখিলেই চলিত। জাঙো বানান করিয়া তিনি উচ্চারণ স্পষ্ট করিয়াছিলেন। গত মাসের প্রবাসীতে হঙ=ইঁ ছাপা হইয়াছে; হইবে হওঁ বা হউঁ। এই করোঙ করো প্রভৃতি স্থানবিশেষে করোম উচ্চারিত হইত। সেসব স্থানে চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ প্রসিদ্ধ ছিল না। কোন অঞ্চলে বন্দঙ, বন্দোঙ, বন্দোঁ; কোন অঞ্চলে বন্দম হইয়াছিল। এইরূপ, কহিলুঁ (বা কহিনু) স্থানে কহিলাঙ পদ আসিয়াছিল। ইহাই অন্য অঞ্চলে কহিলাম আকার পাইয়াছে। কৃত্তিবাসে (সাঃ পঃ সং) হইলাহোঁ পদ আছে। অন্যে হইলাঙ লিখিতেন। কৃত্তিবাসের পুথী-লেখকও অন্যত্র হইলাঙ লিখিয়াছেন। অতএব হোঁ ওঁ স্থানে যে ঙ লেখা হইত, অর্থাৎ ঙ অক্ষরের উচ্চারণ যে ওঁ উঁ ছিল তাহা সিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ, করিবুঁ স্থানে করিবাঙ, এবং স্থান-বিশেষে করিবাম হইয়াছিল। বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষা করিলাম গ্রহণ করিয়াছে, করিবাম করে নাই। করিমুঁ=করিমু, এবং ক্রমে স্থানবিশেষে করুম হইয়াছে।

করোঙ বা করোঁ, হঙ প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রচলনের সময়ে কর্ত্তা মো মুঁ মুঞ মুঞি ছিল। মো করোঁ, মু করুঁ। মো হইতে মো-কে, মো-ত, সর্বনাম পদ ছিল।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে ঙ-যুক্ত শব্দ পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পদ-কল্প-তরু (সাঃ পঃ সং) হইতে কয়েকটা উদাহরণ তুলিতেছি। ভাঙ-ভুজঙ্গম শব্দে ঙ উচ্চারণে কি ছিল? এখন লিখিলে ভাওঁ কিংবা ভাউঁ লেখা হইত। বিদ্যাপতির 'ভাঙু-বিভঙ্গি-বিলাস' শব্দ সন্দেহ মোচন করিতেছে। ই পরে থাকিলে পূর্বস্থিত অকার ঈষৎ ও-কার উচ্চারিত হয়। যেমন হরি—বাঙ্গালা উচ্চারণে হোরি। বোধ হয়, পূর্ব কালেও এইরূপ ছিল। তখন সোঙরি বা সঙরি—সোওঁরি সওঁরি তুল্য উচ্চারিত হইত। চৌঙকি চলয়ে—চৌউঁকি চলয়ে (চমকি চলয়ে)। এইরূপ কোঙর—কোওঁর, সাঙন—শাওঁন, কাঙর—কাওঁর, শাঙলী—সাওঁলী, গোঙারি—গোয়াঁরি, ইত্যাদি। ঙ=উঁঅ মনে না করিলে নমুঙা-বদনি (নমুয়-বদনি) বানান আসিত না।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে একটা বিশেষ প্রমাণ আছে। তিনি দুই শত বৎসর পূর্বে ছিলেন। নিবাস বর্দ্ধমান অঞ্চলে ছিল। লাউসেনের কনিষ্ঠা রাণী কানড়া ক হইতে ক্ষ অক্ষরে চণ্ডিকার স্তব করিতেছেন (জাগরণ পালা, বঙ্গবাসীর সং)। ক খ গ ঘ অক্ষরের পর,

> ঙঁর উগ্রবিনাশিনী উগ্রচণ্ডা মা।
> উদ্ধারের বীজ উমা সার সেই পা॥

ঙ স্থানে উ। এইরূপ, ঞ স্থানে ই; যথা,

> ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়া ঈষদ ইঙ্গিতে।
> ইদানী ইন্দ্রাণী রাখ নয়ন-ভঙ্গীতে॥

লেখক যে প্রচলিত উচ্চারণ ধরিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ঝ ব অক্ষরে স্পষ্ট আছে। এক স্থানে আছে,

> ধাঙসা ধাঙ ধাঙ গাজে।
> ভাং ভাং রণশিঙ্গা বাজে।

প্রাচীন ও বর্ত্তমান ঙ অক্ষরের যে উচ্চারণ, তাহা কি নব্য "বাঙলা"র "বাঙালী"র ঙ-তে আছে?

ঞ যে ইঁঅ রূপে উচ্চারিত হইত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। দিঞা, খসাঞা, ধাইঞা, পাইঞাছে প্রভৃতির আধুনিক বানান দিয়াঁ, খসায়াঁ, 'ধাইয়াঁ', পাইয়াঁছে। ভূঞা, মিঞা প্রভৃতি শব্দে য়াঁ বা ইঁ-আ স্পষ্ট। সহিতে—সহিতেঁ—সইয়েঁ—সঞে; ইহা হইতে সনে, যে অঞ্চলে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ সাধারণ নহে। গোসাঞি নাঞি তেঞি মুঞি প্রভৃতি শব্দে ইঁ বা ঈঁ পড়িতে হইবে। কারণ, এখনও আমরা গোসাইঁ তেইঁ বলি। ওড়িয়াতে নাহিঁ, মুইঁ বলা ও লেখা হয়। অতএব চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত স্বরবর্ণ প্রকাশ করিবার সময় ঙ ঞ অক্ষর লেখা হইত।

আর একটু যাইব কি? ঙ অক্ষরে উ অক্ষরের মাথায় বিন্দু (পাগড়ী) আছে কি? ঞ অক্ষরে এ অক্ষরের গায়ে বিন্দু? মূর্ত্তি-সাদৃশ্য আকস্মিক? ণ ন-এর, ম ং-এর মূর্ত্তিতে সাদৃশ্য আছে, বৃত্তিতেও আছে। ঙ ং মূর্ত্তিতে সাদৃশ্য স্পষ্ট নহে; বৃত্তিতেও কিছু সাদৃশ্য আছে, কিছু নাই।

ভারতচন্দ্র হইতে এক আনুষঙ্গিক তর্কের উত্তর পাওয়া যায়। সুন্দর পঞ্চাশ অক্ষরে কালিকার স্তব করিয়াছিলেন। তিনি অ হইতে অং অঃ গণিয়া অং স্থানে বলিয়াছিলেন,

> অংশরূপা অংশুময়ী অংশে কংস অরি।
> অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্গে করি॥

বোধ হয়, 'অঙ্গে করি' স্থানে 'অঙ্কে করি' হইবে। সে যাহা হউক, অং হইতে অঙ্ক, অঙ্গ পাইতেছি। অর্থাৎ আমরা যেমন সংখ্যা সংগ্রহ আকাঙ্ক্ষা লিখিতেছি, ইচ্ছা করিলে তেমন অংক, অংগ লিখিতেও পারি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

"আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই"

মনে উচ্চ অভিলাষ পোষণ করলে মানুষের দ্বারা বড় কাজ করা সম্ভব হয়। কারণ মানুষ সাধারণত যা ভাবে তার চেয়ে বড় কাজ করতে পারে না। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। হাত যে কাজ করে, মন যদি সে কাজে সাড়া না দ্যায়, তবে তা সার্থক হবার নয়। মন যতদূর পৌছেচে হাত তার চেয়ে বেশী পৌছুবে কেমন করে'?

সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মনকে যদি আবদ্ধ করি তবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রও সঙ্কীর্ণ হয়ে দেখা দিবে। মন যখন সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ধাবিত হয় তখনই কর্ম্মক্ষেত্রের বিপুল বিস্তার চোখে পড়ে। সাধারণ মানুষের মন যে স্তরে কখনো কখনো কষ্টেসৃষ্টে ওঠে মহাপুরুষের মন সেখানে সহজেই বিচরণ করে।

উচ্চাভিলাষ একেবারে মানুষের রূপান্তর ঘটায়। উচ্চাভিলাষ যখন আসে তখন মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোমল আবরণ ছিন্ন করে' কঠোর শ্রম ও দারুণ কষ্টকে বরণ করে' নেয়—ভয় ও কুণ্ঠা তার মন থেকে এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে যায়। অদম্য অভিলাস চরিতার্থ করবার জন্যে সে তখন ঝড়ের মত পৃথিবী তোলপাড় করে' ফ্যালে।

প্রতিদিন প্রবীনের তুচ্ছ বিজ্ঞতার বাঁধি বুলি আমাদের কানে প্রবেশ করে' উচ্চাভিলাষকে খর্ব্ব না করে—উৎসাহের আগুন যেন নির্ব্বাপিত না করে সে সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। যে সিঁড়ি কেউ চোখে দেখেনি আশা সেই সিঁড়ির ধাপ দিয়ে আমাদের হাতে ধরে' নিয়ে যায়। আশা যা দেখায় তা হয়তো পাই না, কিন্তু আশার অনুধাবন করে' আমরা শক্তিলাভই করি, জীবনের প্রসারিত ক্ষেত্র দেখতে পাই। আশা যেখানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সেদিকে যদি অগ্রসর না হই তো সিঁড়ির ধাপের ওপর দিয়ে গড়িয়ে তলায় পড়তে বেশী সময় লাগবে না। যে-কাজে লিপ্ত আছি সে-কাজের উচ্চতম শিখরে উঠতে চেষ্টা করবো—মনের সামনে একটা উচ্চ আদর্শ সর্ব্বদা রেখে দেব, এই হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

ভূমির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উচ্চে উঠতে পারব না। উন্নত হয়ে ওঠ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, নিজেকে ছোট বলে' তুচ্ছ বলে' ভেবনা। অপ্রাপ্ত যা, অর্জিত যা, তা আমাদের জীবনের সমুচ্চ শিখরদেশ নির্দ্দেশ করছে,—যেখানে মহাপ্রাণ লোকেরা বিরাজিত। আশাই আশা ফলবতী হবার সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করে। অতএব আশা হারিয়ো না, আশা কর আশা কর! জীবন যাপন কর একাগ্রচিত্তে। কারণ জীবন তো ছেলেখেলা নয়, একটা মজার অভিনয় নয়; জীবন মিথ্যা মায়া নয়—জীবন সত্য সুন্দর, জীবনের মত বাস্তব আর কিছু নেই। জীবনের কর্ত্তব্য দৃঢ়মনে সম্পন্ন কর; সে-কর্ত্তব্য আকাশের তারার ন্যায় অগণ্য!

জীবনে এমন সময় আসে যখন সম্মানলোলুপতা অসার বলে' বোধ হয়, অর্থে আসক্তি থাকে না; পদমর্য্যাদা বৃথা আর শক্তি অপ্রয়োজনীয় বলে' মনে হয়; আর বোঝা যায় মনে শান্তি না থাকলে কিছুই কিছু নয়, বাহিরের সকল সুবিধা সকল সম্মান অতি তুচ্ছ অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই সুধী জন নিঃস্বার্থ উচ্চাভিলাষকেই মনে স্থান দ্যান; তাতে মনের শান্তি অটুট থাকে।

এশিয়ার অনেক দেশের সন্তোষ ও শান্তিপ্রিয়তা অতি তুচ্ছ এবং হীন। যা পাই তা-ই ভালো, কোনোরকমে দিন গুজরান হলেই হ'ল, এই হ'ল এশিয়ার সাধারণ মনভাব। মান্ধাতার আমল হতে যা চলে আসচে তা-ই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক, তার আর উন্নতির চেষ্টায় মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই! বাঁধি পথে চল, বাঁধি বুলি আওড়াও, আমাদের অত শত দরকার কি! শাকান্নে পরিতৃপ্ত হও!—এই ভাব মনে পোষণ করেই আমরা অধঃ-পতনের চরম সীমায় এসে পৌছেচি—সকল রকম গোলামিতে পাকা হয়ে উঠেছি।

বড় হতে হলে গোড়ার শিক্ষাটা রীতিমত ব্যাপ্ত এবং উদার হওয়া প্রয়োজন। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে বড় হব এরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটু বিপদ আছে। কারণ তা নিয়ে চলতে চলতে কখনো কখনো মানুষ সঙ্কীর্ণ ও একদেশদর্শী হয়ে পড়ে। শোনা যায় বাল্যকালে ডারুইন কবিতা ও সঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিলেন; কিন্তু পরজীবন কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অতিবাহিত করে' তিনি দেখতে পেলেন শেকস্‌পীয়ার তাঁর কাছে নীরস একঘেয়ে হয়ে

উঠেছে! তখন তিনি দুঃখ করে' বলতেন, জীবনটা যদি আর একবার ফিরে আসে তো তিনি প্রতিদিন কবিতা ও সঙ্গীত চর্চ্চা করবেন, যাতে এ-সব মধুর জিনিস উপভোগ করবার শক্তি লুপ্ত না হয়।

জুলিয়া ওয়ার্ড হো বলেন—"প্রত্যেক জীবনেই কিছু কিছু ফাঁক আছে। সেগুলি উচ্চ আদর্শ দিয়ে না ভরালে চিরদিন শূন্য নিরর্থক হয়েই থাকে।" আমাদের মনের পটে নিরন্তর কত যে ছবির ছাপ পড়ছে তা আর বলবার নয়। সে-পটে সুন্দর ছবি না আঁকলে—তা যে কদর্য্যতায় ভরে' যাবে!

সম্পাদিত কর্ম্মের বিভেদ অনুসারে জীবনের বিফলতা বা সফলতা নিরূপিত হয়। কেহ হয়তো প্রাণপণ চেষ্টায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট জুয়াড়ি বা পাকা জুয়াচোর হতে পারে। তা বলে তার জীবন কি সফল? সে তার ব্যবসায়ে বড় বটে, কিন্তু তার সার্থকতা সাধুব্যবসায়ে লিপ্ত যে-কোনো ব্যক্তির বিফলতারও তুল্য নয়। মনকে চোখ ঠারলে বা সমুজ্জল পোশাকে আবৃত করলে নীচ উন্নত হয় না, অসাধু সাধু হয় না, মলিন নির্ম্মল হয় না। মানুষের আদর্শ যেমন তার জীবনও তেমনি হয়।

কারো উচ্চাভিলাষ প্রতিবেশীর চেয়ে ভালো পরা, ভালো খাওা, গাড়ী ঘোড়া চড়া। কারো বা আকাঙ্ক্ষা অজস্র অর্থ ব্যয় করে' বিড়াল কুকুরের বিবাহ দেওা বা উপাধির মালা পরা। ঐ-সব ভালো নয়। তবে এও মনে রাখতে হবে ডিসরেলি বলেছেন—"যে উর্দ্ধে দ্যাখে না সে দ্যাখে নীচে; মন যার উধাও হয়ে ওড়ে না সে হয়ত একদিন ধূলায় ধূসর হবে।"

কেমন হওা উচিত সে-সম্বন্ধে সকলের মনেই একটা আদর্শ থাকে। উন্নতিকামীর মনে এই আদর্শটি সে-নিজে-যা তার চাইতেও বড়। তাদের মধ্যে এমন লোক খুব অল্প যারা বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তার চেয়ে আরো জ্ঞানী গুনী বা উন্নত হতে চায় না।

আমরা যা আছি এবং আমরা যা হতে চাই তার মধ্যে অনেক ব্যবধান! মানুষের মনে কত মহৎ আদর্শ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে! সে-আদর্শ তুলিকায় বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত করা, মর্ম্মরের মধ্যে মূর্ত্তিমান করা, সুরম্য নিকেতনে ফুটিয়ে তোলা, মনোহরণ সঙ্গীতে ব্যক্ত করা; এবং কাব্য-নাটক-উপন্যাস-দর্শন-প্রবন্ধে তার পরিচয় প্রদান করা মানুষের প্রকৃতিগত।

ফিলিপ্‌স্ ব্রুক্‌স্ বলেন—"কোনো যথার্থ মানুষ অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেন না। অপর অর্দ্ধ, উচ্চতর অর্দ্ধের জন্য তাঁর মন নিরন্তর ব্যাকুল হয়ে থাকে।" জর্জ্ ইলিয়ট বলেন—"আমরা যতক্ষণ সম্পূর্ণ জ্যান্ত থাকি ততক্ষণ আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে পারি না। কতক জিনিস আছে যা আমাদের কাছে বড় সুন্দর বড়ই ভালো, সেগুলির জন্যে আমাদের লোভের অন্ত নেই।"

আমাদের প্রাণের ইচ্ছাই আমাদের অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ বাণী। যৌবনের স্বপ্ন জীবনে সম্পূর্ণ সফল হয় না। বর্ত্তমান যা প্রতিজ্ঞা করে ভবিষ্যৎ কখনো সে সমস্তই দিতে পারে না। কেননা বিধাতা আমাদের বেতনের কতক অংশ হাতে রেখে দ্যান পাছে আমরা কাজ একেবারে পরিত্যাগ করি, একেবারে নিরুদ্যম হয়ে যাই। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অবিনশ্বরতার—অফুরান জীবনের কাহিনী সুস্পষ্ট।

সেই উচ্চাভিলাষই বরেণ্য অপরের মঙ্গলসাধনেই যার সার্থকতা এবং বিশ্বনিখিলের কল্যানকর্ম্মে যার নিয়োগ।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরফ্ রিপাব্লিক

(যে দিন)

টাইপ্-মেশিন্ আন্‌লে দেশে হরফ্-রিপাব্লিক্
হাঁফ্ ছেড়ে সব বাঁচ্‌ল হরফ্ ফর্শা হ'ল দিক্;
কারো ঘাড়ে রইবে না কেউ সিন্ধবাদের মত
আঁকড়ে কোমর পাকড়ে গলা—পরাণ ওষ্ঠাগত।
চ্যাঙ্-দোলা কৈউ কাউকে নিয়ে করবে না এর পর
বর্ণমালায় থাকবে না আর অর্দ্ধ-নারীশ্বর।
খবর যেমন গেজেট হ'ল—সেই নজীরের জোরে
বেরিয়ে এল 'ঙ' 'ঞ' অজ্ঞাতবাস ক'রে।

* * * *

প্রথম প্রথম থতমত 'ওয়ঁা' 'ইয়ঁা' করে
গেঞো ভেবে ছল ধরে সব—হেসে পরস্পরে ;
গোয়ঁারেরা ঠ্যাঙা উঁচায় ছেলেরা ভ্যাঙ্চায়,
ব্যাঙের মালা গেঁথে ধাঙড় দিচ্ছে ছেড়ে গায় !
সকল সয়ে রইল তারা,—বল্‌লে গো বরং—
সঙের আধা 'ঙ' বটে, নয়কো "ঙ" সঙ্,
অনুনাসিক গোত্র মোদের, আমরা সবাই বীর—
'ন' 'ণ' 'ম'য়ের দাদা—যেমন ভীম আর যুধিষ্ঠির ।
কদর মোদের বোঝ যদি দেখাব কুদরৎ
কত কথায় করছি বিরাজ তিলে তৈলবৎ ।
এই না বলে 'ঙ' 'ঞ' শিঙায় দিল ফুঁ
কাণ্ড দেখে অবাক,—কেউ আর বলে না হাঁ হুঁ ।

* * * *

রঙ্গে এল গাঙের ফড়িঙ্ কমুঞ উঁচু করে,
রাঙা ফুলের মধ্যে ঝিঁঝি গুঞো ঘোরায় জোরে ;
ডাঞনী ডেঞে পিঁপ্‌ড়ে এলেন ঝুঁকে হেঁটে হেঁটে,
উচ্চিঙড়ে উদয় হ'লেন গাছের বাকল কেটে ;
ডোঙায় এলেন কোঙা হ'য়ে গোসাঞ্ এবং মিঞা,
ঠোঙায় এল ঝিঙা ভাজা, ডিঙায় এল টিঞা ;
গোঙা ছিল কোঙারের ঝি টোঙা উল্‌টে পড়ে,—
জলটুঙিতে ফেলে এল টাটকা জুঞের গোড়ে ;
খুঙির মাঝে পুঁথি ছিল—পঞ্হ মিলিন্দের,
ফুঙি এসে ব্যাখ্যা করেন নূতন করে ফের ;
মাঙ্না ঘোঙা মোঙা ছিল সাঙায় কদিন আজ
শিঙের আওয়াজ পেয়েই সে বার করেছে ভট্‌চায্ ;
ভূঞার মেয়ে এলিয়েছে চুল লুটিয়ে পড়ে ভুঞে,
অলক বয়ে সুগন্ধি জল পড়ছে চুঞে চুঞে,
টাঙি কাঁধে ভুটিঞা এলো রঙীন টুপি মাথে
সঙের মতন চেহারা তার বাঁশের চুঙি হাতে ;
ভাজা পুলির জন্যে এল নারিকেলের ছঞ—
বিধিলিঙের ছাত্রগুলোর পেট করে চুঞ চাঞ ;
চাঞের কাছে খবর গেল চাঞ্ তো রেগে কাঞ্
কেঞ্ চুমিতে কেঞের বাড়া বরের খুড়োর খাঞ্ ।

* * * *

হাঁ হাঁ করে এই সময়ে উঠ্‌ল সকল গাঞি,
'আর প্রমাণে কাজ কি ?' বলে মিঞা আর গোসাঞি,
ঙ ঞর দল যে ভারি বুঝ্‌ল সকল লোক
ফ্যালফেলিয়ে লক্ষ জোড়া রইল ড্যাবা চোখ ।
অনুনাসিক পাণ্ডুকুলের 'ঙ' যুধিষ্ঠির
আঙ্‌রাখা-গায় পাগড়ী মাথায় বস্‌ল সভায় বীর ;
একটি জোড়া মুগুরে ঠেস্ দিয়ে ঞ-ভীম
বুক চিতিয়ে বস্‌ল এসে আফিঙ্ খেয়ে ঝিম্ ।
দেখছ কি আর শুন্‌ছ কি আর ভাব্‌ছ কি আর ধন?—
জয় যে তাদের কায়েম, যাদের পক্ষে জনার্দ্দন !
কাঞ্-কাঞ্-কাঞ্ বাজে কাঁশী ভয় কিছু নাই আর
লাগ্-বঙা-বঙ্ বাজায় নেচে বিদুর অনুস্বার ।

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ।

পাখীর রকমারি

জগতের সকল প্রাণীর মধ্যে পাখী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাহার আকার অবয়ব রীতিনীতি এমন বিচিত্র যে আর কোনো প্রাণীর বোধ হয় এমন বিচিত্রতা নাই। ইহাদের আকার ছোট উটের মতন হইতে একটা সুপারীর মতন পর্য্যন্ত আছে। ইহাদের কেহবা স্থলচর, কেহবা স্থলচর ও জলচর, এবং অনেকেই খেচর। অনেক পাখীর দেহ ভারী বলিয়া বা ডানা ছোট বলিয়া উড়িতে পারে না, অনেক পাখীর মোটেই ডানা গজায় না। ইহাদের পালকের রঙের অন্ত নাই। ইহাদের বাসা গড়িবার ভঙ্গি বিচিত্র ও অদ্ভুত। এই সুন্দর, বিচিত্র আকার ও প্রকৃতির প্রাণীর কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের কৌতুককর বিবরণ আমরা এই প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

পাখীর জন্ম হয় ডিম হইতে, সুতরাং ইহারা দ্বিজ। পাখীর পেটের মধ্যে ডিম হয়, সেই ডিম প্রসবের পর তাহার মধ্যে ছানা পুষ্ট হয়—ইহা প্রকৃতির এক আশ্চর্য্য লীলা। ডিম প্রস্তুত হওয়ার পর ডিমের খোলার ভিতরের তরল পদার্থ কিছুদিন (মুরগীর ডিমের বেলা ১৯ দিন) একটি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় তাপ পাইলে তাহা পাখীর অবয়ব ধরিয়া প্রাণবান হইয়া উঠে। ডিমের মধ্যে দুটি পদার্থ থাকে,

একটি স্বচ্ছ শ্বেতাভ এবং অপরটি হল্‌দে। এই হল্‌দে ডেলার মধ্যে একটি চাকতির মতন থাকে, তাহাই জীব-বীজ। ডিমের মধ্যেকার অপরাপর পদার্থ সেই জীব-বীজকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার খাদ্যমাত্র।

ডিমের খোলার নীচে একটা চামড়ার মতন আবরণ থাকে। তা পাইয়া ডিমের ভিতরকার বীজ যত পুষ্ট হয় ডিমের খোলা হইতে এই চামড়া তত খুলিয়া সরিয়া আসে এবং খোলা ও চামড়ার ভিতরকার জায়গা বাতাসে ভরিয়া যায়; সেই বাতাসে পাখীর ছানার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কাজ চলে। এই বাতাস ডিমের ভিতরে যায় ডিমের খোলার গায়ের অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া।

মুরগীর ডিম ১৬ ঘণ্টা তা পাইলে ডিমের ভিতরকার জীব-বীজের চাকৃতি ছোলঙের বা পেয়ারার আকার ধরে এবং মাঝখানে খাল পড়ে; তখন ছানার শিরদাঁড়া এবং স্নায়ুমণ্ডল পত্তন হইতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের মাঝামাঝি হৃৎ এবং প্রধান রক্তস্থলী প্রস্তুত হয়। সেই দিনের শেষে ভ্রূণের গায়ে দুটি স্বচ্ছ থলি জন্মে, একটি থলিতে জল ভরা থাকে তাহা বাহিরের আঘাত হইতে ভ্রূণকে বাঁচায়, এবং অপরটি খালি থাকে, তাহাতে ভ্রূণ-শরীরের মলমূত্র গৃহীত হয়। তৃতীয় দিনে মস্তিষ্ক, চক্ষু, স্নায়ু, ফুস্‌ফুস, যকৃত এবং অন্যান্য গ্রন্থি আবির্ভূত হইতে থাকে। এখন ডিমের শ্বেতাংশের অনেকখানি রক্ত তৈয়ারীতে খরচ হইয়া যায়। চতুর্থ দিনে নাক, কান এবং চোয়াল আকার ধরে। বড় আলপিনের মাথার মতন গুটির আকারে পা ও ডানার আভাস দেখা দেয়। ২৪ ঘণ্টা পরে এই অবয়বগুলি লম্বা হয়, কনুই ও হাঁটু চেনা যায়, এবং আঙুলেরও ঈষৎ আভাস আসে।

ষষ্ঠ দিনের আগে ডিমের মধ্যেকার ভ্রূণকে পাখী বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। পাখীর ঠোঁট গজায় ১২ দিনে, তার পর দিনে পায়ের নখ গজায়। ৯ দিনে ভ্রূণের সর্ব্বাঙ্গে ছোট-ছোট বোতামের মতন গুটি গুটি পালকের আভাস উঠে, ১৩ দিনে সেগুলি লম্বা কাঠির মতন হয় এবং শীঘ্রই পালকের ঝালরে ছড়াইয়া পড়ে।

মুরগীর বাচ্চা ১৯ দিনেই ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার উপযুক্ত পুষ্ট হয়। তখন ডিমের শ্বেতাংশ কিছুই থাকে না, এবং হলদে ভাগও খুব অল্প ও তরল হইয়া নাড়ী-ভুঁড়ির ভিতর জমা থাকে। এইজন্য ডিম ভাঙিয়া বাহির হইবার পর বাচ্চার ২৪ ঘণ্টা কোন খাদ্যের আবশ্যক হয় না। ১৯ দিনের দিন বাচ্চা ডিমের মধ্যে পাশের দিকে মাথা করিয়া সোজা হইয়া বসে। তখন তাহার ঠোঁটের উপর একটা কড়া শিং গজায়; তাহার ঠোকোর মারিয়া ডিমের খোলের গায়ের চামড়ার আবরণে ছিদ্র করে এবং সেই আবরণ ও খোলার মধ্যেকার বাতাসে নিজের ফুসফুস পরিপূর্ণ করিয়া লয়; ততক্ষণাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ হয় এবং যতদিন জীবন থাকে ততদিন চলে। তারপর সেই শিং দিয়া সে ডিমের খোলার গায়ে ঘা মারিতে থাকে এবং খোলা ফাটাইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

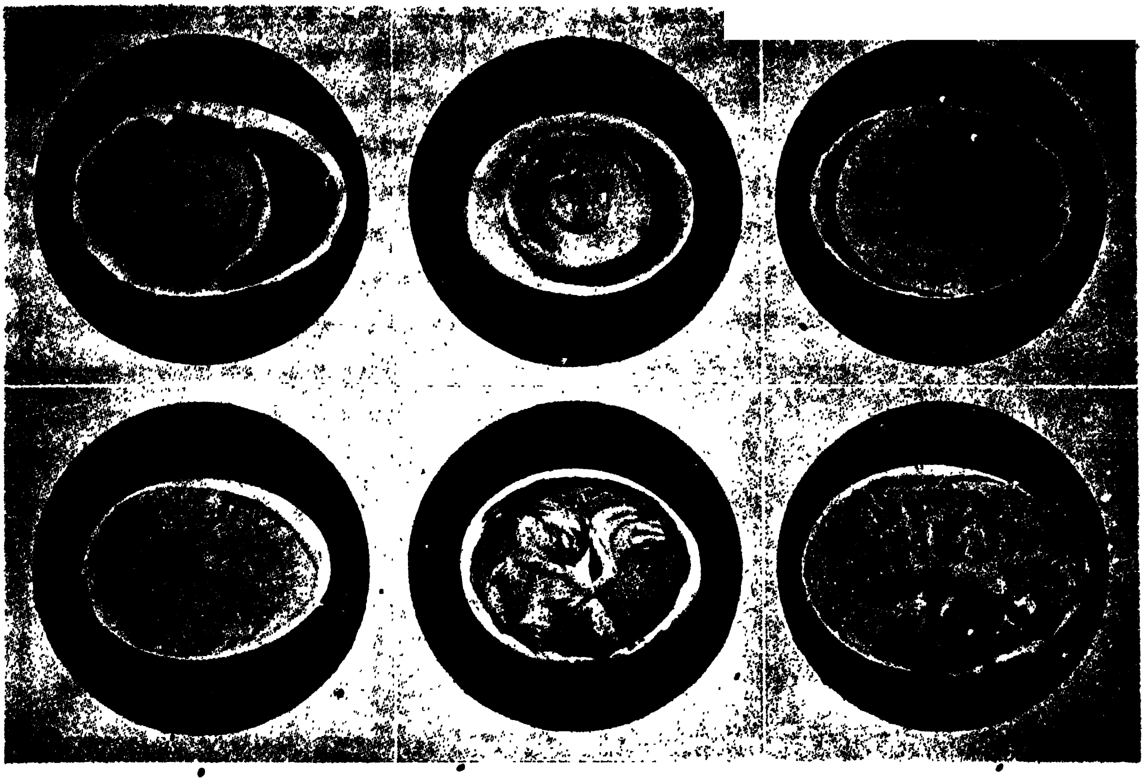
ডিম হইতে যখন বাচ্চা বাহির হয় তখন তাহার গা ভিজা থাকে। যেমন যেমন তাহার গা শুকাইতে থাকে অমনি ক্রমে-ক্রমে তাহার পালক ছড়াইয়া পড়ে।

কোনো পাখী একটি, কোনো পাখী বা ১২টি পর্য্যন্ত ডিম এক-সঙ্গে পাড়ে। প্রায় পাখীর ডিমই সাদা; কোনো কোনো পাখীর ডিম রঙিন বা চিত্রবিচিত্র হয়। ইপিয়োরনিস নামক পাখীর ডিম সর্ব্বাপেক্ষা বড়—এক-একটার বেড় দুই ফুটেরও বেশী। তাহার ডিমের খোলে তিন গ্যালন জল ধরে। ইহাই বোধ হয় রক-পাখী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া উপন্যাসে অমর হইয়াছে। অষ্ট্রিচ পাখীর ডিম আকারে খুব বড় বেলের মতন হইলেও ইহার তুলনায় তাহা অতি ক্ষুদ্র।

যে-সব পাখীর ছানা বাসায় পালিত হয় তাদের গায়ে জন্ম মাত্রেই পালক গজায় না; যারা ডিম হইতে বাহির হইয়াই হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে তাদের গা পালকে ঢাকা থাকে—যেমন মুরগীর ছানা। ডানা ও পুচ্ছে আগে পালক গজায়, পরে অন্যান্য অঙ্গে।

বড় পাখী বছরে দুবার পালক ছাড়ে—প্রধান সময় নূতন ডিম পাড়িবার আগে। হাঁসের ডানার সমস্ত পালক একসঙ্গে ঝরিয়া যায়; অন্য পাখীর ক্রমে-ক্রমে ঝরে।

পাখীর বিশেষত্ব যে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। পাখীর ডানা মানুষের হাতের স্থানীয় অঙ্গ। ব্রিটিশ গায়েনার হোয়াট্‌সিন নামক পাখীর সদ্যজাত ছানার ডানায়



ডিমের মধ্যে পক্ষীভ্রূণের ক্রমপরিণতি।

পালকের পাশে-পাশে কতকগুলি আঙুল ও নখ থাকিতে দেখা যায়। তাহারা এই ডানার নখ, পায়ের নখ ও ঠোঁট দিয়া বড় বড় উঁচু খাড়া গাছে চড়িতে পারে। এই ছানা বড় হইলে তাহাদের ডানার আঙুল ও নখ মিলাইয়া যায়। অনেক পাখী বড় হইলেও খাড়া গাছের বা দেয়ালের গা বাহিয়া উঠিতে পারে, তাহাদিগকে ইংরেজিতে Tree-creepers ও Wall-creepers বলে, যেমন কাঠঠোকরা।

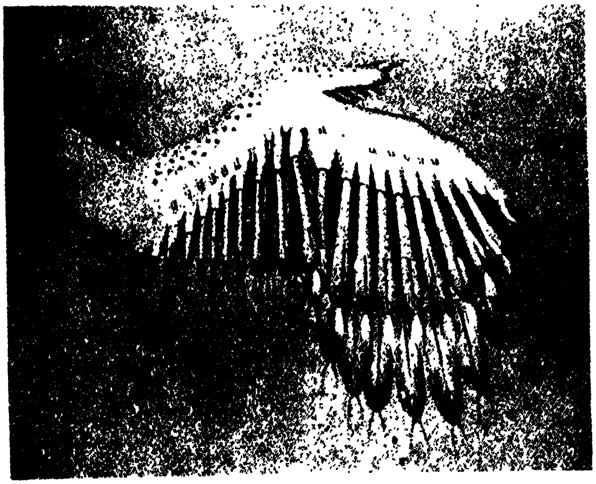
পাখীর সর্ব্বাঙ্গের হাড় ফাঁপা ও বাতাসে ভরা এবং চামড়ার নীচে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতাসভরা থলি থাকে, এজন্য তাহারা সহজে বাতাসে ভাসিয়া উড়িয়া বেড়াইতে পারে এবং এই জন্যই পাখীকে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারা একরূপ অসম্ভব। পাখীর অঙ্গের গড়ন উড়িয়া বেড়াইবার উপযুক্ত, নৌকার মতন বাদামী। সাধারণত পাখীর পায়ে সম্মুখের দিকে তিনটি ও পিছনের দিকে একটি আঙুল থাকে; একটু উপরে একটি নখ থাকে তাহাই পঞ্চম আঙুলের আভাস। অনেক পাখীর সম্মুখে দুটি ও পশ্চাতে দুটি আঙুল দেখা যায়। জলচর পাখীদের আঙুলগুলি একটা পাতলা সঙ্কোচনক্ষম চামড়া দিয়া জোড়া থাকে, তাহাতে তাহাদের জল টানিয়া সাঁতার দিবার সুবিধা হয়। কোনো কোনো পাখীর মাত্র তিনটা আঙুল থাকে;—দুটা সামনে, একটা পাশের দিকে প্রায় পিছনে।

পাখীর মধ্যে সব চেয়ে বড় অষ্ট্রীচ বা উট পাখী এবং সব চেয়ে ছোট টুনটুনি ও মৌচুষকি পাখী। এক জাতের মৌচুষকি ভ্রমরের চেয়ে ছোট হয়।

সকল পাখীর চেয়ে জাপানের ইয়োকোহামা-মোরগের ল্যাজ পাখীর শরীরের অনুপাতে লম্বা, ময়ূরের পুচ্ছের চেয়েও ঢের বড়। ময়ূরের পুচ্ছ সকল—পাখীর পুচ্ছ অপেক্ষা গোছে মোটা, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ও দেখিতে সুন্দর। ময়ূরের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে সে পুচ্ছ বিস্তার করিয়া পেখম ধরিতে পারে। ময়ূরের ন্যায় পেরু ও বেহালা-পাখীও পেখম ধরে। বেহালা-পাখী মাত্র অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। ছাতার পাখীও পেখম ধরে, তাহাদের পেখম পাখার মতন

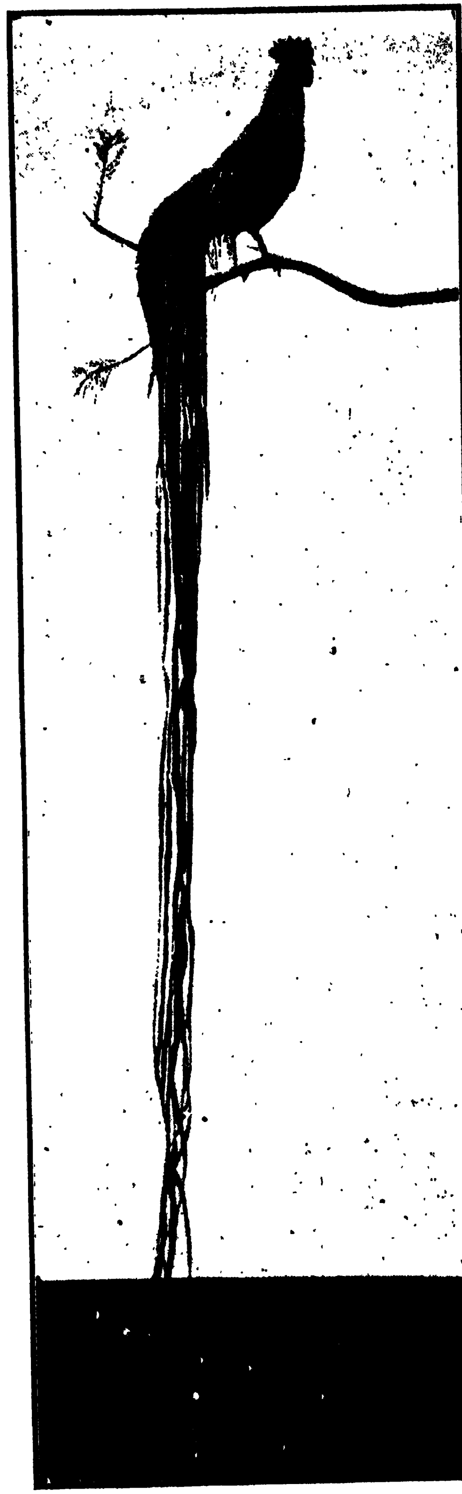


মুর্গীর বাচ্ছা উনিশ দিন তা পাইয়া পরিপুষ্ট অবস্থায় ডিম ভাঙিয়া বাহির হইবার উপযুক্ত হইয়াছে।



পাখীর হাত

ব্রিটিশ গায়েনার হোয়াটজিন্ পাখীর ডানায় আঙুল ও নখ। এই পাখী ডানা, পায়ের নখ ও ঠোঁট দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ধরিয়া খাড়া গাছে উঠিতে পারে।



ইয়োকোহামা-মোরগ—ইহাদের দু-রকম জাত হয়—সাদা

আকার ধারণ করে বলিয়া ইংরেজিতে এদের Fan-tail বলে, বাংলায় বলে ছাতা'র পাখী।

অষ্ট্রেলিয়াতে স্বর্গের পাখী নামে একরকম ছোট ছোট অতি সুন্দর পাখী আছে। এই স্বর্গের পাখীর অনেক রকম জাত, ইহাদের বিভিন্ন জাতের পালকের রং, সংস্থান ও ধরণ বিভিন্ন প্রকারের। এক জাতের স্বর্গের পাখীর পুচ্ছে ও মাথায় খুব সরু সরু তারের মতন বিচিত্র রঙের লম্বা লম্বা



বেহালা-পাখী।

পালক ও শিখা থাকে। এক্‌এক জাতের স্বর্গের পাখীর পালক এত প্রচুর ও বিচিত্র যে দেখিলে একটি গাছের ঝোপ বলিয়া মনে হয়। এই পাখী এত সুন্দর যে নাম হইয়াছে স্বর্গের পাখী, কিন্তু আসলে ইহারা কাকের জ্ঞাতি।

আমাদের দেশের বন-মুরগীর পুচ্ছ অনেক স্বর্গের পাখীর মতন লম্বা ও সুদৃশ্য। নরুন-পোঁছা পাখীর পুচ্ছে একটি পালক খুব সরু ও লম্বা হয় বলিয়া উহার ঐ নাম। গুয়েন্যাকড়া বা শা-বুলবুল পাখীর পুচ্ছ হইতে একটা লম্বা সাদা পালক ন্যাকড়ার ফালির ন্যায় ঝুলে। অষ্ট্রেলিয়ার এক জাতের কুঞ্জপাখীর গায়ে মরিবার ঠিক আগে টকটকে লাল পালক গজায়, অন্য সময় তাদের গায়ের পালকের রং অন্য রকম ও অনুজ্জ্বল থাকে।

পাখীর অপর একটি নাম খেচর; পাখী উড়িতে পারে-না বলিলে স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই অনেক পাখী মোটেই উড়িতে পারে না, অনেক পাখী অতি অল্পই উড়িতে পারে। মুরগী, পাতিহাঁস, প্রভৃতি গৃহপালিত পাখী অতি অল্পই উড়িতে পারে। অষ্ট্রিচ বা উটপাখী জাতীয় পাখীর ডানা থাকিলেও তাহাদের শরীর এত ভারি যে তাহারা মোটেই উড়িতে পারে না। আফ্রিকার অষ্ট্রিচ ৮ ফুট উঁচু হয়; উহাদের ডানাও প্রকাণ্ড, কিন্তু তাহাদের প্রকাণ্ড শরীরকে বাতাসে ভাসাইয়া রাখিবার মতন প্রকাণ্ড নয়; নৌকার পাল তোলার মতন ডানা মেলিয়া উহারা খুব জোরে দৌড়িতে পারে। এই দ্রুত দৌড়িবার শক্তি থাকাতে তাহারা সিংহ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া পাখীর ন্যায় জেব্রা ও হরিণের দলে চরে। পাখীর পায়ে চারটা করিয়া আঙুল থাকে, কিন্তু অষ্ট্রিচের আঙুল মাত্র দুটি, তাহারও একটি অতি ছোট, হয়ত অল্প দিনে তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইবে।

অষ্ট্রেলিয়ার এমু পাখীর ডানা সর্ব্বাঙ্গের পালকের মধ্যে এমন গুপ্ত হইয়া থাকে যে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না যে তাহার ডানা আছে। মোয়া পাখীর ডানা মোটেই নাই। তাহার শরীর ৭ ফুট উঁচু হয়। আপ্‌টারিক্‌স্ পাখীও খুব উঁচু, ডানা-হীন।



স্বর্গের পাখী।



ধ.গর পাখী
ইহাদের পুচ্ছের সরু সরু পালক তারের মতো।

নিউ জিলাণ্ডে কিউই, পেঁচা-টিয়া, ওেকা-রেল প্রভৃতি কয়েক প্রকার পাখী আছে যাহারা মোটেই উড়িতে পারে না। কিউই পাখী দেখিতে অনেকটা সজারুর মতন, ইহারা রাত্রে খুব জোরে কিউই-কিউই করিয়া চেঁচায়। কিউই-পাখীর আর-একটি বিশেষত্ব এই যে তাহারা যে ডিম পাড়ে তাহা তাহাদের আকারের চেয়ে বড় দেখায়।

মরিশাস ও মাডাগাস্কারের প্রাচীন বাসিন্দা, অধুনা লুপ্ত ডোডো সলিটেয়ার পাখী প্রভৃতিও উড়িতে পারিত না, তাহাদের ডানার আভাস মাত্র ছিল, তাহাতে কোনো কাজ হইত না।

এইসব বড় মেজো ছোট নানা আকারের পাখীর উড়িবার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কারণ খাদ্যের প্রাচুর্য্য, এবং প্রতিযোগিতা ও শত্রুর অভাব। এইরূপ নিশ্চিন্ত আয়েসে থাকিয়া উড়িবার আবশ্যক হয় না, এবং অব্যবহারে উড়িবার অঙ্গ ডানা ক্রমে জড় পঙ্গু হইয়া ছোট হইতে হইতে অবশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। তখন বাসস্থানের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন হইলে বা নূতন শত্রুর আবির্ভাব হইলে তাহাদের সবংশে উজাড় হইয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এইরূপে অনেক পাখী উজাড় পাইয়া এখন নামশেষ হইয়া আছে।

মেরুসন্নিহিত বরফে-ঢাকা দেশের বাসিন্দা পেঙ্গুইন পাখী উড়িতে পারে না; জোরে দৌড়িতেও পারে না। কারণ সেখানে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী অজাত-শত্রু হইয়া বাস করে। মেরুযাত্রী মানুষ গিয়া তাহাদের এখন উপদ্রব করিতেছে; লোকের তাড়া খাইলে তাহারা পা ও ডানা দিয়া চারপেয়ে জন্তুর মতন চলে।



বন-মুরগী
ইহাদের পুচ্ছ ও পালক নানান্ রঙের, কোনো কোনো জাত পেখম ধরিতেও পারে।

পাখীর পুচ্ছের উপরে একটি গ্রন্থি থাকে, তাহা হইতে তৈলক্ষরণ হইয়া পালকগুলিকে মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে; জলচর পাখীদের এই তৈলক্ষরণ বেশী হয় এবং তাহাতেই তাহাদের গায়ে জল লাগে না। অনেক পাখীর পালক আপনা-আপনি গুঁড়াইয়া ধূলা হইয়া শরীরে ছড়াইয়া যায়

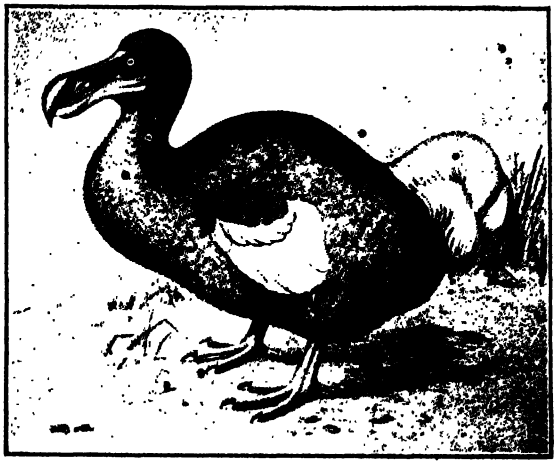


মোআ পাখী
সাত ফুট উঁচু; ডানা মোটেই নাই।

তাহাতেও তাহাদের পাউডার মাথার কাজ হয়, গায়ে জল লাগিতে পায় না; কাকাতুয়ার গলায় মাথার ঝুঁটির নীচে হাত দিলে এই পালক-গুঁড়া পাউডার হাতে প্রচুর লাগিতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণীর প্রাণী খাওয়ার জন্য বাঁচে, বাঁচিবার জন্য খায় না। পাখীদের ঠোঁট দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। যে পাখী যেরূপ আবেষ্টনের মধ্যে থাকে তাহার ঠোঁট তদুপযোগী হয়—সেই আবেষ্টনে সহজপ্রাপ্য খাদ্য গ্রহণের উপযোগী হইয়া ঠোঁট গড়িয়া উঠে। এইজন্য পাখীর ঠোঁটের আকারের অনন্ত প্রকার দেখা যায়।

কাকের ঠোঁট একাধারে ছোরা, কুড়ুল, হাতুড়ি, সাঁড়াশী, চিমটে প্রভৃতির কাজ করে। এরূপ ঠোঁট সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ রকমের কাজের জন্য বিশেষ আকারের বহু-প্রকার ঠোঁট আছে। কাঁচি-ঠোঁট পাখীর ঠোঁট খাড়াদিকে চেপ্টা, উপর ঠোঁটের চেয়ে নীচেরটা লম্বা, এবং ঠোঁট জুড়িলে সাধারণ ঠোঁটের মতন উপরাউপরি না পড়িয়া কাঁচির মতন পাশাপাশি পড়ে। এই পাখী জলচর, মৎস্যাশী। জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইবার সময় নীচের বড় ঠোঁটটা জলে ডুবাইয়া চলে এবং মাছের পোহানের ঝাঁকের নাগাল পাইলে টপ টপ করিয়া একটার পর একটা উপর ঠোঁটের চাপে কাঁচি-কাটা করিয়া গিলিতে থাকে।



ডোডো পাখী
মাডাগাস্কারের প্রাচীন বাসিন্দা, অধুনালুপ্ত; ইহার ডানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও অকর্ম্মণ্য ছিল।

বকের ও সারসের ঠোঁট বর্শার কাজ করে, মাছকে বিঁধিয়া মারিয়া খায়। মাছরাঙার ঠোঁট ছোরা আর চিমটের কাজ করে। কাদাখোঁচা ও বনমোরগের ঠোঁট যেন ডাক্তারী সন্না, তাহার শুধু ডগা দিয়া জিনিস ধরা যায়; কাদা জায়গায় ঠোঁট বিঁধাইয়া পোকা ধরিবার উপযুক্ত।

হর্ণবিল পাখীর বা শিং-ঠোঁট পাখীর ঠোঁট কিম্ভূত-কিমাকার,—তাহার ঠোঁটের উপরে একটা মোটা শিং গজায়, তাহা হাতুড়ির কাজে পোক্ত। অন্য পাখীর ঠোঁটের হাড়ের উপরকার চামড়া পাতলা ও নরম হয়; কিন্তু ইহার ঠোঁট যেমন শক্ত, উহার উপরের আবরণও তেমনি পুরু ও



পাখীর নানাবিধ ঠোঁট

ক—মার্গ্যান্‌সার মেছো পাখীর ঠোঁট। খ—মদ্দা হুইয়া পাখীর ঠোঁট; ইহারা পোকাখোর। গ—কোদাল-ঠোঁট-হাঁসের ঠোঁট। ঘ ফ্লামিঙ্গো বকের ঠোঁট—উভয়েই জলের উপর খিতানো সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্‌ও প্রাণী ছাঁকিয়া খায়।

কঠিন। ইহাদের ঠোঁটের উপরকার শিং খুব মোটা হইলেও তাহার ভিতর ফাঁপা হওয়াতে বেশী ভারী হয় না শিং-ঠোঁট পাখীর আকার কাকের মতন হইতে বড় পেরুর মতন পর্য্যন্ত হয়। এই পাখীর নানা জাতের ঠোঁটের উপরকার শিং নানা আকারের হয়। কাহারো শিং হয় খড়্গের মতন, কাহারো বা হাতুড়ির মতন, কাহারো বা বাঁকা, কাহারো সূচলো, কাহারো ভোঁতা। নেপালের শিং-ঠোঁট পাখীর ঠোঁটে দাঁতের মতন খাঁজ খাঁজ কাটা থাকে,

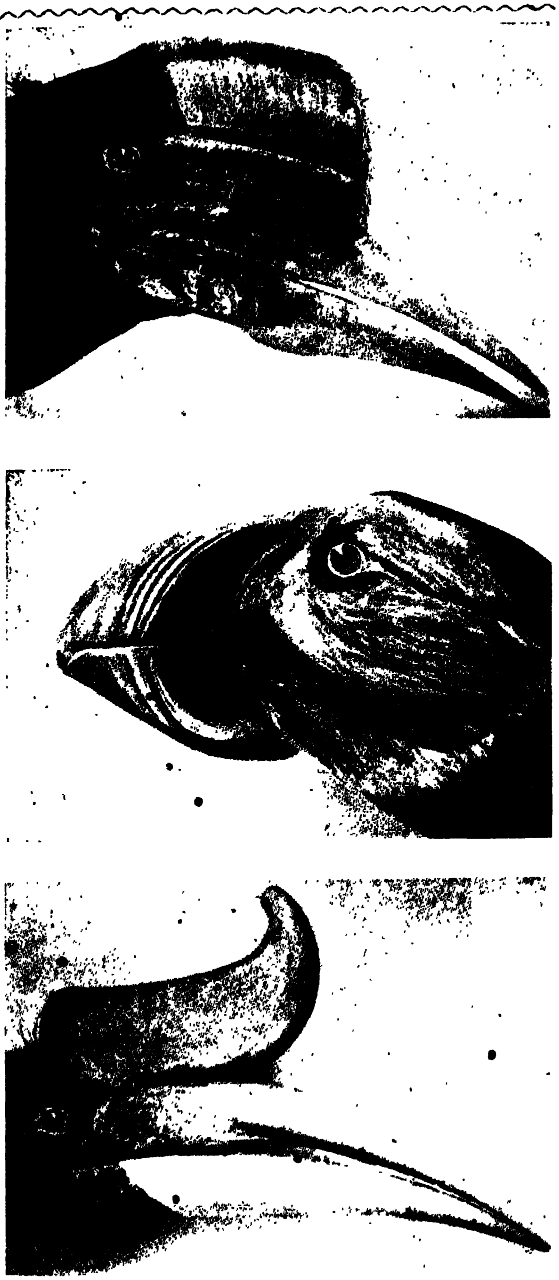


পাখীর নানাবিধ ঠোঁট

ঙ—ধনেশ পাখীর ঠোঁট এক জোড়া চামিচের মত। চ—বক জাতীয় হেরন পাখীর ঠোঁট, ছ—অ্যাভোসেট্ পাখীর ঠোঁট, এই তিনটিই মাছ ধরিয়া খাইবার উপযুক্ত। জ—মাদী হুইয়া পাখীর ঠোঁট, শন্নার মত পোকা ধরিবার উপযুক্ত।

কিন্তু তাহার দ্বারা ইহাদিগকে খাদ্য চিবাইতে দেখা যায় না, তাহারা সমস্ত জিনিষ গিলিয়া খায়। ইহাদের ডাক স্ত্রীলোকের বিলাপধ্বনির মতন। ইহারা গাছের ফুকোরে বাসা করে। ডিম পাড়িবার সময় মাদী পাখী ফুকোরের মধ্যে গিয়া বসে এবং মদ্দা পাখী খড়কুটায় কাদা মাখিয়া সেই ফুকোরের মুখ প্রায় বন্ধ করিয়া দ্যায়। একটু যে ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর দিয়া মাদী পাখী মাঝে মাঝে ঠোঁট বাহির করিয়া দ্যায় এবং মদ্দা পাখীটা তাহার আহার জোগায়। এই পাখীকে দেখিয়াই প্রাচীনকালের আরব ও ইটালীয়দের মধ্যে ফিনিক্স পাখীর কাল্পনিক গল্প চলিত হইয়াছিল। এই পাখী ভারতবর্ষে ও সিংহলে প্রচুর।

ইহাদের এক জাতি মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে। সেখানে ইহাদের শব্দ হইতে ইহাদের নাম হইয়াছে ঠকঠকান্। ইহাদের শরীরের অনুপাতে ঠোঁট অতি প্রকাণ্ড, দেখিলেই আগে ঠোঁটই নজরে পড়ে এবং মনে হয় পাখীর শরীরের চেয়ে ঠোঁটটাই খড়। ইহাদের ঠোঁটের কিনার

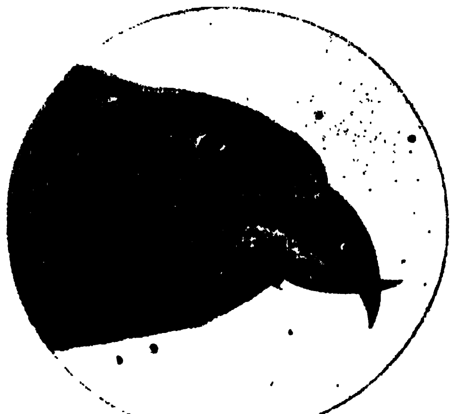


পাখীর নানাবিধ ঠোঁট
উপরে ও নীচে দুই জাতের শিং-ঠোঁট-পাখীর ঠোঁট ও মাঝে মাছখোর পাফিন্ পাখীর ঠোঁট।

করাতের দাঁতির মতন কাটাকাটা, তাহা দিয়া ইহারা খাবার চিবাইয়া খায়। ইহাদের ঠোঁটের রং উজ্জ্বল ও সুন্দর এবং তাহাতে বিচিত্র আকৃতির নক্সা কাটা থাকে। ইহাদের ঠোঁট প্রকাণ্ড হইলেও বাতাস-ভরা-কোষের সমবায়ে গঠিত বলিয়া খুব হাল্কা।

কাকের ঠোঁট কুড়ুলের কাজ চালাইতে পারে বটে, কিন্তু কাঠঠোকরার ঠোঁট কাঠ চেলাইতে সকল ঠোঁটের চেয়ে মজবুত। কাঠঠোকরা বেশ বুঝিতে পারে কোন্ গাছের খোল ফোঁপরা হইয়া গিয়াছে; সে সেই ফোঁপরা গাছের কঠিন পাশ-দেয়াল ফুটা করিয়া তাহার মধ্যে বাসা করে ও নিরাপদে ডিম পাড়িয়া বাচ্চা পালে।

টিয়া, কাকাতুয়া, ময়না, লালমন, হীরামন প্রভৃতির ঠোঁট কাতুরী-কাঁচির কাজ করে; তাহাদের নীচের ঠোঁট খাটো, সামনে আড়া-আড়ি ধার, তাহার উপর উপর-ঠোঁট পড়িয়া চাপ দিলে সহজেই সকল জিনিস কাটিয়া যায়। ইহাতে তাহারা কঠিন খোলার বাদাম আখরোটও কাটিয়া খাইতে পারে।



ঢ্যারা-ঠোঁট পাখীর ঠোঁট।

যে-সব পাখী মাংস ছিঁড়িয়া খায় তাহাদের ঠোঁট ডগায় খুব চোখা হয় এবং অনেকের ঠোঁটের কিনারে সারিসারি দাঁত থাকে। শিক্‌রে বাজপাখীর ঠোঁট বঁড়শীর মতন বাঁকা চোখা, অধিকন্তু কিনারের তীক্ষ্ণধারের উপর একটি করিয়া দাঁত থাকে।

যে-সব ছোট টুন্‌টুনি পাখী ফুলের মধু পান করে তাহাদের ঠোঁট খুব সরু লম্বা ও ঈষৎ বাঁকা হয়; তাহারা ফুলের মধুকোষে ঠোঁট বিঁধাইয়া মধু চুষিয়া খায়। ইহাদের ঠোঁট কাটা-কাটা করাতের দাঁতির মতন, কীট পতঙ্গ ধরিবামাত্র পিষিয়া যায়। ইহাদের জিভও খুব লম্বা—চট করিয়া বাহির করিয়া চট করিয়া গুটাইয়া লইতে পারে এবং চটচটে থুতুতে ফুলের পোকা আটকাইয়া মুখের মধ্যে লইয়া

আসে। ইহাদের পুচ্ছের দুপাশের দুই গুচ্ছ পালক খুব লম্বা হয়।

ধনেশ পাখীর ঠোঁট একজোড়া চামচের মতন, তাহার বিশেষ খাদ্য আহরণের উপযুক্ত। হাঁসের ঠোঁটও অনেকটা এইরূপ। ইহারা গুগলি শামুক ঝিনুক ভাঙিয়া খায়, অথবা জলের উপর যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী বা সূক্ষ্ম উদ্ভিদ জমিয়া থিক-থিক করে সেইগুলিকে জল হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া খায়।

আফ্রিকার নীল নদের ধারে একরকম বক চরে তাহার ঠোঁট অদ্ভুত রকম চওড়া; তাহাকে সেইজন্য আরবেরা জুতো-মুখো পাখী বলে; সুদানের আরবেরা বলে জুতোর জনক; কেহ বা বলে আবু মরকব বা জাহাজের হাইল। ইহারা সাপ, ব্যাং, মাছ, শামুক, ঝিনুক খায়।



ঠক্-ঠকান্ পাখী
কাঠঠোকরা জাতের সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাখী, ঠোঁটের ডগা হইতে ল্যাজের ডগা পর্য্যন্ত ২ ফুট, কিন্তু ইহার ঠোঁটটাই ৮ ইঞ্চি। ঠোঁট খুব শক্ত কিন্তু হাল্কা।

অনেক পাখীর ঠোঁট থাকিলেও আহার সংগ্রহে তাহারা ঠোঁটের ব্যবহার করে না। নাইট-জার বা রেতের বোতল পাখী ঠোঁট মেলিয়া প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে, পোকা মাকড় উড়িয়া গিয়া তাহার গলার বোতলে পড়িলে গিলিয়া খায়। এইরূপ অব্যবহারে তাহাদের ঠোঁট প্রকাণ্ড আকারের ও মাথার তুলনায় অতিশয় ছোট হইয়া পড়িয়াছে।

অনেক পাখীর ঠোঁটের উপর থোপা হইয়া পালক গজায়—যেমন রক্তরাঙা পাহাড়িয়া ময়না।



জুতো-ঠোঁট পাখী।

অনেক পাখীর মাথায় বিচিত্র আকারের পালকের চূড়া হয়, কাহারও বা শিং হয়। আমেরিকার কুরাসৌ পাখীর মাথায় টকটকে লাল তিন ইঞ্চি শিং গজায়, মাদি পাখীর কিছু ছোট হয়।

বর্ত্তমান কালে যত রকম শিকারী পাখী আছে তাহার মধ্যে আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলের বাসিন্দা ঈগল পাখী সব চেয়ে বড়। শকুনি গৃধিনী ডানা মেলিলে এক ডানার ডগা হইতে আর-এক ডানার ডগা পর্য্যন্ত মাপে ঈগলের চেয়ে বড় হইতে পারে, কিন্তু শরীরের মাপে আমেরিকার



শিংওয়ালা ডুবনো পাখী
বা
পাহাড়ে মোরগ।

ঈগল তাহাদের অপেক্ষা বড়। ফিলিপাইন দ্বীপে এক রকম ঈগল পাখী আছে, তাহাদের মুখের ভাব কতকটা বানরের মতন ও কতকটা পেঁচার মতন। তাহারা কেবল মাত্র বানর মারিয়া খায়। এক ছোঁয়ে বানরকে ধরিয়া তীক্ষ্ণ নখে তাহার হৃদপিণ্ড বিঁধিয়া নিমেষ মধ্যে মারিয়া ফেলে। অনেকে বলেন বানরের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে এই হার্পি-ঈগল বানরের আকৃতি লাভ করিয়াছে।

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় এক রকম পাখী আছে তাহারা মাথার পালক ছাতার মতন ছড়াইয়া দিতে পারে। এইজন্য তাহাদিগকে ছাতা-পাখী বলে। ইহাদের গলা হইতে একটা লম্বা নল ঝুলে, কাহারও বা নলের উপর গলায় একটা চওড়া ঝুলিও থাকে, যেন ব্যাগ-পাইপ বাজনা। এই নলের গায়ে পালক থাকে না, চামড়ারই রং খুব উজ্জ্বল লাল ও হলদে হয়। এই নলের সহিত তাহাদের স্বর-নালীর যোগ থাকে, তাহাতে ইহাদের ডাক শানাইয়ের বা ব্যাগ-পাইপের গানের মত খুব চড়া অথচ সুমিষ্ট হয়।

পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে পাখীর প্রকার অসংখ্য। সেখানে পাখীর শত্রু অন্যান্য জীবও বহু প্রকারের। সেইজন্য সেখানে পাখীরা আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য যত প্রকারের বাসা নির্ম্মাণ করে তত আর কোথাও দেখা যায় না। যেখানে গাছ-চড়া পশু ও সাপের ভয় বেশী, সেখানকার পাখীরা গাছের ডাল হইতে ঝুলাইয়া দোদুল্য বাসা নির্ম্মাণ করে।



বানরখোর হার্পি ঈগল
ইহাদের মুখে কতকটা পেঁচা ও কতকটা বানরের ভাব।

ভারতবর্ষে বাবুই পাখী খড় দিয়া কুঠরীওয়ালা লম্বা লম্বা বাসা বুনিয়া শাখা-প্রশাখাহীন লম্বা তাল-গাছের ডগায় ঝুলাইয়া দ্যায়। এই বাসার বুনন অতি পরিপাটি। শত্রু যাহাতে শীঘ্র বাসায় ঢুকিতে না পারে এজন্য লম্বা সুঁড়িপথ থাকে; এবং বাসার পাশে একটা দরজার মতন ফাঁক থাকে, কিন্তু তাহা ভিতরে বন্ধ, সে পথ দিয়া বাসার ভিতরী-ঘরে যাওয়া যায় না, ইহা শত্রুদের ধোকা দিবার জন্য তৈয়ারি হয় মাত্র। অতি ছোট টুনটুনি পাখী ডিমপোবার ওটি

হইতে সুতা সংগ্রহ করিয়া অথবা যেখানে যেটুকু সুতা কুড়াইয়া পায় তাহাই খুঁটিয়া আনিয়া গাছের একটি অথবা একাধিক পাতাকে ঠোঙার আকারে ঠোঁট দিয়া সেলাই করে। সেলাই যাহাতে খুলিয়া না যায় সেজন্য সুতার একপাশে একটা গিঁট বাঁধিয়া দ্যায়। সেই সেলাই-করা পাতার ঠোঙার মধ্যে নরম খড় তুলা দিয়া বাসা করে। তুলা যাহাতে উড়িয়া না যায় তাহার জন্য পাতার গায়ে ছেঁদা করিয়া একটু একটু তুলা ঠেলিয়া বাহির করিয়া দ্যায়। যদি কখনো কোনো পাতা শুকাইয়া গাছ হইতে খসিয়া যায় তবুও তাহা অপর পাতার সঙ্গে সেলাই করা থাকাতে পড়িয়া যাইতে পারে না।



ছাতা পাখী

ইহাদের গলা হইতে এক একটা নল ঝুলে এবং মাথার পালক ছাতার মতন বিস্তারিত করিতে পারে।

আফ্রিকার দক্ষিণে এক রকম তাঁতী পাখী আছে। তাহারা উদ্ভিদের তুলা ও ভেড়ার গা হইতে লোম ছিঁড়িয়া সুতা পাকায় এবং একটা ঝোপের মাথায় কয়েকটা কাঠির গায়ে সুতার টানা পোড়েন বাঁধিয়া কাপড় বুনে এবং তাহার উপর একটা চাঁদোয়া খাটায়। এই বাসা দেখিতে



মৌচুষকি ও টুন্‌টুনি পাখীর বাসা

১—এই বাসাটি খড় কুটা মাকড়সার জাল দিয়া বাঁধিয়া তৈয়ারি ও গাছের ডাল হইতে ঝুলানো। ২—এই বাসাটি তুলা ও পশুর লোম দিয়া তৈয়ারি। ৩—দুটি পাতা সেলাই করিয়া থলির আকারে প্রস্তুত। ৪—শেয়ালা জমাইয়া তৈয়ারি।

ঘড়ির পকেটের মতন হয়। তাহার মধ্যে দোতলায় স্বতন্ত্র একটি ঘর থাকে। সেইটি মদ্দা পাখীর শোবার ঘর। তাঁতী-পাখীরা যখন চরিতে বাহির হইয়া যায় তখন তাহারা বাসায় ঢুকিবার পথ সেলাই করিয়া রাখিয়া যায়; ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিতে না পারিয়া অনেক সময় নিজেরাই ফাঁপরে পড়ে।

ভারতবর্ষের ও ফিলিপাইন দ্বীপের দুগ্‌গা-টুন্‌টুনি পাখী শুকনো পাতা, খড় গাছের আঁশ দিয়া ডিম্বাকৃতি ঠোঙা করিয়া মাকড়সা শুঁয়োপোকা প্রভৃতির জাল দিয়া বাঁধিয়া সরু ডালের ডগায় ঝুলাইয়া বাসা বাঁধে। এই বাসায় ঢুকিবার জন্য ইহার পাশে একটা গর্ত্ত কাটা থাকে এবং তাহার উপর একটা বারান্দা বাহির করা থাকে, তাহাতে শত্রুরা প্রবেশপথ দেখিতে পায় না, ও পাখী বাসায় বসিয়া



সামাজিক চড়ুই পাখীর বাসা
বাবলা গাছের উপরে উলুখড় দিয়া চাল ছাওয়ার মতন বাসা বাঁধিয়াছে।

জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া থাকিলে তাহাকেও কেহ দেখিতে পায় না ও তাহার মাথায় বৃষ্টির জল পড়ে না।

মধু-চুষকি বা মৌটুশকি পাখীর বাসা ভারি স্থন্দর, যেন ছোট ছোট মনিব্যাগের মতন। কোনো-কোনোটা ঝুলি বা থলির মতন। তাহার বুনন আগাগোড়া সমান ও সংহত।

দক্ষিণ আফ্রিকায় চড়ুইপাখীর ন্যায় এক রকম পাখী আছে, তাহারা বেশ সামাজিক—গাছের ডালে ঘাস দিয়া খুব বড় একটা বাসা বুনে ও তাহার মধ্যে অনেক কুঠরী করে, একএক কুঠরীতে একএক জোড়া পাখী বাস করে। এই বাসা দেখিতে ঠিক মানুষের ছাওা খোড়ো ঘরের চালের মতন; যখন তাহাদের গ্রামে নূতন পাখী আসে তখন তাহার জন্য নূতন কুঠরী যোগ করা হয়, অপরের বাস-করা খালি কুঠরীতে কেহ থাকে না। এইরূপে ক্রমশ তাহাদের বাসা বাড়িয়া চলে।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে এক রকম টুনটুনি পাখী আছে তাহারা মাটির সঙ্গে সমান্তরাল (horizontal) একটা ডাল খুঁজিয়া তাহার উপর কাদা দিয়া তন্দুরের আকারের বাসা তৈয়ারি করে। ইহাকে হাঁড়ি-বাসী পাখী বা কুমোর-পাখী বলা যাইতে পারে। ইহাদের বাসা এমন এঁটেল মাটিতে তৈয়ারি হয় যে উহা রোদে শুকাইয়া পোড়া ইটের মতন শক্ত হইয়া যায়। উহার প্রবেশের পথও এমন প্যাচালো ও দরজার পিছনেই এমন একটা শক্ত দেয়াল খাড়া থাকে যে দরজার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া কেহ যে পাখীর ডিম বা ছানা চুরি করিবে তাহার জো রাখে না। এজন্য ঐ পাখী তাহার বাসা লুকাইবার কোনো চেষ্টাই করে না, বেশ সদর জায়গাতেই গড়বন্দি বাসা বাঁধিয়া বাস করে।



কুমোর পাখীর হাঁড়ির মতো বাসা।

ফ্লামিঙ্গো নামে বক জাতীয় সারস-পাখীরা জলার ধারে একএকটা মিছরির কুঁদোর আকারের মাটির ঢিপি গড়িয়া তাহার উপরে ডিম পাড়ে।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক-রকম পাখী আছে তাহারা শুকনো ঘাস পাতা জড়ো করিয়া তাহার উপর ডিম পাড়ে এবং ডিমের উপর ঘাস পাতা চাপাইয়া ঢেরি লাগাইয়া দ্যায়। এই ঢিপির বেড় ৪৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়। ঢিপির ঘাস পাতার তাতে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

এক জাতের ফিঙে পাখী থুতু দিয়া তুলোওালা বীজ জুড়িয়া জুড়িয়া বাসা বানায়। অপর জাতের ফিঙে থুতু দিয়া শেয়ালা জমাইয়া ঠোঙার আকারে বাসা করে। অন্য এক জাতের ফিঙের থুতু এত প্রচুর ও আঠালো যে তাহারা কেবল মাত্র থুতু জমাইয়া বাটির মতন বাসা গড়ে ও সেই বাসা বাড়ীর

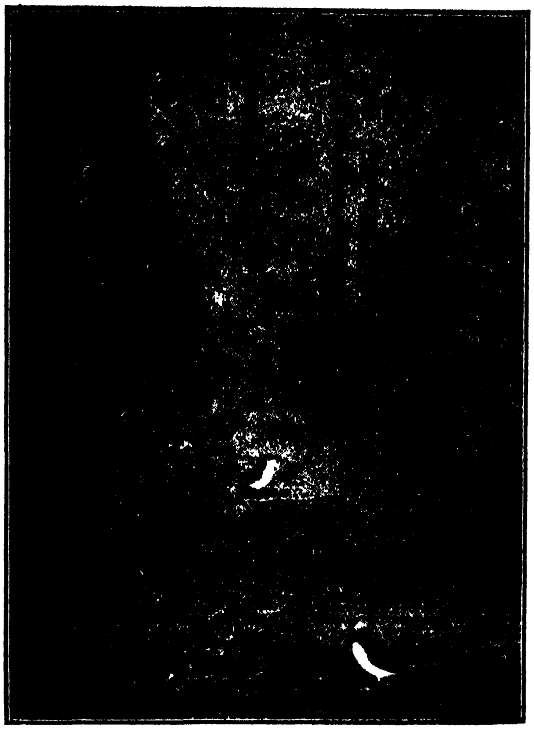
দেয়ালের গায়ে বা পাহাড়ের খাড়া গায়ে থুতু দিয়া ব্রাকেটের মতন আঁটিয়া দ্যায়। এই পাখীর বাসা চীনেরা সংগ্রহ করিয়া ঝোল রাঁধিয়া খায়; ইহা তাহাদের ভোজের বিলাস-দ্রব্য; এজন্য ইহা বাজারে খুব চড়া দামে বিক্রয় হয় এবং যেসব জায়গায় এই পাখী বাসা বাঁধে সেখান হইতে বাসা সংগ্রহের ইজারা-পত্তনি চড়া খাজনায় বিলি করা হইয়া থাকে।

কুঞ্জ পাখী বাসা বাঁধে অতি সাধারণ রকমে, কিন্তু প্রিয়-মিলনের জন্য আলাদা একটি কুঞ্জ রচনা করে। ইহাদের বিভিন্ন জাতের কুঞ্জরচনা বিভিন্ন প্রকারের। কেহ বা কাঁচা পাতা ছিঁড়িয়া একটি পরিষ্কার জায়গায় গোল করিয়া ছড়াইয়া দ্যায়। কেহ বা শুকনো কাঠি দিয়া একটা চাটাই বুনিয়া তাহাতে গোল করিয়া কাঠি খাড়া করিয়া গুঁজিয়া দ্যায় ও শামুকগুলির খোলা, নুড়ি, পালক, হাড় যা যেখানে পায় কুড়াইয়া আনিয়া কুঞ্জগৃহ সাজায়। ইহারা চকচকে ধাতু দ্রব্য



ফিঙে পাখীর থুতু-জমানো বাসা, চীনাদের প্রিয় খাদ্য।

দিয়া ঘর সাজাইতে ভালোবাসে, এজন্য গৃহস্থের বাড়ী চুরি করিতে যায়। কুঞ্জ রচিত হইলে মদ্দা পাখী ঠোঁটে একটি কাঁচা পাতার রুমাল ঝুলাইয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচিতে-নাচিতে গান গাহিয়া প্রিয়াকে আবাহন করিতে থাকে; ইহাদের গানের শব্দও অদ্ভুত—যেন ছেঁদাবোজা একটা নলের মধ্য দিয়া জল ঢালা হইতেছে। এক জাতের কুঞ্জ-পাখী একটা সোজা চারা গাছের চারিধারে মণ্ডলাকারে কাঠি পুতিয়া পানের বরোজের মতন মাথা-ঢাকা কুঞ্জ তৈয়ারি করে ও দরজার সামনে কোমল শষ্প ও শেয়ালা লাগাইয়া তাহার উপর ফুল পাতা ও রংচঙা



কুঞ্জ পাখীর কুঞ্জ রচনা ও কুঞ্জ সজ্জা।

পোকা ছড়াইয়া বাগান সাজায়; এইসব জিনিস বাসি হইয়া গেলে তুলিয়া কুঞ্জের পিছনে ফেলিয়া দ্যায় ও টাটকা ফুল পাতা তুলিয়া আনে। অপর এক জাতের কুঞ্জ-পাখী কুঞ্জ রচনা করে এইরূপে—এক জায়গায় পাশাপাশি দুইটা গাছ পাইলে দুইটি গাছের কাণ্ড বেড়িয়া কাঠি সাজাইয়া উঁচু করিতে থাকে; কাঠির বরোজ উঁচু হইয়া দুইটিতে যতক্ষণ না ঠেকাঠেকি হয় ততক্ষণ উঁচু করিতে থাকে। তাহার পর ফুল পাতা শামুক ঝিনুক ধাতুখণ্ড পোকা মাকড় শেয়ালা ফার্ণ দিয়া বরোজ সাজায়। মদ্দা পাখীরাই স্থপতি আর্টিষ্ট। সাজানো হইলে গৃহপতি আত্মীয় কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে; অভ্যাগতেরা গৃহসজ্জার খুঁত ধরিয়া যদি একটি পাতা কি ফুল একটু সরাইয়া বসায় অমনি গৃহ-পতির সৌন্দর্য্যবোধ অপমানিত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। এই কুঞ্জ-পাখী বা বরোজপাখী কাকের জ্ঞাতি। কাকেরও জ্ঞাতিধর্ম্ম অনুসারে চকচকে জিনিসের প্রতি অতিলোভ আছে এবং সুবিধা পাইলেই চকচকে জিনিস চুরি করিয়া লইয়া গিয়া আপনার বাসায় গুঁজিয়া রাখে।



হরবোলা পাখী।

যে-সব পাখীর বাচ্চা একেবারে ডিম ফুটিয়াই হাঁটিতে পারে তাহারা বাসা বাঁধে না; যাহাদের বাচ্চার জন্মের অনেক পরে পালক গজায় ও হাঁটিবার উড়িবার সামর্থ্য হয় তাহারাই বাসা বাঁধে। কিন্তু কোকিল প্রভৃতি পরভৃত পাখীরা নিজেরা বাসা বাঁধিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া অপর পাখীর বাসায় তাহার ডিম ফেলিয়া দিয়া আপনার ডিম পাড়িয়া আসে এবং পরকে দিয়া নিজের বাচ্চার লালন পালন করাইয়া লয়।

পাখী দাম্পত্য-প্রেম ও নিষ্ঠা এবং অসহায় সন্তানের প্রতি স্নেহের জন্য বিখ্যাত; এইজন্য তাহাদিগকে অপর সকল প্রাণী অপেক্ষা অধিক মনুষ্যধর্ম্মী ও শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

পাখীর মতন সুমিষ্ট স্বর আর কোনো জন্তুর নয়; গাইয়ে পাখীদের কণ্ঠনালী এইজন্য বিশেষ আকারে গঠিত। অনেক পাখী মানুষের কথার নকল করিতে পারে, যেমন— কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না। হরবোলা পাখী সকল রকম শব্দ নকল করে।

পাখীরা এইসব নানা কারণে কবির কাব্যে বহু সমাদৃত।

চারু।

দেশের কথা

স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে "রংপুর-দর্পণ" লিখিয়াছেন—

ছেলেমেয়েদিগকে উপযুক্ত করিতে হইলে পিতা-মাতারও উপযুক্ত শিক্ষা আবশ্যক। সুতরাং গৃহ-শিক্ষা কোমলপ্রাণা নারীদিগের হস্তেই অর্পিত হয়। তাই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন। স্ত্রী-শিক্ষার অর্থ ইহা নহে যে, আমাদের নারীদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিতে ভূষিত করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে এমন ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে যে, তাঁহারা যেন সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষদিগকে সাহায্য করিতে পারেন। গৃহকর্ম্ম ছাড়া এই-সমস্ত বিষয়ে নারীদিগের অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।—(১) নারীদিগের বাঙ্গলা ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। রামায়ণ, মহাভারত জ্ঞান থাকিবে; দেশের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসে যথেষ্ট জ্ঞান থাকিবে; দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিষয় তাঁহারা জানিবেন। (২) ইংরেজী ভাষায়ও নারীদিগের অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা আবশ্যক (৩) স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও মোটামুটী জ্ঞান আবশ্যক;—first aid to the injured অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। (৪) আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মোটামুটী ভাবে ভূগোলে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা কত? বাঙ্গলা দেশ কত জেলায় বিভক্ত? দেশের ও জেলার প্রধান কর্ত্তা কে? দেশের নদনদী কিরূপ ভাবে সন্নিবেশিত ইত্যাদি।

আমাদের দেশে আজকাল কিছুকিছু স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য সভ্য-দেশের তুলনায় তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আমাদের দেশের পুরুষেরা সাধারণত স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী, সেইজন্য যে-সব নারী উচ্চশিক্ষা লাভ করেন পুরুষেরা ও দেশের অশিক্ষিতা নারীরা তাঁদের ভালো চোখে দেখেন না। এটা দুঃখের কথা হইলেও অস্বাভাবিক নয়, কারণ প্রচলিত রীতি বা প্রচলিত আদর্শ ছাড়িয়া নূতন আদর্শ গড়িতে চাহিলে বা নূতন পথে চলিতে চাহিলে সনাতনপন্থীদের হাতে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। অগ্রণী যিনি তাঁর গৌরবই এইখানে; তিনি নূতন আদর্শ স্থাপনা করিতে গিয়া অশেষ দুঃখ ও অপমান মাথা পাতিয়া লইবেন পরবর্ত্তীগণের পথ সুগম করিবার জন্য। জগতের ইতিহাস সকল সাধু অনুষ্ঠানের সকল অগ্রণীদের নিগ্রহের কাহিনীতে পূর্ণ। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিতা নারীরা যদি কেবল নিজেরা শিক্ষিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, দেশের সাধারণ নারীদের মতই জীবন যাপন করেন তাহা হইলে দেশ বঞ্চিত হইল। যাঁর যেমন শক্তি তাঁর সেই পরিমাণে দেশকে কিছু দেওয়া

উচিত। অন্তত প্রত্যেক শিক্ষিতা নারী আর দু-চার জন নারীকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া কিছু কিছু শিখাইয়া দিতে পারেন। আরো কত রকমে দেশের ভালো করিতে পারেন। তবে দেশকে বুঝিতে হইলে চিনিতে হইলে দেশের পথে বাহির হইতে হইবে, দেশের দশজনের সঙ্গে আলাপ করিতে হইবে—ঘরের মধ্যে বসিয়া দেশের ভূগোল মুখস্থ করিলে বা কেবল খবরের কাগজ পড়িলে দেশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বাড়িবে না; দেশ-সেবার পথ কোন্ দিকে তা নির্ণয় হইবে না। অন্যান্য সভ্যদেশে শিক্ষিতা নারীরাই অধিকাংশ পুণ্য-অনুষ্ঠানের অগ্রণী, তাঁরা পুরুষের মতই একাগ্রচিত্তে খাটিয়া থাকেন। আমাদের অল্পসংখ্যক মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন বটে কিন্তু তাঁদের মনের কুণ্ঠা ঘোচে নাই, দশজনের সঙ্গে মেলামেশা দূরের কথা, তাঁরা রাস্তার উপর দিয়া পায়ে হাঁটিতে অক্ষম। তাঁদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন পা-দুখানি দার্জ্জিলিং, মধুপুর প্রভৃতি কয়েকটি বাছা বাছা শহরের রাস্তা হাঁটিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল, যে-সে পথ মাড়াইবার জন্য নয়। এ বিষয়ে শিক্ষিতা মেয়েরা বর্ণজ্ঞানহীন মেয়েদের সমতুল্য। তাঁরাও দেবমন্দিরে বা গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় পথ হাঁটিতে পারেন, কিন্তু যেই কোনো আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী বা অন্য কোথাও যাইতে হইল অমনি গাড়ীর দরকার! মন হইতে সকল কুণ্ঠা সকল কুসংস্কার দূর করিলে তবে দেশের কাজে লাগিতে পারা সম্ভব হইবে। সমাজের কুচক্ষুকে ভয় করিলে দেশবাসীর সামনে নারীর স্বাধীনতা শিক্ষার নব আদর্শ স্থাপিত হইবে কেমন করিয়া? [illegible]র আর-একটি কথা; প্রতিবৎসর মেয়েরা বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছেন, কেহ কেহ খুব কৃতিত্বও দেখাইতেছেন, কিন্তু ইদানীং তো দেখা যায় না একটি মেয়েও কিছু নূতন সাহিত্য, সঙ্গীত বা সুকুমার শিল্প সৃষ্টি করিতেছেন। বাংলা দেশে যে জনকতক নারী উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁদের সংখ্যা দশের কোঠাতেও পড়ে না। এমন অবস্থা কেন হইল সে-কথা ভাবিবার বিষয়। একটি প্রধান কারণ মনে হয় দেশের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ের অভাব। এই জন্য তাঁদের মন সঙ্কীর্ণ থাকিয়া যায়, দেশের জীবনের বড় বিচিত্র লীলা তাঁদের চোখে পড়ে না, দেশের দৈন্য অভাব ব্যর্থতা তাঁদের বিচলিত করে না। মন নাড়া না পাইলে সাহিত্য সৃষ্টি হইবে কেমন করিয়া? দেশকে কিছু দিতে হইলে, দেশকে নানারকমে সমৃদ্ধ করিতে হইলে, গৃহকোণ ছাড়িয়া দেশবাসীর ভিড়ের মধ্যে আসিয়া নারীর দাঁড়ানো আবশ্যক। সনাতনপন্থী হয়তো বলিবে—নির্লজ্জ! কিন্তু যে-লজ্জা নারীকে স্বদেশ হইতে দূরে রাখে, যে-লজ্জা নারীকে প্রকৃত নারীত্ব হইতে বঞ্চিত করে, সে-লজ্জা তো ত্যাগ করাই বিধেয়।

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট অনেক দিন পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। কমিটি হিন্দুপ্রণালী অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা প্রদানের জন্য মত দিয়াছেন। তা ছাড়া মেয়েদের প্রধানত বাংলার সাহায্যেই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে। কমিটির প্রস্তাব কাজে পরিণত হইলে সুফলের আশা আছে।

আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে। কেবল সরকার বাহাদুরের কাছে দুঃখ নিবেদন করিয়া, ভগবানের কাছে হাত জোড় করিয়া বা অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কিছু হইবে না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় চিন্তা করা দরকার। "ত্রিপুরা-হিতৈষী" এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া বলিতেছেন—

"আবহ" বিভাগ হইতে গবর্ণমেণ্ট যথাসময়ে বর্ষার ভাবী অবস্থা ঘোষণা করিলে ভাল হয়। তাহা হইলে কৃষকবর্গও অবস্থা বুঝিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে। এই ঘোষণা যাহাতে দেশের সমস্ত লোক সহজে অবগত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সঙ্গত। প্রত্যেক পুলিশ ষ্টেশন দ্বারা প্রতি গ্রামে ইহার প্রচার করাইলে সকল কৃষকবর্গ ইহা অবগত হইতে পারে। যদি কৃষক বুঝিতে পারে যে, বর্ষা শীঘ্রই ঘটিবে তবে শস্য রোপণ কার্য্যও শীঘ্রই করিতে পারে এবং বর্ষার জল বিলম্বে আসিবে বুঝিতে পারিলে শস্যও বিলম্বে রোপণ করিতে পারে।

কোনও স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া দিলে যদি প্লাবন হইতে শস্য রক্ষা করা সম্ভবপর হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহার বিধান করিতে পারেন। স্থানে স্থানে তদুদ্দেশ্যে জল নিষ্কাশনেরও ব্যবস্থা করিয়া দিলে ভাল হয়। এ বিষয়ে কতদূর করা সম্ভবপর তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যদি অনাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকে তবে পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় মাঠের স্থানে স্থানে কৃষকগণ কূপ খনন করিতে পারে এবং সেই

কূপের জল ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিতে পারে। কিন্তু অনাবৃষ্টি ঘন ঘন ঘটে না এবং আমাদের দেশ নদী-মাতৃক, এইজন্য উক্ত কূপ খনন আবশ্যক না হইতে পারে।

কোন কোন বিশেষ ধান্য এরূপ থাকিতে পারে যাহা বন্যা দ্বারাও বিনষ্ট হয় না কিম্বা যাহা যথাসময়ে যে-কোন স্থানে অল্প সময়ে উৎপন্ন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ ধান্য বাস্তবিক আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশে জলি, বোরো প্রভৃতি ধান্য কতক পরিমাণে এই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু কৃষকগণের অজ্ঞতাবশতঃ এই-সমস্ত ধান্যের সর্ব্বত্র চাষ হয় না।

তাহার পর বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন না করিতে পারাতেও উপযুক্ত পরিমাণে ফসল পাওয়া যায় না। কখন কখন কোনও অজ্ঞাত কারণে ফসল উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, কখনও বা পোকায় ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। কখনও বা উপযুক্ত সার না দেওয়াতে ভাল ফসল হয় না। এই-সমস্ত ক্ষতি যাহাতে না ঘটিতে পারে তজ্জন্য কৃষকদিগের কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা উচিত। আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সকলে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বিষয়ের মধ্যে কৃষিবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলে বোধ হয় দেশের অধিকাংশ লোকেই এই সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং এইরূপ বিধান করিলে ভাল হয় কি না তাহা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

এখন অনেক কৃষক ধান্যের চাষ কমাইয়া পাটের চাষ অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি করিতেছে। ইহাতে নগদ টাকা হাতে বেশী আসে বটে কিন্তু ধান্যের চাষ লোকবৃদ্ধি অনুপাতে কমিয়া যাওয়াতে ধান্যের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ধান্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় নগদ টাকার বৃদ্ধিতে কোন লাভ হয় না। এজন্য এখন রেঙ্গুনের চাউল আমদানী করিতে হয়। পাটের চাষ যত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে তত পরিমাণে আমাদিগকে খাদ্যের জন্য বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হইবে এবং বিদেশ হইতে আমদানী করিতে যে যে অসুবিধা ঘটে তাহাও ভোগ করিতে হইবে। যদি রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে উপযুক্তরূপে ফসল না জন্মে এবং আমাদের যদি বিদেশের ফসলের উপরই নির্ভর করিতে হয় তবে তখন কি অবস্থা ঘটিবে?

এই প্রসঙ্গে "স্বরাজে" প্রকাশিত "ধান বনাম পাট"-শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। নীচে উহার সার সংকলন করিয়া দিতেছি—

বাঙ্গলা দেশে পাটের আবাদের প্রসার ক্রমেই বাড়িতেছে। এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে, পাটের অনুকম্পায় এ দেশের কৃষিজীবী লোকের আর্থিক অবস্থা দিন-দিনই উন্নততর হইতেছে। এই বিশ্বাস বা অনুমানের মূলে আদৌ কোন সত্য আছে কিনা বিশেষভাবে তাহার আলোচনার আবশ্যক।

লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল, একথা বলা যায় কিসে? ভাল মন্দ অবস্থার মাপকাঠি কি?

কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই ৫।৭ বৎসর পরে এক একবার অজন্মা হইয়া থাকে। দেশে যতদিন বড়লোক থাকিবে, সুখেই হউক আর কষ্টেই হউক মুটেমজুরদের দিন একরকমে চলিয়া যায়। কিন্তু কৃষিকার্য্যই যাহাদের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র সম্বল, ক্ষেত্রে শস্য না জন্মিলে তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের জন্য হাল-লাঙ্গল, গরু বাছুর, বীজ, নিড়াইবার ও কাটিবার জন্য অর্থ প্রভৃতি অনেক জিনিষের দরকার হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে অনেক কৃষকই হাল-লাঙ্গল প্রভৃতি বেচিয়া খাইতে বাধ্য হয়, সুতরাং দুর্ভিক্ষাবসানের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহারা আর এই-সমস্ত সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারে না। তবে কৃষকেরা সুজন্মার বৎসরেও যদি কিছু-কিছু খাদ্যশস্য বা তৎবিক্রয়লব্ধ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, তবে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও তাহারা কোনও ক্রমে অনাটনের বৎসর পাড়ি দিতে পারে। যে কৃষকের এই সঞ্চয়ের পরিমাণ যত বেশী অর্থাৎ যাহার ঘরে যত বেশী খাদ্যশস্য মজুত থাকে তাহার অবস্থা তত ভাল। বস্তুতঃ একমাত্র ইহাই ভাল মন্দ অবস্থার একমাত্র মাপকাঠি।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রথম বৎসরে পাটের বাজার একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছিল, তাহার ফলে, যুদ্ধারম্ভের পর একমাস যাইতে না যাইতেই পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলার কৃষকদের ঘরে ঘরেই হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল। ইহার কারণ কি? পাটের আবাদে যদি কৃষকের অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইয়াই থাকে, তবে এক মাস মাত্র পাট বেচিতে না পারায় তাহাদের এরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন? ইহা কি অবস্থোন্নতিরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক? একথা কেহ বোধ হয় বলিবেন না যে ঐ বৎসরে বাঙ্গলা দেশে ধান জন্মে নাই; বরং সে বৎসরে ধানের আবাদ পুরাপুরি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। পাটের আবাদে যদি লোকের অবস্থা ভালই হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে পাট বিক্রয় করিয়া লোকে যদি কিছু-কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে দেশে প্রচুর খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও জমিদার মহাজনের ঋণ শোধ তো পরের কথা, নিজেদের উদরপূর্ত্তির জন্যই তাহাদিগকে চক্ষে এরূপ সরিষার ফুল দেখিতে হইত না।

পাবনা, মৈমনসিংহ, ঢাকা ও ফরিদপুর—বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সাধারণতঃ এই চারিটি জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাটের আবাদ হইয়া থাকে।

এই-সকল স্থানে গেলে পাটোৎপাদনকারী কৃষকের বাড়ীতে বড় বড় টিনের ঘর ও কাঠের খুঁটী দেখিয়া প্রথমতঃ অনেকের মনেই ইহাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে এই-সমস্ত বড় বড় টিনের ঘর গাড়ী ঘোড়া নৌকা প্রভৃতি সবই মহাজনের নিকট রেহাণাবদ্ধ, অধিকাংশেরই দেনার পরিমাণ এত বেশী যে তাহা কোনও কালে শোধ হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং এই-সমস্ত বাড়ী-ঘরকে কৃষকদের বাড়ী ঘর না বলিয়া মহাজনদের বাড়ী ঘর বলিলেই বোধ হয় ন্যায়বিচার করা হইবে। পাটের আবাদে একসঙ্গে কতকগুলি টাকা পাইবার সুবিধা থাকাতে মহাজনগণ বেশ অনায়াসে কর্জ্জ দিতেছে এবং কৃষকেরাও পাট হইলেই মহাজনদের দেনা শোধ করিয়া ফেলিব এই আশায় খুব উচ্চ সুদে কর্জ্জ করিতেছে। সুতরাং ইহাতে কৃষকদের কর্জ্জ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িলেও উহাদের অবস্থার কিন্তু কোনও উন্নতি হইতেছে না ইহা নিশ্চয়।

সর্ব্বপ্রকার খরচ পত্র বাদে পাট বা ধান হইতে কত লাভ থাকে তাহা কি কেহ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন? ধান বুনিয়া একবার কোনও রকমে নিড়াইয়া দিতে পারিলেই কৃষকের সকল কাজ শেষ হয়। পরে পাকিলে ধীরে ধীরে কাটিয়া আনিয়া নিজেরাই মাড়াই প্রভৃতি করিয়া লইতে পারে। সুতরাং ধানের আবাদে নিজেদের পরিশ্রম ব্যতীত ঘর হইতে খুব বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। কিন্তু পাটের আবাদে কি তাই হয়? পাটের বুনানি হইতে বিক্রয় পর্য্যন্ত খরচের অন্ত নাই। অধিকাংশ জমিতেই অন্ততঃ দুইবার নিড়ানি ও বাছট দিতে হয়। তারপর পাট কাটা, ধোয়া ও শুকান তো এক মহামারী ব্যাপার। একদিন আগ পাছ হইলেই সব নষ্ট হয়—সুতরাং যেরূপেই হউক উচ্চহারে মজুর রাখিয়া এই-সমস্ত কাজ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকার পাট বিদেশে রপ্তানী হয়। পাটের আপিসের দারোয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া বড়বাবু পর্য্যন্ত সকলেই বেশ দু-পয়সা রোজগার করে, অথচ যে-কৃষক পাট আবাদ করে সে অন্নাভাবে শুকাইয়া মরে। কেন এরূপ হয় তাহাও "স্বরাজ" বুঝাইয়াছেন—

আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই এমন অবস্থা নয় যে বাজার নরম দেখিলে দু'চার দিন পাট না বেচিয়াও পুঁজি হইতে সংসার চালাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অধিকাংশ কৃষকই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে অতিরিক্ত সুদে মহাজনের নিকট টাকা কর্জ বা দাদন লইয়া পাটের আবাদ করিয়া থাকে। এই সকল মহাজন তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে এবং পাট ধোয়া আরম্ভ করিলেই তাহারা চারিদিক হইতে একেবারে পঙ্গপালের মত আসিয়া হাজির হয়। আষাঢ় মাসে জমিদারকেও কিছু দেওয়া হয় না। সুতরাং জমিদারের গোমস্তারাও একেবারে দুই কিস্তির তাগাদা লইয়া দেখা দেয়। এদিকে ঘরে প্রচুর পাট মজুত থাকিলেও, অধিকাংশ লোকের ঘরে এক সের চাউলও থাকে না—পাট বেচিবে তবে মুখে হাত উঠিবে। সুতরাং কৃষকদের পক্ষে তখন পাট বিক্রয় ব্যতীত আর গত্যন্তর থাকে না। পাটের ব্যবসায়ীরা কৃষকদের এই দুর্ব্বলতার খবর বেশ ভাল রকমেই জানে। সুতরাং তাহারা সকলেই কিছু না কিছু টিল কাটিতে থাকে। কাজেই বাজার অনেকটা নামিয়া যায়। সুতরাং কৃষকেরা যে দর পায়, তাহাতেই পাট বেচিয়া ফেলে। দেশীয় মহাজনেরা বা কোম্পানীর বেতনভোগী ক্রেতা বা কমিশন-এজেন্টেরা এই সময়ে খুব অল্প দরে পাট কিনিয়া রাখে। শুধু তাহাই নয়। এই ক্রেতারা আবার নানা রকমে বিশ্বাসী ও অভাবক্লিষ্ট কৃষকদের নিকট মণকরা অন্ততঃ আট দশ সের পাট আদায় করিয়া থাকে। পরে এই পাট তাহারা উচ্চ দরে কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ করিয়া থাকে।

মাঝে মাঝে বাংলা দেশের অনেক জেলায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হয়। এই-সকল প্রদর্শনীর দ্বারা বিশেষ লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। বাংলা দেশের প্রতি জেলায় এক সময়ে নানাপ্রকার গৃহশিল্প ছিল। তার উপর নির্ভর করিয়া বহু নরনারী জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। অধুনা সে-সব গৃহশিল্প লুপ্তপ্রায় বা লুপ্ত। সেগুলিকে আবার উদ্ধার করার জন্য কোনো চেষ্টা নাই। এমন অবস্থায় কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর সার্থকতা কোথায়?

রংপুরে একটি কৃষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে। "রংপুর-দর্পণ" লিখিয়াছেন—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষ গৃহশিল্প-সমূহের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই বিভাগের কার্য্য প্রদর্শনীর সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হইলে চলিবে না। এই বিভাগের সফলতার জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত করা হউক। পল্লীগ্রামে কোথায় কুন্ কোন্ শিল্প বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কি উপায়ে তাহাদের পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে কমিটি সম্যক্ সংবাদের আদান প্রদান করিবেন। উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিবেন। ইহাই প্রদর্শনীর সফলতা।

আমরা দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব। রঙ্গপুরে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই বাঁশের দ্বারা নানাপ্রকারের শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে। জাপানের বংশশিল্প সুদূর য়ুরোপ ও আমেরিকায়, পরন্তু ভারতবর্ষে, কিরূপ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, সকলেই তাহা অবগত আছেন। চেষ্টা করিলে এই বংশশিল্পকে অনেকের জীবিকার্জ্জন নির্ব্বাহের উপযোগী করা যাইতে পারে। এক সময়ে রঙ্গপুরে প্রচুর পরিমাণে কাগজ উৎপন্ন হইত। জেলার সম্পূর্ণ অভাব পূর্ণ করিয়া এই-সমস্ত কাগজ স্থানান্তরে রপ্তানী হইত।

স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় যে জেলায় প্রদর্শনী আহূত হইবে, সেই জেলায় সেই সেই অবস্থায় যে-সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্বিষয়েই আলোচনা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মূল কথা জেলার কৃষিশিল্পোন্নতির জন্য আমরা একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত দেখিতে চাই। প্রদর্শনীর ব্যয় নির্ব্বাহ কল্পে কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন না—সম্ভবতঃ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডই অধিকাংশ অর্থ প্রদান করিবেন। জেলার এইরূপ একটি হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য সর্ব্বসাধারণ সকলেই অনুমোদন করিবেন।

সু।

কাঙ্গাল

(গল্প)

সে ছিল দরিদ্রের সম্বল, অন্ধের যষ্টি।

শৈশবে মাতৃহারা সে তার মাকে জানিতই না। কি দুঃখী ছিল সে, একটি খেলার সঙ্গী পর্য্যন্ত তার ছিল না, না একটি ভাই কি বোন।

তবু সে ঠিক দুঃখী ছিল না, কারণ সে তার দুঃখ অনুভব করিতে পারিত না; সকল অভাব পূরণ করিত তার সেই বুড়ো বাপ।

বাপের মত খাটিয়া খাওয়াইত, মায়ের মত বুকে জড়াইয়া ঘুম পাড়াইত, আর শিশুর মতই হাস্যমুখর হইয়া তার সাথে খেলিয়া দিন কাটাইত।

সে যখন বুঝিতে শিখিতেছিল এই পৃথিবী খালি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জায়গা নয়, এখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দুমুঠো অন্নের যোগাড় করিতে হয়,—এখানে দুঃখ শোক তুচ্ছ করিয়া, মান-অপমান অগ্রাহ্য করিয়া, সম্মুখের দীর্ঘতর কালের প্রতি বুক ফুলাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়,—এমন একদিনে তাহার বাপকে পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার পরোয়ানা আসিল। বড় দুঃখ যাহাদের, তাহারা

অত সহজে গেলে সে দুঃখ ভোগ করিবে কে? নিয়তির অযাচিত করুণায় বিনা চিকিৎসায় বৃদ্ধ সারিয়া উঠিল, কিন্তু রোগ তার স্মারক চিহ্ন স্বরূপ লইয়া গেল তার চক্ষুর জ্যোতিটুকু।

বৃদ্ধ আর্ত্তস্বরে ডাকিল,—ফকির, বাবা, কি উপায় হবে!

উপায় আর কি, বারো বৎসরের বালক বৃদ্ধের হাত ধরিয়া পথে বাহির হইল।

শীর্ণ বক্ষপঞ্জর রুদ্ধশ্বাসে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিত, অসহ্য বেদনায় বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিত,—দুলাল, আমার মাণিক! এও আমার কপালে ছিল!

উপবাসক্লিষ্ট মুখে হাসি আনিয়া বৃদ্ধের রুক্ষ মাথায় আদরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ফকির একটু ধমকের স্বরে বলিত ছি, ছেলেমানুষ তুমি বোঝনা? বাপ কষ্ট করেই ছেলেকে খাওয়ায়।

তাদের ছোট কুটীর দীর্ঘকাল অসংস্কৃত থাকিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। ছোট গ্রামখানি, একদণ্ডে সবকয়খানা বাড়ী ঘুরিয়া আসা যায়, এখানে নিত্য পেট ভরে না, নিত্য কেহই দিতে চায় না। আর দিবেই বা কি করিয়া? দরিদ্র পল্লীর সকলেরই যে এক অবস্থা, একটু উনিশ বিশ মাত্র।

নিঃসহায় দুটিতে তারা পরস্পরের সহায়স্বরূপ হইয়া, বহু কষ্টে বহু আশায় সহরে গিয়াছিল, দীর্ঘ পথের সুদীর্ঘ যাত্রা বহু অনাহারে বহু অশ্রুজলে সমাপ্ত হইয়াছিল;— কিন্তু তাহাদের সে কষ্ট অবসাদে, সে আশা মরীচিকায়, সে অনাহার—সে অশ্রুজল আরো বুভুক্ষা আরো হাহাকারে পরিণত হইল।

ছোট পল্লীর কুটীরে কুটীরে যাহা মিলিত, বিশাল-নগরীর প্রাসাদ-মালায় তাহার একান্ত অভাব। হয়ত বা তেমনি তাহাদের ভিক্ষাভাজন পূর্ণ হইত। কোনো দিন বা বেশী পর্য্যটনে একমুঠো বেশী। কিন্তু তেমন তৃপ্তিতে তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন হইত কই? এখানে যে মমতার পরিবর্ত্তে অবজ্ঞা, সান্ত্বনার বদলে রূঢ় ধিক্কার পাইয়া মর্ম্ম তাহাদের তিক্ত হইয়া গেল।

(২)

এমনি করিয়া কতদিন কাটিল; প্রবল শীত, দারুণ গ্রীষ্ম আর প্রলয়ঙ্করী ঝড়-বর্ষার মাতাল কাল খেলেনা দিনগুলি লইয়া লোফালুফি করিতে-করিতে চলিয়া গেল, রাখিয়া গেল সারা পৃথিবীতে তাহাদের অনাবৃত পদচিহ্নগুলি —কেহবা সে স্পর্শে সরস সুন্দর হইয়া উঠে, কেহবা দলিত মথিত হইয়া যায়।

একদিন যখন ধনীর দুয়ারে ধিক্কৃত বালক উপলব্ধি করিতে পারিল সে বালক নয়, পূর্ণাঙ্গ কিশোর; এত অনাহারে অযত্নেও সে বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ স্বাস্থ্যসুন্দর কান্তিময়,— সে কেন ভিক্ষা করিয়া খাইবে! আত্মোদর পরিতৃপ্তির জন্য পরের শ্রমার্জ্জিত ধনে সে কেন নিঃসঙ্কোচে হাত পাতিবে? কেন,—কোন্ অধিকারে?

তখন তাহার চিত্ত আবাল্যের অভ্যস্ত কর্ম্মে নিতান্তই বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার আগত যৌবনের নূতন গর্ব্ব, নূতন তেজ, নবতর কর্ম্মলিপ্সা, অনাদর-ক্ষুব্ধ কিশোর প্রাণের ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল। সে ভিক্ষাপাত্র ফেলিয়া জীর্ণ-বস্ত্রে দৃঢ়রূপে কটি সম্বদ্ধ করিল।

বৃদ্ধ কহিল—এ পাগলামি কেন তোর বাবা? তুই যে আমার মায়ের ঠাঁইও কেড়েছিস্, আমায় নিঃসহায় একেলা ফেলে কোথা যাবিরে তুই?

না—সে ফিরিবে না,—ফিরিতে পারে না,—তবে শার্দ্দুল যেমন তার অপূর্ণাঙ্গ শাবককে মুখে করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়, সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই এই ভার বহন করিবে;—তবু তাহাকে কাজ করিতেই হইবে, শ্রমের বিনিময়েই সে খাদ্য গ্রহণ করিবে। এতদিন দ্বারে-দ্বারে ফিরিয়া যে ব্যর্থ শ্রম করিতেছিল, তাহা বৃথায় না ফেলিয়া দরদীকে তার ভিক্ষা-দানের মূল্যস্বরূপ দিবে। সে কয়লার খনিতে কাজ লইল। সারা দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় যে কয়টি পয়সা পাইত, তাহাতেই স্বচ্ছন্দে তাহাদের দিন চলিয়া যাইত।

প্রতি-প্রভাতেই ফকিরের অযত্ন-বিন্যস্ত কেশরাশির মধ্যে শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি সঞ্চালন করিতে-করিতে, একটা দীর্ঘ-শ্বাসের সহিত সমস্ত মৌন আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া, পুত্রকে বিদায় দিয়া স্থবির বৃদ্ধ সারাদিন তার কুটীরের দ্বারখানিতে নীরবে বসিয়া থাকে। সন্ধ্যা যখন আকাশে তার কালো আঁচলের ছায়া ছড়াইয়া, ধরণীর অশ্রান্ত কর্ম্মসঙ্গীতে একটি শ্বাসপতনের শেষে বিরামের যতি আনিয়া দেয়, তখন সে

তাহার জ্যোতিহীন চক্ষু-তারকার উপর জ্যোতিমণ্ডলের অভাব বুঝিয়া গৃহ-দীপখানি জ্বলিবার প্রত্যাশায় কম্পিত-বক্ষে উৎকর্ণ হইয়া থাকে।

(৫)

একদিন,—সেদিন বর্ষার ঘনঘটায় আকাশ ধূসর ছিল, দিনের নিদর্শন জ্যোতিঃপিণ্ডের জ্বালাময় শিখা সেদিন অন্ধের চোখে আলোর মায়া বুলায় নাই। এমন একদিনে রুগ্ন বৃদ্ধ তার শক্তিহীন দেহের ভার প্রাণান্ত পরিশ্রমে মেরুকেন্দ্রে স্থির রাখিয়া তেমনি ভাবে দুয়ারে বসিয়া ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে যেন উদ্বেগ-চঞ্চল পদশব্দ শুনিতে পাইয়া আপনাকে অতন্দ্র রাখিবার চেষ্টায় সচকিত হইতেছিল।

যখন সে কল্পনায় তার কম্পিত ওষ্ঠে স্নেহময় তনয়ের শ্রমোত্তপ্ত ললাটের সুখস্পর্শ অনুভব করিতেছিল, তখন বাহিরে সহসোত্থিত কোলাহলের মধ্যে ভয়-ব্যাকুল কাহার স্বর তার সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া একটা নিদারুণ বিভীষিকায় তাহাকে জড় মূঢ় বানাইয়া দিল।

কে বলিল—বিষাক্ত গ্যাসে নূতন নালা ভরিয়া গিয়া অসাবধান কয়টি ছোকরা মজুরের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে।

বৃদ্ধ একবার আর্ত্তস্বরে ডাকিল—ফকির, বাবা!—

ফকির যখন জনতা ঠেলিয়া ভূলুণ্ঠিত বৃদ্ধের লোলিত মস্তক সযত্নে বক্ষে তুলিয়া লইল, বৃদ্ধ তখন হাসিকান্নার পরপারে।

দুঃসহ বেদনায় উন্মাদ অস্থির যুবক আপনার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া উপাড়িয়া ফেলিতে চাহে;—এমন শোচনীয় মৃত্যু! একটি সান্ত্বনার কথা বলিবার, একমুহূর্ত্ত সেবা করিবার অবসর মিলিল না! তাহারি আশায় প্রতীক্ষমান পিতা যে তাহারি জন্য চলিয়া গেল, স্নেহের বেদনায় ব্যাকুল হইয়া সকল স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া দিয়া গেল!

আর তার কি আছে পৃথিবীতে? কার জন্য,—কার হাসিমুখ দেখিবার জন্য সে ক্ষুধার অন্ন লইয়া ব্যাকুল দ্রুত পদে নিত্য সন্ধ্যায় কুটীরে ছুটিবে?

কেহ নাই তার, কোনো কিছু নাই, কোনো কিছুর প্রয়োজনও নাই। নিজের জন্য নিজের প্রাণের কি এমন দরকার? দশজন দর্শকের মমতা-শূন্য আশা আশ্বাস আর সান্ত্বনার অনুরোধ তাহাকে আরো পাগল করিয়া তুলিল। কি চায় ইহারা? ইহাদের মত তাহার কি আছে যে তাহা দেখিয়া সে আপন চিত্তকে প্রবোধ দিবে?

অশ্রু তার বুকের আগুনে শুকাইয়া গিয়াছে, চোখে শুধু তার রক্তিমা, সেই শুষ্ক আরক্তিম চোখে সে পাগলের মত অনির্দ্দিষ্ট পাদক্ষেপে রাস্তায় ফিরিতে লাগিল।

একটা করুণ আর্ত্তনাদে তাহার চিন্তাস্রোত বা চিন্তা-বিহীন চিত্তের বিপুল বিপ্লব এক নিমেষে থামিয়া গেল। ধূলি ধূসরিতা ঐ উন্মাদিনী নারীর কাতর চীৎকারে বুঝি পাষাণও ফাটিয়া যায়!

ফকিরকে সম্মুখে দেখিয়া রমণী আছাড়িয়া পড়িল,—বাবা, তোর সঙ্গেই ত সে কাজে গিয়েছিল। এনে দে আমার আঁচলের সোনা, আমার কাঙ্গালের ধন, এনে দে আমায় বাবা! আমার যে আর কেউ নেই, আমি যে বড় কাঙ্গাল রে, বড় কাঙ্গাল!

কি ভীষণ দৃশ্য ফকিরের চোখের সাম্‌নে পুনরায় জাগিয়া উঠিল। হায়, এই বিধবার নিধি যে তাহারই চোখের সামনে বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে-করিতে প্রাণ হারাইয়াছে। আর সে অতি-তৎপরতায় আপনাকে রক্ষা করিয়া পর মুহূর্ত্তেই সেই অনুশোচনায় অনুতপ্ত হইয়াও অসহায় বাপের জন্য যে সে কথা ভাবিবারই অবসর পায় নাই। কিন্তু তাহার বাঁচা অনাবশ্যক হইয়াছে। তার অনাবশ্যক প্রাণের বিনিময়ে যদি এই অসহায়া নারীর সর্ব্বস্ব ধন রক্ষা পাইত!

দুঃখিনী বিধবা কাঁদিতেছিল,—বাবারে, তুই যে না খেয়ে কাজে গিয়েছিলি!

মুহূর্ত্তে ফকিরের মনে পড়িল, এযে নিঃসম্বল, নিরন্ন,—এযে নিরুপায়! জানু পাতিয়া অশ্রু-আপ্লুতকণ্ঠে ফকির ডাকিল—মা, সে গিয়েছে, আর ফিরবে না; আয় মা আয়, আমার কাঙ্গালের ঘরে আয়!

সরযূবালা সেন।

উপলখণ্ড

চিত্রে যাহা অস্বাভাবিক তাহা দোষাবহ; কিন্তু যাহা স্বভাবাতিরিক্ত তাহা দোষাবহ নহে। উহা মানুষের সৃষ্টি-ক্ষমতার পরিচায়ক।

ধর্ম্ম এবং স্বাধীনতার নামে জগতে যথেষ্ট অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য ধর্ম্ম বা স্বাধীনতা দায়ী নহে। দায়ী—অন্ধবিশ্বাস।

বৃন্তকে আশ্রয় করিয়াই ফুল ফুটিয়া থাকে; বাস্তবকে আশ্রয় করিয়াই কল্পনা বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

মেঘে যাহা সলিল, লতায় তাহা পুষ্প; কুসুমে যাহা গন্ধ, নারীর তাহা স্নেহ।

যে অপরের চিন্তা এবং হৃদয়কে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না সেই জগতের শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী।

স্বাধীনতা—সর্ব্ববন্ধহীনতা নহে। সমাজে মুক্তি নাই।

ফুল গন্ধহীন হইলেও তাহার বর্ণবৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু কর্ম্মহীন জীবনের গৌরব করিবার মত কিছুই নাই।

মেঘের সার্থকতা শুধু সলিল সিঞ্চনে ধরণীর দেহে শ্যাম শোভা ফুটাইয়া তোলায় নহে, সে বজ্র দ্বারা ধ্বংসও করিয়া থাকে।

কতকগুলি গাছ গৃহের অন্তরাল ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, আবার কতকগুলির পক্ষে উদার আকাশের আবরণই যথেষ্ট।

তুমি নিজে যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ, অপরকেও তাহার ভিতরেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে এরূপ আশা করিও না।

শিমুল ও গোলাপ উভয়েই ঝরিয়া পড়িবে; কিন্তু গোলাপ তাহার স্মৃতি রাখিয়া যাইবে—গন্ধে; আর শিমুল? গলিত পত্রে।

ধর্ম্মের আবরণে যে পাপ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ।

জগৎকে তোমার আপন কাজে খাটাইবার মত শক্তি থাকে—খাটাইও; কিন্তু জগৎটা শুধু তোমার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করিও না।

মানুষ সহজে কাহাকেও আপনা হইতে বড় বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না, আবার ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত না করিয়াও থাকিতে পারে না।

জড়ত্বের শান্তি হইতে দুঃখের চাঞ্চল্য শ্রেয়।

বৃক্ষকে আলোক ও রস উপভোগ করিতে দাও—ফুল আপনিই ফুটিবে। হৃদয়কে জ্ঞান ও আনন্দে পূর্ণ হইতে দাও—তাঁহাকে আপনিই পাইবে।

দেহের পক্ষে যাহা ছায়া, জীবনের পক্ষে তাহাই মরণ? অবস্থার পরিবর্ত্তন?—বিস্মৃতি? নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা অনাহত শান্তি?

সাহিত্য যেদিন ভাবুকতা এবং দার্শনিকতাকে বাদ দিয়া শুধু বাহিরের সৌন্দর্য্য এবং বাস্তবতাকে লইয়া থাকিবে, সাহিত্যের পক্ষে সেদিন নিতান্তই দুর্দ্দিন।

দুঃখ তোমাকে বেদনা দিতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করিতে পারিবে না।

ঝরিয়া পড়াই ফুলের পরিণতি হইতে পারে, কিন্তু মরণই মানুষের চরম পরিণতি ইহা ভাবিতে ইচ্ছা হয় না।

জগতের প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে-সঙ্গেই যেন তোমার প্রাণও স্পন্দিত হয়।

জ্যোৎস্না সাগরের হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তুলে; সৌন্দর্য্য মানব-হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনিয়া দেয়।

সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্য বা চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। রস সৃষ্টির জন্যই কাব্য; চিত্রও তাহাই।

গর্ব্ব মানুষকে অনেক হীনতা হইতে দূরে রাখে।

অপরে তোমাকে যে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিবে তাহা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু প্রকৃতি তোমার জন্য যে বন্ধনের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিও না।

আমরা যখন ঊর্দ্ধে চাহিতে ইচ্ছা করি, তখন তাকিয়ায় হেলিয়া গৃহের ছাদের দিকে তাকাইয়া থাকি। কিরণোজ্জ্বল উদার আকাশের দিকে চাহিবার মত শক্তি আমাদের কবে হইবে?

একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা লোককে পরমুখাপেক্ষী হইতে শিক্ষা দেয়।

সর্ব্ববিষয়ে সাম্য অসম্ভব। হাতের পাঁচটি আঙ্গুলকে কাটিয়া সমান করিতে চেষ্টা করিও না।

সর্প যেমন হারান মণিকে খুঁজিয়া বেড়ায় ভারতের প্রাণকে সেইরূপ করিয়া খুঁজিতে হইবে।

হৃদয় যখন ভাবের আবেগে পূর্ণ হয় তখন নয়, সে আবেগ বরং একটু মন্দ হইলেই তাহাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিও।

প্রাচীন ভারত ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিতে চাহিত না, কারণ তাহা বৃহতেরই অংশ, এবং বৃহৎকেও ধারণার অতীতে রাখিয়া দিত না। আমরা ক্ষুদ্রকেই বৃহৎ বলিয়া মনে করি, এবং জগতে যে বিচিত্র চিন্তা এবং কর্ম্মধারা নিত্য নবনবরূপে বিকশিত হইতেছে তাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি।

জীবনটাকে উপভোগ কর; জড়ত্ব সাত্ত্বিকতা নহে।

মানুষ নিজের জন্য নিত্য নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি করিতেছে।

স্বভাবের কোন্ দৃশ্য যদি হৃদয়ে গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়, যদি সেই শোভাকে কাব্য বা চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যখনই দেখিবে তখনই সে চেষ্টা করিও না; কারণ কল্পনাই শুধু সুন্দরকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে।

জগতে বৈষম্য আছে, তাই অনেকে কর্ম্মফল মানিয়া থাকেন।

মানুষ আপনাকে ভালবাসে বলিয়াই বেদনা সহ্য করিতে পারে।

একদিন হয়ত মানবের মনে তাহার যত্নে রচিত সমস্ত বন্ধনরাশি ছিন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা হইবে। সেদিন কি ভয়াবহ কি গৌরবময়!

গৃহকে সুন্দর করিতে হইবে, জীবনকে সুন্দর করিতে হইবে, তবেই সুন্দরতমের পরিচয় মিলিবে।

সামান্য বালির বাঁধে কখনও নদীর স্রোত বদ্ধ হইবে না। অনুশাসন কখনও মানবের চিন্তাধারার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

মানুষ বন্ধন স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। দিগ্বিজয়ী সম্রাটও হয়ত দুটি উজ্জ্বল নয়নের অথবা দুটি ক্ষুদ্র বাহুপাশের অধীন। সমাজ আপন অনুশাসনের অধীন; যে ক্ষুদ্র, সে আপন স্বার্থের অধীন; যিনি মহৎ, তিনি বিশ্বমানবের অধীন।

তুমি মানব বলিয়াই সম্মানের অধিকারী; সেই মানবতাকে অবমানিত হইতে দিও না।

শূরতা অপরকে ধ্বংস করিবার শক্তি নহে। আপনার সম্মানকে রক্ষা করিবার শক্তিই শূরতা।

চিন্তাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের পদ্ধতিও পরিবর্ত্তিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

নূতনত্বের অন্বেষণ দোষাবহ নহে। যদি তাহাই হয় তবে 'উন্নতি' শব্দটিকে অভিধান হইতে বাদ দিতে হইবে।

মানব-জীবনে কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইতেছে; তবে এ কৃত্রিমতাই এখনকার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িতেছে।

পূজার প্রবৃত্তি অধিকাংশ লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক। জগতে Prometheus দুর্লভ।

অনেক বিদেশী গাছ এ দেশের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না; আবার সকলেই যে পারিবে না তাহা নয়।

কর্ম্ম কখনও নিষ্ফল হইবে না; চিন্তা কখনও ধ্বংস হইবে না।

সর্ব্ববন্ধনহীনতা একমাত্র যিনি মুক্ত পুরুষ তাঁহার অথবা বর্ব্বরের পক্ষেই সম্ভবে।

যে নিজকে যত অধিক ভালবাসে পরের প্রতি সে তত অধিক উদাসীন।

পরের ভাষায় কাব্য লিখিয়া কৃতকার্য্য হওয়া দুরূহ; পরের কলা-পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ আরও দুরূহ।

নূতন নূতন রূপে ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা হইতে ভাষায় কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

তন্দ্রাঘোরে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছি—জাগো জাগো। নিজে ভালরূপে জাগিয়া পরে অপরকে জাগাইবার চেষ্টা কয়জন করিতেছেন?

কতকগুলি শব্দ মানবের নিকট ক্রমে অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। 'ভগবান' শব্দও সেইরূপ একটি?

অধিকাংশ লোকই অপরের দ্বারা চালিত হইতে ভালবাসে। তাহার কারণ, স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তির অভাব, এবং আলস্য-পরায়ণতা।

দেশ জড়ত্বের নিদ্রায় অভিভূত। দুই একজন হয়ত প্রভাতকিরণ স্পর্শে ধন্য এবং বিহঙ্গ-কলরোলে মুগ্ধ হইয়াছেন।

সংসারে তত্ত্ব হইতে কর্ম্মের দাবী অধিক।

কালিকার পক্ষে যাহা স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, অজিকার পক্ষে হয়ত তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

মানুষের প্রবৃত্তি স্বতঃই নূতনত্বের দিকে ধাবিত হয়, তথাপি মানব সহজে নূতনকে বরণ করিয়া লইতে স্বীকৃত হয় না।

যাহা অসমঞ্জস তাহাই অসুন্দর।

শান্ত এবং সংযত মন লইয়াই দেব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বেষ এবং দাম্ভিকতাকে বর্জ্জন করিয়াই সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। যীশু বলিয়াছেন —কেহ এক গালে চড় দিলে অপর গাল ফিরাইয়া দিও। তাঁহার শিষ্যগণ বলেন—কাহাকেও এক গালে চড় মারিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও না, অপর গালেও মারিতে চেষ্টা করিও।

শ্রীকৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী।

হীরাবাগ ধর্ম্মশালা

পূজার ছুটিতে অনেকে দেশভ্রমণে বাহির হন, কিন্তু বিদেশে যাঁহাদের আত্মীয় স্বজন নাই তাঁহারা গিয়া কোথায় থাকিবেন ভাবিয়া পান না। দেশীভাবে থাকিবার হোটেল সব জায়গায় নাই। আছে ধর্ম্মশালা। কিন্তু ধর্ম্মশালার নাম শুনিলেই মনে হয় যেন অনাথ ও দরিদ্রদিগের জন্যই উহার একমাত্র সৃষ্টি। সেই ভ্রম দূর করিবার জন্যই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। কলিকাতা বোম্বাই বেনারস ইত্যাদির ন্যায় জনাকীর্ণ সহরে একা কিম্বা পরিবার লইয়া আসিলে থাকিবার স্থানের অভাবে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় ভুক্তভোগীমাত্রেই উহা অবগত আছেন। কঠিন রোগের চিকিৎসা, সহর দর্শন, বিষয়-কর্ম্ম উপলক্ষে অনেক বড় ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোককেই সহরে আসিতে হয় এবং থাকিবার স্থানের অভাবে তাঁহাদের শুধু যে কষ্ট হয় তা নয়, অনেক সময় উপযুক্ত পয়সা ব্যয় করিয়াও হিন্দুর থাকিবার উপযোগী হোটেল পান না—মধ্যবিত্ত লোকে অবশ্য কলিকাতায় আর্য্যনিবাস বা বম্বের এম্পায়ার হিন্দু হোটেলে রোজ ২৲ টাকা ব্যয় করিয়া থাকিতে পারেন না।

অনেকদিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীগণ শিবমন্দির ও এইরূপ একটি ধর্ম্মশালা খুলিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু করেন নাই।

বম্বে সহরে অবশ্য হিন্দু মুসলমান ও পারসীগণের জন্য স্বতন্ত্র ধর্ম্মশালা অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে শেঠ হীরাচাঁদ তেমান রায়ের পুত্র শেঠ তারাচাঁদ কর্ত্তৃক স্থাপিত ধর্ম্মশালা একটি উচ্চশ্রেণীর বাসস্থান এবং মফঃসলবাসী ধনী ও মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোক যাঁহারা বম্বেতে ৮।১০ দিনের জন্য বেড়াইতে বা কোন কার্য্য উপলক্ষে আসেন তাঁহাদের থাকিবার একটি উচ্চ অঙ্গের বাসস্থান।

হীরাবাগ সহরের মধ্যস্থলে ভুলেশ্বরের নিকট, ট্রাম হইতে ১ মিনিটও লাগে না। হীরাবাগে প্রায় ১৫০টি সুন্দর ঘর আছে। ঘরগুলিতে বিদ্যুতের আলো আছে—অবশ্য রোজ ১০ পয়সা দিতে হয়, সন্ধ্যা হইতে ১২ টা পর্য্যন্ত আলো জ্বালাইবার জন্য; সমস্ত রাত্রি যদি কেহ বিদ্যুতের আলো ঘরে রাখিতে চান তাঁহাকে রোজ ৴০ করিয়া দিতে হয়।

পরিবারাদি সঙ্গে থাকিলে ২টি ঘর ও একলা হইলে সময়ে সময়ে ১টা স্বতন্ত্র ঘর ও বেশী লোকের আমদানী হইলে এক ঘরে দুই জনকে থাকিতে হয়। রাঁধিবার ঘর সম্পূর্ণ আলাদা। ঘরগুলিতে ৫।৬টি করিয়া জানালা আছে, আলো ও বাতাস যথেষ্ট থাকে। প্রত্যেক মহলের উপর-তলাতে ৩।৪টি পাইখানা ও কল ও নাইবার স্থান আছে।

ধর্ম্মশালা বলিলেই যেমন অপরিষ্কার, যেমন একটা এঁদো-পড়া পুরান বাড়ী বলিয়া মনে হয় হীরাবাগ তাহা নহে। রোজ ঝাড়ু দিবার জন্য মাহিনা-করা ঝাড়ুদার আছে, তাহারা দুবেলা ধর্ম্মশালা পরিষ্কার করে। উহাদের কাজ দেখিবার জন্য ও অন্যান্য তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য একজন পশ্চিমের হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জমাদার নিযুক্ত আছে ও একজন ৫০৲ বেতনে পরিদর্শক হীরাবাগে নিযুক্ত আছেন।

ধর্ম্মশালার যাত্রীদিগের আবশ্যক-মত টেবিল, চেয়ার,

খাট ও অন্যান্য আবশ্যকীয় আসবাব বিছানা বাসন, ইত্যাদি হীরাবাগ ধর্ম্মশালার ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয় ও উহার জন্য যৎসামান্য ভাড়া আদায় করা হয়, সাপ্তাহিক প্রতি-জিনিসের জন্য এক পয়সা। বর্ত্তমান পরিদর্শক শ্রীযুক্ত ভালচন্দ্র মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ও অতি সজ্জন ও পরোপকারী। প্রথমে হীরাবাগে আসিলে ৫৲ টাকা জমা লওয়া হয় ঐ ৫৲ টাকা হীরাবাগ ছাড়িবার সময় ফেরৎ পাওয়া যায়। জিনিসপত্র দিবার জন্য ছাপান ফরম আছে, যে যে জিনিস আবশ্যক পরিদর্শককে বা তাঁহার অবর্ত্তমানে হীরাবাগের জমাদারকে বলিলে পাওয়া যায় ও ঐ ছাপান ফরমে লিখিয়া রাখা হয়।

সাধারণতঃ হীরাবাগে ৮ দিন কাল থাকিতে দেওয়া হয়; তবে নেহাত আবশ্যক হইলে অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া ১০।২০ দিন পর্য্যন্ত থাকা যাইতে পারে। হীরাবাগের উপর-তলায় একটি ডাক্তারখানাও আছে, সামান্য ব্যয় করিয়া উহাতে চিকিৎসিত হইতে পারা যায়, ডাক্তারের ভিজিট লাগে না, সামান্য ওষুধের দাম লাগে মাত্র। হীরাবাগের পরিদর্শক কিম্বা অপর কোন চাকরদিগকে বকসীস দেওয়া নিষিদ্ধ ও তাহারাও কখন পান খাইতে জল খাইতে পয়সা চাহিয়া আমাদের দেশের ঐ শ্রেণীর লোকের মত যাত্রীদের জ্বালাতন করে না।

হীরাবাগের কথা লিখিবার আমার দুই উদ্দেশ্য— প্রথম এই কলিকাতা-বাসী অনেকে কার্য্য বা ভ্রমণ উপলক্ষে বম্বে আসেন বা আসিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হীরাবাগে বাস করা যে হোটেলে থাকা অপেক্ষা সুবিধা-জনক এ কথা উপরিলিখিত বিবরণ পড়িলেই জানা যাইবে—কারণ বম্বেতে সহরের ভিতর মাসিক ২০৲ টাকার কমে একখানি ঘর ভাড়া পাওয়া দায়, সে স্থলে হীরাবাগে বিদ্যুৎ-আলো-যুক্ত ২খানি ঘরের মাসিক ভাড়াই বোধ হয় ৪০৲ টাকার কম নহে; তারপর আসবাব বাসন বিছানা সমস্তই পাওয়া যায় ও সর্ব্বোপরি অতিশয় নিরাপদ ও পরিষ্কার স্থান; সুদূর দেশবাসীগণ হোটেলে না থাকিয়া হীরাবাগে থাকিলে কম খরচায় থাকিতে পারিবেন এ কথা লেখা বাহুল্য। তারপর বক্তব্য এই যে কলিকাতার মত বাঙ্গালী-প্রধান সহরে কোন বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত এরূপ কোন ধর্ম্মশালা নাই কেন? ইহা কি বাঙ্গালীদের খুব গৌরবের কথা? অবশ্য কলিকাতাতেও হিন্দুদের থাকিবার জন্য একটি ধর্ম্মশালা বড়-বাজারে বাঁশতলার গলিতে, হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে আছে; কিন্তু সেখানে সুবন্দোবস্তের অভাব ও আশঙ্কাতীত অপরিষ্কার। লজ্জার বিষয় যে বাঙ্গালী প্রধান কলিকাতা সহরে সদয়-হৃদয় মাড়োয়াড়ী মহাত্মাগণ এই ধর্ম্মশালাগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দানশীল লোকের অভাব তাহা নয়—কিন্তু কেন যে এই একটা লোক-হিতকর কার্য্যে বাঙ্গালী ধনী সম্প্রদায় অগ্রসর হন না ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। বাঙ্গালীর দেশে মাড়োয়াড়ী-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অথচ শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কলিকাতা সহরেও বাড়ী দুর্লভ ও সব সময়ে স্বাস্থ্যকর স্থানে পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং কলিকাতা বা মফঃসলবাসী ধনী ব্যক্তিগণ আপনাদের পিতা মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে ধর্ম্মশালা স্থাপন করিবেন কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতায় আসিলে তাঁহারাও সেখানে থাকিতে পারিবেন।

অবশ্য মফঃসলস্থ ধনী ও রাজা জমীদারগণের কলি-কাতায় থাকিবার নিজেদের বাড়ী আছে একথা লেখকের অজ্ঞাত নহে—তাঁহারা সে বাড়ীতে বার মাস বাস করেন না—এ-সকল বাড়ী পড়িয়া নষ্ট হওয়া অপেক্ষা ভদ্র-লোকদিগের থাকিবার স্থান রূপে ব্যবহার করিতে দিবার মত বন্দোবস্ত স্বচ্ছন্দে তাঁরা করিতে পারেন। আশা করি—কলিকাতার ধনী বাঙ্গালী-সম্প্রদায় হীরাবাগের ন্যায় একটি ধর্ম্মশালা কলিকাতায় স্থাপন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও বাঙ্গালীর কলঙ্ক দূর করিতে যত্নবান হইবেন।

বোম্বাই। এ, সি, মুখার্জ্জী।

কল্পতরু

(ওকাকুরা)

অগাধ পরিখা-বাধা তারি পর-পারে
হিমবান শৈলেন্দ্রের বক্ষের তুষারে
পুষ্পিত অনিন্দ্য তরু শুভ্র নিরাময়,
কত জন্ম-জন্ম হায় আকুল হৃদয়
শৈবালে আচ্ছন্ন শুষ্ক শিলাসন পরে,
মায়ামুগ্ধ তারি পানে শুষ্ক চন্দ্রকরে
রব চাহি, গতপাপ কতদিনে হায়
তারি পুণ্য-মধুস্বাদ লভিব হিয়ায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কামনা

(ওকাকুরা)

দেখিতেছি তারা এক ; মোর ধ্রুবতারা—
জানি কোথা চলিয়াছে তরণী আমার
ভগ্ন হাল ছিন্ন পাল হায় দিশাহারা
একেলা চলেছি ভাসি সাগর আঁধার !
নিশার শিশির একি কিম্বা অশ্রুধারা
সিক্ত যাহে একেবারে উত্তরী আমার ?
কোথা সে জোয়ার, ঝড় পাগলের পারা
যার বলে ভেসে আমি যাব একেবারে
আমার কামনা-তীর্থে, তোমার দুয়ারে ?

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অন্তিম ইচ্ছা

(ওকাকুরা)

আমি মরে গেলে পরে, করতাল বাদ্যভরে
কোরো নাকো নগর-কীর্ত্তন,
উড়াওনা চঞ্চল কেতন !
সিন্ধুতীরে, দেবদারু-ছায়া-বীথিকায়
ভাবের পরশে লেখা গানগুলি তার
বক্ষে রাখি সমাহিত করিও আমায় !

মরণ-বিলাপ মোর সেথা দিবানিশি ভোর
আন্‌মনা সমুদ্রের পাখী
তীক্ষ্ণ স্বরে গাহিবে একাকী !
সে বিজন শয়নের শিয়রে আমার
স্মৃতিচিহ্ন যদি কোন না দিলেই নয়,
রোপিও রজনীগন্ধা শুভ্র সুকুমার !

রব আমি আশা করে যবে হিম বাষ্পভরে
ধরণীর সীমা লুপ্ত হবে,
পূর্ণা তিথি জাগবে নীরবে,
বিরহ-বেদনা-শ্রান্ত হৃদয় তন্ময়
শান্ত করি, সে আমার সোহাগপরশে
শয়ন করিবে পাশে ত্যজি লাজ ভয় !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

"পারবে না ফুল ফোটাতে"

রবীন্দ্রনাথের "খেয়া"তে একটি গান আছে

"তোমরা কেউ পারবে না গো,
পারবে না ফুল ফোটাতে"।

জীবনের বিজ্ঞতা যতই বেশি হয় ততই সহজে এর মানে বোঝা যায়। অনেকবার প্রেমের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি প্রেমের পরিচয়ের চিহ্ন পাওয়া ভাল, কিন্তু পেলেই আমরা আরও চাই। আমরা কখনও তৃপ্তি পাই না।

প্রেমের চিহ্ন পেয়ে লাভ কি ? একজন ইংরেজ কবি বলেছেন—

"Never seek to tell thy love
Love that never can be told."

প্রেম একটা ধরবার জিনিষ নয় যে ভাণ্ডারে জমা করে রাখা যাবে। প্রেমের প্রকাশ যদি আমরা পাই সেই প্রকাশটা আমরা সামগ্রী করে রাখতে পারি না। প্রেমের প্রমাণ বাহিরে দেখা যায় না। অনেক সময় এই বিষয়ে পাওয়া এবং না-পাওয়া সমান, বরঞ্চ না পাওয়া ভাল ; কেননা, যদি পাই তবে পরে অনেক অনুশোচনা আসে। আমরা বাইরের চিহ্ন চাই, কিন্তু প্রেম একটি আন্তরিক জিনিষ।

ঠিক এই রকম কর্ম্ম ক্ষেত্রে। ইউরোপে কাজের ফল দেখতে আমরা চিরকাল ব্যাকুল। কাজ করলে পর ফল না দেখলে আমরা তৃপ্তি পাই না। কিন্তু আমরা এত ব্যস্ত কেন ? আমাদেরই কর্ম্মের ক্ষেত্রে একজন অমর কর্ত্তা কাজ করছেন, তাঁর হাতে সমস্ত কর্ম্মের ফল থাকবে। সেইজন্যই ভারতবর্ষের যাঁরা ধার্মিক তাঁরা বলেন নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। বেশি ব্যস্ত হলে কর্ম্মের ফল নষ্ট হয়ে যাবে।

একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকে তখন যদি বেশি ব্যাকুল হয় তার ছবি নষ্ট হয়ে যায়। ছবি সুন্দর হলেও অনেকবার "আরও সুন্দর চাই" বল্‌তে বল্‌তে ছবি খারাপ হয়ে যায়।

সেইজন্য এই জীবনে ধৈর্য্য খুবই দরকার। সমস্ত পৃথিবী বল্‌ছেন "অপেক্ষা করো, তুমি অস্থির হয়ো না, মনে শান্তি রাখো। আমার সমস্ত সৌন্দর্য্য আপনি প্রকাশিত হবে।" ভোর বেলার পাখীদের গান, সূর্য্যাস্তের রঞ্জিত মেঘ, গাছে আমের মুকুল, বেল-ফুলের সুগন্ধ, পদ্ম-ফুলের ফোটা, ও ফলের পাকা সকলই ঠিক সময়ে আসে, কখনও অসময়ে আসে না। ঠিক সেই-রকম প্রেমের প্রকাশ, ভালবাসার চিহ্ন, কাজের সফলতা আপনি হয়ে উঠে। আমরা মিছামিছি ব্যস্ত হব কেন ? কারণ—

"কেউ পারবে না গো
পারবে না ফুল ফোটাতে।"

উইলিয়ম পীয়ারসন।

পুস্তক-পরিচয়

আদর্শ জননী—শ্রীযোগেন্দ্রলাল চৌধুরীর প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন, কলিকাতা। আট আনা। জষ্টিস স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসংবলিত।

গর্ভাধান হইতে আরম্ভ করিয়া শিশুর লালনপালনের সময় শিশুর কিরূপে শারীরিক পরিচর্য্যা করা উচিত এবং চরিত্রগঠনের জন্য কিরূপে কি কি নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা বিশদরূপে সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মাতৃত্বই নারীজীবনের সর্ব্বোচ্চ পদবী; মাতাই শিশুর ধাত্রী শিক্ষয়িত্রী; সুমাতা হইলে সুসন্তান হইয়া থাকে; জননী শিক্ষিতা ও সাধুশীলা হইলে শুধু নিজের যত্নে কিরূপে সন্তানকে সুস্থ সবল হৃষ্টচিত্ত রাখিতে এবং সুশিক্ষা দ্বারা শিশুর কোমল হৃদয়কে সৎপথে লওয়াইতে পারেন তাহার উপায় এই বইএ নানা উপদেশ দিয়া নানা আদর্শমাতার উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো হইয়াছে। মাতা ও ভাবী জননীদের এই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত।

উৎস—রায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীদাশরথি পতি বিদ্যাবিনোদ, কেশিয়াড়ি-মেদিনীপুর। ১৪৮ পৃষ্ঠা, মূল্য।• আনা।

ইহা একখানি প্রবন্ধের সংগ্রহপুস্তক। এই প্রবন্ধগুলি ইহাতে আছে—অভিষেকোৎসব (সম্রাট জর্জের); ভূস্বামিগণের ভবিতব্যতা; কার্ত্তিকে মৎস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন? ঈতি; অপূর্ব্ব অতিথিসৎকার; ভাষানুবাদ; মানব-জীবনে সুখের স্থান; মেদিনীপুরের ভাষা; ধর্ম্মতত্ত্ব-পরিশিষ্ট।

কোরক—শ্রীবিজয়মাধব মিত্রের প্রণীত ও প্রকাশিত, ১৪১।এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১৬ পৃষ্ঠা। ছয় আনা।

কবিতার বই। ৬৫টি কবিতা আছে। অল্প বয়সের লেখা। প্রায় সমস্ত কবিতাই দেবতার নিকট আত্মনিবেদন। ভাব এখনো প্রস্ফুটিত হয় নাই। ছন্দ এখনো তাল-লয়-সঙ্গত হয় নাই। তবু কোরকে মাধুর্য্যের নিতান্ত অভাব নাই। একটি কবিতার কয়েকটি লাইন আমাদের ভালো লাগিয়াছে—

সেদিন উষার শূন্যের গায়
দোদুল একটি পাখী
পাখা টানিয়া বক্ষ বাহিছে;
হর্ষ-বিভোর আঁখি।
নীলিমা-নাগের চুম্বন-চ্যুত
অনুরাগ-রেণু-রাশি
রঞ্জিল দূর শূন্য-সাগর,
রাঙ্গল তারে আসি।

কাকলী—শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ভদ্র ভিলা, নড়াইল। কুন্তলীন প্রেসের ছাপা। ডঃ ক্রাঃ ৩২ পেজি ৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা, বাঁধানো দশ আনা।

কবিতার বই, ভগবৎ-প্রসঙ্গে রচিত। ছন্দে তাল না থাকাতে পড়িতে অসুবিধা হয়।

ভবানীভাবনা—শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র সেনগুপ্ত-প্রণীত। ভবানীপুর, বীরভূম। আট আনা।

ভবানীপুর গ্রামের ভবানীশঙ্কর কবিরাজ লেখকের পূর্ব্বপুরুষ; তিনি ভবানীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। গ্রন্থকার পয়ার ত্রিপদী ছন্দে পদ্য রচনা করিয়া ভবানীপুর গ্রাম, ভবানীশঙ্কর কবিরাজ, তাঁহার প্রতি ভবানীর কৃপা ও আদেশে ভবানীর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, কবিরাজ ভবানীশঙ্করের বংশাবলী প্রভৃতির বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভবানীর স্বপ্নাদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের মুখপাতে লেখকের ও গ্রন্থমধ্যে ভবানীমূর্ত্তির ও মন্দিরের ছবি আছে। এ বইএর সঙ্গে সাধারণের কোনো সম্পর্ক নাই; ইহা একটি বিশেষ গ্রামের বিশেষ বংশের কথা লইয়া রচিত।

সেবকসঙ্গীত—শ্রীরামকানাই দত্ত কর্ত্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। ডিমাই ৮ পেজি ৮০ পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা। ব্রহ্ম-সম্বোধনে ও ব্রহ্মভজনায় এবং বিষয়বাসনার অনিত্যতা প্রদর্শনে রচিত কতকগুলি গান।

কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম-এ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৭০ অখিল মিস্ত্রীর গলি, কলিকাতা। আট আনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বিস্তৃত সমালোচনা। কপাল-কুণ্ডলার চরিত্র ও প্রকৃতি এবং উপন্যাসের উপাখ্যানের সহিত দেশী বিদেশী কোন্ চরিত্র ও উপাখ্যানের সহিত সাদৃশ্য আছে তাহা তুলনায় সমালোচনা করিয়া সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা রচনার রস সৌন্দর্য্য কৃতিত্ব বিশেষত্ব অতি বিচক্ষণ পাণ্ডিত্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার বই অতি অল্পই আছে; ইহা তাহাদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে। সমালোচনা-ব্যবসায়ী বা সমালোচক-অভিমানী লোকেদের এই বইখানি পড়িয়া দেখা উচিত কিরূপে শ্রদ্ধার সহিত সমালোচককে বিচার করিতে হয়, রচনার মধ্যে যাহা গুণপনা ও নৈপুণ্য থাকে তাহাকেই প্রাধান্য দিয়া দোষের ভাগকে অতিক্রম করিতে হয়। ইহা এইসব গুণে একখানি উৎকৃষ্ট সমালোচন হইয়াছে।

মণিমুক্তা—শ্রীরসময় লাহা কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৭নং জয় মিত্র ষ্ট্রীট কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ২৪ পেজী ৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০ আনা।

ওরিএন্টাল সেমিনারীর হেড মাষ্টার শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকার "পূর্ব্ব-ভাষে" পরিচয় দিয়াছেন—"রসময় এবার 'ছাইভস্ম' ছাড়িয়া "মণিমুক্তা"য় হাত দিয়াছেন; তবে মণিমুক্তাগুলি সবই বিলাতী, কিন্তু পাকা জহুরীদের সম্পদ—সচ্চা জিনিষ।......বিদেশী ভাষা ও ভাব স্বদেশী ছাঁচে কবি এমন সুনিপুণভাবে ঢালিয়াছেন যে উহা দেশী বলিয়াই মনে হয়।......এই পুস্তকের অনেকগুলি ইংরাজী কবিতা ইস্কুল-কলেজ-পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায়, অতএব স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের পক্ষে এই সকল কবিতা বিশেষ উপযোগী বলিয়া বোধ হয়।" কবিতাগুলি বিচিত্র ভাব-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। দেশী ছাঁচে ঢালিয়া অনুবাদেও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তবে ছন্দ সেকেলে অক্ষর-মাত্রিক, আধুনিক ধ্বনি-মাত্রিক নহে। এজন্য পড়িতে বাধে, তাল কাটে।

সঙ্গীত-সুধা—শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী বিরচিত। কিরণচাঁদ দরবেশ গ্রথিত (?)। প্রকাশক শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যো-পাধ্যায়। ২৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ৵০ আনা।

ইহাতে ভক্ত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কতকগুলি ব্রহ্ম সঙ্গীত ও কৃষ্ণ সঙ্গীত আছে।

মুরলী—শ্রীসারদাপ্রসাদ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত। প্রকাশক জে, এন, বোস। ২৯ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫৬ পৃষ্ঠা, আট আনা।

কৃষ্ণবিষয়ক ৫৬টি গান।

মুদ্রারাক্ষস।



প্রবাসী

১৬শ ভাগ ২য় খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩২৩	২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

"অতি ব্যগ্র" বিশ্বজনীনতা।

গত ১লা জুন তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি নূতন রকমের সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যাঁহারা এই সভা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রসিদ্ধ লোক নহেন। ঐ শহরে একটি গির্জ্জা আছে, তাহার নাম সামাজিক বিপ্লবের গির্জ্জা (Church of the Social Revolution)। এই গির্জ্জার প্রাঙ্গণে নানা জাতির জাতীয় পতাকা দাহ করা হয়, এবং সর্ব্বশেষে "সর্ব্বজাতীয় শ্রমজীবীদের পতাকা" (The Banner of International Industrialism) তুলিয়া ধরা হয়।

পতাকা-দাহ অনুষ্ঠানটির পূর্ব্বে গির্জ্জাতে উপাসনা হয়। উপাসনার পর গির্জ্জার পাদরি হোয়াইট সকলকে প্রাঙ্গণে সম্মিলিত হইয়া তথায় বিশ্বজনীনতার জন্ম প্রত্যক্ষ করিতে আহ্বান করেন।

সকলে একত্র হইলে একজন বক্তা বলিলেন, "সমুদয় জাতিকে সম্মিলিত করিয়া একটি বিশ্বজনীন সাধারণতন্ত্র স্থাপনের ইহা অপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্ত আর হইতে পারে না।" তার পর হাইন্‌রিক্ ওয়েবার নামক একজন জার্ম্মেন নিজ-দেশের পতাকা পরিত্যাগ করিয়া তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। ওয়েবারের পর গ্রেটব্রিটেন, রুশিয়া, জাপান, ইটালী, সুইডেন, রুমেনিয়া এবং গ্রীসের কোন কোন অধিবাসী নিজ নিজ জাতীয় পতাকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। সর্ব্বশেষে এলবার্ট হেক্কেল নামক আমেরিকার একজন লোক আমেরিকার পতাকা আগুনে ফেলিয়া দিলেন, এবং সার্ব্বজনিক পতাকা খুলিয়া তুলিয়া ধরিলেন।

এই ঘটনাটির নিজের কোন গৌরবের জন্য ইহা এখানে বিবৃত করিলাম না। ইহা একটি লক্ষণ মাত্র। জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে হিংসা ঈর্ষ্যা বিরোধ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে কত যে রক্তপাত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। অন্য দিকে নানা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, নানা কবি, ও অন্যান্য অনেক মহাত্মা সকল মানুষের একতা ঘোষণা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে সকল দেশ এক রাষ্ট্র ও সকল জাতি এক মহা মানবজাতিতে পরিণত হইবে, এবং যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হইবে, ধরা আর নররক্তে প্লাবিত হইবে না, এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া সাধারণ মানুষকেও সেইরূপ আশা দিয়াছেন। অন্ততঃ পক্ষে সমস্ত ইউরোপকে একটি রাষ্ট্রের মত কেমন করিয়া করা যায়, তাহার উপায় এবং ঐ রাষ্ট্রের মূল নিয়মাবলী পর্য্যন্ত কেহ কেহ স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, এবং সকলের চেয়ে "সভ্য" জাতিরাই এই যুদ্ধ করিতেছে। তথাপি মানুষ বিশ্বজনীন একতা, ও স্থায়ী শান্তির আদর্শ ও আশা ত্যাগ করিতে পারে না;—তাহা মানব-

প্রকৃতিতে নিহিত রহিয়াছে। যে ঘটনাটি বিবৃত করিলাম, তাহা এই আদর্শ ও আশার একটি বাহ্য প্রকাশ মাত্র।

ইস্লাম-বিরোধী জাতীয়তা।

জাতীয়তা পাশ্চাত্য দেশসকলে যেমন প্রবল, এক জাপান ছাড়া অন্য কোথাও তেমন প্রবল নহে। কিন্তু জাতীয়তার আড্ডাতেই যে বিশ্বজনীনতা অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহার অনেক লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে যেখানে জাতীয়তার উদ্ভব খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয় নাই, সেখানেও জাতীয়তার উদ্ভব হইতেছে।

যে-সকল দেশে মুসলমানধর্ম্ম প্রচলিত, তথায় মানুষের নাম, পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা, এবং সভ্যতা অনেকটা এক ছাঁচের। মুসলমান ধর্ম্ম মানুষকে এতটা এক রকমের করে, যে, যদি ঐ ধর্ম্ম পৃথিবীব্যাপী হইত, তাহা হইলে উহা দ্বারা এক মহা মানবজাতি গঠনের অনেকটা সাহায্য হইতে পারিত। বিশ্ব-ইস্লাম প্রচেষ্টার (Pan-Islamic Movementএর) যাঁরা অনুরাগী কর্ম্মী, তাঁরা এইরূপ আশাই করেন। কিন্তু ইস্লামধর্ম্ম পৃথিবীব্যাপী হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবার লক্ষণও দেখা যাইতেছে না, এবং যে-সকল জাতি ও দেশ মুসলমানধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহাদের মধ্যেও বরাবর যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছে। তাহা হইলেও বিদেশী-স্বধর্ম্মীর জন্য মুসলমান খুব বেশী বেদনা অনুভব করে, এবং তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করে। অন্য সব ধর্ম্মাবলম্বীরা ঠিক্ এই ভাবে বিদেশী-স্বধর্ম্মীর ব্যথার ব্যথী হয় না। ভারতবর্ষীয় অনেক মুসলমানের তুর্কের সঙ্গে, আরবের সঙ্গে যতটা প্রাণের যোগ, ভারতবর্ষবাসী হিন্দুশিখজৈন-আদির সঙ্গে তেমন যোগ নাই। মুসলমানের এই যে দেশের-সীমালঙ্ঘনকারী ধর্ম্মমূলক স্বাজাতিকতা, ইহা এই সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। যে যুগে ইউরোপের সকল দেশের খৃষ্টিয়ানেরা ইহুদীদের দেশে আসিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড্ নামক ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিল, তখন খৃষ্টীয় জগতেও এই ধর্ম্মমূলক স্বাজাতিকতা ছিল; এখন নাই। এখন ইউরোপের সব দেশে ধর্ম্মমতের বন্ধন অপেক্ষা স্বাদেশিকতা প্রবল।

মুসলমান দেশসমূহের মধ্যে ইউরোপীয় তুরস্ক এখনও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এই তুরস্কে তুর্কদের মধ্যে এক "সর্ব্ব-তুরানিক প্রচেষ্টা"র (Pan-Turanian Movement-এর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহা কেবল সকল তুরানীয়দের প্রতি প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হইত; কিন্তু ইহার মূলে আরব-বিদ্বেষ এবং তজ্জনিত ইস্লাম-বিদ্বেষও রহিয়াছে। বিদ্বেষ বিরোধের আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

এই প্রচেষ্টাটি নিতান্ত আজকালকার নয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ইহার কথা শুনা যাইতেছে। ইহার তুর্কী নাম "য়েনী-তুরান" অর্থাৎ নব্য তুরান। তুর্ক-জাতীয়তা পুনরুজ্জীবিত করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহা তুর্ক-তাতার-জাতীয় সমস্ত লোককে একজাতীয়তাসূত্রে আবদ্ধ করিতে চায়। বুলগেরীয়দিগকেও এই মণ্ডলীভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার নেতারা ইস্লামের বিরোধী; কারণ, তাঁহারা বলেন, যে, ইস্লামের প্রভাব স্বাদেশিকতা-মূলক জাতীয়তার প্রতিকূল এবং ইসলামের প্রভাবে স্বতন্ত্র তুর্ক সভ্যতার উদ্ভব হইতে পায় নাই। "নব্য-তুরানে"র নেতারা তুর্ক জাতির আত্মাকে আরব্য-সভ্যতা ও ইস্লামের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিতে চান।

এই প্রচেষ্টার সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই দুটা দিক্ আছে। সাহিত্যিক বিভাগে তুরানীয় জাতির ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগে আরবজাতির প্রতি বিদ্বেষ বড় প্রবল। "নব্য-তুরান" নেতারা মনে করেন যে আরবেরা তুর্কদের ভাগ্যাকাশে অশুভ গ্রহের মত হইয়া আছে। তাঁহারা বলেন, তুর্কদিগকে, আরবীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া, খাঁটি তুর্ক হইতে হইবে, তাহাদিগকে আরবদের ভাষা ও সামাজিক রীতিনীতি ভুলিতে হইবে, আরবী ভাষার চর্চ্চা ও চলন বন্ধ করিয়া তাহার জায়গায় তুর্কদের ভাষা চালাইতে হইবে।

বিলাতী সেণ্ট্র্যাল নিউস্ এজেন্সীর একজন বিশেষ সংবাদদাতা এইসব খবর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে জার্ম্মেনী এই নব্য-তুরান প্রচেষ্টার আগুনে খুব বাতাস দিতেছে। তাহা সত্য হইতেও পারে। কারণ, আরবদেশ তুরস্কের অধীনতা-শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিয়া স্বাধীন হইয়াছে, এবং জার্ম্মেনী তুরস্কের বন্ধু ও ইংরেজ আরবের বন্ধু।



লোকমান্য শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর টিলক

সেণ্ট্র্যাল্ নিউস্ এজেন্সীর সংবাদদাতা যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহার কতটুকু সত্য বলা যায় না। তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য আমাদের নাই, এবং তাহা করা আমাদের প্রধান বক্তব্য বলিবার পক্ষে আবশ্যকও নয়। সে বক্তব্য এই, যে, বিশ্বজনীনতা চরম ও চূড়ান্ত আদর্শ কিন্তু জাতীয়তার ভিতর দিয়া এই আদর্শে পৌঁছিতে হইবে, এবং এই আদর্শে পৌঁছিবার পরও জাতীয়তা থাকিবে ও থাকিবার প্রয়োজন আছে।

জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা।

মানুষে মানুষে যেমন ঐক্যবোধ আছে, তেমনি পার্থক্য-বোধও আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের চেহারার প্রভেদ যতই হোক না কেন, মোটের উপর সব মানুষের চেহারার এমন একটা মিল আছে যাহাতে করিয়া মানুষকে মানুষ বলিয়া চেনা যায়, অন্য প্রাণী হইতে পৃথক করা যায়। মানুষের অন্তরটারও এইরূপ মিল আছে। এই কারণে বিদ্যার আদানপ্রদান সম্ভব হইয়াছে। মানুষের চিন্তাপ্রণালী ও যুক্তিমার্গ এক রকম বলিয়া একজাতির গণিত বিজ্ঞান দর্শন অন্য জাতি নিজের করিতে পারিয়াছে। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধের ও হৃদয়ের ভাবেরও এইরূপ একটা মূলগত ঐক্য আছে। সেইজন্য একজাতির কাব্য চিত্র মূর্ত্তি অন্য জাতিকে আনন্দ দিতে পারে; একজাতির কাব্য ও শিল্প দ্বারা অন্য জাতি অনুপ্রাণিত হইয়াছে ও হইতে পারে। মিশরের শিল্পের প্রভাব গ্রীসের শিল্পে অনুভূত হয়, ভারতের বৌদ্ধযুগের শিল্প চীন ও জাপানের শিল্পকে অনুপ্রাণিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। পারস্যের শিল্প দ্বারা ভারতবর্ষের শিল্প রূপান্তরিত হইয়াছিল। এখন আবার ভারতবর্ষের শিল্পে কখন কখন পাশ্চাত্য ও জাপানী শিল্পের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের দার্শনিক মত প্রাচীনকালে গ্রীসের দার্শনিক মতকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, এবং আধুনিক কালে জার্ম্মেনীর ও অন্যান্য কোন কোন দেশের দার্শনিক মতকে নিজের প্রভাবের অধীন করিয়াছে। ইটালী, ফ্রান্স ও জার্ম্মেনীর সাহিত্যের প্রভা ইংরেজী সাহিত্যের নানা যুগে অনুভূত হয়। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব বাংলা আধুনিক সাহিত্যে লক্ষিত হয়। বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ভারতবর্ষের হিন্দী, গুজরাটী, কানাড়ী, মালয়ালম প্রভৃতি নানা সাহিত্যে লক্ষিত হয়; সম্ভবতঃ ইংরেজী সাহিত্যের উপরও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব পরে লক্ষিত হইবে।

পোষাক, গায়ের রং, মুখের ও দেহের অন্যান্য অংশের গড়ন, প্রভৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও যেমন সকল মানুষকে একই শ্রেণীর জীব বলিয়া বুঝা যায়, তেমনি ভাষা, ধর্ম্মমত, আচারব্যবহার, বাসস্থান, প্রভৃতির ভিন্নতা সত্ত্বেও অন্তরে মানুষ যে মূলতঃ এক তাহাও বুঝা যায়। পার্থক্য অপেক্ষা এই বাহ্য ও আন্তরিক ঐক্যই অধিক প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু পার্থক্যও আমরা ভুলি না, ভুলিলে চলে না।

কথা আছে, "উদারচরিতানাম্ভ বসুধৈব কুটুম্বকম্।"—উদারচরিত ব্যক্তিরা পৃথিবীর সব মানুষকে আত্মীয় মনে করেন। কিন্তু তা বলিয়া যাহার মনুষ্যত্ব আছে সে কখনও অন্যের বাড়ী আড্ডা গাড়িয়া তাহার অন্ন ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে অনুভব করে, যে, ভগবান্ তাহাকেও হাত পা দিয়াছেন, চোখ কান দিয়াছেন, দেহের শক্তি ও নৈপুণ্য দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন; অতএব তাহার উচিত নিজের চেষ্টায় নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করা। শুধু তাই নয়। সুস্থ সবল প্রকৃতির মানুষ, অপরের চিন্তা ও ভাবকে অবজ্ঞা বা বর্জ্জন করেন না বটে, তাহাও গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহা নিজে মনন করিয়া ও অনুভব করিয়া আত্মসাৎ করেন, এবং অধিকন্তু স্ব-তন্ত্র স্বাধীনভাবেও চিন্তা করেন এবং হৃদয়ে নানা ভাব অনুভব করেন।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, জাতিগতভাবেও তাহাই স্বাভাবিক। অন্য দেশের, অন্য জাতির, বা আমাদেরই দেশের অন্য কালের কোন একজন মানুষ সুস্থ সবল ছিলেন, উপার্জ্জক ছিলেন, সাহসী ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন, চিন্তাশীল ছিলেন, কবি ছিলেন, ভক্ত ছিলেন, ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগযুক্ত ছিলেন বলিয়া আমাদিগের আর কাহারও স্বাস্থ্য শক্তি উপার্জ্জন সাহস বিদ্যা চিন্তাশীলতা কবিত্ব ভক্তি বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রয়োজন নাই, ইহা কেহই মনে করেন না। বেদের ঋষিরা ছিলেন বলিয়া বুদ্ধদেবের, শঙ্করাচার্য্যের, রামানন্দ রামানুজের, কবীর চৈতন্য নানক তুকারামাদির,

রামমোহন রামকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল না, আমরা এরূপ মনে করিনা; ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস জন্মিয়াছিলেন বলিয়া তুলসীদাস কৃত্তিবাস কাশীরাম চণ্ডিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিদের উদ্ভব কেহ অনাবশ্যক মনে করেন না। ইহাও বলা যায় না যে প্রাচীন ঋষি ও কবিরা যাহা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন আধুনিকগণ কেবল তাহারই পুনরুক্তি করিয়াছেন, নূতন কিছু বলেন নাই।

মানুষ যে দেশের যে জাতির যে কালেরই হউক ভগবান যখন তাহাকে কলের পুতুল করিয়া পাঠান নাই, তাহাকে স্বতন্ত্র আত্মা হৃদয় মন বুদ্ধি দিয়াছেন, তখন তাহার নানা দৈহিক ও আত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন ও সুব্যবহারের জন্য সে দায়ী। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-যুগে যাঁহারা আমাদের জন্য আত্মিক মানসিক ঐশ্বর্য্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন আমরা সাধন মনন দ্বারা নিজস্ব করিব, তেমনি নিজের স্ব-তন্ত্র চেষ্টা দ্বারাও ঐরূপ ঐশ্বর্য্য কিছু উপার্জ্জন করিব; নতুবা ভগবান যে আমাদিগকে স্বতন্ত্র আত্মা দিয়াছেন, তাহার সার্থকতা কোথায়?

ঈশ্বর কেবল ভারতবর্ষের, জুডিয়ার, আরব দেশের বা চীনের কোন কোন মহাত্মাকেই আত্মা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগকেই সত্য দর্শনের শক্তি দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগেরই নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা ঠিক্ নয়। তিনি কেবল ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের লোকদিগকেই রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের শক্তি দিয়াছেন, অন্য কোন জাতিকে দেন নাই, ইহা ঠিক্ নয়। তিনি কেবল পাশ্চাত্যদিগকে এবং প্রাচ্যের মধ্যে জাপানীদিগকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষমতা ও যন্ত্রনির্ম্মাণপটুতা দিয়াছেন ইহা ঠিক্ নয়। তিনি বর্ত্তমানে যাহারা স্বাধীন সেইসব জাতিকেই স্বদেশরক্ষার শক্তি ও স্বদেশপ্রাণতা দিয়াছেন, ইহা ঠিক্ নয়। তিনি কেবল প্রাচীন হিন্দু, প্রাচীন গ্রীক্, আধুনিক জার্ম্মেন, প্রভৃতিকেই দার্শনিক করেন নাই। কবিত্ব-শক্তিতে কোন দেশের, জাতির বা কালের লোককে একচেটিয়া অধিকার দেন নাই। সৌন্দর্য্যবোধ, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, শিল্পনৈপুণ্য, কেবল কতকগুলি জাতিকেই দেন নাই। এমন কোন কাল, দেশ, দেশসমষ্টি, জাতি,বা জাতি-সমষ্টি নাই, যাহাতে এবং যাহাদের চেষ্টায় মানবের বিচিত্র শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। মানুষ ধর্ম্মে, জ্ঞানে, শক্তিতে, সভ্যতার সকল অঙ্গে আরও উন্নত হইতে থাকিবে, এবং এই ক্রমোন্নতি প্রত্যেক দেশ ও জাতির সাধনসাপেক্ষ। এমন কোন জাতি নাই, এমন কোন মানুষ নাই যাহার সৃষ্টি অনাবশ্যক। সামাজিক প্রথা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোষে মনে হইতে পারে যে কতকগুলি মানুষের জন্ম ও বাঁচিয়া থাকা একান্ত আবশ্যক, অন্য সকলে না জন্মিলে এবং না বাঁচিয়া থাকিলেও চলিত। কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেকেরই কিছু হইবার, কিছু করিবার, আছে। একজন মানুষেরও যাহা হইবার ও করিবার সে যদি তাহা না হয় বা না করে, তাহা হইলে মানবসমাজের অপূর্ণতা কিছু থাকিয়া যাইবে, মানব-সভ্যতার একটু অভাব দূর হইতে বাকী থাকিবে।

এইরূপ প্রত্যেক জাতিরও মানব-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কিছু হইবার, কিছু করিবার আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের, প্রাচীন জুডিয়ার, প্রাচীন আরবের, প্রাচীন গ্রীসের, প্রাচীন রোমের, বা আধুনিক ইউরোপ আমেরিকা জাপানের উপর ভার দিয়া বা বরাত দিয়া থাকিলে চলিবে না। ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মসাধনপ্রণালী, ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান, সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা, প্রভৃতি দেশকাল জাতি ও ব্যক্তির উপযোগী হওয়া চাই। দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প প্রভৃতিতেও প্রত্যেক জাতির স্ব-তন্ত্র কর্ত্তব্য আছে। সকল বিষয়েই সকল জাতির মধ্যে আদানপ্রদান চলিবে, প্রাচীন হইতে গ্রহণ চলিবে; কিন্তু ধর্ম্মে, সামাজিক ব্যবস্থায়, শিক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, কোন যুগের লোক অন্য যুগের, বা কোন জাতির লোক অন্য জাতির সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, অধীন বা দাস হইবে না; ইহাই জাতীয়তার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

জাতীয়তা এই সমুদয় বিষয়েই প্রত্যেক জাতিকে স্ব-তন্ত্র চেষ্টা করিতে অনুপ্রাণিত করে। জাতীয়তা কেবল রাজনীতি-ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ নহে, কিম্বা, তাহার উপর, দেশী জিনিষ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত "স্বদেশী" প্রচেষ্টা যোগ করিলেই জাতীয়তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিম্বা যদি কেহ তাহার উপর ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ে দেশী সাবেক চালচলন ও সামাজিক প্রথা অন্ধভাবে মানিয়া চলেন

তাহা হইলেও জাতীয়তার বিকাশ সম্পূর্ণ হইল না। অধিকন্তু যদি কেহ অজন্টার চিত্রাঙ্কণ-পদ্ধতি বা রাজপুত চিত্র-শিল্পের হুবহু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাহাও এ কালের সজীব জাতীয় শিল্প হইবে না। আমরা যেমন একটা স্বতন্ত্র জাতির মানুষ, তেমনি একটা স্বতন্ত্র কালেরও মানুষ। আমাদের অবস্থা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবস্থা এক নয়। আমাদিগকে ধর্ম্মে, সমাজে, শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, সব বিষয়ে স্বকীয় চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার মানে এ নয় যে আমরা পুরাতন কিছু লইব না, বা অন্য দেশের কিছু লইব না। লইব; মানুষের মত লইব, মানুষের মত বর্জ্জন করিব; কলের মত নয়। কিন্তু আমাদেরও নিজের কিছু সাধনা নিজের কিছু চেষ্টা চাই; নতুবা আমরা নূতন দেহ ও স্বতন্ত্র আত্মা লইয়া জন্মিলাম কেন?

আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতীয় চেষ্টার ফলকে যে অন্য ব্যক্তির বা অন্য জাতির চেষ্টার ফল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইতেই হইবে, তাহা নয়। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যটা চিন্তার প্রধান বিষয় নয়। প্রত্যেকে স্বকীয় সাধনা, স্ব-তন্ত্র চেষ্টা, করিতেছে কি না, তাহাই ভাবিবার বিষয়।

জাতিতে জাতিতে বিরোধ স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এবং অনেক স্থলেই বিদেশী-বিদ্বেষ স্বজাতিপ্রেমের বেশে আত্মপরিচয় দেয় বলিয়া জাতীয়তা জিনিষটাকেই অনেকে বিদ্বেষ ও বিরোধের ব্যাপার মনে করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। আমি যদি আমার মাকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, তাহার মানে কি এই যে, আমি অন্যের মাকে অশ্রদ্ধা করি ও শত্রু মনে করি? তাহা হইলে আমাদের জননীজন্মভূমিকে ভাল বাসিলে অপরের জননীজন্মভূমিকে বিদ্বেষ করিতেই হইবে, কে বলিল? অপরের ধন চুরি না করিয়াও, অপরকে বঞ্চিত না করিয়াও, লক্ষ লক্ষ লোক নিজের পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য ধন উপার্জ্জন করে। পরোক্ষভাবে বাণিজ্যব্যপদেশে অপরের ধনলুণ্ঠন না করিয়াও এক-একটা জাতিও এইরূপে নিজের উপার্জ্জন দ্বারা খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। বর্ত্তমান কালের শিল্পে-অগ্রসর জাতিদের বড় বড় কারখানার অস্তিত্ব পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির অবনত দশার উপর নির্ভর করে বটে; অনেক স্থলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অবনত করা ও রাখা হয়, অনেক স্থলে তাহাদিগকে স্বসুবিধা ও স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করা ও রাখা হয় বটে; কিন্তু মানবসমাজের ইহাই চরম পরিণতি বা স্থায়ী শেষ দশা নহে। শিল্পবাণিজ্যেও অহিংসামূলক জাতীয়তা আসিবে; না আসিলে প্রলয় ঘটিবে।

একটা জাতির প্রত্যেক মানুষ সুস্থ শিক্ষিত সচেষ্ট না হইলে যেমন সমগ্র জাতিটা পূর্ণ সিদ্ধি ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের পথে অগ্রসর হইতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক জাতি সুস্থ, শিক্ষিত, সচেষ্ট না হইলে সমগ্র মানবজাতি সার্থকজন্মা হইবার পথে অগ্রসর হইয়া পূর্ণ সিদ্ধি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না। এইজন্য জাতীয়তা ব্যতীত বিশ্বজনীনতা হইতেও পারে না, থাকিতেও পারে না। কিন্তু প্রত্যেক জাতির জাতীয়তা অন্য সব জাতির জাতীয়তার অবিরোধী হওয়া চাই। নতুবা সংগ্রামেই অনেকের সাধনার ক্ষয় হইবে।

কেহ যদি বলেন যে সমুদয় মানবজাতি সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করুক না? তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে ভবিষ্যতে কোন কোন বড় ব্যাপারে নৈমিত্তিক সম্মিলিত চেষ্টা হইতে পারে, কিন্তু সব বিষয়ে নিত্য দৈনন্দিন জগদ্ব্যাপী চেষ্টা হইতে পারে না। সমগ্র মানব-জাতির কথা দূরে থাক্, একটা গ্রামের সব লোক সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য, সামাজিক, ও অন্যান্য কাজ একত্র করিতে পারে কি?

আমাদের দেশে, ধর্ম্মবিষয়েও যে আমাদিগকে নিজের স্ব-তন্ত্র সাধনা নূতন করিয়া করিতে হইবে, ইহা অনেকে বুঝেন না, স্বীকার করেন না। কিন্তু অন্য বিষয়েও যেমন এবিষয়েও তেমনি নবীন, সজীব জাতীয়তা ও তদুপযুক্ত চেষ্টার প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় বিষয়ক জাতীয়তা আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় সর্ব্ববিধ কার্য্য সাধনের শক্তি লাভ করিতে সচেষ্ট করে, স্বরাজ লাভ করিতে উদ্বুদ্ধ করে। এ ক্ষেত্রে কেহ একথা বলেন না, যে, "প্রাচীন ভারতে অনেক সাধারণতন্ত্র ছিল, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন, ধর্ম্মপাল ছিলেন, তৎপরে পৃথ্বীরাজ, আকবর, শিবাজী, প্রভৃতি ছিলেন, অতএব আবার নূতন করিয়া শক্তিলাভেরই বা প্রয়োজন

কি, স্বরাজলাভচেষ্টারই বা দরকার কি? এ সব আপনা আপনিই হইবে।" শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ব্যতীত ভারতবর্ষ সুস্থ সবল হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না; সেইজন্য স্বদেশী আন্দোলন করা হইয়াছিল, এখনও তাহার কিছু জের আছে। এক্ষেত্রে ত কেহ বলেন না, "ভারতবর্ষ পূর্ব্বে এশিয়ার নানা দেশ ও দ্বীপ এবং রোম গ্রীস মিশর বাবিলন প্রভৃতি নানা ভূভাগে কৃষিশিল্পজাত নানা দ্রব্য পাঠাইয়া ধনী হইত, এই কথাগুলি আওড়াইলেই আমরা আবার ধনী হইব ও খুব পেট ভরিয়া খাইতে পারিব।" ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনীতি, শিল্প বা বাণিজ্যের চেয়ে সোজা নয়। ইহার জন্যও ব্যক্তিগত স্ব-তন্ত্র সাধনা চাই। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সাধন করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সাত্ত্বিক হইয়াছিলেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, বলিয়া আমরা তাঁহাদের কথাগুলি আওড়াইলেই বা কতকগুলি বাহিরের কাজ করিলেই আমাদের মুক্তি হইবে, ইহা মনে করা গুরুতর ভ্রম। কোন বিষয়েই নিজের ব্যক্তিগত শ্রম ও সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাই। আমাদিগকেও সাধনা করিতে হইবে, আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতে হইবে, সাত্ত্বিক হইতে হইবে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পাইতে হইবে। প্রাচীন বলিয়াই কোন প্রণালী বর্জ্জনীয় নহে, প্রাচীন বলিয়াই শিরোধার্য্যও নহে। শ্রদ্ধাসহকারে বিচার করিয়া দেশকালপাত্রোপযোগী যাহা তাহা গ্রহণীয় ও রক্ষণীয়; এবং নূতন কিছুর প্রয়োজন হইলে তাহা আমাদিগকেই সাধনা দ্বারা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করিতে হইবে।

স্বাদেশিকতার মূল বিশ্বাস।

মনের যে ভাবটিকে জাতীয়তা, স্বাজাতিকতা, বা স্বাদেশিকতা বলা হয়, তাহার মূলে, আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, একটি বিশ্বাস বিদ্যমান আছে। তাহা এই, যে, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতি মোটের উপর অপর যে-কোন দেশ ও জাতির সমান ছিল, আছে, বা হইতে পারে। মানুষ যখন একটি দেশ বা জাতিকে অন্য কোন দেশ বা জাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করে, তখন হয় অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিম্বা বর্ত্তমানের প্রতি করে, অথবা অতীত ও বর্ত্তমান উভয়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে; ভবিষ্যতে কি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করে না। কিন্তু অনেক দেশের অতীত কিরূপ ছিল, তাহা আমাদের জানা নাই, বর্ত্তমানে কোন্ দেশ কতটা উন্নত তাহাও সব স্থলে জানি না; ভবিষ্যৎ ত সকলেরই অজ্ঞাত সুতরাং অনুমানের বিষয়। অথচ কেবল নিজের জাতির বা দেশের উপর টান থাকার জন্যই যে লোকে মনে করে, যে, "অতীতে বা বর্ত্তমানে আমাদের দেশ মহিমান্বিত না থাকিলেও ভবিষ্যতে গৌরব-মণ্ডিত হইবে," তাহা নয়; ইতিহাসে দেখা যাইতেছে যে অতি অসভ্য জাতি কালক্রমে সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে, এবং যে জাতির লোক সুবিধা পাইতেছে তাহারাই উন্নতি করিতেছে; উন্নত দেশ অধঃপতিত হইবার পর আবার উঠিতেছে।

বীরত্বের জন্য প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা, রোমানেরা বিখ্যাত ছিল; তাহারা ভাবে নাই যে অসভ্য গল, ব্রিটন, টিউটন, প্রভৃতিও এ-বিষয়ে তাহাদের সমকক্ষ হইবে। রাজপুত বীরদের কথা, অকালী শিখদের কথা, জাপানী সামুরাইদের কথা ত তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। রোমানেরা যখন সভ্য, তখন ইংলণ্ডের লোকেরা নগ্ন চিত্রিত-দেহ অরণ্যচারী বর্ব্বর। তখন কেহ কল্পনা করে নাই যে কালে ইংলণ্ডের লোকেরা ইটালীর লোকদের চেয়ে উন্নত ও শক্তিশালী হইবে। প্রাচীনকালে গ্রীস ভারতবর্ষের কাছে কোন কোন বিদ্যা শিখিয়াছিল, গ্রীসের নিকট বিদ্যার জন্য ইংরেজ, জার্মেন প্রভৃতি ঋণী; এখন ভারতবর্ষ ইউরোপের নিকট বিদ্যা শিখিতেছে। এইরূপ যে ঘটিবে তাহা প্রাচীনকালে ঠিক্ করিয়া কে জানিত? ভারতবর্ষ এক সময়ে চীনকে ও জাপানকে ধর্ম্ম ও কলা শিখাইয়াছিল, এবং চীনের সভ্যতা জাপানে বিস্তৃত হইয়াছিল; এখন জাপান কোন-কোন বিষয়ে চীন ও ভারতবর্ষ উভয়কেই পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকালে ত একথা কেহই কল্পনা করে নাই; আমরা যখন বালক ছিলাম, সে ত সে-দিনকার কথা, তখনও কবি হেমচন্দ্র জাপানকে "অসভ্য" বলিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধের সময় কে জানিত যে যীশুখৃষ্ট জন্মিবেন, শঙ্করাচার্য্য জন্মিবেন, কবীর, নানক, চৈতন্য জন্মিবেন? যীশুখৃষ্টের সময় কে মনে করিয়াছিল যে

মোহাম্মদ জন্মিবেন? গ্রীক নাট্যকার সোফোক্লীসের সময় কে ভাবিয়াছিল যে তৎকালে অজ্ঞাত ও অখ্যাত অসভ্য ব্রিটিশ দ্বীপে শেক্সপীয়রের মত এমন একজন নাট্যকার জন্মিবেন?

এইসব ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রত্যেক দেশের স্বদেশ-প্রেমিকের এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সমুদয় কাল চিন্তা করিলে তাঁহার দেশ অন্য যে-কোন দেশের নিশ্চয়ই সমকক্ষ। বাস্তবিক সমকক্ষ যদি এখনও না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোন্ দেশ, কোন্ জাতি, কোন্ ব্যক্তি কিরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহা কি ইতিহাসে সব লেখা হইয়াছে? লেখা হইয়া থাকিলেই বা তাহার খোঁজখবর কয়জন রাখে? গ্রীসের মারাথন থার্মোপিলী বীররঙ্গভূমি বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু রাজপুতানার হলদিঘাট এবং আরও কত অপ্রসিদ্ধ স্থান কি সেরূপ গৌরবলাভ করিয়াছে? এ-সকলের কথা তবু ত সভ্য জগতে অল্প-স্বল্প জানা পড়িয়াছে, কিন্তু আমেরিকার "অসভ্য লাল ইণ্ডিয়ান"রা যে স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেমের প্রেরণায় গ্রীকের সমান শৌর্য্য দেখাইয়াছে, তাহা কয়জন জানে? আমেরিকার বিখ্যাত বাগ্মী ও সংস্কারক ওয়েণ্ডেল্ ফিলিপ্স্ এই "অসভ্য লাল ইণ্ডিয়ান"-দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"From Massachusetts Bay back to their own hunting grounds every few miles is written down in imperishable record as a spot where the scanty scattered tribes made a stand for justice and their right. Neither Greece nor Germany nor the French nor the Scotch can show a prouder record. And instead of searing it over with infamy and illustrated epithet, the future will recognise it as a glorious record of a race that never melted out and never died but stood up manfully, man by man, foot by foot, and fought it out for the land God gave him."—*The American Journal of Sociology*, September 1916, p. 263.

ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্স্ বলিতেছেন যে লাল ইণ্ডিয়ানরা ন্যায় এবং নিজেদের অধিকারের জন্য যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা তাহাদের অক্ষয়-কীর্ত্তি; গ্রীস্ জার্ম্মেনী ফ্রান্স স্কটল্যাণ্ড কোন দেশ তাদের চেয়ে গৌরবজনক ইতিহাস দেখাইতে পারে না। ভবিষ্যৎকালে ইহা স্বীকৃত হইবে যে ইণ্ডিয়ানরা মেষের মত মাছির মত মরে নাই, তাহারা, প্রত্যেকে, মানুষের মত, তাহাদের ভগবদ্দত্ত এক-এক হাত জমির জন্য প্রতি হাত জমিতে লড়িয়াছে।

অথচ এই বীরজাতিদের কথা আমরা সামান্যই জানি।

পৃথিবীর সমস্ত বীরপুরুষকেই কি আমরা চিনি? অনেকের নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে উঠে নাই। যাঁহাদের নাম উঠিয়াছে, তাঁহাদেরও অনেকে সমুচিত যশ ও পূজা লাভ করেন নাই। নেপোলিয়নের যোদ্ধা বলিয়া খুব খ্যাতি আছে; কিন্তু নিগ্রো নেপোলিয়ন টুস্যাঁ লুভ্যারর্ত্তিয়্যার (Toussaint L'Ouverture) প্রায় অজ্ঞাতই রহিয়াছেন। অথচ তিনি স্বজাতিপ্রেমে ও প্রকৃত শৌর্য্য ও মনুষ্যত্বে ইউরোপের নেপোলিয়ন অপেক্ষা মহত্তর ব্যক্তি ছিলেন।

এইরূপ কত সাধু, কত মনস্বী, অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছেন।

কোন দেশ, কোন জাতি, কোন যুগ, কোন ব্যক্তি, ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র নহে। আমরা সকলের কাছেই ঋণী ও কৃতজ্ঞ, কিন্তু ধর্ম্মে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রীয়-ব্যাপারে কোনও যুগের দেশের বা জাতির অপর কোনও যুগের দেশের বা জাতির চির-অধীন চির-দাস থাকা অবশ্যম্ভাবী বা একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। সমান-সমানভাবে পরস্পরের উপর সব-জাতি নির্ভর করিবে। ইহাই জাতীয়তা, স্বাজাতিকতা, বা স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র ও মূলবিশ্বাস।

বাঙালী কি লুপ্ত হইবে?

আমরা আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বলিয়াছি যে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে যত মানুষ জন্মিয়াছিল, তার চেয়ে বেশী মানুষ মরিয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ঘটিয়াছিল; তারপর গত বৎসর ঘটিয়াছে। গত বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা ৪৬৯২৯ হইয়াছিল; সুতরাং প্রায় সাতচল্লিশ হাজার মানুষ ১৯১৫ সালে কমিয়াছে। হঠাৎ এইরূপ ঘটে নাই। আগে আগে যত মানুষ মরিত, তার চেয়ে অনেক বেশী জন্মিত। কিন্তু গত পাঁচ বৎসরের হিসাব লইলে দেখা যায় যে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যার এই যে আধিক্য তাহা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল, এবং শেষে জন্মের চেয়ে মৃত্যুরই সংখ্যা বেশী হইয়াছে। ইহা নীচের তালিকায় দেখান হইতেছে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের আধিক্য + চিহ্ন দ্বারা এবং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর আধিক্য — চিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

বৎসর	আধিক্য বা ন্যূনতা
১৯১১	+ ৬৬১৬০৭
১৯১২	+ ২৫০৫৫৬
১৯১৩	+ ১৯৮০৫৩
১৯১৪	+ ১০৩৯৯২
১৯১৫	— ৪৬৯৩৯

এই তালিকা দেখিলে এরূপ মনে হয় না যে ১৯১৫তে জলপ্লাবন বা দুর্ভিক্ষের জন্য মৃত্যু বেশী হওয়ায় কেবল ঐ বৎসর দেশের দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। ঐসব কারণে দুর্গতি একটু বেশী বাড়িয়া থাকিতে পারে; কিন্তু দুর্গতিটা আগেও ছিল এবং তাহা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯১৫ সালে বঙ্গের ২৭টি জেলার মধ্যে ১২টিতে মৃত্যুর চেয়ে জন্ম বেশী হইয়াছিল, এবং ১৫টিতে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমগ্র দেশ ধরিলে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছিল। কোন্ জেলায় মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম বা জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হাজারকরা কত অধিক হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখান যাইতেছে।

জেলা	হাজারকরা মৃত্যুর চেয়ে জন্মের আধিক্য	হাজারকরা জন্মের চেয়ে মৃত্যুর আধিক্য
বৰ্দ্ধমান	...	৯·৬২
বীরভূম	...	২০·৩৭
বাঁকুড়া	...	৪·১৭
মেদিনীপুর	·০৪	...
হুগলী	...	৩·৮৬
হাবড়া	১·৫৮	...
২৪ পরগণা	...	১·৫৩
কলিকাতা	...	১০·০৫
নদিয়া	...	১০·৮৫
মুর্শিদাবাদ	...	১২·৬৩
যশোর	...	৯·০৭
খুলনা	৭·৪৬	...
রাজশাহী	...	৩·৯৬
দিনাজপুর	২·৭০	...
জলপাইগুড়ী	২·৮২	...
দারজিলিং	...	২·০৮
রংপুর	...	৬·৪৫
বগুড়া	...	১০·৩৬
পাবনা	...	১৩·৩৩
মালদহ	...	৬·৯০
ঢাকা	·৪১	...
মৈমনসিং	·৯৯	...
ফরিদপুর	·৮৮	...
বাখরগঞ্জ	৮·৪২	...
চট্টগ্রাম	১৪·১৪	...
নোয়াখালী	১৬·২৪	...
ত্রিপুরা	১০·৯৬	...
সমগ্র বাংলা দেশ	...	১·০৩

মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে তবে ত দেশের উন্নতির কথা আসে। বাঁচিয়া থাকা, এবং সুস্থ হইয়া বাঁচিয়া থাকাটা সকলকার গোড়ার কথা। অতএব, এই যে বঙ্গের অতি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে, ইহার প্রতি, বিশেষভাবে এবং সকলের চেয়ে বেশী করিয়া, দেশের লোকদের এবং গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

দেশে যে মানুষ এত মরিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়তের উপর দৃষ্টি পড়ে। বাংলা-গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন এই অত্যধিকসংখ্যক মৃত্যু হইতেছে "the result largely of widespread epidemics of cholera and small pox, which caused altogether 163,464 deaths, and partly also of reduced vitality consequent on the adverse economic conditions and bad agricultural seasons of this and previous years." "বেশী মানুষ মরিয়াছে ওলাউঠা ও বসন্তের মড়ক হওয়ায়, অর্থাভাব-বশতঃ জীবনীশক্তির হ্রাস হওয়ায়, এবং ঐ (১৯১৫) বৎসর ও পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর ফসল ভাল না হওয়ায়।"

ওলাউঠা ও বসন্তের মড়ক কেন হয়? ওলাউঠার মড়ক সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট হইতে কতকগুলি তথ্য ও মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"The increased mortality in Dacca is said to be due to want of good water-supply which becomes scanty in the rural areas in the dry season, 2697 deaths being reported in March, 3395 in April and 2144 in December or 8236 out of 11728 deaths in the whole year. The Civil Surgeon of Rajshahi says that the association between drought and cholera is remarkable, and that there can be little doubt that the one

is definitely related to other. In fact outbreaks of cholera must be counted upon as annual events as long as the majority of sources of water-supply remain subject to gross contamination as they do at present."

"Regarding the very high rate in Mymensing the Civil Surgeon says :—

'During the flood, due to pollution of the water-supply a most severe form of cholera epidemic broke out in the Tangail sub-division, Jamalpur becoming gradually badly affected with it. In August when a large part of the district was under water dead bodies of cholera patients were thrown into the flood water which carried the germs and spread the disease far and wide,..........."

সুতরাং দেখা যাইতেছে জলের অল্পতা, এবং ওলাউঠায় মৃত রোগীর শব দ্বারা ও অন্যান্য প্রকারে দূষিত জল ব্যবহার, এই মড়কের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কূপ শোধন করিলে যে মড়ক হইতে পায় না বা কমে তাহা নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে :—

"Except in the Rajshahi division wells are not much resorted to as a source of drinking water supply in this Presidency. But as a precautionary measure most of those that are situated in localities where cholera broke out were disinfected with permanganate of potash. This precaution was generally attended with good results."

যে-যে জায়গায় জলের কল আছে, তথায় যাহারা নলের জল ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে ওলাউঠা কম হয় বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত অংশে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে :—

"A serious outbreak of the disease also occurred in Berhampore. In this case special investigation brought to light the fact that the disease was confined to those classes of the population who still persist in drinking unfiltered water brought from the river instead of making use of the pipe-water supply. It was reported that no case of cholera occurred in any house provided with a house connexion. These facts emphasise the value of a pipe-water supply as a preventive of cholera."

বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, কূপ পুষ্করিণী বা অন্য জলাশয়ের জল শব-নিক্ষেপ মল-নিক্ষেপ বস্ত্রপ্রক্ষালন ইত্যাদি দ্বারা দূষিত না করা, দূষিত না করিতে শিক্ষা দেওয়া, দূষিতকরণ নিবারণ করা, এবং যেখানে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায় লোককে তাহাই পানের জন্য ব্যবহার করিতে অভ্যাস করান, এইগুলি ওলাউঠার মড়ক নিবারণের উপায়। দূষিত জল ব্যবহার এই রোগ সংক্রামিত হইবার প্রধান কারণ হইলেও, কদর্য্য, পচা বা অন্য প্রকারে দূষিত খাদ্য ব্যবহার করিলেও যে ইহা সংক্রামিত হইতে পারে, তাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। লোকে অনেক সময় অজ্ঞতাবশতঃ, কিন্তু অধিকাংশস্থলে দারিদ্র্যবশতঃ এইরূপ খাদ্য খাইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হয়।

ওলাউঠা নিবারণের জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের, জমিদার ও অন্য ধনী লোকদের, মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডগুলির, এবং গবর্ণমেণ্টের গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

সব জেলাতেই এই পীড়া ১৯১৫ সালে দেখা দিয়াছিল। ইহার সকলের চেয়ে বেশী প্রকোপ হইয়াছিল মৈমনসিং জেলায়; তার পর মালদহ, পাবনা, ঢাকা, নোয়াখালী, রংপুর, বাখরগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, হাবড়া ও খুলনা।

বসন্তের মারী কেন বাড়িয়াছিল, তাহার কারণ সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। টীকা দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে মাত্র। বসন্তরোগে মৃত ব্যক্তির শব জলে যাহাতে নিক্ষিপ্ত না হয়, তাহার উপায় করা উচিত। বসন্তরোগীর বস্ত্রাদি কোন জলাশয়ে ধৌত যাহাতে না হয়, তাহাও দেখা চাই। অন্য নানা উপায়ে ইহা সংক্রামিত হয়; তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এক-একটা ছোট ছোট ঘরে অনেক লোকের বাস, দেহ অপরিষ্কার রাখা ও ময়লা কাপড় পরা, অপরিষ্কার জায়গায় ও ঘরে বাস করা, নর্দ্দামা আদি অপরিষ্কার রাখা, এইসব কারণেও এই ব্যাধির আবির্ভাব হয়।

দারিদ্র্য ও কৃষির দুরবস্থা।

বাংলা-গবর্ণমেণ্ট আর্থিক দুর্দ্দশাজনিত জীবনীশক্তির-হ্রাস ও কৃষির দুরবস্থা, মৃত্যধিক মৃত্যুর এই দুটি কারণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, দেশের লোক বড় গরীব, চাষের উপরই তাদের প্রধান নির্ভর, ১৯১৫ সালে চাষ নানা কারণে অনেক জায়গায় ভাল না হওয়ায়, লোক মরিয়াছে। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীরা এই দারিদ্র্যের কথাটা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতে বা বলিতে দিতে চান না। অন্নাভাবে বা অন্নকষ্টে কেহ মরিয়াছে, তাহাও স্বীকার পারত পক্ষে করেন না; বলেন উদরাময়ে বা হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হওয়ায় বা আর কোন রকমে মরিয়াছে। কিন্তু উদরাময়টা হয়

কেন? হৃৎপিণ্ডের কাজই বা থামে কেন? অন্নের দুষ্প্রাপ্যতা কি কারণ হইতে পারে না?

আর্থিক দুরবস্থাবশতঃ লোকের জীবনীশক্তির হ্রাস বন্ধ করিতে হইলে, সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা দিয়া এবং নানা উপায়ে পুরাতন শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন দ্বারা লোকের কৃষি ছাড়া অন্য উপার্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে হইবে। তা ছাড়া কৃষিরও উন্নতি করা চাই। আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যদেশে কত কৃষিকলেজ, কৃষির কত উচ্চ মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। আমাদের দেশেও সেইরূপ হওয়া চাই। কেবল বৃষ্টির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। খাল প্রভৃতি খনন করা আবশ্যক। বাঁকুড়া জেলায় যে এত দীর্ঘকালব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল, কিন্তু পুরাতন খালের সংস্কার বা নূতন খালের খনন কোথাও সরকার বা ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড করিয়াছেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই। বাঁধ খনন হইয়াছে বটে; তাহা প্রশংসনীয়।

বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মকব্যাধি।

১৯১৫ সালে বাংলা দেশে ওলাউঠা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ বৎসর বা অন্য কোন বৎসরই ঐ দুই রোগে সকলের চেয়ে বেশী লোক মারা পড়ে নাই। ১৯১৫ সালে হাজারকরা ৩২.৮৩ মৃত্যু হইয়াছিল। তার মধ্যে ওলাউঠায় ২.৮৮, বসন্তে .৭২, কিন্তু জ্বরে ২৩.৪৭। এইরূপ ১৯১৪ সালেও ওলাউঠায় ১.৯৬, বসন্তে .২১, কিন্তু জ্বরে ২২.৪০ মরিয়াছিল। ১৯১০ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত ৫ বৎসরের গড়ে ওলাউঠায় ১.৯৮, বসন্তে .২০, কিন্তু জ্বরে ২১.১৩ মরিয়াছিল। জ্বরই বাংলাদেশের সকলের চেয়ে ভীষণ ব্যাধি। মৃত্যু ত সকল রোগের চেয়ে ইহা হইতেই বেশী হয়; অধিকন্তু যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা নিজে বারবার রোগাক্রান্ত বা অন্য রোগীর সেবায় ব্যতিব্যস্ত ও ব্যয়ভারে জেরবার হওয়ায়, সকল দিকে দেশটা স্ফূর্ত্তিহীন, নিস্তেজ, নির্বীর্য্য, উৎসাহহীন, বিমর্ষ, এবং মানসিক ও দৈহিক শ্রমে অক্ষম হইয়া থাকে।

মানুষকে নির্বীর্য্য করিবার চেষ্টা ম্যালেরিয়া বীরভূম জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়াছিল। ১৯১৪ ও ১৯১৫ দুই বৎসরই বীরভূমে জ্বরের প্রকোপ অন্য সব জেলার চেয়ে বেশী হইয়াছিল, তৃতীয় স্থানীয় তার নীচে মুর্শিদাবাদ। ১৯১৫তে ছিল রংপুর। তাহার পর দিনাজপুর, বগুড়া, নদিয়া, রাজশাহী, মালদহ, প্রভৃতি। এই বৎসরের সরকারী রিপোর্টে ম্যালেরিয়ার কারণ ও তাহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা নাই। কুইনাইন বিতরণের উল্লেখ আছে, ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্য নাই। বন্যার জলে গ্রামের মাঠঘাট ডুবাইয়া দিলে নাকি ম্যালেরিয়া দূর হয়; এই উপায় কোথাও কোথাও আগামী বৎসর (১৯১৬) অবলম্বিত হইবে বলিয়া লেখা হইয়াছে। রোগের একটি কারণ সম্বন্ধে একটু আভাস একটি মন্তব্যে পাওয়া যায়, যদিও তাহার গুরুত্ব কমাইবার চেষ্টাও সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে। কারণটা রেলওয়ের বিস্তার। যথা:—

"Among rural areas Gokarna in Murshidabad which stood second last year now heads the list with a ratio of 69·58 against 53·06. The Civil Surgeon says that this thana continues to be notorious for returning the highest death-rate under the head fever, the health of the locality going from bad to worse since the construction of the B. A. K. Railway. Although there is evidence of there having been a definite increase of malaria in the country traversed by this line, since its construction, data are not yet available to show what proportion of the deaths returned from this area as due to fever is really to be ascribed to malaria."

যুদ্ধ এবং পীড়ানিবারণার্থ ব্যয়ের হ্রাস।

বার্ষিক স্বাস্থ্য-রিপোর্টের উপর গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধের জন্য আর্থিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হওয়ায় যথেষ্ট ব্যয় করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু যখন যুদ্ধ থাকে না, তখনও দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয় না। যুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন কারণে আর্থিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইলে অন্য সব রকমের ব্যয় কমাইয়া মানুষের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এবং বালকবালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে থাকা উচিত। কারণ, রোগজনিত মৃত্যু যুদ্ধ শেষ হইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না, সে বাধা না পাইলে নিজের শিকার লইয়া যাইবেই যাইবে; এবং মানুষ একবার মরিয়া গেলে যুদ্ধের শেষে চিকিৎসিত হইবার জন্য ফিরিয়া আসিবে না। শিক্ষা সম্বন্ধেও ঐ কথা;—যুদ্ধের জন্য বালক-বালিকাদের বয়সবৃদ্ধি থামিয়া থাকিবে না, বয়স বাড়িতেই থাকিবে; এবং কাহারও শিক্ষার সময় পার হইয়া গেলে, যুদ্ধের পর আবার তাহার সেকাল ফিরিয়া আসিবে না; কিম্বা কাহারও কুশিক্ষা, কুঅভ্যাস, ও আলস্য বদ্ধমূল হইয়া গেলে যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে বলিয়াই যুদ্ধের পর তাহা দূর করা সুসাধ্য হইবে না।

জার্ম্মেনী ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ভীষণ শত্রু, তাহাকে পরাজিত করা নিশ্চয়ই দরকার; কিন্তু জ্বর, ওলাউঠা ও বসন্ত আদি পীড়াও কম শত্রু নহে। জার্ম্মেনীর শত্রুতা ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে আরম্ভ হইয়াছে, এবং আর ২।১ বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহার অবসান হইবে; কিন্তু ম্যালেরিয়ার শত্রুতা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অবসান হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিতেছে। প্রতি বৎসর শুধু বাংলা দেশেই দশ লক্ষ লোক জ্বরে মরিতেছে। অন্যান্য রোগেও আরও চারি

লক্ষের উপর মানুষ মরিতেছে; জার্মেনীকে জব্দ করিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য **প্রতিদিন ছয় কোটি** টাকা খরচ করিতেছেন; এবং তাহা করা খুবই উচিত। কিন্তু জ্বরাসুরকে বধ করিবার জন্য **বৎসরে ছয় কোটি কিম্বা তাহার শতাংশ ছয় লক্ষও** খরচ করা যায় না কি? ১৩২২এর বৈশাখের প্রবাসীতে ডাক্তার নীলরতন সরকার একটা অনুমান করিয়াছেন যে জ্বরের জন্য মৃত্যুতে বৎসরে বাংলা দেশের বার কোটি টাকা লোকসান হয়। এই ক্ষতি নিবারণের জন্য কি করা হইতেছে?

"মৃত্যু ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

একপ্রকার অলস নিরুদ্যম তথাকথিত দার্শনিকতা আছে, তাহাতে মানুষকে এই বলিতে প্রবৃত্ত করে, যে, "মৃত্যু দৈব ঘটনা, উহার উপর মানুষের হাত নাই।" কিন্তু এরূপ যুক্তির অনুসরণ করিলে কোন রকম আধিব্যাধিরই প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত নয়। কারণ, যা কিছু ঘটে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, বলিয়া, বসিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক অজ্ঞতা দারিদ্র্য রোগ অকালমৃত্যু এগুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা ঠিক নয়, এবং আমরা স্বভাবতঃ তাহা মনে করিও না; কারণ, নিজের-নিজের পরিবারে অজ্ঞতা দারিদ্র্য রোগ দূর করিতে, এবং অকালমৃত্যু যাহাতে না ঘটে, তাহার উপায় করিতে, আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। এক-একটি জাতি ও দেশ কতকগুলি পরিবার ও গৃহস্থালির সমষ্টিমাত্র। অজ্ঞতা দারিদ্র্য রোগ অকালমৃত্যুর বিরুদ্ধে সমগ্রজাতি এবং দেশব্যাপী সংগ্রাম হওয়াই স্বাভাবিক। এইরূপ সংগ্রাম দ্বারা সুসভ্য দেশসকলে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা খুব কমিয়াছে, দুর্ভিক্ষ আর হয় না, অনশনে মৃত্যুর কথা বড় শোনা যায় না, রোগ ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর লোকের হইতেছে এবং মোটের উপর মৃত্যুসংখ্যাও কমিয়া আসিতেছে। "দৈব" বলিয়া চুপ করিয়া থাকা কাপুরুষের লক্ষণ। আমাদেরই দেশের প্রাচীন নীতিকার উপদেশ দিয়াছেন, "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষম্ আত্মশক্ত্যা," দৈবকে বিনাশ করিয়া আত্মশক্তি দ্বারা পৌরুষকে প্রতিষ্ঠিত কর, এবং শেষ কথা এই বলিয়াছেন, "যত্নে কৃতেঽপি যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ," যত্ন করিয়াও যদি সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে দোষ কি?

পাশ্চাত্য সভ্যদেশসকলে মৃত্যুর হার আয়বৃদ্ধি, সাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা এবং চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের দরুন এত কমিয়াছে, তথাপি এখন যত লোক মরে, তত মৃত্যুরও অনেক অংশ তাহাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শদাতারা নিবার্য মনে করেন। অধ্যাপক উইন্সলো (C. E. A. Winslow) আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের স্বাস্থ্যবিভাগের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ (Educational Director of the New York Department of Health)। আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে (U. S. A.) একটি "জাতীয় জীবনীশক্তি সংরক্ষণ কমিটি" (Committee on Conservation of National Vitality) আছে। এই কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সম্মিলিত-রাষ্ট্রে বৎসরে যে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহার শতকরা ৪০টি স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞানের সুপ্রয়োগ দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। এই-মত কন্‌ষ্ট্রাক্টিভ্ কোয়ার্টার্লী নামক ত্রৈমাসিক কাগজে পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপক উইন্সলো কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে নিউইয়র্ক শহরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ ১০০০ শিশুর মধ্যে ১৪৪টি মরিয়াছিল; সুশিক্ষার দ্বারা ও স্বাস্থ্যের নিয়ম জারী করায় ১৯১৪ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ৯৪ হইয়াছিল।

ডাক্তার হোল্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন:—

"Does God fix the death rate? Once men were taught so, and death was regarded as an act of Divine Providence, often inscrutable. We are now coming to look upon a high infant mortality as evidence of human weakness, ignorance and cupidity. We believe that Providence works through human agencies and that in this field, as in others, we reap what we sow—no more and no less."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিধাতা মৃত্যুর হার ঠিক্ করিয়া দেন নাই। মানুষের দুর্ব্বলতা, অজ্ঞতা ও লোভে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে। ভগবান্ মানুষের হাত দিয়া কাজ করেন; মানুষ যেমন বীজ বপন করে তেমনি ফল পায়,—বেশীও নয়, কমও নয়।

আমেরিকায় টাইফয়েড জ্বরে মৃত্যুর হার কুড়ি বৎসরে প্রতি লক্ষে ৪৬ হইতে ১৬তে পরিণত হইয়াছে। তথায় বৎসরে ক্ষয়রোগে যে দেড়লক্ষ মৃত্যু হয়, তাহার এক লক্ষ নিবার্য্য বলিয়া তথাকার ডাক্তারদের ধারণা। তাঁহারা বলেন ৪৫এর উর্দ্ধ বয়সের লোকেরা যদি প্রতিবৎসর একবার করিয়া বিচক্ষণ ডাক্তারের দ্বারা দেহ পরীক্ষা করান, এবং, ঔষধ সম্বন্ধে নয়, খাদ্যশ্রমবিশ্রামাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা লন, তাহা হইলে গড়ে পাঁচ বৎসর করিয়া পরমায়ু বাড়িতে পারে।

দেশময় স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য খুব চেষ্টা হওয়া দরকার। "স্বাস্থ্য-সমাচারের" মত কাগজের খুব আদর হওয়া উচিত।

বাঁকুড়া-সম্মিলনীর দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড।

দেশে অন্নাভাব কতক পরিমাণে আছেই। এই অভাবের মাত্রা খুব বাড়িলে তাহা দুর্ভিক্ষে পরিণত হয়। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ বৎসরাধিক কাল লাগিয়াছিল; এখন অন্নাভাবের মাত্রা কমিয়া সচরাচর যেরূপ থাকে, প্রায় সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টার প্রয়োজন

আগে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। কেবল দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট লোকদের উপবাস নিবারণের প্রয়োজন কমিয়াছে। সেইজন্য বাঁকুড়া-সম্মিলনীর দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সম্মিলনী আর টাকা লইতেছেন না। তাঁহাদের হাতে উদ্বৃত্ত যে টাকা আছে, তাহা হইতে খুব গরীব কতকগুলি লোককে শীতবস্ত্র দেওয়া হইবে। যে-সকল দয়াবতী ভদ্রমহিলা ও দয়ালু ভদ্রলোক ফণ্ডে অর্থসাহায্য করিয়া সম্মিলনীকে শতশত লোককে অন্নবস্ত্র দিতে সমর্থ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ চৌধুরী আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে ভাগলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার মহাশয়ের পত্নীর অম্বিকানগর অঞ্চলে যে জমীদারী আছে, তথাকার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদিগের মধ্যে তিনি প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছেন, তাহাদের চাষের জন্য যত টাকা ও ধান আবশ্যক তাহা ধার দিয়াছেন, এবং খাজনার টাকার সুদ প্রভৃতি মাফ করিয়া ও বাঁধপুষ্করিণী আদি খনন করাইয়া লোকের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সহৃদয়তা প্রশংসনীয়।

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলক।

মহারাষ্ট্রে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলক অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক লোকের অনুরাগ ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি কেহ নাই। তিনি দেশের হিতসাধনার্থ অনেক স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন ও কারাবাস আদি অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। সমুদয় কষ্ট তিনি চরিত্রের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে সহ্য করিয়াছেন। গত ২০শে জুলাই তারিখে তাঁহার যাটবৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হয়। তদুপলক্ষে, তাঁহাকে যাঁহারা ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা তাঁহাকে একলক্ষ টাকা উপহার দিতে সংকল্প করেন। আমাদের দেশে খুব ভাল কাজের জন্যও এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু তিনি এমনই লোকপ্রিয় যে এই একলক্ষ টাকা সংগ্রহ খুব শীঘ্রই হইয়া গিয়াছিল। টিলক মহোদয় এই টাকা নিজের জন্য গ্রহণ না করিয়া দেশের সেবার জন্য গ্রহণ করেন, এবং বলেন যে সাধ্যানুসারে তাঁহার নিজের টাকাও ইহাতে যোগ করিয়া লোকহিতসাধনে তৎপর থাকিবেন।

তাঁহার জন্মোৎসবের দিন বোম্বাই-গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে পুণার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার নামে এই নোটিশ জারী করেন যে, তিনি একবৎসর নিরপরাধ থাকিবার জামিনস্বরূপ কেন নিজে ২০,০০০ টাকা জমা দিবেন না, এবং আরও ২০,০০০এর জন্য দুজন প্রতিভূ দিবেন না, তাহার কারণ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। তাঁহার নামে এই অভিযোগ হইয়াছিল যে তিনি বক্তৃতা দ্বারা রাজদ্রোহ অপরাধ করিয়াছেন। পুণার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তিনি নোটিস্ অনুযায়ী কারণ দেখাইতে হাজির হন, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিকট ২০,০০০ টাকা জামিন লন, এবং তিনি যদি এক বৎসরের জন্য "ভাল ছেলের" মত সুব্যবহার না করেন তাহা হইলে প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা করিয়া দিবেন এরূপ দুজন প্রতিভূও তাঁহাকে দিতে হয়। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে তিনি বিরক্তিকর এবং মার্জ্জিত-রুচিবিগর্হিত কথা কোন কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজদ্রোহসূচক কোন কথা বলেন নাই। সুতরাং তিনি জামিনমুক্ত হইয়াছেন। ইহা আনন্দের বিষয়।

শ্রীযুক্ত টিলক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তিনি টাইম্‌সের ভারতবর্ষস্থ সংবাদদাতা সার ভ্যালেণ্টিন কিরলের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা চালাইবার জন্য বিলাত যাইবেন। ইহাতে সমাজভয়ভীত অনেকের সমুদ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত হইবে। বিলাতের লোকদিগকে নিশ্চয়ই তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে ভারতবর্ষের ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য ভারতবাসীদিগকে হোমরূল বা স্বরাজের অধিকার অবিলম্বে দেওয়া উচিত।

মহারাষ্ট্রে টিলকপ্রমুখ দেশভক্তদিগের উদ্যোগে স্বরাজ্য-লাভের জন্য হোমরূল লীগ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমিতির চেষ্টায় স্বরাজসমর্থক নানা পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত, এবং নানাস্থানে বক্তৃতা হইতেছে। মান্দ্রাজে শ্রীমতী এনি বেশাণ্টও হোমরূল লীগ স্থাপন করিয়া এইরূপ কাজ করিতেছেন; ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

গতমাসে-তোলা টিলক মহোদয়ের একখানি ফোটোগ্রাফ হইতে আমরা ছবি প্রস্তুত করাইয়া মুদ্রিত করিলাম।

বঙ্গের ও বিহারের ভাষা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাগলপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল; এবার বাঁকীপুরে হইবে। উভয় স্থানই বিহারের অন্তর্গত। বিহারে যে-সকল বাঙালী স্থায়ী বা প্রায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদেরই উদ্যোগে সম্মিলনের এই অধিবেশন হইতেছে। অনেক বিহারীও বাংলা বুঝেন; তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ কেহ কেহ সভাস্থলে উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ কর্ম্ম-কর্ত্তাদের মধ্যে পরিগণিত নহেন। কিন্তু যদি বাঁকীপুরে হিন্দীসাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন হইত, তাহা হইলে তথাকার শিক্ষিত বিহারী ভদ্রলোকেরাই উদ্যোগী কর্ম্মী হইতেন। কারণ, বিহারের কেতাবী ভাষা হিন্দী।

বিহারের "সাধু" ভাষা হিন্দী হইলেও তথাকার কথিত ভাষার হিন্দী অপেক্ষা বাংলার সহিতই সাদৃশ্য বেশী।*

* "The dialects spoken in Bihar," "which he [Dr. Grierson] distinguishes collectively as Bihari,

"In declension, it [Bihari] partly follows Bengali and partly Eastern Hindi, but in the most important point, the formation of the oblique base, it follows the former and bears no resemblance to the latter. In conjugation, it differs altogether from Hindi and closely follows Bengali."†

এই সাদৃশ্য আগে আরও বেশী ছিল। সেইজন্য বিদ্যাপতিকে বিহারী ও বাঙালী উভয়েই আপনাদের কবি বলিয়া দাবী করেন, এবং মিথিলার হস্তাক্ষর ও বাংলার হস্তাক্ষর এক। এই অক্ষর মিথিলার পুরাতন পুঁথিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও মিথিলার ব্রাহ্মণেরা ইহা ব্যবহার করেন।

কোন ভূখণ্ড যদি নিজের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে ত ভাল; নতুবা তাহাকে কোন প্রতিবেশীর নিকট-সংপৃক্ত সাহিত কেই নিজের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। বিহারের কথিত ভাষা হিন্দী ও বাংলা হইতে কতকটা পৃথক হইলেও আধুনিক স্বতন্ত্র বিহারী সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। বিহারে আদালতেও আগ্রা-অযোধ্যার ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, কেতাবী ভাষাও হিন্দী বা উর্দ্দু হইয়াছে। অথচ কথিত ভাষা হিন্দী অপেক্ষা বাংলারই বেশী কাছাকাছি বলিয়া এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা আধুনিক বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্ট বলিয়া, বিহারের কেতাবী ভাষা বাংলা হইলে, এবং বিহারীরা বাংলাকেই আপনাদের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহা অধিকতর স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তাহা হইল না কেন? এই বিষয়টির আলোচনা বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনে কোন বিহারপ্রবাসী যোগ্য বাঙালী করিলে ভাল হয়। তাঁহাকে বিহারী ও বাংলা ভাষার সাদৃশ্য এবং বিহারী ও হিন্দীর পার্থক্য দেখাইতে হইবে। মিথিলার ও বাংলার অক্ষরের ঐক্য এবং মিথিলার ও নাগরী অক্ষরের প্রভেদও দেখাইতে হইবে। তাহার পর, সম্ভবতঃ কি কি কারণে বিহারে বাংলার বিস্তার না হইয়া হিন্দীর বিস্তার হইল, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

ভাসাভাসা ভাবে দেখিলে মনে হয়, বাংলা ও বিহার যখন এক সুবাভুক্ত ছিল, তখন বিহারে বাংলাই ত চলা উচিত ছিল। কিন্তু আসামও এক সময় বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ মিশনরীদের চেষ্টায় ও প্ররোচনায় আসামী একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছে; যদিও আসামের ভাষার সঙ্গে বাংলা "সাধু" ভাষার যে প্রভেদ, চট্টগ্রামের কথিত ভাষায় ও কেতাবী বাংলায় তার চেয়ে বেশী প্রভেদ নাই, এবং পুরাতন আসামীয় কাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্য অপেক্ষা আমাদের পক্ষে বেশী দুর্বোধ্য নহে। যে রকম কারণে ও চেষ্টায় বাংলা ও অসমিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে, বিহারের ভাষাকে স্বতন্ত্র করিবার জন্য সেরূপ কোন মিশনরী বা সরকারী চেষ্টা হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু আমাদের মনে হয় বাংলা ও বিহার এক শাসনের অধীন হওয়াতে, সরকারী কর্ম্মচারী ও প্রথম প্রথম রেলওয়ে ষ্টেশনের কর্ম্মচারী বেশী পরিমাণে বাঙালী হওয়াতে, বিহারীদের মনে যে স্বাভাবিক বিরক্তি, অসন্তোষ ও ঈর্ষ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল (যাহা এখনও আছে), তাহাই বিহারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের অন্যতম অন্তরায় হইয়া থাকিবে। প্রদেশজদিগের সহিত ব্যবহারে প্রবাসী বাঙালী মাত্রেরই সৌজন্যের অভাব আগে ছিল বা এখনও আছে, এরূপ বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে; কিন্তু কতকগুলি প্রবাসী বাঙালীর ব্যবহারে ঔদ্ধত্য ও অশিষ্টতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই দোষ বিহারীদের অসন্তোষ, ঈর্ষ্যা ও বিরক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকিবে। যাহার প্রতি মনের ভাব এইরূপ, তাহার ভাষা ও সাহিত্য কেমন করিয়া গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইতে পারে?

বিহারে বাংলার আদর না হইবার হয় ত আরও একটা কারণ ছিল। বাঙ্গালীদের ভীরু বলিয়া একটা অপবাদ আছে বা ছিল। অপবাদটা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, তজ্জন্য বাঙালীকে "ভাত খাউআ," ও "ভুখা" বলিয়া অনেক খোট্টা অবজ্ঞা করিতেন; এখনও করেন কিনা, জানি না। যে অবজ্ঞার পাত্র, তাহার ভাষা ও সাহিত্য আদৃত না হইবারই কথা।

আমরা যে-দুটি কারণ অনুমান করিলাম, তাহা সত্য কি না, বলা যায় না; অন্য কারণও থাকা সম্ভব। যাহাই হউক, এখন বাংলা বিহার আলাদা হইয়া গিয়াছে। অনেক বিহারী শিক্ষিত হইয়া চাকরী পাইতেছেন, বিহারে পৃথক হাইকোর্ট হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথক হইতেছে। নিতান্ত নির্বোধ ব্যতীত আর কেহ এখন আর সাহসে বিহারী বাঙালীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বাঙালীকে অবজ্ঞা করিতে পারে না। বাংলাকে বিহারের কথিত ভাষা করিবার চেষ্টা করিতে আমরা বলি না; এরূপ চেষ্টা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা নাই, যদিও স্বাভাবিক কারণে বাংলা-বিহারের সীমান্তপ্রদেশে কোথাও কোথাও বিহারীর পরিবর্ত্তে বাংলা

derived from the Magadhi Prakrit, which is also the parent of Bengali, Oriya and Assamese, and it is to these languages that Bihari is most closely allied, and with which it is accordingly grouped." "Dr. Grierson has now shown that the Bihari dialects not only cannot be treated as appertaining to the same language as those of Oudh and Bundelkhand, but that they do not even belong to the same linguistic group."

† The sign of the future tense in Bengali and Bihari is 'b', that of the past 'l' and that of the present definite '*chhi*' The numbers are used, not to distinguish between singular and plural, but to show respect or the reverse, and the distinction between the conjugation of transitive and intransitive verbs has disappeared." Bengal Census Report, 1901, p. 318.

চলিত হইতেছে।* কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রচার বিহারে হইতে পারে। কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার আলোচনা বাঁকীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন করিলে ভাল হয়।

যে ভাষা ও সাহিত্য যত বেশী লোকের দ্বারা ব্যবহৃত ও আদৃত হয়, তাহার উন্নতি ও শক্তি তত বেশী হইবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া, সাহিত্যের বন্ধন প্রেমের বন্ধন। আমরা যদি বিহারীকে বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আনন্দ দিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গে বিহারে একতা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও গদ্যলেখকেরা আমাদের যেরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন, অন্য কোন ইংরেজ তেমন প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র নহেন।

বিহারে বাঙালীর আদর।

"আমরা ভারতবর্ষের প্রধান জাতি হইয়া বসিয়া থাকিব, জ্ঞানে ধর্ম্মে শক্তিতে কেহ আমাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না," এরূপ ভাব পোষণ করা কোন প্রদেশের লোকেরই উচিত নয়। কিন্তু কোন বিষয়ে কাহারও অবস্থা মন্দ থাকিলে, তাহাতেও সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়। ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য আরও একটি বিষয়ে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই অন্য প্রদেশের কতকগুলি লোক স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে। এই প্রবাসীদের মধ্যে অনেকে, যে প্রদেশে বাস করেন তাহার হিতচেষ্টা করেন। প্রবাসী বলিয়া সেই সেই প্রদেশে ইঁহাদের অনাদর হওয়া উচিত নয়। গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে প্রদেশজদের মতই ইঁহাদের আদর হইলে বুঝা যায় যে সমগ্র ভারতব্যাপী জাতীয়তার দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি। বিহারে বিহারী ও বাঙালীর মধ্যে মনোমালিন্যের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি ও শুনিয়া ব্যথিত হইয়াছি। সংপ্রতি রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু-নারায়ণ সিংহ মহাশয় বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ায় আনন্দিত হইলাম। তিনি এক দিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে যোগ রাখেন, অন্যদিকে তেমনি বিহারের হিতসাধনেও তৎপর। আর একটি সুলক্ষণ জাতীয়তার বৃদ্ধি সূচনা করিয়া আমা-দিগকে আনন্দিত করিয়াছে। বিহারের ছাত্রেরা প্রতি-বৎসর সভা করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন, এবং বিহারে শিক্ষা বিস্তারের উপায় আলোচনা করেন। এবার দারভাঙ্গায় এই আলোচনা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল, এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয় ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা।

বাংলা বোম্বাই মান্দ্রাজ এই তিনটি প্রদেশকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর প্রদেশ মনে করা হয়। মান্দ্রাজে প্রতি বৎসর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমিতির অধিবেশন হয়, জেলায় জেলায় বার্ষিক আলোচনা-সমিতি বসে। কিছু দিন হইতে ঐ প্রদেশে হোমরুল লীগের খুব কর্ম্মিষ্ঠতা দেখা যাইতেছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সম্প্রতি আহমেদাবাদ শহরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও শৈক্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, মহারাষ্ট্রে হোমরুল লীগের বেশ উদ্যোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। অনগ্রসর প্রদেশগুলির মধ্যে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে সম্প্রতি রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিল্পবাণিজ্যিক আলোচনাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার আগে ঐ প্রদেশকে মন্ত্রীসভা না দেওয়ার বিরুদ্ধে সভা হইয়াছিল, মিউনিসিপাল বিলের বিরুদ্ধে সভা হইয়াছিল, শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রশ্নের আলোচনার জন্য সভা হইয়াছিল, এবং হিন্দু সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মধ্য-প্রদেশ ও বেরার আগ্রা-অযোধ্যা অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ বলিয়া পরিগণিত। সেখানেও সম্প্রতি রাজনৈতিক আলোচনা-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

বাঙালীর বাক্যবাগীশ বলিয়া বদনাম আছে। আমরা কথায় কথায় বলিতাম, "কথা ঢের হয়েছে, এখন কাজ কর," "এখন আর কথার সময় নাই, কাজের সময় এসেছে"; কাজের জন্যও যে কিছু কথার দরকার তাহা ভুলিয়া যাইতাম। যাহাই হউক, এখন কথা ত বন্ধ হইয়াছে; কাজ হইতেছে কি? কোন্ দিকে কাজ হইতেছে, অন্ততঃ অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে, যাহারা এখন কথা বলিতেছে তাহাদের চেয়ে, কি বেশী কাজ হইতেছে, তাহা জানি না; জানিতে পারিলে সুখী হইব।

বাঙালী কি নীরব সাধনা ও তপস্যার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন? সকলে ভাবিয়া দেখুন ও অনুসন্ধান করুন।

শিবপুর কলেজের ধর্ম্মঘটের পরিণাম।

শিবপুর কলেজের ১৮০ জন ছাত্রের ধর্ম্মঘট করা অপরাধে নাম কাটা গিয়াছিল। তার পর উঁহাদের অভি-ভাবকদিগকে একটা চিঠি দেওয়া হয় যে যাহারা ছেলেদের আবার ভর্ত্তি করিতে চান, তাঁহারা দরখাস্ত করিবেন। প্রায় সকল ছাত্রই দরখাস্ত করে। দরখাস্তগুলির উত্তরে কলেজের শাসকসমিতি যে যে সর্ত্তে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইতে

---

* "North of the Ganges, however, Bengal has invaded Bihar territory, and in the portions of Purnea and Malda which lie to the east of the Mahananda river, the language in common use is Bengali, and not Hindi." Bengal Census Report, 1901, p. 315.

পারিবে, তাহা স্থির করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে কোন ধর্ম্মঘটকারী ছাত্র সরকারী ছাত্রবৃত্তি পাইবে না, নূতন বেতনে কেহ ভর্ত্তি হইতে পারিবে না, প্রত্যেককে বার্ষিক ১০ হইতে ১৫ টাকা জরিমানা দিতে হইবে, যেসব ধর্ম্মঘটকারী ভর্ত্তি হইবে না তাহাদিগকে কলেজ-সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না, ধর্ম্মঘটকারীদের যাহারা কেতাবী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যগত (Practical) অর্থাৎ হাতে-হাতিয়ারে শিক্ষা দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি। এই হুকুমগুলির মধ্যে কোথাও স্নেহ মমতা বিবেচনার বাষ্পও নাই; কেবল দমনের চেষ্টা দেদীপ্যমান। কলেজের শাসক-সমিতির (governing body) যেসব সভ্য এইসব হুকুম দিয়াছেন, তাঁরা সকলেই বিদেশী; কাহারও নিজের, আত্মীয়ের বা বন্ধুবান্ধবের ছেলে শিবপুর কলেজে পড়ে না, কখন পড়িবেও না, সুতরাং দরদ কোথা হইতে আসিবে? দরদ না থাক, শুষ্ক বিচারও ত হওয়া উচিত ছিল। তাহাও হয় নাই। ধর্ম্মঘটকারীদের কি বলিবার ছিল, তাহা শোনা হয় নাই। তাহা শুনিয়া পরিমিত শাস্তি দিলে আপত্তির কারণ ততটা থাকিত না। কলেজের শাসকসমিতির ন্যায়পরতার অভাব ও অবিবেচনা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। শাস্তি মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে তাহাকে লোকে কেবল নির্য্যাতন মনে করে। কিন্তু আমাদের একথা বলাও বৃথা; কারণ, লোকে অর্থাৎ দেশী লোকে কি বলে বা ভাবে তাহা কলেজের শাসকসমিতির সভ্যদের নিকট সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অবজ্ঞার ও তাচ্ছিল্যের জিনিষ। দেশের লোকের কাছে তাঁহাদের কোন দায়িত্ব নাই বলিয়াই ত এইরূপ অতি কড়া হুকুম দেওয়া সম্ভব হয়। তাঁহারা নিজেদের ছেলেদের দুরন্তপনা যে চোখে দেখেন, আমাদের ছেলেদের বেলায় সেটা মনে থাকে না; কারণ, তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের যোগ নাই। এরা যে বিজিত জাতির কতকগুলা উঠ্‌তি-বয়সের প্রাণী মাত্র, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে দমন করিবার চিন্তাটাই আগে আসে; কি করিলে কল্যাণ হইবে, তাহা কে ভাবে? কলেজের শাসকসমিতির হুকুমই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গৃহীত হওয়া উচিত নয়। গবর্ণমেণ্ট পুনর্বিচার করিলে ভাল হয়।

রবীন্দ্রনাথ কানাডার মাটী মাড়াইবেন না।

জাপানে কিছু কাল থাকিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রে গিয়াছেন। কানাডার টরোণ্টো শহরের ডেলী ষ্টার কাগজে মিষ্টার ভি, জেমীসন লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথকে কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে নামিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, কানাডায় অবতরণ করেন নাই। তিনি ঐ দেশে ইহা প্রকাশ করিয়া সকলকে জানাইতে বলিয়াছেন যে যত দিন তাঁহার স্বদেশবাসীদিগকে কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় অবজ্ঞা ও নির্য্যাতন করা হইবে ততদিন তিনি তাহাদের মাটী মাড়াইবেন না; ঐসব জাতির মনের গতি না ফিরিলে তাহারা ভারতবাসীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন না।

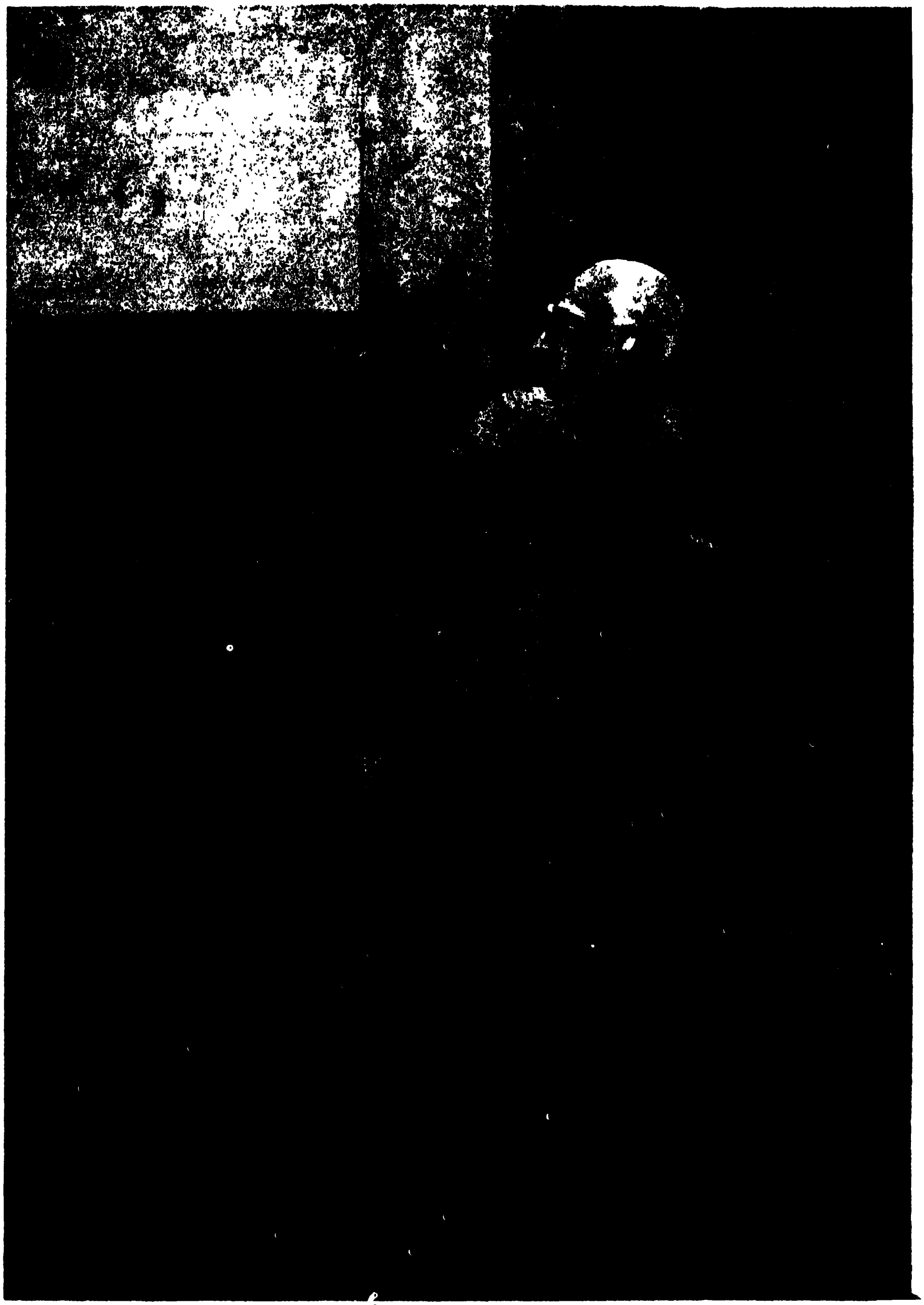
ভারতবর্ষের অস্তিত্ব লোপ।

আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্রে এশিয়ার লোক যাহাতে আর অবাধে যাইতে না পারে তাহার জন্য যখন একটা আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়, তখন তাহাতে অন্যান্য নিষিদ্ধ জাতির মধ্যে জাপানীদেরও নাম ছিল। জাপানের দূত চিন্দা ইহাতে আপত্তি করেন, এবং এই বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন যে "ইহা অত্যন্ত অপমানের বিষয় যে ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের নাম করা হইয়াছে।" জাপানের অনেক লোক ভারতবর্ষকে বড়ই হেয় জ্ঞান করে। ডাক্তার দাঙ্গো এবিনা নামক একজন জাপানী খৃষ্টিয়ান পাদ্রী "শিঞ্জিন" নামক কাগজে লিখিয়াছেন: "To attempt to classify Japan with India is a mistake, for Japan is to be classed only with such countries as Britain, Germany and France: that is, with modern nations." "জাপানকে ভারতবর্ষের শ্রেণীতে ফেলা ভুল, জাপানকে কেবল ব্রিটেন, জার্মেনী, এবং ফ্রান্সের মত দেশের, অর্থাৎ আধুনিক জাতিদের, সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত।"

সম্প্রতি জাপানের একটি কাগজে লেখা হইয়াছে যে পৃথিবীর মধ্যে লোকসংখ্যায় জাপান পঞ্চমস্থানীয় দেশ; প্রথম চীন, দ্বিতীয় রুশিয়া, তৃতীয় আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্ট্র, এবং চতুর্থ জার্মেনী। অবশ্য ভৌগোলিক হিসাবে চীনের নীচেই লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের স্থান; কিন্তু ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব নাই বলিয়া জাপানীরা উহাকে গণনার মধ্যে আনে নাই।

জাপানে চীন দেশের ছাত্র।

জাপানে এখন ৮১৪ জন চীনদেশের ছাত্র আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছাত্র শিল্প শিখিতেছে; ২১০ জন তোকিওর হায়ার টেক্নিক্যাল কলেজে এবং ৩০ জন ওসাকার হায়ার টেক্নিক্যাল কলেজে। তা ছাড়া ২৮ জন বাণিজ্য শিখিতেছে, ৫১ জন চিকিৎসা শিখিতেছে, এবং ৮৫ জন শিক্ষকতা শিখিতেছে। আজকালকার দিনে জগতে টিকিবার উপায় চীনদেশের যুবকেরা ধরিতে পারিয়াছে।



প্লেটো—সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন

(মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত।)

সোক্রাটীস।

হে আথেন্সবাসী নরগণ, আমি জানি না, আমার অভিযোক্তারা তোমাদিগের চিত্তে কি ভাবের উদ্রেক করিয়াছে; তবে আমি নিজে কিন্তু তাহাদিগের বাক্য-মোহে আপনাকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম,—তাহারা এমনই আপাত-মনোহর ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছে। তবু তো তাহারা বলিতে গেলে সত্য কথা একটিও উচ্চারণ করে নাই। কিন্তু তাহারা যে অসংখ্য মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তন্মধ্যে তাহাদিগের এই কথাতেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়াছি—তাহারা বলিয়াছে যে আমি আশ্চর্য্য বক্তা; অতএব তোমাদিগের সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য যে আমি যেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করি। যখন দেখা যাইবে, যে, আমি মোটেই আশ্চর্য্য বক্তা নই, তখন তাহাদিগের উক্তি আমি অবিলম্বেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিব; সুতরাং তাহারা যে এমন কথা বলিতে লজ্জাবোধ করে নাই, এইটিই আমার নিকটে তাহাদিগের চরম নির্লজ্জতার কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তবে, যে সত্য বলে, তাহাকেই যদি তাহারা আশ্চর্য্য বক্তা বলিয়া অভিহিত করে, সে স্বতন্ত্র কথা। যদি ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রায় হয়, তবে আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি, যে, আমি তাহাদিগের অপেক্ষা ভিন্ন-প্রকৃতির বক্তা। এখন, আমি বলিতেছি, যে, তাহারা সত্য অল্পই বলিয়াছে, অথবা কিছুই বলে নাই; কিন্তু আমার নিকটে তোমরা সমগ্র সত্য শুনিতে পাইবে। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা নিশ্চয়ই আমার নিকটে উহাদিগের মত পল্লবিত পদবিন্যাসশোভন অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রুত হইবে না। কিন্তু আমার মনে বিনা আয়াসে যখন যে-কথা উদিত হইবে, আমি সেইরূপ কথায়, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া, আমার বক্তব্য বলিয়া যাইব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যে, আমি যাহা বলিব, তাহা ন্যায্য। অতএব তোমরা আর কিছুই প্রত্যাশা করিও না। কেননা, হে বন্ধুগণ, আমার এই বয়সে তরুণ যুবকের মত পল্লবিত ভাষায় মিথ্যা তর্কজাল লইয়া তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কখনই শোভন হইবে না। কিন্তু, হে আথীনীয় নরবৃন্দ, আমি একান্তচিত্তে একটি বস্তু তোমাদিগের নিকটে ভিক্ষা চাহিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা অনেকে বাজারে, মহাজনদিগের গদিতে ও অন্যত্র আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ; এই সকল স্থানে আমি যে-ভাষায় বাক্যালাপ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, যদি আত্মসমর্থন করিবার কালে আমি ঠিক সেই ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করি, তবে তোমরা তাহাতে বিস্মিত হইও না, কিংবা আমাকে বাধা দিওনা। কেননা, প্রকৃত অবস্থাটা এই—আমার বয়স সত্তর বৎসরের অধিক হইয়াছে; আমি এই প্রথম বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছি; সুতরাং আমি এখানকার বলিবার রীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। আমি যদি বাস্তবিকই অপরিচিত বিদেশী হইতাম, তবে, আমি যে প্রদেশে লালিতপালিত হইয়াছি, তথাকার ভাষায় ও রীতিতে কথা বলিলে তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিতে। অতএব আমি তোমাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি—আমার তো বোধ হয় এই ভিক্ষা ন্যায়সঙ্গত—তোমরা আমার বলিবার রীতি উপেক্ষা করিও; উহা হয়তো তোমাদিগের রীতি অপেক্ষা মন্দ, হয়তো তদপেক্ষা ভাল—কিন্তু তোমরা শুধু ইহাই দেখিও এবং ইহাতেই মনোনিবেশ করিও, যে, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা ন্যায্য, কি ন্যায্য নহে। ইহাই বিচারকের গুণ, যেমন সত্য-কথন ব্যবহারাজীবের গুণ।

২। হে আথেন্সবাসী নরগণ, আমার পক্ষে ইহাই বিধি-সঙ্গত যে আমার পুরাতন অভিযোক্তারা আমার বিরুদ্ধে প্রথমে যে-সকল মিথ্যা অভিযোগ রাষ্ট্র করিয়াছে, আমি পূর্ব্বে তাহার প্রত্যুত্তর দিব, এবং তৎপরে পরবর্ত্তী অভিযোক্তাদিগের বর্ত্তমান অভিযোগগুলি হইতে আত্মসমর্থন করিব। কারণ, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বহু বৎসর ধরিয়া বহুজন তোমাদিগের নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহারা সত্য কথা একটিও উচ্চারণ করে না। আন্যুটস ও তাহার সহচরগণ অপেক্ষা আমি ইহাদিগকেই অধিক ভয় করি; যদিচ উহারাও ভীষণ বটে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা ভীষণতর; তাহারা

তোমাদের অনেককে বাল্যাবধি হস্তগত করিয়া বুঝাইয়া আসিতেছে ও আমার বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ করিতেছে—সোক্রাটীস নামে একজন লোক আছে, সে জ্ঞানী, সে নভোমণ্ডলের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, ভূগর্ভস্থ যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করে, এবং কুযুক্তিকে সুযুক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে। হে আথেন্সবাসিগণ, ইহারা আমার এই প্রকার অখ্যাতি রটনা করিতেছে—ইহারাই আমার ভীষণ অভিযোক্তা; কারণ, তাহাদিগের কথা শুনিয়া লোকে ভাবে, যে, যাহারা এই-সকল অনুসন্ধানে তৎপর, তাহারা দেবতাতেও বিশ্বাস করে না। তারপর, এই অভিযোক্তারা সংখ্যায় বহু, এবং তাহারা বহুকাল ধরিয়া অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অধিকন্তু, তাহারা এমন বয়সে তোমাদিগকে আমার দোষের কথা বলিয়াছে, যখন তোমাদিগের পক্ষে উহা বিশ্বাস করা খুবই সম্ভব ছিল; কেননা, তোমরা তখন বালক, এবং অনেকে কেবল শিশু ছিলে। তাহারা বস্তুতঃ এমত অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে একটি কথা বলে, এরূপ কেহই নিকটে বর্ত্তমান ছিল না। আর, এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা অসঙ্গত ব্যাপার এই, যে, আমি তাহাদিগের নামও অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। ইহাদিগের মধ্যে একজন ব্যঙ্গনাট্যকার আছে, ইহা ভিন্ন আমি তাহাদিগের সম্বন্ধে আর কিছুই বলিতে পারি না। কিন্তু যাহারা ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষবশতঃ তোমাদিগকে আমার প্রতি বিরূপ করিয়া তুলিতেছে; আবার যাহারা নিজেরা আমার নিন্দায় বিশ্বাস করে বলিয়া অপরকেও উহা বিশ্বাস করাইতে প্রয়াসী হইয়াছে; সেই-সকল লোকের সঙ্গে পারিয়া উঠাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। কারণ, আমি তাহাদিগের কাহাকেও এখানে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান কিংবা প্রশ্ন করিতে সমর্থ নই; বস্তুতঃ আমাকে আত্মসমর্থন করিতে যাইয়া বাধ্য হইয়াই যেন ছায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে; এবং আমাকে এমত প্রশ্ন করিতে হইতেছে, যাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য কেহই উপস্থিত নাই। অতএব, আমি যেমন বলিতেছি, তোমরা মানিয়া লও, যে আমার অভিযোক্তৃবর্গ দ্বিবিধ; একদল অধুনা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অপর দল পুরাতন; আমি তাহাদিগের কথা বলিয়াছি। তোমরা স্থির কর, যে, আমি প্রথমে ইহাদিগের বিরুদ্ধেই আত্মসমর্থন করিব; কেননা, তোমরা তাহাদিগের অভিযোগই পূর্ব্বে শুনিয়াছ; এবং তাহারা পরবর্ত্তী অভিযোক্তাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক।

যাক্। হে আথীনীয়গন, আমাকে আত্মসমর্থন করিতেই হইবে; এবং তোমরা বহুকাল অবধি আমার বিরুদ্ধে যে কুভাব পোষণ করিয়া আসিতেছ, তাহা দূর করিতে হইবে—তাহাও আবার এত অল্প সময়ের মধ্যে। যদি তোমাদের ও আমার পক্ষে ইহাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে, আমি আশা করি, আমি এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারিব, এবং আত্মসমর্থন করিয়া সফলকাম হইব। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে, কাজটি কঠিন; কত কঠিন, তাহাও আমার অজ্ঞাত নয়। ঈশ্বরের যাহা অভিপ্রেত, ফল তাহাই হউক; আমাকে বিধিপালন ও আত্মসমর্থন করিতেই হইবে।

৩। তবে আমরা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, যে, সেই অপরাধটি কি, যাহা হইতে আমার প্রতি এই কুভাবের উৎপত্তি হইয়াছে; এবং যাহার উপরে নির্ভর করিয়া মেলীটস আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। আচ্ছা, আমার নিন্দুকেরা আমার কি নিন্দা রাষ্ট্র করিতেছে? তাহারা যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, তাহার লিখিত প্রতিলিপি পাঠ করা কর্ত্তব্য—"সোক্রাটীস পাপাচরণ ও অযথা সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতেছে; সে ভূগর্ভে ও অন্তরীক্ষে যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করে, কুযুক্তিকে সুযুক্তি বলিয়া প্রতীতি জন্মাইতে পারে, এবং এই-সমুদায় অপরকেও শিক্ষা দেয়।" তাহাদিগের অভিযোগ এইরূপ একটা কিছু। তোমরা নিজেরাও আরিষ্টফানীসের একটি ব্যঙ্গনাটকে দেখিয়াছ, যে, সোক্রাটীস নামক একটা লোক একটা দোলায় দুলিতেছে, ও বলিতেছে, যে, সে আকাশে বিচরণ করিতেছে, এবং এইরূপ আরও কত বিষয়ে কত প্রলাপ বকিতেছে, যাহার সম্বন্ধে আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। যদি কেহ এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তবে আমি যে সেই জ্ঞানের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া এই কথা বলিতেছি, তাহা নহে; মেলীটস্ যেন আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কখনও না আনিতে পারে। কিন্তু, হে আথীনীয়

নরগণ, প্রকৃত কথা এই যে আমি এই-সকল ব্যাপারের মধ্যে নাই। তোমরা অনেকেই এবিষয়ে আমার সাক্ষী। তোমাদের মধ্যে যাহারা কখনও আমার কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ, তাহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি, তোমরা পরস্পরকে একথা বল ও বুঝাইয়া দাও। তোমরা এমন বহু জনই তো বর্ত্তমান আছ, তোমরা তবে পরস্পরকে বল দেখি, যে, তোমরা কখনও আমাকে এইরূপ বিষয়ে—অল্পই হউক কি অধিকই হউক—বাক্যালাপ করিতে শুনিয়াছ কি না। তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে, লোকে আমার সম্বন্ধে আর যাহা যাহা বলে, তাহাও এইরূপ মিথ্যা।

৪। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে এই সকল কাহিনীর একটিও সত্য নয়, এবং যদি তোমরা কাহারও নিকটে শুনিয়া থাক যে আমি লোককে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত এবং তজ্জন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাও সত্য নহে। আমি যে অর্থ গ্রহণ করা দোষের বিষয় বিবেচনা করি, তাহা নয়; কেননা, যদি কাহারও লোককে শিক্ষা দিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা আমার নিকটে উত্তম বলিয়াই বোধ হয়। যেমন, লেয়ন্টি-নিবাসী গর্গিয়াস, কেয়সবাসী প্রডিকাস ও এলিসনিবাসী হিপ্পিয়াস শিক্ষাদানে সমর্থ। কারণ, হে বন্ধুগণ, ইঁহারা প্রত্যেকেই যে-কোন নগরে যাইয়া যুবকদিগকে আপন আপন সহবাসের জন্য আকুল করিয়া তুলিতে পারেন। এই যুবকেরা বিনাব্যয়ে ইচ্ছানুরূপ স্ব স্ব নগরের যে কোন অধিবাসীর সহবাস করিতে পারিত; কিন্তু ইঁহাদিগের প্রভাবে তাহারা তাহা ত্যাগ করিয়া ইঁহাদিগের সহবাস করে ও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিয়া অধিকন্তু আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, এখানে পারসবাসী আর-একজন জ্ঞানী লোক আছেন; আমি শুনিয়াছি তিনি এই নগরেই বাস করিতেছেন। কারণ, হিপ্পনিকসের পুত্র কাল্লিয়াসের সহিত আমার দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইয়াছিল; এই ব্যক্তি একাকী সমবেত অপর সকলের অপেক্ষা জ্ঞানীদিগের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছে। এই হেতু আমি তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিলাম। তাহার দুই পুত্র; আমি বলিলাম, হে কাল্লিয়াস, তোমার পুত্র দুইটি যদি গোবৎস কিংবা অশ্বশাবক হইত, তবে আমরা তাহাদিগের জন্য বেতন দিয়া এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম, যে, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মপালনের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে যত্ন করিত; সেই শিক্ষক হইত কোনও অশ্বপাল কিংবা কৃষক। কিন্তু এক্ষণে তাহারা যখন মানুষ, তখন তুমি কাহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাও? এমত কেহ তো যে মানবধর্ম্ম ও রাষ্ট্রধর্ম্ম অবগত আছে? কারণ, আমি বিবেচনা করি, যে, তুমি পুত্রদিগের হিতকল্পে এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা করিয়াছ। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এরূপ কেহ আছে, না নাই? সে বলিল, নিশ্চয়ই আছে। আমি বলিলাম, সে কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? কত বেতন লইয়া শিক্ষা দেয়? সে বলিল, সোক্রাটীস, তাহার নাম এয়ুঈনস; সে পারসবাসী, বেতন পাঁচ মিনা। তখন আমি ভাবিলাম, এয়ুঈনস যদি সত্য সত্যই শিক্ষাকৌশল আয়ত্ত করিয়া এমন সুচারুরূপে শিক্ষা দিতে পারগ হইয়া থাকে, তবে সে ধন্য। আমি নিজে যদি এই সমুদায় জানিতাম, তবে অহংকারে স্ফীত ও গর্ব্বিত হইতাম। কিন্তু হে আথীনীয়গণ, প্রকৃত কথা এই যে আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।

৫। এখন, তোমাদের মধ্যে কেহ হয়তো প্রত্যুত্তর করিতে পারে, "আচ্ছা, সোক্রাটীস, তোমার কাজটা তবে কি? তোমার নামে এই-সকল নিন্দা কেন রাষ্ট্র হইতেছে? কেননা, যদি তুমি অপরের অপেক্ষা অসাধারণ একটা কিছুতে ব্যাপৃত না থাকিতে, অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাহা করে, তদপেক্ষা স্বতন্ত্র কিছু না করিতে, তবে তোমার এমনতর খ্যাতি ও তোমাকে লইয়া এত কথা কখনই হইত না। অতএব, আমাদিগকে বল দেখি, তোমার কাজটা কি, যাহাতে আমাদিগকে অজ্ঞের মত না জানিয়া শুনিয়াই তোমার বিচার করিতে না হয়।" যে এরূপ বলে, আমার বোধ হয় সে ন্যায্য কথাই বলে; সুতরাং কিসে আমার এই নাম হইয়াছে, এবং আমার এই নিন্দার মূল কি, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তোমরা তবে শুন। তোমরা কেহ কেহ হয়তো মনে করিবে, আমি তামাসা করিতেছি; কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও, তোমাদিগকে যাহা বলিব, তাহা সমস্তই সত্য। হে আথীনীয় নরগণ, আমি শুধু একপ্রকার জ্ঞানের জন্যই এই নামের অধিকারী হইয়াছি। সে কি প্রকার জ্ঞান? যে জ্ঞান হয়তো সকল

মানবেরই আয়ত্ত। আমি হয়তো প্রকৃতই এরূপ জ্ঞানে জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতে পারি। কিন্তু আমি এইমাত্র যাহাদিগের কথা বলিয়াছি, তাহারা মানবীয় জ্ঞান অপেক্ষা মহত্তর কোনও জ্ঞানে জ্ঞানী; অথবা আমি উহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কেননা, আমি নিজে উহার কিছুই জানি না। যে-কেহ বলে, যে, আমি জানি, সে মিথ্যাবাদী, সে আমার নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ বলে। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা আমাকে বাধা দিও না,—যদি তোমাদের প্রতীতি হয়, যে আমি, গর্ব্ব করিতেছি, তথাপি বাধা দিও না। কেননা, আমি যাহা বলিব, তাহা আমার কথা নয়; কে এ কথা বলিয়াছেন, তোমাদিগকে তাহা বলিতেছি; তিনি তোমাদিগের শ্রদ্ধার পাত্র। যদি আমার কোন প্রকার জ্ঞান থাকিয়া থাকে, সে জ্ঞান যে প্রকারই হউক না কেন, তাহার সাক্ষীরূপে আমি ডেল্‌ফীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উপস্থিত করিতেছি। তোমরা বোধ করি খাইরেফোনকে জান। সে বাল্যকাল হইতে আমার সঙ্গী ছিল। সে ত্রিংশন্নায়কের শাসনকালে তোমাদিগের জনতন্ত্রের সহিত নির্ব্বাসিত হয়, এবং পরে তোমাদিগেরই সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে। খাইরেফোন কি প্রকৃতির মানুষ ছিল, তাহাও তোমরা জান; সে কেমন দুর্দ্দমনীয় আবেগে আপনার লক্ষ্যপানে ধাবিত হইত। এই জন্যই সে একবার ডেলফীতে যাইয়া আপলো দেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইয়াছিল—বন্ধুগণ, আমি যাহাই বলি না কেন, তাহাতে বাধা দিওনা—সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার অপেক্ষা জ্ঞানী কেহ আছে কিনা। আপলো দেবের হোত্রী উত্তর করিলেন, আমার অপেক্ষা জ্ঞানী কেহই নাই। খাইরেফোন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে; তাহার ভ্রাতা এখানে উপস্থিত আছে, সে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

৬। এখন দেখ, আমি কেন তোমাদিগকে এই-সকল কথা বলিতেছি। আমার নিন্দার উৎপত্তি কোথায়, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে চাই। আমি এই দৈববাণী শুনিয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম—দেবতা কি বলিতেছেন? এবং এই সমস্যার অর্থ কি? কেননা আমি নিজে বেশ জানি, যে অল্পই হউক কি অধিকই হউক, আমি মোটেই জ্ঞানী নহি; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী, ইহার তাৎপর্য্য কি? যেহেতু, তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলেন নাই; কারণ, তাঁহার পক্ষে ইহা বৈধ নহে। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি, বহুকাল পর্য্যন্ত আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই; পরিশেষে আমি একান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক ইহার অনুসন্ধানে এই প্রকারে প্রবৃত্ত হইলাম। যাহারা জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে একজনের নিকটে গমন করিলাম; আমি ভাবিলাম, যে, যদি কোথাও সম্ভব হয়, তবে এইখানে আমি দৈববাণী মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিব; আমি দেবতাকে দেখাইয়া দিব, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী; কিন্তু এই ব্যক্তি আমার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী।" অতএব, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিলাম—তাহার নাম বলিবার আবশ্যক নাই, সে একজন রাজনীতিজ্ঞ ছিল—হে আথীনীয় নরগণ, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া আমি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলাম; আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, যে যদিও সে অপর বহুলোকের নিকটে, বিশেষতঃ আপনার বিবেচনায়, জ্ঞানী বলিয়া গণ্য, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। তখন আমি তাহাকে দেখাইয়া দিতে প্রয়াসী হইলাম, যে, যদিও সে আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করে, তথাপি সে জ্ঞানী নহে। ফলে আমি তাহার ও উপস্থিত বহুজনের বিদ্বেষভাজন হইলাম। সে যাহা হউক, আমি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "আমি এই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী; কেননা, আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কেহই বোধ করি মহৎ ও মঙ্গলের তত্ত্ব অবগত নহে; কিন্তু এই ব্যক্তি না জানিয়াও মনে করিতেছে যে সে তাহা জানে, আর আমি উহা বাস্তবিক জানিও না, এবং জানি বলিয়া মনেও করি না। অন্ততঃ দেখা যাইতেছে, যে, এই ব্যক্তি অপেক্ষা আমার এইটুকু জ্ঞান অধিক আছে, যে, আমি যাহা জানি না, তাহা জানি বলিয়া মনে করি না।" তৎপরে, যাহারা এই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে একজনের নিকটে গমন করিলাম; কিন্তু আমি ঐ একই ফল লাভ করিলাম। এবং সেখানেও আমি তাহার ও অপর অনেকের বিদ্বেষভাজন হইলাম।

৭। তদনন্তর আমি পর্য্যায়ক্রমে একের পর অন্যের নিকটে গমন করিতে লাগিলাম; আমি লোকের বিদ্বেষভাজন হইতেছি, ইহা অনুভব করিয়া দুঃখিত ও ভীত হইলাম; কিন্তু তথাপি আমি বিবেচনা করিলাম, যে, ঈশ্বরের আদেশকে সর্ব্বোপরি শিরোধার্য্য করিতেই হইবে। সুতরাং দৈববাণীর অর্থ কি, তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা কিছু জানে বলিয়া বোধ হইল, তাহাদের সকলের নিকটেই আমাকে যাইতে হইল। হে আথীনীয়গণ—তোমাদিগকে সত্য বলা কর্ত্তব্য—কুক্কুরের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহাতে আমার এইরূপ ফললাভ হইল। আমি দেবতার আদেশে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, যে, যাহাদিগের জ্ঞানের খ্যাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, জ্ঞানের অভাবও তাহাদিগেরই প্রায় পরিপূর্ণ; পক্ষান্তরে যে-সকল লোক নগণ্য বলিয়া পরিচিত, তাহারাই শিক্ষালাভের পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত। এখন, দৈববাণী যাহাতে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তদুদ্দেশ্যে হীরাক্লীসের শ্রমের মত আমাকে যত শ্রমসাধ্য পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, তোমাদিগের নিকটে তাহা বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। রাজনীতিজ্ঞগণের পরে আমি শোকাত্মক কাব্যকার, ডিয়নীসসের জয়-সঙ্গীত-রচয়িতা কবিদিগের নিকটে গমন করিলাম; অভিপ্রায় এই, যে, সেখানে আমি সদ্য-সদ্য আপনাকে তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিব। এজন্য, তাহাদিগের যে কবিতাগুলি আমার বিবেচনায় তাহারা অশেষ শ্রম করিয়া লিখিয়াছে, তাহা হাতে লইয়া আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা উহাতে কি বলিতে চাহিয়াছে; আমি তাহাদিগের নিকটে কিছু শিক্ষা করিব, এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। হে বন্ধুগণ, তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতে আমি লজ্জা বোধ করিতেছি, কিন্তু তথাপি উহা বলিতেই হইবে। তাহারা নিজেরা যাহা লিখিয়াছে, বলিতে গেলে উপস্থিত প্রায় সকলেই তাহাদিগের অপেক্ষা তাহার অর্থ স্পষ্টতররূপে বুঝাইয়া দিতে পারিত। অতএব, আমি অল্পকালের মধ্যেই কবিদিগের সম্বন্ধে এই তত্ত্ব অবগত হইলাম, যে, তাহারা যে-সকল কবিতা রচনা করে, তাহা জ্ঞানের সাহায্যে নয়, কিন্তু এক প্রকার প্রকৃতিদত্ত শক্তি ও অনুপ্রাণনা সাহায্যেই রচনা করিয়া থাকে। তাহারা দৈবজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্বক্তার মত; কেননা, ইহারা অনেক ভাল কথা বলে, কিন্তু যাহা বলে, তাহার অর্থ জানে না। আমার নিকটে কবিদিগের অবস্থাও এই প্রকার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আমি আরও অনুভব করিলাম, যে, তাহারা আপনাদিগের কবিতার জন্য অন্যান্য বিষয়েও আপনাদিগকে লোক-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে,—কিন্তু তাহারা বাস্তবিক অপরের অপেক্ষা জ্ঞানী নহে। সুতরাং আমি এই ভাবিতে ভাবিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম, যে, আমি রাজনীতিজ্ঞদিগের মত ইহাদিগের অপেক্ষাও এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

৮। পরিশেষে আমি শিল্পকারদিগের নিকটে গেলাম; কারণ, আমি নিজে বেশ জানিতাম, যে, আমি বলিতে গেলে শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু আমি দেখিতে পাইব, যে, ইহারা বহু উত্তম বিষয় শিক্ষা করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমার ভুল হয় নাই; কেননা, আমি জানি না, এমন অনেক বিষয় তাহারা জানে; সুতরাং এ বিষয়ে তাহারা আমার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। কিন্তু, হে আথীনীয় নরগণ, আমি দেখিলাম, যে, কবিদিগের যে দোষ, নিপুণ শিল্পীদিগেরও সেই দোষ; তাহারা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, যে, যেহেতু তাহারা স্ব স্ব শিল্পকর্ম্মে নিপুণ, অতএব তাহারা মহত্তম অন্যবিধ কার্য্যেও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রান্তি তাহাদিগের শিল্পজ্ঞানকেও মলিন করিয়াছে; সুতরাং আমি দৈববাণীর পক্ষ হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদিগের জ্ঞানে জ্ঞানী না হইয়া ও তাহাদিগের অজ্ঞতা হইতে মুক্ত থাকিয়া আমি যেমন আছি তেমনিই থাকিতে চাই, না তাহাদিগের জ্ঞান ও অজ্ঞানতা, এই উভয়েরই অধিকারী হইতে আকাঙ্ক্ষা করি? আমি আপনাকে ও দৈববাণীকে প্রত্যুত্তর করিলাম, আমি যেমন আছি, সেইরূপ থাকাই আমার পক্ষে শ্রেয়।

৯। হে আথীনীয়গণ, এই পরীক্ষানিবন্ধন আমার একান্ত নিদারুণ ও ভীষণ বহু শত্রু সঞ্জাত হইয়াছে; তাহারা আমার অসংখ্য অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, এবং তাহাতেই আমার এই নাম হইয়াছে, যে, আমি জ্ঞানী। কারণ,

পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বিবেচনা করে, যে, আমি যে বিষয়ে অপরের ভ্রম প্রদর্শন করি, সে বিষয়ে আমি জ্ঞানী। কিন্তু হে বন্ধুগণ, আমার বিবেচনায় প্রকৃত প্রস্তাবে এক ঈশ্বরই জ্ঞানী, এবং এই দৈববাণীর দ্বারা তিনি ইহাই বলিতেছেন, যে, মানবীয় জ্ঞানের মূল্য অত্যল্প, অথবা কিছুই নহে। আমার বোধ হইতেছে, তিনি এমত বলেন নাই, যে, সোক্রাটীস জ্ঞানী, কিন্তু তিনি আমাকে দৃষ্টান্তস্থলে উপস্থিত করিয়া আমার নাম ব্যবহার করিয়াছেন, যেন তিনি বলিতেছেন, "হে মানবগণ, তোমাদিগের মধ্যে যে সোক্রাটীসের মত জানে যে বাস্তবিক তাহার জ্ঞানের মূল্য কিছুই নহে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।" এই জন্যই তো আমি নিয়ত স্বদেশী ও বিদেশী যাহাকেই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করি, ঈশ্বরের আদেশে তাহাকেই জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি; এবং যখনই আমার প্রতীতি হয়, যে, সে জ্ঞানী নহে, তখনই ঈশ্বরের পক্ষ হইয়া দেখাইয়া দিই, যে, সে জ্ঞানী নহে। এই প্রকার অনবসরবশতঃ আমার রাষ্ট্রীয় কার্য্যে উল্লেখযোগ্য অবকাশ ঘটে নাই, এবং আমি গৃহধর্ম্মেও মনোনিবেশ করিতে পারি নাই; বরং ঈশ্বরের এই সেবার জন্য আমি পরিপূর্ণ দারিদ্র্যেই বাস করিতেছি।

১০। তারপর, যুবকেরা স্বেচ্ছাক্রমে আমার অনুগমন করে; তাহারা ধনীর সন্তান এবং তাহাদিগের যথেষ্ট অবসর আছে; যখন আমি প্রশ্ন করিয়া লোককে পরীক্ষা করি, তখন তাহারা সেই পরীক্ষা শুনিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকে; এবং তাহারা আমার অনুকরণ করে ও পরে অন্যের পরীক্ষা করিতে প্রয়াসী হয়। আর, আমার মনে হয়, তাহারা এই পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুল ও প্রচুর পরিমাণে এমত লোক দেখিতে পায়, যাহারা ভাবে, যে তাহারা যথেষ্ট জানে, কিন্তু জানে অল্পই, অথবা কিছুই জানে না। ইহাতে, যাহারা এই যুবকদিগের দ্বারা পরীক্ষিত হয়, তাহারা ইহাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ না হইয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং বলে যে সোক্রাটীস নামে একটা অতি জঘন্য লোক আছে, সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে। যখন কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "সোক্রাটীস এমন কি করিতেছে ও কি শিখাইতেছে, যাহাতে সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে", তখন তাহাদিগের বলিবার কিছুই থাকে না; প্রত্যুত সে সম্বন্ধে তাহারা কিছুই জানে না; কিন্তু পাছে কেহ মনে করে, যে, উহারা প্রশ্নটির উত্তর খুঁজিয়া পাইতেছে না, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানীর (Philosopher) বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি তাহাদিগের কণ্ঠস্থ আছে, তাহাই তখন বলিতে আরম্ভ করে—যথা, আকাশে ও ভূগর্ভে যাবতীয় পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান, দেবতায় অবিশ্বাস ও কুযুক্তিকে সুযুক্তিরূপে উপস্থিত করিতে শিক্ষা দিয়া সোক্রাটীস যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে। কারণ, আমি বিবেচনা করি, যে, তাহারা এই সত্য কথাটা বলিতে চাহে না, যে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহারা জ্ঞানের ভান করে বটে, কিন্তু জানে না কিছুই। অতএব আমার মনে হয়, এইজন্যই তাহারা বহুকালাবধি আমার ঘোরতর অপবাদ রাষ্ট্র করিয়া তোমাদিগের কর্ণ পূর্ণ করিতেছে; তাহারা উৎসাহী, দুর্দ্দমনীয় ও বহুসংখ্যক; সুগঠিত দলবদ্ধ হইয়া মনোমুগ্ধকর ভাষায় তাহারা আমার নিন্দা প্রচার করিয়া আসিতেছে। ইহারই ফলে মেলীটস, আনুটস ও ল্যুকোন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। মেলীটস কবিবৃন্দের, আনুটস শিল্পী ও রাজনীতিজ্ঞগণের এবং ল্যুকোন বক্তাদিগের পক্ষে রুষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই আমি প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, আমার বিরুদ্ধে যে কুভাব এখন বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি এত অল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমাদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত করিতে সমর্থ হই, তবে আমি নিজেই বিস্মিত হইব। হে আথীনীয় নরগণ, তোমাদিগের নিকটে যাহা উপস্থিত করিলাম, ইহাই সত্য; আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, তাহা হইতে অল্প বা অধিক কিছুই গোপন করি নাই, কিংবা কিছুই অন্তরালে রাখি নাই। তথাপি, আমি বেশ জানি, যে, আমি এই স্পষ্ট কথা দ্বারাই লোককে আমার শত্রু করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে, যে, আমি সত্য কথাই বলিতেছি; এবং আমার বিরুদ্ধে কুভাব ও উহার কারণ, আমি যেরূপ নির্দ্দেশ করিতেছি, উহা প্রকৃতই সেইরূপ। এখনই হউক, আর পরেই হউক, যখনই তোমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর না কেন, তোমরা উহা সেইরূপই দেখিতে পাইবে।

১১। আমার প্রথমোক্ত অভিযোক্তাদিগের অভিযোগগুলি সম্বন্ধে আমার এই আত্মসমর্থনই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। অতঃপর আমি শ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত মেলীটস (সে নিজেকে এইরূপেই অভিহিত করিয়া থাকে) ও পরবর্ত্তী অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযোক্তা, এইরূপ ধরিয়া লইয়া আমরা আবার তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠ করি। উহা এই প্রকার—প্রতিলিপি বলিতেছে, যে, সোক্রাটীস অধর্ম্মাচরণ করিতেছে, কেননা, সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে; পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, সে তাঁহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; এবং সে অপর নূতন দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই অভিযোগ। আমরা এক এক করিয়া ইহার প্রত্যেক ধারা পরীক্ষা করি। মেলীটস বলে, যে, আমি যুবকদিগকে বিপথগামী করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিতেছি। কিন্তু হে আথীনীয় নরবৃন্দ, আমি বলিতেছি, যে, মেলীটসই অধর্ম্মাচরণ করিতেছে; যেহেতু সে তুচ্ছ কারণে লোককে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া গম্ভীর ভাবে একটা কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং সে যে-সকল বিষয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার করে নাই, সেই-সকল বিষয়ে সে যেন কতই উৎসাহী ও ব্যস্ত, এইরূপ অভিনয় করিতেছে। আমি তোমাদিগকে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি, যে, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক্।

ক্রমশঃ।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

চীনাদের জীবনযাত্রা

পিকিঙ-অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে যেরূপ গরম, শীতকালে সেরূপ ঠাণ্ডা। শুনিতেছি নদী তখন জমিয়া যায়, সমুদ্রবন্দরেও জাহাজের গতিবিধি স্থগিত থাকে। অথচ ভাদ্রমাসে এত গরম যে পশ্চিমখোলা কামরায় দিবাভাগে বসিয়া থাকা অসম্ভব। ইহার মধ্যে দুএকদিন বৃষ্টি হইয়া গেল—বৃষ্টির পরেই অনেকটা আমাদের কলিকাতার পৌষমাস পাইতেছি। ইয়োরোপ-আমেরিকান বন্ধুগণ এইরূপ দিনকে "delightful, magnificent" বলিয়া থাকেন।

জাপানে কয়েকটা প্রসিদ্ধ বাগান দেখিয়াছি। পিকিঙে একটা দেখিবার সুযোগ পাওয়া গেল। চীনা বাগানের অনুকরণেই জাপানী বাগানের উৎপত্তি—সুতরাং জাপানী বাগান দেখা থাকিলে চীনা বাগান দেখিবার প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ চীনের সকল জিনিষই জাপানে আছে—তবে জাপানী হাতে সেগুলি অধিকতর সুন্দর ও লাবণ্যময় দেখিতে পাই। অধিকন্তু বর্ত্তমান যুগে জাপানী সমাজ জীবন্ত জাতি—এজন্য তাহাদের প্রাচীন বস্তুসমূহ সুরক্ষিত সুসংস্কৃত এবং স্থানে স্থানে সংশোধিত ও সম্মার্জ্জিত হইতে পারিয়াছে। কিন্তু চীনারা বর্ত্তমান কালে মৃতপ্রায় অবসন্নপ্রাণ ভাবে কোনরূপে দিনপাত করিতেছে। নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা চীনে আরব্ধ হইয়াছে মাত্র, তাহার সুফল কবে ফলিবে এখনও বলা কঠিন। আর প্রাচীন জীবনের ধারা নিতান্ত ক্ষীণ ও পঙ্কিল ভাবে বহিয়া যাইতেছে। তাহাতে প্রাণসঞ্চার করা সম্ভবপর কিনা সন্দেহ হয়। অন্ততঃ তাহা দেখিলে মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র বুঝা যায়।

মাঞ্চুবংশীয় শেষ সম্রাটের শেষ মন্ত্রী এই উদ্যানের অধিকারী ছিলেন। এক্ষণে ইহাতে রিপাব্লিকের সেনাপতিগণ একটা ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কৃত্রিম পাহাড়, নদী, সরোবর, সেতু, বক্রপথ, Kiosk বা বিশ্রাম-গৃহ, ইত্যাদিও আছে।

পিকিঙের রাস্তাগুলি দেখিলে চীনাদিগকে যত অপরিষ্কার মনে হয়, কোন উচ্চ বা মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের গৃহে প্রবেশ করিলে সেরূপ অনুমান করিবার কারণ থাকে না। ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের গৃহ বাহির হইতে অনেকটা কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর মনে হইবে। কিন্তু ফটক পার হইয়া প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিলে আর সে ধারণা থাকে না। স্বাস্থ্যজ্ঞান, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, পারিপাট্য ইত্যাদি চীনাসমাজে যথেষ্টই আছে। ভিতরের সঙ্গে বাহিরের এইরূপ প্রভেদ খানিকটা ভারতবর্ষেও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের উপর জাপানীরা চীনা ও ভারতবাসী অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্যপ্রিয় বলা যাইতে পারে। বিনা আড়ম্বরে সৌন্দর্য্য ভোগ জাপানী সমাজে যেরূপ, সেরূপ বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই।

চীনাদের স্বদেশী হোটেল কয়েকটা দেখা গেল।

ভারতবর্ষে হোটেলের রেওয়াজ এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। গোয়ালন্দ দামুকদিয়া ইত্যাদি ষ্টেশনে ষ্টেশনে কতকগুলি ভাতের দোকান আছে সন্দেহ নাই। তাহাতে শুইবার থাকিবারও ব্যবস্থা হইতে পারে—হইয়া থাকেও। কিন্তু এই ধরণের হোটেলও ভারতবাসীর মজ্জায় বসে নাই—নিতান্ত দায়ে না পড়িলে কোন ব্যক্তি হোটেলে আহার নিদ্রা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। ঘরের আরাম হোটেলে পাওয়া অসম্ভব—ইহাই ভারতবাসীর ধারণা। বলা বাহুল্য ইয়োরোপ-আমেরিকায় জনগণের ধারণা উল্টা—বরং ঘর অপেক্ষা ক্লাবে হোটেলেই খাওয়া থাকার সুখ বেশী অথচ খরচ অত্যন্ত অধিকও নয়। জাপানে সরাইগুলিও জাপানের খাঁটি স্বদেশী জিনিষ। সরাইয়ে বাস করিতে আসিয়া জাপানীরা গৃহবাসের সুখই ভোগ করে। জাপানীরা দরিদ্র জাতি, ইয়োরোপ-আমেরিকানদের সমান অর্থব্যয় করা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব—ইহাদের অশনবসনাদিও ভারতীয় মাপকাঠিতে উচ্চ অঙ্কের বিবেচিত হইবে না। কাজেই অল্প খরচে সরাইওয়ালীরা অতিথিগণকে গৃহবাসের আরাম প্রদান করিয়া থাকে। যে শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভারতবাসী গোয়ালন্দের হোটেলে আহারাদি করিয়া থাকে সেই শ্রেণীর জাপানীদের জন্যই জাপানে সরাইয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। অথচ আমরা হোটেলে বাস নরকযন্ত্রণার মত বিবেচনা করি—কিন্তু জাপানী সরাইগুলিকে লোকেরা নিজের ঘর বিবেচনা করে। বস্তুতঃ হোটেল জিনিষটা ভারতবর্ষে বসে নাই। আমরা 'চটি'তে, মুদীখানায় ও গাছতলায় রান্না করিয়া, অথবা নৌকার পাটাতনের নীচে উনন ধরাইয়া কিম্বা গরুর গাড়ীর ছায়ায় হাঁড়ি চড়াইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত। এই বিষয়ে আমাদের চরম আবিষ্কার "ধর্ম্মশালা" নামক পান্থ-নিবাস। আজকালকার "মহৎ আশ্রম" ইত্যাদির নামোল্লেখ এই ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, কারণ এই ধরণের অতিথিশালা আমাদের নিজস্ব নয়—কাজেই চীনা ও জাপানীদের স্বদেশী সরাইয়ের সঙ্গে এই-সমুদয়ের তুলনা চলিতে পারে না।

জাপানী ও চীনাদের পায়খানা আমাদের ভারতীয় পায়খানার অনুরূপ। পাশ্চাত্য কমোড বা চেয়ারাকৃতি ব্যবস্থা এশিয়ার কুত্রাপি নাই। বড় বড় চীনা হোটেলেও এইরূপই দেখিতেছি। ড্রেনের পায়খানা জাপানেও নাই, চীনেও নাই। এমন কি জলের কলই পিকিঙে আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং কলিকাতার বাসিন্দারা মফঃস্বলে দুএকদিনের জন্য বেড়াইতে গেলে দুর্গন্ধময় পায়খানা ও নদী পাতকুয়ার জল দেখিয়া যেরূপ ভাবিয়া থাকেন তাঁহারা চীনাদের স্বদেশী হোটেলে অথবা বন্ধুগৃহে বাস করিলে ঠিক সেইরূপই ভাবিবেন। বাঙ্গালী জানে যে, কলিকাতার "কলের জল এবং বালাম চাউল" পেটে পড়িলে দরিদ্রের ভবিষ্যৎ শোচনীয় হয়। বাস্তবিকপক্ষে বর্ত্তমান জগতের নূতনতম আরামদায়ক ব্যবস্থাগুলি সবই এইরূপ "জলের কল ও বালাম চাউল।" একবার এই-সমুদয়ের মর্ম্ম বুঝিলে আর মফঃস্বলে বাস অসম্ভব হয়। এই জন্যই ভারতবর্ষে পল্লীসমূহ উজাড় হইয়া যাইতেছে—কে ইহার গতি বন্ধ করিতে পারে? সমস্ত ভারতবর্ষকে কলিকাতার "কলের জল ও বালাম চাউল" না দিতে পারিলে পল্লী-সংস্কার সাধিত হইবে না। সেইরূপ চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার যে-কোন দেশের কথাই ধরি না কেন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন ইত্যাদির "জলের কল ও বালাম চাউল" সর্ব্বত্রই আমদানি অবশ্যম্ভাবী। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরপালনের যে-সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে সেগুলি দুনিয়ার সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া পড়িবে—যতদিন ছড়াইয়া না পড়ে ততদিন দুনিয়ার অবশিষ্ট অংশকে ইয়োরোপ-আমেরিকা মফঃস্বলরূপে ঘৃণা করিবে—ইহা নিশ্চিত। জাপান স্বাধীনভাবে এই-সমুদয় প্রবর্ত্তন করিতেছেন—সুখের কথা। ভারতবাসীর সে ক্ষমতা নাই—চীনাদের ক্ষমতা আছে কি না তাহার পরীক্ষা চলিতেছে।

বর্ত্তমান যুগে স্বাস্থ্য-জ্ঞান এশিয়াবাসীকে ইয়োরোপ-আমেরিকা হইতেই আমদানি করিতে হইবে সত্য। কিন্তু ইহাও জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দুনিয়ার কোথাও আজকালকার আরাম পাওয়া যাইত না। কিয়োতো, মুকডেন, পিকিঙ, মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বাগদাদ, কাইরো ইত্যাদি নগরের কুত্রাপি ইয়োরোপের নগরপুঞ্জ অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী, পানীয় জল ও পায়খানা ছিল না। মধ্যযুগের ইয়োরোপ কোন কোন

বিষয়ে এশিয়ার শিষ্য ছিল, গুরু কোন বিষয়েই নয়। আজ একশত বৎসর ধরিয়া এশিয়া ইয়োরোপ-আমেরিকার শিষ্য, কিছুকাল এই শিষ্যত্ব থাকিবে। নব্য ইয়োরোপ-আমেরিকার সমকক্ষ হইতে এশিয়ার এখনও দেরি আছে। কাজেই আমাদের এখন অনেক ক্ষেত্রে "ছোট মুখে বড় কথা না বলিয়া" বুদ্ধিমানের মত নীরবে সাধনা করা কর্ত্তব্য।

পিকিঙের বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিয়া জিনিষ-পত্র দেখা যাইতেছে। এক পেয়ালা করিয়া দুগ্ধহীন চিনিহীন চা পান সর্ব্বত্রই ঘটিতেছে। কিন্তু সৌজন্য শিষ্টাচারে জাপানীদের স্বভাব যত মধুর, চীনাদের যেন সেরূপ নয়। অতিথি-সৎকারে চীনাদের ধরণ-ধারণ অনেকটা ভারতবাসীর মত। আমরা মুসলমানধর্ম্মীদিগকে আদব-কায়দা সম্বন্ধে অতিশয় মনোযোগী ভাবিয়া থাকি। কিন্তু এ বিষয়ে জাপানীরা মুসলমানদিগকেও পরাজিত করে। সুতরাং জাপানের মধুরতা চীনে দুর্ল্লভ। আমরা ঘরে লোক আসিলে হুঁকা-কল্কে ও একখিলি পান প্রদান করিয়া থাকি। চীনারা সেইরূপ চা "ইচ্ছা" করিতে বলে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু জাপানীদের রকম-সকম দেখিলে অতিমাত্রায় শিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইয়োরোপ-আমেরিকানেরা জাপানকে এইজন্য দাসসুলভ নম্রতার দেশ বিবেচনা করিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করে। আমি পূরবী লোক—জাপানী হাবভঙ্গিতে গোলামি না দেখিয়া আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্দ্য অনুভব করিয়াছি।

চীনাদের ঘরবাড়ীগুলি ভারতীয় ধরণের। একটা উঠানের চারি ভিটিতে চারিখানা গৃহ নির্ম্মিত হয়—উঠানের আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও পবনদেবের স্বাধীন গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারি। খোলার ছাদ—পাথরের মেজে—ইট বা পাথরের দেওয়াল; কাঠের ব্যবহার অল্প। অবশ্য প্রায় গৃহই প্রাচীরবেষ্টিত।

রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম দুই সারি লোক রঙিন পোষাক পরিয়া কোন উদ্দেশ্যে চলিতেছে। কাহারও সঙ্গে নূতন জামা কাপড়, কাহারও সঙ্গে বাক্স প্যাটারা তোরঙ্গ ইত্যাদি। কয়েক জনে একটা সুবৃহৎ খাট বহিয়া লইতেছে। কয়েকজনের কাঁধে টেবিল, আলমারি, আয়না ইত্যাদির বাঁক। হ বা বিছানা বহিতেছে ইত্যাদি। কলিকাতায় কুটুম্বগৃহে "তত্ত্ব" পাঠাইবার দৃশ্য চোখের সম্মুখে উপস্থিত! দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এযে একটা বিরাট শোভাযাত্রা দেখিতেছি। ব্যাপার কি?" দোভাষী বলিলেন—"বরগৃহে কন্যাপক্ষ যৌতুক পাঠাইতেছেন। বিবাহোৎসব দুএকদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে। কন্যাদানের পূর্ব্বে অভিভাবকেরা কন্যার জিনিষপত্র শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।"



চীনা সঙ্গীত।

চীনে বিবাহপ্রথা পাশ্চাত্য ধরণের নয়—জাপানেও নয়। মোটের উপর ভারতীয় ব্যবস্থাই এই-সকল দেশে দেখিতে পাই। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যাকে চিনে না, দেখেও না—কন্যাও বরকে চিনে না, দেখেও না। অসংখ্য যুবকযুবতীর মধ্যে পরস্পর আনাগোনা এবং ভাববিনিময় নব্য ইয়োরোপ-আমেরিকার খাস আবিষ্কার। স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দসই স্ত্রী-নির্ব্বাচন ও স্বামী বাছাই জগতের

আর কোথাও নাই। চীনেও নাই। এখানে পিতামাতা ও অভিভাবকগণই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। ঘটক, গণক ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা চীনাসমাজে প্রচলিত আছে। বাপদাদাদের নামধাম চরিত্র ইত্যাদির সংবাদ না লইয়া বরপক্ষ অথবা কন্যাপক্ষ বিবাহে সম্মত হয় না। বিবাহের পর স্ত্রী ও স্বামীর ভবিষ্যৎজীবন সুখময় হইবে কি না তাহাও গণকেরা কোষ্ঠি বিচার করিয়া বলিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং চীনে ও ভারতবর্ষে এ বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই।

শুনিলাম—পূর্ব্বে বর কন্যাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিত। বিবাহোৎসব বরের গৃহে সম্পন্ন হইত। ইহাতে বরপক্ষের অর্থব্যয় যথেষ্ট—এজন্য আজকাল কন্যাপক্ষ নিজেই স্বামীগৃহে কন্যাকে পাঠাইয়া দেয়। বিবাহ বরের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই একমাত্র কন্যাযাত্রীর দল চীনে দেখা যায়—বরযাত্রী হইবার নিমন্ত্রণ চীনা সমাজে আর নাই।

বিবাহবেশে কন্যা পাল্কীতে করিয়া বরের গৃহে উপস্থিত হইলে বর স্বয়ং আসিয়া পাল্কীর দ্বার উন্মোচন করে। এই তাহাদের প্রথম দেখা বা "শুভদৃষ্টি"। তাহার পর উভয়ে যথাস্থানে গমন করিয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রজ্বলিত বাতির সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসে। এইখানে একজোড়া রাজহংস ও রাজহংসীর সম্মুখে বর জল ঢালিতে থাকে। চীনাদের বিবেচনায় এই পক্ষীযুগল দাম্পত্যপ্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এইজন্য কন্যা পিতৃগৃহ হইতে এই যুগলকে সঙ্গে লইয়া আসে। ইহাদের সম্মুখে বর ও কন্যা পরস্পরের নিকট চিরজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তাহার পর বরের সম্মুখে কন্যা হাঁটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে—বরও শেষে কন্যার নিকট হাঁটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে। স্ত্রীস্বামীর সাম্য এইরূপে প্রদর্শিত হয়।

চীনা বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান পিতৃপুরুষগণের সমাধি-মন্দিরে অথবা স্মৃতিফলকের সম্মুখে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের পিতা হাঁটু পাতিয়া পূর্ব্বপুরুষগণকে জানাইয়া দেন যে পরিবারের ভিতর এক ন ব্যক্তির আমদানি হইল। অবশেষে বর ও কন্যা স্মৃতিফলকের সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া বসে। বিবাহের চারি পাঁচ দিন পরে স্বামী স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরগৃহে যায়—তখন কন্যার পিতা এক ভোজ দিয়া থাকে।

চীনা রমণীর আদর্শ একখানা প্রাচীন চীনাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "The Spirit of the Chinese People" গ্রন্থে অধ্যাপক কু-হুং-মিঙ্ এই আদর্শ বিবৃত করিয়াছেন। নব্য ইয়োরোপ-আমেরিকার নবীনতম সমাজে রমণীর আদর্শ যাহা, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতবর্ষের লোক কু-হুং-মিঙের বিবৃত প্রাচীন চীনা আদর্শ সহজেই বুঝিতে পারিবে—যে-কোন প্রাচ্য মানবের পক্ষেই ইহা বুঝা সহজ। এমন কি ইয়োরোপ-আমেরিকার লোকেরাও কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রমণীজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ ধারণাই পোষণ করিত—বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালেও পাশ্চাত্যদেশের বহু নরনারী এই ধরণের রমণীই পছন্দ করিয়া থাকে।

কু-হুঙ্-মিঙের চরম মত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে:— "The chief end of a woman in China is not to live for herself, or for society; not to be a reformer or to be president of the 'Woman's Natural Feet Society"; not to live even as a saint or to do good to the world; the chief end of a woman in China is to live as a good daughter, a good wife and a good mother."

জার্ম্মান অধ্যাপক মুন্‌ষ্টারবার্গ জার্ম্মান সমাজে প্রচলিত রমণীজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ মতই প্রচার করিয়াছেন। জার্ম্মানেরা রমণীকে প্রধানত "Hausfrau" (housewife) বা গৃহকর্ত্রী ভাবে দেখিতে পছন্দ করে। এই হিসাবে আমেরিকার নবীন রমণী-সমাজ জার্ম্মান সমাজের বিপরীত।

কু-হুঙ্-মিঙ্ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানা চীনা গ্রন্থ হইতে রমণীজীবনের কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিতেছেন। হান্-রাজবংশের আমলে প্যান্-কু নামক ঐতিহাসিকের ভগ্নী Lady Tsao এই গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তকের নাম "Lessons for Women." অধ্যাপক কু বলিতেছেন "The Chinese feminine ideal, as it is handed down from the earliest times, is summed up in 'Three Obediences' and 'Four Virtues.'

গ্রন্থকর্ত্রীর মতে চারি প্রকার লক্ষণ সমন্বিতা হইলে নারীকে গুণবতী বলা যায়। এই চারিগুণের নাম—

(১) Womanly character বা নারীসুলভ নম্রতা ও সংযম

(২) Womanly Conversation বা নারী-শোভন শিষ্টাচার

(৩) Womanly appearance বা নারী শোভন বেশবিন্যাস

(৪) Womanly work বা নারীসুলভ গৃহকার্য্য

আদর্শ রমণীর আর তিন প্রকার লক্ষণ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"When a woman is unmarried, she is to live for her mother, when married she is to live for her husband, and as a widow she is to live for her children." ভারতবাসী এই আদর্শে নিজের মনুর ব্যবস্থাই পাইবে—এবং চীনা জাতিকে নিজের অন্তরঙ্গ আত্মীয় বিবেচনা করিবে সন্দেহ নাই।

চীনাসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। ভারতে ও চীনে এই বিষয়েও ঐক্য আছে।

সমাজজীবন আগামী ২০, ২৫ বা ৫০ বৎসরের ভিতর য়োরোপ-আমেরিকার এবং এশিয়ার কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে তাহা আলোচনা করিতেছি না। সমাজ, পরিবার, বিবাহ, রমণীজীবন, ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন্ আদর্শ শ্রেষ্ঠ তাহাও আলোচনা করিতেছি না। মোটের উপর, এই মাত্র বুঝিতেছি যে, ভাষার পার্থক্য সত্ত্বেও চীনারা এবং ভারতীয় নরনারী একই পরিবারের অন্তর্গত। আমাদের ত্রিশ কোটি লোক এবং চীনের চল্লিশ কোটি লোক বিগত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া একই আদর্শে দুনিয়ায় চলাফেরা করিয়াছে। সহজভাবে চীনা ও হিন্দুদের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিলেও ৭০ কোটি নরনারীকে এক সভ্যতার অন্তর্গত বিবেচনা করিতে বিশেষ কল্পনার আবশ্যক হয় না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

বাঁকুড়ায় ইংরেজীশিক্ষার প্রথম প্রবর্ত্তনের বিবরণ

অনেক প্রাচীন বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া না থাকিলে, কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। বাঁকুড়াতে ইংরেজী শিক্ষা কিরূপে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা আমার পিতৃদেব ৺ হরিচরণ দাস মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। আমি কেবল তাহা শুনিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলাম না; সঙ্গে-সঙ্গে তাহার নোট করিয়াও লইয়াছিলাম। নোটগুলি ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহা "প্রবাসী"তে প্রকাশিত করিলাম। আশা করি, বাঁকুড়াবাসীগণ সাগ্রহে এই বিবরণ পাঠ করিবেন। "প্রবাসী"র পাঠকসাধারণও ইহা পাঠ করিয়া অশীতিবর্ষপূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশের একাংশে লোকশিক্ষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানিতে পারিবেন।

এস্থলে পিতৃদেবের যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাৎকালিক বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর গ্রামে ১২৩৫ সালের মাঘমাসে (ইং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) ইঁহার জন্ম হয়। কোতুলপুর এখন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ও বাঁকুড়া সহরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ১৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ব্যবসায় উপলক্ষে ইঁহার পিতা ৺ ঠাকুরদাস দাস বাঁকুড়াসহরের পশ্চিমপ্রান্তে নূতন-চটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রামের পূর্ব্বভাগে অনতিদূরে বর্ত্তমান ওয়েস্লিয়ান্ মিশন কলেজ অবস্থিত। অষ্টম বর্ষে পিতৃদেব কোতুলপুর হইতে বাঁকুড়ায় আসেন। কোতুলপুরেই ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়; পরে বাঁকুড়ায় আসিয়া ইনি কিছুদিন গৃহে জনৈক শিক্ষকের নিকট বাঙ্গলা ও ফার্সি পড়েন, এবং একটি টোলের ছাত্রের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ ও অমরকোষ অভিধান অভ্যাস করেন। তৎপরে বাঁকুড়ার বাঙ্গালা স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া, নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ইং ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে ইনি জুনীয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইয়া ও বৃত্তিলাভ করিয়া সিনীয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়ন করেন। তৎপরে, বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া প্রায় পনর বৎসর কাল যোগ্যতার



হরিচরণ দাস।

হত শিক্ষকতা করেন। ইঁহার অনেক প্রসিদ্ধ ছাত্রের কট ইঁহার চমৎকার অধ্যাপনা-প্রণালীর প্রশংসা শোনা য়। দেশপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও ার অন্যতম ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং জুনীয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাসবিহারী-প্রমুখ পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া হুগলীকেন্দ্রে গমন করেন। পথে যাইতে-যাইতে ছাত্রগণের সহিত পরীক্ষার্থীরূপে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে ইঁহার সঙ্কল্প হয়। ইনি ছাত্রগণকে ইতিহাস পড়াইতেন না; সুতরাং এই বিষয়টি তাঁহার ভাল জানা ছিল না। রাসবিহারী বাবু শিক্ষক-মহাশয়ের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পথে যাইতে-যাইতে ইঁহার নিকট ইতিহাসের প্রধান-প্রধান ঘটনাগুলির আবৃত্তি করেন। পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া কলেজের অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, ইনি ছাত্রগণের সহিত পরীক্ষা দিতে বসিয়া যান। এই পরীক্ষায় ইনি প্রথম বিভাগে সমুত্তীর্ণ হন। পরে ইনি শিক্ষকরূপে এফ্-এ পরীক্ষাতেও উপস্থিত হইয়া প্রথম বিভাগে সমুত্তীর্ণ হন। বি-এ পরীক্ষার জন্যও ইনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু কোনও অনিবার্য্য কারণে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ইঁহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল যে, পেন্‌শ্যন্ লইয়াও বৃদ্ধবয়সে ইনি অবসরক্রমে পুস্তক পাঠ করিতেন। পড়িয়া-পড়িয়া ইঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। কোনও নূতন ইংরেজী সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তিনি তাহা আনাইতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই, তখন পিতৃদেব পেন্‌শ্যন্ লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। তিনি আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন "আমার বি-এ পরীক্ষাটা দেওয়া হয় নাই। যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাকে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত বি-এ পরীক্ষা দিতাম!" বৃদ্ধ বয়সেও ইনি এমনই বিদ্যানুরাগী ছাত্র ছিলেন!

বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকতা করিতে-করিতে ইনি স্কুলসমূহের ডেপুটী-ইন্স্‌পেক্টার নিযুক্ত হইয়া মেদিনীপুরে যান। সেখানে কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া কিছুদিনের জন্য বর্দ্ধমানে যান। বর্দ্ধমান হইতে আবার মেদিনীপুরে আসেন। সেখান হইতে বদলী হইয়া রাঁচিতে প্রায় দশ বৎসর কাল থাকেন। মেদিনীপুরে থাকা কালে ইনি সাঁওতালী ভাষায় ও রাঁচিতে থাকা কালে ইনি কোল মুণ্ডারী ওরাঁও প্রভৃতি অনার্য্য ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, এবং এই-সমস্ত অনার্য্য জাতির মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য প্রভূত যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগে এই অনার্য্যজাতিগণকে শিক্ষাপ্রদানের নিমিত্ত, গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শত শত পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইনি উক্ত ভাষাসমূহে অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন। ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার ইংরেজী আবৃত্তি শুনিলে চমৎকৃত হইতে হইত। ইংরেজী উচ্চারণও এরূপ বিশুদ্ধ ছিল যে, স্যর্ হেনরী হ্যারিশ্যন্ যখন স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টার ছিলেন, তখন ইঁহার সহিত একদিন আলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন "But for your occasional hesitations, one who hears you would

take you for an Englishman." ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পেন্‌শ্যন্ লইয়া ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় ২৪ বৎসর কাল পেনশ্যন্ ভোগ করিয়া ইনি ৮২ বৎসর বয়সে ১৩১৬ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণ তারিখে পরলোকগমন করেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই সদাচারী, মিতাচারী, ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন, এবং পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল বটে; কিন্তু সত্তর বৎসর বয়সেও ইনি গ্রীষ্মকালে একদিন অশ্বপৃষ্ঠে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন!

ইঁহার বাল্যকালে বাঁকুড়া-জেলায় লোকশিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে ইনি প্রায়ই গল্প করিতেন। তাহাতে তাঁহার বাল্যকাহিনীও কীর্ত্তিত হইত। তিনি তাঁহার ছাত্র-জীবনের বৃত্তান্ত আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যথা-সম্ভব তাঁহারই কথায় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

"কোতুলপুরে আমার জন্ম হয়। ইহা একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত, এখানে অনেক গন্ধবণিক্ বাস করিতেন। সেকালে লেখাপড়ার চর্চ্চা বেশী ছিল না। ছেলেরা পাঠশালায় কেবল সামান্য লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কসিতে শিখিত। কেহ কোনও হস্তলিখিত পুঁথি পড়িতে পারিলেই বিদ্বান্ বলিয়া গণ্য হইত।

"আমি কোতুলপুরে শ্রীশ্রী৺রাধারমণ জীউর মন্দিরের মণ্ডপে শিবু-সরকারের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করি। তখন মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। ভূমিতে খড়ির সাহায্যে দাগা বুলাইয়া আমাদের অক্ষর-পরিচয় হইত। মাটিতে দাগা বুলানো শেষ হইলে, আমরা তালপাতায় 'ক খ' লিখিতাম। পরে 'ক্ক স্ক' ও তৎপরে 'সিদ্ধিরস্তু অ আ ই ঈ' লিখিতাম। তালপাতায় হাতের লেখা পাকা হইলে, আমরা কলাপাতায় লিখিতাম এবং সর্ব্বশেষে কাগজে লিখিতাম। তখন শ্লেট্ ছিল না। তক্তিতে আমরা অঙ্ক কসিতাম। একটা লোহার কলমে কালী মাখাইয়া তক্তিতে লিখিতাম। ছোট অঙ্ক হইলে, তক্তিতে বা পাতায় তাহা কসিতাম। বড় অঙ্ক হইলে, মাটিতে খড়ি পাতিয়া তাহা কসা হইত।

"পুস্তকের মধ্যে আমাদিগকে 'অষ্টশব্দী' 'শব্দসুবন্ত' ও পরে 'অমরকোষ' পড়িতে হইত। এই-সকল পুস্তক পড়া হইলে 'রামায়ণ' 'মহাভারত' ও 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' প্রভৃতি পড়া হইত। মুদ্রিত পুস্তক না থাকায়, হস্তলিখিত পুঁথিই পড়িতে হইত। যাহার পুঁথির প্রয়োজন হইত, গুরু-মহাশয় তাহার জন্য পুঁথি লিখিয়া দিতেন, এবং পুঁথির আকারানুসারে দুই আনা কিম্বা চারি আনা পয়সা পারি-শ্রমিক লইতেন।

"বাল্যকালে আমাদের মাথায় ঝুঁটি বাঁধা থাকিত। আমরা পাত-তাড়ি বগলে করিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে দোয়াত ঝুলাইয়া পাঠশালায় যাইতাম। আমাদের বসিবার আসন, চট বা মাদুর, পাত-তাড়ির সঙ্গে জড়ানো থাকিত। যাহাদের বাড়ী নিকটে তাহারা বাড়ীতে জলখাবার খাইতে যাইত; যাহাদের বাড়ী দূরে, তাহারা 'জলপান,' অর্থাৎ মুড়ি, চিঁড়ে ও গুড় প্রভৃতি বাঁধিয়া আনিত, এবং জলখাবারের ছুটি হইলে তাহা খাইত।

"বাল্যকাল হইতেই আমি অঙ্ক কসিতে ভাল বাসিতাম। মানসাঙ্কেও আমি নিপুণ ছিলাম। সন্ধ্যার পর গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়া আমরা মৌখিক অঙ্ক অভ্যাস করিতাম। ইহাকে তাৎকালিক ভাষায় 'ডাক-বলাবলি' বলিত। এক-জন একটি অঙ্কের প্রশ্ন করিত। অমনই অপর সকলে মনে মনে সেই অঙ্ক কসিয়া তাহার উত্তর বলিত।

"সেকালে কোতুলপুর অঞ্চলে ডাকাত ও লেঠেলের অতিশয় ভয় ছিল। কোতুলপুরের নিকটেই বড় বড় মাঠ। এক-একটি মাঠ তিন ক্রোশ চারি ক্রোশ দীর্ঘ। এই মাঠগুলিকে 'তিন ক্রোশা মাঠ' 'চার ক্রোশী মাঠ' বলিত। সেই মাঠের মধ্যে বা নিকটে কোনও লোকালয় ছিল না। দিনের বেলাতেই কোনও ব্যক্তি একাকী সেই-সমস্ত মাঠ পার হইতে সাহস করিত না। দস্যুরা পথিককে একাকী পাইলে, তাহার প্রাণসংহার করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত। ভাগবত খাঁয়ের দীঘী নামে এখনও একটি বড় দীঘী আছে। দস্যুরা সেই দীঘীর চারিদিকে চাপ-জাল লইয়া মাছ ধরিয়া বেড়াইত। পথিক তাহাদিগকে জেলে মনে করিয়া দীঘীর ঘাটে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া খাবার খাইত, এমন সময়ে সহসা কোনও জেলে মাছ ধরিবার ছলে নিকটে আসিত এবং পথিক একটু অতর্কিত থাকিলে, চাপজালে তাহাকে চাপিয়া

মারিয়া ফেলিত। জালে যেরূপ কাতলা রুই প্রভৃতি বড় বড় মাছ ধরা ও মারা পড়ে, দস্যুরাও সেইরূপে জালদ্বারা মানুষ মারিয়া ফেলিত। এই কারণে, দস্যু কর্ত্তৃক কোনও মানুষ নিহত হইলে, লোকে ঐ অঞ্চলের তাৎকালিক ভাষায় বলিত, 'কাতলা পড়িয়াছে।' 'কাতলা পড়া'র কথা শুনিলেই লোকে শিহরিয়া উঠিত। একদিন আমরা সন্ধ্যার পর গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বসিয়া ডাক-বলাবলি করিতেছি, এমন সময়ে অদূরে একটা মাঠের দিক হইতে এক ভয়ানক আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। 'বাপ্‌রে, মলুম্‌রে' শব্দ শুনিবামাত্র আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া গেল। আমরা সকলেই নীরব ও উৎকর্ণ হইয়া সেই দারুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই আর্ত্তনাদ থামিয়া গেল। গুরুমহাশয় বলিলেন 'মাঠে একটা কাতলা পড়্‌ল রে!' আমরা সকলেই সেই কথা শুনিয়া ভয়ে হতজ্ঞান হইলাম ও তৎক্ষণাৎ বাড়ী চলিয়া গেলাম। পরদিন প্রাতে কৌতূহলপরবশ হইয়া কতিপয় বালক ও লোকের সহিত সেই মাঠে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখি, একটি প্রকাণ্ড জোয়ান মাঠে রক্তাক্তদেহে মরিয়া পড়িয়া আছে। বেচারা ডাকাতদের সঙ্গে যে অনেকক্ষণ যুঝিয়াছিল, তাহা মাটিতে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝা গিয়াছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ একাকী লড়িবে? গ্রাম নিকটে থাকিলেও কেহই তাহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় নাই! মাঠে আর্ত্তনাদ শুনিলেই লোকে ভয়ে নিস্তব্ধ হইত, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে যাইত! সেকালে পথিকগণের জীবন এইরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল।

"আমার পিতা বাঁকুড়াতে থাকিয়া ব্যবসা করিতেন। তাঁহার নিকটে আমার বড়দাদা এবং মেজদাদাও ছিলেন। বড়দাদার জ্বরবিকারের সংবাদ পাইয়া জননীদেবী আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া বাঁকুড়ায় যান। আমি কোতুলপুরের বাটীতে পিসীমার কাছে থাকিলাম। মা বাঁকুড়ায় গিয়া আর কোতুলপুরে আসিলেন না। তখন আমাকেও বাঁকুড়ায় লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। যখন আমার বয়স আট বৎসর, তখন আমি বাঁকুড়ায় আসি। . .

"নূতনচটী গ্রামে তখন পাঠশালা ছিল না। এই কারণে, আমাদিগকে গৃহে পড়াইবার জন্য পিতাঠাকুর মহাশয় জনার্দ্দন সরকার নামে একটি কায়স্থকে নিযুক্ত করিলেন। সকলে ইঁহাকে 'দনাই সরকার' বলিয়া ডাকিত। তাৎকালিক বিদ্যার হিসাবে, ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ছাড়া ইনি ফার্শি ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ফার্শি না জানিলে সেকালে কেহ সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতেন না। আদালতেও ফার্শিভাষা প্রচলিত ছিল। উকীল মোক্তারেরা ফার্শিতে বক্তৃতা করিতেন; ফার্শিতে আর্জ্জি, জবাব, জবাব্-উল্ জবাব ও হদ্দ জবাব লিখিতেন; এবং হাকিমেরাও ফার্শিতে রায় লিখিতেন। সুতরাং সেকালে ফার্শি না জানিলে, বিষয়-কর্ম্ম পরিচালনা করা দুরূহ হইত। আমরা দনাই সরকারের নিকট বাঙ্গলাভাষা ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করা ব্যতীত ফার্শিভাষাও শিক্ষা করিতাম। মেজদাদা ও আমি গোলেস্তাঁ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। দনাই সরকারের নিকট আমরা চারি সহোদর ব্যতীত গ্রামের আরও দুই চারিটি বালক পড়িত। দনাই সরকার আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া ব্যতীত আমাদের কারবারের খাতাপত্রও লিখিতেন।

"দনাই সরকারের নিকট পড়িতে-পড়িতে আমি স্বহস্তে অনেক পুঁথি লিখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে 'দাতাকর্ণের পালা' ও 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পুঁথিগুলি তাঁহার নিকট পড়িতাম। পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ব্যবসা আমার ভাল লাগিত না। আমাদের গ্রামের একটি ব্রাহ্মণ-যুবক বাঁকুড়ায় টোলে পড়িতেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার পাঠাভ্যাস শুনিতাম। তিনি যাহা অভ্যাস করিতেন, আমিও তাহা অভ্যাস করিতাম। এইরূপে আমি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ ও অমরকোষ অভিধান মুখস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাবা এ-সব পছন্দ করিতেন না।

"দনাই সরকারের নিকট পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামগোপাল বাঁকুড়াতে সীতানাথ চক্রবর্ত্তীর গভর্ণমেণ্ট-সাহায্য-প্রাপ্ত পাঠশালা বা বাঙ্গলা স্কুলে পড়িতে যাইতাম। স্কুলটি আমাদের বাড়ী হইতে

এক মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত ছিল। নূতনচটী ও বাঁকুড়া সহরের মাঝে রাস্তার উভয় পার্শ্বে যে বড় বড় মাঠ আছে, তখন সেই মাঠগুলি শাল জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। মাঝে মাঝে জঙ্গল হইতে বন্য জন্তুও বাহির হইত; এই জন্য স্কুলে যাইতে আসিতে আমাদের বড় ভয় হইত।

"আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া স্কুলে যাইতাম। সঙ্গে খাবার লইয়া যাইতাম। বেলা দশটার সময়ে স্কুলের ছুটি হইলে, আমরা পুকুরের ধারে বসিয়া খাবার খাইয়া বাড়ী আসিতাম। আবার ভাত খাইয়া চারিটার সময় স্কুলে যাইতাম। বৈকালে আমাদিগকে চিঠিপত্র লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই বাঙ্গলা স্কুলেই মুদ্রিত পুস্তক প্রথম পাঠ করি। সেই পুস্তকের নাম 'মনোরঞ্জন'। স্কুলে সেই পুস্তক ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ পড়িতাম। বাঙ্গলা স্কুলে বেঞ্চ ছিল না। আমরা বাড়ী হইতে নিজ নিজ আসন লইয়া গিয়া স্কুলে বসিতাম।

"বাঁকুড়ার সুবিখ্যাত ডাক্তার চীক্ (Dr. Cheek) ও জজ্ গোল্ডস্‌বারি (Mr. Goldsbury) সাহেবের যত্নে বাঁকুড়ায় একটি ইংরেজী ফ্রী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই স্কুল আরম্ভ করেন। মাজিষ্ট্রেট জর্জ্জ লক্ (George Locke) ফ্রী স্কুলে প্রত্যহ এক ঘণ্টা করিয়া পড়াইতেন। তখন আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য ইংরেজ রাজপুরুষগণের এমনই যত্ন, চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল! আমি গণিতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলাম। বাঙ্গলা স্কুলে যাইবার আসিবার সময় ইংরেজী স্কুলের ছাত্রেরা আমাকে ধরিত ও অঙ্ক কসিতে বলিত। আমি কঠিন কঠিন অঙ্কও কসিয়া দিতাম। কিন্তু একদিন একটা অঙ্ক কসিতে ভুলিয়াছিলাম বলিয়া সীতানাথ চক্রবর্ত্তী আমাকে অতিশয় প্রহার করিয়াছিলেন।

"কিছু দিন পরে বাঙ্গলা স্কুল ছাড়িয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি ব্যবসা শিখিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহা আমার ভাল লাগিত না। সানবান্দা-গ্রামবাসী মধুসূদন মুখোপাধ্যায় আমাদের গ্রামে তাঁহাদের কারবারের কুটীতে থাকিয়া ফ্রী স্কুলে পড়িতেন। মধুসূদন যখন ইংরেজী পড়িতেন, তখন আমি তাঁহার কাছে বসিয়া তাহা শুনিতাম; কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতাম। তিনি যাহা পড়িতেন তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুই বলিতেন না। কখনও কখনও বিরক্ত হইয়া তিনি বলিতেন 'তুমি ইহার কি বুঝিবে হে?' আমি বলিতাম 'ভাই, তুমি যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে আমি পারিব না কেন? কি পড়িতেছ, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া বল না?' একদিন মধুসূদন আমার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন 'হরি, তুমি ইংরেজী পড়িবে?' আমি বলিলাম 'পড়িব।' সেই দিন মধুসূদন আমাকে ডাক্তার চীক্ সাহেবের কাছে লইয়া গেলেন। চীক্ সাহেব আমার বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম 'বার তের বৎসর হইবে।' সেই দিনেই আমি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম।

"আমি ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়াছি শুনিয়া বাবা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। যাহাতে আমি ব্যবসা শিক্ষা করি, তার জন্যই তাঁহার চেষ্টা। কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমার আগ্রহ দেখিয়া, তিনি আমাকে তখন বড় একটা কিছু বলিলেন না। পরন্তু আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য, পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে তাহার মূল্য দিতেন না, এবং ছুটির সময়ে আমাকে ব্যবসা শিখিতে বলিতেন। দিনের বেলায় আমি তালবনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া পুস্তক পড়িতাম, এবং রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ অভ্যাস করিতাম। রাত্রিতে উঠিয়া পড়িবার সময় অত্যন্ত ঘুম পাইত। যাহাতে আমি ঘুমাইয়া না পড়ি, তজ্জন্য মাথায় একটা টিকি রাখিয়া ঘরের মট্‌কার সহিত সংলগ্ন একটি দড়ির সহিত তাহা বাঁধিয়া রাখিতাম। যখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতাম, তখন টিকিতে টান পড়িত, আর অমনই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত!

"আমাদের ইংরেজী প্রথম পুস্তকের নাম ছিল Murray's Spelling। আমি মধুর কাছে পড়া বলিয়া লইতাম ও পরিশ্রম সহকারে তাহা অভ্যাস করিতাম। তখন ফ্রী স্কুলের হেড্-মাষ্টার ছিলেন কালীচরণ দত্ত, ও সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায়। ময়নাপুরের তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রেরা, অর্থাৎ বরদানন্দ গঙ্গানন্দ এবং মহেশানন্দও ফ্রী স্কুলে পড়িতেন। আমাদের সঙ্গে সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং গঙ্গানারায়ণ বারিক পড়িতেন। নফর পণ্ডিত আমাদিগকে হিতোপদেশ পড়াইতেন।

"ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় গভর্ণমেণ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ফ্রী স্কুল ভাঙ্গিয়া গেল। ফ্রী স্কুলে আমি দুই তিন বৎসরে সেকেণ্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। পুস্তকাভাবে আমি কোনও সহপাঠীর পুস্তক চাহিয়া আনিতাম, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহা পড়িয়া ফেলিতাম, অথবা নকল করিয়া লইতাম। সকলে গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইলে, আমিও সেখানে ভর্ত্তি হইলাম। গভর্ণমেণ্ট স্কুল সর্ব্বপ্রথমে সিপাহী হাঁসপাতালে স্থাপিত হয়। আমাদিগকে মাসিক আট আনা করিয়া বেতন দিতে হইত। স্কুলের হেড্-মাষ্টার হইলেন, নবীনকৃষ্ণ সরকার। ইঁহার পরে বীট্‌সন সাহেব (Mr. Beetson), ওয়াট্‌সন্ সাহেব (Mr. Watson) ও স্পীয়ার সাহেব (Captain Spear) হেড্‌মাষ্টার নিযুক্ত হন। আমি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, এবং প্রায় তিন বৎসর পড়িয়াছিলাম। স্পীয়ার সাহেব সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু অতিশয় মদ্যপান করিতেন। তিনি জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন।

"ডাক্তার জন্‌সনের একটি ছোট অভিধান আমার একমাত্র সম্বল ছিল। আমি এই অভিধানটি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি যখন স্কুলে ভর্ত্তি হই, তখন ক্লাসের সকল বালকের অপেক্ষা আমার বয়স অধিক ছিল। এই কারণে আমি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া নিজ ক্লাসের পাঠাভ্যাস করা ব্যতীত উপরের ক্লাসেরও পুস্তকগুলি কাহারও নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া পড়িয়া ফেলিতাম। আমি অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়িতাম। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। শিরঃপীড়ায় মাথায় এরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা হইত যে মনে হইত তাহা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আমি একখানা চাদর কপালে শক্ত করিয়া বাঁধিতাম এবং সেই ভয়ানক যন্ত্রণা সত্ত্বেও পড়িতাম। বাম হাতে আমি কপাল টিপিয়া ধরিয়া ভাত খাইতাম।

"আমাদের সঙ্গে কাকুট্যার যদুনাথ রায় (ইনি পরে ইঞ্জিনীয়ার হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন), রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি পরে হাইকোর্টের Translator হইয়াছিলেন), গঙ্গানারায়ণ কারিক (ইনি পরে বাঁকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক হইয়াছিলেন), দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি পরে কলিকাতার Collector এবং 'রায় বাহাদুর' ও C. I. E. উপাধিলাভ করিয়াছিলেন), হাড়্‌মাসড়ার গদাধর রায় ও নন্দকুমার রায় প্রভৃতি পড়িতেন। আমরা যখন থার্ড ক্লাসে পড়ি, তখন স্কুল ইন্সপেক্টার লজ্ সাহেব (Mr. E. Lodge) স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দুর্গাগতি, গদাধর ও নন্দকুমার ইন্‌সপেক্টার-সাহেবকে দেখিয়া ক্লাসে থুথু ফেলিয়াছিল ও হাসিয়াছিল। তাহাতে সাহেব অতিশয় ক্রুদ্ধ হন এবং ইহাদের পরীক্ষা করিয়া অসন্তুষ্ট হন। পরে ইহাদিগকে unmannerly (বেআদব্) বলিয়া স্কুল হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি ইহাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও আমার বেশ স্মরণ আছে। তিনি বলিয়াছিলেন "These boys should be weeded out from the School." স্কুল ছাড়িয়া দুর্গাগতি গৃহে পাঠ করিয়া পরিশেষে বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। গদাধরও উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

"আমি ক্লাসের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইতাম, এবং অনেক মূল্যবান্ পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিলাম। Dr. Richardson's Selections from British Poets নামক দুই ভলুম্ পুস্তক ও Addison's Spectator ও অন্যান্য অনেক পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিলাম। আমি পুস্তকগুলি আগা-গোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম।

"বাঁকুড়ার গভর্ণমেণ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে, প্রথম ব্যাচে (batch) যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এবং বরদানন্দ ও গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায় জুনীয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর, আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য ব্যস্ত হই। হেড্-মাষ্টার আমাকে আর এক বৎসর পরে পরীক্ষা দিতে উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু আমার আগ্রহাতিশয্যে তিনি পরিশেষে আমাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আমি হেড্-মাষ্টারের পরামর্শ গ্রহণ করিলে ভালই করিতাম। কেননা আমি দেড় নম্বরের জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। সেই বৎসর মহেশচন্দ্র চৌধুরী (ইনি পরে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন) এবং হারানচন্দ্র মৈত্র

(ইনি পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ হেড্-মাষ্টার হইয়াছিলেন), কেবল এই দুইটি ছাত্রই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে যে পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হই ও প্রথম স্থান অধিকার করি। আমার সঙ্গে যদুনাথ রায়, রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি মাসিক ৮৲ টাকা করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলাম।

"জুনীয়ার স্কলারশিপ্ পরীক্ষায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমাদের পাঠ্য ছিল। যথা:—ইংরেজী সাহিত্যের কোনও বিশেষ পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু আমরা Goldsmith's Essays and Vicar of Wakefield, Addison's Spectator and Dr. Richardson's Selections from British Poets এই পুস্তকগুলি পড়িয়াছিলাম। ব্যাকরণের মধ্যে Lennie's Grammar পড়া হইত। ইতিহাসের মধ্যে Goldsmith's History of Rome, History of Greece and History of England, Marshman's History of India, and Stewart's History of Bengal এই পুস্তকগুলি পড়িয়াছিলাম। Crombe's Etymology and Syntaxও পড়া হইয়াছিল। অঙ্কের মধ্যে Arithmetic জ্যামিতির First Six Books এবং Algebra up to Property of Numbers এইগুলি পাঠ্য ছিল। বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কপঞ্চানন প্রণীত 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামক পুস্তক আমাদের পাঠ্য ছিল।

"আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিনীয়ার স্কলারশিপ পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ, হুগলীতে হুগলী কলেজ, এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর কলেজ এই তিনটি কলেজই তখন প্রসিদ্ধ ছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্য তখন ভাল ছিল না। চারিদিকে খোলা ড্রেন; তাহা হইতে এক বিজাতীয় দুর্গন্ধ বাহির হইত ও সর্ব্বত্র মাছি ভন্‌ভন করিত। রাত্রিতে মশারও ভয়ানক উপদ্রব ছিল। বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা না থাকায়, আমাদের দেশের লোকেরা গঙ্গার লবণাক্ত জল পান করিয়া উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইত ও অনেকে মারা পড়িত। এই কারণে কলিকাতার হিন্দুকলেজে পড়িতে যাওয়ার মত হইল না। যে কারণে কলিকাতায় যাওয়া হইল না, সেই কারণে হুগলিতেও যাওয়া হইল না। অগত্যা কৃষ্ণনগর কলেজেই অধ্যয়ন করিবার সঙ্কল্প করিলাম।

"গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর বাঁকুড়া হইতে বহুদূরে অবস্থিত। বাঁকুড়া হইতে ক্রমাগত ৭।৮ দিন হাঁটিয়া গেলে, তবে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হওয়া যাইত। তখন রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই। যানের মধ্যে কেবল গো-যান ও পাল্কী। পাল্কী চড়িয়া কৃষ্ণনগরে যাওয়া আমাদের অবস্থার বহির্ভূত; গোযানেরও ভাড়া অত্যধিক ছিল। বিশেষতঃ গোযান ভাড়া পাওয়া যাইত না, কেননা কোনও গাড়োয়ান এত দূরদেশে একাকী যাইতে চাহিত না। পথে দস্যুভয় ছিল, এবং পথও সর্ব্বত্র পাকা ও ভাল ছিল না। অগত্যা আমরা পদব্রজেই কৃষ্ণনগর যাইতাম। কাকুট্যাতে গিয়া যদুনাথ রায়কে সঙ্গে লইতাম। আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক-একজন মুটিয়া থাকিত। মুটিয়া আমাদের বিছানাপত্র ও পুস্তকের মোট মাথায় বহিয়া লইয়া যাইত। আমরা বাঁকুড়া হইতে বর্দ্ধমানে যাইতাম। সেখানে কৃষ্ণনগর কলেজের জনৈক সহপাঠীকে সঙ্গে লইয়া অম্বিকা-কালনায় উপনীত হইতাম। এই স্থানে গঙ্গা সমুত্তীর্ণ হইয়া আমরা কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইতাম।"

পিতৃদেব অতঃপর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত বলিয়া, আমি এই স্থানেই প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

কে বড়

ভক্তিভরে ঘড়ী বলে "সেলাম তোমায় ভাই সুময়!
তোমার জন্য আমার জন্ম, পূজেত তোমায় ইচ্ছে হয়।"
"কও কি কথা!" বলে সময়, "কেবা জান্‌ত মোর খবর?
(সবাই) তোমায় দেখে আমায় চেনে, তুমি আমার নওকো পর।"

আবু ছালে সৈয়দ মোহাম্মদ মোকাদ্দের হোসেন চৌধুরী।

পরগাছা

(৩৫)

রাখাল ও মণিমালা পাহাড়পুরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে রাণী জগদ্ধাত্রীর এক দূর-সম্পর্কের ভাই আসিয়া কর্ত্তা হইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে, তাহার নাম বঙ্কবিহারী। সে আফিং গাঁজা গুলি চরস প্রভৃতি নেশা সযত্নে অভ্যাস করিয়াছিল; এক্ষণে দিদির দৌলতে সেইগুলির চর্চ্চায় সে বিশেষ রকম মনোযোগ দিয়াছে। রাজবেশে ফিটফাট হইয়া সে নেশার চর্চ্চা আর খুব লম্বা লম্বা হুকুম করে। সমস্ত জমিদারীর সেই কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছে। এবং তাহার স্ত্রী চন্দনমণি অন্দরের কর্ত্রী, সে-ই রাণী; রাণী জগদ্ধাত্রীর বেনামিতে অন্দরের সমস্ত কর্ত্রীত্ব সে-ই করিয়া থাকে। আর তাহাদের দুজনের মাঝখানে তাহাদের ছেলে কুবেরকে দাঁড় করাইয়া তাহারা তাহার এক হাত দিয়া সমস্ত জমিদারী ও অপর হাত দিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর পুত্রস্নেহ বেদখল করিবার চেষ্টায় আছে।

রাজা ধনেশ্বর মরিতে-না-মরিতে বঙ্কবিহারী পুত্র-কলত্র লইয়া আপনার জীর্ণ ভাঙা তালপাতায়-ছাওয়া একমাত্র কুঁড়ে ঘরখানির মায়া একেবারে ত্যাগ করিয়া ছুটিতে-ছুটিতে আসিয়া পাহাড়পুরে জমিয়া বসিয়াছে। অভিলাষ পুত্র কুবেরকে পোষ্যপুত্র করিয়া দিয়া তাহারাই রাজার জনক-জননী হইয়া প্রভুত্ব করিবে।

রাজা ধনেশ্বর মরিবার পূর্ব্বে রাণী জগদ্ধাত্রীকে দত্তকপুত্র লইবার এক অনুমতি-পত্র দিয়া গিয়াছেন বলিয়া বঙ্কবিহারী ঘোষণা করিয়া দিয়া পুত্রের ওসি হইয়া নিজেই রাজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার বীরত্বে এখন পাহাড়পুরের জমিদারী যায়-যায়।

রাজা ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট খবর লইতে আসিলেন রাজার কেহ ওয়ারিসান আছে কি না, রাজার কোনো উইল আছে কি না, জমিদারী কে চালাইবে।

বঙ্কবিহারী রাজা ধনেশ্বরের পরিত্যক্ত কিংখাবের পোসাক পরিল, মাথায় জরির তাজ চড়াইল, পায়ে জরির জুতা দিল, কানে বীরবৌলী, গলায় হার, হাতে বালা পরিল। কিন্তু কোনোটাই ঠিক মানানসই হইয়া গায়ে বসিল না। তা হোক, সে স্বাধীন নৃপতি! সাদাসিধা পোষাক ত সে পরিতে পারে না! কিন্তু তাহার মহা সমস্যা উপস্থিত হইল, স্বাধীন নৃপতির তুচ্ছ ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবুতে গিয়া দেখা করা উচিত কি না। দেওয়ান রাজনাথ তাহাকে বুঝাইল যে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাঁহার রাজ্যে অতিথি, তখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার সৌজন্যই প্রকাশ পাইবে, মানহানি হইবে না।

বঙ্কবিহারী খুসী হইয়া বলিল—হাঁ হাঁ, যথার্থ বলেছেন মন্ত্রীমশায়। রাজমন্ত্রী! রাজবুদ্ধি! হবে না কেন? কিন্তু রাজকায়দায় যেতে হবে মন্ত্রীমশায়! সম্মুখে দুজন দৌবারিক লাঙ্গা তরোয়াল নিয়ে যাবে, পার্শ্বে দুজন আসা-বরদার চলবে, পশ্চাতে দুজন শরীররক্ষী গোলন্দাজ যাবে; আর আমার সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ দিকে আপনি মহামাত্য যাবেন, আর বাম দিকে খাস খানসামা ঘনশ্যাম ওরফে ঘিনু সোনার ফরসীতে মুক্তার-ঝালর-দেওয়া জড়োয়া সরপোষ চড়াইয়া বহিয়া লইয়া চলিবে!

এই স্বাধীন নৃপতির অদ্ভুত বেশভূষা ও গ্রামভারী চাল-চলন দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের হাস্য রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সাহেব তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনিই কি স্বর্গীয় রাজার জামাই?

বঙ্কবিহারী বুক ফুলাইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া বলিল—না, আমি জামাই নহি, আমি রাজশ্যালক, রাণীর ভ্রাতা!

—আমি জানতে চাই যে রাজা কোনো উইল রেখে গেছেন কি না। যদি উইল না থাকে তবে রাজার মেয়েই ত রাণীর মরণোত্তর উত্তরাধিকারী হবেন। তা হলে রাণীর অভিভাবক তাঁর জামাতাই হবেন ত?

—সে কখনো হতে পারে না। এ স্বাধীন নৃপতির রাজ্য! কন্যাকুলে রাজ্য যেতে পারে না! রাজার অনুমতিপত্র আছে, রাণী দত্তকপুত্র নেবেন। আমার ছেলেই দত্তকপুত্র হবে, এবং সে সাবালগ না হওয়া পর্য্যন্ত আমিই তার ন্যায়-সঙ্গত অভিভাবক, আমিই রাজ্য রক্ষা করব!

—রাণীর কি মত আমি রাণীর নিজের মুখ থেকে শুনতে চাই। আপনারা এইখানে থাকুন, রাণীকে খবর পাঠিয়ে দেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

বঙ্কবিহারী উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—সে কখনো হতে

পারে না! স্বাধীন নৃপতির ভার্য্যা, স্বাধীন নৃপতির ভাবী মাতা, কখনো পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হতে পারেন না!

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন—তিনি দরজায় পরদা ফেলে ওপারে থাকবেন, আমার মেম তাঁর কাছে থাকবেন, আমি এপার থেকে শুধু তাঁর মুখের কথা শুনে যেতে চাই।

বঙ্কবিহারী রাজনাথকে জিজ্ঞাসা করিল—মন্ত্রী, আপনার অভিপ্রায় কি?

—আজ্ঞে, হুজুর যা বলছেন তাতে দোষ দেখি না।

বঙ্কবিহারী ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—হুজুর! এখানে আমি ছাড়া আর কে হুজুর আছে!

রাজনাথ প্রমাদ গণিল। সে তাড়াতাড়ি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইংরেজিতে বলিল—মাপ করিবেন, ইঁহার নানাবিধ নেশা করিয়া মাথার একটু গোলমাল হইয়াছে।

বঙ্কবিহারী হুঙ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অমাত্য, ম্লেচ্ছ ভাষায় কি বললেন?

রাজনাথ কষ্টে হাসি গোপন করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বললাম যে সাহেব যখন রাজভৃত্য তখন প্রভু তাঁকে অন্তঃপুরে যেতে দিতে অস্বীকার করবেন না।

বঙ্কবিহারী হাসিয়া-হাসিয়া গা দুলাইয়া বলিল—অমাত্য, আপনার বুদ্ধির তারিফ করি! রাজভৃত্য, রাজভৃত্য! রাণীর সঙ্গে ভৃত্যের দেখা করতে দোষ কি! হাঁ, সাহেব আপনি মেম-সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে চলুন তবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট মেমকে রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাহারা রাখিয়া তাঁহার মুখ হইতে বঙ্কবিহারী যাহা বলিয়াছিল তাহাই শুনিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রাজা ধনেশ্বরের অনুমতি-পত্র লইয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই সই কি স্বর্গীয় মহারাজের।

রাণী জগদ্ধাত্রী ঢোক গিলিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন—হাঁ।

ম্যাজিষ্ট্রেট রাজা ধনেশ্বরের স্বাক্ষরিত অপর কাগজের সহিত অনুমতি-পত্রের সই মিলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দলিলের সইএর সঙ্গে অনুমতি-পত্রের সইএর মিল নেই বোধ হচ্ছে। এর কারণ কি?

বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—পীড়িত...

ম্যাজিষ্ট্রেট ধমক দিয়া বলিলেন—আপনি চুপ করুন। আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করছি।

রাণী বলিলেন—তখন তিনি পীড়িত ছিলেন।

—আপনি ঠিক জানেন এ সই তাঁর নিজের হাতের?

রাণী জগদ্ধাত্রী ক্ষীণস্বরে বলিলেন—হাঁ।

তখন সাহেব ভাবী পোষ্যপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। অমনি বঙ্কবিহারী বলিয়া উঠিল—দৌবারিক, যাও মহারাজকে নিয়ে এস।

কুবেরও খুব জমকালো জরির জামা ও টুপি পরিয়া আসিল। সে আসিয়া দাঁড়াইতেই বঙ্কবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—মহারাজের আসতে আজ্ঞা হোক্! সাহেব, ইনিই মহারাজ!

কুবেরের বয়স বছর বারো তেরো। ফর্সা রং হইলেও পাড়াগেঁয়ে দৌরাত্ম্যে একটু কটাসে রোদপোড়া হইয়া গিয়াছে; চেহারাটা পাকাটে; তামাকে দম কষিয়া-কষিয়া ঠোঁট দুটো কালিবর্ণ। হাত পা নলি-নলি, হাড়-বেরুনো, শিরা-ওঠা।

সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—এ যতদিন সাবালগ না হয় ততদিন এই ষ্টেট কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে থাকবে, এবং ইহার শিক্ষা সহবতের জন্য একজন শিক্ষিত লোককে নিযুক্ত করতে হবে।

বঙ্কবিহারী মাথা ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—সে কখনো হতে পারে না। এর অভিভাবক আমি! কার সাধ্য এ রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে! যদি করে, বিষম সমরানল প্রজ্জলিত হবে!

সাহেব হাসিয়া "পাগল!" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিন পরে একজন ইংরেজ ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। বঙ্কবিহারী বুক ফুলাইয়া গোঁপে চাড়া দিয়া আস্ফালন করিয়া বলিল—

"তীক্ষ্ণ সূচি-অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি,
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি!"

যে ঐ ম্লেচ্ছ ইংরেজটার শির আনতে পারবে সে পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার পাবে!

জমিদারী-সরকারে গুণ্ডা লাঠিয়াল পোষা থাকে; পাঁচশত টাকার লোভে অনেক লাঠি চঞ্চল হইয়া উঠিল।

কিন্তু দেওয়ান রাজনাথ ঠিক সময়ে সতর্ক ও সাহায্য করাতে সাহেব ম্যানেজার মাথা লইয়া পলাইয়া বাঁচিল।

বঙ্কবিহারী ও রাণী জগদ্ধাত্রীর নামে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারেণ্ট জারি করিলেন।

এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রাখালের ডাক পড়িয়াছিল।

পুলিশকে ঘুষের উপর ঘুষ চাপাইয়া ওয়ারেণ্ট এড়াইয়া রাখা হইতেছিল। কিন্তু আর বুঝি বাঁচানো যায় না। স্বয়ং পুলিশ-সাহেব সশস্ত্র পুলিশ লইয়া বাড়ী ঘেরাও করিতে আসিতেছেন।

রাখালকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে, কিন্তু বঙ্কবিহারীর প্ররোচনায় রাখালকে কেহ পুছে না; রাখাল নিজে হইতে কোনো পরামর্শ দিতে গেলে বঙ্কবিহারী বলিয়া উঠে—তোমার পরামর্শ শুনতে পারি না বাবাজী; তুমি আমাদের বিরুদ্ধ-স্বার্থের লোক!

অন্দরে মণিমালাও মায়ের কাছে পর হইয়া উঠিয়াছে। চন্দনমণি সদাসর্ব্বদা জগদ্ধাত্রী দেবীকে আগলাইয়া-আগলাইয়া ফিরিতেছে, মণিমালা যাহাতে কখনো একলা মায়ের কাছে না থাকিতে পায়; চন্দনমণি কুবেরকে সর্ব্বদা রাণীর কাছে-কাছে রাখে, পাছে ভূপালের উপর রাণীর মায়া বসিয়া যায়। রাণী জগদ্ধাত্রী বিধবা হওয়ার পরই পুলিশ-হাঙ্গামায় পড়িয়া কেমন হতভম্ব জবুথবু হইয়া গিয়াছেন, কাহারও সহিত কথা বলেন না, ভালো করিয়া খান না, ঘুমান না, থাকেন-থাকেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—শেষে এও কপালে ছিল,—রাজরাণী ছিলাম, জেল খেটে মরব!

মণিমালা একদিন রাখালকে বলিল—এখানে দেখছি আমাদের এরা চায় না, আমাদের এখানে দরকার নেই। চল আমরা আমাদের বাড়ীতে ফিরে যাই।

রাখাল বলিল—সে কি হয় মণি। এদের দরকার না থাক, আমি দেখছি এখানে আমাদের দরকার আছে। এই বিপদের সময়ে ফেলে চলে যাওয়া মানুষের কাজ হবে না।

—শেষকালে আমাদের একুল ওকুল দুকুল যাবে। তোমার চাকরীটি গেলে তখন আমাদের কি উপায় হবে?

—তখনকার ভাবনা তখন ভাবব। এখন অন্য ভাবনাই অনেক ভাববার আছে।

—অনুমতি-পত্র তুমি দেখেছ?

—দেখেছি।

মণিমালা একটু ইতস্তত করিয়া বলিয়া ফেলিল—বাবার সইটা ত বাবার বলে বোধ হয় না।

রাখাল বিরক্ত হইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল—মা বলেছেন সে সই শ্বশুর-মশায়েরই। এখন অন্য ভাবনা ছেড়ে দিয়ে মাকে অপমান থেকে বাঁচাতে হবে।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

রাখাল জগদ্ধাত্রী দেবীকে লইয়া পাহাড়পুর হইতে পলায়ন করিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকিবে স্থির করিল। মোকদ্দমা শেষ হইলে ও তখন ওয়ারেণ্টের ভয় না থাকিলে ফিরিয়া আসিবে।

রাখাল আপনার সঙ্কল্প রাণী জগদ্ধাত্রীকে জানাইল তিনি উদাসভাবে বলিলেন—যা হয় কর, আমি কি জানি? হায় কপাল! শেষকালে আপনার বাড়ীঘর ছেড়ে চোরের মতন পালাতে হবে!

বঙ্কবিহারী রাখালকে বলিল—কাপুরুষ নরাধম! পৃষ্ঠ-প্রদর্শন! এই কি বীরধর্ম!

রাখাল বিরক্ত হইলেও কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিয়া বলিল—পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করবেন ত কি মেয়েমানুষকে জেল খাটালে বীরধর্ম্ম রক্ষা হবে?

বঙ্কবিহারী সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল—কেন? মেয়েরা জলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করুক। আমরা সম্মুখ সমরে প্রাণবিসর্জ্জন করি।

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ সম্মুখ সমর করুন। সেই অবসরে আমি মাকে নিয়ে পলায়নই করি।

বঙ্কবিহারী—কাপুরুষ! ভীরু!—বলিয়া রাখালকে গালি পাড়িতে লাগিল।

(৩৬)

পলায়ন করিতে হইবে; কিন্তু পাল্কীর বেহারা পাওয়া যায় না। যাহাকে বলা যায় সেই বলে—এক পেট ভাতের জন্যে কে জান দিবে?

যাকে অনুরোধ করা যায় সেই বলে, কোম্পানির রাজ্য হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর কাহারও প্রজা নহে, কাহারও চোখ-রাঙানি ধমকানির ধার তাহারা আর ধারে না।

তখন অগত্যা ঠিক হইল হাঁটিয়াই পলাইতে হইবে। আজই গভীর রাত্রিকালে।

সন্ধ্যাবেলা পুলিশ আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিল।

রাখাল গিয়া পুলিশের দারোগাকে বলিল—পাড়ার তিন চার জন মেয়ে বেড়াইতে আসিয়া আটক পড়িয়াছে, যদি তিনি দয়া করিয়া তাহাদের বাড়ী চলিয়া যাইতে দ্যান। দারোগা গম্ভীর হইয়া বলিল—কিছু পান খাইতে পাইলে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

দারোগাকে পান খাইবার জন্য হাজার টাকা দিতে হইল।

রাণী জগদ্ধাত্রী ও মণিমালা প্রস্তুত হইয়া চন্দনমণিকে ডাকিল। চন্দনমণি বলিল—পোড়াকপাল! আমি কেন যেতে গেলাম! আমি গেলে কুবেরের এইসব ধনসম্পত্তি আগলাবে কে?

রাখাল বঙ্কবিহারীকে বলিল—আপনি সম্মুখ-সমরের জন্যে থাকছেন ত?

বঙ্কবিহারী বলিল—দিদি যখন পালাচ্ছেন তখন আমি কার জন্যে লড়ব? আমিও দিদির সঙ্গে যাব, তাঁকে রক্ষা করতে হবে ত!

রাখাল হাসি চাপিয়া বলিল—তবে আপনি শিগগির মেয়ে-মানুষ সেজে নিন।

বঙ্কবিহারী স্ত্রীলোকের মতন কাপড় পরিয়া ঘোমটা দিয়া পাড়ার মেয়ে সাজিল। এই বিপদের সময়েও তাহাকে দেখিয়া রাখাল ও মণিমালা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

তখন রাখাল সকলকে বলিল—যে যত পার গহনা পরিয়া লও, তোড়া ভরিয়া টাকা আর মোহর কোমরে বাঁধিয়া লও, টাকার দরকার হইবে।

চন্দনমণি চীৎকার করিতে লাগিল—ওরে বাপরে! আমার কুবেরের টাকা! সব নষ্ট করলে! বাপরে সব লুটে নিলে! আমি চেঁচিয়ে এখনি পুলিশ ডাকব!

রাখাল কিছু না বলিয়া চন্দনমণির দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিল।

বঙ্কবিহারী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"বিপদে পড়িলে বাঘ হরিণের পা চাটে!" চন্দনমণি সয়ে থাক! এর শোধ নেবার দিন আসবে!

যে বাড়ীতে বিবাহের বধূ আসিয়া রাণী হইয়া এতদিন ছিলেন সেইবাড়ী হইতে এতদিনে রাণী জগদ্ধাত্রী অসহায় অকূলে ভাসিলেন।

অসংখ্য দাসদাসীর মধ্যে সঙ্গ লইল শুধু ইনামসিং জমাদার, ঘিসু খানসামা, বিতাড়িত বৃদ্ধা দাসী ইচ্ছা। চারজন বেহারা ফুলচাঁদ, ঝুমকা, ঝড়ু ও কাদুয়া একখানি ডুলি আনিয়া কাঁদিয়া বলিল—অনেক দিন রাণীমায়ের নিমক খাইয়াছি; তিনি হাঁটিয়া পথ চলিবেন ইহা আমরা প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না; রাণীমা ডুলিতে উঠুন।

রাণী জগদ্ধাত্রী ভূপালকে কোলে করিয়া ডুলিতে চলিলেন আর সকলে হাঁটিয়া চলিল। মণিমালার বাপের বাড়ী এখন পরের বাড়ী বলিয়াও বটে, আর মাতা ও স্বামীর সঙ্গে-সঙ্গে থাকিবার জন্যও বটে সেও পলাতকদের সঙ্গে গেল।

বর্ষাকাল। মাঠ ঘাট জলে ভাসিয়া গিয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে পথ ধরিয়া যাইবার জো নাই। রাত্রিকালে মাঠে-মাঠে জল ভাঙিয়া চলিতে হয়; দিনের বেলা কোন গ্রামে লুকাইয়া থাকে। যাহারা না চিনে তাহাদিগকে পরিচয় দ্যায় তাহাদের বাড়ী ঝিকড়গাছিতে, তাহারা জগন্নাথের তীর্থযাত্রী। মণিমালা পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত হইলেও মনে করিয়াছিল এবার তাহাদের দুঃখ ঘুচিল। কিন্তু বিধাতা যে তাহার জন্য নূতনতর দুঃখ সৃজন করিয়া রাখিয়াছিলেন সে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে এই দুঃখে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া মুষড়িয়া পড়িয়াছিল।

ঘুরিতে-ঘুরিতে এক গ্রামে গিয়া সকলে পৌঁছিল, সেই গ্রামে রাজনাথ দেওয়ানের বাড়ী। তাহার নিকট সাহায্য পাইবে আশা করিয়া রাখাল তাহার বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিল।

শুনিয়া বঙ্কবিহারী বলিল—হাঁ অমাত্য-প্রধান অতীব সুজন! উত্তম সঙ্কল্প!

প্রস্তাব শুনিয়া রাজনাথ স্পষ্ট বলিল সে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে চাকরী বাহাল রাখিবার প্রত্যাশা রাখে, অতএব

তাহার দ্বারা কোনো রকম সাহায্য প্রত্যাশা করা মিথ্যা। সে এই পর্য্যন্ত করিতে পারে যে সে ধরাইয়া দিবে না।

সেই দিনের মতো আশ্রয় চাহিলে সে নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহার বাগানের মধ্যে একখানা ভাঙা ঘর দেখাইয়া দিল।

ইচ্ছা-বুড়ি গিয়া বলিল—দেয়ানজি, মুনিবমা একটু শোবেন, যদি একটা বিছানা আর বালিশ দেন।

রাজনাথ মুখ খিঁচাইয়া বলিল—আর বিছানা বালিশ নেয় না। দুদিন বাদে জেলখানায় ইট মাথায় দিয়ে শুতে হবে, এখন থেকে অভ্যেস করতে বলগে।

ইচ্ছার মনের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করিলে সেই নিমক-হারাম লোকের জিহ্বা তখনই খসিয়া পড়িত, তাহার মাথায় সমস্ত আকাশ ভাঙিয়া বজ্রাঘাত হইত।

ঘুরিতে-ঘুরিতে রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রী প্রভৃতিকে লইয়া গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ মণি-মালার আনন্দ ও গর্ব্ব আর ধরে না। একদিন এমনি অসহায় অবস্থায় তাহার মাতা তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া-ছিলেন, আজ মাতাকে তেমনি অসহায় অবস্থায় তাহারই আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে। এ তাহার আপনার গৃহস্থালি, এখানকার কর্ত্রী সেই।

মণিমালা গাঁয়ে পা দিয়াই ছুটিয়া প্রমাদা ও বিন্দিকে দেখিতে গেল। প্রমাদা হাসিতে গিয়া কাঁদিল, বিন্দি তাহার স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গভরে গাহিল—

"তুমি আমার সোহাগ-পাখী, আমি রে তোর পিঁজরা,
আমায় ছেড়ে যাবে কোথায় ওরে কালো ভোমরা।
যে অবধি গেছ তুমি হয়ে আছি কাতরা,
হৃদয়খানি দেখ খুলে হয়ে গেছে ঝাঁঝরা।"

গাহিতে-গাহিতে আজ বড় আনন্দে বিন্দিও সকলের সামনে মন খুলিয়া কাঁদিল।

গাঁ ভাঙিয়া আসিল রাণী দেখিতে; তাহারা রাজকন্যা দেখিয়াছে, রাণী কখনো ত দেখে নাই। এবারও তাহারা হতাশ হইয়া ফিরিল।

বাস্তবিক রাণীর রাণীত্বও ত কিছু ছিল না; তিনি এখন ওয়ারেণ্টের পলাতক আসামী। মেয়ের বাড়ীতেও রাণীর দুর্দিনের বেশী থাকিতে সাহস হইল না। ফরাসী রাজ্য চন্দননগরে গিয়া থাকা স্থির হইল।

(৩৭)

সকলকে চন্দননগরে রাখিয়া রাখাল পাহাড়পুরে ফিরিয়া গেল।

সে গিয়া দেখিল কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস জমিদারীর ভার লইয়া বসিয়াছে। চন্দনমণি অন্দরে জাঁকিয়া বসিয়া নবাবী চালে রাজার মা-গিরি ফলাইতেছে; এবং ভাবী রাজা কুবের একটা চাবুক লইয়া অকারণে যাকে-তাকে মারিয়া-মারিয়া আপনার প্রভুত্ব অভ্যাস করিয়া ফিরিতেছে।

রাখাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহার করিতে মিনতি করিয়া অনুরোধ করিল। সে কারণ দেখাইল যে, রাণী স্ত্রীলোক, তিনি যে ম্যানেজার সাহেবকে খুন করিবার হুকুম দিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না; মোকদ্দমা হইলে আদালতে প্রমাণ হওয়াও সন্দেহস্থল; এক্ষেত্রে তিনি ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহার করিলে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন—আচ্ছা বাবু, এই সর্ত্তে আমি ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহার করিব যে সেই পাগলা বদমায়েস বঙ্ক-বিহারী আসিয়া ধরা দিবে। আমি তাহাকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিব।

রাখাল তাহারও জন্য অনেক অনুনয় করিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, কোনো ফল হইল না।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত কথা রাণী জগদ্ধাত্রীকে বলিল। তিনি শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বঙ্কবিহারী শুনিয়া বলিয়া উঠিল—এ কখনো হতে পারে না। এ ইংরেজের অবিচার! এক অপরাধে দুজনের দুরকম ব্যবস্থা হতে পারে না।

রাখাল ধমক দিয়া বলিল—তা হলে কি আপনার ইচ্ছে যে আপনার সঙ্গে মা সুদ্ধ জেল খাটুন গিয়ে। তা হলেই ইংরেজের সুবিচার হবে!

বঙ্কবিহারী বলিল—না তা নয়! এতে তোমার কিছু কারসাজি আছে! তুমি আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবার অভিলাষ করেছ।

রাখাল বিরক্তি চাপিয়া বলিল—আপনার জেল যাতে না হয় তার জন্যে উকিল ব্যারিষ্টার লাগিয়ে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত

লড়ব। এখন মাকে বাঁচাবার জন্যে আপনি একবার ধরা দেবেন চলুন। আমি বলছি আপনাকে আমি জামিনে খালাস করে আনব!

বঙ্কবিহারী গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিল—এখন আমি অসহায়! যা ইচ্ছে কর। কিন্তু এর প্রতিফল আমি সময় পেলে হাতে-হাতে চুকিয়ে দেবো!

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনাকে আমি ঋণী করে রাখব না। সুদে-আসলে আপনি ঋণ শোধ করবেন, আমি আপত্তি করব না।

রাখাল একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বঙ্কবিহারীকে হাজির করিল। ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন মঞ্জুর করিবেনই না; অনেক বলা কহাতে রাখালের ঝুঁকিতে জামিন মঞ্জুর করা হইল। রাখাল ওয়ারেণ্টের আসামীকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সম্মতি লইয়া একদিন হাজতে আটক রাখিয়া তাহাকেও জামিনে খালাস দিলেন। মকদ্দমা চলিতে লাগিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী এইবার নিরাপদ হইয়া দেশে ফিরিবেন। চন্দননগর হইতে গোসাঁইগঞ্জে আসিয়া গ্রামদেবতা রাধাকান্তের খুব সমারোহ করিয়া পূজাভোগ দিলেন; সমস্ত গ্রামের ভদ্র ও চাষা মেয়ে-পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইল। রাখাল, মণিমালা, প্রসাদী ও বিন্দি ভোর হইতে অর্দ্ধরাত্রিপর্য্যন্ত লোকের পরিচর্য্যা করিয়া বেড়াইল। বৃন্দাবনের ও নারাণদাসীর সম্মান গ্রামে চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

মণিমালা মাকে দিয়া নারাণদাসীকে চেলী ও গহনা, গৌরকে মোহর ও পোষাক, বৃন্দাবনকে গরদের জোড় ও মোহর দেওয়াইল। নারাণদাসী খুসী হইয়া বলিল—হাঁ! এতদিনে টের পেলাম যে নাতবৌ আমাদের রাজার মেয়ে বটে!

গ্রামের ঘরে-ঘরে গরদ চেলী বিলি হইল; গরীব দুঃখীরা যে যাহা চাহিতে লাগিল রাণী জগদ্ধাত্রী তাহাকে তাহা দান করিতে লাগিলেন।

কাঙালী আসিয়া রাখালকে ধরিয়া বসিল—তোমার শাশুড়ীকে বলে যদি আমার একটা চাকরী করে দাও রাখাল!

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীকে গিয়া বলিল—কাঙালী-দাদা আমার পরম উপকারী বন্ধু, সেই আমার চাকরী করে দিয়েছিল। তাকে যদি একটা চাকরী দ্যান।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন—পাহাড়পুরে ওকে নিয়ে চল। কি চাকরীর যোগ্য তুমিই ঠিক করে দিয়ো।

—ওকে ইংরেজি সেরেস্তায় হেডক্লার্ক করে দিলেই হবে, হেডক্লার্ক একজন দরকার আছে।

তাহাই ঠিক হইল। কাঙালী আশাতীত সফলতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

কাঙালী রাখালকে দিয়া চাকরী জোগাড় করিয়া লইয়াই বঙ্কবিহারীর সঙ্গে রাজামামা সম্পর্ক পাতাইয়া তাহার মনোরঞ্জনে লাগিয়া গেল। কারণ কাঙালী বুঝিয়াছিল রাখাল এখন আর পাহাড়পুরের কেউ নয়, বঙ্কবিহারীর দলই প্রধান ও প্রবল।

মণিমালা একদিন রাখালকে বলিল—দেখ, মা বঙ্কমামার সঙ্গে ফিরে যান, তুমি আর পাহাড়পুরে যেও না। তুমি উনাউ যাও।

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল—না, তা কি হয়। ওঁদের পৌঁছে ঠিকঠাক করে দিয়ে আসি। তারপর যা হয় করা যাবে।

—তা হলে তুমি যাও, আমি এখানে থাকি।

—না না, তা হলে মা কি মনে করবেন? মনে করবেন যে আমরা কুবেরের হিংসে করছি। তোমাকেও যেতে হবে।

আবার বিদায়ের পালা। এবার মণিমালা হাসিতে-হাসিতে বিদায় লইয়া বলিল—ভাই ঠাকুরঝিরা, এবার আর কান্না নয়, ধুলো পায়ে লগ্ন, যেমন যাওয়া অমনি ফেরা। আমি শিগগির ফিরব।

তাহাই বিশ্বাস করিয়া বিন্দিও এবার আনন্দের গান গাহিল—

"শুন শুন ওহে পরাণ-পিয়া,
চিরদিন পরে　　পাইয়াছি শ্যাম,
আর না দিব ছাড়িয়া।
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব,
হিয়ার মাঝারে　　যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব।

অগাধ প্রেমের নিগড়ে বাঁধিয়া
রাখিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥"

(৩৯)

বিচারে বঙ্কবিহারীর ছয়মাস জেল হইল। আবার মোকদ্দমা মোশন করা হইল; সে যে ম্যানেজার-সাহেবকে খুন করিবার হুকুম দিয়াছিল বা কেহ তাহার হুকুম অনুসারে ম্যানেজারকে খুন করিতে গিয়াছিল ইহার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না; প্রধান সাক্ষী রাজনাথের কথায় অনেক পরস্পর-প্রতিবাদী উক্তি বাহির হইয়া পড়িল। বঙ্কবিহারী অব্যাহতি পাইয়া গেল।

এই মোকদ্দমা-জয়ের উৎসব শেষ হইয়া গেলেই মণিমালা রাখালকে বলিল—এইবার বাড়ী চল, এখানে এরা ত এখন নিশ্চিন্ত হল।

রাখাল বলিল—দাঁড়াও, আগে পোষ্যপুত্র নেওয়া হয়ে-টয়ে যাক।

মণিমালার বাবা তাঁহার সম্পত্তি কন্যাকে দিয়া যান নাই ইহা যদি সত্য হয়ও, তাহার মা ইচ্ছা করিলে সে সম্পত্তি তাহাকে দিতে পারেন যদি তিনি পোষ্যপুত্র না লন; পোষ্যপুত্র লওয়া না-লওয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন; পোষ্যপুত্র লইতে তিনি যে খুব ব্যস্ত বা ইচ্ছুক তাহাও মনে হয় না; অথচ তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গছাইয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছিল তাহাও ত তিনি প্রতিরোধ করিতেছিলেন না। মণিমালা চোখের সামনে নিজের হকের ধন পরের হস্তগত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেছিল না—তাহার নিজের জন্য নহে, তাহার ভূপাল রাজার দৌহিত্র হইয়াও গরিবের ছেলে হইয়াই যে থাকিবে এই দুঃখ তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। কিন্তু রাখাল বুঝিতে পারিতেছিল না মণিমালা কেন তাহার বাপের বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেছে। সে কেবল ইহাই দেখিতেছিল যে এতবড় জমিদারীটার একটা পাকা বন্দোবস্ত না করিয়া দিয়া তাহার কোথাও নড়া উচিত নয়; পাছে তাহার শাশুড়ী আবার কোনো বিপদে পড়েন।

রাখালের পিসশ্বশুর শ্রীকৃষ্ণ পাহাড়পুরে আসিয়া রাখালকে বলিলেন—বাবাজী, নিজের পায়ে নিজে কি এমনি করেই কুড়ুল মারতে হয়? কোথাকার কে একটা টোঙর এসে তোমার শ্বশুরের সম্পত্তি দখল করে বসছে, তুমি চুপ করে তাই দেখছ? ইনাম-সিং জমাদারকে বল—দুহাতে বঙ্কা আর কুব্‌রার গর্দ্দানা ধরে পাহাড়পুর থেকে দূর করে দিক!

রাখাল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—পিসে-মশায়, আপনি আমাকে অধর্ম্ম করবার পরামর্শ দিতে এসেছেন! আমার শ্বশুরের পোষ্যপুত্র নেবার অনুমতি-পত্র পাওয়া গেছে। এক পোষ্যপুত্র অবর্ত্তমানে পাঁচটি পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র নেবার অনুমতি আছে।

—ও অনুমতি-পত্র ত জাল, বঙ্কার তৈরি।

—মা বলেছেন সই মহারাজার। আর নাই হোক সই মহারাজের; মহারাজ অবর্ত্তমানে সম্পত্তি মায়ের হয়েছে, তিনি যাকে খুসী তাঁর সম্পত্তি দেবেন। মা ইচ্ছা করলে পোষ্যপুত্র না নিয়ে মেয়েকে নাতিকে বিষয় দিতে পারতেন; কিন্তু তাঁরও সে-রকম ইচ্ছের কোনো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এক্ষেত্রে বিষয় নিতে হলে আমাকে হয় চুরি করে অনুমতিপত্র নষ্ট করতে হয়, নয় ঠেঙাড়ে হয়ে একে একে পাঁচ-পাঁচটা পোষ্যপুত্রের মাথায় লাঠি মারতে হয়, নয় শাশুড়ীর বিরুদ্ধে আদালতে জালিয়াতির নালিশ করতে হয়। আপনার কি ইচ্ছে আমি এইসব করি! আমাকে কি এমনি অধার্ম্মিক মনে করেছেন! আর যাকে পোষ্যপুত্র নেওয়া হচ্ছে সে ত যে-সে পর নয়, সে আপনার পিসির সম্পত্তি পাবে—মা আর পিসি-মাসিতে কি খুব তফাত?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ওগুলির মধ্যে একটিও করতে হয় না—কেবল এইটুকু মাত্র প্রমাণ করতে হয় যে উইলটা জাল এবং রাণী করেননি। তিনি যে রাজার সই স্বীকার করেছেন তা undue influence বশতঃ বা ভাইকে বাঁচাবার জন্যে। সেটুকু করতে পারলে অধর্ম্ম করা তো হবেই না, বরং অধর্ম্মের নিবারণই হবে। তুমি যা বলছ তাতে ধর্ম্মজ্ঞান কতটুকু প্রকাশ পাচ্ছে বলা যায় না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের একান্ত অভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

রাখাল চটিয়া বলিয়া উঠিল—আপনি আমাকে প্রলোভন দেখাতে এসেছেন? আমি আপনার কোনো পরামর্শ শুনতে চাইনা।

এইকথার পর শ্রীকৃষ্ণ রাখালকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি মুখ কাচুমাচু করিয়া রাখালের কাছ হইতে অন্দরে মণিমালার কাছে গেলেন।

মণিমালাকে বলিলেন—মণি, ঘরে আগুন লাগাচ্ছে আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিস? মাকে পুষ্যিএঁড়ে নিতে বারণ কর না।

মণিমালা দৃপ্তভাবে বলিল—পিসে মশায়, কেঁদে মান আর যেচে সোহাগ? সে আমার চাইনে।

— তোর ভূপালের কি অবস্থা হবে?

—ভূপাল বেঁচে থেকে লেখাপড়া যদি শিখতে পারে ভালোই, নয়ত মাথায় মোট বয়ে রোজগার করবে।

—রাজার নাতির পক্ষে সেটা কি খুব গৌরবের হবে মণি।

—নিজের পরিশ্রমে নিজের উপার্জ্জন খাওয়া যদি গৌরবের না হয় তবে কি ভিক্ষা করে পরের অনুগ্রহ পাওয়া গৌরবের হবে পিসেমশায়!

—রাজা ধনেশ্বরের ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা নগদ জমা ছিল। জামাই ইচ্ছে করলে সেটা ত নিতে পারে। সে টাকাটা ত এখন জামাইয়ের হাতেই আছে!

—পিসেমশায়, আমার স্বামী চোর নন!

শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন রাখালের হাতে পড়িয়া মেয়েটার সুদ্ধ মতিগতি বিগড়াইয়া গিয়াছে দেখিতেছি! তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলেন।

(৩৯)

মহাসমারোহ করিয়া পুত্রেষ্টি যাগের আয়োজন হইতে লাগিল। ভাটপাড়া নবদ্বীপ ও কাশী হইতে পণ্ডিত, কলিকাতা হইতে যাত্রা থিয়েটার বাজি, লক্ষ্ণৌ হইতে নহবৎ, নানাদেশ হইতে দ্রব্যসম্ভার আসিয়াছে, পাহাড়পুরে মেলা বসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে বড় বড় চালাঘর করিয়া বহু তাম্বু ফেলিয়া নিমন্ত্রিতদের বাসা দেওয়া হইয়াছে। ডিভিজনের কমিশনর, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া গোলাপবাগের মধ্যে বড় বড় তাঁবুতে আছেন।

যাগের আগের দিন রাখাল বঙ্কবিহারীকে বলিল—আজকে একবার কুবেরকে নিয়ে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসুন।

বঙ্কবিহারী বলিল—স্বাধীন নৃপতির ওসকলের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি ঐসমস্ত অবিচারক অত্যাচারীদের মুখদর্শন করি না।

আসল কথা বঙ্কবিহারী স্বাধীন নৃপতির চাল চালিতে গিয়া যে বিষম দায়ে ঠেকিয়া গিয়াছিল তাহারই ভয়ে সে সাহেবদের কাছে ঘেঁষিতে আপত্তি করিল।

রাখাল হাসিয়া বলিল—স্বাধীন নৃপতি হয়ে থাকলে নৃপতি শিগগিরই গজভুক্ত কপিত্থ হয়ে যাবেন। আপনি না যান আমি নিয়ে যাব।

বঙ্কবিহারী আর আপত্তি করিল না; রাজনাথের বিশ্বাসঘাতকতায় ঠেকিয়া শিখিয়া সে এখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া ছোট দেওয়ান দীনদয়ালকে আশ্রয় করিয়াছে। বঙ্কবিহারী দীনদয়ালকে বলিতে লাগিল—এ সমস্তই রাখালের হিংসা! কিসে স্বাধীন নৃপতিকে অপমান করবে তারই চেষ্টা! আচ্ছা, আচ্ছা, এ সমস্তই তোলা থাকছে!

কুবের ও ভূপালকে লইয়া রাখাল কমিশনর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কুবেরকে চন্দনমণি খুব জাঁকজমকের পোষাক পরাইয়া দিয়াছিল; তাহার কুশ্রী চেহারার উপর সেই দামী পোষাক যেন তাহার পৈতৃক দারিদ্র্যকে ও তাঁহার অনভিজাত্যকে বেশী করিয়া ঘোষণা করিতেছিল, যেন সে যাত্রার দলের ছোকরা! আর ভূপালকে মণিমালা নিতান্ত সাদাসিধা পোষাকে সাজাইয়া দিয়াছিল, তাঁহাতেই তাহার কমনীয় প্রিয়দর্শন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাখাল তাহাদিগকে লইয়া যাইতে-যাইতে শিখাইতে লাগিল—দেখ, সাহেবদের কাছে গিয়ে প্রথমে নমস্কার করবে; সাহেবেরা হাত বাড়িয়ে দিলে তোমরাও হাত বাড়িয়ে দেবে; বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকবে, ছটফট করবে না।...

রাখাল প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিল; তাঁহার সহিত তাহার পূর্ব্বকার পরিচয় ছিল; তিনি

সম্মান করিয়া রাখালকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাখালের অভিপ্রায় শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া কমিশনরের কাছে লইয়া গেলেন।

কমিশনরের সম্মুখে গিয়া শিশু ভূপাল হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। কুবের করিল না, আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কমিশনর তাহা লক্ষ্য করিলেন। কমিশনর হাসিয়া তাহাদের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন, ভূপাল হাত বাড়াইল, কুবের হাত বাড়াইল না। কমিশনর তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন। ভূপাল স্থির হইয়া বসিল। কুবের বসিল না, সে একবার চেয়ারের উপর পাতা লোমশ চামড়াখানা তুলিয়া দেখিল; তাম্বুর কোণে একটা পিয়ানো ছিল, দৌড়িয়া গিয়া তাহাতে দুবার টুংটাং করিল; তারপর রাখালের ধমকে মুখ গোঁজ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া মুখ বিকৃত করিয়া নাক খুঁটিতে লাগিল।

কমিশনার ভূপালকে দেখাইয়া বলিলেন—রাণী বুঝি এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নেবেন?

—আজ্ঞে না, এ আমার ছেলে।—বলিয়া রাখাল কুবেরের দিকে ঘুরিয়া নাক হইতে তাহার হাত টানিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—এইটি রাণীর ভাইয়ের ছেলে, রাণী একেই পোষ্যপুত্র নেবেন!

—নিজের মেয়ের এমন সুন্দর ছেলে থাকতে রাণী পোষ্যপুত্র নেবেন কেন?

—স্বর্গীয় রাজার হুকুম আর রাণীর নিজের খুসী।

—পোষ্যপুত্র যদি নিতেই হয় তবে নিজের মেয়ের এমন সুন্দর সভ্যভব্য ছেলে থাকতে অপরের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নিচ্ছেন কেন?

—আজ্ঞে আমাদের হিন্দু আইন অনুসারে মেয়ের ছেলেকে পোষ্যপুত্র নেওয়া যায় না। আরও, আমার ছেলে হয়েই ও জন্মেছে, আমার ছেলেই ও থাকবে।

—আমি আপনার পরিচয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে পেয়েছি। উনাউএর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রাইলী আপনাকে নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরী দিয়েছিলেন তাও শুনেছি। মিঃ রাইলী আপনাকে যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার কাছে তা দেখেছেন বলছিলেন। এখন আপনাকে দেখে আর আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমি বিশেষ মুগ্ধ হলাম। পাহাড়পুর রাজ-সংসারে দেখছি একমাত্র আপনিই লেখাপড়া জানা লোক; ভাবী পোষ্যপুত্রের বাবা শুনেছি আধপাগলা বড় বদ লোক। আমাদের ইচ্ছে যে আপনাকেই আমরা রাণীর পোষ্যপুত্রের টিউটার গার্জ্জেন নিযুক্ত করি। আপনার কি মত?

—আপনারা যদি আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, আমি যথাসাধ্য কর্ত্তব্য করব। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ছেলেকে শিক্ষিত করা ত আমার কর্ত্তব্য বলেই মনে করি।

—আপনাকে যদি আপাতত আড়াই শত টাকা বেতন দেওয়া হয়......

—মাপ করবেন, আমি বেতন নিয়ে কাজ করতে পারব না। আমি অমনই করব—এ আমার শ্বশুরের পুত্র-স্থানীয়, তাকে শিক্ষণ রক্ষণের জন্যে আমি বেতন নিতে পারব না।

—তা হলে আপনাদের একটা মাসহারা ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার হবে।

—আপনারা সে সম্বন্ধেও কোনো চেষ্টা না করলে আমি অনুগৃহীত হব। আমি কারো কাছ থেকে জোর করে বা ভিক্ষে করে কিছু নিতে পারব না।

—তা হলে কি মেয়ে জামাই বিষয় থেকে একেবারে বঞ্চিত হবে?

—সে কথা রাণী নিজে বিবেচনা করবেন।

সাহেবেরা রাখালের নিঃস্বার্থ তেজস্বী স্বভাবের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। রাখাল তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় হইল।

পথের ধারে একজন লোক পথের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিল। কুবের তাহার কাছে আসিয়া হঠাৎ তাহার পিঠে লাথি মারিল; সে বেচারা উঁচু-বাঁধা পথের নীচে পগারে গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

রাখাল ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কুবেরকে বলিল—তুমি ত ভারি বদ ছেলে! ওকে শুধুশুধু মারলে কেন?

কুবের গোঁজ হইয়া বলিল—আমি রাজা! আমার সামনে তামাক খাচ্ছিল, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল না!

রাখাল আর রাগ চাপিতে পারিল না, কুবেরের কান

মলিয়া দিয়া বলিল—এরই মধ্যে রাজাগিরি ফলাতে আরম্ভ করেছ ষ্টুপিড। এমনি করে তুমি প্রজাপালন করবে?

কুবের রাখালের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মনে মনে বলিল—আগে রাজা হই, তারপর কানমলার মজা টের পাইয়ে দেবো!

পরদিনই সে রাজার ছেলে হইয়া গেল। ভবিষ্যতে তাহার রাজা হওয়া রদ করিবার সাধ্য তখন এক যম ছাড়া আর কাহারও রহিল না। এখন হইতে কুবেরকে তাহার পিতার নাম রাজা ধনেশ্বর চৌধুরী বলিতে হইবে, বঙ্কবিহারী মজুমদার তাহার পিতৃপদ হইতে খারিজ হইয়া গেল।

রাজার দৌহিত্র বিষয়ের অধিকারী হইবে বলিয়া যাহার নাম রাখা হইয়াছিল ভূপাল, সে এখন নিঃসম্বল দরিদ্র। আর দরিদ্রের কুঁড়েঘরে যাহার জন্ম হইলেও নাম পাইয়াছিল কুবের, সে ঘটনাচক্রে ধনেশ্বরের উত্তরাধিকারী হইয়া তাহার নামটাকে সার্থক করিয়া তুলিল। ইহাকেই বলে ভাগ্য!

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ

বর্ত্তমানের আলোকপাত ব্যতীত অতীত কালের বর্ণভেদ বুঝা সুকঠিন। এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। আমাদের সম্মুখে যুগল-সমস্যা উপস্থিত:—

ঐতিহাসিক যুগে, হিন্দুবর্ণসমূহের পূর্ব্বতন অবস্থা কিরূপ ছিল?

প্রারম্ভকাল মাত্রই অন্ধকারে আবৃত হওয়ায়, ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়া, এই প্রতিষ্ঠানটির মূল-উৎসে আরোহণ করা কি সাধ্যায়ত্ত?

অতএব, প্রথমে ঐতিহ্য হইতে বর্ণভেদ সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব; প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ হইতে ও সাহিত্যিক প্রমাণ-পত্রাদি হইতে আমরা পরীক্ষা করিব। অতীতের সম্বন্ধে এস্থলে শুধু একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। সাক্ষ্যসমূহের পরিসর ও লক্ষণাদি ঠিক নির্দ্দেশ করা—ইহা একটা দুরূহ কার্য্য; এই পথে অতীব সতর্কতার সহিত, অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইবে।

বিচারের হিসাবে, হিন্দুর সামাজিক জীবন কতকগুলি গ্রন্থের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। এই-সকল গ্রন্থের রচনাকার্য্য সেই-সকল মুনিঋষির প্রতি আরোপিত হয় যাঁহারা ন্যূনাধিক পরিমাণে পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভূত—মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি। তাঁহারা সামাজিক গঠন-পদ্ধতি ও অপরাধের দণ্ডপদ্ধতিকে যে আসনে স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতেই উহা ব্যবস্থা-শাস্ত্র,—অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে "ধর্ম্ম-শাস্ত্র" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর আইন-সংহিতার অন্বেষণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই আইন-সংহিতার না আছে উৎপত্তিস্থান, না আছে রূপ, না আছে প্রামাণিকতা। সমাজের প্রাচীন গঠনাদি প্রায় সর্ব্বত্রই গোড়ায় পারমার্থিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে; পরে তাহা হইতেই লৌকিক পদ্ধতি প্রস্ফুটিত হইয়া সেই পারমার্থিকের স্থান অধিকার করে। কিন্তু ভারতবর্ষে পারমার্থিকের স্থান লৌকিকের দ্বারা ততটা অধিকৃত হয় নাই। হিন্দুসমাজ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রথার দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে। মুখ্যতঃ ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্মোপদেশেরই সংগ্রহ মাত্র। আইন প্রণয়নের অসদ্ভাবে, এবং ব্রাহ্মণদিগের চির-বিবর্দ্ধমান আধিপত্যের প্রভাবে, উক্ত উপদেশগুলি অবশেষে রাজসরকার হইতে, ও জনসাধারণ হইতে একপ্রকার মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। এই মঞ্জুরী বিলম্বে আসিয়াছিল—এবং কতকগুলি নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ যে হয় নাই তাহাও নহে। উহাদিগের ইতিহাসে ইহা একটা গৌণকল্পের ক্রমবিকাশ। আদিম লক্ষণগুলি যে সুনিশ্চিতরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল এরূপ বলা যায় না।

উহারই সমান্তরাল-রেখায় মহাকাব্যগত ঐতিহ্যের প্রবাহও প্রবাহিত হইতেছে। উৎপত্তির হিসাবে অতীব প্রাচীন, ও প্রতিসংস্করণের দরুণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক—এই ঐতিহ্য, অস্পষ্ট-নির্দ্দিষ্ট অথচ অতিবিস্তৃত একটা কাল-বিভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বরূপতঃ ঐই ঐতিহ্য, অধিবাসী লোক হইতে ভিন্ন অপর কোন এক অংশ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। তথাপি, উহার বিশাল কাঠামের

মধ্যে শুধু যে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিবরণগুলি গৃহীত হইয়াছে তাহা নহে, মতবাদসংক্রান্ত উপদেশের জন্যও উহার দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। তা ছাড়া, এই ঐতিহ্য এমন যুগে গড়িয়া উঠে যখন ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, ব্রাহ্মণপ্রদত্ত উপদেশের প্রামাণ্য, সর্ব্বপ্রকারে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিসংস্করণের দ্বারা এই ঐতিহ্য প্রত্যক্ষভাবে আবার ব্রাহ্মণে গিয়াই পৌঁছিয়াছে, ব্রাহ্মণের অব্যবহিত প্রভাবে গিয়াই পৌঁছিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত উহার অসংখ্য সাদৃশ্য—অনেক সময় আক্ষরিক সাদৃশ্য—পরিলক্ষিত হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে, বিশেষতঃ মনুসংহিতা হইতে, অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। মহাকাব্যের বিষয়টা যদিও স্বাজাত্যমূলক, উহার ভাষা যদিও "পণ্ডিতী" ভাষা, তথাপি উহার উক্তি সকল-লোকের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও সামরিক কাহিনী হইতেই মূল বিষয়টা গৃহীত হইয়াছে তথাপি পৌরোহিতিক ঐতিহ্যের সহিত মহাকাব্য খুব মাখামাখি ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রটা এত বৃহৎ, বর্ণনা এত বিচিত্র, যে উহার মধ্যে কিছু কিছু অসংগতি অলক্ষ্যে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারে না। সব ধরিতে গেলে, যেসব নিয়ম পরিঘোষিত হইয়াছে, যে পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে, যে প্রামাণিকতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে সে সমস্তই দুই পক্ষেই অনেকটা সমান।

ছোটখাটো অনৈক্যগুলি ধর্ত্তব্যের মধ্যে আনিয়াও, কোন গুরুতর অনৈক্যের আশঙ্কা না করিয়া, স্বতন্ত্র দুই পর্য্যায়ের দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে যে চিত্র আমাদের নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে, সেই সমগ্র চিত্রটি আমরা এক নজরেই দেখিয়া লইতে পারি।

উহা হইতে যে মতবাদ বাহির হইয়াছে তদনুসারে আমরা দেখিতে পাই, একটি সমাজ, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বর্ণে বিভক্ত, এবং বর্ত্তমানকালের বর্ণভেদের যেসকল নিয়ম,—অনেকটা সেই-সকল নিয়মের দ্বারাই পরিশাসিত। প্রত্যেক জাতের জন্য যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বিভিন্ন ও সীমাবদ্ধ।

বিবাহের নিয়ম খুব যত্নের সহিত নির্দ্ধারিত হইয়াছে। স্বজাতের অন্তর্গত কেবল একটিমাত্র পত্নী, পারিবারিক অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদিতে স্বীয় স্বামীর সাহায্য করিতে পারে। সেই পত্নী হইতেই পুত্র, পিতার সমান পদমর্য্যাদা নিশ্চিন্তরূপে প্রাপ্ত হয়। তেমন উচ্চ জাতের নহে এমন কোন মাতার গর্ভে জন্মিলে সেই পুত্র, মাতার যে জাত সেই জাতে পতিত হয়। পিতৃধনের ভাগ তার হিস্‌সায় কম হইয়া পড়ে। অতএব অন্তত প্রথম পত্নী, পতির যে-জাত সেই জাতেরই হওয়া উচিত। তাছাড়া পিতৃগোত্রে কিংবা মাতার নিকট-সম্পর্কের কাহারও সহিত সেই পুত্রের বিবাহ নিষিদ্ধ। খাদ্যের সম্বন্ধে যে-সকল সামগ্রী সেব্য ও যে-সকল সামগ্রী নিষিদ্ধ তাহা সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। মাদক দ্রব্য সেবন, প্রায়শ্চিত্ত-বিহীন পাতকসমূহের মধ্যে ধৃত হইয়াছে। কোন অস্পৃশ্য জাতের এক দৃষ্টিমাত্রেই ভোজনের দ্রব্য কলুষিত হয়। তবে কখন কখন যে তাহার হাত হইতে খাদ্যসামগ্রী গৃহীত হয় সে নিতান্ত ব্যতিক্রমস্থলের হিসাবে, উপেক্ষা-দৃষ্টির ফলে। তাহার হাতের দান পর্য্যন্ত—(এই নিয়মটা, সত্য কথা বলিতে কি, অনেকটা বাঁকিয়া-চুরিয়া ফেলা হইয়াছে) কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। বিশেষ বিশেষ কতকগুলি প্রথা ব্রাহ্মণ পুণ্যকর্ম্মের সামিল করিয়া তুলিয়াছে :—ঋতুমতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য ; বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ।

জাত হইতে বহিষ্করণই সর্ব্বপ্রধান দণ্ড। সাধারণত ইহা পুনর্ব্বিচার-বিরহিত নহে। সমাজে আবার ফিরিয়া আসিবার জন্য ধাপে-ধাপে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। কিন্তু "পাতক ও উপপাতক" (যাহার দ্বারা পতন হয়) এই গুরুতর অপরাধের নামেই বুঝা যায়, স্বজাত হইতে পতনই উহার স্বাভাবিক ফল।

দেখা যায়, বর্ত্তমানকালের পর্য্যবেক্ষক, জাত-সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রাচীনকালের তথ্যাদির আশ্চর্য্য মিল আছে। কিন্তু উহার মধ্যে খুব একটা বড় রকমের প্রভেদ আছে। বর্ত্তমান ভারতের বাস্তব-জীবনে যেটা খুব চোখে পড়ে সেটা এই—জাতের সংখ্যা অগণ্য, উহাদের মধ্যে সাঙ্কর্য্য ও বিশৃঙ্খল মিশ্রণ ঘটিয়াছে। শাস্ত্রের কথা অনুসারে চারিবর্ণের অধিক বর্ণ নাই :—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র। দাসশ্রেণী শূদ্রেরা

সর্ব্বপ্রকার নীচ কাজে প্রবৃত্ত। বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও প্রতিগ্রহ ছাড়া ব্রাহ্মণের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। প্রভুত্ব করা, প্রজাপালন করা, ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান এবং বেদাধ্যয়ন ইহাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। বৈশ্যের কর্ত্তব্য—গোপালন, ভূমিকর্ষণ, বাণিজ্যব্যবসায়, ভিক্ষাদান। তবে, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও শাস্ত্রাধ্যয়নও বৈশ্যের অবহেলার জিনিস নহে। শূদ্রের প্রধান কাজ উচ্চতর বর্ণসমূহের সেবা করা। এই কাঠামের বাহিরে, কতকগুলি বর্ব্বর ও অস্পৃশ্য লোক আছে যারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, ব্রাহ্মণ্যিক সমাজে প্রবেশ করিতে পায় না; আর আছে কতকগুলি বৈদেশিক ম্লেচ্ছ।

কার্য্যত এই অনুশাসন-ব্যবস্থার মূল্য কি? প্রাচীন প্রথার প্রামাণ্য ও মর্ম্মানুসরণই এই প্রশ্নের মূলে বর্ত্তমান।

প্রথমে একটা কথা বলিয়া রাখি। এই অনুশাসনগুলি ধর্ম্মমত-সুলভ দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইলেও, নিয়মপদ্ধতির সাজে সজ্জিত হইলেও, সহজেই দেখা যায় কতকগুলি খুঁটিনাটি উক্তির দ্বারা উহাদের অনেকগুলি অনিশ্চয়তা, অনেকগুলি রন্ধ্র ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। গণ্ডির বাহিরে যাইবে না এইরূপ একটা "জোর হুকুমের" আবরণে প্রামাণিকতার দুর্ব্বলতা ও ব্যবহারিক শৈথিল্যকে গোপন করা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্রও এইরূপ লক্ষিত হয়। এই-সকল অনুশাসনের মঞ্জুরী ভাসা-ভাসা রকমের, তেমন ঠিক্ করিয়া কিছুই বলা হয় না। আরও গুরুতর দোষ—পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি। প্রত্যক্ষ অথবা গূঢ়ভাবে, বচন হইতে বচনান্তরে, এই-সকল অসঙ্গতি প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়।

এই জাতিতন্ত্রে চার জাতের কথাই আছে। চারিজাত ছাড়া পাঁচ জাত নাই আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি। যতপ্রকার মিশ্রন সম্ভব কল্পনা করিয়া, এই-সকল জাতের মিশ্রণ হইতে নূতন নূতন সঙ্কর জাত বাহির করা হইয়াছে। উচ্চতম জাতের রমণীর সহিত নিম্নতম জাতের পুরুষের সংসর্গের ইতর-বিশেষ অনুসারে প্রত্যেক জাতের নিম্নতার ধাপ নির্ণীত হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে। একই জাতের অন্তর্ভূত দম্পতির সন্তান হইলেও, অবশ্যপালনীয় ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে তাহারা পতিত হয়। তাহারা এক-একটা ব্রাত্য শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠে। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইতে নির্গত হইলে তদনুসারে ব্রাত্যগণ সুবিন্যস্ত শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত হইয়া কতকগুলি পৃথক্ জাতে পরিণত হয়। এই নিয়মপদ্ধতির মধ্যে একটা কৃত্রিম অনুশাসনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই প্রত্যেক উপবিভাগের এক-একটা পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেকেরই পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায়।

উহারা কতকগুলি নমুনা মাত্র সন্দেহ নাই। এই মিশ্রণ হইতে, এই জটিলতা হইতে বুঝা যায়,—যাহাদের নাম করা হইয়াছে তাহা ছাড়া আরও অনেক উপবিভাগ আছে। কোন স্মৃতি-সংহিতায় যে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ উপবিভাগ অসংখ্য—সে কথা নিশ্চয়ই যুক্তিসিদ্ধ। (১)

শাস্ত্রবচনের সরলতা হইতে দেখ আমরা কতটা দূরে চলিয়া গেছি!

আর কিছু না হউক, চারি জাত অন্তত তাহাদের বিশেষ-বিশেষ কাজের মধ্যে কঠোরভাবে বদ্ধ থাকিতেও পারে। কিন্তু তাহার মধ্যেও দেখ কত ত্রুটি-পূরণের ইঙ্গিত! ব্রাহ্মণ্যিক সমাজতন্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে, প্রত্যেক উচ্চ জাতের জীবনযাত্রার এক-একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। কিন্তু উচ্চ জাতের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন কাজ করিলে যে অপমান হয়, "আপদ্ধর্ম্মের" উল্লেখ করিয়া সেই অপমানকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ভুল বুঝিও না; এটা একটা নিদান পক্ষের কথা নহে, ব্যতিক্রম স্থলের কথা নহে,—ইহা খুব সচরাচর জীবনের কাজে পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রবচনের মান বজায় রাখিবার জন্য ইহা একটা পষ্টাপষ্টি ছল মাত্র—মাল-বোঝাই শাস্ত্রের নৌকা ডুবি হইলে আবার উহাকে কোনপ্রকারে উদ্ধার করিবার চেষ্টা। শ্রাদ্ধের ভোজে যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ, তাহাদের তালিকা পাঠ করিয়া দেখা যাক:—চোর, কসাই, ভৃত্য, গায়ক, জুয়াখেলার আড্ডাধারী, এবং আরো অনেক ব্যবসায়ের লোক, সাধারণতঃ এই তালিকাভুক্ত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের কালের ন্যায় তখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে অসংখ্য-প্রকার উপজীবিকা ছিল। "ব্রাহ্মণ যে-কোন কাজে নিযুক্ত হউক না কেন, ব্রাহ্মণকে ভূদেবতা বলিয়া বিবেচনা

(১) বিষ্ণুস্মৃতি, ১৬।৭

করিবে"—এই কথা ঘোষণা করিয়া মনু দূরদৃষ্টি ও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

আদর্শ জাত হইতে যেসকল ব্রাহ্মণ বহিষ্কৃত হইত, তাহারা আজকালের মতোই, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ, কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ জাতে বিভক্ত। মনে হয় মনু এ-সমস্ত কিছুই জানিতেন না। এই-সকল জাত সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নাই। অতএব তিনি সমস্ত তথ্যগুলি জড়ো করিয়া একটা সমগ্র চিত্র দিবেন এরূপ গর্ব্ব তাঁহার ছিল না। একটা কাল্পনিক সমগ্রতা বজায় রাখিয়া জাতের মূল-আদর্শটা দেখাইয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন।

স্বজাতের লোক ছাড়া আর কাহারও সহিত রীতিমত বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু, কতকগুলি বিবাহ-অনুষ্ঠানের জন্য, উত্তরাধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি সম্ভাব্য ঘটনার জন্য, নিম্নতর জাতের রমণীকে অন্ততঃ শাস্ত্রের গৌণ নিয়মানুসারে বিবাহ করিবার সম্মতি দিবার উদ্দেশে যেসকল নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই-সকল নিয়ম হইতে এবং সঙ্করজাতিসংক্রান্ত সমস্ত মতবাদ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যবহার-কালে সাধারণ নিয়মটাও তেমন কড়াক্কড়ির সহিত সমান ভাবে প্রযুক্ত হইত না।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শূদ্রার সহিত বিবাহ বারংবার দৃঢ়তার সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি ইহাতেও স্পষ্ট দেখা যায়, অনেকটা রফা-রফি করিয়া নিয়মলঙ্ঘনের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আহারের নিয়ম সম্বন্ধে ত এইরূপ উপদেশ থাকিবার আরও যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে।

পরিশেষে কতকগুলি বিশেষ স্থল ছাড়া, সাধারণত মাংস আহারের নিষেধ-নিয়মটা উপেক্ষিত হইয়া থাকে। যে সুরাপান অন্য অন্য স্থলে খুব জোরের সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই বিষয়ে আবার কোন কোন স্থলে পুরুষার্থ লাভের পক্ষে ভাল এইরূপ একটা সাদাসিধা হিতোপদেশ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ক্রমাগত প্রথা দৈবপ্রামাণ্যের দ্বারা সমাবৃত হইলেও তাহা ভাঙ্গিবারও কতকগুলি নিয়ম আছে। সূত্রগুলি মনে হয় যেন একেবারে অনতিক্রমণীয়; কিন্তু অনেক স্থলে, সেই সূত্রগুলিই আমাদের জানাইয়া দেয় যে, আসল নিয়ম ব্যবহারের মধ্যেই অবস্থিত; প্রত্যেক ধর্ম্মের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহার, প্রত্যেক জাতের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহারই প্রকৃত নিয়ম, প্রকৃত আইন; এই-সকল ব্যবহার অনুসারেই আইন ও পরোয়ানা জাহির করা ধর্ম্মশীল রাজার কর্ত্তব্য। অনেক পরিমাণে আজিকার দিনেও এই কথা সত্য বলিয়া মনে হয়। সমস্ত অতীত ভারত এই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত ছিল:—যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে সেই-সকল বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন; এবং তাঁহাদের কথাটাই ঠিক্। (মণ্ডলিকের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

"বিশুদ্ধ আচরণ হইতেই উচ্চ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়"—এইরূপ বচনের অভাব নাই। বর্ণসঙ্কর সমস্ত উত্তর-বংশকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। (মহাভারত বনপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব)। পূর্ব্ববর্ত্তী উন্নততর যুগে জাতের নিয়ম ঠিক্ রক্ষিত হইয়াছিল,—এ কথাও অন্য কতকগুলি লোক অস্বীকার করেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, বাস্তব-পক্ষে শাস্ত্রীয় নিয়ম কতটা স্থিতিস্থাপক ছিল।

মহাকাব্য হইতেও এইরূপ ধারণা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় মহাকাব্যেরও ঠিক্ একই রকমের অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। বিষয়টা বড়ই কৌতূহলজনক। বিশেষতঃ মহাকাব্যাদির বিবরণে, এমন অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে যাহা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী। সকল ব্যবসায়ের মধ্যেই অলঙ্ঘ্য প্রভেদ বিদ্যমান এই কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি, তথাপি মহাভারতে দেখা যায় সকল জাতের লোকই যুদ্ধে যোগ দিতেছে;—ব্রাহ্মণ হইলেও দ্রোণ এই যুদ্ধের একজন প্রধান নেতা, গোপালপুত্র হইলেও কর্ণ একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি। শূদ্রবংশজাত হইলেও যযাতি ও বিদুরের সম্মান কম নহে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের মধ্যে,—বড় লোক ও খুব নীচ জাতের লোকের মধ্যে, বিবাহ হইতে প্রায়ই দেখা যায়। ক্ষত্রিয় যুবকেরা যাহারা সচরাচর ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে সেই উপদেশানুযায়ী কাজ করিতে বড় একটা দেখা যায় না। যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে মদ্য মাংস সেবনের নিষেধ-নিয়ম পালন করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্তও কম দেখা যায়। অথচ নিয়ম কাহারও অবিদিত নাই। অনেক সময়ই তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত নিষেধবাক্য ও

নিন্দাবাদ আখ্যানের মধ্যে বিবৃত হইয়া থাকে। তাহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে ঐ-সকল নিয়মলঙ্ঘন প্রায়ই হইত। ইহার পর আমরা আর বিস্মিত হইব না—যদি দেখি রাজাদের মধ্যে সকল জাতের লোকই আছে। এমন কি মনু নিজেই বলিয়াছেন, শূদ্র, রাজার ক্ষমতা পরিচালন করিতেছে,—এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে, অবাস্তব নহে। (মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র)।

ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি মহাকাব্যের এরূপ স্বভাবসিদ্ধ পক্ষপাতিতা যে, যে-প্রাধান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্য খুব সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা মহাকাব্য ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর প্রতি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আরোপ করিয়াছে। সময়-বিশেষে মহাকাব্য ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যকীর্ত্তনও কম করে নাই। মাতঙ্গের ইতিহাস দেখ। মাতঙ্গের বিশ্বাস, সে ব্রাহ্মণসন্তান। বাস্তবপক্ষে তাহার জন্মদোষ ছিল; শূদ্রের ঔরসে তাহার জন্ম হয়; আসলে সে জাতের বাহির। অলৌকিক উপায়ে তাহার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, নিজ পদমর্য্যাদা ফিরিয়া পাইবার জন্য সে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু শত শত বৎসর তপস্যার কষ্ট সহ্য করিয়াও কোন ফল হইল না। বৃথাই শত বৎসর কাল সে এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দ্রের টনক্ নড়িল। ইন্দ্র দৌড়িয়া তাহার নিকট আসিয়া ভাল ভাল বর দিতে চাহিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত ব্যক্তি যে-একটি মাত্র বর চাহিল তাহা ইন্দ্রের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব! কোটি কোটি পুনর্জ্জন্মের ফলে তবে কোন নীচু জাত হইতে উচ্চ জাতে ওঠা যায়। শূদ্র নিষিদ্ধ তপস্যায় প্রবৃত্ত হওয়ায় রাম তাহার শিরশ্ছেদ করেন। এইরূপ একটা ঔদ্ধত্যের কাজ সমস্ত সমাজ-শৃঙ্খলাকে বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক জাতের নিজস্ব অধিকার রক্ষা করা নিতান্তই আবশ্যক।

জাতের আলোচনা-ক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রে আমাদের চেষ্টা একটা ঐতিহাসিক শৃঙ্খল স্থাপন করা; এইজন্য আমরা প্রাচীন তথ্যাদি হইতে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত সামাজিক অবস্থার একটা খাঁটি চিত্র দেখিতে চাই। এক্ষেত্রে এইরূপ আলোচনা করিবার আমাদের কি অধিকার আছে? কি মহাকাব্যগত ঐতিহ্য, কি শাস্ত্রীয় উপদেশ ও অনুশাসন—উভয়ের মধ্যে নিয়ম-পদ্ধতি একই। এক্ষেত্রেও নানা-প্রকার অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতির মধ্য দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু এই-সকল অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতি একপ্রকার কবুল-জবাবের কাজ করে। সকলেই বলেন, এই নিয়ম-পদ্ধতিটা কৃত্রিম ও শুধু তত্ত্ববিচারমূলক। উহা তথ্যের পত্তনভূমির উপর স্থাপিত নহে। প্রতি মুহূর্ত্তেই, তথ্য বিপরীত সাক্ষ্য দেয়, তথ্যের সহিত শাস্ত্রের বিরোধ হয়—তথ্য শাস্ত্রকে ছাপাইয়া উঠে। শাস্ত্রও এ বিষয় সম্বন্ধে বেশী কিছু দাবী করে না। শাস্ত্র উচ্চতর নিয়মাদিকে ব্যবহারের হাতে, প্রথার হাতে, রাখিয়া দেয়। পরিশেষে শাস্ত্র, তথ্যমূলক বিশেষ-বিশেষ অবস্থার হেতু প্রদর্শন করিয়া জটিলতা ও অসঙ্গতি নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করে; এবং এক-একটা কাল্পনিক আদর্শ খাড়া করিয়া তুলে।

জাতিসাঙ্কর্য্যের ব্যাখ্যা কাহারও ভ্রম জন্মাইতে পারে নাই। (Max Muller, Chips) তাহার মধ্যে এত অসম্ভব কথা আছে যে তাহা সহজেই চোখে পড়ে।

এত অসংখ্য জাতের সম্মুখে চতুর্বর্ণের নিয়মটা টেকা ভার। তাই সঙ্করজাতির অস্তিত্ব সমর্থন করিবার এত চেষ্টা। এই চতুর্বর্ণ হইতেই সঙ্কর জাতির আরম্ভ ও উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করা হয়। চতুর্বর্ণ হইতেই এই কতকগুলি জাতের প্রথম উৎপত্তির ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত ভাবে একবার মাত্র ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার পরে আরও যে-সকল জাত উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নহে; উহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাত যে-সকল ভৌগোলিক নাম ধারণ করে প্রথমে তাহা হইতেই ত এই উৎপত্তির ব্যাখ্যাটা মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু শ্রেণীবন্ধনের দিকে হিন্দুদের যে-একটা প্রবল ঝোঁক আছে, সেই ঝোকের মাথায় হিন্দুরা এই-সকল সঙ্কোচকে আদৌ আমলে আনে না। তাছাড়া বাস্তব অবস্থা হইতে হিন্দুদের এই চেষ্টা একটু বল প্রাপ্ত হয়। অনেক সময় এইরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন এক দল জন্মদোষে দুষ্ট হওয়ায় পৈতৃক জাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া সামাজিক সোপানের নিম্ন ধাপে নামিয়া পড়িয়াছে এবং তাহা হইতে আবার একটা নূতন জাত গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং এই জাতের নিয়ম, হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস অনুসারে খুব

কড়াক্কড় ভাবে রক্ষিত হওয়ায় এই বর্ণিয়াদের উপর নির্ভর করিয়া, তাহারা অসন্দিগ্ধভাবে উহাকে একটা বৈধ জাতের মধ্যে ধরিয়া লইয়া সসঙ্কোচে একটা পাকা রকমের সিদ্ধান্ত স্থাপন করে।

ইহা হইতে ভারতের স্মার্ত্তবাগীশেরা একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। যে তত্ত্বটি সমাজগঠনের মূলে অবস্থিত সেই মূলতত্ত্ব হইতেই সেই মূলোচ্ছেদী গোলযোগগুলা বাহির হইয়াছে—তাঁহারা এইরূপ দেখাইতে চাহেন।

এই প্রবণতা এত প্রবল ছিল যে, অনেক প্রকারে উহা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বয়ং মনু কি বলেন নাই যে, ক্রিয়াকর্ম্ম বাদ দেওয়া, ও ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি দোষে কতকগুলি ক্ষত্রিয় শূদ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—যথা পৌণ্ড্রক, ফোড, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন শক, পারদ, পহ্লব, সীন, কীরাত, দরদ, অর্থাৎ ভারতের সমস্ত অ-হিন্দু জাতি, অর্থবা বৈদেশিক, দ্রাবিড়ীয়, চীন, পারস্যিক, গ্রীক্ সীথিয় ও আদিমনিবাসী লোকসকল? ঠিক্ ধরিতে গেলে ব্রাহ্মণিক সমাজ-গঠনের সহিত তাহাদের উৎপত্তি-সংক্রান্ত কোন যোগ-সূত্র নাই। অথচ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির মধ্যে, অনুশাসনের মধ্যে, যেন-তেন্-প্রকারেন উহাদিগকে প্রবেশ করান চাই!

সঙ্করজাতিসম্বন্ধীয় মতবাদ প্রথমেই ত এই নিয়ম-পদ্ধতিরূপ প্রাচীরের একটা অংশ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই চারিটি প্রধান বর্ণ সম্বন্ধে কি বলিবে?

শূদ্রেরা কতকগুলা দাসের সমষ্টি মাত্র—এই কথা শুধু যে একটা খামখেয়ালী কথা তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন, রাষ্ট্রপদ্ধতির মধ্যে উহাদের যে অবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে, তাহাতে উক্ত কথার দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হয়। তিন উচ্চতর জাতির দৃঢ়বদ্ধ একতা, জমাটভাব, সুনিয়ন্ত্রিততা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ও তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা কি বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ব্রাহ্মণ জাতির বর্ত্তমান পরিণাম ত আমাদের চোখের সামনেই রহিয়াছে। তাহাদের এখন কিরূপ অবস্থা? আমরা ব্রাহ্মণকে যাহা দেখিয়াছি তাহা একটি প্রকৃত জাতরূপে নহে, পরন্তু কতকগুলি জাতের সমষ্টি-রূপে। তাহাদের অধিকার সমান নহে, তাহাদের সামাজিক পদমর্য্যাদা সমান নহে এবং তাহারা বিপুল দূরত্ব-ব্যবধানে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। পুরাকাল হইতে অবনতিগ্রস্ত ও পতিত ব্রাহ্মণের একটা দীর্ঘ তালিকা চলিয়া আসিতেছে। অতএব যে সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিসংস্করণ হয় তখনও ইহার অন্যথা হয় নাই। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা যদি বল,—কষ্টেসৃষ্টে তাহাদের নামের চিহ্নটুকুমাত্র রহিয়া গিয়াছে; যেখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নাম প্রকাশ পায় সেখানে দেখা যায়, কোন বিশেষ দলের স্বেচ্ছাকৃত দাবী সমর্থনার্থ আধুনিক কালকে পুরাকালের ভিতর টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহার কতকগুলি প্রামাণিক দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে স্বতন্ত্র ও প্রামাণিক জাত বলিয়া কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতিবাচক একটা সাধারণ নাম মাত্র পাই—তাহার মধ্যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যা যদি কিছু থাকে ত সে নিতান্তই অণু-পরিমাণে। সম্প্রতি হিন্দু নাট্যসাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে আমি দেখাইয়াছিলাম, কতকগুলি ঔপপত্তিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য হিন্দুরা কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করে। শ্রেণীবন্ধনের প্রতি অনুরাগ, তথ্যের প্রতি অবজ্ঞা, আমরা যাহাকে যুক্তিশাস্ত্র বলি সেই যুক্তিশাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা, সূত্র-বচনের প্রতি অযথা ভক্তি—এই সমস্ত মিলিয়া একটা কৃত্রিম নিয়ম-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, অযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য হিন্দুদিগকে প্রণোদিত করে। যে-কথা সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য, তাহা ধর্ম্ম ও ব্যবস্থা নিয়মের পক্ষেও কম সত্য নহে। কোন তত্ত্বকে একটা সাধারণ নিয়মের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে হিন্দু ইতস্তত করে না। যে সকল সীমানির্দ্দেশ আমাদের চোখে অপরিহার্য্য, হিন্দুরা তাহা লইয়া মাথা ঘামায় না। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যে-ব্রাহ্মণ, জাতের কর্ত্তব্য, নিষ্ঠার সহিত পালন করে তাহার চারিটা অবস্থা বা আশ্রম আছে। শিক্ষানবীশের ন্যায় তাহাকে শাস্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম-সকল অধ্যয়ন করিতে হইবে ও কিয়ৎকাল পরে সে বিবাহ করিবে এবং সন্তান উৎপাদন করিয়া পারিবারিক ক্রিয়াকর্ম্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে। একটা অবস্থা আছে যখন সে বনে গমন করিয়া

কঠোর তপস্যায় জীবন যাপন করিবে। আর একটা অবস্থা আছে যখন সে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষার দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। স্মার্ত্তবাগীশদিগের মতে, এই চারি অবস্থা, জীবন-সোপানের ধাপ; বাস্তুত দেখিতে গেলে, এই ধাপগুলি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য। এই অপরিহার্য্যতা আমরা কি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব? শাস্ত্রের বচনানুসারে আমরা যদি মনে করি যে, ব্রাহ্মণ মাত্রই কেবল অধ্যয়ন ও তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত, তাহারা সকলেই চারি আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, এবং জীবনের শেষ দুই ভাগে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে ও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা সত্য হইতে দূরে পড়িব! ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিসংস্করণ-কারীরা শুধু কতকগুলা বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্তকে জুড়িয়া একটা পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছেন। এবং সেই সকল দৃষ্টান্ত ন্যূনাধিক পরিমাণে ব্যতিক্রম-স্থল মাত্র। উহা হইতে—যাহা প্রায় কখনই কার্য্যে পরিণত হয় না এইরূপ একটা আদর্শ-জীবনকে অনুশাসনের দ্বারা সকলের অবশ্যপালনীয় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আমরা কি দেখিতে পাই না যে, নাট্য-সাহিত্যেও আলঙ্কারিকেরা কোন একটা বিশেষ নাটকের জন্য নাটকের একটা স্বতন্ত্র পর্য্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন?—একটা বিশেষ দৃষ্টান্তকে একটা সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বে পরিণত করিয়াছেন?

অতএব দেখা যাইতেছে, এই-সকল ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতারা ও নীতিবাদীরা হিন্দু-মনের যে প্রবণতাটি খুব প্রবল ও স্বাভাবিক, সেই প্রবণতা অনুসারেই কাজ করিয়া থাকেন। তা ছাড়া, তাঁহাদের সকল কাজে একটা স্বার্থবুদ্ধি প্রকাশ পায়, যাহাতে করিয়া শাস্ত্রের প্রামাণিকতার মাহাত্ম্য তাহা হইতে অপসারিত হয়। সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করাই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্ত্তনের জন্য, ব্রাহ্মণের স্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ। তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে যে-সব গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য, তাঁহাদের প্রভুত্ব সুদৃঢ় করিবার জন্য লিখিত। সাহিত্যের একছত্র অধিপতি;—তাঁহারাই আবার মহাকাব্যগত ঐতিহ্যকে আকার প্রদান করিয়াছেন। উহার মধ্যে, আগন্তুভাবে কতকগুলা বিরোধের কথা থাকিলেও, ব্রাহ্মণ্যিক শাস্ত্রেরই ন্যায় মহাকাব্য পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণের দাবী দাওয়া, ব্রাহ্মণের বিশেষাধিকার সমর্থন করিয়াছে।

ধর্ম্মশাস্ত্র শুধু যে ব্রাহ্মণের জন্য সমস্ত প্রভুত্বের কাজ, সমস্ত অনুগ্রহ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তাহা নহে—তাহা ছাড়া দণ্ডের ধাপ পরম্পরাও এমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে যাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে সুবিধা হয়।

দেখা গিয়াছে কিরূপে জাতের পঞ্চায়েৎ, স্বকীয় নিয়োজিত দলপতির পরিচালনাধীনে, আভ্যন্তরিক পুলিসের কাজ করে, আবশ্যক-মত অপরাধীকে জাত হইতে বহিষ্কৃত করে, এবং অর্থদণ্ড আদায় করিয়া অপরাধীর নিষ্কৃতিরও উপায় করিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য শাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণপরিষদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যিক ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্কল্প এস্থলে স্পষ্টই লক্ষিত হয়; তাছাড়া আমাদের একালেও দেখা যায়, একজন ব্রাহ্মণ একাকী কিংবা জাতের পঞ্চায়ৎসভার সহযোগিতায়, এই-সকল নিষ্পত্তির কাজে প্রধান কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। সমস্ত সাহিত্যে ব্রাহ্মণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনুপ্রবিষ্ট, সমস্ত সাহিত্য ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুপ্রাণিত; আমাদের চিত্রিত সমাজ-গঠনও অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণের দ্বারা অনুরঞ্জিত। সমস্ত নিঃশেষে না বলিয়া কত কথা হাতে রাখিয়া বলা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সাহিত্যিক ঐতিহ্যই সাক্ষী।

এই ঐতিহ্য হইতে সরিয়া বর্ত্তমান তথ্যগুলি যেন পর্য্যায়ক্রমে একবার কাছাকাছি আইসে, আবার আশ্চর্য্যরূপে দূরে চলিয়া যায়।

এই জাতের আলোচনা হইতে একটা তথ্য স্পষ্টরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ পায় যে, কতকগুলি স্থায়ী ধরণের মূলতত্ত্বের কার্য্যফল সমান চলিতেছে, অথচ সেই সঙ্গে গঠনাদির পরিবর্ত্তনও হইতেছে। এই ব্যাপারটা নূতন নহে। যে-সকল কারণ হইতে এই পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার কার্য্য বহু শতাব্দী হইতেই চলিতেছে। অতএব দেখা যায়, প্রাচীন কালের অবস্থা যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের ও মহাকাব্যের প্রতিসংস্করণের সময়কার অবস্থার অনুরূপ, সেই অবস্থার অন্তর্ভূত অনেকগুলি খুঁটিনাটি বিষয় ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান তথ্যাদি হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। বড় বড়

রেখাগুলি এখনকার মতো এক রকমেরই। কেবল অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় জাতের গঠনের মধ্যেও কতকগুলি ছোটখাটো সম্ভবপর পরিবর্ত্তনের অবকাশ রহিয়া গিয়াছিল। এইরূপ পরিবর্ত্তন না হইয়া যায় না।

মোটকথা, সিদ্ধান্তের দ্বারা তথ্যাদির ব্যাখ্যা হয় না, তথ্যাদির দ্বারাই সিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়, সিদ্ধান্তকে উচিত সীমার মধ্যে আনিতে পারা যায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চশস্য

জাপানী টিকি—

এসিয়ার প্রায় সকল দেশেই প্রাচীনকালে মাথায় টিকি রাখার প্রথা ছিল। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান এখন পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন টিকির মোহ একেবারে ত্যাগ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষে গোত্র-চিহ্নরূপে মাথায় এক হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত মাথার বিভিন্ন স্থানে টিকি রাখার প্রথা প্রাচীনকালে ছিল। সেই গোত্রচিহ্ন এখন হিন্দুয়ানির চিহ্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সংখ্যায় ও আকারে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে এবং বঙ্গদেশ হইতে উহা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

চীনে মাঞ্চুজাতির অধীনতার চিহ্নরূপে চীনাদের টিকি রাখা মাঞ্চু রাজার আদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। চীনারা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করিয়া দাসত্বের ধ্বজা টিকিরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। কিন্তু এখনও অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ে প্রাচীনপন্থী দু-একজন লোক দাসত্বের চিহ্ন হইলেও চিরাগত প্রথার অভ্যাস বলিয়া টিকি ত্যাগ করিতে পারে নাই। কোনো প্রথায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে তাহার অপকারিতা ও অপমান বুঝিতে পারিয়াও তাহা ত্যাগ করা অল্পবুদ্ধি ও দুর্ব্বলচিত্ত লোকের পক্ষে এই রকমই কঠিন হয়।

জাপানে সামাজিক অবস্থার তারতম্য ও বিশেষ বিশেষ পেশা বুঝাইবার জন্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই টিকি রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীন কালে জাপানীরা লম্বা চুল রাখিত এবং মাঝে সিঁথি করিয়া দুই ভাগে দুই কাঁধের উপর দিয়া চুল ছাড়িয়া রাখিত, অথবা দুই কানের কাছে দুইটা ঝুঁটি বাঁধিত। উৎসবে পর্ব্বে গাছের পল্লব চুলে গুঁজিত অথবা পাতার মালা গাঁথিয়া মাথা বেড়িয়া পরিত। ছয় শতকের মাঝামাঝি সম্রাটের আদেশে উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগকে চুল বিনানি করিয়া মাথার চাঁদির উপরে উঁচু করিয়া খোঁপা বাঁধিতে হইত। কামাকুরা যুগে এই খোঁপার আকার একটা বড় হাতুড়ির মতন হইয়া উঠিয়াছিল। তকুগাওাযুগে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও খোঁপা বাঁধিতে আরম্ভ করে, কিন্তু এই খোঁপা রাজকর্ম্মচারীদের মতন মাথার চাঁদির উপরে না হইয়া মাথার পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। জাপানের গৃহ-যুদ্ধের সময় যোদ্ধারা মাথার চাঁদিতে লম্বা খাড়া খোঁপা বাঁধা অসুবিধা দেখিয়া মাথার সামনের অর্দ্ধেক চুল একেবারে কামাইয়া ফেলিয়া পশ্চাতে এক-একটি ছোট টিকি রাখিতে আরম্ভ করে। ক্রমে এই মাথা-কামানো রীতি রাজদরবারেও প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু দরবারীরা মাথার পিছনের টিকি ঝুলাইয়া না রাখিয়া কড়া বিনানি করিয়া



জাপানের যোদ্ধৃ-যুগের পুরুষদের চুল রাখিবার ভঙ্গি।

সোজা সটান খোঁচার মতন করিয়া রাখিত এবং সেই বিনানি করিতে ব্যবহৃত দড়ির রং হইতে লোকের পদমর্য্যাদা প্রকাশ পাইত—পঞ্চম শ্রেণীর দরবারীরা বেগুনী, পরবর্ত্তী শ্রেণী সাদা ও সাধারণ রাজকর্ম্মচারীরা লাল সুতা দিয়া টিকি বিনাইত। এই টিকি সটান খাড়া হইয়া থাকিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল চা-খেঁটিন। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকে কপালের উপরকার চুল কামাইয়া পিছন দিকে এক গুচ্ছ লম্বা চুল গোড়ায় দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিত। পুরোহিত ও চিকিৎসকেরা একেবারে মাথা কামাইয়া নেড়া হইত। কামাকুরা যুগের গৃহ-বিবাদের পর তকুগাওা যুগ দীর্ঘ শান্তি উপভোগ করিয়াছিল। সেই সময় টিকি রাখার রীতি বহু-প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় টিকি ও খোঁপার মাঝামাঝি রূপ ধরিয়া মাথার চুল বিবিধ আকারের শিরোভূষণে পরিণত হইয়াছিল। মাথার লম্বা চুল মাথার উপরে ফাঁপাইয়া ছড়াইয়া দিয়া ক্রমশ সূচলো করিয়া চাঁদি ও পিছনের সন্ধিস্থলে চোখা করিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। ছোট ছোট ছেলেদের সামনের চুলও নানা বিচিত্র আকারে ঝুঁটি বাঁধিয়া সাজানো হইত; কিন্তু তাহারা বড় হইয়া উঠিলেই সামনের চুল কামাইয়া পশ্চাতে টিকি রাখিত। ১৭৭২ সাল হইতে এই টিকি খুব লম্বা হইয়া উঠিল এবং সেই টিকিকে সুন্দর সুদৃশ্য করিয়া সাজাইবার দিকে খুব ঝোঁক পড়িয়া গেল। সাধারণ লোকেরাও পিছনের টিকি আস্তে আস্তে উপরের দিকে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল এবং শেষে সেই টিকি পিছন হইতে সামনের দিকে উল্টাইয়া কামানো



জাপানী টিকি।

(১) জাপানের গেনরোকু যুগের বালকদের চুলের ভঙ্গি ; সেই সময়ের বয়স্থ পুরুষদের চুলের ভঙ্গি ; মাপ্তি যুগের ভঙ্গি। (২) মাপ্তি যুগের ক্ষত্রিয়-যুবকদের চুলের ভঙ্গি। (৩) আনয়েই যুগের ক্ষত্রিয়দের। (৪) প্রাচীন কালের। (৫) প্রাচীন আমীরের। (৬) মেইজি যুগের অব্যবহিত পূর্ব্বের ক্ষত্রিয়ের। (৭) চাজেন বা চা-ঘোঁটন চুলের ভঙ্গি। (৮) যোদ্ধ্ যুগের শিল্পী ও বণিকের। (৯) ছেলেদের বিবিধ প্রকারের টিকি।

টাদির উপর চেপ্টা করিয়া শোয়াইয়া রাখিত। মাথার সামনের চুল কামানোরও বিচিত্র ভঙ্গি ছিল। কেহ মাঝে মাঝে চুল রাখিয়া ফুলের গাছের কেয়ারীর মতন করিত, কেহবা বাগানের পথের মত করিয়া চুল কামাইত, কেহবা সামনের অনেকখানি কামাইয়া ফেলিত, কেহবা অল্প কামাইত। বণিক, কারিগর, যোদ্ধা প্রভৃতি সকলেরই টিকি ও খোঁপার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হওয়াতে এই সময়ে চল্লিশ পঞ্চাশ রকমের চুল রাখার রীতি প্রচলিত হয়। মজুরদের চেয়ে বণিকদের টিকি লম্বা হইত এবং টিকির পুঁটে খুব বড় হইত ; কারিগরেরা লম্বায় খাটো গোছে মোটা টিকির মাঝখানটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া মুড়ো ঝাঁটা বা কুঁচির মত করিয়া রাখিত। বাড়ীর চাকরেরা সমস্ত মাথার চুল খুব খাটো করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিত। এবং মাথার ঠিক পিছনে একটা লম্বা ঝাঁট বিনানি সটান করিয়া রাখিত। মেইজি যুগ প্রবর্ত্তিত হইলে সকলের উপর হুকুম জারী করিয়া টিকি কাটিবার আদেশ প্রচার করা হয়, কিন্তু কেহই সহজে টিকি কাটিয়া অসভ্য প্রতিপন্ন হইতে স্বীকার করে নাই। এখনও পাড়াগাঁয়ের অনেক লোক প্রাচীন কালের মতন নানা রকমের টিকি রাখে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে। কোন্ টিকি কাহার এবং কোন্ টিকিতে কি পদমর্য্যাদা প্রকাশ পায় তাহা জাপানীরা এখন ভুলিয়া গিয়াছে ; কেবল থিয়েটারের বেশকারেরা প্রাচীন যুগের অভিনয়-সজ্জার জন্য এখন পর্য্যন্ত টিকির কুলজী মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে। পেশাদার পালোয়ানেরা তাহাদের ব্যবসার চিহ্নরূপে মাথার মাঝখানে চূড়ার আকারে টিকি বাঁধিয়া রাখে। এইসব টিকি পুরুষেরাই রাখিত ; স্ত্রীলোকদের কবরী সজ্জার রীতি স্বতন্ত্র।

জাপানের কৌতুককর বিবাহ-রীতি—

হিরোশিমা অঞ্চলের জুনিগাউর গ্রামের জেলেরা নিজেদের মেয়ের সঙ্গে অপর গাঁয়ের ছেলের বিয়ে হওয়া অপমানের ব্যাপার বলিয়া মনে করে। যখনই তাহারা জানিতে পারে যে তাহাদের গ্রামের কোনো মেয়ে অপর গ্রামের কোনো ছেলেকে ভালবাসিয়া তাহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়া নিজের গ্রামের ছেলেদের কাছে অপরাধ করিয়াছে অমনি সেই গ্রামের ছেলেরা দল বাঁধিয়া একটা পিপের মধ্যে করিয়া খানিকটা সাকে মদ ও কিছু মাছ সেই বিশ্বাসহন্ত্রী মেয়েটিকে উপহার দেয়। এই প্রথাকে তারুইরে অর্থাৎ পিপেতে রাখা বলে। মস্ত একটা পিপের মধ্যে অতি সামান্য তুচ্ছ উপহার দিয়া তাহারা অপরাধিনী মেয়েটিকে বিদ্রূপ ও অপমানিত করে। সে বেচারার এই অপমান এইখানেই শেষ হয় না। কেহ কাহারও কাছে কিছু উপহার পাইলে তাহা দেবতাকে নিবেদন করিয়া গ্রামের সকল লোককে দেখাইতে বা ভাগ দিতে হয়। পিপের মধ্যে একটু মদ আর কিছু মাছ উপহার পাইয়া মেয়েটিকে তাহা লইয়া গ্রাম-দেবতার মন্দিরে যাইতে হয় এবং বেদীর সম্মুখের ঢাক পিটিয়া গ্রামের সকল লোককে খবর দিতে হয়। সকলে আসিয়া মন্দিরে জড়ো হইলে সে তাহার বিবাহের সম্মান বা অসম্মানসূচক যে তুচ্ছ উপহার পাইয়াছে তাহা সকলকে বাঁটিয়া দ্যায়। গ্রামের লোকেরা এই বিবাহ-ব্যাপারে খুব খুসি হইবার ভান করিয়া আনন্দ উৎসব করে। ইহাকে তাহারা তারুবিলাকি অর্থাৎ পিপে খোলার উৎসব বলে। এই উৎসবে ভোজের সমস্ত ব্যয় মেয়েটির ভাবী স্বামীকে জোগাইতে হয়। এজন্য অপর গাঁয়ের কোনো ছেলে এই গাঁয়ের কোনো মেয়ের পাণি-প্রার্থী খুব সহজে হইতে চায় না। এই ভোজ হইয়া গেলে তখন তাহাদের বিবাহে আর কোন বাধা থাকে না ; কিন্তু যদি এই ভোজ না দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই দম্পতি সমাজে ঘৃণিত ও নির্য্যাতিত হয়। কখনও কখনও বিবাহ হইতেই দেওয়া হয় না এবং গাঁয়েরও কোনো ছেলে সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় না। এই প্রথা প্রচলনের কারণ—দূর দেশের যুবকেরা সমুদ্রতীরে আসিয়া জেলের মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ঘটাইয়া দুচার দিন বাদে চলিয়া যাইত এবং জেলেদের অপমান ও লজ্জার কারণ ঘটিত। তাহাই রোধ করিবার জন্য এই প্রথার প্রবর্ত্তন।

শিয়ানো জেলার সেইনাইজি গ্রামে বিবাহের সময় কনে যখন কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে বরের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায় তখন কন্যা-যাত্রীদের প্রত্যেকেই এক হাতে একটা সাকে মদের বোতল ও অপর হাতে একটা বাটি লইয়া রাস্তা চলিতে-চলিতে মদ খাইতে-খাইতে যায়।

বরযাত্রীরা কন্যাযাত্রীদের যাইবার পথের মধ্যে মধ্যে এক-একটা বেড়া দিয়া রাখে; সেই বেড়ায় আটক হইয়া কন্যাযাত্রীরা বরযাত্রীদিগকে এক-এক পেয়ালা মদ ঘুষ দেয় এবং কনে তাহার ঘোমটা তুলিয়া সকলকে একএকবার তাহার মুখ দেখিতে দেয়; তখন কন্যাযাত্রীরা বেড়া ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপে এক-এক বেড়ায় আটক সরাইতে বিশ ত্রিশ মিনিট লাগে এবং এক পোয়া পথ চলিতে দুঘণ্টা কাটিয়া যায়। বিবাহ-সভা পর্য্যন্ত মদ খাওয়া চলিতে থাকে এবং এক-এক বিবাহে যে পরিমাণ মদ খরচ হয় তাহার পরিমাণ দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। যে বিবাহে যত মদ খরচ হয় সেই বিবাহ তত জাঁকের।

সাগামি জেলার এক গ্রামে বিবাহের সময় গাঁটছড়া বাঁধা হইলে ও মদ খাওয়া হইলে পর কনে বরের দিকে সলজ্জ ও সপ্রণয় কটাক্ষ করিতে-করিতে বরকে বলে, "প্রিয়তম, অবশেষে আমি তোমার কাছে এসেছি; এ জগতে তুমিই একমাত্র আমার নির্ভরের লোক।" তখন বর ও কন্যাপক্ষের লোকেরা বর ও কনের মাঝখানে আসিয়া হাততালি দিতে-দিতে বলিতে থাকে, "ঠিক কথা, ঠিক কথা।" এই প্রথাকে 'কনের প্রথম কথা' বলে। বর এই প্রথম কনের কথা শুনে এবং এই মধুরবাণী তাহার জীবনের স্মরণীয় ও সান্ত্বনা হইয়া থাকে।

মুৎসু জেলার হাচিনোহে সহরের বিবাহের সময় যখন ভোজ হইতে থাকে তখন শহরের অপরিচিত লোকেরাও যে-সে বিনা নিমন্ত্রণে চার চার জনে দল বাঁধিয়া বিয়ে-বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চার জনের একজন অতি প্রাচীনকালের সামুরাই বা যোদ্ধা সাজিয়া আসে— তাহার মাথার চূড়, টিকি, নকল তরোয়াল এবং মুখের উপর পাউডারের প্রলেপ তাহাকে এমন কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলে যে কেহই তাহাকে চিনিয়া উঠিতে পারে না; তাহাদের একজন সেই বুড়ো সামুরায়ের স্ত্রী এবং অপর দুজন তাহার চাকর সাজে। সেই চার আগন্তুক গম্ভীর ভাবে গিয়া নিমন্ত্রিতের মতন বেশ সপ্রতিভ ভাবে ভোজে বসিয়া যায়। তাহারা নবদম্পতিকে কাগজে মুড়িয়া কিছু টাকা, একটি সুন্দর কাঠের বাক্সে ভরিয়া মুড়মুড়ে করিয়া ভাজা শুকরের মাংস ও পাঁচ বোতল সাকে মদ দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। ভোজের সময় তাহারা খুব গম্ভীর হইয়া থাকে এবং তাহাদিগকে খুব সমাদর করিয়া খাওয়ানো হয়। ভোজের পর মদ খাইতে-খাইতে তাহাদের গাম্ভীর্য্য ভাঙিয়া যায় এবং ঘণ্টা খানেক ধরিয়া নাচিয়া গাহিয়া তাহারা বিদায় লয়। বিদায়ের সময় তাহাদের টাকা ও সাকে মদ দ্বিগুণ করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং কাঠের বাক্সটিও পিঠায় ভরিয়া ফেরত দ্যায়। এই প্রথাকে অপরিচিতের আশীর্ব্বাদ বলে; যত দল অপরিচিত লোকই আসুক না কেন সকলকেই সমাদর করিতে হয় এবং কাহারও সমাদরের একটু ত্রুটি হইলে তাহারা চিরজীবন সেই বরকনেকে খোঁটা দিতে থাকে এবং সেই বরকনে সমাজে নিন্দিত হইয়া কুণ্ঠিত হইয়া বাস করে।

য়ুওয়ামি প্রদেশের হামাদা জেলায় যে-বাড়ীতে বিবাহ হয় সেই বাড়ীতে বিবাহের সময় ছেলেদের দেবতা জিজো বা ষষ্ঠীদেবীর অনেকগুলি পাথরের মূর্ত্তি আনিয়া দরজার কাছে রাখা হয় এবং যে-সমস্ত ছেলেরা সেই-সব মূর্ত্তি আনিয়া হাজির করে তাহারা খুব জোরে হাততালি দিতে-দিতে নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে; এই প্রথার অন্তরগত অর্থ এই যে এই নব দম্পতি তাহাদের ভিটায় পাথরের মতো কায়েম হইয়া, ধনে পুত্রে সুখে থাকিবে। য়ুজুমো প্রদেশেও ঠিক এই রকম প্রথা আছে, কেবল পার্থক্য এই যে বর ও কনে বিবাহ করিয়া যাইবার সময় ষষ্ঠীদেবীর মূর্ত্তিগুলি তাহাদের আগে-আগে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

য়ুওাকি প্রদেশের সোমা জেলায় বিয়ের দিন সন্ধ্যাকালে কনে যখন বরের বাড়ীতে বিবাহ করিতে যায় তখন ষোল সতর বছরের কতকগুলি মেয়ে তাহাদের মুখ চিত্র করিয়া ও মাথায় এক-একখানি লাল রুমাল বাঁধিয়া এক-একটা বড় বড় সিন্দুক বহিয়া লইয়া কনের আগে-আগে যায়। সেই সিন্দুকে কনের পোষাক থাকে। তাহাদের সঙ্গে-সঙ্গে নাদনা ঘোড়ার সহিসেরা গান করিতে-করিতে চলে। বরও বাঁশের চেঁচাড়ি বুনিয়া তৈয়ারি একটা ঘোড়া লইয়া যায় এবং তাহার সঙ্গেও পাঁচজন যুবতী রুমালে মুখ ঢাকিয়া ঘোড়ার লেজের মতন খড়ের আঁটি কোমরে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া বরের সঙ্গে-সঙ্গে চলে। যখন কনে বরের বাড়ীতে পৌছে তখন ঘোড়ার স্থানীয় ঐসব মেয়েরা কনেকে অভ্যর্থনা করে এবং ঘটক কনের হইয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলে, "সাবাস ঘোড়া, সাবাস!" তারপর সকলে ভোজে বসে; মেয়েরা নাচিতে থাকে।

উনজেন প্রদেশের নিশিতাগাও গ্রামের সকল সধবা স্ত্রীলোক যথেষ্ট সাজসজ্জা করিয়া নববৎসরে পিতামাতাকে প্রণাম করিতে যায়। তখন তাহাদের স্বামীদিগকে চাকরের বেশে স্ত্রীর কাপড়চোপড় ও উপহারের বোচকা পিঠে বাঁধিয়া স্ত্রীদের সঙ্গে-সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হয়। তাহারা বাড়ীতে পৌছিলে তাহাদিগকে খুব সমাদর করিয়া অভ্যর্থনা করা হয় এবং সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া ভোজের উৎসব চলে। কুড়ি দিন বাপের বাড়ী থাকিয়া মেয়ে স্বামীকে লইয়া নিজেদের বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। তখন শ্বশুরশাশুড়ী জামাইয়ের বাড়ীতে পালটা দেখা করিতে আসে এবং জামাই শ্বশুরশাশুড়ীকে ভোজ দিয়া উৎসব করে। জাপানে স্ত্রীলোকেরা কখনো পুরুষের আগে-আগে চলিতে পায় না; এই একটি দিন তাহাদের আজীবন দাসীপনার শোধ তুলিয়া স্বামীকে চাকর বানাইয়া লয়।

বুড়াবুড়ীরা অনেক সময়েই তরুণ-তরুণীর প্রণয় সদয় চক্ষে দেখে না; সে রকম অবস্থায় হরণ বা পলায়ন ছাড়া তরুণ-তরুণীর আর অন্য গতি থাকে না। বুজেন প্রদেশে নাগাহামাড়ুরা গ্রামে বাপমায়ে মেয়ের মনের মতন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলে ছেলেটি তাহার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেয়ে চুরী করে এবং শ্বশুরশাশুড়ীর অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের মেয়ে ফিরাইয়া দেয় না। ইয়ামাশিরো প্রদেশে উমেগাহাতা অঞ্চলেও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

* *
*

জাপানের ক্রীড়া কৌতুক—

সকল দেশেই পশুপাখীর লড়াই লাগাইয়া কৌতুক দেখার রীতি প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান-আমলে হাতীর, মহিষের, ষাঁড়ের, মোরগের ও তিতিরের লড়াই খুব সমারোহ করিয়া হইত। এখনও মোরগ, তিতির ও বুলবুলের লড়াই পশ্চিম হিন্দুস্থানে হইয়া থাকে। য়ুরোপে, বিশেষ করিয়া স্পেনে মধ্যযুগে ষাঁড়ের লড়াই খুব প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ ছিল। জাপানে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই লাগাইয়া কৌতুক দেখার রীতি এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। পাহাড়-ঘেরা কোনো নির্জ্জন মাঠে এই লড়ায়ের রঙ্গভূমি স্থির করা হয় এবং পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাপ করিয়া দর্শকদের বসিবার স্থান করা হয়; লড়াইয়ের নির্দ্দিষ্ট দিনে শত শত ষাঁড় লইয়া তাহাদের মালিকেরা উপস্থিত হয়। প্রত্যেক ষাঁড়ের গায়ে একটা কাপড়ের পেটির উপর সেই ষাঁড়ের নাম সুতা দিয়া বুনিয়া লেখা থাকে। কুস্তি লড়াইয়ের মতন দুই পক্ষের ষাঁড়ের নাম ডাকা হয়; এবং উভয় দলের মালিকের মধ্যস্থ নির্ব্বাচন করিয়া হার জিতের বিচার নিষ্পন্ন করে। লড়াইয়ের সময় মধ্যস্থ বিচারক বাঁশের বাখারী হাতে লইয়া ষাঁড়েদের খোঁচা দিয়া বা চাবকাইয়া লড়াইয়ে উত্তেজিত করিতে থাকে। কোনো ষাঁড় পলাইয়া গেলে বা জিব বাহির করিয়া ফেলিলে তাহার

হার হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। তখন উভয় ষাঁড়ের মালিক তাহাদের লড়াই থামাইয়া পরাজিতকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। যে ষাঁড় জেতে তাহাদের এক-একখানা পাঁচ-রঙা কাপড় পুরস্কার দেওয়া হয় এবং তাহারা তাহা শিঙে বাঁধিয়া সগর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া যায়। এই লড়াই দেখিতে হাজার-হাজার লোক সমবেত হয়।

জানুয়ারী মাসে হিরোশিমা অঞ্চলে কচ্ছপ নাচের উৎসব হয়। কাঠের পাতলা তক্তা কাটিয়া কচ্ছপের মূর্ত্তি গড়া হয়। তাহার চার পায়ে এবং মাথায়ও লেজে পয়সা লাগাইয়া ভারী করা হয়। সেই কাঠের কচ্ছপটি বড় ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দশ পনর জনে মিলিয়া খুব জোরে পাখা দিয়া বাতাস দিতে থাকে এবং চীৎকার করিতে থাকে, "কচ্ছপ নাচে, কচ্ছপ নাচে।" পাখার বাতাসের তাড়নায় কাঠের কচ্ছপ মেঝের উপরে নড়িয়া বেড়ায় এবং প্রত্যেক লোকেই বাতাস দিয়া তাহাকে নিজের দিক হইতে অন্যের দিকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। যাহার কাছে গিয়া কচ্ছপ থামিয়া যায় তাহার হার হয় এবং তাহাকে ঘরের মধ্যে সকল লোকের সামনে তিনবার কচ্ছপের মতন হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে হয়। এই খেলায় মহিলারা প্রাণপণ শক্তিতে কচ্ছপের গায়ে বাতাস দিতে থাকেন, কারণ কচ্ছপের মতন হামাগুড়ি দিতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহাদের প্রতি প্রায়ই বিমুখ হইয়া বসে এবং পুরুষদের হাসি ঠাট্টার মধ্যে তাঁহাদিগকেও ঘরের মধ্যে কচ্ছপ-নাচ নাচিয়া ফিরিতে হয়। এই খেলায় ধনী ও ভদ্র সম্প্রদায়েরাই অধিক আনন্দ উপভোগ করে; কারণ যাহারা চাষাভুষো ছোটলোক তাহাদিগকে কাজের জন্য অনেক সময় হামাগুড়ি দিতে হয়; খেলায় হারিয়া হামাগুড়ি দেওয়াটা তাহাদের কাছে তত বিসদৃশ বা লজ্জার ব্যাপার বলিয়া ঠেকে না।

সাৎসুমা অঞ্চলে দুই দল ছেলে পশ্চিম ও পূর্ব্বমুখো হইয়া ২৪০ ফুট তফাতে সার দিয়া দাঁড়ায়। পশ্চিমদিকের একজন ৫ ইঞ্চি বেড়ের একটা লোহার বালা বিপক্ষের দিকে ছুড়িয়া ফেলে; পূর্ব্বদিকের দলের একজন ছেলে একটা বাঁশের লাঠি দিয়া সেই বালাটি ধরিতে চেষ্টা করে এবং যদি পারে তবে তখনি তাহা বিপক্ষের দিকে ছুড়িয়া ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে দুই পক্ষে বালা ছোড়াছুড়ি চলিতে থাকে এবং যাহার হাত হইতে বালা মাটিতে পড়িয়া যায় সে মোড় হয়। যে পক্ষের যত অল্প মোড় হয় সেই পক্ষ জিতে।

ওবি অঞ্চলে, ১৫ই আগষ্ট চন্দ্র-উৎসব উপলক্ষে পোনের ষোল বৎসরের ছেলেরা জমা হইয়া দুই দলে দড়ি-টানাটানি খেলা করে।

আকিহোনোরা গ্রামে যুবকেরা ৭ই জুন সমুদ্রের বড়বানলের সম্মানের জন্য উৎসব করে। সেইদিন বন্দরের সমস্ত জাহাজ ও নৌকার উপর ও সমুদ্রের ধারে মাদুর বিছাইয়া গল্প আলাপ, গান বাজনা, ভোজ প্রভৃতিতে আনন্দ-উৎসব জমিয়া উঠে। জাহাজ ও নৌকার মাস্তুলে-মাস্তুলে লণ্ঠন ঝুলাইয়া সাজানো হয়; ন'টা রাত্রের সময় গ্রামের বৌদ্ধ মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলেই সমস্ত লাল লণ্ঠনগুলি জ্বালিয়া দেওয়া হয় এবং হাজারখানা ছোট ছোট তক্তার উপর হাজার বাতি বসাইয়া জ্বালিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই হাজার বাতির ভাসমান আলো বড়বানলের প্রতিরূপ হইয়া বড়বানলকে আরতি করে।

অনেক পাড়াগাঁয়ে ইয়ামিজিরু অর্থাৎ কালো ঝোল নামে এক রকম খেলা হয়। কোন এক বিশেষ নির্দ্দিষ্ট দিনে কিম্বা রাত্রিতে গ্রামের সকল যুবকযুবতী মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কড়ায় করিয়া ঝোল রাঁধে এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের খেয়াল-মত তরিতরকারি মাছ মাংস ও মসলা আনিয়া সেই কড়ায় ফেলিতে থাকে, কিন্তু কে কি দিতেছে তাহা অপর কাহাকেও জানিতে দেয় না। এই পাঁচ-মিশালি জিনিষের উৎকট ঝোল রান্না হইলে সকলে খাইতে বসে এবং ঝোলের মধ্য হইতে নানাবিধ অদ্ভুত জিনিষ খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফুর্ত্তি করে। কখনো কখনো এই ঝোল হইতে টিকটিকি, বেঙ, আরসোলা প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হয়। এইজন্য এই উৎসবের আর-এক নাম মেকুরাগুই বা অন্ধভোজ অর্থাৎ কাহার ভাগ্যে কি খাবার জুটিবে তাহা কেহই জানে না।

হোক্কাইদো অঞ্চলে এপ্রেল মাসে বরফ গলিয়া গেলে পর শত শত যুবতী প্রত্যেকেই ফুল লইয়া বৌদ্ধ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। প্রথম দিনে ছোট ছোট মেয়েরা ও দ্বিতীয় দিনে যুবতীরা এই পুষ্প-প্রদক্ষিণে যোগ দেয়। দেবপূজা হইতে পূর্ব্বে এই উৎসবের উদ্ভব হইয়া থাকা সম্ভব, কিন্তু এক্ষণে ইহার সহিত পূজা বা ধর্ম্মের কোনো সংস্রব নাই, ইহা এখন কেবল মাত্র আনন্দ-উৎসবে পরিণত হইয়াছে। নব বসন্তের আবির্ভাবে দেশ যখন বরফ হইতে মুক্ত হইয়া পুষ্পপল্লবের সজ্জায় আনন্দিত হইয়া উঠে তখন তরুণীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়া ফুলের সাজি লইয়া জীবন্ত ফুলের মতন দুই দিন উল্লসিত হইয়া বেড়ায়। এই সময়ে দলে দলে যুবকেরা এই উৎসব দেখিতে আসে এবং তখন অনেক মন দেওয়া-নেওয়া ঘটিয়া থাকে।

* *
*

জাপানী বীরের সাহস পরীক্ষা—

পরলোকগত এডমিরাল ইতো সাৎসুমা অঞ্চলের লোক। প্রাচীন কালে সাৎসুমা অঞ্চলে বীরেদের সাহস পরীক্ষার এক অদ্ভুত গল্প তিনি বলিতেন। মধ্যযুগে সাৎসুমা যুবকেরা অদম্য বীরত্ব অর্জ্জনের জন্য কঠিন ব্যায়াম ও নিয়ম পালন করিত। সেকালে মাসে একটা-দুটো প্রাণদণ্ড হইতই; প্রাণদণ্ডের পর সেই মৃতদেহ যুবকদিগকে তরবারি-চালনা শিক্ষা করিবার জন্য দেওয়া হইত। মানুষের দেহে তরবারি বিদ্ধ করিবার সময় কোন্ অঙ্গে কতখানি জোর লাগে এবং তখন যোদ্ধার শরীরে ও মনে কি রকম ভাব জাগে তাহা নির্ণয় করিয়া রাখা দরকার বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্ষত্রিয় যুবকেরা যেই শুনিত যে কাহারো প্রাণদণ্ড হইবে অমনি তাহারা উৎসুক ব্যগ্র হইয়া সেই দিনের অপেক্ষা করিত, এবং সেই দিনে নিজের নিজের তরোয়াল বাঁধিয়া আনন্দে নাচিতে-নাচিতে বধ্য স্থানে ছুটিয়া গিয়া সমবেত হইত। মানুষের দেহে তাহাদের তরবারি চালনার কৌশল পরীক্ষা এবং মনের সাহস ও দেহের শক্তি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া যুবকেরা অধীর হইয়া উঠিত। ঘাতকের তরবারির আঘাতে দণ্ডিত ব্যক্তির মুণ্ড ছিন্ন হইয়া পড়িবা মাত্র সেই রক্তাক্ত ও সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপে কম্পান্বিত দেহ অধিকার করিবার জন্য সমস্ত যুবক হুড়ামুড়ি করিয়া সেই দেহের উপর গিয়া পড়িত। তখন তাহাদের মধ্যে সেই দেহ লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত এবং একজন তাহা ধরিতে-না-ধরিতে আর-একজন ছিনাইয়া লইত। অবশেষে নারিকেল লুটের মতন কেহ একজন সেই দেহকে বুকে জড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া পড়িত এবং শত শত যুবক তাহার উপরে স্তূপাকারে পড়িয়া তাহার হাত হইতে সেই মৃতদেহ ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে থাকিত। তখন সমবেত মুরুব্বিরা ও যুবকদের গুরুজনেরা জোর করিয়া উপর হইতে এক-একটাকে টানিয়া-টানিয়া সরাইয়া দিত, এবং অবশেষে যাহার হাতে সেই দেহ পাওয়া যাইত তাহা তাহারই অধিকার বলিয়া স্থির হইত। তখন সেই যুবক গর্ব্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইত এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মাখিয়া বীভৎস মূর্ত্তিতে সকলের বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টির সম্মুখে মনের আনন্দে সেই মৃতদেহের উপর তরোয়ালের চোট ও খোঁচা মারিয়া শত্রু-বধের কৌশল ও আনন্দ অভ্যাস করিত। য়ুরোপে এখন খড়ের মূর্ত্তি বা খড়-ভরা থলের গায়ে তরোয়াল ও সঙ্গীন বিঁধিয়া অস্ত্র-চালনা অভ্যাস করানো হয়।"

কর্ম্মক্ষম কৃত্রিম হাত—

বর্ত্তমান যুদ্ধে য়ুরোপের সকল দেশেরই অনেক লোক মারা পড়িতেছে। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদের অনেকেই জখম ও অঙ্গহীন হইয়া থাকিবে। যাহাদের হাত কাটা পড়িতেছে তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্য নানান দেশে নানাবিধ কৃত্রিম হাত প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। ইহার একাধিক বিবরণ পূর্ব্বে প্রবাসীতে আমরা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি; সংপ্রতি ভিয়েনার মেডিট্‌শিনিশে-ক্লিনিক্ নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় অধ্যাপক ডাক্তার সাওয়্যারব্রুক্ তাঁহার নিজের ও ডাক্তার ষ্টোডোলা নামক জুরীক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের উদ্ভাবিত এক কৃত্রিম হাতের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই হাত নুলোর বাহুতে জুড়িয়া দিলে সেই বাহুর পেশীর চালনায় স্বাভাবিক হাতের মতন সমস্ত



চিমটার মতন কৃত্রিম হাত।

কাজই করিতে পারিবে। অবশ্য এই হাতের কাজ করিবার ক্ষমতা ব্যক্তির নিজের অভ্যাস বুদ্ধি ও কৌশলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে সন্দেহ নাই। সকল অবয়বের মধ্যে হাতের কাজই অত্যন্ত কৌশলময় এবং কৃত্রিম আঙুলকে স্বাভাবিকের মতন খেলাইতে পারা অত্যন্ত কঠিন। উক্ত ডাক্তার নানা জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন যে কোনো অঙ্গের কতকটা কাটিয়া ফেলিলেও সেই অঙ্গের অবশিষ্ট অংশে যে স্নায়ু শিরা ও পেশী থাকে তাহাদের দ্বারাই গতিবিধি ও সমস্ত কাজের জোর উৎপন্ন করা যায়। তখন তিনি যুদ্ধে আহত সৈনিকদের জখমি অঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহার পরীক্ষার সফলতা প্রমাণ করেন। জখমি অঙ্গ ছেদনের সময় স্নায়ু শিরা ও পেশী যাহাতে যথা-সম্ভব সঙ্কুচিত হইয়া নুলো হাতটা যাহাতে খুব আঁটালো ও নিরেট হয়



স্বাভাবিক হাতের ন্যায় কর্ম্মক্ষম কৃত্রিম হাত।
(১) হাত মুড়িয় মুঠা করার ছবি। (২) হাত ঝুলাইয়া রাখার ছবি। (৩) মুঠি খুলিয়া হাত বাঁকাইবার ছবি। বাহুর সঙ্গে এই কৃত্রিম হাত বাঁধা থাকে, ও বাহুর পেশীর চালনাতেই সমস্ত হাতের কাজ হয়।

তাহার দিকে তাঁহার লক্ষ্য থাকে। এই আঁটালো নুলো অঙ্গের দীর্ঘপেশী দেড় বা দুই ইঞ্চিতে সঙ্কুচিত করিয়া বাইশ পাউণ্ড ভারী জিনিষ তুলিবার ক্ষমতা পাওয়া গিয়াছে। অস্ত্রবিদ্ ডাক্তার সাঁওয়্যারব্রুক্ নুলো হাতের শিরা স্নায়ু ও পেশী সঙ্কুচিত ও সংযত করিয়া তুলিলেন এবং যন্ত্রকৌশলী অধ্যাপক ষ্টোডোলা সেই নুলো হাতের শক্তিতে চালনক্ষম কৃত্রিম হাত গড়িলেন। এই হাতের আঙুল এক সেট কপিকলের ক্রিয়ার দ্বারা চালনা করা যায়। প্রত্যেক আঙুলকে চালাইবার কপিকল স্বতন্ত্র থাকাতে এবং একের অবস্থানের উপর অপর আঙুলের নির্ভর না থাকাতে এই কৃত্রিম হাতের আঙুল দিয়া যে-কোন আকারের এবড়ো-খেবড়ো জিনিষও চাপিয়া ধরিতে পারা যায়—জিনিষের যেখানটা যেমন উঁচু নীচু আঙুলগুলাও ঠিক তেমনি ভাবে চাপিয়া পড়ে। এতদিন পর্য্যন্ত একএক ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ-বিশেষ রকমের হাত তৈয়ারী হইতেছিল। তাঁতীর কাজে মাকু ঠেলিবার জন্য অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একবার জোড়া ও আর-একবার খোলা দরকার হয়; অতএব নুলো

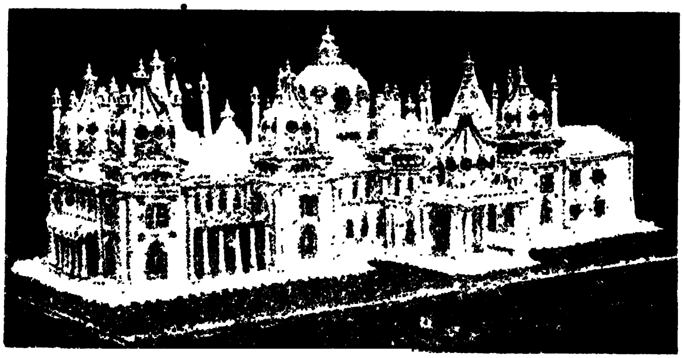
তাঁতীর জন্য যে হাত তৈয়ারী হইত তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর স্থানে দুটা হুক থাকিত যাহা ইচ্ছা-মত জোড়া ও খোলা যায়। এই নূতন হাতের সুবিধা এই যে তাহার দ্বারা সকল রকম ব্যবসায়ের কাজই অনায়াসে চলিতে পারিবে। অধিকন্তু ইহার আকার স্বাভাবিক হাতের ন্যায় হওয়াতে অঙ্গহীনের মনে যে প্রসন্নতা আসিবে তাহার মূল্য নাই।

চারু।

* *
*

চিনির গৃহ—

কোন মানুষ কিম্বা কোন গৃহের অবিকল প্রতিকৃতি আমরা সচরাচর চিত্রে দেখিতে পাই। কিন্তু চিত্রশিল্পী ভিন্ন অন্যান্য শিল্পীরাও এ বিষয়ে কম পটু নহেন। তাঁহাদের কেহবা মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি, কেহবা ধাতব প্রতিমূর্ত্তি, কেহবা প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার কেহবা শ্বেতচূর্ণে (Paris plaster) নির্ম্মিত শুভ্র সুন্দর মূর্ত্তি গঠন করিয়া যশোভাজন হইয়াছেন। বিলাতের এফ এণ্ড কোম্পানী, যাঁহারা লণ্ডনের ক্রিষ্টাল প্যালেসে আতস বাজী প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাঁহারা, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির অগ্নিময় প্রতিকৃতি ও বহু প্রসিদ্ধ ঘটনার অগ্নিময় চিত্র প্রদর্শন করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছেন। ইঁহারা দিল্লী-দরবারের সময় আমাদের ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী কলিকাতা প্রভৃতি নগরে আমাদের সম্রাট প্রভৃতির অগ্নিময় প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।



চিনির-বাড়ী।

আমাদের ভারতবর্ষেও এই-সকল শিল্পীর অভাব নাই। কৃষ্ণনগরের কুম্ভকারগণ ও আগ্রার প্রস্তরশিল্পীগণ তাঁহাদের অসামান্য কর্ম্মনৈপুণ্যে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল বোম্বাই-নিবাসী শ্রীযুক্ত গণপতি কাশীনাথ ম্হাত্রে শ্বেতচূর্ণে (Paris plaster) নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশে এবং বিদেশে সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিনায়ক পাণ্ডুরং কারমরেকার নামক আর-একজন মহারাষ্ট্র শিল্পী শ্রীমতী আনিবেসান্ত, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতির শ্বেতচূর্ণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠন করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই সুপরিচিত ও ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। দেশদেশান্তর হইতে যে-সকল নরনারী তাজ-মহল দেখিবার জন্য আগ্রা নগরীতে প্রতিনিয়ত সমবেত হইয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকেই তথা হইতে তাজমহলের ক্ষুদ্র মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তি ক্রয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সেই-সকল মূর্ত্তি এখনও কত গৃহে সুসজ্জিত কাচনির্ম্মিত আধারে অথবা কক্ষ-বিশেষে সযত্নে রক্ষিত হইয়া সে গৃহের শোভাবর্দ্ধন ও শিল্পীর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

পাঠক পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পীর মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কি এমন কোন ব্যক্তির সংবাদ পাইয়াছেন যিনি চিনি দ্বারা কোন ব্যক্তি বা গৃহের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? সম্প্রতি রয়াল ম্যাগাজিন (Royal Magazine নামক কোন ইংরেজী মাসিক পত্রে চিনি-নির্ম্মিত একটি সৌধের কথা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এই মাসিক পত্রিকা নিতান্ত ছিন্ন অবস্থায় আমার হস্তগত হওয়ায় উহা কোন্ মাস ও বৎসরের তাহা জানিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য এরূপ ঘটনার কথা আর কোথাও অবগত হইতে পারি নাই। তাই আজ অশ্রুতপূর্ব্ব ও বিচিত্র শিল্পের কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে প্রদান করিতেছি।

পূর্ব্বোক্ত পত্রিকায় প্রকাশ যে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রাইটন নগরে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ জর্জ্জ কর্তৃক একটি সুরম্য ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই প্রাসাদের একটি চিনি-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি ব্রাইটন নগরস্থ কোন দোকানের বাতায়নে রক্ষিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি গঠনে দুই জন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে ২১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া উহার কার্য্য সমাপন করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে এই চিনির গৃহ ১২টি ডোম, ৩৪টি চূড়া, ১১টি জানালা ও ২৫০০০ রৌপ্য-গোলক দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছে এবং উহার অন্তর্গত প্রতি কক্ষে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা থাকায় সন্ধ্যাকালে ঐ গৃহ আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উহার যেরূপ শোভা হয় তাহা অতীব উপভোগ্য। এই মূর্ত্তিটির দর্শন লাভের জন্য দলে দলে কত লোক যে ব্রাইটন নগরস্থ পূর্ব্বোক্ত দোকানের বাতায়ন-নিম্নে সমবেত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। দর্শকগণের এতাদৃশ অনুরাগ হইতে মূর্ত্তিটির স্বাভাবিকত্ব ও শিল্পীর কৃতিত্ব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

এবম্বিধ চিনির গৃহ বা মনুষ্যমূর্ত্তি অন্যত্র কেহ গঠন করিয়াছেন কি না কিম্বা বর্ত্তমানে এই শিল্পের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা সম্যক্ অবগত নহি। কিন্তু এই শিল্প যে ক্রমে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও আমরাও যে ঐসকল মূর্ত্তি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব ইহা নিশ্চয় আশা করিতে পারা যায়।

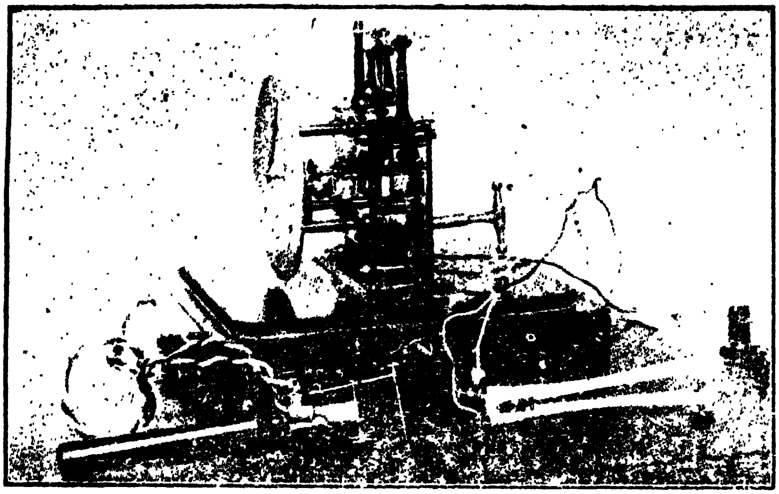
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মল্লিক।

* *
*

বিমান-চারীদের যোগ্যতার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—

সাধারণতঃ—যোগ্যতা যেরূপই থাকুক, অনুরোধ-পত্রের জোরেই অনেক সময় চাকরী মিলে। কিন্তু যে সব কার্য্যে কোনো জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে, তাহাতে শুধু প্রশংসাপত্র দেখিয়া চাকরী দিলে চলে না। এর মধ্যে যুদ্ধবিভাগ অন্যতম। ডাক্তার যদি পরীক্ষা করিয়া কাহাকেও সামরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যের উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবেই সে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হয়, নচেৎ নহে।

যে-কোনো সবল ব্যক্তিই সামরিক স্থলসৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু বিমান-বিভাগে আরো বেশী যোগ্যতা চাই। এই বিভাগে দৈহিকবলের সঙ্গে বুদ্ধিবল ও স্নায়ু, দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ প্রভৃতির অনুভূতি খুব তীক্ষ্ণ থাকা আবশ্যক। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ ডাক্তারে কর্ম্মপ্রার্থীদের দৈর্ঘ্য, ওজন, বুকের বেড়, হৃৎস্পন্দন, ফুস্ফুসের আকার ও চক্ষুর তীক্ষ্ণতা



দ্য আসোভাল কর্তৃক উদ্ভাবিত ক্রনোস্কোপ।
বামদিকে হাতুড়ীটি ডাক্তারের হাতে ও ডানদিকের চিমটাটি পরীক্ষার্থীর হাতে থাকে।

পরীক্ষা করেন ও বিশেষ কোনো খুঁৎ না পাইলে তাহাদিগকে 'কার্য্যক্ষম' বলিয়া মত দেন, এবং তাহারা বিমান-বিভাগে প্রবেশ করে। কিন্তু মানুষের অনুভবশক্তি ও বিচারশক্তি সীমাবদ্ধ, সুতরাং অনেক সময়ে অনুপযুক্ত লোকও 'উপযুক্ত' বলিয়া গৃহীত হয়, এবং কয়েক মাস পরে 'অকর্ম্মণ্য' বলিয়া বিতাড়িত হয়, তাই কি নিজের ও দেশের বিপদ ঘটাইয়া বসে।

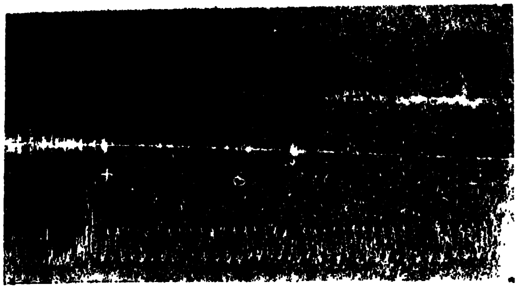
পক্ষান্তরে ফ্রান্সে এই পরীক্ষাকার্য্য বর্ত্তমানে যন্ত্রদ্বারাই সম্পাদিত হয়, আর সে-পরীক্ষা যেমনই সূক্ষ্ম, তেমনি অভ্রান্ত। দুইজন ডাক্তার ম্যাসিয় জাঁ কামা ও ম্যাসিয় নেপার এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা, ও তাঁহারাই এই যন্ত্র পরীক্ষাকার্য্যে প্রয়োগ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পরীক্ষায় প্রথমতঃ দেখা হয় যে কর্ম্মপ্রার্থী দর্শন, শ্রবণ, বা স্পর্শের অনুভূতি কত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারে। দ্য আসোভালের উদ্ভাবিত ক্রনোস্কোপ নামক একটা যন্ত্র ইহা নির্ণীত হয়। এই যন্ত্রে ঘড়ীর মুখের মত একটা অঙ্গ আছে। ঘড়ীর মুখটা যেমন ৬০ ভাগে বিভক্ত, ইহা তেমনি ১০০ ভাগে বিভক্ত। একটা কাঁটা এই একশত দাগের উপর দিয়া এক সেকেণ্ডে একবার ঘুরিয়া আইসে। এই যন্ত্রটি তার দিয়া একটা ছোট হাতুড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। হাতুড়ীটির মধ্যে বিদ্যুৎ-চুম্বকের (electro-magnet) এমন একটা কল বসানো থাকে, যে, ইহাদ্বারা কিছুতে আঘাত করিলেই পূর্ব্বোক্ত কাঁটাটি চলিতে আরম্ভ করে। পিত্তল-নির্ম্মিত চিমটার মত আর-একটি যন্ত্রও তার দিয়া মূল যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই যন্ত্রের পিত্তল-ফলক দুটি যদি চাপিয়া ধরিয়া উভয়ের মধ্যে সংস্পর্শ স্থাপন করা যায়, তবে কাঁটাটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। হাতুড়ীটি ডাক্তার নিজে লইয়া, পরীক্ষাধীন ব্যক্তির হস্তে চিমটাটি দেন।

প্রথমে শ্রবণানুভূতির পরীক্ষা। ডাক্তার পরীক্ষার্থীকে বলিয়া দেন যে সে যেন শব্দ শুনিবামাত্র চিমটার মুখ চাপিয়া ধরে; এই কথা বলিয়া ডাক্তার হাতুড়ীটি দিয়া একটা টীনের বাক্সে আঘাত করেন, কাঁটাটি অমনিচলিতে আরম্ভ করে। আবার পরীক্ষার্থীও শব্দ শুনিয়া চিমটা চাপিয়া ধরিতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই দুই কার্য্যের মধ্যে কাঁটাটি যতগুলি ঘর অতিক্রম করিয়া যায় তাহার সংখ্যা দেখিয়াই বুঝা যায় শব্দ শুনিয়া তাহা প্রকাশ করিতে পরীক্ষার্থীর এক সেকেণ্ডের একশত ভাগের কত ভাগ সময় লাগিয়াছে। কাঁটাটি যদি ৬ ঘর যাইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে এক সেকেণ্ডের একশত ভাগের ৬ ভাগ সময় লাগিয়াছে। যদি ১৭ ঘর যাইয়া থাকে তবে এক সেকেণ্ডের ১০০ ভাগের ১৭ ভাগ; ইত্যাদি।

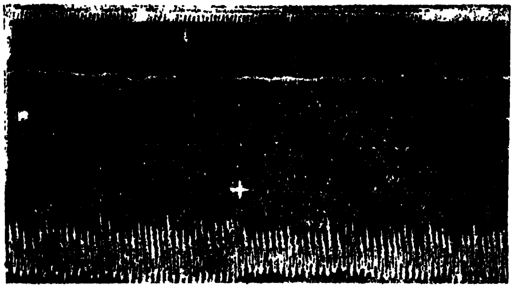
স্পর্শানুভূতিও এই যন্ত্র দিয়াই দেখা যায়। পূর্ব্বে কিছু না বলিয়া ডাক্তার পরীক্ষার্থীর মাথায় বা হাতে হাতুড়ীটি দিয়া মৃদুভাবে আঘাত করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি স্পর্শ অনুভব করা মাত্রই চিমটা চাপিয়া ধরেন—কাঁটা বন্ধ হইয়া যায়। দর্শনানুভূতির পরীক্ষাও এই প্রকারেই হয়। ডাক্তার হাতুড়ীটি একটু দূরে টেবিলে ছোঁয়ান, দেখিবামাত্র পরীক্ষার্থী চিমটা চাপিয়া



রিভলভার আওয়াজ করিয়া পরীক্ষার্থীর স্নায়ুশক্তি পরীক্ষা করা হইতেছে। বুকে নিউমোগ্রাফ, ডান হাতে সিসমোগ্রাফ ও বাঁ হাতে নাড়ী পরীক্ষার যন্ত্র।

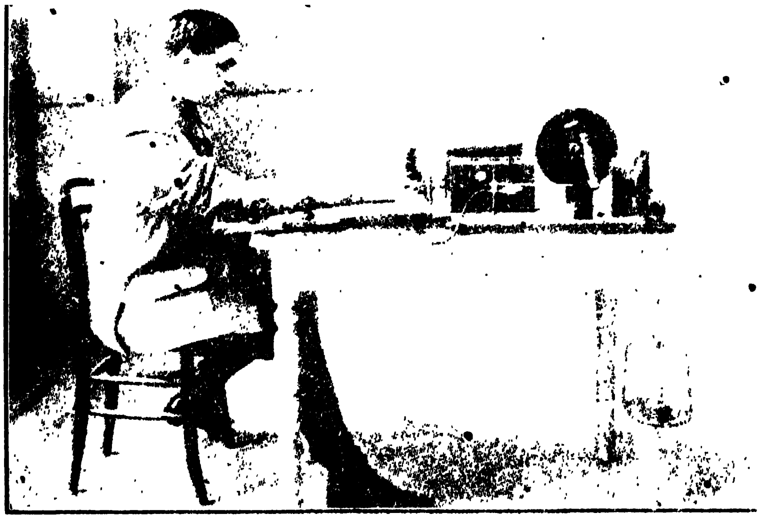


পরীক্ষার্থীর অযোগ্যতার সাক্ষ্য। শাদা যোগচিহ্নটি যে-সময়ে রিভলভার আওয়াজ করা হয় তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। সকলের উপরে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি। তার নীচে নাড়ীর গতি। তার নীচে হাতের কম্পন। এই চিত্রে সবগুলিই খুব অ-সম। ইহা হইতে বুঝা যায় যে পরীক্ষার্থী খুব চমকাইয়া গিয়াছে, সুতরাং তার স্নায়ুশক্তি কম। সকলের নীচেকার দাগগুলি সেকেণ্ড বুঝায়।



পরীক্ষার্থীর যোগ্যতার সাক্ষ্য। রিভলভারের শব্দ শুনিয়াও সে খুব বেশী চমকায় নাই, প্রমাণ তার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি, নাড়ীর গতি, বা শরীরের কম্পন কোনটাই বেশী অ-সম নহে।

খুব চমকাইয়া উঠেন, জোরে নিশ্বাস পড়িতে থাকে, হৃৎকম্প উপস্থিত হয় ও হাত পা কাঁপিতে থাকে। এরূপ লোক বিমানবিভাগের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর বুকে নিউমোগ্রাফ্ (pneumograph) নামক একটি যন্ত্র পরাইয়া দেওয়া হয়, ইহাতে নিশ্বাসের গতি ধরা যায়। বাম হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমায় অন্য একটি যন্ত্র পরাইয়া দেওয়া হয়, ইহাতে নাড়ীর গতি ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝা যায়। কম্পনের গতি ধরিবার জন্য পরীক্ষার্থীর ডান হাত 'সিসমোগ্রাফ' (seismograph—যাহা দিয়া ভূমিকম্প ধরা যায়) যন্ত্রে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই তিনটি যন্ত্রই একটা একটা লেখনীর (style) সহিত সংলগ্ন থাকে, এবং লেখনীগুলির মুখ একটা ভুষামাখা চোঙের (cylinder) গায়ে ঠেকিয়া থাকে। হঠাৎ একটা রিভলভার আওয়াজ করিয়া, বা ম্যাগনেশিয়ম্ আলো জ্বালিয়া, বা তুষার-শীতল এক খণ্ড বস্ত্র, পরীক্ষার্থীর গায়ে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে 'চমকাইয়া' দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভুষামাখা নলটি ঘুরিতে থাকে ও তাহার লেখনীগুলি পরীক্ষার্থীর স্নায়ুশক্তির কথা লিখিয়া দেয়।



পরীক্ষার্থীর ক্লান্তি-সহতা পরীক্ষা করা হইতেছে। আঙ্গুল বাঁকা করিলেই টেবিলের পায়ার কাছের ভারটি উঠে। চাকতির উপর পরীক্ষার্থীর ক্লান্তি লেখা হইয়া যায়।

ধরেন, কাঁটা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কত সময় লাগিল তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই নিরূপিত হয়। যাহারা শব্দ ও স্পর্শের অনুভূতি ১৭/১০০ সেকেণ্ডে, এবং দর্শনানুভূতি ১৯/১০০ সেকেণ্ডে, প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহারাই যোগ্য বলিয়া গৃহীত হন। এর চেয়ে যাহাদের বেশী সময় লাগে তাঁহারা বিমান-বিভাগে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। তাঁহাদের স্পর্শানুভূতিতে সাধারণতঃ ৮/১০০ হইতে ২০/১০০ সেকেণ্ড, শ্রবনানুভূতিতে ১৭/১০০ হইতে ৩৩/১০০ সেকেণ্ড, এবং দর্শনানুভূতি ১২/১০০ হইতে ১৮/১০০ সেকেণ্ড লাগে। যন্ত্র-সাহায্য ভিন্ন এরূপ সূক্ষ্ম-বিচার অসম্ভব।

পরীক্ষার আর একটা বিষয়, কর্ম্মপ্রার্থীর স্নায়ুশক্তি। সকলেই জানেন, যাঁহাদের স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল, তাঁহারা কোন উচ্চ শব্দ শুনিলে

পরীক্ষার্থীর হাত ও বাহু সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে কি না, ইহাও দেখা আবশ্যক। একটা যন্ত্রের উপর পরীক্ষার্থী ডান হাতখানা চিত করিয়া রাখিয়া একটা আংটার মধ্যে তর্জ্জনী প্রবেশ করাইয়া দেয়। যন্ত্রটিতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে এ অবস্থায় আঙ্গুল বাঁকা করিলেই একটি ছোট ভার (weight) উপর দিকে উঠিবে ও আঙ্গুল সোজা করিলেই তাহা আবার নামিয়া যাইবে। পরীক্ষার্থী ক্রমাগত আঙ্গুল বাঁকা-সোজা করিয়া এই ভারটি উঠাইতে-নামাইতে থাকে। প্রথমে বেশ তাড়াতাড়ি হয়, পরে যতই আঙ্গুল ক্লান্ত হইয়া আইসে উহার বেগও ততই কমিয়া যায়। এই ক্লান্তি একখানা ভুষামাখা চাকতির উপর লিপিবদ্ধ হয়। যে সহজেই ক্লান্তিতে অভিভূত হইয়া থামিয়া পড়ে, সে বিমান-

বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে না। আকাশযানে বিমানচারীদিগকে যন্ত্র-সঞ্চালক দণ্ডগুলি (levers) খুব দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া থাকিতে হয়, ও মুহুর্মুহুঃ নাড়া-চাড়া করিতে হয়, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সহজে ক্লান্তিতে অবসন্ন না হওয়া খুবই আবশ্যক।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন গুপ্ত।

ব্রহ্মপল্লীচিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪

বসন্তকাল। গৃহে গৃহে স্ত্রীলোকেরা খড়ের টোকা প্রস্তুত করিতেছে। উঠানে বৃহৎ পিপার মত মরাই। ধনীর গোলায় ধান পূর্ণ।

আজ প্রাতে নদীতীরের দৃশ্য অতি মনোরম। পিয়াক্-কা-ড্যিন্ বা পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট দিন ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ। ঘাটে ধান-বোঝাই নৌকার সারি। যাত্রী ব্যতীত যাহারা গৃহে অবস্থান করিবে তাহারাও নদীতটে বিরাজমান। মাল-বোঝাই শেষে কতকগুলি বস্তা গড়েন ঘাটের ধূলা-বালির উপর পড়িয়া ছিল। কেহ সেই বস্তা-পৃষ্ঠে বসিয়া ধূমপান করিতেছে, কেহ বড় পাথরটার উপরে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে, কেহ নৌকারোহী আত্মীয়কে ডাকিয়া সাংসারিক কথা বলিতেছে—নৌকার বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া যাত্রী উত্তর প্রদান করিতেছে। কয়জন বালক-বালিকা যাইতে না পাইয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতেছে। যাহার করিবার কিছুই নাই, অনর্থক একটা কোলাহল তুলিয়া সে ওপারের জঙ্গল কাঁপাইতেছে।

ফো-লোনের বেজায় আনন্দ। মা-পানের সহিত সে এক নৌকায় যাত্রী। সেই নৌকাতে মং-মৌএর, ও তাহাদের নৌকাতে তাহার নিজের যাইবার কথা হইয়াছিল। যাইবার সময়ে মং-মৌ তাহার সহিত নৌকা বদল করিয়াছে। মাথায় রেশমী রুমাল বাঁধিয়া দুই উরু চাপড়াইয়া সে গান ধরিয়াছে। তাহার জননী লাঠি হস্তে বকুল-গাছের তলায় বসিয়া আছেন।

যাত্রার পূর্ব্বে জলদেবী 'ঈয়ে নাৎ'এর পূজা হইল। মন্ত্র-পাঠের সঙ্গে-সঙ্গে চাল-কলা-সুপারি-মসলাদির নৈবেদ্য চাঙারি-সমেত নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইল। সমবেত লোকের কোলাহলের সঙ্গে-সঙ্গে তরণীগুলি একে একে ছাড়িয়া দিল। বালার্ককিরণোজ্জ্বল সুনীল সলিলে দাঁড় ক্ষেপণের তালে-তালে দাঁড়ীরা মঙ্গলাচরণ গান ধরিল। মৃদু মৃদু হিল্লোলে কনককিরণ মিশিয়া এক অভূতপূর্ব্ব উজ্জ্বল বর্ণ-বিকাশ করিয়া দিল।

দূরে, নব-কিসলয়বস্ত্রপরিহিত বনস্পতির পশ্চাতে কুয়াসার উত্তরীয়ধারী শ্যাম-শৈলরাজপানে বিভোর-নয়নে তাকাইয়া মং-ব্যু মহাশয় ধূমপান করিতেছিলেন,—মা-পান্ কামরা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। ফো-লোন্‌কে দেখিয়া তাহার চঞ্চল নয়নে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সজোরে ক্ষেপণী নিক্ষেপ করিয়া সেও স্বীয় অপাঙ্গের কোণে উত্তর লিখিয়া দিল।

"পেছনে চেয়ে দেখো বাবা, যেন সকলে বাচ্ খেলছে।"

"মং-লেটের নৌকোই বোধ হয় সকলকে এগিয়ে আসছে?"

লজ্জায় মা-পানের শির নত। মং-মৌই সে নৌকার কর্ণধার।

বামে ক্যাথেইয়ং গ্রামের ঘাট। বিশ-পঁচিশখানা নৌকা বোঝাই হইতেছে।

"তোমরা কবে বেরুচ্ছ হে?"

"বুধবার সকালে।"

"ঈয়েদুইন্ তাগার (কূপ প্রতিষ্ঠাতার) কি খবর?"

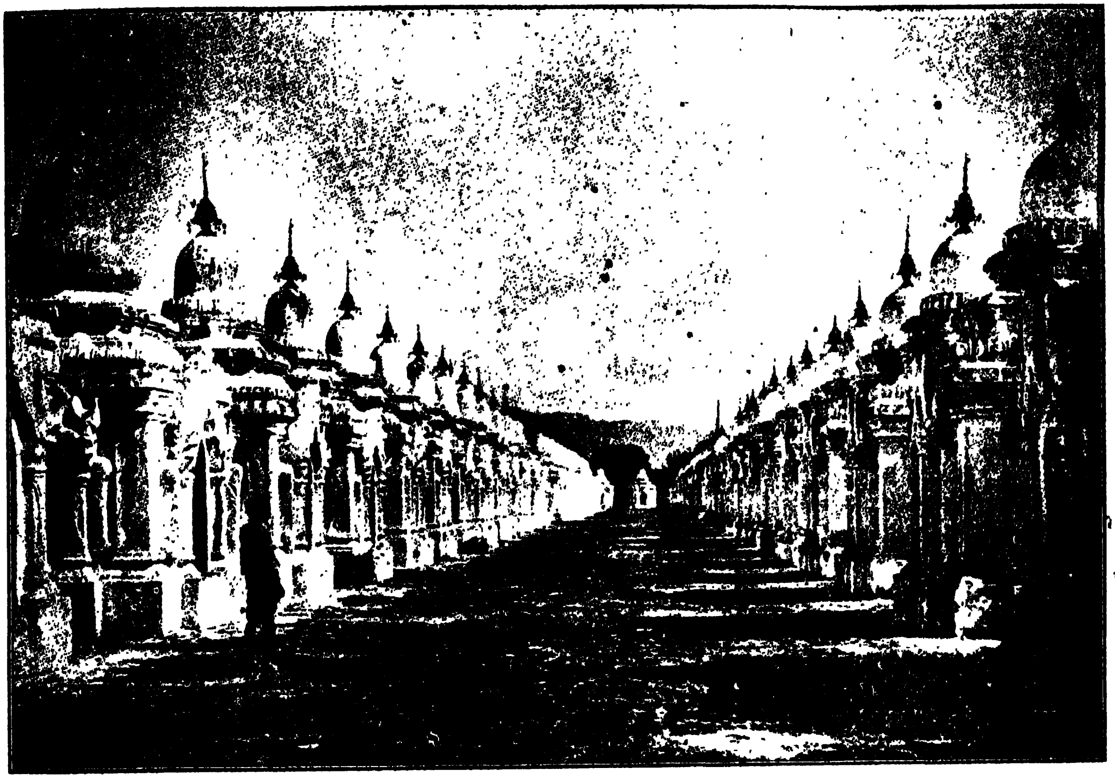
"তার ঘর পুড়ে গেছে।"

"কবে?

"কাল দুপুরে। রাত্তিরটা যাত্রা গেয়ে কাটিয়েছে, আজ ভিক্ষুদের কাছে মাঠে আস্তানা—" আর শোনা গেল না। পিছনের লোকেরা "হেঃএএ—" রবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

প্রায় এগারটা। নদীতীরে জঙ্গল দেখা যায় না। দুই ধারেই গিরিমাটির মত অসমতল ধানক্ষেত। ডান দিকে, দূরের মেঘচুম্বী আরাকান পর্ব্বতের কিয়দংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; কিয়দংশ নীল 'এনামেল' গ্লাসের মত। তাহার অরণ্যাবৃত শিরে গুড়ে-চিনির মঠের মত একটি বৌদ্ধমন্দির।

বাঁকের মুখে তরণী পালভরে চলিয়াছে। বাঁশের



বর্ম্মার ৭২৯ প্যাগোডার বীথি।

বেড়ায় ঘেরা আমবাগানের ফাঁকে দুই চারিটা বৃহৎ টৌঙ্ঘর নৌকারোহীর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে স্থানের তীর খুব উঁচু সোজা। ক্রমশঃ ঢালু। ঢালুতীরের এক-স্থানে রাশীকৃত পলিমাটি। সম্ভব মৃৎপাত্র নির্ম্মাণের জন্য। স্লেটের মত ভাসমান কয়খানা তক্তার উপরে জনৈক যুবতী কলসীকক্ষে দণ্ডায়মান; একজন সুন্দরী আবক্ষজলে লুঙ্গী প্রসারিত করিয়া দুই করে তাহা মার্জ্জনে নিরত। দুইজন বালক সন্তরণক্রীড়ায় রত। তাহাদের কুকুরটা ঘাটে দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতেছে। উপরে ফলবাগানের মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধ মন্দিরের চূড়া। তাহার অনতিদূরে বাঁশঝাড়ের পার্শ্বে, মিশনরিদের কাঠের গির্জ্জা। উভয়ের পশ্চাতে নীল-পর্ব্বতের শিরোভাগ;—মধ্যে বাঁকাচোরা সরু পথ। পথটির উপরে ফলভারাবনত আম্রশাখে বসিয়া একজোড়া হনুমান কলহ করিতেছে।

অপরাহ্ণে হাল ঘুরাইতে ঘুরাইতে মং-ব্যু মহাশয় বলি-লেন—"কাঁটাবনের মাঝে মাঝে ঐ যে পোড়া-কাঠগুলো দেখা যাচ্ছে ওখানে একটা গ্রাম ছিল। বছর দুই আগে একদিন হঠাৎ একদল ডাকাত এসে পড়ল। প্রাণভয়ে কারেনরা দূরে ঐ হোগ্‌লা বনের মধ্যে পালাল। অনেক ধনদৌলত লুঠ করে তারা গাঁ জ্বালিয়ে চলে গেল।"

তখন—নৃত্যশীল অগ্নিশিখার পশ্চাতে দৃশ্যমান পদার্থের মত, অপরাহ্ণকালীন রৌদ্রকিরণপ্রভাবে দূরের শৈলমালা অবিরাম থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

ব্যাঘ্র ও দ্বিখড়্গধারী গণ্ডার-সেবিত জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বড় একটা গ্রামের ঘাটে নৌকা নঙ্গর করিল। তখন ভাটা। জোয়ার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। নদীর জলে মুখ হাত ধুইয়া মাল্লারা হাত-পা ছড়াইয়া বসিল। মা-তেন্ তোলা-উনুনে আগুন জ্বালিয়া দিলেন। মা-পান্ মাথা-পিছু দুই আঁজলা হিসাবে চাউল বাহির করিয়া দিল। চাল ধুইবার সময় ফো-লেমি দেখিল ও-ঘাটে মং-মৌ তাহার পিতার নৌকায় রন্ধন করিতেছে।

আহার করিয়াই সকলের শয়ন ও নিদ্রা। দিনমানে



অধিকক্ষণ নিদ্রা হওয়ায় মা-পান্ বাহিরে নদীবের কাছে আসিয়া বসিল। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। বাতাস সুশীতল। মা-পান্ আপন মনে এই গানটি গাহিতে লাগিল—

(বাঙ্গালা উচ্চারণে লিখিত)

ঈকম্বাঃ তুঃ ময়া পে লোক্
কোন্ মা কা-ইক্ বায়ে
কোন্ মা মানে নাইং ম থাইং নাইং
লোক্ ফোক বায়ে
কো মং মং যে
য়াগু তুঃ ভেক্ গা লে থাইক্ লে
পান মাঃ ফোয়েং স লোঃ
শেং গো চেইত্ ধেঃ মঃ আলোন্ তায়
আউক্-মে বায়ে।

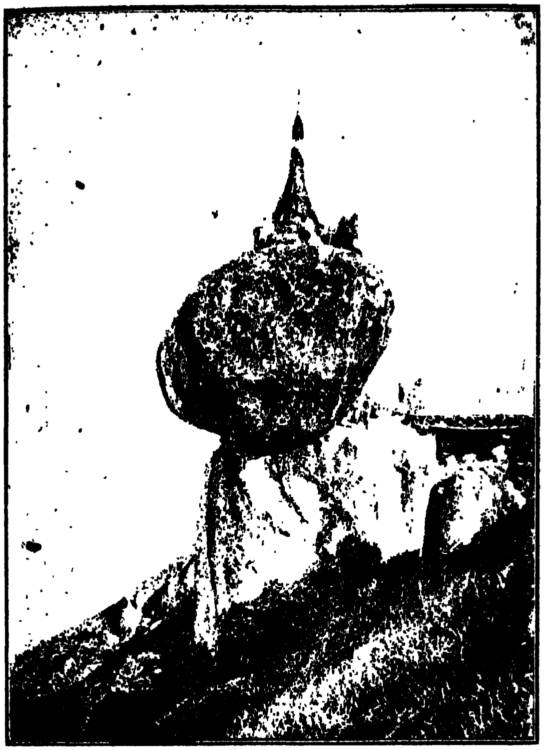
(অনুবাদ)

এ ভুবনে কোনো ঠাঁই, হেন ভালবাসা নাই
তোমারে যত গো আমি বাসি।
ধৈরয ধরিতে নারি তোমার মূরতি হেরি
তোমা পানে চেয়ে শুধু হাসি।
যাইছে মলয় বায়, অলি গুন্ গুন্ গায়,
ফুটিয়াছে ফুল রাশি রাশি।
তোমা তরে এ জীবন, করেছি করেছি পণ
তোমারেই শুধু ভালবাসি।

ফো-লোন্ আসিয়া কহিল "কিছু টাকা হাতাবার বেশ একটা ফন্দী ঠাউরেছি।" সাতনলের কথা মা-পান বিস্মৃত হইয়াছিল। ফো-লোনের কিন্তু তাহার জন্য আহার নিদ্রা ছিল না। "ফন্দীটা শুনবে?"

বালক জননীকে সহপাঠীর কথা কিছু বলিতে চাহিলে, ভাতের ফেন গালিবার সময় জননী যেমন অন্যমনস্কভাবে তাহাকে বলিতে আজ্ঞা করেন, মা-পান্ সেইরূপ ভাবে বলিল "বল।"

"গুদামে যখন বাবার ধান মাপা হবে—মাপ্‌ব ত' আমিই—সে সময়ে রেকের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে—ঝোড়া-পিছু কিছু-কিছু ধান কেটে নেবো। বাবাও খুসী হয়ে দু-চার টাকা কোন্ না দেবেন্।"



এই মন্দিরটি পাহাড়ের মাথায় একটি বড় শিলাখণ্ডের উপর নির্ম্মিত এই শিলাখণ্ড বাতাসে দোলে, অথচ এমন ভারসাম্য আছে যে উল্টাইয়া নীচে পড়িয়া যায় না; শিলাখণ্ডের আকার বর্ম্মার সাম্পান নৌকার মতন্ বলিয়া মন্দিরটির নাম সাম্পান প্যাগোড; মন্দিরে যাইতে হইলে প্রধান পাহাড়ের মাথা হইতে মই দিয়া শিলাখণ্ডে উঠিতে হয়। এই মন্দির সমুদ্রতল হইতে ৩৬৫০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।



বর্ম্মার পুরোহিত।

ধরা পড়িবার ভয় দেখাইয়া মা-পান্ তাহাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বলিল। কিন্তু যখন কৌশলটি তাহাকে ভালরূপে বোঝানো এবং গহনার কথা উল্লেখ করা হইল তখন সে ফো-লোন্‌কে প্রশংসা করিয়া বলিল—"দুজনে চুপি-চুপি বাজারে গিয়ে সাতনল কেনা যাবে।"

ত্রয়োদশী রজনীর তৃতীয় প্রহর। শিলাদিত্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিশানাথ হাস্যবর্ষণ করিতেছেন্। মৎস্যরাজকুমারী তাঁহার গলায় বরমাল্য নিক্ষেপ করিয়া লজ্জাভরে সলিলতলে পলায়ন করিতেছে। ওপারে, বনস্পতির সহিত দ্রুতলয়ে কণ্ঠ মিশাইয়া ঝিল্লীকুল ঝিঁঝিট রাগিণীতে যশকীর্ত্তন করিতেছে।

জোয়ারের স্পর্শে নৌকা দুলিতে থাকিলে, মং-ব্যু মহাশয় জাগরিত হইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি দাঁড়ীদের জাগাইয়া দিলেন। দশ পনর মিনিটের মধ্যে নৌকাগুলি নিঃশব্দে গ্রাম অতিক্রম করিল।

প্রাতে একস্থানে নৌকা লাগাইয়া রন্ধন ভোজন করিতে হইল। জোয়ার আসিলে নৌকাগুলি পুনরায় বেসিন্ অভিমুখে ছুটিল।

বিস্তৃত নদাবক্ষে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলিয়া একটা মহাকায় জাহাজ সাগরমুখে ছুটিতেছিল। মা-পান্ পিতাকে চাপিয়া ধরিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে নৌকাসহ ডুবিবার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

"মং-ব—"

বক্তা একজন প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ। জাহাজের পশ্চাতে,



বর্ম্মার ফুঙ্গি বা পুরোহিতের পাঠশালা ও ভিক্ষু ছাত্র।

রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ নীচু করিয়া নৌকা দেখিতে-ছিলেন।

"দিগো—বে খোয়া মেলে—এঁদিকে—কোথায় যাচ্ছ হে?"

"পাতোইং থোয়ামে—এই বেসিনে" বলিয়াই মং-ব্যু-মহাশয় একগাল হাসিলেন। সশব্দে বাষ্পীয় পোত দূরে চলিয়া গেল। সগর্ব্বনেত্রে একবার চারিদিকে চাহিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

মা-হেন্ প্রশ্ন করিলেন "ওঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে না কি?"

"বিশেষ আলাপ! উনি মস্ত বড় লোক,—ওঁর সঙ্গে এক টেবিলে খেয়েছি। ওঁর নামটা কি ভুলে যাচ্ছি—এইইই—বড় ভাল লোক, সেদিন উনি আমার সঙ্গে 'শেক্‌হ্যাণ্ড' করেছেন, বেসিনে থাকেন।"

বাঁকের মুখে বেসিন নগরীর কলের চিমনি ও সুউচ্চ প্যাগোডা দেখা গেল। ক্রমে অনেকগুলি জাহাজ ষ্টীমার ময়ূরপঙ্খী সাম্পান নৌকা, বয়া ও জেটি অতিক্রম করিয়া নৌকাগুলি ধীরে-ধীরে একটি সুবৃহৎ গুদামের সম্মুখে আসিয়া নঙর করিল। তীর হইতে নৌকা পর্য্যন্ত ঘোলাজলে ধান ভাসিতেছিল, জলে বড়-বড় তক্তা ভাসানো হইল। দলের জনকয়েক বস্তা পাঠাইতে নৌকার উপরে রহিল, অন্য সকলে গুদামে ধান মাপিতে অথবা অন্য কাজে চলিয়া গেল। মা-পান্ ফো-লোন্‌কে লইয়া কলকারখানা দেখিতে চলিল।

মং-ব্যু-মহাশয়ের ধানমাপা শেষ হইয়াছে এমন সময়ে সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া মা-পান্ ফিরিল। কলের ইঞ্জিনীয়র সাহেব তাহাদের সর্ব্বত্র যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইঞ্জিনের অদ্ভুত কার্য্যকারিতার প্রশংসা মা-পানের মুখে আর ফুরায় না।

মিষ্টর থ্রুপি ব্যস্তভাবে সেইদিকে কোথায় যাইতেছিলেন। মা-পান্‌কে দেখিয়া থামিলেন।

মং-ব্যু—"আমারই মেয়ে। আপনার কল দেখতে গিছলো।"

"তোমার মেয়ে? তোমার নাম কি সুন্দরী? মা-পান্—কুসুম? বেশ নাম!"

মা-পানের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। কি বলিতে হইবে বালিকা খুঁজিয়া পাইল না। শুধু বলিল "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

উত্তর শুনিয়া থ্রুপি সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মা পানের পিতামাতাও সেই সঙ্গে যোগদান করিলেন। ফো-লোন্ একটু ম্লান হাসি হাসিল।

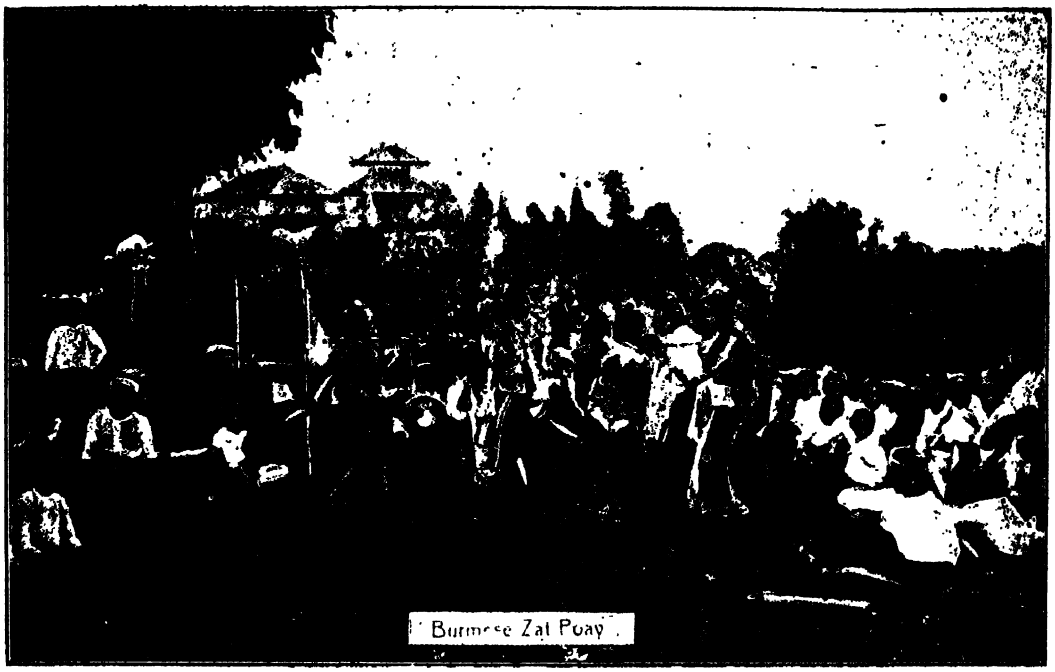
"সহর কেমন দেখ্‌লে?—খুব ভালো?—আচ্ছা আমার বাড়ী দেখ্‌বে?"

মা-পানের চক্ষু দুইটি ডাগর হইয়া উঠিল। মাতার দিকে চাহিল।

"আপনার দয়া—ও যাবে।"

"আচ্ছা" বলিয়া সাহেব চলিয়া গেলেন। তিনি বড় ব্যস্ত।

দিনের চেয়ে সন্ধ্যাকালে গুদামের ভিতর জনতা বেশী। প্রকাণ্ড ঘরের একরকম সমস্তটা জুড়িয়াই রাশীকৃত ধান। ধূলা উড়িয়া বিদ্যুতের আলোককেও নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে। এক কোণে মং-মৌ ও ফো-লোন্ মং-লেট্



বর্ম্মার উৎসব জাট্‌-পোয়ে।



বর্ম্মার রমণীদের নৃত্য।



বর্ম্মার সুন্দরী।

মহাশয়ের ধান মাপ্ করিতেছে। চট্টগ্রামবাসী বৃদ্ধ আঁব্দুল লতিফ মহাশয় খাতা পেন্সিল লইয়া ঝুড়ির হিসাব রাখিতেছেন। সবে মাত্র ঘুমভাঙ্গার পর এই হাঙ্গামা, সুতরাং ফো-লোনের চুরির দিকে তাঁহার নজর নাই।

চুপি-চুপি, মং-মৌ বলিল "আর নয় ধরা পড়্বে।"

"চেপে যাও, কোনো ভয় নেই।"

পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একজন কর্ম্মচারী সব দেখিতেছিল। থুপি সাহেবকে সংবাদ দিবামাত্রই তিনি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ?"

"ওই ছোক্‌রা—আমি দুবার দেখেছি।"

অবিলম্বে মং মৌএর কর্ণমূলে এক প্রবল চপেটাঘাত! মং-মৌ সাহেবকে আক্রমণ করিলে, সাহেব ধাক্কা মারিয়া তাহাকে ধানের উপর ফেলিয়া দিলেন। "আমি নয়" বলিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ও নয় মশাই—" কর্ম্মচারী ফো-লোন্‌কে দেখাইয়া দিল।

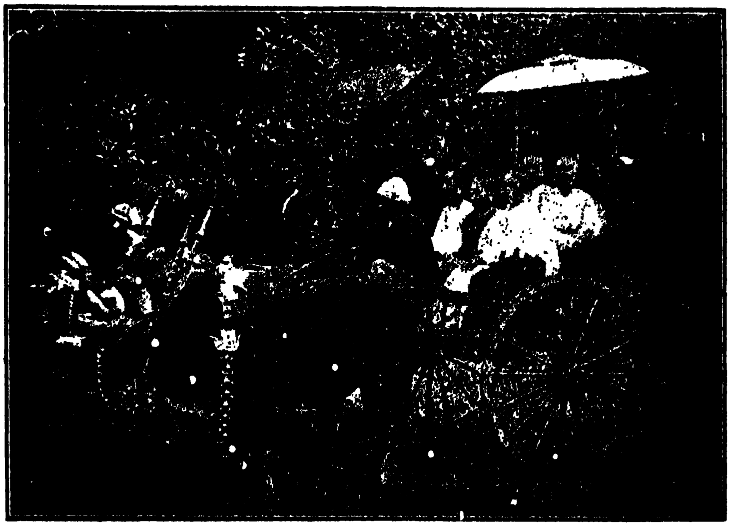
বামহস্তে ফো-লোনের কব্জি ধরিয়া সাহেব বলিলেন "তুই জেলে যাবি না মার খাবি ?"

সকাতরে মং-লেট্ মহাশয় বলিলেন "দয়া করে দুঘা মেরে ছেড়ে দিন।"

বেত্রাঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে ফো-লোন্ তারস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। জনমণ্ডলী নির্ব্বাক বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে ফো-লোন্‌কে লইয়া তাহার পিতা নৌকাতে ফিরিলেন। মং-মৌএর সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় শোয়েটুন্ বলিল, সে আর ফিরিবে না বলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিদ্রার পূর্ব্বে মং-লেট্ মহাশয় স্থির করিলেন, পরদিন ফো-লোন্‌কে গোটা দুই টাকা দিতে হইবে।

মং-মৌ যখন গুদাম হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার জ্ঞান ছিল না। পথে সাহেব অথবা ফো-লোন্‌কে পাইলে সে খুন করিত। আলোকিত রাজপথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে



বর্ম্মার সওয়ারী গরুর-গাড়ী।

ম্যুনিসিপাল বাজারের সম্মুখে গেল। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক। মোড়ে একটি মদের দোকান। ট্যাকে হাত দিয়া দেখিল পয়সা নাই। যাহা হউক চীনাম্যান্ পরিচিত। ধারে চলিতে পারে। দোকানটির সম্মুখভাগ খোলা। ভিতরে বেঞ্চের উপর বসিয়া কয়জন জাহাজী গোরা মদ খাইতেছিল। সাদরে মং-মৌ নিমন্ত্রিত হইল। প্রথম দু এক গ্লাসে মং-মৌ হিসাব রাখিয়াছিল। ক্রমে আট কি আঠারো গ্লাস তাহার স্থিরতা রহিল না।

প্রাতে যখন তাহার চেতনা ফিরিল—সে থানাতে। সঙ্গে একজন সেলর্—নিদ্রিত। কনষ্টেবলের ভাত জল খাইয়া মস্তিষ্কভার কতকটা লাঘব হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে প্রথম গোরার বিচার সে বুঝিল না। দেশী ভাষায় তাহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে আদেশ হইলে সে উঠিল।

"তুমি কাল মাতলামি করেছিলে?"

"হ্যাঁ হুজুর।"

"মারামারি করেছিলে?"

"হতে পারে, মনে নাই।"

সাহেব সমস্তই শুনিলেন। অত্যন্ত পিপাসার বশে মদের দোকানে যাওয়া,—গোরাদের সাদর নিমন্ত্রণ—গান—আর-এক গ্লাসের অনুরোধ—আর স্মরণ নাই। হ্যাঁ, সে জঙ্গলী মানুষ;—বোকা। না, ইতিপূর্ব্বে পুলিশে আসে নাই।

তাহার সততায় সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব তাহাকে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দিলেন। বাহিরে আসিয়া সে দেখিল গোরাটি একজন মুসলমানের সহিত বাক্যালাপে নিযুক্ত। তাহাকে ডাকিয়া মুসলমান বলিল "সাহেব বলছে তোমরা বেকসুর খালাস পেলে অতএব এখন একটু ফূর্ত্তি করা উচিত।" ইঙ্গিতে মদ্যপানের অন্তিম ফল জানাইয়া মং-মৌ নদীর দিকে চলিল।

এদিকে জননীসহ মা-পান বড়ই ব্যস্ত। গতরাত্রে বাজার হইতে তাহারা রেশমী লুঙ্গী, চাদর ও জামা কিনিয়াছিল। সেইগুলি ও হার, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি গহনা পরিয়া, ঘনকৃষ্ণ কেশস্তবকে ফুল গুঁজিয়া, মুখে চন্দন মাখিয়া, পান খাইয়া, কষ্টিমুকুরে স্বীয় রূপের দর কষিয়া, লাল মখমলের চটি-জুতা পায়ে দিয়া, আধ হাত লম্বা 'শালে' চুরুট হাতে লইয়া সাহেবের গৃহে তাহারা উপস্থিত হইল। সাহেব তখন নীচের অফিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তাহাদের উপরে লইয়া গেলেন।

মা-পান এরূপ বাড়ী কখনও দেখে নাই। কার্পেটে মোড়া ঘর, নানাবিধ আসবাব-পত্র, ঘোড়া কুকুরের ছবি, দরজায় ঢুকিতে সাদা ঝালর, বারাণ্ডায় ফুল-গাছের টব, আর কত কি! মা-পানের মাথা গরম হইয়া উঠিল।

মার্ব্বেল পাথরের গোল টেবিলের সম্মুখে পাশাপাশি চেয়ারে তিনজনে বসিয়াছিল। সাহেব মধ্যে। 'বয়' তিনগ্লাস বরফ-লিমনেড দিয়া গেল। মা-পান কখনও বরফ খায় নাই। মুখভঙ্গী যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিয়া বরফ খাইতে হইল। মা-হেন্ কয়টি চুরুট সাহেবকে দিলেন।

"বেশ চুরুট! কুসুমই বোধ হয় তৈরী করেছে?"

সগর্ব্বে মা-হেন্ বলিলেন "আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর মত চুরুট করতে কেউ পারে না।"

"আমার জন্য কতকগুলি তৈরী করবে?"

সলজ্জ মা-পান্ চুরুট পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইল। মাতা বলিলেন "দেড় টাকা শ।" মা-পান্ মাতার দিকে চাহিল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। সাহেব বলিলেন "এ ত অতি সস্তা! এক হাজার চুরুট চাই।"

ভোজনের ব্যবস্থাও গুরুতর। প্রত্যেকের জন্য পৃথক পাত্রে রুটী, মাখন, পুডিং, জেলি, মষ্টার্ড, মাংস, মুরগী, নানাবিধ ফল! রূপার মত কাঁটা চামচ্!

আহারান্তে বৃহৎ একটি মুকুরের সমক্ষে পাঁচ মিনিট অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া মা-পান্ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমাদের এমন আরসি নেই!" ঈষৎ হাসিয়া সাহেব বলিলেন "তোমার মত সুন্দরীর ছবি যদি এই আরসিতে রোজ পড়ত। আপনি কি সে অনুগ্রহ করবেন!"

কি বলিতে যাইয়া সাহেব থামিয়া গেলেন।

বারাণ্ডার বেঞ্চে তিনজনে বসিয়া আছে। চুরুট হাতে সাহেব অন্যমনস্ক।

মা-পান্ বলিল "কেমন চমৎকার বাগান। আমার বড় থাকতে ইচ্ছে করে।"

চিন্তিতভাবে সাহেব প্রশ্ন করিলেন "তুমি এখানে থাকতে চাও?"

সকলে নীরব। কিছু পরে মা-হেন্ কহিলেন "আপনার আজ অনেক কাজ। আমরা যাই, একবার বাজার যেতে হবে।"

উঠিবার সময় সাহেব বলিলেন "সুন্দরী, তুমি চুরুট নিয়ে আসবে ত?"

"ও নিজে নিয়ে আসবে।"

মা-পান্ এক-বাক্স চকোলেট উপহার পাইল।

গুদামের সম্মুখে মং-মৌ তাহাদের সম্মুখে পড়িল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দীর্ঘ কেশরাশি এলোমেলো। সবে মাত্র ঘাটে স্নান করিয়া নৌকায় শয়ন করিতে যাইতেছে।

চকোলেট-মুখে মা-পান্ বলিল "আমরা সাহেবের বাড়ী থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।"

মাথা নাড়িয়া মং-মৌ চলিয়া গেল।

মা-হেন্ বলিলেন "সাহেবরা কখনও মাতলামি করে না।"

মা-পান্ বলিল "চুরিও করে না। ধরা পড়ে মার খাওয়ার চেয়ে নদীতে ডুবে মরা ভাল।"

গ্রামে ফিরিবার কালে মং-ব্যু-মহাশয় ফো-লোন্‌কে নিজ নৌকাতে ডাকিয়া লইলেন। চরিত্র সংশোধন করিতে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন। মা-পান্ জানাইল, সেও পূর্ব্বে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। রাত্রিকালে উভয়ে যখন নৌকার হালের নিকটে গিয়া বসিল, ফো-লোন্ বিবাহের কথা উত্থাপন করিল। মুখ ফিরাইয়া মা-পান্ শয়ন করিতে চলিয়া গেল।

গ্রামে ফিরিবার পরদিনই সংবাদ আসিল, পার্শ্বের গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে। সম্ভব সেই দিনই ম্যুথিট্ আক্রান্ত হইবে। অবিলম্বে সকলে টাকাকড়ি লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করিল।

অপরাহ্ণে বিকট চীৎকার করিতে-করিতে ডাকাতের দল গ্রাম আক্রমণ করিল। বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। ফো-লোন্ ভালরূপে আত্মগোপন করিতে পারে নাই। জঙ্গল-পথে ডাকাতেরা তাহাকে বন্দী করিল।

৫

এক মাস অতীত। মা-পানের সহিত থুপি সাহেবের বিবাহ হইয়াছে। সাহেব মা-হেন্‌কে ৪০০৲ টাকা দিয়াছেন। সেই অর্থে একটা মন্দির প্রস্তুত হইবে। কায়িক পরিশ্রমে গ্রামবাসীরা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। মং-মৌএর সারাদিনে একদণ্ডও বিশ্রাম নাই। স্থির করিয়াছে কয়জন চীনামিস্ত্রি আনাইয়া মাসখানেকের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিবে। সকলে প্রফুল্ল। একে এত বড় মন্দির গ্রামের গৌরবস্বরূপ, তদুপরি একজন ধনী শ্বেতাঙ্গ গ্রামের জামাতা। কো-মং-গে মহাশয় আশা করেন সাহেবের কৃপায় অচিরে তাঁহার একটা উপাধি লাভ হইবে।

সকলেই সুখী। কেবলমাত্র ফোলোনের জননী পুত্র-শোকে অর্দ্ধমৃতা। মং-লেট্ মহাশয়কে দেখিলে তাঁহার বিশেষ কোনও দুঃখ কষ্ট আছে বলিয়া অনুমান হয় না। কিন্তু তাঁহার গৃহিণী আজ অন্ধপ্রায়। আজ তাঁহার অঞ্চলের নিধি থাকিলে মন্দির-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিত। অতি কষ্টে পেরেক লইয়া তিনি মিস্ত্রিদের যোগান দেন।

সেদিন প্রধান মহাশয় আবার বুঝাইয়া বলিলেন, ফো-লোনের জন্য কোনও চিন্তা নাই। দস্যুরা কখনই তাহাকে হত্যা করিবে না। গবর্ণমেণ্ট ডাকাত ধরিবার জন্য পুলিশ নিযুক্ত করিয়াছেন। অচিরে সকলেই ধরা পড়িবে। মং-ব্যু বলিতেছিলেন তাঁহার জামাতাকে বলিয়া ফো-লোন্‌কে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। ফো-লোনের কোষ্ঠীতে আছে, বর্ষার পূর্ব্বে শনির দশা কাটিলে সে গৃহে ফিরিয়া আসিবে।

* * * * *

একদিন প্রাতে মা-সে উঠানে বসিয়া আগুন পোহাইতে-ছেন, একটি বালিকা হাঁফাইতে-হাঁফাইতে দৌড়াইয়া আসিয়া জানাইল, ফো-লোন্ আসিতেছে।

"এই দেখ দিদি তোমার ছেলে। এর জন্য তোমার নাওয়া খাওয়া বন্ধ।"

"এখনও ডাকাতের সর্দ্দার, পোষাক দেখ।"

"আমি তখন বলিনি ফো-লোন্ এর পর কত টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরবে?"

"দেখ্ ভাই গায়ে কি-রকম দত্যি ও বাঘের উল্কি পরা।"

ফো-লোন্ বলিল "মা, চট্‌পট্ খাবার বন্দোবস্ত কর, বড় ক্ষিদে পেয়েছে—এই তোরা সব ভাগ্ সাম্‌নে থেকে।"

শোয়ে-টুন প্রশ্ন করিল "যুদ্ধটা কি খুব বড় গোছের হয়েছিল ?"

"বড় হতে পেলে কই ? কুত্তারা তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। আমরা কিন্তু অনেক মেরেছি। আমি দলের কর্ত্তা ছিলুম—সর্দ্দারের মন্ত্রী সেনাপতি দুইই। তিনি নিজে যুদ্ধ কর্‌তেন না। তাঁরই বন্দুক নিয়ে আমি একগুলিতেই কজনকে সাবাড় করেছি।"

মা হেন্ প্রশ্ন করিলেন "কত টাকা পেয়েছ ?"

"টাকাকড়ি গহনাগাটী নিয়ে একটা হাতীতে করে অনেক মাল আনছিলুম। একদিন রাত্রে সর্দ্দার ভেল্কী-বাজীতে সবই ভূতেদের জিম্মায় পাঠালেন। সকালে মাল কোথা গেল, মাল কোথা গেল, খোঁজ পড়ল।—সর্দ্দার বল্লে ভূতেদের জিম্মায় আছে, ভবিষ্যতে ভাগ পাবে। নইলে দেখ্‌তে কত টাকা আনা যেত। যাক্, এর পর আস্‌বে।"

"সর্দ্দার কি আবার এ গাঁয়ে পড়বেন্ !"

"তাঁর ইচ্ছে হয়ত আস্‌বেন, না ইচ্ছে হয়ত না আস্‌বেন। তবে আমার মত না নিয়ে আস্‌বেন না বোধ হয়।"

মং-মৌ বলিল "খুব ধাপ্পা দিচ্ছ যা হোক্।"

সভয়ে পাঁচ জনে মং-মৌকে অমন কথা মুখে আনিতে নিষেধ করিল।

"তুমি আমাদের হয়ে তাঁকে আস্‌তে বারণ কোরো। তুমি মনে করলেই হবে।" অনেকেই মং-ব্যু মহাশয়ের কথায় সায় দিল।

"আচ্ছা দেখা যাবে। তবে আমার বোধ হয় বছরান্তে একটা চৌথ্ ফৌত্ আদায় না করে তিনি ছাড়বেন না।"

প্রধান মহাশয় এতক্ষণ সমস্ত শুনিতেছিলেন। ক্রোধ-ভরে দুই জন মাতব্বর ব্যক্তিকে ডাকিয়া চলিয়া গেলেন। মং-লেট মহাশয় ডাকাতির কথা কহিতে পুত্রের কানে কানে নিষেধ করিয়া দিলেন।

ব্যাপারটা এই। ফো-লোন্‌কে বন্দী করিয়া দস্যু-সর্দ্দার বো-তা প্রথমে তাহাকে মোটবাহীরূপে নিযুক্ত করে। ক্রমে তাহার সেনাপতি অর্থাৎ বন্দুকধারী চেলার পদে উন্নতি হয়। সত্যই সর্দ্দার নিজে যুদ্ধ করিত না। আক্রমণকালে মালবাহী হাতীর সঙ্গে গভীর অরণ্যে লুকাইয়া থাকিত। যুদ্ধ অর্থে চীৎকার করিতে-করিতে গ্রাম আক্রমণ এবং গ্রামবাসীর দূরে পলায়ন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বন্দুকধারী ফো-লোন ছিল নেতা। শেষে একটি গ্রাম লুণ্ঠনকালে, তাহারা পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। সেই সময়ে দলের কয়জন পুলিশ-হস্তে নিহত হয়। পুলিশের কেহই হতাহত হয় নাই। জঙ্গল-মধ্যে বনফলে দুই দিন উদর পূরণ করিয়া ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরিয়াছে।

অপরাহ্নে কয়জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত প্রধান মহাশয় আসিয়া বলিলেন "ফোলোন্‌কে পুলিশের হস্তে প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য। তবে তাঁহারা তাহাকে জেলে দিতে ইচ্ছা করেন না। একমাত্র উপায় আছে।"

ফো-লোন্ একখানি পত্র লইয়া অবিলম্বে বেসিনে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয়ের নিকট যাউক। চিঠিতে থাকিবে, 'ফো-লোন্ অতি সৎ-ছোকরা। তাহার মত সচ্চরিত্র যুবক গ্রামে দেখা যায় না। মায়ের অনুগত। কোনওরূপ নেশাভাঙ্ নাই। আপামর গ্রামবাসীর নিবেদন তাহাকে একটি কনষ্টেবলের কার্য্য দেওয়া হউক।'

পরবর্ত্তী শুভদিনে কো-মং-গ্নে মহাশয়ের লিখিত ইংরেজী চিঠি লইয়া ফো-লোন্ বেসিন যাত্রা করিল।

* * * *

একটা বাগান-বাড়ীর ফটকের বাহিরে, সেতুর প্রাচীরের উপরে বসিয়া ফো-লোন্ পান চিবাইতেছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন কর্কশকণ্ঠে কহিল "এই—ওখান থেকে উঠে যা, সাহেবের ঘোড়া তোকে দেখ্‌লে ভয় পাবে।"

চমকিয়া ফো-লোন্ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল—মা-পান্ !

"আঁ্যা তুমি ফো-লোন্ !" মা-পান্ নিশ্চল। "তোমাকে না ডাকাতে ধরে নিয়ে গিছল ? তুমি ভালো আছ ?"

মা-পান্ আজ সে মা-পান্ নাই। রূপযৌবন গা ফাটিয়া বাহির হইতেছে। মূল্যবান রেশমী পরিচ্ছদ, হীরার-ফুল, সোনার নেকলেস চুড়ি ! পড়ন্ত রৌদ্র লাগিয়া পাছে মাথা ধরে তাই বাম হস্তে রেশমী ছাতা খোলা !

"আমি এখন পুলিশের লোক !"

কি স্পর্দ্ধা! সহরসুদ্ধ সকলে যাহাকে সম্মান করে তাহাকে ওরূপ তুইতোকারি করা!

"তুমি এখানে কিজন্যে ?"

"সহরের এ অংশটা আমার তাঁবে।"

হায় হায়! চাটগেঁয়ে কুলি চুলোয় যাক্‌, একটি ছাগলও পর্য্যন্ত রাস্তায় নাই যে প্রভুত্ব দেখান যায়!

"তাহলে আমার বাগান থেকে যদি কেউ ফুল চুরি করে তুমি ধোরো। সাহেব বলছিলেন পুলিশের বড় সাহেবকে লিখ্‌বেন! তুমি কতদিন চাকরি করছো?"

"দুদিন। আচ্ছা তুমি এখন নিজে বাজার করতে যাও?"

"না, চাকরেরা যায়। আমি এখন, ওই-যে বড় বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওখানে মা-পিনের কাছে যাচ্ছিলুম।"

তাহার হীরার আংটির উপরে রৌদ্র পড়িয়া ফো-লোনের চক্ষু ঝলসিয়া দিল।

"তোমার খুব বরাত মা-পান্‌!"

"আমাকে তোমার সেই ছেলেবেলার সাথী বলেই জেনো!—আচ্ছা তুমি বড় চাকরি চাও? সাহেবকে তোমার কথা বল্‌ব?"

"তাহলে বড় ভালো—" আরও কি বলিতে গিয়া যুবক চুপ করিল। তাহার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিল।

"মাঝে-মাঝে আমার বাড়ীতে এসে দেখা কোরো। তবু গাঁয়ের খবর পাবো।"

"আমি যাই।"

ফো-লোন্‌ চলিয়া গেল।

"হ্যাঁ—আবার কারুর সঙ্গে কথা কইচ দেখলে ইনস্পেক্টর সাজা দিতে পারে।"

* * * *

"এ-যাত্রা থাকিন্‌ খুব সেরে গেছেন, আমার ভয় হয়েছিল বাঁচ্‌বেন না।"

"সামান্য জরে কেউ মরে না সুন্দরী!"

"খুব বেশী জর হয়েছিল। ও-ব্যায়রামে অনেক লোক মারা গেছে।"

সন্ধ্যাকালে বারাণ্ডায় একটি আরাম-কেদারায় শুইয়া সাহেব বৃক্ষশাখায় পাকা আম দেখিতেছিলেন। মা-পানের সম্মুখে, গোলাপ ফুলের মত ঘুমন্ত শিশু। ডাক্তারেরা সাহেবকে অবিলম্বে বিলাতগমনের উপদেশ দিয়াছেন। রোরুদ্যমান পুত্রকে কোলে তুলিয়া জননী বলিল "আহা, বাবা যাবে বলে খোকা কাঁদ্‌ছে।"

"বোধ হয় পিঁপড়ে কামড়েছে বলে কাঁদছে। পিটটা দেখো দেখি?"

সভয়ে কাতরে ঘাড় হইতে পিপীলিকা ছাড়াইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, * খোকাকে কাঁধে ফেলিয়া চাপড়াইতে চাপড়াইতে জননী বলিল—"খোকাবাবু বাবার জন্যে কাঁদ্‌ছে!"

"আমি গেলে তোমার কষ্ট হবে?"

"হ্যাঁ প্রভু—বড়ই কষ্ট হবে। আটমাস পরে যখন ফিরবেন আমাকে আনবেন্‌।"

"তুমি বাড়ী যাবে নাকি?"

"গাঁয়ের সবাই আমার টম্‌কে দেখতে চেয়েছে।—সেদিন মা আমাকে আপনার কথাবার্ত্তা শিখ্‌তে বলেছে। একটু একটু শিখেছি, না? এই সেদিন কি বল্লেন্‌—হ্যাঁ, টম্‌ আমাদের ইঙ্গলিস্‌ সন্‌! লুকিংগা-লাস্‌, লু-পি। আচ্ছা টম্‌ ইংরিজি বল্‌তে পারবে?"

"তুমি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েই থেকো।"

"হ্যাঁ যাবো। এমন ছেলে সেখানে কেউ দেখেনি। কেমন টক্‌-টক্‌ করছে রং দেখো। আমাকে সবাই ফরসা বলে, আমি ওর চেয়ে ঢের কালো।"

গর্ব্বিতা মাতা খোকাবাবুর কপোল বার-বার আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

"দেখ দেখ; আবার কুকুর দেখা হচ্চে! আপনি টম্‌কে না দেখে কুকুরই দেখ্‌চেন।"

"টম কথা কইতে শিখুক্‌, তাকেও দেখ্‌বো।"

"কুকুর বুঝি কথা কইতে পারে?"

"পারে বৈকি। এই আমায় বল্লে মা-পানের কোলে যে বড় ইদুরটা রয়েছে ওটাকে মেরে ফেল্‌বো?"

---

* বর্ম্মিরা স্ব-হস্তে কোনও প্রাণী হত্যা করে না। তবে মৃতাবস্থায় পাইলে মাংসাদি আহার করিতে বাধা নাই। ব্যাধ ও জেলেরা বর্ম্মি-সমাজে ইতর শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। লেখক।

সভয়ে স্বামীর বক্ষে পুত্রকে রাখিয়া মা-পান্ বলিল "এবার কুকুরকে বলুন টম্ আপনার ছেলে, ইঁদুর নয়।"

"টম্ বর্ম্মী ছেলে। বড় হলে ফুঙ্গি গুরুর পাঠশালে 'কাজ্যী' 'খা গোয়ে'* পড়্বে ; উরুতে উল্কি—"

সভয়ে বাধা দিয়া মা-পান্ বলিল "না, না।"

"মাথায় ঝুঁটি রেখে' রুমাল বাঁধবে। লোকে বল্বে বর্ম্মী ছেলেটি—"

"না, না।"

"তবে লোকে ফিরিঙ্গী 'কাবেয়া' বলুক, সেই কি ভালো ?"

মা-পান্ পুত্রকে স্বীয় কোলে তুলিয়া লইল।

"আমি গেলে বোধ হয় আমাকে ভুলে যাবে ? তোমার মা সেই লোকটার কি নাম বল্ছিলো—হ্যাঁ, মং-মৌ !"

"মং-মৌ, সেই ছুতোর ! যাকে সেদিন এই বাড়ী সারতে হুকুম দিয়েছিলুম ?—আমি তাকে বিয়ে করব ? কক্ষণ না !"

* * * * *

ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী মা-প্যিনের পরামর্শ-মত পরদিন প্রাতঃ-কালীন আহারের পর মা-পান্ আটমাসের খোরাকী স্বরূপ মোট ২৫০ টাকা পাইবার বায়না ধরিল।

"থাক্লে নিশ্চয় দিতুম, বাস্তবিক বলছি আমার কাছে কিছুই নেই !"

"আপনি আমাকে ভোলাচ্চেন !"

"সত্যি নেই। বরং দুমাসের মাইনে আগাম নিয়ে খরচ করেছি।"

"এই বছরখানেক আগে মাকে চারশ টাকা দিয়েছেন ?"

"সেই জন্যই ত' হাতে কিছু নেই !"

মা-পান্ নির্ব্বাক।

"এখন দিতে পার্লে বড় ভালো হত। ফি-মাসে কে এখানে টাকা নিতে আস্বে ?"

সাহেব পুরাতন বস্ত্রগুলি দেরাজ হইতে মাদুরের উপরে রাখিতেছিলেন। ধীরে-ধীরে বলিলেন "তোমাদের আস্তে হবেনা, আমি সব বন্দোবস্ত করে যাব।"

"আমার বড় ইচ্ছা ছিল আপনি কতবড় লোক সকলকে একবার দেখাই।" মা-পান্ কাঁদিয়া ফেলিল।

"আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।"

"মং-লেট কাকা আজ বিকেলে বাড়ী যাবেন। মনে কর্ছিলুম সেই সঙ্গে যাব।"

"আচ্ছা একটু পরে বল্বো।"

* * * * *

মা-পানের জিনিষপত্র গোছানো হইল। আরসিটি চাহিলে সাহেব বলিলেন, এত বড় আরসি লইয়া গেলে সকলে ঠাট্টা করিবে। বুরুশ, চিরুনি, লণ্ঠন প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য পাওয়া গেল। বিদায়কালে সাহেব বলিলেন "আমি এলে তুমি আবার এসো।"

"দয়া করে খবর দেবেন। আমি আপনার দাসী।" তাহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত।

ছেলে-কোলে মা-পান্ নৌকাতে উঠিল। খোকার কপোল আঘ্রাণ করিয়া* তাহাকে নাচাইতে-নাচাইতে মং-লেট বলিলেন "তোমার কি সুন্দর ছেলে মা—কেমন্ খোকা, কেমন্ খোকা !"

সেলাম করিয়া কুলি দুইজন প্রস্থান করিল।

মা-পান্ বিছানা পাতিয়া পুত্রকে শোয়াইয়া দিল।

ভাটার-টানে প্রবলবেগে নৌকা চলিয়াছে। যে সুন্দর প্রাসাদে মা-পান দেড় বৎসরকাল সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে বিরাজ করিয়াছিল সে প্রাসাদ আর দেখা যায় না। রমণীয় বেসিন্ নগরী ও জঙ্গলের অন্তরালে—কিন্তু তাহার মানস-পটে সমুদয় ঘটনাই বায়স্কোপের চিত্রের মত এক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছে। একি স্বপ্ন ! এত আদর যত্ন বিষয় বিভব মুহূর্ত্তের মধ্যে উড়িয়া গেল।

কাহারও সঙ্গে তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল না। অনেক সাধ্যসাধনার পর আহার হইল। এক সময়ে মং-লেট মহাশয় বলিলেন "ফো-লোনের খুব উন্নতি হয়েছে। সবাই বল্ছে সে শিগ্গির জমাদার হবে।"

"হ্যাঁ তার জন্যে আমি সাহেবকে বলেছিলুম। রাস্তায় টম্‌টমে যেতে-যেতে তাকে রাস্তায় পাহারা দিতে অনেক

* বর্ম্মি পড়ুয়া ছেলেদের 'আ কড়ীওলা ক' 'আনাগোনা খ'।

* এদেশে চুম্বন প্রথা নাই।—লেখক।

দিন দেখেছি। দু একবার গাড়ী থামিয়েও তার সঙ্গে কথা কয়েছি।"

"সবাই বল্‌ছে তার নিজের গুণে সে এতবড় হয়েছে। ডাকাতের সর্দ্দার বো-তাকে সেই ধরিয়ে দিয়েছে, তাই এত উন্নতি।"

প্রাতঃকালে একটা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া রন্ধনের আয়োজন হইতেছিল। একদল মেয়ে স্নান করিতে আসিল। সকলেরই মুখে টমের প্রশংসা। তাহাদের সঙ্গে সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে কয়জন যুবতী মা-পান্‌কে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল। মা-পান্ বলিল 'বাথ্ রুমে' স্নান করা তাহার অভ্যাস। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী মা-পিন্ বলেন অসভ্যেরাই নদীতে স্নান করে।

পিত্রালয়ে মা-পান্ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। সাহেব তাহাকে কঠোর শাসনে রাখেন নাই সত্য, কিন্তু কোনও যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্ব্বে স্বামীকে তাহার পরিচয় দিতে হইত এবং আফিসের কোনও কর্ম্মচারীর সহিত বাক্যালাপের অনুমতি ছিল না। সেই হিসাবে পিত্রালয় সুখকর বটে। প্রথম-প্রথম আহারকালে তাহার কান্না পাইত। একদিন তাহার বাটীর ব্যবস্থা শুনিয়া মাতা বলিলেন "ইচ্ছে হয় খাও, না ইচ্ছে হয় ফেলে দাও—বেলা ভাল লাগে না!"

গ্রীষ্মকাল একরকমে কাটিল। বর্ষার দিনে হাঁস মুরগীর সহিত ক্ষুদ্র ঘরে থাকা অসহ্য। সহরে কোথাও যাইবার অভিলাষ হইলে সহিসকে খবর পাঠাইলেই হইত, অবিলম্বে বারাণ্ডায় গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইত। এখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির সময়ে গ্রাম-মধ্যে এক কোমর জল দাঁড়ায়। আবশ্যক হইলে নৌকা-যোগে ভিজিতে-ভিজিতে এ-বাড়ী সে-বাড়ী যাতায়াত করিতে হয়। ছেলেবেলার মত এখন আর বারাণ্ডায় বসিয়া খেলানার খড়ের মন্দির ভাসাইতে ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া এই সময়ে তাহাদের লেণ্ট্ বা ব্রত উপবাস জপতপের কাল। লেণ্টের তিনমাস বিবাহ, কর্ণবেধ বা কোনও প্রকার আমোদ প্রমোদ করা নিষিদ্ধ। প্রৌঢ় স্ত্রীপুরুষেরা সকলেই দিবসে একাহারী হইয়া সারাদিন মালা জপেই অতিবাহিত করেন। বাকী সকলে দিবারাত্রে কুড়ি-ঘণ্টা নিদ্রাতেই কাটায়।

মেঘ কাটিয়া সূর্য্য উঠিলে মাঠে লাঙ্গল দেওয়া রীতি। সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া সন্ধ্যাকালে সকলে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। আহারের পরেই শয়ন ও নিদ্রা। যে স্ত্রীলোকেরা দিনমানে গৃহে থাকে, তাহারা সাংসারিক কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। ফলতঃ বেসিনবাসীর তুলনায় সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র ও অসভ্য।

একদিন ছোট ভগ্নীর সহিত মা-পানের একটু বচসা হইল।

"আমাদের আস্তাবলও তোদের বাড়ীর চেয়ে ভালো।"

"একশ বার! এ বাড়ী ঢের খারাপ! কিন্তু কি করবে দিদি বল। দিন-কতক পরে ত আবার সেখানে যাবেই, তবে মিছিমিছি মন খারাপ করা কেন?"

স্বামীর পত্রপ্রাপ্তির আর আশা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল, একদিন তাঁহার পত্র আসিলে পাঁচজনে তাহাকে ঘিরিয়া পত্র শুনাইতে বলিবে। সে সাধ মিটিল না। একদিন মাতা বলিলেন, "তিনি কি গরজে পত্র লিখিবেন? সব টাকা-কড়ি ত' কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়াছেন!"

শীতে ধান কাটিবার পালা। সে মাঠে যাইত বটে কিন্তু টম্‌কে কাছ-ছাড়া করিত না। ধূলা রৌদ্র লাগিয়া চেহারা খারাপ হইয়া যাইবার ভয়ে সারাদিন চালা-ঘরে থাকিত। প্রখর রৌদ্রের সময় কেহ কেহ কাস্তে হস্তে একটু বিশ্রাম করিতে আসিয়া দুই চারিটি কথা কহিত মাত্র। মং-মৌ মাঠে আসে না যে খোকাবাবুকে কাঁধে করিয়া বেড়াইবে বা খড়ের গহনা নির্ম্মাণ করিয়া সাজাইবে। মা-পানের সহিত সে বেশী কথা কহে না। মা-পানের আগমনকালে সে তাহাকে আনিতে ঘাটে গিয়াছিল, কিন্তু মা-পান সামান্য সূত্রধরের দিকে ফিরিয়াও দেখে নাই।

৬

শশিকলার ন্যায় টম্ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন সে মাতার লুঙ্গী অথবা মং-মৌর অঙ্গুলি ধরিয়া দাঁড়াইতে পারে। হামা দিয়া কাক ধরিতে যায়। সুবিধা পাইলেই কাদার উপরে গিয়া চাপড় মারে। মা-পানের মুখ হইতে চুরুট কাড়িয়া লইতে গেলে তিনি বলেন, বয়স না হ'লে ইংরেজের ছেলে চুরুট খায় না। ঠাকুরদাদা একদিন তাহাকে চুরুট খাওয়াইতে গিয়া মেয়ের কাছে অপমানিত হইয়াছিলেন।

শুভদিনে মাল-বোঝাই নৌকা লইয়া অনেকে গ্রাম পরিত্যাগ করিল। শত অনুরোধ সত্ত্বেও মা-পানের কথা রহিল না; সকলেই বলিলেন, অযাচিত ভাবে যাওয়া যুক্তি-সিদ্ধ নহে। বাটীতে ফিরিয়া মা-পান্ ভগ্নীকে বলিল "এবার যদি শুনি তিনি ফেরেন্‌নি, খোকাকে তোর হাতে সঁপে দিয়ে আমি সন্ন্যাসিনী হব।"

"কি বল্‌লি দিদি! ও-মা—মাগো—! নিশ্চয় তোর মাথা খারাপ হয়েছে!"

"দেখিস্ তুই, বেসিনের কুমোর-পাড়ায় যে সরাইখানা আছে মাথা মুড়িয়ে সেখানে গিয়ে থাক্‌বো। ঘর ঝাঁট দেবো আর ছত্তরে জল যোগাব।"

*　*　*　*　*

তখন সন্ধ্যা। মং-ব্যু মহাশয় গ্রামে ফিরিলেন। ছেলে কোলে মা-পান্ নদীতীরে তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। তীরে উঠিয়াই তিনি বলিলেন "অনেক কথা আছে, তোমরা এস।"

বাঁশঝাড়ের তলায় আসিয়া চুরুট ধরাইতে-ধরাইতে বলিলেন "সাহেবের বদ্‌লি একজন নূতন সাহেব এসেছে। তিনি বল্লেন সাহেবের শরীর সারেনি। একজন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। ব্যস্ত হয়োনা—আরও খবর আছে। তারপরে তিনি মা-পান্‌কে কিছু টাকা পাঠিয়েছেন।"

মা-হেন্ প্রশ্ন করিলেন "কত টাকা;—এনেছে?"

উত্তর না দিয়া তিনি কন্যার দিকে দেখিলেন। জনতা হইতে বাহির হইয়া মা-পান্ সন্ধ্যার আঁধারে মিশাইয়া গেল।

কয়দিন সে বাটী হইতে বাহির হয় নাই। কেহ আসিলে বিছানায় গিয়া শয়ন করিত।

একদিন বৈকালে, মং-মৌএর সহিত পথে তাহার সাক্ষাৎ হইল। মং-মৌকে দাঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া মা-পান বলিল "খোকা তোমার কোলে যেতে চাইছে। আজ কাল ত' আর তারদিকে ফিরেও দেখো না।"

খোকাকে কাঁধে বসাইয়া মং-মৌ ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করিল "কোত্থেকে আসছ?"

"ফো-লোনের মা টম্‌কে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন। সেখান থেকেই আস্‌ছি।"

"ফো-লোন্ কবে আস্‌বে কিছু শুনলে?"

"শিগ্‌গিরই বুঝি আস্‌বে, আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। শুনেছ বোধ হয় একটা চটী তৈরী করাবো। তোমার পরামর্শ চাই।"

মং-মৌ খোকাকে তাহার মাতার কোলে দিতে গেল।

"কাঁধে করে আমার সঙ্গে নিয়েই এসনা। ও তোমায় বড় ভালবাসে।"

বাটীর নিকটে আসিয়া মা-পান্ বলিল "অনেক দিন তুমি আমাদের বাড়ী আসনি। মাথা খাও কবে আস্‌বে বল। তোমার পরামর্শ ছাড়া কাজে হাত দিতে পারব না। আমার দিব্যি আজ রাত্রে এসো।"

*　*　*　*

"বেনেলে মায়েঃ লা—কিহে কেমন আছ?"

"মা-বা-য়েঃ—ভাল আছি। আশা করি আপনাদের কুশল? ৯৬ প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত আছেন?" *

"হ্যাঁ বাবা। তুমি এখন বাড়ী যাও।"

ফো-লোন্ চলিয়া গেলে প্রধান মহাশয় বলিলেন "দেখ্‌চেন ছোকরার কেমন উন্নতি হয়েছে। কিরকম জ্ঞানীর মত কথাবার্ত্তা শুন্‌লেন?"

"সত্যবটে রূপেগুণে ওর মত গ্রামে কেউ নাই। তবে একটা জিনিস আমার নজরে বাধ্‌ল। পয়সা খরচ করে কালা মাঝির নৌকাভাড়া করে আস্‌বার আর মোট বইবার জন্য অতগুলো মুটে নিয়ে আস্‌বার কি দরকার ছিল? গ্রামের কারুর নৌকা কি যাতায়াত করে না?"

"ভাই হে লক্ষ্মীদেবী সাবানাৎএর কৃপা হলে সবই হয়!"

আহারকালে মাতা ফো-লোনকে বলিতেছিলেন "মা-পানের সঙ্গে একবার দেখা করবি না কি? সে তোর কথা জিজ্ঞেস্ করছিল।"

"সত্যি!"

"সত্যি বল্‌ছি। অনেকবার ছেলে কোলে এসে তোর আস্‌বার কথা জিজ্ঞেস্ করেছে।"

"কিছুই আশ্চর্য্য নয়। হুঁ বড়ই দর্প হয়েছিল। আচ্ছা তুমি ঠিক দেখেছ আমি যখন আসি সে আমায় দেখেছে?"

* পত্র লিখন অথবা কথোপকথনকালে ব্রহ্মবাসীদের মধ্যে নমস্কার প্রভৃতি অভিবাদন প্রথা প্রচলিত নাই। লেখক।

"সে আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল আমি দেখেছি।"

হাসিয়া ফো-লোন্ ভাবিল নৌকাভাড়ার টাকা আটটা তবে বৃথা যায় নাই।

সেদিন সন্ধ্যাকালে ফো-লোনের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া গ্রামের সকলেই স্বীকার করিয়াছিল সেরূপ ভোজ সে-গ্রামে ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। জ্যাম্, বিলাতী-দুগ্ধ-মিশানো চা, বিস্কুট, নানাবিধ ফল, সাদা-পিপীলিকা-মিশ্রিত বাঁশের গোড়ার সশ্‌শড়ি, কুমীরের কালিয়া, আরও কত কি! ফো-লোনের আদর-সম্ভাষণ ও মং-মৌএর পরিবেষণে সকলেই ধন্য-ধন্য করিয়াছিল। আহারান্তে গ্রামের কয়জন যুবক যুবতী কর্ত্তৃক 'বুদ্ধদেবের পরিণয়' গীতাভিনয় হয়। বাটী যাইবার কালে মং-মৌ টমের জন্য কয়খানি বিস্কুট ও একবাক্স লজ্জুস চাহিয়া লইয়া গেল।

পরদিন সকালে আটটার সময় ফো-লোনের প্রাতঃ-ভ্রমণের ইচ্ছা হয়। বিলাতী কোট বুট টেরিতে শোভিত ফো-লোন্ সাহেব নদীতীরে গুন্‌গুন্ করিয়া গান গাহিতে-ছিল। ঘাটে মা-পানের সহিত সাক্ষাৎ। পূর্ব্বদিবসও উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু ফো-লোন্ কথা কহে নাই। আজ নিজেই কথা পাড়িয়া সে টমের প্রশংসা করিতে লাগিল।

ফো-লোনের প্রশ্নের উত্তরে মা-পান বলিল "নাঃ, এ বিস্কুট মং-মৌ আজ সকালে খোকার জন্যে মাকে দিয়ে গেছে। আমরা কেউ কিনিনি।"

"কাল রাত্রে এগুলি আমার বাড়ী থেকে চুরি যায়। আমি তাকে জেলে দেবো।"

বিদ্রূপ শুনিয়া মা-পান্‌ও হাসিয়া উঠিল।

"তুমি জানো আমি এখন কে?"

হাসিয়া মা-পান্ বলিল "মং-মৌও সকালে মাকে তাই বলছিল।"

"তোমার কাছে সে ঘন-ঘন যায়, না?"

"হাঁা, টম্ তাকে বড় ভাল বাসে।"

"বেসিনে যেতে তোমার ইচ্ছে করে?"

"না, দেশই ভালো।"

"আমারও এখানে থাকতে ইচ্ছে হয়। তবে কি জানো, সেখানে বড় সাহেবের নজরে থাকা যায়। সাহেব যে রকম ভালবাসে, শিগ্‌গিরই হয়ত ইনাস্‌পেটার হ'ব।"

"তা হলে বেশ হয়।"

"হাঁা, তবে দায়িত্ব বাড়বে।"

"তোমার বাড়ী এসে আনন্দ হচ্ছে?"

"হাঁা, মাকে দেখ্‌বার জন্যে মনটা বড় অধীর হয়েছিল।"

"অনেক বন্ধুবান্ধবও ত আছে।"

"কাল একজনের সঙ্গে বিকেলে দেখা হয়েছিল। সে দৃক্‌পাতই করেনি।"

"হয়ত ভেবেছিল তুমি কথা কইবে না।"

"মং-মৌর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে খবর দিতে ভুলো না।"

"আহাহাহা—আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।"

"সকলেই বলে। এই তুমি বল্লে সে তোমার বাড়ী ঘন-ঘন যায়!"

"ওঃ—আমি সরাই করাব সেই জন্যে।"

"তা হলে রাত্তিরে যাব নাকি?"

"বারণ করতে পারি না।" মা-পান্ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

সাজসজ্জা করিয়া ফোলোনের জনক জননী মং-ব্য মহাশয়ের গৃহে বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিলেন। কোষ্ঠী গণনা করাইয়া রাজযোটক মিল হইয়াছে। মং-লেট্ মহাশয় শোয়েটুনের হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া অন্য গ্রামের ভালো একদল যাত্রা ও পুতুল নাচের বায়না করিয়া আসিতে বলিলেন।

শুভ দিবসের প্রত্যূষে মনোমত বেশভূষা করিয়া, একটি গরুর গাড়ীর অগ্রে অগ্রে, শ্রীমান ফো-লোন্ বিবাহ-যাত্রা করিল। শোয়েটুন্ গাড়ীর চালক। বর রেশমী ছাতা খুলিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। গাড়ীর উপরে শয্যা-দ্রব্য, বস্ত্র, বাক্স, পানের ডিবা, পিক্‌দানি প্রভৃতি ঘর-বসতের দ্রব্যাদি। বারাণ্ডা হইতে প্রতিবেশীরা বরকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। মা-সে নিজ সম্পত্তি হইতে কিছু টাকা খরচ করিয়া সন্ন্যাসীদের জন্য বেশ বড় একটা সিদে পাঠাইয়া দিলেন।

মং-ব্য মহাশয় বলিলেন "আপনারা অনুমতি করুন বাবাজীকে নিয়ে যাই। অন্ন প্রস্তুত।"

বারাণ্ডার দাওয়ায় স্ত্রীলোকেরা নূতন কাঠের পাত্রে পায়সান্ন রাখিয়াছিলেন। বরকন্যা তাহার সম্মুখে উপবেশন করিল।

প্রধান মহাশয় বলিলেন—"এবার দুজনে আহার করো। ছিঃ মা, লজ্জা করে না।"

রাত্রির প্রারম্ভেই বাঁসর-ঘরের ছাদে বৃষ্টিধারার ন্যায় প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল। দম্পতিযুগল তখন ফুলশয্যায় শয়ন করিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত। হাসিয়া মা-পান্ বলিল "আইবুড়োরা এসেছে।"

"অনেকদিন ভেবেছি আমিও একদিন এই বাড়ীর ছাদে ঢিল ছুঁড়বো।"

"বাঃ।"

রাস্তায় মং-মৈ বলিল "আর নয় ছাদ ভেঙ্গে যাবে। গ্রামভাটীটা আদায় করে চল আমার বাড়ী গিয়ে জুবাজী খেলা যাক্!"*

(সমাপ্ত)

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা

মীরাবাঈ।

গত আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম মহাশয় "মীরাবাঈ" শীর্ষক নিবন্ধে ঐ ভক্তিমতী হিন্দুনারীর জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "ভক্তমাল" এবং অন্য দু'একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে সামান্যভাবে মীরাবাঈ-এর জীবনেতিহাস বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু সোম-মহাশয় যেরূপ বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, দুঃখের বিষয়, আমরা অন্যত্র সেরূপ প্রয়াস দেখিতে পাই না। ইহাতে তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, প্রবন্ধটি অতি মনোযোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ পাইয়াছি। কিন্তু কএকটি স্থলে ভক্তমালে বর্ণিত ঘটনা-পরম্পরার সহিত অনৈক্য দেখিতেছি। অবশ্য, কোন্ ঘটনাগুলি সত্য এবং কোন্‌গুলিই বা পরবর্ত্তীকালের লেখকবর্গের কল্পনা-প্রসূত, তাহা বর্ত্তমানক্ষেত্রে স্থির নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এই অনৈক্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য-বোধ করিতেছি।

(ক) সোম মহাশয়ের প্রবন্ধে মীরাবাঈ-এর জন্মস্থান কুড়কী গ্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 'ভক্তমালে' দেখিতেছি, মীরাবাঈ-এর জন্মস্থানের নাম মেরতা গ্রাম।

(খ) সোম-মহাশয়ের প্রবন্ধে লিখিত আছে যে উদা গিরিধর লালজীকে দেখিতে চাহিলে, মীরাবাঈ-এর আকুল-আহ্বানে তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহলে পরপুরুষ প্রবেশ করিয়াছে সংবাদ পাইয়া ক্রুদ্ধ রাণা মীরাবাঈকে অশেষপ্রকার ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদকে দেখিতে চাহেন। নৃসিংহমূর্ত্তিতে প্রকটিত মীরার ইষ্টদেবের দেখা পাইয়া মূর্চ্ছিত হন। এবং সেই রজনী হইতেই, সর্প, বিষ প্রভৃতির সাহায্যে মীরার প্রাণ নাশ করিবার জন্য বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

কিন্তু 'ভক্তমালে' আছে যে বাদসা আকবর তানসেন-সহ বৈষ্ণববেশে বাঈজীর গৃহে আসিয়া তাঁহার গান শুনিয়া মোহিত হন। তিনি নগর ত্যাগ করিলে প্রকাশ পায় যে মহলে পর-পুরুষ প্রবেশ করিয়াছিল; ইহাতে রাণা

বধূ ভ্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।
ছুটিয়া কাটিতে গেলা তরবারি লৈয়া॥

* * *

বিষ-আদি খাওয়াইল, কিছুই না হয়।
হরির ভকতজনে বিঘ্ন কে করয়॥

এবং ফলে—

বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল।
বাঈজী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল॥
গৃহ হৈতে নিকাশিলা গেলা বৃন্দাবন।

(গ) সোম-মহাশয় লিখিয়াছেন যে বৃন্দাবন-ধামে মীরাবাঈ শ্রীজীবগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'ভক্তমালে' আছে, মীরাবাঈ শ্রীশ্রীরূপগোস্বামীর সহিত ঐরূপ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহাই যুক্তিযুক্ত এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে।

বৃন্দাবনে গিয়া বাই আনন্দে মগন।
বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ গোস্বামী দরশন॥

শ্রীমন্মথ-মথন সরকার।

মীরাবাঈ ও জৌনপুর-প্রসঙ্গ।

আশ্বিনের প্রবাসীতে মীরাবাঈ প্রসঙ্গে (৫৭৫ পৃঃ ৩য় প্যারা) আছে "১৫৫৫-১৫৬০ সম্বতের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মীরাবাঈর জন্ম হয়" আবার শেষ প্যারায় (৫৮১ পৃঃ) আছে "৫৬ বৎসর বয়সে ১৬২০-১৬৩০ সম্বতের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মীরাবাঈ দেহত্যাগ করেন।" ১৫৫৫-৬০ মধ্যে জন্ম হইলে ১৬২০-৩০ পর্য্যন্ত ৬০-৭৫ বৎসর হয়।

বিক্রমজিত বেশী দিন মীরাবাঈকে কষ্ট দিতে পারেন নাই। রাণা সংগ্রাম ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার বহু অপত্যের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই মারা যান। তৃতীয় রত্ন সিংহ অল্পকালই রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। পরে চতুর্থ বিক্রমজিত রাণা হন। ফরিস্তার মতে ৯৩৮ হিজরায় (ডিসেম্বর ১৫৩১—জানুয়ারি ১৫৩২ খ্রীঃ) গুর্জ্জরাধিপতি বাহাদুর শাহ চিতোর ধ্বংস করেন। প্রবন্ধে প্রকাশ যে চিতোর ধ্বংস মীরার নির্ব্বাসনের পর। অতএব বোধ হয় মীরা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর দেবরের ভয়ে বিক্রমের সিংহাসন-প্রাপ্তির পরই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চিতোর ত্যাগ করেন। আকবর চিতোরে মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না। প্রথমতঃ চিতোর তাঁহার প্রধান শত্রুর রাজধানী, দ্বিতীয়তঃ মীরা যখন চিতোরে তখন

---

* Mr. E. D. Cumming-এর With the Jungle-folks in Upper Burma" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ হইতে এই গল্পটির অধিকাংশ উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি—বর্ম্মি, পালি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত—মোলমিন্-নিবাসী শ্রমণ শ্রীযুক্ত অগ্রবংশ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই গল্পটি পাঠ এবং অনুমোদন করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। মৌলিক বর্ম্মিগান দুইটি ও পত্রখানির জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী। লেখক।

অকবরের জন্মই হয় নাই। মীরার শেষ জীবনে, বৃন্দাবনে, অকবরের সহিত সাক্ষাৎ সম্ভব বটে কিন্তু সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নাই। তানসেন অকবরের চাকরী ৯৮১ হিজরা (১৫৭৩ খৃঃ) কাছাকাছি কোন সময়ে পান। মীরার তুলসীদাসের উপদেশ গ্রহণ সম্ভব নহে। কবিতার ভাবে বোধ হয় চিতোর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তুলসীর মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু তুলসীর জন্ম (১৫৩২ ৩৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ চিতোর ধ্বংসের এক বৎসর পরে; তখন মীরার বয়স ২৯ ৩০ বৎসর।

জৌনপুর প্রসঙ্গে আছে (৫৮৫ পৃঃ ৩য় প্যারা) "শার্কী বংশের প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ। অকবরের রাজত্ব'কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রায় শত বর্ষকাল—এবংশ বরাবর স্বাধীন ছিল।" ১৩৯৭ হইতে অকবরের সিংহাসনপ্রাপ্তি (১৫৫৬ খ্রীঃ) ১৫৯ বৎসর হয়। ফরিস্তার মতে মহমুদ তোগলক ৭৯৬ হিজরায় (১৩৯৪ খ্রীঃ) আপনার পিতার প্রধান মন্ত্রী খোজা সরবরকে খান-জাহা ও পরে মলিক-উশ-শর্ক (পূর্ব্ব দেশের রাজা) উপাধি দিয়া আপনার রাজ্যের পূর্ব্বাংশের শাসনকর্ত্তা করেন। খোজা, প্রভুকে দুর্ব্বল দেখিয়া স্বাধীন হয়। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পালিত পুত্র মুবারক রাজা হয় ও এই বংশ ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করে। ১৪৭৬ খৃঃ সিকন্দর লোদী হুসেন শর্কীকে তাড়াইয়া রাজ্য কাড়িয়া লয়েন। ৯৭২ হিজরায় (১৫৬৪-৫) খৃঃ অকবর জৌনপুর গিয়াছিলেন। সেই সময়ে আপন সেনাপতি মুনঅম খাঁ খান-খানাকে একটি পুল প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন।

মুনঅম খাঁ (মুন্নী খাঁ নহে) যে পুল প্রস্তুত করেন তাহার গায়ে তারিখ-লেখা একটি কবিতা আছে। ইহাতে জানা যায় ৯৭৫ হিজরা (১৫৬৭-৮ খৃঃ) পুল শেষ হয়। এই মুনঅম খাঁ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ খান-খানা। ইনিই দাউদের নিধনকর্ত্তা ও বঙ্গবিজেতা।

শ্রীঅমৃতলাল শীল।

নমঃশূদ্রের উচ্চশিক্ষা।

কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে "নমঃশূদ্রের উচ্চশিক্ষা" শীর্ষক মন্তব্যে নমঃশূদ্র ছাত্রদিগের পাশের সংখ্যা, যাহা "নমঃশূদ্র-হিতৈষী" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। এবৎসর যে-সকল নমঃশূদ্র ছাত্র পাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩৯ জন; আই,এ ৭ জন; আই,এস্, সি ১ জন; বি-এ, ৪ জন; বি, এস, সি ১ জন; এতদ্ভিন্ন এম, এও ১ জন পাশ করিয়াছেন।

শ্রীযাদবচন্দ্র দাস,
চাঁদসী ডাক্তার।

"বিরহ ভাবিয়া কান্দে দুহুঁ দোহাঁ কোলে"

দেখা-ভিক্ষা দিতে তুমি যখন আস প্রিয়া
বিরহেরই ভয়-ভাবনায় ভরে সকল হিয়া—
নিমেষ-পাতের আগেই বুঝি স্বপন যাবে টুটে,
আবার দেখা এই জীবনে জুটেই কি না জুটে;
মিলন-ক্ষণে বিরহেরই ব্যথায় ভরে বুক,
হাসতে গিয়ে কান্না আসে এ বড় কৌতুক!

শ্রী—

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

তৃতীয় অধ্যায়।

তিব্বতীয় নিষ্ঠুরতার পূর্ব্বাভাষ।

আমি যখন দার্জ্জিলিংএ সাবদুংলামার নিকট তিব্বতী-ভাষা শিক্ষা করিতাম, তখন তাঁহার নিকট তিব্বতের এক সাধুলামার জীবনের করুণ কাহিনী শুনিয়াছিলাম। সাবদুং লামা তিব্বতে এই ব্যক্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন; তাঁর নাম ছিল, সেংচিন দোরজিচান। এই ব্যক্তি দলাইলামার সহকারী লামার শিক্ষক ছিলেন। সমুদায় তিব্বত রাজ্যে এই সাধু ব্যক্তির ন্যায় আর কেহ জনসাধারণের অধিক ভক্তির পাত্র ছিল না। বন্ধুবর শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে এই ব্যক্তির শিক্ষাধীনে কিছুকাল ছিলেন। শরৎবাবু যদিও এই লামার সংশ্রবে অধিক দিন আসেন নাই, কিন্তু তাঁহার এই পরিচয়ের ফল বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। শরৎবাবু তিব্বত হইতে আসিবার অব্যবহিত পরেই তিব্বতরাজ্যে রাষ্ট্র হইল যে শরৎবাবু ইংরেজের চর হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র যে তিন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শরৎবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কয়েদ করা হইল। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন তাঁহাকে রাহাদানি সংগ্রহ করিয়া দেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি শরৎবাবুকে গৃহে স্থান দেন, তৃতীয় এই সাধুলামা। ইঁহাকে কারাগারে দিয়াই নিরত হয় নাই—এই নিরপরাধ সাধু ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। আমার বন্ধু সাবদুংলামার নিকট এই মহাত্মার জীবনের বিষয় শ্রবণ করিয়া যথার্থই আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। ইঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে যে কিপ্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ভক্তি প্রীতি যদি কাহারও প্রতি উচ্ছ্বসিত হয় তবে এই ব্যক্তির প্রতি হইতে পারে। যে-ভাবে এই মহাত্মা নিদারুণ মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক দেবোচিত। সাবদুংলামার নিকট আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা নয়। আমি যখন ছদ্মবেশে লাসায় ছিলাম তখনও বিশ্বস্ত

ব্যক্তিদের মুখে এই কাহিনী শুনিয়াছি। শরৎবাবু তিব্বতে গিয়াছিলেন, এই গুজব রাষ্ট্র হইবামাত্র লামা সেংচিন দোরজিচান বুঝিলেন যে তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "শরৎবাবুর সহিত সংস্রব-হেতু আপনি ঘোর বিপদে পতিত হইলেন, আপনি কি করিয়া রক্ষা পাইবেন জানি না।" তিনি উত্তর করিলেন, "প্রাণ যায় যাবে, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার আমার জীবনের ব্রত; আমি কি তিব্বতের লোক ছাড়া আর কাহারও নিকট আমার ধর্ম্মের কথা বলিব না? বিদেশীর নিকট বলাতে দোষ কি? শরৎবাবু 'চর' কি 'বৌদ্ধধর্ম্মচোর' জানি না। যাহা আমার উচিত বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই করিয়াছি।" বাস্তবিক এই বৌদ্ধসাধুর প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল, যে, যাহাতে দেশবিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে—এই ধর্ম্মের বিলয় কেন হইল স্মরণ করিয়া কত ক্ষোভ করিতেন, এমন কি তাঁহার কয়েক জন শিষ্যকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ঘুমপাল মন্দিরের তিব্বতী লামা আমার শিক্ষক মহাশয় অন্যতম। জাপানে প্রচারোৎসাহী ধর্ম্মাত্মা অনেক আছেন; তিব্বতে এভাব একান্ত বিরল। বাস্তবিক সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা ইঁহার প্রাণে ছিল না। ইঁহার উদার মত তিব্বতের অভিজাত কুলের বড় প্রীতিকর ছিল না।—ইঁহার শত্রুরও অভাব ছিল না। ছিদ্রান্বেষী শত্রুগণ ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। এই সময় শরৎবাবু-সংক্রান্ত কথা তাহাদের বড় মনোমত বোধ হইল। সেংচিন দোরজিচানের বিপদ ঘনাইয়া আসিল। শরৎবাবুর তিব্বত-বাস প্রচারিত হইবামাত্র সেংচিন দোরজিচানের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের এক দিবসে সাধুলামাকে হত্যা করা হয়। তাঁহাকে কনবোর (তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের অপর নাম) জলে নিমজ্জিত করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হয়। আমার বন্ধু সাবদুংলামা এই করুণ দৃশ্যের বর্ণনা করিতে-করিতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন, সেই দৃশ্য আমার চক্ষে আজও ভাসিতেছে, আমিও বড়ই ক্ষোভের সহিত সেংচিন দোরজিচানের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতেছি। সে দিনের কথা স্মরণ করিলে আজও আমার প্রাণ ব্যথিত হয়

যেদিন ব্রহ্মপুত্রের (কনবোর) কূলে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর শান্ত সমাহিত ভাবে উপবেশন করিয়া লামাশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে রোরুদ্যমান তিব্বতবাসী তাঁহাকে ঘিরিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। সে. সাধুর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—ধ্যানী বুদ্ধের ন্যায় প্রশান্ত মনে তিনি ধ্যানস্থ। মৃত্যুর সময় নিকট হইলে তিনি ঘাতকদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি প্রস্তুত হইয়াছি, এইটুকু পাঠ করিয়া, আমার এই অঙ্গুলি উর্দ্ধে তুলিয়া তিনবার সঙ্কেত করিব, অমনি তোমরা আমায় নদীর জলে নিক্ষেপ করিবে।" ঘাতকেরা সুদৃঢ় রজ্জু দিয়া তাঁহার দেহ বন্ধন করিল। চারিদিকে দর্শকগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তাহারা ভীষণ তরঙ্গায়িত কনবোর ফেনিল জলের দিকে তাকাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, চক্ষের জলে তাহারা ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হারাইল, সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিবার শক্তি আর থাকিল না। তাহাদের সকলের পূজনীয়, সকলের নমস্য সাধুর জীবনের এ শোচনীয় পরিণাম তাহাদের প্রাণকে দগ্ধ করিতেছিল। লামা যেই উর্দ্ধে হাত উত্তোলন করিলেন, অমনি তাহাদের ক্রন্দনের রোল গগন ছাইয়া ফেলিল, "হায় এখনই ত সব শেষ হইবে!" "হায় হায় কি হইল?" এই রব সকলের মুখে। ঘাতকদিগের আজ হাত কাঁপিতেছে, তাহাদের পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া আজ অশ্রু চক্ষে দেখা দিয়াছে,—আজ তাহারা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে কাতর,—সেংচিন দোরজিচান স্থিরকণ্ঠে আবার বলিলেন, "আর কেন তোমরা বিলম্ব করিতেছ, আমারও সময় হইয়াছে, ত্বরায় আমায় জলমগ্ন কর।" তাহারা অশ্রুসিক্ত মুখে কর্ত্তব্য পালন করিল, লামার পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড এক প্রস্তর বাঁধিয়া দড়ি ধরিয়া জলে নিমজ্জিত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার মৃতদেহ জল হইতে উঠাইয়া লইল—সকলে সবিস্ময়ে দেখিল প্রাণবায়ু তখনও বহির্গত হয় নাই। আবার তাঁহাকে নদীর জলে ডুবাইয়া দিল। আবার তুলিয়া দেখে তখনও তাঁহার প্রাণ যায় নাই। এই সময় দর্শকবৃন্দ কোলাহল করিয়া উঠিল, "এ সাধুর মৃত্যু নাই—তোমরা আর ডুবাইতে পারিবে না, ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়া দাও।" ঘাতকেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি আশ্চর্য্যের বিষয় তখন লামা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে

ধীরে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমার জন্য শোক করিও না, আমার পৃথিবীর কার্য্য শেষ হইয়াছে, আমি আনন্দের সঙ্গে মরিতেছি, আমার শুভদিন আসিয়াছে, তিব্বতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয় হউক, আমি আর কিছু চাই না, এইবারে আমায় ডুবাইয়া দাও আর দেরী করিও না।"

এইবারে ঘাতকেরা দেহ তুলিয়া দেখে যথার্থই তাহা প্রাণহীন হইয়াছে। তখন তিব্বতী প্রথানুসারে মৃতদেহ খণ্ডবিখণ্ড করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া সকলে কাঁদিতে-কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া গেল। আমি যেদিন সাবদুংলামার মুখে এই কাহিনী শুনিলাম, সে দিন হইতে ইহা আমার প্রাণে গাঁথা আছে। আমি যে তিব্বতযাত্রী। আবার আমার জন্যই বা এমন করিয়া কাহাকে জীবন দিতে হয়, কে জানে?

চতুর্থ অধ্যায়

ছলনায় যাত্রারম্ভ।

১৮৯৮ সালের প্রথম দিবসে সুপ্রভাতে উঠিয়া আমি যথারীতি ধর্ম্মপুস্তক পাঠে এবং ধ্যানে কাটাইলাম। আজিকার দিন আমার সার্থক হউক—এই আমার প্রার্থনা। জাপানের জয় হউক। জাপানের মহিমান্বিত সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীর দীর্ঘ আয়ু, এবং সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিয়া আজিকার দিন ধন্য করিলাম। সমুদায় বৎসরটা তিব্বতীভাষা শিক্ষায় অতিবাহিত করিলাম। বৎসরান্তে দেখিলাম, কি লিখিত, কি চলিত—তিব্বতীভাষা আমি একপ্রকার আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি—অতএব তিব্বতযাত্রায় আর বিলম্ব করা উচিত নয়। যাত্রা-বিষয়ে স্থিরসংকল্প হইলাম। এখন কোন্ পথে যাত্রা শ্রেয় সেই বিষয় লইয়া শরৎবাবুর সহিত পরামর্শ চলিতে লাগিল। দারজিলিং হইতে তিনটি পথ দিয়া তিব্বত-রাজ্যে গমন করা যায়। প্রথম থামুবু রোং অর্থাৎ পীচ উপত্যকা দিয়া, দারজিলিং হইতে নরাটং দিয়া পূর্ব্বে কাঞ্চনজঙ্ঘার অপর দিক দিয়া। তৃতীয় সিকিম দিয়া কামলাজোং দিয়া বরাবর একেবারে লাসা। এই তিনটি পথেই তিব্বতের সীমানায় সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র পাহারা দিতেছে; সুতরাং প্রবেশ অসম্ভব। শরৎবাবু বলিলেন নরাটং-পথে গিয়া প্রহরীকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলে সে হয়ত জাপানী ধর্ম্মশিক্ষার্থী বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু এ-প্রস্তাব আমার মনঃপূত হইল না। আমি স্থির করিলাম নেপালের পথ দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিব। নেপাল ভগবান বুদ্ধের চরণ-রেণুলাভে পবিত্র দেশ,—বৌদ্ধ-স্মৃতিপূর্ণ,—বৌদ্ধগ্রন্থের অমূল্য-ভাণ্ডার,—সেই রমণীয় নেপালরাজ্য আমার গন্তব্য স্থান হইল। কিন্তু হঠাৎ কি করিয়া দারজিলিং ত্যাগ করি। দারজিলিংএ বিস্তর তিব্বতীর বাস, তাহারা সকলেই শুনিয়াছে তিব্বতযাত্রার জন্য আমি তিব্বতীভাষা শিক্ষা করিয়াছি। তাহারা যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে আমি তিব্বতে যাইতেছি, তাহা হইলে হয় আমায় হত্যা করিবে, না হয় আমায় তিব্বতে ধরাইয়া দিয়া প্রচুর পুরস্কার লাভ করিবে। অতএব যে-কোন প্রকারে হউক তাহাদের চক্ষে ধূলি দিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া যাত্রার পূর্ব্বে দারজিলিংএ প্রচার করিয়া দিলাম "দেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমার এখনই জাপানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।" এই বলিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলাম। শরৎবাবু ভিন্ন প্রকৃত কথা কেহ জানিত না। যাত্রার পূর্ব্বে আমার স্বদেশী বন্ধুগণ, হিগো ইতো প্রভৃতি আমায় ৬৩০ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাই আমার পথের সম্বল হইল।

শ্রীহেমলতা দেবী।

শোধবোধ

(মোপাসাঁর গল্প হইতে)

আমি পোনর-বচ্ছর ভিরলঞে যাইনি। সেখানে আমার বন্ধু স্যারভালের বাড়ী; প্রুসিয়ানেরা যখন ফ্রান্স আক্রমণ করে তখন তার বাড়ী ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল; সে এখন আবার তা সারিয়ে নিয়েছে। তার বাড়ীতে গিয়ে শীকার করে বেড়াবার জন্যে আমায় সে নিমন্ত্রণ করেছিল; তাই আবার এখানে এসেছি।

এই জায়গাটার সঙ্গে আমার খুব ভালবাসা হয়ে-গিয়েছিল। এক-একটা জায়গায় এমন একটা মোহিত-করা সৌন্দর্য্য থাকে যে লোকে যে-আবেগের সহিত তার

প্রেয়সীকে ভালবাসে সেইসব জায়গার ওপরও ঠিক সেই-রকম টান হয়। যে-সব লোককে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এই-রকমে মুগ্ধ করে, এক-এক জায়গার হয় একটা ঝরণা নয় একটা বন কিম্বা একটা জলা অথবা একটা পাহাড় ঠিক যেন একটা আনন্দ-উৎসবের স্মৃতির মতন কোমল-ভাবে জড়িয়ে তাদের মনের মধ্যে জমা হয়ে থাকে। কবে কখন একদিন উজ্জ্বল আলোকের মোহিনী মায়ায় সজ্জিত হয়ে একটা পুষ্পিত বন বা নদীর ঘাট চোখে পড়েছিল কিন্তু তার ছবি মনে আঁকা হয়ে থাকে এবং সময়ে-সময়ে বার-বার তার কথা মনে পড়ে। যেমন পথে ঘাটে বা মেলায় কোনো অচেনা সুন্দরী কোনো এক বসন্তের প্রভাতে চোখের উপর আনন্দ বুলিয়ে মনের মধ্যে অতৃপ্তি জাগিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে যায়, কিন্তু তার স্মৃতি কখনো ভোলা যায় না।

ভিরলঞ্জের সকল-কিছুই আমার ভালবাসার ছিল—তার ছোট-ছোট বনের ভিতর দিয়ে সরু সরু সোঁতাগুলি শিরা ধমনীর মতন জমিতে ক্ষেতে রসরক্ত জুগিয়ে ফেরে। জলায়-জলায় কত মাছ, কত পাখী। চমৎকার!

আমি আনন্দমনে পাখীর মতন উড়ে চলেছিলাম, আমার কুকুর দুটি আগে-আগে শীকার খুঁজে ফিরছিল এবং বন্ধু স্যারভাল আমার ডাইনে কিছুদূরে রসুন ক্ষেতের ভিতর দিয়ে চলছিল। একটা বনের মোড় ফিরেই আমার চোখে পড়ল একটা পোড়ো বাড়ী।

তখনই আমার মনে পড়ে গেল এই বাড়ীটার যে ছবি আমি ১৮৬৯ সালে দেখেছিলাম—লেপাপোঁছা ঝকঝকে পরিষ্কার; বাগানঘেরা দরজার সামনে মুরগী হাঁস পায়রা চরছিল। পোড়ো বাড়ী তার ভাঙাচুরো কঙ্কালসার দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এর চেয়ে শোকাবহ দৃশ্য আর কিছু নেই। আমার মনে পড়ল একদিন আমি যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তখন এই বাড়ীর গিন্নি আমায় আদর করে কফি তৈরি করে খাইয়েছিল। সেইদিন স্যারভালের কাছে এদের পরিচয় শুনেছিলুম—বাড়ীর কর্ত্তা চোরা-শীকারী ছিল, চুরি করে শীকার করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা পড়ে; তাদের ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম, ঢেঙা একহারা জোয়ান.—দুঁদে চোরা-শীকারী বলে তারও খ্যাতি রটে গিয়েছিল; এইজন্য তাদের লোকে বলত বুনো।

আমি স্যারভালকে ডাক দিলাম। সে তিন টপকে আমার কাছে এলে আমি তাকে বুনোদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তখন সে এই গল্পটি বললে।—

জারমানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যখন লড়াই বাধল, বুনো ছোকরার বয়স তখন তেত্রিশ। সে মাকে বাড়ীতে একলা ফেলে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে যুদ্ধে চলে গেল। বুড়ীর জন্যে কেউ বড় একটা বেশী আহা করলে না, কারণ লোকে জানত যে তার অবস্থা বেশ সচ্ছল গোছালো। বুড়ী গাঁয়ের এক টেরে বনের ধারে নিরালা বাড়ীতে একলাই থাকত। এতে তার ভয় লাগত না, তার বাড়ীর মরদদের মতন তারও মুরদ কম ছিল না; ঢেঙা একহারা পোক্ত রকমের জোরালো মেয়েমানুষ সে, সে কারুর সঙ্গে রসিকতাও করত না, কারুর রসিকতা বরদাস্তও করত না। গেঁয়ো মেয়েরা হাসি-তামাসার অবসর পায় না, সেটা পুরুষদের কাজ; মেয়েদের একঘেয়ে কষ্টের জীবন তাদের ম্লান আর সঙ্কীর্ণ করে তোলে, তাইতে তাদের মুখ কঠোর হয়ে ওঠে এবং হাসিতে তাদের মুখ একটুও উজ্জ্বল হয় না।

বুনো বুড়ী একলাটি তার দিন গুজরান করত। হপ্তায় হপ্তায় হাটের দিন খাবার-দাবার কিনতে একবার মাত্র গাঁয়ে ঢুকত। শীত পড়াতে চারিদিক বরফে ছেয়ে গেল; নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে বলে শোনা যেতে লাগল। বুড়ী হাটে-মাঠে যাবার সময় তার ছেলের চোরা-শীকারের সঙ্গী একটা মর্চে-ধরা ক্ষয়া-কুঁদোর বন্দুক হাতে করে নিয়ে যেত। সেই লম্বা বলিষ্ঠ কঠোর প্রকৃতির বুড়ীকে একলাটি গম্ভীর মুখে বরফের উপর দিয়ে আস্তে-আস্তে বন্দুক নিয়ে যেতে দেখলে গাটা কেমন ছমছম করে উঠত।

একদিন গাঁয়ে জারমানরা এসে পড়ল। তারা ভাগ করে গাঁয়ের লোকের বাড়ী বাড়ী বাসা নিলে, যার যেমন অবস্থা আর যার বাড়ীর যেমন ওসার তার বাড়ীতে তত জন। বুনো-বুড়ীর অবস্থা ভালো বলে তার ভাগে পড়ল চার জন—লম্বা চওড়া জোয়ান, ধপধপে ফরসা, মুখ-ভরা চাপদাড়ি, নীল চোখ এবং যুদ্ধের হয়রানি হটরানি সত্ত্বেও দিব্যি মোটা-সোটা; সদ্য-জয়-করা দেশে এসেও তাদের ব্যবহার বেশ শান্ত মিষ্ট রকমেরই; তারা তাদের বুড়ো আশ্রয়দাত্রীর

খুব খাতির করেই চলত এবং যতটা পারত তার মেহনত ও খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করত।

তাদের চারজনকে প্রায়ই দেখা যেত সেই ঠাণ্ডা কন্‌কনে বরফজমা দিনেও কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে খালি গায়ের উপর বরফের মতন ঠাণ্ডা কন্‌কনে জলের আছড়া দিয়ে স্নান করছে, ঠাণ্ডা লেগে গা এমন লাল হয়ে উঠত যে মনে হত তাদের গোলাপী রঙের চামড়া ফেটে এক্ষনই যেন রক্ত বেরুবে। কখনো বা তাদের দেখতে পাওয়া যেত কেউ রান্নাঘর নিকুচ্ছে, কেউ কাঠ চেলাচ্ছে, কেউ তরকারী কুটছে, কেউ কাপড় কাচছে—যেন চারটি সুবোধ ছেলে বুড়ো মায়ের ঘরকন্নার সকল কাজ করে দিচ্ছে।

পরের চার ছেলেতেও বুড়ীর নিজের এক ছেলের অভাব পোরাতে পারেনি, বুড়ী সদাই তার ছেলের কথা ভাবত—সেই শালের কোঁড়ার মতন ঢেঙা ছেলে, তার বাঁশীর মতন নাক, কটা কটা চোখ সদাই বুড়ীর মনে পড়ত। সে যখন-তখন থেকে-থেকে, তার অতিথি চারজনের কাউকে না কাউকে জিজ্ঞাসা করত—"হ্যাগা, তোমরা কি জানো তেইশ নম্বর পল্টন—ওর নাম কি, ফরাশীদের পলটন্—এখন কোথায় আছে? আমার ছেলে সেই পলটনে আছে।" জবাবে তারা ভাঙা-ভাঙা ফরাশী ভাষায় বলত "না জানি না ত; জানি ত না।"

ঘরে তাদের নিজেদের মায়ের কথা মনে করে তারা বুড়ীর দুঃখ বুঝত এবং তাকে, সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার সেবায় দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে যেত। যদিও তারা শত্রু তবুও বুড়ী তাদের ভালবাসতে সুরু করেছিল। সাধারণ লোকেরা দেশের শত্রু বলেই লোককে ঘৃণা করতে পেরে ওঠে না; সেটা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ ক্ষমতা। যারা নিম্নশ্রেণীর আর গরীব, সকল লেঠার হেপা পোহায় বেশী করে তারাই; দাঙ্গা ফসাদে তারাই আগে মারা পড়ে, কামানের মুখে আগে তারাই যায়, যুদ্ধের নৃশংসতায় তারাই সব চেয়ে বেশী ভোগে, তাদের দারুণ দারিদ্র্য নূতন নূতন চাপে দুঃসহ হয়ে ওঠে; কারণ তারা দুর্ব্বল, তারা অবোধ, তারা বাধা দিতে অক্ষম; কিন্তু তারা কিছুতেই ঠিক করে বুঝে উঠতে পারে না বড়লোকদের লড়াইয়ের মানে, তাদের ঠুনকো গৌরবের মহিমা আর পবিত্র পলিটিক্যাল দায়িত্বের চুলচেরা হিসাব যার হেরফেরে পড়ে ছ'মাসের মধ্যে দু'দুটো জাতকে-জাত জয়ী আর জিত উভয়েই সমানভাবে একেবারে জেরবার হয়ে যায়।

গাঁয়ের লোকেরা বুনো-বুড়ীর জারমান চারজনকে উদ্দেশ করে বলত—ওরা বুড়ীর মায়ায় বাঁধা পড়েছে।

একদিন সকাল বেলায় বুড়ী যখন একলা বাড়ীতে ছিল তখন সে দেখলে একটা লোক গাঁয়ের দিক থেকে মাঠ পার হয়ে তার বাড়ীর দিকে আসছে। ঠাওরে ঠাওরে দেখে সে বুঝতে পারলে আসছে যে সে ডাকপিয়াদা। ডাকহরকরা এসে তাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। ভাঙা খাপ থেকে ভাঙা চশ্‌মা বার করে সে চিঠি পড়লে—

"ঠাকরুণ,

এই চিঠি আপনাকে দুঃসংবাদ দিতে যাচ্চে। আপনার ছেলে ভিক্তর, কালকে মারা গেছে, একটা কামানের গোলা তাকে দুটুকরো করে ফেলেছিল। আমি তার কাছেই ছিলাম, আমরা এক পলটনেরই লোক, যদি কিছু ভাল-মন্দ ঘটে তাহলে আপনাকে খবর দিতে সে আমাকে বলেছিল। আমি তার পকেট থেকে তার ঘড়ীটা নিয়ে রেখেছি তার স্মরণচিহ্ন যুদ্ধ শেষ হলে আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।

প্রণতঃ সীজার রিভো, তেইস নম্বর পলটনের সেনা।"

চিঠিতে তিন হপ্তা আগেকার তারিখ ছিল।

সে কাঁদলে না, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; এমন আঘাত তার লেগেছিল, সে এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যে তখন তার বেদনা-বোধ ছিল না। খানিক পরে তার মনে পড়ল ভিক্তর মারা গেছে। তখন আস্তে আস্তে তার চোখ জলে ভরে উঠল এবং ব্যথায় তার সমস্ত প্রাণ ছেয়ে গেল। একে একে তার কত কথাই মনে হতে লাগল, সে কথার কি তীব্র জ্বালা!—সে আর কখনো তার ছেলেকে কোলে করতে পাবে না! পুলিশের গুলিতে বাপ মারা পড়েছিল; জারমানরা তার ছেলেকে মেরেছে, কামানের গোলায় দুটুকরো হয়ে কাটা পড়েছে! মায়ের চোখের সামনে সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে উঠল; সে যেন দেখতে লাগল, তার বীর ছেলে গায়ে গোলা লাগতেই দারুণ রাগে লম্বা গোঁপ কামড়ে ধরেছে, তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, তারপর তার মাথা ঢলে পড়ছে।

ওরা তার দেহটাকে নিয়ে করলে কি! যদি তারা তার ছেলেকে তার কোলে ফিরিয়ে এনে দিত, যেমন সে একদিন তার স্বামীকে ফিরিয়ে পেয়েছিল—কপালের মাঝখানে গুলির ঘায়ে রক্ততিলক আঁকা!

হঠাৎ সে কথার শব্দ শুনতে পেলে, তার জারমান অতিথিরা গা থেকে ফিরছে। সে চিঠিখানা চট করে পকেটে লুকিয়ে ফেলে চোখ মুছে অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল। তারা চার জনেই পরম খুসিতে খুব হাসতে-হাসতে এসে হাজির হল, তারা একটা খরগোস চুরি-করে শীকার-করে এনেছে এবং ইসারায় তাই দেখিয়ে আজকের খোরাকটা বেশ জুতসই হবার সম্ভাবনা বুড়ীকে জানিয়ে দিলে। বুড়ী অমনি খাবারের জোগাড়ে লেগে গেল; কিন্তু খরগোসটাকে মারতে গিয়ে তার হাত আর উঠল না, যদিও একাজ এই তার নূতন নয়। তখন জারমানদের একজন মাথার ওপর এক কিল মেরে খরগোসটাকে নিকেষ করে দিলে।

খরগোসটা মরে গেলে বুড়ী ছাল ছাড়াতে বসল। কিন্তু তার হাতে রক্ত লাগতে দেখেই সে শিউরে উঠল—তাজা গরম রক্ত তার হাতের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাচ্ছে অনুভব করে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত শিউরে উঠল। এই খরগোসের মধ্যে সে দেখছিল তার নিজের ছেলেকে, সেই তার লম্বা জোয়ান ছেলে দুটুকরো হয়ে কাটা পড়েছে, সর্ব্বাঙ্গ তার রক্তারক্তি, এই খরগোসটার মতন হয়ত সেও ধড়ফড় করছিল।

সে জারমানদের সঙ্গে খেতে বসল, কিন্তু এক গ্রাসও সে মুখে তুলতে পারলে না। তারা তার দিকে লক্ষ্য না করেই মনের আনন্দে গোটা খরগোসটা গিললে। বুড়ী চুপ করে গুম হয়ে বসে একএকবার তাদের দিকে আড় চোখে চাচ্ছিল আর কি ভাবছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "আমরা একসঙ্গে এক মাস হল আছি। আমি কিন্তু এখনো তোমাদের নামও জানি না।"

অনেক করে যখন তারা বুঝতে পারলে সে কি বলছে তখন তারা তাকে নিজের-নিজের নাম বললে। কিন্তু তাতেই তার হল না, সে তাদের নাম আর বাড়ীর ঠিকানা কাগজে লিখিয়ে নিলে; তারপর তার চোখা নাকের উপর চশমা চড়িয়ে বুড়ী একবার সেই কাঁকড়া-বিছের মতন অবোধ্য লেখার ওপর চোক বুলিয়ে নিয়ে কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটের মধ্যে যে-চিঠিখানা তাকে তার ছেলের মরার খবর এনে দিয়েছিল তারই গায়ে রেখে দিলে।

খাওয়া শেষ হলে বুড়ী তাদের বললে—"আমি তোমাদের জন্যে একটা মজা করছি রোসো।" এই না বলে সে যেখানে জারমানরা শুতো সেখানে বিচুলি বয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সে এত কষ্ট করছে দেখে তারা যখন আশ্চর্য্য হচ্ছিল তখন সে তাদের বুঝিয়ে দিলে যে এতে তাদের বেশ গরম হবে। তখন তারাও বুড়ীর সঙ্গে বিচুলি বইতে লেগে গেল। আঁটির পর আঁটি বিচুলি সাজিয়ে-সাজিয়ে চাল পর্য্যন্ত উঁচু করে তুললে এবং ঘরের মধ্যে বিচুলির দেয়াল-দেওয়া আর-একটা ঘর বানিয়ে তুললে। সেই গরম ঘরে বিচুলির মিষ্টি গন্ধ শুঁকে তারা খুব কসে ঘুম দেবে।

রাত্রে খাবার সময়ও তাকে কিছু খেতে না দেখে জারমানদের একজন দরদ জানিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলে। সে বললে তার পেট ব্যথা করছে। আগুন পোহাবার জন্যে সে বেশ গনগনে আগুন জাগিয়ে তুলেছিল। জারমান চারজন মই বেয়ে মটকার নীচে ওপর-ঘরে শুতে চলে গেল।

দরজা বন্ধ হতেই বুড়ী আস্তে-আস্তে মইটি সরিয়ে নিলে। নিঃশব্দে বা'র-দরজা খুলে রান্নাঘর থেকে আরও বিচুলি আনতে বেরিয়ে গেল। বরফের ওপর দিয়ে খালি পায়েই সে আনাগোনা করছিল যেন একটুও শব্দ না হয়; মাঝে-মাঝে সে থমকে দাঁড়িয়ে জারমান চারজনের পাল্লা দিয়ে নাক ডাকানোর শব্দ শুনছিল।

সব ঠিকঠাক করে এক আঁটি বিচুলি এনে সে আগুনে ধরলে আর জ্বলে উঠতেই ঘরময় বিচুলির গাদায় সেই আগুন ছড়িয়ে দিলে। তারপর সে বেরিয়ে এসে দেখতে লাগল।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘরের ভিতরটা আলোয় আলো হয়ে উঠল। দেখতে-দেখতে ঘরের ভিতরটা প্রকাণ্ড তন্দুরের মতন দাউ-দাউ আগুনে গন-গন করতে লাগল, আর তার আলো জানলা দরজা দিয়ে বাইরে বরফের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ বাড়ীর মটকা ফুঁড়ে উচ্চ চীৎকার আকাশ বিদীর্ণ করে দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল—ভয়ের আর জ্বালার হাত হতে পরিত্রাণ পাবায় জন্যে মানুষের ব্যাকুল আর্ত্তনাদ! চাল ভেঙে ঘরের মেঝেয় এসে পড়তেই মটকা ফুঁড়ে আগুনের শিখা ঊর্দ্ধে লক-লক করে উঠল; সমস্ত বাড়ীটা একটা প্রকাণ্ড মশালের মতন তখন দাউদাউ করে জ্বলছিল।

আগুনের শোঁ শোঁ শব্দ, আড়া খুঁটি পড়ার শব্দ, আর মাটি ফাটার শব্দ ছাড়া আর কারুর কোনো সাড়া-শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। সমস্ত চালটা ধসে পড়তেই আকাশময় বিস্তৃত কালো ধোঁয়ার গায়ে আগুনের হাজার ফুলকি ছড়িয়ে গেল যেন একটা প্রকাণ্ড পাখী সলমা-চুমকি-আঁটা পেখম মেলে নৃত্য করছে। চারিদিকে বরফে ঢাকা মাঠ আগুনের আভায় লাল-মিনার-কাজ-করা রূপার একখানা প্রকাণ্ড থালার মতন সুন্দর দেখাচ্ছিল।

দূরে একটা ঘড়ী বেজে উঠল।

বুনো-বুড়ী তার ঘরের শ্মশানের সামনে তখনও বন্দুক-হাতে করে দাঁড়িয়ে ছিল—তার ছেলের বন্দুক—তার ভয় পাছে জারমান চারজনের কেউ পালিয়ে বাঁচে।

যখন সে দেখলে সব শেষ হয়ে গেছে তখন সে বন্দুক-টাকে ছুড়ে জারমানদের চিতার আগুনে ফেলে দিলে; অমনি একটা গুলি আওয়াজ হয়ে গেল।

এখন লোক জড়ো হতে আরম্ভ হয়েছিল,—গাঁয়ের চাষারা আর জারমানরা। তারা এসে দেখলে বুড়ী খুসি হয়ে একটা গাছের গুঁড়ির উপর চুপ করে বসে আছে।

একজন জারমান অফিসার চোস্ত ফরাশী ভাষায় তাকে জিজ্ঞাসা করলে "তোমার সিপাইরা কোথায়।"

সে হাত বাড়িয়ে পোড়া বাড়ীর দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল "ঐ ওখানে!"

সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। জারমান অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করলে "আগুন লাগল কেমন করে?"

সে বললে "আমি নিজে লাগিয়ে দিয়েছি।"

কেউ তার কথা বিশ্বাস করলে না, মনে করলে দুর্ঘটনায় বুড়ীর মাথা বিগড়ে গেছে। তখন সে সকলকে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার—ছেলের মরার খবরের চিঠি আসা থেকে বেড়া-আগুনে পড়ে বেচারা জারমানদের কাতর আর্ত্তনাদ পর্য্যন্ত যা যা ঘটেছিল ও সে যা যা করেছিল সমস্তই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বর্ণনা করে শোনালে।

যখন তার বলা শেষ হল তখন সে পকেট থেকে দুখানা কাগজ টেনে বার করলে এবং কোন্‌খানা কি ভালো করে দেখবার জন্যে চোখে চশমা লাগিয়ে নিভন্ত আগুনের সামনে মেলে ধরলে। তা থেকে একখানা বেছে সকলের দিকে দেখিয়ে বললে "এতে ভিক্তরের মরার খবর এসেছে।" তার পর আর-একখানা দেখিয়ে বললে "এতে ওদের নাম ঠিকানা লেখা আছে, তোমরা ওদের বাড়ীতে খবর দিতে পারবে।"

জারমান অফিসার এসে তার ঘাড় চেপে ধরেছিল। সে শান্তভাবে তার দিকে ফিরে বললে "ওদের মায়েদের লিখো, আমি ভিক্তর সাইমনের মা, যাকে লোকে বুনো-বুড়ী বলে সেই আমিই তাদের মেরেছি। কেমন করে মেরেছি সেটা বলতেও ভুলো না যেন।"

অফিসার জারমান-ভাষায় চেঁচিয়ে কি একটা হুকুম দিলে। অমনি জারমান সৈন্যেরা এসে তাকে ধরলে আর বাড়ীর তপ্ত লাল দেয়ালের গায়ে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিলে। বারো জন সৈন্য কুড়ি কদম দূরে চকিতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে। বুড়ীও একটুও নড়ল না। সে বুঝতে পেরেই চুপ করে অপেক্ষা করছিল।

আবার এক হুকুম হতেই সব-কটা বন্দুক একসঙ্গে একবার আওয়াজ হয়ে গেল, তারপর একে একে পর পর বারো বার।

বুড়ী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল না; যেন তার পা দুটো কেটে দেওয়া হয়েছে এমনি ভাবে আস্তে আস্তে নীচে নেবে গেল।

জারমান অফিসার তার কাছে এগিয়ে গেল। বুড়ী প্রায় দুখানা হয়ে কেটে গেছে, কিন্তু তখনো সে ছেলের মরার খবরের চিঠিখানা মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে আছে, তাতে রক্ত মাখামাখি।

আমার বন্ধু স্যারভাল বললে "জারমানরা এর শোধ তোলবার জন্যে আমার বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়েছিল।"

কিন্তু আমি ভাবছিলাম যারা এই বাড়ীতে দগ্ধে মারা গেছে সেই চার বেচারার মায়েদের কথা; আর সেই আর-

এক মায়ের কথা যে এই নৃশংস ভয়ানক প্রতিহিংসা নিয়ে ঐ দেয়ালের গায়ে গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল।

আমি আগুনে-পোড়া একটুকরা পাথর মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলাম

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাহিত্য

সাহিত্য কথাটা যতই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হউক না কেন এই ব্যাপকতার একটা সীমা আছে, এই সীমাবোধ সাধারণ পাঠক বা সমালোচক সকলের মনেই স্বতঃই উদয় হয়। পুস্তকমাত্রেই কি সাহিত্যের অন্তর্গত হইবে?--কোথায় সাহিত্যের সীমারেখা? এই প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। রেলওয়ে গাইড (Railway Guide) বা পাক-প্রণালীকে আমরা যথার্থ সাহিত্য বলিতে পারি না, মেঘনাদ-বধ কপালকুণ্ডলাকে আমরা বেশ জোর করিয়া সাহিত্য বলিতে পারি। এইরূপ কতকগুলি পুস্তক-বিশেষের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ সম্ভব হইলেও আইন করিয়া সাহিত্যের সীমা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কারণ এমন অনেক কেতাব আছে যেগুলির সম্বন্ধে 'হাঁ' 'না' কিছুই সঠিক বলা যায় না। সেইগুলিকে লইয়াই গণ্ডগোল। পঞ্জিকা, ডাইরেক্টরী অথবা বিজ্ঞান-জগতের কোন একটা তত্ত্ব লইয়া যে সকল পুস্তক লিখিত হয়, সে-সকলকে অনেকে সাহিত্য বলিতে চান না। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র এ-সকল অনেকের মতে সাহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে আসে, অনেকের মতে আসে না। সাহিত্যে আমরা খুঁজি কি? ভাবের গরিমার সহিত ভাষার পারিপাট্য, জ্ঞানের গভীরতার সহিত ভাষার সরলতা, জ্ঞানানন্দের সহিত একটু সৌন্দর্য্যবোধাত্মক রস। সাধারণ সাহিত্যে কোন সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ না থাকাই ভাল। বিষয়টিও যেন সাধারণের মনযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। ভাব ও ভাষা দুই-ই সাহিত্যের লক্ষ্য বলা যাইতে পারে। 'ভাবপ্রকাশের জন্যই ভাষা। চুল-খাড়া-করিয়া, ছেঁড়া-ন্যাকড়া-পরিয়া, তেল-না-মাখিয়া বেড়াইলেই সন্ন্যাসী হয় না। তবে যদি, তুমি ভাবের ঘোরে পোষাকের দিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া থাক তাহাতেই বা দোষ কি?

ভাবটিকে মানুষ ও ভাষাটিকে পোষাক বলিতে পারা যায়। মানুষ প্রাকৃত অবস্থায় উলঙ্গ; আধ্যাত্মিক চরম উন্নতিতেও তাহার খোলস খসিয়া পড়ে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন সভ্য সমাজে বিচরণ করিতে হইলে পোষাক চাই, নচেৎ যাদুঘরে স্থান লইতে হয়। এখানে কৃত্রিমতা খাটিবে না। লোকচক্ষু পরছিদ্র অন্বেষণে বিশেষ জাগ্রত। তবে পোষাকের আড়ম্বরের সহিত জ্ঞানের দৈন্য মানুষকে সুন্দর করা দূরে থাকুক, হেয় করে। সাহিত্য-জগতেও এই নিয়মই বর্ত্তমান।

শেক্‌স্‌পীয়রের প্রথম জীবনের নাটকের সহিত মধ্য-জীবন ও শেষ-জীবনের নাটকের তুলনা করিলে এ বিষয়টি বেশ বুঝা যায়। রবীন্দ্রবাবুর মত "খুসী তোমার ফুটে উঠে শরত আকাশে" লিখিতে হইলে প্রথমে তাঁহার মত নিজের মনে 'খুসীকে ফুটান' চাই।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ স্বরূপ হওয়া চাই। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা সমাজের সর্ব্বতোমুখী ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রাপ্ত হই। সাহিত্যের একটা জীবন আছে। সুতরাং সাহিত্যের অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা যেন শব্দ-বিজ্ঞান বা অলঙ্কার-শাস্ত্র বা ছন্দের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া নিজেকে সিদ্ধকাম মনে না করি।

সাহিত্যের সৃষ্টি হইল কিরূপে?

মানুষ সামাজিক জীব, সে কেবল নিজের জন্য ভাবে না, পাঁচ জনের ভাবনা তাহার মধ্যে থাকে। আবার নিজের চিন্তা ও ভাবগুলি সে নিজের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। সে নিজের বিষয়ে বা পরের বিষয়ে যাহা ভাবে তাহা প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার সাহায্য লয়। আর সমাজের এবং নিজের আদর্শ-মতে এই ভাষার পারিপাট্যের দিকে, সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখে। ভাষার সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিলে সাহিত্য বিকলাঙ্গ হয়—আর সমাজের দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নীতিবিরুদ্ধও বটে।

সাহিত্যের বিষয়।

(১) ব্যক্তিগত জ্ঞান, নিজের সম্বন্ধে চিন্তা, কল্পনা।

(২) মানবের মানব সম্বন্ধে জ্ঞান, চিন্তা এবং কল্পনা।

যথা—জন্ম, মৃত্যু, পাপপুণ্য ও তাহাদের, পরিণাম— পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধ, জগতের সহিত সম্বন্ধ ইত্যাদি।

(৩) সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা ও কল্পনা।

যথা—উন্নতি অবনতির কারণ, ইতিহাস ; সমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা।

(৪) প্রকৃতির সহিত সাহিত্যিকের সম্বন্ধ, সাধারণের সম্বন্ধ, তাহার সৌন্দর্য্য, কার্য্যকারিতা ইত্যাদি।

সাহিত্যিক যে-ভাবে প্রণোদিত হইয়া লেখেন, সেই ভাবটি যদি তাঁহার ভাষার মধ্য দিয়া পাঠকের হৃদয়ে ফুটাইতে পারেন; সেই ভাবটি তাঁহার হৃদয়ে যেরূপ অনুভূতির উদ্রেক করিয়াছিল, সেই অনুভূতিটি যদি পাঠকের হৃদয়ে জাগাইতে পারেন; প্রকাশকালে যে ভাষা বা ছন্দের সাহায্য লইয়াছিলেন, তাহা যদি মনোরম হয়, তবে না তিনি সাহিত্যিক? এবং ভাষা যাহাতে সাধারণের মনরঞ্জন করিতে পারে সেই জন্যই না ব্যাকরণের সৃষ্টি?

সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব।

সাহিত্যকে সকল সময় ঠিক সমাজের দর্পণস্বরূপ বলিতে পারা যায় না—কারণ তাহাতে সাহিত্যিকের চশমার রংএর ছাপ পড়ে। সেইজন্য অনেক সময় সাহিত্যকে সাহিত্যিকের দর্পণস্বরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাহিত্যিক অনেক সময় জগতটাকে নিজের ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া-পিটিয়া নূতন একটা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। অথবা জগতের কোন্ অজানা কোণে কোন্ অননুভূত সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া দেন—ইহাতেই না তাঁহার ব্যক্তিত্ব?

সাহিত্যের উপকারিতা।

ইহা আমাদের কূপমণ্ডুকত্ব হইতে উদ্ধার করে, ঘরে বসিয়া জগতের বাহিরের এবং ভিতরের ম্যাপ দেখিতে পাওয়া যায়। নিজেকে জগতের ছাঁচে ঢালিয়া মানানসই করিয়া লইতে পারা যায়। ব্যক্তিত্বের অভিমান দূর হয়—আবার জগতকে নিজের ছাঁচে ঢালিয়া আমিত্বের প্রসার করিতে পারা যায়।

সাহিত্যে ভাষার ধারা।

আজকাল অনেকের ধারণা হইয়াছে যে ভাষার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন সাহিত্যিকের নহে, সেটা বৈশেষজ্ঞের। এটি একটি মারাত্মক ভ্রম। যেমন দেহতত্ত্বটি বাদ দিলে মনস্তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ (পরিভাষা ও ভাষার অতিগূঢ় দিকগুলি বাদ দিলেও) ভাষার যে একটা ধারা আছে সেটার দিকে (তাহার পরিবর্ত্তন, সৌন্দর্য্য, অবনতি, উন্নতি) লক্ষ্য না রাখিলে তাহার মধ্য দিয়া মানবজীবন ও সমাজের যে পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ গিয়াছে, তাহার অন্বেষণেও সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। সকল বড় বড় সাহিত্যিকেরই ভাষার একটা বিশেষ ধারা আছে। আবার প্রত্যেক যুগের ধারারও একটা বিশেষত্ব থাকে। সেইটিও তাঁহার বা সেই সময়ের জীবন-নদের প্রবাহের একটা দিকনির্ণয়-যন্ত্র। আমরা অনেক সময় পড়িতে-পড়িতে দুই একটি অংশ প্রাপ্ত হই যাহার সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে "এটি অমুকের লেখা," হয়ত আমরা কি কারণে ঐরূপ ধারণা করিলাম তাহা বলিতেও অনেক সময় অক্ষম হই, কিন্তু তবুও যেন ইহা নিতান্ত পরিচিত জনের কথার মত কানে বাজে—শব্দ-বিন্যাস বাক্যগঠন-প্রণালী ও ছন্দের মধ্যে তিনি ধরা পড়েন—ভাবটি যতই সাধারণ হউক না কেন, ভাবটিকে তিনি ভাষার যে ছাঁচে ফেলেন সেই ছাঁচটি যে কাহার মুখের ছাঁচ তাহা আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না।

ভাষাকে ভাবের পোষাক বলিলেও একটু ভুল থাকিয়া যায়, কারণ আমরা একটি পোষাক খুলিয়া আর-একটি নির্বিঘ্নে পরিতে পারি। কিন্তু ভাষায় লেখকের যে-ছাপ থাকিয়া যায় তাহা মুছা যায় না। শেক্‌স্‌পীয়রের ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া শেক্‌স্‌পীয়রকে উপভোগ করিতে পারা যায় না। কার্লাইল এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Style is not the Coat of a writer, but his Skin." লিখিবার ভঙ্গী লেখকের জামা নয়, তাহা তাঁহার গায়েরই চামড়া। কিন্তু যাঁহার বাস্তবিক বলিবার নিজস্ব কিছু আছে তাঁহার বলিবার ধারাটিও একটু নূতন ঠেকে। "Every spirit builds its own house." প্রত্যেক মন তার নিজের আবাস গড়িয়া লয়।

ভাষার বিশেষত্বের ভিতরে লেখকের মুখের বিশেষ-বিশেষ রেখাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা সাহিত্যের আনন্দ-রসের একটি প্রধান প্রস্রবণ। (This means that literature is a fine art—ইহা হইতে বুঝা যায় যে সাহিত্যও একটি সুকুমার শিল্প কলা)।

সাহিত্যে কাব্য।

কাব্য কি ?—প্রশ্নটির উত্তর এ পর্য্যন্ত সঠিক কেহ দিতে পারেন নাই। তবে চেষ্টা করিতেও কেহ ছাড়েন নাই। সেণ্ট আগষ্টাইন জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন—"যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে আমি জানি না, যদি না জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে আমি জানি।" এই উত্তরটি ঠিক ভগবান সম্বন্ধে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাহাই। ইহা অপেক্ষা সঠিকভাবে নির্দ্দেশ করিতে যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই ফাজিলামি।

কেহ বলেন "কাব্য ছন্দবিশিষ্ট রচনা", কেহ বলেন 'সত্যের কঠোর রসকে কল্পনার ভিয়ানে ফেলিয়া মিষ্ট করিয়া লওয়া।" কেহ বলেন "ভাবের অকষ্ট-প্রসূত উচ্ছ্বাস যে-চিন্তার ও ভাষার সাহায্য লইয়া প্রকাশ হয় সেই চিন্তাময়ী ভাষাই কাব্য।"

মেকলে সাহেব বলেন "সেই শব্দবিন্যাস-শিল্পকে আমরা কাব্য বলি যাহা শব্দের বিন্যাসের সাহায্যে কল্পনারাজ্যে এরূপ মোহ আনিয়া দেয় যে তখন কল্পনাতে সত্য ভ্রম হয়—চিত্রকরেরা রংএর দ্বারা যেরূপ চিত্রে বাস্তবতার মোহ আনিয়া দেয়—সেইরূপ।"

কোলরিজ্ সাহেবের মতে—"ইহা বিজ্ঞানের বিপরীত, আনন্দই ইহার লক্ষ্য, সত্য ইহার লক্ষ্য নহে।"

ওার্ড্‌স্ওার্থের মতে—"ইহা সকল জ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি এবং বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিরই ভাবময়ী উচ্ছ্বাস।"

এইরূপ নানা উপায়ে কাব্য কি তাহা বলিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।

কাব্যের উপাদান।

মনুষ্য-জীবনের প্রশ্নগুলির মীমাংসাই সাহিত্যের কাজ, যদি এরূপ বিশ্লিষ্টভাবে বলা সম্ভব হয় তাহা হইলে বলা যায় যে ভাবরাজ্যের এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে যে জীবন, তাহার মীমাংসাই কাব্যের কাজ; চিন্তারাজ্যের মধ্যে যে জীবন তাহার মীমাংসাই বিজ্ঞানের কাজ।

কিন্তু শুধু ভাব এবং কল্পনা লইয়াই কাব্য হয় না। কাব্য একটা শিল্পও বটে। সেই শিল্পের বাহ্যিক একটা সৌন্দর্য্য আছে। সেটার স্থান ছন্দে। ছন্দ যেখানে ভাব এবং কল্পনাতে মিলিত হয় সেইখানেই হইল কাব্যের সৃষ্টি।

কবির কথায় বলিতে গেলে—এই যে ছন্দের এবং ভাবের মিলন—এটা নিতান্ত স্বাভাবিক হওয়া চাই। নায়ক নায়িকার মিলনের মত, জীবাত্মার পরমাত্মার মিলনের মত, রূপ এবং গুণের মিলনের মত, উল্লাস এবং হাস্যের মত, দুঃখ এবং ক্রন্দনের মিলনের মত এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া চাই। এ-মিলন যেন তাহাদের পরস্পর আকর্ষণে ঘটিত হইয়া থাকে, এ-মিলন বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহ-ঘটিত মিলনের মত নহে। তবে না ইহা কাব্য ?

ছন্দকে কাব্যের পোষাক বলিতে পারা যায় না। মনস্তত্ত্ববিংগণের নিকট ইহা জানা যায় যে ছন্দ, সুর বা সঙ্গীত, কাব্যের মধ্যে যে-ভাবটি নিহিত থাকে, চর্চ্চাকালে আমাদের মধ্যেও সেই ভাবপুঞ্জকে মথিত করিয়া, আমাদিগকে কাব্যের রাজ্যে আনাইয়া দেয়, এবং একটি অপূর্ব্ব মোহ উৎপাদন করে। ছন্দপাত করিয়া কাব্যরসাস্বাদ করিতে যাওয়া আর মুক্তাধবল শিশিরবিন্দু-সকলের অঙ্গে হস্ত প্রয়োগ করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে যাওয়া একইরূপ কৃতকার্য্যতা আনয়ন করে।

কাব্যে সততা।

বিজ্ঞান আমাদিগকে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান দান করিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু কাব্য—ঐসকল বস্তু বিষয়ক জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কিরূপ ভাবের উন্মেষনা করে, কিরূপ কল্পনার তরঙ্গ উত্থিত করে তাহাই দেখায়।

কাব্যের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতার ও সততার মাপ করিতে হইলে কবির বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ কি না এবং তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত উক্ত বিষয়ের ছবিখানি এবং ঐ বিষয়-জাত, হৃদয়োত্থিত তরঙ্গমালা প্রাকৃতিক না কৃত্রিম, সে বিষয়েও পরীক্ষা চালবে।

মনুষ্য-সমাজে কবির স্থান।

কেহ কেহ বলেন—ঘরের যেমন কার্নিস—বাড়ীর যেমন বাগান, কবিও সমাজের তেমনই একটি অঙ্গসৌষ্ঠবের সামগ্রী মাত্র। কিন্তু তাহা নহে। কবি আমাদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার চক্ষু ফুটাইয়া দেন। এই বাস্তব-জগতে

অতিন্দ্রিয়ের সংবাদ আনিয়া দেন। জীবজগত বাস্তবকে যে-শান্তির আশায় যুগের পর যুগ আঁকড়াইয়া ধরিতেছে ও বিফলমনোরথ হইতেছে কবি তাহার ভগ্নহৃদয় জোড়া লাগাইবার জন্য অতিন্দ্রিয়ের রাজ্য হইতে আনীত শান্তির ধারা প্রবাহিত করিতেছেন। জগতে কয়জন লোক চক্ষু থাকিতেও অন্ধ নয়? কান থাকিতেও কালা নয়?

সাহিত্যে নাটক এবং উপন্যাস।

আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থানাভাবের জন্যও বটে আর নাটক এবং উপন্যাসের সম্বন্ধের নৈকট্যের জন্যও বটে, এই দুইটি একত্র আলোচিত হইল। উভয়ের সাদৃশ্য এবং পার্থক্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেই উভয়েরই স্বরূপ প্রস্ফুটিত হইবে।

মানুষ নিজেকে জগৎ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ভাবিতে পারে না, নিজের বিষয় ভাবিতে হইলেই জগতের ভাবনা আসে, নিজের সমালোচনা করিতে গেলে জগতের সমালোচনা আসে; এমন কি মানুষ নিজের বিষয় প্রথমে ভাবিতে শিখে না, তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ভাবনাই তাহাকে শেষে আত্মচিন্তায় লিপ্ত করে, ইহাই মনস্তত্ত্ববিৎগণের মত। মানব এই ভাবনার অভিব্যক্তির জন্যই যুগের পর যুগ সাহিত্যের সাহায্য লইয়া আসিতেছে। সাহিত্যের শিল্পের দিকটা সমাজের রুচি এবং সুবিধার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে যুগে যুগে এক একটা নূতন আকার ধারণ করে। মহাকাব্য, নাটক, উপন্যাস—এই শিল্পের এক-একটা আকার। নাটককে ঠিক সাহিত্যশিল্প বলা যায় না —কারণ ইহা বাস্তবের অনুকরণরূপ রঙ্গমঞ্চের সাহায্য লয়। উপন্যাসই এই আকারগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণাবয়ব। উপন্যাসকে মেরিঅন ক্রফর্ড (Marion Crawford) পকেট-নাটক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

উপন্যাসের উপাদান।

(১) ঘটনা—অর্থাৎ যে-সকল কার্য্যকলাপ অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে।

(২) চরিত্র—যাহাদিগকে লইয়া এবং যাহাদের সম্বন্ধে এই-সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে।

(৩) চরিত্রগুলির কথোপকথন—এইটিকে একটি পৃথক্ বিভাগ না বলিয়া দ্বিতীয় বিভাগের অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

(৪) দৃশ্য এবং কাল—যে-সকল স্থানে এবং যে-যে-সময়ে ঘটনা পরম্পরা ঘটিয়া গিয়াছে।

(৫) ভাষা।

এই পাঁচটি বিভাগে উপন্যাসকে মোটামুটি বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়।

উপন্যাসের আর-একটি অঙ্গ আছে যাহা উপেক্ষার জিনিষ নয়, যাহা লেখকের জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক উপন্যাসক্ষেত্রে বর্ত্তমান,—এইটি হচ্ছে মনুষ্যসমাজের কতকগুলি দিকের সমালোচনা—কতকগুলি তত্ত্বের নির্দ্দেশ ও সমাধান—লেখকের জগৎ ও সমাজ সম্বন্ধে ধারণা।

নাটককেও মোটামুটি এই কয় ভাগেই বিশ্লেষণ করিতে পারা যায়। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—

(১) নাটককে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য বলা যায় না—ইহাকে রঙ্গমঞ্চের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকিতে হয়, এবং রঙ্গমঞ্চের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহারও অবয়বের পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।

(২) ব্যক্তিত্বহীনতা—উপন্যাসে লেখক প্রকাশ্যভাবে বা অবান্তরভাবে চরিত্র, ঘটনাবলী, দৃশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া ঘটনাবলীর ঋজুতা সম্পাদন করিতে সক্ষম। নাটকে ঘটনাবলী ও চরিত্রের স্বতঃবিকাশ হইতেই আমাদের যাহা কিছু ধারণা-করিয়া লইতে হইবে—লেখক কোন সাহায্য করিতে পাইবেন না (অন্ততঃ গাঢাকা না দিয়া)।

(৩) উপন্যাসের অবয়ব লেখকের ইচ্ছামত বৃহৎ হইতে পারে, কারণ তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পাঠশেষ করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম নাই। পক্ষান্তরে নাটকের অভিনয়ের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া লইতে হয়। এই কার্য্য অনেক সময় রঙ্গমঞ্চের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। এ-বিষয়ে শেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথই চরম দৃষ্টান্ত। আকারে কত ক্ষুদ্র হইয়া সাহিত্য-জগতে উহা কত বৃহৎ স্থান অধিকার করিয়া আছে! ম্যাক্‌বেথ ও তাঁহার পত্নী সাহিত্যজগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণময়—সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক সৃষ্টি—অথচ কত সংক্ষেপ! কয়টি কথায় গড়া!

সাহিত্যে প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ বহুমুখী। ইহার অবয়ব ও উদ্দেশ্য অনির্দ্দিষ্ট। সেই কারণে ইহাকে এখনও সাহিত্যের একটি স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ বিভাগ বলিতে পারা যায় না।

বঙ্গসাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার দিকে খুব অল্প সাহিত্যিকই অনুরাগী।

বেকনের প্রবন্ধকে 'অতি সংক্ষিপ্ত জ্ঞাননির্য্যাস' বলা যাইতে পারে। মণ্টেস্কের প্রবন্ধ—চিন্তাপ্রবাহ, অন্য পুঁথি হইতে প্রামাণিক উল্লেখ এবং উদাহরণের একটি খিচুড়ি বিশেষ।

লকের প্রবন্ধ Human Understanding ত দার্শনিক চিন্তায় ঠাসাঠাসি একটি বৃহদাকার গ্রন্থ। মেকলে, স্পেনসারের প্রবন্ধগুলি এক একখানি পুস্তক। পাশ্চাত্য মনস্বীগণের প্রবন্ধক্ষেত্রে এইরূপ বিরোধী অবস্থা হইতে আমরা প্রবন্ধের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সুমীমাংসায় আসিতে পারিলাম না।

শব্দার্থ-নির্দ্দেশ-ধুরন্ধর জনসনের ব্যাখ্যানুসারে "চিন্তা-রাশিকে হজম হইবার পূর্ব্বাবস্থায় যদি বমন করা হয় তাহা হইলে তাহাকে প্রবন্ধ কহে"—তাহাতে ভাত, ডাল. তরকারি সবই থাকে। তাঁহার মতে ত ইহা তবে সাহিত্যের রোগ-বিশেষ।

আমাদের ভাষায় Essayকে প্রবন্ধ বা রচনা এবং Treatiseকে 'পুস্তিকা' বলা যাইতে পারে।

প্রবন্ধের বিষয় একটি; নিয়মের বাঁধাবাঁধি বিশেষ কিছুই নাই; ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্ফুটন বা চিন্তার উদ্দাম-লহরী প্রবন্ধে থাকিবে না। আকার নাতিবৃহৎ (২—১০ পৃষ্ঠা)। Treatiseএ লেখক নিরপেক্ষভাবে, ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত পর্য্যন্ত না করিয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়টি আলোচনা করিবেন। কিন্তু Essayতে—লেখক যথেচ্ছা নিজ মতামত প্রকাশ করেন ইহাই অভিপ্রেত।

সাহিত্যে ক্ষুদ্র বা চুটকি গল্প।

চুটকি-গল্প দিন-দিন সাহিত্যের প্রিয়তম অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার কাটতির কতকগুলি কারণ দেখা যায়।

(১) এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে সাধারণ পাঠক হোমিওপ্যাথিক ডোজেই সাহিত্য পছন্দ করেন। ইহা ত স্বাভাবিক।

(২) মাসিক-পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠবস্বরূপ এগুলি না থাকিলে তাহার এত প্রচলন সম্ভব হইত না।

(৩) কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাই উপন্যাসের বর্ত্তমান সংস্করণ। এবং উপন্যাসের চরম পরিণতি ইহাতেই। একথাটা একেবারেই ঠিক নয়। তাহার কারণ উপন্যাসের ন্যায় ইহা নানা ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সমাজের অভিব্যক্তি দেখাইতে পারে না, পরন্তু ইহা একটি ঘটনা বা একটি চরিত্রের অভিব্যক্তি লইয়া কৃতার্থ।

চুটকির দোষ।

(১) ইহার দোষ এই যে ইহা একটি ভাবের বা কল্পনার স্বতন্ত্র বিকাশের ভিতর দিয়া তাহার চরমোৎকর্ষ ফুটাইতে চেষ্টা করে। ভাবপরম্পরার সংঘর্ষের মধ্যে যে ভাববিশেষের জীবন, তাহাই উপভোগ্য;. চুটকিতে তাহার স্থান নাই।

(২) চরিত্রগুলির একটা দিক আমরা দেখিতে পাই—পরন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্যে তাহাকে না চিনিলে ত চেনাই হইল না—চুটকিতে তাহার ব্যবস্থা নাই।

ইহা হইতে বেশ. বুঝা যাইতেছে যে উপন্যাসের পরিণতি চুটকিতে হইতে পারে না। চুটকি একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি।

চুটকির বিশেষত্ব।

(১) ইহা ক্ষুদ্রাকারে উপন্যাস নয়।

(২) বিষয়টি এবং চরিত্রগুলি যেন তাহার নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে সন্তোষজনক পরিণতি লাভ করিতে পারে।

(৩) ইহা একটি নির্দ্দিষ্ট চরিত্র বা চরিত্রের নির্দ্দিষ্ট একটা দিক বা ঘটনাবিশেষ বা সময়বিশেষ বা ভাব-বিশেষ বা আদর্শবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া চলিবে। এই কেন্দ্রটি স্থির থাকিবে। পারিধির স্থিরতার দরকার নাই (The centre is fixed, circumference anywhere)। উপন্যাসে এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। চুটকিতে একটি মূল উদ্দেশ্য এবং তাহারই পরিণতি থাকিবে। অপর-গুলি তাহার আবরণ বা সৌষ্ঠব বা পরিকল্পনারূপে ব্যবহৃত। ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ? ঘামা-শামার কর্ম্ম নয়। সমা-

লোচকেরা এইজন্য চুট্‌কি লেখাকে উপন্যাস লেখার চেয়ে কঠিন কাজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৪) ইহাতে চরিত্রগুলির কথোপকথন থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে; অথবা শুধু কথোপকথনের দ্বারাই ইহা পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে।

চুট্‌কি-গল্প-গঠন-প্রণালী।

(১) একটি চরিত্রকে লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী ঘটনাবলী সৃষ্টি করা।

(২) একটি ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী চরিত্রের সৃষ্টি।

(৩) একটি দৃশ্যের কল্পনা করিয়া লইয়া তদনুযায়ী চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ।

উপন্যাস যে-সকল উপাদানে গঠিত, চুট্‌কিও সেই-সকল উপাদানে; সুতরাং স্বতন্ত্র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। *

শ্রীগঙ্গাদাস চট্টোপাধ্যায়।

দেয়ালি

আঁধার রাতি উজার করি উজল হল দিশি;
দীপের মালা পরিয়া গলে রূপসী আজি নিশি।
হৃদয়ভরা নবীন অনুরাগে,
আঁধারে আজি দেবতা মম জাগে,
দয়িতে আজি পূজিতে চাহি প্রণয়-শতদলে,
আঁধার রাতি উজার করি অযুত বাতি জ্বলে।
আকাশে আজি আসেনি শশধর,—
চাঁদিনী নিশি হাসেনি মনোহর,
দীপের ছায়া আকাশ-পটে তারকা হয়ে ফোটে,
আঁধার রাতি উজার করি হরষ-ধারা ছোটে।
নিঙাড়ি লয়ে চাঁদের যত আলো,—
ধরার পরে ঢালো গো আজি ঢালো,
পথের ধারে আলোর মালা পরায়ে দিল সিঁথি
সগরি রাতি জাগরি রহ দেয়ালি আজি তিথি॥

সরযূবালা সেন।

---

* Wm. Henry Hudson's *An Introduction to the Study of Literature* অবলম্বনে লিখিত।

দেশের কথা

দেশের কথা বলিতে গেলেই দুর্ভিক্ষ, মহামারি, শিক্ষার অভাব এইগুলোই মনে পড়ে—আশার কথা বড় একটা মনে পড়ে না। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের প্রশমন হইয়াছে, আপাতত এইটিই একটু আনন্দ-সংবাদ। "বাঁকুড়া-দর্পণ" লিখিয়াছেন—

ভবিষ্যৎ যতটুকু লক্ষ্য হইতেছে তাহাতে দেশের দুর্গতি দূরীকৃত হইবার আশা উদিত হয়। অন্নাভাবের মহৎ দুঃখ দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। আশুধান্য গৃহজাত হইতেছে। তদ্বারা অনেক দীন দরিদ্রের উদরান্নের সংস্থান হইবে। হৈমন্তিক ধান্যও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে আশা হয়। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই কৃষিকার্য্যের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রতি বৎসর এখানে গড় যে পরিমাণে বৃষ্টি হয় তাহা অপেক্ষা ৮ ইঞ্চি বৃষ্টি অধিক হইয়াছে। আশ্বিন মাসে মহা দুর্যোগ।

বাঁকুড়া জেলার অবস্থা যেমন একটু শোধরাইল অমনি অন্যান্য জেলার দুরবস্থা আরম্ভ হইল। দেখা যায় হরেদরে আমাদের দেশের অবস্থা সেই একপ্রকারই থাকে। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য! এবারে অতিবৃষ্টিতে অনেক স্থানে অল্পবিস্তর শস্য-হানি ঘটিয়াছে। বন্যায় শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। শিলচর হইতে প্রকাশিত "সুরমা" সংবাদ দিয়াছেন—

গতবৎসরের অপেক্ষাও এবার শিলচরে প্লাবনের মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছিল। বিগতবৎসরের বন্যা, কাছাড়জেলায় সাময়িক উপদ্রব ঘটাইলেও, এমনভাবে শস্যহানি করিতে পারে নাই। তখন বর্ষাকালের বন্যাবিনষ্ট শস্যক্ষেত্রে কৃষকেরা আবার নূতন ধান্যের বীজ বপন করিয়া প্রচুর শস্য লাভ করিয়াছিল। এবার 'পাকাধানে মই' পড়িয়াছে।

যে-ধান জলসাৎ হইয়াছে তাহা আর আসিবে না; কৃষকেরা প্রাণপাত করিলেও এবার মাঠে ধান ফলিবে না। বিগতবর্ষের বন্যায় হাইলাকান্দি সবডিবিসনের অত্যল্প স্থানই জলমগ্ন হইয়াছিল; এবার শিলচর সদরের এলাকার মত হাইলাকান্দি মহকুমার ফসলও সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। যে দিকে তাকাও, কাছাড়জেলার বড় বড় ধান্যক্ষেত্র-পূর্ণ হাওরগুলি অপার জলরাশি বুকে লইয়া ধূ ধূ করিতেছে। এবার-কার বন্যা চা-ক্ষেত্রের অনিষ্ট সাধনেও কার্পণ্যপ্রকাশ করে নাই। বন্যা ও বৃষ্টির ফলে এ যাত্রা চা'এর শোচনীয় ক্ষতি ঘটিয়াছে। পরন্তু দেশে গোগ্রাস নাই। গোগ্রাসের অভাবে গবাদিপশুর দারুণ বিপত্তি দেখা দিয়াছে। গো-মহিষগুলি ক্রমেই অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে এবং দেশব্যাপী গো-মড়কের আশঙ্কা ঘনাইয়া আসিতেছে।

এবারে বর্দ্ধমান জেলাতেও পুনরায় বন্যা হইয়াছিল। "বাঁকুড়া-দর্পণে" প্রকাশ—

অজয় নদীতে বন্যা হওয়ায় বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভেরিয়া প্রভৃতি ৫০ খানি গ্রামের ২০ বর্গ মাইল স্থান ভীষণরূপে প্লাবিত হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটায় গরু বাছুর অনেকে রক্ষা করিতে পারে নাই, কেবল আপনাপন প্রাণ লইয়া পলাইয়াছে। প্রায় সমস্ত

গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে ১৯১৩ সাল অপেক্ষা জল ৩ ফুট বেশী উঠিয়াছিল।

ইহা ছাড়া ঢাকা নোয়াখালী ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানেও জল-প্লাবন ঘটিয়াছিল, তবে সুখের বিষয় শস্যহানি বিশেষ হয় নাই। কাঁথির খবরও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। "নীহার" লিখিয়াছেন—

এবৎসর আবাদের প্রথমাবস্থায় অতিবৃষ্টি ও পরে বৃষ্টির অভাবে চাষের কার্য্যের নানা বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, তবুও লোকে প্রাণপাত পরিশ্রমে যে-আবাদ করিয়াছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই এবার বেশ সুফসল জন্মিবার আশা করিয়াছিল; কিন্তু ভাদ্রমাস হইতে প্রবল বৃষ্টি হইতে থাকায় অন্যদিকে জল-নিকাশের অভাবে মাঠের জল অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি হইয়া স্থান-বিশেষে ফসলের অল্পবিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। বৃষ্টি বাতাসেও অনেক ধান্যের শীষ আগড়া মারিয়া এবং জলে পড়িয়া নষ্ট যাইতেছে।

পথঘাট, বাঁধ, বোশা ও উচ্চ স্থানাদি স্থায়ীভাবে জলমগ্ন থাকায় গবাদির খাদ্য তৃণ সমূলে নষ্ট হইয়াছে। এজন্য গবাদির খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। তারপর জলে কাদায় থাকিয়া গবাদি নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছে। ইহাতে অনেক গোরু বাছুর মারাও যাইতেছে।

"মোহাম্মাদী" স্বীয় সমাজের দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া সর্ব্বদাই সমাজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। এমনিই হওয়া দরকার। নিজের দোষ না দেখিলে বা তাহা সংশোধন না করিলে উন্নতির আশা কোথায়? আমার যা আছে তা-ই ভালো, কোনো কিছুরই পরিবর্ত্তন বা সংশোধন অপ্রয়োজনীয়, এ-ভাব জাতীয় উন্নতির পক্ষে মারাত্মক। মুসলমানের বর্ত্তমান শিক্ষাহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া এবং হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানেরও সমতালে অগ্রসর হওয়া উচিত এই অতি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া "মোহাম্মাদী" ভালোই করিয়াছেন। আমরা সানন্দে "মোহাম্মাদী"র উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত আহমদ আলী।

মুসলমানের যে-মস্তক জ্ঞানবিজ্ঞান ও উন্নত ধ্যানধারণার কেন্দ্র ছিল, আজ তাহা সঙ্কীর্ণতা, দ্বেষহিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও কুচিন্তার কেন্দ্র হইয়াছে। একমাত্র ইওরোপীয় তুর্কীদিগকে ছাড়িয়া দিলে অন্য কোথাও তাহার জীবনীশক্তির সাড়া পাওয়া যায় না, সকলেই যেন মৃত, দুনিয়া যেন আর সে মরা টানিতে অক্ষম। শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস আরব-ভূমি আজ মূর্খতার লীলা-নিকেতন। পারস্য এখনও বিলাসে নিমগ্ন এবং পিয়ারি পিয়ার মিঠি মিঠি বুলির ভিতর হাবুডুবু খাইতেছে। স্পেনের কথা বলিবার আবশ্যক নাই। মধ্য এশিয়ার দশা আরবেরই অনুরূপ। আফ্রিকার মুসলমান রাজ্য ও জনপদসমূহ বিভিন্ন প্রবলজাতির লীলা-নিকেতনে পরিণত। টিউনিস, আলজেরিয়া ও মরোক্কো প্রভৃতি স্থান হস্তান্তরিত। চীনের সংবাদ রাখে কে? ভারতবর্ষ ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগের বাজারে পর্য্যবসিত। যাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের একটি অংশ পাইলে দুনিয়া উদ্ধার পাইত, আজ তাহাদেরই ভ্রাতা ভগ্নীরা দুটী অন্নের জন্য লালায়িত। ফলতঃ যে-দেশের মুসলমানদিগের শতকরা ৯৫ জন মূর্খ, তাহাদিগকে লইয়া যে ধর্ম্মব্যবসায়ীরা ছিনিমিনি খেলিবে তাহাতে বিচিত্র কি?

ভারতের মুসলমানকে চিরদিন হিন্দুর সহিত এদেশে বসবাস করিতে হইবে, সুতরাং হিন্দু এক পা বাড়াইলে তাহাকে দুই পা বাড়াইতে হইবে, যেহেতু সংখ্যায় সে হিন্দু অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু দু পা বাড়ান ত দূরের কথা, হিন্দু কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে-খবরও সে রাখে না। এমতাবস্থায় সে কি করিয়া হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিবে। সংসারে জীবিতের সহিতই জীবিতের বন্ধুত্ব সম্ভাব হইয়া থাকে। অনুগ্রহ করিয়া কেহ মরা লাশ মাথায় বহন করে না, করিলেও দুই এক ঘণ্টা পরে সমাধিস্থ করে। দেশের মঙ্গলের জন্য স্বায়ত্ত-শাসন স্বরাজ চাইই, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহা দুদিন অগ্র পশ্চাৎ দিবেন। তাহাতে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই, দিলেও তাহা কেহই শুনিবে না। তখন মুসলমানের অবস্থা কিরূপ হইবে? হিন্দুর সহিত সব বিষয়ে সমকক্ষ না হইলে, নিজের প্রাপ্য কি করিয়া তাহারা বুঝিয়া লইবে। তখন ধর্ম্মব্যবসায়ীরা গিয়া ফতোয়া দিয়া কিছু করিতে পারিবেন কি? ফল কথ, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, এখনই কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে, জাতির উদ্ধারের পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। শিল্প বাণিজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, একতা সম্প্রীতি, সমবেত শক্তি-গঠন ইত্যাদি বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতার উপর আমাদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে না হইলেও অনেকাংশে নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় দুধ, ঘী, সরিষার তেল প্রভৃতি প্রধান প্রধান আহার্য্য দ্রব্যেই আজকাল যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল মিশ্রিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে "২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ" যথার্থই লিখিয়াছেন—

কলিকাতায় খাদ্য-দ্রব্যসমূহে ভেজাল ও কৃত্রিমতার মাত্রা প্রায় চরম সীমায় উঠিয়াছে। কলিকাতা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল বিধায় অধুনা পল্লীগ্রামেও সেই ভেজালের ঢেউ গিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই অধুনা "সহুরে ব্যারাম" সেই অম্ল অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ পল্লীবাসীকেও আক্রমণ করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আটা ময়দা প্রভৃতি কোন কোন দ্রব্য খাঁটী পাওয়া যাইত, অন্ততঃ চাউলের গুঁড়া ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ইহাতে মিশ্রিত হইতে পারে বলিয়া লোকে অনুমান করিতে পারিত না। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে আটা ও ময়দাতেও দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ীগণ খুব বেশী পরিমাণ ভেজাল চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আটা ময়দার সহিত আজকাল একরকম কোমল প্রস্তর অতি সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে!

ভেজাল-মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্যই যাহাতে বাজারে বিক্রী হইতে না পারে, মিউনিসিপালিটী হইতে তেমন আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

"স্বরাজ" পল্লীগ্রামের পানীয় জল দূষিত হওয়ার একটি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সকলেই জানেন, পাট গাছ বিশেষরূপে না পচাইতে হইলেও উহা দীর্ঘকাল যাবত জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কৃষকগণের ভাষাতে

এই ক্রিয়াকে পাটের 'জাগ' দেওয়া বলে; বলাই বাহুল্য, যে-জলে পাট জাগ দেওয়া হয়, তাহা বিশেষরূপে পচিয়া থাকে। এই পচা জলকে যদি অন্য জলের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব না করিয়া রাখা যাইতে পারিত, তাহা হইলে পাটের জাগে পানীয় জলের দূষিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু যাঁহারা পল্লীসমূহের সামান্য-মাত্র খবরও রাখেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে বাঙ্গলা দেশে ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। আষাঢ় শ্রাবণ মাসের ঘন বৃষ্টি ও নদীসমূহের উচ্ছ্বসিত জলে বঙ্গপল্লীর পথ ঘাট মাঠ নদী নালা ডোবা, বিল পুকুর—সমস্তই একাকার হইয়া যায়, তখন আর ইহাদিগকে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। সুতরাং কোনও কারণে এই অখণ্ড জলাশয়ের একাংশে জল দূষিত হইলে, ঐ দোষ যে সহজেই উহার অন্যান্য অংশেও অল্প-বিস্তর ছড়াইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? বস্তুতঃ পাট-পচা জলের দ্বারাই এই দেশের সর্ব্বপ্রকার জল দূষিত হইতেছে।

যেখানে-সেখানে পাট-পচানো নিবারণ করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ মর্ম্মে একটি আইন জারি করিতে হয়। তবেই পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষা হয়।

সু।

ভারতপ্রাণা ভারতীর যবন-দেশে যবনীবেশ

পূজারী পণ্ডিত James Adam যবনী-বেশধারিণী ভারতী দেবীর পদপ্রান্তে হিরাক্লিটীয় তত্ত্বজ্ঞানের (Heraclitean philosophyর) নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন দিব্য পছন্দ-সই ইংরাজি ঢঙে; পরন্তু সেই যাবনিক তত্ত্বজ্ঞানের নৈবেদ্য-সজ্জার মধ্য হইতে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞানের পুণ্য গন্ধ নিঃশ্বসিত হইতেছে কেমন যে চমৎকার, তাহা তিনি মূলেই জানিতে পারেন নাই; জানিতে পারিবেনই বা কেমন করিয়া? আমার কিন্তু ঘ্রাণে তাহা ছাপা থাকিতে পারে না এইজন্য—যেহেতু দেশীয় শাস্ত্রোদ্যানের ফলপুষ্পের প্রাণ-জুড়ানিয়া স্নিগ্ধ সৌরভ আমার অনেক কালের পুরাতন বন্ধু। তবে কিনা—নৈবেদ্যের ডালি-গুলার আকৃতি এবং গঠন যবন দেশীয়; আর সেইজন্য—আধার-পাত্রের ছাঁপায় পড়িয়া আধেয় দিশী সামগ্রীগুলিও দর্শক-গণের চক্ষে যবন-দেশীয় বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি তাই Adam মহোদয়ের সজ্জিত নৈবেদ্য-সজ্জার আদ্যোপান্ত শুঁকিয়া দেখিয়া যে যে স্থান হইতে দেশীয় শাস্ত্রোদ্যানের যে যে ফলফুলের সুগন্ধ নিঃশ্বসিত হইতেছে, সেই সেই স্থানে সেই সেই ফলফুলের নামের ছাপ বসাইয়া দিতেছি;—তাহা হইলেই দর্শকগণের ভ্রমের দ্বারে কপাট পড়িয়া যাইবে। পণ্ডিতবর বলিতেছেন

"The God-head in Heraclitus is the creative power [জগজ্জননী শক্তি] or substance [জগন্নিধান 'প্রধান' কিনা মূলপ্রকৃতি] which at definite intervals [কল্পে কল্পে] evolves itself [পরিণত হ'ন] into a world, and in course of time [প্রলয়কালে] absorbs all things again.... ......The universe itself as well as each individual part of it, must traverse the 'upward and downward' road [প্রতিলোম এবং অনু-লোম মার্গ]. But the upward and downward road, Heraclitus insists, is one and the same [সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতেও it is one and the same;

upward road প্রতিলোম	downward road অনুলোম
↑ অগ্নি জল পৃথিবী	অগ্নি জল পৃথিবী ↓

☞ Road এক; direction দুই]; and we have finally to consider the Godhead [জগজ্জননী শক্তি or মূল প্রকৃতি aforesaid] as the harmony transcending every opposition [as the ত্রিগুণের দ্বন্দ্বাতীত সাম্যাবস্থা]. To Heraclitus the whole world [গুণ-বৈষম্যে আপাদমস্তক ওত-প্রোত ব্যক্ত প্রকৃতি] is one gigantic battle-field of adverse powers forever waging internecine feud [সাংখ্যশাস্ত্রেও তাহাই বলে—বলে যে, সত্ত্ব রজো এবং তমোগুণের মধ্যে ঝুটাপাটি চলিতেছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া দিনরাত্রি অনবরত] .....The doctrine of the flux ['চলাং তু প্রকৃতিং প্রাহুঃ' (বাংলা) 'প্রকৃতির নামই চলা',—এই doctrine *] is only another

* মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩১৮ অধ্যায়ে দেখ।

way of expressing this universal warfare [viz., সত্ত্ব versus রজঃ—যেমন সুখ versus দুখ ; রজঃ versus তমঃ—যেমন উদ্যম versus অবসাদ ; সত্ত্ব versus তমো —যেমন জ্ঞান versus মোহ]. To sum up : In Heraclitus the three conceptions, Logos ['মহান্' বা হিরণ্যগর্ভ], Fire [লোকাদি অগ্নি] and God [অপর ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা] are fundamentally the same. Regarded as the Logos, God [হিরণ্যগর্ভ] is the omnipresent Wisdom [বিশ্বব্যাপী মহতী বুদ্ধি বা মহান্] by which all things are steered [সর্ব্ব জগতের কাণ্ডারী] ; regarded in his physical (অবোধাত্মক) aspect, that is to say as Fire, he is the substance which creates [জগৎপ্রসবিতা সবিতা—লোকাদি অগ্নি] ; and in both these aspects (in both বোধাত্মক and অবোধাত্মক aspects) he is everchanging fire [অবোধাত্মক বহুরূপী তেজ] and yet forever changeless unity [বোধাত্মক অদ্বিতীয় সৎ]......'the one is all, and the all is one.'" [শেষের এই মহা-বাক্যটি শুনিয়া দিব্যধামবাসী ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরা বলিলেন "ওঁ" কিনা "Amen"]. পণ্ডিতবর James Adam এইরূপে হিরাক্লিটসের প্রচ্ছন্ন সাংখ্যবাদের (অর্থাৎ যাবনিক ভাষার পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন সাংখ্যবাদের) গুণগানের পালা সাঙ্গ করিয়া তাহার কিয়ৎকাল পরে জগদ্বিখ্যাত প্লেটো'র প্রচ্ছন্ন বেদান্তবাদের গুণগানের পালা আরম্ভ করিতেছেন এইরূপ :—

"Passing over the minor Socratical schools, I propose to devote the remaining lectures to Plato .....We shall find, I think, that the famous allegory of the Cave in the *Republic* is a convenient starting point for our investigation." অতঃপর যাবনিক ভাষার অবগুণ্ঠনের আড়ালে ভারতী দেবীর মুখচন্দ্রে কলঙ্কাকৃতি চন্দনের ছাপ (অর্থাৎ বাংলা অক্ষর-পাঁতি) মানাইয়াছে কেমন সুন্দর, তাহা আঁখি ভরিয়া চাহিয়া দেখিবার বিষয় ; অতএব দেখা হো'ক :—পণ্ডিতবর বলিতেছেন,

"We are first invited to conceive a number of prisoners [একদল বদ্ধ জীব] immersed in a long and gradually sloping subterranean chamber [মনোময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষে, প্রাণময় কোষ হইতে অন্নময় কোষে—স্থূল হইতে স্থূলতরে ক্রমশ পরিণমমান 'gradually sloping' অবিদ্যার গুহাগারে নিমজ্জিত]. They are so firmly bound that they cannot move head or limb ; they see nothing either of themselves or one another, the necessity of their situation compelling them always to direct their gaze on the wall in which the cave ends. At some distance above and behind the prisoners, a fire is burning [আভাস-চৈতন্য বা জীব-চৈতন্য জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে] and between them and the fire is a transverse path [প্রাণ-ক্রিয়া-সকলের চলা-ফেরা-কার্য্যের গুপ্তপথ—সংক্ষেপে প্রাণময় কোষ]. Along this roadway carriers are continually passing with all kinds of implements and images upon their heads [with ইন্দ্রিয়রূপী implements and স্থূলশরীর-রূপী images upon their heads]—statuettes of men and other animals, wrought in wood and stone and every sort of material. The wall skirting the path-way intercepts of course, the shadows of the carriers [of the প্রাণময়-কোষের গুপ্তপথে চলাফেরাকারী প্রাণ-ক্রিয়া-রূপী বাহকবৃন্দ], but the objects [অন্নময়-কোষরূপী বা স্থূল-শরীর-রূপী জড়-মূর্ত্তি-সকল] which they carry overtop the wall, and are reflected by the light of the fire [by the light of the আভাস-চৈতন্য] upon the end wall of the dungeon. Thus it happens that the prisoners see only a constant succession of shadow-shapes that 'come and go,' and having never seen anything besides, they naturally

suppose these moving phantoms to be the sole realities.........The next division of the simile deals with prisoner's release from bondage. When the chains are unloosed and he is suddenly compelled to stand erect, and turn round and walk, and raise his eyes towards the light, he is at first dazzled, and perplexed, and in his bewilderment would fain still cherish the delusion that after all there is more light and truth in the shadows he formerly saw, than in the originals he now beholds. Finally his guide succeeds in dragging him forth into the upper world, away from the sun-illumined lantern [away from আভাস-চৈতন্য] into the actual sunlight [into কূটস্থ চৈতন্য]. Slowly his eyes become accustomed to brightness. At first he discerns only the shadows and images [অবচ্ছায়া এবং প্রতিমা] of what we in this world call real [of বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব]; afterwards he is able to look upon the originals [গোড়ার তত্ত্ব] from which they come, and so on progressively from higher to yet higher [from মনোময় কোষ to বিজ্ঞানময় কোষ, from বিজ্ঞানময় কোষ to আনন্দময় কোষ ; প্লেটোর ভাষায়—from opinion-রাজ্য অর্থাৎ from অবিদ্যা-রাজ্য to idea-রাজ্য অর্থাৎ to তত্ত্ব-রাজ্য, from idea-রাজ্য to harmony-রাজ্য] until at last he endures to gaze upon the sun [upon সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম] and see him as he is in his own domain [in his আপন মহিমা—'স্বে মহিম্নি']".

প্লেটো তাঁহার গুহা-রূপকটির উপসংহার-স্থলে এ যাহা বলিয়াছেন, ইহা আমাদের নিকটে কিছুই নূতন নহে আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েরই বেদান্তবিৎ আচার্য্যেরা যাহা এক-বাক্যে বলিয়া থাকেন—তাহাই তিনি বলিয়াছেনঃ—কি? না „ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার-লাভই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। প্লেটোর বেদান্তবাদ এইরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রশস্ত বেদান্তবাদ; আর, সেইজন্য, তাহা শঙ্করাচার্য্যের স্বমতানুযায়ী বেদান্তবাদের সহিত সর্ব্বাংশে মেলে না। শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তবাদ অদ্বৈতবাদ শুধু না—তাহা **অতি-অদ্বৈতবাদ**। অদ্বৈতবাদ যে, অমূলক, তাহা আমি বলি না; উল্টা আরো আমি বলি এই যে, তাহা পরাকাষ্ঠা সত্য-মূলক; কেননা, বাস্তবিকই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য সমস্ত জগতের সার পদার্থ। সেই সঙ্গে এটাও কিন্তু বলি যে, রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজা যেমন নামে রাজা—কাজে নিঃসম্বল পথের ভিখারী, দ্বৈত-ভ্রষ্ট অতি-অদ্বৈতবাদ তেমি নামে অদ্বৈতবাদ কাজে শূন্য-বাদ। এটা অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, চলিবার সময় যেমন একই মুহূর্ত্তে দুই পা এক সঙ্গে বাড়ানো অসম্ভব—ভাবিবার সময় তেমনি একই মুহূর্ত্তে দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয় তত্ত্ব ভরপুর মনোনিধান করা অসম্ভব; কিন্তু তা বলিয়া এটা আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, রাত্রিকালে ভরপুর বিশ্রাম এবং দিনমানে ভরপুর শ্রমশীলতা যেমন উভয়ে উভয়ের পরম উপকারী, তেমি, ভজনকালে পরমাত্মাতে চিত্তের ভরপুর তন্ময়ীভাব এবং সাধনকালে সাংসারিক কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানে ভরপুর তৎপরতা উভয়ে উভয়ের পরম উপকারী। প্লেটোর বেদান্তবাদ শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী বেদান্তবাদ না হইলেও তাহা **বেদান্তবাদ** তাহাতে আর ভুল নাই;—তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত সাধু বেদান্তবাদ, আর, সেইজন্য তাহা সাধুসজ্জনগণের সাধুবাদের পাত্র।

প্লেটো'র শাস্ত্রের সহিত দেশীয় শাস্ত্রের এত এত স্থানে এত এত রকমের মিল রহিয়াছে যে, সমস্ত মিল-গুলি সৈন্য-সাজাইবার মতো করিয়া পাঠক মহোদয়ের নেত্রের সম্মুখে কাতারে কাতারে সাজাইয়া দাঁড় করানো সহজ ব্যাপার নহে। তাহা মস্ত একজন ভীমতুল্য ক্ষত্রিয়-বীরের কার্য্য হইতে পারে, পরন্তু আমার ন্যায় দ্বিজাধমের পক্ষে তাহা একপ্রকার অসাধ্য-সাধন। তবে **একটি কার্য্য** আমি করিতে পারি—ভারত প্রাণা ভারতী দেবী যাবনিক ভাষার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা দিয়া যবন-বিদ্যা-মণ্ডপের (Academyর) উদ্যান-বীথিকায় চলা-ফেরা করিতেছেন **কেমন আশ্চর্য্য অপরিজ্ঞাতভাবে,**

তাহার নিদর্শন-স্বরূপে দেবীর সুন্দর সুন্দর চারি-পাঁচটি চরণ-চিহ্ন তাঁহার ভক্ত সেবকগণের নয়ন-গোচরে নিবেদন করিতে পারি; তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

(১) জ্ঞানের মূলতত্ত্ব।

Republic of-Plato'র প্রণয়ন-কর্ত্তা R. L. Nettleship বলিতেছেন

"Both to ordinary people and the philosophers among the Greeks the good meant the object of desire, that which is worth having, that which we most want."

তাহা যেন বুঝিলাম; কিন্তু সজ্জন-গণের সেই যে পরম প্রার্থনীয় বস্তু—কী সে বস্তু? যে সকল অস্থায়ী বস্তুর প্রলোভনে অবোধ লোকের অসংযত চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহাই কি? না আর কোনো কিছু? কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ২৫শ।২৬শ শ্লোক দুটিতে এ প্রশ্নের সমুচিত উত্তর দেওয়া হইয়াছে অনেককাল পূর্ব্বে। সে-দুটি শ্লোক এই :-

যমরাজা॥ যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে, সর্ব্বান্ কামান্ ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা নহীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ। আভি মৎ প্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব। বাংলা॥ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যে সকল কামনার বস্তু মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ, তাহার মধ্যে, যাহা তোমার মন চায়, প্রার্থনা কর। এই যে-সকল দিব্য স্ত্রী, দিব্য রথ, দিব্য বাদিত্র, এমন-সকল সামগ্রী পৃথিবীর মনুষ্যেরা পায় না বহুদিন সাধ্যসাধনা করিলেও—সমস্তই দিলাম আমি তোমাকে—এই সকল লইয়া পরম সুখে জীবন যাপন কর।

নচিকেতা॥ শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বং জীবিতং অল্পমেব। তবৈব বাহাস্ তব নৃত্যগীতে॥ বাংলা॥ মর্ত্ত্যজীবের এই যে কাল্‌কের ভাবনা, এই কাল্‌কের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ জর্জ্জরিত হইতে থাকে; তাহাতে আবার, জগৎসুদ্ধ জীবের সমস্ত পরমায়ু একসঙ্গে জোড়া দিলেও তাহা পদ্মদলের জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। অতএব তোমার অশ্বরথ তোমারই থাকুক—তোমার নৃত্যগীত তোমারই থাকুক।

নচিকেতার এই মর্ম্মভেদী প্রত্যুত্তর শুনিয়া—কে-এমন হতচেতন সে না মুক্তকণ্ঠে-স্বীকার করিবে যে, ইন্দ্রিয়-রোচক অস্থায়ী ভোগ্য সামগ্রীসকল বাস্তবিকই কোনো জ্ঞানবান্ জীবের পরম প্রার্থনীয় বস্তু নহে। কী তবে মনুষ্যের পরম প্রার্থনীয় বস্তু? বেদান্তশাস্ত্রে বলে—জন্মমৃত্যুবিহীন অটল ধ্রুব বস্তুই মনুষ্যের পরম প্রার্থনীয় বস্তু; আর তাহারই নাম সৎ। এমতে পাইতেছি :—
সৎ = নিত্যবস্তু = পরমার্থ = পরম অর্থ = পরম প্রার্থনীয় বস্তু = 'the Good'। আমাদের দেশের প্রচলিত আটপৌরিয়া ভাষাতেও—সৎকর্ম্ম = good deed, সদাচার = good behaviour, সৎসঙ্গ = good company, ইত্যাদি। অতএব এ কথা একটুও মিথ্যা নহে যে, দেশীয় শাস্ত্রে যাহার নাম 'সৎ'—প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহারই নাম 'the Good'। এই গেল সৎ; তাহার পরে আসিতেছে চিৎ।

এই সাদা সাতের আঁকটি যে, লেখ্য কাগজের অঙ্গের সামিল তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। আর এটাও বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ সাদা সপ্তাঙ্কটি লিখিত হইবার পূর্ব্বেও উহা কাগজের ঠিক্ ঐ স্থানটিতে বর্ত্তমান ছিল—তবে কিনা অদৃশ্য-ভাবে। সপ্তাঙ্কের ঐরূপ অদৃশ্য সাদা মূর্ত্তি সাদা কাগজের সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছে। লেখক যখন সাদা কাগজে কোনো-একটি কালো অক্ষর বিন্যাস করেন—করেন তখন তিনি, আর কিছু না—ঐ কালো অক্ষরটির যে-একটি অদৃশ্য সাদা মূর্ত্তি লেখ্য কাগজে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই উপরে দাগা বুলা'ন্। তিনটি বিষয় এখানে পরে পরে দ্রষ্টব্য।

প্রথম দ্রষ্টব্য।

সাদা কাগজে কালো অক্ষর যখন যাহা আবির্ভূত হয় তাহা যেমন কাগজের অন্তর্গত কোনো-একটি অদৃশ্য সাদা অক্ষরের দৃশ্য প্রতিলিপি, তেমনি, জ্ঞান-গোচরে লক্ষ্যবস্তু যখন যাহা আবির্ভূত হয় তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত কোনো একটি অব্যক্ত তত্ত্বের সুব্যক্ত প্রতিরূপ।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন ভিন্ন কালো অক্ষরের মূলস্থিত ভিন্ন ভিন্ন সাদা

অক্ষর অদৃশ্য হইলেও—সকল অক্ষরের মূলস্থিত একমাত্র দৃশ্যবস্তু যেমন লেখ্য কাগজ নিজে, তেমি, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য বস্তুর মূলস্থিত ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব অব্যক্ত হইলেও—সকলের মূলস্থিত একমাত্র সুব্যক্ত তত্ত্ব-জ্ঞান স্বয়ং।

তৃতীয় দ্রষ্টব্য।

লেখ্য কাগজ যেমন আপনার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত অদৃশ্য সাদা অক্ষরের এবং আপনার পৃষ্ঠবর্ত্তী সমস্ত দৃশ্যমান কালো অক্ষরের একমাত্র গোড়া'র ক্ষেত্র, জ্ঞান তেমি আপনার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত অব্যক্ত সত্যের এবং আপনার সম্মুখবর্ত্তী সমস্ত সুব্যক্ত সত্যের একমাত্র গোড়া'র সত্য। এখন দেখিতে হইবে এই যে, গোড়া'র ক্ষেত্র সেই যে, লেখ্য কাগজ, তাহা যেমন তাহার পৃষ্ঠবর্ত্তী অক্ষর-সকলের অধিষ্ঠান-ভূমিরূপে প্রকাশমান, তেমি, গোড়া'র সত্য সেই যে, জ্ঞান, তাহা সম্মুখস্থিত বস্তুসকলের বাস্তবিক-সত্তারূপে প্রকাশমান। বাস্তবিক-সত্তা যে, কিরূপ সত্তা, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে যে, তাহা হাতি নয় অথচ হাতির মূলে আছে; ঘোড়া নয় অথচ ঘোড়া'র মূলে আছে; স্বপ্ন নয় অথচ স্বপ্নের মূলে আছে; নিদ্রা নয় অথচ নিদ্রার মূলে আছে। এক কথায়—বাস্তবিক-সত্তা সকল-বস্তুরই গোড়া ঘেঁসিয়া জ্ঞানের সহিত মাখামাখিভাবে চিরবর্ত্তমান। বাস্তবিক-সত্তা'র আরেক নাম ধ্রুব-সত্য এবং তাহা সংশয়-শূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত একেবারেই একীভূত। এমতে পাইতেছি

সত্য = জ্ঞানের সহিত একীভূত বাস্তবিক সত্তা
= বাস্তবিক সত্তার সহিত একীভূত জ্ঞান
= চিৎ; তবেই হইতেছে যে,

সত্য = চিৎ।

এইজন্য বলি যে, দেশীয় শাস্ত্রে যাহার নাম চিৎ প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহারই নাম 'the True.' এই গেল চিৎ; তাহার পরে আসিতেছে—আনন্দ।

এই স্থানটিতে কবি-Keats এর Endymion-কাব্যের শিরস্থানীয় প্রথম পংক্তিটি আমার মনে পড়িতেছে; তাহা এই:—"A thing of beauty is a joy for ever"। ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, 'the Beautiful = নিত্য আনন্দ।

জিজ্ঞাসু॥ সৌন্দর্য্য পদার্থটা কি?

প্রবোধয়িতা॥ আমি যদি তোমাকে বলি যে "তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে আমি একটি পুস্তক রচনা করিয়া তোমাকে তাহা উপহার প্রদান করিব," বলিয়া—তৎ-পরতা'র সহিত তাহা রচনা করিতে বসিয়া যাই, তাহা হইলে তাহা যে কত বৎসরে শেষ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; তবে এটা স্থির যে, দশ বৎসরের কমে না। অতএব ওরূপ একটা অপরিমেয় বৃহৎকার্য্যে কোমর বাঁধিয়া প্রবৃত্ত হওয়া আমার ন্যায় ত্রিকালোত্তীর্ণ লোকের পক্ষে নিতান্তই একটা বিসদৃশ কার্য্য। আবার তা'ও বলি—তোমার প্রশ্নের উত্তর-প্রদানে বিরত হওয়াও আমার পক্ষে শোভা পায় না। অতএব, যাহা সবিস্তরে পর্য্যালোচনা করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইতে থাকে ক্রমাগতই—শেষ হইতে চাহে না কিছুতেই, সেই অপার এবং অনি-র্ব্বচনীয় বিষয়টি আমি তোমাকে যত পারি সংক্ষেপে—ঠারেঠোরে ইঙ্গিত ইসারায়—বলিয়া খালাস হইতেছি;—প্রণিধান কর।

(১) জীব-মাত্রেরই প্রাণ তাহার শরীরের মর্ম্মস্থানীয় কতকগুলি আটপহুরিয়া ব্যাপারের সৌসামঞ্জস্যের উপরে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

(২) আমাদের প্রাণের গোড়া-ঘেঁসা অব্যক্ত সৌসামঞ্জস্যের ব্যাপারটিকে যখন আমরা কোনো সম্মুখস্থিত বস্তুতে সুব্যক্ত দেখি, তখন, সেই বস্তুটিতে আমাদের প্রাণ'কে যেন আমরা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ দেখিতেছি—আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হয়; আর সেই কারণে তাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি।

(৩) এমতে পাইতেছি—
সুন্দর বস্তু = প্রাণের প্রতিমা = দ্বিতীয় প্রাণ।

(৪) আমাদের প্রাণ'কে আমরা অন্তরে অনুভব করি, আর, তাহা আমাদের অতিশয় প্রিয় বস্তু। সেই অনুভূয়-মান প্রাণ'কে আমরা যখন আবার প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করি, তখন আমাদের আনন্দ ধরে না। তাহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি কোথায়? না সুন্দর বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গা-দির সৌসামঞ্জস্যে।

(৫) অন্তরে প্রাণের অধিষ্ঠান-মাত্রে যদি আমাদের আনন্দ হয়, তবে বাহিরে প্রাণ'কে প্রত্যক্ষবৎ মূর্ত্তিমান দেখিলে তাহা অপেক্ষা আরো কত না আনন্দ হইবার কথা? সুন্দর বস্তু দেখিলে তাই আমাদের আনন্দ উথলিয়া উঠে। সুন্দর বস্তু=আনন্দের খনি।

(৬) প্রকৃতি পরমাত্মার প্রাণের প্রতিমা, আর সেইজন্য পরমা সুন্দরী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য=পরমাত্মার আনন্দ

॥ ইতি কথোপকথন সমাপ্ত ॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ষষ্ঠ অনুবাকে লেখে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্য ভিসংবিশন্তি"॥ বাংলা॥ "আনন্দ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারা জীবন ধারণ করে; আর, তাহার পরে আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে।" ঐ উপনিষদের ২য় বল্লীর ৭ম অনুবাকে লেখে

"অসৎ বা ইদমগ্রে আসীৎ। ততোবৈ সদ্ অজায়ত। তদ্ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতং উচ্যতে ইতি। যদ্বৈতৎসুকৃতং রসোবৈসঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধা আনন্দীভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি॥ বাংলা॥ সৃষ্টির পূর্ব্বে সকলই অব্যক্ত ছিল। সেই অব্যক্ত হইতে এই ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে আপনা-কর্ত্তৃক প্রকাশিত পরমাত্মাকে 'সুকৃত (অর্থাৎ সুন্দররূপে ব্যক্তীকৃত) বলা যায়। এই যে 'সুকৃত' পরমাত্মা ইনি রসস্বরূপ [ইহার ভাব এই যে, যিনি সুন্দর করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'কে এবং সেই সঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি পরম সুন্দর]। এই রস-স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দান্বিত হ'ন। কেবা শরীর-চেষ্টা করিত—কেবা জীবন ধারণ করিত—যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা না থাকিতেন [অর্থাৎ জগতে ব্যক্ত না হইতেন]। ইনিই সকলকে আনন্দ দান করিতেছেন।" ফল কথা এই যে, প্রথমতঃ, জগজ্জন পরমাত্মার প্রেমের পাত্র—সুতরাং পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ; কেননা প্রেমের পাত্র সম্মুখে আবির্ভূত হইলে আনন্দ অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ, জগজ্জনের পাল্টাপ্রেমে তিনি আপনাকে আপনি বাঁধা দিতেছেন—সুতরাং তিনি রসস্বরূপ পরম সুন্দর; কেননা তাঁহাতে রস না থাকিলে কিসের গুণে তাঁহাতে ভক্তেরা প্রাণমন আত্মা সমর্পণ করেন? তবেই হইতেছে যে, আনন্দ এবং রস অথবা, যাহা একই কথা, আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য **একেরই এপিঠ-ওপিঠ।**

এমতে পাইতেছি :—

জ্ঞানের মূলতত্ত্ব।

দেশীয় শাস্ত্রে যাহা সৎ চিৎ আনন্দ—

প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহাই

the Good, the True, the Beautiful।

(২) সাধনের মূল মন্ত্র।

ভগবদ্গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে লেখে

'ওঁ তৎসৎ ইতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।"

[বাংলা] "ওঁ তৎসৎ এই তিনটি মন্ত্রাঙ্গ দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ সর্ব্বশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ।" যে-কোনো বস্তু আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তাহাকেই সত্য বলিয়া অবধারণ করি, এবং 'তৎ' [that] বলিয়া নির্দ্দেশ করি। তাই বেদান্তের পরিভাষায় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাংকেতিক নাম 'তৎ'। তৎ ='the True'। 'সৎ'='the Good,' ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বরের সাঙ্কেতিক নাম ওঁ, ইহা সকলেরই জানা কথা। অতঃপর ওঙ্কারের সহিত 'তৎসৎ' মন্ত্রাঙ্গ দুটির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অনুধাবন করিয়া দেখা যা'ক্।

রাজার **জ-এ** যফলা দিলে যেমন রাজ্য হয়, সতের **ত-এ** যফলা দিলে তেমি সত্য হয়। সৎ এবং সতের মধ্যে তাই সম্বন্ধ এইরূপ :—

(১) সৎ=নিত্য বস্তু=মঙ্গল=পরমাত্মা স্বয়ং। (২) সত্য=সতের কিনা পরম পুরুষের প্রকৃতিরাজ্য; আর সে-যে প্রকৃতিরাজ্য তাহা ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ উত্তম মধ্যম এবং অধম এই তিন শ্রেণীর প্রজার বাসস্থান।

পরমাত্মার নিরঞ্জন (অর্থাৎ নিখুঁত) পূর্ণ প্রকাশ পরমাত্মা স্বয়ং, তাই সে রকম প্রকাশ জগতের মধ্যে কুত্রাপি সম্ভাবনীয় নহে। জগতে—তাঁহার (১) কিয়ৎ প্রকাশ, (২) কিয়ৎ অপ্রকাশ, (৩) অপ্রকাশ হইতে

প্রকাশে সমুত্থান, (৪) প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে ঢলিয়া পড়ন, এই চারিটি ব্যাপার ক্রমাগতই চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার সামান্য-গোচের দৃষ্টান্ত একটি এই :—

(১) মধ্যাহ্ন—প্রকাশ

(২) সায়ংসন্ধ্যা—প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে ঢলিয়া পড়ন।

(৩) রাত্রি—অপ্রকাশ

(৪) প্রাতঃসন্ধ্যা—অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুত্থান।

এইরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যথা যথা সময়ে সতের ক্রোড়ে বিশ্রাম করিয়া এবং সেই আরাম-নাড় হইতে যথা যথা সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া গন্তব্য পথে প্রতিনিয়ত অগ্রসর হইতেছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা তাঁহার এই প্রকৃতিরাজ্যের মঙ্গলময় অধীশ্বর; আর, সত্য-রূপা প্রকৃতি সেই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা'র স্বরূপের প্রতিরূপ। তবেই হইতেছে যে, সূর্য্য এবং সূর্য্যালোকের ন্যায় সৎ এবং সত্য একেরই এপিঠ ওপিঠ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রেরই তাই ভিতরকার একটি নিগূঢ় কথা এই যে, ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা পরমেশ্বর—প্রকৃতি এবং পুরুষ—উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত কারণ—সত্য এবং মঙ্গল—তৎ এবং সৎ—দুইই একাধারে। এই গেল দেশীয় শাস্ত্রের মূলমন্ত্র—ওঁ তৎসৎ। এখন প্লেটোর শাস্ত্রের মূলমন্ত্র কী তাহা দেখা যা'ক্ :—Republic of Plato'র গ্রন্থকার R. L. Nettleship বলিতেছেন—

"It is essential to the clear understanding not only of Plato but Greek philosophy generally...to realize the place held in them by the conception of the 'good' [of the সৎ]. We see at once from what Plato now proceeds to say of the good, that three ideas, which to us seems to have little connection with one another are for him inseparable. The good is at once: first the end of life, that is the supreme object of all desire and aspiration [পরম প্রার্থনার বস্তু=পরমার্থ=পরমমঙ্গল=সৎ]; secondly, the condition of knowledge [চিতের গোড়া'র কথা], or that which makes the world intelligible [or বাস্তবিক সত্তা=সত্য=তৎ]; thirdly the creative and sustaining cause of the world [এক কথায়—'ওঁ']."

Plato'র শাস্ত্রের এই তিনটি মন্ত্রাঙ্গের মালা গাঁথিয়া পাইতেছি "সৎ তৎ ওঁ।" সাকল্যে পাইতেছি—

সাধনের মূলমন্ত্র।

দেশীয় শাস্ত্রে	প্লেটোর শাস্ত্রে
ওঁ তৎ সৎ	সৎ তৎ ওঁ

(৩) অবিদ্যা।

অবিদ্যা বস্তুটা কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে তাহার একটি সহজ উপায় হ'চ্চে জড়পদার্থ বস্তুটা কি, তাহা বুঝিয়া দেখা; কেননা জড় এবং অবিদ্যার মধ্যে দুই পা মাত্র ব্যবধান। তা'র সাক্ষী :—

জড়, (১) জড়তা, (২) মূঢ়তা, অবিদ্যা।

আজ আমাদের এই শাস্ত্রালোচনা সভায় জড়পদার্থের স্বরূপ-সম্বন্ধে B.A.-বেদান্তবাগীশ এবং তর্কালঙ্কার খুড়া'র মধ্যে মল্লযুদ্ধ বোঝা-পড়া হইবার কথা আছে। হাত-তালি পড়িয়াছে! দুজনা একসঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া কেমন দেখ স্বীয় ভাবে সামনাসামনি উপবিষ্ট হইলেন! দোঁহার মধ্যে বোঝা পড়া হইয়া শেষে কিরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হয় দেখা যা'ক্।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ আপনাদের শাস্ত্রে জড়পদার্থ সামান্য নহে পদার্থ; আমাদের শাস্ত্রে কিন্তু জড়পদার্থ পদার্থই নহে।

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ আমাদের শাস্ত্রই প্রামাণিক শাস্ত্র।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ জিজ্ঞাসা করি—জড়পদার্থ বস্তুটা কি?

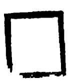
তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ তাহা যে বস্তুটা কি—তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। বস্তুটা তাহা আর-কিছুনা—শুদ্ধ কেবল পরমাণু-গণের সংঘাত।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ সংঘাত আবার একটা বস্তু নাকি? সংঘাত তো জানি একপ্রকার অবস্থা—সংহত অবস্থা।

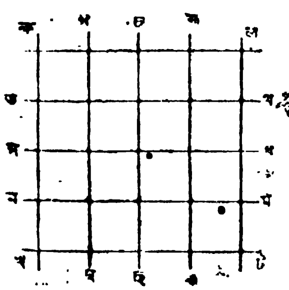
তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ মানো-তো এটা যে, সংঘাত বলিয়া একটা পদার্থ জগৎসুদ্ধ সকল বস্তুরই সঙ্গের সঙ্গী? তাহা যদি মানো, তবে তাহাকে বস্তু বলিতে ভয় কিসের?

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ যদি বলা যায় যে, সংঘাতের নামই বস্তু, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, কোনো একটি বস্তুর অবয়ব-সংঘাত ভাঙিয়া গেলে, বস্তুটিও সেইসঙ্গে না-ভাঙিয়া-যাইয়া রক্ষা পাইতে পারে না। আমি যদি আপনাকে দেখাইতে পারি যে, একটি বস্ত্র-খণ্ডের সূত্রাঙ্গগুলির সংঘাত ভাঙিয়া গিয়াছে, অথচ বস্ত্রখণ্ডটি যেমন তেমনি অটুট রহিয়াছে, তাহা হইলে আপনি কী বলিবেন?

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ বলিব যে, আমাদের বেদান্তবাগীশ-বি-এ-বাবাজির মতো সেরা বাজিকর জগতে নাই! এও কি কখনো সম্ভবে যে, বস্ত্রের সূত্রাঙ্গগুলি পরস্পরের সন্নিকর্ষ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, অথচ বস্ত্রটি স্বস্থানেও ছিন্ন হইবে না?

B.A.-বেদান্তবাগীশ  এই কাচের চাকিটি লউন্। উহার ইংরাজি নাম magnifying glass কিনা পরিবর্দ্ধক কাচ। উহার মধ্য দিয়া  এই বস্ত্র-খণ্ডটি ঠাহর করিয়া দেখুন্। কিরূপ দেখিতেছেন?

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ তোমার ঐ হাতের পেন্সিলটা আমাকে একবার দেও দেখি; দেখিলাম ঠিক এইরূপ।



দেখিলাম যে, কখ, গঘ, চছ, জঝ, নট, তদব, কল, তথ, দপ, নম, যট, এই তন্তুগুলা'র একটিও আর-একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাই—সবগুলাই স্ব স্ব প্রধান।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ আর-একবার ভাল করিয়া ঠাহরিয়া দেখুন;—এটা কি দেখিতেছেন না'যে বস্ত্রখণ্ডটি'র সূত্রাঙ্গগুলার সংঘাত ভাঙিয়া গিয়াছে, অথচ বস্ত্রখণ্ডটি যেমন-তেমনি অটুট রহিয়াছে?

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ তুমি বাজিকরই বটো! তোমারই জিত! এ যা দেখিতেছি—ইহা-দৃষ্টে সংঘাত'কে আর বস্তু বলা চলে না; তন্তু'র সংঘাতকেও না, তন্তুগত তুলা'র আঁশের সংঘাত'কেও না, তন্তুগত তুলার আঁশের পরমাণুগণের সংঘাত'কেও না—কোনও সংঘাত'কেই বস্তু বলা চলে না। বস্তু তবে ও'র কোন্খানটায় না জানি! বড্ড এবার তুমি আমাকে প্যাঁচে ফেলিলে! ভেবে' দেখি রো'সো! আচ্ছা; বস্ত্র-খানি যেন হ'ল তন্তু-গুলার সংঘাত; তন্তু যেন হ'ল তুলার আঁশের সংঘাত; তুলার আঁশ যেন হ'ল পরমাণুগণের সংঘাত; কিন্তু পরমাণু তো আর কোনো কিছুর সংঘাত নহে—পরমাণুকে তবে বস্তু বলিতে দোষ কি? আমার পূর্ব্বের কৃত সংজ্ঞা-নির্ব্বাচনটির অশুদ্ধ শোধন করিয়া এক্ষণে আমি তাই বলিতে চাই এই যে, জড়পদার্থ বস্তুটা আর কিছু না—শুদ্ধ কেবল পরমাণু-মাত্র।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ আমি যদি আপনাকে দেখাইতে পারি যে, পরমাণু মাত্রই অবয়ব-সংঘাত?

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ যে-দণ্ডে তাহা তুমি আমাকে দেখাইবে সেই দণ্ডে আমার এই ন্যায়ের পুঁথিটাকে আমি জলে নিক্ষেপ করিয়া তোমার ঐ বেদান্তের পুঁথিটিকে মাথায় করিয়া পূজা করিব।

B.A.-বেদান্তবাগীশ ॥ "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" এ কথাটা আপনার নিকট হইতেই আমি শিক্ষা-লাভ করিয়াছি; অতএব আপনার মুখে ও কথা শোভা পায় না। আমি আপনাকে কেবল এই সোজা কথাটি স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, এটা যখন আপনি স্বীকার করেন যে, একটি ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটেরও বক্ষ এবং পৃষ্ঠের মধ্যে প্রভেদ আছে, আর, এটাও যখন আপনি স্বীকার করেন যে, এক মাত্রায় পৃথক্ফল ন্যায়-বিরুদ্ধ, আর, আপনি যখন কিঞ্চিৎ বিষয়টার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, কোনো সংঘাতকেই পরমাণু বলা চলে না, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে যে, একটি ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতম পরমাণুরও একার্দ্ধ এবং অপরার্দ্ধের মধ্যে প্রভেদ আছে, সুতরাং পরমাণু-মাত্রই তাহার দুই অর্দ্ধের সংঘাত; আর, সেই জন্য পরমাণুকেও বস্তু বলা চলে না।

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ এ যাহা তুমি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া

দেখাইলে, ইহার উপরে কাহারও দ্বিরুক্তি চলিতে পারে না। তুমি যদিচ **সেদিনকার** বই না—B.A.-বেদান্তবাগীশ, তথাপি তোমার নিকটে পরাভব স্বীকার করিতে আমার লজ্জিত হইবার কোনো কারণ নাই; কেননা "বৃহন্নলা সারথির্যস্য কৃতস্তস্য পরাভবঃ"—"সামন্তো যস্য বেদান্তঃ কৃতস্তস্য পরাভবঃ।"*

যা হো'ক্—আজ আমার মস্ত একটা ভুল ভাঙিয়া গেল! বুঝিলাম এক্ষণে যে, রাজ্যসুদ্ধ লোক না-বুঝিয়া যাহাকে বলে জড়বস্তু তাহা অবস্তুরই আর-এক নাম॥ পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝা-পড়া হইয়া চুকিল—শান্তিঃ শান্তিঃ॥

একটি কথা এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য; সে কথা এই যে, জড়বস্তু যে, বস্তু নহে, তাহা নহে। জড়বস্তুও বস্তু—চেতন-বস্তুও বস্তু। তবে কি? না জড়বস্তু'কে আমরা যে-রকম বস্তু ঠাওরাই—উহা সে-রকম বস্তু নহে—উহা পরমাণু-সংঘাত নহে। জড়বস্তুতে সংঘাতের আরোপ=বস্তুতে অবস্তুর আরোপ। বৈদান্তিক ভাষায়—ইহাকে বলে অধ্যারোপ। অবিদ্যা কী? না ঐরূপ অধ্যারোপের কারণ-রূপি **অজ্ঞান**; এক কথায়—ভ্রমজ্ঞান। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ নামক পুস্তকে অবিদ্যার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ:—

"বস্তুনি অবস্তু-আরোপো যঃ সোঽধ্যারোপঃ ...। অসর্পভূতে রজ্জ্বাদৌ সর্পত্বারোপণং যথা। তৎকারণং অজ্ঞানং ......অবিদ্যা ইতি নিগদ্যতে। তদেতৎ সন্ ন ভবতি নাসদ্ বা। সতো ভিন্নং অভিন্নং বা ন দীপস্য প্রভা যথা।" [বাংলা] "রজ্জু-আদিতে যেমন সর্পত্বের আরোপ, তেম্নি বস্তু'তে অবস্তুর আরোপ'কে অধ্যারোপ বলা যায়। এই-প্রকার অধ্যারোপের কারণরূপি অজ্ঞান (সংক্ষেপে ভ্রমজ্ঞান) অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়। এই যে অবিদ্যা ইহা সৎও না অসৎও না; দীপের প্রভা'কে যেমন দীপ হইতে ভিন্নও বলা যাইতে পারে না—অভিন্নও বলা যাইতে পারে না, অবিদ্যা'কে তেম্নি সৎ হইতে ভিন্নও বলা যাইতে পারে না অভিন্নও বলা যাইতে পারে না।" শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই যে বলিয়াছেন—"অধ্যারোপের কারণ-রূপি অজ্ঞান=অবিদ্যা," ইহার পরিবর্ত্তে কেহ যদি বলেন "অজ্ঞানমাত্রই=অবিদ্যা", তবে সেটা তাঁহার বড়ই ভুল। মূর্চ্ছাগত ব্যক্তি তো ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন; কিন্তু তথাপি তাহার সে অজ্ঞানকে অবিদ্যা বলা যাইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু সে-অজ্ঞান হইতে রজ্জুতে সর্পভ্রম বা আর-কোনো প্রকার ভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াছেন যে, কেবল অধ্যারোপের কারণ-রূপি অজ্ঞান (অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান)=অবিদ্যা, তা বই, অপর কোন প্রকার অজ্ঞান অবিদ্যা নহে।

জিজ্ঞাসু॥ অবিদ্যার লক্ষণ নিরূপণ করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য দুইভাবের দুইটি কথা পরে পরে বলিয়াছেন। প্রথমে বলিয়াছেন—অবিদ্যা অধ্যারোপের অর্থাৎ ভ্রম-জ্ঞানের মূল কারণ; তাহার পরে বলিয়াছেন—অবিদ্যা সৎও নহে অসৎও নহে। এ দুইটি কথার পৃথক্ পৃথক্ অর্থ বুঝিতে আমার কিছুই কঠিন বোধ হইতেছে না; **বুঝিতে পারিতেছি না কেবল** দুয়ের মধ্যে বন্ধনের আঁট কিরূপ; সেইটিই আমাকে আপনি আজ বুঝাইয়া দি'ন্।

প্রবোধয়িতা॥ অবিদ্যা অধ্যারোপের, অথবা যাহা একই কথা, ভ্রমজ্ঞানের মূল কারণ বলিয়াই তাহাকে সৎও বলা যাইতে পারে না অসৎও বলা যাইতে পারে না। নিম্নে প্রণিধান কর—

অবিদ্যাকে সৎ বলা যাইতে পারে না কেন।

সৎ হইতে সত্যজ্ঞান ছাড়া ভ্রম-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।	অবিদ্যা হইতে ভ্রম-জ্ঞান ছাড়া সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না।

এই কারণে অবিদ্যাকে সৎ বলা যাইতে পারে না।

অবিদ্যাকে অসৎ বলা যাইতে পারে না কেন।

অসৎ হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না	অবিদ্যা হইতে ভ্রম-জ্ঞান উৎপন্ন হয়

* এখানে সামন্ত শব্দের অর্থ—'অধিনায়ক'। প্রকৃতিবাদ অভিধান দেখ।

এইকারণে অবিদ্যাকে অসৎ বলা যাইতে পারে না।

তবেই হইতেছে যে, অবিদ্যা সৎও না অসৎও না।

জিজ্ঞাসু ॥ "অবিদ্যা হইতে" না বলিয়া আমি যদি বলি "অজ্ঞান হইতে" ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে তাহাতে কী দোষ হয়?

প্রবোধয়িতা ॥ অবিদ্যা যে, কাহাকে বলে, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে; আর, অজ্ঞান যে কাহাকে বলে, তাহাও তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। তা'র সাক্ষী:—

(১) অবিদ্যা=বিদ্যার অভাব।

(২) অজ্ঞান=জ্ঞানের অভাব।

এটা তো তুমি মানো যে, একজন অধম মূর্খও জ্ঞানবান্ জীব? অতএব এটা স্থির যে, বিদ্যার অভাবে মনুষ্যের জ্ঞানের অভাব হয় না। বিদ্যার অভাবে হয় তবে কী? না মনোমধ্যে ভ্রম-জ্ঞানের আধিপত্য-বিস্তার। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাই বলিয়াছেন—

"অধ্যারোপের অথবা, যাহা একই কথা, ভ্রমজ্ঞানের মূল কারণ—অবিদ্যা।

এটা যেমন দেখিলাম যে, বিদ্যার অভাব অবিদ্যা, এটাও তেম্নি দেখা চাই যে,

বিশেষ জ্ঞান=বিদ্যা।

আর সেইজন্য

বিশেষ-জ্ঞানের অভাব=অবিদ্যা।

চক্ষের সামনে একগাচি দড়ি পড়িয়া রহিয়াছে—এরূপ অবস্থায়,

"ওটা লম্বাকৃতি বস্তু" এইরূপ জ্ঞান=সামান্য জ্ঞান

"ওটা দড়ি" এইরূপ জ্ঞান=বিশেষ-জ্ঞান

"ওটা দড়ি নহে" এইরূপ জ্ঞান=বিশেষ জ্ঞানের অভাব

"সম্মুখে অন্ধকার" এইরূপ জ্ঞান=সম্মুখস্থিত বস্তুবিষয়ক সামান্য জ্ঞানেরও অভাব।

এখন জিজ্ঞাসা করি যে, যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম বা যষ্টিভ্রম বা লতা-ভ্রম হয়, তখন সে-যে ভ্রমজ্ঞান, তাহা কোন্ প্রকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়? "সম্মুখে অন্ধকার", এই প্রকার জ্ঞান হইতে—না "ওটা রজ্জু নহে" এই প্রকার জ্ঞান হইতে? দেখা'র সহিত জানা'র উপমা দিয়া বলিলাম যে, "'সম্মুখে অন্ধকার' এই প্রকার জ্ঞান;" কিন্তু প্রকৃত কথাটি যাহা বক্তব্য তাহা এই যে, সম্মুখে কিছুই না—এই প্রকার জ্ঞান=অজ্ঞান। এখন দ্রষ্টব্য এই যে, অন্ধকার-দেখা যেমন না-দেখা'রই আর-এক নাম; তেমনি কিছুইনা-জানা না-জানা'রই আর-এক নাম। অতএব "সম্মুখে অন্ধকার" অথবা, যাহা একই কথা, "সম্মুখে কিছুই না" এই প্রকার জ্ঞান (যাহার আর এক নাম না-জানা, তাহা) হইতে রজ্জুতে সর্পভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না ইহা বলা বাহুল্য। উৎপন্ন হয় তাহা "ওটা রজ্জু নহে" এইরূপ বিশেষ-জ্ঞানের-অভাব হইতে; তার সাক্ষী:—ঐ লম্বাকৃতি বস্তুটা যেহেতু রজ্জু নহে, এই হেতু উহা—হয় সর্প, নয় যষ্টি, নয় লতা ইত্যাদি। তবেই হইতেছে যে সামান্য-জ্ঞান বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইতে—অবিদ্যা হইতে—ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয়; তা বই কিছুইনা জানা-রূপি জ্ঞান হইতে অথবা, যাহা একই কথা, অজ্ঞান হইতে ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এই যে ভ্রমজ্ঞানের মূল-কারণ-রূপা অবিদ্যা ইহা সৎও নহে অসৎও নহে, —সৎ নহে কেন? না যেহেতু সৎ হইতে সত্যজ্ঞান ছাড়া ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; অসৎ নহে কেন? না যেহেতু অসৎ হইতে কিছুই উৎপন্ন হইতে পাবে না—ভ্রমজ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। বেদান্ত শাস্ত্রে তাই বলা হইয়াছে "অবিদ্যা সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া" অবিদ্যা সৎও নহে, অসৎও নহে, এইরূপ একটা স্ববিরোধী পদার্থ। বেদান্তের সদসদ্ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়া অবিদ্যা কিরূপ—এই তো তাহা দেখিলাম; এখন যবনী অবিদ্যা কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্।

পণ্ডিতবর R. L. Nettleship বলিতেছেন

"Plato goes on to show that the philosopher has knowledge, while the mere philomathes [অর্থাৎ mere learned man কিনা পুঁথিগত বিদ্যার জাহাজ] has only 'opinion.' Now when we say we 'know' a thing we imply that it has being; and the being of a thing is exactly conterminous with its knowableness…on the other hand what is the negation of being is the negation of knowableness… Now in ordinary language we distinguish knowing [জানা] from

thinking [মনে করা] or opinion, which lies between these two extremes of perfect knowledge and perfect ignorance···The object of knowledge is what is [অর্থাৎ being]...Opinion also must have an object···On the other hand, it cannot have the same object as knowledge. It results that the object of opinion must both be and not be. We can neither say that it is ...nor that it is not [অর্থাৎ সদসদ্‌ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ং] এইরূপ দেখা যাইতেছে যে বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে বলে অবিদ্যার ভ্রমাত্মক object, অর্থাৎ object-এর ভান মাত্র, প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহারই নাম object of opinion; কেননা দুইই 'সদসদ্‌ভ্যাং অনির্ব্বচনীয়ং।' তবেই হইতেছে যে দেশীয় শাস্ত্রে যাহার নাম অবিদ্যা প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহারই নাম Opinion।

(৪) হিরণ্যগর্ভ এবং বৈশ্বানর।

পণ্ডিতবর R. L. Nettleship বলিতেছেন

"He (অর্থাৎ Plato) makes the world as we perceive it with the senses after the pattern of a world which is intelligible [He makes the ভৌতিক জগৎ consisting of অন্নময়াদি কোষ after the pattern of বুদ্ধিজগৎ consisting of বিজ্ঞানময় কোষ]; which means not that there are really two worlds, but that, as we might say, the world as it is revealed through the senses [স্থূল জগৎ] is the manifestation of an intelligible order [of মহতী বুদ্ধি, সংক্ষেপে of মহান্, অথবা, যাহা একই কথা, of সমষ্টি বিজ্ঞানময় কোষ]. At the end of the Timaeus we find the distinction between the creator and the intelligible world tending to disappear [we find the distinction between হিরণ্যগর্ভ and সমষ্টি-বিজ্ঞানময়াদি কোষ অথবা, যাহা একই কথা, between হিরণ্যগর্ভ এবং তাঁহার শরীর বা উপাধি, tending to disappear], while the sensible world itself [while দৃশ্যমান বিশ্বচরাচর consisting of সমষ্টি-অন্নময়-কোষ which is বৈশ্বানর বিরাট্ পুরুষের শরীর বা উপাধি] becomes God made manifest to the human senses [becomes বৈশ্বানর-দেব কিনা বিষ্ণু]."

অর্থাৎ আমরা যেমন শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহার বিজ্ঞানময়-কোষ-রূপী সূক্ষ্মশরীরের মস্তকের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলি যে, ইনি বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাকে তাঁহার অন্নময় কোষ রূপী স্থূল শরীরের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলি যে, ইনি ভারতবর্ষের নানা দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; প্লেটো তেম্নি জগদাত্মাকে তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষরূপী অথবা, যাহা একই কথা, মহতী বুদ্ধিরূপী সূক্ষ্মশরীরের মস্তকের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে, এই intelligible orderই—বিজ্ঞানময় বিবিধব্যবস্থাই—creator of the world এবং তাঁহাকেই তাঁহার দৃশ্যমান-বিশ্বরূপী স্থূল শরীরের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে, ইনিই God menifest to human senses. বেদান্ত-শাস্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে;—পরব্রহ্মকে তাঁহার সূক্ষ্মশরীরের মস্তক রূপী সমষ্টি বিজ্ঞানময় কোষের সহিত অথবা, যাহা একই কথা, মহানের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলা হইয়াছে যে, ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তা হিরণ্য-গর্ভ, এবং তাঁহাকে তাঁহার দৃশ্যমান বিশ্বরূপী স্থূলশরীরের সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলা হইয়াছে যে, ইনিই বিরাট্‌পুরুষ বা বৈশ্বানর।

পঞ্চদশী নামক প্রসিদ্ধ বেদান্ত-গ্রন্থে স্পষ্ট লেখা আছে—"হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরোঽভবৎ" [বাংলা] "হিরণ্যগর্ভ এই সকল স্থূল-শরীরে প্রবেশ করিয়া বৈশ্বানর হইলেন।" Plato'র শাস্ত্রের সহিত দেশীয় শাস্ত্রের এইরূপ আষ্টেপৃষ্ঠে মিল।

পণ্ডিতবর James Adam বলিতেছেন "Before we leave the subject of the World-soul it is necessary to touch upon the difficult question "What does Plato mean by describing it as created?" তিনি তো বলিবেনই—"difficult question!" আমার নিকটে কিন্তু উহা কিছুই difficult নহে। Plato'র

শাস্ত্রে যাঁহার নাম World-soul দেশীয় শাস্ত্রে তাঁহার নাম বোধাবোধাত্মক হিরণ্যগর্ভ। হিরণ্যগর্ভ is 'created' এ কথা সত্য; কিন্তু তাঁহার creator কে? তাঁহার creator তিনি আপনিই। হিরণ্যগর্ভ অব্যক্ত হইতে সর্ব্ব প্রথমে জন্মেন, তাই তাঁহার আর-এক নাম 'প্রথমজ'; আবার, তিনি আপনিই আপনার জন্মদাতা—অর্থাৎ আপনিই আপনাকে অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত করেন, তাই তাঁহার নাম স্বয়ম্ভূ। ফল-কথা এই যে যেমন আপনি না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না, তেমনি আপনাকে সৃষ্টি না করিলে অন্যকে সৃষ্টি করা যায় না। নিশাবসানে যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি আপনা হইতেই জাগিয়া ওঠে—প্রলয়াবসানে তেমনি ব্রহ্মা আপনা-হইতেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হ'ন;—এইরূপে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২য় বল্লীর ৭ম অনুবাকটি যদিচ পূর্ব্বে বাংলা-অনুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, তথাপি তাহার মূল বাদ দিয়া শুদ্ধ কেবল বাংলা অনুবাদটি এই জায়গাটিতে পুনরুল্লেখ করা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

তৈত্তরীয় উপনিষদের ২য় বল্লীর ৭ম অনুবাকের বাংলা অনুবাদ॥ সৃষ্টির পূর্ব্বে সকলই অব্যক্ত ছিল। সেই অব্যক্ত হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত পরব্রহ্ম আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে আপনাকর্ত্তৃক প্রকাশিত পরমাত্মাকে 'সুকৃত' (অর্থাৎ সুন্দররূপে ব্যক্তীকৃত) বলা যায়। এই যে, সুকৃত পরমাত্মা ইনি রস-স্বরূপ। [ইহার ভাব এই যে, যিনি সুন্দর করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এবং সেইসঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি পরম সুন্দর]।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"মা ফলেষু কদাচন"

(বৃন্দ, কবি)

ভবিষ্যতের হাতে ফলাফল,
কাজ ক'রে শুধু যাই,
পাশাগুলো আছে মুঠোর মধ্যে
দান পড়াটা তো নাই।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

বলাকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১১৮ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট কাগজে সুপরিচ্ছন্ন ছাপা ও উত্তম বাঁধা। মূল্য মাত্র একটাকা।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বাল্যাবধি এক এক অবস্থায় নিজের উদ্ভাবিত পুরাতন প্রণালীকে অতিক্রম করিয়া নূতনের সৃষ্টি করিয়া নব-নব-উন্মেষ-শালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে প্রতিভার উদ্বোধন হইয়াছিল, মানসী সোনার তরী চিত্রাতে তাহার প্রতিষ্ঠা; কিন্তু কাব্যরচনার সেই ধারা ক্ষণিকা ও খেয়াতে ভিন্ন খাতে বহিয়া রসিক জনকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছে। তাহার পর গীতাঞ্জলী গীতিমাল্য ও গীতালি যে সুরের সুরধুনী বহাইয়া চলিয়াছিল তাহা অকস্মাৎ পাগলা-ঝোরার ন্যায় বলাকায় নূতন অসম ছন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রসিক চিত্ত প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রতি পদে আপনাকে আপনি অতিক্রম করিয়া চলে বলিয়া মহাস্থবিরেরা তাহার সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিতে না পারিয়া মহাকবির অসাধারণ প্রতিভাকেই নিন্দা করিয়া বলে যে তাহাকে ধরিতে পারা যায় না, তাহা অবোধ্য। আমাদের দেশের প্রাচীন কাব্যরচনার প্রণালী ছিল ছন্দে ঘটনার বর্ণন ও জানা তত্ত্বের জাল বোনা। তাহা ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যখন নব নব ছন্দে অনির্ব্বচনীয় মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সুরু করিলেন তখন তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার সুর যখন কানে বসিল তখন একদল ভক্তের আবির্ভাব হইল। কিন্তু আবার যখন কবিতা রচনায় অ-কথ্য ভাষা ছাড়িয়া কবি কথ্য ভাষার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে লাগিলেন, তখন সেই ভক্তরাই বলিতে লাগিল—কবি আগে বেশ লিখিতেন, এখন এসব কি হইতেছে? ক্রমে তাহাও সহিয়া গিয়াছিল। আবার সকলকে বিস্মিত বিপর্য্যস্ত করিয়া নূতন ছন্দে নূতন ভাবের কবিতার আবির্ভাব হইয়াছে—সেগুলি গাঁথা হইয়াছে বলাকায়। এখনও দু-একটি নিন্দুকের কণ্ঠ শোনা যাইতেছে, কিন্তু সে উক্তি ভয়ে-ভয়ে অর্দ্ধোচ্চারিত মাত্র, শীঘ্রই তাহা নীরব হইবে। বলাকার পাগলা-ঝোরা অসম ছন্দ একাধিক কবিযশপ্রার্থী অনুকরণ করিতেছেন; তাহাতেই ইহার দর যাচাই হইয়া গিয়াছে। বলাকার কবিতাগুলি নদীর মতন 'আপন বেগে পাগলপারা,' ভাবের গাম্ভীর্য্যে পাগলা-ঝোরার মতন পরিপূর্ণ ও উচ্ছ্বসিত, বলাকার মতনই মানস সরোবরের যাত্রী। যাহার মানস-সরোবরে দেবী সরস্বতীর আসন-শতদল ফুটিয়া আছে সেখানে এই বলাকা শ্বেতপদ্মকলিকার অসূত্রগ্রথিত মালিকার মতন বিহার করিবে ইহা সুনিশ্চিত। বলাকার মালায় তাজমহল, ছবি, ঝিলম, নূতন বৎসর, বলাকা, প্রভৃতি অতুল্য।

চতুরঙ্গ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১২৩ পৃষ্ঠা। উত্তম কাগজ, পরিষ্কার ছাপা। মূল্য বারো আনা মাত্র।

এখানি গল্পের বই। চারটি ছোট গল্প—জেঠামশায় শচীশ দামিনী শ্রীবিলাস—পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে এই বইএ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন বৎসরে বৎসরে আপনার নূতন রূপকে অতিক্রম করিয়া নূতনতর হইয়া আসিয়াছে, গল্পও সেইরূপ। সাধনা ও ভারতীর যুগের গল্প একরূপ, প্রবাসীর যুগে অন্যরূপ, আবার ভারতীর যুগে আরেকরূপ, সবুজপত্রের যুগে অপরূপ! রবীন্দ্রনাথের তুল্য সর্ব্বতোমুখী

প্রতিভা জগতে এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই। ছোটগল্প লেখায় তাঁর সমকক্ষ জগতের কোনো সাহিত্যে কেহ নাই। চতুরঙ্গের গল্প চারটিতে তেজালো ভাষায় ইহাই দেখানো হইয়াছে যে সমাজধর্ম্মের চেয়েও প্রাণধর্ম্ম প্রবল এবং তাহা অবহেলা বা শাস্তিতে দমাইয়া রাখিবার বস্তু নহে। এই চারিটি গল্পের চারিটি চরিত্রই আপন মহিমায় এমন উজ্জ্বল হইয়া চিত্রিত হইয়াছে যে তাঁহাদের সম্মুখে অতি উদ্ধত ন্যায়াভিমানী বিচারককেও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে হয়। এই অপরূপ সৃষ্টি দ্বারা বঙ্গসাহিত্য জগতের সকল সুধী রসিকের সেব্য ও বরণীয় হইয়াছে। কোনো বাঙালী যদি ইহার সমাদর করিতে না পারে তবে সে কৃপার পাত্র।

আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কলিকাতা। সচিত্র। রয়াল অষ্টাংশিত ২৬৬ পৃষ্ঠা। দাম আড়াই টাকা।

ভূমিকায় গ্রন্থকার বইএর পরিচয় দিয়াছেন—"আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস সমস্তটাই ভারতী পত্রিকায়......বাহির হইয়াছে...... প্রথম খণ্ডে আমার বাল্য জীবন কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয় খণ্ডে আমার সিবিল সর্ব্বিস পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বোম্বাই প্রবাসের শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত, এবং সেই সঙ্গে বোম্বাই মহারাষ্ট্র ও সিন্ধু দেশের ইতিহাস, পারসী জাতি, জৈন স্বামীনারায়ণ প্রভৃতি গুজরাতের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, আর্য্যসমাজ ও প্রার্থনা-সমাজের বিবরণ অল্প-বিস্তর দেওয়া হইয়াছে।......এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা এ উভয়েরই সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে 'নানা মুনির নানা মত। কোন কোন পণ্ডিত......দূষ্য বিবেচনা করেন, আবার বীরবল-প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন যাঁহারা ঐ ভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন-মত এই দুইপ্রকার ভাষার উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। আমার মনে হয় বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভাষারও তারতম্য আবশ্যক হইয়া পড়ে।"

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ভারতের নবযুগের সন্ধিক্ষণ; যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মসাধনায় কর্ম্মসাধনায় সাহিত্য ও শিল্পসাধনায় বঙ্গের অগ্রণী; ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজকার্য্যে অধিকার লাভের পথ সিভিল-সার্ভিসে ভারতবাসীর প্রবেশের অগ্রণী তিনি স্বয়ং। এহেন ব্যক্তির জীবনস্মৃতিতে জন্মস্থান বঙ্গদেশের ও কর্ম্মস্থান বোম্বাই প্রদেশের যে পরিচয় পরিব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ, কৌতূহলজনক ও অতীব সুখপাঠ্য। বহু প্রসিদ্ধ লোকের চরিত্র ও কর্ম্ম, বহু দর্শনীয় স্থান, বহু সমাজের ও পরিবারের রীতিনীতি অভিজ্ঞতা-লব্ধ বর্ণনার সহিত বহু চিত্রের সমাবেশে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

পাপার্ড্ডি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। কাগজ ছাপা সুন্দর, প্রচ্ছদ সুদৃশ্য, গতানুগতিক নহে। ১৯৪ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা।

গল্পের বই। মুক্তি, ভেইয়া, বেচারা, দুঃখী, কালো জুড়ি, পূর্ণ, কালো ছায়া, দুই সন্ধ্যা—এই আটটি গল্প আছে। সবকটি গল্পই করুণ-রসে অভিষিক্ত। গল্পগুলিতে ওস্তাদ-লেখকের কারিকুরি অতি সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে; কালো জুড়ি ও কালো ছায়া গল্প পড়িতে-পড়িতে ওস্তাদ ফরাসী গল্পলেখকদের লেখা পড়িতেছি বলিয়া মনে হয়। স্বচ্ছ সরল ভাষার মধ্য দিয়া অতিসূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব কলিকা হইতে বিকাশের মতন অতি অনায়াসে অথচ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও লেখকের এতটুকু চেষ্টার লক্ষণ ধরা যায় না, ঐরূপ পরিণতি ও অবসান যেন ঘটনাচক্রে হইতেই হইত,—ইহাই মণিলাল বাবুর গল্পরচনার বিশেষত্ব। মণিলাল-বাবু তাঁহার পূর্ব্বযাত্রী ও সংযাত্রী বহু লেখককে অতিক্রম করিয়া দেবী সরস্বতীর পূজার মন্দিরে যে-অর্ঘ্যরচনা করিয়াছেন তাহা দেবী গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার ভক্তেরাও সেই নির্ম্মাল্য সাদরে গ্রহণ করিবেন।

নালক—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ৮৭ পৃষ্ঠা, আট আনা।

বুদ্ধদেবের কাহিনী এই বইএ বর্ণিত হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকর—রঙের ও শব্দের উভয়েরই ছবি আঁকিতে তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ নাই। এই কাহিনীর বর্ণনায় পংক্তিতে পংক্তিতে কত রং কত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই-সব ছবি কবিত্বের রসের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে ঝলমল করিতেছে। পাঠ করিতে করিতে মন সৌন্দর্য্যের রসে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। এই বইখানি একটু বড় বালকবালিকার হাতে দিলে তাহারা ইহা হইতে যে আনন্দ সম্ভোগ করিবে তাহা বাংলা সাহিত্যের আর অতি অল্প পুস্তকেই পাইবার সম্ভাবনা আছে।

অভ্র-আবীর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ২৪০ পৃষ্ঠা। উত্তম এণ্টিক কাগজে সুপরিচ্ছন্ন ছাপা। দাম পাঁচ সিকা।

কবিতার বই। লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির আধুনিকতম মৌলিক কবিতার সমষ্টি-দেবী সরস্বতীর পূজার অভ্র-আবীর,-উজ্জ্বল ও রঙিন। এই কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দের কারিকুরি বাগ্দেবীর প্রতিমাকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃত করিয়াছে—পিয়ানোর গানের একমাত্রিক তাল হইতে মহাসরস্বতীর পঞ্চম-সওয়ারি তাল পর্য্যন্ত কত তালের কতবিধ ছন্দ, কোথাও এতটুকু স্খলন নাই ত্রুটি নাই তাল কাটে নাই; এমন অবলীলায় ছন্দ-রচনায় খুব কম কবিই কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন। দেবী বীণাপাণির আসন-শতদল ভাবের শতদল মেলিয়া, কবিত্বের সৌরভে ভুরভুর করিতেছে—কুসুম-পঞ্চাশৎ কাজরি-পঞ্চাশৎ বাণীর কণ্ঠের শতাবলী হার, অপর কবিতাগুলি বাণীর বক্ষের ধুকধুকি। এই বইএর অনেক কবিতার মধ্যে কবির প্রবল দেশানুরাগ ও সমাজানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে; দেশের ও সমাজের অবনতি ও দুর্দ্দশা দেখিয়া কবি কোথাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কোথাও বা মোহ-গ্রস্তদের চেতনা সঞ্চারের জন্য কঠিন তিরস্কার করিয়াছেন। কবির চিত্ত একদিকে যেমন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরস আহরণ করিয়া সরস্বতীর চরণতলে মধুচক্র রচনা করিয়াছে, অপরদিকে মানব ও মানবসমাজ এবং স্বদেশ ও স্বদেশীর সহিত মমত্ব উপলব্ধি করিয়া সকলের মধ্যে আপনাকে বিতরণ করিয়াছে। জাতির পাঁতি, নির্জ্জলা একাদশী, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি, ইজ্জতের জন্য, মৃত্যুস্বয়ম্বর প্রভৃতি কবিতায় কবির চিত্ত ব্যথিতের ব্যথায় আত্মীয়তা অনুভব করিয়া আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; এসব কবিতা বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবে। গ্রন্থশেষে কবির ভগবানে আত্মনিবেদন ও নির্ভর পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে, চক্ষু সিক্ত করে।

মুদ্রারাক্ষস।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



"না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ,
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।"

চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের সৌজন্যে।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩২৩

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রাচীন কাহারা ?

এখন যাঁহারা পৃথিবীতে সশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের বয়স বেশী তাঁহারা প্রাচীন, যাঁহাদের বয়স কম, তাঁহারা নবীন; ইহা বুঝা খুবই সোজা। কিন্তু যাঁহারা পুরাকালে পৃথিবীতে বাস করিতেন, এখন দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন, না আমরা,—যাহারা এখন পৃথিবীতে বাস করিতেছি,—আমরা প্রাচীন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। যাঁহারা পুরাকালে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদিগকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলা যাইত; কারণ তাঁহাদের বয়স আমাদের চেয়ে বেশী হইত। কিন্তু তাঁহারা ত' এখন বাঁচিয়া নাই; তাঁহারা বর্ত্তমান কালের মানুষদেরই মত ৫০।৬০।৭০।৮০।৯০ বা একশত বৎসর * বাঁচিয়া থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে তাঁহাদের ও আমাদের প্রাচীনতা বা নবীনতা কেমন করিয়া স্থির হইবে? একটা উপায় আছে। পৃথিবী তখনও ছিল, এখনও আছে; মানবজাতি তখনও ছিল, এখনও আছে। সৃষ্টিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া তখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর বা মানবজাতির বয়স যত ছিল, এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর ও মানবজাতির বয়স তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। একএক জন মানুষ কেবল নিজের জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হয় না, যে কালে জন্মগ্রহণ করে, তখনকার সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও সে লাভ করিয়া প্রবীণ হইতে পারে। পুরাকালে পৃথিবীতে মানবজাতির যতটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পাইয়াছি, এবং এখন তাহার উপর আরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পুঁজি বাড়িয়াছে; কেননা, তখনকার পৃথিবী ও মানবজাতি অপেক্ষা এখনকার পৃথিবী ও মানবজাতি বয়োবৃদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সেকালের মানুষদের চেয়ে একালের মানুষদেরই প্রবীণ হইবার বেশী সুযোগ রহিয়াছে। অতএব, শুনিতে কেমন কেমন ঠেকিলেও, সেকালের লোকেরা অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা ছিলেন নবীন, এবং আমরাই প্রাচীন।

কিন্তু আমরা প্রাচীনতর পৃথিবীতে এবং প্রাচীনতর মানবসমাজে বাস করি বলিয়াই অধিকতর প্রবীণতার দাবী বা ভান করিতে পারি না। সেকালের জ্ঞান ও ভূয়োদর্শন নিজস্ব করিয়া তাহার উপর একালের, বা স্বোপার্জ্জিত, বেশী কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারিলে তবে অধিকতর প্রবীণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারি। একালের মানব-সমষ্টি সেকালের মানব-সমষ্টি অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও শক্তিশালী; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে

* আমরা পুরাকালের মানুষদের আয়ুর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সাক্ষ্যই গ্রহণ করিতেছি; পুরাণ ও কাব্যে বর্ণিত কাহারও কাহারও ২।৫ শত বা ২।১০ হাজার বৎসর পরমায়ুর কথা কল্পনামাত্র।

অধিকতর প্রবীণতার দাবী করিতে হইলে তাহাকে নিজের আন্তরিক ঐশ্বর্য্যের প্রমাণ দেখাইতে হইবে। যাঁহারা এখন বাঁচিয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে বৃদ্ধতমেরাই যে সকলের চেয়ে প্রবীণ ও জ্ঞানী, তাহা ত বলা যায় না। বয়স বাড়িলেই জ্ঞান বাড়ে না। অধিকাংশ মানুষ গাছ-পাথরের মত বয়সেই বড় হয়, অল্প জ্ঞান সঞ্চয় করার পর কতকগুলি সংস্কার লইয়া কেবল বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় মন আত্মা দিনের পর দিন বিকাশ পাইতে থাকে না। আমার বয়স বেশী, অতএব হে ছোক্‌রাগণ, আমাকে মান্য কর, এমন কথা মুখে বা মনে মনে কেবল মূর্খ লোকেই বলে। যে যত মনন করিয়াছে, ধ্যান করিয়াছে, সাধন করিয়াছে,—তা যে-কোন ভাল বিষয়েই হোক্ না—সে তত বৃদ্ধ। একজন পঁচিশ বৎসরের মানুষ একজন ষাট বৎসরের মানুষের চেয়ে বৃদ্ধ হইতে পারে। যুবকেরাও, প্রাচীনতর পৃথিবীতে জন্মিয়া প্রাচীনতর মানবসমাজে বাস করেন বলিয়াই যে প্রবীণতর, এমন যেন মনে না করেন। পূর্ব্বেকার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দখলীকার হইয়া, তদুপরি নিজের সাধনালব্ধ কিছু দেখাইতে পারিলে, তবে তাঁহারা প্রবীণতর বিবেচিত হইতে পারেন।

সেকালের লোকদের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন এবং একালের লোকদের ধৃষ্টতা বর্দ্ধন আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সৎবস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন সিদ্ধিলাভ, কোন উন্নতি সম্ভবে না। আমাদের উদ্দেশ্য, সেকালের লোকেরা যাহা বলিয়া লিখিয়া করিয়া গিয়াছেন তাহাও বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করা, এবং একালেও আমাদের আত্মশক্তিদ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করা। একালের সর্ব্ববিধ উন্নতিচেষ্টাকে দাবিয়া রাখিবার জন্য সেকালের যে "প্রাচীনতা"র দোহাই দেওয়া হয়, সেই "প্রাচীনতা"টি বাস্তবিক প্রাচীন কিনা, তাহা পরীক্ষা করা, এবং সেই "প্রাচীনতা"র প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করা, আমাদের উদ্দেশ্য। সেকালকে আমরা উড়াইয়া দিতে চাই না, তাহা অসম্ভব; সেকাল আমাদের হাড়েহাড়ে ঢুকিয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেকালকে আমরা আমাদের জীবনগতির **একমাত্র** নির্ণায়কও করিতে পারি না। আমাদের পৃথিবী, আমাদের মানবসমাজ, একালের পৃথিবী, একালের মানবসমাজ। একালের মানবসমাজের অবস্থা সেকালের মানবসমাজের অবস্থা হইতে কোন কোন বিষয়ে পৃথক্। একালে জীবন যাপন করিবার জন্য সেকালের অভিজ্ঞতা যতটা কাজে লাগে, তাহা অবশ্যই লইব, কিন্তু পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে এবং নূতনপথ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিতেও হইবে।

সেকাল মানে কেবল সেই অনেক শত বা অনেক হাজার বৎসর আগেকার কাল নয়, গতকল্যও সেকালের অন্তর্গত।

ধর্ম্মের প্রকাশ কি শুধু অতীতে আবদ্ধ?

বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীয়, মুসলমান প্রভৃতি যে-সকল বড় বড় ঐতিহাসিক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম পুরাকালে নির্দ্দিষ্ট আকারে অপরিবর্ত্তিতভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করি নাই, ধর্ম্মমতগুলিরও ভাল করিয়া অনুশীলন করি নাই; কিন্তু কোন কোন ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছু কিছু পড়িয়াছি। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে আগে আরও অনেকগুলি "সুসমাচার" (gospel) গ্রন্থ ছিল, এখন চারিখানিতে দাঁড়াইয়াছে। এইগুলির ইংরেজী অনুবাদ আগে যেমন ছিল, এখন সংশোধিত সংস্করণে (revised version) তাহা হইতে কোন কোন গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ রহিয়াছে। সুতরাং খৃষ্ট যাহাই বলিয়া থাকুন,—এবং তিনি ঠিক কি বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবিত কালে কোন রিপোর্টার লিখিয়া রাখেন নাই কিম্বা কেহ গ্রামোফোনে ধরিয়া রাখেন নাই,—তাঁহার নামে পরিচিত ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে। তাঁহার অনুচরদের মধ্যে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি কেবল তাঁহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, নূতন পারমার্থিক বাণীও তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং গোঁড়া খৃষ্টিয়ানেরা যাহাই বলুন, তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রকাশ অতীতেই আবদ্ধ নহে, একালেও উহার ধারা প্রবাহিত।

কেবল অতীত কালে আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া সেই জল হ্রদসরোবরাদিতে যদি সঞ্চিত থাকিত, একালে যদি আর বৃষ্টি না হইত, এবং আমরা সেই পুরাকালের

সঞ্চিত জলই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতাম, তাহা হইলে, উহার সহিত, কেবল অতীত কালে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ এবং শাস্ত্রমধ্যে নিবদ্ধ ব্রহ্মবাণীর তুলনা দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এখনও নূতন করিয়া আকাশ হইতে জল পড়ে, এখনও নদী বহে, এখনও পুকুরে, হ্রদে জল বাড়ে। তেমনি মানুষের আত্মায় এখনও ঈশ্বরের প্রকাশ হয়, এখনও মানুষ সত্য দেখে, বাণী শুনে।

খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলের মত মুসলমানদের কোরান তাঁহাদের বিবেচনায় অভ্রান্ত ব্রহ্মবাণী। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক সম্প্রদায় আছে, এবং এই সেদিন পঞ্জাবে আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। সুফিরাও মুসলমান বলিয়া পরিচিত; অথচ তাঁহাদের সমুদয় মত ও বিশ্বাস যে কোরান হইতে গৃহীত তাহা বলা যায় না।

হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা এরূপ মনে করেন না যে পুরাকালে একই সময়ে বেদ পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি আদি প্রকাশিত বা রচিত হইয়াছিল, যদিও অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদের এইরূপ ধারণা আছে যে সমুদয় শাস্ত্রই সমান প্রাচীন। শিক্ষিত কথাটি আমরা শুধু "ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত" অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, সংস্কৃত ও বাংলা শিখিয়া যাঁহারা চিন্তা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাও শিক্ষিতপদবাচ্য। শিক্ষিত হিন্দুগণ সমুদয় শাস্ত্রকে বেদের সমান প্রামাণিক মনে করেন না বটে, কিন্তু সমুদয় শাস্ত্রই যে মানা উচিত তাহাও বলেন। এই শাস্ত্রগুলির মধ্যে বেদ প্রাচীনতম, অন্যগুলি তদপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের। কিন্তু সকলের চেয়ে আধুনিক যাহা, তাহা যখন প্রকাশিত ও রচিত হইয়াছিল, হিন্দুসমাজে তাহার পর আর কি নূতন ব্রহ্মবাণী অবতীর্ণ হয় নাই? তাহার পর হিন্দুসমাজের সাধকেরা ধার্ম্মিকেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি প্রাচীন কোন-না-কোন শাস্ত্রেরই অনুবাদ, পুনরুক্তি, রূপান্তর, বা ব্যাখ্যা, না নূতন কিছু?

অন্যান্য প্রদেশে তুলসীদাস, রবিদাস, দাদূ, তুকারাম, একনাথ, প্রভৃতি যে-সকল সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থ ও উক্তি আদি আমরা সকলে ভাল করিয়া না জানিতে পারি; কিন্তু বঙ্গে যে-সকল সাধক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় আমরা কিছু বেশী জানি। ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের কথা আমরা বলিব না; কারণ, হিন্দুসমাজভুক্ত অধিকাংশ লোক ত ব্রাহ্মদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেনই না, ব্রাহ্মেরাও অনেকে আপনা-দিগকে অহিন্দু মনে করেন। অতএব যাঁহাদিগকে কেহ অহিন্দু মনে করেন না, এরূপ লোকদের কথাই বলিব। রামপ্রসাদী গান বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত। তাহাতে যে-সকল পারমার্থিক তত্ত্ব আছে, তাহার সমস্তই কি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হিন্দুশাস্ত্র হইতে গৃহীত? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। যদি কেহ সেরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার একটি একটি রামপ্রসাদী গান লইয়া, তাহার পাশে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত বাক্য বসাইয়া, উভয়ের অভেদ কিম্বা অন্ততঃ সাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের বোধ হয়, ইহা কেহই করিতে পারিবেন না। ইহাও স্বীকার্য্য যে রামপ্রসাদের পদাবলী হইতে হিন্দুসমাজ ভক্তিমার্গের নূতন পাথেয় পাইয়াছেন। সুতরাং ইহা প্রতীত হইবে, যে, সংস্কৃত হিন্দুশাস্ত্রগুলি রচিত হইবার পরেও হিন্দু রাম-প্রসাদ মানুষকে নূতন ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়াছেন, এবং তাঁহার দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নূতন বিকাশ হইয়াছে।

তাঁহার অনেক পূর্ব্বে চৈতন্য আবির্ভূত হন। তাঁহার কথা বৈষ্ণবেরা সংস্কৃত কোন শাস্ত্র অপেক্ষা কম ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন না, বস্তুতঃ তাঁহারা তাঁহাকে অবতার মনে করেন। অন্য যে-সকল হিন্দু বৈষ্ণবদ্বেষী নহেন, তাঁহারাও চৈতন্যের বাণী ভক্তির সহিত শিরোধার্য্য করেন। তাঁহার প্রতি হিন্দুসমাজের ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব যেরূপই হউক, তিনি যে হিন্দুসমাজকর্ত্তৃক হিন্দু বলিয়া গৃহীত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার সমুদয় উপদেশ সংস্কৃত কোন-না-কোন শাস্ত্রের অনুবাদ, পুনরুক্তি বা ব্যাখ্যা, ইহা কেহই বলিতে বা প্রমাণ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার দ্বারাও যে জগতে নূতন ধর্ম্মালোক আনীত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে যাঁহাকে দেখিয়াছেন, যাঁহার কথা শুনিয়াছেন, সেই পরমহংস রামকৃষ্ণও হিন্দু বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধেও ইহা বলা যায়, যে, উহার সমস্তই সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে গৃহীত, ইহা কেহ দেখা-

হইতে পারিবেন না। তাঁহার উপদেশ দিবার প্রণালী, তাঁহার কথিত নানা দৃষ্টান্ত, তাঁহার উক্তিনিহিত নানা তত্ত্ব, এ সকলের মধ্যে নূতনত্ব খুব আছে। এই-সব নূতন জিনিষ পুরাকালের শাস্ত্র হইতে আসে নাই, অথচ তদ্দ্বারা হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছেন এবং হিন্দু নামের গৌরব বাড়িয়াছে।

এই-সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইতেছে যে ধর্ম্মের প্রকাশ শুধু অতীতকালে আবদ্ধ নহে; তাহার বিকাশ ও প্রকাশ এখনও চলিতেছে এবং পরেও চলিবে। কেহ নূতন কিছু বলিলে বা করিলেই তাহাকে হিন্দুধর্ম্মের বা অন্য কোন ধর্ম্মের বিরোধী মনে করিবার কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্তা অতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা জীবনের লক্ষণ; তাহাকে আদর করিতে না পারা জরার চিহ্ন ও মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ। কোন কোন পীড়া হইলে মানুষ আলো সহ্য করিতে পারে না, আলোতে কষ্ট পায়, আলোকে ভয় করে। জ্ঞান ও ধর্ম্মের নূতন আলোককে ভয় করাও সুস্থ আত্মার লক্ষণ নহে।

গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র।

গত ১১ই ডিসেম্বর দরবারে বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গে রাজনৈতিক অপরাধ ও তাহার দমন ও নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। সংক্ষেপে তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য্য এই যে বাংলাদেশে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত ষড়যন্ত্র আছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দুর্ব্বল করা এবং পরিশেষে ইহার উচ্ছেদ সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক হত্যা, ডাকাতি, প্রভৃতি এই ষড়যন্ত্রকারীদের কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত। এই-প্রকার একটি দলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হাতে প্রমাণ আছে। সর্ব্বসাধারণে সে-সব প্রমাণের কথা জানেন না বলিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেন, সে-সব তথ্য জানিলে দোষ দিতেন না। এজন্য গবর্ণর প্রজাসাধারণকে দোষ দিতেছেন না। প্রমাণগুলি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশ্বাস-উৎপাদক, কিন্তু এ প্রকারের নহে যে, বিচারালয়ে সেগুলি আইনসম্মত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। এইজন্য, যে-সব লোককে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে আটক করা হইতেছে, তাহাদিগকে বিচারার্থ কোন বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় না। গবর্ণমেণ্ট যে-সব তথ্যের প্রমাণে কাজ করিতেছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার মত নহে।

কথাগুলি গবর্ণর বেশ ভদ্রভাষায় বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বঙ্গের রাজনৈতিক অসন্তোষ নিবারণের কোন পন্থা নির্দ্দিষ্ট বা সূচিত হইতেছে না। "আমরা ঠিক্ করিতেছি বলিয়া আমাদের বিশ্বাস; তোমরা সব কথা জাননা বলিয়া মনে করিতেছ যে আমরা জুলুম করিতেছি, জানিলে বলিতে না। কিন্তু তোমাদিগকে আমাদের হাতের প্রমাণগুলি জানাইবার উপায় নাই। কিন্তু তোমরা সমালোচনা করিতেছ বলিয়া আমিও তোমাদিগকে দোষ দিতেছি না।" এরূপ কথায় গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার মধ্যে ঐক্য ও মিলনের ভূমি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনের উপাদান, কিছু পাওয়া যাইতেছে না। অথচ দেশে শান্তি রক্ষা করা যেমন দরকার, দেশের লোককে বুঝানও তেমনি দরকার যে অত্যাচার অবিচার হইতেছে না। কিন্তু গবর্ণর বলিতেছেন প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া সন্তুষ্ট হইব যে অবিচার জুলুম হইতেছে না? গবর্ণরকে আমরা অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু তিনি ত স্বয়ং সমস্ত বিষয় নিজের চক্ষে দেখেন না, নিজের কানে শুনেন না; পুলিশের গোয়েন্দা, এবং সহযোগীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক "রাজার সাক্ষী" হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রীসভার সভ্য ও সেক্রেটারী পর্য্যন্ত নানা শ্রেণীর লোকের সত্যবাদিতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, বিচারশক্তি, প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণর দরবারের বক্তৃতা করিয়াছেন। সুতরাং বিনাপ্রমাণে কেমন করিয়া তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া যায়? আর যদি গবর্ণর স্বয়ংই সমস্ত দেখিতেন শুনিতেন; তাহা হইলেও প্রমাণ আবশ্যক হইত। কারণ তিনিও মানুষ, তাঁহারও ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টপক্ষ হইতে যাহা বলা হইতেছে, তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক এমন কথা আমরা বলিতে পারি না, কারণ আমরা এবিষয়ের খাঁটি খবর কিছুই জানি না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সব কথাই যে নির্ভুল, প্রমাণ অভাবে

তাহাও বলিতে পারি না। বিপ্লবপ্রয়াসী দলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এরূপ দল একটা আছে। তাহাদের সংখ্যা, প্রভাব ও শক্তি সম্বন্ধে আমরা ঠিক্ কিছু জানিনা। কিন্তু এই দলের ব্যাপ্তি, লোকসংখ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে পুলিশ গবর্ণরের মনে যে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে, আমরা তাহা ভ্রমশূন্য মনে করি না। গত বৎসর বঙ্গে ৬৫৩ টা ডাকাতির মধ্যে পুলিশের লোকেরাও কেবল ২৪টাকে রাজনৈতিক বলিয়াছে; এবং তাহারা মোটে ৩৬টা অপরাধকে বিপ্লবপ্রয়াসীদের কৃত বলিয়াছে। সংখ্যাবহুল দেশব্যাপী শক্তিশালীদলের কাজ এরূপ হইবার কথা নয়।

যে-সকল দেশে প্রজাশক্তির প্রভাব সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্ষমতারও উপরে, যেখানে সরকারী কর্ম্মচারী-দিগের উন্নতি অবনতি পদস্থ থাকা না থাকা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সর্ব্বসাধারণের মতের উপর নির্ভর করে, তথায় বিশেষ কোন শাসননীতি ভাল কি মন্দ সকল লোককে বুঝাইতে হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে যাহা করিতে হয়, এদেশেও ঠিক তাহাই করা দরকার। কারণ, সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত বা অপসৃত করিবার ক্ষমতা আমাদের না থাকিলেও, আমাদের মনটা ঠিক্ স্বাধীন দেশের লোকদেরই মত; তাহাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস সন্তোষ অসন্তোষ যে-সব কারণে হয়, আমাদেরও সেই-সব কারণে হয়। আমরা অক্ষম বলিয়া আমাদের মনের ভাব উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে; কিন্তু বিশ্বশক্তি নিগূঢ়ভাবে কার্য্য করে, তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ।

ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয় যে কে দোষী, কে নিরপরাধ? দেশে ষড়যন্ত্র আছে, অতএব পুলিশ যাহাকে ধরিবে, তাহাকেই আটক করিয়া রাখিতে হইবে, শাসননীতি এরূপ হইতে পারে না; এবং কার্য্যতও দেখা যাইতেছে যে পুলিশকর্ত্তৃক ধৃত ২।১ জন লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ধারণা এই যে যাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হইতেছে, তাহাদের মধ্যেও বিস্তর লোক নিরপরাধ। গবর্ণর কয়েকমাস আগে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ধৃত ও আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় এবং হাইকোর্টের জজ হইবার উপযুক্ত একজন রাজকর্ম্মচারী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখেন। তিনি এই কথা বলার পরও প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে কোন কোন স্থলে ধৃত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তাহা বলা হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এবিষয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের বক্তব্য জানিতে পারা যায় নাই।

ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে একজন কর্ম্মচারী যত কেন যোগ্য ও পরিশ্রমী হউন না, পুলিশের ধৃত এত লোক সম্বন্ধে যথাসময়ে ধীর ভাবে সমস্ত প্রমাণ তন্ন তন্ন করিয়া দেখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর কি না। আমরা সম্ভবপর মনে করি না।

এ-সব বিষয়ে অনেক কাগজে অনেক কথা লেখা হইয়াছে, আমরাও আগে অনেক লিখিয়াছি, কিন্তু এ-দেশে প্রজার মতের শক্তি অত্যন্ত কম বলিয়া তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি আবার বলিতেছি, যাহাতে একজন মানুষের উপরও অবিচার না হয়, একটি পরিবারও অকারণে অভিভাবকশূন্য ও অভাবগ্রস্ত না হয়, একটি ছাত্র বা অন্য যুবকের ভবিষ্যৎ অকারণে মাটী না হয় এবং সে লোকসমাজে বিনাদোষে দাগী বলিয়া গণ্য না হয়, যাহাতে জেলায় জেলায় সরকারের প্রতি বিরক্তি ও প্রতিহিংসার ভাব নিরপরাধ দুর্ব্বল আইনসঙ্গত-প্রতিকার-লাভে-অসমর্থ আবদ্ধ লোক ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে প্রধূমিত হইতে না থাকে, তাহার সমুচিত উপায় গবর্ণমেণ্টের করা কর্ত্তব্য।

এদেশে সর্ব্বসাধারণের মতের প্রভাব নাই বলিলেই হয়। ইংলণ্ডে জনসাধারণের মত প্রবল। ইংলণ্ড জার্ম্মেন শত্রুর খুব নিকট। জার্ম্মেন চর হয় ত এখনও তথায় আছে। তথায় জলপথে ও আকাশপথে জার্ম্মেনদের উপদ্রব আছে। বিলাতে সন্দেহভাজন লোককে যেরূপ চটপট্ আবদ্ধ করা দরকার, এখানে তাহা নয়। একজনও ব্রিটিশসাম্রাজ্যদ্রোহী লোক বা জার্ম্মেন চর তথায় একদিনও স্বাধীন থাকিলে যতটা অনিষ্টের সম্ভাবনা, এখানে ততটা

নয়। বিলাতের পুলিশ যেরূপ বিশ্বাসভাজন, এখানকার পুলিশ সেরূপ বিশ্বাসভাজন নয়। বিলাতে ও ভারতে এই-সকল প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, বিলাতে দেশরক্ষা-আইন অনুসারে কোন সন্দেহভাজন লোক সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইলে মন্ত্রণা বা পরামর্শ-সমিতির (advisory board) মত অনুসারে করা হয়। এ দেশে এইরূপ মন্ত্রণাসমিতির অধিকতর প্রয়োজন আছে, এখানে কোন মানুষকে ধরিবার আগেই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বিচক্ষণ বিচারকদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, এখানে ধৃত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইবার অধিকতর প্রয়োজন আছে, এখানে ধৃতব্যক্তির নিজব্যয়ে বা সরকারী ব্যয়ে আইনজ্ঞের পরামর্শ ও সাহায্য পাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যে আইনভঙ্গ করিয়াছে, তাহাকে শাস্তি দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য; যে **বাস্তবিক** আইনভঙ্গ করিতে প্রয়াসী মাত্র তাহাকেও **এ সম্বন্ধে** আটক করা দরকার মনে হইতে পারে। কিন্তু নিরপরাধের নিগ্রহ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

রাজদ্রোহ নিবারণের উপায়।

লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতা পড়িয়া বুঝা যায় যে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর প্রতি ভারতবাসীদের অসন্তোষের সহিত ষড়যন্ত্রের সম্পর্ক আছে। তিনি বলিতেছেন:—

I and my colleagues believe that there is in Bengal a widespread well organised conspiracy, whose aim is to weaken the present form of Government and, if possible, to overthrow it, by means which are criminal. No British Government can complain if the people whom it governs wish to modify its form or to take any legal steps to bring about change. Government may regret such a wish, it may oppose change in every legal way, but it will not be true to British tradition if it does more. But no Government, British or not British, can tolerate the use of crime to overthrow it or to weaken it; a Government which did that would be untrue to the people whom it governs. It is our plain duty to put down the conspiracy with a firm hand.

ইহা বেশ স্পষ্টকথা, এবং গবর্ণর যতটা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের কোন অনৈক্য নাই; কিন্তু রাজপুরুষেরা যে দমননীতিকেই কার্য্যতঃ যথেষ্ট মনে করিয়া, চুপ করিয়া আছেন, ইহা আমরা সুলক্ষণ বা সন্তোষের বিষয় মনে করি না। গবর্ণর বলেন, প্রজারা আইনসঙ্গত ভাবে শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অসন্তুষ্ট হইবেন না, যদিও আইনসঙ্গত উপায়ে এই চেষ্টা ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইতে পারেন। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-চেষ্টায় বাধা না দিয়া, প্রজাদের প্রার্থিত পরিবর্ত্তন মঞ্জুর করাটাও যে চলিতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত নয় কি? নামে নয়, কাজে, স্বায়ত্তশাসন পাইলে দেশটা যে বহু পরিমাণে ঠাণ্ডা হইবে, ইহা নিশ্চিত। অবশ্য, বিপ্লবপ্রয়াসী-দের লক্ষ্য কি বলিতে পারি না, সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারে না, স্বাধীন থাকিবার শক্তিও আমাদিগকে দিতে পারে না। ইংরেজের সহিত তাহার আলোচনা করা বৃথা। যাহারা পৃথিবীর প্রবল জাতিদের মনের ভাব জানে, আধুনিক যুদ্ধের আয়োজনের অর্থ বুঝে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাত আছে, এমন কোন লোক গুপ্ত বা প্রকাশ্য বিদ্রোহ দ্বারা স্বাধীনতালাভের কল্পনা মনে স্থান দিতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে থাকিয়া কতটা ক্ষমতা আমরা লাভ করিতে পারি, ইংরেজের সহিত তাহারই আলোচনা হইতে পারে, ও করা উচিত। আমাদের মতে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির মত, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মত, স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ আমরা পাইলে, বিপ্লবপ্রয়াসী সন্তুষ্ট না হউক, তাহাদের দল বাড়িবার পক্ষে খুব বাধা পড়িবে। অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে বলে taking the wind out of their sails, গবর্ণমেণ্ট এই উপায়ে তাহা করিতে পারেন; বিপ্লব-প্রয়াসীদের নৌকার পালে যে বাতাস লাগিতেছে, তাহার মুখ ফিরাইয়া তাহার জোরে এই উপায়ে অন্য কাজ, আইনসঙ্গত কাজ, হইতে পারে। আমরা জানি, স্বাধীনতা মানবহৃদয়ের পক্ষে বড়ই আকর্ষণের বস্তু, ইহার নামটাতে পর্য্যন্ত উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বাধীনদেশের লোকদের প্রধান প্রধান অধিকারগুলি, ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহের মত, আমরাও পাইলে, অর্থাৎ দেশের কেবল আভ্যন্তরীণ কাজে আমরা **কার্য্যতঃ** প্রায় স্বাধীন হইলে, **নামে** স্বাধীন হইবার জন্য বিদ্রোহিতা যুবকদের হৃদয়েও স্থান পাইবে না।

বিদ্রোহিতা নির্ম্মূল করিবার ইহাই চূড়ান্ত উপায়। কারণ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যতই শক্তিশালী হউন, তাঁহারা মানুষের হৃদয়কে নূতন করিয়া গড়িতে পারিবেন না, স্বাতন্ত্র্যের এবং আত্মসম্মানবোধের ইচ্ছা ও আশা তাহা হইতে উৎপাটিত হইবে না। নৈরাশ্য বিদ্রোহিতার জনক। বিদ্রোহিতাকে বিনষ্ট করিতে হইলে নৈরাশ্য দূর করিতে হইবে। ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতবাসীদের মনে এই আশা জন্মাইয়া দিউন, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও তাহাদের স্বাতন্ত্র্যলাভ হইতে পারে, মানুষের মত আত্মসম্মান বজায় থাকিতে পারে, মানুষের সর্ব্ববিধ শক্তির ও অধিকারের, অন্যদেশের লোকদের মত, বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, তাহারা খাড়া হইয়া মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারে; তাহা হইলে বিদ্রোহিতা দূর হইবে, বিপ্লবপ্রয়াসীদের দলে নূতন লোক যোগ দিবে না। ব্রিটিশ উপনিবেশসকলে স্বাধীনতার অভিলাষ খুব আছে, কিন্তু বিদ্রোহিতা নাই।

আমরা যে আশা দেওয়ার কথা বলিতেছি, তাহার মানে স্তোকবাক্য নয়; তাহাতে অসন্তোষ বরং আরও বৃদ্ধি পাইবে। আইন করিয়া স্পষ্টভাবে জানাইতে হইবে যে আমাদিগকে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই কোন্ সময়ে উপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতা দেওা হইবে, এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহার কিয়দংশ আমাদিগকে দিতে হইবে এবং বাকী দিবার আয়োজন ও শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে হইবে।

দেশের দারিদ্র্যও বিপ্লবপ্রয়াসের একটা পরোক্ষ কারণ। তাহা কমাইবার আন্তরিক চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ হইতে হওয়া চাই।

শিক্ষা ও জনসেবা।

বিপ্লবপ্রয়াসীদের দলে নূতন লোক প্রবেশ করিবার কথা উপরে একাধিকবার বলিয়াছি। গবর্ণর স্বয়ং বক্তৃতায় এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন দলের কতকগুলি লোক মস্তিষ্কস্বরূপ, তাহারা মন্ত্রণা দেয় ও কার্য্যপ্রণালী স্থির করে। তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক তাহাদের হস্তস্বরূপ; তাহারা খুন, ডাকাতি প্রভৃতি করে। তাহার পর অনেকে আছে যাঁহারা আড়কাটির মত দলে নূতন নূতন লোক (প্রায়ই যুবা) আনিবার চেষ্টা করে। অনেক শিক্ষক এইরূপ আড়কাটির কাজ করে, এবং অনেকে নূতন লোক জুটাইয়া দলবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে জনহিতৈষী নানা সমিতিতে প্রবেশ করে।

গবর্ণর এইসব কথা বলিবার পূর্ব্ব হইতেই শ্রমজীবী বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, প্রভৃতির প্রতি পুলিশের খর দৃষ্টি আছে, এবং তাহার ফলে এইরূপ কতকগুলি বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে; যদিও যাঁহারা বিশেষ খবর রাখেন এমন অনেক লোকের মতে ঐ ইস্কুলগুলি দ্বারা কোন অনিষ্ট হইতেছিল না। গবর্ণর এক্ষণে পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার ফলে শিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত ও অন্যবিধ জনসেবকগণ আরও অসুবিধায় পড়িবে। কারণ, চৌকিদার, পুলিশ কনষ্টেবল, জমাদার, প্রভৃতির প্রকৃতিই এই যে তাহারা ডাকিয়া আনিবার হুকুম পাইলে বাঁধিয়া আনে, কোন-প্রকার জনহিতৈষী সমিতির উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিলে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া নিজ-নিজ কার্য্যভার লাঘব করে এবং হাঙ্গামা একেবারে চুকাইয়া দেয়।

আমরা কখনও দেশশাসক হই নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই; সুতরাং বলিতে পারি না, গবর্ণর বিদ্রোহার্থীদের দল-বৃদ্ধির প্রণালীর যতটা বিস্তারিত ও পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আবশ্যক ছিল কি না। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, বিশেষ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের নাম করিবার একান্ত প্রয়োজন ছিল না। এইরূপ নাম করার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের ও দেশের বিশেষ কি উপকার হইবে, বুঝিতে পারিতেছি না। রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত প্রবাসী-সম্পাদকের কোন সম্পর্ক নাই। বরং নানা কারণে প্রবাসী-সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক মাতব্বর লোকের ও তাঁহাদের কোন কোন বন্ধু ও অনুচরের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের পাত্র। এইজন্য আমরা নিরপেক্ষভাবে ব্যাপারটির আলোচনা করিতে সমর্থ।

শিক্ষাদান ও অন্যবিধ জনসেবা ব্যপদেশে বিদ্রোহীরা যে নিজেদের দল পুরু করিবার চেষ্টা করে, গবর্ণরের তাহা বলিবার হয় ত এই শুভ উদ্দেশ্য ছিল, যে, অভিভাবকেরা যেন ছেলেদিগকে এ-সব কাজে যাইতে না দেন, কারণ তথায় তাহাদের কুসঙ্গী জুটিতে পারে। কিন্তু ইহা আমাদের অনুমান মাত্র; বাস্তবিক লর্ড কারমাইকেলের কি উদ্দেশ্য

ছিল জানি না। উদ্দেশ্য যাহাই থাক্, ফল যাহা হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। অতি-সাবধান লোকে জনসেবার কার্য্যে আরও কম যাইবে, ছেলেদিগকে আরও কম যাইতে দিবে, এবং অর্থ-সাহায্যও আরও কম করিবে। তাহার মানে কি? মানে বুঝিতে হইলে আমাদের দেশে জনসেবা সাধারণতঃ কি কি রকমের হয়, তাহার উল্লেখ আবশ্যক। জনসেবকেরা দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপ্রপীড়িত লোকদের সাহায্য করেন, নিরক্ষর দরিদ্র লোকদিগকে শিক্ষা দেন, রুগ্নের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন, ম্যালেরিয়া নিবারণ ও অন্যবিধ উপায়ে কোন কোন স্থানের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন, ইত্যাদি। দুর্ভিক্ষ ও বন্যা হইলে গবর্ণমেণ্ট লোকের অনেক সাহায্য করেন; কিন্তু জনসেবকদের সাহায্য ব্যতীত সকল দরিদ্রের প্রাণরক্ষা গবর্ণমেণ্ট কখন করিতে পারেন নাই, পরেও পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। রুগ্নের চিকিৎসা এবং নানাস্থানের স্বাস্থ্যোন্নতিও গবর্ণমেণ্টের একার চেষ্টায় সমস্ত হয় না, এবং সম্মিলিত সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টাতেও অল্পই হইতেছে। নিরক্ষর দরিদ্রদের শিক্ষাদানরূপ কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট অতি-অতি সামান্য-ভাবে করিয়াছেন বলিলে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় নিন্দা করা হইবে না, বোধ হয়।

এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট-পক্ষের কোন উক্তিতে বিপন্ন, নিরন্ন, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, নিরক্ষর লোকদের হিতসাধন-চেষ্টা মন্দীভূত হইলে, তাহা দুঃখের বিষয় হইবে। রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি লর্ড কারমাইকেলের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কুফল নিবারিত হইবে না।

লর্ড কারমাইকেলের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল বলিয়া আমরা মনে করি না; সেরূপ মনে করিবার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু সদুদ্দেশ্য সাধনেরও এরূপ উপায়ই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে কুফল না ফলে, বা সর্ব্বাপেক্ষা কম কুফল ফলে। দুষ্ট লোকে আগুন লাগাইয়া অপরের ঘর পুড়াইয়া দেয়; কিন্তু এইরূপ ঘর-জ্বালান নিবারণের জন্য কেহ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে দিয়াশলাইয়ের কারখানা বন্ধ করিয়া দেয় না। অনেক বঙ্গনারী কেরোসীনে পরিহিত শাড়ী ভিজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া আত্মহত্যা করে; কিন্তু তজ্জন্য কেরোসীন আমদানী ও বিক্রি বন্ধ হইতে পারে না। আফিং, কুচিলার বিষ, ও সেঁকো বিষ খাইয়া লোকে আত্মহত্যা করে, এবং অপরকেও গুপ্ত হত্যা করে; কিন্তু এই-সব বিষের অবাধ বিক্রি আইন দ্বারা বন্ধ করা হয় নাই, কোন রাজকর্ম্মচারী বিক্রেতাদিগকে পরোক্ষভাবে ও বক্তৃতাদিদ্বারা কখনও নিরুৎসাহও করেন নাই। শিক্ষাদান ও অন্যবিধ জনসেবা ব্যপদেশে রাষ্ট্রীয় অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, হয় ত হইয়াছে; কিন্তু ইষ্ট যে তদপেক্ষা খুব বেশী হইয়াছে, তদ্বিষয়ে লর্ড কারমাইকেলেরও কোন সন্দেহ নাই, নতুবা তিনি রামকৃষ্ণমিশনের প্রতি প্রকাশ্যভাবে শ্রদ্ধা জানাইতেন না।

আমাদের বোধ হয় পুলিশকে গোপনে সন্দেহভাজন লোক বা লোকসমষ্টির প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিতে বলিলেই যথেষ্ট হইত, জনসেবাপরায়ণ সভাদির উল্লেখ না করিলেও চলিত, এবং নাম ধরিয়া রামকৃষ্ণমিশনের উল্লেখ করিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

লর্ড কারমাইকেল যাহা বলিয়াছেন, তাহার আর-এক-প্রকার কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। রাজপুরুষেরা বক্তৃতা ও সরকারী রিপোর্টে ছাত্রদের চরিত্রের উন্নতির উপর খুব জোর দেন। কিন্তু সচ্চরিত্র মানে জড়ভরত গোছের গোবেচারী নয়। সচ্চরিত্রতার মধ্যে মন্দ কাজ না করা, এবং ভাল কাজ করা, দুই-ই আছে। তা ছাড়া মানুষের শক্তিটা নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না; তাহাকে ভাল কাজে না লাগাইলে মন্দ কাজে লাগে। সরকারী ব্যবস্থায় ছাত্রদের রাজনৈতিক আইনসঙ্গত প্রচেষ্টার সহিত নিষ্ক্রিয় সম্পর্ক রাখাও নিষিদ্ধ। যদি জনসেবার কাজেও প্রকারান্তরে প্রবল বাধা পড়ে, তাহা হইলে তাহারা কোন্ ভাল কাজটা করিয়া মহচ্চরিত্র হইবে, কোন্ ভাল কাজ তাহাদিগকে মন্দ কাজ হইতে দূরে রাখিবে? অনেক বাক্যবাগীশ তথাকথিত জননায়কদের মত সমাজসেবার সমস্ত বোঝাটা যুবকদের ও ছাত্রদের ঘাড়ে চাপাইবার পক্ষপাতী আমরা নহি; কারণ তাহাদের প্রধান কাজ জ্ঞান উপার্জ্জন। কিন্তু অবসর-সময়ে জনসেবা করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা তাহারা স্বার্থপর, আমোদপ্রিয় ও ক্ষুদ্রচেতা হইবে। ইহা নরহিতৈষী কাহারও বাঞ্ছিত হইতে পারে না।

যাহা হউক, লর্ড কারমাইকেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা

ত বলিয়াছেন; আমরা তাহা হইতে পরোক্ষভাবে যেটুকু ক্ষতির আশঙ্কা করিতেছি, তাহা নিবারণের জন্য এখন গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি এবং অন্য রাজপুরুষেরা ধীর ভাবে বিচার করুন। যত-প্রকার জনহিতকর কাজ সমাজসেবকেরা করেন, সরকারের পক্ষ হইতেও তাহা খুব বেশী পরিমাণে করা উচিত। তাহা হইলে, জনসেবা পরোক্ষভাবে বাধা পাওয়ায় যত লোকের সাহায্য না পাইবার সম্ভাবনা, তাহারা অনেকে সাহায্য পাইবে। গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র নিরক্ষর লোকদের জন্য নৈশ ও অন্যবিধ অবৈতনিক বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে স্থাপন করুন; দাতব্য চিকিৎসালয় এতগুলি স্থাপন করুন, যাহাতে কাহাকেও বিনা-ব্যয়ে চিকিৎসা ও ঔষধের জন্য বাসগ্রাম হইতে তিন মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করিতে না হয়; যে-সকল সরকারী ও বেসরকারী লোককে গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন, তাহাদের তত্ত্বাবধানে ছাত্র ও অন্য যুবকদিগকে জনসেবা করিয়া সচ্চরিত্র হইবার ও থাকিবার সুযোগ প্রদান করুন; দুর্ভিক্ষাদির সময় আরও হৃদ্যতার সহিত সাহায্যের ব্যবস্থা করুন; সকল গ্রামের জলাভাব দূর করুন; এবং গ্রামগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আন্তরিক উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া যান। এই সমস্ত কাজ করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্টের আগে হইতে ছিল। এখন এই দায়িত্ব-বোধ আরো ভাল করিয়া জন্মা উচিত।

জনসেবা যাঁহাদের প্রাণের জিনিষ, তাঁহাদিগকে ভয় না পাইতে বলা নিষ্প্রয়োজন। অতি-সাবধানদিগকেও বলি, ভয় পাইবেন না।

সমুদয় পুলিশ এবং কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণমেণ্টেরও এই উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, যে খাঁটি সৎকর্ম্মীরা প্রকৃত সৎকার্য্য করিতে যাহাতে কোনও বাধা না পান, তাহা যেন তাঁহারা দেখেন।

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষসমর্থন।

দরবারে লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতার একটি বাক্য, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সুবিচার লাভের সাহায্য করিবে না। তিনি বিদ্রোহার্থীদলের অন্তর্গত নানা শ্রেণীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের কাজ রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে বিচার-কালে তাহাদের পক্ষে উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা। তিনি বলিয়াছেন, "they help to arrange for the defence of any members of the organization who are prosecuted in a Law Court". ইহা পুলিশের থিওরি বটে, এবং গবর্ণর ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন, দেখিতেছি। কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া এই বিশ্বাস প্রকাশ করায়, লোকের এইরূপ ধারণা হইতে পারে যে, যে-কেহ এই-প্রকার অভিযুক্ত লোকের পক্ষ সমর্থনের যোগাড় বা বন্দোবস্ত করে, সে বিদ্রোহী দলের লোক। ইহাতে যদি কেহ ভয়ে তাহাদের পক্ষে কোন উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত না করে, অন্ততঃ কোন কোন স্থলে, তাহা হইলে কি সুবিচার হইবে? তাহা হইলে কি পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলেই দণ্ডিত হওয়া অনিবার্য্য হইবে না? কিন্তু এরূপ অবস্থা আমরা সুবিচারের, গবর্ণমেণ্টের সুনামের, এবং নিরপরাধ প্রজার ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা-সম্ভোগের অনুকূল বলিয়া মনে করি না।

লর্ড কারমাইকেল পুলিশের যে থিওরিটিতে সায় দিয়াছেন, তাহার উপর পুলিশ যদি আরও দুটি থিওরিতে তাঁহাকে আস্থাবান্ করিতে পারিত এবং তিনি তাহা নিজের মত বলিয়া প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে পুলিশের রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রভাব অপ্রতিহত হইত; যথা—যে-সব উকীল-ব্যারিষ্টার আদালতে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করে এবং যে-সব সম্পাদক বিচারান্তে তাহাদের পক্ষে লেখে, তাহারাও বিদ্রোহার্থী দলের লোক। এখন যেমন ফৌজদারী অনেক মোকদ্দমায় সরকারী উকীল ব্যারিষ্টার আসামীর দোষ প্রমাণ করিবার জন্য নিযুক্ত হন, তেমনি দরিদ্র আসামীর পক্ষ সমর্থন জন্যও সরকারী উকীল ব্যারিষ্টার থাকা উচিত বলিয়া আমরা কয়েকবার লিখিয়াছি; কারণ দুষ্টের দমন যেমন সরকারের কর্ত্তব্য, নির্দ্দোষের রক্ষণও তেমনি কর্ত্তব্য। লর্ড কারমাইকেল যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে রাজনৈতিক ফৌজদারী মোকদ্দমায় আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হওয়া আরও আবশ্যক হইবে।

প্রিয়নাথ সেন।

খ্যাতনামা সাহিত্যরসিক ও সমালোচক প্রিয়নাথ সেন মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যোগ্য পুত্র মন্মথনাথ সেনের অকালমৃত্যুর শোক পাইয়াছিলেন, নিজেও বৃদ্ধ



প্রিয়নাথ সেন।

পিতাকে কাঁদাইয়া গেলেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং এইসকল ভাষার বিস্তর পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "সুবর্ণবণিক-সমাচার" পাঠে অবগত হইলাম, তিনি

কলিকাতা আহিরীটোলা-নিবাসী স্বনামধন্য মথুরমোহন সেনের বংশধর........তিনি বাণীপূজার একজন নির্ব্বাক সাধক ছিলেন। লক্ষাধিকমুদ্রা ব্যয়ে সঞ্চিত তাঁহার পুস্তকাগারে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সযত্নে সংগৃহীত আছে। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসেও তিনি ত্রিশ টাকার পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহার কিয়দংশ পাঠ করেন।

প্রথমে "প্রবাসী"তে মুদ্রিত এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"তে প্রিয়নাথ সেন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার দ্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্ব্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদা সর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভ কালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

সাহিত্যরসিকের ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রশংসা আর কি হইতে পারে? রবীন্দ্রনাথ এখন সুদূরে। দেশে থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে সেন মহাশয় সম্বন্ধে আরও কত কথা জানিতে পারা যাইত। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি সম্ভবতঃ বন্ধুর সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন।

প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ দরিদ্র হইল।

শিল্প-কমিশন।

আমরা শিল্পজাত যত রকম দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে। কাঁচা মাল অধিকাংশই ভারতে উৎপন্ন হয়, অল্পস্বল্প বিদেশ হইতে আমদানী করিলেই চলে। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে-সব দেশ বিখ্যাত তাহারা তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে কাঁচা মাল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে। কার্পাস-সূত্র ও বস্ত্র নির্ম্মাণ ইংলণ্ডের একটি প্রধান ব্যবসা; কিন্তু তুলা একগাছিও ইংলণ্ডে জন্মে না; সমস্তই আমেরিকা, মিশর ও ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিতে হয়।

প্রধানতঃ ভারতবর্ষের কাঁচা মালের সাহায্যে ভারতেই কেমন করিয়া নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণার্থ গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কমিশনের বৈঠক ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরে হইতেছে। কমিশন বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য লইতেছেন। ইহার সভ্যগণ অনুসন্ধান করিয়া যে-সকল তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং গবর্ণমেণ্টকে যে-সকল পরামর্শ দিবেন, তাহা কেবলমাত্র বা বিশেষ করিয়া ভারতবাসীদের উপকারের জন্য, এই ভ্রম যেন কেহ না করেন।

যাহাদের উদ্যোগ, মূলধন, শিল্পজ্ঞান এবং গবর্ণমেণ্ট ও রেল কোম্পানীদের উপর প্রভাব বেশী, তাঁহারাই বেশী লাভবান্ হইবেন। কিন্তু উদ্যোগিতা থাকিলে ভারতবাসীদেরও চেষ্টা সফল হইবে, বলা যাইতে পারে।

অনেক রকম শিল্পদ্রব্য আছে, যাহা কারিগরেরা নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া প্রস্তুত করিতে পারে, এবং তাহা করিয়াও লাভ রাখিয়া বাজারে বিক্রী করিতে পারে। এইরূপ অনেক জিনিষ কারখানায় প্রস্তুত হয় না; কোন কোনটি কারখানায় প্রস্তুত হইলেও, তাহার সঙ্গে কারিগরের বাড়ীতে প্রস্তুত জিনিষের প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। এই-সকল শিল্প কি, এবং কি কি অনুকূল অবস্থার সমবায়ে কারিগরেরা তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা স্থির করা কমিশনের একটি প্রধান কাজ।

তাহার পর বড় বড় কারখানার কথা। তাহার জন্য চাই কল কারখানা খাড়া করিবার জন্য জমী, তৎসমুদয় খরিদ করিবার জন্য মূলধন, কাঁচা মাল, কাঁচা মাল কিনিবার জন্য মূলধন, বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, কারিগর ও অন্য শ্রমজীবী, যতদিন না কারবার হইতে লাভ হয় ততদিন ঐ-সকল ব্যক্তির বেতন দিবার মত মূলধন, উৎপত্তি-স্থান হইতে কারখানায় যথাসম্ভব অল্পব্যয়ে কাঁচা মাল আনিবার বন্দোবস্ত, এবং কারখানা হইতে বাজারে শিল্পদ্রব্য যথাসম্ভব অল্পখরচে চালান করিবার উপায়, ইত্যাদি। কোন্ প্রদেশের কোন্ জায়গায় কোন্ জিনিষের কারখানা করা উচিত, তাহা স্থির করাই প্রথম কর্ত্তব্য। যেখানে কাঁচা মাল সুবিধা দরে পাওয়া বা আমদানী করা যায়, যেখানে অনুচ্চ মজুরীতে শ্রমী পাওয়া বা আমদানী করা যায়, এবং যেখান হইতে কাটুতির জন্য সহজে অল্পব্যয়ে বাজারে জিনিষ চালান করা যায়, কারখানা স্থাপনের স্থানটি এরূপ হওয়া দরকার।

ভারতবর্ষের সমুদয় খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ জিনিষ হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক-প্রকার ব্যবস্থা ও চেষ্টার আবশ্যক, যাহা জাপান প্রভৃতি দেশে হইয়াছে। কোন ব্যবসাতে লোকে সাহস করিয়া মূলধন খাটাইতে অগ্রসর না হইলে গবর্ণমেণ্টের সুদ গ্যারাণ্টি করা দরকার হইতে পারে, যেমন এদেশে সরকার অনেক রেলওয়ে নির্ম্মাণে করিয়াছেন। যে-সব জিনিষ এদেশে ব্যবসাহিসাবে প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, সন্দেহ আছে, তাহা তৈয়ার করিবার নিমিত্ত সরকারী পরীক্ষা-কারখানা আবশ্যক হইতে পারে। নূতন রকম কাঁচা মাল হইতে নূতন উপায়ে কাগজ বা অন্য কোন রকম জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে কিনা, তজ্জন্য পরীক্ষা-ও-গবেষণা-গৃহ (research laboratory) আবশ্যক। যাহাতে লোকে সহজে শিল্প-সম্বন্ধীয় নানা বিশ্বাসযোগ্য খাটি খবর পাইতে পারে, তাহার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র শিল্পের বিজ্ঞপ্তি-বিভাগ (Industrial Intelligence Department) থাকা দরকার। ইহা বাণিজ্যিক বিভাগ (Commercial Intelligence Department) হইতে স্বতন্ত্র হওয়া চাই। অবস্থা-বিশেষে গবর্ণমেণ্টকে কিছু মূলধনও ধার দিতে হইতে পারে। জাপানে জাহাজ-নির্ম্মাতারা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট সাহায্য (Subsidy) পাইয়া থাকে। কোন কোন ব্যবসায়ে এ দেশেও তাহা আবশ্যক হইতে পারে। টাকা কর্জ্জ করিবার সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক, সমবায়-সমিতি, রেল ও ষ্টীমারের সস্তা মাশুল, বিদেশ হইতে আমদানী শিল্পদ্রব্যের উপর শুল্কস্থাপন দ্বারা দেশী শিল্প সংরক্ষণ, গবর্ণমেণ্টের ব্যবহারের জন্য সমস্ত জিনিষ যথাসম্ভব ভারতবর্ষ হইতে ক্রয়, বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, ও কারিগর প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাথমিক স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষা দান, শ্রমজীবীদের বুদ্ধি ও কার্য্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য দেশমধ্যে সার্ব্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন, তাহাদের কার্য্য-ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বৃদ্ধি এবং সকলের পক্ষে পুষ্টিকর যথেষ্ট-খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগবিধান,—এইরূপ অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে দেশের লোকের চরিত্রের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ব্যতিরেকে শিল্পবিষয়ে উন্নতি হইবে না। মূলধন আদি বাহিরের আয়োজন, এবং শিল্পনৈপুণ্য ত থাকা চাই-ই। তা ছাড়া, শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সততা, পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা ও ক্ষমতা, সময়-নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা, এইরূপ নানাবিধগুণ যে জাতির মধ্যে যত বেশী, তাহাদের শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের শক্তিও তত বেশী।

ভারতপ্রবাসী সমস্ত ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার প্রস্তাব।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের মুখপত্র প্রায় সব কাগজে এই প্রস্তাবটি উত্থাপিত ও সমর্থিত হইতেছে যে ভারতপ্রবাসী সমর্থ-বয়সের সমুদয়-ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করা উচিত। এ-টা সম্পূর্ণ ইংরেজদের ব্যাপার, আমাদের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ভাবিয়া, দেশের খবরের কাগজ-ওলারা ও অন্য লোকেরা ইহার বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক ইহার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আছে।

যদি ভারতপ্রবাসী সমর্থ বয়সের সব ইংরেজকে সশস্ত্রযুদ্ধ শিক্ষা করিতে ও সৈনিক হইতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যয় ও শিক্ষার খরচ ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে দিতে হইবে; অর্থাৎ আমরা যে ট্যাক্স দি, তাহা হইতেই টাকা খরচ করা হইবে। সুতরাং আমাদের দেখা উচিত যে ইহাতে আমাদের লাভালাভ কি আছে। এংলোইণ্ডিয়ানদের কাগজে এই প্রস্তাবের সপক্ষে বলা হইতেছে, যে, ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা দরকার। ভারতবর্ষকে কোন্ বহিঃশত্রু আক্রমণ করিবে? চীনের সঙ্গে, তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজের শত্রুতা নাই। ভারত আক্রমণ করিবার মত তাহাদের অবস্থাও নয়। রুশিয়ার সঙ্গে, জাপানের সঙ্গে, ইংরেজের বন্ধুত্ব রহিয়াছে। জার্মেনী সুদূরে। সুতরাং বহিরাক্রমণের কথাটা ছল মাত্র। আভ্যন্তরীণ উৎপাতের মধ্যে অল্প-সংখ্যক ডাকাতি ও মধ্যে মধ্যে ২।১ জন পুলিশ খুন আছে। তাহার প্রতিকার পুলিশের দ্বারাই হইতেছে। ১৮৫৭ সালের পর দেশে বিদ্রোহ হয় নাই। তাহার পর দেশকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে এত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, ইহাকে সুযোগ মনে করিয়া ভারতবাসীরা বিদ্রোহ করে নাই, বরং সকল প্রদেশ হইতে তাহারা মানুষ দিয়া, টাকা দিয়া, জিনিষ দিয়া, ইংলণ্ডের সাহায্য করিয়াছে। এমত অবস্থায় আভ্যন্তরীণ উৎপাতের ওজুহাতে সমুদয় এংলোইণ্ডিয়ানকে সশস্ত্র করিবার প্রস্তাব ভারতবাসীদিগকে খুব বেশী রকমে ভীত ও নির্বীর্য্য করিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে বলিয়া আমরা সন্দেহ করি। সুতরাং এ প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিতে গবর্ণমেণ্টকে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

আমরা মানবোচিত সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে ইচ্ছা করি; কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা নহে। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও চাহি না যে কতকগুলি অস্থায়ী বাসিন্দা বিদেশী লোক আমাদেরই টাকায় সশস্ত্র হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে, এবং আমরা সর্ব্বদা ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিব। রাষ্ট্রীয় অধিকার-বিশিষ্ট মানুষের একটা লক্ষণ এই যে সে প্রয়োজন-মত স্বেচ্ছায় আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিতে পারে; পরাধীন মানুষ তাহা করিতে পারে না। নিরস্ত্র থাকিতে বাধ্য হওয়ার অপমান এইখানে। বহুকাল হইতে কংগ্রেস এই কারণে ও অন্যান্য কারণে অস্ত্র-আইন উঠাইয়া দিতে বা সংশোধন করিতে গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছেন। অপমানের মাত্রাটা আরও যাহাতে বাড়ে, তাহাতে আমরা সম্মতি দিতে পারি না।

তা ছাড়া, ইহা কেবল মান-অপমানের কথাও নহে। এক শ্রেণীর লোক সশস্ত্র ও অপর শ্রেণী নিরস্ত্র হইলে উভয়ে সম্প্রীতি থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের একটি ধারা অনুসারে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিদ্বেষ জন্মান একটি দণ্ডার্হ অপরাধ। যাহাতে পরোক্ষ ভাবে এইরূপ বিদ্বেষ জন্মিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের তাহা ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়। গবর্ণমেণ্টের ইহা অগোচর নাই যে ভারতবর্ষে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীরা ইচ্ছা করিলেই সশস্ত্র হইতে পারে এবং দেশী লোকেরা ইচ্ছা করিলেই পারে না বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর কোন কোন লোক উদ্ধত ও অবিবেচক হয়, এবং তাহারা যথেষ্ট সাবধানতার সহিত অস্ত্র ব্যবহার না করায় এবং ক্রোধ দমন না করায় মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনায় কোন কোন হতভাগ্য ভারতবাসী হত বা আহত হয়। এই জন্য সশস্ত্র হওয়া সম্বন্ধে দেশী লোক এবং ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীর বর্ত্তমান পার্থক্য আরও বেশী বাড়ান আমরা অবাঞ্ছনীয় মনে করি। যদি এরূপ কিছু করিতেই হয়, তাহা হইলে বরং দেশী লোকদিগকেও ভলাণ্টীয়ার হইবা

যুদ্ধ শিখিবার অধিকার দেওয়া হউক, এবং সমর্থ বয়সের শারীরিক যোগ্যতাবিশিষ্ট সমুদয় দেশী লোককে সৈনিক হইতে বাধ্য করা হউক। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাই আমাদের নিবেদন।

কংগ্রেসের কাজ।

যুদ্ধ শেষ হইবামাত্রই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরস্পর সম্বন্ধ কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত হইবে, তাহা নহে; কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র পুনর্গঠনের দিকে সাম্রাজ্যের গতি হইবে, তাহা নিশ্চিত। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লণ্ডের যে স্থান ও অধিকার আছে, স্বশাসক (self-ruling) উপনিবেশগুলির ততটা অধিকার নাই। সিংহলের মত, রাজার অধীন উপনিবেশগুলির (crown colonies) রাষ্ট্রীয় অধিকার সামান্য। ভারতবর্ষের মত অধীন দেশগুলির স্থানও খুব নীচে। এখন বিলাতী পার্লেমেণ্টে যুদ্ধ ও শান্তির প্রস্তাব স্থির হয়, সাম্রাজের রক্ষার বন্দোবস্ত স্থির হয়, সাম্রাজ্যের বাণিজ্যনীতি নির্দ্ধারিত হয়, অন্যান্য রাজ্য, সাম্রাজ্য ও সাধারণতন্ত্রের সহিত সকল বিষয়ে সম্বন্ধ স্থির হয়, উপনিবেশসমূহের এবং অধীন দেশ-সকলের শাসনকর্ত্তা ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হন,—এক কথায় সমগ্র সাম্রাজ্যসম্বন্ধীয় সব কাজ ইংলণ্ডে হয়। স্বশাসক উপনিবেশগুলি দাবী করিতেছেন যে যুদ্ধের পর তাঁহারা আর উপনিবেশ থাকিবেন না, সাম্রাজ্যের অংশীদার হইবেন। তাঁহাদের একটা প্রস্তাব এই যে একটা সাম্রাজ্যিক পার্লেমেণ্ট হউক, তাহাতে তাঁহারাও সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইবেন। কিন্তু তাঁহারা এটা চান না যে ভারতবর্ষও এই সাম্রাজ্যে একজন অংশীদার হয়। ভারত অধীনই থাক, এবং তাঁহারাও মনিব হন, এই তাঁহাদের ইচ্ছা। কিন্তু মনিব-পদবী-লিপ্সু এই মানুষগুলি আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, কোথাও ভারতবাসীদিগকে মানুষ জ্ঞান করেন নাই, তাহাদের খুব নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা করিয়াছেন। এই জন্য আমরা নূতন মনিবগুলি চাই না। কিন্তু তাহারা যে কয়েক বৎসরের মধ্যে সাম্রাজ্যে অংশীদার হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং এই নূতন পরাধীনতা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় দেখা চাই। একমাত্র উপায় আমাদেরও সাম্রাজ্যের অংশীদার হওয়া। উপনিবেশগুলির মত স্বশাসক হওয়ার উপর তাহা নির্ভর করে।

স্বশাসক হইবার প্রয়োজন ও ইচ্ছা আমাদের আগে হইতেই আছে। এখন এই নূতন কারণে সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব বাড়িয়াছে। অতএব ইচ্ছা ও চেষ্টাও তদনুরূপ প্রবল হওয়া দরকার। প্রবল ইচ্ছা জন্মান ও প্রবল চেষ্টার আয়োজন করা, ইহাই এবারকার কংগ্রেসের প্রধান কাজ। মোস্লেম লীগেরও ইহাই প্রধান কাজ। প্রস্তাব ধার্য্য করিলেই এই কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। সমস্ত দেশের লোককে সংবাদপত্র, ক্ষুদ্রপত্রী, পুস্তিকা, পুস্তক ও ব্যাখ্যান দ্বারা স্বশাসক হইবার প্রয়োজন বুঝাইতে হইবে, এবং তজ্জন্য সচেষ্ট করিতে হইবে। স্বরাজে দেশের লোকেরই অবিশ্বাস থাকিলে স্বরাজপ্রাপ্তির অন্তরায় তাহার মত আর কি হইতে পারে?

বিলাতেও উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়া তথাকার লোককে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য ও ভারতবাসীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণের জন্য, ভারতবর্ষের স্বরাজ পাওয়ার প্রয়োজন বুঝাইতে হইবে। তজ্জন্য যে দুই তিন লক্ষ টাকা চাই, তাহা আমাদিগকেই তুলিয়া দিতে হইবে।

সাময়িক ব্যাপারের মধ্যে পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয় বিল, এবং ভারতরক্ষা আইনের ও মুদ্রাযন্ত্র আইনের প্রয়োগ যে-ভাবে হইতেছে, তাহা, কংগ্রেসের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী।

ত্রিপুরা জেলার বন্যায়, দুর্ভিক্ষে ও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবে, বাঁকুড়া জেলার দুর্ভিক্ষে, খুলনায় ওলাউঠার সময়, অজয় নদীর বন্যায় বিপন্ন গ্রামসকলে, এবং অন্য নানা স্থানে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী কিরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রপাঠকেরা জানেন। মণ্ডলী কোন কোন জায়গায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মণ্ডলী "কলেরা নিবারণের উপায়" এবং "ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায়" নামক দুটি ক্ষুদ্রপত্রী প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পল্লীগ্রামের লোকদের কাজে লাগিবে। অন্যান্য কাগজপত্র, শ্রীযুক্ত ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, মেয়ো হাঁসপাতাল, কলিকাতা, এই ঠিকানায় চিঠি লিখিলে পাওয়া যাইবে। তিনি এই মণ্ডলীর অবৈতনিক সম্পাদক।

একজন নজরবন্দীর কথা।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতরক্ষা আইন অনুসারে নজরবন্দী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেকগুলি প্রশ্ন করা হয়। একটি প্রশ্ন এই:—ইহা কি সত্য যে নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়কে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ না দিয়াই নজরবন্দী করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল? তদুত্তরে গবর্ণমেণ্টপক্ষ হইতে মাননীয় কার সাহেব বলেন যে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিনি সে সুবিধা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুযোগ নজরবন্দী করিবার হুকুম দিবার পূর্ব্বে, দেওয়া হইয়াছিল, না পরে, উত্তর হইতে তাহা বুঝা গেল না। লাট সাহেবের কাছে নগেন্দ্র দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ না দিয়া নজরবন্দী করা হইয়াছে। এই দরখাস্ত

অনেক দৈনিক ইংরেজী কাগজে বাহির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই দরখাস্তের পর তিনি সুযোগ পাইয়াছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর সম্মান।

শুনা যাইতেছে, ইণ্ডিয়ান মিলিটারী সার্বিস বিভাগের ডাক্তার কাপ্তেন জ্যোতিলাল সেনকে মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্য মিলিটারী ক্রস দিয়া পুরস্কৃত করিবার জন্য তত্রত্য সেনানায়ক সুপারিস করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিলাল সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন মহাশয়ের পুত্র। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কাপ্তেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় মিলিটারী ক্রস্ দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। কুটের অবরোধের পর যাঁহারা বন্দী হন, ইনি তন্মধ্যে একজন। দুঃখের বিষয় সম্প্রতি ইঁহার মাতৃদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইহলোকে আর বীর পুত্রের মুখ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

ব্রিটিশ সেনাদলে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ সাহসিকতার জন্য সর্ব্বোচ্চ সম্মান। মিলিটারী ক্রস্ তাহারই নীচে।

নকল যুদ্ধ।

কলিকাতার কয়েকটি ইংরেজী দৈনিক কাগজে নৌশেরায় কতকগুলি বাঙালী সিপাহী ও পাঠান সিপাহীর মধ্যে নকল যুদ্ধের একটি বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। তাহাতে বাঙালীর ছেলেদের রণকৌশল, পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা সন্তোষজনক। কিন্তু ইহা লইয়া বড়াই করা এবং বলা যে পাঠান সিপাহী অপেক্ষা বাঙালী সিপাহীর শ্রেষ্ঠতার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, নিতান্তই ছেলেমানুষী; কোন সাবালক বাঙালী সম্পাদকের তাহা করা উচিত নয়। করিলে, যে-সব জাতি যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। উপহাস ইতিমধ্যেই কাগজে বাহির হইয়াছে। নকল যুদ্ধ পুরুষোচিত ক্রীড়ার মত; রণকৌশল শিখাইবার জন্য এই খেলা খেলিতে হয়। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, প্রভৃতির চেয়ে এ-খেলা শক্ত বটে, এবং ইহাতে বেশী কৌশলের এবং নেতৃত্ব-শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা আসল যুদ্ধের সমতুল নয়।

বাঙালীর ছেলেদের সাহস সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য তাহাদের কোন একটা সাধারণ কৃতিত্বে তৃপ্তিলাভ করিলেও আমরা উৎফুল্ল হইয়া বড়াই করিবার কারণ দেখি না। এ রকম বাহাদুরী ত তাহারা দেখাইবেই। যে সব জাতি অনেক দিন হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের যেরূপ কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়, আমাদের ছেলেরাও যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন কিছু করিলে আমাদের তাহাতে উৎফুল্ল হওয়া হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন ও সঙ্গত হয়, যদি আগে অ-বাঙালী কাগজে বাঙালীর ছেলেদের প্রশংসা বাহির হয়, এবং পরে তাহা বাঙালীদের কাগজে উদ্ধৃত হয়। কাঁচা ভিত্তির উপর বড়াইয়ের বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

সমাজসংস্কার ও বাংলাদেশ।

লক্ষ্ণৌ শহরে আগামী বড়দিনের ছুটির সময় যেমন কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তেমনি জাতীয় সমাজ-সংস্কার-সমিতিরও অধিবেশন হইবে। বাংলাদেশেই সমাজ-সংস্কারের আরম্ভ হয়। রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সতীদাহ উঠাইয়া দেন। স্ত্রীধন সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দু ব্যবস্থা কিরূপ ন্যায়সঙ্গত ছিল, তাহা দেখাইয়া তিনি সে বিষয়েও হিন্দুনারীদের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু-বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হয়, এবং কতকগুলি বিধবার বিবাহও তিনি দেন। তাহার পর ব্রাহ্মসমাজে এখনও মধ্যে মধ্যে বিধবাদের বিবাহ হয়, এবং হিন্দুসমাজে ২১৪টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে মোটের উপর বাংলাদেশ পিছাইয়া পড়িতেছে, এবং অন্য অনেক প্রদেশ অগ্রসর হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শুভ চেষ্টা সফল হয় নাই; কিন্তু বহুবিবাহ অন্যান্য নানা কারণে পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে বাল্যবিবাহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের ফলে হিন্দুসমাজেও অনেক বুদ্ধিমান্ লোক এই আন্দোলন বাংলাদেশে করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন অন্য নানা কারণে ছেলেদের বাল্যবিবাহ শিক্ষিতসমাজে অনেকটা বন্ধ হইয়াছে; লোকে বুঝিয়াছে যে অল্পবয়সে বিবাহ দিলে ছেলেদের শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, এবং ছেলেকে আইবড় রাখিয়া পাস্ করাইতে পারিলে বিবাহের বাজারে দর বাড়ে। তাহা হইলেও, অন্য কোন কোন প্রদেশে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন আছে, সেরূপ কিছু বাংলাদেশে এখন নাই। মেয়েদের বিবাহের বয়স, বিশেষতঃ শিক্ষিত-সমাজে, এখন আগেকার চেয়ে কিছু বাড়িয়াছে। বাল্যবিবাহ মেয়েদের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া বুঝায়, অল্পপরিমাণে এই সুফল ফলিয়াছে। তদপেক্ষা গুরুতর কারণ, বোধ হয়, বরদের চড়া দর।

স্নেহলতার আত্মহত্যার পর বর-পণের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হইয়াছিল। উহার পরও অনেক বালিকা আত্মহত্যা করিয়াছে; কিন্তু বাঙালীর খড়ের আগুন দাউ দাউ করিয়া অল্পক্ষণের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া গিয়াছে। ডাক্তারদের সাক্ষ্যে, কলিকাতার স্বাস্থ্যকর্মচারীর রিপোর্টে, শহর-নির্মাণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সুবিখ্যাত অধ্যাপক গেডিস্ সাহেবের বক্তৃতায়, ইহা বারবার উল্লিখিত হইয়াছে যে আমাদের অবরোধ-প্রথা এবং তদনুযায়ী স্বল্পালোক ও স্বল্প-বায়ু অন্তঃপুর নির্ম্মাণ-প্রথা আমাদের বিস্তর নারীর ক্ষয়রোগ এবং তজ্জনিত মৃত্যুর কারণ। বাল্যবিবাহ এবং তজ্জনিত অকালমাতৃত্বও যে অনেকের মৃত্যুর কারণ, তাহাও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টান্তে ও আন্দোলনে এবং উল্লিখিত কারণসমূহে এখন এইটুকু ফল হইয়াছে যে নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে এখন হিন্দুনারীরাও প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা ও বায়ুসেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা সামান্য আরম্ভ মাত্র। অবরোধের জন্য বাংলা বোম্বাইয়ের খুব পশ্চাতে রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রে অবরোধ নাই। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এবং পঞ্জাবের অবস্থাও এ বিষয়ে বাংলা অপেক্ষা ভাল। নারীর শিক্ষার জন্য চেষ্টাও বাংলা অপেক্ষা মহারাষ্ট্র ও অন্য কোন কোন প্রদেশে প্রবল।

সমাজ সংস্কারের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য, মানুষকে তাহার বংশ-ও-জাতি-জনিত অসুবিধা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করা, এবং নারী নারী বলিয়া তাহাকে অনেক সমাজে যে সব কৃত্রিম অসুবিধায় ফেলা হয়, তাহা হইতে মুক্তি দেওয়া। নারীদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির, জাতির জন্য, লাঞ্ছনা ও অসুবিধা এখনও রহিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কতকটা স্বাভাবিক ভ্রাতৃভাব হইতে এবং, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে, গরজে পড়িয়া নেতারা এইদিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের উৎসাহ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, কতকগুলি লোকমাত্র এখনও এইসকল জাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। বহুশতাব্দী লাঞ্ছনা সহ্য করায় নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির মধ্যে সামাজিক বিদ্রোহিতা দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের একটি কারণ, হিন্দুসমাজের লোকদের "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য। মুসলমান-সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব আছে, হিন্দুসমাজে তাহা নাই। "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকে খৃষ্টিয়ানও হইতেছে। পঞ্জাবে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে "নিম্ন"শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা যেরূপ প্রবল ও সুশৃঙ্খল, বঙ্গে ঠিক সে রকমের চেষ্টা বেশী নাই।

বঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশে নারী-জীবন।

মোটের উপর বাংলাদেশে নারীর জীবন অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের নারী-জীবন অপেক্ষা, বোধ হয়, অধিক দুঃখপূর্ণ। একথা আমরা পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছি। বঙ্গে নারীর আত্মহত্যার সংখ্যাধিক্যের প্রতিও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বে ঠিক্ সংখ্যার উল্লেখ করি নাই। এখন তাহা করিতেছি।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় সরকারী রিপোর্টে কি কি পীড়ায় ও অন্যান্য কারণে কত স্ত্রীলোক ও কত পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা লিখিত আছে। এই রিপোর্টে দেখা যায় যে ঐ বৎসর ১৪৫২ জন পুরুষ এবং ২০১৮ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। পুরুষদের প্রায় দেড়গুণ অধিক স্ত্রীলোক যে আত্মহত্যা করিয়াছে, তাহার নিশ্চয়ই কারণ আছে। জীবন নিতান্ত দুর্বহ না হইলে লোকে আত্মহত্যা করে না।

এখন আমরা ১৯১৫ সালে চারিটি প্রদেশে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যার সংখ্যা সরকারী রিপোর্ট হইতে সংকলন করিয়া দিতেছি।

১৯১৫ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা।

		আত্মহত্যাকারী	
প্রদেশ	মোট বাসিন্দা	পুরুষ	নারী
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১,৩৯,১৬,৩০৮	৪৪১	৫২৩
বিহার-ওড়িশা	৩,৪৪,৯০,০৩৮	৬০৫	১১০৫
আগ্রা-অযোধ্যা	৪,৬৮,২০,৫৫৬	৭৬৪	১৭৯৯
বাংলা দেশ	৪,৫৩,২৯,২৪৭	১৪৫২	২০১৮

এই তালিকায় দেখা যায় যে সব প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক আত্মহত্যা করিয়াছে; সুতরাং সর্ব্বত্রই শিক্ষাদ্বারা নারীর মনকে দৃঢ়তর করিবার, নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, এবং নারীর পক্ষে দুঃখজনক সামাজিক প্রথার সংস্কার ও অন্য উপায়ে নারীর জীবনকে অধিকতর আনন্দপূর্ণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অন্য তিনটি প্রদেশের সহিত বাংলা দেশের অবস্থা তুলনা করিলে দেখা যায়, যে, আগ্রা-অযোধ্যার লোকসংখ্যা অপেক্ষা বাংলা দেশের লোকসংখ্যা বেশী; অথচ বঙ্গে আগ্রা-অযোধ্যা অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বঙ্গের লোকসংখ্যা মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের লোকসংখ্যার তিনগুণের কিছু বেশী, চারিগুণ অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু বঙ্গে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের, অতিসামান্য-কম-চারিগুণ স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। বাংলার লোকসংখ্যা বিহার-ওড়িশার লোকসংখ্যার দেড়গুণ অপেক্ষা অনেক কম; কিন্তু আত্মঘাতিনী বঙ্গনারীর সংখ্যা আত্মঘাতিনী

বিহার-ওড়িশাবাসিনীদের প্রায় দ্বিগুণ, দেড়গুণ অপেক্ষা অনেক বেশী। অতএব, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে অন্য তিনটি প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে নারীদের আত্মঘাতিনী হইবার গুরুতর কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইসব কারণ আবিষ্কার করিয়া, ব্যাধির প্রতিকার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য।

তালিকা হইতে ইহাও দেখা যায় যে মোটবাসিন্দাসংখ্যার অনুপাতে আগ্রা-অযোধ্যা এবং বিহার-ওড়িশা অপেক্ষা আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যাও বঙ্গে অধিক। ইহারও কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। দেশের রাষ্ট্রীয়, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয়, সামাজিক ও আর্থিক দুরবস্থা নরনারী উভয়েরই জীবনকে ক্লেশকর করিতে পারে। কোন কারণে পুরুষের, কোন কারণে নারীর, দুঃখ অধিক হয়, এবং মোটের উপর যে নারীর দুঃখই সর্ব্বত্র বেশী তাহা ত দেখাই যাইতেছে।

বিলাতে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যা।

কেহ যেন মনে না করেন, পৃথিবীর সকল দেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী বেশী আত্মহত্যা করে। প্রমাণস্বরূপ আমরা ইংলণ্ডে আত্মহত্যার একটি তালিকা দিতেছি।

বৎসর	আত্মঘাতী পুরুষ	আত্মঘাতিনী নারী
১৯০১	২৩১৮	৮০৩
১৯০২	২৪৬০	৮০৭
১৯০৩	২৬৪০	৮৭১
১৯০৪	২৫২৬	৮২২
১৯০৫	২৬৮৩	৮৬২

পুরুষ বা নারী যে-জাতিই বেশী আত্মহত্যা করুক, উহা একটি সামাজিক ব্যাধি; উহার চিকিৎসা চাই। ইউরোপের সকল দেশের গড় ধরিলে আত্মঘাতীর সংখ্যা আত্মঘাতিনীর সংখ্যার ৩৷৪ গুণ। এইজন্য সেখানকার অবস্থা ও ভারতবর্ষের অবস্থা বিভিন্ন বলিয়া, চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, বাঙালীর মেয়েরা উপন্যাস পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে! কিন্তু ইউরোপের মেয়েরা যে শতগুণ বেশী উপন্যাস পড়ে?

শিক্ষা ও শ্রমজীবীদের কার্য্যকারিতা

আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, ডি লা ফস্ সাহেব এবং বঙ্গের ডিরেক্টর হর্নেল সাহেব শিল্পকমিশনের নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে সার্ব্বজনীন অবশ্যকর্ত্তব্য শিক্ষার সপক্ষে মত দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহাদ্বারা শ্রমজীবীদের কার্য্যক্ষমতা বাড়িবে। বড় কারখানার কার্য্যে নিযুক্ত একজন ইংরেজও এইরূপই মত দিয়াছেন। ইঁহার নাম জৈ, এল্, টাল্টন্। ইনি কুরারডুবী এঞ্জিনীয়ারিং কারখানার এবং বার্ড কোম্পানীর কয়লার খনিসকলের প্রধান এঞ্জিনীয়ার। আমাদের ধারণা পূর্ব্বাবধি এইরূপই আছে।

ভারতীয় শ্রমজীবীদের কার্য্যকারিতা।

ভারতবর্ষীয় শ্রমজীবীদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তাতা লোহ ও ইস্পাত কারখানার সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ টাটুওাইলার সাহেব (Mr. T. W. Tatwiler) শিল্পকমিশনের সমক্ষে ভারতীয় শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উৎসাহবর্দ্ধক। তিনি বলেন:—

My opinion of the Indian workmen taken as a whole is that they are very intelligent and quick to learn, and they generally shape well when they are trained properly. Indians, given every facility and encouragement, just as industriously apply themselves to this particular kind of work as Europeans, possibly more so during the hot weather, as the tropical conditions are less irksome to them. And this applies to all Departments.

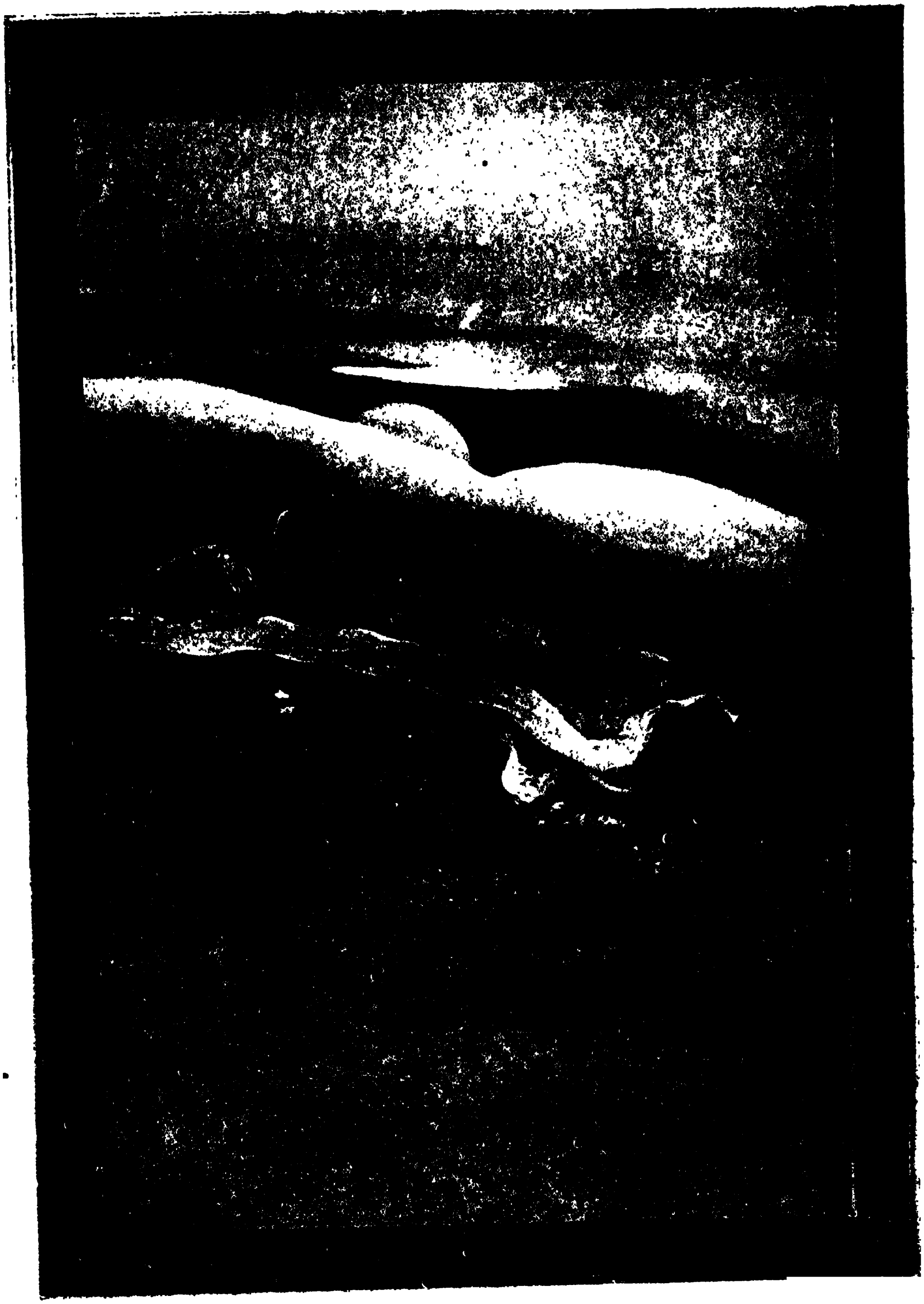
If an Indian has proper food and nourishment, he should be a steady worker and better able to stand the climate of the country than a foreigner, who usually comes out without his family and misses the wholesome influence of public opinion such as exists in his own country, and is therefore apt to dissipate, which is hardly conducive to his regular attendance.

As a rule, the Indian is more amenable to discipline than the foreigner, who on the strength of his contract or under the impression that he is indispensable to his employers is apt to get a swelled head and to disregard discipline. Again, the Indian has a permanent interest in the place and the country, and naturally takes more interest in his surroundings and helps to develop the social and intellectual side of his community. When an Indian is substituted for a foreigner, there is a great saving in salary.

I am sure that where Indians have been substituted for Europeans in these Works, the quality of our products has not suffered.

বাঁকুড়ার কথিত ভাষা।

ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীসারদাচরণ মিত্র একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমরা জানি বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের লোকেরা 'কৃ' ধাতু খুব ব্যবহার করিয়া থাকে। 'খাওয়া হইল' স্থলে তাহারা 'খাওয়া করা হইল' বলিবে।" আমরা বাঁকুড়ার মানুষ, সেখানেই আমাদের জন্ম ও বসবাস। আমরা কৃ ধাতু বেশী ব্যবহার করি বটে। যেখানে পুব্যালোকে বলিবে "আনাও", আমরা কেহ কেহ সেখানে বলি, "আনা করাও"। কিন্তু "খাওয়া করা হইল"টা ভূতপূর্ব্ব জজ বাহাদুরের সৃষ্টি। ওরূপ কথা আমরা বলি না। "ভারতী"র কোন কোন লেখিকাও মধ্যে মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত বাঁকুড়ী কথার উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। বাঁকুড়ার কথিত ভাষার জন্য আমরা একটুও লজ্জিত নহি। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে অদ্ভুত কথা চাপাইলে জংলী বাঁকুড়ী মনুষ্য আমরা, আমাদেরও হাসি পায়।



"এই যে খোকা তরুণ তনু
নতুন মেলে আঁখি—"

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের সৌজন্যে।

প্লেটো—সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন

(মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

১২। সোক্রাটীস—আচ্ছা, মেলীটস, এস, আমাকে বল দেখি, যুবকেরা যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, তাহা তুমি বহুমূল্য জ্ঞান কর কি না?

মেলীটস—হাঁ, করি।

সোক্রাটীস—তবে এস, এই বিচারকদিগকে বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে? এ তো সুস্পষ্ট, যে, তুমি যখন এ বিষয়ে এতটা ব্যগ্র, তখন তুমি ইহা জান। তুমি বলিতেছ, যে, আমি তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি, এবং সেই জন্যই তুমি আমাকে রাজদ্বারে আনিয়াছ এবং আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ। এখন এস, ইহাদিগকে প্রকাশ করিয়া বল, কে তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছে। মেলীটস, তুমি তো দেখিতেছ, যে, তুমি নীরব রহিয়াছ এবং তোমার বলিবার কিছুই নাই? তথাপি তোমার নিকটে ইহা লজ্জাজনক বোধ হইতেছে না? আমি যে বলিতেছি, যে, তুমি এই সকল বিষয়ে কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার কর নাই, তোমার নীরবতাই কি তাহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ নহে? ওহে সাধু, বল, কে তাহাদিগকে ভাল করিতেছে?

মেলী—নিয়মসমূহ (Nomoi—the Laws)।

সোক্রা—কিন্তু, হে পুরুষোত্তম, আমি তাহা জিজ্ঞাসা করি নাই; আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, যে, সে কোন্ ব্যক্তি যে যুবকদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, এবং যে সর্ব্বপ্রথমে এই নিয়মগুলিরই জ্ঞানলাভ করিয়াছে?

মেলী—এই বিচারকগণ, সোক্রাটীস।

সোক্রা—তুমি কি বলিতেছ, মেলীটস? ইহারা যুবকদিগকে শিক্ষা দিতে ও তাঁহাদিগের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ?

মেলী—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—ইঁহারা সকলেই? না, কেহ কেহ সমর্থ, কেহ কেহ অসমর্থ?

মেলী—সকলেই।

সোক্রা—হীরার দিব্য, তুমি বেশ বলিতেছ; তবে তো উপকারী বান্ধব খুব প্রচুরই দেখা যাইতেছে! আচ্ছা, আর একটা কথা; এই শ্রোতৃবর্গ যুবকদিগের উন্নতিসাধন করেন, কি করেন না?

মেলী—হাঁ, তাঁহারাও করেন।

সোক্রা—মন্ত্রিগণও কি করেন?

মেলী—হাঁ, মন্ত্রিগণও।

সোক্রা—কিন্তু, ওহে মেলীটস, তবে রাজসভার সদস্যগণ অবশ্যই যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছেন না? অথবা তাঁহারা সকলেই তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন?

মেলী—হাঁ, তাঁহারাও উন্নতিসাধন করিতেছেন।

সোক্রা—তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যে, আমি ভিন্ন আথীনীয়েরা সকলেই যুবকদিগকে মহৎ ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, একা আমিই তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি। তুমি ইহাই বলিতেছ?

মেলী—হাঁ, আমি খুব জোর করিয়াই এইরূপ বলিতেছি।

সোক্রা তুমি আমাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছ। আচ্ছা, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার কি মনে হয়, যে, ঘোটক সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ? ঘোটকের উন্নতি সাধন করে সকল লোকেই, কিন্তু একজন উহাদিগকে মন্দ করে? না, যাহা ইহার সর্ব্বথা বিপরীত, তাহাই সত্য? একজন, অথবা অল্পজন—অর্থাৎ অশ্বপালগণ—ঘোটকের উন্নতি সাধনে সুক্ষম; কিন্তু বহুজনই ঘোটকের সংস্পর্শে আসিলে ও ঘোটক ব্যবহার করিলে তাহাদিগের অবনতি ঘটাইয়া থাকে? হে মেলীটস, ঘোটক ও অন্যান্য সমুদয় জন্তু-সম্বন্ধে কি এ কথাই ঠিক্ নয়? নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে ঠিক্, তা' তুমি ও আনুটস 'না'-ই বল বা 'হাঁ'-ই বল। যুবকদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের সৌভাগ্য বড়ই বেশী হইত, যদি কেবল একজন তাহাদিগের অহিত করিত এবং অপর সকলেই তাহাদিগের হিতসাধনে রত থাকিত। কিন্তু, মেলীটস, প্রকৃত কথাটা এই, যে, তুমি যথেষ্ট প্রমাণিত করিয়াছ, যে, তুমি যুবকদিগের সম্বন্ধে কখনও ভাব নাই; এবং তুমি যে-সকল অভিযোগে আমাকে বিচারালয়ে

আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ, সেই-সকল বিষয়ে তুমি যে কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার কর নাই—তোমার সেই শ্রমবিমুখতা তুমি নিজেই জাজ্বল্যমান প্রকটিত করিয়াছ।

১৩। ওহে মেলীটস, দেবপিতার দোহাই, আমাদিগকে বল দেখি, সজ্জনের সহিত বাস করা ভাল, না, অসৎ লোকের সহিত বাস করা ভাল? ওগো মহাশয়, জবাব দেও; আমি তো তোমাকে এমন একটা কঠিন কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি না। অসৎ লোকে কি নিয়তই প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট এবং সাধুজন ইষ্ট করে না?

মেলী—নিশ্চয়ই।

সোক্রা—এমন কেহ আছে কি, যে স্বীয় সহচরদিগের দ্বারা উপকৃত না হইয়া বরং অপকৃত হইতে চায়? হে ভদ্র, উত্তর দাও; কেননা, আইন তোমাকে উত্তর দিতে আদেশ করিতেছে। এমন কেহ আছে কি, যে অপকৃত হইতে ইচ্ছা করে?

মেলী—নিশ্চয়ই কেহ নাই।

সোক্রা—বেশ কথা; আমি যুবকদিগকে মন্দ ও অসৎ করিয়া তুলিতেছি বলিয়া তুমি যে আমাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছ, তা' আমি এই কাজটি ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতেছি, কি অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিতেছি?

মেলী—ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি।

সোক্রা—সে কি কথা, মেলীটস? আমার এত বয়স হইয়াছে, তবু তুমি তোমার এই বয়সেই আমার অপেক্ষা এত অধিক বিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছ, যে, তুমি জানিয়াছ, অসৎ লোকে নিয়তই স্বীয় নিকট-প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট ও সাধুজন ইষ্ট করিয়া থাকে, আর আমিই এমন অজ্ঞানতায় ডুবিয়া রহিয়াছি, যে, আমার এইটুকু জ্ঞান নাই, যে, আমি যদি আমার সহচরগণের কাহাকেও অসাধু করিয়া তুলি, তবে তাহা দ্বারা আমারই কোন না কোনও অনিষ্ট ঘটিবে? সুতরাং তুমি বলিতেছ, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই এতবড় একটা অপকর্ম্ম করিতেছি? ওহে মেলীটস, আমি তোমার এমনতর কথা বিশ্বাস করি না, এবং আমার মনে হয় যে তুমি অপর কোন লোককেও ইহা বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। হয় আমি যুবকদিগকে মোটেই মন্দ করিতেছি না, না হয়, যদিই বা মন্দ করি, অনিচ্ছাপূর্ব্বকই করিতেছি; সুতরাং এই উভয় মতানুসারেই তুমি মিথ্যাবাদী। যদি আমি অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগকে মন্দ করিয়া থাকি, তবে এইপ্রকার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য তুমি যে আমাকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিবে, এমন কোনও বিধি নাই; কিন্তু তুমি আমাকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিরস্কার করিবে ও শিক্ষা দিবে, ইহাই বিধি। কারণ, ইহা তো সুস্পষ্ট, যে, আমি অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে দুষ্কর্ম্ম করিতেছি, দুষ্কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে পারিলেই উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কিন্তু তুমি আমার সংস্পর্শে থাকিতে ও আমাকে শিক্ষা দিতে চাহিতেছ না; তুমি তাহা পরিহার করিয়া আমাকে বিচারালয়ে লইয়া আসিয়াছ, যদিও নিয়ম এই, যে, যাহাদিগের দণ্ডের প্রয়োজন তাহারাই এখানে আনীত হইবে, কিন্তু যাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন, তাহারা নহে।

১৪। কিন্তু, হে আথীনীয় নরগণ, প্রকৃত কথা এই, যে, আমি যেমন বলিয়াছি, মেলীটস্ এই-সকল বিষয়ে কখনই অল্প বা অধিক কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করে নাই। সে যাহা হউক, তুমি আমাদিগকে বল দেখি, মেলীটস, আমি কিরূপে যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি? তুমি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, তদনুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, আমি তাহাদিগকে সেই দেবগণে অবিশ্বাস ও অপর নূতন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি; তুমি ইহাই বলিতেছ, না?

মেলী—হাঁ, আমি খুব দৃঢ়তার সহিত এইরূপ বলিতেছি।

সোক্রা—তাহা হইলে, হে মেলীটস, যে দেবগণ সম্বন্ধে এই আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের দোহাই, তুমি আমাকে ও এই বিচারকগণকে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া বল। কেননা, তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি বলিতে চাও, যে, আমি যুবকদিগকে কোন কোন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিই? তাহা হইলে তো আমি নিজে দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, এবং আমি তবে একেবারে নাস্তিক নই ও আমার অপরাধটাও এজাতীয় নয়; অথবা তোমার

অভিপ্রায় এই, যে, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় বিশ্বাস করে, আমি তাঁহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি অপর দেবতায় বিশ্বাস করি; সুতরাং তুমি বলিতেছ, যে, আমার অপরাধ এই, যে, আমি অপর দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দিতেছি? না, তুমি বলিতেছ যে আমি দেবগণের অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস করি না, এবং অপরকেও তাহাই শিক্ষা দিতেছি?

মেলী—আমি ইহাই বলিতেছি, যে, তুমি দেবগণের অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস কর না।

সোক্রা—ও বিচিত্রবুদ্ধি মেলীটস, তুমি কি উদ্দেশ্যে এরূপ বলিতেছ? আমি কি অপর লোকের মত চন্দ্র-সূর্য্যকেও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করি না?

মেলী—হে বিচারপতিগণ, আমি দ্যোপিতার দিব্য করিয়া বলিতেছি, সোক্রাটীস চন্দ্রসূর্য্যকে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করে না; কেননা, সে বলে, সূর্য্য প্রস্তর ও চন্দ্র মৃৎপিণ্ড।

সোক্রা—হে প্রিয় মেলীটস, তুমি কি ভাবিতেছ, যে, তুমি আনাক্সাগরসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছ? তুমি বিচারকগণকে এতই অবজ্ঞা করিতেছ ও তাঁহাদিগকে এমনই নিরক্ষর ভাবিতেছ, যে, তাঁহারা জানেন না, ক্লাজমেনাই-বাসী আনাক্সাগরসের গ্রন্থগুলি এইপ্রকার মতে পরিপূর্ণ? আর, যুবকেরা আমার নিকটেই এই-সকল মত শিক্ষা করিতেছে, যদিচ তাহারা অনেক সময়ে রঙ্গালয়ে বড় জোর এক ড্রামাতেই এগুলি ক্রয় করিতে পারে, এবং যদি সোক্রাটীস এগুলিকে নিজের বলিয়া প্রচার করে তবে তাহাকে পরিহাসও করিতে পারে, বিশেষতঃ যখন মতগুলি এমনই অদ্ভুত? কিন্তু, দ্যোপিতার দোহাই, তুমি কি বাস্তবিকই আমার সম্বন্ধে এই মত পোষণ কর, যে, আমি কোন দেবতার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করি না?

মেলী—আমি দ্যোপিতার দিব্য করিয়া বলিতেছি, তুমি দেবতার অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস কর না।

সোক্রা—ওহে মেলীটস, তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য; এবং আমার বোধ হয়, যে, তুমি নিজেও জান, যে, তোমার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হে আথীনীয়গণ, আমার এইরূপ বোধ হইতেছে, যে, মেলীটস একান্ত উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল; সে বস্তুতঃ যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়াই আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। বোধ হইতেছে, যেন সে আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটা ধাঁধা রচনা করিয়াছে। সে যেন মনে মনে বলিতেছে, "এই জ্ঞানী সোক্রাটীস কি তবে বুঝিতে পারিবে, যে, আমি রঙ্গতামাসা করিতেছি এবং আপনি আপনার কথা খণ্ডন করিতেছি? না, আমি তাহাকে ও অন্য যাহারা আমার কথা শুনিবে তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইব?" আমি দেখিতে পাইতেছি, যে, মেলীটস অভিযোগে নিজেই নিজের বিপরীত কথা বলিতেছে; সে যেন বলিতেছে, "সোক্রাটীস দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া, অথচ দেবতায় বিশ্বাস করিয়া, অপরাধী হইয়াছে।" কিন্তু এটা একটা পরিহাস-রসিকের কথা।

১৫। হে বন্ধুগণ, আমরা তবে বিচার করিয়া দেখি, কেন আমার নিকটে ইহাই অভিযোগের অর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। মেলীটস, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আর তোমরা, আমি প্রারম্ভেই যে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখিও; এবং আমি যদি আমার চিরাভ্যস্ত প্রণালীতে কথা বলি, তবে আমাকে বাধা দিও না।

ওহে মেলীটস, এমন লোক কেহ আছে কি, যে মানবীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু মানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? বন্ধুগণ, মেলীটসকে উত্তর দিতে বল; আর তোমরা একটার পর একটা বাধা দিও না। এমন কেহ আছে কি, যে অশ্ববিষয়ক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু অশ্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? অথবা বংশীবাদনে বিশ্বাস করে, কিন্তু বংশীবাদকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? হে পুরুষোত্তম, এমন কেহই নাই। তুমি যদি উত্তর দিতে না চাও, তবে আমিই তোমাকে ও উপস্থিত আর সকলকে বলিয়া দিতেছি। কিন্তু তুমি এই পরবর্ত্তী প্রশ্নটার উত্তর দাও। এমন কেহ আছে কি, যে দৈব ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না?

মেলী—না, নাই।

সোক্রা—কত বড় অনুগ্রহই করিলে, যে, ইঁহাদের দ্বারা বাধ্য হইয়া আমার কথাটার জবাব দিলে। তুমি তবে বলিতেছ, যে, আমি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ও তাহাই শিক্ষা দিই, তা' সে দেবাত্মা নূতনই হউক বা পুরাতনই হউক। তোমার কথা অনুসারে আমি অন্ততঃ দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; তুমি অভিযোগে শপথ করিয়া এইপ্রকার বলিয়াছ। কিন্তু, আমি যদি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে ইহা একান্ত নিশ্চিত, যে, আমি দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি। কেমন, কথাটা ঠিক্ নয়? হাঁ ঠিক্। তুমি যখন উত্তর দিতেছ না, তখন আমি ধরিয়া লইতেছি, যে, তুমি আমার সহিত একমত হইয়াছ। কিন্তু, আমরা কি দেবাত্মাদিগকে দেবতা, কিংবা দেবগণের সন্তান, বলিয়া মনে করি না? বল, হাঁ, কি না?

মেলী—হাঁ, নিশ্চয়ই।

সোক্রা—তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, যে, আমি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি দেবাত্মারা একপ্রকার দেবতা হন, তবে আমি যে বলিয়াছি, যে, তুমি একটা ধাঁধাঁ রচনা ও রঙ্গ তামাসা করিতেছ, তাহা ঠিক্ই বলিয়াছি; কেননা, তুমি বলিতেছ, যে, আমি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, অথচ পুনশ্চ দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, যেহেতু আমি দেবাত্মায় বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি দেবাত্মারা দেবকন্যা কিংবা অন্য জননীর গর্ভজাত দেবগণের জারজ সন্তান হন—তাঁহারা যাহারই সন্তান হউন না কেন—তবে এমন মানুষ কে আছে, যে, দেবসন্তানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অথচ দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না? যদি কেহ অশ্ব-ও-গর্দ্দভ শাবকের (অর্থাৎ অশ্বতরের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, অথচ অশ্ব ও গর্দ্দভের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করে, তবে তাহা যেমন অদ্ভুত, এটাও ঠিক্ সেইরূপ অদ্ভুত। ওহে মেলীটস, তুমি আমাকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে কিংবা আমার প্রকৃত কোনও অপরাধ আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ; ইহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু, এমন কোন কৌশল নাই, যদ্দ্বারা, যে মানুষের বিন্দুমাত্রও বুদ্ধি আছে, তাহাকে তুমি বুঝাইতে পারিবে, যে, একজন দৈব ও দৈবাত্ম ব্যাপারে বিশ্বাস করে, অথচ সে দেবাত্মা ও দেবতা (ও বীরগণের) অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না।

১৬। কিন্তু, হে আথীনীয় নরগণ, প্রকৃত কথা এই, আমি যে মেলীটসের অভিযোগ-বর্ণিত অপরাধে অপরাধী নই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমার বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; বরং এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে যাহা বলিয়াছি—যে, আমার বিরুদ্ধে বহুলোকের চিত্তে বিষম বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছে—তোমরা বেশ জানিও, যে, তাহা সত্য। যদি আমি অপরাধী বলিয়া পরিগণিত হই, তবে মেলীটস বা আন্যুটস নয়, কিন্তু ইহাই—এই বহুজনের নিন্দা ও বিদ্বেষই আমাকে অপরাধী ধার্য্য করিবে। নিন্দা ও বিদ্বেষ কত অসংখ্য সাধু লোকেরই প্রাণ হরণ করিয়াছে, এবং আমি বিবেচনা করি, আরও করিবে; আমাতেই যে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, এমন আশঙ্কা নাই।

এখন, কেহ হয় তো বলিবে, "আচ্ছা, সোক্রাটীস, তোমার কি লজ্জা বোধ হইতেছে না, যে, তুমি এমন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলে, যাহাতে তোমাকে এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতেছে?" আমি তাহাকে এই ন্যায্য প্রত্যুত্তর দিতেছি,—হে বন্ধু, তুমি যদি বিবেচনা কর যে, যে মানুষের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাহার পক্ষে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এইটি গণনা করা কর্ত্তব্য, যে, সে বাঁচিবে, না মরিবে, কিন্তু তাহার শুধু ইহাই দেখা কর্ত্তব্য নহে, যে, সে যাহা করিতেছে তাহা ন্যায্য কি অন্যায়, তাহা সাধুজনের কার্য্য, কি অসাধু লোকের কার্য্য, তবে তুমি সঙ্গত কথা বলিতেছ না। তোমার কথা অনুসারে, যে-সকল দেবাত্মজ বীরগণ ট্রয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই, বিশেষতঃ থেটিসনন্দন আখিলীস্, মূর্খ ছিলেন। আখিলীস কলঙ্কের তুলনায় বিপদকে এমনই তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, যে, তিনি যখন হেক্টোরকে সংহার করিবার জন্য একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জননী—তিনি দেবী ছিলেন—আমার মনে হয়, এইরূপে

তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন:-"হে বৎস, যদি তুমি স্বীয় সখা পাট্রক্লসের মৃত্যুর প্রতিশোধ লও, এবং হেক্টোরকে বধ কর, তবে তুমি নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, 'কারণ, (তিনি বলিলেন) হেক্টোরের পরেই তোমার নিয়তি বিহিত হইয়া রহিয়াছে'।" যখন জননী এইরূপ বলিলেন, তখন তাঁহার বাক্য শুনিয়া তিনি বিপদ ও মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিলেন; কাপুরুষের মত জীবন ধারণ করা ও প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ না লওয়াই তাঁহার নিকটে অনেক অধিক ভয়াবহ বোধ হইল; তিনি বলিলেন, "আমি পাপাচারীর দণ্ডবিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ মরিতে চাই; আমি যেন অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি নৌবৃন্দ সমীপে লোকের উপহাসভাজন হইয়া ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অবস্থান না করি।" তুমি কি বিবেচনা কর, যে, তিনি বিপদ ও মৃত্যুকে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন? হে আথীনীয় নরগণ, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সত্য। কোনও ব্যক্তি নিজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবিয়া যেখানেই আপনাকে স্থাপন করুক না কেন, অথবা তাহার অধিনায়ক কর্ত্তৃক যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, আমার বিবেচনায় তাহার সেইখানে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য; তাহার পক্ষে কলঙ্ক ভিন্ন মৃত্যু কিংবা অপর কিছুই গণনা করা উচিত নহে।

১৭। হে আথেন্সবাসিগণ, তোমরা আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য যাঁহাদিগকে নায়ক নির্ব্বাচন করিয়াছিলে, তাঁহারা পটেইডাইয়া, আম্ফিপলিস ও ডীলিয়মে আমাকে যখন যে স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, আমি মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটিলেও অপর সকলের ন্যায় তখন সেই স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলাম। সুতরাং, যখন আমি বুঝিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, যে, ঈশ্বর আমাকে জ্ঞানান্বেষণে এবং আপনার ও অপরের পরীক্ষায় জীবন যাপন করিতে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন যদি আমি মৃত্যু কিংবা এইপ্রকার অন্য কিছুর ভয়ে ভীত হইয়া আমার জীবন-ব্রত ত্যাগ করিতাম, তবে তাহা একটা অদ্ভুত কর্ম্ম হইত। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপারই হইত; এবং তখন বস্তুতঃ ন্যায়-সঙ্গতরূপেই কেহ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতে পারিত, যে, আমি দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, যেহেতু, আমি দৈববাণী অগ্রাহ্য করিয়াছি, মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়াছি, এবং জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। কেননা, হে বন্ধুগণ, মৃত্যুকে ভয় করা জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করা—ইহা ছাড়া আর কিছুই নয়; যেহেতু, মৃত্যুভয়ের অর্থই এই, যে, আমরা যাহা জানি না, তাহাই জানি বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, মৃত্যু মানবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মহিষ্ঠ কল্যাণ কি না, তাহা কেহই জানে না; অথচ লোকে যেন উহা সম্যক্ অবগত আছে এই ভাবিয়া উহাকে সর্ব্বপ্রধান অমঙ্গলরূপে ভয় করে। ইহা কি সেই নিতান্ত লজ্জাজনক অজ্ঞানতা নয়, যে অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা যাহা জানি না, তাহাও জানি বলিয়া ভাবিয়া থাকি? বন্ধুগণ, এক্ষেত্রেও হয় তো জনসাধারণের সহিত আমার এইটুকু পার্থক্য আছে; এবং যদি আমি তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী বলিয়া প্রতীয়মান হই, তবে তাহা এই জন্য, যে, আমি যখন পরলোক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই জানি না, তখন আমি মনেও করি না, যে, আমি জানি। কিন্তু আমি জানি, যে, অন্যায়াচরণ করা ও যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তিনি দেবতাই হউন বা মানুষই হউন—তাঁহার অবাধ্য হওয়া অকল্যাণকর ও ঘৃণার্হ। আমি যেগুলি অকল্যাণ বলিয়া জানি, সেগুলির জন্য, যেসকল বিষয় কল্যাণ কি না আমি জানি না, তাহা আমি কখনই ভয় করিব না, বা পরিহার করিতে প্রয়াসী হইব না। সুতরাং তোমরা যদি এক্ষণে আনুটসের যুক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও,—সে বলিয়াছে, যে, হয় আমাকে মূলেই এখানে আনয়ন করা উচিত হয় নাই, না হয়, যখন আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইয়াছে, তখন আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই কর্ত্তব্য; সে তোমাদিগকে বলিতেছে, যে, যদি আমি অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে তোমাদিগের পুত্রগণ সকলেই সোক্রাটীস যাহা শিক্ষা দিতেছে তাহাতে নিরত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিপথগামী হইবে—তোমরা যদি এই হেতু আমাকে বলিতে, "ওহে সোক্রাটীস, এবার আমরা আনুটসের কথায় কর্ণপাত করিব না; এবার তোমাকে আমরা নিষ্কৃতি দিব; কিন্তু তোমাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যে, তুমি এই প্রকার অনুসন্ধান ও জ্ঞানান্বেষণে আর কালাতিপাত

করিবে না; যদি তুমি আবার ইহাতে লিপ্ত হও, তবে তুমি প্রাণ হারাইবে।" আমি যেমন বলিলাম, যদি তোমরা এই নিয়মে আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিতে, তবে আমি তোমাদিগকে বলিতাম, হে আথীনীয়গণ, আমি তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি; কিন্তু আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অনুগামী হইব; যতদিন আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও দেহে সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন আমি জ্ঞানান্বেষণ এবং তোমাদিগকে শিক্ষাদান ও সৎপথ প্রদর্শন করিতে বিরত হইব না; যখনই তোমাদিগের কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহাকে আমার চিরাভ্যস্ত ভাবে আমি বলিব, হে পুরুষোত্তম, তুমি আথীনীয়, জ্ঞান ও বীর্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুবিখ্যাত নগরীর অধিবাসী, তোমার কি লজ্জা হইতেছে না, যে তোমার ঐশ্বর্য্য কিসে পরিপূর্ণ হইবে, এবং মান ও খ্যাতি বর্দ্ধিত হইবে, তাহার জন্য তুমি এত শ্রম করিতেছ? তুমি কি জ্ঞানের জন্য, সত্যের জন্য, কিরূপে আত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য, যত্নবান্ হইবে না, বা তাহাতে মনোনিবেশ করিবে না? যদি সে আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয় এবং বলে, যে, সে এই-সকল বিষয়ে যত্নবান্, তবে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ ছাড়িব না, কিম্বা চলিয়া যাইব না; কিন্তু আমি তাহাকে প্রশ্ন করিব, পরীক্ষা করিব ও তাহার বাক্য খণ্ডন করিব; এবং যদি আমার বোধ হয়, যে, তাহার গুণ নাই, অথচ সে বলে যে আছে, তবে তাহাকে আমি এই বলিয়া তিরস্কার করিব, যে, সে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ তাহাকেই অল্পমূল্য, ও যাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ, তাহাকেই বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছে। যুবক ও বৃদ্ধ, বিদেশী ও স্বপুরবাসী, যাহারই সহিত আমার সাক্ষাৎ হউক না কেন, তাহার প্রতিই আমি এইরূপ করিব, বিশেষতঃ স্বপুরবাসীদিগের প্রতি; কেননা, তাহারা জন্মাবধি আমার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। কারণ, তোমরা বেশ জানিও, ঈশ্বর আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়াছেন; এবং আমি বিবেচনা করি, যে, এই নগরে তোমাদিগের পক্ষে আমার ঈশ্বর-সেবার অপেক্ষা মহত্তর সৌভাগ্য আর ঘটে নাই। কেননা, আমি আর কিছুই না করিয়া শুধু সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেছি, এবং যুবক ও বৃদ্ধ তোমাদের সকলকেই বুঝাইতে চাহিতেছি, যে তোমরা দেহের জন্য ভাবিও না; অগ্রেই অর্থের জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া খাটিয়া মরিও না; কিন্তু আত্মা যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য যত্নশীল হও; আমি বলিতেছি, অর্থ হইতে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম হইতেই অর্থ ও মানবের স্বকীয় ও রাষ্ট্রীয় অপর যাবতীয় শুভ প্রসূত হইয়া থাকে। যদি আমি এই প্রকার শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে বিপথগামী করিয়া থাকি, তবে অনিষ্ট গুরুতরই হইয়াছে; কিন্তু যদি কেহ বলে, যে, আমি ইহা ছাড়া আর কিছু শিক্ষা দিতেছি, তবে সে অলীক কথা বলিতেছে। অতএব, হে আথীনীয়গণ, আমি বলিতেছি, তোমরা আন্যুটসের কথামত কার্য্য কর, বা করিও না; আমাকে নিষ্কৃতি দেও, কিম্বা নিষ্কৃতি দিও না; কিন্তু যদি বা আমাকে সহস্রবারও মরিতে হয়, তথাপি আমি আমার জীবনব্রত কখনই পরিবর্ত্তন করিব না।

১৮। হে আথীনীয় নরগণ, আমাকে বাধা দিও না; আমি তোমাদিগের নিকটে যে ভিক্ষা চাহিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখ, এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে বাধা না দিয়া আমার কথাগুলি শুন; কেননা, আমি বিবেচনা করি, শুনিলে তোমাদিগের উপকার হইবে। আমি তোমাদিগকে অন্য এমন কিছু বলিতে যাইতেছি, যাহা শুনিয়া তোমরা হয় তো চীৎকার করিয়া উঠিবে; কিন্তু কখনই তাহা করিও না। আমি যেমন, তাহা তো তোমাদিগকে বলিলাম; এখন বেশ জানিও, তোমরা যদি আমাকে বধ কর, তবে আমার অপেক্ষা তোমরা নিজেদেরই গুরুতর অনিষ্ট করিবে। মেলীটস বা আন্যুটস আমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না, কারণ ইহা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে; কেননা, আমি বিশ্বাস করি যে, অধম ব্যক্তি দ্বারা শ্রেষ্ঠজনের অনিষ্ট সাধিত হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধিই নয়। অবশ্য তাহারা হয় তো আমাকে হত্যা করিতে পারে, অথবা নির্ব্বাসিত করিতে পারে, কিম্বা রাষ্ট্রীয় অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারে; তাহারা ও অন্য অনেকে হয় তো এগুলিকে গুরুতর অমঙ্গল বলিয়া বিবেচনা করে; আমি কিন্তু তাহা

করি না; আমি মনে করি, তাহারা এক্ষণে যাহা করিতে যাইতেছে তাহা—অর্থাৎ কোন লোককে অন্যায়-মত বধ করিবার চেষ্টাই—বহুগুণে গুরুতর অকল্যাণ। এক্ষণে, হে আথীনীয় নরগণ, কেহ কেহ ভাবিতে পারে, যে, আমি আমার আত্ম-সমর্থনের উদ্দেশ্যেই এই-সকল কথা বলিতেছি; কিন্তু আমি তাহা মোটেই করিতেছি না; আমি তোমাদিগের জন্যই এত কথা বলিতেছি। তোমরা আমাকে দোষীর মত দণ্ড দিয়া এবং এইরূপে ঈশ্বরের দান অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধী হইও না। কারণ তোমরা যদি আমাকে প্রাণে বধ কর, তবে সহজে এমন অন্য একজন পাইবে না। একটা হাস্যজনক উপমা ব্যবহার করিয়া বলা যাইতে পারে,—যে বিশালবপুঃ ও তেজস্বী অশ্ব স্বীয় দেহের বিশালতাবশতঃ কিঞ্চিৎ অলসপ্রকৃতি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য যেমন দংশের প্রয়োজন, তেমনি ঈশ্বর এই নগরীকে দংশন করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই পুরীকে আক্রমণ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে এইপ্রকার একটা দংশরূপে প্রেরণ করিয়াছেন; কারণ, আমি সমস্ত দিন সর্ব্বত্র তোমাদিগের উপরে উৎপতিত হইয়া তোমাদিগকে জাগাইতেছি, উপদেশ দিতেছি, তিরস্কার করিতেছি; এই কর্ম্মে আমার কদাচ নিবৃত্তি নাই। বন্ধুগণ, তোমাদিগের পক্ষে সহজে এমন অন্য কেহ মিলিবে না; তোমরা যদি আমার কথা শুনিতে, তবে আমাকে অব্যাহতি দিতে। সুপ্ত ব্যক্তিদিগকে জাগাইয়া দিলে তাহারা যেমন ক্রুদ্ধ হয়, তোমরাও হয়-তো সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছ; আনুটসের কথানুসারে কার্য্য করিলে তোমরা অবশ্য অক্লেশে এক আঘাতেই আমাকে মারিয়া ফেলিতে পার; এবং এইরূপে যদি ঈশ্বর তোমাদিগকে দয়া করিয়া আমার স্থলে আর কাহাকেও প্রেরণ না করেন, তবে অতঃপর অবশিষ্ট জীবনকাল নিদ্রাতেই যাপন করিতে পার। আমি যেপ্রকার; ঈশ্বরই যে আমাকে সেইপ্রকার করিয়া এ পুরীকে দান করিয়াছেন, তাহা তোমরা ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে—ইহা কখনই মানব-প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া বোধ হয় না, যে আমি এতবৎসর ধরিয়া আমার যাবতীয় বৈষয়িক ব্যাপারে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি ও সমুদয় গৃহস্থালির কর্ম্মে অযত্ন হইতেছে, তাহা সহ্য করিয়াও নিয়ত তোমাদিগকে লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছি; এবং পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিজনের নিকটে যাইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জনে যত্নশীল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছি। আমি যদি এরূপ করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু লাভ করিতাম, কিংবা এই-সকল উপদেশ দিয়া বেতন গ্রহণ করিতাম, তবে ইহার কারণ বুঝা যাইত। কিন্তু, এক্ষণে তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ, যে, যদিচ প্রতিপক্ষ নির্লজ্জের মত আমার বিরুদ্ধে কতই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের নির্লজ্জতা এতদূর যাইয়া পঁহুছিতে পারে নাই, যে, তাহারা বলিবে এবং সাক্ষ্য উপস্থিত করিবে, যে, আমি কখনও বেতন চাহিয়াছি বা গ্রহণ করিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা যে সত্য, আমি বোধ করি আমার দারিদ্র্যই তাহার যথোচিত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

১৯। হয় তো তোমাদের নিকটে ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, যে, আমি যদিচ ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া উপদেশ দিতেছি ও বহুবিষয়েই ব্যাপৃত রহিয়াছি, তথাপি আমি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জনসভায় গমন করিয়া তোমাদিগের সহিত রাজ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে সাহসী হইতেছি না। ইহার কারণ কি, তাহা তোমরা বহুবার বহুস্থলে আমাকে বলিতে শুনিয়াছ; কারণটি এই—আমি ঈশ্বর সন্নিধানে এক দৈব ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছি; মেলীটস পরিহাস করিয়া অভিযোগ-পত্রে ইহারই উল্লেখ করিয়াছে। আমি বাল্যাবধি এই ইঙ্গিত পাইতেছি; ইহা একপ্রকার বাণী; আমি যখনই এই বাণী শুনিতে পাই, তখনই আমি যাহা করিতে যাইতেছি, তাহা হইতে ইহা আমাকে নিবৃত্ত করে; কিন্তু ইহা কখনও আমাকে কোনও কর্ম্মে নিয়োগ করে না। এই বাণীই আমাকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়াছে; এবং আমার বোধ হয়, নিষেধ করিয়া অতি উত্তম কর্ম্মই করিয়াছে। কারণ, হে আথীনীয় জনগণ, তোমরা বেশ জান, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতাম, তবে অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রাণ হারাইতাম, এবং তোমাদিগের বা আমার নিজের কোনই

হিত সাধন করিতে পারিতাম না। আমি সত্য কথা বলিতেছি বলিয়া আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। এমন কোন লোক নাই, যে, কি তোমাদিগের, কি অন্য জনতন্ত্রে, রাষ্ট্র মধ্যে যে বহু অন্যায় ও অবৈধ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিয়াও নিরাপদ থাকিতে পারে। যে বাস্তবিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করিতে উদ্যত, সে যদি অল্পকালের জন্যও প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, তবে তাহাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবেই কার্য্য করিতে হইবে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

কবি ও ঋষি

স্মরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে এমন অনেক দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহাদের স্বচ্ছ মানস-দর্পণে বিশ্বের গূঢ়তত্ত্ব-সকল প্রতিফলিত হইয়া ধরা দিয়াছে, এবং যাঁহারা সেই-সকল আত্মোপলব্ধ সত্য জনসমাজে প্রচার করিয়া মানব-সভ্যতার বিকাশ-ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই মন্ত্র- বা সত্যদ্রষ্টা ঋষি আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। শুধু বেদমন্ত্র কেন, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিমাত্রেই অপৌরুষেয়। কারণ তাহা মানবের মধ্য দিয়া পরমব্রহ্মের পূর্ণ-জ্যোতির আংশিক প্রকাশ। এবং এই-সকল ভগবদ্-অনুগৃহীত মহাপুরুষ ঋষি, তা সে তাঁহারা যে-দেশের ও যে-যুগেরই হউন না কেন। যদিও প্রাচীনকালে প্রধানতঃ বেদমন্ত্রের রচয়িতাদেরই আমাদের দেশে ঋষি বলা হইত, তথাপি কপিল-কণাদাদি ষড়দর্শনকার এবং ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি মহা-কবিগণও ঋষি নাম পাইয়াছেন। ইঁহারা কেহই মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগেরও শ্রেষ্ঠ মনীষী বা কবির বিশিষ্ট গুণ বুঝাইবার জন্য ঋষি শব্দের ব্যবহার অসঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না। গত্যর্থ (=বুদ্ধ্যর্থ)-বাচক ঋষি শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ ধরিলেও এরূপ প্রয়োগে কোন দোষ আসে না। অলৌকিক জ্ঞান বুদ্ধি বা মনীষার আলোকে যাঁহার চিত্তাকাশ উজ্জ্বল এবং এক স্বর্গীয় প্রেরণায় যিনি নিজ হৃদয়ে পরম সত্যের অনুভূতি লাভ করেন তিনি ঋষি।

সুতরাং ঋষি যে শুধু প্রাচীন যুগেই আবির্ভূত হইতেন এবং এখন আর দৃষ্টিগোচর হন না, এরূপ কথা বলা চলে না। যখনই কোন কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিরন্তন ধ্রুব সত্যের একটা অভিনব দ্বার খুলিয়া দেন তখনই আমরা ঋষির সাক্ষাৎকার লাভ করি। আজ কবির কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক কবি আপনার কাব্য-সৃষ্টির অন্তরালে যে-সকল গভীর তত্ত্বের আভাস দেন তাহা ঋষির সত্য দর্শন হইতে ন্যূন নহে। বৈদিক ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা ন্যায়, ধর্ম্ম, সত্যমূলক ভগবানের পরম-বাণী প্রচার করিয়াছেন তাঁহারা একাধারে কবি ও ঋষি। ঈশা, মূশার ন্যায় যাঁহারা ঐশী শক্তির প্রভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া সত্যধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা Prophets বা ঋষি নামে বিদিত হইলেও তদানীন্তন যুগের কবি ছিলেন। তাই কবি শেলী বলিয়াছেন—Poets were called, in the earlier epochs of the world, legislators or prophets। শেলীর এই উক্তির মর্ম্ম এই যে, এই-সকল মহাপুরুষগণ প্রকৃতপক্ষে কবিই ছিলেন, লোকে তাঁহাদিগকে কবি না বলিয়া শাস্ত্রকার বা ঋষি আখ্যা দিয়াছে। লর্ড বেকনও তাঁহার একটি প্রবন্ধে ('Of Religion') প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কার্য্যই ছিল তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কবিগণই ছিলেন তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার। বৈদিক ঋষিগণের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব স্বরচিত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে' কয়েকটি ঋকের অনুবাদ করিয়া তাহাদের কাব্যসৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই-সকল আত্মজ্ঞানী ঋষি যে ভগবৎ-প্রভাবান্বিত কবি ছিলেন তাহা আমাদের স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। ঋষির ন্যায় কবিরও সেই 'vision and the faculty divine'—সেই পরমজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি—থাকে যাহাতে উভয়কে একই শ্রেণীতে ফেলিতে পারা যায়। একথা যদি সত্য হয় যে, 'Poetry is the record of the best and happiest

moments of the happiest and best minds' *—কবিতা আনন্দোল্লাসিত-চিত্ত মনীষীর অসীমানন্দপূর্ণ শুভ মুহূর্ত্তগুলির পরিচয় দেয়। তাহা হইলে আর কবিত্বে ও ঋষিত্বে প্রভেদ কি? একদিকে যেমন "ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না, ঋষির রসনা মিছেনা কহে," তেমনই অপরদিকে আবার কবির শ্রেষ্ঠ-মুহূর্ত্ত-সঞ্জাত আনন্দধারাপ্লুত আত্মোপলব্ধিও কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

কবি যে আপনার প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে নিরন্তর এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণা, এক অনির্ব্বচনীয় উন্মাদনা, এক স্বর্গীয় আবেশ অনুভব করেন, তাহার উল্লেখও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা সেই রহস্যময়ী শক্তি যাহার মধ্যে কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া বিহ্বল প্রাণে বলিতে থাকেন—

একি কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে!

কবির এই অন্তরবাসিনী প্রেরণাই তাঁহার জীবন-দেবতা। কবি নিজে এই দেবতার হস্তের বীণাটি মাত্র। তিনিই কবিকে দিয়া আপনার গান গাওয়াইতেছেন, আপনার বাণী প্রচার করিতেছেন। একথা যে শুধু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এবং ইহা যে শুধু তাঁহারই নিজস্ব আত্মানুভূতি, তাহা নয়। শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই অসীম রহস্যময়ী শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। শেলী তাই কবির হৃদয়ে প্রকৃত কবিত্বের বিকাশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—It is as it were the interpretation of a diviner nature through our own—ইহা যেন আমাদের মধ্য দিয়া কোন স্বর্গীয় প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ। মহাকবি গেটেও এই ঐশী শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও ইহাকে Genius of Life বা জীবন-দেবতা বলিয়াছেন, 'which does with him what it pleases and to which he unconsciously resigns himself, whilst he believes he is acting from his own impulse'*—'এই জীবন-দেবতা কবিকে যদৃচ্ছা চালিত করেন, এবং কবি যখন মনে করেন তিনি নিজের ভাবাবেশে লিখিতেছেন তখন তিনি প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞাতসারে এই শক্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করেন।" গেটের এই উক্তি কি রবীন্দ্রনাথেরই "তুমি যা বলাও আমি বলি তাই" কথারই রূপান্তর মাত্র নহে? এই দিব্য শক্তি যাঁহার জীবন-দেবতা Genius of Life, এবং যিনি এই শক্তির প্রভাবে diviner nature বা স্বর্গীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হন তিনি ঋষি হইতে কম কিসে?

তবে যে সকলে কবিকথাকে ঋষিবাক্যের ন্যায় শিরোধার্য্য করিয়া লয় না তাহার কারণ লোকের রুচি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঋষি মাত্রেরই মত বা উক্তি কি আমরা সকলেই গ্রহণ করি? চার্ব্বাক ঋষির নাস্তিকতা কিম্বা কপিল ঋষির সাংখ্য মত যেমন সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই, সেইরূপ সকল কবির প্রচারিত মত বা তত্ত্ব সকলে মানিয়া লইতে না পারেন। আধুনিক ঋষিদের মধ্যে টল্‌ষ্টয়ের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু ধর্ম্ম সমাজ ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত তাঁহার মত অনেকেরই—বিশেষতঃ গোঁড়া খৃষ্টানদের—মনঃপূত হয় নাই। কবি ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কাব্য-সাধনার মূল মন্ত্র ছিল সমগ্র বিশ্বে এক ঐশ্বরিক সত্তার ব্যাপ্তি বা প্রকাশের উপলব্ধি, অথবা আমাদের ভাষায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।" ইহা ইংরেজ পাঠক কবির একটা মত বা ধারণামাত্র বলিয়া মনে করেন। কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মে ঠিক ইহার অনুরূপ কিছু নাই। আমরা কিন্তু মনে করি যে, ইংরেজ কবির হৃদয়ে এই মহাসত্যটির উন্মেষই তাঁহাকে ঋষিত্বে উন্নীত করিয়াছে, কারণ তিনি কবিত্ব-প্রভাবে হিন্দু ঋষির তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন এই সর্ব্বব্যাপী সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—A motion and a spirit that impels all thinking things, তখন আমাদের উপনিষদের "যেনাহুর্মনোমতম্" মনে পড়িয়া যায়, এবং

* Shelley, Defence of poetry.

* Eckermann, March 11, 1828.

ইংরেজ কবি হিন্দুর এই তত্ত্বের কত নিকটে পৌছিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারি। এইখানেই তাঁহার ঋষিত্ব। সুতরাং কোন বড় কবির মত বা তত্ত্ব আমরা গ্রহণ করিতে পারি না বলিয়া যে তিনি ঋষি হইতে পারেন না এরূপ যুক্তি দাঁড়াইতে পারে না। আর মনে রাখিতে হইবে যে ঋষি বলিতে ঠিক saint বা সাধু বুঝায় না। সুতরাং কোন কোন কবি সামাজিক হিসাবে আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের ঋষিত্বের হানি হয় নাই। আমাদের প্রাচীন ঋষিদের মধ্যেও শকুন্তলার জনক বিশ্বামিত্র এবং ব্যাসপিতা পরাশর অকলুষিত-চরিত্র ছিলেন না। শুধু চন্দ্রে নয়, সূর্য্যেও কলঙ্ক আছে। কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে যাহা কালিমা হইয়াছে সূর্য্যের স্বীয় দীপ্ত তেজ তাহা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে কবিমাত্রেই ঋষিত্বের দাবী করিতে পারেন না। নূতন বাণী শুনাইতে বা নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে বড় বেশী কবি জন্মগ্রহণ করেন না। কল্পনার হাওয়ায় ভাষার রঙীন ফানুষ উড়াইতে পারিলেই বড় কবি হওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কবিদের প্রতিভা থাকিতে পারে; কিন্তু সেই প্রতিভা যদি প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল না হয়, এবং তাহার সহিত যদি গভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রগাঢ় আত্মানুভূতি, এবং সর্ব্বোপরি এক দিব্য শক্তির আবেশ সম্মিলিত না হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিব না, এবং তাঁহাদের কবিত্বে ঋষিত্বের গুণ থাকিতে পারে না। ইংরেজিতে এইরূপ শ্রেষ্ঠ কবিকে transcendental poet বা অতীন্দ্রিয়দর্শী কবি বলে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কাব্যকুঞ্জ অনেক কবির মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বোধ হয় ঋষিকবি বলা যায় না। একথা যাঁহারা স্বীকার করেন না তাঁহাদের সহিত তর্কের কোন প্রয়োজন দেখি না। কারণ যাঁহারা বুঝেন না যে রবীন্দ্রনাথই এখন সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর চিন্তা-ধারা পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের তর্ক দ্বারা ইহা বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি অদ্বিতীয় মনীষী। তিনি নোবেল প্রাইজ্ পাইয়াছেন বলিয়াই যে বড় কবি হইয়াছেন তাহা নহে। দেশ তাহার অনেক পূর্ব্বেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে তাঁহাকে মহাড়ম্বরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া দেশ তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। পাশ্চাত্যে তাঁহার কিরূপ আদর হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, মিল্‌টন্, ডান্টে অপেক্ষা বড় কবি বলিয়াছেন। তাঁহার নোবেল প্রাইজ পাইবার এক বৎসর পূর্ব্বে North American Review নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধে যে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একস্থলে আছে—

In the Bengali poems of Rabindranath Tagore you will find that common emotional appeal united in a music and a rhythm many degrees finer than Swinburne's—a music and rhythm almost inconceivable to Western ears—with the metaphysical quality, the peculiar subtlety and intensity of Shelley; and that with a simplicity that makes this miracle appear the most natural thing in the world. As far as I know *no western poet yet born has done precisely this.* Not Milton; he is far too grandiose for the human heart. Not Wordsworth; he is at once too subtle and too ponderous. And not the great mystic poets of the West............... Not even Dante and St. John of the Cross, though they stand nearest (they are very near) to this great mystic poet of Bengal. *

যাঁহার সম্বন্ধে বিদেশী সমালোচক বলিতেছেন যে পাশ্চাত্যে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই যিনি কবিত্বের সহিত আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, আমরা সেই আমাদের রবীন্দ্রনাথকে চিনিলাম না, ইহা বিচিত্র নহে কি?

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

পরখ্

(বুন্দ কবি)

ডাক শুনি নাই কানে আজো তাই
ডাঁক শুনে লাগে তাক।
ফাগুনে ফারাক বুঝিব বেবাক
কে কোকিল কেবা কাক।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* North American Review for May, 1913.

ময়না

(ব্রেট হার্টের গল্প হইতে)

অনেককাল আগে পচম্বার কয়লার খনিগুলির কাছাকাছি একটা জায়গায় খনির কুলী মজুর কণ্ট্রাক্টর কেরানী বাবু প্রভৃতিকে নিয়ে একখানি ছোটখাটো গ্রাম গড়ে উঠেছিল। গ্রামটি লোক-সমাজের চোখের একেবারে বাইরে। ছোট ছোট নদী, শিউলিবনে-ঢাকা পাহাড়ের ঢিবি আর বড় বড় শালবনে মিলে তাকে এমন করে লুকিয়ে রেখেছিল যে অনেক চেষ্টা করলেও বাইরের জগৎ কি লোকসমাজ তাকে আপনার গণ্ডীর ভিতর আনতে পারত না। গোধূলির ম্লান লাল আলো যখন সেই গ্রামের ছোট ছোট খোলার বাড়ীগুলির উপর ছড়িয়ে পড়ত, তখন গ্রামখানিকে দেখে মনে হ'ত যেন মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যালক্ষ্মী। সে গ্রামের ছোট ছোট রাঙা বাঁকা পথগুলি মাঝে মাঝে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আবার কিছু দূর থেকে উঁকি মেরে দেখা দ্যায়। সেই-সব পাহাড়ের গা দিয়ে আর তলা দিয়ে অনেকগুলি ক্ষীণস্রোতা ছোট ছোট নদী ঝিক্‌-মিক্ করে। তাদের জলের তুলনায় বালির রাশিই বেশী। কচি মেয়ের মত পথ আর নদীগুলি যেখানে লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত, সেখানে পাহাড়গুলি বুড়ী সেজে চিরগম্ভীর মূর্ত্তি ধরে বসে থাকে; তারা কখনও টলে না। গ্রামের কিছু দূরে অনেকগুলি খোয়াই আর খাদ ক্ষুধিত দৈত্যের মত হাঁ করে পড়ে ছিল। তাদের মুখের ভিতর হীরার মতন ঝক্‌ঝকে অসংখ্য পাথরের দাঁত।

গ্রামে অর্থের সন্ধানে নানাদেশের নানালোক এসে জুটেছিল। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ছোটনাগপুরী—সবরকম মানুষই সেখানে মজুত। গোবর্দ্ধন সরকার নামে এক প্রায় নিরক্ষর বাঙালী এই গ্রামে এসে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। প্রথম যেদিন তাকে এখানে দেখা যায়, সেদিন তার সম্বল ছিল কেবল একটি হুঁকো, একটি ছাতা আর একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ পেটে-আঁতে-লাগা; উপরি একটি সুপুষ্ট পিলে। কুলির কাজে হাত দিয়ে চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপায় আর নিজের বুদ্ধি ও হিসাবের জোরে সে অনেক ব্যবসা ফেঁদে বসল।

শেষকালের ব্যবসাটিই হ'ল তার কাল। গোবর্দ্ধনের বাড়ীর সামনে একখানা মস্ত লম্বা খোলার ঘর। রোজ সন্ধ্যা ছটার সময় যখন কয়লাখনির চিম্‌নিতে তীক্ষ্ণ সুরে ছুটির বাঁশী বেজে উঠ্‌ত, তখন শ্রান্তক্লান্ত কুলি-মজুরের দল কয়লার গুঁড়ো মেখে ঘামে সারা অঙ্গ ভিজিয়ে পাহাড়ের গায়ের সরু বাঁকা পথগুলি বেয়ে হিন্দি-বাংলা-মেশানো অপূর্ব্ব খিচুড়ী গান গাইতে গাইতে তার সেই ঘরখানায় এসে হাজির হ'ত। পরিবারহীন কুলিরা এইখানেই সন্ধ্যা বেলার আহারটা সেরে যেত; সেইসঙ্গে অল্পবিস্তর মদও খেতে ভুলত না। এই সুযোগে গোবর্দ্ধন কিছু টাকা ক'রে নিচ্ছিল। কিন্তু বিধি এবার বাম। লোককে মাতাল করতে গিয়ে নিজেও মদ ধরে গোবর্দ্ধনও রীতিমত মাতাল হ'য়ে উঠ্‌ল। এখন সে গ্রামের লোকের কল্যাণে মাতাল গোব্‌রা নামেই সুবিখ্যাত।

গোবর্দ্ধনের পতন সুরু হ'ল বটে, কিন্তু গ্রাম বেড়েই চল্‌ল। মানুষ বাড়লেই তাদের সভ্য করবার জন্যে একদল লোক জুটে যায়; কোথা থেকে এক খৃষ্টান পাদ্রী এসে একখানা ঘরে গির্জ্জা খুলে বসল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ মদ খেয়ে একসঙ্গে মাতলামি করে, ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন গালাগালি মারামারি করেই কাটায়, এদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা দরকার। কাজেই পাদ্রীমশায় প্রতি রবিবার তাদের ধরে লম্বা লম্বা উপদেশ দিতে লাগলেন। পরকাল সম্বন্ধেও অনেক ভয় দেখাতে ছাড়লেন না। গ্রামের মাঝখানে একখানা আটচালা ঘরে এক পাঠশালা বস্‌ল। দুঘর খৃষ্টান ভদ্রলোকও গ্রামের অধিবাসী হলেন।

পাঠশালার তরুণ শিক্ষকটির নাম ছিল নবীন। কিন্তু পোড়োর দল তাকে মাষ্টার বলেই ডাক্‌ত। একদিন রাত্রে পাঠশালার ঘরে মাষ্টার একলাটি বসে এক বোঝা বালি-কাগজের খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। বড় বড় কাঁচা অক্ষরে হিজিবিজি কত কি লেখা; মাষ্টার যথা-সাধ্য সেগুলিকে সভ্য করে তোলবার চেষ্টা কচ্ছেন, এমন সময় দরজার গায়ে আস্তে আস্তে টক্ টক্ করে শব্দ হ'ল। সারাদিন কাকে তাঁর চালের খোলা উল্টে উল্টে অনেক শব্দ করেছে, তাতে তাঁর কাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে যখন অভ্যাগতটি

শিকল ঠক্ ঠক্ করতে লাগল্ তখন তার দিকে না তাকিয়ে আর উপায় কি? ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে, একটা তেলচিটে লাল আঙিয়া গায়ে, এলো-থেলো চুলে একটি ছোট মেয়েকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মাষ্টার প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিলেন। কিন্তু একটু পরেই মনে পড়ল, ঐ ডাগর কালো চোখ দুটি, ঐ রোদে-পোড়া তামাটে মুখখানি, ঐ রুক্ষ ঝাঁকড়া কালো চুলের রাশি, ঐ লাল-ধুলা-মাখা ছোট ছোট হাত-পাগুলি সবই ত' তাঁর পরিচিত। এ ত' গোবর্দ্ধন সরকারের মাতৃহীনা কন্যা ময়না।

ময়নাকে সে গ্রামের সবাই চিন্‌ত। গ্রামের চারি প্রান্তে এমন কোনো স্থান ছিল না, যা তার অগম্য। মাষ্টার ভাবলেন "এমন সময় ময়নার এখানে কি দরকার?" ময়না ভয়ানক দুর্দ্দান্ত মেয়ে। কার সাধ্য তাকে পোষ মানিয়ে নরম করে রাখে। ময়নার বাবার দুর্ব্বল চরিত্র আর রণচণ্ডী ময়নার খেয়াল পাগলামি ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব গ্রামে প্রায় প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ময়না পাঠশালার ছেলেদের সঙ্গে সমানে মারামারি আর কুস্তি করত; উপরি তাদের নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেও ছাড়ত না। কাঠুরিয়া শালবনে কাঠ কাট্‌তে গেলে ময়না তাদেরও সঙ্গী। কত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে মাষ্টার ময়নাকে খালি পায়ে খালি মাথায় তপ্ত বালির চরের উপরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। নদীর ধারে কুলিদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বাঁধা। ময়নার শুক্‌নো মুখখানি দেখে অনেক সময় সেখানকার মেয়েরা তার ক্ষুধা পিপাসা দূর করবার চেষ্টা করত। এই-সব যেচে-দেওয়া দানেই ময়নার নিরুদ্দেশ যাত্রার সময়কার সমস্ত অভাব দূর হ'ত। এর বেশী দয়াও যে ময়নাকে কেউ কোনো দিন করেনি তা নয়। এই দুরন্ত বুনো ময়নাটিকে মানুষ নামের যোগ্য করে তোলবার ইচ্ছায় পাদ্রী মহাশয় কুলিদের হোটেলে তার একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ময়না কি বাগ মানবার মেয়ে? একটু রাগ হলেই সে হোটেলওয়ালাকে ঘটী বাটি ছুড়ে মারতে সুরু করে দিত, কেউ কিছু ঠাট্টা করলে তারও নিস্তার ছিল না। আর নীতি-বিদ্যালয়ে গিয়ে সে এমন বিদ্রোহ বাধিয়ে বসল যে ক্ষমা-ধর্ম্মের প্রচারক খৃষ্টীয় পাদ্রীকেও অক্ষমার শরণ নিতে হ'ল। ময়নার উৎপাতে ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড় আস্ত থাকবার জো ছিল না, আর নীতিশিক্ষা যা হ'ত তা' ত বলাই বাহুল্য। কাজেই পাদ্রী মহাশয় তাকে প্রায় কান ধরেই বা'র করে দিলেন। তার ছেঁড়া কাপড়, জটবাঁধা চুল আর ক্ষতবিক্ষত পা দুখানি দেখলেই তার স্বভাব আর কীর্ত্তিকলাপের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নাকে দেখে মাষ্টারের একটু দয়া হ'ল। তার ঝক্‌ঝকে কালো চোখের নির্ভীক দৃষ্টি তাঁর মনে একটু শ্রদ্ধারও উদ্রেক করে তুললে।

মাষ্টারের মুখের উপর চোখ রেখে ময়না নির্ভয়ে গড়-গড় করে অনেকগুলো কথা বলে গেল—"তুমি একলা আছ বলেই আমি এখন এলাম। তোমার পোড়োগুলো থাক্‌লে আমার একটুও আস্‌তে ইচ্ছে করে না। ও-গুলোকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। আচ্ছা, তুমি এখানে পাঠশাল কর, না? আমিও এখানে পড়ব।"

ময়নার কাপড় চোপড় আর চেহারা দেখে লোকের মনে দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। তার উপর দু ফোঁটা চোখের জল ফেললে ত' কথাই নেই; তবে ওতে মনটা নরম হওয়া ছাড়া আর বড় বেশী কিছু হ'ত না। কিন্তু ময়নার রুদ্র মূর্ত্তিই কোন্ ফাঁকে মাষ্টারের মনে শ্রদ্ধাকে ডেকে আন্‌লে। বিচার করে দেখলে হয়ত লোকে বলত এখানে শ্রদ্ধা করা উচিত নয়। কিন্তু মন জিনিষটাকে মোটেই ভাল বিচারক বলা চলে না। কোনোখানে নূতনত্বের খোঁজ পেলেই তার চিরনবীন প্রাণ আপনার অজ্ঞাতেই আপনার শ্রদ্ধাটুকু সেখানে সঁপে বসে।

কপাটের শিকলের ভিতর আঙ্‌লগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে মাষ্টারের অনিমেষ দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রেখে ময়না তখনও একটানা নদীর স্রোতের মত বকে চলেছে,—"আমার নাম হ'ল গে ময়না, ময়না সুন্দরী দাসী। সত্যি বলচি, মা কালীর দিব্যি আমার নাম ময়না। আর বাবার নাম গোবর্দ্ধন সরকার, ঐ যে গো সেই মাতাল বুড়োটা, গোব্‌রা, গোব্‌রা, বুঝেছ এবার? ময়না দাসী, মনে থাকবে ত নামটা? আমি পাঠশালে নেকাপড়া করতে আসব।"

মাষ্টার বল্লেন, "তা' বেশ ত!"

ময়নাকে রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে সকলে তার সব কাজেই বাধা দিত, সব কথাতেই অমত করে বস্‌ত।

এমন কি অনেক সময় বেশ নির্দ্দয় ব্যবহার পর্য্যন্ত করত। তারও যে একটা হৃদয় আছে, সেটা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। সেই থেকে বাধা পাওয়াটাই ময়নার কাছে একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হ'ত। এখন মাষ্টারকে অমন সহজে তার কথায় সায় দিতে দেখে সে ত' অবাক্। কথা বলা থামিয়ে নিজের এক গোছা চুল নিয়ে সে নিঃশব্দে আঙুলে জড়াতে লাগ্‌ল। প্রথমে সে দাঁত দিয়ে শক্ত করে ঠোঁটটা চেপে দাঁড়িয়ে ছিল, অল্পে অল্পে সে ঠোঁট দু'খানির বাঁধন খুলে কিসের আবেগে যেন একটু কেঁপে উঠল। ময়নার দৃষ্টি ক্রমে নেমে এসে পড়ল তার পায়ের নখের উপর, এত কালের রোদে-পোড়া তামাটে গাল দুটিরও যেন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠবার চেষ্টা। হঠাৎ মাষ্টারের মাদুর-খানার উপর আছড়ে পড়ে তার যা কান্না "ওগো যমে আমায় ভুলেছে কেন গো।" সে কান্না আর যেন শেষ হবে না। কাঁদতে কাঁদতে ক্রমশঃ সে নিৰ্জ্জীব হয়ে পড়ল। সে কান্না শুনলে মনে হয় তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি দুঃখের ভারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তার কান্নার বিরাম নেই দেখে মাষ্টার তাকে তুলে বসিয়ে নিজেও তার পাশে চুপটি করে বসে রইলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু পরে সে আবার কি সব বলতে সুরু করলে, "আমি লক্ষ্মী মেয়েই হব, আমি ভাল মেয়ে হব, ওগো আমি ত' কিচ্ছু......"

তাকে কথা বলতে শুনে মাষ্টারের সাহস হ'ল, তিনি বল্লেন, "তুমি পাদ্রী সাহেবের ইস্কুল ছেড়ে দিলে কেন?"

ময়না বল্লে, "পাদ্রী আমায় বলে কি না, 'তুমি দুষ্ট বালিকা, পরমেশ্বর তোমাকে ঘৃণা করিবেন।' কেন ও আমায় অমন করে বলবে? আমাকে ওর পরমেশ্বর দেখ্‌তে পারেন না, আমি কেন সেখানে যাব? কখ্‌নো যাব না। কালী মাঈর দিব্যি যাব না, যীশুর দিব্যি যাব না। যে আমায় ঘেন্না করে তার কাছে আমি যাই না।"

"এমনি করে তুমি তাঁকে বলেছিলে?"

"হ্যাঁ, বলেছিলুম না ত' কি?"

ময়নার কথা শুনে মাষ্টার হেসে উঠ্‌লেন। বাইরে তখন শাল গাছের সারির ভিতর দিয়ে ক্রুদ্ধ পবন সাঁ সাঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছিল; এমন সময়ে ছোট খোলার ঘর-খানায় নবীনচন্দ্রের প্রাণ-খোলা অট্টহাসিটা বড় বেখাপ্পা শোনাল। তখনই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি হাসির ভুলটা সেরে নিলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাষ্টার ময়নার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

ময়নার মুখ চোখ ফেটে কথাগুলো ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে পড়তে চায়। তার বাবা? বাবা আবার কে? সে ওর জন্যে কবে কি করেছে? কার জন্যে পাড়ার মেয়ে-গুলো ময়নাকে অমন করে নাক সিঁটকোয়? পথ চলতে দেখ্‌লে লক্ষ্মীছাড়ীরা "ঐরে গোব্‌রা মাতালের মেয়ে" বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে। বলতে বলতে ময়নার শোক উছ্‌লে উঠল; "ওগো মাগো! আমি কেন মরি না গো! ওগো যম কি পথ ভুলে গেছে। সবাই মরে কেবল আমিই মরি না। আমি এখ্‌খুনি মরব, এখ্‌খুনি মরব।" বলে ময়না মেজেয় মাথা খুঁড়তে লাগল। তার কান্না আর থামে না।

শিশুর মুখে অমন অস্বাভাবিক কথা শুনে মাষ্টার তাকে আর সকলেরই মত করে বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু তার ছিন্ন বেশ আর মাতাল পিতার মূর্ত্তিটি তোমার আমার মত তিনি ভুলে যাননি। ময়নার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে মাষ্টারের, সে কত কথা! তারপর তাকে ধরে তুলে, কাপড় জামা ঝেড়ে, চুলগুলি চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে কাল পাঠশালায় আসতে বলে দিলেন। গ্রাম্য পথের অনেকখানি পর্য্যন্ত ময়নার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে মাষ্টার তাকে বিদায় দিলেন। তাদের সামনের সরু পথটিতে তখন চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ময়না চলে গেল; মাষ্টার তার দিকে তাকিয়েই আছেন। মেয়েটি মাথা নীচু করে চলতে চলতে মনসা-কাঁটার বেড়া-দেওয়া খ্রীষ্টের গোরস্থানের পাশের পথে এসে পড়ল, সেইখানে পথটি বেঁকে পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে। ময়না বাঁকের কাছে একবারটি দাঁড়াল। আকাশের গায়ে কত উঁচুতে তখন শান্ত তারাগুলি জ্বলছে আর নীচে ঐ ছোট্ট মেয়েটি বেদনার ছায়ামূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে। মোড় ফিরতেই ময়না অদৃশ্য হয়ে গেল, মাষ্টারও আপন কাজে পাঠশালায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর মন আর কাজে ভিড়ছে না। তাঁর ঝাপসা চোখে বালি-কাগজের

খাতার উপর ছেলেদের টানা আঁকা বাঁকা লাইনগুলি সারিসারি সীমাহীন গ্রাম্যপথ হয়ে উঠল, কত বিষণ্ণ শিশু-মূর্ত্তি কাঁদতে কাঁদতে তারই উপর দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পাঠশালার আটচালা ক্রমশঃ এমনি নির্জ্জন ঠেকতে লাগল যে মাষ্টার সহ্য করতে না পেরে দরজা বন্ধ করে বাড়ী চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ময়না পাঠশালায় হাজির। আজ তার মুখখানি একটু ধোয়া মোছা, চিরুণির সঙ্গে যুদ্ধ করে চুলগুলিও খানিকটা বাগে এসেছে। চোখে আজও মাঝে মাঝে আগুনের হলকা দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু ব্যবহারটা অনেক ধীর ও শান্ত হয়ে এসেছে।

নূতন ছাত্রী ময়না এসে মাষ্টারের জীবনের ধারা যেন একটু বদলে গেল। এ ছাত্রীটি মাষ্টারকে ঠিক তার আসনটি দেয় না। তার দাবীও বেশী, অত্যাচারও বেশী। কাজেই মাষ্টার আর ছাত্রী দু-জনকেই অনেক পরীক্ষা আর স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে চলতে হয়। ফলে দুজনের মধ্যে একটা বিশ্বাস ও মমতার যোগ স্থাপিত হল। মাষ্টারের সাম্‌নে ময়না খুবই বাধ্য, কিন্তু একটু অবজ্ঞা কি অবহেলা কল্পনা করেই সে আড়ালে মহা অনর্থ বাধিয়ে তুলত। মাঝে মাঝে ময়নাকে জ্বালাতন করতে গিয়ে যুদ্ধে তার কাছে হার মেনে দুর্দ্দান্ত ছাত্ররা সমস্ত মুখে নখের আঁচড় আর সারা অঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন কাপড় জামা পরে কাঁপতে কাঁপতে ময়নার নামে মাষ্টারের কাছে নালিশ করতে আসত। তখন সে বেচারার মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায়। ময়নার অত্যাচারে লোকে সেই পাঠশালায় আর ছেলেমেয়ে পাঠাতেও ভয় পেতে লাগল। যাদের সে ভাবনা নেই, তাদের কথার সুর একটু অন্য রকম। তারা বলে, "আহা তবু ত নবীন মাষ্টার মেয়েটার একটা গতি করে দিলে!" তাদের ধন্যবাদে তরুণ মাষ্টারের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

সেই জ্যোৎস্নারাত্রির প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে মাষ্টারের প্রভাবে ময়নার অতীত জীবনটা ক্রমশঃ ছায়ার মত মিলিয়ে আস্‌তে লাগল। পাদ্রীর মত ধর্ম্মশিক্ষা দেবার চেষ্টা তিনি একদিনও করেননি। পড়ার বইএর মধ্যে কোনো কোনো কথা পড়ে কখনো কখনো আপনিই তার চোখ জলে ভরে আসত। সে অশ্রু মানুষের উপদেশে ফোটান নয়।

২

প্রথম পরিচয়ের তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যা বেলা মাষ্টার খাতাপত্র নিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় সেই-দিনকার মত কপাটে ঠক্‌ঠক্‌ করে শব্দ করে ময়না এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। সেই উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি আর লম্বা লম্বা কালো চুলগুলি না থাকলে আজকার ময়নাকে সেই আগেকার ময়নার ছায়া বলেও কেউ ভুল করত না। সে এসে বল্‌লে, "আজকে বুঝি তোমার অনেক কাজ রয়েছে?" উত্তর পাবার আগেই আবার বল্‌লে "আমার সঙ্গে একবার আস্‌বে?" মাষ্টার শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে আগেকার মত মাথা দুলিয়ে জোর দিয়ে বলে উঠল, "তবে শীগগির উঠে এস।"

দুজনে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে?" সে বললে, "আমার বাবাকে দেখতে।"

আজ প্রথম ময়নার মুখে বাবা কথাটি শোনা গেল। এতদিন সে "সেই বুড়োটা" "গোবর্দ্ধনসরকার" "গোবরা" প্রভৃতি নামেই কাজ চালাত। তিন মাসের মধ্যে আজই সে প্রথম বাবার কথা পাড়লে; মাষ্টার জান্‌তেন ঐ বিষয়টা এড়িয়ে চলতে ময়নার খুব চেষ্টা। তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা জেনে মাষ্টার নীরবে ময়নার পিছন পিছন চল্লেন। মাষ্টারের হাতখানি ধরে ময়না কত খাদে খোয়াইয়ে, কত ঝোড়ে ঝোপে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বাইরের কোনো কথাই আর তখন তার মনে ছিলনা, শুধু এই খুঁজে বেড়ানর ব্যাপারটাই তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল। মাঝখানে শুক্‌নো খড় পাতার আগুন জেলে এক জায়গায় কতকগুলো কুলি আগুন পোয়াচ্ছিল, ময়নাকে চিন্‌তে পেয়ে তারা তাকে নাচতে গাইতে অনুরোধ করলে, একজন মদ খাওয়াবারও চেষ্টা করলে, কিন্তু ময়নার সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। কোথাও দু'একটা লোক মাষ্টারকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে। একটি ঘণ্টা কেটে গেল এমনি করে। কত জায়গায় ঘুরে ফিরেও সন্ধান না পেয়ে তখন তারা

একটা খাদের ধার দিয়ে ফিরে আস্তে লাগল। হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দূরে কিসের যেন একটা শব্দ হল। গাছপালা আর পাহাড়ের ঢিবির গায়ে লেগে শব্দের প্রতিধ্বনিও কয়েকবার দম্ দম্ শব্দ করে উঠল। নদীর ধারের কুকুরগুলো শব্দ শুনে মহা ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলে। এদিকে ওদিকে কয়েকটি আলোও যেন ছুটোছুটি করে চলে গেল। তাদের খুব কাছেই একটি ছোট নদী। ঝুপ্ঝুপ্ করে কয়েকখানা পাথর পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়ল সেই নদীর জলে। শালবনের ভিতর দিয়ে একটা দম্কা হাওয়া হাহা করে বয়ে গেল, যেন ক্ষ্যাপার কান্না। তারপর সব নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা আরও নিবিড়, আরও গভীর, আরও ভীষণ। ময়নাকে সাহস দেবার জন্যে মাষ্টার ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু ময়না ত নেই। কোথায় উড়ে গেল? ভয় পেয়ে মাষ্টার নদীর ধার দিয়ে খানা খন্দ ডিঙিয়ে ছুটে চল্লেন। গ্রামের শেষে গোরস্থানের ধারের সেই পাহাড়ের কাছে থেমে দেখলেন, ঐ যে পাহাড়ের উপর দিয়ে পাখীর ডানার মত আঁচলখানি উড়িয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ময়না ছুটে চলেছে।

পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে দেখলেন এক জায়গায় কয়েকটা আলো আর মানুষের ছায়া নড়ছে। একদল লোক ম্লান বিমর্ষ মুখে বসে আছে। শোনা গেল, একজন বলছে, "লোকটা মদ খেয়ে সব উড়িয়ে, ধারে মাথার চুলটি অবধি বিকিয়ে দিয়েছে। কটা পয়সা পাবার জন্যে জুয়া খেলে পয়সা ত একটাও মিল্ল না, উপরি হেরে গিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হ'ল। শেষকালে কিনা এই পরিণাম!" মাষ্টার হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবামাত্র ময়না তাদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে একটা গর্ত্তের কাছে টেনে নিয়ে চলল। ময়নার মুখখানা একেবারে শাদা! তাতে রক্তের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তার পাগলামি আজ কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যার আগমনের অপেক্ষায় সে ছিল, তার আবির্ভাব হয়েছে। আজ তার দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছে, সে আজ মুক্তি পেয়েছে। গর্ত্তের কাছে গিয়ে মেয়েটি একটা ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপের মত কি দেখিয়ে দিলে। মাষ্টার ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, গোবর্দ্ধন সরকার একটা পিস্তল হাতে করে পড়ে আছে। তার শরীরটা একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।

৩

শিকলকাটা ময়না এখন আগেকার তুলনায় অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। শোকই তাকে ক্রমশ জগতের অন্য পাঁচ জনের মত করে তোলবার চেষ্টা করছিল। তার বাবার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন রাখবার জন্যে মাষ্টার নিজ খরচে গোবর্দ্ধন সরকারের নামে তার চিতাভস্মের উপর একটি সমাধি করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা বেলা সেদিক দিয়ে বেড়াতে গেলে মাষ্টার প্রায়ই দেখতেন সমাধির উপর বনফুলের মালা সাজান রয়েছে। একটি ছোট মাটির প্রদীপও মাঝে মাঝে জলতে দেখা যেত। ফুলের মালাগুলিতে পাশাপাশি ধুতরা, আকন্দ, চাঁপা, কাঠ-গোলাপ সবই থাকৃত। মধু আর বিষের এই গলাগলি দেখে তরুণের মনে কি একটা বেদনা জেগে উঠ্ত।

সেদিন ভারি গরম। বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাষ্টার দেখ্লেন, বনের ঠিক মাঝখানটিতে একটা ঝুঁকে-পড়া গাছের ডালের উপর ময়না বনলক্ষ্মীর কোলের শিশুটির মত বসে আছে। তার কোলে রাজ্যের ঘাস পাতা, কচি কচি শালের পল্লব, বুনো ফুল ফল, আরও কত কি! মুখ নীচু করে ময়না গুনগুন করে একটা সাঁওতালী গান গাচ্ছিল। দূর থেকে মাষ্টারকে দেখে সে একটু সরে বসে তার অপূর্ব্ব সিংহাসনে বন্ধুর জন্যে জায়গা করে দিলে। অতিথিসৎকার হ'ল বুনো কেশুর আর ফল দিয়ে। তার আগ্রহ আর আড়ম্বর দেখে কে! তার কোলে নানা রকম বিষাক্ত ফুল দেখে মাষ্টারের বড় ভয় হ'ল। তিনি বল্লেন তাঁর ছাত্রী হতে হলে সে ওসব ছুঁতে পাবে না। ময়না সেগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনও সে ছোঁবে না।

ময়না একটু সভ্য ভব্য হয়ে উঠ্লে অনেক সদয়-হৃদয়া গৃহিণীই তাকে ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি হলেন। তাদের মধ্যে দাসগৃহিণীর সকলের থেকে বেশী সুনাম। ভদ্রমহিলা খৃষ্টান। কাজেই ময়নার মত কুড়োনো মেয়ের সেই বাড়ীতেই একটু স্বচ্ছন্দে থাকা সম্ভব। আদব-কায়দা ও রীতিনীতির বিষয়ে দাসগিন্নি ছিলেন কিন্তু খুব

কড়া। নানা রকম রীতিনীতির দড়াদড়ি দিয়ে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে কতশত সাধ্যসাধনার পর তিনি যখন প্রকৃতি দেবীর সকল ছাপই নিজের মন থেকে অনেকটা উঠিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন তখনই তিনি খুসী হয়ে বলেছিলেন, "এতদিনে স্বর্গের পথে এক পা বাড়ানর আশা হল।" কিন্তু এত করেও তাঁর ক্ষুদ্র "সংস্করণ"গুলি অনেক পরিমাণে উচ্ছৃঙ্খল রয়েই গিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে প্রকৃতি ছেলেদের পেয়ে বস্‌লেন। দাসগিন্নির ছেলেবেলার যত অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাঁর হৃদয়ে ঢোকবার রাস্তা না পেয়ে, সেই কড়া পাহারার পথ এড়িয়ে কোন্ সুযোগে খিড়কীর দরজা দিয়ে ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ল। এত ছেঁটে কেটেও দাসগিন্নি তাঁর ঘরখানিকে সুন্দর ফুলের বাগান করে তুলতে পারলেন না। সৌখীন বাবুদের কেয়ারি-করা ফুলের বাগানের মত সারাক্ষণই এক রকম রূপ ধরে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকবার মত ছেলেমেয়ে তাঁর নয়। বুনো ফুলের মত নানাভাবে অজস্ররূপে ফুটে ওঠাই ছিল তাদের স্বভাব। খোকা, নরু, ফুলু, রাজু কেউই মায়ের মনের মতন হয়নি। এক কেবল নগেন্দ্রনন্দিনী ওরফে নগুই তাঁর আদর্শ-মত গড়ে উঠেছিল। সেই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। নগুর বয়স তের চোদ্দ হবে। সে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত শিষ্ট। হাসি ঠাট্টা জানে না, কখনও মার কথার অবাধ্য হয় না।

এই বাড়ীতে মাষ্টার ময়নার স্থান করে দিলেন। দাস-গিন্নির একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, নগুই ময়নার আদর্শ। ময়না দুষ্টুমি করলে গৃহিণী তার কাছে নগুর গুণাবলীর অনেক ব্যাখ্যা সুরু করে দিতেন। ময়না অনুতপ্ত হলেও গৃহিণী নগুরই আদর্শ তার চোখের সাম্‌নে খাড়া করে তুলতেন। একদিন শোনা গেল ময়না ও গ্রামের আর-সব ছেলে-মেয়েদের আদর্শরূপে পাঠশালায় শোভা পাবার জন্যে নগু নেহাৎ অনুগ্রহ করে তরুণ মাষ্টারের ছোট্ট বিদ্যালয়টিতে আসছে। তিনি একান্ত বাধিত হয়ে নগুকে ভর্ত্তি করে নিলেন। কিন্তু নূতন ছাত্রীটির কল্যাণে তাঁর কাজ অনেক বেড়ে গেল। যখন-তখনই তার কলম ভেঙে যায়, মাষ্টার না কেটে দিলে হয় না। খাতা ছিঁড়েও অহরহই যাচ্ছে, সেটাও মাষ্টারকেই সেলাই করে দিতে হয়। হাতের লেখা কি অঙ্কের খাতা দেখে দেবার সময় নগু প্রায় মাষ্টারের পিঠের উপর পড়ে অন্য সকলকে আড়াল করে রাখে। তার একরাশ কালো কোঁকড়া চুল রেশমের পর্দ্দার মতন মাষ্টারের মুখের সাম্‌নে এলিয়ে পড়ে' মাষ্টারকে তার একলার সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। পাঠশালায় কোন জিনিষ ফেলে গেলে মাষ্টার না খুঁজে দিলে নগু কিছুতেই সেটা খুঁজে পায় না। তরুণ মাষ্টারও মাঝে মাঝে ছাত্রীকে খুসী করবার জন্যে তার কাজে একটু বেশী নজর দিতেন। একদিন সন্ধ্যায় মাষ্টার নগুর কি একটা জিনিষের খোঁজ করতে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। সেদিন নগুর সঙ্গে তাঁর অনেক গল্পগাছাও হয়েছিল। লোকে দেখে মনে করেছিল মাষ্টার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বুঝি নগুকেই সব চেয়ে বেশী পছন্দ করেন।

তার পরদিন সকাল বেলা ময়না পাঠশালে এল না। বেলা বেড়ে চলল, দুপুর হ'ল, কিন্তু ময়নার দেখা নেই। নগুকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল, তারা দুজনে এক-সঙ্গেই ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু ময়না একগুঁয়েমি করে অন্য পথে চলে গেল। সন্ধ্যা হ'ল, তবু ময়না এল না। মাষ্টার দাসগিন্নির কাছে খোঁজ করতে গেলেন, বেচারী ত' শুনে ভয়ে অস্থির। দাস-মহাশয় ব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও ময়নার কোনো খোঁজ পাননি। নরু রাজুরাও কিছু জানে না। দাসগিন্নি বল্লেন "তবে বুঝি মেয়েটা জলে ডুবে গেছে! ওমা গো কি হবে! পাঁকে কাদায় যে সারা অঙ্গ ভরে যাবে, গোর দেবার সময় কি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব?" মাষ্টার বিষণ্ন মনে পাঠশালায় ফিরে এলেন। আলো জেলে মাদুরের উপর চুপ্‌টি করে বস্‌তে গিয়ে দেখলেন এক-টুক্‌রো ছেঁড়া কাগজে ময়নার হাতের আঁকা বাঁকা অক্ষরে তাঁরই নাম লেখা রয়েছে। কাগজখানা অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা, খুব সযত্নে মোড়া ও ভাত দিয়ে ভাল করে আট্‌কান; পাছে কোনো লোকে তার ভিতরের লুকোনো কথাগুলি জেনে ফেলে সেই ভয়ে উল্টা পিঠে বড় বড় করে লেখা "মালীক ভিন্ন অন্ন কেহ খুলীবে না।" আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে চিঠিখানা খুলে মাষ্টার পড়তে আরম্ভ করলেন:—

সত কোটি প্রণাম পুঃরসঃর নিবেদন, পরে, মাষ্টার মশায় তুমি চিঠিটা পড়বার অনেক আগেই আমি এদেষ থেকে পালিয়ে যাব। আর কোনো দিনও ফিরে আস্‌ব না। কোনো দিনও না, আর একবারটিও না। আমার ফকির-মালাগুলো জানকিয়াক্কে দিতে চাও ত দিয়ে দিও, আমার মাত্রিস্নেহর ছবিখানা শৈলিকে দিও। কিন্তু নগিকে কিচ্ছু দিও না। খবদ্দার কিচ্ছু দিও না বলে রাখ্‌ছি। আমার তাকে কেমন লাগে জানো? দেখলে দু চখ্‌খু জোলে যায়। আজ আর কিছু লিখ্‌ব না। ইতি

শেবিকা শ্রীমতি ময়নাসুন্দরী দাসী।

চিঠিখানা হাতে করে বসে মাষ্টার কত কি ভাবতে লাগলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ কালো পাহাড়ের পিছন থেকে তার চক্‌চকে মুখখানি বার করে পাঠশালার সরু পথটি আলো করে দিলে। দিনের বেলা এই পথের উপর দিয়ে কত চাঁদের মত খোকা খুকী তাদের ফুলের মত পা ফেলে পাঠশালায় এসেছিল, মাষ্টারের বোধ হয় তাও মনে পড়ছিল। আর কিছুক্ষণ ভেবে তিনি যেন একটা কিনারা পেলেন। চিঠিখানাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে পথে উড়িয়ে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা কাক কোকিল ডাকবার আগেই মাষ্টার শালবনের ভিতর দিয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলেছেন; খস্‌ খস্‌ শব্দে দুটো-একটা শেয়াল দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল; কাকগুলো দিনের আলোর দেখা পেয়ে কোলাহল করতে করতে বাসা ছেড়ে উড়ে বেরুলো। অনেক দিন আগে যে ঘন বনের মধ্যে গাছের ডালে পাখীর মতন ময়নাকে বসে থাকতে দেখেছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে মাষ্টার সেইখানে এসে হাজির। সেই নুয়ে-পড়া গাছের ডালটি আজও তেমনই রয়েছে, তার উপরে কচি পাতার ছাতাটিও মেলা আছে, কিন্তু সিংহাসন আজ খালি। যুবক আর একটু এগিয়ে আস্‌তেই ভীরু বন্য পশুর মত কে যেন গাছপালার মধ্যে চম্‌কে ছুটে পালাল। ঝুঁকেপড়া গাছের ডালপালা ছিঁড়তে ছিঁড়তে শুকনো পাতার উপর দিয়ে মড়মড় শব্দ করে সে কোন্‌ এক ঝোপের কোলে লুকোল। মাষ্টার কাছে গিয়ে গাছের ডালপালার ঘন বুনুনির ভিতর কি মারতেই পলাতক ময়নার কালো চোখের উপর নজর পড়ল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল, কারুর মুখেই কথা নেই। শেষকালে ময়নাই তাদের নীরব আলাপের শেষ করলে। কোনো ভূমিকা না করেই সে বলে উঠল, "তোমার কি চাই?"

অভিনয়ের পালাটা মাষ্টার আগেই মুখস্থ করে এসেছিলেন, অত্যন্ত নরম স্বরে বল্লেন, "গোটা কয়েক কুল আর কেঁন্তুর।"

"সে-সব পাবে-টাবে না। চলে যাও এখান থেকে। ন্‌গেন্দ্রনন্দ্রিনীর কাছে নাওনা গিয়ে দুষ্টু কোথাকার।" রাগের চোটে নগেন্দ্রনন্দিনীর নামে জোর দিতে গিয়ে ময়না অনেকগুলো রফলা জুড়ে দিয়েছিল।

"মইনু, আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, কাল থেকে কিছু খাইনি। ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি।" এই বলে তরুণ মাষ্টার ক্লান্ত শরীরে গাছের উপর হেলে পড়লেন।

এইবার ময়নার মনটা একটু নরম হল। অনেক দিন আগে সে যখন ভবঘুরের মত পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত, সেই দুঃখের দিনের কথা মনে করে মাষ্টারের কল্পিত এই বেদনাটা সে বুঝলে। তাই অমন বুক ভাঙা করুণ স্বরে ময়না একটু বিচলিত হ'ল। তার সন্দেহটা কিন্তু তখনও একেবারে ঘোচেনি। সে বল্‌লে "ঐ গাছের গোড়াটায় খুঁড়ে দেখ, অনেক পাবে এখন; কিন্তু কাউকে বোলো না যেন।" ময়নার ভাঁড়ারের চোরের অভাব ছিল না।

মাষ্টার মশায় যে কিছু খুঁজে পেলেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্ষুধায় বোধ হয় তাঁর সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ময়নার বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। শেষকালে আর স্থির থাক্‌তে না পেরে পাতার ঝোপের ভিতর থেকে পাখীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে "আচ্ছা, আমি যদি নীচে নেমে তোমায় গোটা কয়েক ফল পাকুড় বের করে দি, তাহ'লে আমায় ছোঁবে না তুমি?" মাষ্টার তৎক্ষণাৎ রাজি। ময়না বললে, "যে আমায় ছোঁবে, সে যমের বাড়ী যাবে।"

চুক্তিভঙ্গের ফলে মাষ্টার ইহজগৎ ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন ময়না ঝপ করে গাছের

উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। এইবার কিছুক্ষণ নীরব ভক্ষণের পালা। একটু পরেই ময়না পাকা গিন্নির মত বিজ্ঞভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?" মাষ্টার তখনই আরোগ্য লাভের লক্ষণ দেখাতে সুরু করলেন। তারপর ময়নাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীমুখো হলেন। দু'চার পা যেতে না-যেতেই ময়না তাঁকে এক ডাক দিলে। ময়না যে তাঁকে ডাক্‌বে তা' তিনি আগেই জান্‌তেন; কাজেই ডাকবা মাত্রই ফিরলেন। ময়নার মুখখানা একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছে, তার বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটি জলে টলটল করছে। মাষ্টার তার কাছে গিয়ে ছোট দুখানি হাত ধরে তার সজল চোখের দিকে চেয়ে বল্লেন, "মইনু, সেই যেদিন তুমি প্রথম আমাকে দেখ্‌তে এসেছিলে, সেই সন্ধ্যেবেলার কথা মনে পড়ে কি?" হ্যাঁ, ময়নার সে কথা খুবই মনে আছে। "তুমি পাঠশালে পড়তে পার কি না আমায় জিজ্ঞেস করলে, তুমি বলেছিলে লেখাপড়া শিখবে, ভাল মেয়ে হবে, তাই আমি বল্লাম • • • • •"

ময়না তাড়াতাড়ি বললে "থাক, থাক।"

যুবক বললেন, "আজ যদি তোমার মাষ্টার এসে বলে যে তার সেই ছোট্ট ছাত্রীটিকে নইলে একলাটি তার দিন কাটে না, সেই ক্ষুদে মেয়েটি এসে তাকে ভাল হ'তে না শেখালে কিছুতেই চল্‌বে না, তাহ'লে তুমি তাকে কি বল?"

মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে রইল। মাষ্টারও তার উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে রইলেন। একটা খরগোষ ছুটে এসে তার নরম-নরম দুটি পা তুলে ঝক্‌ঝকে চোখ দুটি মেলে ঐ দুটি নীরব মানুষের দিকে চেয়ে রইল। একটা কাঠবিড়ালী সেই পোড়ো গাছটা বেয়ে খানিকটা ছুটে এসে সেইখানেই থেমে তার ল্যাজটি উল্টে পিঠে বুলাতে লাগল। মাষ্টার চুপিচুপি বল্লেন, "মইনু, সবাই যে তোমার জন্যে বসে।" মইনু একটু মিষ্টি হাসি হাস্‌লে। দখিন হাওয়া সেই সময় গাছের মাথায় মাথায় একটা কাঁপন দিয়ে গেল, ঘন ডালের ফাঁক দিয়ে একটি আলোর রেখা এসে সেই অস্থিরচিত্ত ছোট মানুষটির ঠিক মুখের উপর পড়ল। হঠাৎ ঝট্ করে উঠে ময়না মাষ্টারের হাতখানা ধরলে। কি একটা কথাও বল্‌লে কিন্তু বোঝা গেল না। তার কালো চুলগুলি কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে মাষ্টার একটি চুম্বন করলেন। তারপর বনের ম্লান আলো ও ভিজে মাটির গন্ধ পিছনে রেখে দুজনে খোলা পথের আলোয় বেরিয়ে এলেন।

৩

অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আগের তুলনায় অনেকটা ভাল ব্যবহার করলেও নগেন্দ্রনন্দিনীর উপর ময়নার বেজায় রাগ। তার সেই হিংসাটুকু বোধ হয় তখনও নিবে যায়নি। নগুর গোলগাল শরীরে চিমটি কাটা বোধ হয় তার বেশী সুখতর বোধ হত। মাষ্টারের চোখের উপর এ রকম শত্রুতার ততটা সুবিধা না হওয়ায় ময়না এক নূতন পথ আবিষ্কার করলে।

ময়নাকে প্রথম দেখে তার পুতুল-টুতুল থাকা সম্ভব বলে মাষ্টারের মনে হয়নি। তবে অনেক বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও প্রথমে যা মনে করেন না, পরে তা দেখ্‌তে পান। কাজেই ময়নারও একটা পুতুল আছে দেখা গেল। তার চেহারাটা ঠিক ময়নারই পুতুল হবার উপযুক্ত। তারই যেন একটি ছোট প্রতিমূর্ত্তি। দাসগিন্নি একদিন হঠাৎ এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেল্লেন। আগেকার দিনে পুতুলটা ছিল ময়নার ভ্রমণের সাথী। তার প্রতি অঙ্গে পুরা কালের কষ্ট সহ্যের অনেক নিদর্শন আঁকা আছে। রোদে জলে তার গায়ের আসল রং অনেককাল উঠে গেছে, তার জায়গায় এখন খানা-ডোবার কাদা লেপা। ময়নাকে আগে যেমন দেখাত, এর চেহারাও অনেকটা সেই রকম। তারই ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের নেকড়া এর কাপড়। ছোট মেয়েদের মতন ময়না কোনোদিন একে আদর করত না। পাঠশালার উঠোনে একটা গাছের কোটরের ভিতর বেচারা সারাদিন একলাটি শুয়ে থাক্‌ত। ময়না একলা বেড়াতে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিত। ঠিক ময়নার মতন তারও কোনো বাবুআনা কি সখের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না।

দাসগৃহিণীর মনে করুণার সঞ্চার হওয়ায় তিনি ময়নাকে একটা নূতন পুতুল কিনে দিলেন। ময়না খুব গম্ভীর ভাবেই সেটা নিলে, কিন্তু মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। পুতুলটার লাল লাল গাল আর নীল নীল চোখ

ঠাউরে দেখতে দেখতে ময়নার একদিন মনে হল, এর সঙ্গে যেন নগুর কিছু সাদৃশ্য আছে। পুতুলটার কপাল-গুণে ময়নার চোখে সেটা ধরা পড়ে যাওয়াতে সে তক্ষণি পুতুলের মোমের মাথাটা পাথরের উপর আছড়ে ভাঙ্‌লে; তারপর তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে যখন-তখন রাস্তা দিয়ে হিঁচ্‌ড়ে বাড়ী থেকে পাঠশালা আর পাঠশালা থেকে বাড়ীতে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতে লাগল। কখনও বা বেচারা নির্দ্দোষীর নিরীহ শরীরে ছুঁচ ফুটিয়ে বসিয়ে রাখত। কুশপুত্তলি পুড়িয়ে লোকে যেমন শত্রুর অমঙ্গল কামনা করে, ময়না এর ওপর দিয়ে সেই রকম কোনো অভিচার করতে চাইত, কি নগুর শ্রেষ্ঠতার আর-একটা নিদর্শন দেখে রাগে ও-রকম করত তা ঠিক বলা যায় না।

ময়নার এই রকম অনেক খেয়াল ছিল বটে কিন্তু গুণও দুটো চারটে ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েদের মত সে কোনো কাজে হাত দিতে ইতস্ততঃ করত না। তার সাহস বড়ই বেশী। সব কাজই সে ঝাঁ করে সরু করে দিত। কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিত বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গে। তবে উত্তরগুলি যে সব সময়েই অভ্রান্ত হত তা বলা চলে না। তবে সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখলে মাষ্টারের মনেও মাঝে মাঝে নিজের বিদ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হত।

ময়না যখন মাষ্টারেরই একলার জিনিষ হয়ে পড়ল, তখন আর তার খেয়াল নিয়ে আমোদ করে কাটান চল্‌ল না। তাকে ভাল ত মাষ্টার খুবই বাসতেন; কিন্তু তাকে মানুষ করে তুলতে হবে ত। এই বিষয়ে অনেক ভেবে চিন্তে মাষ্টার ঠিক্‌ করলেন ময়নাকে বিচার করা তাঁর পক্ষে ঠিক সম্ভব নয়। গ্রামের পাদ্রীর পরামর্শ-মত কাজ করলে বোধ হয় নিরপেক্ষ বিচার হওয়া সম্ভব। পাদ্রীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না; কিন্তু ময়নার মঙ্গলের কথা, বিশেষতঃ তাঁদের পরিচয়ের সন্ধ্যার কথা মনে করে তাঁর এই অপ্রিয় কাজটাও বেশ একটা গৌরবের কাজ বলে মনে হল। সেদিন সন্ধ্যায় ঐ বনের পাখীটি যখন আর কারও কাছে ধরা না দিয়ে স্বেচ্ছায় তাঁরই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল তখন তার ভার ভগবান্‌ নিশ্চয়ই ওই ক্ষুদ্র মানুষটির উপরই দিয়েছিলেন।

পাদ্রী তাঁকে দেখে খুবই খুসী হয়ে উঠলেন। নিজের বাতের ব্যথা প্রভৃতির বিস্তৃত কাহিনী শুনিয়ে তিনি দাস-গৃহিণীর বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁদের কথা তুলেই পাদ্রী-মশায় ঐ আদর্শগৃহিণী আর তাঁর কন্যার শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ করলেন। নগুর প্রশংসা ত তাঁর মুখে ধরে না। মেয়ে বল্‌তে হয় ত ঐ মেয়ে। যেমন তার রূপ তেমনই তার গুণ। মাষ্টার দেখলেন এর পর ময়নার কথা তোলা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। পাদ্রীর মতে বোধ হয় ময়নার নরক ভিন্ন গতি হবে না। অগত্যা মাষ্টার ময়নাকে একান্ত তাঁরই আশ্রিত ভেবে একটা সামান্য ছুতো করে বেরিয়ে পড়লেন। এই সামান্য ঘটনাটি আবার ছাত্রী ও মাষ্টারকে আগেকার মত পরস্পরের খুবই কাছে এনে ফেললে। মাষ্টারের এই ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে ছাত্রী খুবই খুসী হয়ে উঠেছিল। হারানো জিনিষ খুঁজে পেলে লোকে তাকে যেমন চোখে-চোখে রাখে ময়নাও তার গুরুটিকে তেমনি করে ঘিরে রাখলে। আবার এখন খাওয়াদাওয়ার পর আগেকার মতন দুজনে মাঠে মাঠে বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের এই পথ চলার কোনো লক্ষ্য ছিল না। ছুটিতে পথ চলাতেই তাদের আনন্দ।

একদিন চল্‌তে চল্‌তে ময়না হঠাৎ থেমে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর চড়ে বসল। সেখানে বসে মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন তাঁর মনের ভিতর ডুবুরী নামিয়ে খোঁজ আরম্ভ করলে। মাথা নেড়ে কালো চুলগুলি নাচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "আচ্ছা, তুমি পাগল, নয়?" "না।" "তোমার ক্ষিদে পায়নি?" (ময়নার মতে ক্ষুধা রোগটি মানুষকে যখন-তখন পেয়ে বস্‌তে পারে।) "না।" "তার কথা ভাবছ না?" মাষ্টার খুব মিষ্টি সুরে বল্লেন, "কার কথা মইনু?" "সেই কটা মেয়েটার কথা।" (ময়না নিজে কালো বলে নগুকে এই নাম দিয়েছিল।) "না।" "সত্যি বল্‌ছ?" "হাঁ।" 'দিব্যি ক'রে বল।" "আচ্ছা, তোমার দিব্যি বল্‌ছি।" ময়না ছুটে এসে মাষ্টারকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেয়ে আবার পাখীর ডানার মত আঁচল উড়িয়ে ছুটে চলে গেল। এর পর তিন চার দিন ময়না অন্য ছেলে-মেয়েদের মত "ভাল" হয়ে চল্‌তে স্বীকার করেছিল।

৪

এই গ্রামে মাষ্টারী আরম্ভ করবার পর মাষ্টারের দু' বৎসর কেটে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর আয়বৃদ্ধির কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। কাজেই তিনি অন্য জায়গায় যাবার জোগাড় করতে লাগলেন। একথা তিনি তাঁর বন্ধু গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া আর কোনো লোককে বলেননি। আগামী বৎসর বসন্ত কালে তাঁর যাবার কথা; কিন্তু লোকে বড় গোলমাল করে বলে তিনি কথাটা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন; ময়না পাছে শুনে ফেলে সে ভয়টাও ছিল।

ময়নার কথা তিনি সহজে ভাবতে চাইতেন না। তার কথা মনে পড়লে তিনি স্বার্থপরের মত নিজেই নিজেকে অনেক মন-গড়া উত্তর দিতেন। ভাবতেন, ময়নার প্রতি টান, ও কিছু না; ওটা কল্পনা, পাগলামি, বোকামি; আমার থেকে বড় আর দৃঢ়চিত্ত লোকের হাতে পড়লেই বোধ হয় ময়নার ভাল হবে। ময়নার এখন এগার বারো বছর বয়স, আর তিন চার বছর পরে ত' সে বেশ বড়সড়ই হয়ে উঠ্‌বে। তখন ত' আমাকে ভুলেই যাবে; আমি কেন মিথ্যে মায়া বাড়িয়ে নিজের পথ বন্ধ করি!

কর্ত্তব্যের যাতে ত্রুটি না হয় এই মনে করে তিনি ময়নার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল সকলকে এক-একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তার এক মাসি বেহারে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন, তিনিই কেবল তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চিঠির উত্তর দিয়েছেন। চিঠিতে ময়নার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের কোনো উল্লেখ না থাকলেও মাষ্টার মাসির বাড়ী ময়নার কত আদর যত্ন হবে, স্নেহশীলা রমণীর কাছে থাক্‌লে সে কত শান্তশিষ্ট হবে, এইসব অনেক আকাশকুসুম গড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিঠিখানা ময়নাকে পড়ে শোনাতে গিয়ে তাঁর চমক্ ভাঙ্‌ল। চিঠির দিকে সে ফিরেও তাকালে না। চুপ্ করে বসে বসে শুনলে, পড়া হয়ে গেলে কাগজখানা কেটে কয়েকখানা মানুষের আকৃতি করে তার গায়ে "কটা মেয়েটা" লিখে পাঠশালার ঘরের দেয়ালময় লাগিয়ে বেড়ালে।

শীতকাল কেটে গিয়ে বসন্ত দেখা দিল। গাছে গাছে নূতন পাতা, ছোট ছোট কুঁড়ি ও শালবনের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, বসন্তের দূতরূপে, আগেই এসে উপস্থিত। পাহাড়ের গায়ে এক-একটা কাঠ-গোলাপের গাছ ফুলের ভারে হাস্যমুখী বালিকার মত মাথা হেঁট করে আছে। বড় বড় মাঠের দিকে তাকালে আর কোথাও ধূসর রং দেখা যায় না; কে যেন সমস্ত বনে উপবনে মাঠে ঘাটে সবুজ তুলি বুলিয়ে গিয়েছে, এক তিলও ফাঁক নেই। মাঝে মাঝে দুটি চা'রটি ঘাসের ফুল মিট্‌মিট করে চেয়ে আছে। গোরস্থানের গায়ে কালপুরুষ আরো দু' চারটি স্তূপ বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিছু দূরে গোবর্দ্ধনসরকারের সমাধি পড়ে আছে, তারও গায়ে সবুজ শেয়ালা অনেকখানি রং ধরিয়ে দিয়েছে।

শহরে এক সার্কাসের দল এসেছিল; তারা ফিরে যাবার পথে আশেপাশের গ্রামগুলিতে দু' এক দিনের জন্যে আড্ডা গেড়ে গেড়ে যাচ্ছে। ময়নাদের গ্রামও বাদ যায়নি। গ্রামের নবীন দলের মধ্যে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। মাষ্টারের পাঠশালার শিশুগুলি সার্কাস ছাড়া আর কোনো কথাই বলে না। তাদের কাছে জিনিষটা একেবারেই নূতন। মাষ্টার ময়নাকে একদিন সার্কাস দেখাবেন বলেছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ময়না ও মাষ্টার সার্কাসে গিয়েছেন। ঘোড়দৌড়, তারের উপর নাচ, সঙের খেলা সবই হ'ল। মাষ্টার ময়নার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন কোনোটাতেই তার গম্ভীর মুখে হাসির উদ্রেক করতে পারলে না। খেলা শেষ হয়ে গেলে ময়না একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে চোখ দুটি কুঁচ্‌কে ভুরুগুলি নামিয়ে আন্‌লে। তারপর মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বললে "আমায় বাড়ী নিয়ে চল।" কথাটা বলেই ময়না মুখ নীচু করে কি যেন ভাব্‌তে লাগল। মাষ্টার সারা পথ তাকে হাসাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সবই বৃথা। সে দু' হাতে তাঁর হাতখানা ধরে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু মাষ্টার যেন একটু ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। কোনো রকমে ময়নাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই মাষ্টার আপন পথে প্রস্থান করলেন।

এরপর দু তিন দিন ময়না দেরী করে পাঠশালায় আস্‌তে লাগল। তাঁর পথের সম্বল সঙ্গীটির অভাবে সেবারকার শুক্রবারে মাষ্টারের সান্ধ্য ভ্রমণই হ'ল না। বইখাতা গুছিয়ে বাড়ী যাবার জোগাড় করতে করতে

শুনলেন মিহি গলায় কে বল্‌ছে, "দেখুন, মাষ্টার মশায়।" মাষ্টার ফিরে দেখ্‌লেন নরু। ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "কি হে, কি হয়েছে? বলে ফেল শীগ্‌গির করে।"

"দেখুন, আমি আর ভোলা ভাবছিলাম যে ময়না আবার পালিয়ে যাবে।"

অপ্রিয় কথা লোকে যার কাছে শোনে তার উপরই একটু অযথা-ভাবে চটে ওঠে। মাষ্টরও বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "কি সব যা' তা' বক্‌ছ?"

"হ্যাঁ দেখুন, সত্যি বল্‌ছি, ও আজকাল বাড়ী থাকে না; আমি আর ভোলা ওকে সার্কাসওয়ালাদের সঙ্গে কথা বল্‌তে শুনেছি। আজও ওকে তাদের কাছে দেখে এলাম। কাল ও আমাদের বল্লে যে ও সেই মেয়েটার মতন বল নিয়ে তারের উপর নাচ্‌তে পারে; আরো কত সব খেলা আমাদের দেখালে।" তাড়াতাড়ি কথা বল্‌তে বল্‌তে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নরুর প্রায় গলা বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল, সে থেমে গেল।

মাষ্টার বল্লেন, "সার্কাসের কোন্ লোকটার সঙ্গে দেখ্‌লে?"

"ওই যে সেই ঝক্‌ঝকে টুপি-পরা লোকটা। সেই বাবরী চুল। আর সোনার বোতাম পরা আর সোনার চেনও আছে।" ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে অনেক কষ্টে নরু এই কটা কথা বল্‌লে।

মাষ্টারের মনে হ'ল বুকের ভিতর কি একটা যেন শক্ত হয়ে উঠ্‌ছে, বই খাতা ফেলেই তিনি দৌড় দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। নরু ছোট ছোট পা ফেলে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে চলতে খুব চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। পথের মাঝখানে হঠাৎ থেমে মাষ্টার প্রায় নরুর ঘাড়ে পড়বার জোগাড়। আবার কথা সুরু করে মাষ্টার বল্লেন, "তারা কোথায় কথা বলছিল?"

"সেই আটচালার কাছে।"

বড় রাস্তার উপর এসে মাষ্টার দাঁড়ালেন, নরুকে বল্লেন, "যা, ছুটে গিয়ে দেখে আয় ময়না বাড়ী আছে কি না, থাকলে আটচালায় এসে আমাকে বলিস্। না থাকলে আর আস্‌তে হবে না। যা দৌড়ে যা।"

নরুর ছোট পায়ে যত শক্তি ছিল তত জোরে সে দৌড় দিল।

আটচালার কাছে আসতে কতকগুলো লোক হাঁ করে মাষ্টারের দিকে চেয়ে রইল। মাষ্টার পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখটা মুছে ঘরে ঢুকলেন। ঘর বারাণ্ডা চারি ধারে খুঁজেও ময়নার দর্শন পাওয়া গেল না। এক দিকের বারাণ্ডায় একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তার মাথায় জরির টুপি। তার সাজসজ্জা, চুলকাটা দাড়িছাঁটা দেখেই মাষ্টারের ভক্তি চটে গিয়েছিল। লোকটা তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েও চুরুট হাতে করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন কিছুই জানে না। মাষ্টার তার ঠিক সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুজনে চোখোচোখি হ'তেই মাষ্টার আর-একটু কাছে সরে এলেন। কিন্তু কথা বলতে সুরু করতেই গলার ভিতর কি যেন একটা ঠেলে উঠে তাঁর স্বর বন্ধ করে দিচ্ছিল। তাঁর নিজের গলার স্বর শুনে তিনি নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। কেমন যেন ক্ষীণ, ভাঙা, বহু দূরের একটা স্বর। মাষ্টার বললেন, "শুনলাম্ ময়না বলে' আমার পাঠশালার একটি মেয়ে তোমাদের দলে ভর্ত্তি হবার জন্যে তোমার কাছে কি সব বলেছে। সত্যি না কি?"

লোকটা চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে এদিক ওদিক পাইচারি করতে করতে বললে, "যদি বলেই থাকে?"

মাষ্টারের গলার স্বর আবার বন্ধ হয়ে এল, অতি কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার কথা সুরু করলেন, "তুমি যদি মানুষ হও তাহ'লে আমি তার অভিভাবক এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে। তার ভবিষ্যতের জন্য আমিই দায়ী। তুমি যে তাকে কি রকম জীবনের পথে নিয়ে যাচ্ছ তা তুমিও জান, আমিও জানি। মানুষের মত কথা বলতে চাও ত' বল। ওর মা নেই বাপ নেই ভাই বোন ত্রিসংসারে কেউ নেই। তুমি কি তাদের অভাব পূরণ করবে?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসি হাসলে।

মাষ্টার বললেন, "তোমার কাছে অনুরোধ করছি ওকে আর কিছু বোলো না, আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি ওকে......" বলতে বলতে আবার যুবকের গলার স্বর কেঁপে বন্ধ হয়ে এল।

লোকটা কি বুঝল জানি না, একটা চাষাড়ে রকম ঠাট্টা করে বললে "আমার সঙ্গে চালাকি খাটবে না।"

তার কথার চাইতে কথার সুরে, চাহনির ভঙ্গীতে আ

ধরণধারণেই মাষ্টারের বেশী অপমান বোধ হ'ল। লোকটা হেসে দাঁত কটা ঢাক্‌বার আগেই মাষ্টার এতক্ষণের রাগের জ্বালা মিটিয়ে তার মুখের উপর এক ঘুসি মারলেন! জানোয়ারটার মাথার টুপি দশ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়ল, চুরুটটা হাত থেকে ছট্‌কে পাশের একজন লোকের গায়ের চাদরে গিয়ে পড়ল। অত জোরে ঘুসি মারতে গিয়ে মাষ্টারের হাতখানা ত' ফেটে চটে রক্তারক্তি। সার্কাসওয়ালার সখের ছাঁটা দাড়িও কিছু দিনের জন্য একটু নূতন রূপ ধারণ করলে।

কিছুক্ষণ ধরে খুব মারামারি, ঝুটোপুটি, গালাগালি চলল। চারধারে অনেক লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে এসে হাজির। হঠাৎ একদল লোক এসে জরির টুপীধারীকে ঘিরে দাঁড়াল। মাষ্টারের যখন হুঁস হ'ল তখন সেখানে আর প্রায় কেউ নেই। একজন লোক তার বাঁ হাতখানা ধরে দাঁড়িয়ে, ডান হাত দিয়ে তখনও দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু সেই হাতের মুঠির ভিতর একটা ঝক্‌ঝকে ছুরি। কখন যে কে সেখানা তার হাতে দিয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই।

দাসমশায় মাষ্টারের হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাষ্টার আবার ফিরবার চেষ্টা করে ক্ষীণস্বরে বল্‌লে, "ময়না?" দাসমশায় বল্লেন, "সে বাড়ীতে।" পথে যেতে যেতে তিনি বল্লেন যে ময়নাই তাঁকে বাড়ী গিয়ে ডেকে এনেছে; সে গিয়ে বল্লে যে একটা লোক মাষ্টারকে খুন করছে। দাসমশায়ের সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে মাষ্টার পাঠশালার পথে চললেন। কাছাকাছি গিয়ে পাঠশালার দরজা খোলা দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন ময়না। একলা ঘরে ময়নাকে বসে থাকতে দেখে ত' তিনি অবাক।

মাষ্টার স্বভাবতই একটু স্বার্থপর ছিলেন। সার্কাসওয়ালার সেই চাষাড়ে ঠাট্টাটা এখনও মাষ্টারের মনে কাঁটার মত বিঁধে উঠ্‌ছিল। তিনি ভাব্‌ছিলেন ময়নার প্রতি তাঁর ভালবাসাটাকে এমন চোখে দেখা বোধ হয় লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, তা' ছাড়া ময়না ত' স্বেচ্ছায়ই তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা ছেড়ে গিয়েছে। তবে আর তার কথা অত ভেবে কি ফল? এত লোকে যখন ওর আশা ছেড়ে দিলে তখন তাঁরই বা কি দায়? ওকে যে মানুষ করা যাবে না সে ত' দেখাই যাচ্ছে। জগতে কি আর কেউ অনাথ নেই? তাদের মতন করেই না হয় ওরও দিন চলবে। যার জন্যে এত কাণ্ড সে ত' বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছিল। লাভের মধ্যে তাঁর প্রাণটা নিয়ে টানাটানি। লোকে এখন তাঁকে কি বলবে?

এই আত্মচিন্তার সময় ময়নার সঙ্গে দেখা করতেই তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। ঘরে ঢুকে তিনি ময়নাকে বল্লেন, এখন তাঁর অনেক কাজ, ময়না না থাকলেই ভাল হয়। ময়না উঠে দাঁড়াতে মাষ্টার দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সেখানে বসে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ চেয়ে দেখ্‌লেন, ময়না তখনও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাষ্টার মুখ তুলতেই বললে, "তুমি কি লোকটাকে মেরে ফেলেছ?"

মাষ্টার বল্লেন, "না।"

মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "কেন একেবারে মেরে ফেললে না ওকে? ওই জন্যেই ত' তোমার হাতে ছুরিখানা দিয়েছিলাম।"

মাষ্টার যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "তুমি ছুরি দিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলাম। আমি সেই কোণের গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম তুমি লোকটাকে মারলে, তারপর দুজনেই পড়ে গেলে। তার জামার পকেট থেকে ছুরিটা পড়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে সেটা তোমার হাতে তুলে দিলাম। মারলে না কেন এক ঘা?" ময়না একটানে সব কথাগুলো বলে নিলে। তার কালো চোখ দুটো জল-জল করে উঠল, ছোট হাতখানাও শক্ত মুঠি বেঁধে উঠ্‌ল।

মাষ্টার নির্ব্বাক!

ময়না আবার কথা সুরু করলে, "তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতে তাহ'লে আমি বলতুম যে আমি ওই বাজিকরদের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছিলাম জানো? তুমি যে আমায় না বলে চলে যাচ্ছিলে। আমি সব জানি। তুমি যখন ডাক্তারকে বলছিলে তখনই আমি শুনেছিলুম। নগিদের বাড়ী একলাটি থাকতে আমার বয়ে গেছে। মরে গেলেও থাক্‌তাম না।"

খুব হাত মুখ ভঙ্গী করে কথা বলে ময়না নিজের জামার

ভিতর হাত গলিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট সবুজ পাতা বের করলে। পাতাগুলোকে হাত বাড়িয়ে অনেকখানি দূরে ধরে সেই আগেকার মত সাঁওতালী স্বরে খুব জোর দিয়ে বলতে লাগ্‌ল, "তুমি বলেছিলে এই বিষ পাতা খেলে আমি মরে যাব। বেশ হবে, এইগুলো খেয়ে মরব, নয়ত ওদের সঙ্গে চলে যাব। এখানে আমায় কেউ দেখতে পারে না, সবাই আমায় ঘেন্না করে, আমি কখ্‌খনো এখানে থাক্‌ব না। তুমিও নিশ্চয় আমাকে দু চক্ষে দেখ্‌তে পার না, নইলে অমন করতে দিতে না।"

ময়না থরথর করে কাঁপতে লাগ্‌ল, তার চোখ দিয়ে বড় বড় দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল পাছে ধরা পড়ে যায় তাই চট্‌ করে সে জলটা মুছে ফেললে, গালে বোলতা বস্‌লেও লোকে তত তাড়াতাড়ি করে না। "আমায় যদি কয়েদ করে রেখে যেতে না দাও তবে আমি বিষ খাব। খাব না কেন? আমার বাবা ত' আত্মহত্যা করেছিল। তুমি যেদিন বলেছিলে এগুলো খেলে মানুষ মরে যায় আমি সেই দিন থেকেই এগুলো বুকে করে নিয়ে বেড়াই।"

মাষ্টারের চোখের সাম্‌নে গোবর্দ্ধন সরকারের নির্জ্জন সমাধিটা ও ক্ষুদ্র বালিকার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিটি ভেসে উঠ্‌ল। তার হাত দুখানি ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন, "আমার সঙ্গে যাবে মইনু?"

বালিকা ছুটে এসে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে মহানন্দে লম্বা টান দিয়ে বল্‌লে, "হুঁ......।"

"যদি আজকেই—আজ রাত্রেই যাই?"

"আজ রাত্রেই যাব।"

যে বাঁকা সরু পথের উপর দিয়ে ময়না একদিন ক্লান্ত চরণে মাষ্টারের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথে আজ দুজনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়ল। সে পথে তার চরণচিহ্ন আর কোনো দিন পড়বে বলে মনে হ'ল না। আকাশের তারাগুলি তাদের মাথার উপর জ্বলে উঠল। আজ মাষ্টার ও ছাত্রীর শিক্ষা সমাপ্ত হ'ল। পাহাড়-ঘেরা গ্রামখানির পাঠশালার দরজা আজ তাদের কাছে চিরদিনের মত রুদ্ধ।

শ্রীশান্তা দেবী।

জগৎপ্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীর

পৃথিবীর "সপ্ত আশ্চর্য্য"জনক (Seven wonders of the world) বস্তুর কথা ছেলেবেলা হইতে সকলেই শুনিয়া আসিতেছি। মিশরে পিরামিড দেখিয়া একটা সাধ মিটিয়াছিল। আজ চীনের Great Wall বা বিরাট প্রাচীর দেখিতে বাহির হইলাম। ইহাও দুনিয়ার একটা বিস্ময়জনক কাণ্ড।

হোটেল হইতে রিক্‌শতে রেলষ্টেসনে আসিলাম। লাগিল প্রায় এক ঘণ্টা। পথে একটা শোভাযাত্রা দেখিলাম। দোভাষী বলিলেন—"কন্‌ফিউসিয়ানধর্ম্মীরা মৃতব্যক্তির সৎকার করিবার জন্য এইরূপ সমারোহ করিয়া থাকে।" একটা প্রকাণ্ড মঞ্চের মধ্যে শব রক্ষিত—বহু লোকে ইহা বহিয়া লইয়া যাইতেছে। নানাপ্রকার কাগজের বাগান এবং মানুষের মূর্ত্তি বহন করিয়া বহুসংখ্যক কুলি অগ্রসর হইতেছে।

ষ্টেসনে পৌছিলে মোসাফেরখানার ভৃত্যেরা এক পেয়ালা গরম চা দিল। গরম জলে ভিজান একখানা তোয়ালেও পাইলাম। চীনাদের দস্তুরই এইরূপ দেখিতেছি। রেলে বসা গেল। পিকিঙ সহর ছাড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা। পথে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর-চীনের সুপরিচিত ভূট্টা, বজরা, জাওয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্র। অল্প দূরেই সম্রাট্‌গণের একটা বিলাসভবনের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হইল। দোভাষী বলিলেন—"উহার নাম Summer Palace বা গ্রীষ্মপ্রাসাদ। ইহা প্রস্তুত করিতে সম্রাটেরা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। পর্য্যটক মাত্রেই এই প্রাসাদ দেখিতে আসে।" খানিক পরে একটা সমর-বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী দেখিতে পাইলাম। ষ্টেসনে নীলবসনাবৃত নরনারী, খ্যাম্পানি শকট, কুল-তরমুজ-ডিম-বিক্রেতা এবং পল্লীকুটির ও গ্রাম্যপথ কাহারও চোখ এড়াইতে পারে না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ন্যান্-কাও ষ্টেসনে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। পিকিঙ হইতে এই স্থান ৩৩ মাইল। ষ্টেসনের নিকটে এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কলযন্ত্র ও আসবাবপত্রের পরিচয় পাওয়া গেল। রেলপথ উন্মুক্ত হইবার পূর্ব্বে এখানে একটা সামান্য পল্লীমাত্র ছিল। এই পথে সওদাগরদিগের উষ্ট্রযান অনেক দেখা যায়।

২১০ সালে স্থ-হুয়াঙ সম্রাট্ সকল চীনা প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করেন। তিনি ভিন্নভিন্ন কেন্দ্রের প্রাচীরগুলি যথারীতি সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত করিয়া এক বিরাট প্রাচীর সৃষ্টি করেন। এইজন্য সাধারণভাবে চীন সাম্রাজ্যের ঐক্যস্থাপয়িতাকে বিরাট প্রাচীরের প্রবর্ত্তক বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিদিগের আরব্ধকার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সান্-হাই-কোয়ানের নিকট প্রাচীর পীতসাগরে মিশিয়াছে—পশ্চিমে মঙ্গোলিয়ার শেষসীমা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। মোটের উপর ২৫০০ মাইল প্রাচীরের দৈর্ঘ্য। সমস্ত চীন দেশটা যেন একখানা প্রাসাদ—সম্রাটের নিজ সম্পত্তি; তাহার এক দিককার বেড়াই এত লম্বা। প্রাচীন কালের রাষ্ট্রশাসন এইরূপ পারিবারিক বা ব্যক্তিগত নীতি অনুসারেই পরিচালিত হইত।

পঁচিশ শত মাইলের সর্ব্বত্রই পর্ব্বত নাই, কাজেই প্রাচীর বহুস্থানেই সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। সকল কেন্দ্রের অংশই সুগঠিত বা সুরক্ষিত ছিল এরূপ বলা যায় না। তবে ন্যান্-কাও পাসের সমীপবর্ত্তী অংশ সকল দিক হইতেই গৌরবজনক। যথাকালে দেশরক্ষার জন্য এখানে দুর্গের কার্য্য যেরূপ হইত আজ দেখিবার জিনিস হিসাবেও এখানে সেইরূপ যথেষ্ট আকর্ষণ আছে।

কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ভাবিতেছি—এত বড় দেওয়াল প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা ছিল কি? দেওয়াল প্রস্তুত করিতে এবং রক্ষা করিতে যত খরচ পড়িয়াছিল তাহাতে কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হইতে পারিত না কি? অধিকন্তু সেনাবিভাগকে সুশিক্ষিত করা যাইত না কি? অথচ এই প্রাচীরের দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত দেশ রক্ষা হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মোগল কুব্লা খাঁ চীনসাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসিলেন। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চুরাজ চীনের সম্রাট হইলেন। ইহারা দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যখন চীনে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন কেহই তাঁহাদিগের পথ রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

বিরাট প্রাচীর একটা বিরাট পাগ্লামির সাক্ষ্যস্বরূপ আজ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনতম কালের কোন সময়ে হয়ত ইহার সার্থকতা ছিল।" কিন্তু অল্পকালের ভিতরেই উহা অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য বিংশ শতাব্দীতে ইহার কোন মূল্যই নাই। বরং ইহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করাই কঠিন। বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল Great Wall বা মহাপ্রাচীরই কালে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। আজকাল ইয়াঙ্কিরা যখন Monroe Doctrine মনরো-নীতির দোহাই দিয়া ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র-পুঞ্জকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বহির্ভূত করিতে চাহে তখন দুনিয়ার লোক হাস্য সংবরণ করিতে পারে কি? অথচ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ইয়াঙ্কিদের এই বহিষ্কার-নীতি বা "মহাপ্রাচীর" দুনিয়ায় যথেষ্ট সমাদৃতই হইয়াছিল। প্রাচীর, বন্ধন, আবেষ্টন, নিয়ম, সূত্র, শাস্ত্র, রীতি, নীতি ইত্যাদি যাহাই দেখি না কেন—কোন জিনিষই চিরকালের জন্য নয়। যথাসময়ে ইহাদের মূল্য ফুরাইয়া আসে, তখন এইগুলি ভাঙ্গিয়া যায়, অনেক সময়ে আপনা-আপনিই ভাঙ্গে অথবা বাহির হইতে সামান্য আঘাত পাইলেই ভাঙ্গে। এইরূপে প্রাচীর-গড়া ও প্রাচীর-ভাঙ্গা মানবেতিহাসের স্তম্ভস্বরূপ। প্রত্যেক দেশে বহুসংখ্যক "চীনা-প্রাচীর" উঠিয়াছে, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—আবার উঠিবে আবার ভাঙ্গিবে। হে চীনের বিরাট প্রাচীর, তোমার গড়নে ভাঙ্গনে দুনিয়াবাসী সংসারের চরমজ্ঞান লাভ করিতেছে—"আজ যাহা সৎ, কাল তাহা অসৎ হইতে পারে। আজ যাহা বিদ্যা, কাল তাহা অবিদ্যা হইতে পারে। আজ যাহা নীতি, কাল তাহা দুর্নীতি হইতে পারে। আজ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া পূজ্য, কাল তাহা অধর্ম্ম জ্ঞানে বর্জ্জনীয় বিবেচিত হইতে পারে।"

রাত্রিকালে ন্যানকাও পল্লীতে ফিরিলাম। রেলওয়ে হোটেলে বাস করা গেল। প্রায় আমাদের দেশী ডাক-বাঙ্গলার মত এই পান্থনিবাস। হারিকেন লণ্ঠন এবং মোমবাতীর ব্যবহার বহুদিন পরে করিতে হইল। দুইজন ইয়াঙ্কি আজ এইখানে অতিথি—ইহারাও পর্য্যটক। একজন বারবৎসর হইতে চীনে আছেন—ক্যাণ্টনে খৃষ্টান বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক—ক্যাণ্টনী উপভাষায় কথা কহিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের কার্ণেগী ইন্‌ষ্টিটিউশনের ভূগোল-বিভাগ হইতে ইনি চীনের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

চারপেয়ের বাসা

আমরা পাখীদিগকে বাসানির্ম্মাণ করিয়া সন্তানপালন করিতে দেখিয়া এমনি অভ্যস্ত যে, অনেক স্তন্য-পায়ী চারপেয়ে জীবও যে বাসানির্ম্মাণ করিয়া থাকে তাহার সন্ধান লইতে আমরা ভুলিয়া যাই। শেয়াল, বেজী, খরগোস, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি যেসব জন্তু গর্ত্তের মধ্যে থাকে তাহারা গর্ত্তের তলায় খড়কুটা দিয়া বাসানির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর সন্তানপালন করে।

এই-সমস্ত বাসা স্থায়ী রকমের, পাখীদের ন্যায় কেবল মাত্র প্রজননের সময় নির্ম্মিত সাময়িক বাসা নয়। কাঠবিড়ালী ও মেঠো ইঁদুর প্রজননের সময় গাছের উপর বা ক্ষেতে শস্যের গাছে সন্তান পালনের জন্য সাময়িক বাসা বাঁধে।



ওরাংওটাং বানরের বাসা।



মেঠো ইঁদুরের বাসা।

কাঙারু অপুষ্ট অবস্থায় প্রসূত শাবক ও অষ্ট্রেলিয়ার পিপীলিকাভুক্ ডিম পালন করিবার জন্য আলাদা বাসা নির্ম্মাণ করে না বটে, কিন্তু উভয় জন্তুরই মাদীদের পেটে এক-একটি যে থলি থাকে তাহাই তাহাদের সন্তান বা ডিম্বপালনের বাসার কাজ করে।

মেঠো ইঁদুর মাঠ ছাড়িয়া কখনও লোকালয়ে যায় না। ফসলের সময় তাহাদের সন্তানপ্রসবের কাল। ক্ষেতে ফসলের গাছ বড় হইয়া উঠিলে তাহার ডাঁটার গায়ে



বীবরের জাঙাল ও বাসা।

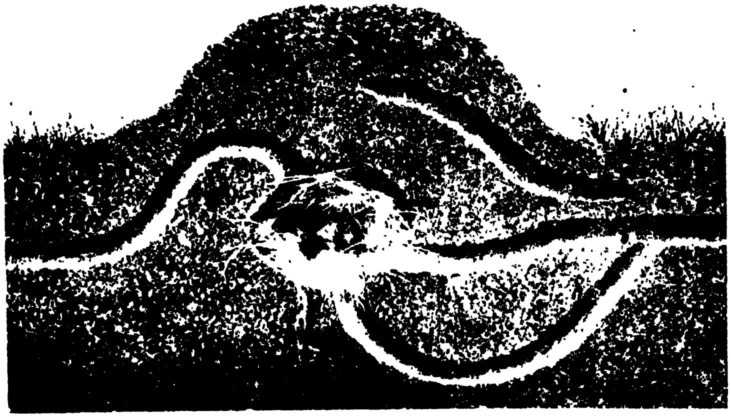
ফসলের পাতা সুকৌশলে বুনিয়া সুদৃঢ়, গোল গোল বাসা তৈয়ারী করে। এই বাসার বুনন এমন ঘন পোক্ত হয় যে ইহা পাড়িয়া বলের মত গড়াইয়া দিলেও তাহা খুলিয়া বা ভাঙিয়া যায় না এবং তাহার মধ্যেকার বাচ্চাদের গায়ে একটুও চোট লাগে না। এই বাসার মুখ এমন সুকৌশলে ঢাকা থাকে যে সহজে খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।

মেঠো ইঁদুরের বাসার মতন সুন্দর বাসা গড়ে ম্যাডাকাস্কার দ্বীপের লেমুর ইঁদুর। লেমুর বানরের জাতি। লেমুর ইঁদুর, ইঁদুর ও বানরের মধ্যবর্ত্তী জাতি। ইহারা খুব লম্বা গাছের আগডালে পাখীর বাসার মতন বাসা কাঠি ও পাতা দিয়া বুনিয়া প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে পশুর লোম বিছাইয়া দ্যায়। এই বাসায় ধাড়ীরা গ্রীষ্মের সময় বিশ্রাম করে এবং সন্তান পালনও করে।

কাঠবিড়ালী পাতা, শেয়ালা এবং গাছের আঁশ দিয়া বুনিয়া হয় দু'ফরকি ডালের উপর নয় গাছের কোটরে বাসা তৈয়ারী করে। ফিরকি ডালের উপর বাসা করিলে তাহা আশপাশের জিনিসের সঙ্গে এমন ভাবে মিলাইয়া করে যে কোথায় তাহার বাসা আছে তাহা সহজে ধরিতে পারা যায় না। জুন মাসে সেই বাসায় কাঠবিড়ালী তিন-চারটি বাচ্চা প্রসব করে; তাহাদের গায়ে তখনও লোম থাকে না, চোখও ফোটে না।

ডরমাউস্ বা নিদ্রালু ইঁদুর সারা শীতকালটা ঘুমাইয়া কাটায়। এই সুদীর্ঘ বিশ্রামের সময় যাপন করিবার জন্য ও নিদ্রান্তে সন্তানপ্রসবের জন্য তাহারা কাঠি পাতা শেয়ালা ও ঘাস বুনিয়া গোল গোল বাসা তৈয়ারী করে এবং তাহার মধ্যে বিশ্রামকালের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। দুম্বা-ভেড়ার মতন তাহারা লেজে চর্ব্বি জমাইয়া রাখে, খাদ্যের অভাব হইলে উপবাসের সময় সেই জমা চর্ব্বি খরচ করিয়া দেহের পুষ্টি করে। ইহাদের বাসা দু-রকমের হয়—এক, মাটির উপর; দ্বিতীয়, মাটি হইতে দু-তিন হাত উঁচুতে গাছের গায়ে।

সুমাত্রা ও বর্ণিয়ো দ্বীপের লাল বানর এবং ওরাং-ওটাং



ছুঁচোর বাসার সুড়ঙ্গ পথ।

পাঁচ-সাত'শ ফুট পর্য্যন্ত, উচ্চে বার-তের ফুট এবং তলায় কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত চওড়া হয়। এই বাঁধ জল হইতে ক্রমশ ঢালু হইয়া উঠিয়া মাথায় হাত দুই পরিসর থাকে। কখনো কখনো এক মাইল লম্ব বাঁধও দেখা যায়। এইরূপে বাঁধ দিয়া তাহারা একটা ছোট পুকুরের মতন করে এবং সেই পুকুর ক্রমশ মজিয়া গিয়া পানা শেওলায় ভরিয়া উঠিলে তাহার উপর কাঠ পাতিয়া মাটি লেপিয়া ভেলা গড়ে ও তাহার উপর কুঁড়ে-ঘরের মতন বাসানির্ম্মাণ করে। তারপর

বানর জঙ্গলের মধ্যে খুব বড় বড় উঁচু গাছের মধ্যে ছোট গাছ বাছিয়া তাহার উপর ডালপালা দিয়া মঞ্চের মতন বাসা নির্ম্মাণ করে। ইহাদের বাসার গাছ প্রতিবেশী গাছেদের তুলনায় ছোট হইলেও ইহাদের বাসা মাটি হইতে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে হয়। বড় গাছের ঘেরার মধ্যে ছোট গাছ বাছিয়া বাসা তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্য এই যে ঝড়-বাতাসের ঝাপট বড় গাছের উপর দিয়াই যাইবে, তাহাদের বাসার কোনো ক্ষতি হইবে না। এক-এক গাছে দুই-তিন বানরদম্পতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসানির্ম্মাণ করিয়া রাত্রিযাপন করে। এই বাসা তাহাদের ঘুমাইবার ঘর এবং সূতিকাগারও বটে।

এইরূপে ইঁদুরজাতীয় ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুরাও বাসানির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ছুঁচো মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটিয়া সেই সুড়ঙ্গের মধ্যস্থলে একটা বড় গর্ত্ত করে এবং তাহাতে খড় কুটা বিছাইয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। ছুঁচো গর্ত্তের মধ্যেই সারা জীবন কাটায়। কদাচ বাহির হইয়া পড়িলে গর্ত্তে ঢুকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে।

বীবর ইঁদুরজাতীয় প্রাণী। ইহারা জলা জায়গায় বাস করে। জলা জায়গার অগভীর এক অংশ আপনাদের বাসস্থান স্থির করিয়া অন্যদিকের বানের জল যাহাতে সেদিকে না আসে সেজন্য খুব লম্বা ও উঁচু একটা বাঁধ দিয়া তাহারা নিজেদের বাসা রক্ষা করে। এই বাঁধ কাঠ, পাথর, ডালপালা ও মাটি সাজাইয়া তৈয়ারী হয় এবং লম্বায়



হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাসের বাসা ও সুড়ঙ্গ পথ।

তাহার তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়া গোড়া কাটিয়া একটা বড় লম্বা গাছ এমন করিয়া তাহার বাসার সামনে ফেলে যে তাহা তাহার কুঁড়ে-ঘরের দরজার আগড়ের কাজ করে এবং বাসা হইতে ডাঙ্গায় বা বাঁধে যাইবার সাঁকোর কাজও করে।



পিপীলিকাভুকের বাসা।

অষ্ট্রেলীয়ার হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাস্ সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী জীবের—টিকটিকি ও ছুঁচোর—মধ্যবর্ত্তী। ইহারা জলে ও স্থলে উভয়ত্রই বিচরণ করে। নদীর ধারে পাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া ছুঁচোর বাসার মতন ইহারাও বাসা করে এবং সেই বাসায় মাদী হংসচঞ্চু নরম তলতলে দুটি ডিম পাড়ে। ইহাদের বাসায় যাইবার সুড়ঙ্গের একটা মুখ জলের তলায় থাকে এবং আরেকটা মুখ ডাঙার দিকে থাকে।

আমেরিকার জাগুয়ার নামক বাঘ অধিকাংশ সময় গাছেই বাস করে। আমেরিকা, আফ্রেরিকা ও অষ্ট্রেলীয়ার নানা প্রকারের পিপীলিকাভুক্ হয় গাছে নয় মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটিয়া বড় একটা গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে।

তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর

(শ্রীএকাই কাওয়াগুচি কর্ত্তৃক বিবৃত)

পঞ্চম অধ্যায়।

নেপালযাত্রা

দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আগমনের পর জীব বাহাদুর নামে তদানীন্তন নেপাল-সরকারের কলিকাতার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত আমার সৌভাগ্যক্রমে পরিচয় হইল। এই ব্যক্তি এখন লাসায় নেপালরাজের মুখপাত্ররূপে বাস করিতেছেন। আমি এই নেপালীরাজপুরুষের নিকট হইতে নেপালের দুই পদস্থ ব্যক্তির নিকট পরিচয়-পত্র গ্রহণ করিয়া নেপাল যাত্রা করিলাম।

১৮৯৯শালের ২০এ জানুয়ারী আমি বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইলাম। ভগবান শাক্যমুনি বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতিমাখা পরম তীর্থ এই। কি আশ্চর্য্য সৌভাগ্যক্রমে সিংহলবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপালের সহিত আমার এস্থানে সাক্ষাৎ হয়। ইঁহার সহিত আমার অনেক প্রীতিকর আলাপ হইল। আমি তিব্বত যাইতেছি শুনিয়া দলাই লামার জন্য কিছু উপহার আমার সঙ্গে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার উপহার—রৌপ্যময় ক্ষুদ্র মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এবং তাল-পত্রে লিখিত একখানি বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক। আমি আনন্দের সহিত আমার সিংহলবাসী বন্ধুর উপহার দলাই লামার জন্য লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ধর্ম্মপাল তিব্বত-ভ্রমণের একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "লাসা দর্শন করিবার অত্যন্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে যাইতে পারি না।"

বুদ্ধগয়ায় প্রথম রাত্রি আমি বোধি-বৃক্ষতলে ধ্যানে কাটাইলাম। সেদিন আমার হৃদয়ের ভাব অবর্ণনীয়। এই বৃক্ষতলেই না ভগবান বুদ্ধ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই দিন রজনীতে প্রকৃতির কি প্রশান্ত, কি মনোরম দৃশ্যই না দেখিলাম। বোধি-বৃক্ষের উপর যখন চন্দ্রোদয় হইল তখন আমার প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। আমার হৃদয়ে ভগবান বুদ্ধ জাগ্রত হইলেন, আমি তখন তাঁর উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করিলাম। বুদ্ধগয়ায় দুই এক দিন বাস করিয়া রেলযোগে নেপাল

যাত্রা করিলাম। পরদিন ২৩এ জানুয়ারী সিগাউলি পৌঁছিলাম। এখানে ইংরেজ রাজ্যের সীমানা, ইহার পরেই নেপাল রাজ্যের এলাকা। এদেশে আমার তিব্বতী-ভাষাজ্ঞান কোন কাজেই লাগিবে না। আমাকে হিন্দুস্থানী বা পার্ব্বতীয়া ভাষায় কথা না বলিলে আর চলিবে না, তা আমি এই দুই ভাষাই জানি না। মনে ভাবিলাম সিগাউলিতে কয়েক দিন বাস করিয়া দুই চারটি প্রয়োজনীয় পার্ব্বতীয় কথা শিখিয়া লইব। আমার সৌভাগ্যবশতঃ দেখি যে সিগাউলির বাঙ্গালা পোষ্ট-মাষ্টারটি চমৎকার পার্ব্বতীয় জানেন। ইংরেজিও তাঁর বেশ জানা ছিল। আমি কাগজ পেনসিল লইয়া প্রয়োজনীয় সমুদায় কথার পার্ব্বতীয় প্রতিশব্দ লিখিয়া লইতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতে আমার নোটবুক লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি,—এমন সময় দেখিলাম রেল হইতে তিনজন তিব্বতী ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন। একজনের বয়স ৪০ বৎসর হইবে, দ্বিতীয়টি বৌদ্ধ পুরোহিত, অনুমান ৫০ বৎসর বয়স হইবে, তৃতীয়টি তাঁহাদের ভৃত্য বলিয়া বোধ হইল। ইঁহাদের দেখিয়াই আমার মনে হইল, যে, আমি যদি এই তিব্বতী ভদ্র-লোকটির সহিত নেপালে যাইতে পারি তবে বড় চমৎকার হয়। সাহসে ভর করিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে গেলাম। শুনিলাম সম্প্রতি তাঁরা তিব্বত হইতে আসিয়াছেন, এবং এখন নেপাল যাইতেছেন। ভদ্রলোকটি তিব্বতবাসী। এইবারে তাঁরা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কোন্ দেশের লোক জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম "আমি চীনদেশবাসী।" তখন প্রশ্ন হইল "তুমি চীন হইতে কোন্ পথে আসিয়াছ, জলপথে না স্থলপথে?" এইবারে আমায় ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিতে হইল। আমি সেই সময় শুনিয়াছিলাম আজও জলপথে আসিলে কোন চীনাকে তিব্বতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। অতএব বলিলাম "স্থলপথে।" তার পর প্রশ্ন হইল, "তুমি চীনের কোন্ অংশের লোক?" আমি বলিলাম "ফুসী।" "তুমি নিশ্চয়ই চীনে ভাষায় কথা বলিতে পার।" 'না' বলি কোন মুখে? 'হাঁ' বলিলাম বটে, কিন্তু পাছে ধরা পড়ি এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। ভদ্রলোকটি তখন গড়গড় করিয়া চীনে ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন। কি বিপদেই পড়িলাম! তাঁহার কথা এক অক্ষরও বুঝিলাম না, বলিলাম "মহাশয় পিকিংএর শুদ্ধভাষায় কথা বলিতেছেন, আমি পাড়াগেঁয়ে কথা জানি, শুদ্ধভাষা ভাল বুঝিতে পারি না।" তখন প্রশ্ন হইল "চীনে ভাষা লিখিতে পার কি?" কি ভাগ্যে লিখিতে একটু পারি! তাঁহার আজ্ঞাক্রমে চীনে ভাষায় বিদ্যা প্রকাশ করিলাম। অধিকাংশ তাঁহার অবোধ্য, তিনি দুই একটি কথা বুঝিলেন। অতঃপর আমার ভাষা পরীক্ষা স্থগিত হইল। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ভদ্রলোকটি তিব্বতী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি বলিলে স্থলপথে চীন হইতে আসিয়াছ, কোন্ পথে আসিয়াছ বল ত।" "লাসার পথে মশাই। দারজিলিং হইয়া বুদ্ধগয়ায় তীর্থ করিয়া এখন নেপাল রাজ্যে যাইতেছি।" আমার এখনও অব্যাহতি নাই—আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "লাসায় তুমি ছিলে কোথায়?" আমি বলিলাম "সেরা বিহারে।" সেখানকার প্রধান পুরোহিতকে জানি কিনা জিজ্ঞাসা করাতে আমি "জানি" বলিয়া উত্তর দিলাম। দারজিলিংএ সবচুং লামার নিকট লাসার বিষয় যাহা শুনিয়াছিলাম তাহার পরিচয় কিছু কিছু দিলাম। আমার মুখে লাসার ভিতর-কার কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটির আর সংশয় রহিল না যে আমি লাসায় যাই নাই। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি নেপালে কাহার নিকট যাইতেছ, পূর্ব্বে কখন গিয়াছিলে কি না?" আমি বলিলাম "নেপালে এই আমার প্রথম আগমন, আমি জীব বাহাদুরের নিকট হইতে নেপালের মহা বৌদ্ধের পুরোহিতের নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া যাইতেছি।" তিনি বৌদ্ধের প্রধান পুরোহিতের নাম শুনিয়াই উৎকর্ণ হইলেন, বলিলেন "জীব বাহাদুর আমার বিশেষ বন্ধু। কার নিকট পরিচয়-পত্র লইয়া যাইতেছেন নাম শুনিতে পারি কি?" আমি তাড়াতাড়ি পরিচয়-পত্রখানি বাহির করিলাম। তিনি দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "কি আশ্চর্য্য! এ যে আমার নামেই!" আমার বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রহিল না। কি সৌভাগ্য! যাঁর নিকটে যাইতেছিলাম তিনি আমার অগ্রেই উপস্থিত! তখন হইতে সেই ভদ্রলোকটির আশ্রিত ও সঙ্গী হইলাম। তিনি

পরদিনই পদব্রজে নেপাল যাত্রার প্রস্তাব করিলেন, বলিলেন "অশ্বারোহণে যাইবার প্রয়োজন নাই, দুইজনে পদব্রজে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে ও সদালাপ করিতে করিতে সুখে চলিয়া যাইব। আমি 'তথাস্তু' বলিয়া রাজি হইলাম। আমরা কথাবার্ত্তা বলিতেছি এমন সময় দুইজন ভৃত্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল তাঁহাদের সমুদায় জিনিষপত্র চোরে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পাশ্বনিবাসে গিয়া দেখিলাম ভদ্রলোকটির ৩৫০ টাকা, কাপড় বই প্রভৃতি চুরি গিয়াছে। আমিও সেই পান্থশালায় ছিলাম, কিন্তু আমার কিছু চোরে লয় নাই। আমার নবপরিচিত বন্ধুর নাম বুদ্ধবজ্র, সঙ্ঘের পুরোহিতটির নাম মায়ার, তিনি লাসার ডিবন বিহারের তত্ত্ববিদ্যার শিক্ষক। ২৫এ জানুয়ারি আমরা উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া পরদিন নেপাল সীমানার বীরগঞ্জে পৌছিলাম। সেখানে "তীব্বতবাসী চীনা" বলিয়া রাহাদানি পাইলাম। সেখান হইতে বিস্তীর্ণ দলাই জঙ্গল পার হইয়া ২৮এ তারিখে বিছাখরিতে পৌছিলাম। সেখানেই রাত্রিবাস করিলাম। রাত্রি ১০টার সময় যখন আমি যথারীতি দৈনিক পুস্তক লিখিতেছি এমন সময় নৈশ নিস্তব্ধতা ও প্রকৃতির অপার শান্তি ভঙ্গ করিয়া এক ভীষণ গর্জ্জন শ্রুত হইল। সেই গর্জ্জনে যেন আমাদের গৃহখানি কাঁপিয়া উঠিল। আমি গৃহের জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখি, এক প্রকাণ্ড বাঘ উদর তৃপ্তি করিয়া জল পান করিতে আসিয়া মনের আনন্দে গর্জ্জন করিতেছে। বিছাখরি হইতে দুইদিন ক্রমাগত নদীর তীর বাহিয়া চলিলাম। তৃতীয় দিনে দেখি আমাদের সম্মুখে তৃণ গুল্ম-বিহীন এক উচ্চ পর্ব্বত দাঁড়াইয়া আছে। পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সে বড় কঠিন পথ। ৩॥ মাইল ক্রমাগত উঠিয়া "বিসাপনিগড়িতে" পৌছিলাম। এখানে নেপাল রাজের গড়। এখানে বিস্তর সিপাহীর সমাগম দেখিলাম। বিসাপনিগড়ির শিখর দেশে দাঁড়াইয়া হিমালয়ের হিমানীমণ্ডিত শিখরমালা দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিলাম। এ যে কি মহান্ দৃশ্য তাহা আর বলিবার নয়। আমি দারজিলিং এবং টাইগার হিল হইতে চির তুষার-মণ্ডিত অনন্তহিমানী দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা আজ এই মহান্ দৃশ্যের তুলনায়, স্বপ্নে দৃষ্ট ছবির ন্যায় ম্লান আকার ধারণ করিল। যুগযুগের সঞ্চিত তুষারভার মস্তকে করিয়া হিমাচল আজ আমার নিকট কি অপূর্ব্বভাবে দেখা দিল! এস্মৃতি আমার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইবার নয়। গাড়ি হইতে ক্রমে মর্কু উপত্যকায় নামিলাম। সেখানে রাত্রিবাস করা গেল। ১লা ফেব্রুয়ারি প্রাতে "চন্দ্রগিরি" উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দেখি চন্দ্রগিরির পার্শ্বদেশ হইয়া অপর্য্যাপ্ত "রোডোডেনড্রন" ফুল ফুটিয়া আছে। চন্দ্রগিরির শিখর হইতে আবার মহান্ হিমাচলের শুভ্রতুষার-কিরীটের দর্শন পাইলাম। শিখর হইতে নামিবার পথে সহসা বিচিত্র চিত্রপটের ন্যায় কাটমণ্ডুর উপত্যকা নয়নগোচর হইল। বিস্তীর্ণ উপত্যকা হইতে দুইটি মন্দির মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আমার বন্ধু বলিলেন, একটি কাশ্যপবুদ্ধ ও একটি শিখী বুদ্ধের স্মরণার্থ পবিত্র মন্দির!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দীনদরিদ্রের সহায়তায়।

কাটমণ্ডুর কাশ্যপ মন্দিরের আশে-পাশের গ্রামখানিকে 'বৌধ' বলে। লামা বুদ্ধবজ্র এই গ্রামখানির প্রধান পুরুষ এবং ঐ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত।

প্রত্যেক বৎসরে, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এখানে তিব্বত, মঙ্গোলীয়া, চীন প্রভৃতি দেশ হইতে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। গ্রীষ্মকালে "গিরিস্বর্গ"গুলিতে ম্যালেরিয়ার ভয়ে এই সময়ে সকলে আসিয়া থাকে। এই যাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই তিব্বত-বাসী। তন্মধ্যে ধনীর সংখ্যা অত্যন্ত কম, অধিকাংশ লোক অতিশয় দরিদ্র। তাহারা সমুদায় শীতকালটা যাযাবরের ন্যায় পথে ঘাটে থাকিয়া কোন প্রকারে দিন কাটায়। শীতের পর দেশে ফিরিয়া যায়।

তিব্বতরাজ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যেই আমার নেপালে আগমন। নেপাল হইতে তিব্বত যাইবার বিস্তর ছোট বড় পথ আছে। কিন্তু আমার গুপ্ত অভিসন্ধির কথা কাহাকেও বলিতে পারি না, এমন কি আমার সদয় বন্ধু লামা বুদ্ধবজ্রকেও কিছু বলিতে পারি নাই। তিনি আমাকে চীনে বলিয়াই জানিতেন এবং প্রশস্ত পথে তিব্বত

দিয়া চীনে যাত্রা করিব এই তিনি জানেন। গুপ্ত পথে তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে এই আমার অভিসন্ধি। আমার অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ নিয়ত অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে-সকল দরিদ্রযাত্রী নেপাল হইতে তিব্বত যায়, তাহারাও প্রধান প্রধান গিরিপথগুলি দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না, কারণ বিস্তর উৎকোচ না দিলে, এ-সকল পথে রাহাদানি মিলে না। দরিদ্রেরা কখনই ওসব পথে যায় না। আমার অনুমান ঠিক হইল। তখন ভাবিলাম এই-সকল দরিদ্র লোকের সহিত বন্ধুতা করিয়া পথের সংবাদ ভাল করিয়া লইতে হইবে। অতএব দুই হস্তে "বৌধ" মন্দিরের দরিদ্রদিগকে দান করিতে লাগিলাম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা আমার ভক্ত হইল। তখন অবলীলাক্রমে তাহাদের নিকট হইতে পথের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনেক চিন্তার পর, মানস সরোবরের নিকট দিয়া তিব্বতে যাইব মনস্থ করিলাম। এ পথটি কিছু দীর্ঘ। কাটমণ্ডু হইতে পশ্চিমে "লো" নামক প্রদেশ দিয়া যাইতে হয়। এই পথেই যাত্রা করিব স্থির করিলাম। কিন্তু সহজ পথ থাকিতে এ দুরূহ পথ দিয়া যাত্রার কথা শুনিলে লোকে আমায় সন্দেহ করিবে। অতএব একটা ওজর চাই। আমি লামা বুদ্ধবজ্রকে বলিলাম যে "বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানস সরোবরের তীরে কৈলাশ পর্ব্বতের বিস্তর বর্ণনা আছে। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ। এতদূর আসিয়া একবার এই পবিত্র স্থান দর্শন না করিলে ক্ষোভের সীমা থাকিবে না, অতএব আমি মানস সরোবর হইয়া তিব্বত যাইব।" লামা বুদ্ধবজ্র আমার কথা শুনিয়া অনেক নিষেধ করিলেন, বলিলেন "পথ যেমন খারাপ, তেমনি দস্যুপরিপূর্ণ। তুমি যদি যাও মৃত্যু নিশ্চিত।" আমি বলিলাম "জন্মিলেই মৃত্যু, তীর্থে যদি মৃত্যু হয়, তার চেয়ে বৌদ্ধ লামার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?" আমাকে দৃঢ়সংকল্প দেখিয়া তিনি আমার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিলেন। "খাম" নামক অঞ্চলের তিনজন যাত্রী সঙ্গী পাইলাম। তন্মধ্যে একজন ৬০ বৎসরের বৃদ্ধা। তাহারা আমার জিনিষপত্র বহিয়া লইয়া যাইবে এই স্থির হইল। খামের লোকেরা বিখ্যাত ডাঁকাত। টুকজি পর্য্যন্ত একজন সঙ্গী পাইলাম।

সপ্তম অধ্যায়।

তুষার হিমালয়।

১৮৯৯ সালের মার্চ্চ মাসের এক সুপ্রভাতে তিনজন পুরুষ ও এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমার বন্ধু-প্রদত্ত তুষার-শুভ্র এক অশ্বে আরোহণ করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের মন্দির হইতে বিদায় লইলাম। সেদিন আমার শরীর ভাল ছিল না, তৎপূর্ব্ব দিন জ্বর হওয়াতে শরীরটা বড়ই দুর্ব্বল ছিল; কিন্তু আর ত আমি নিশ্চিন্ত মনে কাটমণ্ডুতে বাস করিতে পারি না। কোন্ দিন বা আমি জাপানী বলিয়া ধরা পড়ি এবং আমার তিব্বত যাত্রা স্থগিত হয়! কাটমণ্ডু হইতে উত্তরপশ্চিমমুখে বাহির হইয়া ইংরেজ রেসিডেন্সির মধ্য দিয়া নাগার্জ্জুন পর্ব্বত পার হইয়া সন্ধ্যার সময় "জিতলী পিড়ি" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সে রাত্রি এক মুদীর কুটীরের ধারে রাত্রিবাস করিলাম। নেপালের বর্ত্তমান অধিপতি পরম হিন্দু, সুতরাং নেপাল রাজ্যে জাতিভেদের প্রকোপ মন্দ নহে, সুতরাং আমি সহজে কোথাও আশ্রয় পাই নাই। পর্ব্বত-গুহায়, বনে জঙ্গলে, গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে অধিকাংশ সময় রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে। এইবারে আমি হিমালয়ের যে নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিলাম সেখানে আমার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই কোন বিদেশী পদার্পণ করে নাই। সুতরাং এ-দেশের দু এক কথা বলিলে সকলেরই ভাল লাগিবে।

কাটমণ্ডু হইতে যাত্রার তৃতীয় দিবসে প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিশূল গণ্ডকীর (কিরং নদীর) পশ্চিম পারে চুঙ্গি নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। সহরটি ক্ষুদ্র এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র। সহরের উত্তরে একটি সুন্দর নির্জ্জন বনের মধ্যে পার্ব্বত্য নদীর কুলকুল ধ্বনি শুনিতে শুনিতে নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিলাম। পরদিন উষাকালে উত্তর-পশ্চিমে "পোখরা" অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এ স্থান হইতে তিব্বত-সীমান্তে "কিরং" পাঁচ দিনের পথ। কিন্তু সে পথে কঠিন প্রহরার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং এ পথে আমার যাত্রা করা হইবে না। আবার তিন দিনে ৪০ মাইল পথ ভাঙ্গিয়া "বারেং বারেং" ও "সারেং" গ্রাম পার হইয়া "আপ্ত নদী" উত্তীর্ণ হইয়া "আলগাটা" নামক প্রসিদ্ধ স্থানে পৌছিলাম। এ স্থান

তিব্বতের সহিত বাণিজ্যের কেন্দ্র। বুড়ী গঙ্গা বা বুড়ী গণ্ডকীর পশ্চিম তীরে এই সহর। লোহার ঝুলান সেতু পার হইয়া এস্থানে পৌঁছিলাম। সেখানে প্রায় ৫০ জন তিব্বতীকে দেখিলাম। "আলগাটা" পার হইয়া ৯ দিন ক্রমাগত পাহাড়ের পর পাহাড়, উপত্যকার পর উপত্যকা, কত বিস্তীর্ণ বন, কত পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম পার হইয়া পোখরায় পৌঁছিলাম। জাপানের উদ্যান-বাটিকাপূর্ণ সহরের ন্যায় পোখরার মনোহর শোভা দেখিলাম। পোখরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। শ্যামল সুন্দর উপত্যকা, পুষ্পাচ্ছাদিত পর্ব্বতগাত্র পার্ব্বত্য নিঝরিণীর কলনাদে মুখরিত। পোখরা নগরী যেন একখানি প্রকৃতির সুবিচিত্র চিত্রপট। হিমালয়ের বিবিধ প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু "পোখরা"র ন্যায় সুন্দর দৃশ্য কোথায়ও দেখি নাই। পোখরা আর-এক কারণে সমধিক প্রসিদ্ধ, এত সুলভ দ্রব্যের সম্ভার কোথায়ও দেখি নাই। পোখরায় ৬ দিন বাস করিয়া ২৫৲ টাকা দিয়া একটি তাঁবু প্রস্তুত করিয়া লইলাম।

পোখরা ছাড়িয়া ঠিক উত্তর মুখে যাত্রা করিয়া উচ্চ পর্ব্বতশিখরের সম্মুখীন হইলাম। এই পর্ব্বতমালা এমন খাড়া যে অশ্বপৃষ্ঠে গমন স্থানে স্থানে দুঃসাধ্য হইল। সঙ্কীর্ণ পর্ব্বতগাত্র দিয়া অন্যমনস্কভাবে যাইতেছি, হঠাৎ একটা গাছের ডালে আমার গলা আটকাইয়া আমাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ধরাশায়ী করিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার অশ্বটি তৎক্ষণাৎ থামিয়া পড়িল, আমি ঘোড়ার লাগাম ছাড়ি নাই। সে যাত্রা ভীষণ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাম। লাগামটি হাত হইতে খুলিয়া গেলেই আমি শত ফুট নিম্নে পড়িয়া প্রাণ হারাইতাম। আমি পড়িয়া গিয়া এমন প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম যে মাটি হইতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিলাম না, অশ্বপৃষ্ঠে উঠা আমার আর সাধ্য হইল না। আমার সঙ্গী কুলিদ্বয় পর্য্যায়ক্রমে আমায় পৃষ্ঠে বহন করিয়া একমাইল উপরে পর্ব্বতশিখরে উপস্থিত করিল। সেখানে তাঁবু গাড়িলাম। দুইদিন ক্রমাগত কর্পূরের আরক গাত্রে মালিশ করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। সেই পর্ব্বতশিখরের অপর পারে প্রকৃতির নির্জ্জন রাজ্যে পদার্পণ করিলাম। সেখানকার প্রকৃতির শান্ত গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাব আমার প্রাণে মুদ্রিত হইয়া গেল। সেই গভীর নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া যখন কোকিলের কুহুধ্বনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইত, তখন অপূর্ব্ব ভাবাবেশে প্রাণ ডুবিয়া যাইত, এবং কবিতা আমার অন্তরে জাগ্রত হইত।

শ্রীহেমলতা দেবী।

ব্রাহ্মণসাহিত্য, বেদ ও বর্ণভেদ

(Emile Senartএর ফরাশী হইতে)

যে যুগে হিন্দুজগতের গঠন স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সেই যুগের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাকাব্যের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দুইটি প্রাচীনতম রচনা-ধারার যুগল পত্তনভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক ব্রাহ্মণ্যিক সাহিত্য এবং তাহার নীচে বৈদিক সূক্তের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার;—এই শেষোক্ত রচনা-সংকলনকে আমরা বিশেষরূপে "বেদ" নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

এক্ষণে আমাদিগকে উজান বাহিয়া বেদ পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে।

পুরাকাল হইতে, পুরোহিত সম্প্রদায়ের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা "সূত্রের" মধ্যে জমাট বাঁধিয়া আছে। আমরা ইহার কতকগুলি সংগ্রহ পাইয়াছি। এই মূল-উৎস হইতেই "ধর্ম্মশাস্ত্রের" কলস পূর্ণ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া শেষ-বিশ্লেষণে দেখা যায়, উহা ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রত্যক্ষভাবে অমুক-অমুক পুরোহিত-সম্প্রদায়ের সহিত যোগসূত্রে আবদ্ধ। এই পারিভাষিক সাহিত্য আবার যে-সকল বিস্তৃত রচনাকে "ব্রাহ্মণ" বলা যায় সেই "ব্রাহ্মণ"ভাগের চূড়ান্ত দেশে অবস্থিত। ধর্ম্মচিন্তাসকল যজ্ঞব্যাপারে কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, "ব্রাহ্মণ" তাহারই পুরাতন সাক্ষী। এই গ্রন্থগুলি বড়ই অদ্ভুত; কতকগুলি ক্রিয়া-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানের কথা উহাতে পর-পর যদৃচ্ছভাবে বর্ণিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে আবার ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে—"নিরুক্ত"সম্বন্ধে কতকগুলি যদৃচ্ছভাবের উক্তি, একটা গুহ্য রহস্য-ধারা, কতকগুলা ছেলেমানুষি ধরণের সিদ্ধান্ত, ও কতকগুলা দুঃসাহসী ভিত্তিহীন কল্পনারঞ্জিত আলোচনা। আমরা এক্ষণে যে

বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই উহাতে নাই। তবে ঐ সম্বন্ধে আগন্তুভাবে কখন কখন দুই একটা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই মাত্র। কিন্তু তাহার মূল্য খুব বেশী; কেননা, মোটের উপর ইঙ্গিতগুলা বেশ স্পষ্ট রকমের।

Weber নামক একজন বড় সমজদারের মতে,—"এই "ব্রাহ্মণ"-যুগ হইতে জাতের গঠন পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল। কাল্পনিক আদর্শের ভাবে ও সংহিতার আকারে মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রে, যে অবস্থা আমাদের নিকট এক্ষণে প্রকাশ পায়, তখন হইতেই সেই অবস্থা আমাদের সম্মুখে দেখিতে পাই।" সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাদি না থাকিলেও, যেসকল প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও জ্ঞাতব্য বৃত্তান্তের খণ্ডাংশ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই।

উহার মধ্যে চতুর্বর্ণ নিজ নিজ বিশেষ-অধিকার-সমেত পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত তখনি দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষত তখনকার ব্রাহ্মণদের অধিকার ও কর্ত্তব্য, আধুনিককালে বর্ণিত কর্ত্তব্য ও অধিকারের সম্পূর্ণ অনুরূপ; বংশকে বিশুদ্ধ রাখিবে—এইরূপ উপদেশ বিধিমতে প্রদত্ত হইয়াছে। তিন উচ্চ বর্ণের অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণ মুখ্যত এক পত্নী গ্রহণ করিবেক কিন্তু গৌণভাবে অন্য পত্নী গ্রহণে কোন বাধা নাই। দীক্ষার প্রতি নিয়ত অবহেলা প্রদর্শন করিলে, জাত হারাইতে হয়। অন্যান্য আরো অনেক দোষের জন্য জাতিচ্যুত হইতে হয়; তবে কি না, ধাপে ধাপে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে যাহার অনুষ্ঠানে এই চরম-দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পতিতের সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিষিদ্ধ; সর্ব্বপ্রকার সংস্রব নিষিদ্ধ; তাহাদের হস্ত হইতে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না! পাছে তাহারা ছুঁইয়া ফেলে এইজন্য সর্ব্বদাই ভয়ে-ভয়ে থাকিতে হয়। নীচ জাতের সহিত আহার করিতে পারা যায় না। নীচ জাতের বাসন-কোসন ব্যবহার করা যায় না। ভিষকের ব্যবসায়ে অশুচি দ্রব্যের স্পর্শ অনিবার্য্য বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ ভিষক হইতে পারে না। সুরাপান অনুমোদিত নহে; মাংসাহার, অন্তত কোন কোন স্থলে, একেবারেই নিষিদ্ধ। বিভিন্ন পশুর চর্ম্ম ব্যবহার নিষিদ্ধ। শাস্ত্রতঃ না হৌক ব্যবহারতঃ মিশ্রজাতদিগের এখানে স্থান আছে;—অনেকগুলির নাম ধরিয়া সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নিয়মগুলির মধ্যে একটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও এরূপ বুঝায় না যে, উহারা গঠনের পথে চলিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমানকালেও যখন আমরা প্রথা বা আচার-ব্যবহারকে কতকগুলি সাধারণ সূত্রে পরিণত করি, তখনও এইরূপ অনেকগুলা ব্যতিক্রমের স্থান পৃথক্‌ করিয়া রাখি। এই-সকল অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতি হইতে মূল-অভিপ্রায়টি যেন আমরা বিনির্ম্মুক্ত করিয়া লই। বিশেষ-বিশেষ স্থল-অনুসারে, বিভিন্ন ব্যাখ্যার উৎপত্তি হয়।

কতকগুলি বচনের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে, প্রতীয়মান হইবে যে, শোণিত-মূলক বিশেষ অধিকার অপেক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যের মূল্যরূপে নির্দ্ধারিত হইত। কিন্তু এই ভাষার অর্থ কি—তাহা আমরা অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারি, এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যও সেই অভিজ্ঞতার অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়া থাকে:—ইহা প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণের জ্ঞানধর্ম্মের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করে; কেবলমাত্র জন্ম হইতে যে-সকল অধিকারের সৃষ্টি হয়, উহা কোন প্রকারেই তাহা বিস্মৃত হইতে দেয় না। এক স্থলে, উহা অক্ষরে অক্ষরে সমর্থিত হইয়া থাকে। অজ্ঞতা বা ব্যসনাসক্তিবশতঃ অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি কেহ অবহেলা করে, তখনি সে জাতিচ্যুত হয়।

অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি খুবই মৃদু ধরণের হইলেও উহা হইতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকারের মূল্য খুবই কম ছিল? আজিকার দিনেও অনেক স্থলেই আমরা দেখিয়াছি ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত ও অপরাধের দণ্ড খুবই লঘু ধরণের। তা ছাড়া এ কথাটাও যেন ভাবিয়া দেখা হয়, ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এখানে সর্ব্বত্রই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ অসম্ভব-রকমের দক্ষিণা পায়, এমন কি, সেই দক্ষিণা, শত সহস্র গাভী পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া থাকে। অপরাধী একজন নীচ জাতের লোক হইলে, বিচার-নিষ্পত্তিকারী ব্রাহ্মণ অম্লান-বদনে বলে যে, তাহার নীচ জাতিত্বই তাহার অপরাধের বিশিষ্ট হেতু! এই-সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থকারেরা, স্মৃতিসংস্কারকেরা, ব্রাহ্মণের জন্য

এরূপ সুবিধা করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রায়শ্চিত্ত-দণ্ড-বিধিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধী ব্রাহ্মণের দণ্ডের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই যে বিশেষ-অনুগ্রহ ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয়, ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার কিরূপ সুরক্ষিত ছিল।

অবশ্য, যে ভূখণ্ড হইতে ধর্মশাস্ত্র বা মহাকাব্যের উৎপত্তি হয়, এই সাহিত্য সেই ভূখণ্ডেরই সাহিত্য। চতুর্বর্ণের নিয়ম-তন্ত্রটা কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার সমসাময়িক সাক্ষী অন্বেষণ করিতে গেলে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্ধ হইতে হয়। কিন্তু এই নিয়ম সম্বন্ধে এত অত্যুক্তি আছে, একটা রুদ্ধদ্বারিতার দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত যে, শুধু এই নিয়মটির মধ্যে নহে, যে-গোঁড়ামির আকার অধুনা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই নিয়মের পদ্ধতিটার মধ্যেও কতকগুলি মনোভাব, কতকগুলি স্বার্থ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ইহা একটা কৃত্রিমতা দোষে, ভিত্তিহীন নিরঙ্কুশ কাল্পনিকতা দোষে দুষ্ট। অন্ততঃ উহার মূল আদিম-সাহিত্যের মধ্যেও নিহিত দেখা যায়। ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৈদিক সূক্তসমূহের মধ্যে অনেকগুলি সেই যুগেরই সমসাময়িক—যে-যুগে পুরোহিত সম্প্রদায়ের দ্বারা উহা শাখাপল্লবে বিস্তার লাভ করে। তন্মধ্যে যে বৈদিক সূত্রটি ভারতে জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় সেই সূত্রটি খুব একটা প্রাচীন দলিল বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আদি-পুরুষের শরীর হইতে কিরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্গত হইয়াছে উক্ত সূত্রে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। বচনটিতে উক্ত হইয়াছে,—"ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ, রাজন্য তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার ঊরু-যুগল।" যে-সর্ব্বমান্য সঙ্কলনের মধ্যে এই বচনটি স্থান পাইয়াছে তাহা যে খুব আধুনিক তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই বচনটিতে সমস্তের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়া পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে। পূর্ব্বেও যে চারি জাতের অনুরূপ চারি বর্ণ ছিল এই বচনটিকেই তাহার সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমার মতে ইহা অপেক্ষা "ঠুনকো" ধরণের কথা আর দ্বিতীয় নাই। একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা আমার বক্তব্যটি বুঝাইব। Haug এবং তাঁহার পর M. Kern সাধারণ মতের বিরুদ্ধে আরো সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে জাতের কথা সম্পূর্ণরূপে শুধু জানা ছিল তাহা নহে, পরন্তু আরো ঊর্দ্ধতনকালে আরোহণ করিয়া দেখান যাইতে পারে—যে সময়ে ইরানীয় ও হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষেরা পাশাপাশি বাস করিত, সে সময়েও জাতের অস্তিত্ব ছিল। তাঁহারা কোন্ যুক্তি-বলে এ কথা বলেন? হয় তাঁহারা আবেস্তার কতকগুলি বচনের উপর—নয় প্রাচীনকালে ইরানের লোকদিগের চারি "পিষ্ট্রে" বিভক্ত থাকা সম্বন্ধে যে খুব-আধুনিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলেন। এই চারি "পিষ্ট্রা" চারিবর্ণের অনুরূপ। পারস্যের ইতিহাসে কোথাও জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য নাই। কিংবা Kern ও Haugএর মতে, জাতের ধারণাটি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের সহিত এরূপ অকাট্যরূপে অনুস্যূত যে হিন্দুদের ন্যায় পারসীকদের মধ্যেও বর্ণভেদ-প্রথা প্রচলিত ছিল—অসঙ্কোচে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন! এই দুই পর্য্যায়ের মধ্যে একটা বাহ্যিক যোগ আছে আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের মধ্যে যে একটা মৌলিক যোগ আছে, অবশ্যম্ভাবী যোগ আছে, তাহা কিছুতেই সপ্রমাণ হয় না।

আমার কথাটা আর একটু বুঝাইয়া বলিব। শাস্ত্রীয় মতবাদ কেবল চারি বর্ণই স্বীকার করে। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, এই কাঠামটা খুবই সংকীর্ণ। উহার মধ্যে অসংখ্য জাত। তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে এইখানেই একটা প্রধান বিরোধ—এ বিরোধ সহজে মীমাংসা হইবার নহে। কালভেদের হেতু প্রদর্শন করিয়া কি এই বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করা যাইতে পারে? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি,—একাধিক নিদর্শনের দ্বারা, এমন কি পরস্পর-বিরুদ্ধ কথার দ্বারা, শাস্ত্রীয় মতবাদ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে, স্বীকার করিয়াছে যে, অনেকগুলি জাত পূর্ব্বকাল হইতেই ছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জাত বাস্তবিকই ছিল কি না সন্দেহস্থল। তা' ছাড়া মনে হয়, জাতের বিস্তৃত পর্য্যায়গুলি শাস্ত্রীয়-নিয়মের সহিত খাপ খায় না, কঠোর রুদ্ধদ্বারিতার সহিত খাপ খায় না, এবং জীবন্ত জাতের যে বিশেষ-লক্ষণ দল-গঠন ও স্বায়ত্তশাসন—তাহার সহিতও খাপ খায় না।

লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা ভারতে ব্রাহ্মণ উপাধি গ্রহণ করিয়াছে এবং এক হিসাবে ঐ নামে একীভূত হইয়াছে তাহারা বস্তুত বহু বিভাগে বিভক্ত ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। তাহাদের প্রত্যেক বিভাগই বিশেষ-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সচরাচর "ব্রাহ্মণ জাতের" উল্লেখ করিয়া থাকি; আসলে বলা উচিত "ব্রাহ্মণিক জাতসমূহ।" যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের এক-একটু বিশেষত্ব আছে তাহাদের সকলকেই আমরা সাধারণভাবে একজাত বলিয়া থাকি। পতিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনু যাহা কবুল করিয়াছেন, তাহা হইতে সপ্রমাণ হয়, তিনিও এইরূপ করিয়াছিলেন। এখনকার মতো তখনও সকল ব্রাহ্মণই সম্মানিত সাধারণ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইত। মহাভারতের একস্থানে আছে, মাতা যে বংশেরই হউক না কেন, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণই। মনুর নিয়মের সহিত যে-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার মীমাংসা অসম্ভব বলিয়া প্রথমে মনে হইলেও, তাহা যে অগত্যা মীমাংসার অতীত এরূপ নহে। মতবাদ যাহাই বলুক না কেন, জাত বদ্‌লাইয়াও ব্রাহ্মণ থাকা যায়।

আমাদের চারিদিকে নিরীক্ষণ করা যাউক। এখনকার রাজপুত—যাহারা পাশ্চাত্য ভারতের সামরিক বংশের লোক তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে। পদমর্য্যাদা ও ব্যবসায়ের হিসাবে তাহারা ক্ষত্রিয় জাতির অনুরূপ। তাহাদের সকলকেই কি এক জাত বলা যাইতে পারে? না তাহারা কোন বিশেষ জাতের একটি উন্নতিশীল খণ্ডাংশ মাত্র? আমরা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের চোখের সামনে এমন কত জাত দেখিয়াছি যাহারা অধিকারী না হইয়াও উচ্চ উপাধি দখল করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার দ্বারা একটা সামাজিক সুবিধা করিয়া লইয়াছে। এস্থলেই ব্যাপারটা নূতন হইবে কেন?

এইখানে আমরা একটা নূতন অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিব; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই নামে চারি আদিম "জাত" বুঝায় না, ইহারা চারি "শ্রেণী" বা "বর্গ"; এই শ্রেণীগুলি খুব প্রাচীন হইলেও হইতে পারে। পরে উহাদিগকে "জাতে"র স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বরূপত পৃথক্ ও উৎপত্তিসূত্রে পৃথক,—প্রকৃত জাতগুলা—(যাহা উক্ত চতুর্ব্বর্গ হইতে নিঃসৃত) গোড়াগুড়ি হইতেই খণ্ডাংশে বিভক্ত ও সংখ্যায় বহুল হইয়াছিল।

মতবাদ ও তথ্যের মধ্যে যে অনৈক্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেবল এইরূপ ব্যাখ্যাই উহার মীমাংসা করিতে সমর্থ।

এইখানেই ইরানীয় বচনগুলির সহিত তুলনা,—তাহার সমগ্র মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইরানীয় চারি পিস্ত্রা ও চারি হিন্দুবর্গের মধ্যে যে একটা সৌসাম্য আছে এইখানেই তাহার গূঢ় ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (Ludwig Rigveda) "অথ্রব" বা পুরোহিত ব্রাহ্মণের অনুরূপ; "রথেস্থ" বা যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়ের অনুরূপ; "রাষ্ট্রিয়-ফ্‌শুইয়া" বা গৃহপতি, বৈশ্যের অনুরূপ; "হুইতি" বা হস্ত-সাধ্য কাজে ব্যাপৃত শ্রমজীবী, শূদ্রের অনুরূপ। সাধারণ সাদৃশ্যটা খুব চোখে পড়ে। কতকগুলা সংশয়াত্মক পার্থক্য ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণিক কিম্বদন্তী অনুসারে বৈশ্যেরা কৃষী ও বণিক্‌রূপে খ্যাত; কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য উহাদিগকে প্রায়ই সচরাচর গৃহপতিই বলিয়া থাকে। ইরানীয় পর্য্যায়ের সহিত খুব কাছাকাছি মিল আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু হুইতি শ্রেণী সম্বন্ধে তেমন কোন সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না যাহাতে করিয়া শূদ্রের সহিত ঠিক্ তুলনা করা যাইতে পারে; শূদ্রের ন্যায় "হুইতি"কেও এক পাশে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে—তাহারা ধর্ম্মের হিসাবে ও সমাজের হিসাবে নীচু। উভয় পক্ষেই, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা প্রবেশ করে, তাহাদের এক রকমেরই দীক্ষা;—তাহারা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে। (১) অতএব তুলনাটা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ। (২)

ইরানের পিস্ত্রা-সমূহকে প্রকৃতরূপে জাত বলা যায় কি না ইহা লইয়াই বিবাদ; এবং এই বিবাদ ন্যায্য বিবাদ। যাহা হইতে জাত উৎপন্ন হইতে পারে, ইরানে এরূপ কতকগুলি জাতের অঙ্কুর ছিল কি না,—(যেমন ভারতে কতকগুলি

(১) Spiegel পৃ ১০০। ইহা খুব সম্ভব যে, ভারতের ন্যায় ইরানেও, উপবীত গ্রহণ তিন শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ ছিল; চতুর্থ শ্রেণীর অধিকার অসম্পূর্ণ ছিল এবং ঐ শ্রেণী নিকৃষ্ট অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল (Geeger)। জোরোষ্টার-ধর্ম্মাবলম্বীকে যে দীক্ষা দেওয়া হইত "হুইতি"রা সে দীক্ষা প্রাপ্ত হইত কি না, তৎসম্বন্ধে Spiegel অসংকোচে স্বীকার করিলেও, তাহা সংশয়াত্মক বলিয়া মনে হয়।

(২) Spiegel Eran Alterthumsk।

জাতের অঙ্কুর হইতে জাতের উৎপত্তি হইয়াছে)—এ বিষয়ের নির্দ্ধারণ করা—সে স্বতন্ত্র কথা। সে যাহাই হউক, আবেস্তায় চারি পিষ্ট্রা চারি শ্রেণী মাত্র—জাত নহে। হিন্দুদিগের চতুর্বর্গ গোড়ায় এইরূপই ছিল। যদি উভয় পক্ষে বিভাগ সম্বন্ধে মিল থাকে, তো সে দূর অতীতের জিনিস বলিয়াই এই মিল দেখা যায়। এবং জাতটা কেবল ভারতেই যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,—তাহার অর্থ,—জাতের সহিত ঐ শ্রেণীবিভাগের স্বরূপ-গত কোন মিল বা অবিচ্ছেদ্য যোগ নাই।

আমি জানি, এই দুইয়ের মধ্যে একটা মিল স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে; এইরূপ স্বীকার করা হয় যে, অব্যতিক্রমী আদিম একতা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া গিয়া উহা হইতে বর্ত্তমান কালের খণ্ডাংশ-সকল উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অসম্ভাব্যতা এক নজরেই উপলব্ধি হয়। জাতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিবার জন্ম যে-সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে, পরে আমি সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। আপাতত, সাহিত্য-কিংবদন্তী হইতে যে-সকল তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে আমি তাহাতেই আপনাকে বদ্ধ রাখিব। আমাদের এই অনুসন্ধানের পথে, যে-সকল প্রাচীনতম সামগ্রী আমরা প্রাপ্ত হইব তাহা হইতেই জাতের নিদর্শন সংগ্রহের চেষ্টা করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহানামন্

(প্রথম হলকা)

"রাজা নেই ব'লে অরাজক নয়
কপিলবাস্তু পুরী,
সন্তাগারের সন্তেরা আছে,
বাজা ওরে বাজা তুরী।
নগর-জ্যেষ্ঠ শ্রীমহানামন্
আদেশ করেন সবে
রাজদস্যুর এই দস্যুতা
নিরোধ করিতে হবে।
কোশল-ভূপতি প্রসেনজিতের
তনয় পিতৃঘাতী
বৃদ্ধ পিতার রাজ্য হরিয়া
দেমাকে উঠেছে মাতি;
পর-ধন পর-রাজ্যের ক্ষুধা
প্রাণে জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্,
দাসীর পুত্র দস্যু হয়েছে
দারুণ এ বিরুধক।
এই নগরের মালঞ্চে ওর
মা একদা ছিল দাসী,
মহামনা মহানামনের দ্বারে
অন্নপিণ্ড গ্রাসি'—
পুষ্ট যে হ'ল তাহারি পুত্র
দুয়ারে পেতেছে থানা,
ঘোচাতে মায়ের দাস্যের স্মৃতি
বুঝি হেথা দেছে হানা।
অধমের ধারা ধরেছে ধৃষ্ট
ভুলে গেছে উপকার,
অধঃপাতের পিছল পথে পা
দিয়েছে কুলাঙ্গার।
ভেবেছে দর্পী,—শাক্যসিংহ
বনে গিয়েছেন ব'লে,—
শাক্য-কুলের পৈতৃক ভিটা
হরণ করিবে ছলে;
খবর পেয়েছে,—হিংসা-বৃত্তি
ছেড়েছে শাক্য-কুল,—
তাই সে এসেছে নিরস্ত্র জনে
করিবারে নির্ম্মূল।
হার মেনে ফিরে গেছে বারেবার
আবার এসেছে তেড়ে,
ধৃষ্টের চূড়ামণিরে এবার
সহজে না দিব ছেড়ে।
বুদ্ধের জ্ঞাতি শাক্য আমরা
করি না প্রাণের হানি,
তবুও যুঝিব, সহজে না দিব
রাজাহীন রাজধানী।

অমোঘ-লক্ষ্য আমরা শাক্য
হই না মুষ্টিমেয়,
লড়িবে ভুজঙ্গ হাতীর সঙ্গে,
যুঝিব,—না ছাড়ি শ্রেয়।
ঘোষণা দেছেন নগর-জ্যেষ্ঠ
শোনো ওগো শোনো সবে
প্রাণীর প্রাণের হানি না করিয়া
যুদ্ধ করিতে হবে।
কে করিবে এই নূতন লড়াই ?—
এস জোড়া-তূণ এঁটে,
শত্রুরে মোরা প্রাণে না মারিব
ছেড়ে দিব কান কেটে।
শত্রু-সৈন্য বিব্রত করা
এই আজিকার ব্রত,
কোশলের সেনা ভোলে না যেন রে
শাক্য-রণের ক্ষত।
প্রাণে প্রাণে দেশে যায় যাক্ ফিরে
কান-কাটা পল্টন
মরণ-অধিক লজ্জার লেখা
বহে যেন আমরণ।"

(দ্বিতীয় হল্‌কা)

সাড়া পড়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
কপিলবাস্তু জুড়ে,
নিদ্রা তন্দ্রা ভয় সব যেন
মন্ত্রেতে গেল উড়ে।
প্রহর না যেতে বর্ম্মে চর্ম্মে
ছেয়ে গেল দশদিক
মরাল সহসা সাঁজোয়া পরিয়া
সজারু সাজিল ঠিক।
রাজাহীন দেশে জনে জনে রাজা
জনে জনে দুর্জ্জয়,
স্বদেশের মান রাখিতে সমান
ব্যগ্র ও নির্ভয়।

মজুর কৃষাণ গোপনে আপন,
হাতিয়ারে দ্যায় শান্,
চারিদিকে শুধু 'সাজ্' 'সাজ্' 'সাজ্'
চারিদিকে 'হান্' 'হান্'।
বাহির হইল বিরাশী হাজার
শাক্য তীরন্দাজ,
হাতীর সমুখে ভীমরুল-পাতি
অভিনব রণ আজ।
একদিকে ব্যূহ কোশল-সেনার
পিষিতে চাহিছে চাপে,
আর দিকে যত হিংসা-বিরত
রুদ্ধ আবেগে কাঁপে।
বাণে বাণে প্রাণ অস্থির তবু
সমঝি' যুঝিছে সবে,
প্রাণের হানি না করিয়া যে আজ
যুদ্ধ করিতে হবে।
লঘু করে বাণ করে সন্ধান
সুলঘু ক্ষিপ্র গতি
অশ্বচালনে অঙ্গ-হেলনে
বিদ্যুৎ-হেন জ্যোতি।
তীর হানি শুধু কোশল-সেনার
কান কুণ্ডল কাটে,
ঝরা পাতা হেন কাটা কানে কানে
ছেয়ে ফেলে মাঠে ঘাটে !
কেটে পাড়ে তূণ ধনুকের গুণ
অমোঘ লক্ষ্যে বিঁধে,
সারথির হাতে বল্গা ঘোড়ার
কেটে দিয়ে ধায় সিধে !
করে টলমল বিকল কোশল-
সেনা অদ্ভুত রণে,
বাণ দিয়ে যেন করে বিদ্রূপ
শাক্যেরা খুসী মনে।
ঢালে ভোঁতা করে শত্রুর খাঁড়া,
খড়্গ না হানে ফিরে,
অদ্ভুত যোদ্ধা যুঝিছে বৌদ্ধ
নিরঞ্জনার তীরে ;

বুকের উপরে শত্রুর ছুরি
মরণ সে ধ্রুব জানে,
হাতে হাতিয়ার শত্রুরে তবু
মারিবে না কেউ প্রাণে!
হাজারে হাজারে বুদ্ধের জ্ঞাতি
চলেছে মরণ ভেটে
হাস্য-বদনে মরিছে শাক্য
মৃত্যুর কান কেটে।

(তৃতীয় হল্‌কা)

সন্ধ্যা আসিল, ক্ষণিক সন্ধি
আনিল অন্ধকার,
শাক্য-দুর্গে তূর্য্য ধ্বনিল—
ফেরো সবে এইবার।
শাক্য-কুলের মৌমাছি ওরে!
মৌচাকে দেরে চাবি,
হের বিব্রত শ্রাবস্তি-সেনা
হস্তী মদস্রাবী।
অসমান রণ চলে কতখন?
এইবার ফিরে আয়।—
শাক্য-গড়ের কোমর-কোঠায়
বাজে তুরী উভরায়।
পড়ে অর্গল দুর্গ-দুয়ারে
পরিখায় ফোলে জল,
কান-কাটা সেনা কান দাবী ক'রে
করে দূরে কোলাহল।
প্রাণহারা সেনা সেই কোলাহল
শুনিবারে নাহি পায়—
দাবীর চেয়ে সে ঢের বেশী দিয়ে
শুয়েছে মৃত্তিকায়।

(চতুর্থ হল্‌কা)

কপিলবাস্তু করি' অবরোধ
ব'সে আছে বিরূধক,
ঘাঁটি-মুহড়ায় কড়া পাহারার
বেড়া দেছে কণ্টক।
যুদ্ধ নাহিক, দীর্ঘ দিবস
কাটিছে শুদ্ধ ব'সে,
শাক্যদুর্গ দুরান্দাজের
ধাক্কায় নাহি ধ্বসে।
রসদ ফুরায়, কি হবে উপায়?
ফৌজ উঠিছে ক্ষেপে,
ছাউনীর ধারে ব্যাধি উঁকি মারে,
কত রাখা যায় চেপে?
চোখ-রাঙানিতে ভুরু-ভঙ্গীতে
চেপে রাখা যায় কত?
অসন্তোষের আক্রোশ নিতি
ফণা তোলে শত শত।
"ছাউনী নাড়িব" কহে বিরূধক।
মন্ত্রী তা' শুনি কয়
"আমাদের চেয়ে অবরুদ্ধেরা
ঢের বেশী ক্লেশ সয়;
দাঁতে তৃণ করি তারা তো এখনো
আসেনি শিবিরে সবে,
এখন নড়িলে শত্রু হাসিবে
লোকে অপযশ ক'বে;
এখন নড়িলে পায়ে ঠেলা হবে
করগত সিদ্ধিরে।"
সেনাপতি কয় "মুখ দেখানো যে
দায় হবে দেশে ফিরে।"
কহে বিরূধক "তাই হোক; তবে
পল্টন খুসী নয়।"
"আছে কূটনীতি পল্টন মোর"
মন্ত্রী হাসিয়া কয়।

(পঞ্চম হল্‌কা)

শাক্য-পুরের সন্থাগারেতে
সন্থ মিলেছে যত,
শত্রুর দূত এনেছে যে চিঠি
তাহারি বিচারে রত।
শুদ্ধোদনের শূন্য আসনে
বুদ্ধের ছবি ভায়,

রাজাহীন দেশে রাজার যে কাজ
দশে মিলে করে তায়।
পাকা পাকা যত মাথা ঘেমে ওঠে,
কথা ওঠে কতশত ;
পত্রের পরে টিপ্পনি করে
যার যেবা মনোমত।
"শাক্যের প্রতি নেই বটে প্রীতি,
নেইও বিশেষ দ্বেষ"
লিখেছে কোশল "দ্বার যদি খোলো
দেখে যাই এই দেশ,
তীর্থ সাকার এ দেশ আমার
মায়ের মাতৃভূমি,
এরে ছারেখারে দিতে নারি, শুধু
পথ-রজ যাব চুমি।"
"সে তো বেশ" কহে সন্ত জিনেশ ;
"বড় বেশ নয়" কন—
সন্ত দেবল "ছল এ কেবল,
চোরের এ লক্ষণ।"
সন্ত নালদ "কহিল রসদ
দুর্গে আদৌ নাই,
আজ নয় কাল দুর্গ-দুয়ার
খুলিতেই হবে, ভাই,
অনশনে নিতি মরে ছেলে বুড়া
পুত্র কন্যা জায়া,
কপিলবাস্তু জুড়িয়া পড়েছে
মৃত্যু-কপিশ ছায়া।
মরার অধিক যন্ত্রণা নেই,
মরিতেই যদি হয়
অস্ত্রে মরিব, অনশনে হেন
তিলে তিলে মরা নয়।"
তর্ক বাড়িল আওয়াজ চড়িল
শান্ত সন্তাগারে,
বোঝা নাহি যায় কি যে হবে, হায়,
কোন্ দল জিনে হারে।

অনশন ? কিবা অস্ত্রে মরণ ?
বকাবকি এই নিয়ে,—
যমের মহিষ গুঁতাবে, কিন্তু
কোন্ শৃঙ্গটা দিয়ে ?
নাম-গুটিকার কুণ্ডাতে শেষে
গুটি দিল গিয়ে সবে,
গুটি গুনে ঠিক হইল—হা ধিক
দুয়ার খুলিতে হবে !

(ষষ্ঠ হল্‌কা)

দুর্গদ্বারের অর্গল আজ
খুলিতে গিয়েছে টুটে,
পল্‌টন লয়ে পশে বিরুধক
কল-কোলাহল উঠে।
এ কি অদ্ভুত ? কোথা গেল দূত—
ময়ূরপুচ্ছধারী ?
পল্‌টন লয়ে কেন পশে পুরে ?
এ দেখি জুলুম ভারি !
একা এসে দেশ দেখে চলে' যাবে
এই কথা ছিল আগে,
রাজদস্যুর দস্যু-স্বভাব
কোন্ ছুতা পেয়ে জাগে ?
শাক্যপুরীর ধনৈশ্বর্য্য
দেখে আপনার চোখে
লোভের নাড়ীটা হয়েছে প্রবল,
ঠেকাবে কে বল্ ওকে ?
পল্টনগুলা করে লুণ্ঠন
যার-তার ঘরে ঢুকি' ;
নাগরিকে আর সৈনিকে, হায়,
বেধে গেল ঠোকাঠুকি।
ভুলি প্রতিজ্ঞা রাজা বিরুধক
হুকুম করিল জারি—
"শাক্যের কুল কর নির্ম্মূল
কি পুরুষ কিবা নারী।"

ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-রোল
কাঁদে নারী কাঁদে শিশু,
নাহি দ্যায় কান তাহে শয়তান
নিদারুণ বিজিগীষু।
আগুন জ্বলিছে খড়্গ ঝলিছে
রক্তে ফিনিক্ ছোটে;
তর্জ্জনে হাহাকারে একাকার
আর্ত্ত ধূলায় লোটে;
আহত লোকের বুকের উপরে
ছুটে চলে ক্ষেপা ঘোড়া,
তাণ্ডবে মাতি নাচে ক্ষেপা হাতী
বীভৎস আগাগোড়া।

(সপ্তম হল্‌কা)

নগরমুখ্য শ্রীমহানামন্
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে, হায়,
জীবন ভিক্ষা মাগিতে প্রজার
চলেছেন দ্রুত পায়।
চলেছে বৃদ্ধ ভগ্ন-হৃদয়
মরণ-পাংশু মুখে;
নগ্ন চরণে, দাঁড়াইতে রাজ-
দস্যুর সম্মুখে।
চলেছে সন্ত সুগত-পন্থ
দুটি হাত বুকে জুড়ে
দেশের দশের দুর্গতি দেখি
দুখের দহনে পুড়ে।
ভাবিছে বৃদ্ধ "একিরে বিষম
একিরে মনস্তাপ,
কোন্ কালামুখ রাজ্যকামুক
চিন্তিল মনে পাপ,
সে পাপের ছায়া কায়া ধরি পশে
কপিলবাস্তুপুরে
পুণ্যের ঘরে একি অনাচার
হাহাকার দেশ জুড়ে।
বুদ্ধের দেশে একিরে যুদ্ধ
একি হানাহানি, হায়,
প্রাণ দিলে যদি রোধ করা যেত
রুধিতাম আমি তায়।"

(অষ্টম হল্‌কা)

ভিক্ষা মাগিছে বৃদ্ধ আপন
দাসীর ছেলের কাছে,
"জয়তু রাজন্! বুড়া একজন
প্রসাদ তোমার যাচে;
নিজ পরিচয় দিতে নাহি ভয়,
মহানামনের নাম
হয়তো শুনেছ,—জননীর মুখে,—
ওগো কীর্ত্তির ধাম!
অতিথি একদা হ'ল তব পিতা
আমারি সে উপবনে
ভাবী রাণী সনে নয়নে নয়নে
মিলিল শুভক্ষণে;
এ বুড়া একদা মায়েরে তোমার
করেছে সম্প্রদান,"—
"জানি তা' জানি তা'" কহে উদ্ধত
"ছাড়ি' ভণিতার ভান
কী প্রসাদ চাও খুলে বল তাই।"
"নিরীহ প্রজার প্রাণ"—
কহিল বৃদ্ধ নীরবে সহিয়া
অবিনয় অপমান।
"নিজ প্রাণ নিয়ে পালাও বৃদ্ধ,
অধিক কোরো না আশ"
কহে বিরুধক মূর্ত্ত বিরোধ
হাসিয়া অট্টহাস।
"রাজন্!" "কি চাও?—যাও, যাও, যাও,
পালাও সপরিবারে,
এর বেশী কিছু কোরো না ভিক্ষা
আমার এ দরবারে।

কান কুণ্ডল কেটেছে আমার
তোমার নিরীহ প্রজা,
সমুচিত সাজা দিব আমি তার
বলে দিনু এই সোজা।"
মৌন ক্ষণেক রহিয়া বৃদ্ধ
কহেন জুড়িয়া কর
"জননীরে স্মরি' এ ভিক্ষা তবে
দাও কোশলেশ্বর!
নিশ্বাস রুধি' আমি যে অবধি
ডুবিয়া থাকিব জলে
সে অবধি লোক কোরো না আটক
যাক্ যেথা খুসী চ'লে।
তারপর তুমি দিয়ো জনে জনে
শাস্তি ইচ্ছামত।"
"ভাল, তাই হবে"—বলে' রাজা ভাবে—
"বুড়ার দম বা কত?
কত বা পালাবে?—যাবে, দেখা যাবে;
বুড়াটা পালায় যদি!—
তবে এ নগরে কি পথে কি ঘরে
রক্তে বহাব নদী।"

(নবম হল্‌কা)

অবারিত দ্বার পালায় যে যার
যেথা দু'চক্ষু যায়,
কপিলবাস্তু হরিষে বিষাদে
মূরছি পড়িল প্রায়।
কেউ বেগে ধায় পিছে না তাকায়
প্রাণ নিয়ে সোজাসুজি,
কেউ যেতে যেতে ফিরে এসে ফের
তুলে নিয়ে যায় পুঁজি।
বসন ভূষণ ফেলে কেহ ধায়
ছেলে আঁকড়িয়া বুকে,
ফ্যাল্‌ফ্যাল্ চায় ইতিউতি ধায়
কথা নাই কারো মুখে

সোনা কুশাসনে জড়ায়ে গোপনে
বিপ্র পালায় রড়ে,
যেতে তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠীর ভুঁড়ি
ঝন্‌ঝন্ রবে নড়ে!
কাণ্ড দেখিয়া কোশল-সৈন্য
চোখ পাকালিয়া চায়,
রাজার হুকুমে দু'হাত গুটায়ে
দাঁতে দাঁত ঘষে, হায়!

(দশম হল্‌কা)

হোথা বিরূধক বিরক্ত মনে
পাটলি হ্রদের কূলে
পল গণি' গণি' হয়েছে অধীর
ধবল-ছত্র-মূলে।
"জনহীন প্রায় হ'ল যে নগরী,
মন্ত্রী, এ কী বালাই,
এখনো যে দেখি মহানামনের
উঠিবার নাম নাই!
জ্বলে দেহ রাগে, কে জানিত আগে
বুড়ার এতটা দম?
ফেরফার কিছু নেই তো ভিতরে?—
সুড়ঙ্গে সংক্রম?—
ডুব দিয়ে কেউ দেখুক কি হ'ল,—
ফেরফার থাকে যদি
উচিত শাস্তি করিব বুড়ার
রক্তে বহাব নদী।"
মনে মনে কয় মন্ত্রী "তেমন
কিসে আর হবে সখে,
লোক কই আর?—রক্ত-তৃষা কি
মিটাবে অলক্তকে?"

(একাদশ হল্‌কা)

পল গণি' গণি' প্রহর কেটেছে
নারে আর দেরী নয়,
কোনো কৌশলে ফাঁকি দিয়ে বুড়া
পালায়েছে নিশ্চয়।

পাটলির জল তোলপাড় করে
কোশল-রাজের লোক,
মহানামনেরে পাক্‌ড়া করিতে
নাকে মুখে লাগে জোঁক।
পাঁক তোলে আর আঁকুবাঁকু করে,
ঢোকে ঢোকে জল খায়;
জলের তলায় কই সুড়ঙ্গ ?
কই বুড়া কই ? হায় !
সহসা ফুকারি কহিল জনেক
"না না পালায়নি কেহ,
শালের শিকড় আঁকড়িয়া আছে
আড়ষ্ট মৃতদেহ !
ছল ক'রে বুড়া ডুবেছিল জলে
বুড়ার কি কড়া জান,
জলের তলায় মরিল হাঁপায়ে
বাঁচাতে পরের প্রাণ !"
ক্রোধে চীৎকারি কহে বিরুধক
"ভারি—ভারি বাহাদুরী
খাবি খেতে খেতে খল-পনা,—মরে'
গিয়ে তবু জুয়াচুরী !"

(দ্বাদশ হল্‌কা)

ক্লেশের মরণ বরণ করিয়া
অমর হইল কারা ?
স্মৃতি-ছায়াপথ উজলি জগৎ
তারা হ'য়ে আছে তারা !
মরণের সাথে করি মহারণ
হ'ল মৃত্যুঞ্জয়,
দেশভায়েদের আয়ু কে বাড়াল
নিজ আয়ু করি' ক্ষয় ?
মানুষে মানুষে বিশ্বাস কার
প্রতি নিশ্বাসে বাড়ে ?
কার সংযম চরম সময়ে
যমের দণ্ড কাড়ে ?
কে ধর্ম্মিষ্ঠ স্বদেশনিষ্ঠ
ধর্ম্মের রাখি' মান
দেশের সেবায় করিল সহজে
নিজের জীবন দান ?
বীরের স্বর্গে অমল অর্ঘ্য
কারা পায় সব-আগে ?—
মহানামনের মহা নাম জাগে
তা'-সবার পুরোভাগে।
শাক্যকুলের দ্বিতীয় সিংহ
বুদ্ধ সে গৃহবাসী—
আড়াই হাজার বছরেও ম্লান
নহে তার যশোরাশি। *

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্য্যপ্রকৃতির সাম্য হইতে বৈষম্যে পরিণতি

প্রাচীন গ্রীকজাতি এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতি গোড়ায় একই জাতি ছিল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঘটনা-ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশই বাড়িতে থাকিয়া পরিশেষে দাঁড়াইল আসিয়া এমনি-এক চরম সীমান্ত প্রদেশে—যে প্রদেশে প্রভেদের আর এক নাম উদয়াস্তের বৈপরীত্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পিথাগোরাস Philosophy-শব্দের নির্জ্জীব শরীরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। Philosophy শব্দের অর্থ জ্ঞানের প্রতি প্রাণের ভালবাসা—সংক্ষেপে **জ্ঞানানুরাগ**। এই যে জ্ঞানানুরাগ—এই জ্ঞানানুরাগ আর্য্যজাতির একটা অস্থিমজ্জাগত বিশেষত্ব। পুরাতন গ্রীসের দেবপ্রতিমা এবং দেবালয় প্রভৃতির পরমাশ্চর্য্য গঠন-সৌকর্য্যে প্রতিভা'র হস্ত তো দেখিতে পাওয়া যায় খুবই, তা ছাড়া—জ্ঞানানুরাগের হস্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা কম না। আর্য্যজাতীয় এবং অনার্য্যজাতীয়

---

* বকহিল-রচিত বুদ্ধচরিত অবলম্বনে।

শিল্পের মধ্যে কত না প্রভেদ? এক দিকে যেমন দেখিতে পাওয়া যায় যে, মিসর বাবিলোন্ প্রভৃতি বড় বড় সাম্রাজ্যের বড় বড় শিল্পকার্য্য জগজ্জনের তাক্ লাগাইবার মতো করিয়া পরিগঠিত হইয়াছিল **ঐশ্বর্য্য-প্রিয়তার বিসদৃশ বিরাট্ ছাঁচে,** আর এক দিকে তেমি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাতন গ্রীসের উচ্চ অঙ্গের শিল্প-কার্য্যসকল ভাবুকের মনে ভাব জাগাইয়া তুলিবার মতো করিয়া বিরচিত হইয়াছিল **জ্ঞানানুরাগের সুসদৃশ রমণীয় ছাঁচে।** জ্ঞানানুরাগের পুণ্যসলিলা সরস্বতী এক্ষণে বটে তাহার এই সাধের জন্মভূমিতে উৎপাতের-উপর-উৎপাতের বালুকাস্তরে চাপা পড়িয়া মরিয়া রহিয়াছে বলিলেই হয়;—পুরাকালে কিন্তু তাহা গ্রীস দেশেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমি, উভয়ত্রই সমান বেগবতী ছিল। প্রভেদ কেবল এই যে, গ্রীস্‌দেশে তাহা জ্ঞানের বাহির-অঞ্চল'কে—বিষয়-রাজ্য'কে—নিখুঁত সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে ধাবমান হইয়াছিল; আমাদের দেশে তাহা জ্ঞানের ভিতর-অঞ্চল'কে—বিষয়ি-রাজ্য'কে—ঐরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে ধাবমান হইয়াছিল। এক কথায়—বাহিরের সৌন্দর্য্য এবং ভিতরের আনন্দের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, পুরাতন গ্রীস্‌দেশীয় শিল্প এবং আমাদের দেশীয় শিল্পের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৬ষ্ঠ পঞ্চিকার ১ম অধ্যায়ের ১ম খণ্ডে আছে

"ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি। এতেষাং বৈ শিল্পানাং অনুকৃতীহ শিল্পং। যদেব শিল্পানি আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈ র্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" [বাংলা] "এই-সকল দেবশিল্পকে শিল্প বলা যাইতেছে। আর আর শিল্পসকল দেবশিল্পের অনুকরণ মাত্র। এই যে মন্ত্ররূপী শিল্পসমূহ ইহারা আত্মার সংস্কার সাধন করে। যজমান এতদ্দ্বারা আত্মাকে ছন্দোময় করিয়া গড়িয়া তোলেন।" এতদ্ব্যতীত ঋগ্‌বেদের অনেক স্থানে রথশিল্পীদের রথনির্ম্মাণের সহিত ঋষিদিগের স্তোত্র-রচনার উপমা দেওয়া হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় আছে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" [বাংলা] "যোগ একপ্রকার কর্ম্মকৌশল" অথবা, যাহা একই কথা, যোগ একপ্রকার আধ্যাত্মিক শিল্প-নৈপুণ্য।* ভারতবর্ষীয় ঋষিদিগের জ্ঞানানুরাগ এইরূপ উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক শিল্পের মধ্য দিয়া পরাবিদ্যার দিকে অগ্নিশিখার ন্যায় উন্মুখ হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, স্বর্ণকারের নল-প্রধাবিত ফুৎকার-বলে অগ্নিশিখা যেমন দ্রাব্য স্বর্ণখণ্ডের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে—গ্রীস্‌দেশীয় আর্য্যদিগের জ্ঞানানুরাগ তেমি উচ্চ অঙ্গের লৌকিক শিল্পের মধ্য দিয়া পরাবিদ্যা হইতে অপরাবিদ্যার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

প্রাচীনকালের সভ্যতা'কে মোটের উপর দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে—(১) আর্য্যজাতীয় সভ্যতা এবং (২) অনার্য্যজাতীয় সভ্যতা। এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর সভ্যতার ভিতরের লক্ষ্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ ছিল দুই বিভিন্ন-ধর্ম্মী অভীষ্টের প্রতি। আর্য্যজাতীয় সভ্যতার ভিতরের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল—ঐশ্বর্য্যের প্রতি তত না, যত **জ্ঞানের প্রতি**; অনার্য্যজাতীয় সভ্যতা'র ভিতরের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল—জ্ঞানের প্রতি তত না, যত **ঐশ্বর্য্যের প্রতি**। বিমল গঙ্গা এবং শ্যামল যমুনা'র সঙ্গমঘটনের ন্যায় আর্য্যানার্য্য সভ্যতার সঙ্গম ঘটিয়াছিল—প্রাচীন গ্রীসেও যেমন—প্রাচীন ভারতেও তেমি। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, গ্রীস্‌দেশীয় আর্য্যজাতির সহিত পশ্চিম-এসিয়ানিবাসী এবং উত্তরপূর্ব্ব-আফ্রিকানিবাসী অনার্য্য সভ্য জাতিগণের মেশামেশা ঘটিয়াছিল সুগম জলপথের মধ্য দিয়া খুব সুবিধামাফিক; পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির সহিত দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় অনার্য্য সভ্যজাতিগণের মেলামেশা ঘটিয়াছিল দুর্গম অরণ্য এবং পর্ব্বতের মধ্য দিয়া অনেক কষ্টে; আর সেইজন্য, গ্রীস্ দেশীয় আর্য্যজাতির সহিত দুই বাপা-ভালুকো গোচের অনার্য্য সভ্য জাতির—ফিনীসীয় এবং মিশর দেশীয় অনার্য্য সভ্যজাতির—যেমন পুরা-মাত্রা মিশ্ খাইয়াছিল, আমাদের দেশের আর্য্যজাতির সহিত দাক্ষিণাত্যনিবাসী অনার্য্য সভ্যজাতির তাহার সিকির সিকি মাত্রাও মিশ্ খাইতে পারে নাই, আর

* বীরভূমের জমিদার বংশীয় স্বর্গীয় প্রতাপনারায়ণ সিংহ—যিনি আমার শ্রদ্ধাস্পদ ধর্ম্মভ্রাতা এবং প্রিয় বন্ধু ছিলেন, তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ আমার এইস্থানের এইকথাটি শুনিয়া আমাকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার বিরচিত একটি যোগবিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধে ঐ কথাটি আরো ফুটাইয়া বলিয়াছেন এইরূপ:—'Yoga is the art of building up a eautiful life in consonance with the laws of spirit!"

সেইজন্য দাক্ষিণাত্যনিবাসী অনার্য্য সভ্যজাতিরা আর্য্যাবর্ত্তের স্মৃতিপুরাণ-শাস্ত্রে রাক্ষস এবং বানরের দলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। নালী'ঘা যেমন চর্ম্মে দেখা দিলে মর্ম্মে প্রবেশ না করিয়া ছাড়ে না, তেম্নি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্য্যজাতি-দোঁহের প্রকৃতিগত সাম্যের ভিতরে ঐ অবস্থাগত বৈষম্যটি অল্পে অল্পে পথ কাটিয়া কাটিয়া মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া পরিশেষে প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়াইল। ঘটিল যাহা—তাহা এই :—

আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কৃতভাষী জাতির জ্ঞান-ভক্ত আর্য্য প্রকৃতি, এবং বালি ও রাবণের স্বজাতিগণের ঐশ্বর্য্যভক্ত অনার্য্য প্রকৃতি পরস্পরের সহিত সমান-সমান ভাবে মেলা-মেশা করিতে সুবিধামতো পথ পাইল না; আর, তাহার ফল হইল—ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সমাজের মধ্যে ঐশ্বর্য্যানুরাগের সংস্রব হইতে জ্ঞানানুরাগের বিশ্লেষণ এবং পরাবিদ্যার সেবা-কার্য্যে বিদ্বন্মণ্ডলীর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির ঐকান্তিক বিনিয়োগ। পক্ষান্তরে, পুরাতন গ্রীকদিগের জ্ঞান-ভক্ত আর্য্যপ্রকৃতি এবং ফিনীসীয় প্রভৃতি জাতিদিগের ঐশ্বর্য্য-ভক্ত অনার্য্য-প্রকৃতি পরস্পরের সহিত সমান-সমান ভাবে মেলা-মেশা করিতে পথ পাইয়াছিল দিব্য সুবিধামতো; আর, তাহার শুভ ফল যাহা ঘটিয়াছিল তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বাণিজ্যব্যবসায়সূত্রে পশ্চিম-এসিয়া এবং উত্তরপূর্ব্ব-আফ্রিকার সঙ্গে পুরাতন গ্রীসের আদান-প্রদান চলিয়াছিল নানা রকমের, আর সেই সুযোগে যবন-জাতীয় আর্য্যসন্তানেরা শিল্প-বাণিজ্যাদি-ঘটিত অপরাবিদ্যায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তানদের অপেক্ষা ঢের বেশী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

জ্ঞানানুরাগ এবং ঐশ্বর্য্যানুরাগের মিলন-পারিপাট্যের ফল যাহা ফলিয়া উঠিল পুরাতন গ্রীসের শেষ বয়সে, তাহা মস্ত একটা জগদ্‌বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যাপার :—মহাপণ্ডিত আরিষ্টটেলের মস্তিষ্ক-বলোপার্জ্জিত জ্ঞানের আলোক এবং তাঁহার দিগ্‌বিজয়ী-শিষ্য বীর-কেশরী আলেক্‌জাণ্ডারের বাহুবলোপার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের প্রতাপ জোড়ে মিলিয়া পৃথিবী মধ্যে হুলস্থুল বাধাইয়া দিল। আলেক্‌জাণ্ডারের মহৈশ্বর্য্য কটালের বানের ন্যায় হু হু করিয়া ফাঁপিয়া উঠিলও যেমন দেখিতে দেখিতে, আর, প্রকাণ্ড একটা বুদ্‌বুদের ন্যায় ফাটিয়া সহস্রধা ছটকিয়া পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়া গেলও তেম্নি দেখিতে দেখিতে। বিধাতার মনে কি আছে তাহা আগে-থাকিতে আঁচিতে পারা দেবতারও অসাধ্য :—দর্শকেরা সকলেই মনে করিলেন "এইবার আলেক্‌জাণ্ডারের অতুল কীর্ত্তিকলাপ সর্ব্বসুদ্ধ রসাতলে যায় বা!" ইতিমধ্যে আলেকজাণ্ডারের ধরাবলুণ্ঠিত ঐশ্বর্য্যের ভস্মরাশির মধ্যে জ্ঞানাগ্নি ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া পৃথিবীর অবৈজ্ঞানিক পুরাতন যুগ একেবারেই উল্টাইয়া দিল।

যুগ উল্টাইয়া দিবার অধিনায়কদিগের প্রধান জটলার স্থান হইল আলেক্‌জাণ্ডারের সেই অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ যাহার আলেক্‌জান্দ্রিয়া-নাম অতি অল্পকালের মধ্যেই সারা পৃথিবীময় ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকার সন্ধিস্থলবর্ত্তী লক্ষ্মীসরস্বতীর মহা পীঠস্থানে—প্লেটো'র পরাবিদ্যা, আরিষ্টটেলের নানামুখীন বিদ্যা, ইউক্লিড্‌মুখ্য পণ্ডিতগণের জ্যামিতিবিদ্যা, হিপার্কস্‌মুখ্য পণ্ডিতগণের জ্যোতির্ব্বিদ্যা, আর্কিমীডীস্‌মুখ্য পণ্ডিতগণের যন্ত্রবিদ্যা—এক কথায় পুরাতন গ্রীসের চিরসঞ্চিত বিদ্যার সমস্ত পুঁজিপাটা—একত্র সমবেত হইয়া ঐ সুমঙ্গল তীর্থস্থানটিকে সর্ব্ববিদ্যার জ্যোতিষ্কেন্দ্র করিয়া তুলিল। যুগপরিবর্ত্তনকারী বিজ্ঞানের সেই তেজঃপুঞ্জ প্রাতঃসূর্য্য দিক্‌চক্রবালে মাথা তুলিবা-মাত্রই তাহার বিশ্ব-বিজয়িনী রশ্মিছটা আরব্য ইহুদীয় এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের চিরপোষিত অজ্ঞানান্ধকারের দুর্গকপাটে ঘনঘন আঘাত করিতে আরম্ভ করিল; তাহার পরে দিক্‌চক্রবালের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে উত্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে তমোঘ্ন রশ্মিজাল প্রসারণ করিতে লাগিল। এইখান হইতেই শাস্ত্রমূলক পুরাতন জ্যোতিষের রশ্মিছটা প্রমাণমূলক নূতন বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া ইটালীর এবং ইটালী হইয়া অন্যান্য ইউরোপীয় প্রদেশের বাইবেল-ভক্তি-প্রসূত মোহান্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। এইখান হইতেই প্লেটোনিক পরাবিদ্যার বিমল রশ্মিছটা ভারতীয়-ব্রহ্মবিদ্যা মিশ্রিত নূতন বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া ইহুদীয় ধর্ম্মের মোহমেঘের ফাটকে আটক পড়িয়া কিয়ৎকাল-যাবৎ চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার

পরে মেঘমুক্ত হইয়া ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতসমাজে নিজমূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরাবিদ্যা-ভাগীরথীর গোমুখী কিন্তু আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমি এটা ভুলিলে চলিবে না। যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহাদের কাহারো নিকটে এ-কথা ঢাকা থাকিতে পারে না যে, প্লেটো'র গুরু ছিলেন একদিকে যেমন তাঁহার সমকালের সক্রেটিস্ **চারি আনা মাত্রা**, আর একদিকে তেম্নি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের পিথাগোরীয় এবং আইওনীয় সম্প্রদায়ের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা **বারো আনা মাত্রা**; আর শেষোক্ত আচার্য্যগণের গুরু ছিলেন (পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমি যেমন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি) ভারতবর্ষীয় তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরা; তা ছাড়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নব-বিধান-খণ্ডের ভিতরে তত্ত্বজ্ঞানের আভাস যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তেরই গুরু ছিলেন প্লেটো। আমি তো বলিলাম "গুরু ছিলেন প্লেটো"; কিন্তু আমার **মন** তাহাতে কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। আশ্চর্য্য এই যে, আমার মন যাহা বলিতেছে তাহা পণ্ডিতবর Holmesএর প্রণীত Creed of Buddha নামক পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে এইরূপ;—

"In christendom the character of Jehova has been profoundly modified (though the change which has been effected is as yet potential rather than actual) by the influence of the Founder of Christianity, whose ideas, whatever may have been the history of their development in his mind, belong in their essence to the creed of the Far East."

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত—ঈসা মহাপ্রভু আমাদের দেশের জ্ঞানি-জনের সহিত কখন্ কিরূপ সংস্রবে আসিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে আমি প্রস্তুত না-থাকা কারণে আমার মনোগত পূরা সত্য-কথাটির পরিবর্ত্তে আমাকে এইরূপ একটি আধা সত্য-কথা বলিয়াই অগত্যা ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নববিধান-খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞানের আভাস যত কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তেরই গুরু ছিলেন প্লেটো। কিন্তু তাহা হইলেও প্রকারান্তরে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, আমাদের দেশের ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যেরাই খৃষ্টীয় তত্ত্বজ্ঞানের আদি গুরু—কেননা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমি এই গুপ্ত রহস্যটি প্রকাশ্যে টানিয়া বাহির করিতে পারৎপক্ষে ত্রুটি করি নাই যে, আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যেরাই পুরাতন গ্রীসের তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যগণের আদি গুরু ছিলেন।

এখানে আমি অতিশয় ব্যাপক অর্থে গুরুশব্দ ব্যবহার করিতেছি ইহা বলা বাহুল্য; আর, বর্ত্তমান প্রকরণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত করিবও আমি তাই। প্রচলিত অভিধান-শাস্ত্রে বলে শুধু এই যে, শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ আচার্য্য; পরন্তু আমার এখানকার অভিধান-শাস্ত্রে অধিকন্তু বলে এই যে, শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ ব্যতীত ব্যাস, কপিল, বুদ্ধদেব প্রভৃতি অনেকানেক মহাত্মা। তেম্নি আবার—প্রচলিত অভিধান-শাস্ত্র কেবল এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত যে, চৈতন্য মহাপ্রভু, তাঁহার সামকালিক রামানন্দ নরোত্তম হরিদাস প্রভৃতি শিষ্যগণের গুরু ছিলেন, তথৈব, ঈসা মহাপ্রভু তাঁহার সামকালিক পীটর্ জোহান্ প্রভৃতি শিষ্যগণের গুরু ছিলেন; পরন্তু আমার এখানকার অভিধান-শাস্ত্রে অধিকন্তু বলে এই যে, চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার পরবর্ত্তী কালের বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-মাত্রেরই গুরু—ঈসা মহাপ্রভু খৃষ্টান মাত্রেরই গুরু।

জিজ্ঞাসু ॥ তা যদি আপনি বলেন—তবে চৈতন্য মহাপ্রভুও তো বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার গুরু ছিলেন কে? ঈসা-মহাত্মারই বা গুরু ছিলেন কে?

প্রবোধয়িতা ॥ এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন নারদ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ভাগবত সম্প্রদায়ের পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা; পরন্তু ঈসা-মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন যে, কে, এ কথাটার একটু সমঝিয়া উত্তর দেওয়া আবশ্যক। এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, তাঁহার স্বদেশীয় আচার্য্যগণ তাঁহার গুরু ছিলেন না; কে যে তবে তাঁহার গুরু ছিলেন—সেইটিই হ'চ্চে বিষম সমস্যা। জিজ্ঞাস্য বিষয়টির সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের হৃদ্গত ভক্তির সহিত আমার চিদ্গত যুক্তির **তেলে-জলের** ন্যায় **অ**-বনিবনাও। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের হৃদ্গত ভক্তি বলে—ঈসা মহাপ্রভুর গুরু স্বয়ং ঈশ্বর; ইহাদের এই কথাটি এক হিসাবে যেমন

সর্ব্ববাদি-সম্মত সত্য; আর এক হিসাবে তেমি একটুও সত্য নহে। ঈশ্বর স্বয়ং যেমন সকল মনুষ্যেরই গুরু, আর তা ছাড়া পশুপক্ষীদিগেরও গুরু, তেমিভাবে তিনি ঈসা-মহাপ্রভুরও গুরু, এ কথা কেহই অস্বীকার করেনও না—অস্বীকার করিতে পারেনও না। খৃষ্ট-ভক্তেরা কিন্তু এই সর্ব্ববাদি-সম্মত কথাটি বলিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া—যে-ভাবে আমরা বলি বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবদিগের গুরু চৈতন্য মহাপ্রভু, শিখ্‌দিগের গুরু নানক, মুসলমানদিগের গুরু মহম্মদ, পক্ষিশাবকের গুরু মাতা-পক্ষিণী, সেই ভাবে বলেন যে ঈশ্বর স্বয়ং অ্যাকা কেবল ঈসা-মহাপ্রভুরই গুরু, তা বই আর-কোনো ব্যক্তিরই গুরু নহেন। এই জায়গাটিতেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের হৃদ্‌গত ভক্তির সহিত অপরাপর নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের চিদ্‌গত যুক্তির তেলে-জলের ন্যায় কিছুতেই মিশ্‌ খাইতে পারে না। আমার বিশ্বাস এই যে সেণ্ট্‌মাথিউ'র লিখিত খ্রীষ্ট-চরিতে এই যে একটি কথা লিখিত আছে

"There came wise men from the east to Jerusalem. Saying where is he that is born king of the Jews? for we have seen his star in the east and are come to worship him."—

এ কথাটা যদিচ আর আর পুরাতন কালের পৌরাণিক ইতিহাসের ন্যায় একটা সাজানো উপন্যাস মাত্র, তথাপি উহার যবনিকার আড়াল হইতে খুব একটি সম্ভবপর সত্য-কথা উঁকি দিতেছে—যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা তাহা দেখিতে পা'ন। সে কথাটি এই যে, মহাত্মা ঈসার মর্ত্ত্য-জীবনের কৃত্য-কার্য্যটি আমাদের দেশের জ্ঞানিজনকর্ত্তৃক সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অনুমোদিত হইয়াছিল; আর, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ঈসা-মহাপ্রভুর প্রথম বয়সে তিনি কোনো-না-কোনো সূত্রে আমাদের দেশের জ্ঞানিজন-গণের সহিত সংস্রবে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হাজার হোক—আমার মনোগত কথাটার এটা একটা অত্যন্ত কাঁচা ধরণের অভাবপক্ষীয় প্রমাণ মাত্র, আর সেইজন্য তাহা অধিকাংশ পাঠকগণের সন্তোষভাজন না হইবারই কথা। আমি তাই আমাদের দেশের জ্ঞানিজনের সহিত ঈসা-মহাপ্রভুর সংস্রবের কথাটা আমার মনের মধ্যে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এইটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিব মনে করিয়াছি যে, প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাব ঈসা-মহাপ্রভুর মনোমধ্যে কতক না কতক পরিমাণে কার্য্য করিয়াছিল অবশ্যই—কেননা তাঁহার আবির্ভাবের অনতি-পূর্ব্বে প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞানের বীজ কয়েকজন মাথালো মাথালো ইহুদী শাস্ত্রিগণের জ্ঞানালোচনা-ক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া নূতন স্ফূর্ত্তিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল—ইহা সকলেরই জানা কথা।

ঈসামহাপ্রভুর মুখ্য মন্তব্য কথাটি ছিল এই যে, ঈশ্বর সর্ব্বজগতের পিতা এবং জাতি-বিজাতি-নির্বিশেষে সমস্ত মনুষ্যই তাঁহার সমান স্নেহের পাত্র। পক্ষান্তরে, ইহুদী শাস্ত্রিগণের মুখ্য মন্তব্য কথাটি ছিল এই যে, জিহোবা তাঁহাদের স্বজাতির একপ্রকার নিজস্ব ঈশ্বর। এটা ছিল তাঁহাদের একটা আবহমানকালের চিরপোষিত হৃদ্‌গত বিশ্বাস যে, জিহোবা-ঈশ্বর যেমন তাঁহাদের **স্বজাতির** সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী এমন-আর কোনো জাতিরই না; আর সেইজন্য ভবিষ্যতে যখন তাঁহার মসীহা অবতার (Messia) স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া নিখিল সসাগরা পৃথিবীর রাজ্য-ভার স্বহস্তে লইবেন, তখন ইহুদী জাতি যেমন তাঁহার ষোলো আনা অনুগ্রহের পাত্র হইবে এমন-আর কোনো জাতিই না। ঈসা মহাপ্রভুর Heavenly Father (স্বর্গীয় পিতা) এবং তাঁহার স্বজাতীয় শাস্ত্রি-মহোদয়দিগের রাজেশ্বর জিহোবার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ইহা বলা বাহুল্য। Heavenly Father নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করা তখনকার কালের ইহুদী শাস্ত্রীদিগের কর্ণে যতই নূতন ঠেকিয়া থাকুক্ না কেন—আমাদের দেশের বেদবিৎ পণ্ডিতগণের নিকটে তাহা কিছুই নূতন নহে; তা'র সাক্ষী—বিগত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে আমি নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি:—

"দৌষ্‌পিতঃ......মৃড়তা নঃ" [বাংলা] "হে দৌষ্‌পিতা আমাদিগকে সুখী কর।" দৌঃশব্দের অর্থ heaven বা দ্যুলোক বা নাক্ষত্রিক জগৎ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের ১১শ খণ্ডে আছে "ঔপমন্যব কং ত্ব-মাত্মানং উপাস্স ইতি। দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি। হোবাচ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরোঽয়ং ত্বমাত্মানং উপাস্সে" [বাংলা] রাজা প্রশ্ন করিলেন "ঔপমন্যব, কোন্

আত্মাকে তুমি উপাসনা করিয়া থাক?" ঔপমন্যব বলিলেন "দ্যৌ'কে মহারাজ।" রাজা বলিলেন "এই যে দ্যৌ-আত্মা যাঁহার তুমি উপাসনা করিয়া থাক, ইনি সুতেজা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডে আছে "তস্য হ বা এতস্য আত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজা" [বাংলা] "এই যে বৈশ্বানর আত্মা ইঁহার মস্তক সুতেজা"; ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, সূর্য্যাতিসূর্য্য ক্রোড়ে করিয়া নাক্ষত্রিক জগৎ বা সুতেজা বা দ্যৌ বা heaven সমস্ত জগতের মাথা—কি না মূল নিয়ামক; আর, সেই জন্য বলা যাইতে পারে যে, যিনি নাক্ষত্রিক জগতের অধীশ্বর, তিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর; আর, যিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর, তিনি জ্ঞানবান্ জীবগণের আত্মার অধীশ্বর এবং ভক্ত-জনগণের প্রাণের অধীশ্বর। ঋগ্‌বেদের এই দ্যৌষ্পিতাকেই শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ি সংহিতার মাধ্যন্দিনীয় শাখার ৩৭শ অধ্যায়ের ২০শ মন্ত্রে "পিতানোঽসি" "তুমি আমাদের পিতা" বলিয়া ডাকা হইয়াছে; তা ছাড়া, কাব্য-পুরাণাদিতে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির অধীশ্বর পরমপুরুষকে জগতের মাতাপিতা বলিয়া ভূয়োভূয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে; তার সাক্ষী রঘুবংশের গোড়াতেই আছে "জগতঃ পিতরৌ বন্দে" [বাংলা] "জগতের পিতামাতাকে বন্দনা করি।" এই যে, আর্য্যজাতিগণের পরমারাধ্য দ্যৌষ্‌পিতা বা Heavenly father—যিনি নাক্ষত্রিক জগতের অধীশ্বর এবং ভক্তজনগণের হৃদয়ের অধীশ্বর, ঈসা-মহাপ্রভু সেই Heavenly fatherএরই—দ্যৌষ্‌পিতারই একান্ত অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, তা বই, তিনি তাঁহার স্বজাতির নিজস্ব ঈশ্বরের কি না জিহোবার এ৹টুও ভক্ত ছিলেন না। ঈসা-মহাপ্রভু ইহুদীয় শাস্ত্রি-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজেশ্বর জিহোবার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরের—Heavenly fatherএর—দ্যৌষ্‌পিতা'র—পূজার প্রবর্ত্তন করিতে কত না চেষ্টা পাইয়াছিলেন! কিন্তু রাজেশ্বর জিহোবা'র অবমাননা ইহুদী শাস্ত্রীদিগের প্রাণে সহিবে কেন—কাজেই ইহুদীশাস্ত্রিগণের সমস্ত দলবল অ্যাক্‌জোট্ হইয়া ঈসা-মহাপ্রভু'কে বিধর্ম্মী বলিয়া হুটু করিয়া দিলেন। ঈসা-মহাপ্রভুর জীবৎকালে ইহুদীদিগের নেতৃপক্ষীয় শাস্ত্রি-মহোদয়েরা রোমীয় শাসনের প্রতাপানলে এরূপ দুর্ব্বিসহ অন্তর্দাহে গুম্‌রিয়া গুম্‌রিয়া সারা হইতেছিলেন' যে, মসীহা কবে জেরুসালেমের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের শোকাশ্রুকে আনন্দাশ্রুতে পরিণত করিবেন তাহারই প্রত্যাশা তাঁহাদের জীবনের প্রধানতম উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কাজেই তাঁহাদের রাজরাজেশ্বর জিহোবাকে তাঁহারা কোথায় জেরুসালেম-মহানগরীর রাজসিংহাসনে বসাইবেন—তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক-tabernacle হইতে উঠাইয়া আনিয়া আর এক tabernacleএ বসাইতে—হৃদয়-tabernacleএ বসাইতে—কিছুতেই তাঁহাদের মন সরিল না। ফল কথা এই যে, তেলে-জলে যেমন মিশ্ খায় না, তেম্নি জ্ঞান-প্রেম-ভক্ত আর্য্যপ্রকৃতির সহিত ঐশ্বর্য্য-ভক্ত অনার্য্যপ্রকৃতির আদবেই মিশ্ খায় না। ঈসা-মহাপ্রভু জন্মিয়াছিলেন-বটে অনার্য্য-বংশে, কিন্তু তাঁহার যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার স্বজাতীয় অনার্য্য প্রকৃতিকে আর্য্য ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লওয়া হইয়াছিল বলিলে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই! আমার বিশ্বাস এই যে, ইংরাজী শাসনের মধ্য দিয়া আমাদের দেশের ভট্টাচার্য্যগণের উপরে যেমন ইউরোপীয় বিদ্যার প্রভাব তলে তলে কার্য্য করিতেছে, তেম্নি ঈসা-মহাপ্রভুর আবির্ভাবের এক-আধ্ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই রোমীয় শাসনের মধ্য দিয়া ইহুদী শাস্ত্রীদিগের উপরে গ্রীস্ দেশীয় বিদ্যার—আর সেই সঙ্গে নব-প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞানের—প্রভাব তলে তলে কার্য্য করিয়াছিল; আর, ঈসা-মহাপ্রভুর প্রথম বয়সে কতক বা সেই গ্রীক প্রভাবের—কতক বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারক-দিগের ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত বিশ্বব্যাপী মৈত্রীভাবের—বাতাস তাঁহার গায়ে লাগা'তে, তাহারই গুণে তিনি দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ হইয়া উঠিয়াছিলেন।* তা'ছাড়া—বৌদ্ধ কিম্বদন্তীর সহিত খ্রীষ্টীয় কিম্বদন্তীর একটি স্থানে খুব স্পষ্ট সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ:—বুদ্ধদেব যেমন মার-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবা-

* বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী মহাযান-পন্থীদিগের মধ্যে ঈসা-মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই নিরীশ্বরতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভগবদ্-ভক্তির স্রোত প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল—বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব নাই।

মাত্র মার'কে পরাজয় করিয়াছিলেন, ঈশা মহাপ্রভু তেম্নি সয়তান কর্তৃক আক্রান্ত হইবা-মাত্র সয়তান'কে পরাজয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, আমাদের দেশের এই যে দুইটি শাস্ত্রীয় ভাষার বচন—"মাঙ্গলিক অভিষেক" (baptism), "দ্বিতীয় জন্ম" (new birth), এ দুইটি বচন খৃষ্ট-চরিতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রের মধ্য দিয়া না-তো-আর কোন্ শাস্ত্রের মধ্য দিয়া? আবার খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের আদিম প্রচারকদিগের মনের উপরে প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞান আধিপত্য করিয়াছিল নিতান্ত কম না;—সেণ্ট্‌পাউল যে, ইহুদী তত ছিলেন না যত গ্রীক ছিলেন, আর, সেণ্ট্‌জন্ যে, নব-প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞানের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বহস্ত-লিখিত পত্রাবলী এবং পুস্তকেই মধ্যাহ্ন-দিবালোকের ন্যায় সুব্যক্ত। প্লেটোনিক তত্ত্বজ্ঞান-সরস্বতী যে, বাহ্য-পরিচ্ছদেই **যবনী**—পরন্তু যবনিকা'র আড়ালে তিনি মূর্ত্তিমতী **ভারতী**—ইহা আমি অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি। এই সকল পর্দার আড়ালের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া-শুনিয়া আমার মনোমধ্যে এইরূপ একটা ধ্রুব বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আমাদের দেশের পরাবিদ্যা নানাপ্রকার গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়া অলক্ষিত ভাবে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় ধর্ম্মরাজ্যে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল **প্রভূত পরিমাণে**।

☛ [Holmes-এর সুন্দর পুস্তকখানি (The Creed of Buddha) সম্প্রতি কেবল আমার হস্তে আসিয়াছে। ঐ পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আমার মনের মতো কয়েকটি ছত্র দেখিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি আমার প্রবন্ধটি ছাপাইতে দিবার পরে আমি তাঁহার পুস্তকের শেষাংশের একটি পরিচ্ছেদে আমার মনের কথাটি চমৎকার স্পষ্টাকারে প্রতিফলিত দেখিয়া আমার আনন্দ হইল এম্নি—যেন আমি হাতে চাঁদ পাইলাম!—সে পরিচ্ছেদটি এই:—

"To the pious Christian, who believes that Christ brought his ideas—or shall I say, his store of "theological information"?—down to earth from the supernatural Heaven, the suggestion that he borrowed ideas from India, or any other terrestrial land, may possibly seem profane, yet Theology itself admits, or rather insists, that Christ was (and is) "very man" as well as "very God"; and if he was "very man", if he was open to all human influences, we may surely take for granted that his pure and exalted nature was peculiarly sensitive to the spiritual ideas of his age. That Christ had come under the influence of the spiritual ideas of the Far East is a hypothesis which explains many things, and for which therefore there are many things to be said. To attempt to prove in detail the indebtedness of the 'Gospel' to the "Ancient Wisdom" would carry me far beyond the limits which the aim of this work has imposed upon me. But I would ask any one who can approach the question with a genuinely open mind to make the following simple experiment. Let him first saturate himself with the spiritual thought of India,—with the speculative philosophy, half metaphysical, half poetical, of the Upanishads, and with the ethical philosophy of Buddha. Let him then study the sayings of Christ, making due allowance for the distorting medium (of Jewish prejudice and Messianic expectation) through which his teaching has been transmitted to us. He will probably end by convincing himself, as I have done, that the spiritual stand-point of the sages of the Upanishads, of Buddha, and of Christ were, in the very last resort, identical.]

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরগাছা

(৪০)

রাণী জগদ্ধাত্রীর পোষ্যপুত্র লওয়ার উৎসব শেষ হইয়া গেলে মণিমালা রাখালকে বলিল—এইবার ত এখানকার সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল, এইবার চল।

রাখাল বলিল—এখনো যাবার সময় হয়নি। এত লোকের সুখদুঃখ একটা ছোট ছেলের হাতে পড়েছে; সে যদি সৎ হয়ে গড়ে না ওঠে ত লোকের সর্ব্বনাশ করবে; বিশেষতঃ কমিশনার সাহেব আমার হাতে ওর শিক্ষার ভার দিয়েছেন।

মণিমালা স্বামীর সহিত কখনো তর্ক করিতে পারিত না, সে নিরস্ত হইল।

এ বাড়ীতে মণিমালারও বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল। কুবের অকস্মাৎ দিদিকে এ বাড়ীতে প্রধান অবলম্বন মনে করিয়া তাহার নেওটো হইয়া উঠিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী একটা নূতন কিছু বড়মানুষী করিতেছি মনে করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পোষ্যপুত্রটির নিতান্ত গ্রাম্য চেহারা ও অশিষ্ট ব্যবহার তাঁহার মোটেই ভালো লাগে নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট পুত্রকে প্রিয় করিয়া তুলিবার জন্ত চন্দনমণি সদাই সচেষ্ট ছিল। কুবের একবারও তাহার কাছে গেলে সে তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিত—ওরে হাবা ছোঁড়া, যা না তোর পিসিমার কাছে, ভূপাল যে তোর পিসিমার মন জুড়ে বসছে; শেষে স্ত্রীধন সম্পত্তিটা কি তাকে দিয়ে ফেলবে!

কুবের রাণীর কাছে গেলে তিনি মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কুবের যদ ডাকিত—পিসিমা। অমনি জগদ্ধাত্রী তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিতেন—পিসিমা! যাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফতুর হলাম সে একদিন মা বললে না। দূর হ চক্ষুশূল আমার সামনে থেকে।

কুবের পিসিমার তিরস্কারে ও মায়ের শিক্ষায় যদি কোনো দিন রাণী জগদ্ধাত্রীকে মা বলিয়া ডাকিত তাহাও তাঁহার ভালো লাগিত না, বেজার হইয়া বলিতেন—অনভ্যেসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে। তোমার আর আড়ষ্ট হয়ে মা বলতে হবে না।

কুবের তিরস্কৃত হইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া গেলে মা তাহাকে আবার ধাক্কা দিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিত। তখন নিরুপায় কুবের কোনোখানে আশ্রয় না পাইয়া রাগে ও দুঃখে একলাটি এককোণে গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; স্নেহের অভাবে তাহার কঠিন মন কঠিনতর হইয়া উঠিতেছিল।

কুবেরের কোনো কিছুর দরকার হইলেও তাহার মা তাহাকে রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিত। তাহাতেও রাণী জগদ্ধাত্রী রুষ্ট হইয়া রূঢ় স্বরে বলিতেন— তোর মা আর বাবাই ত সব করছে, এটা করতে কি হল যে আদিখ্যেতা করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে?' ইহার ফলে এই হইত যে বেচারা কুবেরের অভাব না মা, না পিসিমা কেহই পূরণ করিতেন না।' এইসব কারণে কুবেরের বিরক্ত মন তাহার অধীন চাকর-দাসীদের উপর অকারণে অত্যাচার করিয়া লঘু হইতে চাহিত; এবং তাহার ফলে সে রাখালের নিকট তিরস্কার ও প্রহার লাভ করিত।

সকল দিক হইতে তাড়া খাইয়া সে একাকী ম্লান মুখে উদাস দৃষ্টিতে, কোথাও চুপ করিয়া প্রায়ই দাঁড়াইয়া থাকিত।

ইহা মণিমালার চোখে পড়াতে তাহার মন এই হতভাগ্য বালকের উপর করুণায় ভরিয়া উঠিল। তারপর হইতে সে তাহাকে ঐরূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেই তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া কোলের কাছে আনিয়া স্নেহ-গলিত স্বরে বলিত—কেন ভাই, অমন করে দাঁড়িয়ে আছ? কে বকেছে? তুমি আমার ঘরে এস, কি চাই তোমার?

সেইদিন হইতে মণিমালা খুঁজিয়া-খুঁজিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সকল অভাব মোচন করে, স্নেহ দিয়া যত্ন করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দ্যায়।

শেষে হইল এই, একটু কোথাও ব্যথা পাইলেই কুবের দিদির চোখে পড়িবার মতো জায়গাতেই আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু সাহস করিয়া কখনো নিজে সে দিদির ঘরে যাইতে পারে না; কারণ তাহার মা কোনো দিন তাহাকে মণিমালার কাছে দেখিলেই চোখ টিপিয়া আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে তিরস্কার করিত, মণিমালার ঘরে যাইতে নিষেধ করিত, এবং নিরন্তর তাহার মনে বিষ উদ্গিরণ করিয়া বলিত—রাম সকলের বন্ধু কিন্তু রামের বন্ধু কেউ নয়! ঐ যে ভূপালের মা, খবরদার ওকে এতটুকু বিশ্বাস করিসনে। ওরা তোর সব চেয়ে শত্রু, কারে পেলে পাঁশ পেড়ে কাটবে, বিষ খাওয়াবে।

এইরকম কথা বালকের মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট আতঙ্ক সৃজন করিত। তাহার মন মণিমালার কাছে যাইতে চাহিলেও সে যাইতে পারিত না।

কুবেরকে মণিমালা যে যত্ন করিতেছে এবং কুবেরও যে ক্রমে মণিমালার অনুগত হইয়া উঠিতেছে ইহা চন্দনমণির শ্যেনদৃষ্টি এড়াইল না। চন্দনমণি একদিন দেখিতে পাইল কুবের ভয়চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে চোরের মতন চুপেচুপে মণিমালার ঘরের দিকে যাইতেছে। চন্দনমণি বাঘিনীর মতন লাফাইয়া আসিয়া ছেলের কান ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তাহার গালে জোরে এক চড় কষাইয়া দিয়া বলিল—অপ্পেয়ে, উড়ে ফড়িং

পুড়ে মরে! শক্তুরের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিস। মার চেয়ে যে দরদী তাকে বলে ডান, এও জানিসনে।

কিন্তু চন্দনমণির এত সাবধানতা ও শাসন সত্ত্বেও কুবেরের চুরি করিয়া দিদির মমতার কাছে ধরা দিতে যাওয়া রোধ করা গেল না। চন্দনমণি সমস্ত দিন সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত, পাছে কেউ কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া খায় এই তার সব চেয়ে বেশী ভয়; রাণী জগদ্ধাত্রী সমস্তক্ষণ ভূপালকে লইয়া তন্ময় হইয়া থাকেন; সুতরাং চুরি করিয়া দিদির আদর কুড়াইয়া বেড়াইতে কুবেরকে বেশী বেগ পাইতে হইল না।

(৪১)

মণিমালা যখন অন্দরে কুবেরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন রাখালও বাহিরে আপনাকে নানা কর্ম্মের পাকে জড়াইয়া তুলিয়াছে। কুবেরকে পড়ানো, ঘোড়ায় চড়াইয়া সঙ্গে-সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাওয়া, তাহাকে সৎ উপদেশ দেওয়া রাখালের প্রধান কাজ হইয়াছে; কমিশনার তাহাকে পাহাড়পুর বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন; কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার সকল কাজে তাহারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন; প্রজারা কেহ কোনো বিপদে পড়িলে তাহাকেই আসিয়া ধরে—সেও ম্যানেজারকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করে। কোথাও আগুন লাগিলে রাখাল ঘোড়া ছুটাইয়া সেখানে গিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করে; গৃহহীন-দিগকে পাহাড়পুরে আনিয়া আশ্রয় দ্যায় এবং যাহাতে শীঘ্র তাহাদের নষ্ট গৃহ পুনর্নির্ম্মিত হয় তাহার চেষ্টা ও সাহায্য করে। কোথাও বন্যা হইলে রাখাল খাবার ও কাপড়ে নৌকা বোঝাই করিয়া সেই গ্রামে গিয়া বাস করে; কোথাও কলেরা হইলে হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্স লইয়া দিন নাই রাত নাই রোগী দেখিয়া বেড়ায়,—প্রায় লোকই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মর্ম্ম জানে না, তাহাদের কড়া হুকুমে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করায়। কোথাও জলকষ্ট আছে সংবাদ পাইলে সেখানে ইন্দারা করিয়া দিবার জন্য ম্যানেজারকে অনুরোধ করে; যেখানে রাস্তা নাই, সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে দিয়া রাস্তা করাইয়া দ্যায়। বেচন মণ্ডল খুব ধনী, বাড়ীতে হাতী পোষে, অথচ তাহার খড়ের বাড়ী, বছর বছর অগ্নিকাণ্ডে সে গৃহহীন হইয়া কষ্ট পায়, অনেক ক্ষতিও হয়; কিন্তু বাপপিতামহ কেহ ইট পোড়ায় নাই, ইট পোড়ানো তাহাদের সহিবে না, এই ভয়ে তাহারা কোঠা বাড়ী করে না; রাখাল সকল অমঙ্গলের ঝুঁকি নিজের উপর লইয়া নিজের নামে তাহাদিগকে ইট পুড়াইয়া দিয়া তাহাদের কোঠাবাড়ী করিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে; ইহার জন্য তাহারা সপরিবারে রাখালের কাছে কৃতজ্ঞ। নূতন পথ হইতেছে, পথের উপর "গ্রামদেবতী"র গাছ পড়িল, কেহ কাটিবে না, গাছটা থাকিলে পথটাতে বিশ্রী একটা মোচড় পড়ে, রাখাল নিজে কুড়ুল ধরিয়া সে গাছ কাটিয়া ফেলিল, অথচ লোকে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল জামাই-বাবু মুখে রক্ত উঠিয়া মরিল না; ইহাতে সকলে রাখালকে ভয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। তুফানি সাহার জমি জরিপ হইয়া আমিনরা আবিষ্কার করিয়াছে তুফানি একশত বিঘা জমি ছাপাইয়া ছিপাইয়া খাইতেছিল; তুফানি আসিয়া রাখালের সম্মুখে একশত টাকা রাখিয়া হাত কচলাইতে-কচলাইতে বলিল, বাবু পান খাইবার জন্য এই টাকা লইয়া যদি উহার জমিটা ছাড়াইয়া দ্যান; তুফানি রাখালের কাছে চাবুক খাইয়া টাকা তুলিয়া লইয়া দৌড় দিল, কিন্তু কিছুদিন পরে সে দেখিল তাহার বিনা তদ্বিরে একষট্টি বিঘা জমি সে ফেরত পাইয়াছে—সেই জমিটুকুই তাহার হকের পাওনা, বাকী জমিটা সে বাস্তবিকই ছাপাইয়া খাইতেছিল। রাখাল ম্যানেজারকে বুঝাইল যে পাহাড়পুরে ছেলেদের একটি বড় ইংরেজি স্কুল, মেয়েস্কুল, খয়রাতি ডাক্তারখানা ও হাঁস-পাতালের নিতান্ত অভাব আছে; ম্যানেজার নিমিত্ত মাত্র হইল, রাখালই প্রজাদের ডাকিয়া সভা করিয়া তাহাদিগকে স্কুল ও ডাক্তারখানার উপকারিতা বুঝাইয়া চাঁদা আদায় করিয়া গবর্মেণ্টকে লিখিয়া স্কুল ডাক্তারখানা ও হাঁসপাতাল স্থাপন করিল। ডাক্তার ও মাষ্টারদিগকে লইয়া সে সাহিত্য ও দেশহিতের উপায় আলোচনায় লাগিয়া গেল। এইসব কারণে রাখাল ইতরভদ্র সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র। তাহার দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা, গম্ভীর প্রকৃতি, সাধু চরিত্র, শুচি বাক্য ও অন্যায়-অসহিষ্ণু তেজস্বী ক্রোধন স্বভাব দেখিয়া সকলেই তাহাকে ভয় করিত; যে

ব্যক্তি তামাক পর্য্যন্ত খায় না, রহস্য করিয়াও অশ্লীল বা মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করে না, যে এতটুকু ত্রুটি দেখিলে রূঢ় কঠিন দণ্ডবিধান করে, আবার যে বিপদে সহায়, সম্পদে সুখী, উৎসবে বিনা নিমন্ত্রণে আনন্দের ভাগী, তাহাকে সকলে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম যথেষ্টই করিত, কিন্তু বন্ধু বলিয়া কেহ অন্তরঙ্গ হইতে পারিত না।

রাখাল যখন গৌরবের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তখন মূষিকধর্ম্মীরা তাহার গৌরব-মন্দিরের ভিত্তি তলে-তলে খুঁড়িয়া ফোঁপরা করিয়া ফেলিতেছিল। রাখালের গৌরবে সুখী ছিল না তিনজন—বঙ্কবিহারী, চন্দনমণি ও কাঙালী। বঙ্কবিহারী স্বাধীন-নৃপতির জনক, তাহার কাছেই সকলের আসা উচিত; কিন্তু কেহ যে তাহাকে পুছে না সে শুধু রাখালেরই জন্য! প্রজারা তাহাকে জানাইলেই ত সে স্কুল ডাক্তারখানা মঞ্জুর করিয়া দিত; প্রজারা দরখাস্ত করিল না, সে ত আর রাখালের মতন ছোটলোক নয় যে প্রজাদের কাজ যাচিয়া করিয়া বেড়াইবে! রাখাল ছোটলোক, সে সাধারণ লোকের সমকক্ষ হইতে লজ্জা বোধ করে না; কিন্তু বঙ্কবিহারীর ত রাজমর্য্যাদা আছে, সে ত আর যে-সে গরীব টোঙর লোক নয়! আর রাখালের এই যে কাণ্ড সে ত তাহাকেই চাপা দিবার জন্য!

বঙ্কবিহারীর এই ধারণা যে যথার্থ, তাহার প্রধান সাক্ষী ও সমর্থক ছিল কাঙালী। রাখাল কোনো কাজ করিলেই কাঙালী অর্থপূর্ণ স্বরে বলিত—রাজামামা, রাখালের মতলব কি বুঝেছেন তো? আপনার রাজবুদ্ধি, আপনাকে খুলে বলতে হবে কেন!

কাঙালী যাহা নাও ইঙ্গিত করিত বঙ্কবিহারী তাহার অকথিত কথার মধ্য হইতে তাহাও হাতড়াইয়া বাহির করিত।

অন্দরে গেলেই চন্দনমণি বলিত—তুমি যে একেবারে নিবে গেলে! যত-সব রাহু এসে জুটেছে! ভূপাল কুবিরের রাহু, মণি আমার রাহু, রাখাল তোমার রাহু!

তাই ত! বঙ্কবিহারী এই ত্রি-রাহুর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বিশেষ রকম চিন্তিত হইয়া উঠিল।

(৪২)

একদিন সন্ধ্যায় তোষাখানায় কিংখাবের তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া বঙ্কবিহারী রূপার গড়গড়ায় জরির লম্বা নটকা লাগাইয়া মৃগনাভি-দেওয়া অম্বুরি তামাক খাইতেছিল; রাখাল পাশের ঘরে বসিয়া কুবেরকে পড়াইতেছিল। খাওয়ার পরিচারক ব্রাহ্মণ প্রাণকৃষ্ণ আসিয়া খবর দিল আহার প্রস্তুত হইয়াছে। রাখাল কুবেরকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া বঙ্কবিহারীকে বলিল—মামা খেতে চলুন।

—হুঁ হাঁ বাবা চল চল।—বলিয়া বঙ্কবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল—এই, কোই হ্যায়?

আরদালি বাবুরাম মিশ্র সামনে আসিয়া বলিল—হজুর!

বঙ্কবিহারী বলিল—মিশির, হামারা জুতি ঘুমায় দেও!

বাবুরাম হাত জোড় করিয়া বলিল—হজুর, ম্যয় বাহ্‌মন; হজুরকো লিয়ে ম্যয় জান দেগা, পর্ ইজ্জৎ নেহি দেগা!

ব্যাপার দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল।

বঙ্কবিহারী রাখালের সম্মুখে রাজকায়দা করিতে গিয়া অপদস্থ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—বে-আদব, বে-ইমান, তুমকো হাম বরখাস্ত্ কিয়া।......কোই খানসামা হাজির নেই হ্যায়?

না, কোনো খানসামা সে তল্লাটে নাই। খানসামা ডাকিতে আরদালি ছুটিল। বঙ্কবিহারী খানসামার আগমনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল, কেহ জুতা ফিরাইয়া না দিলে সে যাইবে কেমন করিয়া? কোন্ প্রাতঃস্মরণীয় নবাব জুতা ফিরাইয়া দিবার লোক না পাইয়া শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়াছিলেন তবু নবাবী চাল ছাড়িয়া নিজে জুতা ফিরাইয়া পরিয়া পলায়ন করেন নাই বলিয়া শোনা আছে; নবাবের প্রাণের কাছে বঙ্কবিহারীর খাবার জুড়াইয়া যাওয়া ত অতি তুচ্ছ!

রাখাল হাসিয়া বলিল—আপনিই পায়ে করে জুতোটা ঘুরিয়ে পরুন না।

বঙ্কবিহারী নবাবী চালে বলিল—ও রকম করে পাদুকা পরা আমার অভ্যাস নাই।

রাখাল হাসিতে-হাসিতে বলিয়া ফেলিল—জুতোপরা অভ্যাসটাই আপনার কত দিনের?

বঙ্কবিহারীর চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল।

কাঙালী তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া জুতা ঘুরাইয়া দিল।

রাখাল ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

বঙ্কবিহারী কাঙালীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—হাঁ, তুমি আমার ভগ্নীপুত্র আছ, কোনো দোষ নাই, দিতে পার, দিতে পার, তুমি ভক্তিমান আছ, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করবেন!

—আমি আপনাকে ভক্তি করি, রাখালের তা সহ্য হয় না। দেখলেন ত কেমন করে চলে গেল।

—এর উচিত প্রতিফল দিতে হবে। তুমি বুদ্ধিমান আছ, ভেবে চিন্তে সত্বর একটা উপায় নিরূপণ কর।

—যে আজ্ঞে, ভেবে দেখব।—বলিয়া কাঙালী বাসায় গেল। বঙ্কবিহারী খাইতে অন্দরে গেল।

খাইতে বসিয়া রাখাল দেখিল তাহার লুচিগুলি কাঁচা আছে, এবং বঙ্কবিহারী ও কুবেরের পাতের লুচিগুলি বেশ খর-ভাজা। সাত ভূতে জুটিয়া তাহার কুবেরের ভাণ্ডার সমস্ত খাইয়া ফুঁকিয়া উড়াইয়া দিতেছে ইহা চন্দনমণি সহ্য করিতে পারিতেছিল না; এজন্য সে প্রত্যেকের পাওনা যথাসাধ্য করমকষ্যি করিয়া কমাইয়াছে। যে এক-সের চাউলের সিধা পাইত, সে এখন আধসের পায়; আগে যত মাছতরকারী রান্না হইত এখন তাহার অর্দ্ধেক হয়, পাচকেরা ঘি-তেলের টানাটানি লইয়া অসন্তোষ ও রন্ধনে অক্ষমতা প্রকাশ করে; চাকর-দাসীরা খাইতে পায় না বলিয়া খুঁৎখুঁৎ করে; যাহারা আগে লুচি খাইত তাহাদের রুটি ও যাহারা রুটি খাইত তাহাদের ভাত বরাদ্দ হইয়াছে;—চন্দনমণি ত আর সমস্ত লুটাইয়া দিয়া কুবেরকে ফতুর হইতে দেখিতে পারে না। সকলেরই বরাদ্দ কমিয়াছিল, কেবল রাখাল মণিমালা ভূপাল ও রাণী জগদ্ধাত্রীর নিয়মিত বরাদ্দ কমাইতে তাহার সাহসে কুলায় নাই; তবে রাখাল ও মণিমালার বরাদ্দ নামে মাত্র ঠিক ছিল, তাহাদের লুচির দুপিঠ ভাজা হইত না। আর বরাদ্দ বাড়িয়াই চলিয়াছিল চন্দনমণির নিজের ও তাহার স্বামী বঙ্কবিহারীর। ক্ষীর-পাঁরা দুধ না হইলে তাহারা খাইতে পারে না, আধা-ছানার মণ্ডা ছাড়া মুখে রুচে না; পোলাও কালিয়া লুচি কচুরি সর ননী প্রায়ই চাই—কারণ এই রকমই তাহাদের খাওয়া চিরকালের অভ্যাস!

রাখাল লুচি ছিঁড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—মামী, এই কাঁচা লুচির চেয়ে দুটি সুসিদ্ধ ভাতের ব্যবস্থা যদি করে দাও.....

চন্দনমণি সমস্ত শরীর দুলাইয়া কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—ওমা! লুচি কাঁচা আছে কি গো! এমনি লুচি ত আমার বাবুদাদার বাড়ীতে হয়!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—তোমার বাবুদাদা বুঝি খুব বড়লোক!

—বড়লোক আবার নয়! সাতমহল বাড়ী, হাতীশালায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া! পায়রার ডিমের মতন গজমোতির একছড়া হার আছে; বাবুদাদা হাতীর দাঁতের তক্তপোষে শোন; গোলাপজলে মুখ ধোন! শিকার করতে যান বাঘ সিংহী গণ্ডার সজারু কত কি, হাতীর পিঠের ওপর সোনার জিন কষে!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ঘোড়ার জিন মামীমা, হাতীর হাওদা।

চন্দনমণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—ওমা! মণি! তোদের এখানে বুঝি হাওদা বলে! আমাদের ওখানে বলে জিন। তোদের বুনো দেশের বুনো কথা শুনে হাসি পায় বাছা। হাওদা! হাওদা আবার একটা কথা হল!

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—কিন্তু লুচির সঙ্গে সিমের তরকারীও কি তোমার বাবুদাদা ভালোবাসতেন?

—উঃ বড্ড! সাতটা বাগানে শুধু সিম হত! একবার এত সিম হয়েছিল যে সোম-বচ্ছর কাঠ কিনতে হয়নি, সিম আর আমসির জ্বালে রান্না হল! বাবুদাদা বলতেন, আহা! এমন সিম সব পুড়িয়ে ফেলছিস তোরা চন্দন! আমায় সিমের কোপ্তা কালিয়া ছেঁচকি করে দিস! সকাল বেলা পাঁউরুটি জল-খেতেন কিনা, সকালে উঠে বারো মাস ত্রিশ দিন সিম-ছেঁচকি আর পাঁউরুটি টাটকা করে দিতে হত।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—পাঁউরুটি করতে জানো নাকি মামীমা?

—পুছ্! আমরা করতে যাব কেন? হালুইকর বামুন ছিল; বেলে বেলে তেলে ফেলত আর ফোঁস ফোঁস করে ফুলে উঠত!

ইহার পর আর কেহই কোনো কথা বলিতে পারিল না। রাখাল মাথা নীচু করিয়া আহারে মনোযোগ দিল। মণিমালা ভূপালের মাছের কাঁটা বাছিবার জন্য খুব ঝুঁকিয়া পড়িল। কেবল বঙ্কবিহারী সহধর্ম্মিণীর আভিজাত্যগৌরবের সম্মুখে সকলকে অধোবদন ও নিরুত্তর দেখিয়া বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া ঘন ঘন গোঁফে চাড়া দিতে লাগিল।

নমণি রাখালকে পাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল—সিম-ছেঁচকি খেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে কি বাবা? আলুর তরকারী এনে দেবো কি একটু?

রাখাল মুখ তুলিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল—আমি গরিবের ছেলে মামী, আমি তোমাদের মতন কোনো বাবুদাদার ঐশ্বর্য্য চোখেও দেখিনি; আমি যে-দাদামশায়ের বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলাম সেখানে এই সিম-ছেঁচকিও আমার জুটত না, দিদিমা আমাকে কলাপোড়া ভাত দিতেন! তাই, আমার কিছুতেই কষ্ট হয় না; আমার মনে কষ্টের টিকে দেওয়া হয়ে গেছে!

মণিমালার চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল ঝরিতে লাগিল, মণিমালা ভূপালের মাছের কাঁটা-বাছা ফেলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি রাখালের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—তা ত বটেই, ঠিক কথাই ত। তুমি গরিব গেরস্তঘরের ছেলে, তোমার যা-তা একটা কিছু হলেই হল। কিন্তু আমি ত দাদাবাবুর বাড়ীতে মানুষ! হলে হবে কি? আমারও ভালো জিনিস মুখে রুচত না। বাড়ীতে সোনার সামিগ্‌গিরি থইথই করছে, আমি তা খেতে পারতাম না, আমি সেই ময়রার দোকানে গিয়ে মুড়িমুড়কি কিনে খেতাম! ছেলেবেলায় পয়সা ত পেতাম না—এক-একখানি করে তাবিজের দাঁতি খুলে খুলে ময়রাকে দিতাম, আর মুড়িমুড়কি খেতাম!

রাখাল হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাবুদাদা কৃপণ ছিলেন বুঝি? পয়সা হাত থেকে বেরুত না?

—কৃপণ! [illegible]ঝাঁকা সিকি-পয়সা ছিল; সিকি-পয়সার রেওয়াজ উঠে যেতে সেই এক-ঝাঁকা সিকি-পয়সা নিয়ে গিয়ে রাস্তায় ঢেলে দিলেন; গাঁয়ের ছেলেরা তাই নিয়ে ময়না-পুকুরে ছিনিমিনি খেলত! ... তুমি যে কিছুই খেলে না বাবা?

রাখাল হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। বলিল—সামান্য জিনিস খাওয়া অভ্যেস করেছিলাম মামী, কিন্তু কাঁচা খেতে অভ্যেস করিনি।

চন্দনমণি মুখ নাড়িয়া বলিল—লুচি খাওয়া তোমার অভ্যেস নয় কিনা, তাই অমন লাগছে। আচ্ছা, কাল থেকে ভাতের ব্যবস্থাই করে দেবো!

(৪৩)

রাখাল আঁচাইয়া ঘরে আসিতেই মণিমালা তাহার হাত ধরিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল—এইবার বাড়ী চল।

রাখাল ব্যথিত হাসি হাসিয়া বলিল—বাড়ী! বাড়ী ত আমার কোথাও নেই মণি! গোসাঁইগঞ্জে রাঙাদিদিমা তোমাকে যে কষ্ট দেন, মামী আমাকে তা এখনো দিতে পারেননি। আমি তোমাকে সে কষ্টের মধ্যে আর টেনে নিয়ে যাব না, আমার এ কষ্টের চেয়ে সেখানে তোমার কষ্ট আমার মনকে বেশী পীড়া দ্যায়।

—রাঙা-দিদির কাছে না হয় না থাকব, দুজনে এক-খানা কুঁড়ে করে তোমার উপার্জ্জনের খুদকুঁড়ো আমি হাসিমুখে খাব; সেখানে আমি তোমাকে ত যত্ন করতে পারব।

—গোসাঁইগঞ্জে গিয়ে থাকব অথচ যাদের খেয়ে আমি মানুষ তাদের থেকে পৃথক হয়ে থাকব এ আমাকে দিয়ে হবে না। যেতে হলে তাঁদের সংসারেই থাকতে হবে। কিন্তু মণি এখানে আমার কিছু কষ্ট নেই, কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছ? কুবের আমাদের হাতে এসে পড়েছে, তাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবে?—সে ত শুধু তোমার মামার ছেলে নয়, সে যে এখন তোমারই মা-বাপের ছেলে; তোমার ভাই!

এ কথায় মণিমালাকে নিরুত্তর হইতে হইল, কিন্তু

তাহার মন আরাম পাইল না। তাহারা চলিয়া গেলে কুবেরের কষ্ট খুবই হইবে, কিন্তু—।

এই কিন্তুটা স্পষ্ট করিয়া তুলিবার সাহায্য করিল অতি গোপনে কাঙালী।

কাঙালী বঙ্কবিহারীকে পরামর্শ দিল যে বঙ্কবিহারী বোর্ডে দরখাস্ত করুন এই বলিয়া যে নাবালগ রাজার শিক্ষা ও রক্ষণের ভার রাখালের উপর দেওয়া অন্যায় হইয়াছে, কারণ রাখালের স্বার্থ কুবেরের স্বার্থের বিরোধী; এরূপ বিরুদ্ধ-স্বার্থের লোকের হাতে বালক রাজার ভার পড়াতে রাজার শারীরিক মানসিক ক্ষতি ও অপকার হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বালক রাজার মৃত্যু হইলে যখন রাখালের পুত্রেরই বিষয়ের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা তখন রাখালের নিকট কুবেরের হিত আশা করা অগ্নি হইতে জল লাভের আশার ন্যায় নিতান্তই অসম্ভব।

বঙ্কবিহারী খুসী হইয়া বলিল—বাবাজী, তুমি তীক্ষ্ণধী আছ! ভবিষ্যতে তোমাকে মন্ত্রী করে দেবো! বাবাজী, তুমিই দরখাস্তটা মুসাবিদা করে লিখে দিও—তুমিই আমার দক্ষিণ হস্ত, হবে না কেন, ভক্তিমান ভগ্নীপুত্র আছ!

—এই দরখাস্তটাতে যদি রাণীমার দস্তখত করিয়ে দিতে পারেন তবে খুব জোর হয়।

—তার আর চিন্তা কি! সে হয়ে যাবে!

কাঙালী দরখাস্ত লিখিয়া দিল। বঙ্কবিহারী সেইখানা লইয়া গিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে সই করিয়া দিতে বলিল। জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—এটা কি?

—কুবেরের জন্যে একজন ভালো মাষ্টার রাখবার দরখাস্ত।

—কেন, রাখাল ত পড়াচ্ছে?

—রাখাল ত সদাসর্ব্বদা নানান কাজ নিয়ে নাম কিনতেই ব্যস্ত, ও কি কুবেরকে পড়ায়, না ওর খোঁজ রাখে? আর ও অস্থায়ী লোক, বাড়ী চলে যাবে শুনছি, কুবেরের ভালো হয়েছে এ আর চোখে সহ্য হচ্ছে না। এ রকম হিংসুক লোকের হাতে কুবেরকে ছেড়ে দেওয়া আর যমের মুখে ছেড়ে দেওয়া দুইই সমান। আপনি দেখেছেন ত দিদি, রাখাল কুবেরকে কি রকম শাসনই না করে? সেদিন একটু তামাক খেয়েছিল বলে বেদম করে মারলে। স্বাধীন নৃপতির গায়ে হাত তোলা! রাজা সে, তামাক খাবে না?

জগদ্ধাত্রী দেখিলেন কথাগুলা সমস্তই যুক্তিসঙ্গত বটে। তিনি কলম লইয়া সই করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রত্যেক-বার সই করিবার সময় তাঁহাকে নামের বানান ও অক্ষর লিখিতে দেখাইয়া দিতে হইত; বঙ্কবিহারী বলিতে লাগিল—এইখান থেকে লিখুন,—শ্রী, ম, তয়ে দীর্ঘঈ, রয়ে আকার, মূর্দ্ধণ্য ণয়ে দীর্ঘঈকার, বর্গীয় জ, গ, দয়ে ধয়ে আকার, তয়ে রফলা—এ লিখে মাত্রা দিন, হাঁ, এই দিকে এইখানে দীর্ঘঈকার দিন, তারপর দয়ে একার, বয়ে দীর্ঘঈকার, চয়ে ঐকার—এদিকে একার, এপাশে আকার দিয়ে মাথা উড়িয়ে দেন, হাঁ ঠিক হয়েছে, ধয়ে হ্রস্বউ, রয়ে আকার, মূর্দ্ধণ্য ণয়ে দীর্ঘঈকার। পাশে একটা কসি টেনে দেন, হাঁ।

দরখাস্ত ম্যানেজারের মারফতে বোর্ডে প্রেরিত হইবে; ম্যানেজারকে দেওয়া হইল। ম্যানেজার কুবেরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—রাখাল-বাবুর উপর তুমি খুসী আছ?

কুবের ঘাড় জোরে নাড়িয়া বলিল—না।

—কেনে?

—বড় বকে, মারে।

—দোস্‌রা মাষ্টার হোলে তুমি খুসী হোবে।

কুবের উৎসাহিত হইয়া বলিল—হাঁ।

তারপর ম্যানেজার রাখালকে ডাকিয়া বলিল—রাখলবাবু, দেখেছেন?

রাখাল দরখাস্তের নীচে রাণী জগদ্ধাত্রীর সই দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল—'মা এমন কথা লিখলেন? মাও আমাকে সন্দেহ করছেন!'—কিন্তু একথা তার একবারও মনে পড়িল না যে রাণী জগদ্ধাত্রীর নিজের শিক্ষা ও বুদ্ধি মোটেই নাই, তিনি যে-রকম দুর্ব্বল চরিত্রের লোক তাহাতে তাঁহাকে দিয়া কিছু করাইয়া লওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যথিত হাসি হাসিয়া রাখাল বলিল—এ কথাটা আমারই মনে পড়া উচিত ছিল; কুবেরের শিক্ষণ ও রক্ষণের ভার আমার নেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি এখন বুঝতে পারছি। আপনি এ দরখাস্ত বোর্ডে পাঠিয়ে দিন।

—তার চেয়ে আপনি পদত্যাগ করে আমার মারফতে বোর্ডে একখানা ইস্তফা-পত্র পাঠিয়ে দিন, আমি এ দরখাস্ত পাঠাব না।

রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ভাবিয়া বলিল—না সাহেব, এ কথা ত আমার নিজে থেকে মনে পড়েনি, এই দরখাস্ত আপনি দেখালেন বলে মনে পড়ল। আমি ইস্তফা দেবো না, বরখাস্ত হওয়ার অপমানই আমাকে স্বীকার করতে হবে - সেটা আমার ন্যায্য প্রাপ্য!

সাহেব ম্যানেজার আপন মনে বলিয়া উঠিল—O how noble!......রাখালবাবু, আমি আপনাকে যত দেখছি আপনার ওপর তত শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল—আপনি আমাকে বন্ধুত্বের সম্মান দিয়েছেন বলে ওরূপ মনে করছেন। আমি ত শুধু ন্যায় আর কর্ত্তব্য পালন করতে চেষ্টা করি, মানুষের এতে প্রশংসা পাবার কিছু নেই, না করলে নিন্দা পাবার কারণ আছে বটে!

বোর্ড হইতে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল; রাখালকে বরখাস্ত করা হইল। এত বড় গর্ব্বিত রাখালের এই অপমানে বঙ্কবিহারী ও কাঙালী খুব উৎফুল্ল হইল, কিন্তু আর সমস্ত দেশের লোক এত বড় মানী-লোকের গৌরব-হানি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আবার রাণী জগদ্ধাত্রীর সইকরা আর-এক দরখাস্ত পড়িল রাখালের স্থানে কাঙালীকে শিক্ষক ও রক্ষক নিযুক্ত করা হোক।

ম্যানেজার রাখালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা রাখালবাবু, এই ষ্টেটের কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাউকে কি ওয়ার্ডের টিউটর গার্জ্জিয়ান হওয়ার উপযুক্ত মনে হয়?

রাখাল অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—কাঙালী হলে আপাতত কাজ চলতে পারে; তবে সে আমার আনা আমার দেশের লোক, তাকে নিযুক্ত করলেও আপত্তি হবে।

ম্যানেজার হাসিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর আবেদন দেখাইল। রাখাল দেখিয়া খুসী হইয়া বলিল—তা হলে ঠিকই হয়েছে, আপনি সুপারিশ করে দিন।

—কত মাইনে দেওয়া যাবে ওকে? এখন এক-শ টাকা পাচ্ছে।

—দুশো টাকা হলেই ঠিক হবে বোধহয়।

—বড় বেশী হল না? আমি একশ পঁচিশ কি দেড়শ লিখব ভাবছিলাম।

—কাজের দায়িত্ব বড় বেশী, আর পদের মর্য্যাদার অনুরূপ বেতন না হলে লোকের কাছে ও সম্মান পাবে না।

—আচ্ছা তবে তাই হবে।

ম্যানেজার কুবেরকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কাঙালীবাবু মাষ্টার হোলে তুমি খুসী হোবে?

কুবের উৎফুল্ল হইয়া বলিল—হাঁ, খুব!

—কেনে?

—কাঙালী-বাবু আমাকে রাজাবাবু বলে, ওর সামনে আমি তামাক খাই, তবুও আমাকে কিছু বলে না—এক-দিন আমাকে তামাক সেজে দিয়েছিল!

ম্যানেজার হাসিল।

কাঙালী দুশো টাকায় কুবেরের শিক্ষক নিযুক্ত হইল। কিন্তু সে রাখালের উপর হাড়ে চটিয়া গেল—কারণ, ম্যানেজারসাহেব তাহাকে আড়াইশো টাকা বেতন দিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, রাখাল মাঝে পড়িয়া পঞ্চাশ টাকা কমাইয়া দিয়াছে—সাহেবের খানসামা জুম্মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে নাকি জানিয়াছে!

(৪৪)

রাখাল মণিমালাকে বলিল—মণি, আমার এখানকার কাজ চুকে গেছে, এইবার চল।

মণিমালার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এখন যাওয়া ঠিক হবে না, লোকে বলবে এতদিন আমরা স্বার্থের জন্যে পড়ে ছিলাম, যেই কাজ গেল অমনি আমরা চলে যাচ্ছি। আরও, আমরা চলে গেলে কুবেরের বড় অবস্থা হবে।

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে। কিন্তু এখানে শুধু-শুধু বসে ভাত ধ্বংস করাটা কি ভালো দেখাবে?

মণিমালা মনে মনে খুসীই হইয়া বলিল—তবে এখনি চল মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

রাণী জগদ্ধাত্রী ভাত খাইয়া শুইয়া একটি সোনা-বাঁধানো কলি-হুঁকায় তামাক খাইতেছেন, সর্ব্বর মা ও ঝুনকিয়া

দাসী পা চাপিতেছে, চন্দনমণি মাথার কাছে বসিয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতেছে। মণিমালার পিছনে পিছনে রাখালকে সেই ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হুঁকাটা তিনি চন্দনমণির হাতে দিয়া বলিলেন—বৌ, বৌ, শিগগির এটা লুকোও!

চন্দনমণি হুঁকা লইয়া বলিল—তুমি দিদি ওদের দেখে ভয় কর!

জগদ্ধাত্রী লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—ভয় নয়, ওরা খায় না তাই ওদের কাছে খেতে লজ্জা করে।

চন্দনমণি কোনো দিন তামাক খাইত না; সে দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া রাখাল ও মণিমালা যাহাতে দেখিতে পায় এমন ভাবে খুব সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ভড়র ভড়র করিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রাখাল ও মণিমালা তাহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি উচ্চরবে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, রাণী জগদ্ধাত্রীও খুলখুল করিয়া হাসিতে লাগিলেন—রাখাল ও মণিমালা খুব জব্দ হইয়া গিয়াছে!

চন্দনমণি বলিল—দেখলে দিদি! এ বাড়ীর কর্ত্তা তুমি আর আমি; ওরা ত নয়! ভয় করতে হয় ওরা করবে, আমাদের যা খুসী আমরা করব। পছন্দ না হয় ওরা নিজের পথ দেখুক!

জগদ্ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন—ওরা যাবে যাবে শুনছিলাম, কবে যাবে?

—গেলেই হল, কোনো কাজ নেই কম্ম নেই, উড়ে বসে ঘুরো লুসছেন আর কুবিরের হিংসেতে জলে মরছেন বৈ ত নয়!

জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া গেলেন।

চন্দনমণি পরম সুযোগ পাইয়া কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া জগদ্ধাত্রীর চুলের রাশি হাতে তুলিয়া বলিল—এমন রেশমের মতন চুল এক ঢাল, তুমি বাঁধো না কেন দিদি?

—পিঠের ওপর পড়ে' যখন গা-টা গিজ-গিজ করে তখন এক-একবার ভাবি বাঁধি, কিন্তু মণি আর রাখাল কি মনে করবে ভেবে বাঁধতে পারিনে।

চন্দনমণি আর কথাটি না বলিয়া উঠিয়া গিয়া আলমারী খুলিয়া আয়না চিরুণী ফিতে কাঁটা জরির গোটা আনিয়া বলিল—দিদি উঠে বস।

জগদ্ধাত্রী উঠিয়া বসিয়া হাসিয়া বলিলেন—এই বুড়ো বয়সে কি সং সাজাবি বৌ! চুলটা না হয় জড়িয়ে দে, খোঁপায় আর গোটা দিসনে! বুড়ো বয়সে লোক হাসবে?

চন্দনমণি চুল বিনুনি করিতে করিতে বলিল—বুড়ো! আমি পুরুষমানুষ হলে তোমায় নিকে করতাম!

জগদ্ধাত্রী খুসীতে খুলখুল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দনমণি একখানি কালা-ফিতে-পাড় ফরাসডাঙার ধুতি বাহির করিয়া জগদ্ধাত্রীকে পরাইল; গহনার বাক্স খুলিয়া গলায় হার, বাহুতে অনন্ত, আঙুলে আংটি পরাইল।

জগদ্ধাত্রী খুসী হইয়া বলিলেন—করছিস কি বৌ? বিধবা মানুষের কি এসব পরতে আছে?

চন্দনমণি বলিল—বিধবার পরতে নেই নোয়া সিঁদুর আলতা! গহনা পরতে দোষ নেই।

চন্দনমণি জড়োয়া বালা তুলিয়া পরাইতে গেল।

জগদ্ধাত্রী কুণ্ঠিত হইয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন—না, না, নীচে-হাতটা শুধু থাক।

রাণী জগদ্ধাত্রীর মনের মধ্যে যে বিলাসিতা অতৃপ্তিতে ব্যথিত হইয়াও লোকলজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া ছিল, তাহা চন্দন-মণির সাহায্যে ও সমর্থনে সার্থক হইতে পারিয়া রাণীকে অত্যন্ত আরাম ও আনন্দ দিল।

মণিমালা ও রাখাল চন্দনমণির তামাক খাওয়া দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল; ক্ষণেক বিলম্ব করিয়া আবার তাহারা আসিয়া দেখিল এই অভাবনীয় ব্যাপার।

মণিমালা অবাক হইয়া মায়ের কাণ্ড দেখিল। মা তাহার নিকটে একটু লজ্জিত হইলেও এই সজ্জায় তাঁহার মন খুসী আছে দেখিয়া সে দুঃখিত হইল। একেই সে মায়ের কাছে বিনা পাহারায় আসিতে পাইত না বলিয়া বড় একটা ঘেঁসিত না, তাহার উপর মায়ের এই বেশ দেখিয়া মায়ের ত্রিসীমানায় থাকিতে তাহার আর প্রবৃত্তি মাত্র রহিল না।

রাখাল অন্যায় দেখিতে পারে না। সে স্পষ্ট মুখের উপর বলিয়া বসিল—মা; এ আবার কি সং সাজলেন? এ আপনার উপযুক্ত হয়নি। এতে স্বর্গীয় মহারাজকে অপমান করা হচ্ছে!

রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন।

চন্দনমণিও রাখালের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মণিমালাও চলিয়া গেল।

রাখাল চলিয়া গেলে চন্দনমণি ঠোঁট উল্টাইয়া বলিয়া উঠিল—বাপরে! যারপরনাই ছেলে কুবির, সে কিছু বললে না, আর উনি কোথাকার কে, গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হয়ে এলেন শাসন করতে!

চন্দনমণি জগদ্ধাত্রীর কানে গুঞ্জন করিতে লাগিল—কখ্খনো শুনো না দিদি; তুমি বড়, না ওরা বড়! মহারাজের মান কিসে থাকবে বা যাবে তা তুমি বোঝ বেশী, না ঘুঁটে-কুড়ুনির ছেলে একটা কোথাকার হাভাতে টোঙর সে বেশী বোঝে? কুবির ত তোমায় কিছু বলে নি। যতক্ষণ সে কিছু না বলছে, ততক্ষণ তোমার কাকে ভয়?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া থাকিলেন। দেখিয়া চন্দনমণি বলিল—কণ্টক বিদায় করে দিলেই পার! তুমি না বলতে পার; আমি বলব।

জগদ্ধাত্রী তাহাতেও কোনো হাঁ কি না বলিলেন না দেখিয়া চন্দনমণির সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গেল।

(৪৫)

রাণী জগদ্ধাত্রার ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মণিমালা রাখালকে বলিল—আর আমাদের এ বাড়ীতে থাকা উচিত নয়, আমরা ক্রমে ফাল্‌তো হয়ে উঠছি।

রাখাল চিন্তাকুল মুখে বলিল—কিন্তু এখন আমরা চলে গেলে এই পরিবারটিকে একেবারে সর্ব্বনাশের মুখে ফেলে দিয়ে যাওয়া হবে। চন্দনমণি মাকে দুর্ব্বল পেয়ে তাঁকে অধঃপাতের পথে ঠেলে নিয়ে চলছে।

—আমরা থেকে কি করব? কি বা করছি?

—আমরা অনেকখানি বাধা হয়ে আছি। আমরা সরে গেলে আর রক্ষা থাকবে না। ওদিকে কাঙালী বড় হাল্কা ধরণের লোক, তার হাতে কুবের পড়েছে, কাঙালীকে সামলে রাখাও আমার কর্ত্তব্য।

মণিমালা আবার নিরস্ত হইল।

কিন্তু চন্দনমণি নিরস্ত হইতে পারিতেছিল না। দিদিকে অত্যাচারীর কবল হইতে রক্ষা করিবার আগ্রহ ও দরদ তাহার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাখাল সেদিন খাইতে বসিয়া বলিয়াছিল কাঁচা লুচি অপেক্ষা সুসিদ্ধ অন্ন তাহার অধিক রুচিকর। লুচি সুপক্ক হইল না, লুচির স্থান অন্ন গ্রহণ করিল। সেদিন রাত্রে এক-জায়গায় বসিয়া বঙ্কবিহারী ও কুবের খাইল লুচি এবং রাখাল খাইল ভাত।

মণিমালা ঘরে আসিয়া রাখালকে বলিল—আর থাকা উচিত নয়, এখনো মানে মানে যাই চল।

—কেন, অপমান কোথায় দেখলে? লুচির চেয়ে ভাতই ত আমি ভালো বাসি; আমি ভাত খেতে চেয়েছিলাম বলেই ভাত হয়েছে।

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি আপনার বাড়ীতে শাক ভাত খেতে পার, কিন্তু পরের বাড়ীতে কেউ যদি নিজে লুচি খেয়ে তোমাকে ভাত খেতে দ্যায় সেটা কি অপমান নয়? তোমার পায়ে পড়ি তুমি, এখান থেকে চল।

—দাঁড়াও, আমি যে কটা কাজ আরম্ভ করেছি শেষ করে নিতে দাও, তারপর তোমার কথা শুনব।—পাঁচটা পরগণায় পাঁচটা বড় স্কুল আর খয়রাতি ডাক্তারখানা করছি; এখানকার স্কুলটাকে কলেজ করবার জন্যে লেখালেখি হচ্ছে, হয়ত হবে। দেশটার একটু শ্রী ফিরিয়ে দিয়ে, লোকগুলোকে একটু মানুষ হবার পথ দেখিয়ে দিয়ে তবে যাব, ততদিনে কুবেরও সাবালগ হয়ে যাবে।

—এমনি করতে করতে তোমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, তখন কি আর তুমি কোনো কাজকর্ম্ম করতে পারবে?

—নাইবা পারলাম মণি! আমাদের দুটো পেটের জন্ম ভাবনা?

—ষাট, ভুপাল আর বিভা বেঁচে থাক, আমাদের দুটো পেট হতে যাবে কেন?

—ওদের ভাবনা কুবের ভাববে মণি। আমি কুবেরের মঙ্গলের জন্যে আমার সমস্ত আশা ভরসা বিসর্জ্জন দিলাম, আমার ছেলেদের সে দেখবে না? সে মামা, ভুপাল ভাগনে; আর ভুপাল অমনি তার মামার অনুগ্রহ নেবে না, ষ্টেটের সেবা করে তার বদলে রাজার ভাগনে হয়ে

প্রতিপালন হবে। কুবের তোমাকে কত ভালো বাসে দেখছ ত? সে ভূপালকে ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না, বিভাকে দেখলেই বুকে করে নেয়।

মণিমালার হৃদয় এই কথায় কুবেরের প্রতি স্নেহে ভরিয়া উঠিল। আহা বালক সে, সে দিদিকে তাহার পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াও সকলের অনাদরে তাহার ব্যথিত হৃদয় সেই দিদিরই স্নেহে জুড়াইতে চাহিতেছে। তাহাকে মণিমালা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে নাই, সেও যে পরম নিশ্চিন্ত মনে তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে। এই স্নেহের বন্ধন কি কখনো টুটিবার?

মণিমালা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তবে একটি কথা আমার শুনতে হবে তোমাকে; তুমি আর সকলের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে পাবে না, তোমাকে আজ থেকে ঘরে খেতে হবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—তোমার মনের মধ্যেকার রাজকন্যাটি এই কথা তোমাকে দিয়ে বলাচ্ছে। তা, আচ্ছা, তাই হবে।

আজ হইতে রাখাল এক-বাড়ীতে থাকিয়াও কতকটা ভিন্ন হইয়া পড়িল। এক সংসারে রান্না হইলেও মণিমালা রাখালের খাবার যাহা পাইত তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া দিত।

একাদশী। রাখাল আজ ভাত খাইবে না। মণিমালা চন্দনমণিকে বলিল—মামী, আজ ওঁর একাদশী।

চন্দনমণি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—লোকের বের্তো নিয়ম করতে হয়, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে করা উচিত। আর নইলে সংসারে যা রান্না হবে তাই খেতে হবে। জোনাজাতের ফরমাস-মতন রাঁধতে হলেই ত চিত্তির!

মণিমালার অত্যন্ত রাগ হইল বলিয়া সে আর কোনো কথাই না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। ঠাকুরবাড়ীতে রাত্রে ঠাকুরের ভোগ হয় লুচি। মণিমালা ঠাকুরবাড়ীর পরিচারক গুরুপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিল—গুরুদাদা, আজ ওঁর একাদশী, রাত্তিরে লুচি খাবেন; বাড়ীতে লুচি ভাজার সুবিধে হবে না; তুমি একপোয়া ময়দা কিনে ঠাকুরের লুচি ভাজা হলে যদি একটু কষ্ট করে ভেজে দ্যাও! এখন আমার হাতে পয়সা নেই, ময়দার দাম তোমায় দুদিন পরে দেবো!

হায় রাজার মেয়ে! একপোয়া ময়দা কিনিবার পয়সা হাতে নাই!

গুরুপ্রসাদ ব্যথিত হইয়া বলিল—দিদি, পয়সা দিতে হবে কেন? ঠাকুরবাড়ীর ময়দাও ত সে তোমারই বাপের পয়সার!

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার বাপের পয়সায় তাহার আর অধিকার কৈ?

শীঘ্রই বাড়ীর চাকর-দাসীরা টের পাইল যে জামাইবাবুর আজ একাদশী, কিন্তু চন্দনমণি তাঁহার খাওয়ার ব্যবস্থা কিছুই করিল না। সকলেই চন্দনমণির উপর দারুণ বিরক্ত হইয়াছিল, ইহাতে সকলে বেশী করিয়া বিরক্ত হইল।

খাবারের পরিচারক প্রাণকৃষ্ণ সন্দেশ ও চিনি লইয়া গিয়া মণিমালাকে দিয়া আসিল; ঘিসু ভাণ্ডার হইতে ক্ষীর ও কলা লইয়া গিয়া দিয়া আসিল। মণিমালা স্বামীর জন্য চাকরদের এই চুরি-করা দানও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। তাহাকে কুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া প্রাণকৃষ্ণ ও ঘিসু বলিল—এসব ত আপনারই জিনিষ আপনাকে এনে দিচ্ছি দিদি!

রাত্রে রাখাল খাইতে বসিয়া আহারের বিবিধ প্রচুর আয়োজন দেখিয়া হাসিয়া বলিল—দেখ ত কত আয়োজন হয়েছে, আর তুমি বল কিনা যে মামী বিরক্ত হন! লুচি কাঁচা ছিল বলেছিলাম বলে আজকে কেমন খর লুচি ভেজে দিয়েছেন!

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিতে পারিল না।

রাখাল মণিমালার ম্লান মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বুঝিতে পারিল এই আহার জোগাড় করিতে মণিমালাকে অনেক দুঃখ সহিতে হইয়াছে। রাখালের গ্রাস আর মুখে উঠে না, মুখের খাবার গলা দিয়া নামে না! রাখাল গম্ভীর হইয়া মাথা নত করিয়া খাইতে লাগিল। মনে মনে ঠিক করিল এ বাড়ীতে এই তাহার শেষ আহার, আর না!

মণিমালা রাখালের জন্য দুধ পর্য্যন্ত লইতে আসিল না দেখিয়া চন্দনমণি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উহারা কি আজ তবে উপবাস থাকিবে, না নিজেরাই তোলা উনুনে কিছু রাঁধিয়া বাড়িয়া লইল, ইহা জানিবার জন্য চন্দনমণির মন

ছটফট করিতে লাগিল। চন্দনমণি এক বাটি দুধ হাতে করিয়া সন্ধান লইতে মণিমালার ঘরে গেল। রাখাল বিবিধ উপকরণ লইয়া খাইতে বসিয়াছে দেখিয়া ত তাহার চক্ষু স্থির! সে খাইতে না দিয়া এ যে রাখালের সুখের দশা করিয়া তুলিয়াছে, এই আপশোষ তাহার মনের সর্ব্বাঙ্গে চিম্‌টি কাটিতে লাগিল! সে অবাক হইয়া রাখালের রাজভোগ খাওয়া দেখিতে লাগিল।

চন্দনমণি আসিয়া স্তম্ভিত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া রাখাল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল—অবাক হয়ে কি দেখছ?

সেই কথার আঘাতে সচেতন হইয়া চন্দনমণি থত-মত খাইয়া বলিল—দুধ এনেছি। কিসে ঢেলে দেবো?

রাখালের মন ক্রোধে ঘৃণায় লজ্জায় অপমানে পূর্ণ হইয়া ছিল। সে বাঁ হাতের তেলো মাথায় চাপড়াইয়া কর্কশ স্বরে বলিল—মাথায়!

তাহার ক্রোধন স্বামী না জানি কি অনর্থ বাধায় এই ভয়ে মণিমালা তাড়াতাড়ি বলিল—আমার ত আর আলাদা বাসন নেই মামী, বাটি সুদ্ধই রেখে যাও।

—এ বাটি যে রূপোর!

মণিমালা ম্লান মুখে হাসি টানিয়া বলিল—রূপো আমি চিনি মামী।

—যদি চুরি যায়? শিগগির করে ফেরত দিয়ে এসো।

—আমার বাবার বাটি, একটা যদি আমি চুরিই করি!

চন্দনমণি মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার বাবার যবে ছিল তবে ছিল, এসব এখন কুবিরের।

—কুবের এখন আমার বাবারই ছেলে, আমার ভাই। তুমি আর কুবেরের কেউ নও মামীমা।

চন্দনমণি একেবারে সঙ্কুচিত এতটুকু হইয়া দুধের বাটি রাখালের সামনে নামাইয়া রাখিয়া মণিমালাকে বলিল—বাটিটা বাসনের ঘরে রেখে এসো। রূপোর বাসন-সব কোন্ ঘরে থাকে জানো ত?

মণিমালা মৃদু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—মামীমা, এ আমারই বাবার বাড়ী! তুমি এখানে কদিন এসেছ?

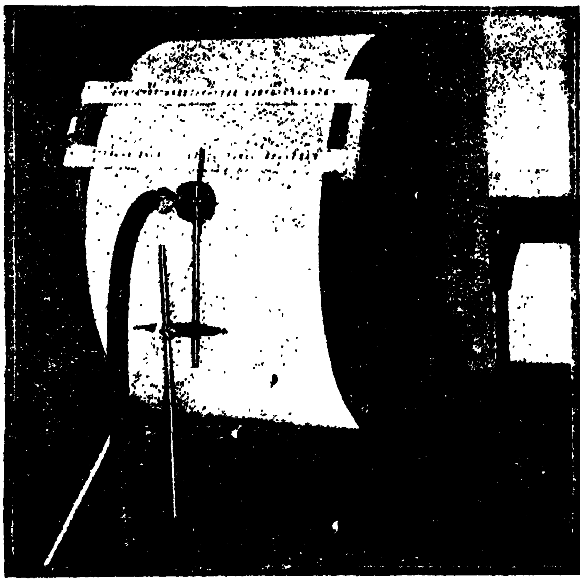
চন্দনমণি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। (ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চশস্য

বধিরের সঙ্গীত শিক্ষা—

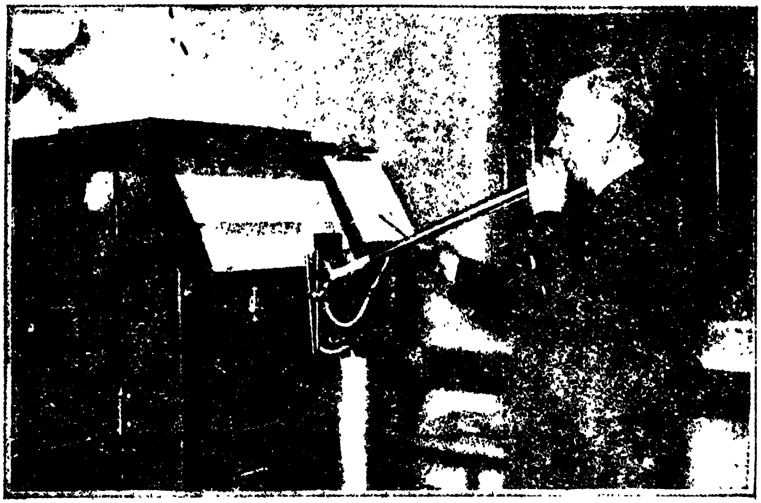
জন্মবধিরেরা প্রায়ই বোবা হয়। ইহার কারণ এই যে তাহারা ছেলেবেলা হইতে অন্যের কথা না শুনিতে পাওয়ায় ভাষা শিখিতে পারে না। তাহাদের স্বর-যন্ত্র প্রথমে সুস্থ থাকিলেও ক্রমে অব্যবহারে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। আবার যাঁহারা জন্মবধির নহেন, তাঁহারা কথা বলিতে পারেন বটে, কিন্তু বিশুদ্ধরূপে সঙ্গীতশিক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কোনো বাদ্যযন্ত্রে সুর বাঁধিবার সময়ে বা গলা সাধিবার সময়ে সুর ঠিক-মত হইতেছে কি না তাহা আমা-দিগের কর্ণই বলিয়া দেয়। কিন্তু সম্প্রতি একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যাহার সাহায্যে সঙ্গীত-বিদ্যায় চক্ষুই কর্ণের কার্য্য করিতে পারিবে। এই যন্ত্রটির নাম 'টোনোস্কোপ বা স্বর-দর্শক।'



টোনোস্কোপ বা স্বর দর্শক যন্ত্রের কাঠামো। বিন্দুগুলি ও সুর-জ্ঞাপক সংখ্যাগুলি দেখা যাইতেছে।

যন্ত্রটির প্রধান অঙ্গ একখানি পরদা। উহার উপরে ১৭,৫০০টি বিন্দু সাজানো আছে। আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে শুধু কতকগুলি বিন্দু দেখা যায় আর বাকীগুলি অস্পষ্ট হইয়া যায়। বিন্দুগুলি সাজাইবার কৌশল এরূপ যে, যে-বিন্দুগুলি কোনো বিশেষ আলোকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা রেখার মত সাজানো থাকে। মানুষের গলায় যতগুলি সুর উঠিতে পারে, এই রেখার সংখ্যাও তত—প্রত্যেক রেখা একএকটি সুর বুঝায়, রেখাগুলির ধারে ধারে কতকগুলি সংখ্যা বসানো আছে, তাহাতে বুঝা যায় কোন্ রেখা কোন্ সুর।

টোনোস্কোপের সামনে একটা গ্যাসের বাতি জ্বলে। বিন্দু চিহ্নিত পরদাখানা একটা চোঙের (cylinder) গায়ে আঁটা থাকে। চোঙটি স্প্রিংএ বা তড়িৎ-বলে ঘুরিতে থাকে। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে নিকটে কোনো শব্দ হইলে আলোর শিখা নাচে। সুতরাং এ



কালা-বোবা কথা কহিতে শিখিতেছে।
একটা কথার উচ্চারণে স্বরদর্শক বা টোনোস্কোপ যন্ত্রে যেরূপ আঁক পড়ে, সেইরূপ আঁক উৎপাদন করিবার চেষ্টার দ্বারা কথা কহিতে শেখা।

অবস্থায় কেহ যন্ত্রের নিকটে সঙ্গীত আলাপ করিলে শব্দতরঙ্গে আলোর শিখাটি প্রকম্পিত হয়। সুর যত উচ্চ হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে শব্দ-তরঙ্গের সংখ্যা যত বেশী হয় শিখাটি ততই ছোট হইয়া যায়। যে সুরে শিখাটি যত-টুকু ছোট হয়, শিখার সেই অবস্থার আলোকে টোনোস্কোপে শুধু সেই সুর-জ্ঞাপক রেখাটিই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গায়ক বিভিন্ন রেখাগুলি দেখিয়া ও তাহাদের পার্শ্বের সংখ্যা দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে তাঁহার সুর ঠিক হইতেছে কি না।

ধরা যাক, একজন বধির ব্যক্তি উদারার 'প' সুরটি সাধিতেছেন। শিক্ষার্থী ঐ সুরটি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিলে আলোটি যতটা কমিয়া যায়, তাহাতে পরদায় চিহ্নিত উদারার 'প' রেখার বিন্দুগুলি শুধু দেখা যাইবে—অন্য বিন্দুগুলি অস্পষ্ট থাকিবে। যদি সুরটি একটু বেশী উচ্চ বা নিম্ন হইয়া যায় তাহা হইলে আলোটিও একটু বেশী বা কম কমিবে এবং পরদায় 'প' রেখা দেখা যাইবে না—অন্য কোনো রেখা ফুটিয়া উঠিবে। ইহাতেই গায়ক নিজের ভুল ধরিতে পারেন এবং ঠিক যে-সুর উচ্চারণ করিলে পরদায় চিহ্নিত 'প' রেখাটি ফুটিয়া উঠে, চেষ্টা করিয়া তাহাই অভ্যাস করিতে পারেন। এমনি করিয়া তিনি কানের সাহায্য বিনাও অভ্রান্ত সুর সাধিতে পারেন। যন্ত্রটির কার্য্য এত সূক্ষ্ম যে সুরের একশত ভাগের এক ভাগ এদিক-ওদিক হইলেও ধরিয়া দিতে পারে।

এই যন্ত্র-সাহায্যে সুস্থ ব্যক্তিরাও শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া বিশুদ্ধরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে পারেন। যাঁহারা বেহালা, বাঁশী, কর্ণেট প্রভৃতি বাজান, তাঁহারাও নিজেদের বাজানো ঠিক হইতেছে কি না তাহা যন্ত্র বাজাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক করিতে পারেন। যন্ত্র বাজাইয়া যদি দেখিতে পান যে টোনোস্কোপে স্বরলিপির অনুরূপ রেখাই দেখা যাইতেছে, তবেই বুঝিতে পারেন যে তাঁহাদের বাজনা ঠিক হইতেছে। এ ছাড়া ইহাতে বধিরেরা কথা বলা শিখিতে পারেন, বাগ্মিতা-শিক্ষার্থীরা স্বরের রকমারি শিখিতে পারেন। যন্ত্রটির উদ্ভাবয়িতা ডাক্তার সি এফ্ লোরেঞ্জ এবং কার্ল ই সি-শোর (Dr. C. F. Lorenz and Carl E. Seashore)। তাঁহাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে যন্ত্রটি আরো অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগিবে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

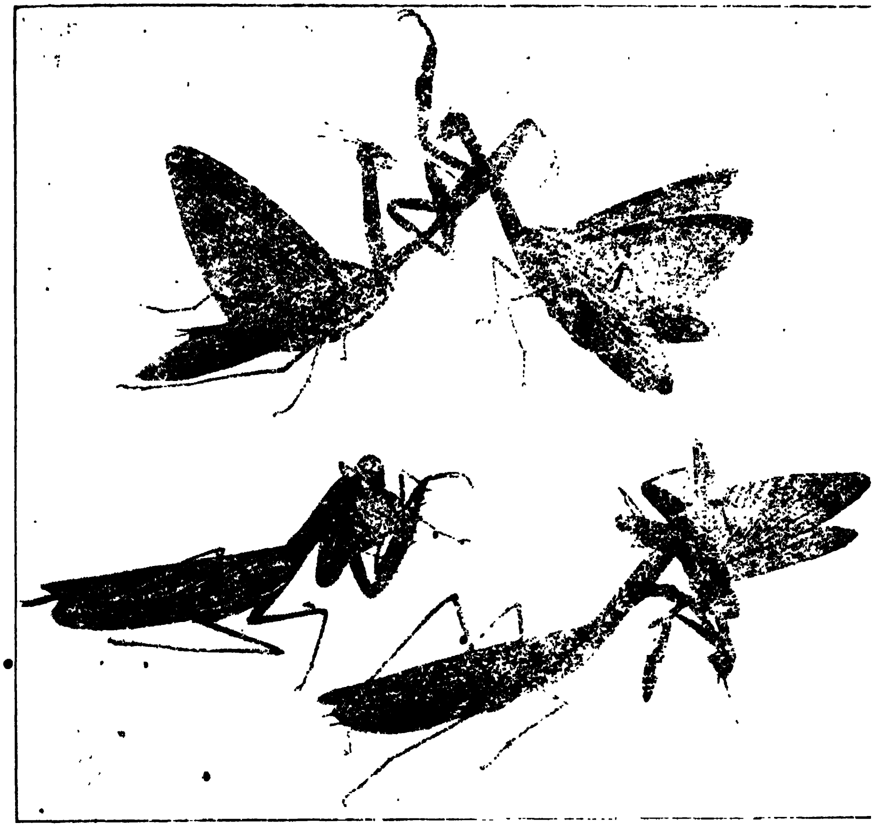
* *
*



মাদি কাঁকড়া-বিছে স্বামীহত্যা করিতেছে।

জীবের রাক্ষসী প্রবৃত্তি—

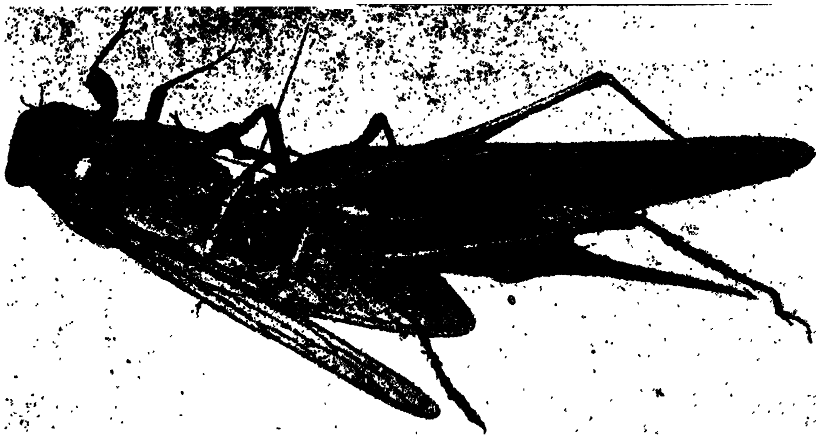
মানুষে মানুষ খায় শুনিলে আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠে; এমন কি কোনো জীবেরই প্রাণবধ করা অন্যায় বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু প্রাণী-জগতের রীতিনীতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে জীবের রাক্ষসী প্রবৃত্তি প্রকৃতি-দত্ত। নিম্নতম পর্য্যায়ের প্রাণী থেকে মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই হয় স্বজাতির নয় অপর জাতির প্রাণবধ করিয়া আত্মরক্ষা ও শরীর পোষণ বা বংশধারা রক্ষা করে। লণ্ডনের ন্যাশনাল রিভিউ পত্রিকায় প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্বজ্ঞ কুমারী শ্রীমতী ফ্রান্সেস পিট এ বিষয়ে একটি কৌতুককর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।



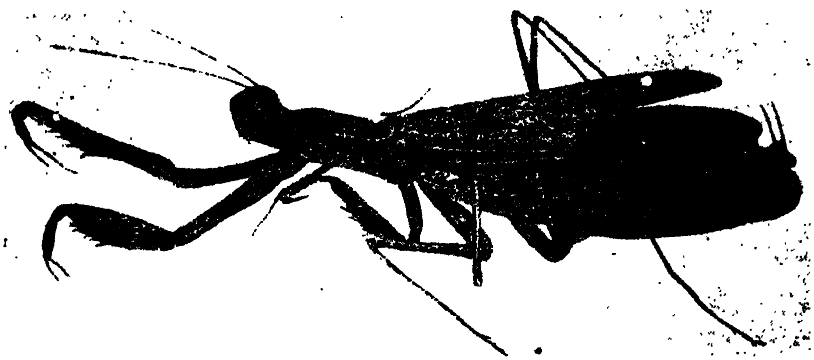
ফড়িঙের প্রেমালাপ -ফল প্রণয়ীর প্রাণনাশ ও দেহ ভক্ষণ।

প্রকৃতি শক্তের ভক্ত। অক্ষম অসমর্থ দুর্ব্বল প্রাণীকে প্রকৃতি বিনাশ করে, হয় অপর কোনো বলবত্তর জাতির দ্বারা অথবা স্বজাতির পরমাত্মীয়ের দ্বারাই। বিনাশের দ্বারা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন যখন প্রকৃতির নিয়ম, তখন সেই বিনষ্ট প্রাণীর শরীর মিছামিছি পচিয়া মাটি হয় কেন মনে করিয়া প্রকৃতি তাহা বিনাশকারীর খাদ্য রূপে তাহার শরীরপোষণের কাজে লাগাইয়া দ্যায়—প্রকৃতির ভাণ্ডারে এতটুকুও অপচয় হইবার তো জো নাই। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণী অপর প্রাণীর রক্ত মাংস খাইয়াই নিজেদের প্রাণধারণ করে; বিড়াল নিজের সদ্যজাত বাচ্চা ও ইঁদুর সমান আনন্দেই ভক্ষণ করে। পাছে বংশ বৃদ্ধি হইয়া খাদ্যাভাব ঘটে বা স্ত্রীর অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এই ভয়ে অনেক জন্তু নিজেদের সদ্যজাত শাবকদের বধ করে ও কেহ কেহ খাইয়া আহারের অভাব মোচন করে। বানর ও হনুমানের মদ্দা বাচ্চা হইলে পালের গোদা তাহার পেট চিরিয়া প্রাণবধ করে, এজন্য মদ্দা বাচ্চার জননী শিশুসন্তানকে বুকে লইয়া লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরে, জনকের আক্রমণ হইতে ছেলেকে রক্ষা করিবার জন্য জননী নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করে. অনেক সময় ভয় ভুলিয়া মানুষের ঘরের মধ্যে আশ্রয় লয়, দুর্দ্দান্ত জনক ছেলের পেট নখে চিরিয়া মারিয়া ফেলিলেও জননী ছেলেকে বুক হইতে নামায় না, শেষে পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে হয় ফেলিয়া দ্যায় নয়ত আপনার পেটে রাখিয়া দ্যায়—প্রাণ ধরিয়া ফেলিতে পারে না। পেঁচা ও সোনালি ঈগল প্রভৃতি শিকারী পাখীর মাদিরা একই দিনে সমস্ত ডিম পাড়ে না; প্রথম ডিমটি পাড়িয়াই তাহারা তা দিতে বসিয়া যায়; সুতরাং আগেকার ডিমের বাচ্চা পরের ডিমের বাচ্চার অপেক্ষা আগে জন্মিয়া অনুজদের চেয়ে বড় সুতরাং বলিষ্ঠ হয়; খাবার সময় কাড়াকাড়ি লড়ালড়িতে বড়রাই জয়ী হয় ও ছোটরা জখম হয়, জখমী বিকলাঙ্গ ভাইবোন বা সন্তান লইয়া পরিবারকে ভারাক্রান্ত করিতে তাহারা চাহে না; কাজেই সেই আহতকে একবারে বধ করিয়া জঠরানলে আহুতি দিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হয়। খরগোষ ইঁদুর প্রভৃতি ভীরু প্রাণী বিপদের সম্ভাবনা অথবা ধৃত বা বন্দী হইবার আশঙ্কা দেখিলে সন্ত্রস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বাচ্চাগুলিকে নিজেরাই খাইয়া সন্তানদের বন্ধনদুঃখ মোচন করে। সাপ, গিরগিটি, কুমীর, মাছ, জলের সোনাপোকা প্রভৃতি বহু প্রাণী নিজেদের ডিম ও বাচ্চা অথবা দুর্ব্বল স্বজাতিকে খাইয়া থাকে। জলচর গিরগিটির সদ্যজাত বাচ্চাগুলি বেঙাচির মতন দেখিতে হয়; জনক-জননীরা নিজের সন্তান ও প্রতিবেশীর সন্তানের পার্থক্য ধরিতে না পারিয়া নির্ব্বিচারে আত্মপর ভেদ ভুলিয়া বাচ্চা ও বেঙাচি দুই খাইয়া থাকে। প্রজাপতির পলু ও কীড়া গাছের পাতার গায়ে থাকিয়া পাতা খাইয়া বাঁচে; কিন্তু পাতা খাইবার সময় একটা কীড়া অপর কীড়ার নাগাল পাইলে আর বাছবিচার করে না, পাতার সঙ্গে জাতভাইকে সুদ্ধ পেটে পুরিয়া ছাড়ে। সাপের দাঁত মুখের ভিতর-দিকে বাঁকানো, এজন্য সাপ কিছু কামড়াইয়া ধরিলে তাহা সমস্তটা গিলিয়া ফেলা ছাড়া বেচারার আর উপায় থাকে না, উগলাইতে গেলে তাহার দাঁত ভাঙিয়া প্রাণান্তকর ব্যাপার ঘটে; সাপ ইঁদুর মনে করিয়া ছুঁচা ধরিলে তাহার বিপদের অন্ত থাকে না, না পারে দুর্গন্ধ ছুঁচাকে গিলিতে, না পারে উগলাইয়া ফেলিতে; দুইটা সাপে একটা ব্যাং বা ইঁদুর কামড়াইয়া ধরিলে উভয়েরই বিপদ, যে উহারই মধ্যে আকারে বড় ও প্রবল সে ছোট দুর্ব্বল জাতভাইকে সুদ্ধ গিলিয়া ফেলিতে বাধ্য হয়।

কাঁকড়া-বিছে, ফড়িং, মৌমাছি, মাকড়সা প্রভৃতি প্রাণীর মদ্দারা বাঁচিয়া থাকে শুধু বংশরক্ষার জন্য; মাদি গর্ভ ধারণ করিলেই তৎক্ষণাৎ মদ্দাকে মারিয়া ফেলে এবং কেহ কেহ বা মারিয়া খাইয়া ফেলে। এই সব প্রাণীর মাদিরা মদ্দাদের চেয়ে আকারে বড় ও বলিষ্ঠ হয়, কিন্তু প্রণয়িনীর মন ভুলাইবার জন্য মদ্দাদের রূপ সুন্দর হয়; ইহাদের মদ্দারা প্রণয়িনীদের কিছুতেই তুষ্ট করিতে পারে না, প্রণয় নিবেদন করিতে গেলে হাতাহাতি না হইয়া যায় না, সাধ্যসাধনায় যদি বা মন পায় তবে তাহা প্রাণের বদলে; প্রণয় জানাইতে আসিয়া



মাদি ফড়িং স্বামীকে বধ করিতেছে।



মাদি ফড়িং স্বামীকে গিলিতেছে।

প্রণয়িনীর বিরাগ বুঝিতে না পারিয়া বেশী সাধ্যসাধনা করিতে গিয়াও অনেক বেচারা প্রাণে মারা পড়ে। কাঁকড়া-বিছে দাড়া দিয়া প্রণয়ীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে, এবং সেই মরণ-আলিঙ্গনের সময় সে বেচারা বেশী ছটফট করিয়া মরিতে আপত্তি করিলে প্রণয়িনী ল্যাজ উল্টাইয়া তাহার প্রণয়ীর গায়ে বার দুইচার হুল ফুটাইয়া সকল নড়াচড়া ঠাণ্ডা করিয়া দ্যায়।

* *
*

পক্ষী বৃক্ষরক্ষী—

গাছ পত্রপল্লবের ছাতার তলে পাখীর মাথা রাখিবার জায়গা করিয়া দ্যায়, পাখী গাছের শত্রু পোকা-মাকড়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়া গাছের প্রত্যুপকার করে। কোনো গাছকে না কাটিয়া শীঘ্র মারিয়া ফেলিবার দরকার হইলে তাহাতে পাখী বসিতে না দিলেই কাজ সহজ হইয়া আসে। বাস্তবিক ইহা পরীক্ষিত সত্য। আমেরিকান ফরেষ্ট্রি নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে; আমেরিকার ছেলেরা খেলনা বন্দুক লইয়া পাখীদের বধ করিয়া বা ভয় দেখাইয়া বেড়ায়, তাহার ফলে লোকালয়ে পাখীর আসা যাওয়া কম হইতেছে ও জনপদের উদ্ভিদ পোকার কবল হইতে রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। জগতের সমস্ত পাখী উচ্ছেদ হইয়া গেলে সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত উদ্ভিদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সকল পাখীর চেয়ে কাঠঠোকরাই গাছের বেশী উপকারী বন্ধু, ইহারা গাছের গায়ের পিঁপড়ে পোকা-মাকড় খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়া ফেলে, রুগ্ন গাছের শুক্‌নো ফোঁপরা কাঠের ভিতরেও যাহারা জন্মিয়া গাছের তাজা অংশও কুরিয়া খায় তাহারাও কাঠঠোকরার ঠোঁটের ঠোকর হইতে অব্যাহতি পায় না, কাঠঠোকরা গাছের কাঠ ফুটা করিয়া গোপন গহ্বর হইতে গাছের শত্রু পোকা-মাকড়দের সন্ধান করিয়া বাহির করে; সুতরাং যে গাছে কাঠঠোকরা বসে বা বাসা করে সে গাছের আর মার নাই।

আমার কলিকাতার বাসার উঠানের ধারে একটা বেলগাছ আছে, তাহাতে কাকের আড্ডা ছিল; উঠান নোংরা করে বলিয়া কাক বসিলেই তাড়া দেওয়া হইত। এইরূপ ছয় বৎসরের চেষ্টায় কাকেদের শোকে তাহাদের আশ্রয়-বৃক্ষটি শুকাইয়া পল্লবহীন কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছে।

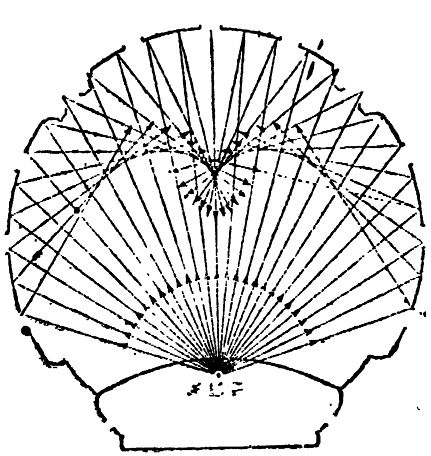
* *
*

ছেলেদের ঘড়ি ঘড়ি ক্ষুধা পায় কেন ? –

দি জার্নাল অফ্ দি আমেরিকান্ মেডিক্যাল্ এসোসিয়েশান পত্রে বহু পরীক্ষালব্ধ ফল প্রকাশিত হইয়াছে যে একজন স্কুলে ভর্ত্তি হইবার বয়সের বাড়ন্ত ছেলে একজন জোয়ান বয়সের চাষার মন্দ অপেক্ষা দেড়া খাবার না পাইলে তাহার পুষ্টির ও বাড়ের ব্যাঘাত ঘটে। উঠন্ত বয়সের ছেলেমেয়েরা জোয়ান লোকের চেয়ে শতকরা ২৫ ভাগ অর্থাৎ সওয়াগুণ বেশী খাদ্য রসরক্তে পরিণত করিয়া লইতে পারে; সেইজন্য তাহাদের ঘন ঘন ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং ক্ষুধানলে খাদ্যের জ্বালানি না জোগাইলে জঠরানলে দেহের ক্ষয় হইতে থাকে। উঠন্ত বয়সের ছেলেদের নিম্নলিখিত পরিমাণে খাদ্য দরকার হয়—

	প্রোটিন	তৈল	কার্ব্বোহাইড্রেট বা শর্করা
মোট খাদ্য	২০.৫	২৫.৬	৬০.৫
অপচয়	৩.৮	৫.৪	৪.২
নিট দেহপুষ্টি	১৬.৭	২০.২	৫৬.৩

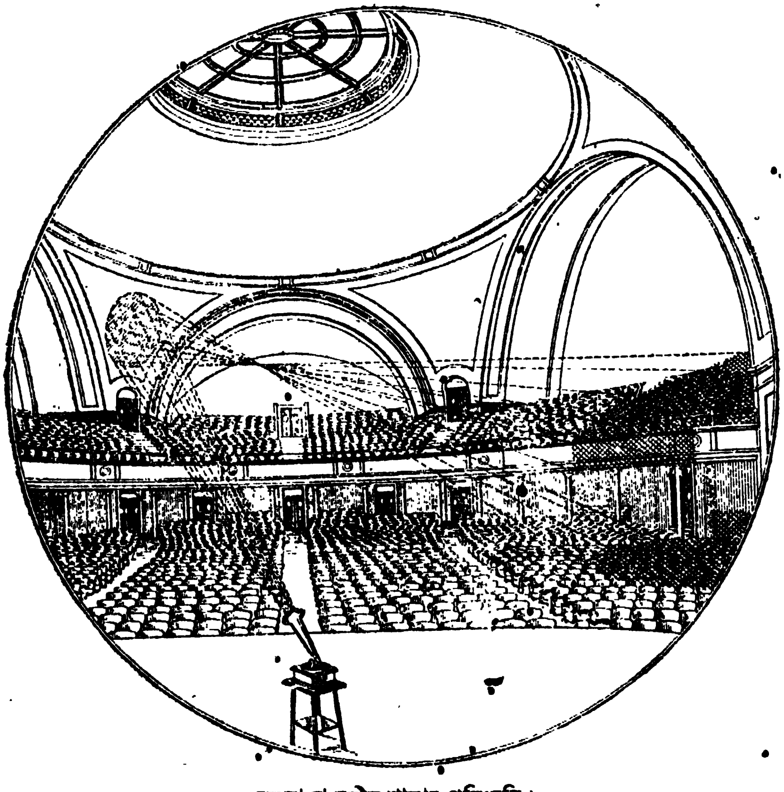
এই দেহপুষ্টি খাদ্য হইতে আদায় করিতে হইলে রুটি মাখন দুধ চিনি ভাত তরিতরকারি খাইলেই পাওয়া যায়; তদতিরিক্ত অন্য কিছু খাওয়া স্বাদ ও মুখ বদলের জন্য মাত্র। উঠন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের ঐ সব টাটকা খাদ্য খুব ঘন ঘন খাইতে পাওয়া দরকার।



শ্রোতৃসভার আদর্শ নক্সা।
এ দিকের মঞ্চ হইতে বক্তৃতা বা সঙ্গীতের শব্দ শ্রোতাদের দিকে যাইবে ও প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গেসঙ্গেই শ্রুতিগোচর হইবে, তাহাতে একই ধ্বনি শোনা যাইবে, এক শব্দের প্রতিধ্বনির সহিত অপর শব্দের ধ্বনি মিশিয়া গণ্ডগোল হইবে না।

বক্তৃতা-ঘরে প্রতিধ্বনি—

ঘরের দেয়াল নিরেট কঠিন হইলে ও জানালা দরজা অল্প থাকিলে সেই ঘরে শব্দের প্রতিধ্বনি হয়। বক্তৃতা অভিনয় বা সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি হইলে শ্রোতাদের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয়, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে জড়াজড়ি হইয়া যায়। আবার খুব উঁচু ও ফাঁকা ঘর হইলে ধ্বনি ভাসিয়া বাহির হইয়া যায়, শ্রোতারা শুনিতে পায় না। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বক্তৃতা-মঞ্চের পিছনে শব্দের প্রতিফলক লাগাইতে হইয়াছে, যাহাতে শব্দ প্রতিহত হইয়া শ্রোতার কানে পৌঁছে, উপরে বা বাহিরে ভাসিয়া না যায়। লর্ড রেলে আবিষ্কার করেন যে ঘরের দেয়ালের গায়ে চুলের, বোনা বনাত কাপড় দেয়াল হইতে একটু ছাড়িয়া আঁটিয়া দিতে পারিলে সেই ঘরের সমস্ত শব্দ সেই কাপড়ে শুষিয়া যাইবে ও তাহাতে আর প্রতিধ্বনি হইতে পারিবে না। কি রকম আকারের প্রেক্ষাগৃহ বা শ্রোতৃমন্দির হইলে সমস্ত ধ্বনি সোজা গিয়া ও প্রতিফলিত হইয়া একই সঙ্গে শ্রোতার কানে পৌঁছিতে পারে অঙ্ক কষিয়া তাহারও নক্সা আঁকা হইয়াছে; ধ্বনি ও প্রতিফলিত ধ্বনি একসঙ্গে কানে আসিলে কোনো অসুবিধা বোধ হয় না, কেবল স্বরের একটু বিকৃতি বোধ হয়। কিন্তু ধ্বনির পরে প্রতিধ্বনি শুনিলে পরের ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি মিশিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়া তোলে।



বক্তৃতা বা সঙ্গীত-শালায় প্রতিধ্বনি।

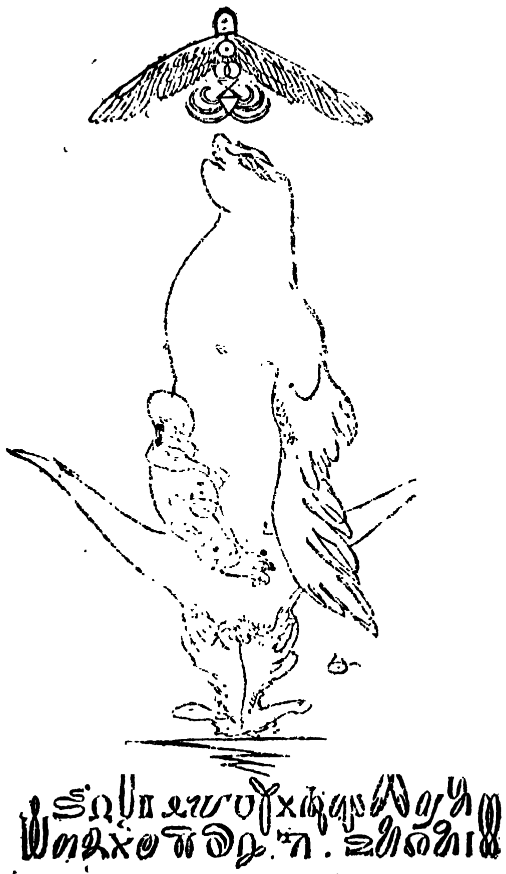
* * *

খুসীর খেয়ালে ছবির সাধনা—

আর্ট সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিক পত্র ফরম্; তাহাতে ইংরেজ শিল্পী অষ্টিন ও. স্পেয়ার এবং ফ্রেডেরিক কার্টার এই মত প্রচার করিতেছেন যে ভালো চিত্রকর হইবার বাসনা থাকিলে রেখাসন্নিপাতে মুক্ত স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সর্ব্বাগ্রে দরকার; ইহার জন্য কোনো উদ্দেশ্য মনে না রাখিয়া ভবিষ্যতে সেইসব রেখাপাতে কি আকৃতি হইবে তাহার চিন্তা ভুলিয়া আপনার খুসী খেয়াল-মত যা-তা রেখা বেপরোয়া হইয়া টানিয়া যাইতে হইবে; এই-সব রেখার একত্র সন্নিপাতে যে-সব ছন্দ, যে-সব টান ও যে-সব আকৃতি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে তাহারাই ক্রমে চিত্রকরের



চিত্রকরের খেয়াল-খুসীর রেখার টান।



চিত্রকরের খেয়াল-খুসীর রেখার টানে ছবি ও নক্সার আদ্যার জন্ম।

ইচ্ছাধীন ও আজ্ঞাধীন হইয়া পড়িবে। খেয়ালের রেখার টানে হাত বসিলে পরেও হাত অবলীলায় খেলিবে, এবং নিরুদ্দেশ্য রেখার সমবায়ে যে-সব আকৃতির আদরা পাওয়া যাইবে তাহারাই চিত্রকরকে কতবিধ



চিত্রকরের খেয়াল-খুসীর রেখার টানে কল্পনার অদ্ভুত খামখেয়ালী।

নক্সার পরিকল্পনা ইঙ্গিতে জানাইবে, পরে তাহারাই কত কাজে লাগিবে। বস্তুতন্ত্রতা ব হুবহু অবিকল নকল ও ঠিকঠাক মাপজোখের ভাবনা ভুলিয়া হাতকে মনের আনন্দে যে না খেলাইতে পারে সে কখনো উৎকৃষ্ট চিত্রকর হইতে পারে না; আবার যা-খুসী তাই আঁকিলেই চিত্রকর হওয়া যায় না; যার মনে রূপের আনন্দ রেখার ছন্দে ধরা পড়িয়াছে সেই যা-খুসী তাই রেখা বুনিতে বুনিতে রূপের আনন্দ ধরিবার জাল তৈয়ারি করিতে পারে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উপদেশ দিয়াছিলেন দেয়ালের গায়ের ফাটা চটা শেয়ালা দাগের মধ্যে অন্বেষণ করিলে যাহার রূপ ধরিবার চোখ আছে সে কত নক্সা কত ছবি কত আকৃতি আবিষ্কার করিতে পারে; যে চিত্রকরের মন তাজা সে তাহা হইতেই

নূতন সৃষ্টির আভাস সংগ্রহ করিবে। হাতকে স্বচ্ছন্দ গতিতে বেপরোয়া ছাড়িয়া দিয়া একই রেখা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া টানিয়া কিছু গড়িয়া তুলিবার দিকে যাইতে হইবে, কিন্তু কি গড়িব সে চিন্তা বা কেমন করিয়া গড়িব সে চেষ্টা একটুও থাকিবে না, একই রেখার জড়াজড়িতে যাহা হইয়া উঠে উঠিবে। এইরূপে ব্যক্তির ভাব নিজস্ব পথে আকার পাইয়া ফুটিতে থাকিবে।

ইঁহাদের মতের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের মতের অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলালের ছবিতে এই দুই শিল্পীর নির্দ্দিষ্ট বেপরোয়া জোরালো রেখাসম্পাতের আনন্দ ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়, তাঁহার ছবির রেখাসম্পাতে কুণ্ঠা দ্বিধা ইতস্তত একটু থাকে না।

চারু।

কষ্টিপাথর

জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ।

পরাধীনতা—ব্যক্তিগত দাসত্বকেও পরাধীনতা বলা যায়। কিন্তু দাসত্ব ও অধীনতার আর-এক মূর্ত্তি আছে, যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব বা অধীনতা। পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যে-সকল প্রাচীন রাষ্ট্র বা জাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অধিকাংশই কোন না কোন সময়ে অন্যের অধীনতা সহ্য করিয়াছে। ব্যক্তিগত দাসত্ব-প্রথা পৃথিবী হইতে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। কিন্তু জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় দাসত্ব এখনও প্রবলভাবে কার্য্য করিতেছে ও সভ্যতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে, তাহা যে কোন দিন লুপ্ত হইবে, এরূপ আশার কারণ আজও দেখা যাইতেছে না।

স্বাধীনতা স্বাভাবিক, পরাধীনতা অস্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতিই নিজের শক্তিবলে ও পারিপার্শ্বিক শক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া উন্নতির দিকে—বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। বাহিরের কোন শক্তি যদি এক জাতির ঘাড়ে চাপিয়া বসে, তবে তাহার জাতীয় বিকাশ আর স্বাভাবিকরূপে ঘটে না, সে জাতি পঙ্গু ও দুর্ব্বল হইয়া যায় ও মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়।

এক জাতি আর-এক জাতির অধীন হইলে, তাহার জাতীয় জীবনের সর্ব্বদিকেই যে বিকাশের বাধা হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রথমতঃ—ধনোৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ধারায় অনেক বাধা উপস্থিত হয়। যে জাতি প্রভু হইয়া বসে সে অধীন জাতির উৎপন্ন ধনাদিতে নিজের ভাগ যথাসাধ্য জোর করিয়া বা কলে-কৌশলে আদায় করিয়া লয়। নিজেদের সুবিধার জন্য এমন সমস্ত নিয়ম ও বিধি নিষেধাদি প্রচলন করিতে থাকে যে, অধীন জাতির পক্ষে সেগুলি হিতকর হইতেই পারে না। অধীন জাতি যদি প্রভুজাতির তুলনায় নিতান্ত অসভ্য ও বর্ব্বর হয়, তবে তাহাকে স্বদেশে দাসরূপে কেবল প্রভুজাতির কার্য্যের জন্যই জীবন ধারণ করিতে হয়। আর যদি অধীন জাতিও কতকটা সভ্য ও উন্নত হয়, তাহা হইলেও প্রভুজাতির শক্তি এবং কৌশলবলে, তাহাকে স্বপরিশ্রমলব্ধ ধনের অনেক অংশ হইতেই বঞ্চিত হইতে হয়। দেশমধ্যে ধনোৎপাদনের যেসকল লাভজনক পন্থা থাকে, প্রভুজাতিই তাহা হস্তগত করিয়া লয়, এবং অধীন জাতির উন্নতির পথে যতপ্রকার বাধা দেওয়া যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে সে ছাড়ে না। কারণ দাসজাতি চিরদিনই তাহার পদানত ও সেবাপরায়ণ হইয়া থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ইচ্ছা; আর যাহাতে ইহার বিপরীত ঘটিতে পারে সেরূপ ব্যবস্থায় সে সহজে প্রশ্রয় দেয় না। ফলে প্রভুজাতি ক্রমে ধনী ও ক্ষমতাশালী, এবং দাসজাতি দরিদ্র ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ—দুর্ব্বল ও স্বল্পসভ্য জাতি, প্রবলতর ও সভ্যতর জাতির সংস্পর্শে আসিলে, তাহার সামাজিক জীবনেও মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে অধীন দুর্ব্বল জাতির জীবনে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, তাহার সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক সময়ে যে বিপ্লব ঘটে, তাহার ফল জাতীয় জীবনের পক্ষে হিতকর হয় না। নূতন নূতন অভ্যাস ও প্রথা তাহার সমাজমধ্যে ঢুকিয়া তাহার বহুদিনের নির্দ্দিষ্ট জাতীয় জীবনের গতি অনেক সময়ে রুদ্ধ ও বিকৃত করিয়া তোলে ও জীবনীশক্তির মূল শিথিল করিয়া দেয়। নূতন সভ্যতা ও প্রবলতর জাতির সংস্পর্শে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক ব্যাধিও সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে ও জাতির জাতীয় স্বাস্থ্য শোচনীয় হইয়া উঠে। অন্যদিকে প্রবল ও দুর্ব্বল দুই জাতির সংমিশ্রণে সঙ্করবর্ণের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই সঙ্কর বা মিশ্রজাতি প্রায়ই দুর্ব্বল, জীবনীশক্তিহীন ও রুগ্ন হইতে দেখা যায়। অনেক স্থলে স্ত্রীলোকদের উৎপাদিকা-শক্তি হ্রাস হইয়া যায় ও শিশুমৃত্যু বাড়িতে থাকে। মিশ্রণের ফলে প্রায়ই সমাজে নানারূপ ব্যভিচার ও দুর্নীতিও প্রবেশ করিতে থাকে এবং তাহাতেও জাতির জীবনীশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া ফেলে।

তৃতীয়তঃ—জীবনের সর্ব্ববিভাগে পরাধীন জাতির কার্য্যকরী শক্তির স্ফূর্ত্তি পাইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে না। রাষ্ট্র ও দেশশাসন প্রভৃতি ক্ষমতার কার্য্য কচিৎ তাহাদের হাতে পড়ে। এইরূপে শারীরিক, মানসিক—সকল-প্রকার বিকাশের পথেই তাহারা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহার ফলে তাহাদের মনুষ্যোচিত শক্তি ও বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে; এবং যতই পরাধীনতার কাল দীর্ঘতর হইতে থাকে, ততই তাহারা অধিকতর অকর্ম্মণ্য, অপটু, পরিশ্রমকাতর, উৎসাহহীন ও সর্ব্ববিষয়ে পঙ্গু হইতে থাকে। যে কোন জাতিই দীর্ঘকাল পরাধীনতা ভোগ করিয়াছে, তাহাদেরই জাতীয় জীবনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ—পরাধীন জাতির জীবনে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট হয়, তাহা হচ্চে আত্মশক্তির উপর বিশ্বাসহীনতা। ক্রমাগত বাধা পাইয়া, জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের যে কোন স্থান আছে, ইহা তাহারা ভুলিয়া যায়, ও গতানুগতিক ভাবে, নিতান্তই যন্ত্রচালিতবৎ তাহারা জীবন কাটাইতে থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাহাদের বৃদ্ধি মলিন হইয়া যায়। প্রতিভার মৌলিকতা ও নব নব উন্মেষ তাহাদের মধ্যে বিরল হইয়া উঠে। পরপদাশ্রিত জাতিরা নিজেদের বিশেষত্ব হারাইয়া, কেবল প্রভুজাতিরই শিখানো কথা আবৃত্তি করিতে থাকে; তাহারই প্রদর্শিত পন্থা উহাদের একমাত্র গতি হইয়া উঠে। ইহা একপ্রকার মৃত্যুই বলা যাইতে পারে। জীবন্মৃতবৎ, জরাগ্রস্ত জাতি নিজের প্রাণশক্তি এইরূপে হারাইয়া, আপনার অজ্ঞাতসারেই শোচনীয় ধ্বংসের পথে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইতে থাকে।

• শিল্পবাণিজ্যের হ্রাস ও দারিদ্র্য—জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ মূর্ত্তি শিল্পবাণিজ্যে প্রতিযোগিতা। ধনোৎপাদন ও বণ্টনের উপরে জাতীয় স্থিতি ও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সমাজের কতকাংশ কৃষি ও শিল্পের দ্বারা ধনোৎপাদন করে, নানা উপায়ে সেই ধনের বণ্টন হয়, ও বাণিজ্য দ্বারা তাহার বিনিময় ঘটে; এবং এইরূপে সমাজ-শরীরের বিভিন্নাঙ্গ বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়া সমাজকে সুস্থ ও সবল রাখে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক সমাজ নিজের প্রয়োজন নিজেই সাধন করে, কচিৎ বা অন্য সমাজের সঙ্গে

আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অভাব পূরণ করিয়া লয়। কিন্তু যখন কোন দুর্ব্বল ও স্বল্পসভ্যজাতি প্রবলতর বুদ্ধিমান জাতির সংস্পর্শে আসে, তখন অনেক সময় এই-সকল ব্যবস্থা একেবারে উল্টাইয়া যায়। প্রবলতর বুদ্ধিমান জাতি, নিজের উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বলে, দুর্ব্বলতর স্বল্পবুদ্ধিজাতির শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হস্তগত করিয়া লয়; ধনোৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা সমাজের নিজের অধিকারচ্যুত হইয়া বৈদেশিক শক্তির করায়ত্ত হইয়া পড়ে। তাহার ফলে দুর্ব্বল জাতি ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে, তাহাদের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের হ্রাস হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেয়; এবং এইরূপে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া দুর্ব্বল দরিদ্র জাতি ধ্বংসের মুখে যাইতে থাকে। আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রবলতর জাতিরা নানারূপে অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া শিল্পবাণিজ্যের নূতন নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে ও পৃথিবীময় দুর্ব্বলতর স্বল্পসভ্য জাতিদের শিল্পবাণিজ্য হস্তগত করিয়া লইতেছে। দুর্ব্বলতর স্বল্পবুদ্ধি জাতিরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পারিয়া ক্রমে ক্রমে দরিদ্র ও হতশ্রী হইয়া পড়িতেছে।

সামাজিক প্রথা ও কুসংস্কার—বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যের চেষ্টাতেই জীবনের লক্ষণ। আর জীবদেহ যতক্ষণ বাহিরের সঙ্গে এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সমাজের পক্ষেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। যতক্ষণ সমাজ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে জীবন্ত থাকে; আর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিলেই তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জীবদেহ যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন সে তাহার বাহিরের নানা শক্তিসমূহকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়;—বাহ্য ও আভ্যন্তর নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। এই সম্বন্ধের সফলতার উপরেই জৈব-বিকাশের গতি নির্ভর করে। সমাজও তাহার বিকাশের পথে বাহ্যশক্তি-সকলকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয়; ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের বিবিধ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আপনার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে থাকে। প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের শক্তিই জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। অবশ্য এই চলা বা গতিও নিরবচ্ছিন্ন নহে, ইহার সঙ্গে স্থিতিও আছে। আর প্রকৃতপক্ষে গতি ও স্থিতি এই উভয়ে মিলিয়াই বিকাশকে গড়িয়া তোলে। স্থিতি দ্বারাই সমাজে বৈশিষ্ট্য বা তাহার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যটুকু রক্ষিত হয়;—প্রাচীন কালের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ—তাহার পারম্পর্য্য ইহাতেই বজায় থাকে। আর ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাহ্যশক্তির সঙ্গে আপনাকে সুসঙ্গত করিয়া লয়। সুতরাং স্থিতি ও গতি এই উভয়ই সমাজের যথার্থ বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয়; যে সমাজ কেবল স্থিতিকেই আঁকড়াইয়া থাকে, বাহ্যশক্তির সঙ্গে মিলাইয়া আপনার বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, আচার প্রথা প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারে না, সে সমাজ পঙ্গু ও জড়। জীবন্মৃতবৎ সেই সমাজ শীঘ্রই ধ্বংসের মুখে যায়। অপর পক্ষে যে সমাজ কেবলই গতিকে বা চলাকে আদর্শ করিয়া লইয়াছে, সে সমাজ নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলে; চারি পার্শ্বের নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কেবলই চলিতে গিয়া সে নিজের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বিশ্ব-মানবের সভাতে কোন স্থানই অধিকার করিতে পারে না। যে সমাজ স্থিতি ও গতি এই দুইকেই যথাযোগ্য মিলাইয়া, কালপ্রবাহের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সেই সমাজই আপনার স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে এই লক্ষণ অনেক পরিমাণে দেখা যায়। প্রাচ্য জাতির মধ্যে আধুনিক জাপান বিকাশ ও উন্নতির পথে আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। সে বর্ত্তমান জগতের নবীন আদর্শ ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সমস্ত প্রাচীন জড়তা ও দৈন্য পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বমানব-সমাজে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে জাপানের প্রতিবাসী চীন ঠিক ইহার উল্টাপথে চলিয়াছে। এই স্থবিরজাতি স্থিতিকেই প্রবলরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। বহুশত বৎসরের আবর্জ্জনার জাল 'সনাতনী'র মোহে স্তূপাকার করিয়া তাহাতেই পরমানন্দ বোধ করিতেছে। বিশ্বমানবের গতিপথে যে-সকল নব নব সমস্যার উদয় হইতেছে, তাহার সঙ্গে সে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না, ও আপনাদের অতি প্রাচীন বিবিব্যবস্থা, আচার-প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতিকে প্রবল আসক্তির বশে নির্ব্বিচারে রক্ষা করিয়া, পঙ্গুতা ও জড়তার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এরূপ ভাবে চলিলে তাহার মৃত্যু যে অদূরবর্ত্তী হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ জীবন্ত ছিল। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষ কোন দিনই 'সনাতনী'র মোহে জড়তাকে প্রশ্রয় দেয় নাই। নব নব অবস্থার সঙ্গে সে আপনাদের বিধিব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া, নব নব সমস্যার সমাধান করিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের 'যুগধর্ম্ম' ও 'আপদ্ধর্ম্ম'ই সে বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষ স্থবির ও বৃদ্ধ চীনের ন্যায় নিজেকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে। নূতন পৃথিবীর নূতন আদর্শের সঙ্গে সে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে না। পূর্ব্বপুরুষের গৌরবের মোহে অন্ধ হইয়া সে জীবনহীনতাকেই প্রশ্রয় দিতেছে ও অনাদিকালের জঞ্জালজাল সযত্নে রক্ষা করিয়া মৃত্যুব্যাধির বীজকেই পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। কিরূপে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনকে মিলাইয়া লইতে হয়, কি করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ও আদর্শ বজায় রাখিয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ও বিকৃতবুদ্ধি চিররুগ্ন ব্যক্তির ন্যায়, শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি পরস্পরের সঙ্গে ভাব ও আদর্শের আদানপ্রদান করিতেছে, বিভিন্নজাতি পরস্পরের সাহায্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি করিতেছে,—সমুদ্র, আকাশ, জলবায়ু বা প্রাকৃতিক কোন শক্তিই যখন মানুষের উৎসাহকে বাধা দিতে পারিতেছে না, ঠিক সেই সময়েই আমরা 'সমুদ্র-যাত্রানিষেধ' বিধি দৃঢ়রূপে রক্ষা করিয়া আপনাদের সূর্য্যালোকহীন অন্ধগুহার মধ্যে আরামে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি। এই বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের দিনেও যে জাতি এইরূপে জড়তাকে প্রশ্রয় দিয়া দিব্য আরামে ঘুমাইতে পারে, তাহাদের যদি ধ্বংস না হয়, তবে আর কাহার হইবে? নবীন পৃথিবীর নব নব আদর্শ, নব নব ভাবকে আমাদের 'অচলায়তনের' দৃঢ় প্রাচীর দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেই আমরা বিপুল চেষ্টা করিতেছি ও তাহার ফলে সেই অচলায়তনের মধ্যেই যে আমাদের জীবন্ত সমাধি ঘটিতে পারে তাহা ভুলিয়া যাইতেছি।

(নারায়ণ, আশ্বিন) শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

* * *

অশোকের ধর্ম্মলিপি।

মৌর্য্য নরপতি অশোক তাঁহার সাঁইত্রিশ-বর্ষব্যাপী রাজত্বকালের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাঁইত্রিশটি লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার হায়দারাবাদ রাজ্যে আর একটি নূতন অশোক-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিগুলি

ইতিহাসে কখন অশোক-লিপি, কখন বা অশোক-অনুশাসন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহবা তাহাকে শুদ্ধ করিয়া বলিয়া থাকেন অনুশাসন-লিপি। অনুশাসন অর্থে সাধারণতঃ রাজার আদেশ বুঝায়। কিন্তু মহারাজ অশোক সে অর্থে উহা কোথাও ব্যবহার করেন নাই।

অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি আদেশমূলক নহে, উহা উপদেশ-মূলক। এই ধর্ম্মলিপির মধ্যে কোন-প্রকার রাজ-আদেশের কঠোরতা নাই, উহার মধ্যে আছে, বিশ্বের প্রতি মৈত্রী-ভাবে-অনুপ্রাণিত মহা-প্রতাপান্বিত এক সম্রাটের উদার কোমল উপদেশবাণী। উহাতে আছে মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীয় সুহৃদের উপকার, পরোপকারিতা, জীবে দয়া, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, সত্যের প্রতি সমাদর। ধর্ম্মলিপি পাঠে প্রতীয়মান হয় যে প্রাণী-জগতের হিতসাধনই অশোকের মূলমন্ত্র ছিল। লোকের যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য ও প্রকৃত কল্যাণপ্রদ, তাহাই মহারাজ অশোক সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধৌলি ও জৌগড় অনুশাসন-মধ্যে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন; সকল মনুষ্যই আমার পুত্র, এই মহাবাক্য পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য করিয়া এক ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের পূর্ব্বে যদিও মিশর, বাবিলন, আসিরীয় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে অনুশাসন উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তাঁহার পরেও অনেক নরপতি এবম্প্রকার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানবের কল্যাণার্থে প্রস্তরগাত্রে নীতিতত্ত্বের এরূপ উচ্চ আদর্শ অমর তুলিকায় আর কেহ কখনও উৎকীর্ণ করেন নাই। এই-সকল অনুশাসনলিপি যদি আদেশমূলক হইত, তাহা হইলে ইহার লঙ্ঘনে কোন-না-কোন-প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা থাকিত। উৎকীর্ণ অনুশাসন-মধ্যে কোথাও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা নাই। ধর্ম্মলিপিগুলি প্রধানতঃ প্রজাবৃন্দের উপদেশরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের যত-প্রকার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, এই-সকলের মধ্যে অনুশাসনলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক। ইহা হইতে যে কেবল কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা অবগত হওয়া যায় তাহা নহে, উহা হইতে অতীত যুগের ভাষা, লিখনপ্রণালী, লিপিবিদ্যার ক্রমোন্নতি, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজকীয় রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়েও অসংখ্য জ্ঞানলাভ করা যায়। এই নিমিত্তই অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি ঐতিহাসিকের নিকট এত মূল্যবান।

অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইয়া থাকে—প্রথম শিলা বা গিরিলিপি, দ্বিতীয় কলিঙ্গ-লিপি; প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যে আবিষ্কৃত বলিয়া ইহা কলিঙ্গলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই লিপি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। যে স্থানে উক্ত অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম অনুসারে একটিকে বলা হয় ধৌলিলিপি, দ্বিতীয়টি জৌগড়লিপি। ইহাদের মধ্যেও ধৌলিতে দুইটি এবং জৌগড়ে দুইটি মোট চারিটি লিপি আছে। স্তম্ভ-লিপি—এগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভগাত্রে খোদিত বলিয়া স্তম্ভলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভাবড়া লিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট, রুম্মিংদি বা রুম্মিন্ দেবী, নিগ্লিব, দেবী বা Queen's Edict, সারনাথ, কৌশাম্বী, এলাহাবাদ, সাঞ্চী ও বরাবর গুহালিপি, তৎপরে নবপ্রকাশিত মাস্কি অনুশাসন। যে যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানের নাম অনুসারে এই লিপিগুলি ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

এই অনুশাসনাবলী পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে।—প্রথম, শিলা-লিপি—চৌদ্দটি শিলালিপি ও চারিটি কলিঙ্গলিপি এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; দ্বিতীয়, স্তম্ভলিপি—ইহার সংখ্যা সাতটি; তৃতীয়, খণ্ড বা ক্ষুদ্র শিলালিপি—যথা ভাবড়ালিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট ও মাস্কি এই শ্রেণীভুক্ত; চতুর্থ, ক্ষুদ্র বা অন্যান্য স্তম্ভলিপি—যেমন রুম্মিন দেবী, নিগ্লিভলিপি, সারনাথ-স্তম্ভলিপি, কৌশাম্বী বা প্রয়াগলিপি ও সাঞ্চীলিপি। পঞ্চম, গুহালিপি—বরাবর গুহালিপি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আবিষ্কৃত শিলালিপির সংখ্যা চতুর্দ্দশটি। অশোকের রাজত্বের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসরে এই গিরিলিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অনুশাসনে অশোক তাঁহার অভিষেক-বৎসর হইতে রাজত্বকাল গণনা করিয়াছেন। অশোকের অভিষেককাল খ্রীঃ-পূঃ ২৬৯ বা খ্রীঃ-পূঃ ২৬৮ বলিয়া একরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং খ্রীঃ-পূঃ ২৫৫ বা খ্রীঃ-পূঃ ২৫৬ অব্দ মধ্যে অশোকের শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তস্থিত ছয়টি বিভিন্ন স্থানে এই চৌদ্দটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যথা সাহাবাজগড়ি (পেশোয়ারের নিকট), মানসেরা (উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে), কালসী (দেরাদুন জেলায়), গির্ণার (কাঠিয়াবাড়), ধৌলি (ভুবনেশ্বরের নিকট), ও জৌগড় (গঞ্জাম জেলায়)। এই স্থানগুলি অশোক-সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তভাগে অবস্থিত। সাহাবাজগড়ি ও মানসেরা অনুশাসনগুলি খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত; অবশিষ্ট অনুশাসন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত।

অশোকের খণ্ড বা ক্ষুদ্র গিরিলিপির সংখ্যা ছয়টি। একই লিপি বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে তিনটি দক্ষিণ প্রদেশে ও তিনটি উত্তর ভারতে অবস্থিত। দক্ষিণে মহীশুর প্রদেশে চিতলগড় জেলার অন্তর্গত সিদ্ধপুর, যটিঙ্গরামেশ্বর এবং ব্রহ্মগিরি এই তিনটি স্থানে উক্ত অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। উত্তর ভারতে রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে বৈরাট, দক্ষিণ বিহারে সাহাবাদ জেলায় সাসেরাম এবং জব্বলপুর জেলায় রূপনাথ এই তিনটি স্থানে উহা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। বৈরাটের নিকটবর্ত্তী ভাবড়া নামক স্থানে কোন এক গিরিচূড়ায় একটি বৌদ্ধবিহারভূমিতে এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ভাবড়া লিপি নামে পরিচিত। ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ করিয়া এই লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গয়ার আট ক্রোশ উত্তরে ফল্গুনদীর পশ্চিম পারে বরাবর শৈলশ্রেণী অবস্থিত; এই শৈলশ্রেণীমধ্যে কতকগুলি গুহা নির্ম্মিত; সেই গুহামধ্যেই উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

চীন পরিব্রাজক হিউএন্-সাঙ্ (য়ুআন-চুয়াঙ) অশোক-নির্ম্মিত ষোলটি স্তম্ভের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ষোলটির মধ্যে এ পর্য্যন্ত দশটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক স্তম্ভ একটি সমগ্র প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত ও নানাবিধ কারুকার্য্যশোভিত। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(১) লৌড়িয়া নন্দনগড়স্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়া হইতে নেপাল যাইবার পথে লৌড়িয়াগ্রাম, ইহা মথিয়া হইতে তিন মাইল উত্তরে। এই স্তম্ভটি ৪০ ফুট উচ্চ। নানাবিধ কারুকার্য্যে বিভূষিত।

(২) প্রয়াগস্তম্ভ—ইহার দৈর্ঘ্য ৩২´ ও ব্যাস ২´-২´´। এলাহাবাদ ফোর্টে এলেনবরাব্যারাকের নিকট এক্ষণে উহা স্থাপিত। প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি, কৌশাম্বীলিপি ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। ইহার উপরিভাগে অশোক অনুশাসন, তাহার নিম্নে একদিকে কৌশাম্বীলিপি ও অন্যদিকে দেবী অনুশাসন (Queen's Edict), তাহার নিম্নে সমুদ্রগুপ্তের খোদিত লিপি।

(৩) রামপুরস্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত পিপারিয়া গ্রামের এক মাইল দূরে রামপুর নামক একটি গ্রামমধ্যে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। ইহাতেও প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি খোদিত।

(৪) লৌড়িয়া অররাজ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেথিয়ার পথে

কেশরী স্তূপের দশক্রোশ দূরে অররাজ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লৌড়িয়াগ্রাম। এই স্থানে একটি স্তম্ভ স্থাপিত আছে, ইহা দৈর্ঘ্যে ৩৬´-৬´´। এই স্তম্ভগাত্রে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) দিল্লী তোপ্রা স্তম্ভ—দিল্লীর সন্নিকট ফিরোজাবাদের অন্তর্গত কোথিল পাহাড়ের চূড়ায় এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। আম্বালার নিকট-বর্ত্তী তোপ্রা হইতে ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজতোগলক কর্ত্তৃক ইহা আনীত হইয়াছে। সুলতান এই স্তম্ভটি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং বহুযত্নে সহস্র সহস্র ব্যক্তির সাহায্যে উহা দিল্লীতে আনয়ন করেন। ইহাতে সাতটি স্তম্ভলিপি অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভটি দিল্লীসিবালিক বা ফিরোজসার লাট নামে কখন কখনও উক্ত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২´-৭´´।

(৬) দিল্লী মিরাট স্তম্ভ—এই স্তম্ভটি দিল্লীর অন্তর্গত একটি উচ্চ ভূমির উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইহা এক্ষণে ভগ্নপ্রায়। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজতোগলক এই স্তম্ভটিও মিরাট হইতে আনয়নপূর্ব্বক দিল্লীতে তাঁহার মৃগয়াবাসের নিকট স্থাপন করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ইহার বর্ত্তমান স্থানে ইহাকে পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন। স্তম্ভগাত্রে প্রথম ছয়টি স্তম্ভলিপি অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ আছে।

(৭) সাঁচী-স্তম্ভ—মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপালরাজ্যে সুবৃহৎ সাঁচী-স্তূপের উপর দক্ষিণদ্বারে এই স্তম্ভটি স্থাপিত আছে। সারনাথ, কৌশাম্বী ও প্রয়াগলিপির পাঠ ইহাতে অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(৮) সারনাথ স্তম্ভ—ইহাতে সাঞ্চী ও কৌশাম্বী লিপির পাঠ বিস্তারিত ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

(৯) রুম্মিন্‌দেবী স্তম্ভ—বস্তি জেলার অন্তর্গত দুলহার গ্রামের ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে রুম্মিন্‌দেবীর মন্দির; এই মন্দির-সম্মুখে একটি স্তম্ভ বিরাজিত। রুম্মিন্‌দেই প্রাচীন লুম্বিনী গ্রাম। এই স্থান গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান বলিয়া অশোক এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন ও এই লিপি উৎকীর্ণ করেন।

(১০) নিগ্লীভ স্তম্ভ—বস্তী জেলার অন্তর্গত নেপাল তরাই প্রদেশে নিগ্লীভ নামক গ্রামে এই স্তম্ভ এক্ষণে স্থাপিত আছে। নিগ্লীভসাগর নামক একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে উহা প্রতিষ্ঠিত। এরূপ প্রবাদ যে পূর্ব্বে এই স্তম্ভটি গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমন নামক বুদ্ধের জন্মস্থানে প্রোথিত ছিল।

গিরিগাত্রে, তীর্থসমূহে, রাজপথে এই-সকল অনুশাসন পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিত। যাহাতে সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হয়, সেই নিমিত্ত অনুশাসনগুলি সেই সময়কার প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

(নারায়ণ, কার্ত্তিক) শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

* * *

জাতি বা বর্ণভেদের কথা।

জাতিভেদ একটা সামাজিক ব্যবস্থা। ব্যবস্থা মাত্রেই অবস্থার উপরে নির্ভর করে। সমাজের এক অবস্থায় যে ব্যবস্থা কল্যাণকর হয়, অন্য অবস্থায় তাহা হয় না।

এই জাতিভেদ একটা সনাতন ব্যবস্থা নয়। আমরা আজ যাহাকে জাতিভেদ বলিয়া জানি, প্রাচীন আর্য্যসমাজে তাহা ছিল না। আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদ বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালে একই বংশে, একই পরিবারে জন্মিয়া, কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয়, আর কেহবা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনটি জাতি নহে, কিন্তু তিনটি বিশেষ সামাজিক বৃত্তিমাত্র। এক লোকে নিজের বা সমাজের সকল কাজ করে না, করিয়া উঠিতে পারে না, পারিলেও তাহাতে যে অযথা শক্তিক্ষয় হয় তাহার উপযুক্ত মূল্য মিলে না। এইজন্য সমাজে শ্রমবিভাগ আরম্ভ হয়। বৈশ্যেরাও মাটি ফুঁড়িয়া উঠে না, ক্ষত্রিয়েরাও ইন্দ্রলোক হইতে নামিয়া আসে না। ব্রাহ্মণেরাও ব্রহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হন নাই। সমাজ-জীবনের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে, সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, সমাজ-অঙ্গী হইতে ফুটিয়া ও সমাজের অঙ্গবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে গড়িয়া উঠে। সকল বর্ণেরই মূল সামাজিক বৃত্তির বা কর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

কৃষিবাণিজ্যাদি যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম; শাসন-সংরক্ষণ যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম; যজন-যাজন, ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্ম-শিখান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এ সকলও একটা অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক বৃত্তি বা কর্ম্ম। সমাজের লোকের অন্ন ও আবাসাদির ব্যবস্থার জন্য যেমন বৈশ্যবৃত্তির আশ্রয়ে বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য যেমন ক্ষাত্রবৃত্তির আশ্রয়ে ক্ষাত্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ সমাজের ধর্ম্ম-সাধন ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ব্রহ্ম-বৃত্তির আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এসকল বর্ণ আকাশ হইতেও উড়িয়া আসে নাই, সমাজের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেও একেবারে পরিস্ফুট আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দুষ্টলোকে স্বার্থবশ হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়াও এগুলিকে গড়িয়া তুলে নাই। এই বর্ণত্রয় সমাজ-বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের আত্ম-প্রয়োজনে, সমাজ-জীবনের বিকাশ ও পূর্ণতা সাধনের জন্য, ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক কিছুই নাই।

অন্ন-বস্ত্রাদির উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, সমাজের শাসন ও সংরক্ষণ, এবং ধর্ম্মযজন ও ধর্ম্মযাজন,—এই তিনটি সমাজ-জীবনের প্রধান কর্ম্ম। সকল সমাজে, সকল দেশে, সকল কালেই এই তিনটি কর্ম্ম ছিল; আর সর্ব্বত্রই এই তিনটি মুখ্য সামাজিক বৃত্তির আশ্রয়ে তিনটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথমে এই-সকল সামাজিক বৃত্তির অনুকরণ করিয়া তিনটি বিশিষ্ট বর্ণ বা জাতির সৃষ্টি হয় নাই। আদিতে একই পরিবারের মধ্যে কেহবা কৃষিবাণিজ্য কর্ম্ম করিত, কেহ বা সমাজ-শাসন ও সমাজ-রক্ষা করিত, আর কেহ বা যজনযাজন করিত। ফলতঃ তখন দুইটি মাত্র বৃত্তিই, বোধ হয়, বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছিল, সমাজের সকলকেই ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। শান্তির সময় যেমন কেহবা কৃষি-গোরক্ষা প্রভৃতি করিত, কেহবা যজনযাজনাদি করিত, সেইরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে, সকলেই অস্ত্রধারণ করিয়া স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্র ও স্বজাতির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইত। যুদ্ধবিগ্রহাদি যখন একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, তখন সকলকেই ক্ষাত্রকর্ম্মশিক্ষা ও ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। তখন সমাজে প্রকৃতপক্ষে একই বর্ণ ছিল, সকলেই ক্ষত্রিয় ছিল; অথবা অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে, দুই বর্ণ মাত্র ছিল, কেহবা বৈশ্য, কেহবা ব্রাহ্মণ ছিল। যুদ্ধবিগ্রহাদি যত কমিয়া যাইতে লাগিল, শান্তি যত স্থায়ী হইতে আরম্ভ করিল, ততই একদল লোক ক্ষাত্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বিশেষভাবে কৃষিগোরক্ষা বাণিজ্যাদি কর্ম্মে, আর একদল যজন-যাজন ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তখনও বর্ণভেদ গড়িয়া উঠে নাই। এই অবস্থাতেও একই পরিবারের, এমন কি একই পিতামাতার দশজন সন্তানের মধ্যে কেহ বা বৈশ্যবৃত্তি, কেহবা ক্ষাত্রবৃত্তি, কেহবা ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করিতেন। ইহার বহু পরেও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয়ের, আর বৈশ্য ও শূদ্রের পুত্র ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহাতে কোনও প্রকারের নিষেধ ছিল না। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি বৃত্তি ছিল, কিন্তু বর্ণবিভাগ বা বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত

হয় নাই। মহাভারতে বর্ণভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু একবর্ণের লোকের পক্ষে অপর বর্ণের বৃত্তি অবলম্বন একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। ভারতযুদ্ধের কালে ব্রাহ্মণেরা অবাধে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; দ্রোণ ও কৃপ তার সাক্ষী। বৈশ্যেরা ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিতেন—রাধেয় তার সাক্ষী। শূদ্রেরা যজন-যাজন না করুন, অন্ততঃ নীতি ও ব্যবহারবিদ্ হইয়া রাজসভায় মন্ত্রীর আসন পাইতে পারিতেন,—বিদুর তাহার প্রমাণ। তবে বর্ত্তমান মহাভারতে আমরা যে সমাজ-চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে সমাজে একটা বর্ণবিভাগ যে কতকটা পাকিয়া উঠিয়াছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে এই বর্ণ-বিভাগ যে একদিন সমাজে এতটা কঠিন আকার ধারণ করে নাই, অথবা করিয়া থাকিলেও মহাভারত রচনার সময়ে তাহার সংস্কারসাধন যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার প্রমাণ এই মহাভারতেই আছে। চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ—গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া আমি ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ-সমন্বিত সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছি—গীতার এই বাক্যই তার প্রমাণ। জাতিভেদটা তখন গুণকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মগত বা বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল বা পড়িতেছিল। আর এইরূপ জন্মগত বা বংশগত জাতিভেদ লইয়া একটা বিরাট ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন অসাধ্য; ইহা দেখিয়াই, এই ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রধান আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় এই বর্ণচতুষ্টয়কে গুণকর্ম্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অজ্ঞাতজাতিকুল রাধেয়ের ক্ষত্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ইহার আর-এক প্রমাণ। বিদুরের জন্মকথা ইহার তৃতীয় প্রমাণ। পঞ্চ পাণ্ডবের জাতক-কাহিনীর অন্তরালে, কোন্ নিগূঢ় সমাজ-রহস্য লুকাইয়া আছে, তাহাই বা ভেদ করিবে কে? বেদব্যাসের জন্মবৃত্তান্তও কঠোর এবং অনুল্লঙ্ঘনীয় জাতিভেদ-প্রথার সমর্থন করে না। বর্ত্তমান মহাভারতখানি যখন সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয়, তখন বর্ণবিভাগটা অনেক পরিমাণে পাকিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তখনও পুরাতন স্মৃতি লুপ্ত হয় নাই। আর তারই জন্য যেখানেই এই জাতিভেদের বিরোধী প্রমাণ ছিল, সেখানেই একটা গোঁজামিল দিয়া ঐ পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে আধুনিক অবস্থার ও ব্যবস্থার একটা সঙ্গতি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

আদিতে গুণকর্ম্ম-অনুসারেই বর্ণবিভাগের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহা যেমন সত্য, এই গুণকর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত বর্ণবিভাগ যে ক্রমে, স্বাভাবিক উপায়েই, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের আত্মপ্রয়োজনেই আবার জন্মগত ও বংশগত হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপই সত্য। দুইলোকে চেষ্টা করিয়া, বর্ণবিভাগেরও সৃষ্টি করে নাই, আর বর্ণবিভাগ হইতে পরে বর্ত্তমান বর্ণভেদেরও প্রতিষ্ঠা করে নাই। বর্ণবিভাগ ও বর্ণভেদ দুই, সমাজ-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্য কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

প্রাচীন কালে আজিকার মতন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। প্রকাশ্য বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। শিক্ষার্থীগণ উপযুক্ত গুরুর নিকটে যাইয়া আপন আপন অভীষ্ট বিদ্যা শিক্ষা করিত। এরূপ অবস্থায় যে যে-বিদ্যা ভাল করিয়া জানিত, সহজেই সকলের আগে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন ও আগ্রহ সহকারে সেই বিদ্যা আপনার পুত্র ও অপরাপর পরিবারবর্গকেই শিখাইত। কার্য্যকরী বা বার্ত্তিক বিদ্যা কিম্বা technical এবং professional knowledge, এইরূপ ভাবে পুরুষানুক্রমেই রক্ষিত ও প্রচারিত হইল। পিতার বা পিতৃব্যের নিকট হইতে প্রত্যেক পরিবারের বালকেরা তাহাদের বংশের বিশেষ বিদ্যা-সকল শিক্ষা করিত। ধর্ম্মযাজন তখন একটা বিশেষ বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম তখন যজ্ঞাদি জটিল কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করিত। যজ্ঞের মন্ত্রাদি মুখে মুখে শিখিতে হইত। কোন্ ভাবে কোন্ যজ্ঞ করিতে হয়, তাহার ক্রম এবং কুশলতার উপরে যজ্ঞের সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে,—এই ক্রমের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বা এই নিপুণতার একটুও অভাব হইলে সমস্ত যজ্ঞকর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়—লোকের এই বিশ্বাস ছিল। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মযাজনকর্ম্ম শিখিতে ও শিখাইতে বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। বিশেষতঃ ক্রমে যখন এই-সকল যজ্ঞকর্ম্ম দ্বারা পুরোহিতেরা বিস্তর দক্ষিণা লাভ করিতে লাগিলেন, তখন নিজেদের ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে একটা মন্ত্র-গুপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। কেহ অপরকে সহজে আপনার বিদ্যা আর শিখাইতে চাহিত না। এই ভাবে যাহা আদিতে কেবল সামাজিক বৃত্তিগত ছিল, এই নূতন অবস্থাধীনে, নূতন ও জটিল শিক্ষার প্রয়োজনে, ক্রমে তাহা বংশগত হইয়া পড়িল। যেমন যজন-যাজনাদি ব্রহ্মকর্ম্ম, সেইরূপ শাসন ও সংরক্ষণাদি রাষ্ট্র-কর্ম্ম বা ক্ষাত্র-কর্ম্ম, এবং কৃষি-বাণিজ্যাদি বৈশ্যকর্ম্মও কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়িল। প্রাচীন সমাজের অবস্থাধীনে এইরূপ হওয়া কেবল অনিবার্য্য নহে, কিন্তু প্রয়োজনীয় হইয়াও উঠিয়াছিল। এইরূপে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণ জন্মগত হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কেহবা ঋগ্বেদী, কেহবা সামবেদী, কেহবা যজুর্ব্বেদী, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীনকালে মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতেই যে এরূপ বিভাগ গড়িয়া উঠে নাই, ইহা কে বলিবে? বিভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, ইহাও সত্য। কিন্তু প্রাচীনতম যুগে, সামাজিক সংমিশ্রণের অবসর ও প্রয়োজন উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে-সকল শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তাহা যে সম-ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা ও মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতে জন্মে নাই এমন কথা বলা যায় না। বৈশ্যদিগের মধ্যে যে এই কারণেই নানা শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং অধিকাংশ ব্যবসায়ই পুরুষক্রমানুগত হইয়া পড়ে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। শূদ্রেরাও এই কারণে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, কেহবা সৎশূদ্র, কেহবা অন্ত্যজ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি জাতির অঙ্গসেবা যাহারা করিত, তাহাদের "জল চল" হইয়া গেল; তাহারা সৎশূদ্র হইল। যাহাদের এ সুযোগ ও সুবিধা ছিল না বা ঘটিল না, তাহারা অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ রহিয়া গেল।

এই ভাবেই কালক্রমে আমাদের বর্ত্তমান জাতিভেদ বা বর্ণভেদের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমাজের আত্মপ্রয়োজনে অবস্থা-বিশেষে এই বর্ণভেদের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন সে পুরাতন অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু সে ব্যবস্থা বদলায় নাই। ইহাই ত দোষের কথা।

(নারায়ণ, কার্ত্তিক) শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

* * *

বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দলাদলি।

পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই দলাদলি হয়। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্ম্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে।

অতি তুচ্ছ যে কথা লইয়া দলাদলি হয়, পালিতে তাহাকে দশবথু বলে, সংস্কৃতে দশবস্তু। অর্থাৎ দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। যথা:—

(১) অনেক ভিক্ষু শিঙের পাত্রে একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন, সব সময়ে তো লুণ-দেওয়া ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুণ খাইতেন না। লুণ না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুণ মিশাইয়া খাইত। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবার সঞ্চয়? যাহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুণ সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কি? আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শয়ন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুণ থাকিলেই সর্ব্বনাশ হইয়া গেল? এই আপত্তির নাম সিঙ্গিলোণ কপ্পো।

(২) বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক দুই প্রহরের পর কোন ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যদি খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। সুতরাং অনেক ভিক্ষুর খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখন হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দু'প্রহরের পূর্ব্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি? সুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

(৩) ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোন কোন ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? প্রথমতঃ দু'বার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে বেচারা নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া গিয়া আবার সব জিনিষ খাইয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে ঘরে খাইয়া যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্যে বলিলেন, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে যাইতে বড় কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কি? এও একটা বিবাদের কারণ।

(৪) এক-এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শব্দের অর্থ পরগণা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গায় যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষথ করিবে। উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, বাঙ্গালায় যাহাকে উপোষ বলে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন এ নিয়ম বড় কড়া; যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে পোষধ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর সকলে বলিলেন, পৃথক পৃথক হইয়া পোষধ করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হয়, তাহাদের ধর্ম্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয়, এবং তাহাতে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে, লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক পৃথক উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য আবার ভিক্ষুদের দেখিবার দরকার হয়। সুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

(৫) বৌদ্ধদের সকল কর্ম্মই সঙ্ঘে নির্ব্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিহারের ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকিলে, কোন কোন বিহারের ভিক্ষুরা, অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কি করিয়া ভাব।" আর একদল বলিবেন, "তাহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কি করি, কাজ তো ফেলিয়া রাখা যায় না।"

(৬) গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কি? বৃদ্ধেরা বলিবেন তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথায় কি করিয়া গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্য্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।

(৭) দুপ্রহরের পর ভিক্ষুরা অন্নাহার করিবে না ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস বলিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না। দই মওয়া হইলে তবে তো ঘোল হয়। অনেক ভিক্ষু দইয়ে জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে 'আমওয়া' দই এটা ভিক্ষুকের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোন মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারী হয়। একটা 'মওয়া', একটা 'আমওয়া'। এতে আর এতই তফাৎ কি? বৃদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাৎ আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রসও নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়া যা 'আমওয়া' দই খাওয়াও তা। এ কার্য্যটি একেবারেই করা উচিত নয়। সুতরাং এটাও একটা বিবাদের কারণ।

(৮) মদ গাঁজিয়া উঠিবার পূর্ব্বে জল বলিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্ব্বে ঝাঁঝওয়ালা রস খাওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, "ওতো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। সুতরাং মদ হওয়ার পূর্ব্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।" অপরে বলিলেন, "আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কি করিব।"

(৯) যে আসনের ছিলে না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে সুন্দর আসন হয় তাহাতে বসা ভিক্ষুদের নিষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চা'ন এইরূপ সুন্দর আসনে বসিতে। বৃদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে 'উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না', সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিল কাটিলাম আর না কাটিলাম তাহাতে কি আসিয়া গেল? আমর উচ্চাসনেও বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমর ভগবানের আজ্ঞা কি করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।

(১০) সোনারূপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদে নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোনারূপ লইতেন। তাঁহারা উপোষ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিতে এবং উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্ষাপণ কাহাপন ব কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোনারূপ ছুঁইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খর করিতেন। কার্ষাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়

বুঝাইত। বৃদ্ধেরা বলিলেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। অন্য ভিক্ষুরা বলিলেন, আমরা তো ছুঁইলাম না, কি করিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক এক শ বৎসর অতীত হইয়া গেলে, বৈশালীর ভিক্ষুরা, বিশেষতঃ যাহারা বজ্জী বংশে জন্মিয়াছিল তাহারা, এই দশ বস্তু চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় যশ নামে একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রথমেই মহাবনবিহারে উপোষধ-শালায় দেখিলেন একটা ধাতুপাত্রে জল রহিয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহ'-পন দিতেছে। তিনি বলিলেন, এটা বড় দোষের কথা। তিনি উপাসকদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর ভিক্ষুরা খুব চটিয়া গেল। তাহারা নানারূপে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তিনি পলাইয়া কৌশাম্বী গেলেন। এবং সেখান হ'তে পাবা অবন্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে অহোগঙ্গ পর্ব্বতে গমন করিলেন। সম্ভূত শোন-বাসী অহোগঙ্গ পর্ব্বতে বাস করিতেন। যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। ক্রমে পাবা হইতে ৬০ জন ও অবন্তী হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে রেবত সকলের চেয়ে প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান। তাঁহাকে এ কথা জানান যাক। তিনি তক্ষশীলার নিকট বাস করিতেন। সহজাতি নামক স্থানে রেবতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রেবত শুনিয়া বলিলেন, এ দশটাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত। বৈশালীর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন। রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন না এবং শিষ্যটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা পাটলীপুত্রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

সহজাতিতে ১১৯০ হাজার ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এ বিবাদের নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। অতএব তোমরা বৈশালী চল। সেখানে রেবত দেখিলেন যে লোকে বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন উদ্বাহিকা করিয়া ইহার নিষ্পত্তি কর। অর্থাৎ আটজন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাতে নিষ্পত্তির ভার দাও। ৮ জন বড় বড় ভিক্ষু বাছিয়া লওয়া হইল। ইহাঁদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর। ইহাঁরা সকলেই তথাগতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ক্রমেই সে মত প্রচার হইল। যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল স্থবিরবাদী অথবা থেরাবাদী। যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাঙ্ঘিক। এইরূপে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে দশটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়া হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দুই দল হইয়া গেল।

(নারায়ণ, কার্ত্তিক)　　　　শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

———

সৌজন্যের শক্তি

শিষ্টাচার করতে মানুষের কোনোই কষ্ট নেই, ইচ্ছা করলে সকলেই শিষ্ট হ'তে পারে। মুখের দুটো মিষ্ট কথায় শক্তি বা কিছুই অর্থ ব্যয় হয় না, অথচ এর সাহায্যে মানুষকে যথেষ্ট খুসী করা যায়। স্বার্থের দিক দিয়ে দেখলেও এর প্রয়োজন কম বলে' মনে হয় না। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে' লোকের কাছ থেকে প্রচুর কাজ আদায় করা যায়, রূঢ় কথা বলে' বা হাঁক-ডাক করে' যে যায় না এমন কথা নেই,—কিন্তু তাতে করে' যে-কাজ আদায় হয় তা অনিচ্ছাকৃত কাজ—তা আনন্দের কাজ নয়। আর যে কাজের উৎপত্তি আনন্দে নয় তা কখনো সুসম্পন্ন হতে পারে না।

পাশ্চাত্য সমাজে শিষ্টাচারের কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে। লোকের সঙ্গে মেলামেশার সময় সেগুলি মেনে চলতে হয়। ইংরেজিতে তাকে বলে এটিকেট্। কোনো এক সময়ে ব্যাগের মধ্যে কি কি জিনিষ আছে তার একটা তালিকা একখানি টিকিটে লিখে ব্যাগের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হোত। এই টিকিট ঝোলানো থাকলে ব্যাগটা আর খুলে দেখা হোত না। ক্রমে কথাটা বোঝাতে লাগলো সেই টিকিট, যার ওপর নিমন্ত্রিতদের জন্যে কতকগুলি নিয়ম লেখা থাকে। এই থেকেই ভব্যতার নিয়মগুলির নাম হল 'এ টিকেট' বা 'এটিকেট্'!

*　*　*

একবার ঝোড়ো হাওয়া মলয়-বাতাসকে জিজ্ঞাসা করলে—আমার মত শক্তি পেতে তোমার ইচ্ছা হয় না? দেখ আমি যখন চলতে আরম্ভ করি তখন বরাবর সমুদ্রের তীরে তীরে আমার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করে' মানুষ নিশান তুলে দ্যায়। তোমরা যেমন করে' একগাছা সরু বেত নুইয়ে ফ্যালো আমি তেমনি অতি সহজেই জাহাজের বড় বড় মাস্তল মুচড়ে দিই। পাখার এক ঝাপটে সমুদ্রের তীরভূমির ওপর আমি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে দিই। আমি অতলান্তিক মহাসাগরকে কাঁপিয়ে ফুলিয়ে উঁচু করে' ধরি। আমি রোগী ও দুর্ব্বলের ত্রাস, তাদের হাড় পর্য্যন্ত আমি কাঁপিয়ে তুলি, আমার হিমশীতল হাত থেকে রক্ষা

পাবার জন্যে মানুষ জঙ্গল কেটে আগুন তৈরি করে—খনির নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে' কয়লা সংগ্রহ করে' চুল্লী জ্বালায়। আমার নিশ্বাসে জমে' গিয়ে কত লোক অকালে কবরের আশ্রয় গ্রহণ করে। আমার মত শক্তিমান্ হতে চাও না?

মলয়-বাতাস উত্তর দিল না, অতি ধীরে সে আকাশের তল থেকে ভেসে এল। অমনি নদী হ্রদ সমুদ্র, বন উপবন শস্যক্ষেত্র, পশু পাখী মানুষ সবাই হেসে উঠলো। বাগানে বাগানে ফুল ফুটলো, ফলের গাছে রসাল ফল আর ধরে না, শস্যে সোনার রং ধরল, আকাশের অসীম বিস্তারের উপর দিয়ে তুলার মত মেঘের দল ভেসে এল। পাখীর বিচিত্রবর্ণ পাখা আর নৌকোর শুভ্র পাল রৌদ্রকিরণে ঝিকমিক করে' উঠলো—যেদিকে চোখ পড়ে সেখানেই স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্য। সবুজ পাতায়, ফুলে ফলে, শস্যপূর্ণ মাঠে, সৌন্দর্য্য-আনন্দ-ও-প্রাণসম্ভারে-পূর্ণ থালায় গর্ব্বিত নির্ম্মম ঝোড়ো হাওয়ার প্রশ্নের উত্তর মলয় বাতাস এমনি করে পাঠিয়ে দিলে।

শুনতে পাই একবার রাণী ভিকটোরিয়া স্বামীর সঙ্গে প্রভুত্বের স্বরে কথা কওয়ায় তিনি মনে আঘাত পেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে' বসেছিলেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে দরজায় ঘা পড়লো।

ভিকটোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট জিজ্ঞাসা করলেন—"কে?"

গর্ব্বিতভাবে রাণী বল্লেন—"আমি ইংলণ্ডের রাণী! দরজা খোল!"

ঘরের মাঝ থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ পরে দরজায় মৃদু করাঘাত হল, তারপর শোনা গেল নরম গলায়—"আমি, ভিকটোরিয়া তোমার স্ত্রী।" দরজা তারপর আর বন্ধ রইল না, ঝগড়াও মিটে গেল।

রমণীর যেমন সৌন্দর্য্য, মানুষের তেমনি ভব্যতা। ভব্যতার কাছে মুহূর্ত্তে মানুষ হার মানে।

বহুকালের পুরানো এক কিম্বদন্তীতে প্রকাশ বেসল্ নামে জনৈক সন্ন্যাসী পোপের আদেশে ধর্ম্মমন্দির থেকে বিতাড়িত হন। এমন অবস্থায় তিনি মারা গেলেন। তাঁর তো স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটতে পারে না, তাই একজন দেবদূত এসে তাঁকে অধোলোকে নিয়ে চল্লেন। কিন্তু বেসলের ব্যবহার অতি অমায়িক, আলাপ করবার শক্তিও অসাধারণ তাই যেখানেই যান সেখানেই সকলে তাঁকে বন্ধু বলে আদর করে। স্বর্গচ্যুত দেবদূতেরা সকলেই তাঁর ধরণ ধারণ গ্রহণ করলে, এমন কি আসল দেবদূতেরাও দূরদেশ থেকে এসে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লাগলো। ব্যাপার যখন এমন হয়ে দাঁড়াল তখন তাঁকে পাতালের গভীরতম দেশে নিয়ে যাওয়া হল—কিন্তু ফল সেই একই তাঁর মজ্জাগত ভব্যতা এবং তাঁর কোমল হৃদয়কে প্রত্যাখ্যান করবে কে?—তিনি নরককেও স্বর্গ করে তুল্লেন অবশেষে দেবদূত সন্ন্যাসীকে নিয়ে ফিরে এসে বল্লেন, তাঁকে শাস্তি দেবার মত জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না। অগত্যা তাঁর শাস্তি রদ করা হল এবং স্বর্গে তিনি এক মহাসাধুর পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

লর্ড পিটারবরো বলেছিলেন—"বিশপ ফেনেলো চমৎকার লোক। তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে আসতে হল পাছে তিনি আমায় খৃষ্টান করে' ফেলেন!"

ডিউক মার্ল্‌বরো ইংরেজি লিখতেন খারাপ, বানান করতেন ততোধিক খারাপ; তবুও তিনি বড় বড় সাম্রাজ্যের হাল ধরেছিলেন। তাঁর মধুর ব্যবহারের প্রভাব সারা য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর স্নিগ্ধ হাসি আর মনোহর বাণী শত্রুর দারুণ ঘৃণাকে ধূলিসাৎ করে' শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করতো।

এক ভদ্রলোক তাঁর ষোড়শী কন্যাকে তাঁর নিজের দারুণ শত্রু অ্যারনবারের বিচার দেখতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোকটি অ্যারনকে পাকা কৃতঘ্ন বলেই ভাবতেন। মেয়েটি কিন্তু বারের মধুর ব্যবহারে এমন মুগ্ধ হয়ে গেল যে সে পিতৃশত্রুর বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে আসন গ্রহণ করলে। ক্রুদ্ধ পিতা কন্যাকে বিচারালয় থেকে নিয়ে গিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখলেন, কিন্তু বারের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কন্যার বিশ্বাস কিছুতেই টললো না। পঞ্চাশ বৎসর পরে মেয়েটি বলেছিলেন—"আজ পর্য্যন্ত আমি তাঁর ব্যবহারের আশ্চর্য মায়া কাটাতে পারিনি!"

শ্রীমতী রেকামিয়ার এমন চমৎকার লোক ছিলেন যে পারীর সেণ্ট রক গির্জ্জার খয়রাতের বাক্স নিয়ে একবার মাত্র ঘুরে তিনি উপস্থিত জনসাধারণের নিকট থেকে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আদায় করেন। নেপোলিয়ন ইটালি থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করলে তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে বিরাট আয়োজন হয়। সেই সময় এই মোহিনী রমণীর দর্শন লাভ করে' বিপুল জনতা মহাবীর নেপোলিয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করতে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল।

কোপ্পের আভিজাত-সম্প্রদায় দুখানা গাড়ীতে ভ্রমণ করে' ফিরে এলেন। প্রথম গাড়ীতে যাঁরা এলেন তাঁরা তাঁদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। পথে ঝড় জল বজ্রপাত, রাস্তার ভয়ানক অবস্থা, গাড়ীর হেঁচ-কানি ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয় গাড়ীর লোকেরা তো তা শুনে অবাক। তাঁরা তো এ-সব-কিছুই জানেন না। কেমন করেই বা জানবেন? গাড়ীতে তাঁরা যখন আসছিলেন তখন মাদাম দ্য স্তেল, শ্রীমতী রেকামিয়ার, বেঞ্জামিন কনষ্টাণ্ট ও স্লেগেলের মধ্যে আলাপ চলছিল। সে কী গল্প! সকলের মন তখন সে রঙিন গল্পের পুষ্পকরথে কল্পলোকে উধাও হয়ে চলে গিয়েছিল। তাঁদের মধুর আলাপ মদের নেশার মত গাড়ীর সকলকে অভিভূত করে' ফেলেছিল।

শ্রীমতী টেস্সে বলতেন—"আমি যদি রাণী হতুম তাহ'লে প্রতিদিন মাদাম দ্য স্তেলকে আমার সঙ্গে কথা কইতে হুকুম করতুম।"

লংফেলো এভাঞ্জেলাইনের সম্বন্ধে যে-কথা বলেছিলেন স্তেল সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে—"তিনি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তখন মনে হল যেন কি এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত থেমে গেল!"

পুরুষের মনে নারীসম্মানবোধ জাগাতে হলে নারীর যথার্থ মার্জ্জিত ও নম্র হওয়া প্রয়োজন। মানুষকে খুসী করতে হলে নিজেও খুসী হওয়া দরকার। বিনয়ী বা ভদ্র হওয়া মানে নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকা।

• • •

ডিকেন্সের সুপরিচিত এক ব্যক্তি বলতেন—"ডিকেন্স যখন ঘরে ঢুকতেন মনে হত যেন সহসা ঘরের মধ্যে একটা মস্ত আগুন জ্বালা হয়েছে—সবাই তার তাপে আরাম বোধ করতো।"

গ্যয়টে রেস্তরাঁয় আহার করতে গেলে লোকেরা ছুরি কাঁটা ফেলে তাঁকে তারিফ করতে থাকতো! ম্যাসিডনের ফিলিপ ডেমস্থেনিসের বিখ্যাত বক্তৃতার বিবরণ শুনে বলে-ছিলেন—"আমি সেখানে থাকলে তিনি আমাকেই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে বাধ্য করতেন।"

ওয়েণ্ডেল্ ফিলিপ্সের সুমধুর স্বর-প্রবাহের মোহ শ্রোতারা কিছুতেই কাটাতে পারতো না। তাঁকে এবং তাঁর উদ্দেশ্যকে মনে মনে ঘৃণা করলেও তারা মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর বক্তৃতা শুনতো। তাঁর বলবার ধরণে কেমন একটা সম্মোহনী শক্তি ছিল যা শ্রোতাদের মনোযোগ অসামান্য বলে আকর্ষণ করতো।

আমেরিকার সেনেট বা পার্লামেণ্টে ষ্টিফেন ডগ্লাশ গালাগালি খেয়ে উঠে বলেছিলেন—"যে-কথা কোনো ভদ্র-লোকের বলা উচিত নয় সে-কথার জবাব কোনো ভদ্র-লোকের দেবার দরকার নেই।"

•

নিউইয়র্কের এক মহিলা ফিলাডেল্ফিয়াগামী ট্রেনে একটি কামরায় সবেমাত্র উঠে বসেছেন—তাঁর সামনে একজন মোটা-সোটা ভদ্রলোক বসে ছিলেন, তিনি চুরোট ধরালেন! মহিলাটি কাশলেন, তারপর উসখুস করতে লাগলেন, কিন্তু এ-সবেতে কোনো ফল হল না। তখন তিনি তীব্রভাবে বলে' উঠলেন—"আপনি বোধ হয় বিদেশী তাই জানেন না যে এই ট্রেনে একটা স্বতন্ত্র ধূমপানকক্ষ আছে; এ কামরায় ধূমপান নিষেধ।" লোকটি কোনো কথা না বলে' জানালা গলিয়ে চুরোটটি ফেলে দিলেন। ক্ষণকাল পরে ট্রেনের গার্ডের কাছে মহিলাটি যখন শুনলেন যে তিনি ভুল করে' জেনারেল গ্রাণ্টের খাস কামরায় উঠেছেন তখন লজ্জায় ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তাড়াতাড়ি কামরা ত্যাগ করে' গেলেন। কিন্তু যে-চমৎকার ভব্যতার বলে জেনারেল তাঁর চুরোট ফেলে দিয়েছিলেন সেই ভব্যতার বলে, পাছে মহিলাটি লজ্জিত হন বলে', তিনি তাঁর দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না। তাঁর

মুখ প্রশান্ত স্থির রইল, ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির রেখাও ফুটলো না।

জুলিয়ান রাল্‌ফ্‌ প্রেসিডেণ্ট আর্থারের মাছধরার বিবরণ টেলিগ্রাফ করে' রাত দুটোর সময় হোটেলে ফিরে দেখলেন সব দরজা বন্ধ। চাকরদের জাগাবার জন্যে তিনি ও তাঁর দুই বন্ধু মিলে একটা পাশের দরজায় ঘা দিতে লাগলেন। অল্পক্ষণ পরেই দ্বার খুলে দিলেন স্বয়ং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আর্থার!

রাল্‌ফ্‌ বড়ই কুণ্ঠিত হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। প্রেসিডেণ্ট বল্লেন—"তাতে কি হয়েছে। আমি না এলে আপনাদের যে সকাল পর্য্যন্ত রাস্তাতেই কাটাতে হোত। আমি ছাড়া কেউ জেগে নেই। আমার কাফ্রি ছোকরাটিকে পাঠাতে পারতুম, কিন্তু সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছে, তাকে জাগাতে ইচ্ছে হল না।"

প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ বা ইংলণ্ডের জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের ভদ্রতার খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। তিনি য়ুরোপের সেরা ভদ্রলোক বলে' পরিচিত ছিলেন। একবার তিনি এক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে আহারে নিমন্ত্রণ করেন। আহারের পর চা দেওয়া হলে সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি চা'র রেকাবিতে চা ঢেলে খেতে লাগলেন, তা দেখে তো সকলে অবাক! কী অদ্ভুত গ্রাম্যতা! চারিদিকে একটা চাপা হাসি চলতে লাগলো। সহসা রাজকুমার চোখ তুল্লেন—মুহূর্ত্তে এই বিদ্রূপের হাসির মর্ম্ম বুঝতে পেরে গম্ভীরভাবে তিনিও চা'র রেকাবিতে চা ঢেলে তাঁর অভ্যাগতের মতই পান করতে লাগলেন। এই নীরব ভর্ৎসনায় লজ্জিত হয়ে তখন রাজপরিবারের অন্যান্য সকলেই রাজকুমারের অনুরূপ করতে লাগলেন।

কার্লাইল ছিলেন স্কট্‌ল্যাণ্ডের কৃষক। রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে ডাকিয়ে অভিজাতের উপাধি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কার্লাইল তা প্রত্যাখ্যান করেন—তাঁর নিজের আভিজাত্যই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। রাজসভার কায়দাকানুনে তিনি এমনি অনভিজ্ঞ ছিলেন যে রাণী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় কয়েক মিনিট কথাবার্ত্তার পরই তিনি বল্লেন—"বসা যাক আসুন।" এ-কথা শুনে পারিষদেরা মূর্চ্ছা যান আর কি! কিন্তু রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যের সহিত তৎক্ষণাৎ উপবেশন করে' এক ইঙ্গিতে তাঁর সমস্ত পুতুলগুলিকে বসিয়ে দিলেন।

কেহ কেহ এমন এক রাজদণ্ড ধারণ করেন যার সামনে অন্যে সানন্দে মাথা নত করে। তাঁদের এ মায়া-প্রভাবের উৎপত্তি কোথায়? এই অপ্রতিহত শক্তির রহস্য কি?

উচ্চশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সব সময়ে যে ভব্যতার দেখা পাওয়া যায় এমন নয়। কোনো কোনো রাজদরবারেও অশিষ্ট ব্যবহারের নিদর্শন বর্ত্তমান। প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স্‌ ও তাঁর পত্নী একবার একটি ভোজ দ্যান—অবশ্য সে-ভোজে সমাজের সেরা লোকদেরই নিমন্ত্রণ হয়েছিল। রাজকুমারীর সেই সবেমাত্র বিবাহ হয়েছে; তাঁকে দেখবার জন্যে এমনি ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যে বৈঠকখানা ঘরের এক মঞ্চ থেকে রাজকুমারীর প্রস্তরমূর্ত্তি মেজেয় পড়ে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেল। কিন্তু সমবেত রমণীমণ্ডলীর এমনি অভব্য আগ্রহ যে তাঁরা সেই ভাঙা মূর্ত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে উঠলেন!

রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন যখন রাজ্যের আমীর ওমরাহদের নিমন্ত্রণ করতেন তখন কার্ডের ওপর ভব্যতার এই নিয়মগুলি ছাপাতেন—"আহার শেষ হবার পূর্ব্বেই ভদ্রলোকেরা মাতাল হয়ে পড়বেন না। সভার মাঝে আমীর-ওমরাহেরা স্ত্রীকে ধরে' প্রহার করবেন না। রাজসভার মহিলারা খাবার জলের গ্লাসে মুখ ধোবেন না বা আহারের কাঁটা দিয়ে দাঁত খুঁটবেন না।" তখন অবস্থা এমনিই ছিল, আর আজ রুশ আভিজাত-সম্প্রদায় শিষ্ট ব্যবহারে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন।

মানুষের দেহের অসঙ্গতি বা অপূর্ণতা পূর্ণ করে তার শিষ্ট ব্যবহার। মানুষকে যারা আনন্দ দ্যায় বা মুগ্ধ করে তারা দেহের সৌন্দর্য্যে নয়, মনমোহন ব্যবহারের দ্বারাই এরূপ করে।

রূপকে গ্রীকেরা দেবতার করুণার নিদর্শন বলেই মনে করতো। এবং সেই রূপই তারা পূজার যোগ্য মনে করতো যা গর্ব্বিত বা অকরুণ ভাবের প্রকাশে ক্ষুণ্ণ হয়নি

তাদের আদর্শ অনুসারে রূপ হবে আনন্দ সন্তোষ প্রীতি ভালোবাসা সহৃদয়তা প্রভৃতি অন্তরগত ভাবের বিকাশ।

মিরাবো ছিলেন ফ্রান্সের একজন অতি নিরীহ সাদা-সিধা গোছের লোক। শোনা যায় তাঁর মুখ ছিল বাঘের মুখে বসন্তের দাগ থাকলে যেমন হয় তেমনি; কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল অতুল্য।

মাদাম দ্য স্তেল মোটেই রূপসী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল যার সামনে রূপ সঙ্কোচে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। পুরুষের মনের ওপর তাঁর আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল। তারা ছিল তাঁর ইচ্ছার দাস এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমতীর মত লোকের জীবনের কাজ গড়ে' তুলতেন। ফ্রান্সের লোকের ওপর তাঁর যে প্রভাব ছিল তাকে নেপোলিয়নও এত ভয় করতেন যে তিনি তাঁর লেখা ধ্বংস করে' ফ্রান্স থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেন।

আর্টে যেমন, জীবন ও চরিত্রের রূপবিকাশেও তেমনি কোনো কোণ উগ্র হয়ে বেরিয়ে নেই। মনে হয় রেখাগুলি সব অভঙ্গ, সব বাঁকগুলি এমনি সহজে এমনি স্নিগ্ধভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশেছে। অনেক সুন্দর প্রাণকে এই উগ্র কোণগুলিই পূর্ণ সৌন্দর্য্যলাভে বঞ্চিত করে। স্থানকাল-ভেদে বা রূঢ় অসংযমতার সহিত প্রকাশিত হলে ভালোও পূরো ভালো হতে পায় না। অনেক নরনারীই একটুখানি সহৃদয় ভব্যতা বা একটু মধুর ব্যবহারের দ্বারা তাঁদের প্রভাব ও সার্থকতা শতগুণ বাড়াতে পারেন।

মৃগনাভি যেমন দীর্ঘকাল ধরে' চারিদিক সুগন্ধে আমোদিত করলেও তার আসল মূল্য কমে না, আমরাও তেমনি আমাদের ব্যবহারের তারতম্য-অনুসারে আমাদের আশপাশের লোকের ওপর ভালো বা মন্দ প্রভাব বিস্তার করি, কিন্তু নিজেরা যা তা-ই থেকে যাই।

ইতর জীবও আমাদের মার্জ্জিত বা রূঢ় ব্যবহার বুঝতে পারে। একটা কুকুরকে এক টুকরো মাংস ছুড়ে দাও, সে সেটা মুখে নিয়ে দৌড়ে পালাবে। কিন্তু সেই কুকুরটাকেই কাছে ডেকে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তোমার হাত থেকে সেই মাংসের টুকরো নিতে দাও, দেখবে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় সে তার ল্যাজ নাড়ছে। তোমার দেবার আন্তরিকতা কুকুরের হৃদয় স্পর্শ করেছে। দান যারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুড়ে দ্যায় গ্রহীতার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করা তাদের পক্ষে অন্যায়।

ভব্যতা পরম সম্পদ। ভব্য লোকেদের প্রচুর অর্থ না হলেও চলে, কারণ তাদের কাছে সকল স্থানেই দ্বার অবারিত।

সকলেই তাদের আদর করে, সকলেই তাদের চায়। কারণ তারা সূর্য্যালোকের মত; তারাই সর্ব্বত্র আনন্দ ও আলো বিতরণ করে। ঈর্ষা ও মন্দ অভিপ্রায়কে তারা পরাজিত করে, কারণ তারা মনে ও-রকম ভাব পোষণ করে না। মধুমাখা মানুষকে মৌমাছি কামড়ায় না এ-কথা কে না জানে?

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জন্‌সন্‌ আহার করতেন অসভ্য এসকিমোর মত এবং যে-সব লোকের মতের সঙ্গে তিনি একমত হতে পারতেন না তাদের তিনি বলতেন "মিথ্যাবাদী!" জন্‌সন্‌ "বুড়ো ভালুক" নামে পরিচিত ছিলেন। লণ্ডনের এক ভোজে গোল্‌ড্‌স্মিথ্‌ আমেরিকার "লাল মানুষ"দের সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করেন। তা শুনে জন্‌সন্‌ বলে' উঠলেন—"আমেরিকার 'লাল মানুষ'দের মধ্যে এমন মূর্খ কেউ নেই যে এমন প্রশ্ন করতে পারে।" গোল্‌ড্‌স্মিথ উত্তর দিয়েছিলেন—"মশায় আমেরিকার কোনো বর্ব্বরও ভদ্রলোককে এমন কথা বলার মত অসভ্যতা করবে না।"

"জীবন ক্ষণস্থায়ী হলেও তার মধ্যে ভব্যতা প্রকাশের যথেষ্ট অবসর আছে"—মার্কিন ঋষি এমার্সন এ-কথা বলে-ছিলেন। কথাটি যথার্থ। লোকে চাকরবাকর ও পরিবারস্থ লোকদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করে তা থেকেই তার ভব্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। রথচাইল্ড, লরেন্স্‌, ব্রুক্‌স্‌ প্রভৃতি অনেক ক্রোড়পতি তাঁদের চাকর-বাকরের সঙ্গে খরিদ্দারদের তুল্য মধুর ব্যবহার করতেন।

দু'হাজার বছর আগে আরিস্টট্‌ল্‌ ভদ্রলোকের যে বর্ণনা দিয়েছেন আজও ভদ্রলোক বলতে তা-ই বোঝায়। তিনি বলেছেন—"ভালো মন্দ সকল অবস্থাতেই তিনি সংযমের সঙ্গে চলবেন। নিজেকে খুব উঁচু বলে' ভাববেন না, হীন তুচ্ছ বলেও নয়। সার্থকতার আনন্দে তিনি আত্মহারা হবেন না, বিফলতার শোকে মুহ্যমান হবেন না।

নিজের কথা বা পরের কথা তিনি বলে' বেড়াবেন না। নিজেকে প্রশংসা করা হোক বা পরকে দোষ দেওয়া হোক কোনটারই পক্ষপাতী তিনি হবেন না।"

সর্ব্বহারা দরিদ্রও ভদ্রলোক, যদি তার আশা আনন্দ আত্মসম্মান ও সাহস থাকে। সে-ই প্রকৃত ধনী। দুর্ভাগিনী মেরি কুইন অফ স্কট্‌স্ যখন ফাঁশির মঞ্চে উঠছিলেন তখন কারাধ্যক্ষ তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে নিজের হাতখানি এগিয়ে দিলেন। মেরি হাতখানি গ্রহণ করে' বল্লেন—"ধন্যবাদ মশায়—এই শেষ, আর আপনাকে কষ্ট দেব না!" আমাদের ব্যবহার যেমন, আমরাও তার ফলে তেমনি, হয় বিরক্তি নয় সান্ত্বনা পাই; হয় উন্নত নয় নীচ হই; হয় বর্ব্বর নয় মার্জ্জিত ও ভদ্র হই। পরের ওপর যে-ব্যবহার করি তা নিজেদের ওপরও অদম্য প্রভাব বিস্তার করে; সে-প্রভাব বাতাসের মতই নিত্যপ্রবাহিত এবং সদাজাগ্রত।

ঘাস আগাছা কাঁটাগাছ—এ-সব জন্মাবার জন্যে কোনো আয়োজন কোনো যত্ন করতে হয় না। তারা আপনা-আপনিই বেড়ে ওঠে। কিন্তু কাঁচের ঘরের মধ্যে ঐ যে রক্তমণির মত গোলাপ, যার চারিদিকে থাকে থাকে সবুজ পাতাগুলি চোখ-জুড়ানো অপূর্ব্ব সুষমায় সুবিন্যস্ত; যার সুগন্ধের হিল্লোলে বাতাস চঞ্চল—ওটি সহসা জন্মায়নি, ওর পিছনে বহু সুমার্জ্জিত সুসংস্কৃত গোলাপ রয়েছে; ও-গোলাপের ক্ষণস্থায়ী রম্য জীবনের জন্যে মানুষকে অনেক আয়োজন অনেক যত্ন করতে হয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট জেফারসন একদিন তাঁর নাতির সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে' বেরিয়েছেন। পথে এক ক্রীতদাসের সঙ্গে দেখা—সে তার টুপি তুলে অভিবাদন করলে। প্রেসিডেণ্ট টুপি তুলে প্রতিনমস্কার করলেন, কিন্তু নাতিটি কাফ্রির নমস্কার ফেরালে না। প্রেসিডেণ্ট বল্লেন—"টমাস, তুমি ক্রীতদাসকে তোমার চেয়ে বেশী ভদ্র হতে দিলে?"

কাফ্রি ফ্রেড্ ডগ্‌লাস বলেছিলেন—"আমেরিকার যুক্তরাজ্যে লিংকন হলেন প্রথম বড় লোক যাঁর সঙ্গে আমি মন খুলে কথা কয়েছি। তাঁর ও আমার মধ্যে যে রংএর অশেষ প্রভেদ তিনি তা একবারও আমার মনে পড়তে দ্যাননি।"

"রাজার সঙ্গে যেমন করে' খাবে নিজের বাড়ীতেও তেমনি করে' খাও"—চীনা ঋষি কনফুসিয়াসের এ একটি খাঁটি উক্তি। পিতামাতা বাড়ীতে ছেলেপুলের ব্যবহারের ওপর নজর রাখলে বাহিরেও তাদের ব্যবহার সুন্দর শোভন থাকে।

তাড়াতাড়ি লণ্ডনের একটা রাস্তার বাঁক ঘুরতে গিয়ে এক যুবতী মহিলা সজোরে এক ধূলিমলিন ভিক্ষুক ছোকরার গায়ের ওপর পড়লেন। ছেলেটি প্রায় পড়ে গিয়েছিল আর কি। তাড়াতাড়ি থেমে মুখ ফিরিয়ে মহিলাটি মধুর স্বরে বল্লেন—"আমায় মাপ কর ভাই; আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।" বিস্মিত ছোকরাটি তাঁর পানে ক্ষণেক চেয়ে টুপিটা তুলে মাথা নত করে' অভিবাদন করে' বল্লে—সারা মুখ তার আনন্দের হাসিতে তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—"আমি আপনাকে খুসি হয়ে মাপ করছি, খুব খুসি হয়ে! এর পরের বার যখন আপনি আমার ঘাড়ে এসে পড়বেন, তখন আমাকে একদম উল্টে ফেলে দিলেও কথাটি কইব না।" মহিলাটি এগিয়ে গেলে সঙ্গীর দিকে ফিরে সে বল্লে—"দ্যাখ জিম্, আজ এই প্রথম আমার কাছে একজন ক্ষমা চাইলে—মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছে!"

ওয়াশিংটন থেকে জনৈক রাজনীতিজ্ঞ ড্যানিয়েল ওয়েবস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ীতে পৌছোবার চেষ্টায় ঐ ব্যক্তি একটা নূতন পথ দিয়ে এগিয়ে দেখলেন একটা ছোট ঝরণা বয়ে চলেছে। ঝরণা পার হবেন কেমন করে' ভাবছেন এমন সময় নিকটেই এক অপ্রিয়দর্শন কৃষককে দেখতে পেয়ে বল্লেন—"আমায় ওপারে পৌছে দাও, বকশিস পাবে।" কৃষক তার সুবিস্তৃত কাঁধের ওপর তাঁকে বসিয়ে পরপারে উত্তীর্ণ করে' দিলে, কিন্তু বকশিস কিছুতেই নিলে না। কয়েক মিনিট পরে, আগন্তুক যখন ওয়েবস্টারের বাড়ীতে বসে আছেন, তখন সেই বৃদ্ধ কৃষক উপস্থিত হয়ে বল্লেন তিনিই ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার!

দাসপ্রথার উচ্ছেদকল্পে যিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই গ্যারিসনকে যখন উন্মত্ত ক্রোধান্ধ জনসাধারণ পথের মাঝ দিয়ে হিড় হিড় করে' টেনে নিয়ে গিয়েছিল, যখন তারা তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ ছিঁড়ে দিয়েছিল, তখনো তাদের

প্রতি যে-বিনয় গ্যারিসন দেখিয়েছিলেন তা কোনো রাজা-রাজড়াকেও দেখাতে পারতেন। অদ্ভুত ছিল তাঁর চিত্তের শান্তি! ভদ্রতায় তিনি যীশুখৃষ্টেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, যিনি দারুণ মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতর হয়েও বলেছিলেন—"পিতা, এদের ক্ষমা কর, এরা জানে না কি করচে!"

পোষাকপরিচ্ছদের পারিপাট্য ভালো জিনিষ সন্দেহ নেই—তা তার যে যতই নিন্দা করুক। তবে এর চেয়েও বড় সৌন্দর্য্য আছে; তা হচ্ছে মনের সৌন্দর্য্য বা হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, সেটি স্বাভাবিক ও সহজ সৌজন্য।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের কথা

আমাদের সমাজের অনেক বিধিই প্রাচীনকালে সদুদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত হইলেও কালক্রমে সমাজের পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। লৌকিকতা এরূপ একটি সমাজবিধি। আমাদের দেশে জনসাধারণের আয় এত অল্প যে দুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া খাওয়া কুলায় না, তার উপর আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে আজ বিবাহে কাল শ্রাদ্ধে অপর একদিন উপনয়নে বা অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রিত হইয়া লৌকিকতা দিতে দিতে কষ্টের একশেষ হয়, অথচ না দিলেও মান থাকে না, এই জন্যই অনেকে লৌকিকতা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিতেছেন। এসম্বন্ধে "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" লিখিয়াছেন—

প্রাচীন আর্য্যগণ সমাজকে পীড়িত করিবার উদ্দেশ্যে লৌকিকতার সৃষ্টি করেন নাই। আমাদের বিশ্বাস—সমাজের স্থিতি-কল্পে, সমাজের মঙ্গলের জন্য,—লৌকিকতার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। আজকাল আমাদের দেশে বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অসংখ্য "প্রভিডেন্ট কোম্পানী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই সকল কোম্পানীকে প্রতি মাসে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া রাখিলে, বিবাহাদির সময় প্রদত্ত-চাঁদার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অথবা চতুর্গুণ টাকা পাওয়া যায়—ফলে একসঙ্গে একটা মোটা টাকা কর্ম্মকর্ত্তার হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

হিন্দুর লৌকিকতা সেই স্মরণাতীত কাল হইতেই, নীরবে, এইরূপ প্রভিডেন্ট ফণ্ডের কাজ করিয়া আসিতেছে। তোমার কন্যার বিবাহে হাজার টাকার প্রয়োজন, তোমার পিতার শ্রাদ্ধে ৫০০৲ শত মুদ্রার আবশ্যক; তোমার বন্ধুগণ, আমার আত্মীয়মণ্ডলী, সেই ব্যয় সংকুলানের জন্য প্রত্যেকে সাধ্যমত তোমার সাহায্য করিলেন। লৌকিকতার অছিলায়—এইরূপে খরচের সময় আমরা কিছু টাকা হাতে পাইলাম। আমাদের ব্যয়ভারেরও কিছু লাঘব হইল। আবার তাঁহাদের বাটীতে কোনও ক্রিয়া কর্ম্ম হইলে, তুমি ও আমি এইরূপ সাহায্য করিব। এই যে পরস্পরের সাহায্য ইহাই লৌকিকতার পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা লৌকিকতার মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা ধনীর লৌকিকতার গৌরব করি, দরিদ্রের লৌকিকতার আদর করি না। এই ইতর বিশেষের অনুষ্ঠানেই 'লৌকিকতা' কলুষিত হইয়াছে! যদি মনস্বী হও—ইহারই পরিবর্ত্তন কর। দরিদ্র আত্মীয়ের কাছে অর্থ, বস্ত্র, উপঢৌকন লইও না,—তাঁহার স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধাই অমূল্য লৌকিকতা! ধনীকে ও তাঁহাকে সমদৃষ্টিতে অভিনন্দন কর। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে। এরূপ লৌকিকতায় ধনীর আনন্দ বাড়িবে, দরিদ্রের সঙ্কোচ ঘুচিবে,—তোমার উৎসবও সার্থক হইবে। যাঁহার যেরূপ অবস্থা তিনি সেইরূপে লৌকিকতা রাখুন। তুমি কর্ম্মকর্ত্তা—সাদরে তাহাই গ্রহণ করিও। তারতম্য করিতে যাইও না।

ভদ্রলোককে উৎসবে আহ্বান করিয়া, টেক্স আদায়ের মত উপঢৌকন আদায় করা অতীব অন্যায়। বাস্তবিক লৌকিকতা রক্ষার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের বাড়ী খাইতে গেলে সে সুবিমল "ভোজনানন্দ" লাভ হয় কি? আমরা নিজেরাই দেখিয়াছি একই দিনে ৪।৫ বাটী হইতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইলে অনেকটা বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। এক দিনে অনেকগুলা টাকাও খরচ হইয়া যায়। পাঁচ বাড়ীতে লৌকিকতা করিতে ১০৲ টাকা ব্যয় করিলাম—আমাদের গোষ্ঠিশুদ্ধ গিয়া পেট ভরিয়া খাইয়া আসিলেও যে সে টাকা উঠিবে না!

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে কোনো বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য সরকারী কমিশন নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে অনেক কমিশন বসিয়াছে, অনেক লোকের সাক্ষ্য লওয়াও হইয়াছে, বহুৎ সোরগোল হইয়াছে, কিন্তু ফলে কিছুই হয় নাই। সম্প্রতি এক শ্রম-শিল্প কমিশন প্রধান প্রধান শহরে বৈঠক বসাইয়া শিল্প সম্বন্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে "চারুমিহির" লিখিয়াছেন—

দেশে যে ঘোর দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণের উপায় করিতে না পারিলে অচিরেই বাঙ্গালী কুলিমজুরের জাতিতে পরিণত হইবে সন্দেহ নাই।

এখন এক কৃষিকার্য্য ব্যতীত এ দেশের লোকের হস্তে অন্য কোনও ব্যবসা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল কৃষিকার্য্য দ্বারা কোনও দেশ ধনী হইতে পারে না। কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন অর্থদ্বারা একটি সমগ্র জাতির বর্ত্তমান-সময়োপযোগী নানাপ্রকার অভাব দূর হইতে পারে না। আবার আমাদের কৃষি-ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে রৌদ্র-বৃষ্টির সামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে।

দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধিত না হইলে কৃষিব্যবসা দ্বারা আমাদের দরিদ্রতা দূর হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

এ দেশের শিল্পাদির উন্নতি সাধন করা যে প্রয়োজন তাহা বর্ত্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ভাবে এ দেশের শিল্পাদির উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধান জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; তৎপর তন্নিমিত্ত জাপানে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন; সম্প্রতি ঐ বিষয় অনুসন্ধান জন্য এক কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পক্ষ হইতে যে-সকল ব্যক্তি ঐ কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন তাঁহারা তাঁহাদের স্বসমাজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিরন্তন প্রথানুসারে এ দেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্যে

গবর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে অর্থ ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য ব্যতীত কোনও দেশের শিল্পের উন্নতি যে অসম্ভব তাহা জাপান, জর্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস-পাঠক অবগত আছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বিলাতী গবর্ণমেণ্ট কিরূপে আইনাদি করিয়া বিলাতী শিল্পের উন্নতি ও রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য এ দেশের শিল্প নষ্ট করিয়াছিলেন তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নহে।

আমাদের দেশে শিল্পাদির উন্নতি না হইয়া ক্রমে অবনতি ঘটিতেছে ইহা নির্দ্ধারণ নিমিত্ত কোনও প্রকার সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, তাহা কেহই মনে করিবেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট শিল্পাদির উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কি উপায়ে তাহা সংঘটিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ কোনও মতভেদ আছে এবং তজ্জন্য সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যকতা আছে তাহা পূর্ব্বে আমরা মনে করি নাই। আমরা এখন দেখিতেছি, এ দেশের শিল্পোন্নতি বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি আমাদের দেশস্থ ইয়োরোপীয় শিল্পী ও বণিকগণ ঠিক তাহা বুঝেন না। ইয়োরোপীয় শিল্পী ও বণিকগণের মতানুসারেই আমাদের গবর্ণমেণ্টকে চলিতে হয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যকতা হইয়াছে।

ইংরেজ সাক্ষীগণ একবাক্যে বলিতেছেন, এ দেশের শিল্পোন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও আর্থিক সাহায্য করা সঙ্গত নহে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধিত হইলে এ দেশে ইয়োরোপীয় শিল্প দ্রব্যের আদর নষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইয়োরোপীয় শিল্পের আদর এ দেশে নষ্ট হয় ইহা ইংরেজ শিল্পী ও বণিকগণের নিজ স্বার্থের বিরোধী এবং অন্যান্য কারণেও উহা কখনও তাহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

শিল্প-কমিশন প্রসঙ্গে "মোহাম্মাদী" বলেন—

ভারতের নষ্টপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য এদেশের মঙ্গলার্থী ব্যক্তিগণ বহুদিন হইতে চেষ্টা ও আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, এই অকৃতকার্য্যতার জন্য এদেশের লোকের কর্ম্মশক্তি ও যোগ্যতার প্রতি আংশিকরূপে দোষারোপ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক অভিজ্ঞ পাঠকই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যের প্রতি রাজ-পক্ষের অমনোযোগিতা বা উপেক্ষাই তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী। গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান বাণিজ্যনীতি ও ইউরোপীয় বণিকদিগের সমর্থনমূলক শুল্কাদির ব্যবস্থা এদেশের শিল্পবাণিজ্যাদি ধ্বংসের প্রধান কারণ। এদেশের স্বার্থরক্ষাকে রাজশাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে ব্যবস্থা-বিধান বিধিবদ্ধ করা হইলে—ভারতবর্ষ এতদিনে জাপান অপেক্ষাও অধিক উন্নতিলাভ করিতে পারিত। আজকালও একখানা পিয়ার্স সোপ (সাবান) যাহা কলিকাতায় চারি আনায় বিক্রয় করা হয়, জাপানে তাহার মূল্য বার আনার কম নহে। জাপান গবর্ণমেণ্ট স্বদেশের শিল্পীদিগকে উৎসাহিত ও লাভবান করার জন্য বিদেশাগত সমস্ত শিল্পদ্রব্যের উপর ঐরূপ অতিরিক্ত শুল্কস্থাপন করিয়াছেন। তাই অল্পদিনের মধ্যে জাপান ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

মামলাবাজিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ধনী পথের ভিখারী হইতেছে, কিন্তু মামলার কমতি নাই। অধিকাংশ মামলার উৎপত্তি জমিজমা লইয়া। এক বিঘা জমি কিনিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে চারিপাশের লোকের সঙ্গে মামলায় জড়িত হইতে হইবে। নিত্যই এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। ইহার প্রতীকার কি এবং কে তাহা করিবেন?

"জ্যোতিঃ" লিখিতেছেন—

মামলা ছাড়, দেশ সুখশান্তিপূর্ণ হোক, তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ইত্যাদি সদুপদেশ দিয়া দেশের লোকের কাছে কোন ফল পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তোমরা মামলাবাজ, তোমরা নচ্ছার ইত্যাদি গালাগালিও অরণ্যে চীৎকারবৎ নিষ্ফল। যে কোন অমঙ্গলের প্রতীকারের অসীম ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের শাসনকর্ত্তারা নিয়মতন্ত্রের (constitution) ব্যতিক্রম কিছুই করিবেন না। এক সময় মনে করিতাম দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, দেশের সমস্ত উৎপাতের মাত্রা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যাইবে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে মানুষের অর্থপিপাসা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে দেশের ভালমন্দের কথা চিন্তা করিবার অবসরও তাঁহাদের নাই।

"জ্যোতি"র মতে বিচারকেরাই একমাত্র আশাস্থল।

দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের হাকিমেরা অবিরত দেখিতেছেন যে কতকগুলি মামলাকারী মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করে, মিথ্যা সাক্ষী তৈয়ার করে, আদালতের সমক্ষে দাঁড়াইয়া শপথপূর্ব্বক আগাগোড়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যায়। সেই সমস্তকে দমন করিবার জন্য যদি তাঁহারা বদ্ধপরিকর হন তবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, দুই বছরের মধ্যে এদেশের সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমার সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও বেশী কমিয়া যাইবে; এবং তখন সুবিচারবিধানের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিবে।

সু।

হতভাগ্যের সান্ত্বনা

পূজার ফুলে সাজিয়ে সাজি হাজির হলি যবে,
দেবতা তোরে বিমুখ হল? লজ্জা তাতে হবে?
চরণে সে ঠেল্‌ল সাজি
লুটালো ফুল ধুলায় আজি?
তার চরণ ত ছুঁয়েছে ফুল! এই ত সফল পূজা,—
ওরে অবোধ, ও অভাগা, মনটাকে তোর বুঝা!

তোর কপালে এমন হল?—এমনটাকেই নে না,
অমন যদি না হল তার আশাই ছেড়ে দে না!
জমা হয় গাছে ফুট্‌ল না ফুল,
কাঁটার বেলা হয়নি ত ভুল?
হাসি যদি না জোটে ত কান্না কাড়ে কে?
যে এসেছে বরণ করে তারেই নে ডেকে।

এমন হল, অমন নহে? এই কি নহে ভালো?
অন্ধকার ত জমাট আছে, নাই বা জলুক আলো!
বসন্ত তোর নাই বা আসুক,
আকুল ধারায় বর্ষা নামুক,
গ্রীষ্মকালের রুদ্র দহন তাই বা মন্দ কি?
কারুর দয়ায় হৃদয়টা তোর নয় যে বন্ধকী!

তুই যে শুধু দিয়েই গেলি, পেলি না এক কড়া,
দেউলে হলি উজাড় করে মোহরের সাত ঘড়া,
এই ত রে জিত্, এই ত রে জয়,
ছাড় রে সকল লজ্জা ও ভয়,
হতভাগার ভাগ্য দেখে স্তব্ধ বসুমতী!
ধন্য হল অভাগা তোর সকল ক্ষয় ও ক্ষতি।

করবি পূজা? কর্ না রে তুই গোপন হৃদয়-তলে,
পরাণে ফুল না ফুটে ত পূজবি চোখের জলে।
তুই পারীআ পঞ্চমা জাত,
তোর জীবনে নাইরে প্রভাত,
চিররাত্রি অন্ধকারে করতে হবে যাপন,
একলা রবি একপাশেতে কেউ না রে তোর আপন।

তোর ভয়েতে দেব্‌তা যে সেও ছুতের ভয়ে সারা!
তুই ত রবি মুক্ত, হল মন্দির তার কারা!
দেব্‌তা থাকুক মন্দিরে তার
তোর ভয়েতে রুধিয়া দ্বার,
বাহিরে তার পূজোপচার তুই অভাগ্য সাজা,
হতভাগার জয় আজি তোর ভগ্ন ঢাকে বাজা!

১৭ বৈশাখ ১৩২৩
রাত্রি ১টা।

বিশ্রী।

পুস্তক-পরিচয়

ছোট-বউ—শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক মিত্র কোং, কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, কলিকাতা। ডঃ ফুঃ ১৬ অং ৮০ পৃষ্ঠা। দাম ছয় আনা।

ইহা ঠিক উপন্যাসও নয়, ছোট গল্পও নয়; লেখক তাই ইহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বড় গল্প। গল্পটি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, আগাগোড়া সুখপাঠ্য। ভাষার একটু-আধটু ত্রুটি এখানে-সেখানে চোখে লাগিলেও, বর্ণনার মধ্যে কোনো কৌশল বা কারিকুরি না থাকিলেও, আখ্যানের আকর্ষণে বিনা আয়াসে পড়িয়া যাওয়া যায়। স্ত্রী-চরিত্রগুলি ফুটিয়াছে মন্দ না।

ভগবান দত্তের তিন ছেলের তিন বউ ও এক বিধবা কন্যা লইয়া সংসার। মেজো বউ খুব বড়লোকের মেয়ে, দেমাকী ঠেকারী গুমোরী; ছোট বউও ধনীর কন্যা কিন্তু সে আমুদে স্পষ্টবাদী; বড় বউ সাদাসিধা মানুষ, গেরস্তর মেয়ে; বাড়ীর বিধবা মেয়ে প্রমদা জয়কেতে—অর্থাৎ যে-দিক প্রবল বলিয়া জয়ী হইবার সম্ভাবনা দেখে বেচারা সেইদিকে হয়। মেজো বউ বড়মানুষী দেখাইয়া শ্বশুরকে পর্য্যন্ত অপমান করিত, ছোট বউ তাহাকে বাধা দিয়া-দিয়া সকলের মনের দুঃখ যথাসম্ভব নিবারণ করিবার ব্রত লইয়াছিল।—ইহাই গল্পের মোটামুটি প্লট। এই অল্প পরিসরের মধ্যে যতটা সম্ভব সব-কয়টি স্ত্রী-চরিত্রই বেশ ফুটিয়াছে। পুরুষ-চরিত্র একটিও ফুটে নাই, বোধহয় অপ্রধান বলিয়া লেখক সেদিকে মন দ্যান নাই।

হারুন-অর-রশিদের গল্প—শ্রীসেখ ফজলল-করিম কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক নূর লাইব্রেরী, ১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। দুই রঙের কালিতে বর্ডার দিয়া ছাপা; উপহারের পৃষ্ঠাটি তিন রঙের ছাপা; মলাটটি সুদৃশ্য; অনেকগুলি ছবি আছে; ৫৭ পৃষ্ঠা; দাম কিন্তু মাত্র আট আনা।

হারুন-অর-রশিদ খলিফার নামের সঙ্গে এমন একটি রোমান্টিক ভাব জড়িত আছে যে তাঁহার কাহিনী বিচিত্র রকমে কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। লেখক সেই অদ্ভুতকর্ম্মা রাজার একটি মাত্র কাহিনী লইয়া শিশুদের জন্য বর্ণনা করিয়াছেন—এই কাহিনীটি হারুন-অর-রশিদের সহিত আবুল-হোসেনের কৌতুককাহিনী, ইহা আরব্য-উপন্যাসে ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৌতুকনাটিকায় আমাদের সাধারণলোকেরও পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু আবুল-হোসেনের পুরাতন কাহিনী তাহার কৌতুকরসের জন্য চিরনূতন; এবং লেখকের বর্ণনার ভঙ্গিতে নূতনতর হইয়া উঠিয়াছে। গদ্য রচনাতেও যে ছন্দ তাল রচনা করা যায় তাহা অনেক লেখকই জানেন না। গদ্যের ছন্দতাল রচনায় ওস্তাদ শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের এই লেখকও গদ্যে ছন্দতাল রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; মোলায়েম কবিত্বময় ছন্দতালযুক্ত ভাষার নূপুর পায়ে দিয়া লেখকের বর্ণনা যেন নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। আর-একটি বিশেষত্ব লেখক চল্‌তি কথার ভাষায় রচনা করিয়াছেন, অথচ কোথাও জড়তা নাই বা কথ্য অকথ্য ভাষার খিচুড়ি হয় নাই। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে লেখক বাস্তবিক বাঙালী, তিনি বাংলা ভাষার প্রাণের পরিচয় পাইয়া আনন্দ হইতে রচনা করিয়াছেন। ভাষার ধাত বুঝিয়া লিখেন এমন লেখক বাংলা দেশে খুব কম; সেই কমের মধ্যে এই লেখককে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার রচিত এই বইখানি আমাদের শিশুসাহিত্যের দীনতা মোচনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। আমরা তাঁহার লেখনী হইতে আরো উপহার পাইবার প্রত্যাশা করি।

লেখককে একটি বিষয়ে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। দৈহিক ব্যাপার মাত্রই অতি স্থূল এবং সেইজন্য গোপনযোগ্য; এই কারণে লোকের সামনে খাইতে পর্য্যন্ত মানুষের লজ্জা হয়, সংস্কৃত-সাহিত্যে বিদূষকের খাওয়ার লোভ বর্ণনা করিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করা হইত। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো শারীর চেষ্টার বর্ণনা সাহিত্যে চলে না; করিলে তাহা অশ্লীল বা বীভৎস হয়। পায়খানায় যাওয়া বা চাবুক মারার স্থাননির্দ্দেশ সহজেই বাদ দেওয়া চলিত।

ঘুমের গল্প—শ্রীহেমদাকান্ত চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক বেঙ্গল বুক ক্লাব, ১২ রামমোহন দত্ত রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। রয়াল ১৬ অং ৭৬ পৃষ্ঠা। অনেকগুলি ছবি আছে। মূল্য আট আনা।

এই বইএ ওয়াশিংটন-আর্ভিঙের রিপ্ ভান্ উইঙ্ক্ল্ ও স্লিপী হলো নামক গল্প দুটি এবং আবু-হোসেনের গল্পটি ছেলেদের জন্য সহজ সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আলসে-কুড়েদের কৌতুককর ঘুমের গল্প পড়িয়া শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিবে। গল্পগুলির মধ্যে হাস্যকৌতুকের উপাদান যথেষ্ট আছে, এবং লেখকের ভাষা তাহা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে নাই।

চামুণ্ডার শিক্ষা—
সুদখোর সওদাগর— } শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসারদাকুমার দত্ত, ১৭ ব্রীজ-রোড, চেতলা, আলিপুর, কলিকাতা। সচিত্র। ৮৫ ও ৮৪ পৃষ্ঠা। মূল্য উভয়েরই দশ আনা করিয়া। বই দুখানি সুদৃশ্য।

এই দুখানি বইএ মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়ারের টেমিং অফ্ দি শ্রু ও মারচ্যাণ্ট্ অফ্ ভেনিস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকদ্বয়ের উপাখ্যানভাগ ছেলেদের জন্য দেশী ছাঁচে চল্‌তি কথায় বিবৃত হইয়াছে। চল্‌তি কথায় রচনা করিয়া লেখক সুবুদ্ধি ও বাংলা ভাষার উপর অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন; রচনা সুন্দর ও সুললিত হইয়াছে। বালকবালিকারা এই দুই বইএ বহু শিক্ষা ও কৌতুকের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দুখানি বইএর ও জগতের শ্রেষ্ঠ নাটককারের পরিচয় লাভ করিবে।

মুদ্রারাক্ষস।

গায়ে হলুদ—গল্প-পুস্তক, ১৪১ পৃঃ। শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্ প্রণীত, এবং ৭ ঈশ্বরদাসের লেন ঢাকা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

আলোচ্য বইখানিতে প্রভাতকুমার ও ললিতকুমার এই দুইটি গল্প আছে। গল্পের আখ্যানভাগ সাদাসিধা; প্রভাতকুমার প্রেমে পড়িয়া পিতার অমতে বিবাহ করায়, সাধারণত যেমন ঘটে তেমনি ঘটিল, অর্থাৎ পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। অবশেষে কিন্তু অনুতপ্ত পিতা পুত্র ও পুত্রবধূকে আবার গ্রহণ করিলেন। ললিতকুমার ডাক্তার, সে ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া যাইতে-যাইতে রক্ষা পায়, এবং একটি মেয়েকে জল হইতে উদ্ধার করে। মেয়েটির নাম নির্ম্মলা। নির্ম্মলার থাকার মধ্যে ছিল পিতা, তিনিও জলে ডুবিয়া মারা যান। অগত্যা নির্ম্মলা ডাক্তার-বাবুর পরিবারভুক্ত হইয়াই থাকিল। নির্ম্মলাকে ডাক্তার ভালোবাসে অথচ ঘটনাচক্রে বিবাহ করিয়া বসিল আর-একজনকে। ডাক্তারের স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন। মরিবার সময় তিনি সন্তানটিকে নির্ম্মলার কোলে দিয়া এবং স্বামীকে নির্ম্মলাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন।

বইখানির ভাষা সরল অনাড়ম্বর। গল্প দুটি কিন্তু জমে নাই। পড়িতে-পড়িতে পরে কি হইবে জানিবার কৌতূহল জাগে না। গল্পের শেষ কিরূপ হইবে তা গোড়া থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। গল্পবর্ণি[ত] কোনো চরিত্রের সুখে বা দুঃখে মন বিচলিত হয় না।

বইখানির ছাপা পরিষ্কার, কাগজ ভালো।

সু।

দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত প্রকাশক ডাক্তার শ্রীকানাইলাল গুপ্ত, বি, এ, ১২১ নং বারাণসী ঘোষে[র] ষ্ট্রিট, কলিকাতা। ১৩৯ পৃঃ। মূল্য ।/০ আনা।

"বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসো বাপি কর্ত্তনম্"—প্রাণ যায় যাউ[ক] কেহ মাথা কাটিয়া ফেলে ফেলুক, তাহাও ভাল; কিন্তু মহেশ্বরে[র] আরাধনা না করিয়া জল গ্রহণ করিব না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া গুরু[র] নিকট শিষ্য দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক সাধন করিতে আরম্ভ করেন। আ[জ] কাল সন্ধ্যাবন্দনা দূরে, গায়ত্রীজপও করিবার অবসর পাওয়া যায় না এই ভাবই সম্প্রতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আবার অনেক স্থলে দীক্ষা অনাবশ্যক, ও গুরুকরণ ব্যর্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। এরূপ সময়ে "দীক্ষা ও গুরুতত্ত্বে-র" মত পুস্তকের কতদূর আদর হইবে বলা যায় না তথাপি ইহার প্রচারের বিশেষ আবশ্যকতা রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে-তন্ত্রে গুরু বলিতে বস্তুত কি বুঝিতে হয়, এবং দীক্ষা আবশ্যক কে[ন] গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে কয়েক ব্যক্তির সংবাদরূপে তাহা সহ[জ] ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক সময়ে কোনো বিষয়ে[র] বস্তুত সম্যক্ না জানায় লোকের মনে নানা বিরুদ্ধ ধারণার উদয় হ[য়] বিশেষত যদি কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির এইরূপ হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোকেরা তাহাই অনুসরণ করিয়া একটা বিষম অনর্থে[র] সৃষ্টি করিয়া ফেলে। গুরুবাদ-সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়াছে। যাঁহা[রা] ইহা সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আলো[চ্য] গ্রন্থে অনেক সাহায্য পাইবেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্‌গোমঙ্গলম্—শ্রীবিভূতীশচন্দ্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ-প্রণী[ত] কলিকাতা, ২৪ নং, মিডিল রোড, ইটালী, গৃহস্থ পাবলিশিং হা[উস] হইতে প্রকাশিত, ৪৭ পৃঃ, মূল্য ।০।

এই পুস্তকে গোজাতির উপযোগিতা ও তাহার বর্ত্তমান দুর্দশ[া] প্রতীকার-সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্যে সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গানুবা[দ] আলোচনা করা হইয়াছে। গোপালন-সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে য[া] নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই তুলিয়া দিয়া বাঙ্গলায় আলোচনা করি[লে] ভাল হইত, পর্য্যাপ্ত হইত। ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রচুর বিধি আছে, ইহার [সহিত] আরো নূতন-নূতন বিধিবাক্যসমূহ প্রণয়ন করিয়া পূর্ব্বের বিধিগুলি[র] সহিত যোগ করিলে তাহাতে বস্তুত ক্ষতি-হয়। গোচরভূমি দান ক[রা] খুব ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ভূমিতে "পিতৃমাতুঃ স্বস্য নামকৃতং শ্লোকং প্রস্তরখোদিতং প্রণয়েৎ"—এইরূপ বিধি ঠিক ন[হে]। লেখকের সংস্কৃতের আদর্শও ইহাতেই বুঝা যাইবে।

মহিম্নঃ স্তোত্রম্—(গন্ধর্ব্বাধিপতি পুষ্পদন্তপ্রণীতম্) অ[…] টীকাবঙ্গানুবাদ-সমেতম্, চতুর্ধুরীণোপনামক-শ্রীমদনমোহন শ[র্ম্মণা] সম্পাদিতম্। পল্লীবন্ধু প্রেস্, নাওডাঙ্গা, রংপুর। ক্ষুদ্রাকার ৬২ মূল্য ৵০।

মূল স্তোত্র সুপ্রসিদ্ধ। টীকাটি কয়েকখানি কীটদষ্ট পত্রে অস[ম্পূর্ণ] ভাবে প্রাপ্ত। ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। টীকাকারের না[ম] পাওয়া যায় নি। ছাপা মোটেই ভাল নহে।

আমিত্বের প্রসার,—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, [কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য] বেদান্তবাচস্পতি শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার, এম্,এ, বি,এল্- কর্ত্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, যশোহর, প্রথম খণ্ড ১৪০ পৃঃ, দ্বিতীয় খণ্ড ১৬৯ পৃঃ। মূল্য প্রতিখণ্ড ৸৹ আনা।

বেদান্তের গোড়া-আগায়, তা বেদের মন্ত্রেই হউক আর বর্ত্তমান শিক্ষিতমানীর উপেক্ষিত পুরাণেই হউক, সর্ব্বত্রই এই এক অতিসত্য কথা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভেদদৃষ্টি বা ভেদবুদ্ধিতে জীবের ভয়-শোক-মোহ প্রভৃতি দুঃখ, আর অভেদ বা ঐক্য-দৃষ্টিতে সেই-সব দুঃখের বিনাশ হয়, জীবের স্বরূপ প্রকাশ পায়, সে পরম আনন্দে পূর্ণ হয়। কাচ স্বরূপত স্বচ্ছ-সুনির্ম্মল, কিন্তু তাহাতে কালী লাগিলে যেমন তাহার স্ব-রূপ ঢাকিয়া যায়, তাহার স্বচ্ছতা-সুনির্ম্মলতা প্রকাশ পায় না, আত্মাও সেইরূপ স্বভাবত স্বচ্ছ ও আনন্দময়, কিন্তু ভেদদৃষ্টিতে তাহা মলিন হইয়া উঠে, তাহার স্বাভাবিক আনন্দময়তা তিরোহিত হইয়া যায়, এবং শোক-মোহ-ভয় ইত্যাদি দুঃখজাল দেখা দেয়। অনুকূল বায়ুর সঞ্চারে মেঘ অপগত হইলে যেমন সূর্য্যের স্ব-রূপ প্রকাশ হয়, সেইরূপ ভেদদৃষ্টি অপসৃত হইলে, ঐক্যবুদ্ধির স্ফুরণ হইলে আত্মার আনন্দ পুনর্ব্বার আবির্ভূত হয়।

আত্মাকে বা আপনাকে সকলেই ভালবাসে, আপনার প্রতি কাহারো দ্বেষ হয় না, আপনাকে কেহ ঘৃণা করে না; আত্মা বা আপনা ছাড়া অপর বস্তু-ব্যক্তির প্রতি লোকের দ্বেষবুদ্ধি হয়, তাহাতে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এখন অপর বস্তু-ব্যক্তি বলিতে যদি কিছুই না থাকে, যদি জীব কেবল আপনা-মাত্রই থাকে, তবে তাহার আর ঘৃণা থাকে না। আপনার নিকটে আপনার ভয় হয় না, খুব নির্ভয়ে থাকা যায়; কিন্তু যখন নিকটে আর-একটা কিছু দাঁড়ায়, আপনা ছাড়া অপর কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, তখন ভয়ও উপস্থিত হয়। এইরূপে এই যে, আপনা হইতে পৃথক করিয়া দেখা, আপনা বা আত্মা হইতে ভেদবুদ্ধি, ইহাই শোক-মোহ-ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ আনয়ন করে, জীব মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করে। এই ভেদবুদ্ধি বা দ্বৈতবুদ্ধি নষ্ট হইলে, এবং অভেদবুদ্ধি বা অদ্বৈতবুদ্ধির উদয় হইলে সর্ব্বদুঃখের অবসান হয়, জীব স্ব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আনন্দময় হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত মহাবাক্যগুলি এই কথাই প্রকাশ করিতেছে:—

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি।"
তৈত্তি. ২.৭।

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ।" ভাগবত, ১১.২.৩৭।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

"যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্...অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।" তৈত্তি. ২.৭।

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ঈশা ৬-৭।
"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" গীতা.
"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্-ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥" ভাগবত.

এই যে অদ্বৈতজ্ঞান, ইহারই অপর নাম হইতেছে—সর্ব্বভূতে আত্মার ও আত্মায় সর্ব্বভূতের দর্শন, সংক্ষেপে সর্ব্বত্র আত্মদর্শন। ভাগবতের ভাষায় ইহাকেই বলে সর্ব্বভূতে ভগবানের এবং ভগবানে সর্ব্বভূতের দর্শন (যেমন গীতায় অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন, এবং ভাগবতে যশোদার শ্রীবালগোপালের মুখগহ্বরে ভুবনদর্শন)।

এই অদ্বৈতজ্ঞান বা সর্ব্বত্র আত্মদর্শন কি, ইহা লইয়া আচার্য্যগণের বিবিধ মত আছে। ইহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন, আমরা মোটামুটি একরূপ কিছু বলিব।

কন্যার বিবাহ হইলে যত দিন সে জননী না হয়, তত দিন তাহার নিজেরই বেশবিন্যাস প্রভৃতি সৌন্দর্য্যবিধানে বা যত্ন-আদরে বিশেষ লক্ষ্য থাকে, তাহাতেই সে পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু জননী হইলে সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সে ভাব পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়। দেখা যায়, তখন সে নিজের জন্য ব্যাকুল নহে, তাহার সমগ্র দৃষ্টি তখন শিশুটির দিকে গিয়াছে, শিশুরই সাজ-সজ্জা, আদর-যত্নে তাহার দিন কাটিতেছে,—পূর্ব্বে তাহাই নিজের জন্য কাটিতেছিল। পূর্ব্বে নিজেরই রোগাদি পীড়ায় কষ্ট অনুভব করিত, এখন শিশুর রোগ হইলে নিজেরই রোগ হইয়াছে মনে করে, তাহাকে কেহ আঘাত করিলে সেই আঘাত নিজেরই ভাবে, "পুত্রে নষ্টে মৃতে অহমেব মৃতো নষ্টঃ"—মনে করিয়া ব্যাকুল হয়। একটি পুত্রের পর আর একটি, তাহার পর আর একটি, এইরূপ যত পুত্র জন্মে, জননী তাহাদের সকলেরই জন্য ঐরূপ করে। পূর্ব্বে কেবল নিজের কথা ভাবিত, এখন কতজনের কথা ভাবিতে হয়। কেন এরূপ হয়?

কোনো নিরাশ্রয় পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিয়া লোকের মনে দুঃখ হয়। কেন, তাহার নিজের শরীরে ত কিছুই হয় নাই, তবু তাহার দুঃখ হয় কেন?

ইহার একমাত্র উত্তর, সে তাহাদের মধ্যে আত্মদর্শন করে। পুত্র জন্মের পূর্ব্বে জননী কেবল নিজেরই দেহের মধ্যে আপনাকে বা আত্মাকে দেখিত, কিন্তু শিশু জাত হইলে সে তাহারও মধ্যে নিজেকে দেখিতে পায়। দয়ালু ব্যক্তি ঐ পীড়িতের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পান। নিজের পরিচ্ছিন্ন দেহসজ্ঘাত ছাড়া পুত্রগণেরও মধ্যে নিজেকে বা আত্মাকে দেখিতে পায় বলিয়াই সেই জননী তাহাদিগকে ঘৃণা করে না, তাহাদের নিকটে ভয় পায় না, নির্ভয়ে থাকিতে পারে।

এই যে, এইরূপ আত্মদর্শন, ইহা যত-যত বাড়িবে, যত অধিক-অধিক ব্যক্তিতে এইরূপ আত্মদর্শন হইবে, তত-ততই সঙ্কীর্ণতা যাইবে, উদারতা আসিবে; দ্বেষ কমিয়া যাইবে, ভালবাসা উৎপন্ন হইবে; কেবল স্বার্থ লইয়া লোক পশু হইবে না, পরার্থ লইয়া দেব হইয়া উঠিবে; কেবল নিজেরই উদর পোষণ করিতে ব্যস্ত থাকিবে না, প্রথমে অন্যকেই পোষণ করিবার জন্য উদ্যত হইবে, তাহাতেই আত্মোৎসর্গ করিবে, এবং তাহাতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। ইহাই নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন:—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥"

ইহা একপ্রকারের আত্মদর্শন; গীতার এই শ্লোক-অনুসারে ইহাকে সমদর্শন বলিতে পারা যায়। অন্যরূপও আত্মদর্শন আছে কিন্তু বলিয়াছি এখানে সে আলোচনার দরকার নাই।

আলোচ্য পুস্তকে এই সমদর্শন-রূপই আত্মদর্শন বিবৃত হইয়াছে। পুস্তককার ইহারই নাম দিয়াছেন আ মি ত্বে র প্র সা র। তাঁহার মতে ইহার বিবক্ষিত ভাবার্থ এই যে, কেবল নিজেরই মধ্যে নিজেকে বা আত্মাকে সঙ্কুচিত না রাখিয়া অন্যেরও মধ্যে ইহাকে প্রসারিত করিতে হইবে অর্থাৎ অপরেরও মধ্যে আত্মাকে দেখিতে হইবে। কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া এই কথাটাই তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তাঁহার চেষ্টার আংশিক সফলতা হইয়াছে। কিন্তু যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। সনাতন ধর্শ্মের যে-সকল বিধান ব্যাখ্যা করিয়া তিনি নিজের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই বা ঠিক করিতে পারেন নাই। যাহা বলার দরকার ছিল, তাহা বলেন নাই, বা যাহা অনাবশ্যক তাহা বলিয়াছেন। স্থানে স্থানে অসম্বদ্ধ বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক কথা এলো-মেলো-ভাবে বিশৃঙ্খলভাবে লেখা হইয়াছে, পুনরুক্তি করা হইয়াছে। পুস্তক-প্রণয়নের যুক্তিযুক্ত প্রণালী উপেক্ষিত হইয়াছে। যে শাস্ত্রবচন যাহা সমর্থন করিতে পারে না, তাহাও তাহার সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ভুল ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, দর্শনশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষার ও ছাপার ভুলও প্রচুর রহিয়াছে। আমরা ইহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দিব।

"আমিত্বের প্রসার" নামটা সঙ্গত মনে হয় না। ললিত বাবু ইহা পূর্ব্বেই ধরিয়াছেন মনে হইতেছে। গ্রন্থকার ঐ শব্দে যে, বস্তুত আত্মপ্রসার বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি একাধিকবার 'আমিত্বের প্রসার' প্রয়োগ করিলেও, তাঁহারই লেখা হইতে বুঝা যায়:— "কিন্তু দেহকে আত্মপ্রসারের উপকরণ জ্ঞান না করিয়া...আত্মার প্রসারের চেষ্টা" (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৭ পৃ.)। আলোচ্য গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের নাম দেওয়া হইয়াছে Expansion of Self. ইহাতেও ঐ কথাটা বুঝা যাইতেছে। আবার অন্যত্র (ঐ ৯২ পৃঃ) "সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আত্মপ্রসার বা আমিত্বের প্রসার।" এখানে তাঁহার মতে আত্ম-প্রসার=আমিত্বের প্রসার। কিন্তু আত্মা=আমি, আমিত্ব নহে। অতএব আত্ম-প্রসার=আমি-প্রসার, অথবা আমির প্রসার। আমিত্বের প্রসার হইতে পারে না। আমি ও আমিত্ব এক নহে। আবার আমিত্বের প্রসার বলিতে হইলে আত্ম-প্রসার বলা চলে না, বলিতে হইবে আত্মত্বের প্রসার। এবং তাহা হইলে Expansion of *Self* বলা চলিবে না, *Selfness* বলিতে হইবে।

অহম্=আত্মা, অতএব অহম্=আমি হইলে, আত্মা=আমি। অতএব আমিত্ব=আত্মত্ব। ইহার মধ্যে কোনো ভুল নাই।

গ্রন্থকার আবার (প্রকাশকের নিবেদন, ৵৹) এই আমিত্বকে অহংতত্ত্বের সহিত এক করিয়া এক বিষম গোলমালের সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতও ঐ দুইটি এক পদার্থ নহে। "আমিত্বে বা অহংতত্ত্বে যে কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি তাহাই অহঙ্কার। সুতরাং আমিত্বের প্রসারে অহঙ্কারের প্রসার।" ইহার তাৎপর্য্যটা কি, এবং হেতু-হেতুমদ্ভাবটাই বা কি হইল বুঝা যায় না।

'আমি-আমি' 'আমার-আমার', অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় অহঙ্কার-মমকার বন্ধের কারণ। অতএব ইহার বিনাশই প্রার্থনীয়। গ্রন্থকার ইহাই দেখাইতে চাহেন, এবং ইহা এক ভাবে ঠিকই যে, এই 'আমি-আমি' 'আমার-আমার' ভাবকে প্রসার করিতে পারিলেই তাহার বন্ধন-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, আর মুক্তির শক্তি ফুটিয়া উঠে। অর্থাৎ কেবল নিজেরই দেহের মধ্যে 'আমি' বা আত্মাকে দেখিলে হইবে না, সকলেরই মধ্যে দেখিতে হইবে। কেবল আমার নিজেরই লোক-জনকে 'আমার' ভাবিতে হইবে না, "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ভাবিতে হইবে। মনে হয়, ইহাই তিনি "নিবেদনে" বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু ভাষায় তাহা পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে (৯৭ পৃঃ) মা য়া শীর্ষক প্রবন্ধটিতে জগতের প্রকৃতিরূপা ভগবচ্ছক্তি মায়ার সহিত বাঙ্‌লায় স্নেহ-দয়া-মমতা-অর্থে প্রচলিত মায়ার অভেদ করিয়া এক অদ্ভুত কল্পনা করা হইয়াছে। "বস্তুতঃ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সন্তানের প্রতি যে মমতা, উহা যদি সে প্রসার করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মায়া, ব্রাহ্মী মায়া বা মহামায়াতে পরিণত হইল।" ইহা নূতন ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই!

"রজঃশক্তিই সত্ত্বশক্তিতে পরিণত হয়" (১ম খণ্ড, ১১৭ পৃঃ), "রজও যেরূপ ক্রিয়াশীল, সত্ত্বও তদ্রূপ ক্রিয়াশীল" (ঐ, ১১৮ পৃঃ), "দেহই বাসনার আধার" (২য় খণ্ড, ৮৭ পৃ), এই-সকল উক্তি কোনো দার্শনিকের প্রবন্ধে আশা করা যায় না। "পরমব্রহ্মের পর "আমিত্বে" পরিণত হয়" (১ম খণ্ড, ২৬ পৃ), ইহাও চমৎকার।

"ব্রহ্মচর্য্যই আমিত্বের প্রসারপ্রাপ্তির একমাত্র সোপান" (১ম খণ্ড, ৪৭ পৃ) হইলে আর সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়, এবং গ্রন্থকারেরও ইহার পর লেখনী পরিত্যাগ করা উচিত ছিল।

গ্রন্থকার বলিয়াছেন "সাধারণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সনাতন শাস্ত্রানুসারে আমিত্বের প্রসারের জন্য বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম" (১ম খণ্ড, ১৯ পৃ)। কিন্তু ইহা যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা ত কিছুই হয় নাই, বরং বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ, উচ্চ ভাব আছে, যাহা দ্বারা বস্তুতই আত্মার প্রসার হইতে পারে, তাহার কোনো উল্লেখ না করিয়া একবারে তাহাকে ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে।

দেবাসুর-সংগ্রাম-নামক প্রবন্ধে নানা গোলমাল করা হইয়াছে। ছান্দোগ্যের উদ্ধৃত বাক্যাবলীতে (২-২) আধ্যাত্মিক মুখ্য প্রাণের দৃষ্টিতে উদ্গীথ বা প্রণবের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। এখানে প্রাণায়ামের কোনো সম্বন্ধ নাই। অথচ গ্রন্থকার "প্রাণায়ামের দ্বারাই প্রণব সাধন" সমর্থনের জন্য এ বাক্যাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার এই প্রসঙ্গে প্রাণায়াম-শব্দের ব্যুৎপত্তিও নূতন দেওয়া হইয়াছে— "প্রাণান্ যময়তীতি প্রাণায়ামঃ"!

সমস্ত গ্রন্থখানি বাঙ্গলায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "নিশীথ স্বপ্ন-সংবাদ"টি সংস্কৃতে লিখিত হইল কেন বুঝা যায় না। যে সংস্কৃতে প্রবন্ধটি লিখিত, তাহাতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়েরই গৌরবের হানি হইয়াছে। ভাষাটি অতি জঘন্য, ইহা সংস্কৃত বাক্পদ্ধতির (idiom) ধার দিয়াও যায়নি, বাঙ্‌লা-গন্ধে পরিপূর্ণ, এবং প্রভূত ব্যাকরণ-দোষে দুষ্ট। খাঁটি সোজা বাঙ্‌লায় লিখিলে প্রবন্ধটা "কোকিলের অভিশাপ" শীর্ষক লেখাটির মত ভালই হইত।

বাহুল্যভয়ে আর একটিমাত্র কথার উল্লেখ করিয়া আমরা শেষ করিব। গ্রন্থকার কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া যাহা লিখিয়াছেন (১ম খণ্ড, ১০৩ পৃ) তাহা কি ঠিক হইয়াছে? তাঁহার "আমিত্বের প্রসারের" ইহাই কি আদর্শ? গ্রন্থকার এই পুস্তকে উহার উল্লেখে কিছু লাভ করিয়াছেন কি?

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩২৩

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বাংলা ভাষায় গবেষণার ফল প্রকাশ।

বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের ন্যায়, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্ত্তমান মনস্বিগণও যদি, তাঁহাদের জ্ঞান-গরিমার সম্পদ্ বঙ্গভাষাতেই উপনিবদ্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও যাঁহাদের হস্তে বাঙ্গালার সারস্বত-রাজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাতেই স্বস্ব জ্ঞানের চরম ফল লিপি-বদ্ধ করিয়া যান,—এবং এই-প্রকারে যদি বহুকাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে এমন একদিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গণের অনেক কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বাঙ্গালার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্বস্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশপূর্ব্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন।"

অতঃপর ইহাও লিখিত হইয়াছে :—

যদি যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গভাষাকে অক্ষয় করিবার বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, মানুষের অনন্য-সাধারণ-কমনীয়, নিজের জাতীয়তার ও জাতীয় সাহিত্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ অথবা বর্দ্ধিত করিবার জন্য,—বাঙ্গালী নিজের নিজের জ্ঞানধামতার পরিচয়, স্বস্ব উপার্জ্জিত জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্য-সম্ভার নিজ-নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত যশের সম্মোহনী তৃষ্ণার বশবর্ত্তী না হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই দুরূহ বলিয়া প্রতিভাত কার্য্য, ক্রমেই সুকর হইয়া আসিবে।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে "স্বয়ং অসিদ্ধ" হইলেও, তৎকর্ত্তৃক পঠিত অভিভাষণে অপরের জন্য সাধনার পথ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

"দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করিব, আমার জননী বঙ্গভাষাকে জগতের বরণীয় করিব,—আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্যমায়ের সন্তান আমার মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে,—এইপ্রকার পবিত্র সঙ্কল্পরূপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্ব্বক, কোন একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করিলেই তাহা বিদেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ অর্জ্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে।"

অন্যের সুসজ্জিত ও সুন্দর মাকে মা বলিয়া জীবন ধন্য করা যায়, ইহা নূতন কথা বটে।

অভিভাষণে একাধিক বার যশের আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হইয়াছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক ও অন্য গবেষকগণ যশ চান না, ইহা আমরা বলিতেছি না; সদুপায়ে খ্যাতি লাভ করিবার ইচ্ছা অসাধু ইচ্ছাও নহে। কিন্তু তাঁহারা কেবল যশের জন্যই গবেষণা করেন, এবং যশের জন্যই গবেষণার ফল বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করেন, ইহা, গবেষকদিগের অন্তর্য্যামী না হইলে, বলা যায় না। আমরা অন্তর্য্যামী নহি, সুতরাং এ বিষয়ে আর কিছু বলিব না। আমাদের মনে হয়, সর্ব্বোপরি জ্ঞানের পিপাসা —বিশ্বের নিগূঢ় রহস্য জানিবার কৌতূহল, তাহার পর জগতের ও ভারতের জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা, এবং

মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিবার আকাঙ্ক্ষাও আমাদের গবেষকদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিতে পারে। নূতন আবিষ্ক্রিয়া সত্য কি না, খাঁটি কি না, তাহা পরখ করিবার কষ্টিপাথর ভারতে দুর্লভ। কষ্টিপাথর আছে বিদেশে। আবিষ্ক্রিয়াগুলির সত্যতা পরীক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিদেশী ভাষায় তাহা লিখিত হওয়া আবশ্যক। তা ছাড়া, বিদেশী ভাষায় পারিভাষিক শব্দের প্রাচুর্য্য বশতঃ তাহাতে লেখাও সহজ। সম্ভবতঃ এই-সব কারণে বাঙালী গবেষকগণ ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করেন।

সে যাহা হৌক, এখন অভিভাষণের আসল প্রস্তাবটির আলোচনা করি। এ বিষয়ে আগে একটা অবান্তর কথা আগেই শেষ করিয়া ফেলি। বাঁকিপুরের ইংরেজী দৈনিক এক্‌স্‌প্রেস্ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

However sound the precept of the President is, we would have been glad if he had more effectively followed it by his own practice. The Conic Sections and other mathematical works of the President are all in English, and it would have been a great advance in the language if they had been written in Bengali.

অবশ্য, শুধু উপদেশের চেয়ে উপদেশ-ও-দৃষ্টান্ত ভাল বটে। কিন্তু এস্থলে এক্‌স্‌প্রেস্ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি অবিচার করিয়াছেন; কারণ তিনি মৌলিক গবেষণাই মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কনিক সেক্‌শুন্স্ মৌলিক গবেষণার বহি নহে, উহা কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য সঙ্কলিত পুস্তক। আমরা গণিতজ্ঞ নহি, কিন্তু শুনিয়াছি, আশুবাবু যৌবনে গণিতে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছিলেন। অভিভাষণ হইতে জানা যায়, সেই অল্পবয়সেই তাঁহার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাগরূক হইয়াছিল, কিন্তু পারিভাষিক শব্দ রচনা করা কঠিন বলিয়া বা অন্য কোন কারণে, ইংরেজীতেই তাঁহার সামান্য গবেষণা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যশের তৃষ্ণা তাঁহার ছিল কি না, জানি না।

আসল প্রস্তাবটি যে অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা, সর্ব্ববিধ অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলেই (in the abstract) খুব উৎকৃষ্ট। অবস্থার বিচার না করিয়া উপায় প্রণালী বা পন্থা নির্দ্দেশ করিলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে বার্ক্ বলিয়াছেন :—

"Circumstances (which with some gentleme[n] pass for nothing) give in reality to every politic[al] principle its distinguishing colour, and discriminatin[g] effect. The circumstances are what render eve[ry] civil and political scheme beneficial or noxious [to] mankind."

এই কথাগুলি রাষ্ট্রনৈতিক ভিন্ন অন্যক্ষেত্রেও খাটে অভিভাষণে রুশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। রুশিয়া রাসায়নিক মেণ্ডেলেয়েফ্ রুশীয় ভাষায় নিজ গবেষ[ণা] লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু রুশিয়ার ও বাংলা অবস্থার প্রভেদ মনে রাখা দরকার। রুশিয়া স্বাধীন, বাং[লা] পরাধীন। রুশদের মাতৃভাষা এবং রুশিয়ার রাজভা[ষা] একই। রুশীয় ভাষায় যাহা লিখিত হয়, তাহার আদ[র] অন্যদেশে হইতে বিলম্ব হইলেও তাহা রুশীয় রাজশক্তি[র] সাহায্য এবং রুশদের আদর অবশ্যই পাইতে পারে। পরাধী[ন] দেশের লোকদের গুণ, বিশেষতঃ অশ্বেত লোকদের গু[ণ] "সভ্য" জগতে স্বীকৃত হওয়াই কঠিন। ফিলিপাইন রিভি[উ] সত্যই বলিয়াছেন :—

Dependent peoples are always looked upon [by] westerners as short of qualifications; and, whatev[er] their actual merits may be, they (their merits) a[re] lost sight of under cover of such advisably prevailin[g] belief that they (said people) are short of qualific[a]tions.

এই কারণে রুশ রাসায়নিকের গুণগরিমা যত সহ[জে] স্বীকৃত হইবে, বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের গুণ তত সহ[জে] স্বীকৃত হইবে না। বাঙ্গালীর মাতৃভাষা ও রাজভা[ষা] স্বতন্ত্র। সুতরাং বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক বাংলায় নিজ গবেষ[ণা] প্রকাশ করিলে তাহা রাজশক্তির সাহায্য পাইবে না সরকারের গোচর করিবার জন্য তাহাকে আবা[র] ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিতে হইবে। প্রথমেই বাংলা[য়] গবেষণা লিখিয়া ফেলিলে, অন্যের আবিষ্ক্রিয়া দ্বা[রা] গৌরবলাভপ্রয়াসী অসাধু লোকদের তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া নিজের গবেষণা বলিয়া জাহির করিবা[র] সুবিধা হয় বটে। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের দ্বারা ইংরেজীতে লিখিত গবেষণা চাপা দিয়া রাখিয়া তাহা নিজের বলি[য়া] প্রচার করিবার চেষ্টা ইংলণ্ডেই হইয়াছিল।

বাঙালী বাংলায় লিখিলে তাহা যে কেবল গবর্ণমেণ্টের

অগোচর থাকে, তাহা নয়; দেশের লোকও তাহাকে নূতন কিছু বলিয়া পুছে না বা অজ্ঞতাবশতঃ নূতন বলিয়া চিনিতে পারে না। আশুবাবুর অভিভাষণে দেখিতেছি যে "প্রথম যৌবনে" যখন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার "সতত ধ্যান ছিল, যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব।" অতএব বাংলা সাহিত্যে নূতন কোথায় কি হইতেছে, তাহার খবর তিনি যৌবনকাল হইতেই রাখিয়া আসিতেছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার গবেষণাপ্রসূত তত্ত্ব বাংলা মাসিক পত্রে দুটি প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এগুলির কোন খবর বিদেশীরা লইবে, এমন আশা করা যায় না; কিন্তু আশুবাবু রাখিয়াছিলেন কি না জানিতে ইচ্ছা হয়। ১৩১৮ সালে মৈমনসিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে আচার্য্য বসু তাঁহার অভিভাষণে তরু-লিপি (Plant Autograph) সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া প্রথম প্রচার করেন। তখন বিদেশীরা ইহার সন্ধান লয় নাই, পায় নাই। কয়েক বৎসর পরে ইহা ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণ ১৩১৮ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছিল। হয়ত জ্ঞানাভাব-বশতঃ সর্ব্বসাধারণে ইহার মৌলিকত্ব বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার সুপণ্ডিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কি উহার আদর করিয়াছিলেন? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দেশবিদেশের অনেক অধ্যাপক নিয়োগ করাইয়াছিলেন; কিন্তু ডাক্তার বসুকে বোধ হয় তাঁহাদের প্রত্যেকেরই চেয়ে নিকৃষ্ট বোধে, বাংলায় বা ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে কখন আহ্বান করেন নাই। বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া বিদেশী ভাষায় পুস্তকাকারে ও রয়্যাল সোসাইটীর কার্য্যবৃত্তান্তে প্রকাশিত হওয়ায়, এবং নানা সভ্যদেশে তিনি তজ্জন্য আদৃত হওয়ায়, সম্ভবতঃ এখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রভৃতিকে বাংলা লিখিতে উপদেশ দিতেছেন। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে জগদীশচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলে তিনি পরিষদে নিজের গবেষণা-বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা করিবেন, এবং বন্দোবস্তের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহারও কিয়দংশ তিনি দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু মাতৃভাষার সেবা ও মাতৃভাষাকে "গৌরবান্বিত" করিবার এই যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন, বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা আশুবাবু চাঁদা দিয়া বা অন্যপ্রকারে তাহার পোষকতা কতটুকু করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। কেহ কিছু করিয়াছেন বলিয়া ত শুনি নাই।

অভিভাষণে, ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া বঙ্গ-ভাষাতেই লিখিতে, "একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া গ্রহণ" করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাই যেমন আমাদের দেশে, অনাদৃত ধুতিপরা মানুষ হ্যাটকোট পরিলে শ্রেণীবিশেষকর্তৃক সম্মানিত হয়, তেমনি মাতৃভাষায় অনাদৃত জিনিষ ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত হইবার পর কাহারও কাহারও নিকট সম্মান পায়। বিজ্ঞান কয়জন বুঝে বা পড়ে? কিন্তু কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নানা প্রকারের প্রবন্ধ, এসব বিস্তর লোকে পড়ে। রবিবাবু এসব বরাবর বাংলাতেই লিখিয়া আসিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এই বাংলা চেহারাকে উপাধিভূষিত করেন নাই। যখন মডার্ণ রিভিউ কাগজে তাঁহার লেখার ইংরেজী বাহির হইতে থাকে, তখনও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। যখন ইংলণ্ডে তাঁহার রচনার ইংরেজী বাহির হইয়া গেল, তিনি নোবেল প্রাইজ্ পাইলেন, তখন "রূপান্তরিত" রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্যাচার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তখন আশুবাবুই ভাইস-চ্যান্সেলার। আমরা তখন এই-সব কথা লিখিয়াছিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বেঙ্গলী কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখান হইয়াছিল যে, যতদিন রবিবাবুর লেখা ইংরেজীতে বাহির হয় নাই, (মডার্ণ রিভিউয়ে কিন্তু হইয়াছিল), ততদিন তাঁহার গৌরব ইংরেজকে বুঝান যাইবে না বলিয়াই, তৎপূর্ব্বে তাঁহাকে ডি-লিট্ উপাধি দেওয়া হয় নাই! ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক।—ইংরেজকে বুঝাইতে পারা যাইবে না, এই ওজুহাতে যে-দেশে উপাধি দেওয়াও চলে না, সে দেশে আশুবাবুর প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করার সুসাধ্যতা সম্বন্ধে অন্ততঃ সন্দেহ করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ,—"জন্মভূমির তথা জননী

বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি।" ইহা বোধ হয় স্বীকৃত হইবে, যে, আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা জন্মভূমির গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন। বঙ্গভাষার গৌরববৃদ্ধির ভারও যদি তাঁহারা লইতে নাই পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি খুব বেশী দোষ দেওয়া যায়? অর্থনীতির একটা নিয়ম আছে, যে, শ্রমবিভাগ (division of labour) দ্বারা কাজ বেশী হয় ও ভাল হয়। বৈজ্ঞানিকগণ একাগ্রভাবে গবেষণা করুন, এবং যে ভাষাতে সহজে ও শীঘ্র গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাই করুন; পরিভাষা রচনা করিবার জন্য যে সময় ও চিন্তার দরকার, তাহা তাঁহাদের ঘাড়ে চাপাইলে যদি মোটের উপর আবিষ্ক্রিয়া করিবার জন্য সময় ও শক্তি পূর্ণ ভাবে তাহাতেই প্রযুক্ত না হয়, তাহা কি ক্ষোভের বিষয় হইবে না? আমাদের মনে হয়, যিনি বাংলায় যে বিষয় লিখিতে চান, তিনি তাহা লিখুন। কিন্তু যিনি তাহা করিতে রাজী নহেন,—তা সে যে কারণেই হউক,—তাঁহার পুস্তকাদি অনুবাদ করাইবার বন্দোবস্ত সম্মিলন করুন। সেরূপ প্রস্তাব সভাপতি বা আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি তিনজন লোকের বহি ছাপাইবার ভার ধনী লোককে বা সর্ব্বসাধারণকে লইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে মৌলিক গবেষণার, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার, বহি একখানিও নাই। যদি বাঙালী বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণা শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রভৃতি দ্বারা বাংলায় লিখাইয়া ছাপাইবার জন্য একটি ফণ্ড স্থাপিত হয়, এবং আশুবাবু তাহার পৃষ্ঠপোষক (Patron) এবং প্রথম চাঁদাদাতা হন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, এই-সব বহি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াও ধার্য্য হইতে পারে। তাহা হইলে বাঙালীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি, এবং বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি; দুই-ই হইবে, এবং আশুবাবুর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের মূল নিয়মাবলী।

শুনিতেছি, সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকিপুরের অধিবেশনে উহার ভিত্তি ও কাঠামো ঠিক করিয়া দিবার জন্য মূল নিয়মাবলী প্রণয়নার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সব জিনিষেরই মূল নিয়মাবলীর প্রয়োজন আছে; তাহা গড়ন, এবং কাজ করিবার পদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহা স্থি করিয়া দিবার আবশ্যক আছে। কিন্তু আগে হইতে কো বিজ্ঞাপন না দিয়া হঠাৎ এরূপ কমিটি কেন করা হইল বুঝ যাইতেছে না।

একটা আম গাছ কিম্বা অন্য কোন গাছ কি ভাে বাড়িবে, তাহা না দেখিয়া তাহার শৈশবেই তাহা চারিদিকে ও উপরে একটা শক্ত কঠিন বেড়া ছাদ দিয়া দিলে কি ফল ভাল হয়? কোন শিশুর কত বড় এবং কি রকমের হইবে, তাহা জানিতে হই যৌবন পর্য্যন্ত দেখিতে হয়; তাহার আগেই, শৈশবে কৈশোরে, একটা তোমার-আমার খেয়াল-মত শক্ত জু তাহাকে পরাইয়া দেওয়া কি ভাল? কংগ্রেসের বয় ৩০ পার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু মূল নিয়মাবলী এই কয়ে বৎসর আগে মাত্র প্রণীত হইয়াছে। যাহা হউক, য এখনই কিছু করিতে হয়, বিধিমত সময় দিয়া, কলিকাতা সাহিত্যপরিষদ, সাহিত্যসভা, মফঃস্বলের সমুদয় সাহিত পরিষদ, সম্মিলনের পরিচালনসমিতি, সম্মিলনের ভূতপূ সমুদয় সভাপতি, প্রভৃতি সকলের মত লইয়া কাজটি ক উচিত। নতুবা কমিটির কাজ পণ্ড হইবে, তাঁহা হইবেন "গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লে"র মত। এতদি সাহিত্যপরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, সম্মিলনের সাধার সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত দশ জন সভ্যের সহযোগিতা সম্মিলনের কার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন। এই পরিচাল সমিতিকে কি অকস্মাৎ উড়াইয়া দেওয়া হইল? পরিষ কয়েকমাস হইল, বাংলাদেশের ও তাহার বাহিরে সমুদয় বঙ্গীয় সাহিত্যিক সভাসমিতির সহযোগিতা লাভে চেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। সম্মিলনেরও উদ্দেশ্য যং সমুদয় বাংলাসাহিত্যবিষয়ণী চেষ্টাকে একলক্ষ্য ও পরস্প সহযোগিতাসূত্রে আবদ্ধ করা, তখন সাহিত্যপরিষদে এই চেষ্টাকেই সাহায্যদানে প্রবলতর করিলে কি ক্ষ হইত? একই কাজ করিবার জন্য একাধিক রব আয়োজনে কেবল যে শক্তির অপচয় হয়, তাহা ন দলাদলিরও সূত্রপাত হয়। শুনিলাম বাঁকিপুরে কমি নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে অনেক সভ্য বিষয়টির ভাল করি

আলোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মত লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু সভাপতির শাসনদণ্ড-পরিচালনে এসব চেষ্টা ভূমিসাৎ হইয়াছিল। যাহা হউক, কমিটিতে সমুদয় সাহিত্যপরিষদ, এবং পরিচালন-সমিতির প্রতিনিধি কে কে হইলেন, কেন হইলেন, কে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিল, এসব কথা সর্ব্বসাধারণের জানিবার অধিকার আছে। সাহিত্যপরিষদের সভাপতি মহাশয়কে বা সহকারী সভাপতিদিগকে কেন বাদ দেওয়া হইল, তাহাও জিজ্ঞাস্য।

স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ।

সাধারণব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনতম সভ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজের শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, বিষয়বুদ্ধি, ও সাধুতা দ্বারা সচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব নহে। তাঁহা অপেক্ষা অল্প শিক্ষা ও অল্প টাকার পুঁজি লইয়া তাঁহা অপেক্ষাও দরিদ্র অবস্থা হইতে এই বংলাদেশেই তাঁর চেয়ে বহুগুণ অধিক অর্থ অনেকে উপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে তিনি বাল্যকালে কেবলমাত্র পাঠশালায় শিক্ষা পাইয়াও নিজের চেষ্টায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে উন্নত আদর্শ উপলব্ধি করিয়া জীবনে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের সেই আদর্শ অনুসারে বহু পরিমাণে চলিতে পারিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে অনেকের মানসিক দৃষ্টি কুসংস্কার ও বৃথা ভাবুকতার কুহেলিকা ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও সামাজিক নানা বিষয়ের সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার চিন্তা ও বিচার করিবার শক্তি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। নূতন নূতন বিষয় জানিবার ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। অধুনা দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় নিজে বেশ বড় বড় লেখা ভিন্ন পড়িতে পারিতেন না; সুবিধা হইলে অপরকে দিয়া পড়াইতেন। "প্রবাসী" সম্বন্ধে শেষ কিছুদিন বলিতেছিলেন, "তোমরা বড় ফিকা কালীতে ছাপিতেছ।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণে তিনি প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। উপাসনায় তিনি এমন নিষ্ঠাবান্ ছিলেন যে সুস্থ থাকিতে এক রবিবারও মন্দিরের উপাসনায় অনুপস্থিত হন নাই। তিনি ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন, এবং ব্রাহ্মবালক বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি যে-কাজে হাত দিতেন, তাহা খাড়া করিয়া তুলিতেন। এ বিষয়ে তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা ভ্রমণ পাঠ লিখন প্রভৃতি অতি নিয়মিত ছিল। জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত কোন কাজের বা হিসাবের বাকী বকেয়া রাখিয়া যান নাই। কাজের আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ছিল। তিনি সমাজের সকল রকম কাজ করিয়া গিয়াছেন; সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং শেষ পঁচিশ বৎসর সমাজের দাতব্য বিভাগের ভার তাঁহার হাতে ছিল। ইহা তাঁহার অতি প্রিয় কাজ ছিল। দাতব্য ভাণ্ডার হইতে জাতিধর্ম্মবয়সনির্ব্বিশেষে কতকগুলি অসহায় লোক সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। কখন কখন দেখা যাইত তিনি পথের ভিখারীকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতেছেন। শিশুরা তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। তাহাদের জন্য বিস্কুট, কুল, কমলালেবু, প্রভৃতি সঙ্গে রাখিতেন ও তাহাদিগকে দিতেন। ইতর প্রাণীদিগকে আহার দেওয়া তাঁহার একটি প্রিয় কাজ ছিল। তাঁহার দুতলায় বারান্দাসংলগ্ন একটি তক্তায় পক্ষীদের জন্য প্রত্যহ অন্ন রাখিতেন। তাহা তাহারা আনন্দে ভোজন করিত। বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা যেমন বাড়ীর ছোটবড় সকলের খবর লইয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ যথাসাধ্য সমাজের সকল বিভাগের নানা গৃহস্থের খবর লইয়া বেড়াইতেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-লেখক।

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া লুসিটেনিয়া জাহাজে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথে জার্ম্মেনরা ঐ জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। তাহাতেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। যোগ্য পুত্রের এই আকস্মিক অপমৃত্যুতে চণ্ডীবাবু অত্যন্ত শোক পান। ইন্দুপ্রকাশ আমেরিকা

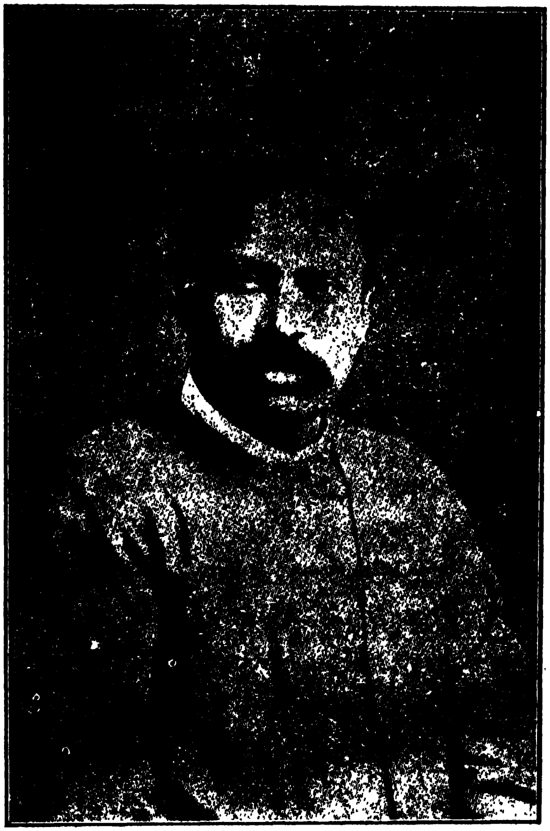
যাইবার পূর্ব্বেই সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী তাঁহার পিতামাতার শোকে সমবেদনা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর চণ্ডীবাবুর জামাতা বিজ্ঞানকলেজের অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ শেঠ গবর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন; কারণ জানা যায় নাই। ইহাতে তাঁহাদের পারিবারিক ক্লেশের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই নিরপরাধ জামাতা কেমন করিয়া মুক্তি পাইতে পারেন, সেই চেষ্টায় চণ্ডীবাবু ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ফিরিবার সময় ট্রাম গাড়িতে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যান, এবং তাঁহার দেহের উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহারও এইরূপে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পরিবারবর্গ যে কিরূপ শোক পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

চণ্ডীবাবু "মা ও ছেলে", "কমলকুমার", প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত-রচয়িতা বলিয়াই তিনি অধিক পরিচিত। ইহা বি-এ শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এইরূপ পুণ্য-শ্লোক পুরুষের জীবনচরিত লিখিবার সুযোগ অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। এ-বিষয়ে চণ্ডীবাবু ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার লিখিত জীবনচরিতের হিন্দী অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

চণ্ডীবাবুর বাগ্মিতা ছিল। তিনি মজলিশে বেশ গল্প জমাইতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিস্তর গল্প তিনি জানিতেন, এবং তাহা বলিতে তাঁহার খুব উৎসাহ ছিল।

পর্য্যটক পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস।

রাজা রামমোহন রায় ষোল বৎসর বয়সে হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিতে এই কথা লিখিত আছে; কিন্তু তাঁহার তিব্বত ভ্রমণের বিশেষ কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তিব্বত অজ্ঞাত দেশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। এই অজ্ঞাত দেশে গিয়া তাহার বৃত্তান্ত সভ্য সমাজে বিস্তারিত ভাবে প্রথম প্রকাশ করেন, একজন বাঙালী। তিনি রায় বাহাদুর



রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ঈ।

শরচ্চন্দ্র দাস, সী, আই, ঈ,। সম্প্রতি ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। ভৌগোলিক আবিষ্কার বড় বিপৎসঙ্কুল কাজ। ইহাতে শক্ত দেহ, শক্ত মন, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কৌশল, সবই দরকার। হিমালয়ের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া, যে-দেশের লোকেরা বিদেশীদিগকে বরাবর সন্দেহ করিয়া তাহাদের তিব্বত প্রবেশে বাধা দিয়া আসিতেছে, সেই দেশে ১৮৭৯ ও ১৮৮১ সালে দুই দুইবার গিয়া তথাকার রীতিনীতি ও ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া, পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া, তিনি যে ফিরিয়া আসেন, ইহা খুব বাহাদুরী। তাঁহার দুইবার তিব্বত-প্রবাসের বৃত্তান্ত ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া, রাজনৈতিক কারণে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত গোপনে রাখা হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে তাহা রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী দ্বারা

সম্পাদিত হইয়া ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিব্বতের ধর্ম্ম, জাতিতত্ত্ব (ethnology) এবং নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে বহুমূল্য তত্ত্ব নিবদ্ধ আছে। শরচ্চন্দ্র তিব্বত হইতে তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেক পুস্তক আনিয়াছিলেন। তন্মধ্যে খুব মূল্যবান গ্রন্থগুলি তিনি সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোন কোনটির সম্পাদনে তিনি তাঁহার বন্ধু উগোন্ গ্যাৎসো এবং অন্যান্য লামা (তিব্বতীয় পুরোহিত) দিগের সাহায্য পাইয়াছিলেন। তিনি একখানি তিব্বতী-ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে সিকিম ও তিব্বতসীমান্ত প্রদেশে যাত্রা করেন। পর বৎসর চীনদেশ দর্শন করেন। ১৮৮৭ সালে তিনি শ্যামদেশে গিয়া রাজবংশীয় বজ্রজ্ঞান বরোরসের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং শ্যামদেশের রাজা দ্বারা তুষিত-মত পদকে ভূষিত হন। তাঁহার ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য তিনি রয়্যাল জিও-গ্রাফিক্যাল সোসাইটী কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়ের জায়গীর, এবং রায় বাহাদুর ও সী, আই, ঈ, উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি গত বৎসর জাপান ভ্রমণ করেন, এবং তৎসম্বন্ধে মডার্ণ-রিভিউ কাগজে ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁহার তিব্বত-যাত্রার বৃত্তান্ত মডার্ণরিভিউ মাসিক পত্রে বহু সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একমাত্র অধ্যাপক।

বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সমগ্র বাংলা দেশে একমাত্র রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ, মহাশয়ই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাই নিশ্চয়ই মত। কেননা, উক্ত রায় সাহেব ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। এই সব বক্তৃতা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে আবার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে তিনি নিযুক্ত হন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামতনু লাহিড়ী গবেষণা-ফেলোশিপ্ (Ramtanu Lahiri Research Fellowship) স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া। এই ফেলোশিপের মাসিক বৃত্তি ২৫০৲ টাকা। "ফেলো"কে তাঁহার গবেষণার ফল বৎসরে বারটি বক্তৃতার আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হয়। ১৯১৩র ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ব্বোক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনই পাঁচ বৎসরের জন্য এই কাজে নিযুক্ত হন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস একা দীনেশ বাবুই জানেন, এবং তিনি এ-বিষয়ে সমস্ত জ্ঞানের আধার এবং এ-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অফুরন্ত, বাংলা-ভাষার ও সাহিত্যের সকল যুগেরই সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক ও অন্যবিধ জ্ঞান প্রত্যেক বাঙালী অপেক্ষা বেশী!

এই "ফেলো"র কর্ত্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট্সে (১৯১৩, ৭ম খণ্ড, ২৩৮১ পৃষ্ঠা) এইরূপ লিখিত আছে:—

(i) To devote himself to the investigation of the History of Bengali Language and Literature from the earliest times.

(ii) To deliver annually a course of twelve public lectures embodying the results of his investigations; the lectures to be published by the university.

(iii) To submit to the syndicate every six months a report of the progress of work done by him during the preceding six months. The Fellowship to be suspended if on the report of a competent authority the work be not found to be satisfactory or up to the standard expected.

দ্বিতীয় সর্ত্ত অনুসারে ফেলোর বক্তৃতাগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকাশ করিবার কথা। আমরা যতদূর জানি বিশ্ববিদ্যালয় এই কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। এক একটি বক্তৃতার দাম আড়াই শত টাকা। এরূপ বহুমূল্য জিনিষ মাঠে মারা যাওয়া কি ভাল? তৃতীয় সর্ত্ত অনুসারে ফেলোকে ছয়মাস অন্তর নিজের কাজ সম্বন্ধে রিপোর্ট দিবার কথা। আমরা যতদূর জানি দীনেশবাবু একটি বারও রিপোর্ট দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে দীনেশ

বাবুকে মাসে মাসে রিপোর্ট দিতে হইবে। তাহারই বা কি হইল, জানিতে চাই। তৃতীয় সর্ত্তে ইহাও আছে যে ফেলোর কাজ যদি উপযুক্ত ব্যক্তির মত অনুসারে সন্তোষকর বা আদর্শসই না হয়, তাহা হইলে ফেলোশিপ স্থগিত করা হইবে। আমরা যতদূর জানি দীনেশ বাবুর বক্তৃতা এরূপ কোন উপযুক্ত পরীক্ষকের বিচারাধীন করা হয় নাই। যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই বিচারক কে? তাঁহার যোগ্যতা কি? এবং তাঁহার রায়ই বা কি?

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা করিতে হইলে সংস্কৃত ছাড়া, এবং হিন্দী, বিহারী, ওড়িয়া, মরাঠী, ফারসী, আসামী প্রভৃতি ভাষার সহিত পরিচয় থাকা দরকার। তা ছাড়া ভাষাবিজ্ঞানে দখল থাকা চাই। এসব দিকে দীনেশ বাবু কতটা জ্ঞানবান্ বা কি পরিমাণে অজ্ঞ তাহা বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? তিনি যে যে কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া যোগ্য লোকদিগকে দরখাস্ত করিতে কেন বলা হয় না? গোপনে গোপনে কাজ সারিবার কারণ কি?

এই-প্রকারে বহু বৎসর ধরিয়া একই ব্যক্তিকে কোন-প্রকারে টাকা পাওয়াইয়া দেওয়াকে ইংরেজীতে বলে জবারি। দীনেশবাবু বাংলাভাষার ও সাহিত্যের কিছু জানেন না, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু একমাত্র তিনিই জানেন, তিনি সবই জানেন, নির্ভুল-রূপে জানেন, কোন যুগেরই কথা তাঁর চেয়ে বেশী কেহ জানেন না, এবং তাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, একথাও কিন্তু নিতান্ত আহাম্মক ভিন্ন কেহ বলিবে না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীনতম বাংলা সম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা ও প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার করিয়াছেন, দীনেশ বাবু সেরূপ করেন নাই। শাস্ত্রীমহাশয়কে কেন বিশ্ব-বিদ্যালয় একবারও নিযুক্ত করেন নাই? অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় দীনেশবাবু অপেক্ষা বহু ভারতীয় ভাষাবিৎ। তিনি বাংলা ভাষার ব্যকরণসমেত যেরূপ অভিধান একা রচনা করিয়াছেন, তাহা এক অসাধারণ কীর্ত্তি। তাঁহার জ্ঞানের আদর বিশ্ববিদ্যালয় কেন করিলেন না? শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইতিহাসে সুপণ্ডিত। বাং ভাষার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হই প্রাকৃতের নানা রূপের খবর রাখিতে হয়, হিন্দী ওড়ি প্রভৃতি ভাষা জানিতে হয়, বাংলা দেশের আগেক ইতিহাসটাও জানিতে হয়। এ-সব বিষয়ে বিজয় বা খুব পড়াশুনা আছে, এবং তিনি বেশ বিশদভাবে বক্ত করিতেও পারেন। তিনিও ত বাংলা ভাষা ও সাহি সম্বন্ধে নূতন কথা শিক্ষিত বাঙালীকে শুনাইতে পারিতেন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সুযোগ দিলেন না কেন? আর অনেকের নাম করা যাইতে পারে। যিনি যতবড় পণ্ডিত হউন, একজনের চেষ্টায় কখন কোন বিষয়ের সব ত উদ্ঘাটিত হইতে পারে না। প্রত্যেক যোগ্য লোব এক একটা বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিতে পারেন এবং বাংলা দেশে যোগ্য লোকের একান্ত অভাব হয় নাই

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র "The Advanc ment of Learning"; "The Advancement the Art of Adulation"ও নহে, কিম্বা "The A vancement of persona grata" ও নহে। সুতর সীণ্ডিকেটের যে-সব সভ্য ধামাধরা নহেন, তাঁহাদের দে উচিত যে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার সদ্ব্যয় হয়, এ যে কাজের যাহা সর্ত্ত তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়।

অবরুদ্ধ পুত্রের জন্য মাতার অনুরোধ।

আমরা নিম্নমুদ্রিত পত্রখানি প্রকাশার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

Bara dighi Squar
Noakhali
The 6th January 19

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার পুত্র শ্রীমান্ নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় বর্ত্তমান সময় তাহ মাতামহীর বাটী পুকুরদিয়া গ্রামে আবদ্ধ থাকিবার আদেশ পাইয়াছে বিগত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সে কামিং সাহেব বাহাদুরের নিব ইংরাজীতে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছে। তাহার অবিকল নব অদ্য আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনি দয়া-পরবশ হইয়া উ দরখাস্তখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে এই দরিদ্রা স্ত্রীলোকে বিশেষ উপকার হইবে। নিবেদন ইতি—

বিনীতা—
শ্রীমতী শশীমুখী গুহ রা

To

The Additional Secretary, Political Department,
Government of Bengal.

(Through the Superintendent of Police, Noakhali.)

The humble memorial of Nagendrakumar Guha Roy, Son of Tarini Charan Guha Roy at present interned in his mother's house at Pukurdia, Police Station Lakhmipur, District Noakhali, most respectfully showeth,

I. That your Honor's humble memorialist submitted a memorial to your Honor through the Superintendent of Police, Noakhali, on the 3rd October, 1916, in which he prayed for granting him an interview with the 'Judicial Officer' to whom His Excellency said in one of his speeches that all evidence were produced before the final order of internment and before whom he would clearly and finally explain his conduct. But your Honor's humble memorialist regrets to say that he has not yet been favoured with any reply to that memorial though it is now over two months.

II. That your Honor's humble memorialist has read with keen interest the interpellations made in the last meeting of the Bengal Legislative Council by some Hon'ble members concerning his internment and his attention has been drawn to a reply made on behalf of the Government by the Hon'ble Mr. Kerr, to a question put by the Hon'ble Babu Akhilchandra Dutta.

III. That the Hon'ble Mr. Kerr in reply to the question as to your Honor's petitioner's submitting an explanation said that an opportunity was given to your Honor's memorialist to submit an explanation and he took advantage of that opportunity. Your Honor's humble memorialist is at a loss to ascertain when and how and to whom he was given such opportunity of submitting an explanation. The memorial which he submitted on the 3rd October, 1916 to your Honor and in which he prayed for giving explanation before the 'Judicial Officer' has not been responded to by your Honor till to-day. In that memorial he stated that Mr. Bartley of the C. I. D. "Took down the antecedents of your Honor's memorialist and a short history of his past deeds and movements. Besides that he put before your Honor's memorialist lots of names of suspects wanting him to say whether he knew them".

IV. That your Honor's humble memorialist begs further to submit that save and except asking him the names of some suspects of Comilla, Calcutta and other places wanting him to say whether he knew them, Mr. Bartley did not give your Honor's memorialist the least hint or idea as to the allegations or charges made against him nor did he ask for any explanation from your Honor's memorialist in any form whatever. What your Honor's humble memorialist did was that he of his own accord in order to convince Mr. Bartley of his innocence, impossibility or improbability of joining the anarchist propaganda and of his abhorrence of anarchical crimes, explained his conduct, deeds and sentiments. But as he was kept quite in the dark as to the allegations made against him, such a general explanation which he gave of his own accord might not have covered the charges against him and it was rather futile for your Honor's memorialist to enter his defence without having the least knowledge of the charges or allegations made against him.

V. That your Honor's humble memorialist begs to claim his legitimate right as a loyal and peaceful British subject of His Majesty the King Emperor, of being allowed an opportunity of disproving the allegations or charges made against him, and fervently prays that your Honor would be graciously pleased to grant him the said right which he has not yet been till to-day.

VI. And for this act of kindness your Honor's memorialist shall as in duty bound ever pray.

Dated, Pukurdia
(P. S. Lakhmipur, Dt.
Noakhali)
The 15th December, 1916.

(Sd.) NAGENDRAKUMAR
GUHA ROY.

ইহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এই দরখাস্তের কি জবাব দিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়।

নিজ নিজ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী সমুদয় লোককে কি এইরূপ সুযোগ দিয়া থাকেন ?

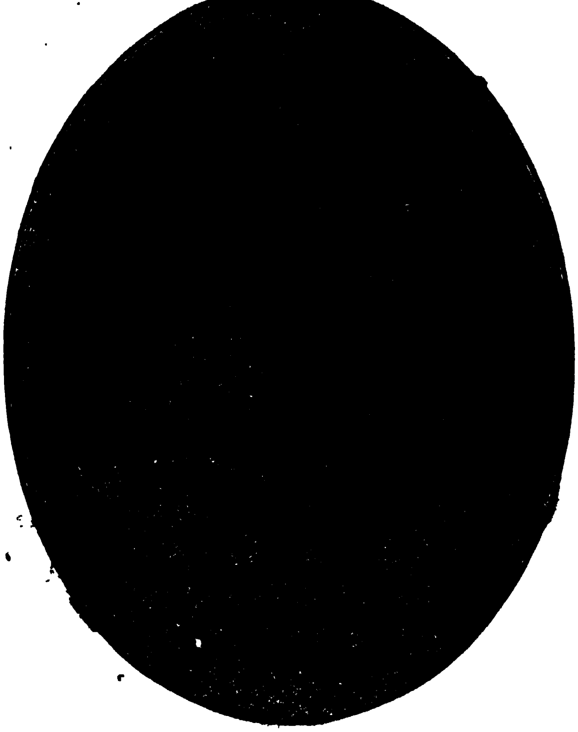
পৌষ মাস।

কথায় বলে, কারো পৌষ মাস, কারো বা সর্ব্বনাশ। পৌষ মাসে শস্য গৃহাগত হইত, অন্নাভাব থাকিত না, জ্বর ও অন্যান্য ব্যাধি থাকিত না, দেশে আনন্দের ঢেউ খেলিত। এই জন্য পৌষমাসের এত আদর। এই জন্য লোকে প্রার্থনা করিত,

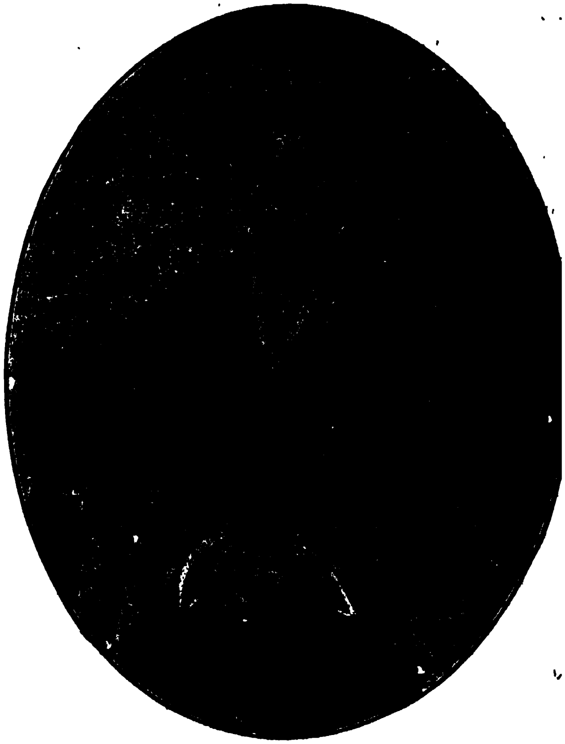
এসো পৌষ যেয়ো না,
জনম জনম ছেড়ো না,
যদি বা ছাড়বে তুমি,
পরাণে মরব আমি।

এখন পৌষেও লোকের অন্নাভাব যায় না, লোকে জ্বরের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। তথাপি, অন্নাভাব কতকটা ঘুচে, এবং পীড়াও অনেকটা কমে। সেইজন্য এখনও আমরা ঐ প্রার্থনা করিতে পারি। তা ছাড়া, এখন আর এক কারণে পৌষমাস আদরণীয় হইয়াছে। এই মাসে ভারতবর্ষের লোকেরা সমবেত হইয়া সকল বিষয়ে আপনাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে।

কংগ্রেসে সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতি ও ধর্ম্মের লোকের স্থান আছে। ইহাতে সমবেত হইয়া সকলেই রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে পারেন, দেশের



মাননীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার।



মাননীয় সীতানাথ রায়।

আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। এই প্রকারে শিল্পোন্নতি-পরামর্শ-সভায় ভারতবর্ষের সকল জাতি ও ধর্ম্মের লোক যোগ দিতে পারেন। মাদকব্যবহার-নিবারণের জন্য বৎসর বৎসর যে পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয়, তাহাতেও ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগ দিতে পারেন।

এসব ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বা ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোকদেরও অনেক পরামর্শ-সভা এই পৌষ মাসে হইয়া থাকে।

সকলেই চান মঙ্গল। ভাল কিসে হয়, সকলেরই সেই চেষ্টা। কিন্তু, কল্যাণ যে কি, এবং কি উপায়ে সাধিত হইতে পারে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, তাঁহাদের চেষ্টার দ্বারা মঙ্গল যে সাধিত হইতে পারে, এই আশা সকলেরই আছে। এই আশা না থাকিলে কেহ কোন-প্রকার সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিত না। সত্যের জয় হইবে, ন্যায়ের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গল যাহা তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এ-বিশ্বাস না থাকিলে সামান্য চেষ্টাও কেহ করিত না,—বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, দারিদ্র্য, কারাবাস, মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করা ত দূরের কথা। এই আশা ও বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে সব সময়ে সকল সংস্কার-প্রয়াসীর মনে থাকে না বটে; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই সকল শুভচেষ্টার মূলে এই আশা ও বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ধর্ম্মবিশ্বাস। ইহা আমাদিগকে বলে, যে, বিশ্ব মঙ্গল-নিয়মে শাসিত, বিশ্বের গতি মঙ্গলের দিকে। হিতসাধন করিতে যে চেষ্টিত, সমুদয় বিশ্বের শক্তি তাহার সহায়; অহিতসাধনে যে নিযুক্ত, বিশ্বশক্তি তাহার প্রতিকূল। এইজন্য দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র লোকের নেতৃত্বে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না, এই বিশ্বাসটা আমাদের মধ্যে খুব দৃঢ় হওয়া উচিত।

কংগ্রেস্ ও মস্‌লেম্ লীগ্।

এবার কংগ্রেস ও মস্‌লেম্ লীগের অধিবেশন লক্ষ্ণৌ শহরে হইয়াছিল। এবার উভয় সভার বিশেষত্ব এই যে উভয় সভারই সভাপতি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া ভারতবর্ষের স্বরাজ্য লাভের অনুকূলে মত প্রকাশ ও যুক্তি

প্রদর্শন করেন, এবং উভয় সভাতেই স্বরাজের অনুকূল প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হয়। এবারকার কংগ্রেসের বিশেষত্ব এই-যে সুরাটে গৃহবিবাদের পর এই অধিবেশনেই প্রথমে, আইনসঙ্গত আন্দোলনের পক্ষপাতী সকল দলের রাজনৈতিক একত্র সম্মিলিত হইয়া সম্মিলিত ভারতের দাবী সর্ব্বসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। কংগ্রেস ও মস্‌লেম্ লীগের সহযোগিতায় স্বরাজ-প্রার্থীদের ভারতশাসন-পদ্ধতির একটি খস্‌ড়াও প্রস্তুত হইয়াছে।

সকল প্রদেশের, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, সকল দলের দাবী এখন এক। এখন, যে-সব ইংরেজ স্বরাজবিরোধী তাহাদের বুলি প্রধানতঃ দুটি। প্রথম, "তোমরা এখনও স্বরাজের উপযুক্ত হও নাই।" তাহার উত্তর এই, যে, "মহাশয়দের মতে আমরা কোন কালেই স্বরাজের উপযুক্ত বিবেচিত হইব না; কারণ আমাদের যোগ্যতা স্বীকৃত হইলে মহাশয়দের প্রভুত্ব, বিশেষ অধিকার ও লাভের পথে কণ্টক রোপিত হইবে।" দ্বিতীয়, "তোমরা দেশের লোকদের নামে দাবী করিবার কে?" তাহার উত্তর, "আমরা যে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রতিনিধি নহি, তাহাদের অভাব আকাঙ্ক্ষা আমরা জানি না, তাহাদের নামে কোন দাবী আমরা করিতে পারি না, একথা বলিবার আপনারা কে? আপনাদের ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, চেহারা, জাতি, দেশ, সব আলাদা; আপনাদের কাছে দেশের লোকেরা কখন্ কি-প্রকারে জানাইল যে আমরা তাহাদের কেহ নহি?" বাস্তবিক যে-সব ইংরেজ স্বরাজ-বিরোধী, তাহাদের এই-সব কথার মত আস্পর্দ্ধার কথা, হাস্যকর কথা আর হইতে পারে না। আর একটা বুলি আছে, যে, যোদ্ধা জাতিরা শিক্ষিত লোকদিগকে মানিবে না। কিন্তু যোদ্ধা জাতিদের মধ্যেই যে শিক্ষিত লোক রহিয়াছে, তাহারাও যে কংগ্রেস ও মস্লেম লীগে উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবী করিতেছে। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করি, "মহাশয়েরা যে কথায় কথায় যোদ্ধা জাতিদের প্রতি এত দরদ দেখান, তাহাদের জন্য কি বিশেষ অধিকার মঞ্জুর করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। মহাসাহসী, রণকুশল, ভিক্টোরিয়া-ক্রশ-ভূষিত ভারতীয় সৈনিকরাও সৈন্যদলে লেফ্‌টেনেণ্ট হইতে পারে না, যাহা যুদ্ধে অনভিজ্ঞ অজাতশ্মশ্রু অনেক ছোক্‌রা ইংরেজ বরাবর হইয়া আসিতেছে। ইহাও জানাইতে চাই, যে, ভারতীয় সিপাহীরা তাহাদের স্বদেশ-বাসী শিক্ষিত লোকদিগকে খুব মান্য করে, ইহা আমরা অনেকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানি।" এখন ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ ও জাতি হইতেই সিপাহী লওয়ার রীতি ক্রমে ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং এ-আপত্তিটা করিবার উপায়ও অচিরে অন্তর্হিত হইবে। আরও অনেক বুলি আছে; তাহার উল্লেখ এখন করিব না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়লাটের বক্তৃতা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় বড়-লাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, তিনিও একসময়ে ১৮ বৎসর বয়সের ছিলেন, এবং ভবিষ্যতের মোহন স্বপ্ন দেখিতেন; সেইজন্য এদেশেও ঐরূপ স্বপ্নদর্শক যুবকদের সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি আছে। দুঃখের বিষয়, ইংরেজ যুবক নিরাপদে স্বপ্ন দেখিতে পারে, এবং নিরাপদে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টাও করিতে পারে, কিন্তু আমাদের ছেলেরা স্বপ্ন দেখিবার পর যদি সে-বিষয়ে পরস্পর কথা বলে, কিম্বা চিঠি লেখালেখি করে, কিম্বা স্বপ্নটা কেমন করিয়া বাস্তবে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা করে,—কাহারও গায়ে একটু আঁচড় দিবার কল্পনামাত্রও না করিয়া চেষ্টা করে,—তাহা হইলেও, তাহাদের অনেকে নানাবিধ সরকারী কর্ম্মচারীর সন্দেহ-ভাজন হয়, এবং অনেক সময় উৎপীড়িতও হয়। যে কয়েক শত যুবক নজরবন্দী ও অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই রকমের নিরপরাধ স্বপ্নদর্শক যুবক যে অনেক আছে, তাহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

বড়লাট বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন, এবং সেই গঠিত চরিত্র লইয়া রাষ্ট্রবাসীর কর্ত্তব্য (duties of citizenship) পালন। তিনি বলেন—As I look back to my university days, I believe even as undergraduates we dimly held by these two ideas—character and the responsibility of citizenship. "আমার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের কথা ভাবিলে মনে পড়ে যে আমরা বি-এ পাশ করিবার আগেও চরিত্র এবং রাষ্ট্রবাসীর (citizenএর) দায়িত্ব এই দুটি আইডিয়াকে হৃদয়ে পোষণ করিতাম।" আমাদের ছেলেরাও তাহা করিতে পারে। কিন্তু বড়লাট ইংরেজের ছেলে ও ভারত-বর্ষের ছেলেদের অবস্থার মধ্যে একটা মস্ত বড় প্রভেদ ভুলিয়া যাইতেছেন। আমরা রাষ্ট্রে বাস করি বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবাসীর অধিকার (citizenship) ত আমদের নাই। অধিকার এবং দায়িত্ব (right and responsibility) এই দুটি জিনিষের কথা একসঙ্গেই বলা উচিত। ইংরেজের ছেলেরা শুধু দায়িত্বের কথা ভাবিলেই চলে, কারণ অধিকার তাহার আছে। আমাদের ও আমাদের ছেলেদের কোন খাঁটি রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই; সুতরাং তাহাদের কাছে দায়িত্বের কথা বলিলে তাহাদের মনে উৎসাহ না বাড়িয়া অসন্তোষের বৃদ্ধি হয়। যাহার অধিকার নাই,

তাহারও অবশ্য দায়িত্ব আছে, অধিকার লাভের চেষ্টার দায়িত্ব আছে; কিন্তু যাঁহারা অধিকার দিতে রাজি নন্, তাঁহারা দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। আমরা আশা করিতে পারি কি যে বড়লাট যেমন দায়িত্ব চাপাইতে চান, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে অধিকারও দিতে চান?

চরিত্র বলিতে ইংরেজ নিজের দেশে যাহা বুঝেন, এই দেশেও কি ঠিক্ তাহাই বুঝেন? এখানকার বহু বহু সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজের কথায় ও কাজে ত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরেজের ছেলের character বা চরিত্র আছে বলিলে কেবল সে গোবেচারী ভালমানুষ, কাহারও মন্দ করে না, এরূপ বুঝায় না; নানারকম ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি তাহার আছে, এবং ভয়ে বা স্বার্থনাশের আশঙ্কায়, সে তাহা করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, ইহাও বুঝায়। সে যে নির্ম্মলস্বভাব তাহা বুঝায়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সত্যবাদিতা, স্পষ্টবাদিতা, সৎকর্ম্মে সাহস, স্বদেশপ্রেম, দুঃস্থলোকের সেবা করিবার জন্য স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্তি, নির্ভীকতা, দৃঢ়চিত্ততা, এই-রকম নানা পুরুষোচিত গুণও বুঝায়। আমাদের দেশে ইংরেজরা আমাদের ছেলেদিগকে গোবেচারী, ভালমানুষ, খুব বাধ্য দেখিতে চান। বাধ্যতা ও নির্দোষিতা অবশ্য সদ্‌গুণ; তাহার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না। কিন্তু সাহস ও স্বদেশপ্রেম দেখিলে অধিকাংশ ভারতপ্রবাসী ইংরেজ সন্দেহ করেন যে, গতিক বড় ভাল নয়। দুঃস্থ লোকের শিক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যাদিতে কেহ নিযুক্ত হইলে সে সন্দেহ-ভাজন হয়। বিলাতে মেরুদণ্ডটা সোজা করিয়া চলা দৃঢ়চিত্ততা ও চরিত্রবত্তার একটা লক্ষণ। ভারতপ্রবাসী বহুবহু ইংরেজের কাছে দেশী লোকের চরিত্রবত্তার একটা লক্ষণ বাঁকা মেরুদণ্ড।

চরিত্র বলিতে এই-সব ইংরেজ কি বুঝেন, তাহার একটা প্রমাণ দি। ইহা আমরা অনেকেই জানি যে কংগ্রেস ও প্রাদেশিক সমিতিতে রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া একটি ছেলেরও চরিত্র কলঙ্কিত হয় নাই; কিন্তু থিয়েটার গিয়া অনেকে খুব অসচ্চরিত্র হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রদিগকে, কংগ্রেসাদির বক্তৃতা না শুনিয়া, "খাঁটি নির্জ্জলা বিদ্যানুশীলনের হাওয়া"য় (atmosphere of pure studyতে) কালযাপন করিতে উপদেশ কতবার দেওয়া হইয়াছে, এবং তজ্জন্য নিয়মও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পতিতা অভিনেত্রী ও দুশ্চরিত্র অভিনেতার দ্বারা যে-সব থিয়েটারের হাওয়া দূষিত, সেখানে না যাইতে কখন কোন সরকারী ইংরেজ ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন কি? ছাত্রাণামধ্যয়নম্ তপঃ, ইহা আমরা মানি। কিন্তু যাহাতে বাস্তবিক ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে "খাঁটি-বিদ্যানুশীলনের হাওয়া" কেমন করিয়া খাঁটি থাকে, বুঝিতে পারি না। আমরা চাই যে আমাদের ছাত্রেরা তুষারের মত অতি শুভ্র, অতি পবিত্র, অতি নিষ্কলঙ্ক-স্বভাব হইবে; আমরা ইহাও চাই যে তাহারা সর্ব্বপ্রকার মানব-হিতকর কার্য্যে ত্যাগী বীর হইবে। বিদ্বেষ তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে না, প্রেম ও সেবা মূলমন্ত্র হইবে। এই মন্ত্রের সাধনে তাহারা কুসুমকোমল ও বজ্রকঠোর হইবে। মন্দ হইতে তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে বিরত থাকিবে, কিন্তু ভাল যাহা, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে দৃঢ়তার সহিত করিবে। ভারতবর্ষীয় যুবকদের চরিত্রের এই আদর্শ যে-সব ইংরেজ গ্রহণ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি।

বড়লাট, ওকালতী ছাড়া যুবকদের আরও নানা উপার্জ্জনের পথ যাহাতে খুলিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন। পথ যখন খুলিবে, আমরা তখন আনন্দিত হইব।

শিক্ষকতার কাজটিকে তিনি আরও গৌরবান্বিত করিতে চান্, এবং শিক্ষকদের বেতন বাড়াইতে চান। শিক্ষক মানে শুধু ইস্কুলের মাষ্টার, না কলেজের অধ্যাপকও? গবর্ণমেণ্ট-কলেজের মোটামোটা মাহিনার অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতাগুলিও যখন কেবলমাত্র গুণ অনুসারে যোগ্য-ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে, তখনই বড়লাটের কথা সার্থক হইবে। ইস্কুলের শিক্ষকদের বেতন বাড়ান খুব দরকার। কিন্তু শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যত টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইতেই যদি শিক্ষকদিগকে আরও বেশী বেতন দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাঁড়িবে কিরূপে, এবং দেশ হইতে অজ্ঞতা দূর হইবে কেমন করিয়া? অতএব, বড়লাটের কথার মানে যদি এই হয় যে, শিক্ষার বিস্তারের গতিও বাড়িবে, এবং শিক্ষকদের বেতনও বাড়িবে, তাহা হইলে আনন্দের বিষয়। আশা করি, তাঁহার কথা শিক্ষার বিস্তার রোধের কারণ হইবে না; এবং বেসরকারী দরিদ্র স্কুলগুলিকে কোন নির্দ্দিষ্ট উচ্চ হারে শিক্ষকদিগকে বেতন দিতে বাধ্য করা হইবে না।

বড়লাট উপাধিপ্রাপ্ত যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমাদের দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য তোমাদের উপর ডাক পড়িয়াছে। আমি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করিতেছি যে তোমাদিগকে সেই আহ্বানে সাড়া দিতে সমর্থ করিবার জন্য আমার সাধ্যে যাহা কুলায় তাহা আমি করিব।" এই প্রতিজ্ঞা যদি বড়লাট পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি চিরস্মরণীয় হইবেন, এবং দেশের খুব কল্যাণ হইবে। যে-সব যুবক বিনা বেতনে, কেবল হিতসাধনের জন্য, দরিদ্র অজ্ঞ লোক-

দিগকে শিক্ষা দিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে বিনা দোষে নজরবন্দী বা আবদ্ধ হইয়াছে, অনেক জায়গার শ্রমজীবী বিদ্যালয়গুলি যে পুলিশের উপদ্রবে উঠিয়া গিয়াছে, বড়লাট তাঁহার অঙ্গীকার পালনের প্রথম কিস্তি-স্বরূপ, এই-সব যুবকদের বিচার হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও উকীল জজদের দ্বারা করাইলে, এবং ঐ বিদ্যালয়গুলি চালাইবার বন্দোবস্ত করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।

বড়লাট বলিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া কি-প্রকারে ইহার উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় স্থির করিবার জন্য আগামী বৎসর শীতকালে একটি কমিশন বসিবে। কমিশনের সভ্যগণ নিযুক্ত হইবেন কেবল শিক্ষা-বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়া। বিলাত হইতে তিন জন বিশেষজ্ঞ আসিবেন। ভারতবর্ষ হইতে (ইংরেজ কি দেশী লোক, সরকারী বা বেসরকারী লোক তাহা উল্লিখিত হয় নাই) যাঁহারা সভ্য নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকেও শিক্ষা-বিষয়ে খুব যোগ্যতা দেখিয়া নিযুক্ত করা হইবে। শিক্ষা-বিষয়ক সমস্যাগুলি, কেবল শিক্ষাকে কেমন করিয়া খুব কার্য্যকর ও ফলপ্রসূ করা যায়, সেইদিক্ হইতে সমাধান করিবার চেষ্টা করা হইবে। ইহার মানে দুরকম হইতে পারে। (১) অনেক ইংরেজ রাজনৈতিক কারণে শিক্ষার বিস্তারকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ শিক্ষার প্রসার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক। এক অর্থ এই হইতে পারে যে বড়লাট এ দলের লোক নন, তিনি শিক্ষাকে একটা রাজনৈতিক বিপদ মনে করেন না। তাহা হইলে ভাল। (২) একদল লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষার উৎকর্ষসাধন, এ-দুটা পরস্পর বিরোধী; যদি দেশে খুব সরেস শিক্ষা চাও, তাহা হইলে বিস্তারের কথা ভাবিও না। সাধারণতঃ ভারত-প্রবাসী ইংরেজদের ঝোঁক সরেস ও ফলদায়ক (good and efficient) শিক্ষার উপর (যদিও আমাদের ধারণা এই যে ইহা শিক্ষার বিস্তার রোধ করিবার একটা ফন্দী মাত্র)। যদি বড়লাট এই-প্রকার অতি-সরেস ও অতি-ফলদায়ক শিক্ষার ভক্ত হন, এবং শিক্ষার বিস্তার তেমন আবশ্যক মনে না করেন, তাহা হইলে আমরা সুখী হইতে পারি না। আমরা দেখিতেছি, যে-যে দেশে শিক্ষা খুব সরেস, সেই-সেই দেশে শিক্ষার বিস্তারও খুব বেশী; আমরা দুই-ই চাই। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বরং শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত না হইলে, শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হইবার যোগ্যতম সব ছেলে-মেয়েকে শিক্ষালয়ে আনা গেল কি না, তাহাতে খুব সন্দেহ থাকে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি শিক্ষা না পায়, তাহা হইলে ইহা ধ্রুব সত্য যে যোগ্যতম বিস্তর লোক শিক্ষা পাইল না। দশ হাজার ছাত্রের মধ্যে যদি কুড়িটি খুব প্রতিভাশালী লোক পাওয়া যায়, এক লক্ষ ছাত্রের মধ্যে বাছিতে পাইলে যে সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশী ঐরূপ লোক পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং প্রথমোক্ত কুড়িটির চেয়ে তাহাদের কাহারো কাহারো প্রতিভাও যে বেশী হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষাকে খুব সরেস ও ফলদায়ক করিতে গিয়া যদি দুর্মূল্য করা হয়, তাহা হইলে আরও বিপদ্। সবদেশেই শিক্ষার বেশী ফল ফলে গরীবের ছেলেমেয়েদের হৃদয়মনে। তাহারাই যদি বাদ পড়িল, তাহা হইলে দেশের প্রতিভার স্ফুরণ কেমন করিয়া হইবে, এবং দেশের সমস্ত গৃহ হইতে অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত কি-প্রকারে হইবে?

বিলাতের বিশেষজ্ঞ তিন জন, ভারতবর্ষীয় অবস্থা-বিষয়ে বিশেষ-অজ্ঞ হইতে পারেন। এখানকার সভ্যগণও কিরূপ হইবেন জানিনা।

এইসব কারণে কমিশনটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ এই যে ভারতবর্ষের পাঁচটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু কলিকাতাটার উপরই কেন কমিশন বসান আবশ্যক বোধ হইল। ইহার দোষ ত্রুটি যাহা যাহা আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্য কোন ভারতবর্ষীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে অপকৃষ্ট শিক্ষা পায় না। অধিকন্তু, এখানে অন্য জায়গার চেয়ে উচ্চশিক্ষা দিবার আয়োজন ও তাহা পাইবার সুযোগ বেশী; সুতরাং শিক্ষা পায়ও অধিকতর ছাত্র। ইহার জন্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রশংসাভাজন। গবেষণা ও নূতন জ্ঞান সঞ্চয় এখানেই ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী হয়। আমরা জানি এই বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজদের চক্ষুশূল,—সম্ভবতঃ এইসব কারণেই। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ইহার হাজার ত্রুটি-সত্ত্বেও, ইহার মত উচ্চশিক্ষার স্থান পাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে। প্রমাণস্বরূপ এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক লীডারের মত উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হিন্দুস্থানীদের কাগজ। সম্পাদক মান্দ্রাজী। তিনি যে বাঙালীদের ভক্ত বা পক্ষপাতী, এরূপ বদনাম তাঁহার অতি-বড় শত্রুও করিতে পারিবে না। তিনি কি বলিতেছেন দেখুন—

We will make no concealment of our apprehension about the latter part of Lord Chelmsford's address. Why does he want a commission to investigate into the affairs of Calcutta University? 'We as the Government of India, have carefully considered the

situation with regard to the Calcutta University.' What is that situation, and what is there alarming or disquieting about it? How does it differ from the situation with regard to the other Indian University? From the Indian point of view there is a great deal that is wrong with all of them, and an independent commission which will give due weight to Indian national requirements and report without fear or favour will be welcomed. But such as they are the University whose whole policy calls for improvement vastly more than Calcutta is Allahabad. Such as the Indian Universities are at present, the least unsatisfactory is the Calcutta University, thanks to the wealth of talent it easily commands, its strong and fairly independent Senate, and the splendid work done by Sir Asutosh Mookerjee as Vice-Chancellor. At the same time it is true that the University which gives the least satisfaction to Anglo-Indian critics is also Calcutta. It has been evident for some considerable time that the Government of India are not quite happy over the affairs of that University. The Chancellor of another University nearer home has even gone the length of utilizing his Convocation address to cast a stone at it. What the Government of India's present ideas are on the constitution proper to an Indian University, we have been allowed to know in connection with the proposed Patna University. These all are circumstances which cannot be dismissed as irrelevant in an examination of the decision to appoint a commission of investigation. Has the University Senate itself been consulted regarding it? We are not aware that it has been. Nor is it a proposal that is put forward; it is a decision which has been announced. This amounts to a censure of the conduct of affairs by the Senate. Is there a justification for it? Not that we know. In the circumstances we must maintain that there is no case for a commission of investigation and we must regret the decision of his Excellency's Government. Of course it does not follow that we prejudge the work the commission will do. We shall rather be moved by the hope that its deliberations may bear good fruit—unlike those of many another commission.

ভারতবাসীর শিক্ষার নিন্দার উত্তর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, যে-সব ইংরেজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিন্দা করে, তাহাদের কথার উত্তর-স্বরূপ দুজন ইংরেজের মত উদ্ধৃত করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সার হেনরী মেনের মত এই:—

'It is not true, I am sorry to have to repeat this thing so many times, but it is not true, that the knowledge which is diffused under the influence of the University is either slight or superficial, except in the sense in which the proposition might be advanced of any university in any European country, and under the circumstances of India the very diffusion of even slight knowledge over such multitudes of minds would be a fact of the utmost importance and interest.'

যাহারা দেশী লোকদের শিক্ষার নিন্দা করে, তাহাদের বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সার হেনরী মেনের সন্দেহ ছিল। ডাক্তার জর্জ এডাম স্মিথ নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন:—

'It is surely unjust to sneer at the Hindu Bachelor of Arts because he neither speaks nor writes a foreign tongue with the grace and accuracy of one who learned it from his mother's lips. A little reflection and experience will convince those who are indifferent to a kind of progress with which they have no sympathy, that there is little or no intellectual inferiority on the part of Hindu graduates to the mass of Cambridge, Oxford or Scottish University men.'

পঞ্জাবেও ইংরেজীশিক্ষিত সিপাহী চাই।

পঞ্জাবের ছোট-লাট বাঙ্গালী ইংরেজীজানা সিপাহীদের উল্লেখ করিয়া পঞ্জাবের ইংরেজীশিক্ষিত ন্যূনকল্পে এণ্ট্রেন্স-পাসকরা লোকদিগকেও সিপাহী হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? বাংলা দেশের কোন সিপাহী আগে সৈন্যদলে ছিল না। যুদ্ধ করিতে জানার আবশ্যকতা শিক্ষিত বাঙালী বুঝে; সুতরাং সিপাহী হইবার সুযোগ পাইবার পর কতকগুলি বাঙালী যুবক সিপাহী হইয়াছে। পঞ্জাবের অবস্থা স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের অন্য যে-কোন প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাব হইতেই গবর্ণমেণ্ট বেশী সিপাহী পান। সমস্ত দেশী সৈন্যের অর্দ্ধেক পঞ্জাবী। যুদ্ধের সময় যত নূতন নূতন সিপাহী ভর্ত্তি হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক লাখের উপর পঞ্জাবী। সুতরাং পঞ্জাবী সিপাহী ছিল না বলিয়া শিক্ষিত লোকদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সিপাহী করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। একটা কারণ নিশ্চিত এই যে বাঙালী ইংরেজীজানা সিপাহীদের মধ্যে সেনানায়কেরা এমন কিছু দেখিয়াছেন, যাহাতে বুঝা গিয়াছে, যে, সাধারণ নিরক্ষর সিপাহী অপেক্ষা তাহারা শ্রেষ্ঠ। এইজন্য পঞ্জাব হইতেও এইরূপ শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর সিপাহী লওয়া হইতেছে। শিক্ষিত ভারতবাসীর শত্রু ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ও স্বীকার করিয়াছেন যে পঞ্জাবের ছোটলাট পরোক্ষভাবে, শিক্ষিত পঞ্জাবীদিগকে শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীদের প্রশংসাই করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয়। টাইম্‌স্ অভ্ ইণ্ডিয়া এই উপলক্ষে একটি খুব ন্যায্য কথা বলিয়াছেন। বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যখন সৈনিক হয়, তখন তাহারা জানে যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে তাহারা কমিশন (অর্থাৎ লেফ্‌টেনেণ্ট, কাপ্তেন, মেজর, প্রভৃতি সেনানায়কত্ব) পাইবে। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদিগকে যখন সিপাহী হইতে আহ্বান করা হইতেছে, তখন তাহাদিগকেও কমিশন পাইবার আশা দেওয়া উচিত। ঠিক কথা।

যদি ইংরেজীজানা রণদক্ষ সিপাহীদিগকে কমিশন

দেওয়া হয়, তাহাকে তাহা প্রাপ্তির আংশিক কারণ যে বাঙালী সিপাহীরা হইবে, ইহা সুখের বিষয়।

পঞ্জাবের শিক্ষিত যুবকদিগকে সিপাহী হইতে আহ্বান করিবার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। তাহা কতকটা রাজনৈতিক, কতকটা আর্থিক। এ পর্য্যন্ত খুব অল্প বাঙালীই সিপাহী হইয়াছে বটে, কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত বলিয়া তাহাদের একটা শ্রেষ্ঠতা অনিবার্য্য। সৈনিক বিভাগে প্রধানতঃ বাঙালীরই এরূপ শ্রেষ্ঠতা থাকা হয়ত বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই। দ্বিতীয় কথা এই যে বাঙালী সিপাহীরা শিক্ষিত বলিয়া, অনেক খবরের কাগজে তাহাদিগকে অধিক বেতন দিতে বলা হইয়াছে। ইহা ন্যায্য দাবী। অথচ বেতন সম্বন্ধে পার্থক্য করিলে অন্য সিপাহীরা অসন্তুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যদি অন্য প্রদেশ হইতেও, বিশেষতঃ বীরভূমি পঞ্জাব হইতেও, সাধারণ সিপাহীর বেতনে ইংরেজী শিক্ষিত সিপাহী পাওয়া যায়, তাহা হইলে শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীর জন্য বেশী বেতনের দাবীর আর তেমন জোর থাকিবে না। সরকার পক্ষ হইতে বেতনসমস্যার হয় ত এইরূপ সমাধান স্থির হইয়াছে। কিন্তু এ-সবই অনুমান এবং যে কারণেই পঞ্জাব হইতে ইংরেজীশিক্ষিত সিপাহী সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া থাকুক, তাহাতে আমাদের কোনই অসন্তোষের কারণ নাই। বরং ইহা একটা লাভ, যে, ষ্টেট্স্‌ম্যানের মত শত্রুপক্ষও একথা স্বীকার করিতেছেন, যে, পঞ্জাবের ছোটলাটের শিক্ষিতদের প্রতি আহ্বানে, ভারতবাসীদিগকে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে "লিপিকর" বা "কেরাণী" এবং "যোদ্ধা" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত, তাহা ভাঙিয়া গেল। ("Sir Michæl O' Dwyer's appeal breaks down the ancient division of Indians into "writers" and "fighters".")

উকীলের আত্মোৎসর্গ।

রাজসাহীর ২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক উকীল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্, মহাশয় গত ২৭শে ডিসেম্বর পদ্মানদী হইতে, নিমজ্জমান দুটি স্ত্রীলোকের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া নিজে প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক দুটিকে বাঁচাইয়াছেন, কিন্তু দুইহাতে দুজনের বোঝা বহিয়া তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং স্রোতের টানে পড়িয়া ডুবিয়া যান। এরূপ বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ চিরস্মরণীয় করা কর্ত্তব্য। যে ঘাটে এই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার নিকট যতীন্দ্রবাবুর কোনও উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন অবিলম্বে স্থাপিত হওয়া উচিত।

পৌষের পরামর্শসভাগুলি কি চান।

পৌষে কংগ্রেস্, মস্লেম লীগ প্রভৃতি, যে-সকল সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতিদের অভিভাষণে, নির্দ্ধারিত প্রস্তাবসকলে এবং বক্তাদের বক্তৃতায় কি কি সংস্কার, পরিবর্ত্তন, ও উন্নতি আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিল, কেহ যদি তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত ভারতবর্ষের লোকদের মনের গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা সমুদয় সভার বৃত্তান্ত, অভিভাষণ প্রভৃতি পাই নাই, দৈনিক কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাও সমস্ত সংগ্রহ করিতে এবং পড়িতে পারি নাই। সুতরাং এই আবশ্যক কাজটি করিবার চেষ্টাও আমরা করিতে পারিলাম না। কেবল কয়েকটিমাত্র সভার ব্যক্ত কয়েকটি আকাঙ্ক্ষার কথা লিখিতেছি।

সমাজ সংস্কার সভা, শিল্পোন্নতি সভা, মাদকসেবননিবারণ সভা, এসকলের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা সকলেই জানেন। অন্যান্য সভার কোন কোন আকাঙ্ক্ষার কথাই আমরা বলিব।

বঙ্গের সুবর্ণ বণিক সভা।

সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর বালক ও বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। বরপণ কুপ্রথা দূরীকরণ। উচ্চশিক্ষা লাভের পর যুবকদের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া। শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন।

ওড়িয়া ছাত্রদের পরামর্শ-সভা।

ছাত্রদের মাসিক পত্র, এবং নানা শিক্ষাকেন্দ্রে লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপন। বাল্যবিবাহ নিবারণ। বরপণ-আদায় নিবারণ। বিদেশে শিল্প শিক্ষার জন্য ছাত্র পাঠাইবার নিমিত্ত ফণ্ড স্থাপন।

সমগ্র ভারতের মুসলমান শিক্ষাসভা।

দেশ-মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রচলন।

ক্ষত্রিয়-উপকারিণী মহা সভা।

সভাপতি কাশ্মীরের মহারাজা। উচ্চশিক্ষার বিস্তার। বিবাহাদি শুভকর্ম্মে বাইনাচ বন্ধ করা। বরপণ প্রথা নিবারণ।

একলিপি-বিস্তার সভা।

সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষা ও নাগরী লিপির প্রচলনের চেষ্টা।

কায়স্থ সভা।

সভাপতি সার্ রাসবিহারী ঘোষ। নারীদের শিক্ষা। নারীদের অবরোধ-প্রথা এবং বাল্য বিবাহের উচ্ছেদ সাধন। কায়স্থদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে একত্র আহার ও বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলন।

ক্ষত্রী-সভা।

সভাপতি কাশ্মীরের মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর অমরনাথ। ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলন। বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ব্যয় সংক্ষেপ। শিক্ষা বিস্তার। বালিকাদের শিক্ষা। বাল্যবিবাহ নিবারণ। বালিকাদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ১৬, এবং বালকদের ২১ করা। শিক্ষাদান দ্বারা বিধবাদের অবস্থার উন্নতি সাধন।

সমগ্র ভারতের হিন্দুসভা।

সভাপতি মহীশূর ত্রিবাঙ্কুড় ও বড়োদার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত ভী, পী, মাধব রাও। সম্মিলিত পারিবারিক ও সামাজিক ভগবদারাধনা (ইহা খৃষ্টিয়ান, মুসলমান ও ব্রাহ্মদের মধ্যে চলিত আছে)। সমুদয় হিন্দু বালক-বালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন। প্রাথমিক শিক্ষা দেশে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি সাধন এবং তাহাদের সহিত এখনকার চেয়ে ভাল ব্যবহার করা। যাহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসী করিয়া হিন্দুসমাজে স্থানদান। হিন্দু বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদের যথোপযুক্ত যত্ন করা। বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ সাধন।

ছাত্রদের সম্মিলন-সভা (মান্দ্রাজ)।

সভাপতি সার্ সুব্রহ্মণ্য আইয়ার (হিন্দু, ব্রাহ্মণ)। কলেজের তত্ত্বাবধায়ক-সমিতিদিগকে অনুরোধ যে তাঁহারা ছাত্রদিগকে পিতামাতার ধর্ম্ম-অনুযায়ী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করুন। সাম্প্রদায়িক ছাত্রনিবাস ছাড়া, এরূপ একটি সার্ব্বজনিক ছাত্রনিবাস স্থাপন যেখানে ইচ্ছা করিলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে-কোন ছাত্র থাকিতে পারিবে। (এই প্রস্তাব প্রায় সকলের মত অনুসারে গৃহীত হয়।) ছাত্রদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ। ধূমপান নিষেধ। বাল্যবিবাহ নিবারণ। নারীদিগকে জাতীয় আদর্শ-অনুসারে দেশভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান।

ভাটিয়া-সভা।

ভাটিয়ারা বোম্বাই পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু বণিক জাতি। সভায় এইমত্ ব্যক্ত হয় যে সভা বিবাহের শাস্ত্রোক্ত আদর্শের দিকে অগ্রসর হউন; সেই আদর্শ অনুসারে কালে নারীর বিবাহের বয়স ১৮ ও পুরুষের ২৫ হইবে; কিন্তু আপাততঃ কন্যার বয়স যেন ১৪ এবং বরের ১৮র কম না হয়।

থিয়সফিক্যাল-সভা।

ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন। সকল ধর্ম্মের ঐক্য প্রচার। ঈশ্বরের সহিত যোগ উপলব্ধি। মানুষের কোন সৎ কাজই ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছেদ্য নহে। রাজনীতির উদ্দেশ্য দেশের মঙ্গল করা, অতএব ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির খুব সম্পর্ক আছে। আমাদিগের কেবল দেবমন্দিরে, মসজিদে, গির্জ্জায় ধার্ম্মিক হইলে চলিবে না, বাজারে, আদালতে, চিকিৎসা-কার্য্যে, যুদ্ধে, ব্যবসাতে, ধার্ম্মিক হইতে হইবে। ধর্ম্মকে সকল কাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে হইবে।

সমগ্র ভারতের দেশী খ্রীষ্টিয়ানদিগের সভায় জাতীয়ভাব।

এই সভার সভাপতি উৎকলের শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস মহাশয় তাঁহার অতি উৎকৃষ্ট অভিভাষণে বলেন যে, দেশী খৃষ্টিয়ানেরা, রাষ্ট্রীয় উন্নতিচেষ্টায় অন্য সমস্ত দেশীলোকদের সহিত সহানুভূতি দেখান না, ইহা সত্য নহে। তিনি আরও বলেন যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মানুষের জাতীয়ত্ব (nationality) পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। যে শিশু যে দেশে ও যে জাতির মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহার ধর্ম্ম যাহাই হউক, তাহার পূর্ব্বপুরুষদের সমুদয় জ্ঞানধর্ম্মসভ্যতার গৌরবের সে উত্তরাধিকারী। তিনি রামায়ণ মহাভারত, দ্রৌপদী ও সীতা, বানরদের সহিত রামের মিত্রতা, প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া দেখান যে সেকালে নারীর কিরূপ গৌরব ছিল, এবং ইহাও বলেন যে সেকালে অনার্য্য জাতিরা অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইত না। তাঁহার বংশের কোনও মহিলা "সতী" হইয়া স্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখ করিয়া বলেন, "তাঁহার রক্ত আমার শিরায় বহিতেছে, আমাকে সর্ব্বদা ধর্ম্মবিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে।"

দেশীখৃষ্টিয়ান সভায় মিঃ ডেভিড্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহার পঠিত এক প্রবন্ধে বলেন যে দেশীয়খৃষ্টিয়ানদের দেশী নাম থাকা উচিত নয়, খাঁটি বাইবেলীয় নাম রাখা উচিত; তাঁহাদের পোষাকও বিলাতী ফ্যাশনের হওয়া উচিত। সভাপতি মধুসূদন দাস মহাশয় বলেন, "খৃষ্টিয়ান বলিয়াই আমি মনে করি, আমার এরূপ কিছু করা কর্ত্তব্য নহে যাহাতে আমাকে আমার দেশে বিদেশীর মত দেখাইবে।" তার পর শ্রীযুক্ত চক্র চেট্টি বলিলেন যে দাস মহাশয় সভাস্থ সকলের মনের কথা বলিয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে মিঃ ডিভিডের প্রবন্ধটি সভার কার্য্যবিবরণে ছাপা হইবে কি না। ছাপা হইলে লোকে দেশী খৃষ্টিয়ানদের মনের ভাব ভুল বুঝিবে। যদি ছাপা হয়, তাহা হইলে ইহা লিখিয়া দিতে হইবে যে সভাস্থ অধিকাংশ লোকের মত মিঃ ডেভিডের বিপরীত। সভাপতি মহাশয় সভার মত জানিতে চাহিলেন। এক মিঃ ডেভিড ছাড়া আর সকলেই বলিলেন যে তাঁহার প্রবন্ধ ছাপা হওয়া উচিত নয়।

এই-প্রকারে দেশী ভাবের জয় হইল।



যে ফুল ফুটিল বারেক কুঞ্জ 'পরে !
ঝরে' গেল সে যে মরে' গেল চিরতরে। — ওমার খৈয়াম।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত আব্দর রহমান চুগতাই।

চিত্রাধিকারী শ্রীযুক্ত মির্জা গুলাম রসুল, কে-এস, পুলিস ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট (ফিরোজপুর) মহোদয়ের সৌজন্যে।

ইতিহাস

[বাঁকিপুর সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ]

প্রাচীন লীলার ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাজিয়া উঠে "বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।" যে পবিত্র ক্ষেত্রে আজ আমাদের এই সম্মিলন ও উৎসব, ইহাই যে বঙ্গ-সভ্যতার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের জন্মভূমি, তাহাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। মিথিলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগের যে প্রদেশ মহাভারতের সভাপর্ব্বে (সভা ৩০অ, ১) গোপালকক্ষ নাম পাইয়াছিল, বায়ু এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে প্রদেশ গোমন্ত বা গোবিন্দ জাতির আবাস বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল (মার্কণ্ডেয় ৫৭অ, ৪৪; বায়ু ৪৫অ, ১২৩), সেই প্রদেশের এক সময়ের গৌড়নাম আমাদের সমগ্র বঙ্গভূমির অতি আদরের ও গৌরবের নাম। মৎস্যপুরাণকার বলেন (১২অ, ৩০) যে রাজা শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; গৌড়বহো কাব্যে পাই যে কবির সময়ের মগধের অধিপতি ঐ গৌড়দেশ এবং মগধের অধীশ্বর ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল (৪১৩, ৪১৭, ৪১৮ ও ৪১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এল্‌বেরুনি দেখিয়া গিয়াছিলেন যে কুরুরাজ্যের থানেশ্বর পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে অলঙ্কৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমদিকে সে গৌড়দেশের প্রসারের কথা দূরে থাকুক, কুশনদীর কচ্ছ-প্রদেশেও প্রাচীন গৌড় নাম প্রচলিত নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সহজলভ্য গ্রন্থ পড়িয়া হয়ত বিদ্যালয়ের বালকেরাও শিখিয়াছেন যে যাঁহারা পাল রাজা নামে খ্যাত তাঁহারা মুখ্য ভাবে এই মগধাদিদেশেই বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য বিভাগ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া শাসন করিতেছিলেন। বাক্‌পতির সময়ের মত তখনও এই রাজাদের গৌরবের উপাধি ছিল গৌড়-মগধেশ্বর। নারায়ণ-পালের উত্তরাধিকারীরা যখন আদি গৌড় ও মগধ হারাইয়া বঙ্গের একটি উপবিভাগে আশ্রয় লইয়াছিলেন; তখন যে মিথিলা-মগধের জনস্রোত ও সভ্যতাস্রোত বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতেছিল, এবং সমগ্র বিহার প্রদেশ, রাষ্ট্রকূট, গুর্জ্জর প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মধ্য ভারতীয় জাতির বিশেষত্বে চিহ্নিত হইতেছিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। বলীর বংশের অর্থাৎ দ্রবিড় জাতীয় পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামে পরিচিত লোকেরা যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মগধের ভাষা, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তাহা অতি সুস্পষ্ট। মহীপাল যখন বরিন্দ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন লাভ করিয়াছিলেন, তখন মহানন্দার পশ্চিম পারে পূর্ব্বপুরুষদের আদিভূমিতে ক্ষমতা প্রসার করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু যাহা ভাঙ্গিয়াছিল তাহা গড়ে নাই। পাশ্চাত্য ও মধ্যদেশের প্রভুতায় বিহার পরিবর্ত্তিত হইল; দেশের লোক মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিল, ভিন্ন অক্ষর লিখিয়া ভিন্ন ভাষা শিখিল, ভোজনের সামগ্রীতেও পরিবর্ত্তন ঘটাইল। আর সমগ্র বাঙ্গলায় মগধের সভ্যতা ও গৌড়ী রীতি সুরক্ষিত হইয়া নূতন বিকাশ লাভ করিল। বিকাশের ধারাবাহিকতা বিচার করিলে আমরাই আজ বঙ্গদেশে প্রাচীন মগধের সভ্যতার বড় ভাগের উত্তরাধিকারী এবং আজ এই বিহার-প্রবাসে প্রাচীন বিহারের পরিস্ফুট প্রতিনিধি। তাই পরিবর্ত্তিত বিহারের লোকেরা আজ আমাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না, এবং আমরাও এই প্রাচীন লীলাভূমিতে দেশবাসীর সাড়া না পাইয়া প্রাচীন-স্মৃতি বহন করিয়া বলিতেছি—"বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।"

তবে এই উৎসবের নাটমন্দিরে যদি বিশ্বজনীয় নূতন সুর ভাঁজিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বাঁশরী আবার বাজিত; ভারতীর পূজার মণ্ডপে পুরোহিতেরা যদি বিশ্বজনীন নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সকলেই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিত। কেবল যে এ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাস গাঁথা পড়িয়াছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের সেকাল একালের সকল প্রদেশের ও সকল জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাসের অচ্ছেদ্য মিলন আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতায় যদি বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া তুলি, এবং ঐ দেশের মধ্যেই সকল প্রাচীনতা খুঁজিবার লোভে যদি কালিদাসকে নবদ্বীপে জন্ম লইতে বাধ্য করি, আর্য্য-

ভট্টের নাম হইতে ভাটপাড়ার উৎপত্তি মনে করি, সুন্দর-বনকে বেদের আরণ্যকভাগের জনিত্র বলি, এবং সর্ব্বশেষে বহরমপুরকে ব্রহ্মপুর করিয়া সেখানকার মাটি হইতে স্বয়ং ব্রহ্মার আদি পদ্মাসনের 'ফসিল্' তুলি, তাহা হইলে আওরংজেবের আমলের পালিস্-করা পাথর কিংবা নেপালী মালমস্লা আমাদের ইতিহাসের মন্দির গড়িবার সময় কাজে লাগিবে না, এবং আমাদের ক্ষুদ্র মন্দিরে কোন সার্ব্বভৌম পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আসিবেন না। "পাল" কথাটি যাঁহাদের নামে সমাসে যোড়া পাওয়া যায় বলিয়া যাঁহারা পাল নামে কীর্ত্তিত, তাঁহাদের প্রথম আমলের রাজাদের শরীর যদি খাঁটি বাঙ্গলার মাটির গড়ন না হয়, তাহা হইলে আমাদের ইতিহাসকে লজ্জায় মুখ ঢাকিতে হয় না। পিতৃপুরুষদের ঐতিহাসিক তর্পণে যদি বংশপ্রবর্ত্তক চল্লিশজন ঋষির নামের সঙ্গে সঙ্গে বলীর দ্রবিড়-মেলের পুত্রদিগকে স্মরণ না করি, তাহা হইলে কেবল ঐতিহাসিক সিদ্ধির গায়েই জল দেওয়া হইবে।

এখানে বড় বড় ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে আসি নাই,—ক্ষমতাও নাই। আমি ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের পুরোহিত নহি। কথাটা বিনয়ের অভিনয়ের জন্য বলি নাই; এখনও যে দেবীর মন্দির গড়া হয় নাই, সেখানকার কাজের জন্য কেহই এখনও পৌরোহিত্য পায় নাই। কেহ বা মাটি খুঁড়িতেছে, কেহ বা পাথর কুড়াইতেছে, কেহ বা দেশে দেশে বিবিধ জাতির লোকের কাছে উপযুক্ত মালমস্লার অনুসন্ধান করিতেছে। যাঁহারা গাড়ি গাড়ি মাল ঢোলাই করিতেছেন তাঁহাদের গাড়িতে কখন কখনও দুই একটুক্রা উপকরণ তুলিয়া দিয়াছি বলিয়াই আজ এই বৃহৎ উৎসবের দিনে আমার প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে; সেজন্য কৃতজ্ঞচিত্তে সকলকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। আজ এই সুবিধায় যাঁহারা ইতিহাসের উপাদানের ভার বহিতেছেন, এবং যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইতে চাহিতেছেন, বিশেষ ভাবে তাঁহাদের উদ্দেশে দুই চারিটি কথা বলিব। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা হইতে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পর্য্যন্ত আমাদের সকল মালগুদামে যে-সকল উপকরণ রক্ষিত হইতেছে, তাহা বাছাই করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ কারিগরেরা মন্দির গড়িবেন এবং খ্যাতি লাভ করিবেন; মন্দিরের ভবিষ্যৎ পুরোহিতেরা বিলক্ষণ দক্ষিণা পাইয়া সুখী হইবেন। সেই যশ এবং দক্ষিণা এখন লাভ করিবার জন্য যদি কোন ভারবাহক উৎকণ্ঠিত বা উৎসুক হয়েন, তবে তিনি আপনার কর্ত্তব্য করিতে পারিবেন না। সংগৃহীত পাথরের দুচারিখানি সাজাইয়া যদি কেহ ঘর গড়িয়াছেন ভাবেন, তবে তিনি বড়ই ভুল করিবেন। যে সাহিত্য চিত্ত-বিনোদনের জন্য, তাহার পাকা মন্দিরে চণ্ডিদাসের দিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া আসিতেছে, অনেক সুস্বাদু ভোগ নিবেদিত হইতেছে। যে ভোগের লোভে সে মন্দিরের দরজায় আমরা সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া থাকি; এমনকি ইয়োরোপ আমেরিকার লোকেরাও হাত পাতিয়া ভোগ লইয়াছে, এবং আমাদের একালের কবি পুরোহিতকে অনেক দক্ষিণা দিয়াছে। ইতিহাস লইয়া এত গৌরব লাভের দিন এখনও আসে নাই; সেদিন বহুদূরে। এখন ইতিহাসের নামে দেখিতে পাই যে চারিদিকের চালাঘরে কেবলই ইট পাথরের পালা, এবং কোথায়ও বা প্রত্নতত্ত্বের ঢেঁকিতে, ব্যাকরণের মুষলে খান কতক ইট ভাঙ্গিয়া সুরকি করা হইতেছে। যাঁহারা খ্যাতি ও দক্ষিণা চাহেন, এই কচকচির ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান নাই। যাঁহারা একথা বুঝিয়া-সুঝিয়া ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারবাহক হইতে চাহেন, তাঁহারাই নিষ্কাম ব্রত লইয়া আসুন।

এখানে খ্যাতিও নাই দক্ষিণাও নাই, বরং উল্টা একটুখানি নিগ্রহ লাভের সম্ভাবনা আছে। সত্যের কিছুমাত্র অপলাপ না করিয়া, যে ঘটনা ঠিক যাহা, তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে; উহাতে যদি চিরদিনের পোষা সংস্কারের গায়ে আঘাত লাগে, যদি আপনার দলের লোকেরা অন্যদলের লোকের কাছে উপহসিত হয়, যদি ইয়োরোপীয়দের চক্ষে ভারতের কোন রীতি বা অনুষ্ঠান অসুন্দর বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলেও অসঙ্কোচে সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। ইয়োরোপের বিজ্ঞান ও ইতিহাস-মন্দিরে বড় বড় পুরোহিতেরা অসঙ্কোচে প্রচার করিতেছেন যে দৈবাৎ যদি তাঁহাদের দেশের লোকের শরীরে আর্য্য নামক কোন জাতির রক্ত থাকে

তবে উহা ছিটেফোঁটার অধিক নহে; একটা নিগ্রোপ্রায় জাতির সহিত আল্পাইন জাতির সংস্রবে যে বেশীর ভাগ ইয়োরোপীয় জাতির উৎপত্তি, একথা সুস্পষ্ট স্বীকৃত হইতেছে। কেহ যদি সুপদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন যে সেকালের আর্য্যেরা এবং একালের আমরা খাঁটি কুলীন বংশেই জন্মিয়া আসিয়াছি, সে ত ভাল কথা। কিন্তু যদি একটু উল্টা কথা বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি আমরা সত্যকাম জাবালের মত নির্ভীক হইতে পারিব না? কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে আমি ইতিহাসের ধান ভানিতে আসিয়া নৃতত্ত্বের শিবের গীতের দৃষ্টান্ত দিতেছি কেন? নৃতত্ত্ব না হইলে যে ইতিহাস হয় না তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আর্য্য এবং আর্য্যেতর জাতি লইয়াই ভারতবর্ষ, এবং সংখ্যায় আর্য্যেতরেরাই অত্যন্ত অধিক। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের ভাষায়, ধর্ম্মে এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে যে আর্য্যেতর জাতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা আর্য্যেতর জাতির তথ্য না জানিলে কেহ ধরিতে পারিবেন না। বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে ও মিশ্রণে কেমন করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে এই জাতির শরীর, মন, প্রবৃত্তি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস, ভাষা ও সামাজিক অনুষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, সেই ইতিহাসই দেশের যথার্থ ইতিহাস। যথার্থ ইতিহাস কি তাহা ভুলিয়া যাই বলিয়াই যখন কোন প্রাচীন সময়ের একখানি ক্ষুদ্র দান-লিপিতে কোন একটি বিস্মৃত প্রদেশজয়ী রাজার একখানি গ্রামদানের বিবরণ পড়ি, তখন উহা হইতে ইতিহাসের কোন উপাদান না পাইলেও অনির্দ্দিষ্ট একজন প্রাচীন রাজার বীরত্ব, বদান্যতা প্রভৃতির বর্ণনায় শতাধিক পৃষ্ঠা লিখিবার উদ্যোগ করিয়া থাকি। একজন রাজা নিষ্ঠুর হইতে পারে, বা দয়ালু হইতে পারে, বা আর কিছু হইতে পারে; কিন্তু জাতি-সাধারণের অবস্থা বা চরিত্র বুঝিতে হইলে, দেশের লোকের ধাত বুঝিতে হইলে, তিন ছত্রের তাম্রফলকের লুপ্ত রাজার নাড়ি টিপিয়া কিছু বুঝিতে পারা যায় না। রাজাদের নামের তালিকা, ও দেশ জয়ের বিবরণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাহাতে লোক-সাধারণের কোন বিবরণের আভাস পাওয়া যায় না তাহা ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র উপাদান মাত্র। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে, হইবে এবং হওয়া উচিত। কিন্তু আর্য্যেতর জাতিসমূহের শরীর, ভাষা, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি সুমার্জ্জিত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মত পবিত্র, পূজ্য, এবং জ্ঞাতব্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়া চাই। নৃতত্ত্বই যে ইতিহাসের গোড়া, বিভিন্ন অবস্থায় লোক-সাধারণের পরিবর্ত্তনের বিবরণই যে যথার্থ ইতিহাস, ইয়োরোপেও তাহা অল্পদিন পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দের যে প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহার বশবর্ত্তী হইয়াই উঁহারা বলিতেন, এবং এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবর্ষে কখনও ইতিহাস লিখিত হয় নাই। নূতন ভাব লইয়া আমরা বলিতে পারি যে কোন দেশেই হয় নাই।

ইয়োরোপের অবস্থা ও প্রকৃতির ফলে সেখানে যাহা ছিল বা আছে, তাহা যদি আমাদের না থাকে, তবে যে-অবস্থার ফলে তাহা আমাদের নাই, তাহা বুঝিয়া লইয়া ভারতের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস বুঝিবার পথ পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটা গোঁজামিল দিয়া ইয়োরোপীয়দের কাছে একটা কাল্পনিক অবস্থা খাড়া করা চলে না। আন্তর্জাতিক বিবাদ মিটিয়া গেলে যেখানে সকলেরই মিলিত বংশধরেরা এক ঐতিহ্য মাথায় বহিয়া চলে, সেখানে বিবাদের দিনের দলবিশেষের গৌরবের কথা লইয়া এক-একটা বিশেষ বিশেষ জাতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ রচিত হইতে পারে না। বিদেশ হইতে শক, যবন, হুনেরা আসিয়া যখন একেবারে আমাদের সমাজশরীরে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিল, তখন বিশেষ ভাবে দ্বন্দ্বজনিত কোন এক পক্ষের গৌরবের কথা স্বতন্ত্র সাহিত্যে রক্ষিত হইয়া আদৃত হইতে পারে নাই। কোন প্রদেশেই এমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় নাই যাহাতে জাতিতে জাতিতে ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে পারিয়াছিল কিংবা ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইতে পারিয়াছিল। অতি-প্রাচীন গল্পে পড়ি যে নির্ব্বাসিত রাজপুত্র প্রচুর বললাভ করিয়াও প্রাচীন রাজ্য-লাভের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং বিপুলায়তন ভারতবর্ষের একটি স্থানের বা "অরণ্য ঠানে রজ্জম্ মাপেসসামি" বলিয়া নূতন রাজ্য গড়িয়াছেন,

তখন প্রাচীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। অনেক বুভুক্ষু জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিবার প্রচুর স্থান পাইয়াছিল এবং ভারতবাসী হইয়া গিয়াছিল। সেকালের সকলেই হিদেন ছিল বলিয়া পরস্পরের মিলনে বাধা হয় নাই। পরে যখন অন্য জাতির লোকেরা আসিলেন, এবং নূতন রকমের ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষত্বটুকু ষোল আনা বজায় রাখিবেন, তখনকার দ্বন্দ্বে ইয়োরোপীয় ধরণের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্ত দিব। যাঁহারা দ্রবিড় জাতীয়ের বঙ্গভূমিতে আর্য্য-সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের লোকদিগকে আর্য্য-আদর্শ লইবার জন্য কোন-প্রকার পীড়ন করেন নাই; দেশের লোক নূতনত্বের সৌন্দর্য্যে অথবা গৌরবে মুগ্ধ হইয়াই নূতন লোকদিগের মিত্র প্রতিবেশী হইয়াছিল, এবং গুণ এবং ক্ষমতা দেখিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্যই নূতনকে শ্রেষ্ঠ পদবী দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রসারের সময়েও কোনও উৎপীড়ন ঘটে নাই। ব্রাহ্মণদের নামে যতই দুর্ণাম থাকুক, তাঁহারা যাচিয়া যাচিয়া উচ্চশ্রেণীর দ্রবিড় জাতীয়দিগকে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য পুরোহিত দিয়াছিলেন, এবং শূদ্রবর্গের প্রসার বাড়াইয়া দিয়া শূদ্রের নবশাখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েরাও যাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া স্পর্শ করিত না, তাহাদিগকে ইঁহারাও স্পর্শ করেন নাই, অথবা দ্রবিড়ের কাছেও মান মর্য্যাদা রাখিতে হইলে স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে বাঙ্গালায় আর্য্য আগমনের কোন্ গৌরবের কথা সোৎসাহে ও সাগ্রহে পড়িবার মত ছিল যে সেই কথা লইয়া সেই সময়ের ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইবে? যত জ্ঞাতব্য বা শিক্ষাপ্রদ হউক না কেন, যাহাতে রক্ত গরম করিবার মত উদ্দীপনা নাই, তাহাকে কেহ যেন ইতিহাসই বলিতে চাহেন না। এ ভ্রান্তি না গেলে আমাদের ইতিহাস রচিত হইবে না। ভ্রান্তি যে ঘুচিতেছে, ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ যে চিহ্নিত হইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি; কাজেই আশায় ও আনন্দে বলিতে পারি যে আমাদের ইতিহাসের বিপুল ও সুন্দর মন্দির গড়িয়া উঠিবে, এবং সকল ভারবাহীর পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্লেটো—সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন

(মূল গ্রীক হইতে অনুবাদিত)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

২০। আমি যাহা বলিলাম, তোমাদিগের নিকটে তাহার অকাট্য প্রমাণ—বাক্যের প্রমাণ নয়, কিন্তু তোমরা যাহাকে আদর করিয়া থাক, সেই কার্য্যের প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। তবে শুন, আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে; তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, যে এমন একজনও নাই, যাহার নিকটে আমি মৃত্যু-ভয়ে অন্যায় কর্ম্ম করিতে সম্মত হইব; আমি বরং এমত আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অচিরাৎ মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিব। আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা আদালতের একটা চলিত কথা, কিন্তু কথাটা সত্য। হে আথীনীয়গণ, আমি এই পুরীতে আর কোনও পদ লাভ করি নাই, শুধু মন্ত্রণাসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তখন আমাদিগের আণ্টিঅখিস গোত্র অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল,—যখন, যে দশজন সেনাপতি আর্গিনুসাইর নৌযুদ্ধে স্বীয় সেনাদিগকে উদ্ধার করেন নাই, তোমরা অবৈধরূপে একযোগে তাহাদিগের বিচার করিতে চাহিয়াছিলে; কাজটি যে নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা পরবর্ত্তীকালে তোমরা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলে। সেই সময়ে অধিনায়কগণের মধ্যে আমি একাকী এই অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ ও ইহার বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়াছিলাম। বক্তারা তখন আমাকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং তোমরা চীৎকার করিতেছিলে ও আমাকে তোমাদিগের মতে মত দিতে আদেশ করিতেছিলে; কিন্তু আমি ভাবিয়াছিলাম, যে, কারাগার বা মৃত্যুর ভয়ে তোমাদিগের সহিত অন্যায় কার্য্যের প্রস্তাবে মত দেওয়া অপেক্ষা ন্যায় ও নিয়মের জন্য বিপদকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়ঃ। যখন নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই ঘটনা ঘটে। পরে যখন স্বল্পনায়কতন্ত্র (Oligarchy) স্থাপিত হয়, তখন ত্রিংশন্নায়ক আমাকে ও অপর চারিজনকে ভোজনাগারে ডাকিয়া পাঠাইয়া আদেশ করেন, যে, আমাদিগকে সালামিস হইতে সালামিস-বাসী লেওনকে আনয়ন করিতে

হইবে; অভিপ্রায় এই যে তাঁহারা তাহাকে হত্যা করিবেন। তাঁহারা অপর বহু লোককে এই-প্রকার অনেক আদেশ করিতেন; অভিসন্ধিটা এই ছিল, যে, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব বহুসংখ্যক লোক তাঁহাদিগের অপকর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়িবে। কিন্তু তখন আমি বাক্যে নয়, অপিচ কার্য্য-দ্বারা দেখাইয়াছিলাম, যে, আমি (একটা গ্রাম্য কথায় বলা যাইতে পারে) মৃত্যুকে এতটুকুও গ্রাহ্য করি না, কিন্তু অন্যায় ও অপবিত্র কার্য্যকে বিশ্ব-সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গ্রাহ্য করিয়া থাকি। সেই শাসনকর্তৃগণ এত ক্ষমতাশালী হইয়াও আমাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া এমত কাতর করিতে পারেন নাই, যে, আমি অন্যায় করিতে প্রবৃত্ত হইব; কিন্তু যখন আমরা মন্ত্রণাগার হইতে বাহির হইলাম, তখন ঐ চারিজন সালামিস যাইয়া লেওনকে লইয়া আসিলেন, আর আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। যদি ত্রিংশ-নায়কের শাসন অচিরে অবসান না হইত, তবে আমি হয় তো এই জন্য প্রাণ হারাইতাম। এই বিষয়ে তোমরা অনেকেই আমার সাক্ষী রহিয়াছ।

২১। এখন, তোমরা কি মনে কর, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতাম, সাধুজনের মত ন্যায়-ধর্ম্মের সহায়তা করিতাম, এবং সকলেরই যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি এই-প্রকার সহায়তা করা সর্ব্বোপরি শ্রেয়ঃ বলিয়া মানিয়া লইতাম, তবে আমি এত বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম? আথেন্সবাসিগণ, নিশ্চয়ই নয়; না, অন্য কোন লোকও পারিত না। কিন্তু আমি সারা জীবন, কি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, কি নিজের গৃহস্থালিতে, যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাতে তোমরা আমাকে এইরূপই দেখিতে পাইয়াছ, যে, আমি ন্যায়ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কখনও কাহারও নিকটে অবনত হই নাই; অপরের নিকটেও নহে; আর আমার নিন্দুকেরা যাহাদিগকে আমার শিষ্য বলিয়া অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, তাহাদিগের নিকটেও নহে। আমি কিন্তু কখনও কাহারও গুরু হইয়া বসি নাই। যদি কেহ আমার কথা ও আমার জীবনব্রতের বার্ত্তা শুনিতে চাহে, সে যুবকই হউক বা বৃদ্ধই হউক, আমি কখনও তাহাকে আমার সঙ্গলাভে বঞ্চিত করি না; আমি যে অর্থ পাইলে আলাপ করি ও অর্থ না পাইলে আলাপ করি না, তাহা নহে; কিন্তু আমি সমভাবে ধনী ও দরিদ্র সকলকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার দিয়াছি; এবং যে-কেহ আমার কথা শুনিতে ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়, আমি তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতে প্রস্তুত আছি। এইসকল লোকের মধ্যে যদি কেহ ভাল হয়, বা ভাল না হয়, তবে ন্যায়তঃ আমি তাহার কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারি না; কেননা, আমি কখনও কাহাকেও কোনও-প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, বা শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত ও হই নাই। যদি কেহ বলে, যে, সে কখনও আমার নিকটে কিছু শিক্ষা করিয়াছে, বা সে একাকী গোপনে আমার নিকটে এমন কিছু শুনিয়াছে, যাহা অপর সকলেই শুনে নাই, তবে তোমরা বেশ জানিও, যে, সে সত্য কথা বলিতেছে না।

২২। তবে কেন লোকে দীর্ঘকাল আমার সহবাসে যাপন করিয়া আনন্দ লাভ করে? আথীনীয়গণ, তোমরা তাহা শুনিয়াছ। আমি তোমাদিগকে সমস্তই সত্য বলিয়াছি। কারণটি এই, যে, যাহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু জ্ঞানী নয়, তাহাদিগকে আমি যে পরীক্ষা করি, তাহা শুনিয়া তাহারা আনন্দ সম্ভোগ করে; কেননা, ব্যাপারটা অমনোরম নয়। আমি বলিতেছি, যে, দৈববাণী, স্বপ্ন ও অন্য যত উপায়ে ঈশ্বরের বিধি মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়,—সর্ব্বপ্রকারেই ঈশ্বর আমাকে এই কার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। হে আথীনীয়গণ, ইহাই সত্য; সত্য কি না, তাহার পরীক্ষাও সহজ। কারণ, আমি ইতোমধ্যেই যুবকদিগের অনেককে বিপথগামী করিয়াছি ও অনেককে বিপথগামী করিতেছি, ইহা যদি সত্য হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝিতে পারিত, যে, আমি যৌবনকালে তাহাদিগকে অসদুপদেশ দিয়াছি; এবং তাহারা এক্ষণে বিচারালয়ে আসিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত ও প্রতিশোধ লইত। আর, যদি তাহারা এইরূপ করিতে অনিচ্ছুক হইত, তবে তাহাদিগের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেহ না কেহ—তাহাদিগের পিতা বা ভ্রাতা বা অপর কোনও স্বগণ—আমি যদি তাহাদিগের কোনও অনিষ্ট

করিতাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করিত ও প্রতিশোধ লইত। বস্তুতঃ তাহারা অনেকে এখানে উপস্থিত আছে, আমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। প্রথমতঃ আমার স্বগোত্র ও সমবয়সী, ক্রিটবৌলসের পিতা ক্রিটোন্ এখানে উপস্থিত; তৎপরে স্ফীট্টস-বাসী লুসানিয়াস্,—সে আইস্খিনিয়াসের পিতা; এবং এপিগেনীসের পিতা কীফিসস-বাসী আন্টিফোনও এখানে বর্ত্তমান। তারপর এখানে এমন অনেকে উপস্থিত আছে, যাহাদিগের ভ্রাতারা আমার সহবাসে কালযাপন করিয়াছে। থেয়জটিডসের পুত্র, থেয়ডটসের ভ্রাতা নিকস্ট্রাটস্—থেয়ডটসের মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং সে অবশ্যই নিকস্ট্রাটসকে নীরব থাকিতে উপরোধ করে নাই—এবং ডীমডকসের পুত্র এই পারালস; থেয়াগীস তাহার ভ্রাতা ছিল; এবং আরিষ্টোনের পুত্র এই আডাই-মাণ্টস; তাহার ভ্রাতা প্লাটোন্ (Plato) এখানে উপস্থিত; এবং আইআণ্টাডোরস; তাহার ভ্রাতা এই আপল্লডোরস। আমি তোমাদিগের নিকটে আরও অনেকের নাম করিতে পারিতাম। মেলীটসের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল, যে, নিজের বক্তৃতার কালে সে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য আহ্বান করে। কিন্তু তখন যদি সে আহ্বান করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকে, এখন আহ্বান করুক; আমি মঞ্চ হইতে অবতরণ করিতেছি; সে বলুক, তাহার এমত সাক্ষ্য কিছু আছে কি না। কিন্তু হে বন্ধুগণ, তোমরা দেখিতে পাইবে, যে, প্রকৃত কথা ইহার সর্ব্বৈব বিপরীত; মেলীটস ও আন্যুটসের কথানুসারে আমি যাহাদিগের আত্মীয়গণকে উন্মার্গগামী করিয়া তাহাদিগের অকল্যাণ সাধন করিতেছি, তাহারাই এই অসৎপথপ্রদর্শক, অহিতাচারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। যাহারা আমার প্ররোচনায় বিপথগামী হইয়াছে, তাহারা যে আমার সাহায্য করিতে চাহিবে, তাহার বরং সঙ্গত কারণ আছে; কিন্তু যাহারা বিপথগামী হয় নাই, যাহারা এখন পরিণতবয়স্ক পুরুষ, তাহাদিগের সেই স্বজনবর্গ যে আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, সত্য ও ন্যায় ভিন্ন—তাহারা জানে, যে, মেলীটস্ মিথ্যাবাদী, এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই সত্য—ইহা ভিন্ন, তাহার আর কি কারণ থাকিতে পারে?

২৩। যাক্, বন্ধুগণ। আত্মসমর্থনের জন্য আমার যাহা বলিবার আছে, এই কথাগুলি ও হয় তো এই-প্রকার অন্যান্য কথাই তাহার প্রায় সব। তোমাদিগের মধ্যে কেহ হয় তো আপনার ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছ। সে নিজে আমার অপেক্ষা একটা তুচ্ছতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকালে অবিরল অশ্রু মোচন করিতে করিতে বিচারকগণকে কত কাকুতি মিনতি করিয়া মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছে; এবং আপনার সন্তানসন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এবং বহু বন্ধুবান্ধবকে বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের গভীর অনুকম্পার উদ্রেক করিতে প্রয়াসী হইয়াছে; আর আমি, সে যাহাকে চরম বিপত্তি বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাতে পতিত হইয়াও এ-সকলের কিছুই করিতেছি না। ইহা দেখিয়া সে হয় তো আমার প্রতি কঠোর-হৃদয় হইয়া উঠিয়াছে, হয় তো ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে ক্রোধের বশীভূত হইয়াই স্বীয় মত জ্ঞাপন করিবে। যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে—'যদি' বলিলাম এই জন্য, যে, তাহার এমত হওয়া উচিত নহে—যদিই বা এমত কেহ থাকে, তবে আমার বোধ হয় আমি তাহাকে সঙ্গতরূপেই এই কথা বলিতে পারি—"ওহে পুরুষোত্তম, আমারও আত্মীয়স্বগণ আছে, কেননা, হোমরের কথায় বলিতে পারি, 'আমিও বৃক্ষ বা প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হই নাই,' কিন্তু আমি মানুষ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি;" সুতরাং হে আথীনীয় নরগণ, আমারও আত্মীয়স্বজন ও তিনটি পুত্র আছে; একটি এখনও কিশোরবয়স্ক, অপর দুইটি শিশু। কিন্তু তথাপি আমি তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া তোমাদিগের নিকটে মুক্তি ভিক্ষা করিব না। কেন আমি এই-প্রকার কিছুই করিব না? হে আথীনীয়গণ, আমি যে গর্ব্বভরে কিংবা তোমাদিগকে অসম্মান করিবার উদ্দেশে এই-প্রকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহা নহে; আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পারি কি না, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আমার ও তোমাদিগের ও সমগ্র পুরীর সুনামের জন্য আমার ইহা শোভন বলিয়া বোধ হইতেছে না, যে, আমি এই বয়সে এবং এমন নাম থাকিতেও—সে নাম সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক—এই-প্রকার কাজ করিতে যাইব। লোকে অন্ততঃ সিদ্ধান্ত

করিয়া রাখিয়াছে, যে, সোক্রাটীস ও জনসাধারণের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে কিংবা মনুষ্যত্বে কিংবা ঈদৃশ অন্য কোনও গুণে, বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত, তাহারা যদি এই-প্রকার আচরণ করে, তবে তাহা লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে। আমি বহুবার কত বিশিষ্ট লোককে এই-প্রকার আচরণ করিতে দেখিয়াছি; যখন তাহাদিগের বিচার উপস্থিত, তখন মনে হয় যে তাহারা কি অদ্ভুত ব্যবহারই করিতেছে; তাহারা যেন ভাবিতেছে যে যদি তাহারা মরে, তবে কি ভীষণ দশাতেই পতিত হইবে—যেন তোমরা যদি তাহাদিগকে বধ না কর, তবেই তাহারা অমর হইবে। আমার মনে হয়, যে, এই লোকগুলি পুরীর উপরে কলঙ্ক আনয়ন করে; কেননা, কোনও বিদেশী ইহা দেখিয়া ভাবিতে পারে, যে, আথীনীয়গণের মধ্যে যাহারা গুণগ্রামে বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাহাদিগকে তাহারা শাসনকার্য্যে ও অন্যান্য সম্মানার্হ পদে নির্ব্বাচন করে, তাহারা স্ত্রীলোক অপেক্ষা একটুকুও শ্রেষ্ঠ নহে। হে আথীনীয়গণ, তোমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিন্দুমাত্রও খ্যাতি আছে, তাহাদিগের এরূপ করা কর্ত্তব্য নহে; যদি আমরা এরূপ করিতে চাই, তাহা করিতে দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু তোমাদিগের ইহাই প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য যে, যে ব্যক্তি বিচারালয়ে এই-প্রকার করুণরসের অভিনয় করে ও তদ্দ্বারা পুরীকে উপহাস-ভাজন করিয়া তুলে, তাহার প্রতিই, যে এ-সকলের কিছুই না করিয়া একেবারে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকে, তাহার অপেক্ষা, তোমরা অনেক অধিক নির্দ্দয়।

২৪। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, খ্যাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিচারকের চরণে কাকুতি মিনতি করা কিংবা তাঁহার অনুকম্পার উদ্রেক করিয়া মুক্তি-ভিক্ষা করা আমার নিকটে ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; বরং তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত জানাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। বিচারক এই নিয়মে বিচারকের আসনে উপবেশন করেন নাই, যে, যাহারা তাঁহার অনুগ্রহভাজন, তিনি শুধু তাহাদিগকে ন্যায় বিধান করিবেন; কিন্তু তিনি সমুদায় বিচার করিবেন; তিনি এই শপথ করিয়াছেন, যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ বিতরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু নিয়মানুসারে সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা করিবেন। সুতরাং আমাদিগের কর্ত্তব্য নয়, যে, আমরা তোমাদিগকে শপথ লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দিব, তোমাদিগেরও উচিত নয়, যে, তোমরা এমন শিক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, উহা আমাদিগের উভয়পক্ষের কাহারও পক্ষেই ধর্ম্মাচরণ হইবে না। অতএব, হে আথীনীয়গণ, তোমাদিগের সম্মুখে এরূপ আচরণ করিতে আমাকে আদেশ করিও না; আমি তাহা শোভন বা ন্যায্য বা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না, বিশেষতঃ মনে রাখিও, আজ মেলীটস্ আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্মাচরণের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে—আজ আমাকে এমন আদেশ করিও না। কারণ, যদি আমি তোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হই, এবং মিনতিদ্বারা জয়লাভ করিয়া তোমাদিগকে শপথভঙ্গ করাইতে পারি, তাহা হইলে আমি স্পষ্টই তোমাদিগকে এই শিক্ষা দিব, যে, তোমরা দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিও না; এবং তাহা হইলে আমি আমার আত্মসমর্থনের দ্বারাই জাজ্বল্যমান এই অভিযোগ প্রমাণিত করিব, যে, আমি দেবতায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাহা একেবারেই সত্য নহে, কেননা, হে আথীনীয়গণ, আমি যেমন দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, আমার অভিযোক্তারা কেহই তেমন করে না। আমি আমার বিচারভার তোমাদিগকে ও ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছি; আমার ও তোমাদিগের পক্ষে যাহা সর্ব্বোত্তম, তাহাই বিহিত হউক।

(পাঁচশত একজন বিচারকের মধ্যে ২৮১ জন এই মত প্রকাশ করিলেন যে সোক্রাটীস অপরাধী, ২২০ জন বলিলেন, তিনি নির্দ্দোষ।)

২৫। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা যে আমাকে অপরাধী স্থির করিলে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই; না হইবার অনেক কারণ আছে; একটি কারণ এই, যে, তোমরা যে এই প্রকার করিবে, তাহা আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত নয়; আমি বরং উভয় পক্ষের মত-সংখ্যা দেখিয়াই অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি; কেননা, আমি কখনও ভাবি নাই, যে, দুই পক্ষের সংখ্যার পার্থক্য এত অল্প হইবে; আমি ভাবিয়াছিলাম যে উহা অনেক অধিক হইবে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যে, যদি কেবল ত্রিশজন অপর পক্ষে মত

দিত, তবেই আমি মুক্তি লাভ করিতাম। সুতরাং আমার বোধ হইতেছে, যে, আমি এখন মেলীটসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি; শুধু নিষ্কৃতি পাইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু অতি সুস্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, যদি আন্যুটস ও ল্যাকোন আমার অভিযোক্তা হইয়া উপস্থিত না হইত, তবে সে এক পঞ্চমাংশ মতও পাইত না, সুতরাং তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা দণ্ড দিতে হইত।

২৬। সে তবে আমার প্রাণদণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে। বেশ; আমি তাহা হইলে, হে আথীনীয়গণ, উহার স্থলে কোন্ দণ্ডের প্রস্তাব করিব? অথবা ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, আমি যাহার উপযুক্ত, তাহাই প্রস্তাব করিব? আমি যে এমন কুশিক্ষা পাইয়াছিলাম, যে, নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবন যাপন করি নাই, তজ্জন্য আমি কিরূপ দণ্ডের উপযুক্ত হইয়াছি? অর্থদণ্ড, না কারাবাস, না নির্ব্বাসন, না মৃত্যু? সাধারণ লোকে যাহা মূল্যবান্ জ্ঞান করে—অর্থ, পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি, সেনাপতিত্ব, জনসভায় বাক্‌পটুতা এবং অন্যান্য রাজপুরুষপদ, সমিতি ও দলাদলি, এই নগরে যাহা সর্ব্বদাই গঠিত হইতেছে—আমি সে সমুদায়ই উপেক্ষা করিয়াছি; কারণ, আমি ভাবিয়াছিলাম, যে, আমি যেরূপ ধর্ম্মভীরু, তাহাতে এই-সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইলে আমার আর রক্ষা থাকিবে না; সুতরাং আমি এমনস্থলে যাই নাই, যেখানে যাইয়া আমি তোমাদিগের কিংবা আমার কোনই উপকার করিতে পারিব না; আমি বলি, যে, আমি তৎপরিবর্ত্তে সেইখানেই গিয়াছি, যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে আমি প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া তোমাদিগের মহোপকার সাধন করিয়াছি; আমি তোমাদিগের প্রত্যেককে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি, যে, তোমরা প্রথমেই নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য শ্রম করিও না; কিন্তু তোমরা কিরূপে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে পূর্ণতা লাভ করিবে, পূর্ব্বে তাহারই জন্য যত্নবান্ হও; তোমরা এই পুরীর সম্বন্ধে ভাবিবার পূর্ব্বে পুরীর কোনও বিষয় সম্বন্ধে ভাবিও না; অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তোমরা এই পন্থারই অনুসরণ করিও। এই-প্রকার জীবন যাপন করিয়া আমি কোন্ দণ্ড ভোগ্ করিবার উপযুক্ত হইয়াছি? হে আথীনীয়গণ, যদি সত্য সত্যই আমাকে আমার উপযুক্ততানুরূপ দণ্ডের প্রস্তাব করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, আমি কোনও সুখসেব্য দণ্ডেরই উপযুক্ত সে দণ্ড এমন কোনও হিতকর বস্তু হইবে, যাহা আমার পক্ষে উপযোগী। তবে, যে হিতকামী দরিদ্র ব্যক্তি তোমাদিগকে উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে অবসর কামনা করে তাহার পক্ষে কি উপযোগী? হে আথীনীয়গণ, সাধারণ ভোজনাগারে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা অপেক্ষা এমন ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই। অলুম্পিয় উৎসবে তোমাদিগের মধ্যে যে অশ্বধাবনে কিংবা অশ্বযুগসহ রথ্যপরিচালনে জয়লাভ করিয়াছে, তাহার অপেক্ষাও এই ব্যবস্থা ঐ ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কেননা, শেষোক্ত ব্যক্তি তোমাদিগকে সুখী বলিয়া কল্পনা করিতে সমর্থ করে, আর আমি তোমাদিগকে সুখী হইতে শিক্ষা দিই; এবং তাহার আহারের অভাব নাই, কিন্তু আমার আছে অতএব আমি ন্যায়তঃ যে-প্রকার দণ্ডের উপযুক্ত, আমাকে যদি তাহাই প্রস্তাব করিতে হয়, তবে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে তোমরা সাধারণ ভোজনাগারে আমার আহারের ব্যবস্থা কর।

২৭। আমি অনুকম্পা উদ্রেকের প্রয়াস ও মিনতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তোমরা যেমন আমাকে গর্ব্বিত ভাবিয়াছিলে, এখনও হয় তো আমি এই-প্রকার বলিতেছি বলিয়া তোমরা আমাকে তাহাই মনে করিতেছ। কিন্তু, হে আথীনীয়গণ, তাহা সত্য নহে; প্রকৃত কথাটা বরং এই—আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও মানুষের প্রতিই অন্যায়াচরণ করি নাই; কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহা বুঝাইতে পারি নাই, কেননা, আমরা অল্পকাল পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, যে, যেমন অন্যান্য জনসমাজে নিয়ম আছে, তেমনি যদি আমাদিগের মধ্যে এই নিয়ম থাকিত যে, যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার বিচার কেবল একদিনেই শেষ হইবে না, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু এখন এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার বিষম অপবাদ দূর করা সহজ নহে। কিন্তু আমার যখন এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, যে, আমি কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করি নাই, তখন আমি কখনই নিজের প্রতিও অন্যায়াচরণ করিব না; আমি

নিজের মুখে কখনই বলিব না, যে, আমি অকল্যাণকর দণ্ডের উপযুক্ত; সুতরাং আমি কেন আমার প্রতি এমনতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে বলিব? মেলীটস যে দণ্ডের প্রস্তাব করিয়াছে, আমাকে বা সেই দণ্ড ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে? আমি তো জানি না, তাহা আমার পক্ষে ভাল না মন্দ? তাহার স্থলে আমি এমন কোনও দণ্ড আদর করিয়া গ্রহণ করিব, যাহা, আমি বেশ জানি, সকলের পক্ষেই অশুভ? আমি তাহাই প্রস্তাব করিব? কারাবাস? প্রতি বৎসর যে এগারজন কারাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আমি কেন তাঁহাদিগের দাস হইয়া কারাগারে জীবন যাপন করিতে যাইব? না আমি এই প্রস্তাব করিব, যে, আমার অর্থদণ্ড হউক এবং যতদিন উহা না প্রদত্ত হয়, ততদিন আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিব? কিন্তু আমি এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি, কেন আমি এমত প্রস্তাব করিব না, কেননা, দণ্ড দিতে পারি, আমার এত অর্থই নাই। তবে কি আমি নির্ব্বাসনের প্রস্তাব করিব? তোমরা হয় তো আমাকে এইরূপ দণ্ড দিতে সম্মত হইবে। কিন্তু আমি যদি এতই মূর্খ হই যে এ কথাটাও বুঝিতে পারি না, যে, তোমরা আমার একই পুরবাসী হইয়াও আমার কথাবার্ত্তা ও যুক্তি তর্ক সহিতে পারিলে না, প্রত্যুত সেগুলি তোমাদিগের পক্ষে এমনই ভারবহ ও বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিল, যে, তোমরা এক্ষণে তাহা হইতে মুক্তি অন্বেষণ করিতেছ; আর অন্য দেশের লোক সেগুলি অক্লেশেই সহ্য করিবে—তাহা হইলে তো আমার জীবনের প্রতি আসক্তি একান্তই প্রবল। না, আথীনীয়গণ, তাহা কখনও হইতে পারে না। আমি যদি এই বয়সে এই পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াই এবং স্থান হইতে স্থানান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়া জীবন যাপন করি, তবে সে জীবন আমার পক্ষে মধুরই হইবে বটে! কারণ, আমি বেশ জানি, যে, আমি যেখানেই যাই না কেন, এখানকার মত সর্ব্বত্রই যুবকেরা আমার কথা শুনিবে। এবং যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিই, তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠগণকে বলিয়া আমাকে নির্ব্বাসিত করিবে; আর, যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া না দিই, তাহা হইলে তাহাদিগের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিবে।

২৮। এখন, কেহ হয় তো বলিবে, "ওহে সোক্রাটীস, তুমি কি আমাদিগের পুরী হইতে প্রস্থান করিয়া নীরব ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া জীবনযাপন করিতে পার না?" কেন পারি না, তাহা তোমাদিগের সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া যারপরনাই কঠিন। কারণ, যদি আমি বলি, যে, এরূপ করিলে ঈশ্বরের অবাধ্যতা করা হইবে, এই জন্য আমি নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারিব না, তাহা হইলে আমি মিথ্যা বিনয় করিতেছি ভাবিয়া তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না। আবার, আমি যদি বলি, যে, তোমরা আমাকে যেমন আলাপ করিতে শুনিয়াছ, তেমনি প্রতিদিন ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলা ও আপনাকে ও অপরকে পরীক্ষা করাই মানবের পক্ষে মহত্তম সৌভাগ্য, এবং অপরীক্ষিত জীবন মানুষের পক্ষে ধারণযোগ্যই নয়,—আমি এরূপ বলিলে তাহা তোমরা আরও কম বিশ্বাস করিবে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, আমি বলিতেছি, যে, ইহাই সত্য, যদিচ তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ নহে। অথচ কিন্তু আমি এমত ভাবিতেও অভ্যস্ত হই নাই, যে, আমি কোনওরূপ দণ্ডের যোগ্য। আমার যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে আমি যত অধিক সম্ভব অর্থদণ্ডের প্রস্তাব করিতাম; কারণ তাহাতে আমার কোনও ক্ষতি হইত না; কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, আমার অর্থ নাই; তবে আমি যাহা দিতে সমর্থ, তোমরা যদি তাহাই দণ্ড করিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। আমি হয় তো এক মিনা দণ্ড দিতে পারি; আমি তাহাই প্রস্তাব করিতেছি। হে আথীনীয়গণ, এই প্লাটোন, ক্রিটোন, ক্রিটবৌলস এবং আপল্লডোরুস আমাকে ত্রিশ মিনা প্রস্তাব করিতে অনুরোধ করিতেছে, তাহারা বলিতেছে যে তাহারা ইহার প্রতিভূ হইবে; আমি তবে ত্রিশ মিনাই প্রস্তাব করিতেছি; এই অর্থের জন্য ইহারাই আমার যথাযোগ্য প্রতিভূ থাকিবে।

(বিচারকগণের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের মতানুসারে সোক্রাটীসের প্রাণদণ্ড বিহিত হইল।)

২৯। হে আথীনীয় নরগণ, তোমরা দীর্ঘকাল লাভ করিতে পারিলে না; অথচ যাহারা এই পুরীর প্রতি দোষারোপ করিতে চাহে, তাহাদিগের নিকটে এই অল্পকালের জন্য তোমরা এই নাম ও নিন্দা উপার্জ্জন করিলে, যে তোমরা জ্ঞানবান্ পুরুষ সোক্রাটীসকে হত্যা করিয়াছ। কারণ, জ্ঞানী হই বা না হই, যাহারা তোমাদিগের নিন্দা করিতে চাহিবে, তাহারা আমাকে জ্ঞানী বলিবেই বলিবে। তোমরা যদি অল্পকাল অপেক্ষা করিতে, তোমাদিগের বাঞ্ছিত আমার মৃত্যু নিয়তি-বশে আপনিই উপস্থিত হইত। কেননা, তোমরা আমার বয়ঃক্রম দেখিতেছ; তোমরা দেখিতে পাইতেছে, যে, আমি জীবনপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া সম্প্রতি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াছি। আমি তোমাদিগের সকলকেই এই কথাগুলি বলিতেছি, তাহা নহে; কিন্তু যাহারা আমার প্রাণদণ্ডে মত দিয়াছে, তাহাদিগকেই এইরূপ বলিতেছি। এবং আমি তাহাদিগকে এ কথাও বলিতেছি,—বন্ধুগণ, তোমরা হয় তো ভাবিতেছ, যে, আমি যুক্তির অভাবেই পরাজিত হইলাম; অর্থাৎ আমি যদি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিপ্রায়ে সকলই বলা ও সকলই করা উচিত বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে যে-প্রকার যুক্তি উপস্থিত করিতাম, তাহার অভাববশতঃই আমার প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইল। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই ঠিক্ নহে। আমি যুক্তির অভাবে পরাজিত হই নাই; কিন্তু অতিসাহসিকতা ও নির্লজ্জতার অভাবেই পরাজিত হইয়াছি। আমি এমত ভাষায় তোমাদিগের সমক্ষে আত্মসমর্থন করিতে চাহি নাই, যাহা তোমাদিগের পক্ষে শ্রুতি-মধুর হইত; আমি তোমাদিগের সম্মুখে বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ ও এইরূপ অন্য কিছুই করি নাই, বা বলি নাই; আমি তাহা আমার পক্ষে একান্ত অযোগ্য মনে করি, কিন্তু তোমরা অপরের নিকটে এই সমুদায় শুনিতেই অভ্যস্ত হইয়াছ। ইহাও আমার পরাজয়ের কারণ। আমি আত্মসমর্থনকালে এমত বিবেচনা করি নাই যে বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া আমার কাপুরুষোচিত আচরণ করা কর্ত্তব্য; এখনও আমি এ সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন করি নাই; আমি বরং কাপুরুষের মত বিলাপ ও অশ্রুপাতপূর্ব্বক আত্মসমর্থন করিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা, আমি যেমন করিয়াছি, তেমনি আত্মসমর্থন করিয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিব। কেননা, কি বিচারালয়ে, কি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বা অপর কাহারও পক্ষেই এমত আচরণ কর্ত্তব্য নহে, যে, যাহা-তাহা করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে। যুদ্ধে অনেক সময়ে স্পষ্টই এমত ঘটিয়া থাকে, যে, পরাজিত ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া এবং পশ্চাদ্ধাবিত শত্রুগণের চরণে ভূপতিত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়া মৃত্যু হইতে ত্রাণ পাইতে পারে। এবং প্রত্যেক বিপদেই এমন অন্য অনেক উপায় আছে, যাহাতে যদি কেহ সকলই করিতে ও বলিতে সাহসী হয়, তবে সে মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, এইরূপে মৃত্যুকে পরিহার করা কঠিন নহে, প্রত্যুত পাপকে পরিহার করাই অধিকতর কঠিন; কারণ, পাপ মৃত্যু অপেক্ষা দ্রুতগামী। আমি বৃদ্ধ ও মন্থরগতি বলিয়া এক্ষণে শ্লথতর মৃত্যু আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে; আর, আমার অভিযোক্তারা চতুর ও দ্রুতগামী; এজন্য তাহারা অধিকতর দ্রুতধাবনপটু পাপের পাশে আবদ্ধ হইয়াছে। এবং আমি তোমাদিগের হস্তে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিবার জন্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি; আর তাহারা সত্যসমীপে পাপ ও অন্যায়ের দণ্ড ভোগ করিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। আমি আমার দণ্ড আদরে গ্রহণ করিতেছি, তাহারাও তাহাদিগের দণ্ড আদরে গ্রহণ করিতেছে। যাহা যেরূপ ঘটিবার, বোধ করি তাহা সেইরূপই ঘটিয়াছে; এবং আমার মনে হয়, এ-সমুদায় যথাযোগ্যই বিহিত হইয়াছে।

৩০। হে আমার দণ্ডদাতৃগণ, অতঃপর আমি তোমাদিগকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি। কারণ, আমি এখন সেই অন্তিম কালে উপনীত হইয়াছি, যখন মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে; যখন মৃত্যুকাল আসন্ন, তখনই লোকে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া থাকে। বন্ধুগণ, তোমরা যাহারা আমাকে হত্যা করিতেছ, তাহাদিগকে আমি বলিতেছি, তোমরা আমাকে বধ করিয়া আমাকে যে দণ্ড দিতেছ, আমার মৃত্যুর পরেই তদপেক্ষা সহস্রগুণে কঠিনতর দণ্ড তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন তোমরা এই ভাবিয়া এই কর্ম্ম করিতে যাইতেছ, যে, তোমা-

দিগকে জীবনের কোনও হিসাব দিতে হইবে না; তোমরা তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে ফল ইহার একেবারেই বিপরীত হইবে। আরও বহুতর লোকে তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবে; আমিই তাহাদিগকে এক্ষণে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতেছি, যদিচ তোমরা তাহা বুঝিতে পার নাই; তাহারা আমা-অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও নব্যতর; সুতরাং তাহারা তোমাদিগের পক্ষে অধিকতর দুর্ভর হইয়া উঠিবে, এবং তোমরাও তাহাদিগের প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইবে। যদি তোমরা ভাবিয়া থাক, যে, লোকে তোমাদিগকে তিরস্কার করিলে তাহাদিগকে বধ করিয়াই উহা নিবারণ করিবে, তবে তোমরা ঠিক্ ভাবিতেছ না ও ঠিক্ পথের সন্ধান পাইতেছ না। কেননা, অব্যাহতি লাভের এটা পথই নয়; ইহা না সাধ্যায়ত্ত, না উৎকৃষ্ট; প্রত্যুত সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুগম পন্থা এই যে, তুমি, অপরের প্রতিরোধ করিও না, কিন্তু যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পার, আপনাকে সেইরূপ করিয়া গঠন কর। তোমরা যাহারা আমার দণ্ডবিধান করিয়াছ, তাহাদিগকে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী বলিয়া আমি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি।

৩১। আর, তোমরা যাহারা আমি নির্দ্দোষ বলিয়া মত দিয়াছ, যতক্ষণ কারাধ্যক্ষ একাদশ রাজপুরুষ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন এবং যতক্ষণ না আমি সেই স্থানে গমন করি, যথায় আমাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে, ততক্ষণ, যে ঘটনা ঘটিল তৎসম্বন্ধে আমি তোমাদিগের সহিত আলাপ করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। অতএব, বন্ধুগণ, তোমরা ক্ষণকাল আমার নিকটে অবস্থান কর, কেননা, যতক্ষণ সম্ভব, আমরা পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারি, তাহাতে কিছুই বাধা দিতেছে না। তোমরা আমার প্রিয়; এইমাত্র আমার পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে, আমি তাহার অর্থ তোমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে চাই। হে বিচারপতিগণ,—তোমাদিগকে বিচারপতি বলিয়া সম্বোধন করাই সঙ্গত—আমার পক্ষে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। আমি আজীবন দৈব ইঙ্গিত পাইয়া আসিতেছি; এত দিন উহা নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এবং আমি যদি অতি তুচ্ছ বিষয়েও অন্যায় করিতে উদ্যত হইতাম, তবে প্রতিবাদ করিত। আর, আমার পক্ষে এক্ষণে কি ঘটিয়াছে, তাহা তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ; এমন ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা লোকে চরম বিপত্তি বলিয়া ভাবিতে পারে, এবং ভাবিয়াও থাকে। কিন্তু, আমি যখন প্রাতঃকালে গৃহ হইতে বাহির হইলাম, যখন এইখানে বিচারালয়ে প্রবেশ করিলাম, কিংবা যখন আত্মসমর্থন করিতে লাগিলাম, তখন তাহার কোন স্থলেই, এই দৈব ইঙ্গিত আমাকে বাধা প্রদান করে নাই। অথচ অনেক সময়েই অন্যস্থলে কথাবার্ত্তার মধ্যে এমত হইয়াছে, যে, আমি যেই কথা বলিতে যাইতেছি, অমনি এই দৈববাণী আমাকে রোধ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারে উহা আমার বাক্য কিংবা কার্য্য কিছুরই প্রতিবাদ করে নাই। আমি ইহার কারণ কি মনে করি? তোমাদিগকে বলিতেছি। আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ; আমাদিগের মধ্যে যাহারা মনে করে, যে, মৃত্যু অশুভ, তাহারা ভ্রান্তধারণা পোষণ করিতেছে। আমি ইহার মহা প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ, আমি যদি কোন না কোনও শ্রেয় লাভ করিতে না যাইতাম, তবে আমার চিরসহচর দৈব ইঙ্গিত অবশ্যই আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিত।

৩২। আমরা এইরূপে বিচার করিলেও বুঝিতে পারিব, যে, মৃত্যু যে কল্যাণের কারণ, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মহতী আশা বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেননা, মৃত্যু এই দুইয়ের একটি—হয় মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার কোন বিষয়ের কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না; না হয়, লোকে যেমন সচরাচর বিশ্বাস করে, মৃত্যুর অর্থ আত্মার একপ্রকার পরিবর্ত্তন এবং ইহলোক হইতে অন্যলোকে প্রস্থান। মৃত্যু যদি অনুভূতির বিলোপ হয়, উহা যদি সেই ব্যক্তির সুষুপ্তির মত হয়, যে নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন অবধি দেখে না, তবে তো মৃত্যু একটা অত্যাশ্চর্য্য লাভ। কারণ, যদি কোনও ব্যক্তিকে বরস্বরূপ এমত রজনী চাহিতে হয়, যে রজনীতে নিদ্রিত হইলে সে স্বপ্ন অবধি দেখিবে না, এবং সেই রজনীর সহিত তাহাকে যদি তাহার জীবনের অন্য দিবা ও রাত্রির তুলনা করিয়া বলিতে হয়, সে আপনার জীবনে কয় দিবস যামিনী এই রাত্রির অপেক্ষা অধিকতর সুখে ও

সুষ্ঠুরূপে যাপন করিয়াছে, তবে আমি বিবেচনা করি, যে, শুধু সাধারণ লোকে নয়; কিন্তু পারস্যের মহারাজও দেখিতে পাইবেন, যে, অন্য দিবারাত্রির তুলনায় এইপ্রকার রাত্রির সংখ্যা অতি অক্লেশেই গণনা করা যাইতে পারে। মৃত্যু যদি এইপ্রকার হয়, তবে আমি উহাকে লাভই বলিতেছি। কেননা, এই সংজ্ঞাহীনতার অবস্থায় অনন্তকাল এক রাত্রির অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। পক্ষান্তরে, মৃত্যু যদি ইহলোক হইতে অন্যলোকে মহাযাত্রা হয়, এবং একথা যদি সত্য হয়, যে, সেখানে উপরত সকলেই বাস করিতেছে, তবে হে বিচারপতিগণ, ইহা অপেক্ষা মহত্তর কল্যাণ আর কি হইতে পারে? যদি আমরা যমালয়ে উপনীত হইয়া ইহলোকের তথাকথিত বিচারকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই, এবং তথায় সেই-সকল সত্য বিচারক প্রাপ্ত হই, যাঁহারা, আমরা শুনিতে পাই, পরলোকে বিচার করিয়া থাকেন—যদি তথায় আমরা মিনোস, ও রাডামান্থুস, আইআকস ও ট্রিপ্‌টলেমস এবং অন্যান্য দেবসম্ভব বীর পুরুষদিগকে দেখিতে পাই, যাঁহারা স্বীয় স্বীয় জীবনে ন্যায়বান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে কি এই মহাযাত্রা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে? অথবা অর্ফেয়ুস ও মৌসাইঅস এবং হীসিঅডস ও হমীরসের (Homer) সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষায় এমন কি আছে যাহা তোমরা দিতে না পার? এই-সকল কাহিনী যদি সত্য হয়, তবে আমি তো পুনঃ পুনঃ মরিতে চাই। আমি যদি পরলোকে পালামিডীস্ ও টেলমোনতনয় আইআস এবং অন্যান্য যাঁহারা প্রাচীন কালে অন্যায় বিচারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভ করিতে পারি, তবে তাহা কি অপূর্ব্বই হইবে; তাঁহারা ইহলোকে যে দুঃখ বহন করিয়াছেন, তাহার সহিত, আমি যাহা বহন করিলাম, তাহার তুলনা একটা উপেক্ষার বিষয় হইবে না। বিশেষতঃ আমি তথায় কামনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিব—আমি এখানে যেমন লোককে পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও তেমনি সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, কে প্রকৃত জ্ঞানী, এবং কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানী নহে। হে বিচারপতিগণ, ট্রয়-সংগ্রামে গ্রীকবাহিনীর নেতা কিংবা অড্যুসেয়ুস বা সিস্যফস অথবা অপর যে লক্ষ পুরুষ ও রমণীর নাম করা যাইতে পারে, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইলে আমরা কোন্ ঐশ্বর্য্য না প্রদান করিতে পারি? সেখানে ইহাঁদিগের সহিত কালযাপন ও কথোপকথন এবং ইহাঁদিগকে পরীক্ষা করা কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বলিয়াই অনুভূত হইবে! অন্ততঃ সেখানে তাঁহারা কখনই এজন্য কাহাকেও প্রাণে বধ করেন না। কারণ, ইহলোকবাসী অপেক্ষা তাঁহারা তথায় অন্যরূপে অধিকতর সুখে বাস করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে; যদি প্রচলিত কাহিনী সত্য হয়, তবে অধিকন্তু তাঁহারা অনন্তকাল অমর।

৩৩। হে বিচারপতিগণ, তোমাদিগেরও এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া কর্ত্তব্য; তোমরা এই সত্য অন্তরে ধারণ করিও, যে, সাধুজনের পক্ষে কি জীবনে কি মরণে কোনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না; এবং দেবগণ তাঁহার জীবনের কোন বিষয়ের প্রতিই উদাসীন নহেন। আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহা আপনিই ঘটে নাই; আমি উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতেছি, যে, এক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ও বিষয়দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করাই আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। এই জন্যই দৈব ইঙ্গিত আমাকে একবারও প্রতিনিবৃত্ত করে নাই, এবং আমি আমার দণ্ডদাতা ও অভিযোক্তাদিগের প্রতি বড় বিরক্ত হই নাই। তাহারা অবশ্যই যে ইহা বুঝিতে পারিয়াই আমাকে দণ্ড দিয়াছে ও অভিযোগ করিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু তাহারা আমার ক্ষতি করিবে বলিয়াই ভাবিয়াছিল। এই জন্য আমি তাহাদিগকে ন্যায়তঃই তিরস্কার করিতে পারি। তথাপি আমি তাহাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা চাহিতেছি। হে বন্ধুগণ, আমার সন্তানেরা যখন যৌবনে উপনীত হইবে, তখন যদি তোমরা দেখিতে পাও যে, তাহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থ কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের জন্য অধিকতর যত্নবান্ হইয়াছে, তবে তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান করিও, ও আমি যেমন তোমাদিগকে দুঃখ দিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে দুঃখ দিও; এবং যদি কিছু না হইয়াও তাহারা ভাবে যে তাহারা একটা-কিছু হইয়া বসিয়াছে, তবে আমি যেমন তোমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিও, যে, যে-সকল বিষয়ে যত্নবান

হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে তাহারা যত্নবান্ নহে, ও প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠাবান্ না হইয়াও তাহারা মনে করিতেছে, যে, তাহারা একটা কিছু হইয়া পড়িয়াছে। যদি তোমরা এইরূপ কর, তবেই আমি নিজে ও আমার পুত্রগণ তোমাদিগের হস্তে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এক্ষণে প্রস্থানের সময় উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চলিলে; আমাদিগের মধ্যে কে কল্যাণতর পথে গমন করিল, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকলের পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত।

সমাপ্ত।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

চিত্রকর

(গল্প)

ক।

সে ছবি আঁকত। কালো কালো একরাশ কোঁকড়ানো চুলের আড়ালে বড় বড় আবেশভরা চোখ দুটি, যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত কমনীয় মুখমণ্ডল,—তাতে না ছিল আনন্দের আভা, না ছিল বিষাদের কৃষ্ণছায়া। সবাই জান্‌ত—সে পাগল।

নাম ছিল তার সুনন্দ। পাহাড়ের কোল-ঘেঁসা ছোট্ট গ্রামখানির এক সুদূর প্রান্তে একটা ঝরণার ধারে তার কুটীর। পাখীর গান, ঝরণার কল্লোল, গাছের ছায়া, সবুজ মাঠের সোনালী ফসল,—চারদিকে কেবলি শোভা, কেবলি সঙ্গীত। ভোরে ও সন্ধ্যায় যখন কুয়াসার ধূসর আবরণ চারদিকে স্বপ্নলোক রচনা করত, ঝিঁঝিঁ-ডাকা নিঝুম রাত্রি ও নির্জ্জন দ্বিপ্রহর যখন সুনন্দের নিঃসঙ্গ জীবনকে বিশ্বসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিত, সে তখন তারি মধ্যে তার সৃষ্টিছাড়া আনন্দের সন্ধান পেত, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা আবছায়ার মতো তার অন্তরের কোণে ভেসে ভেসে উঠ্‌ত—মনের মধ্যে আনাগোনা করত শুধুই রং আর তুলি, তুলি আর রং।

এই খাপছাড়া পাগলের কাছে কেউ বড় একটা ঘেঁসত না বটে, কিন্তু তার চিত্রবিদ্যার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি রাজদরবার থেকেও প্রায়ই তার কাছে ছবির জন্য তাগিদ আসত; যখন তার খেয়াল হত পূর্ণোৎসাহে রাজার হুকুম তামিল করত, আবার যেদিন খুসী রাজার লোকজনদের কুটীর থেকে তাড়িয়ে দিত।

খ।

সেদিন সারারাত বৃষ্টির পর সকালবেলার মেঘভাঙা রোদে চারিদিক ঝলমল করছিল। মাঠের ভিজে ঘাস ও গাছের ভিজে পাতার ওপর ভোরের আলো ঝিক্‌মিক্ করছিল। ঘুম থেকে উঠেই সুনন্দের সেদিন কি এক খেয়াল চাপল, সে তাড়াতাড়ি তুলি রং আর পট নিয়ে বাইরে একখানা চৌকী টেনে চুপচাপ করে বসল। দূরে গমের ক্ষেতে ভোরের হাওয়ার তরঙ্গলীলা চলছিল; মাঠের শেষে আকাশের গায়ে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী—ঠিক ধূসর মেঘের মতো। নীচে যেখানে ঝরণার শাদাজল একখানা কালো পাথরের ওপর ঝরঝর করে পড়ছিল, তারি আশেপাশে একটা ঝোপের মতো,—অনেকগুলো বনফুলের গাছ, তাতে রংবেরঙের অসংখ্য ফুল।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো সুনন্দ একদৃষ্টে ফুলগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ঝরণাজলের পতনবেগে গাছগুলো একটু একটু কাঁপছিল, উৎক্ষিপ্ত জলকণা মুক্তাফলের মতো পাতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল।

সুনন্দ স্বপ্ন দেখছিল,—যেন সেই ফুলগাছগুলোর মধ্যে অকস্মাৎ একটা সজীবতার সাড়া পড়ে গেছে, ঝরণার কলসঙ্গীতে যেন একটা আনন্দবার্ত্তা জেগে উঠেছে, বাতাস যেন একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবেশে পাগলের মতো ছুটাছুটি করছে।

হঠাৎ সুনন্দ চেয়ে দেখল—লতা, পাতা, ফুল ও সবুজ শষ্পাস্তরণের বিচিত্র বর্ণসম্ভারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক সুন্দরী যুবতী! আফিমফুলের মতো তার রং, দুটি রক্ত-গোলাপের পাপ্‌ড়ির মতো পাত্‌লা পাত্‌লা তার ঠোঁট দুটি। চাঁপার কলির মতো তার কোমল করাঙ্গুলি পাতার আড়ালে এদিক ওদিক ফুলের সন্ধান্ করছিল। বুকের আঁচলে জড়ানো একরাশ ফুল কোমল বক্ষের তালে তালে মৃদু মৃদু কাঁপছিল।

সৌন্দর্য্য-দেবতার খেয়ালী পূজক সুনন্দ নির্ব্বাক

বিস্ময়ে ভক্তের মতো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আকাশের সুনীল চিত্রপটের ওপর কী এ-অপরূপ আলেখ্য! দূরে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে সোনার ঢেউ দিগন্তের নীলিমার গায়ে লুটিয়ে পড়ছে; ঝরণার জলরাশি অবিশ্রাম কলগীতিতে প্রবহমান, নীচে ফুল ও পাতার বাসন্তী-কুঞ্জ,—মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্যে বিকশিতা এক সুন্দরী তরুণী! বর্ষণমুক্ত প্রভাতের তরুণসূর্য্য গলিত-স্বর্ণধারায় তার অভিষেক করছে, শীকরশীতল প্রভাতী হাওয়া ভক্ত ভৃত্যের মতো তাকে ব্যজন করছে, ঝরণার স্বচ্ছ সলিলধারা আনন্দগানে তার কোমল চরণদুটি ধৌত করে বয়ে যাচ্ছে।......

মুহূর্ত্তের জন্য যুবতী তার বড় বড় চোখ দুটি তুলে চাইল। সুনন্দ চম্‌কে উঠ্‌ল,—এযে শান্তি!—তারি মতো বিশ্বপরিত্যক্তা এক হতভাগিনী!......পুরাতন, ওগো চিরপুরাতন, অকস্মাৎ আজ এ কোন্ নবীনতার সুষমায় সুন্দর হয়ে এলে?'

গ।

শান্তি যখন সুনন্দের ঘরকন্নার কাজ গুছিয়ে নিল তখন সকলে ভাব্‌ল এবারে হয়ত পাগলের খেয়াল বদ্‌লে যাবে। কিন্তু তার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ শান্তির সৌন্দর্য্যের নেশায় সুনন্দ যেন একেবারে মাতাল হয়ে উঠ্‌ল, তার হাজার রকম সৃষ্টিছাড়া খেয়ালের মধ্যে ছবি আঁক্‌বার খেয়াল যেন দশগুণ বেড়ে গেল। এবারে শান্তিই তার সকল ছবির আদর্শ। দিন নেই, রাত নেই, শান্তিকে ঠায় বসে থাক্‌তে হয়, আর সুনন্দ পটের ওপর রং ফলাতে ফলাতে ভাব্‌ত—কেমন করে ঐ আঙুরের মতো নিটোল গাল দুটির লালিমা, ঐ ভাসা-ভাসা চোখের মদির-মাধুর্য্য, ঐ যৌবনপুষ্পিত দেহের পেলব লাবণ্য তুলির রেখা-সম্পাতে পটের ওপর ফুটিয়ে তোলা যায়!

দেশে যতই সুনন্দের ছবির জয়জয়কার পড়ে গেল ততই নিত্য নূতন যশোলাভের তীব্র খেয়াল তাকে একেবারে পেয়ে বস্‌ল।

কিন্তু এদিকে যে শান্তির নিভৃত চিত্তে পূজার অর্ঘ্যথালি অনাদরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে, একবিন্দু জলের পিপাসায় তার সমস্ত অন্তর যে চাতকের মতো হাহাকার করে মরছে সেদিকে সুনন্দের দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল না। তার সে শিল্পীর চোখ যখন শান্তির প্রতি-অঙ্গের রেখায় রেখায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিত, তখন নারীত্বের আহত মর্য্যাদার ক্ষোভে, দুঃখে, কুণ্ঠায় শান্তির বেপথু অন্তর অবনত হয়ে পড়ত।

দেয়ালের গায়ে টাঙানো তারি বিচিত্র ভঙ্গীর প্রতিকৃতিগুলোর দিকে তাকিয়ে শান্তি ভাবত যেন তার রূপ-লাবণ্য তিলে তিলে অপহরণ করে ঐ ছবিগুলো তার স্বামীর অন্তরে তার জায়গাটুকু সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে বসেছে। তার দু'চোখ দিয়ে ঈর্ষ্যার আগুন ঠিক্‌রে পড়ত,—কিন্তু ব্যর্থ সে আক্রোশ, নিষ্ফল সে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার!

শান্তির সকল মর্ম্মবেদনাকে সার্থক করে যেদিন শুভ্র পুষ্পস্তবকের মতো একটি সুন্দর শিশু তার কোল জুড়ে বস্‌ল সেদিন তার অন্তরের প্রীতির অবরুদ্ধধারা মাতৃ-স্নেহের উচ্ছ্বসিত প্রবাহে শত মুখে উৎসারিত হয়ে উঠ্‌ল।

সুনন্দের অন্তরে তখন অপত্যস্নেহের কোনো স্থান ছিল না। সেখানে সে সৌন্দর্য্য-দেবতার যে রাক্ষসী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার বেদীমূলে দিনে দিনে পলে পলে হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি উৎসর্গ করে সে রিক্ত হয়ে বসেছিল।

ঘ।

'ওগো, আজ মাপ কর, শুধু আজকের দিন। খোকার বড্ড অসুখ, কেমন যেন ছটফট করছে।'

'কিছুতেই তা' হতে পারে না। আর দশদিন মাত্র বাকী। জানো, এ প্রদর্শনীতে রাজা স্থির করবেন, দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কে।'

'শুধু আজ—একটা দিন—একটা দিন আমায় ভিক্ষে দাও। খোকা আমার যেন কেমন করছে।'

'ও—ও কিছু নয়। আর সময় নষ্ট কোরো না বল্‌ছি। এ দশদিন তোমার একটুও ছুটি নেই।......'

পাশের ঘরে শিশুর কাতরকণ্ঠ শোনা গেল,—'মাগো—মা!'......

'ঐ!—শোন শোন! ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!'

'ফের্ আমার সময় নষ্ট করছ? ভালো হবে না বলে

রাখ্‌ছি, শান্তি ! জানো তুমি আমার এ ছবির জন্য দু'দশটা খোকাকে অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারি ?......'

সুনন্দের চোখের দিকে চেয়ে শান্তা শিউরে উঠ্‌ল। কাতরদৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌ল—'ওগো তুমি অমন করে চেয়োনা।—যাচ্ছি—চল।—হায় নিষ্ঠুর !......'

পাশের ঘরে আবার কান্নার শব্দ শোনা গেল। সুনন্দ তাড়াতাড়ি শান্তার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছবির ঘরে কবাট বন্ধ করে দিল।......

'হাঁ, ঠিক হয়েছে। এবার হাতখানা মাথার দিকে এম্‌নি করে তুলে ধর। হাঁ, হাঁ, ঠিক এই রকম।......আঃ, ফের চোখে জল !—সব মাটি করবে দেখ্‌ছি। চোখ মুছে ফেল, ভালো করে মুছে ফেল।......হাঁ, এবারে ঐ সাশীর দিকে তাকিয়ে একটু হাস।......'

পাশের ঘরে আবার কান্নার শব্দ শোনা গেল।...... 'আঃ, জালালে ! কি এক আপদই জুটেছে !'—কোণের জানালায় একটু ফাঁক ছিল, সুনন্দ তাড়াতাড়ি সেটা এঁটে দিল।

সারাদিন বসে থাক্‌বার পর ঠিক সন্ধ্যার কাছাকাছি শান্তি ছুটি পেল। পিঞ্জরমুক্তা বিহঙ্গীর মতো খোকার ঘরে ছুটে গিয়েই সে উচ্ছ্বসিতস্বরে কেঁদে উঠ্‌ল।

তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় গাছপালা বাড়ী-ঘর রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। দূরে গ্রাম্য কৃষকদের গোহাল থেকে রাশি রাশি ধোঁয়া উঠ্‌ছে; গম-ক্ষেতের মাঝে সরু পথ দিয়ে তখনো দু'একদল গোমহিষ মন্থরগতিতে গৃহে ফিরছে।

সুনন্দ তন্ময় হয়ে এই সান্ধ্যদৃশ্য দেখ্‌ছিল, এমন সময় বাড়ীর ঝি হঠাৎ ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল—'ওগো তুমি একটিবার এসে দেখে যাও, খোকা বুঝি আর নেই।'

'অ্যাঁ, কি বল্‌লে ? খোকা নেই ?—যাক্‌, আপদ চুকেছে !—না—না, রোস, দেখি একবার।......'

অসম্পূর্ণ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সুনন্দ খানিকক্ষণ কি ভাব্‌ল।......

'হাঁ, রোস।—মৃতশিশুর ছবি—ঐ খানটায়—ঠি-ক্‌ মানাবে !—দাঁড়াও ঝি, আমি কাগজ আর পেন্সিল্‌ নিয়ে যাচ্ছি।......'

৬।

'আজ্‌কের রাতই শেষ। কাল সকাল থেকে তোমার ছুটি। চেয়ে দেখদিকিন একবার ছবিখানার দিকে !—সারা দুনিয়া খুঁজে এলেও এরকম আর একখানা মিলবে না !—আজ আমার কেবল বলতে ইচ্ছা হচ্ছে,—ধন্য আমি ! ওগো আমি ধন্য !... . ...ওঃ, কাল যখন রাজ-সভায় ছবির আবরণ খুলে ছবিখানা হাজার হাজার লোকের সামনে তুলে ধরব, কল্পনা করতে পারো কি শান্তি কী সে কোলাহল জাগবে তখন !—তখন কি সবাই একবাক্যে বল্‌বে না যে দেশের সেরা শিল্পী—সুনন্দ ?...... তুলির আর একটু স্পর্শ !—ঐখানে ঐ টল্‌টলে গালের ওপর আর একটুখানি রং ফলানো !—তার পর ?—সব সুন্দর ! সব সার্থক !!—আজ আর রাত্তিরে আমি ঘুমাব না শান্তি !—ঠিক সকালবেলা সূর্য্যোদয়ের প্রথম সোনালী আভাটুকু যখন ঐ কাচের সাশীর ভিতর দিয়ে তোমার মুখের ওপর এসে পড়বে, তখনি তোমার গালের গোলাপী রংটুকু আমি ছবির ওপর ঠিক তুলে নিতে পারব।...... ঐখানটায় সোফার ওপর তুমি ঘুমোও; মুখখানা সাশীটার দিকে ঘুরিয়ে রাখো।—শুধু আজকের রাত, শান্তি, কাল সকাল থেকেই তোমার ছুটি !......'

বাইরে ঘরের ছাদের ওপর দিয়ে কয়েকটা রাত্রিচর পাখী হঠাৎ বিকট চীৎকার করে উড়ে গেল। সে শব্দে এক মুহূর্ত্তের জন্য সুনন্দ যেন একটু চম্‌কে উঠ্‌ল।......

চারদিক নিস্তব্ধ। দেয়ালের গায়ে ঘড়ীটা ক্রমাগত টিক্‌টিক্‌ করছিল,—ক্রমে একটা—দু'টা—তিনটে বেজে গেল। শান্তির শীর্ণ দেহলতা তখন সোফার ওপর এলিয়ে পড়েছে।

সুনন্দের চোখে ঘুম নেই। তার হাতে রঙের তুলি,—কতক্ষণে সকাল হবে, কখন সে তুলির শেষ স্পর্শে ছবিখানা সম্পূর্ণ করবে—অধীর আগ্রহে সে তারি প্রতীক্ষা করছিল। ছবির গায়ে কক্ষের উজ্জ্বল আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল করছিল—সুনন্দ আনন্দ ও গর্ব্বে বিহ্বল হয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাই চেয়ে দেখ্‌ছিল।

......ক্রমে পাঁচটা বেজে গেল। পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে ম্লান দীপ্তি জেগে উঠ্‌ল। সুনন্দ তখন চাঞ্চল্যে

অধীর। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে কেবলি দেখ্‌তে লাগল উদয়ের আর কতক্ষণ বাকী, কতক্ষণে সাশীটার ওপর তরুণ সূর্য্যের প্রথম কিরণরেখা প্রতিফলিত হবে।...

আর দেরী নেই,—এক মিনিট—দু'মিনিট—তিন মিনিট!—তুলিতে রং মাখিয়ে কম্পিত বক্ষে পলকহীন দৃষ্টিতে সুনন্দ শান্তির ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চেয়ে রইল।

·· ...কাচের সাশীর ভিতর দিয়ে একটি সোনালী আলোর রেখা ধীরে ধীরে শান্তির মুখের ওপর এসে পড়ল, মুহূর্ত্তের জন্য যেন তার বিষাদ-পাণ্ডুর মুখমণ্ডল ম্লান হাস্যচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হয়ে উঠ্‌ল, মুহূর্ত্তের জন্য তার বিশীর্ণ গণ্ডের ওপর যেন প্রথম যৌবনের শোণিতোচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ লালিমায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল!......

ধীরে—ধীরে সুনন্দ পটের ওপর তার তুলি স্পর্শ কর্‌ল,—ছবির লাবণ্যমণ্ডিত মুখমণ্ডলে যৌবনের দীপ্তি একনিমেষে ফুটে উঠ্‌ল, আর তারি সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিম সন্ধ্যাকাশের শেষ রক্তিম আভাটুকুর মতো শান্তির গণ্ডের ক্ষণিক লালিমাটুকু ধীরে ধীরে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল।......

সার্থকতার আনন্দে সুনন্দ পাগলের মতো চীৎকার করে উঠ্‌ল,—'নিয়েছি, নিয়েছি—ঠিক তুলে নিয়েছি!... এবার সব পরিশ্রম সার্থক—সব শেষ!......শান্তি, এবার তোমার ছুটি!......'

অধীর উচ্ছ্বাসে ছুটে গিয়ে শান্তিকে বক্ষে জড়িয়ে চুম্বন করতেই সুনন্দ চম্‌কে উঠ্‌ল—শান্তির ক্ষীণ তনুলতা প্রাণহীন—অসাড়—শীতল!*

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

ছুঁচ ও তলোয়ার

(কবির নাম আব্‌দর্ রহিম, ইনি ইতিহাসের বৈরাম খাঁর পুত্র।)

বড় দেখে কভু ছোটোরে কোরো না হেলা,
ছোটো জিনিসের ছোটো ছোটো কাজ মেলা;
ছুঁচের যখন হ'য়ে পড়ে দরকার
তখন কি ভাই কাজে লাগে তলোয়ার?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* কোনও ফরাসী উপন্যাসের পরিচ্ছেদ-বিশেষের ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

চীনের শিকাগো

হুপে প্রদেশ।

রাত্রি আড়াইটা পর্য্যন্ত চেঙ্‌-চাও জংসনের মোসাফেরখানায় কাটাইলাম। ঠিক যেন মোকামা ষ্টেসনের আবহাওয়া। খোলা মাঠে পড়িয়া রেলযাত্রীরা নিদ্রা যাইতেছে উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়াছে। নিকটবর্ত্তী হোটেল দোকানে হাল্লা শুনিতে পাইতেছি। দোভাষী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আহারের কি ব্যবস্থা হইবে? চীনা সরাইয়ে মাছমাংসের কারবার অত্যধিক।" দোভাষী বলিলেন—"ভাবনা কি? সম্মুখেই মুসলমানের সরাই আছে। মুসলমানেরা হিন্দু আহার্য্য দিতে পারিবে।" মুসলমানেরা শূকর খায় না। কিন্তু কন্‌ফিউশিয়ানধর্ম্মীরা আহারে বসিলে কোন বস্তু বাদ দেয় না। কাজেই চীনা মতে মুসলমানের খাদ্যে হিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য এখানে হিন্দু শব্দের অর্থ ভারতবাসী। হিন্দু নামে যে এক ধর্ম্মমত আছে তাহা দুনিয়ার কোন লোক জানে না। ইয়োরোপ-আমেরিকার কয়েকজন পণ্ডিত ছাড়া পাশ্চাত্যেরা হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। এমন কি মিশরী, জাপানী ও চীনা জনগণও হিন্দুত্ব নামক "সনাতন ধর্ম্মের" নাম শুনে নাই।

পিকিঙ্‌ হইতে গাড়ী আসিল। এই গাড়ীতে হ্যান্‌কাও যাত্রা করিলাম। সকাল প্রায় দশটা পর্য্যন্ত হোনান প্রদেশেই আছি। পরে হুপে প্রদেশ সুরু হইল। হোনান ও হুপের সীমান্ত প্রদেশ পর্ব্বতময়। উত্তর চীনের শস্যশ্যামল বজরার প্রান্তর আর দেখিতে পাইতেছি না। চারিদিকে সবুজ তৃণমণ্ডিত অথবা প্রস্তরময় তরুহীন পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতেছি। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে গিরিদুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রদেশ হইতে প্রদেশের আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই পর্ব্বতসমাকুল জনপদ বিশেষরূপেই ব্যবহৃত হইত। গাড়ী হইতে কোথাও কোথাও প্রাচীন দুর্গ-দেওয়ালের অংশ দেখা গেল।

মাঞ্চুরিয়ায় প্রবেশ করিবার পর হইতেই ষ্টেশনে ষ্টেশনে সশস্ত্র সৈন্য দেখিয়াছি। এই অঞ্চলেও দেখিলাম। শুনিতেছি হুপে প্রদেশের পাদ্রী এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকগণ

গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের পর্ব্বতে বিহার করিতে আসেন। এক ষ্টেসনে কয়েক-জন শ্বেতাঙ্গ গাড়ীতে উঠিলেন।

হুপে প্রদেশের পল্লী-কুটিরগুলি দরিদ্রতর বোধ হইতেছে। খড়ো চালা এবং মাটির দেওয়াল চোখে পড়িতেছে। খোলার ছাদ এবং ইটের দেওয়াল আর দেখিতেছি না। গো-বলদের ব্যবহার চীনের অন্যত্র দেখি নাই—এই অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে এবং শকটের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। এখানকার ডুলিও কিছু নূতন ধরণের।

পাহাড়িয়া ভূমি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। এখন হইতে চারিদিকে ধানের জমি। কোরিয়া ছাড়িবার পর ধান্যক্ষেত্র দেখি নাই। আজ মধ্য চীনের উভয় সীমায় চিরপরিচিত উদ্ভিদের শোভা দেখিতে পাওয়া গেল। উত্তর চীনের সর্ব্বত্র বজরা, ভুট্টা এবং কাঙ্গুনের দৃশ্য বিরাজমান। নদী খাল বিল ইত্যাদি একাধিক পার হইলাম। জল সর্ব্বত্রই ঘোলা। জেলের ডিঙ্গি, ধীবর-পল্লী ও কৃষক-কুটির দেখিয়া পূর্ব্ববঙ্গের চিত্র স্মরণে আসে।

খানিক পরে আধুনিক ধরণের কলকারখানাবহুল নূতন অট্টালিকার নগরাংশ দৃষ্টিগোচর হইল। বুঝিলাম হ্যান্‌কাও সমীপবর্ত্তী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়া হইতে নবীনতম ইয়োরোপ-আমেরিকার আবহাওয়ায় উপস্থিত হইলাম। অল্প পরে ইয়াংসি-কিয়াঙ্‌ নদীর ধারে-ধারে চলিতেছি। নদীর উপর ষ্টীমার, সমুদ্রপোত, নৌকা ইত্যাদির গতিবিধি দেখিতেছি। কিনারায় লোহালক্কড়, কাঠ, মালগুদাম ও কার্য্যালয়ের আবেষ্টন। চীনের শিকাগোতে আসিয়া উপস্থিত।

পিকিঙ্‌ হইতে ৭৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হ্যান্-কাও অবস্থিত। ইয়াংসি-কিয়াঙের সমুদ্র মোহনা হইতে এই স্থান প্রায় ৬০০ মাইল পশ্চিমে। বাঙ্গালীর পক্ষে এলাহাবাদ ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে অবস্থিত, শাং-হাই বন্দরের চীনারা হ্যান্-কাওকে চীনের প্রায় সেই অংশে অবস্থিত বিবেচনা করিবে। ইয়াংসি-কিয়াঙ্‌ চীনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরার্দ্ধকে উত্তরচীন এবং দক্ষিণার্দ্ধকে দক্ষিণ-চীন বলা হয়। এই নদীকে আমাদের বিন্ধ্য পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা চলিতে পারে। উত্তর চীন দেখা থাকিলে দক্ষিণ চীন দেখা হয় না, আবার দক্ষিণ চীন দেখা থাকিলে উত্তর চীন দেখা হইল না। দুই চীনের লোকজন বাহ্যদৃশ্য প্রাকৃতিক আবেষ্টন বিভিন্ন। ভারতবর্ষের আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যও এইরূপই বিভিন্ন। ইয়োরোপ যে হিসাবে এক হইয়াও বহু, ভারতবর্ষও সেই হিসাবে এক হইয়াও বহু, চীনও সেই ধরণেই এক হইয়াও বহু।

হুপে প্রদেশের লোকসংখ্যা আড়াই কোটি। একটা প্রদেশই আধখানা বাঙ্গালা দেশ আর কি! সুতরাং ৪০ কোটি নরনারীর চীন দেখা কার্য্য একটা বিরাট ব্যাপার। হাতীর কান দেখিয়া হাতীর বর্ণনা করিলে একরূপ দৃশ্য মনে আসিবে, তাহার পিঠ দেখিয়া তাহার পরিচয় দিতে হইলে অন্য এক দৃশ্য মনে আসিবে। চীন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখা আবশ্যক।

কনসেশন-মহাল্লা।

হোটেলের কামরায় বসিয়া দক্ষিণ দিকে ইয়াংসি-কিয়াঙের জল দেখিতে পাইতেছি। হোটেল হ্যান্-কাও নগরে ফরাসী কন্‌সেশনে অবস্থিত। পিকিঙের হোটেলের মত এই হোটেলও ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী জনগণের কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত। চীনারা এখানে বাবুরচি ও খানসামা। দুইজন ভারতবাসীকে কর্ম্মচারী দেখিলাম—একজন পার্শী, অপর জন গোয়ানিবাসী খৃষ্টান। রাত্রে এক নূতন মাছ খাওয়া গেল। নাম "ম্যাণ্ডারিন" মাছ। ম্যাণ্ডারিন চীনাদের উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নাম। ইয়াংসি নদীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাছ বলিয়া ইহাকে শ্বেতাঙ্গরা এই নাম দিয়াছে।

আমাদের দেশে গাড়োয়ান আর কুলীদিগকে যেমন কোনমতেই সন্তুষ্ট করা যায় না, চীনের প্রত্যেক নগরে ও ষ্টেসনে তাহাই দেখিতেছি। সেদিন কয়েক-জন জাপানী পর্য্যটকও চীনা-সমাজের এই দোষ উল্লেখ করিতেছিলেন।

রিক্‌শতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। হোটেলের আশে-পাশে ফরাসী কনসেশনের ভিতর নানা-প্রকার বিদেশী দোকান, ব্যাঙ্ক, মহাজন-সমিতি ইত্যাদি রহিয়াছে। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, আসবাব সবই যেন মার্সেঈএর মত। এই অংশে থাকিলে চীনের কোন নগরে আছি মনে হয় না। সম্মুখে তরুশোভিত সুপ্রশস্ত বাঁধা-পথ। নদীর কিনারায় এই বাঁধ। কলিকাতার চাঁদপাল-ঘাটের

নিকট গঙ্গার উপর গড়ের মাঠের রাস্তা যেরূপ, হ্যান্‌কাও নগরের এই বাঁধও সেইরূপ। ইহা চীনের গৌরব নয়—বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের আধিপত্যের চিহ্ন।

ফরাসী কন্‌সেশন-মহাল্লার দুই ধারে আরও কন্‌সেশন-মহাল্লা রহিয়াছে। একদিকে জার্ম্মান ও জাপানী রাষ্ট্রদ্বয়ের আধিপত্য-ক্ষেত্র—অপরদিকে রুশ ও ইংরেজ রাষ্ট্রদ্বয়ের আধিপত্য-ক্ষেত্র। কন্‌সেশন-মহাল্লা বা বিদেশী আধিপত্য-ক্ষেত্রের ভিতর পানীয় জলের কল, নর্দ্দমা ইত্যাদি স্বাস্থ্য-রক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা আছে।

ইংরেজ কন্‌সেশন চীনা নগরের সংলগ্ন। এইখানে দেখিলাম বহু শিখ সৈন্য পাহারাওয়ালার কার্য্যে নিযুক্ত। লাল-পাগড়ীওয়ালা ভারতীয় প্রহরী পিকিঙের ইংরেজ-মহাল্লায়ও দেখিয়াছি। চীনারা ভারতবাসীকে সাধারণতঃ এইরূপ বরকন্দাজ, দ্বারবান্ ও পাহারাওয়ালা ভাবেই জানে। এই শ্রেণীর লোক হইতে অনেকসময়ে চীনা জনসাধারণ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া থাকে। কাজেই ভারত-বাসীর নামে চীনের লোকেরা নাসিকা কুঞ্চিত করে। চীনের যত স্থানে এইরূপ বিদেশী কন্‌সেশন-মহাল্লা আছে সেই-সকল স্থানে ন্যূনাধিক পরিমাণে ভারত-বিদ্বেষ জন্মিয়াছে।

একটা রাস্তায় দেখিলাম তড়িতের বাতিতে রাত্রি গুল্‌জার হইয়া আছে। ইয়োরোপ-আমেরিকার প্রণালীতে দোকানে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। এই রাস্তার পরেই চীনাদের স্বদেশী নগর। দোভাষী বলিলেন—"রাস্তার উপর যে-সকল বড় বড় গৃহ দেখিতেছেন এইগুলি মাত্র দুই তিন বৎসরের জিনিষ। ১৯১১ সালে বিপ্লবের সময়ে হ্যান্‌কাও সহরের প্রায় সকল গৃহই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।" চীনের আধুনিক ইতিহাসে হ্যান্-কাও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কারণ এইখানেই স্বরাজতন্ত্রীরা মাঞ্চুসম্রাটের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম খড়্গ ধারণ করেন। আজও এই অঞ্চলে স্বরাজবাদীগণের দল অতিশয় প্রবল। চীনের নানা স্থান হইতে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন পুষ্ট হইতেছে। কিন্তু হ্যান্‌কাওবাসীরা এই আন্দোলনে বাধা দিতেছে।

কন্‌সেশন সহরের রিক্‌শ চীনা সহরে প্রবেশ করিতে পারে না। চীনা সহরের রিক্‌শ কন্‌সেশন সহরে আসিতে পায় না। ইহার নাম "নিজ বাসভূমে পরবাসী"। হোটেল হইতে যে রিক্‌শতে বাহির হইয়াছিলাম, চী… সহরের সীমান্তে আসিয়া তাহা ছাড়িতে হইল। এইব… চীনা সহরের রিক্‌শতে বসা গেল। দুই সহ… আব্‌হাওয়া, আবেষ্টন, রাস্তা ঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদি… আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই অঞ্চলে পথগুলি এত সঙ্ক… যে রিক্‌শ চলাও কঠিন। দোভাষী বলিলেন—"আজক… এখানে যতটা পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা দেখিতেছেন ত… পুরাতন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরে দেখিতে পাইতেন না।"

নদীর ধারের বড় রাস্তার উপর ব্যবসায়ী-পরি… সমূহের গৃহ অথবা কন্‌সালাদির কার্য্যালয়। নদী… আমেরিকান, জাপানী, চীনা ও অন্যান্য ষ্টীমার এবং জাহ… ভাসিতেছে। সমুদ্র হইতে প্রায় ৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থ… পর্য্যন্ত অর্ণবযানের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি জগতের আর কে… দেশে আছে কিনা জানি না। হ্যান্‌কাও এই কার… জগদ্বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। অপরদিকে হ্যান্‌কাও চী… মধ্যস্থলে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদি… হইতেই হ্যান্‌কাও সহরে আসা যাওয়া করা যায়। ফল… আন্তর্ব্বাণিজ্য-বিষয়েও হ্যান্‌কাও প্রধানতম কেন্দ্র। … দুই কারণে বিদেশী বণিকগণ হ্যানকাও নগরের কন্‌সেশ… মহাল্লাকে বিশেষরূপে উন্নত করিতে যত্নবান্।

বস্তুতঃ ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্যই বিদে… রাষ্ট্রপুঞ্জ চীনসম্রাটের নিকট প্রধান প্রধান কেন্দ্রে খানিক… ভূমি চাহিয়া লইতেন। এই ভূমির উপর তাঁহারা নিজেদে… কার্য্য চালাইবার উপযুক্ত ঘরবাড়ী, জেটি, মালগুদা… ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা পাইতেন। বিদেশী… সহজে এই-সকল অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চীনসম্রা… ইঁহাদের কামানবন্দুকের প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হই… নানা সময়ে নানা জাতিকে এইরূপ অধিকার বা Concession বিতরণ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য বাণিজ্য-বিষয়ক অধিকার প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি রাষ্ট্রী… এবং আইন-বিষয়ক অধিকারও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলত… যে যে নগরের মধ্যে কনসেশন-মহাল্লা আছে সেই-সক… নগরের এই অঞ্চল যথার্থই চীনসরকারের বহির্ভূত। কন্‌সেশন-ভূমিতে এবং পরাধীন ভূমিতে বিশেষ পার্থক্য নাই।

হংকঙ ইংরেজের অধিকৃত পূরা পরাধীন ভূমি। সেইরূপ পোর্টআর্থারও পূরা পরাধীন ভূমি। কিন্তু টিনসিন, হ্যানকাও, শাংহাই ইত্যাদি ৪০।৫০ কেন্দ্রে কনসেশন-ভূমি মাত্র আছে। এই ভূমির উপর কোন এক বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার নাই। বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ সমবেত হইয়া সেই ভূখণ্ডের শাসন করিয়া থাকেন—কিন্তু চীনা সরকারের পক্ষে হংকঙ ও পোর্টআর্থার ইত্যাদি যেরূপ, এই-সকল কনসেশন-ভূমিও প্রায় সেইরূপ।

পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের কনসেশন ভূমি নাই। এই সহরের এক অংশে তাঁহাদের সকলের দূত ও প্রতিনিধি-গণের জন্য কার্য্যালয়ের উপযোগী স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। এই অংশে বিদেশী ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বাড়ীঘর দেখা যায় না। একমাত্র সরকারী কাছারি এবং দূতগণের বাসগৃহ এই অংশের বিশেষত্ব। পিকিঙ চীনের রাষ্ট্রকেন্দ্র, এইজন্য বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণের কার্য্যালয় এবং বাসগৃহ পিকিঙেই অবস্থিত। ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে, বার্লিনে, তোকিওতে, পারীতে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকেন্দ্রে এই ধরণের দূত-ভবন আছে। রাষ্ট্রদূতগণ স্বকীয় সরকারের প্রতিনিধি বা ডেলিগেট-স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অতিথিভাবে বাস করেন। এইজন্য দূতভবনকে লেগেশন (Legation) বা প্রতিনিধি-সৌধ বা অতিথিশালা বলা হইয়া থাকে।

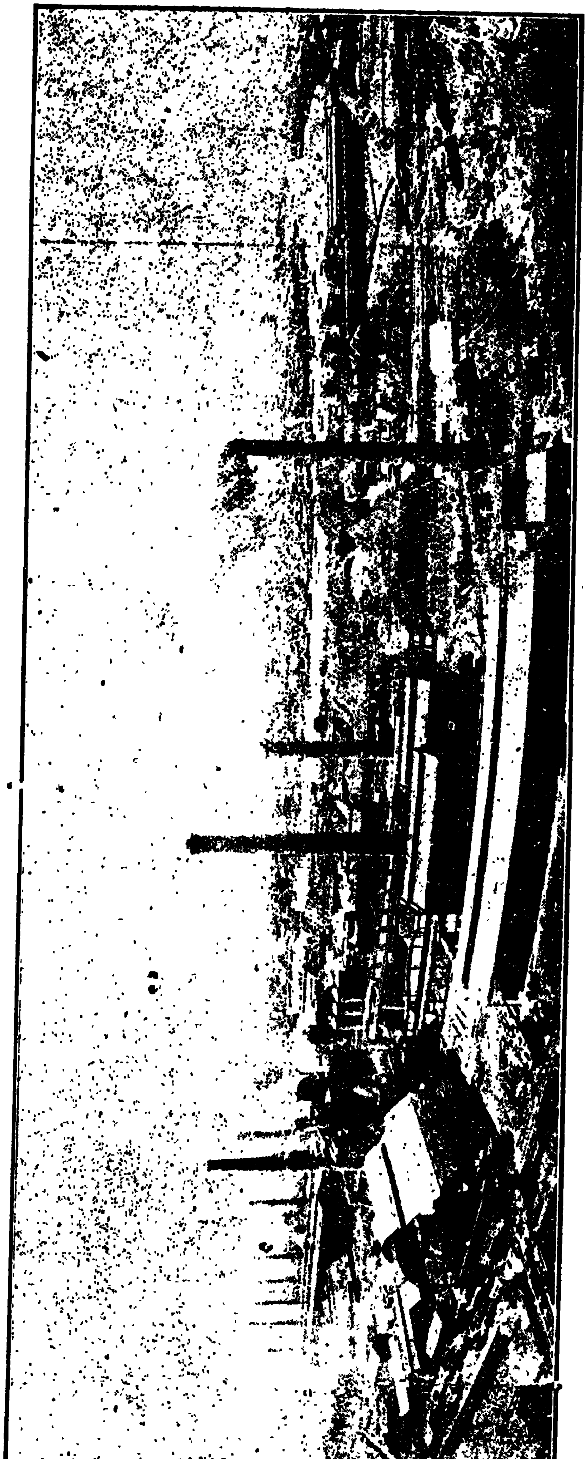
ইংল্যাণ্ড, জাপান, জার্ম্মানি ইত্যাদি প্রথমশ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তিগণ তাঁহাদের স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিনিধি-ভবন-সমূহকে সাধারণ চোখেই দেখিয়া থাকেন। এই-সকল প্রবল দেশে লেগেশন-গৃহগুলির প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধে সভ্য রাষ্ট্রের আতিথ্য আদব কায়দা যেরূপ হওয়া উচিত তাহার বেশী কিছু করা হয় না। কিন্তু পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রদূত-গণের ভবন চীনা সরকারের কার্য্যালয়-সমূহ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিনিধিগণের জন্য একটা জনপদ স্বতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই জনপদে একটা লেগেশন-সহর বা অতিথি-নগর গড়িয়া উঠিয়াছে। এরূপ লেগেশন-সহর দুনিয়ায় আর কোথাও নাই। লণ্ডনের ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দূতভবন অবস্থিত। তোকিওতেও কোন এক স্বতন্ত্র জনপদের মধ্যে সকল রাষ্ট্রদূতের ভবন নাই। কিন্তু পিকিঙে যাহা দেখিয়াছি হ্যানকাওর কনসেশন-মহাল্লা হইতে তাহাকে পৃথক্ করা কঠিন। কনসেশন-ভূমিতে বাণিজ্যাধিকারের সঙ্গে বিদেশীরা অন্যান্য যতপ্রকার অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন, পিকিঙের লেগেশন-ভূমিতে চীনাসরকারের অতিথিমাত্র হইয়াও তাঁহারা প্রায় সেই-সকল অধিকারই ভোগ করিতেছেন।

হ্যান-ইয়াঙে লৌহ-কারখানা।

ইয়াংসি পূর্ব্বে-পশ্চিমে প্রবাহিত। হ্যানকাওয়ের অপর পারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে উচাঙ নগর অবস্থিত। উচাঙ হুপে প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র। প্রাচীনতম কাল হইতেই উচাঙ চীনাসমাজে প্রসিদ্ধ। তিনহাজার বৎসর পূর্ব্বেও এবং কনফিউশিয়াসের আমলে এই অঞ্চলের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্যাগোডা-মন্দির এবং অন্যান্য অট্টালিকা অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। ১৯১১ সালের বিপ্লবে হ্যানকাও নগরের মন্দিরগুলি ধূলিসাৎ হইয়াছে—কিন্তু উচাঙের কতিপয় প্যাগোডা দণ্ডায়মান আছে।

এতদিন উচাঙই প্রধান ছিল—হ্যানকাও মাত্র একটা ধীবর-পল্লীরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী রাষ্ট্রের কনসেশন এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর ইংরেজেরা সর্ব্বপ্রথম এই আধিপত্য ভোগের অধিকার পান। বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে হ্যানকাও উচাঙকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—এমন কি সমুদ্রবন্দর শাংহাইকেও পরাস্ত করিতে অগ্রসর। জাপানের ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং কোবে যেরূপ অল্পকালের ভিতর দ্রুত উন্নতির সাক্ষী, মধ্যচীনের হ্যানকাও নগরও সেইরূপ।

চীনারা হ্যানকাওকে নয়প্রদেশের প্রবেশদ্বার-রূপে বর্ণনা করিয়া থাকে। চীনের আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্যে ইহার মূল্য এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ শিকাগো যেরূপ ইয়াঙ্কিস্থানের বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র, হ্যানকাও সেইরূপ চীনের ভিতরকার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। সম্প্রতি হ্যানকাও হইতে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত ১৮০০ মাইল বিস্তৃত রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে। তাহার প্রভাবে



হানইয়াঙ লৌহ-ক ....

হ্যানকাও আরও উন্নত হইবে। অধিকন্তু জলপথে সুদূ দেশের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ত আছেই।

হ্যানকাও নগরের শিল্পসম্পদও নগণ্য নয়। প্রাচী ধরণের নানা শিল্প-কারখানা উচাঙ-হ্যানকাও জনপদে ব কাল হইতেই আছে। আধুনিক রীতির কলকারখানা বর্ত্তমান যুগে স্থাপিত হইয়াছে। বয়নফ্যাক্টরি, দিয়াশলাই ফ্যাক্টরি, তামাক ফ্যাক্টরি ইত্যাদি কারবারে বাষ্পে ব্যবহার এবং যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত। এই-সমুদয়ে কোন কোনটা বিদেশী ধনীদিগের সম্পত্তি—চীনাদে অধীনেও বহুসংখ্যক নব্য-কারবার চলিতেছে। বস্তুত এই-সকল স্বদেশী শিল্পের প্রভাবে বিদেশী দ্রব্যে আমদানি চীনে অনেকটা কমিয়াছে। এই হিসাবে চীনাদে অবস্থা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই।

চীনের মধ্যে একটিমাত্র লৌহ-কারখানা আছে তাহাও এই জনপদেই অবস্থিত। স্থানের নাম হ্যান ইয়াঙ। ইহার প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত উ (Woo) মহাশয়ের সঙ্গে আমেরিকা হইতে হনলুলু আসিবার সময়ে আলাপ হইয়াছিল। ইঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য হ্যান্-ইয়াঙ যাত্রা করিলাম।

রুশ-কন্‌সেশনের ঘাটে একটা ক্ষুদ্র ষ্টীমলাঞ্চে বস গেল। ইহা লৌহকারখানা কোম্পানীর সম্পত্তি এখান হইতে ১৫মিনিটে হ্যান্-ইয়াঙে পৌঁছিলাম। প্রথমে ইংরেজ-কন্‌সেশনের ঘাট, বাঁধ এবং অট্টালিকা-সমূহ দৃষ্টিগোচর হইল। পরে চীনা সহরের ঘাট এবং বাড়ী ঘর দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বত্রই ষ্টীমার, জাহাজ ও নৌকার গতিবিধি দেখিতেছি। যতই চীনা মহাল্লার দিকে অগ্রসর হইতেছি ততই স্বদেশী বণিক-তরণীর সংখ্যা বেশী দেখিতেছি। আমরা গঙ্গার উপর পাটনাই নৌকা, ঢাকাই নৌকা ইত্যাদির সারি দেখিয়া থাকি। ইয়াংসি-বক্ষে সেইরূপ বিভিন্ন চীনা প্রদেশের স্বদেশী নৌকা দেখিলাম। এই সকল "Junk"এর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক নাম আছে।

হ্যান্‌কাও হইতে হ্যান্-ইয়াঙ যাইতে হইলে নদীর উপর উজান চলিতে হয়। লাঞ্চে একসঙ্গে দুই কিনারার দৃশ্যই দেখিতে পাইতেছি। ইয়াংসির প্রস্থ এখানে দুই মাইল হইবে। উচাঙের পারে অনতিদূরে পাহাড় দেখা যায়—

সহরটা যেন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। পুরাতন নগর-প্রাচীরও দেখা গেল।

ক্রমশঃ অগণিত বণিক্-তরণীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইগুলি হ্যান্‌কাওয়ের পারেই দেখিতেছি। চীনের এক প্রসিদ্ধ নদী এই স্থানে ইয়াংসিতে মিশিয়াছে। তাহার নাম হ্যান্। দুয়ের সঙ্গমস্থলে সময়ে সময়ে ৩০,০০০ এমন কি ৪০,০০০ নৌকাও বাঁধা থাকে। ইয়াংসিতে বেশীক্ষণ থাকা নৌকা-সমূহের পক্ষে নিরাপদ নয়। এইজন্য মাঝিরা এই দ্বিতীয় নদীর কূলে কূলে লঙ্গর করিয়া মাল-বিনিময় করে। এত নৌকা সমবেত হয় যে ৫।৬ মাইল পর্য্যন্ত ইহাদের সারি দেখা যায়। লাঞ্চ হইতে বুঝিলাম যেন এই হ্যান্-ইয়াংসি-সঙ্গমে মাস্তুলের জঙ্গল দেখিতেছি। এই বিরাট মাস্তুল-জঙ্গল দেখিলেই চীনাদের স্বদেশী আমদানি রপ্তানির পরিমাণ আন্দাজ করা যায়।

হ্যান্-ইয়াংসির সঙ্গমেই Iron and Steel Works অবস্থিত। এইখানে একটা পাহাড়ের উপর পুরাতন মন্দির-সদৃশ অট্টালিকা দেখা গেল। বিপ্লব পক্ষীয় সৈন্যগণ ১৯১১ সালে এই পাহাড়ে এক বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। হ্যান্‌ইয়াঙে গোলা-বারুদের কারখানা এবং ইটের কারবারও আছে।

লোহকারখানা প্রায় বিশ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। আজকাল এখানে ২৫০০ শ্রমজীবী কর্ম্ম করে। বিদেশী ওস্তাদ বা অধ্যক্ষ একজনও নাই। প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে জার্ম্মান এঞ্জিনিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা যুবকগণ কর্ম্ম করিতেছেন। ইঁহাদের নায়কতায় কারখানার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র শিল্প-বিদ্যালয়ও পরিচালিত হইতেছে। রেলের লাইন, সেতুর বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি প্রস্তুত করাই এই কারখানার উদ্দেশ্য; এঞ্জিন তৈয়ারি করা হয় না।

কর্ম্মকর্ত্তারা বলিলেন—"আপনাদের সাকৃচিতে তাতা-প্রতিষ্ঠিত যে কারখানা আছে তাহার তুলনায় আমাদের এই কারবার খেলানার সামগ্রী মাত্র।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হ্যান্‌ইয়াঙে এই কারবার খুলিবার কারণ কি? আশে-পাশে খনি আছে কি?" উ বলিলেন—"উচাঙ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার খেয়াল বলা যাইতে পারে। এখান হইতে কয়লার খাদ ১০০ মাইল পশ্চিমে এবং লোহার খনি প্রায় ৭০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কাজেই ইহাদের মধ্যবর্ত্তী কোন কেন্দ্রে কারখানা স্থাপন করা যুক্তি সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছিল। শাসনকর্ত্তা বুঝিলেন তাঁহার রাজধানীর সম্মুখে এই নব্য-কারবার খুলিলে উচাঙ-হ্যানকাও জনপদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।"

এই কারবার হইতে এখনও লাভ বাহির হয় নাই। আজ ইংরেজের নিকট কর্ত্তারা টাকা ধার লইতেছেন, কাল জার্ম্মানের নিকট ধার লইতেছেন। এক্ষণে জাপানের টাকাই বেশী খাটিতেছে। কাজেই জাপানের প্রভাব ইহা পরিচালনায় বিশেষ লক্ষিত হয়। ইংরেজ জাপানকে এইরূপ অনেক কারণে ইয়াংসি অঞ্চলে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করিতেছেন।

চীনের ভিতর ফরাসী, জার্ম্মান, ইংরেজ, আমেরিকান ও জাপান রাষ্ট্রসমূহ নানা স্থানে রেলওয়ে নির্ম্মাণের অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহারা এই কারখানা হইতে সকল-প্রকার সরঞ্জাম খরিদ করিতে বাধ্য। এইরূপ চুক্তি আছে বলিয়া এখানকার মাল পড়িয়া থাকে না। চীনা সরকার এই উপায়ে কারখানাকে "সংরক্ষণ" করিতেছেন। এই চুক্তি না থাকিলে বিদেশী রেল-মহাজনেরা তাঁহাদের স্বদেশ হইতেই লোহালক্কড় আনাইতেন। ভারতীয় রেল-কোম্পানীরা বিলাত হইতেই মাল আনাইয়া থাকেন। সম্প্রতি তাতার কারখানা বিলাতী কারখানাগুলির প্রতিযোগী হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় কে জয়ী হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত।

চীনের নুন-কর ও রাজস্ব বিভাগ।

দুইজন ইয়াঙ্কির সঙ্গে আলাপ হইল। একজন আকর-তত্ত্ববিৎ, দশ-বার বৎসর কাল চীনের নানা স্থানে খনন-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; অপর-জন চীনা সরকারের নুন-কর বিভাগে কর্ম্মচারী।

চীনে কর আদায় করা এক বিষম কাণ্ড। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গবর্মেণ্টের কার্য্য-তালিকা অত্যল্প ছিল। কাজেই অল্প মাত্র কর পাইলেই গবর্মেণ্টের খরচ চলিয়া যাইত। বিভিন্ন

প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট এবং জেলা-গবর্মেণ্টগুলি মূল গবর্মেণ্টের অধীনতা বেশী স্বীকার করিতেন না। এদিকে তাঁহারাও জনসাধারণ হইতে অল্পমাত্র খাজনা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। মধ্যযুগে ইয়োরোপে এবং ভারতবর্ষেও অনেকটা এই অবস্থা ছিল।

চীনে আজও সেই অবস্থা রহিয়াছে। প্রদেশ-সমূহ এক-প্রকার পরস্পর স্বাধীন বলিলেই চলে। এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে মাল চালান করিতে হইলে ব্যবসায়ীগণকে শুল্ক দিতে হয়। সকল প্রদেশ যে এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত সেই ধারণা জন্মে নাই। অধিকন্তু এক এক প্রদেশে এক এক নিয়ম প্রচলিত। তাহার উপর শুল্ক আদায় হইলে তাহা অনেক সময়ে সরকারী কোষাগারে পৌঁছে না।

এই-সকল অসুবিধা নিবারণ করিবার জন্য চীনা গবর্মেণ্টকে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। সম্প্রতি ইংরেজ কর্ম্মচারী এক বিভাগের কর্ত্তা—উহা Salt Gabelle বিভাগ। এই ব্যক্তি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কর্ম্ম করিতেন—এক্ষণে চীনে রহিয়াছেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা বিদ্যালয়-স্বরূপ। এইখানে অভিজ্ঞতা লাভ করিলে কর্ম্মচারীরা মিশর, পারস্য, চীন ইত্যাদি দেশে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

ইংরেজ কর্ম্মচারীর অধীনে নুন-কর বিভাগে যথেষ্ট শৃঙ্খলা আসিয়াছে—চীনাস্বরাজের ধনাগমও বাড়িয়াছে। চীনাদের আর-একটা রাজস্ববিভাগ ইংরেজের অধীনে বহুকাল হইতে পরিচালিত হইতেছে। বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জের বণিকগণ সমুদ্রপথে চীনের নানা বন্দরে মাল আমদানি করে। তাহাদের উপর Custom-Duty বা শুল্ক বসান চীনাদের রীতি। কিন্তু এই শুল্ক আদায় করিয়া উঠা চীনাদের ক্ষমতায় কুলায় নাই। এই কারণে Maritime Custom অর্থাৎ সামুদ্রিক শুল্ক বিভাগ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজের শাসনে আসিয়া শুল্কের পরিমাণ যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে। এই দুই বিভাগে আজকাল প্রায় ২৷৩ হাজার ইংরেজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-শাসিত দেশ; চীনের স্বরাজও কি ব্রিটিশ-শাসিত নয়? আবার শুনিতেছি ভূমিকর বিভাগও নাকি ইংরেজের হস্তে প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক, চীন সরকার যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা ত অ[illegible] করিতেছেন। কিন্তু এই ধন তাঁহার কোষাগ[illegible] থাকিতে পায় কি? এবিষয়ে চীনের দুর্ভাগ্য [illegible] নয়। নুন-কর এবং আমদানি-কর উভয়ই বিদে[illegible] উত্তমর্ণগণের নিকট বন্ধক রহিয়াছে। ১৮৯৪ স[illegible] জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে চীনগবর্ণমেণ্ট পাশ্চ[illegible] দেশে টাকা ধার লন। তাহার পর ১৯০০ খৃষ্টা[illegible] বক্সার নামক স্বদেশ-সেবকেরা বিদেশীদিগকে [illegible] হইতে তাড়াইবার আয়োজন করেন। সেই প্র[illegible] বিফল হয়। পক্ষান্তরে বিদেশী রাষ্ট্রপুঞ্জ [illegible] সরকারের নিকট Indemnity বা ক্ষতিপূরণ চাহে[illegible] সেই টাকা দিবার ক্ষমতা চীনাদের ছিল না। কা[illegible] উহাও ঋণ। তাহার পরে দেশের মধ্যে রেল প্রতি[illegible] এবং সুশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্যও টাকা আবশ্[illegible] হয়। এই টাকাও বিদেশের উত্তমর্ণগণ হইতে আসিয়াছে। অবশেষে ১৯১১ সালে স্বরাজ স্থাপি[illegible] হইবার পর শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য বিরাট ঋণ গ্র[illegible] করা হয়। প্রত্যেকবার টাকা ধার দিবার সময়ে বিদেশী যথোচিত Security বা জামিন বন্ধক চাহিয়াছেন চীনের রাজস্ববিভাগ চিরকালই অকর্ম্মণ্য। বিদেশী[illegible] বলিলেন "তোমাদের অমুক অমুক বিভাগে যত আ[illegible] হইবে সবই বন্ধক রাখ। অধিকন্তু ঐ-সকল বিভা[illegible] পরিচালনায় বিদেশী কর্ম্মচারী নিযুক্ত কর।" চী[illegible] সম্মত না হইয়া কি করিবেন?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

অকর্ম্মার ক্ষমতা

১

ব্রাহ্মণের বাছুর—চল ভাই পাল্লা দিয়ে
এক দৌড় দি।
গোয়ালার বাছুর—শুয়ে ন্যাজ নাড় দেখি,
দৌড়ে কাজ কি?

২

য়ুরোপ—চল যাই রণক্ষেত্রে একচোট লড়ি;
এসিয়া—কাজ নাই, শিবনেত্রে মালা জপ করি।

শ্রীক্ষীরোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

বর্ণ, শ্রেণী ও জাত

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

আমি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি, হিন্দু মূল-গ্রন্থাদি অনুসারে, চারি জাতের পদ-মর্য্যাদা সমান ছিল না। এই চারি জাত দুই দলে পরিণত হইয়াছিল,—এক দলের ভিতর তিনটি উচ্চশ্রেণীর জাত এবং অপর দলের ভিতর কেবল একটি মাত্র জাত সন্নিবিষ্ট।

প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত "আর্য্য"গণ অথবা আর-এক নামে অভিহিত—"দ্বিজ"গণ। দীক্ষাপ্রদত্ত নব-জন্মগ্রহণের দ্বারা এই দ্বিজদিগের স্বাভাবিক জন্ম দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দীক্ষা-সংস্কার হইতে বর্জ্জিত শূদ্রেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা বা শাস্ত্রালোচনা করিতে পারে না,—কেননা তাহার পূর্ব্বে দীক্ষা অপরিহার্য্য। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানও করিতে পারে না। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাই উচ্চশ্রেণীর জাতেরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করে। বড়-জোর তাহারা কতকগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে। কেবল ইহারই দ্বারা খুব সামান্য পরিমাণে সাধারণ সমাজের মধ্যে তাহারা একটা স্থান পায়। দীক্ষার দ্বার দিয়াই মহৎ আর্য্যবংশের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়; মনু স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, এই দ্বিতীয় জন্ম পার না হইলে, আর্য্যও শূদ্র হইতে উৎকৃষ্ট নহে। অতএব এইরূপ বিভাগ অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা শুধু সামাজিক বিভাগ নহে—ইহা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিভাগ। তিন উচ্চ জাতের কোন মৃত ব্যক্তিকে শূদ্র যদি বহন করে তাহা হইলে সে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কতকগুলি দোষের নিন্দা করিতে হইলে, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে ঐ দোষের জন্য উহারা শূদ্রের সামিল হইয়া পড়িয়াছে; অর্থাৎ স্বজাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। মনু বলেন, শূদ্রের কোন "পাতক" হইতে পারে না। বস্তুত শূদ্র এমন কোন দোষ করিতে পারে না, যাহার দরুন তাহার অধঃ-পতন হইতে পারে। এমন কোন উচ্চ স্থানে তাহারা উঠিতে পারে না, যেখান হইতে তাহারা নীচে পড়িতে পারে।

আমরা যে-যুগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই যুগে এই গভীর-অঙ্কিত ভেদাভেদের অনুরূপ একটা জাতিগত পার্থক্য থাকাই সম্ভব। শূদ্রদিগের শাসনাধীনে যে-সকল লোক ছিল তাহারা কেবলই আদিম-দেশবাসী —(উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে স্থানান্তরে যাত্রাকালে আর্য্যেরা যাহাদিগের সংস্রবে আইসে) অথবা কতকগুলা মিশ্রজাতের অন্তর্ভুক্ত, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এ কথাটা গৌণকল্পের কথা। গোড়ায় নিশ্চয়ই আর্য্য ও শূদ্রের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে একটা জাতিগত বিরোধ ছিল। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে, একটা অপরিহার্য্য মিশ্রণ সংঘটিত হইয়া ঐ মিশ্রণ উহাদের মধ্যে ব্যবধান ও নীতিগত বিরোধের লাঘব করিয়াছে, কিন্তু স্মৃতিকে কখনই মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

শূদ্রের প্রতি কতদূর অবজ্ঞা ও বৈরিতা প্রদর্শিত হইত তাহা কি বিচার করিয়া দেখিতে ইচ্ছা কর ?—একটা বচনে—শূদ্রের হত্যা এবং গির্গিটি ময়ূর ও ভেকের হত্যা একই সীমা-রেখার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে; কোন শিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, গুরুকে গুরু-দক্ষিণা দিবার জন্য অনায়াসে একজন শূদ্রকে গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিজগণের সম্মুখে এমন-কি বাহ্য-সম্বন্ধেও—যদি কোন শূদ্র যথোচিত ব্যবধান রক্ষা করিয়া না চলে, তাহা হইলে তাহাকে খুব কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।

ব্রাহ্মণদিগের সাহিত্যে শূদ্র ও আর্য্যের মধ্যে অর্থাৎ দ্বিজগণের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ সম্বন্ধ—একটা বৈরিতার সম্বন্ধ ধর্ম্মশাসনের ন্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শূদ্র ও আর্য্য এই দুই শব্দে শুধু যে পদমর্য্যাদার অসমতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, পরন্তু দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ঐতিহ্যের মধ্যে গভীরতর যুঝাযুঝির ভাব প্রকাশ পায়। বৈদিক মন্ত্রাদিতে দেখা যায়, উহাদের মধ্যে পুরাপুরি সংগ্রাম চলিয়াছিল।

বর্ণ—আক্ষরিক অর্থে রং—সংস্কৃত ভাষায় জাতের নামে চলিয়া গিয়াছে। এই সম্বন্ধে "বাদ-সাদ" দিয়া যাহা কিছু আছে তাহা আমি পরে দেখাইব। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত, মতবাদ-সিদ্ধ চারি জাত "বর্ণ"-নামেই নিয়ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই অর্থ বেদে নাই। দুই পরস্পর-বিরোধী উক্তি সম্বন্ধেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা "আর্য্য-

বর্ণ" ও "দাসবর্ণ"। উহাদের কতকগুলি পর্য্যায়-শব্দ আছে যাহা আরো স্পষ্টার্থবাচক, যথা "কৃষ্ণচর্ম্ম," "কৃষ্ণ মনুষ্য"। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধপক্ষ বুঝাইবার জন্যও কখন-কখন "কৃষ্ণবর্ণ" প্রযুক্ত হয়। এই-যে বৈপরীত্যবাচক উক্তি, আরো কিছুকাল পরে, উহারই অনুরূপ উক্তি এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যথা:— "আর্য্য" ও "শূদ্র", "আর্য্যবর্ণ" ও "শূদ্রবর্ণ"।

একটা ক্রমপরিণাম-সূত্রে, পরে এই "বর্ণ"শব্দ দুই বিভিন্ন বৈরীজাতির ভেদ নির্দ্দেশ করিতে লাগিল—অপেক্ষাকৃত শ্বেতচর্ম্মের ভেদ ও কৃষ্ণচর্ম্মের ভেদ। পরবর্ত্তী সাহিত্যে আর্য্য-বংশোদ্ভব তিন জাত "আর্য্যবর্ণ" বলিয়া অভিহিত হইলেও গোড়ায় উহা একবচনাত্মক "আর্য্যবর্ণ" ছিল। সমস্ত "ফর্সা-রং"-বিশিষ্ট জাতি সাধারণভাবে "আর্য্যবর্ণ" বলিয়া অভিহিত হইত।

অতএব ইহা নিশ্চিত, যে, এই পদ্ধতির শব্দপ্রয়োগ একটা বিভিন্ন অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রেণী-বিভাগের সুবিধার জন্য এইরূপ প্রয়োগের আরম্ভ হয়—গোড়ায় ইহার অর্থ অন্যরূপ ছিল। পরে আদিম অর্থ হইতে একটু তফাৎ হইয়া পড়ে। এই কথাটি যেন আমরা মনে রাখি।

বৈদিক যুগের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণাই থাকুক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, বৈদিক সূক্ত ও মন্ত্রের মধ্যে, তিনটি বৃহৎ শ্রেণীভেদ দেখা যায়, যথা:—পুরোহিত, অধিপতি, ও সাধারণ লোক; আমরা দেখিতে পাই, বিভিন্ন নামে, এই পুরোহিতগণ যজ্ঞকার্য্যে যজ্ঞের আনুষঙ্গিক মন্ত্রাদি রচনায় ব্যাপৃত। যুদ্ধবিগ্রহ ও জনসভার মধ্যে আমরা অধিপতিকে দেখিতে পাই। সাধারণ লোক সম্বন্ধে বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায়। তাহারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ "কুল বা গোত্রের" অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তাহারা অধিপতি বা রাজাকে ঘিরিয়া থাকে।

তখন হইতেই পুরোহিতের কার্য্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়; অন্যের অনধিকার চর্চ্চা হইতে তাহারা সুরক্ষিত হয়। সর্ব্বত্রই রাজার ক্ষমতা, অথবা সাধারণতঃ রাজন্যবর্গের পদগৌরব স্থিরনির্দ্দিষ্ট হইয়া, ন্যূনাধিক পরিমাণে কুলানুক্রমিক হইয়া পড়ে। এই ত্রিবিধ শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে, এতৎসংক্রান্ত শাস্ত্রীয় উপদেশাদির ম[illegible] আধুনিক "জাত"-সংক্রান্ত মতবাদে বা ব্যবহারে [illegible] সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই [illegible] শব্দের মধ্যে কখন কখন নৈকট্য স্থাপিত হইয়াছে, [illegible] যায়। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, এই তিন শ্রেণীই [illegible] জাতির অন্তর্ভুক্ত। একটা শ্লোকে আমরা দেখি[illegible] পাই,—"বিশগণ স্বতই 'রাজার' সম্মুখে মস্তক অবনত ক[illegible] এবং 'ব্রাহ্মণ' রাজার পুরোবর্ত্তী।" পুরোহিতের ক্ষ[illegible] তখন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল ইহা স্বীকার করিলেও ক্ষমতার ঠিক্ অবস্থাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়; রাজ[illegible] পুরোহিতের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে, সমগ্র প্রজামণ্ডলীর স[illegible] রাজা ও পুরোহিতের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বেশ [illegible] যায়। আমরা দেখিতে পাই এই শ্রেণীগুলি ন্যূনা[illegible] পরিমাণে রুদ্ধদ্বার ও পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ; [illegible] তবু ইহারা শ্রেণী মাত্র—"জাত" নহে।

তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যাইতে পারে [illegible] ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদের তিন প্রধান জাত, উক্ত ত্রিবিধ শ্রে[illegible] ঠিক্ অনুরূপ। কিরূপে এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যাই[illegible] পারে?

তিনটি জাত যে-যে নামে অভিহিত হইয়া থাকে তন্ম[illegible] কেবল "ব্রাহ্মণ" এই নামটি বৈদিক সূক্তে প্রাপ্ত হওয়া [illegible] (যে "পুরুষে"র কথা উপরে বলা হইয়াছে এবং যিনি [illegible] পদ্ধতিটাকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, সুবিধা-মত, সেই পুরু[illegible] মুখ হইতেই এই সূক্তটি বাহির করা হইয়াছে। ইহ[illegible] উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা আমরা পরে তলাইয়া দেখিব [illegible] ইহাও অতি বিরল। আদিম "ব্রহ্মণ"ই পুনঃ পুনঃ পাও[illegible] যায়; ইহা ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। সমস্ত পৌরোহিতিক ক্রিয়া-কর্ম্ম[illegible] একই ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত করিবার জন্য এই শব্দটি নির্দ্দি[illegible] হইয়াছে। যোদ্ধৃবর্গের দুই উপাধি "ক্ষত্রিয়" ও "রাজন্য" ক্ষত্রিয় উপাধিটি, ক্ষমতা-অর্থে দেবতাদিগের নামের সহি[illegible] অনেকবার সংযোজিত হইয়াছে, দুই-একবার অধিপতিদিগে[illegible] নামের সহিতও সংযুক্ত হইয়াছে, (ঐ বাক্যগুলি আধুনি[illegible] যুগের বলিয়া সন্দেহ হয়) কিন্তু "রাজন্য" শব্দ একেবারে অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে, সাদাসিধা "রাজন্" শব্দটি অভিজা[illegible] বর্গের প্রচলিত উপাধি; "ক্ষত্র" এই শব্দের ভি[illegible]

রাজকীয় ক্ষমতা নিহিত। বৈদিক সূক্তাদির মধ্যে "বৈশ্য" শব্দ অপরিচিত; বহুবচনান্ত আদিম "বিশ" শব্দ সেই-সব "কুল" বা "গোষ্ঠী"-সমূহের নাম—যাহাদের লইয়া দেশের সমস্ত জনসাধারণ সংগঠিত। আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত "ব্রহ্ম," "ক্ষত্র" ও "বিশ" এই ত্রিবর্গ কেবল মাত্র বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের পরবর্ত্তী সাহিত্যে, এই ত্রিবর্গ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যে-সকল গ্রন্থে কখন কখন "ব্রাহ্মণ", ক্ষত্রিয়", "বৈশ্য" ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-সকল গ্রন্থেও "ব্রহ্ম", "ক্ষত্র" ও "বিশ", এই ত্রিবর্গের বারম্বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতেই উহার উৎপত্তির প্রাচীনত্ব সূচিত হয়।

আমার বিবেচনায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, উহা কোন পারিভাষিক বিদ্যা হইতে উৎপন্ন। যে নিয়ম-পদ্ধতির সহিত উহা যোগসূত্রে আবদ্ধ সেই নিয়ম-পদ্ধতিটি বেদ-প্রতিভাত অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম বলিয়া বোধ হয় না। ঐ শব্দ-গুলির মধ্যে যে নিয়মপদ্ধতি আবদ্ধ রহিয়াছে, উহা বিচার-বিবেচনার ফল বলিয়া মনে হয়, একটা সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সহিত, অন্ততঃ আদিম ত্রিবর্গ বিভাগ-প্রসূত একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার সহিত উহাকে উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদের দ্বারা বৈদিক সাক্ষ্যসমূহের ব্যাখ্যা করিলে তবেই প্রকৃত সম্বন্ধটা ফিরিয়া পাওয়া যায়।

আর্য্যশাখাবংশসমূহের নীচে, চিরন্তন বৈরীরূপে কেবল "দাসবর্ণ"ই বৈদিক সূক্তাদিতে বর্ণিত হইয়াছে; উহারা শত্রুজাতি, উহাদের আর-এক নাম "দস্যু"। বৈদিক সূক্তাদিতে শূদ্রের উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে সাহিত্যে "দস্যু" শব্দ পুনর্ব্বার গৃহীত হইয়াছে এবং উহারা লোকসমাজের নিম্নতম স্তরে স্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যিক সমাজ-কাঠামের ভিতর দস্তুরমত উহাদের কোন স্থান নাই। কখন কখন—এমনকি বর্ত্তমানকালেও—উহারা সমাজ-বহিষ্কৃত বা চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হয়, বৈদিক যুগে শূদ্রের অনুরূপ কোন নিম্নস্তরের লোক ছিল না—আর্য্য সমাজের একেবারে বাহিরে ছিল না, অথবা এমন একটা শিথিল-বন্ধনের অধীনতা উহাদের ছিল যে তাহাতে তাহাদের পক্ষে বিশেষ কোন হীনতা হয় নাই—নয়, যদিবা কোন নিম্নস্তর সে সময়ে ছিল এরূপ হয়,—যে-সকল কবিদের গান আমাদের হস্তে আসিয়া পৌছিয়াছে সেই-সকল গানের রচয়িতা কবিগণ উহাদিগের জন্য কোন পৃথক্ স্থান নির্দ্দেশ করা,—সাধারণ দস্যুসমূহের বাহিরে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা—আবশ্যক মনে করেন নাই। বৈদিক যুগের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে যে এই পদ্ধতিটা বিকাশলাভ করে নাই—প্রত্যুত উহা একটা সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি—ইহা তাহারই আর-একটা অভিনব প্রমাণ।

বেদোক্ত "বিশ"গণ যে বিশেষ-কোন জাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, "পুরোহিত" ও "অধিপতি" শ্রেণীর বাহিরে—কেবল সাধারণ জনসমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল,—ইহার যে-নিদর্শন আমরা পাইয়াছি তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদ, আদিম "বিশ" হইতে যে "বৈশ্যের" ব্যুৎপত্তি করিয়াছে, তাহা কতকটা খামখেয়ালি ধরণের, ও ইতিহাসের হিসাবে অলীক। "অর্য্য" শব্দ বৈদিক সূক্তাদিতে ব্যবহৃত হইলেও—উহা "আর্য্য" শব্দেরই পর্য্যায়-শব্দ, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু বিশেষরূপে বৈশ্যদিগের সম্বন্ধেই উহার প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব ইহা খুব স্মরণে রাখা আবশ্যক যে বৈশ্যেরাই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন লোক ছিল; সাধারণ লোকের স্থূলাংশ উহারাই ছিল। যাহাকে প্রকৃতপক্ষে "জাত" বলা যায়, সেই জাত অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, এক একটা বিশেষ ব্যবসায়ে ব্যাপৃত, একটা সাধারণ বংশের বন্ধনে আবদ্ধ, কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন, কতকগুলি নিজস্ব প্রথার দ্বারা পরিশাসিত। সুতরাং উপরি-উক্ত অস্পষ্ট দলবিভাগের সহিত "জাতের" আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

আমি এযাবৎকাল স্বীকার করিয়া আসিয়াছি—এবং সকলেই সচরাচর স্বীকার করিয়া থাকে যে,—ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদে "বর্ণ" শব্দটি "জাতে"র ঠিক অনুরূপ। আমি যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা আমার পাকা স্বীকারোক্তি নহে; স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আপাততঃ মানিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র। আমি আমার এই স্বীকা-রোক্তিটাকে একটু সীমাবদ্ধ করিতে চাহি।

প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বী লোক-সমূহের মধ্যে রংএর ভেদ, 'বর্ণ'

শব্দে সূচিত হয়। পরে ঐ-সকল লোক খণ্ডাংশে আরো বিভক্ত হইয়া পড়িলে, বর্ণ শব্দ "সাদা" "কালো" এই দুই আদিম বর্ণে আবদ্ধ না থাকিয়া আরো বিস্তার লাভ করিল, এবং বর্ণ শব্দ আরো অসংখ্য পর্য্যায়ের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। উহা মূলোৎপত্তির সমস্ত পদাঙ্ক-রেখা হারায় নাই। বর্ণ শব্দে সাধারণভাবে জাত বুঝায় না, পরন্তু কেবলমাত্র "চারি জাত" বুঝায়। "হরিবংশে"র কোন এক স্থানে যাহাকে "চারি বৈধ জাতি" বলা হইয়াছে, এই বর্ণ শব্দ কেবল সেই "চারি জাতি"র সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গৌণকল্পের জাতগুলা বা মিশ্রজাতগুলা—যাহা ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদসঙ্গত বিভাগের অনুরূপ নহে পরন্তু যাহা প্রকৃত জাতের অনুরূপ, (যে জাতকে জীবন্ত ভাবে আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি)—ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ-সকল অপ্রধান ও মিশ্র জাতের আর-একটা নাম আছে—তাহা "জাতি"। এই "জাতি" শব্দ ঠিক্‌ "জাতের" মর্ম্মার্থই প্রকাশ করে; কেননা "জাতি"র অর্থ "জন্ম, বংশ"। আমার বিশ্বাস, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা সর্ব্বত্রই জাতিশব্দ এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, "পরিবার" বা "গোত্র" অর্থে নহে। এই দুই শব্দের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যের প্রতি সম্যক্‌ লক্ষ্য না করায় অনেকেই ভুল করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদের ভিতর যে দুই উপাদান সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায় সেই উপাদানগুলির স্মৃতি এই পার্থক্যের দ্বারা খুব নিম্নতরযুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে:—

কোন এক দূর-অতীতের সঞ্চয়-ভাণ্ডার যে-বেদ, সেই বেদ হইতে এমন-এক শ্রেণীবিভাগের আভাস পাওয়া যায়, যাহার সহিত ইরাণের শ্রেণীবিভাগের তুলনা করিয়া এবং আরো অন্যান্য নিদর্শন দেখিয়া, বেদোক্ত শ্রেণীবিভাগের বহুপ্রাচীনত্বের সম্বন্ধে অকাট্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সামাজিক সাহিত্যে, উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, জাতের পদ্ধতিটা আমরা অবগত হই। এই সাহিত্য বৈদিক ঐতিহ্যের নিগড়ে বন্দী হইয়া, বৈদিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারিত্ব অসংকোচে মানিয়া লইয়াছে। অতীতের স্মৃতি ও বর্ত্তমানের বাস্তবতা উভয়ে মিলিয়া-মিশিয়া একটা খিচুড়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবন্ত জা[illegible] পদ্ধতিটা প্রাচীন বংশ-বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগের কাঠ[illegible] মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই-সকল অসঙ্গ[illegible] ভীত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ের আলোচনা [illegible] বিরত হন নাই। জাত খণ্ডাংশে বিভক্ত হওয়ায় [illegible] মধ্যেও শ্রেণীবিভাগের ভাবটা রহিয়া গিয়াছি[illegible] তাহাতেই তাঁহাদের কাজ আরো সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

আজিকার দিনেও, শ্রেণীগতগর্ব্ব সমস্ত ব্রা[illegible] মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। অসংখ্য জাতের যে অসমতা, যে পার্থক্য বিদ্যমান, ব্রাহ্মণের শ্রেণীগত [illegible] তাহার মূলে। এই শ্রেণীগত গর্ব্ব আরো প্রকাশ পা[illegible] কথা সেই সময়ে যখন আর্য্য জাতির সংখ্যা কম [illegible] জাতিসংমিশ্রণ ততটা অগ্রসর হয় নাই, লোকেরা খণ্ড[illegible] ততটা বিভক্ত হয় নাই। এমন-কি অভিজাত যোদ্ধ[illegible] মধ্যেও শ্রেণীগত স্বার্থ, একটা প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ[illegible] রক্ষা করিতে ও একপ্রকারে সাম্য বজায় রাখিতে [illegible] হইয়াছিল। নিশ্চয়ই, এই ভাবটি, এই আপেক্ষিক এব[illegible] —উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও পাণ্ডিত্যসমন্বিত পুরোহিত-শ্রেণীর [illegible] যেমন অপরিহার্য্য ছিল তেমনি উহাকে রক্ষা ক[illegible] সহজসাধ্য ছিল। শ্রেণী ও জাতের মধ্যে ঐকা[illegible] অসঙ্গতি আদৌ ছিল না। এই দুই পদ্ধতি একত্র মি[illegible] হইতে পারিত, একত্র মিলিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারি[illegible] উৎপত্তির সূত্রদ্বয়কে এক করিয়া ফেলাতেই ভুল হইয়াছে।

কেবল ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদই এই গভীর পার্থ[illegible] উপর একটা মায়াজাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া[illegible] উহার অন্তর্গূঢ় প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই, ছোট [illegible] জীবন্ত জাতদিগকে সেই-সকল পর্য্যায়ের মধ্যে [illegible] হইয়াছে যাহাদের মূল্য এক্ষণে কতকটা নামমাত্র [illegible] পড়িয়াছে। ঐ-সকল ছোট ছোট জাতকে এমন এক পদ্ধ[illegible] উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যে পদ্ধতির নিকট উ[illegible] গোড়ায় অপরিচিত ছিল। ঐ পদ্ধতি হইতে উ[illegible] স্বাভাবিক নিয়মে পরিপুষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত পাণ্ডি[illegible] জোরে উহাদের ঐরূপ অর্থ ঘটাইয়া তোলা হইয়াছে।

বৈদিক যুগে জাত ছিল কি না, এই লইয়া অ[illegible] তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সকলেই একবাক্যে স্বী[illegible]

করেন যে "পুরুষ সূক্তটি" খুবই আধুনিক, সুতরাং উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্যসমূহও এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। তাহার ফলে অন্ততঃ এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, বৈদিক যুগে জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয়েরই আলোচনার সূত্রস্থানরূপ মূল-ভিত্তিটিকে একটু বদল করা উচিত।

বৈদিক সূক্তাদিতে বর্ণ শব্দে জাত বুঝায় না,—এই কথায় কিছুই আসিয়া যায় না যদি ইহা সত্য হয় যে, কোন-এক সময় উহা জাতের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিম্বা কালবিলম্বে উহার ঐ অর্থ প্রচলিত হইয়াছিল। যদি অধিবাসী লোকের মধ্যে একটি ত্রিবর্গ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, যদি আরো দূর অতীতে উহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেও স্থিরসিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে উহা "শ্রেণী" ছিল কি "জাত" ছিল। সর্ব্বপ্রকার পারিবারিক অবস্থার মধ্যে "শ্রেণী"র ভিতরেও পদমর্য্যাদার নির্দ্দিষ্ট সোপানপরম্পরা পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং শুধু পদমর্য্যাদা-সোপানের অস্তিত্বে কোন নিগূঢ় বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না। জাত-জিনিসটা আসলে সংকীর্ণ চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, পার্থক্য-সমন্বিত—সুতরাং উহার মূল অন্যত্র নিহিত।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বৃহৎ পর্য্যায়গুলির নীচে, এই বিস্তৃত মণ্ডলগুলির ভিতর, এমন কোন উপাদান বৈদিক সূক্তের মধ্যে পাওয়া যায় কি না,—যাহা জাতের সংগঠনে সাহায্য করে, যথা জ্ঞাতিত্ব, ব্যবসায়, ধর্ম্ম, নিবাস,—সেই-সকল বৈদিক গঠন যাহা জাতের অনুরূপ,—ইহাই প্রকৃত সমস্যা। ইহারই অনুসন্ধান করিতে হইবে। আর একটা এই দেখিতে হইবে,—এই অনুসন্ধান ফলপ্রসূ হইবে কি না।

M. Ludwig যেরূপ যোগ্যতার সহিত বেদ ঘাঁটিয়া দেখিয়াছেন এমন আর কেহ দেখে নাই; আর তিনি বেদ সম্বন্ধে জাতের বিরুদ্ধে যেরূপ ঝোঁক্ দিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ আর কেহ করে নাই। কোন অভাব-বাচক সিদ্ধান্ত—এমন কি খুব প্রামাণিক অভাব-বাচক সিদ্ধান্তও তাঁহাকে থামাইয়া দিতে পারে নাই। মোট কথা, তিনি কিছুই আবিষ্কার করেন নাই। তিনি শ্রেণীবিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন কি?—হাঁ করিয়াছেন। জাতের বিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন কি? না, করেন নাই। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, কতকগুলা জটিল ক্রিয়া-কর্ম্ম অনুষ্ঠান, কতকগুলি গান,—পৌরোহিত্যতন্ত্রকে যে খুব দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছিল এবং এই পুরোহিতের কার্য্য প্রায়ই বংশগত ছিল,—সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারে না। বাহুবলে বলীয়ান কতকগুলি ধনশালী অধিপতি-শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল কি না এবং অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও বিশেষ করিয়া জন্মের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল কি না—Mr. Ludwig ইহাও প্রদর্শন করেন নাই। জাতের যে-সকল নির্দ্দিষ্ট সীমাবন্ধন আছে, তিনি বেদে সেই-সকল সীমাবন্ধনের কথা কিছুই পান নাই; তিনি ইহাও সপ্রমাণ করেন নাই যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত একীভূত "মঘবনেরা" কোন রুদ্ধদ্বার দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুখ্যতঃ Mr. Ludwig নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জন সাধারণরূপ "বিশ"গণের উপরে পুরোহিত ও অভিজাতবর্গ—এই দুই সুস্পষ্ট পৃথক শ্রেণী অধিষ্ঠিত দেখিতে পাইয়াছেন। এই-সকল নিদর্শন জাত-পদ্ধতির অস্তিত্ব খ্যাপনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া যদি তিনি বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে সে শুধু ব্রাহ্মণিক্য পদ্ধতির দৃষ্টিভূমি হইতে। তিনি মনে করেন—অন্ততঃ মৌনভাবে—যে, এই পদ্ধতি হইতে যথার্থ তথ্য প্রকাশ পায়। সুতরাং, অতীতকালে যখন শ্রেণী ও জাতের মধ্যে কিছু-কিছু মিলের চিহ্ন দেখা যায়, তখন জাতটা সমগ্রভাবেই ছিল এইরূপ সপ্রমাণ হয়। আমার মতে, ইহা "চক্রক"-ন্যায়াভাস, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছে। Mr. Zimmer উক্ত কথার সুযোগে উল্টা পক্ষের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উল্টা দিক্ হইতে আর-একটা এই স্থির করিতে হইবে,—খুব প্রাচীন সূক্তাদি যে-সময়ে রচিত হয়, সেই যুগে জাত-জিনিসটা আদৌ ছিল কি না। যদি ভাবিয়া দেখা যায়, ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে জাত-পদ্ধতির যার-পর-নাই প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও, (আমি এখানে শ্রেণী হিসাবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের আধিপত্যের কথা বলিতেছি না)—সমস্ত পরবর্ত্তী সাহিত্যে, জাত কত কম স্থান অধিকার

করিয়াছিল, তাহা হইলে শুধু বচনাদির মৌনতার গুরুত্ব এস্থলে খুব কমই বলিতে হইবে। আমার বিশ্বাস—যদি বংশের খুব প্রাচীন গঠনপদ্ধতি হইতে, স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ অনুসারে, জৈবিক ধরণের ক্রমবিকাশ অনুসারে, ভারতের জাতিতত্ত্বসংক্রান্ত, অর্থ-নীতি সংক্রান্ত, ভূগোল-সংক্রান্ত, মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত বিশেষ অবস্থার মধ্যে জাতের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার প্রচেষ্টাদি খুব ধীর-গতিতে হওয়াই সম্ভব; ঐরূপ আদিমকাল-সুলভ উপাদানের উপর, জীবনের নিতান্ত সহজ সংস্কারের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত থাকিলে,—বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত সূক্তাদি হইতে, জাতের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে, কোনোধরণের বেশী সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব নহে।

হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে যে পদ্ধতির প্রকাশ দেখা যায় উহা প্রাচীন সূক্তাদির যুগে ছিল না, অন্ততঃ ছিল বলিয়া গ্রন্থকারগণকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। ইহা সুনিশ্চিত, কেননা,—ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদের অন্তর্ভুক্ত মুখ্য সংজ্ঞাগুলি এমন সকল বিষয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার শুধু আদিম অবস্থাটাই সূক্তাদির নিকট পরিচিত ছিল; কেননা,—ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদের সাধারণ সুরটা যেরূপ তাহাতে মনে হয়, সূক্তাদির প্রভাবের বশীভূত হইয়া সূক্তাদির সমকালবর্ত্তী ঐতিহ্যের কাছাকাছি যাইবার জন্য উহার যেন একটা আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ্যিক পদ্ধতি বরাবরই তথ্যমূলক এমন একটা অবস্থার দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল যাহা খুবই বিভিন্ন। প্রকৃত কথা এই—বেদ হইতে যে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিঘটিত অবস্থা অবগত হওয়া যায়, তাহার সহিত জাতের পূর্ণ-বিকাশ অসঙ্গত ও অসংলগ্ন; কিংবা এমনও মনে হয় না যে,—উহা তখন হইতেই ছিল—(যদিও প্রাগবস্থায়) এবং উহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া এখনকার নির্দ্দিষ্ট আকার ও গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমার খুবই সন্দেহ হয়, বচনাদি হইতে এই প্রশ্নের কোন একটা নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় না। হিন্দু প্রাচীনকালের সূক্তাদির প্রকৃত প্রতিষ্ঠা কিরূপ ছিল এখনো তাহা খুব অসম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ঠিক্ কোন্ সময়ের সহিত উহার মিল হয়, সে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট—সুতরাং এইরূপ সন্দেহ করিবার আরও বেশী হেতু আছে। সূক্তাদি হইতে প্রাচীন যুগের একটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু উহার সহিত কতকগুলি খাঁটি হিন্দু-লক্ষণও মিশ্রিত দেখা যায়। সূক্তাদি সময়ের পর যে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই সভ্যতা উক্ত সূক্তাদির প্রতি অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে; অথচ ঐ সভ্যতা ধর্ম্মসংক্রান্ত, ভূগোল-সংক্রান্ত, সমাজসংক্রান্ত এমন একটা ভূমির উপরে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছিল যাহা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন।

এই একই জিনিসের দুই বিভিন্ন দিক্ কিরূপ সম্বন্ধ-সূত্রে পরস্পর সম্বন্ধ ছিল, আজ কে তাহা সাহস করিয়া নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবে?

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরগাছা

(৪৬)

এতদিন মণিমালার মত হইয়াছে ত রাখালের মত হয় নাই, রাখালের মত হইয়াছে ত মণিমালার মত হয় নাই, আজ উভয়েরই এক মত হইয়াছে—এ বাড়ীতে আর থাকা নয়। বিদায় লইবে বলিয়া রাখাল ও মণিমালা রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকটে গেল।

রাখাল ও মণিমালা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই জগদ্ধাত্রী বলিলেন—আমি এই ভাবছিলাম তোমাদের ডেকে পাঠাব। আমরা কাল তিথি করতে যাচ্ছি। ম্যানেজার-সাহেব কুবেরকে যেতে দিলে না। সে রইল; তাকে তোমরা দেখো। বঙ্ক আর বৌ আমার সঙ্গেই যাবে।

চন্দনমণি অমনি সোহাগ জানাইয়া বলিল—কুবেরের ত দিদি আর বাবুদাদা-অন্ত প্রাণ। দিদি আর বাবুদাদা তার কাছে থাকলেই হল। আমরা ত যেন তার কেউই নই। তবে আমরা থেকে আর করব কি, তোমাদের কল্যেণে দিদির সঙ্গে একটু তিথিধম্ম করে আসিগে।

রাখাল চন্দনমণির কথা লক্ষ্য না করিয়াই রাণী জগদ্ধাত্রীকে বলিল—মা, আমরা এখান থেকে যাব বলে বিদায় নিতে এসেছিলাম।

রাণী জগদ্ধাত্রী রাখাল ও মণিমালার মুখের দিকে ছলছল চোখে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন, কোনো কথা বলিতে পারিলেন না।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—তা ত তোমরা যাবেই বাবা, পরের বাড়ী আর কদ্দিন থাকবে, না বেশী দিন থাকা ভালো দেখায়। তা এত তাড়াতাড়ি কেন, আমরা তিথি সেরে ফিরে আসি, তার পর যেয়ো।

রাণী জগদ্ধাত্রীর চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আর হইল না। রাণী জগদ্ধাত্রী তীর্থযাত্রা করিলেন।

রাণী জগদ্ধাত্রী ও চন্দনমণির অবর্ত্তমানে রাখাল ও মণিমালার উপর রাণীর স্ত্রীধন সম্পত্তি রতনপুর পরগণা হইতে সংসার পর্য্যন্ত দেখিবার ভার পড়িয়াছে। মণিমালা হাসিমুখের মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিয়া ভোর হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাড়ীর চাকর দাসী, ঠাকুরবাড়ী অতিথশালা প্রভৃতির তত্ত্ব লইয়া ফিরিতেছে; যে-সব চাকর বাড়ীতে খায় না, সিধা পায়, তাহারা বরাদ্দের উপর ছুটা আলু কি একটা মূলা বেশী পাইয়া খুসী হইয়া যাইতেছে। সকলেই হায় হায় করিতেছে—এমন সোনার মনিব থাকিতে কোথাকার একটা ছোটলোক দৃষ্টিকৃপণ মাগী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া এমন রাজবাড়ীকে মুদিখানার চেয়েও হেয় করিয়া তুলিয়াছে—যেখানে লোকে এতকাল আমাপা জিনিস খাইয়াছে লইয়াছে, সেখানে আজকাল শুধু দাঁড়িপাল্লার টানাটানি আর মুখখিঁচুনি রাজত্ব করিতেছে!

রাখাল রতনপুর পরগণা তদারক করিতে গিয়াছে। সেখানে বঙ্কবিহারী গিয়া কেবল গালি ও চাবুকে প্রজার সহিত পরিচয় করিত, রাখাল সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলের সমান হইয়া তাহাদের সুখদুঃখের কাহিনী জানিতেছে; সে দেশের অভাব অসুবিধা নিজে দেখিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছে। প্রজারা বলাবলি করিতে লাগিল—এবার সেই বঙ্কাটা আসিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া রূপলহরী নদীর জলে ভাসাইয়া দিবে। রাণী মরিলে স্ত্রীধন সম্পত্তি মেয়েই ত পাইবে, তখন এই জামাই-বাবুই কর্ত্তা হইবে; তাহারা রামরাজত্বে বাস করিবে। কিন্তু তাহারা জানে না যে তাহাদের এই সুখের আশা মরীচিকা, আলেয়ার আলো—রাখাল প্রস্তুত হইয়া আছে রাণী জগদ্ধাত্রী তীর্থ করিয়া ফিরিলেই এখানকার সম্পর্ক চুকাইয়া সে বিদায় লইবে।

বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রায় বৎসর খানেক পরে রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আবার স্থগিত রাখিতে হইল।

কবিরাজ কান্তলাল মিশ্র চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন; মুঙ্গের কি ভাগলপুর হইতে অপর বৈদ্য আনিবার জল্পনা হইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—রাখাল, আমার রতনপুর পরগণা ভূপালকে দেবো; একটা লেখাপড়া করে আন, সই করিয়ে নাও।

রাখাল বলিল—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি ভালো হবেন। ভালো হয়ে যাকে যা দিতে ইচ্ছে হয় দেবেন।

বঙ্কবিহারী বলিল—বাঃ! এও কি একটা কথা হল! মানুষের শরীরগতিকের কথা ত বলা যায় না; যদি নাই ভালো হলেন? লেখাপড়া যখন করে দিতে চাচ্ছেন সই করিয়ে রেখে দেওয়া ভালো। ভালো হয়ে উঠে ইচ্ছে না হয় সে দানপত্র বাতিল করতে ত পারবেন। আমি ছোট দেওয়ানজীকে দিয়ে লিখিয়ে আনছি...

বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বঙ্কবিহারীর পরোপকারের প্রবৃত্তি হঠাৎ এরূপ প্রবল হইতে দেখিয়া রাখাল ও মণিমালা আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

তোষাখানায় বঙ্কবিহারীর ঘরে দেওয়ান দীনদয়াল ও কাঙালীর ডাক পড়িল। তিন জনের পাকা মাথার সূক্ষ্ম-পরামর্শে একখানি দানপত্র অতি সত্বর মুসাবিদা ও পরিষ্কার করিয়া লেখা হইয়া গেল।

বঙ্কবিহারী সেখানিকে হাতে করিয়া দোয়াত কলম লইয়া আসিয়া অজ্ঞানপ্রায় রাণী জগদ্ধাত্রীর শিয়রে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল—দিদি, দিদি! ও দিদি, শুনছেন?

চটকা ভাঙিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী জোর করিয়া চোখ মেলিয়া বলিলেন—অ্যাঁ?

—রতনপুরের দানপত্তর লিখে এনেছি, সই করে দেবে?

—দাও।—বলিয়া জগদ্ধাত্রী তাঁহার কম্পিত হস্ত শূন্যে বাড়াইলেন। দুই হাত কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানায় পড়িয়া গেল।

বঙ্কবিহারী জগদ্ধাত্রীর গলার নীচে হাত দিয়া তাঁহাকে তুলিয়া বসাইতে গেল।

রাখাল ভৎর্সনা করিয়া বলিল—ওঁকে মেরে ফেলবেন নাকি? বিষয়টাই পাওয়া বড় হল?

বঙ্কবিহারী রাখালের কথা কানে না তুলিয়া আস্তে আস্তে জগদ্ধাত্রীকে উঁচু করিয়া তুলিল। এবং বঙ্কবিহারীর চোখের ইসারায় চন্দনমণি একটা বড় তাকিয়া তাঁহার পিঠের নীচে দিয়া তাহার উপর আর-একটা বালিসে তাঁহার মাথাটি আস্তে আস্তে রাখিয়া দিল। একখানা খাতার উপর দানপত্র মেলিয়া ধরিয়া বঙ্কবিহারী কলমে কালি তুলিয়া কলম জগদ্ধাত্রীর হাতে ধরাইয়া দিল এবং সুস্থ বেলায় যাঁহাকে নামের বানান বলিয়া দিতে হইত এই অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় তিনি অভ্যাস-বশত আলপনার রেখা টানার মতন রেখা মাত্র টানিয়া নিজের দস্তখতটি খতের উপর ফুটাইয়া তুলিলেন। তারপর তিনি অচৈতন্য হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি তখন দানপত্র লইয়া ব্যস্ত; রাণী জগদ্ধাত্রীর দিকে তাহাদের লক্ষ্য করিবার তখন অবসর নাই। রাখাল ও মণিমালা ধরাধরি করিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে ভালো করিয়া বিছানায় শুয়াইয়া দিল এবং কান্তলাল কবিরাজ তখন ক্ষিপ্র হস্তে মকরধ্বজ মাড়িতেছিল। অনেক পাখার বাতাস ও তাহুতের পর যখন জগদ্ধাত্রীদেবীর জ্ঞান হইল তখন বঙ্কবিহারী রাখাল ও কান্তলাল মিশ্র কবিরাজকে সেই দানপত্রে সাক্ষীর স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করিল—বাবাজী, তুমি আর কবিরাজজী এই দানপত্রের সাক্ষী হও—সই কর।

রাখাল দানপত্রে সই করিতে গিয়া দেখিল যে তাহাতে ভূপালের নামের পরিবর্ত্তে কুবেরের নাম কাঙালীর হাতের স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। এবং সাক্ষী বলিয়া আগে হইতেই কাঙালী ও দীনদয়াল সই চুকাইয়া রাখিয়াছে। মৃত্যুর শিয়রে দাঁড়াইয়া যাহারা প্রবঞ্চনা করিতে পারে তাহাদিগকে রাখাল কুকুর মনে করে। রাণী জগদ্ধাত্রীকে বিক্ষুব্ধ করা হইবে বলিয়া সে আত্মসংবরণ করিল, নতুবা এক এক পদাঘাতে তাহাদিগকে তাহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল। রাখাল সেই দলিল টান মারিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিল, সই করিল না। বঙ্কবিহারী একলাফে তাহার উপর গিয়া পড়িয়া কুড়াইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—হাঁ হাঁ ক্রোধ হতে পারে তোমার বাবাজী, ক্রোধ হতে পারে। ন্যায্য! ন্যায্য!

রাখাল আর তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না।

দলিল সই করিবার বিক্ষেপের ফলে, জগদ্ধাত্রীর পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, দুর্ব্বলতার অবসাদে চেতনা লুপ্তপ্রায় হইল। যায়-যায় অবস্থা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ, দুধ ও বেদানার রস খাওয়াইয়া কোনো রকমে প্রাণটাকে দেহে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছে।

(৪৭)

আজ একাদশী। আজ ঔষধ পথ্য দেওয়া যাইবে না, আজ জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু নিশ্চয়। বঙ্কবিহারী ব্যস্ত হইয়া ব্যবস্থা করিতে লাগিল কেমন করিয়া তাঁহাকে তেশূন্য হইতে মাটিতে উঠানে নামানো হইবে; কে কে সঙ্গে শ্মশানে যাইবে; বাড়ীর ভাণ্ডারে কত মণ চন্দন-কাঠ আছে, তাহাতেই দাহ শেষ হইবে, না, আরো কাঠ লাগিবে; যদি লাগে ত বাজার হইতে আর কতখানি চন্দন-কাঠ সংগ্রহ হইতে পারিবে; গাওয়া ঘি কয় হাঁড়া আছে; এই-সমস্ত জিনিস লইয়া-যাইতে কতজন ভারী লাগিবে; পথে শব লইয়া যাইবার সময় খৈ বাতাসা ও পয়সা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতে হইবে; ভাণ্ডারে কয় ছালা খৈ মজুত আছে, প্রহ্লাদের মা না হয় আরও কিছু খৈ চট করিয়া ভাজিয়া ফেলুক; খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করা হোক কত টাকার পয়সা পাওয়া যাইবে; হারা-ময়রাকে বাতাসা করিতে বলিয়া আসুক; ঘিনু খানসামা মালখানা

হইতে নূতন ধোয়া থান কাপড় বাহির করিয়া কতকগুলা কাপড় ও উত্তরীয় ফাড়িয়া ফেলুক ; শব ঢাকা দিবার জন্য একখানা জামিয়ার বাহির করিয়া দিক। বঙ্কবিহারী সমস্ত একে একে মনে করিয়া-করিয়া আদেশ করিতেছিল এবং সেই-সমস্ত আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কি না চন্দনমণি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছিল।

মণিমালা মায়ের পা দুখানি কোলে করিয়া বসিয়া অত্যন্ত কাঁদিতেছিল; রাণী জগদ্ধাত্রীর কোলের কাছে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ভূপাল ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছিল; ঘরে বাহিরে সমস্ত চাকর দাসী আশ্রিত আত্মীয় পরিজন জড়ো হইয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতেছিল; কবিরাজ বিছানার ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়া নাড়ী ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল কখন্ কোন্ মুহূর্ত্তে সেই অতি ক্ষীণ স্পন্দনটুকুও স্থগিত হইয়া যায়। রাখাল শিয়রের কাছে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। দাঁড়াইয়া থাকিতে-থাকিতে রাখাল হঠাৎ বলিয়া উঠিল—কবিরাজজী, কোনো উপায় আর নেই কি ?

কবিরাজ বলিল—দাবাই ও পথ্য পড়িলে আরো দুচার দিন লড়িতে পারা যাইত। তার মধ্যে ভগবান চাহে ত এই কঠিন অবস্থা কাটিয়া রোগ আরামের পথে যাইতে পারে।

রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জোর দিয়া বলিল - আপনি ওষুধ দিন। মণি, চট করে গিয়ে একটু গরম দুধ নিয়ে এস, একটা বেদানার রস কর।

রাখাল ঔষধের পুরিয়া লইয়া খলে ঔষধ মাড়িতে বসিল। সেই শব্দে বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি ছুটিয়া ঘরে আসিয়া বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! রাখাল! তুমি করছ কি ? আজ যে একাদশী!

রাখাল ঔষধে মধু ও আদার রস মিশাইতে মিশাইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল—জানি।

—আজকে ওষুধ খাবেন কি করে ?

—আমি আস্তে আস্তে চাটিয়ে দেবো, তাহলেই খেতে পারবেন।

—পাপ হবে যে ?

—হয় আমার হবে। যমরাজার সঙ্গে বোঝাপড়া আমিই করব।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—ধর্ম্ম আর রইল না!

রাখাল ঔষধের খল হাতে করিয়া উঠিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—নাঃ!

এমন সময় মণিমালা দুধ আনিল।

চন্দনমণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওমা মণি! তুইও এইসব অকল্যাণের কাজ করছিস! জানিস একাদশীর দিন বিধবার খাবার জোগাড় করলে কিম্বা খাওয়া দেখলে নিজে বিধবা হয়! পতিহত্যার পাতক হয়!

রাখাল রাণী জগদ্ধাত্রীকে ঔষধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে বিরক্ত হইয়া চাপা গলায় বলিল- তবে মামী, তুমি এখান থেকে যাও ত, একাদশীতে বিধবার খাওয়া দেখে তুমিও আর আমার গুণের মামাটিকে হত্যা কোরো না!

চন্দনমণির কিন্তু বঙ্কবিহারীর প্রতি কিছুমাত্র দয়া দেখা গেল না, সে ঠায় দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া একাদশীতে বিধবার খাওয়া দেখিল। বঙ্কবিহারী চন্দনমণির স্বামীভক্তি ও এয়োত রক্ষার আগ্রহ যে কতখানি তাঁহা জানিয়া প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন হইল তাহা তাহার বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি দেখিয়া কিছুই বোঝা গেল না।

সমস্ত দিন প্রাণলোলুপ আগন্তুক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার পর সন্ধ্যার সময় কবিরাজের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—যাক এযাত্রা রাণীজী রক্ষা পাইয়া গেলেন।

বাড়ীর সকলে যে পরিমাণ প্রফুল্ল হইল, বঙ্কবিহারী চন্দনমণি দীনদয়াল ও কাঙালী সেই পরিমাণে বিষণ্ণ হইয়া গেল।

(৪৮)

রাণী জগদ্ধাত্রী রোগমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বড় দুর্ব্বল। কবিরাজ বলকারক রসায়ন ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বলিয়াছেন—ঔষধ পথ্য যত্ন শুশ্রূষার একটু ত্রুটি হইলে পীড়া যদি পুনরায় ফিরিয়া হয় তবে আর বাঁচানো যাইবে না।

রাখাল ও মণিমালা যাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া রাত্রিদিন প্রাণপণে তাঁহার সেবা যত্ন করিতেছে। এবং যাহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে এজন্য শ্রীধর কথককে আনাইয়া প্রত্যহ কথা শুনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি সর্ব্বদাই

কুণ্ঠিত হইয়া দূরে দূরে থাকে; বাড়ীতে আর তাহারা জোর করিয়া আধিপত্য করিতে পারে না; সকল তাতেই তাহাদের কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ। কাজেই আস্তে-আস্তে বাড়ীর সমস্ত ভার রাখাল ও মণিমালার হাতে আসিয়া গেল; তাহারা কর্ম্ম ও সেবার আনন্দে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছিল, বাড়ীর সকলে তাহাদের যত্নে প্রফুল্ল ও পরিতুষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন রাণী জগদ্ধাত্রী বসিয়া কথা শুনিতেছেন, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে, কথকের করুণ-রস বর্ণনায় সকলের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র রাজার সর্ব্বস্ব লইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতেছেন—শুনিতে-শুনিতে রাণী জগদ্ধাত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আমারও এইরকম দশা হবে; কুবেরের যে-রকম রকম-সকম দেখছি তাতে সে আমায় লক্ষ্যস্থল দেবে বলে ত বোধ হয় না; নিজের একটা স্ত্রীধন ছিল, সেটাও ভূপালকে দিয়ে ফেলেছি; ভূপালও যদি আমায় তাড়িয়ে দ্যায় তবে হরিশ্চন্দ্রের মতন দশাই আমারও হবে।

মণিমালা পাশে বসিয়া ছিল। বলিল—কুবেরকে তুমি সর্ব্বস্ব দিয়েছ, সে কি মা তোমাকে অশ্রদ্ধা করতে পারে? আর ভূপালকে তুমি কিছু না দিলেও সে আপনার প্রাণ ফেলতে পারবে তবু তোমা'কে ফেলতে পারবে না, তুমি যে তার মায়ের মা!

রাণী জগদ্ধাত্রী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—অত বড় রতনপুর পরগণাটা ভূপালকে দিলাম তবু সেটা কিছু দেওয়া হলনা! বাবা! তোমাদের খাঁই আর কিছুতে মেটে না! আমার পেটে যদি একটা ছেলে হত তবে ঐ বা কোথায় পেতিস?

মণিমালা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। চন্দনমণি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন বরাহহাটির দিদি বলিলেন—রতনপুর পরগণা ভূপালকে দিয়েছ ছাই! বঙ্ক সেটা কুবেরের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও ব্যথিত হইয়া মণিমালার লজ্জিত বিষণ্ণ নত মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্যি মণি?

মণিমালা চুপ করিয়া বসিয়া কার্পেটের নক্সার উপর আঙুল বুলাইতে লাগিল।

জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওদের সর্ব্বস্ব নিয়েও পেট ভরছে না! শেষকালে আমায় ঠকিয়ে ভূপালের মুখের গ্রাস চুরি করে নিলে!

জগদ্ধাত্রী আর কথা শুনিতে পারিলেন না; দৌড়-ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—ঝুনকিয়া, রাখালকে ডেকে আন।

রাখাল কথা শুনিতেছিল। মা ডাকিতেছেন শুনিয়া উঠিয়া অন্দরে আসিল।

রাখালকে দেখিয়াই জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন—রাখাল, এতদিন তোমরা আমাকে বলনি কেন?

—কি মা?

—বঙ্ক আমাকে ঠকিয়ে ভূপালের বিষয় চুরি করে নিয়েছে।

—এ কি বলবার কথা মা?

—তুমি এক্ষুনি লিখে নিয়ে এস; আমি সজ্ঞানে সই করে ভূপালকে রতনপুর পরগণা দান করব।

—তা হয় না মা, ও সম্পত্তি কুবেরকেই দেওয়া হয়ে গেছে। দিয়ে ফিরিয়ে নিলে কুবেরের মনে কষ্ট হবে। ভূপাল কি একটা তুচ্ছ সম্পত্তির জন্যে মামার সঙ্গে বিবাদ করতে যাবে? কুবের সকলকার বড় হয়েছে, সেই তার আত্মীয় স্বজন আশ্রিত প্রতিপাল্য-দের দেখবে।

জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ওরা আমার সব নিলে!

এই ঘটনায় বঙ্কবিহারী, চন্দনমণি ও কুবের জগদ্ধাত্রীর চক্ষুশূল হইয়া পড়িল। তাহারাও কুণ্ঠায়, লজ্জায় চাকর-দাসীর কাছেও আর মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত না, মনে করিত যেন সকলের মনের মধ্যে নিরন্তর নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতেছে—চোর! চোর!

উহারা যতই দূর হইয়া যাইতে লাগিল রাখাল,

মণিমালা ও ভূপাল ততই জগদ্ধাত্রীর নিতান্ত আপনার ও নির্ভরের পাত্র হইয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী একদিন বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সোনার কাঁচি দিয়া আপনার রেশমের ন্যায় কোমল সূক্ষ্ম দীর্ঘ কেশরাশি কাটিয়া ফেলিলেন; তারপর সেগুলিকে কালো রেশম দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া কতকগুলি চুলবাঁধা গুছি করিয়া বড় রূপার থালে সাজাইলেন; পেড়ে কাপড় ছাড়িয়া আবার সাদা ধুতি পরিলেন; হার ও অনন্ত খুলিয়া বাক্সে রাখিলেন; সোনা-বাঁধানো হুঁকাটাকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া সোনার বেড়টা বাক্সে রাখিলেন। ঝুনকিয়াকে বলিলেন—মণিকে ডাক।

মণিমালা আসিয়া মায়ের পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—মণি, আমার মাথার এই চুলের গুছি, আমার গায়ের গহনা ভূপালের বৌ হলে তাকে দিস। নিয়ে যা। এইমাত্র আমার সম্বল বাকী আছে, আর কিছু নেই। শনির দৃষ্টি পড়বার আগে তুই নিয়ে রাখ। পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ আছে—তাও আমি ভূপালকে দেবো মরবার সময়।

মণিমালার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলিল—তোমার নাতবৌকে তুমিই হাতে করে সাজিয়ে দিয়ো মা।

জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া বলিলেন—সে সুখ আমার কপালে নেই। রাখাল ত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দিতে দেবে না। আমি আর কতদিন বাঁচব? তুইই আমার নাম করে ভূপালের বৌকে দিস।

মণিমালা চোখে আঁচল চাকা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী বলিলেন—ঝুনকিয়া, এই থালাটা, আর গহনার বাক্সটা মণির ঘরে রেখে দিয়ে আয়।

চন্দনমণি যখন শুনিল যে বড় হাতীর দাঁতের বাক্সর একবাক্স গহনা বেহাত হইয়া গিয়াছে, তখন সে আপনার কপালে নির্ঘাত এক চড় মারিয়া বলিল—পোড়াকপাল আমার! গহনাগুলোর কথা ছাই একটুও মনে ছিলনা!... আচ্ছা!...

চন্দনমণি ছুটিয়া গিয়া বঙ্কবিহারীকে বলিল—কুবিরের বিয়ের একটা শিগগির জোগাড় কর।

—হঠাৎ?

—দরকার হয়েছে।

শামুক আঁটিয়া গেলে যেমন ভাব হয় তেমনই একটা দৃঢ় ও অর্থপূর্ণ ভাব সহধর্ম্মিণীর মুখে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কবিহারী বলিল—আচ্ছা, কাঙালীকে বলি, তার জানা শোনা যদি কোনো ভালো মেয়ে থাকে।

কাঙালী বঙ্কবিহারীর নিকট শুনিয়া খানিকক্ষণ মুখ উঁচু করিয়া ভাবিয়া বলিল—কৈ ভালো মেয়ে ত মনে পড়ছে না। রাজরাণী হবার যোগ্য মেয়ে ঘটক লাগিয়ে খুঁজতে হবে।

বঙ্কবিহারী বলিল—ঠিক বলেছ, ঘটকদের নিযুক্ত করাই শ্রেয়।

কাঙালী সেইদিন বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া শীঘ্র তাহার পরিবার পাহাড়পুরে আনাইবার ব্যবস্থা করিল।

যেদিন তাহার পরিবার আসিয়া পৌছিল সেইদিন কাঙালী কুবেরকে বলিল—রাজাবাবু, তুমি আমার বাড়ীতে যাও না কেন? আমার বাড়ীতে কেমন পায়রা আছে, হীরামন পাখী আছে, খরগোশ আছে.........

কুবের উৎসুক হইয়া বলিল—সত্যি মাষ্টার মশায়? আমি দেখতে যাব।

কুবের কাঙালীর বাড়ীতে যাইতেই কাঙালী ও তাহার স্ত্রী আন্না বহু সমাদর করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। তারপর কাঙালী ডাকিল—কাতু, এইদিকে এস, রাজাবাবুকে নিয়ে গিয়ে তোমার চিড়িয়াখানা দেখাওগে।

কাঙালীর কন্যা কাত্যায়নী লজ্জারক্ত নতমুখে আসিয়া কুবেরের সামনে দাঁড়াইল। গৌরী সুন্দরী সে, বয়স তাহার চৌদ্দ বৎসর। সে একখানি ধোয়া জরি-পেড়ে নীলাম্বরী শাড়ী, হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি, কানে দুটি দুল ও আলতা-দেওয়া পায়ে ঘুঙুর-দেওয়া মল পরিয়া আসিয়াছিল; এই সামান্য আভরণেই তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল।

কাঙালী বলিল—কাতু, রাজাবাবুকে ডেকে নিয়ে যাও।

কাত্যায়নী লজ্জিত হাসিমুখ একটু তুলিয়া সঙ্কোচে চঞ্চল দৃষ্টিতে কুবেরের দিকে একটু চাহিয়া ধীর মৃদু কণ্ঠে বলিল—আসুন।

কুবের সেই সুন্দরী কিশোরীর আহ্বানে পুলক-মোহের মাদকতায় তন্ময় হইয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইল। মলের ঘুঙুরের মৃদুগুঞ্জনে আকৃষ্ট হইয়া বংশীরবে মুগ্ধ সর্পের মতো কুবের কাত্যায়নীর সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া গেল।

আবার যখন মলের শব্দ ফিরিয়া আসিতে শোনা গেল তখন আন্না একটু উঁচু গলাতেই কাঙালীকে বলিতেছিল—কাতুর কি তেমন অদেষ্ট হবে যে রাজার গলায় মালা দেবে। রাজরাণী পাটরাণী হওয়া সে কি যেমন-তেমন ভাগ্যের কথা। সে আমাদের বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ!

উঁচু করিয়া বলিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, কথা কয়টা কুবেরের কানে পৌঁছিল। সেইদিন হইতে মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীর পশুপক্ষী কয়টির উপর কুবেরের এমন মমতা পড়িয়া গেল যে দিনান্তে তাহাদের একবার না দেখিলে সে স্থির থাকিতে পারিত না, এবং তাহাদিগকে এমন নিবিষ্ট ভাবে এত বেশীক্ষণ ধরিয়া সে পর্য্যবেক্ষণ করিত যে কুবের প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো নূতন আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে বলিয়া ধারণা হইতে পারিত।

বঙ্কবিহারী যখন ঘটক লাগাইয়া মেয়ে খুঁজিতে ব্যস্ত ছিল, কাঙালী যখন মেয়েকে কুবেরের সহিত পরিচয় করাইতে ব্যস্ত ছিল, কুবের যখন কাত্যায়নীর চিড়িয়াখানায় ভর্ত্তি হইয়া প্রাণীতত্ত্বের গবেষণায় ব্যস্ত ছিল, তখন চন্দনমণিও নিশ্চিন্ত ছিল না। সে আস্তে আস্তে গিয়া জগদ্ধাত্রীর কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। জগদ্ধাত্রী মুখ ঘুরাইয়া ভার হইয়া বসিলেন। চন্দনমণি বলিল—দিদি, এই বেশই তোমার এখন ঠিক মানিয়েছে—আজ বাদে কাল তোমার বেটার বৌ ঘরে আসবে।······আচ্ছা দিদি, কুবিরের বিয়ে দেবে না? আমরা ত বুড়ো হতে চল্লাম, ক'ব আছি কবে নেই, জীবনের সাধ আহ্লাদটা করে নেওয়া যাক এইবেলা। তোমারও ত একটি আদর যত্ন করবার লোক চাই—বেটার বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে নিয়ে এস।

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, কোনো কথাই বলিলেন না। চন্দনমণি কিন্তু দমিবার পাত্র নহে, সে এতদিন যে-সঙ্কোচে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া সে এখন নিরন্তর জগদ্ধাত্রীর কাছে-কাছে হামেহাল হইয়া তাঁহার সেবা করিয়া তুষ্টিসম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবে সঙ্কল্প করিল।

কুবের জগদ্ধাত্রীর ঘরের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে ছিল। চন্দনমণি ডাকিল—কুবির, শুনে যাও, দিদি ডাকছেন।

কুবের বিরক্ত মুখে আসিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী কোনো কথাই বলিলেন না। চন্দনমণি বলিল—তোমার মা যে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন তোমার বিয়ে হবে।

কুবেরের বিরক্ত মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে স্মিত মুখে চাহিল কিন্তু তাঁহার মুখে হর্ষের চিহ্নমাত্র না দেখিয়া কুবের সেখান হইতে প্রস্থান করিল। চন্দনমণিও আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

উহারা চলিয়া গেলে জগদ্ধাত্রী রাখালকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন—রাখাল, কুবেরের বিয়ে দিতে হবে তুমি মেয়ের খোঁজ কর।

—বঙ্কমামা ত খোঁজ করছেন।

—খোঁজ করছে বুঝি? আমাকে না জানিয়েই? না ওদের খোঁজ করতে হবে না, তুমি খোঁজ কর।

—এত ছেলেমানুষের বিয়ে দেবেন না মা। কুবের এখন লেখাপড়া করুক, সাবালগ হোক, তখন বিয়ে দেবেন

জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া গেলেন আর কোনো কথা বলিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেলে বঙ্কবিহারীকে ডাকাইয়া জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—বঙ্ক, কোথাও ভালো মেয়ের সন্ধান পেলি?

—হাঁ, মহিষবাথানের বেচন চক্করবর্ত্তীর মেয়ে নাক-ফুঁড়িকে ত আপনি দেখেছেন; তোফা সুন্দরী মেয়ে; তার সঙ্গে কুবেরের বিয়ে দিলে হয় না?

—তা মন্দ কি? বেচনকে বলে দাও একদিন মেয়েকে নিয়ে আসুক, আমরাও একবার ভালো করে দেখি শুনি, কুবেরও একবার দেখুক!

বেচন চক্রবর্ত্তী খবর পাইয়াই মেয়েকে নূতন চুনরী কাপড় কোঁচা করিয়া ঘাগরার ধরণে পরাইল; পাটের জাদ দিয়া চুল বাঁধিয়া গোঁজ খোঁপার নীচে জাদের থোপনা দুলাইল; কপালময় পেটে-পাড়া চুলের

নীচে তেল-সিঁদুর লেপিল; কাঁকন, খাড়ু, হাঁসুলী ও গুজরী প্রভৃতি গহনার ভার সর্ব্বাঙ্গে চাপাইল; কানে সার মাকড়ি ও নাকে বেসর ও বুলাকি ঝুলাইল; পায়ে আলতা, হাতে মেহেদি ও চুলে মাথাঘষার মসলা লেপিয়া রাজার মনোহরণ বেশে কন্যা সাজাইল। তারপর একখানি ডুলিতে তাহাকে মুড়িয়া-সুড়িয়া বসাইয়া দিয়া নিজে একটা বেটো ঘোড়ায় চড়িয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। রাজদরবারে যাইতেছে বলিয়া নিজেও একটু সাজিয়া লইয়াছিল —— কষিয়া মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া তাহার উপর একটা মলমলের চাপকান পরিয়াছিল এবং একখানা তসরের চাদর উত্তরীয় করিয়া বুকে ও একখানা পাগড়ী করিয়া মাথায় বাঁধিয়াছিল,—রাজদর্শনের সময় অঙ্গে পট্টবস্ত্র থাকা আবশ্যক; বহুদিনের তেল ও শিশির খাওয়ানো দিল্লীওয়াল জুতা পায়ে ও একখানি ময়লা গামছা 'উরমাল' হাতে লইয়াছিল!

নাকফুঁড়িকে দেখিয়া জগদ্ধাত্রী বলিলেন—বাঃ! বেশ মেয়ে। একেই আমার বৌ-মা করব।

তাহার সেই বেশভূষা, আড়ষ্টভাব ও তামাটে পাকা চেহারা দেখিয়া মণিমালা ত হাসিয়া খুন। সে অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া জগদ্ধাত্রীকে বলিল—এ মেয়ের সঙ্গে কুবেরের বিয়ে দিয়ো না মা।

রাণী জগদ্ধাত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—কেন? তোমাদের কিছুই পছন্দ হয় না! এ মেয়ে মন্দ কিসে হল?

—কুবেরের পছন্দ হবে না মা।

—এমন মেয়ে আবার পছন্দ হবে না! যা ত ভূপাল তোর মামাকে ডেকে আনত, তোর মামীকে এসে দেখুক।

ভূপাল হাসিতে-হাসিতে দৌড়িয়া গিয়া কুবেরকে বলিল—মামা মামা, শিগগির এস, একটা কেমন জানোয়ার এসেছে দেখসে।

কুবের আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি জানোয়ার?

ভূপাল হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িয়া বলিল—হুতুমথুমো!

কুবের উৎসুক হইয়া ভূপালের সহিত হুতুমথুমো দেখিতে ছুটিল। আসিয়াই নাকফুঁড়িকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

—দেখলে মামা হুতুমথুমো!—বলিয়া ভূপাল হাসিতে-হাসিতে গড়াইয়া পড়িল।

রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—কুবের, দেখ্ কেমন কনে? বিয়ে করবি ত?

চন্দনমণি বলিল—দিব্যি মেয়ে, এ আর কুবিরের পছন্দ হবে না! ওর বেশ পছন্দ হয়েছে!

কুবের বলিয়া উঠিল—ছাই পছন্দ হয়েছে। আমি মাষ্টার মশায়ের মেয়ে কাত্যায়নীকে বিয়ে করব।

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—মাষ্টার মশায়? কাঙালী? তার মেয়েকে আবার কোথায় দেখলি?

কুবের চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—মাষ্টার মশায়ের বাড়ীতে, আবার কোথায়?

ভূপাল কুবেরের সঙ্গে-সঙ্গে যাইতে-যাইতে জিজ্ঞাসা করিল—মামা, দিদিমার সামনে কাত্যায়নীকে বিয়ে করবে বলতে লজ্জা করল না?

কুবের বুক ফুলাইয়া বলিল—আমি রাজা! আমার আবার কাকে লজ্জা, কাকে ভয়! আমার যা খুসী আমি ত তাই করব। নইলে কি ঐ হুতুমথুমোকে বিয়ে করব নাকি!

ভূপাল হুতুমথুমোকে স্মরণ করিয়া আবার হাসিতে গড়াইয়া পড়িল। বলিল—মামা, ওর নাম শুনেছ? দিব্যি নাম—নাকফুঁড়ি!

কুবের নাক সিঁটকাইয়া বলিল—যেমন চেহারা, তেমনি সজ্জা, তেমনি নাম!

বেচারী নাকফুঁড়ি আবার ডুলিতে চড়িল। বেচন চক্রবর্ত্তী আবার ঘোড়ায় চড়িয়া মহিষবাথানে ফিরিয়া গেল।

ডাক কাঙালীকে, দেখ তাহার মেয়েকে,—রাজবাড়ীময় সাড়া পড়িয়া গেল।

বঙ্কবিহারী কাঙালীকে ডাকিয়া স্নেহপূর্ণ ভৎর্সনা করিয়া বলিল—বাবাজী, তোমার নিজের সুন্দর মেয়ে আছে! তোমাকে সুন্দর মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম সেদিন, তুমি ত তখন বললে না কিছু?

কাঙালী কাষ্ঠ-বিনয় অভিনয় করিয়া বলিল—রাজা-মামা, আমি কি কখনো মনেও করতে পারি যে আমার

মেয়ে রাজরাণী হবে; সে কি রাজাবাবুর যোগ্য! সে সাধ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মতন হবে! লোকে হাসবে যে।

—না, না। তুমি অতি বিনয়ী সাধু সজ্জন আছ! তুমি আমাকে ভক্তি কর! তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে না ত হবে কে? তোমার মেয়েকে অন্দরে নিয়ে এস; রাণী-দিদি, তোমার রাণী-মামী, মণি-টনি সকলে দেখ্‌বে একবার।

রাজবাড়ীর কিংখাবের ঘেরাটোপ-দেওয়া রূপো-বাঁধানো পাল্কীতে লম্বা-লাঠিঘাড়ে চৌগোঁপ্পাওয়ালা দারোয়ানের পাহারায় বেষ্টিত হইয়া কাত্যায়নী শুধু একখানি কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া স্বল্প আভরণকে নিজের রূপে সুন্দর করিয়া রাজবাড়ীতে দেখা দিতে আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল —হাঁ, রাণী হইবার মতন রূপ বটে!

ভূপাল ছুটিয়া গিয়া কুবেরকে বলিল—মামা, মামা, কেমন মামী এসেছে দেখসে।

কুবের হাসিয়া বলিল—যাঃ! আর জ্যাঠামি করতে হবে না।

রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত খুসী হইয়া বলিলেন—মণি, ছাখ, এ মেয়ে রাণী হবার যুগ্যি কি না!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—মা, শুধু রূপ হলেই রাণীর যুগ্যি হয় না,—বাহির-ভিতর দুইই যার ভালো, তারই রাণী হওয়া উচিত—তার ওপর যে অসংখ্য লোকের সুখদুঃখ নির্ভর করবে!... ..কাতু ত আমার অচেনা মেয়ে নয়? ওদের গাঁয়ে গিয়ে ত আমি বছর খানেক ঘর করে এসেছি।

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল—যাকে দেখতে নারি তার হাঁটন বাঁকা! তোমরা ক্যাঙালীকে দুচক্ষে দেখতে পারনা, তাইতে তার এমন সোনার মেয়েও তোমাদের মনে ধরে না!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো না মামী, দিলে কারুর ভালো হবে না।

—ষাট ষাট! শুভকর্ম্মে অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না বাছা!

—একবার বললাম আর বলব না। ঐটুকু মেয়ের কোঁদলের জ্বালায় পাড়ার লোক অস্থির থাকত, গায়ে পড়ে ঝগড়া করত ও।

—ছেলেবেলা অমন অবুঝ সবাই হয়েই থাকে। এখন ত দিব্যি শান্ত শিষ্ট হয়েছে; মুখে রা-টি নেই। ক্যাঙালীর মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে?

এ কথার আর উত্তর নাই। মণিমালা একটু হাসিয়া, উঠিয়া চলিয়া গেল।

চন্দনমণি জনান্তিকে বলিয়া উঠিল—উঃ! কী বিষম হিংসে!

রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ ভার করিয়া বলিলেন—বৌ, বঙ্ককে বল গণপতি ভটচাযকে দিয়ে একটা বিয়ের দিন দেখিয়ে ঠিক করুক। এই মেয়ের সঙ্গেই কুবেরের বিয়ে দিতে হবে।

(৫০)

রাজবাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার লাগিয়া গেল—রাজাবাবুর বিয়ে! বিবাহের ব্যয়-মঞ্জুরীর জন্য বঙ্কবিহারীর অনুরোধে কাঙালী বোর্ডে দরখাস্ত লিখিয়া দিল। রাণী জগদ্ধাত্রীর দস্তখতে সেই দরখাস্ত চল্লিশহাজার টাকা ষ্টেট হইতে পাইবার হুকুম মঞ্জুর করিয়া আনিল।

কিন্তু বঙ্কবিহারী এক ফর্দ্দ করিল ষাট হাজার টাকার। রাণী জগদ্ধাত্রীকে বুঝাইল যে স্বাধীন নৃপতির বিবাহে মাত্র ষাটহাজার টাকা খরচ ত অতি সংক্ষেপে নমো নমো করিয়া কাজ সারা!

রাণী জগদ্ধাত্রী বলিলেন—তা ত বটেই! কিন্তু বাকী বিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় কোথায়? আমার ত তোরা কিছু বাকী রাখিস নি!

—কেন? আপনার কোম্পানির কাগজ রয়েছে ত!

—সে আমি ভূপালকে দেবো মনে করেছি।

—হাঁ সে ত দিতেই হয়। কিন্তু এখন কাজ আটকাচ্ছে, ঐটা ভাঙিয়ে এখন খরচ হোক, তারপর কুবের সাবালগ হয়ে রাজা হলে ষ্টেট থেকে সে আপনাকে পঁচিশ কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে!

রাণী জগদ্ধাত্রী কোম্পানির কাগজখানি বাহির করিয়া বঙ্কবিহারীর হাতে দিলেন। শুভকর্ম্মে অনেক বিঘ্ন ভাবিয়া কাঙালী স্বয়ং কোম্পানির কাগজ বিক্রয় করিতে কলিকাতা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

রাখাল যখন শুনিল যে কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের

বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার ভয় হইল যে কুবের এবং বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণির সঙ্গে কাত্যায়নীর যোগ হইলে কাহারো তিষ্টিবার জো থাকিবে না। কাঙালীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া রাখাল কাঙালীকে বলিল —কাঙালী-দা, এ কাজটা কি তোমার উচিত হচ্ছে?

কাঙালীর মুখ শুকাইয়া গেল, রাখাল কোম্পানির কাগজের কথা বলিতেছে মনে করিয়া শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করিল—কি?

—বংশজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া।

কাঙালী হাঁফ ছাড়িল।—কেন ক্ষতি কি?

—তুমি এতবড় কুলীন, দেশে সমাজ নিমন্ত্রণ হলে আগে তোমাকে মালাচন্দন দিয়ে বরণ করতে হত; বংশজের বাড়ী অনুগ্রহ করে ভাত খেতে তুমি পাঁচটাকার কম দক্ষিণায় রাজি হতে না; আর আজ অক্লেশে তুমি সেই কুলমর্য্যাদা একেবারে বিসর্জ্জন দিতে যাচ্ছ! আমি তৎকুল-ফুল মানিনে, তোমরা মানো বলেই বলছি।

কাঙালী লজ্জিত হইয়া বলিল—কি জানো রাখাল, মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে··

—তোমার আরও মেয়ে রয়েছে। তোমার ছেলের মেয়ে রয়েছে, আরও হবে। তাদের মুখের দিকে ত তাকাচ্ছ না। তাদের এর পর কি গতি হবে? কোথায়ই বা তাদের বিয়ে দেবে, আর সমাজেই বা তোমার অবস্থা কি হবে তা ভেবে দেখেছ কি?

—পয়সা থাকলে বিয়ের জন্যে আটকাবে না।

—তুমি ত মাত্র দুশো টাকার চাকরী কর।

—রাজা জামাই হলে সেই তার শ্বশুরবাড়ীর মেয়েদের ভালো জায়গায় বিয়ের খরচ দেবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল—অনিশ্চিতের আশায় নিজের জাতের সম্মানটা ঘোচানো ভালো হচ্ছে কি না, আর এক-বার ভালো করে ভেবে দেখো!

কাঙালী গুম হইয়া রহিল। রাখাল চলিয়া যাইতে না যাইতেই রাজবাড়ীতে রাষ্ট হইয়া গেল যে রাখাল বিবাহে ভাঙচি দিতে গিয়াছিল।

রাণী জগদ্ধাত্রী শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন— বৌ যে বলে, রাম সবার বন্ধু, রামের বন্ধু কেউ নয়, সে সত্যি! রাখাল আর মণি কুবেরের হিংসাতেই গেল।

চন্দনমণি বলিল—দেখলে দিদি, আমি কি মিথ্যে কথা বলি, না হিংসে করে বলি। মণি যে কুবিরের অত যত্ন করে, তার মতলব কি বুঝিনে, কুবির রাজা হলে ওর স্কন্ধে চেপে সুখ করবার ফিকির!

কুবের বলিয়া উঠিল—সে আর হচ্ছে না! আমি সবাইকেই চিনে নিয়েছি। আগে আমি স্বাধীন রাজা হই, তারপর দেখাব মজা!

চন্দনমণির একটা বড় রকমের দুর্ভাবনা ঘুচিল।

ইহার পর রাখাল মণিমালা ও ভূপালকে দেখিলেই রাণী জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া বসেন। তাহাদের সহিত কথা বলা একরকম বন্ধ হইয়া গেল এবং চন্দনমণির সহিত ঘনিষ্ঠতা আবার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

(ক্রমশ)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছোটলোক

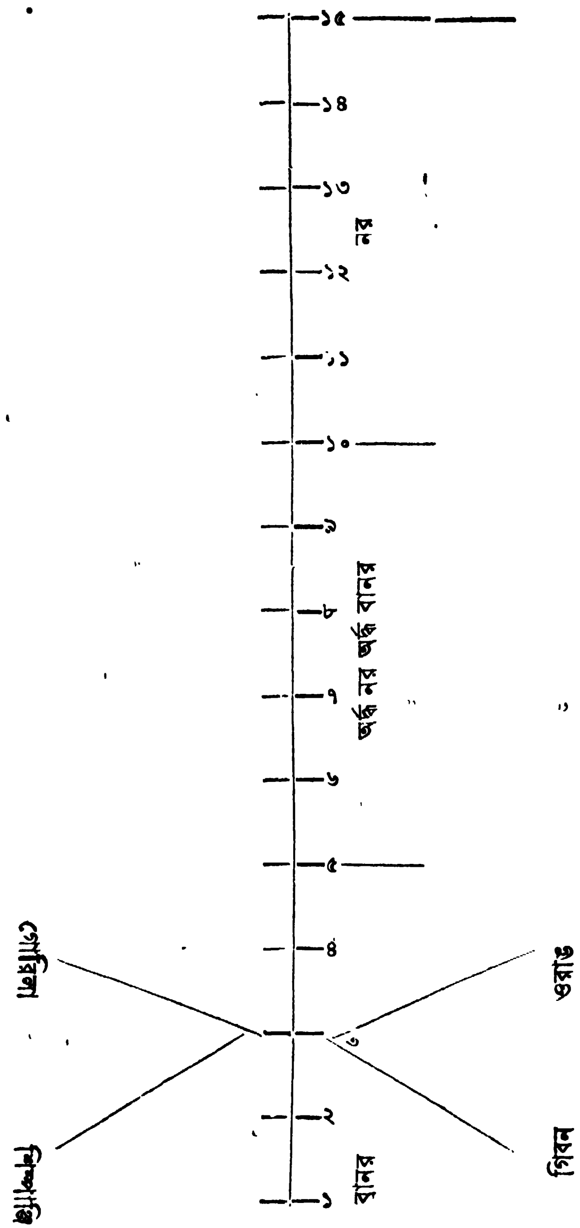
আনত-মুখে বেদনা বুকে, ভিখারী উঠানে
দাঁড়াল যেই,
ভরিয়া মুঠি, আসিল ছুটি'—বধূ সে!
কপালে ঘোমটা নেই?
"হ্যাঁলা বউ—ওমা—ওকি—ছি ছি ছি!
কি ছোট-লোকের এ আনিয়াছি ঝি"—
দূরে গবাক্ষে গর্জ্জে শাশুড়ী তার।
দু'হাতে বক্ষে টানিল ভিখারী
দেহ-লতা বালিকার।
সীঁথির সিঁদুরে ভিখারী-অশ্রু ঝরিল রক্তমণি
'ওমা—ওকি—ওগো।' ছুটিল শাশুড়ী করে সম্মার্জ্জনী!
চমকি দাঁড়াল—"এ যে গো বেয়াই!
—কাঁধে কেন ছেঁড়া-ঝুলি?"
হাসিয়া ভিখারী কহিল—"বেয়ান্!
তুমিই দিয়াছ তুলি!—"

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে খাদ্যের ক্রম-বিকাশ

বানর-বংশ হইতেই যে মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা একরূপ নিঃসংশয়-রূপেই স্থির হইয়া গিয়াছে। জ্ঞাতিত্বসূত্রে গোরিলা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানুষরা যে আমাদের পরম আত্মীয়, সে কথা আর অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। মানুষ আর এই সব বনমানুষরা যে একই পিতামাতার উত্তর-বংশীয় সন্তান, কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত আবার এমন কথাও বলিয়া থাকেন। ইহা যে অসম্ভব সে কথা বলা যায় না। সে যাই হোক্, ইহা যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন, বানর হইতে সহসা টপ্ করিয়া মানুষের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা সহসা হয় নাই। ধীরে ধীরে ক্রমাভি-ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সুবিধার জন্য এই অভি-ব্যক্তিকে কয়েকটি stage বা অবস্থায় ভাগ করা যাইতে পারে। এবং ইহার জন্য মাথার খুলির আয়তনের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ধরিয়া লওয়া যাক্ মানুষ এবং গোরিলা ও শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানুষদের পূর্ব্বপুরুষ একই। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে, বর্ত্তমান বনমানুষের মাথার খুলির যে মাপ, মানুষের পূর্ব্বপুরুষের মাথারও সেই মাপ। একটা শিম্পাঞ্জির মাথার মাপ ৩০০ কিউবিক্ সেন্টিমিটার (cubic centimeter); তাহা হইলে, মানুষ যাহাদের হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদেরও মাথার মাপ ৩০০ কিউবিক্ সেন্টিমিটার্। বর্ত্তমান সভ্য মানুষের মাথার মাপ কিন্তু ১৫০০ কিউবিক্ সেন্টিমিটার্। তাহা হইলে. এই দেখা যাইতেছে, বানর-অবস্থা হইতে মানুষ যতই ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার মাথার খুলির আয়তনও তেমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম ছিল ৩০০, ক্রমে ক্রমে ১০০ করিয়া বাড়িয়া ১৫০০ হইয়াছে। অন্য কথায় ৩ হইতে ১৫তে উঠিয়াছে। অর্থাৎ ৩ হইতে ৪; ৪ হইতে ৫; এইরূপে এক এক সিঁড়ি উঠিয়া বর্ত্তমান সভ্যাবস্থায় ১৫তে উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নের চিত্রে বানর হইতে মানুষের ক্রমোন্নতি দেখান যাইতেছে।



অভিব্যক্তি সোপান

(৩ সিঁড়িতে মানুষের পূর্ব্বগামী বানরের স্থান দেখান হইয়াছে; এ-সময় তাহার মাথার খুলি ৩০০ সি, সি ছিল। ১৫ ধাপে বর্ত্তমান সভ্য মানুষের স্থান; মাথার খুলির মাপ, ১৫০০ সি, সি। ১০ সোপান হইতেই যথার্থ নরের সৃষ্টি। ৩ হইতে ৫ সোপান পর্য্যন্ত নরাকার বানর; ৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত বানরাকার নর। ১০ হইতে যথার্থ নর।)

এতাবৎকাল মানুষের খাদ্যের মধ্যে জান্তব ও উদ্ভিজ্জ — এই উভয়বিধ পদার্থ থাকিতে দেখা যায়। তাহাকে কোন কালেই শুধু নিরামিষ বা শুধু আমিষ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে দেখা যায় না। আমিষ ও নিরামিষের পরিমাণ কিন্তু সকল অবস্থাতেই সমান থাকিতে দেখা যায় না। মানুষ যেই এক এক ধাপ করিয়া উন্নতির সোপানে উঠিয়াছে অমনি তাহার খাদ্যের মধ্যে আমিষ ও নিরামিষের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে। কিরূপ ভাবে হইয়াছে, তাহা আমরা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্ব্বে জীব- ও উদ্ভিদ্-জগৎ হইতে মানুষ যে-সকল খাদ্য আহরণ করিত, তাহাদের নামোল্লেখ করিব। জান্তব খাদ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার মাংস, মৎস্য, পক্ষীমাংস, ডিম্ব, বেঙ্, সাপ, গিরগিটি, পোকামাকড়, শামুক, ঝিনুক, কীট পতঙ্গ, দুগ্ধ, মধু প্রভৃতি ছিল। উদ্ভিজ্জ খাদ্যকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—

(অ) বীজ,—উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে বীজই সর্ব্বপ্রধান, কেননা ইহা যেমন পুষ্টিকর এমন অন্য কিছু নহে। বীজে প্রোটিড (proteid) পরিমাণে খুবই বেশি।

(আ) ফল—ইহাদের মধ্যে শর্করা ও কতকগুলি লবণ আছে, প্রোটিড (proteid) নাই বলিলেই হয়।

(ই) কন্দমূল প্রভৃতি,—ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ শ্বেত-শর্করা (starch) থাকিতে দেখা যায়।

(ঈ) শাকশবজি,—পত্র পল্লবাদি ইহার অন্তর্গত।

এ-সকল ছাড়া স্থল-বিশেষে ও দেশ-বিশেষে বেঙের ছাতা (mushroom), সমুদ্রজাত উদ্ভিদ্, এবং বৃক্ষ-বিশেষের বল্কল ও গঁদও খাদ্যরূপে ব্যবহার হইয়া আসিতে দেখা যায়।

উপরে যে-সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম করা গেল, স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের তেমন সুস্বাদ থাকে না এবং ইহারা অনেকটা অসার পদার্থে পূর্ণ থাকে। কর্ষণ দ্বারা ইহাদের গুণের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন ইহাদের হ্রাস বৃদ্ধি হয়; শিঠা, শিকড়ে কমিয়া তাহার স্থানে শাঁসাল পদার্থ জন্মাইতে দেখা যায়। অনেক উদ্ভিদ আবার স্বাভাবিক অবস্থায়, কটু, তিক্ত এবং বিষাক্ত থাকে, চাষের দ্বারা তবে খাদ্যের উপযোগী হয়। এই স্থানে এই কথাটি মনে রাখা আবশ্যক, চাষ আবাদ প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, এত বড় বিপুল বিশ্বে মানুষ শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া একদিনও টিকিতে পারে নাই। উদ্ভিদ ছাড়া তাহাকে খাদ্যের জন্য জীব জানোয়ারের উপরও বড় কম নির্ভর করিতে হয় নাই। সাধারণের ধারণা কিন্তু ইহার বিপরীত। ইহাঁরা মনে করেন সত্যযুগে মানুষকে খাদ্যের জন্য জীবহিংসা করিতে হইত না, সে সময় গাছে গাছে, লতায় লতায়, প্রচুর সুরসাল ফল ধরিয়া থাকিত, কেবল পাড়িয়া খাইবার কষ্টটুকু স্বীকার করিলেই হইত। আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। পৃথিবীতে আজও এমন অনেক অসভ্য বর্ব্বর জাতি আছে, যাহারা কৃষিকাজ জানে না, বন্য ফল মূলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করে। কৃষিকাজ না জানিলেও, ইহারা কিছু-কিছু কাজ বুঝে। এই কারণে কাঁচা অবস্থায় যে-সকল উদ্ভিদ্ খাওয়ার উপযোগী নয়, তাহাদের প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বারা খাদ্যের উপযোগী করিয়া লয়। তবুও কিন্তু ইহাদের শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া চলে না। ইহাদের মৎস্য মাংস প্রভৃতিও ব্যবহার করিতে হইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, চাষ আবাদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিলে, মানুষের টিকিয়া থাকা সম্ভব হইত না। সাধারণের আর-একটি ভুল বিশ্বাস এই যে, কলা, লেমু, আম, জাম, আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি সুমিষ্ট সুরসাল ফলমূল আজ আমরা যে অবস্থায় দেখিতেছি, চিরকালই তাহারা সেইরূপই ছিল। ইহাঁরা মনে করেন, সেকালে বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, ইহারা অজস্র পরিমাণে উৎপন্ন হইত। ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে কর্ষণ-জাত, এ কথা অনেকেই অবগত নহেন। আদিম অবস্থায় ইহারা হয়ত একেবারেই খাদ্যের উপযোগী ছিল না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জংলা আম ও বাগানের আমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আক ও নারিকেলও শুধু কর্ষণের দ্বারা তাহাদের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

খাদ্যের ক্রমোন্নতি।

বনমানুষ হইতে মানুষ হইবার কালের মধ্যে মানুষের খাদ্যের যে-সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাদের মোটামুটি

তিনটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক যুগের বিশেষত্ব এই যে খাদ্যদ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাহাদের উন্নতি হইয়াছে।

প্রথম যুগের সহিত আমাদের পরিচয়, যখন মানুষ তাহার অভিব্যক্তি-সোপানের ১০ম ধাপে পদার্পণ করিয়াছে। এ সময় সে পশুশীকার করিতে ও মাছ ধরিতে শিখিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তাহাকে প্রধানতঃ উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত; কেননা, কি করিয়া পশুশীকার করিতে হয়, কেমন করিয়া মাছ ধরিতে হয়, তাহা সে জানিত না। কিন্তু যেই সে শীকার-কৌশল উদ্ভাবন করিল, অমনি মানুষ তাহার খাদ্যতালিকা হইতে উদ্ভিদের পরিমাণ হ্রাস করিয়া, মৎস্য-মাংসের উপর অধিকতর-রূপে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ ১১ ধাপ হইতে ১২ ধাপে উঠিবার সময়। এই যুগের বিশেষত্ব এই যে, এ সময় মানুষ উদ্ভিজ্জ দ্রব্যকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ না করিয়া, তাহাকে প্রস্তুত করিয়া খাইতে শিখিল। উদ্ভিদকে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া জলে, ভিজাইয়া নরম করিয়া, অথবা অগ্নির সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে ধরিল। এরূপ করিতে থাকায়, যে-সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থ পূর্ব্বে ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, তাহারাও ব্যবহারের যোগ্য হইল; তাহার ফলে এ সময় খাদ্যের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পাইল।

তৃতীয় যুগের আরম্ভ অভিব্যক্তি-সোপানের ১৩ ধাপ হইতে। এ সময় মানুষকে কিছু হিসাবী হইতে দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে তাহাকে কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে দেখা যায় না। এখন হইতে সে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিতে শিখিল। এই সময়ই সে প্রথম চাষ করিতে আরম্ভ করিল। এই জন্য তাহার খাদ্যের তালিকা পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বনমানুষ হইতে মানুষের পদবীতে উন্নীত হইবার কালে, খাদ্যের যে-সব ক্রমিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

বানরাবস্থা (anthropoid stage)—এ সময় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের খাদ্য অবিকল বর্ত্তমান কালে বনমানুষদের মত ছিল। ফলমূল, বীজ, পত্র প্রভৃতি তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল বটে, তবে কিয়ৎপরিমা পোকা মাকড়, বেঙ সাপ প্রভৃতিও যে না চলিত এমন ন

নর-বানরাবস্থা (homosimian period)—অ অবস্থার তুলনায় এ অবস্থাটি অধিক দিন স্থায়ী বলি বিবেচনা হয়। এ সময় মানুষকে বানর নাম ত্যাগ করি ধীরে ধীরে নর নাম গ্রহণের জন্য নিয়ত চেষ্টিত থাকিে দেখা যায়। এ যুগের বেশীর ভাগ সময় যদিচ তাহাে প্রধানতঃ কাঁচা উদ্ভিদ খাইয়া জীবনধারণ করিতে দে যায় বটে, কিন্তু এখানে তাহার খাদ্যের প্রকার-ভেদ বিলক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সময় হইতে দেখা যায়, সে এ স্থানে না থাকিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত পূর্ব্বাপেক্ষা চালাক চতুরও হইয়াছিল। ছোটখাট জী জানোয়ারকে বাগে পাইলে, ধরিয়া ভক্ষণ করিতে শিখিয়াছিল। ফল কথা, এ সময় হইতে মানুষ ক্রমশ আমিষাহারী হইতে আরম্ভ করিল এবং নিরামিষের পরিমা কমাইতে আরম্ভ করিল।

শিকারী ও মৎস্যজীবী অবস্থা
(Early hunting and fishing period)

এ-সময় মানুষ পশু শিকার করিয়া ও মাছ ধরিয় জীবন যাপন করিতে লাগিল। পশু শিকার করিতে ও মাছ ধরিতে নানা-প্রকার কৌশল অবলম্বনের আবশ্যক, মানুষ এসময় তাহা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফাঁদ তৈরী, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নিতান্ত কম বুদ্ধির আবশ্যক করে না। অতএব এসময় মানুষের বুদ্ধি পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকটা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অস্ত্রশস্ত্র বা ফাঁদ ভিন্ন বড় বড় পশু শিকার করা সম্ভবপর নয়, আর কোনরূপ একটা কৌশল অবলম্বন না করিলে যথেষ্ট মাছও ধরা সম্ভব নয়। এই-সকল কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে থাকায়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এসময় বিশেষ পরিচালনা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, ইহার ফলে

তাহার জ্ঞানের পরিমাণ বেশ একটু পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছিল। সত্যকথা বলিতে কি, এই সময় হইতেই মানুষ যথার্থ মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে, তাহার আচার-ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই অনেকটা বানরের মতই ছিল। এসময় সে শিকার অন্বেষণ ও মৎস্যের সন্ধানে সর্ব্বদাই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করিত। ইহার জন্য তাহাকে মৎস্য-মাংসের অভাব অনুভব করিতে হইত না। ইহার ফল এই হইল যে, সে খাদ্য হইতে উদ্ভিদের পরিমাণ কমাইতে লাগিল—এখন সে দস্তুরমত আমিষাশী হইয়া পড়িল। তাহার পাকাশয়ে পূর্ব্বের মত উদ্ভিজ্জ খাদ্য আর তেমন সহ্য হইতে থাকিল না, কাজেই তাহাকে বেশী মাত্রায় আমিষের উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে যে-সকল স্থান উদ্ভিদবহুল, সেই-সকল স্থানেই মানুষে বাস করিত; এখন হইতে আর তাহাকে তাহা করিতে হইল না। যেখানেই শীকার ও মৎস্য আছে, মানুষ সেই সেই স্থলে গিয়া বাস করিতে লাগিল। মানুষের এই শীকার-জীবী অবস্থাতেই, তাহাকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়।

এখন পর্য্যন্ত মানুষ আগুনের ব্যবহার শিখে নাই। কি করিয়া রাঁধিতে হয়, তাহা তাহার মাথায় আসে নাই। এরূপ অবস্থায়, খাদ্যদ্রব্যকে খুব ভাল করিয়া না চিবাইয়া, গলাধঃকরণ করিবার জো ছিল না। ইহার ফলে উদ্ভিদ-খাদ্যের শ্বেতসার-ভাগ লালার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইত এবং মুখের মধ্যেই তাহার জীর্ণকার্য্য অনেকটা সম্পন্ন হইত, কেননা লালা সহযোগে শ্বেতসার একরূপ শর্করায় পরিণত হয়, লালার সহিত মিশিতে না দিলে, তাহা হইতে পায় না। অতএব দেখা যাইতেছে, রন্ধন-বিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য এখনকার মত অপরিবর্ত্তিত আকারে মানুষের পাকাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না।

আদি রন্ধনযুগ (The early cooking period)

এ-সময় মানুষ খাদ্যদ্রব্যকে রন্ধন করিতে শিখিয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষিকাজ ও পশুপালন-ব্যাপার তখনও তাহার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মানুষ যে-দিন প্রথম রাঁধিতে শিখিল, অভিব্যক্তির ইতিহাসে সে-দিনটি একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন মনে করিতে হইবে। কেননা মানব-সভ্যতার জন্মই সেইদিন হইতে। ইহার পর হইতেই কৃষিকাজের সূচনা হইতে দেখা যায়। মানুষ প্রথমতঃ উদ্ভিদখাদ্যই রাঁধিয়া খাইত, আমিষকে এমনি কাঁচা অবস্থায় আহার করিত। ইহার একটা কারণও না ছিল এমন নয়। সে অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিল উদ্ভিদকে রাঁধিয়া খাইলে যত সহজে জীর্ণ হয়, এমন কাঁচা অবস্থায় নহে। আমিষের বেলায় রন্ধনের সে কোন আবশ্যক উপলব্ধি করে নাই। কেননা কাঁচা মাংস সে অতি সহজেই জীর্ণ করিতে সমর্থ হইত। আর একটা কথা এই যে, যাহাকে অত চেষ্টা ও যত্ন করিয়া শীকার করিত, তাহাকে সেই দণ্ডেই উপভোগ করিবার জন্য তাহার মনে স্বাভাবিক স্পৃহা জন্মিবারই কথা। রাঁধিবার বিলম্বও সহ্য করিতে পারিত না। রন্ধনের দ্বারা মাংস অধিকতর সুস্বাদ হয়, সত্য, কিন্তু জীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে কাঁচা মাংস যে রাঁধা মাংস অপেক্ষা বেশী সুবিধাকর সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অসভ্য ও বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ সুগন্ধ, সুস্বাদ ও সৌন্দর্য্যের কোন ধারই ধারে না। এগুলি সভ্যতার আনুষঙ্গিক ফল। রন্ধন-বিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে বহুদিন ধরিয়া মানুষ প্রথমতঃ আমিষ খাইয়াই জীবন ধারণ করিত। শীকারলব্ধ জীবকে ঔৎসুক্য ও আনন্দের সহিত টপ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিত, এবং তাহা সহজে জীর্ণ করিয়াও ফেলিত। এই কারণে আমিষকে রাঁধিবার সে কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু উদ্ভিদ সম্বন্ধে তাহার ধারণা অন্যরূপ হইয়াছিল। এ-সময় অধিকাংশ উদ্ভিদই কাঁচা অবস্থায় তাহার পক্ষে জীর্ণ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই কারণে মানুষ সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভিদ-খাদ্যকেই রাঁধিয়া খাইতে ধরিয়াছিল, আমিষ-খাদ্যকে নহে।

অবশ্য এরূপ মনে করা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, রন্ধন করিতে শিখিবার পূর্ব্বে মানুষ কাঁচা উদ্ভিদখাদ্য যাহাতে সহজে জীর্ণ হয়, তাহার জন্য কোন চেষ্টাই অবলম্বন করে নাই। সে উদ্ভিদখাদ্যকে রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিত, মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া নরম করিয়া লইত। এসকল

উপায়ে উদ্ভিদখাদ্য যে অনেকটা সহজ-পরিপাচ্য হয়, ইহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া ইহাও জানা যায়, যে, এসময় বিষাক্ত উদ্ভিদকে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া, তাহার বিষাক্ত অংশ তফাৎ করিয়াও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। এই-সকল কারণে যে-সকল উদ্ভিদকে সে ইতিপূর্ব্বে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ ছিল, সেগুলিও খাদ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই কারণে তাহার উদ্ভিদ-খাদ্যের তালিকা যে কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; কিন্তু যে-দিন মানুষ রন্ধন করিতে শিখিল, সেই দিন হইতেই তালিকাটি অসম্ভবরূপে স্ফীত হইয়া উঠিল। কেননা যে-সকল উদ্ভিদ কোনরূপেই গ্রহণযোগ্য ছিল না, তাহারাও রন্ধনের দ্বারা আহারের উপযোগী হইয়া দাঁড়াইল। ইহার ফলে, মানুষের পূর্ব্বেকার শীকারবৃত্তি অনেকটা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। সে যে শীকার অভ্যাস একবারে ত্যাগ করিল, কিম্বা আমিষে আর তাহার কোন লোভ থাকিল না, এমন নহে। তবে সে পূর্ব্বের অপেক্ষা আমিষের পরিমাণ অনেকটা কমাইয়া ফেলিল। এখন তাহার খাদ্যের মধ্যে অর্দ্ধেক উদ্ভিদ ও অর্দ্ধেক আমিষ থাকিতে দেখা গেল।

রন্ধনের দ্বারা খাদ্যদ্রব্যের এমন অবস্থা হয়, যাহাতে আর তেমন চিবাইবার আবশ্যক করে না। এই কারণে মানুষ যে-দিন রাঁধিতে ধরিল, সেইদিন হইতে তাহার চিবাইবার অভ্যাসটাও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতে লাগিল। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য আর পূর্ব্বের মত লালা সহযোগে মুখের মধ্যেই জীর্ণ হইবার সুযোগ পাইল না।

কৃষিজীবন (agricultural life)

মানুষ কবে হইতে কৃষিকাজ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা ঠিক বলা বড় কঠিন। যতই কম হউক, ইহা অন্ততঃপক্ষে ৪০০০০ বৎসরের কম নয়। মানুষ আগে কৃষিকাজ, না আগে পশুপালন করিতে শিখিয়াছে, তাহাও ঠিক বলিবার উপায় নাই। এসিয়া মহাদেশে এমন কয়েকটি অসভ্য জাতির ইতিহাস পাওয়া যায়, যাহারা চাষবাস করিবার পূর্ব্বে পশুপালন করিতে শিখিয়াছিল।

অসময়ের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হইতেই সম্ভবতঃ কৃষিকার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

কৃষিকাজ ও পশুপালন করিতে শিক্ষা করা অব[ধি] মানুষের খাদ্যের তালিকা অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। কৃ[ষি]জীবন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ফলমূলাদির আহরণের চেষ্টা[য়] মানুষকে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কিন্তু এখ[ন] আর তাহার কোনই আবশ্যক ছিল না। কেননা [সে] ইচ্ছামত এখন হইতে সকল দ্রব্যই একস্থানে থাকি[য়া] উৎপন্ন করিতে পারিত। বন্য নারিকেল, তাল, ডুমুর, খেজুর প্রভৃতি যাহা পূর্ব্বে একবারে খাবার উপযোগ[ী] ছিল না, এ-সময় তাহারা উপাদেয় ফলে পরিণত হইল। চাষের দ্বারা উদ্ভিদের যে কতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহা[র] উত্তম দৃষ্টান্ত গোল আলু ও কপি। এ-দুটি জিনিসই এ[ক] সময়ে নিতান্ত অখাদ্য ছিল, কিন্তু চাষের গুণে আজ তাহার তরকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এইরূপে কৃষিকাজের দ্বারা মানুষ তাহার খাদ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ উভয়ই অসম্ভব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইল। কৃষিবিদ্যায় যখন তাহার একটু অভিজ্ঞতা জন্মিল, তখন মানুষ ধান গম যব প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইল। এ সময় মানুষ যে শুধু উদ্ভিদ-খাদ্যেরই উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহা নহে, জান্তব খাদ্যেরও এ সময় বড় কম উন্নতি হয় নাই। পশুপালন করিতে শিখায়, সে এ সময় হইতে নানা-প্রকার পশুপালন করিয়া তাহাদের মাংস ও দুগ্ধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি পুষিয়া, তাহাদের ডিম্ব ও মাংস ব্যবহার করিতে লাগিল। ফলতঃ মানুষ যেদিন হইতে কৃষিজীবন অবলম্বন করিল, সেইদিন হইতে কি জান্তব, কি উদ্ভিদ সকল-প্রকার খাদ্যেরই বিশেষ উন্নতি সাধিত হইল। তবে জান্তব খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিদ-খাদ্যেরই যে বেশী উন্নতি হইয়াছিল সে কথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এই কারণে এ সময় মানুষের খাদ্যের মধ্যে আমরা নিরামিষের পরিমাণ বেশী এবং আমিষের পরিমাণ অল্প থাকিতে দেখি। বর্ত্তমান কালেও সভ্য মানুষ প্রতিদিন যাহা খাইয়া থাকে, তাহার মধ্যে নিরামিষের ভাগই বেশী, এবং আমিষের ভাগ অপেক্ষাকৃত কমই বলিতে হইবে।

মানুষের কৃষিজীবী অবস্থাকে দুইটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম যুগে আমরা মানুষকে

কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া চাষ-বাস করিতে দেখিতে পাই না। সে একটি উর্ব্বর ভূমিখণ্ড পছন্দ করিয়া, সেখানে কিছুদিনের জন্য থাকিয়া শস্যাদি বপন করিল, তাহার পর উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। এ সময় তাহার বাড়ী কি গ্রাম বলিয়া কিছু ছিল না। ইহার পর আমরা মানুষকে ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিয়া চাষ-বাস করিতে দেখি। মানুষকে বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় দেখিতেছি, ইহা সেই অবস্থা আর কি।

পূর্ব্ব অবস্থায় মানুষ যে শুধু চাষ করিত তাহা নহে, তাহার সঙ্গে শীকারও করিত। কৃষিজীবনের প্রথম অবস্থায়, মানুষ এক স্থানে স্থির হইয়া না থাকায়, সে তেমন ভাবে আত্মোন্নতি করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কেননা সে সময় তাহাকে খাদ্যের সন্ধানে প্রায় সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত—ভাবিবার বা চিন্তা করিবার তাহার অবসর মাত্র ছিল না। যে-দিন মানুষ ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিতে ধরিল, মানুষের সভ্যতার ও উন্নতির প্রকৃত আরম্ভও সেইদিন হইতে মনে করিতে হইবে। সেও আবার কম দিনের কথা নহে। যেমন-তেমন করিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর ত হইবেই। প্রাচীন ভারতবর্ষ, বাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে অন্ততঃ ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ এক স্থানে বাস করিয়া কৃষিকাজ করিত, পণ্ডিতরা এমনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৃষি-কার্য্যের যেমন যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, মানুষ বনজাত উদ্ভিদ খাওয়া ততই কমাইতে আরম্ভ করিল। এখন আর সে উদ্ভিদকে পূর্ব্বের মত কাঁচা অবস্থায় আহার করিত না, ফলফুলারী ভিন্ন অন্য সকল উদ্ভিদ-খাদ্যকেই সে অগ্নির সাহায্যে রাঁধিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কাঁচা উদ্ভিদ জীর্ণ করিবার শক্তিও তাহার ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইল।

আমরা দেখিতে পাইলাম, বানর-অবস্থা হইতে সভ্য নর-অবস্থায় উপস্থিত হইবার সময়ের মধ্যে, প্রতি যুগেই মানুষের খাদ্যের মধ্যে আমিষ ও নিরামিষ দুই বর্ত্তমান ছিল। তবে উহাদের পরিমাণ সব সময় ঠিক এক-রকম ছিল না। বনমানুষ ও অর্দ্ধনর-অর্দ্ধবানর অবস্থায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বুদ্ধির যতই বিকাশ হইতে লাগিল, ছোট ছোট জীব জানোয়ার পোকামাকড়, পাখী সরীসৃপ প্রভৃতি ধরা তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বের অপেক্ষা ক্রমশ সহজসাধ্য হইতে লাগিল। এই কারণে এ সময় হইতে তাহার খাদ্যের মধ্যে আমিষের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহাকে প্রধানতঃ নিরামিষাশীই বলিতে হইবে। ইহার পর ক্রমোন্নতি দ্বারা সে যখন শীকার যুগে উপনীত হইল তখন তাহার খাদ্য প্রধানতঃ আমিষ হইয়া দাঁড়াইল, তখনও নিরামিষ একবারেই যে ছিল না তাহা নহে, ছিল বটে কিন্তু তাহার পরিমাণ নিতান্ত অল্প। তাহার পর মানুষ যখন রন্ধন করিতে শিখিল, তাহার খাদ্যের মধ্যে নিরামিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু তখনও আমিষের পরিমাণ বড় অল্প ছিল না, প্রায় নিরামিষের সমানই হইবে। এ সময় মানুষ অর্দ্ধ আমিষাশী ও অর্দ্ধ নিরামিষাশী হইয়া পড়িয়াছিল। পৃথিবীতে আজও এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা চাষ করিতে জানে না, কিন্তু কি করিয়া রাঁধিতে হয়, তাহা অনেকটা জানে। এই-সকল অসভ্যদের অবস্থা এবং রন্ধন-যুগের মানুষের অবস্থা অনেকটা যে একই রকম তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই-সকল অসভ্য জাতিদের খাদ্যে অর্দ্ধেক আমিষ ও অর্দ্ধেক নিরামিষ থাকিতে দেখা যায়। একথা অবশ্য খুবই সত্য, এই-সব অসভ্য জাতিরা যে-সকল স্থানে বাস করে, সেখানকার জমি খুবই অনুর্ব্বর, সুতরাং শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে গেলে, তাহাদের জীবন রক্ষা হয় না। কিন্তু একথাও একরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা যতই থাক্ না কেন—তাহাতে আপনা হইতে যাহা জন্মায় তাহা মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে কোন মতেই যথেষ্ট মনে করা যাইতে পারে না। অগ্নির ব্যবহার করিতে শিখিবার পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের খাদ্যের মধ্যে আমিষের পরিমাণ যদিচ নিতান্ত অল্প ছিল না, তথাপি সে সময় তাহাদের পাকাশয়ের এমন অবস্থা ছিল, যাহাতে আস্ত কাঁচা উদ্ভিদ খাইয়া তাহারা

অনায়াসে জীর্ণ করিতে সমর্থ হইত। মানুষ ধীরে ধীরে যতই উন্নতির মুখে অগ্রসর হইতে চলিল, কাঁচা উদ্ভিদ জীর্ণ করা তাহাদের পক্ষে ততই কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। বর্ত্তমান কালে সভ্য জাতিদের কাঁচা উদ্ভিদ জীর্ণ করা একবারে অসম্ভব বলিলেই হয়।

রন্ধন-কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষের খাদ্য-তালিকায় উদ্ভিদের পরিমাণ বেশ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু কৃষিকাজের আরম্ভ হইতে ইহার পরিমাণ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশুপালন বিদ্যার উন্নতি হওয়ায় আমিষ খাদ্যেরও একবারে বৃদ্ধি না হইয়াছিল এমন নয়, তবে কৃষিকাজ দ্বারা শস্যাদির যতদূর ফলন সম্ভব হইয়াছে, আমিষের জোগান ততটা হইতে পারে নাই। এই কারণে মোটের উপর বলিতে গেলে, বর্ত্তমান কালে মানুষের খাদ্যে নিরামিষের ভাগই বেশী।

পৃথিবীতে এখন পর্য্যন্ত এমন দুই একটি অসভ্য জাতি আছে, যাহারা কেবলমাত্র আমিষের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিয়া আছে। এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে। অধিকাংশ মানুষই বর্ত্তমান কালে অধিক পরিমাণ নিরামিষ ও অল্প পরিমাণ আমিষ খাইয়া জীবনধারণ করে। হিন্দুদের মধ্যে এমন দুই একটি শাখা আছে, যাহারা কেবলমাত্র নিরামিষের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যদিচ বনমানুষ ও নর-বানর অবস্থায় প্রধানতঃ নিরামিষাশী ছিল, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, আমিষের মাত্রা বাড়াইতে বাড়াইতে শেষে তাহারা পাকা আমিষাশী হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময় তাহারা পশু শীকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া জীবন অতিবাহিত করিত। উদ্ভিদ-খাদ্য অতি অল্পই গ্রহণ করিত। ইহার পর যেদিন তাহারা আগুনের ব্যবহার শিখিল, সেদিন হইতে তাহাদের খাদ্যে উদ্ভিদের পরিমাণ আবার বাড়িয়া উঠিল। শেষে তাহারা অর্দ্ধ আমিষ ও অর্দ্ধ নিরামিষ ভোজী হইয়া পড়িল। তাহার পর যেদিন হইতে কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তন হইল, সেদিন হইতে তাহার খাদ্য পুনরায় নিরামিষ-প্রধান হইয়া দাঁড়াইল।

আমাদের কথা যে মিথ্যা কল্পনা মাত্র এমন যেন কেহ মনে না করিয়া বসেন। মানুষকে এক সময়ে লক্ষাধিক বৎসর ধরিয়া প্রধানতঃ আমিষ খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। মানুষ যতদিন কৃষিকাজ শিখে নাই, ততদিন আমিষের উপর নির্ভর না করিয়া থাকিয়া উপায় ছিল না। বর্ত্তমান কালে মানুষের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের সমাধান করিবার সময় উপরের কথাটি ভুলিলে চলিবে না। আমিষ আহার রোগের আকর ও মৃত্যুর সহচর, আর নিরামিষ আহারই স্বাস্থ্যকর ও দীর্ঘায়ুকর এরূপ সিদ্ধান্ত করা খুব সঙ্গত মনে করা যায় না। মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা এই দেখিতে পাই এককালে মানুষ নিরামিষ অপেক্ষা আমিষের উপরই বেশী নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। একথা অবশ্য খুবই সত্য, মানুষ যে-সময় শীকার করিয়া বেড়াইত, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিত না, সে সময় তাহার পক্ষে অধিক পরিমাণ আমিষ জীর্ণ ও দেহজাত করা খুবই স্বাভাবিক ও অনায়াসসাধ্য ছিল; কিন্তু তাহার পর যেদিন হইতে সে কৃষিকাজ অবলম্বন করিয়া একস্থানে বসবাস করিতে ধরিল, সেদিন হইতে তাহার পাকাশয়ের এমন পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, যাহাতে অধিক আমিষ সহ্য করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতে লাগিল। এখন তাহার পাকযন্ত্রের এমন অবস্থা হইয়াছে, যাহাতে তাহা রাঁধা আমিষেরই অধিক উপযোগী মনে করিতে হইবে। যাহারা ছুটাছুটি না করিয়া শুধু একই স্থানে বসিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে অধিক আমিষ গ্রহণ স্বাস্থ্যহানিকর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কুকুর শ্বাপদ জন্তু—আমিষই তাহার স্বাভাবিক খাদ্য। কুকুরকে যদি ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করিতে না দিয়া, একস্থানে দিনরাত আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সে পূর্ব্বের মত আর মাংস সহ্য করিতে পারে না ইহা আমরা অনেকবার দেখিয়াছি। নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তির পক্ষে অধিক আমিষ আহার অপকারক হইলেও আমিষকে যে একবারে খাদ্যতালিকা হইতে বিদায় করিতে হইবে তাহার অহিংসা ছাড়া আর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।



চিত্তসংযম

বর্ত্তমান যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ। এখনকার সমস্যা হচ্ছে, একটি ইঞ্জিন থেকে কেমন করে' দশ ঘোড়ার শক্তি পাওয়া যাবে, কিন্তু সে-ইঞ্জিন এক্‌-ঘোড়ার শক্তিযুক্ত ইঞ্জিনের সমান স্থান অধিকার করবে। তেমনি আজকের সমাজও একজন লোকের কাছে দশ ব্যক্তির সামর্থ্য প্রত্যাশা করে। কোনো একটি বিষয়ে যিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন সমাজ তাঁরই গলায় জয়মাল্য পরায়। পাঁচ কাজে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে কোনো কাজই সুসম্পন্ন হয় না। সাফল্য পেতে হলে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন। অনেক কাজ কোনো-প্রকারে সম্পন্ন করবার চেষ্টা না করে' একটি কাজ ভালোরকম করা, এই হল আমাদের যুগধর্ম্ম। এ-যুগে কর্ম্মপ্রচেষ্টা যাঁর নানাদিকে বিক্ষিপ্ত তাঁর সাফল্যের আশা বিরল।

লণ্ডনে এক দোকানের সামনে একখানা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল—"এখানে মালবহন ও সংবাদবহন হয়, কার্পেটের ধুলা ঝাড়া হয়, এবং যে-কোনো বিষয়ের উপর কবিতা রচনা হয়।" বলা বাহুল্য লোকটি উপরোক্ত কোনো কাজেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি।

যারা সফল হয় আর যারা বিফল হয় তাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে তাদের কাজের পরিমাণের তারতম্যে নয়—কাজের রকমে; অর্থাৎ নিপুণ বা অক্ষম কাজে। যারা ব্যর্থ হয় তাদের মধ্যে অনেকে কাজ করে যথেষ্ট, কিন্তু সে-কাজের কোনো বিলি-বন্দোবস্ত নেই—তা এলোমেলো কাজ। কাজের পরিমাণ যথেষ্ট হলেও শক্তির সংযম ও চিত্তের একাগ্রতার অভাবে সব পণ্ড হয়ে যায়। এই-সব লোক তুচ্ছ ঘটনাকে সুযোগে পরিণত করতে পারে না। সাধু উদ্যমের পরাজয়কে তারা জয়গৌরবে ভূষিত করতে জানে না। এদের সামর্থ্যের অভাব নেই, সময় প্রচুর; কিন্তু এরা একবার আগে যায়, পরের বার পশ্চাতে তাকায়—এমনি করে' জীবনকে এরা কেবল শূন্যতায় ভরে' তোলে।

এমনি একটি লোককে জিজ্ঞাসা কর তার জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? সে বলবে—"আমি কিসের উপযুক্ত তা তো ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমি জানি পরিশ্রম ব্যর্থ হবার নয়, তাই স্থির করেছি সারা জীবন দারুণ পরিশ্রম করে' চলব, এমনি করতে করতে কিছু-না-কিছু একটা জুটে যাবে।" কিন্তু তা অসম্ভব। বুদ্ধিমান জীব কি সোনারূপার খনির সন্ধানে সারা দেশ খুঁড়ে বেড়াবে? যদি কিছু পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে যে প্রতিনিয়ত ঘোরে সে কিছুই পায়না। মনপ্রাণ দিয়ে আমরা যা চাই আমরা তা-ই পাই; আর, কিছু না চেয়ে যদি কেবলই খুঁজি তবে পাইনা কিছুই। ফুলের কাছে আসে অনেক পতঙ্গ, কিন্তু একমাত্র মৌমাছিই ফুলের মধুটুকু লুটে নিয়ে যায়। বাল্যের পড়া-শুনা ও পরিশ্রমের ফলে আমরা যতই কেন রসদ সংগ্রহ করে' বিশ্বের পথে বেরুই না, তাতে ফল কিছুই হবেনা, যদি আমাদের মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের কাজের একটা সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে। নাবিক যদি না জানে কোন্ বন্দরে তার যাত্রা তবে তার ভাগ্যে সুবাতাস বইবেনা।

কার্লাইল বলেন—"অতি দুর্ব্বল যে সে-ও একের ওপর শক্তি সংহত করে' কিছু করতে পারে, কিন্তু পরম শক্তিমানও তার সামর্থ্য নানার ওপর বিক্ষিপ্ত করে' প্রায়ই ব্যর্থ হয়। জলের বিন্দু অবিরাম পতনের দ্বারা কঠিনতম প্রস্তরের মধ্যেও ছিদ্রপথ প্রস্তুত করে, কিন্তু খরতোয়া স্রোতস্বতী তারই ওপর দিয়ে গভীর কল্লোলে, চলার চিহ্নমাত্র না রেখে, বয়ে যায়।"

এক পাদরি বলেছিলেন—"ছেলেবেলায় মনে করতুম বজ্রই মানুষ মারে। বড় হয়ে বুঝলুম মানুষ মারে বিদ্যুতে, বজ্রে নয়। তখন থেকে স্থির করেছি আও-য়াজ কম করে' আলো দেব বেশী।"

বন্দুকের কতকগুলো ছররা গলিয়ে একটা বড় গুলি বা বুলেট তৈরি কর, সেটা চারজন লোকের দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। দারুণ শীতের দিনেও সূর্য্যালোককে সংহত কর, দেখবে অতি সহজেই আগুন জ্বলে উঠবে।

মানুষের মধ্যে যাঁরা অতি-মানব, যাঁরা বীরপুরুষ, তাঁরা সব ছিলেন একাগ্রচিত্ত; এক লক্ষ্য এক উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা জীবনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, একই জায়গায় তাঁরা অবিরাম তাঁদের বিরাট হাতুড়ির ঘা লাগিয়েছেন যতদিন না উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এক উদ্দেশ্য এই-সব বীরপুরুষদিগকে, আচ্ছন্ন করে' রাখে,

গতি তাঁদের একই দিকে, প্রতিজ্ঞা তাঁদের দুর্জ্জয়, সংগ্রামে তাঁদের আনন্দ। কি পাঠ্যাবস্থায় কি পর-জীবনে, লোহা যখন গরম হয় তখন তার ওপর আঘাত করতে তো হবেই, উপরন্তু লোহার ওপর আঘাত করে' করে' তাকে গরম করে' তুলতে হবে।

উদ্দেশ্য নিয়ে খেলা কোরো না।

ডিকেন্স বলতেন—"পড়ায় বা কাজে যে গুণ আমাদের কাজে আসে সেটি হচ্ছে মনঃসংযোগের অভ্যাস। তুচ্ছ সাধারণ ব্যাপারের ওপর প্রতিদিন অদ্ভুত নিষ্ঠার সহিত মনঃসংযোগ না করলে আমার সকল কল্পনা বা আবিষ্কার বিফল হ'ত। যার ওপর আমি সমস্ত মন অর্পণ করতে না পারি তেমন কাজে আমি কখনো হাত দিই না।"

সকল কাজেই সম্পূর্ণ মন দেওয়া দরকার পড়ায়, কাজে বা খেলায়।

চার্লশ কিংশলে বলেন—"যা যখন ধরি তাই নিয়েই পড়ি, তখন জগতে আর কিছুই থাকে না। এটি সাফল্যের মন্ত্র। অনেকে কিন্তু কাজে যেমন মাতেন, আমোদ আহ্লাদে তেমন তন্ময় হতে পারেন না।"

সব-জিনিষের কিছু কিছু জানতে গিয়ে আপনাদের খণ্ড খণ্ড করেন বলে' অনেকে বড় হতে পারেন না। এ-সব লোক সাধারণের সম্ভ্রম আকর্ষণ করলেও জগৎকে কিছু দিতে পারেন না।

লিটনকে অনেকে জিজ্ঞাসা করতেন তিনি এত বই লেখেন কখন? সময় পান কেমন করে'? তার উত্তরে লিটন বলেন—"আমি এত কাজ করি, তার কারণ আমি একই সময়ে অনেক কাজ করি না। ভালো কাজ করতে হলে অতিরিক্ত কাজ করা চলে না। আজ অতিরিক্ত কাজ করলে কাল ক্লান্তিবশত খুব কম কাজ হবে। কলেজ ছেড়ে সংসারে নেমে রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করে' আমি আমার সমসাময়িক লোকেদের চেয়ে কিছু কম পড়িনি। আমি অনেক বেড়িয়েছি, অনেক দেখেছি; দেশের রাষ্ট্রে যোগ দিয়েছি, জীবনের শত কাজে ব্যস্ত থেকেছি, তা সত্ত্বেও আমি প্রায় ষাটখানা বই লিখেছি। তার মধ্যে কোনো কোনো বই লিখতে আমাকে যথেষ্ট পড়াশুনা ও অনুসন্ধান করতে হয়েছে। আমি কিন্তু লেখা পড়ায় দিন তিন ঘণ্টার বেশী খরচ করিনি, পার্লামেণ্ট বসবার সময় তা-ও নয়। কিন্তু এই তিন ঘণ্টা সময় সমস্ত মন আমি কাজে নিযুক্ত করেছি। কিছুমাত্র চিত্তবিক্ষেপ ঘটেনি।"

কোলরিজ ছিলেন অদ্ভুত মানসিকশক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের স্থিরতা ছিল না। তিনি ছিলেন কল্পলোকের ভোগী; ফলে তাঁর তৎপরতা ও শক্তি এবং অনেক দিক দিয়ে তাঁর জীবনও শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি স্বপ্নের মধ্যে বেঁচে ছিলেন এবং স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তাঁর জীবন-অঙ্কে যবনিকা পড়েছিল। সর্ব্বদাই তিনি মনে মনে মতলব আঁটতেন, কিন্তু মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত সে-সব মতলব কাজে পরিণত হয়নি। প্রায়ই কিছু একটা করতে উদ্যত হতেন, কিন্তু করা আর হয়ে উঠত না। চার্লশ ল্যাম্ব লিখেছিলেন—"কোলরিজের মৃত্যু হয়েছে। শোনা যায় তিনি মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে চল্লিশ হাজারের বেশী লেখা রেখে গিয়েছেন—কিন্তু তার মধ্যে একটিও সম্পূর্ণ নয়!"

একই বিষয়ে যে-পরিমাণে শক্তি নিয়োজিত রেখেছেন সেই পরিমাণেই মহাপুরুষেরা বড় হয়েছেন এবং কর্ম্মে সার্থকতা লাভ করেছেন।

একখানি মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' হগার্থ সেটি একাগ্রচিত্তে দেখতে থাকতেন যতক্ষণ না তা তাঁর মনের ওপর ছাপ রেখে যেত। তারপর তিনি ইচ্ছা হলে মন থেকে সেই ছবিখানি আঁকতে পারতেন। প্রত্যেক জিনিষই এমন মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করতেন, মনে হ'ত যেন তিনি তা দেখবার সুযোগ আর কখনো পাবেন না। এই অভ্যাসের ফলেই তিনি তাঁর চিত্রে সমস্ত খুঁটি-নাটি এমন আশ্চর্য্যরূপে ফোটাতে পারতেন। তাঁর শিক্ষা খুব যে বেশী ছিল তা নয়, কিন্তু সে-অভাব তিনি তাঁর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির দ্বারা পূরণ করে' নিয়েছিলেন।

জেলখানায় যাঁরা পুস্তক রচনা করেছেন তাঁরা একাগ্র পর্য্যবেক্ষণের মূল্য জানেন। কোনো আগন্তুকের আগমন, কুঠরির দ্বারের সম্মুখ দিয়ে একটি কর্ম্মচারী বা কয়েদীর গমন, এইরূপ অতি তুচ্ছ ঘটনাও এমন করে' চোখে পড়ে যেন বহুকালের মধ্যে তেমন ঘটনা আর ঘটবে না।

নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত রাস্তা ব্রডওয়ে দিয়ে বিরাট মিছিল চলেছে, পথের দুধারে সারে সারে অসংখ্য লোক, ব্যাণ্ড বাজছে—এমন অবস্থায় হোরেস গ্রীলি "অ্যাষ্টর হাউস"-এর ধাপের ওপর বসে' উপুড়-করা টুপির ওপর কাগজ রেখে "নিউইয়র্ক ট্রিবিউন"-এর জন্যে সারগর্ভ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

কোনো এক কড়া লেখায় বিরক্ত হয়ে এক ভদ্রলোক "ট্রিবিউন"-আফিসে এসে সম্পাদকের খোঁজ করলেন। একটা ছোট ঘরে নীত হয়ে তিনি দেখলেন সম্পাদক ঘাড় গুঁজে হু হু করে' লিখে চলেছেন। কুপিত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার নাম গ্রীলি?" সম্পাদক কাগজ থেকে মুখ না তুলেই চটপট বল্লেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ। কি দরকার?" ভদ্রলোক তখন মুখ খুল্লেন, যা মুখে এল তাই বলে' গালাগালি করতে লাগলেন। সম্পাদকের মুখে কথা নেই, তিনি লিখেই চলেছেন; পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাচ্ছে, গ্রীলির মুখের ভাবের কোনো পরিবর্ত্তন নেই, আগন্তুকের কথা তাঁকে এতটুকু বিচলিত করছে না। অবশেষে গালাগালি করে' ক্লান্ত হয়ে পড়ে' কুপিত লোকটি বিরক্তিভরে যখন ফিরে যাচ্ছেন এমন সময় গ্রীলি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে ভদ্রলোকের পিঠ থাবড়ে অতি শান্ত ভাবে বল্লেন—"বসুন বসুন, যাবেন না মশাই; মনটাকে হাল্কা করে' নিন; তাতে আপনার ভালো হবে। আর এতে করে' আমি কি লিখব তা ভাববার খুব সুবিধে হচ্ছে। যাবেন না, বসুন।"

ডানিএল ওেবস্টারকে দেখে সিডনী স্মিথের মনে হয়েছিল তিনি যেন প্যাণ্টালুন-পরা একটি ষ্টীম-ইঞ্জিন!

উইলিআম পিট্ দেশের রাষ্ট্রে প্রধান হবার জন্যেই বেঁচে ছিলেন এবং মরেও ছিলেন। তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারেনি। আর কিছুতেই তিনি মন দিতেন না, ঐ এক চিন্তাতেই তিনি বিভোর ছিলেন; খরচের দিকে লক্ষ্য ছিল না, তাই একক জীবন যাপন করেও এবং বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও তিনি অনেক ঋণ রেখে মারা যান। হৃদয় থেকে তিনি তাঁর সুগভীর প্রেমকেও সমূলে উৎপাটিত করেন—তা তাঁর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রতিকূল ছিল বলে'। মৃত্যুর পরে যশোলাভ করবার জন্যে তিনি মোটেই উৎসুক ছিলেন না, তাই পরবর্ত্তীগণের জন্যে তাঁর একটি বক্তৃতাও রেখে যাননি। সমস্ত সামর্থ্য একই পথে চালিত করে' পঁচিশ বৎসর ইংলণ্ডের রাজদণ্ড তিনি চালনা করেছিলেন। বামে বা দক্ষিণে কোনো দিকে লক্ষ্য না করে' অবিরাম গতিতে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অবশ্য, একই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ যদি আমাদের চিত্তকে সংকীর্ণ করে বা আমাদের বিচিত্র শক্তির সামঞ্জস্য বিধানের পথে অন্তরায় হয়, তবে তা বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্তু সব-জান্তা হবার চেষ্টায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে শতভাগে খণ্ডিত করার চেষ্টাতেও প্রচুর অপকারের সম্ভাবনা।

শিশু যখন চলতে শেখে তখন তার দৃষ্টি যদি কোনো এক বস্তুতে আবদ্ধ করতে পার তাহলে সে কোনোগতিকে হেঁটে সেখানে গিয়ে পৌঁছোবে, কিন্তু সেই জিনিসটি তার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিলেই সে তখুনি পড়ে যাবে।

পাশ্চাত্যভূমিতে কেহ কর্ম্মের অনুসন্ধানে আবেদন করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—"তুমি কি করতে পার?" সে কোন্ কলেজে পড়েছে বা তার পিতৃপিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় না। (আমাদের দেশে যদিও একথা খাটে না।) সেখানে বড় বড় ব্যবসায়ের মাথায় যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সে-ব্যবসায়ের নিম্নতম ধাপ থেকে উঠে ক্রমে সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সহযোগী সেনানায়কদের চেয়েও বেশী পরিমাণে একাগ্রতা খাটিয়েছিলেন বলেই গ্রাণ্ট আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধ অবিলম্বে শেষ করতে পেরেছিলেন। ওয়াশিংটনের চরিত্রেও এই গুণটি পরিস্ফুট ছিল। তীক্ষ্ণ ও যথার্থ পর্য্যবেক্ষণ চিত্তসংযম-শক্তি-লাভের একটি উপায়। ডারুইনের অদ্ভুত সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ।

সাধারণত মন যা চায় তা আমাদের বুদ্ধি এবং শক্তির অপ্রাপ্য নয়। ধন, বিদ্যা বা সাফল্যের যে স্রোত তা সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতই নিয়ন্ত্রিত এবং নিশ্চিত; তারও নড়চড় নেই। সকল সাফল্যের ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই বুদ্ধিবৃত্তি এবং সমস্ত মানসিক এবং শারীরিক শক্তি একই অবিচলিত উদ্দেশ্যের ওপর সংস্থাপিত; সকল

বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এক অবিচলিত ধৈর্য্য; এবং লোভ হতাশা এবং ব্যর্থতা জয় করবার অসীম সাহস।

মানুষ এবং তার কাজ—এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ! মানুষের সামর্থ্যের সকল রশ্মি একটি বস্তুর ওপর সংহত করতে পারা না-পারার ওপরই এই প্রভেদের উৎপত্তি নির্ভর করে। নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞান প্রায়ই ভাসা-ভাসা রকমের হয়ে থাকে।

যথার্থ আর্টের স্বরূপ হচ্ছে উদ্দেশ্যের স্থিরতা। পটের ওপর যিনি অনেক ভাব ফোটাতে চেষ্টা করেন, সকল মূর্ত্তিগুলিকেই যিনি প্রাধান্য দ্যান, তিনি বড় চিত্রকর নহেন। প্রকৃত শিল্পী তিনি, যিনি বহু-বিচিত্রের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী ঐক্য প্রকাশ করেন, প্রধান ভাবটি যিনি চিত্রের অন্তরস্থিত মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তোলেন; অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি, চিত্রের ছায়াসুষমা, সমস্তই সেই একটি মূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হয়েই সার্থক হয়। সুনিয়ন্ত্রিত জীবনেও—তা মানুষ যতই কেন নানাবিষয়ে অভিজ্ঞ হউন বা তাঁর শিক্ষা যতই উদার হোক না – এমন একটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে যেখানে অন্য ক্ষুদ্র শক্তিগুলি সংহত হয়ে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে।

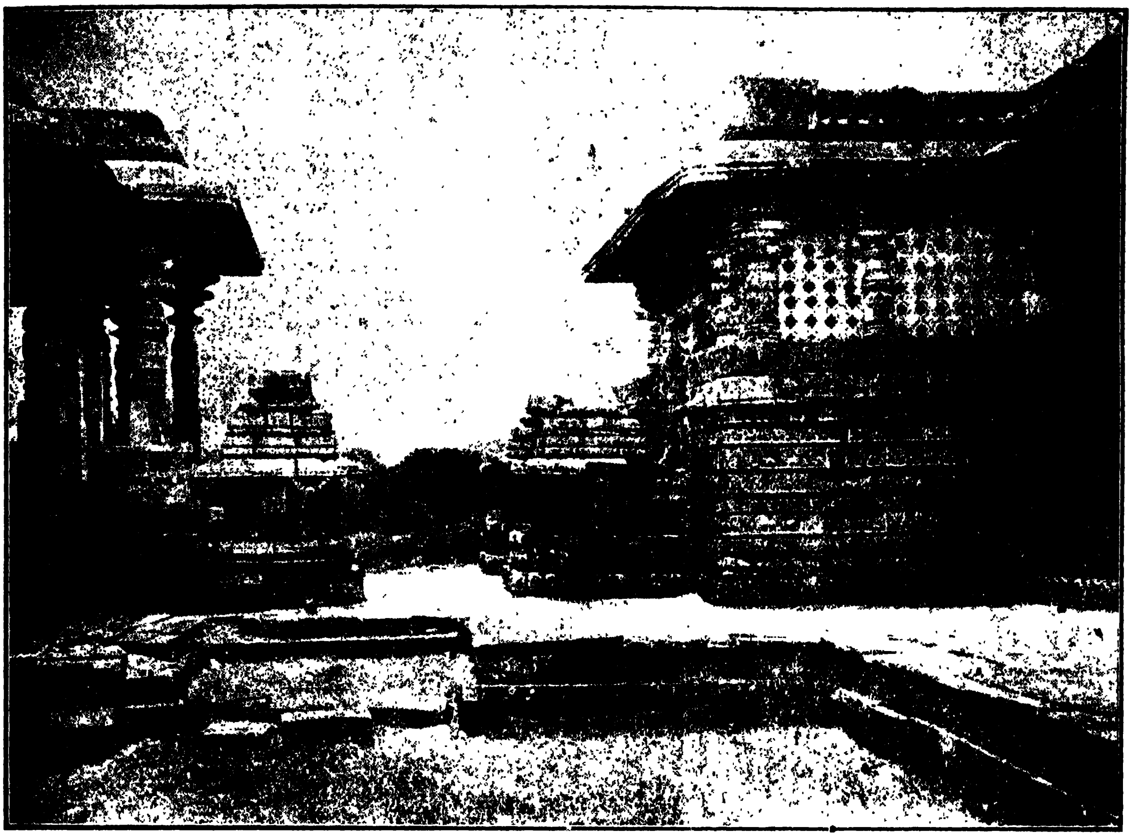
প্রকৃতিতে কোনো শক্তির অপব্যয় নেই। হঠাৎ বা অকারণ কিছু ঘটে না। পত্র পুষ্প, নীহারকণা, অণুপরমাণু সকলের ওপরই এক-একটি উদ্দেশ্যের ছাপ সুস্পষ্ট; তা অবিচলিত অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দেখাচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে, অর্থাৎ মানুষকে।

লক্ষ্য ঊঁচুদিকেই হওয়া উচিত, কিন্তু দৃষ্টি রাখতে হবে সেই লক্ষ্যের ওপর মানসচোখে যে-লক্ষ্য আমরা বিঁধতে পারব। অসম পাষাণের মধ্যে যে কখনো দেব-সন্দর্শন করেনি সে কেমন করে তা থেকে দেবতার মূর্ত্তি রচনা করবে? যা-তা একটা পাঁচমিশুলি উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কাজ হবে না। ধনুক থেকে যখন তীর ছোড়া হয় তখন সে-তীর একেবারে লক্ষ্য অভিমুখেই ছুটে যায়, পথে আর কা'কে আঘাত করতে পারে তার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় না। চুম্বক-শলাকা আকাশের সকল আলোকের দিকে ফেরে না কোন্‌টি ভালো দেখবার জন্যে। সূর্য্যালোকের রশ্মিচ্ছটা তার চোখে ধাঁধা লাগাচ্ছে, উজ্জ্বল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অগণ্য তারা ম্লান চোখে মৃদু চাহনিতে তার স্নেহলাভের জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে, কিন্তু সে অবিচলিত; প্রচণ্ড রৌদ্রও যেমন, বাদলের অবিরাম বর্ষণ ও মত্ত ঝঞ্ঝার হাহা-কারের মধ্যেও তেমনি তার একাগ্রদৃষ্টি ধ্রুবতারার দিকেই। কারণ সমস্ত তারকা অশ্রান্ত পদক্ষেপে যুগের পর যুগ তাদের কেন্দ্র পরিক্রমণ করছে, কেবল ধ্রুবতারাই সুদূর শূন্যে অফুরান পথ অতিক্রম করে' চলেছে—যে-পথ একবার প্রদক্ষিণ করে' আসতে পঁচিশ হাজার বছর কেটে যাবে! তাই মানুষের হিসেবে এক দিনের জন্যে নয়, এক শতাব্দীর জন্যেও সে স্থির অচঞ্চল। জীবনযাত্রাতেও আমাদের নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে, সত্যের পথ থেকে, কর্ত্তব্যের পথ থেকে বিচলিত করবার জন্যে শত শত রঙীন আলোক আমাদের ডাকছে, অবিরাম ডাকছে। কিন্তু এই-সব চাঁদ যাদের আলো ধার-করা, এই-সব উল্কা যারা কেবল জল-জল করে কিন্তু পথ নির্দ্দেশ করে না, এরা যেন আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে! তাহলেই আমাদের জীবন সার্থক হবে।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহীশূরে চালুক্য স্থাপত্য

কোন জাতি বড় কি না তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় তাহার চিন্তার ধারা অনুশীলন করিলেই। এই চিন্তার ধারা অনুশীলন হইতেই জানা যায় সেই জাতি সভ্যতা, সমাজ ও ধর্ম্মের জগতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং সেই অগ্রসরের মূল্য বিশ্বসমাজে কতটুকু ও তাহার স্থান কোথায়। জাতির চিন্তার বিকাশ যে শুধু পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ থাকে তাহা নহে, ইহা তাহার আচার ব্যবহার স্থাপত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়াও যথেষ্ট প্রকাশ পায়। জাতিবিশেষের যুগের পর যুগের চিন্তার ক্রমপরিণতির ইতিহাস শিল্পে ও স্থাপত্যে যেমনটি পাওয়া যায় তেমনটি বুঝি আর কোথায়ও পাওয়া যায় না, কারণ শিল্প ও স্থাপত্য মানবের চিন্তার ধারাকে আকার দান করে ও যাহা শুধু মনোরাজ্যেরই জিনিস ছিল তাহাকে বাস্তব রাজ্যের জিনিস করিয়া তোলে। সেইজন্য কোনও জাতি-বিশেষকে বুঝিতে হইলে তাহার



মন্দিরের মনোরম কারুকার্য্য।

স্থাপত্যকে বুঝিতে হইবে ; তবে তাহাকে ভালরূপে বোঝা যাইবে। ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলেও ভারতশিল্পের ইতিহাসকে দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের এই শিল্পের ইতিহাস দেখিতে গেলেই যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হইবে, কেননা—অতীত ভারতের অনুপম শিল্পসৌন্দর্য্য ও স্থাপত্যের জন্য তাহার বিপুল অর্থ ব্যয়, সুনিপুণ শিল্পীগণের প্রাণপাত পরিশ্রম, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও উৎসাহের পরিচয়ে আনন্দের অবতারণা করিবে ও আমাদের বর্ত্তমান ঔদাসীন্য ও অন্ধানুকরণ-প্রবৃত্তির চিন্তা বিষাদ উৎপাদন করিবে। অতীত ভারতের স্থাপত্যগরিমার পরিচয় ভারতের যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আজ এস্থলে ঐরূপ এক-স্থানের শিল্পগৌরবের পরিচয় দিব।

মহীশূরে যে-সকল প্রাচীন মন্দিরাদি দৃষ্ট হয় সাধারণতঃ সকলে ইহাকে চালুক্য-স্থাপত্য নামে অভিহিত করিয়া থাকে, কিন্তু একটু বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝা যায় যে, ইহা চালুক্যদের কার্য্য নহে। ইহার অধিকাংশই হয়শলাদের সময়ের কাজ। মহীশূরে এই হয়শলা-স্থাপত্যের অনেক সুন্দর সুন্দর নিদর্শন এখনও বেশ ভাল ভাবে আছে। অবশ্য বহু মন্দিরাদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এই-সকল ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরাদির স্থাপত্য-নিদর্শন এখনও চমক লাগাইয়া দেয়। হিন্দুরা যদি এ-বিষয়ে একটু অবহিত হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের গৌরবের —তাঁহাদের কেন, জগতের গৌরবের—সামগ্রীগুলি এমন-ভাবে নষ্ট হইয়া যাইত না। মহীশূর রাজসরকারের চেষ্টায় অবশ্য এখন আর কিছু নষ্ট হইতেছে না।

মহীশূরের শিল্পের প্রধান গৌরব হলবিদ্ ও বেলুড়ের মন্দিরাদির স্থাপত্য। এই স্থাপত্যের কএকটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ দেখা যায় মন্দিরগুলি বহুভুজাকৃতি



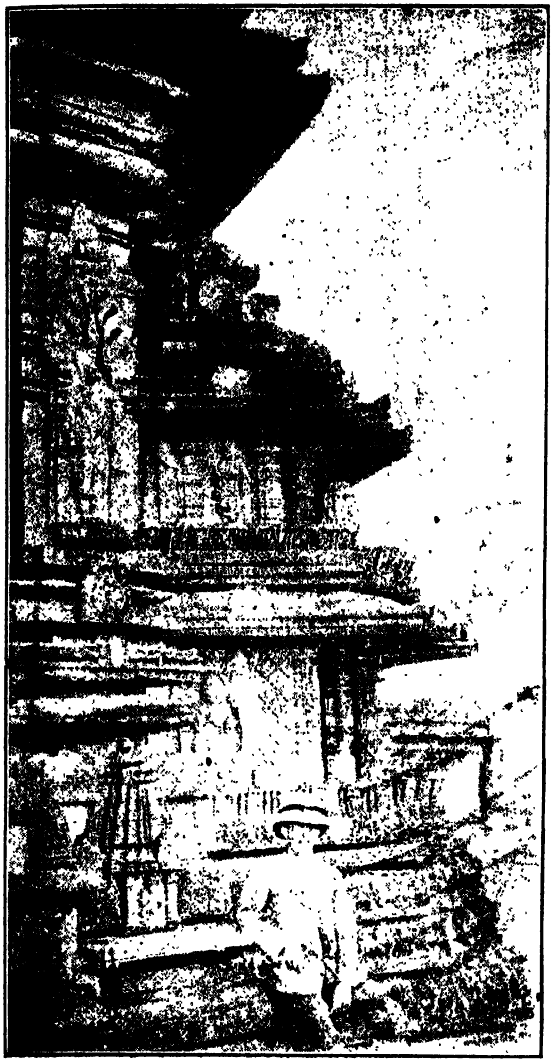
মন্দিরের তোরণ।

অর্থাৎ নক্ষত্রাকৃতি। কিন্তু ইহার সকল ভুজ অর্থাৎ দিক সমান নহে—চারিদিক অপেক্ষাকৃত লম্বা। দেয়ালে কোলঙ্গা-কাটা থাকে থাকে নানা মূর্ত্তি সজ্জিত ও

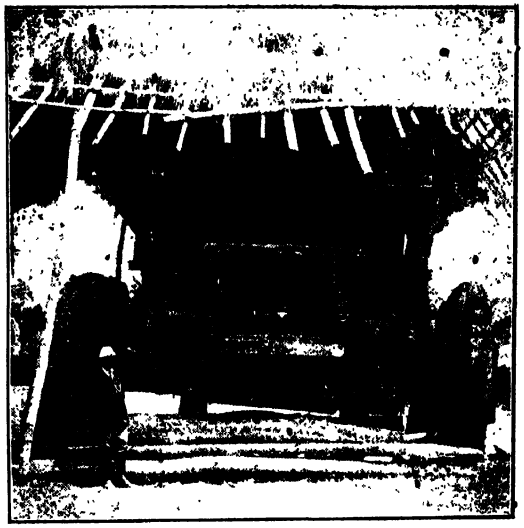
চতুর্থদিকে প্রবেশপথ। একটা প্রকাণ্ড ছাদের তলা দিয়া তিনদিকে সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরের প্রবেশ-পথে পৌছান যায়। শিল্পীদের বিশেষ চেষ্টা ছিল—প্রবেশদ্বারে শিল্পের পরিচয়টি

রকমের স্তম্ভ আছে, তবে প্রায় সকলগুলিই জোড়া জোড়া। মন্দির ১০-১৫ ফুট চওড়া চত্বরের উপর অবস্থিত।

হল্‌বিদে দুইটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। হয়্‌শলেশ্বরের মন্দিরটি ইহাদের মধ্যে প্রাচীন। বিনয়াদিত্যের (১০৪৭—১১০০) সময় ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয়, কিন্তু তিনি ইহার নির্ম্মাণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। দ্বিতীয় কেদারেশ্বরের মন্দিরটি বীর বল্লাল ও তাঁহার রাণী অভিনবা কেতলী দেবী কর্ত্তৃক ১২১৯ খৃঃ নির্ম্মিত হয়। প্রথমটির ৮৬ বৎসর নির্ম্মাণের পর বংশের উৎখাত ও অরাজকতা প্রভৃতির জন্য নির্ম্মাণ-কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। দেবজী, মাসানা, মায়ানা প্রভৃতি দক্ষ শিল্পীগণ নির্ম্মাণ-কার্য্যে রত ছিলেন। ফার্গুসান সাহেব অনুমান



মন্দিরের এক কোণ।



রথ।

বেশী করিয়া দেওয়া, কারণ প্রবেশদ্বারের শিল্পে যত সুনিপুণ হস্তের ও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যত্র ঠিক অতটা পরিমাণে উহা পাওয়া যায় না। মন্দিরের মধ্যে আলোক প্রবেশের বন্দোবস্ত একরূপ নূতন উপায়ে করা হইয়াছে। পাথর ফুটা করিয়া জানালার কাজ করা হইয়াছে। সচ্ছিদ্র প্রস্তরের মধ্য দিয়া বেশ আলোক আসিতে পারে। স্তম্ভগুলিতে শিল্পকার্য্যের তেমন প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না—কিন্তু দেখিলেই মনে হয় যেন কলের সাহায্যে কুঁদিয়া এগুলিকে মসৃণ করা হইয়াছে। মন্দিরে নানা-

করেন যে, সোমনাথপুরের মন্দিরের মত এখানকার ভিতরের মন্দির দুইটির উপরে দুইটি গম্বুজ ও প্রধান চত্বরের উপর বহু গম্বুজ নির্ম্মাণের ইচ্ছা শিল্পীদের ছিল। নিকট হইতেই প্রস্তরখণ্ডগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল ও খণ্ডগুলি যথাস্থানে সজ্জিত ও সংলগ্ন করিবার পর তাহার উপর খোদাই করা হয়। প্রস্তরগুলি যখন কাটিয়া সজ্জিত করা হয় তখন ঐগুলি নরম ছিল—কিন্তু বহুদিবস রৌদ্রবাতাস ও শিশির পাইয়া এখন বেশ শক্ত হইয়া গিয়াছে, যদি তাহা না হইত তবে এই সহস্র বৎসর তাহারা এমন অবিকৃত

আছে। এই তোরণ সম্বন্ধে ফাগুর্সান সাহেব বলেন যে "এই তোরণের প্রত্যেক দিক তৈরী করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম দরকার করিয়াছে তাহা বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে ঐ পরিমাণ কার্য্যের জন্য ব্যয়িত হয় নাই।"

যাহা হউক পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশের লোকের স্থাপত্যে ও শিল্পে বেশ একটু আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—এই আগ্রহের ফলে যদি যাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে তাহা মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যায় তাহা হইলেও ইহার ফল শুভ বলিতে হইবে।

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

পঞ্চশস্য

নেটা হাতের পরীক্ষা—

অনেক লোকের ডাহিন হাত অপেক্ষা বাঁ হাত খেলে ভালো; অথচ ছেলেবেলা হইতে পিতামাতা ও শিক্ষকের শাসন এবং লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাহাদিগকে সক্ষম হাতে সুবিধামত কাজ করিতে বাধা দিতে থাকে; দুটাই যখন হাত তখন যাহার যেটাতে সুবিধা সে তাহাতেই কাজ করিতে পারে; সচরাচর লোকে যে হাতে যে কাজ করে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলেই ক্রোধ বা ব্যঙ্গ করা অন্যায়; যাহার য হাতে সুবিধা তাহাকে সেই হাতেই কাজ করিতে দেওয়া উচিত, নতুবা কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

আমেরিকার সাউথ দাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ফ্রাঙ্কলিন জোন্‌স্, কোন্ ছেলের কোন্ হাত পটু ধরিবার জন্য, একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; এই যন্ত্রে ছেলেদের কোন্ হাতের আল্‌না নামক হাড় লম্বায় বড় তাহাই মাপা যায়; কনুই হইতে কব্জির মধ্যে যে দুখানি জোড়া হাড় থাকে তাহারই ভিতর দিকের লম্বা হাড়খানির নাম আল্‌না; যে হাতের আল্‌না হাড় লম্বায় বড় হয় সেই হাত বেশী পটু হয়, এবং ছেলেদের সেই হাতে কাজ করিতেই অভ্যাস করানো উচিত। এই যন্ত্রে সদ্যপ্রসূত শিশু হইতে সকলের হাতই মাপা যায় এবং যত সকাল-সকাল শিশুর হাতের মাপ লইয়া তাহাকে সেই হাত চালনায় অভ্যস্ত করা যায় ততই ভালো। অধ্যাপক মাপিয়া দেখিয়া ঠিক করিয়াছেন দশ হাজার ছেলের মধ্যে ৪১৭ জন বাঁইয়া বা নেটা হইয়াই জন্মিয়াছিল, ৯৫৮৩ জন ডাহিনা; অর্থাৎ মানুষের শতকরা ৪জন বাঁইয়া, ৯৬ জন ডাহিনা। সুতরাং প্রকৃতির ব্যবস্থা উল্টাইয়া জুলুম করিয়া নেটাদের ডাহিন হাতে কাজ অভ্যাস করাইলে সেইসব ছেলে জড়বুদ্ধি তোতলা ও অসুন্দরকর্ম্মী হয়। এই যন্ত্র তৈয়ারী করা খুব সোজা, চিত্র দেখিলেই উহার নির্ম্মাণ-কৌশল যে-কোনো যন্ত্রজ্ঞানী বুঝিতে পারিবেন; এই যন্ত্রে কনুই হইতে আঙুলের মাঝের গিরা পর্য্যন্ত মাপ লওয়া হয়, কারণ কেবল মাত্র আল্‌না হাড়ের মাপ নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়।

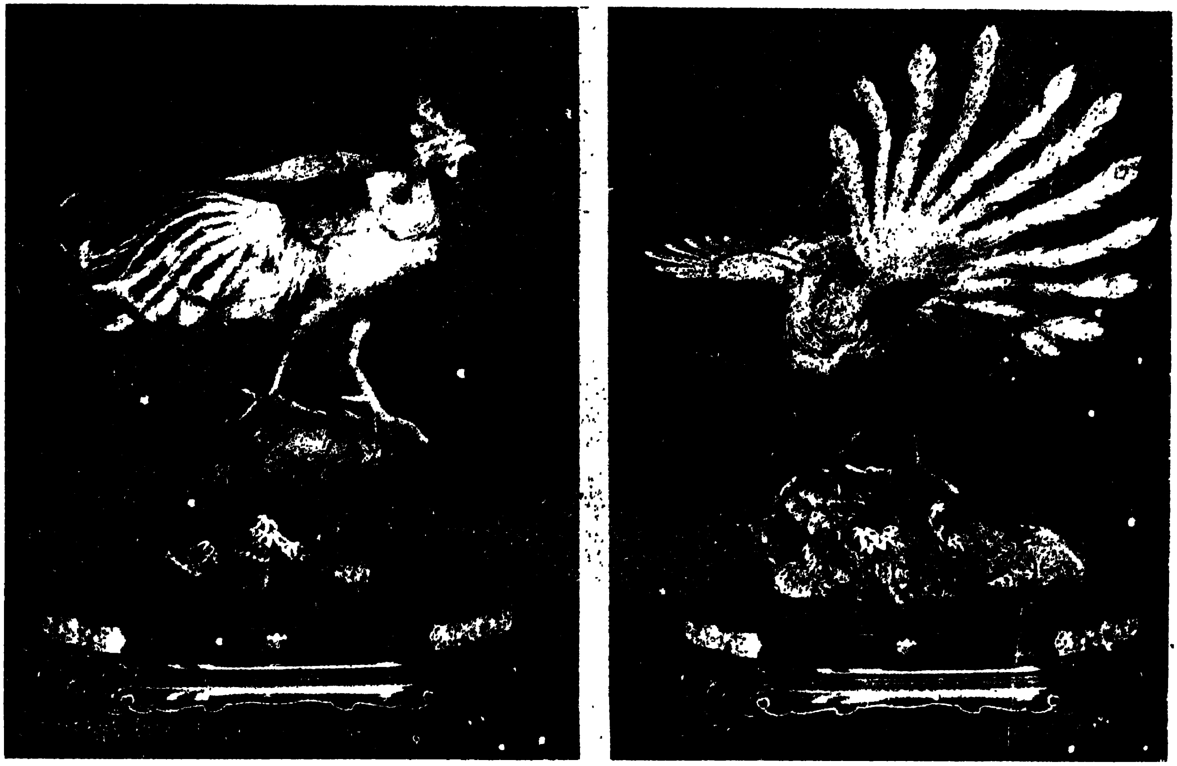


হাতের দক্ষতা নির্ণয়।

বাড়ী বহন—

আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারেরা গোটা গোটা কোঠা বাড়ী এক জায়গা হইতে উঠাইয়া অপর জায়গায় বসাইতে পারে; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবাসীতে ইহার বিবরণ ও ছবি আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমেরিকানেরা জলে স্থলে সমান ভাবে বাড়ী বহিয়া লইয়া যাইতে পারে; এক শহরের এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তায় জমির উপর বাড়ী তুলিয়া লইয়া বসায়; এক শহর হইতে অপর শহরেও বাড়ী বহিয়া লইয়া যায়। নেপোলিয়নের বাসভবন কিনিয়া ফ্রান্স হইতে তাহা জাহাজে তুলিয়া আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি পানামা-পাসিফিক প্রদর্শনী হইয়া গেল; সেখানে বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল; প্রদর্শনীর পরে অত-খরচ করিয়া তৈয়ারি বাড়ীগুলি নষ্ট করিয়া ভাঙিয়া না ফেলিয়া লোককে বিক্রয় করা হইতেছে এবং খরিদদারেরা সেইগুলিকে জাহাজে তুলিয়া বা ভেলায় ভাসাইয়া জাহাজ দিয়া টানিয়া অভিলষিত স্থানে লইয়া গিয়া বসাইতেছে।

দি ইঞ্জিনিয়ারিং রেকর্ড নামক আমেরিকার কাগজে ইহার একটি বর্ণনা বাহির হইয়াছে। একটা দেবদারু কাঠে তৈরি বাংলা-ঘর ৫৫ হাজার টাকা খরচে নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই বাড়ীটিকে মেলার মাঠ হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত এক মাইল পথ তুলিয়া লইয়া যাইতে এক সপ্তাহ লাগিয়াছিল। ঐ বাড়ীটির ওজন ১৬০ টন বা প্রায় সাড়ে চার হাজার মণ। সেইটিকে ডাঙা হইতে ভেলায় তোলা যে কিরূপ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করা যায়; ঐ অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার পালা বড় ঘন ঘন ও জলের ওঠা নামা খুব বেশী—৯ ফুট। সুতরাং বাড়ীটিকে ভেলায়

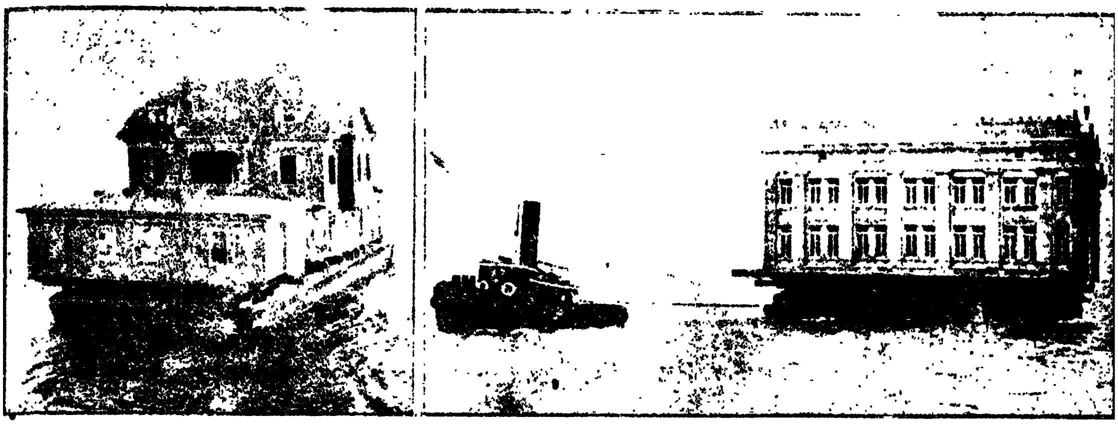


রূপার ময়ূর।

জাপানের সেকরার তৈয়ারী।—সম্রাটের অভিষেকের সময় আমীর-সভা (Peers' Club) সম্রাটকে উপহার দিয়াছিল।



মসজিদের সোপানে ফকির।
চিত্রকর শ্রীযুক্ত অরুণকুমার নাগ।



বাড়ী বহন।

চাপাইতে হইয়াছিল খুব চটপট। ভেলায় চাপাইয়া ১৫ মাইল দূরে এক জায়গায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল ছয় ঘণ্টায়। সব চেয়ে যে বড় বাড়ীটি নড়ানো হইয়াছিল তাহা ১৩২½ ফুট লম্বা, ৮০ ফুট চওড়া, ৪৩ ফুট উঁচু, ওজন হাজার টন বা সাতাশ হাজার মণ। ছখানা ছয় শত টনের ভড় জোয়ারের সময় খুব উঁচুতে চড়ায় তুলিয়া পাশাপাশি রাখা হয়; ভাটার সময় জল নামিয়া গেলে বাড়ীটিকে সেই ভড়ের উপর চড়ানো হয়; আবার জোয়ার আসিলে তাহাদের ভাসাইয়া ৩২ মাইল দূরে এক জায়গায় বাড়ীটিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এইরূপে বহু বাড়ী মেলার ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

দুধ খাওয়ার নিয়ম—

বিশুদ্ধ দুধ যেমন স্বাস্থ্যপ্রদ, অশুদ্ধ দুধ তেমনি স্বাস্থ্যহানিকর। গরুর বাঁট, গোয়াল, দোহাল, ভাঁড়, দুধ রাখিবার ঘর ও পাত্র প্রভৃতি সমস্তই যদি খুব পরিষ্কার না থাকে তবে দুধের মধ্যে যক্ষ্মা, ক্ষয়, ডিপথেরিয়া, টাইফয়েড, শূল প্রভৃতি কঠিন রোগের বীজ বাসা বাঁধিয়া থাকে; এই অশুদ্ধ দুধ খাইয়াই বৎসর বৎসর অত শিশুর মৃত্যু হয়। রুগ্ন গরুর দুধ খাইলেও মানুষের বহুবিধ গো-রোগ হইয়া থাকে।

অনেকে মনে করেন দুধ জ্বাল দিয়া লইলে রোগবীজ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু পাস্তুর দেখাইয়াছেন ১৫৮ ডিগ্রি ফ্যারেনহিট তাপের কমে সব রোগবীজ নষ্ট হয় না। অধিকন্তু ডাক্তার কেলগ্, গুড্ হেল্থ নামক সাময়িক পত্রে, মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে রান্না করিয়া খাওয়াটা মানুষের একটি স্বাস্থ্যহানিকর বিলাসিতা; রান্না-করা জিনিস স্বাদু হয় বলিয়া লোকে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত খায় ও তাহার ফলে পীড়িত হয়; রান্না করিলে খাদ্যবস্তুর অনেক পুষ্টিকর উপাদানের অপচয় হয় অথবা উল্টা রকমে অপকারী হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া দুধ কিছুতেই গরম করিয়া খাওয়া উচিত নয়; সুস্থ পরিষ্কার গরুর বাঁট হইতে সদ্য-দোওয়া খাঁটি দুধ কাঁচা খাওয়া পরম বৃষ্য ও রসায়ন; কাঁচা টাটকা দুধে ভাইটামিন, আনজাইম প্রচুর থাকিয়া জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত করে, মস্তিষ্ক ও পেশী-পোষক প্রোটিন থাকাতে দেহ বলিষ্ঠ হয়, অস্থিপোষক লবণ থাকাতে দেহের লাবণ্য ও কান্তি উজ্জ্বল করে। দুধ গরম করিলে ঐসব গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

দুধও কঠিন খাদ্যের মতন চিবাইয়া খাওয়া উচিত। চিবাইয়া খাওয়ার গুণ এই যে খাদ্য লালার সহিত মিশিয়া পেটে গিয়া শীঘ্র হজম হয় এবং হজম হওয়া মানে দেহে শোষিত হইয়া রসরক্তে পরিণত হইয়া জীবনীক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। বাছুর ও শিশুরা মাতৃস্তন্য চিবাইয়া চিবাইয়া খায়, অর্থাৎ দুধ পান করিবার সময় তাহারা এক এক ঢোক দুধ মুখে লইয়া মুখ নাড়িয়া পাকলাইয়া পাকলাইয়া বেশ করিয়া লালা-মিশ্রিত করিয়া খায়। এক চুমুকে খানিক দুধ গিলিয়া খাইলে পেটে গিয়া সমস্তটা চাপ দই বাঁধে; সেই চাপ দই হজম করা সকলের সাধ্যে কুলায় না। সুতরাং দুধ ঢোকে ঢোকে মুখ নাড়িয়া খাওয়া উচিত; একেবারে অনেকখানি দুধ খাওয়া উচিত নয়; দুধ দিয়া পায়স পরমান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া খাইলেও গুরুপাক হয়।

কিন্তু যাহাদের পাকাশয়ে অধিক পরিমাণে অম্লরস ক্ষরিত হয় অর্থাৎ যাহাদের অম্লরোগ আছে, তাহাদের পক্ষে অনেকখানি দুধ একেবারে খাওয়া উপকারী; অল্প দুধ খাইলে অধিক অম্লরসের সংযোগে পেটে যে দই চাপ বাঁধে তাহা অত্যন্ত কঠিন হয়,—এবং তাহাতে হজমের ব্যাঘাত হয়; বেশী দুধ খাইলে সেই অম্লরস অতখানি দুধকে খুব কঠিন করিয়া জমাইতে পারে না।

পাকাশয় একই সময়ে এমন দুরকমের অম্লরস ক্ষরণ করিতে পারে না যাহাতে দুধ ও মাংস দুই হজম করিতে পারে; সুতরাং মাংস খাওয়ার পর দুধ বা দুধ খাওয়ার পর মাংস খাওয়া উচিত নয়। ইহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-সম্মত।

যাহারা বেশী দুধ খায় তাহাদের অপরাপর খাদ্যের মধ্যে ফল ও তরী-তরকারী প্রধান হওয়া উচিত; দুধে চুনের ভাগ বেশী থাকে, এবং শরীরপোষক পটাশ ও সোডা খুব কম থাকে, তাহা ফল ও তরকারীতে—বিশেষ করিয়া আলুতে—খুব প্রচুর থাকাতে হরণপূরণ হইয়া যায়। কেবল দুধ ও দাল খাইলে ছেলেদের রক্তপিত্ত রোগ হয়—অর্থাৎ দাঁতের গোড়া নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়ে; ইহার কারণ দালে আলকলি বা চুন জাতীয় পদার্থ কম থাকে,—দেহে সঞ্জাত অম্লরসকে আলকলি-পদার্থই সমতা দান করে।

ছাতার বাঁটের চাষ—

ছাতার বাঁট সুন্দর ও সুবিধা-মত করিবার জন্য ছাতার বাঁটের রীতিমত চাষ হইয়া থাকে। ফ্রান্সের সেইন-এ-ওয়াজ অঞ্চলে ১৫০০ বিঘা জমিতে শুধু উহারই চাষ হয়। ক্ষেতে ওক, অ্যাশ,

পপ্লার, মেপ্ল্ গাছ পুতিয়া গাছের চারাগুলি বেশ বড় হইলে গোড়া ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলা হয়; তখন তাহাদের গোড়া হইতে সোজা সোজা কোঁড় বাহির হয়; সেই কোঁড়গুলির গায়ে নানাবিধ নক্সা কাটিয়া দ্যায়। তিন বৎসরে সেই নক্সাগুলি কাঠের গায়ে গভীর ও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তখন সেই কোঁড়গুলিকে কাটিয়া, ডালপালা ছাঁটিয়া রৌদ্রে শুকায় এবং তাহার পর গরমজলের ভাপে রাখিয়া তাহাদের গায়ের ছাল ছাড়াইয়া ফেলে। তারপর সেগুলিকে ভিজে তাত দিয়া সোজা করে ও নির্দিষ্ট মাপে কাটিয়া লয়। কোঁড়গুলি তাজা থাকিতেই বাঁকাইয়া বা ইচ্ছামত স্থানে অপর একটা গাছের জোড়কলম লাগাইয়া বা একটা ডাল অল্প রাখিয়া কাটিয়া বিবিধ ধরণের বাঁটের হাতল তৈয়ারি করে।

শুক্র গ্রহে জীব আছে কি ?—

আমেরিকার খ্যাতনামা জ্যোতিষ ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের লেখক শ্রীযুক্ত গ্যারেট সার্ভিস আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে শুক্র-গ্রহে জীব আছে কি না।

শুক্রগ্রহের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই অনুমান হয় যে সেখানে জীব থাকার সম্ভাবনা একশত, ও না-থাকার সম্ভাবনা এক। এবং সেইসব জীবের যাহারা শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের চেয়েও অনেক বিষয়ে উন্নত ও পরিণত।

সূর্য্যের চারিদিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে শুক্রের যতক্ষণ সময় লাগে, ঠিক ততক্ষণ সময়েই সে নিজের শরীরও একবার মাত্র পাল্টায়; পৃথিবী সূর্য্যকে যতক্ষণে একবার প্রদক্ষিণ করে ততক্ষণে নিজের শরীর ৩৬৫ বার ঘুরায়; ইহার ফলে পৃথিবীর এক বৎসরে ৩৬৫ অহোরাত্র আসে যায়, কিন্তু শুক্রের এক বৎসরে মাত্র এক পিঠে একটি দিন ও অপর পিঠে একটি রাত্রি, অর্থাৎ শুক্রের এক গোলার্দ্ধে চিরদিবস ও অপর গোলার্দ্ধে চিররাত্রি বর্ত্তমান। কোনো কোনো জ্যোতিষীর মতে কিন্তু শুক্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর ন্যায়ই দিবারাত্রির পর্য্যায় ঘুরিয়া চলে।

শুক্রের এক পিঠে অনন্ত দিবস ও অপর-পিঠে যদি অনন্ত রাত্রি হয় শুক্রের পিঠে দিন সে-পিঠে এত গরম ও যে-পিঠে রাত্রি সে-পিঠ এত বেশী ঠাণ্ডা হওয়ার কথা যে শুক্রের কোনো পিঠেই জীব উৎপত্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না—ইহা যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা শুক্রের আব-হাওয়া ও আবহের অবস্থা ভাবিয়া দেখেন না। অধ্যাপক হাউসডেন স্বীকার করেন যে চিররাত্রিময় দেশে জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবপর না হইলেও দিনের দেশে জীব থাকিবার অনুকূল অবস্থা শুক্রে আছে। সার্ভিস বলেন চিররাত্রিময় দেশেও জীব থাকিবার কোনো বাধা নাই—রৌদ্রের উত্তাপের অভাব শুক্রগ্রহের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ও বিশেষ রকমের আবহ-অবস্থায় পূরণ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়।

শুক্রগ্রহ আজন্ম এই অবস্থাতেই আছে; ক্রমশঃ শীতল হইয়া জীবনিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি জীব চিররাত্রির দেশের ও কতকগুলি চিরদিবসের দেশের উপযোগী হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের আবহাওয়ার বৈচিত্র্য ও তাপবৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও আকৃতির জীব ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু শুক্রের অবস্থার সমতা জীব ও উদ্ভিদ উৎপত্তিতেও সমতা রক্ষা করিয়া থাকিবে। জীব ও উদ্ভিদের আকার ও বৃদ্ধি মাধ্যাকর্ষণের টানের প্রবলতার উপর নির্ভর করে; ছোট গ্রহের টান কম বলিয়া সেখানে জীব ও উদ্ভিদের বাড় বেশী হয়। শুক্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অল্প কম; সুতরাং সেখানকার জীবের আকার প্রকার ও চেহারা অনেকটা পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদের মতন হওয়া সম্ভব। শুক্রের হাওয়া পৃথিবীর বাতাসের চেয়ে ঘন; সুতরাং সেখানকার প্রায় সকল জীবেরই উড়িবার ক্ষমতা আছে বোধ হয়। মাধ্যাকর্ষণ অল্প ও বাতাস ঘন হওয়াতে পাখী-জাতীয় জীবেদেরই প্রাধান্য এবং তাহাদের মধ্যেই বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ ঘটিয়া উঠিতেছে; সেখানকার মানুষ-জাতীয় বুদ্ধিমান জীবেদেরও ডানা আছে—তাহারাই বোধ হয় পৃথিবীর কাল্পনিক পরী বা গন্ধর্ব্ব। শুক্র-গ্রহের চারপেয়ে জানোয়ারেরা নিরেট বোকা ধরণের, গাধার সগোত্র গোছের।

শুক্রগ্রহের জীবেরা অধিকাংশই স্থলচর। তাহারা আবার তিন প্রকারের—(১) শুক্রপৃষ্ঠের মধ্যবলয়ের উপরে যেখানে সূর্য্যের তাপ বেশী লাগে সে জায়গাটা আফ্রিকার সাহারার মতন মরুময়, সেখানকার জীব পৃথিবীর মরুপ্রদেশের জীবের অনুরূপ; কিন্তু পৃথিবীর মরুভূমিগুলি আবহমান কাল ধরিয়া মরুই ছিল না, অনেক মরুভূমি সমুদ্রের শুষ্ক গর্ভ; কিন্তু শুক্রের মরুপ্রদেশ দুহাজার মাইল ব্যাপিয়া বলয়াকারে লক্ষ লক্ষ বৎসর হইতে সমভাবেই আছে; সুতরাং সেখানকার মরুজীবের মধ্যে বৈচিত্র্য পৃথিবীর বৈচিত্র্যহীন মরুজীবের চেয়েও ঢের কম। একই অবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জীবের যে পরিণতি হইয়াছে তাহাতে প্রতিবেশী জীব-সকল হইতে তাহাদের আকৃতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের হইয়া পড়িয়াছে। শুক্রের মরুবলয়ের জীবগুলি অতিকায় কিম্ভুতকিমাকার, পৃথিবীর সত্যযুগের মৎস্য কূর্ম্ম সরীসৃপ হইতেও ভয়ঙ্কর কুদর্শন সরীসৃপ; উদ্ভিদও ফণীমনসা-জাতীয়, কুদর্শন কণ্টকী, তাহাদের ডগডগে রঙের বড় বড় ধামার মতন ফুল। শুক্রের মধ্যদেশ এইরূপ অদ্ভুত ভয়ঙ্কর অনাসৃষ্টির জন্মভূমি, সেখানে অন্য দেশের খুব সাহসী জীবও উঁকি মারিতে ভয় পায়। (২) এই মরুবলয়ের পরে যে বলয়টি তাহার বেড় ১৬ হাজার মাইল, চওড়া ২০০০ মাইল; তাহার মরুসন্নিহিত প্রান্ত গ্রীষ্মপ্রধান ও অপর দূর প্রান্ত শীতপ্রধান—যেমন পৃথিবীর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও আলাস্কা বা ভারতবর্ষ ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্ত্তী দেশগুলি। এই প্রদেশের উপর ঘন মেঘের চন্দ্রাতপ সদা-প্রলম্বিত থাকে ও মাটির উপর বড় বড় চওড়া চওড়া খাল কাটা আছে; তাহার ফলে এই দেশের উদ্ভিদ ও জীব পৃথিবীর উল্লিখিত দেশেরই সমতুল্য হওয়া সম্ভব। (৩) চিররাত্রিময় দেশের জীব—ইহাদের কথা পরে হইবে।

প্রকৃতি পৃথিবীর পরীক্ষাশালায় লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া কত-বিধ জীব গড়িয়া ভাঙিয়া বহু গবেষণায় বর্ত্তমানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে মানুষের যেমন আকার-প্রকার বুদ্ধি-শুদ্ধি তাহাই জীবপরিণতির শ্রেষ্ঠ বিবর্ত্তন। সুতরাং আন্দাজ করা যাইতে পারে যে শুক্রবাসী জীবদের বুদ্ধিমান যাহারা তাহারাও কতকটা মানুষেরই মতন, কেবল স্থানীয় অবস্থার ফেরে যা অল্পস্বল্প অদল-বদল হইয়া থাকিবে। তাহারা মানুষের মতন খাড়া হইয়া চলে; মস্তিষ্কটা শরীরের ঊর্দ্ধে মাথার মধ্যেই থাকে; মানুষের মতনই চলিবার জন্য একজোড়া পা ও কাজ করিবার জন্য একজোড়া হাত তাহাদেরও আছে; তবে কার্য্যপ্রণালী ও অবয়বের আকারের খুঁটিনাটিতে পার্থক্য থাকিতে পারে।'

সূর্য্য হইতে বিকীর্ণ বিদ্যুৎ-শক্তিতে ব্যাপ্ত আকাশের যে অংশে পৃথিবী আছে, তাহা অপেক্ষা অধিক বিদ্যুৎময় ক্ষেত্রে শুক্রের অবস্থান। ইহার ফলে শুক্রগ্রহের চুম্বকশক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তি খুব প্রবল হইবার কথা। ইহার প্রভাব সেখানকার জীবের দেহ ও বুদ্ধিকে অধিকতর শক্তিশালী ও কর্ম্মক্ষম করে। অধ্যাপক হাউসডেনের মতে শুক্রের উপরে যে ঘনমেঘের চাঁদোয়া আছে তাহা শৌক্রেয় লোকেদের বুদ্ধির রচনা; সেই মেঘাস্তরণে সৌর শক্তি সঞ্চিত হইয়া শুক্রপৃষ্ঠে আবশ্যক-মত সঞ্চারিত হয়; এবং এইরূপে সর্ব্বত্র তাপ ও শৈত্যের সমতা সম্পাদন করিয়া তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে। পৃথিবীর

বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় গাছপালা খুব বাড়ে; সুতরাং শুক্রের স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সেখানকার জীব ও উদ্ভিদের পোষণ ও বৃদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে। শুক্রে একে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর অপেক্ষা কম, তাহাতে বৈদ্যুতিক ও চুম্বক-শক্তি অধিক এবং মেঘ-শামিয়ানা তাপ ও শৈত্যের সমতা রক্ষা করে, ইহাতে সেখানকার লোকেরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে আকারে বড়, দেহ-শক্তিতে দৃঢ়, মনের জোরে দৃঢ় ও স্নায়বিক বলে পোক্ত। ইহার ফলে তাহাদের এমন সব ইন্দ্রিয় উদ্গত হইয়াছে যাহা আমাদের ভাগ্যে জুটে নাই। আমরা যেমন আলো ও শব্দ দেখিতে ও শুনিতে পাই, তাহারা তেমনি সহজে বিদ্যুতের অস্তিত্ব বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় দিয়া ধরিতে পারে হয়ত। সে-সমস্ত ইন্দ্রিয় মাথার চারিদিকেই থাকা সম্ভব। তাহারা কথা বলে 'ইলেক্ট্রো-ম্যাগ্নেটিক' অর্থাৎ বৈদ্যুত-চৌম্বক শক্তিসমন্বিত স্বরে, তাই সে-কথা সমস্ত গ্রহপৃষ্ঠেই শোনা যায়। যদি তাই হয় তবে সেখানকার প্রেমিক এমন কথা বলিতে পারে না যে "সখী, তোমার গোপন কথাটি, শুধু আমায় বোলো আমায় বোলো।" সেখানে সব কথাই সকলের কাছে ফাঁস হইয়া যায়। তবে এমনও হইতে পারে যে আমাদের তারহীন টেলিগ্রাফের মতন সে শব্দ সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িলেও সকলেই ধরিতে পারে না, কেবল যাহাকে বলা হইতেছে সেই ধরিতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির মধ্যে অবগাহন করিয়া থাকাতে মনের কথা মনে মনে চালান করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব; এবং তাহাদের মনেরও এমন বাহ্য বল আছে যাহার ধাক্কায় বস্তুকেও গতি দান করা যায়। তাহারা শত্রুকে চোখের কটাক্ষে বধ করিতে পারে, কামান বন্দুক তাহাদের কিছুই করিতে পারে না; তাহাদের চোখের বদলে, কিম্বা চোখ ছাড়াও, এমন একটা ইন্দ্রিয় আছে যাহা হইতে বিদ্যুৎ ছিটকাইয়া অপরকে সম্মোহিত বা আঘাত করিতে পারে। আমরা যেমন চোখের পর্দায় চারিদিকের বস্তুর প্রতিফলিত আলোকের ছবি দেখিয়া তাহাদের সত্তা অনুভব করি, শৌক্রেয় লোকেরা পারিপার্শ্বিক বস্তুর বিদ্যুৎ-বিকিরণ অনুভব করিয়া তাহাদের সত্তার জ্ঞান লাভ করে হয়ত। বিদ্যুৎ-শক্তি আলোক-শক্তি হইতে প্রবল বলিয়া তাহাদের বস্তুজ্ঞান আমাদের বস্তুজ্ঞান হইতেও প্রকৃষ্টতর ও প্রগাঢ়, বস্তুর গূঢ় অন্তর্দেশের খবর পর্য্যন্ত রঞ্জন-রশ্মি বা X-rayর ছবির মতন তাহাদের ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে।

শৌক্রেয় লোকেরা দীর্ঘায়ত, সুসমঞ্জস-দেহ, সুন্দর সুদর্শন; তাহারা অতিমানুষ, অপার্থিব শক্তিসম্পন্ন; তাহাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি, মদনের স্বরূপ সঙ্গত হইয়াছে। শুক্রগ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া সেখানে কতবিধ নব-নব শক্তি নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে; তাহার ফলে সেখানকার লোকেরা অদ্ভুতকর্ম্মা, আমাদের কল্পনাও তাহাদের কাজের কাছে হার মানে। যন্ত্রবিজ্ঞানে তাহারা সুপণ্ডিত; তাহারা এক-একজন এক-একটা চলন্ত জীবন্ত বিদ্যুতের ব্যাটারী; তাহারা মাটিতে হাঁটিয়া চলে আমাদের দৌড়ের মতন, আকাশেও উড়িয়া বেড়ায় অনায়াসে। পৃথিবীর সকল দেশের পুরাণেই দেবরাজকে বজ্রপাণি বলিয়া কল্পনা করা হয়; শুক্রের দিনময় লোকেরা বজ্রপাণি বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

শুক্রগ্রহের চন্দ্র নাই। তাহার রাত্রিময় পৃষ্ঠ তারকার আলোক ও বিদ্যুৎ-উদ্ভাসনে আলোকিত। সেই দেশের লোকেরাও বুদ্ধিমান জীব বটে, কিন্তু দিনময় পৃষ্ঠের লোকদের মতন নহে। চন্দ্রলোকে বাতাস নাই বলিয়া সেখানে জীবের সম্ভাবনা মনে হয় না; কিন্তু শুক্রের রাত্রিময় দেশে প্রচুর আবহাওয়া থাকাতে সেখানে জীবের সম্ভাবনা আছে। সে দেশ খুব ঠাণ্ডা বলিয়া জীবেদের গা খুব লোমশ ও শীতসহ বলিয়া অনুমান হয়। এইসব জীবেরও বৈদ্যুতিক ইন্দ্রিয় থাকা সম্ভব—তাহা হইতে গভীর সমুদ্রের জীবের মতন আলোক বিকিরণ হয় ও টর্পেডো বা বৈদ্যুতিক কুঁচলে মাছের ন্যায় বিদ্যুৎ-আঘাত করিতে পারে। তাহারা বুদ্ধিমান জীব হইলেও দিনময় পৃষ্ঠের জীবেদের মতন দেখিতে নয়; তাহারা মাটির তলায় বাস করে এবং উপযুক্ত অঙ্গের সাহায্যে মাটির তলায় ছুঁচোর সুড়ঙ্গ-আবাসের ন্যায় তাহারাও বড়-বড় শহর জনপদের পত্তন করে।

শুক্রের দিনময় পৃষ্ঠের খাল হইতে জলবাষ্প প্রবাহিত হইয়া রাত্রিময় পৃষ্ঠের দিকে যায় এবং সেখানকার ঠাণ্ডায় জমিয়া বরফের বলয়ে রাত্রিময় দেশটিকে ঘিরিয়া অনধিগম্য করিয়া রাখে; কিন্তু সেই বরফ-বলয়ের বেষ্টনীর মধ্যের দেশ বরফ-বিমুক্ত ও সেখানকার বাতাস শুষ্ক—সুতরাং সেখানে জীবের বিচরণের কোনো বাধা নাই। অনুল্লঙ্ঘ্য বরফ-বলয়ে বেষ্টিত থাকাতে দিনময় দেশের জীব রাত্রিময় দেশে বা এদেশের জীব সেদেশে গতায়াত করিতে পারে না;—তাহারা একই গ্রহে জন্মিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া আছে।

চারু।

কষ্টিপাথর

মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান।

জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মহাত্মা নিউটন, (১৬৪২—১৭২৭ খৃঃ অব্দে) মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান সভ্যজগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই নিগূঢ় তত্ত্ব ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই মোসলেম বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়। এই মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব, তখন মুসলমান শিক্ষিতসমাজে এতই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, অবৈজ্ঞানিক কবিগণও নানা প্রাকৃতিক বর্ণনাপ্রসঙ্গে এই তত্ত্বের আলোচনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক কবি, মৌলানা রুমীর "মসনবী-এ-মানবী" নামক মহাকাব্যের মধ্য হইতে কয়েকটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

প্রাকৃতিক বিধানে, জগতের সমুদয় উপাদান পরস্পর সংযোজিত এবং প্রেমভরে একটা আর একটির প্রতি আকৃষ্ট।

জগতের প্রত্যেক বস্তু অন্যের সহিত সম্মিলন-প্রয়াসী, যথা চুম্বক লৌহখণ্ড, বৃক্ষ লতার প্রতি আকৃষ্ট।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী (চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা ইত্যাদি) পৃথিবীকে সাদর সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "চুম্বকের সহিত লৌহের যেরূপ সম্বন্ধ, তোমার সহিতও আমাদের সেইরূপ সম্বন্ধ।"

কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—এই ভূমণ্ডল কিরূপে এই ব্যোমমণ্ডল-বেষ্টিত শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে?

ইহা লণ্ঠনের ন্যায় কিরূপে শূন্যে ঝুলিতেছে? ইহা না নিম্নগামী হইতেছে, না ঊর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে!

দার্শনিক তাহাকে উত্তর দিলেন, "আকাশ বা সৌরজগতের গ্রহাদির আকর্ষণ-শক্তিতে জগৎ ষট্‌দিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে।

একটি চুম্বকের শূন্য গোলকের মধ্যে, এক দোদুল্যমান লৌহখণ্ড সংরক্ষিত হইলে তাহা যেরূপ ঝুলিতে থাকে ঠিক তদ্রূপ।"

যে যুগে সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, যে যুগে ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টিয়ানগণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রবলবেগে বাধা দিতেছিল, সেই যুগেই মোসলেম পণ্ডিতগণ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অণু-পরমাণুর

সংযোজন-তত্ত্ব অবগত ছিলেন এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ও চুম্বকের আকর্ষণ-শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

মৌলানা রুমী-বিরচিত 'মসনবী' গ্রন্থে বিশ্বনিয়ন্তা খোদাতাআলার মহিমা প্রকাশ-প্রসঙ্গেই কবিতায় মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আলোচনা আসিয়া পড়িয়াছে। এই মহাকাব্য ছয়শত বর্ষেরও অধিক হইল রচিত হইয়াছে।*

আবদুর রহমান।

* মুসলমানগণ যে, পণ্ডিতপ্রবর নিউটনের সপ্তশতাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব অবগত ছিলেন, মোসলেম-জগতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এমাম ফখর উদ্দীন রাজি দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তিনি তাঁহার "মবাহেসে মশরেকিয়া" নামক গ্রন্থে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সাবেত এবনে কোর্‌রা'র একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার বঙ্গানুবাদ যথা—"আমরা যখন কোন প্রস্তরখণ্ডকে উর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করি, তখন তাহা যে ভূতলশায়ী হয় তাহার কারণ এই যে প্রত্যেক বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ তাহার বৃহত্তম অংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রত্যেক বস্তুর পক্ষে তাহার সমশ্রেণীর মূল বা বৃহৎ বস্তুর প্রতি ধাবিত হওয়া স্বাভাবিক। ইহার একটা দৃষ্টান্ত যথা,—মনে করুন, ভূপৃষ্ঠের দুইখণ্ড মাটি যদি শূন্যদেশে অনতি ব্যবধানে সংরক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার বৃহৎ খণ্ড ক্ষুদ্র খণ্ডকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবে। পৃথিবীকে সমান ভাগে দুইখণ্ডে বিভক্ত করিয়া শূন্যমার্গে রাখিয়া দিলে তাহা পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একসঙ্গে মিলিত হইবে। পরন্তু ইহাও যদি কল্পনা করিয়া লওয়া যায় যে, পৃথিবীকে সূর্য্য-মণ্ডলের নিকট রাখিয়া দিয়া আর একখণ্ড প্রস্তর বর্ত্তমান পৃথিবীর স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে, উক্ত প্রস্তর-খণ্ড পৃথিবী কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সেই সুদূর সূর্য্য-মণ্ডলের নিকট উপস্থিত হইবে। আবার এরূপ যদি কল্পনা করা হয় যে, পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া শূন্যমার্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে, ঐ-সকল খণ্ডাংশ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ম্মিলিত হইবে।" মুসলমান কবিগণও যে কবিতাদিতে নানা বর্ণনা-প্রসঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের অবতারণা করিতেন, আমরা এই ক্ষেত্রে "কবি ওয়াহশী এজদি" প্রণীত "মসনবী শিরিঁ ফরহাদ" গ্রন্থ হইতে আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। কবি হিজরী দশম শতাব্দীর লোক।

অনুবাদ—প্রত্যেক সতত-গতিশীল পরমাণুতে এক আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান, সেই পরমাণু অন্য পরমাণুকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

তুমি যদি নিম্ন হইতে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখ, তাহা হইলে কোন বস্তুই তুমি এই আকর্ষণ-শূন্য দেখিতে পাইবে না।

অগ্নিশিখা হইতে বায়ুমণ্ডল পর্য্যন্ত, এবং জলাম্বু হইতে ভূতল পর্য্যন্ত, পৃথিবীর নিম্নতম দিক হইতে উচ্চ আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত তুমি যদি বুঝিতে পার, তবে সর্ব্বত্রই পাশাপাশি ও দলে দলে এই আকর্ষণ বিদ্যমান।

পদার্থ-জগতের এই আকর্ষণ সম্বন্ধ, অতি জটিল শৃঙ্খলে লুক্কায়িত, বলা বাহুল্য যে, এই আকর্ষণই মূল পদার্থ, এতদ্ব্যতীত আর সমস্তই ভুয়া।

এই আকর্ষণ-শক্তি লৌহখণ্ডে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, তাহাতেই সে চুম্বকের সহিত জড়িত হইয়া থাকে।

এই আকর্ষণ-প্রভাবেই অনায়াসে তৃণ-লতা চুম্বকের সহিত সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুতেই যেন এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, তাই প্রত্যেক বস্তু, অন্যের প্রতি ধাবিত হইতে বিব্রত।

বস্তুতঃ যখন এই আকর্ষণী শক্তি কোন বস্তুতে প্রবলতর হইয়া উঠে, তখন তাহা প্রেমভারাক্রান্ত হইয়া বস্তুর প্রত্যেক অণুপরমাণুতে বিস্তার লাভ করে।

"নহজলবলাগাৎ" গ্রন্থে আরও স্পষ্টভাবে এই মাধ্যাকর্ষণের প্রমাণ বিদ্যমান।

(আল-এসলাম, আশ্বিন)

* * *

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের লিখন-পদ্ধতির ক্রমাভিব্যক্তি—

বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সাধারণতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ ইহার জন্ম ও শৈশব—অর্থাৎ রামমোহনী যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। দ্বিতীয় ভাগ রামমোহনী যুগ। তৃতীয় ভাগ বিদ্যাসাগরীয় যুগ। চতুর্থ ভাগ বঙ্কিমী যুগ। পঞ্চম ভাগ আধুনিক যুগ। অবশ্য এই-সমস্ত যুগেরও আবার অনেকগুলি বিভাগ আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যাইতে পারে চণ্ডীদাস প্রভৃতির গদ্যপদ্যময় যুগ। এই গদ্যপদ্যময় যুগের নমুনা আমরা চণ্ডীদাসের পদকল্পতরুতে পাই।

প্রাচীনকালে বাংলা পদ্যই সবিশেষ আলোচিত হইত। বর্ত্তমান যুগেও পদ্য লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে এবং হইতেছে; তুলনায় বাংলা গদ্যের সেরূপ আলোচনা হয় নাই। তবে অধুনা বাংলা গদ্য লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ধারা কোন্ পথে চলিবে তাহা লইয়া খুব আন্দোলন করিতেছেন।

প্রথম ভাগ

জন্ম—বাংলা গদ্য-সাহিত্য যে কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সঠিক সময় নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। তবে এ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-যুগের পূর্ব্বের বাংলা ভাষায় কোনও গদ্য-রচনা পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে মোটামুটী এক-রকম ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে বৌদ্ধ-যুগে প্রাচীন গদ্য-সাহিত্যের বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল।

শূন্য পুরাণ—শূন্য পুরাণে প্রাচীন গদ্যের প্রথম নমুনা দৃষ্ট হয়। ইহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই সময়ে অন্য কোনও গ্রন্থে গদ্যের নমুনা পাওয়া যায় না। ইহার পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-যুগে বাংলা গদ্যের চলন হইতে আরম্ভ হয়।

কারিকা—চৈতন্যপ্রভুর শিষ্য রূপগোস্বামীর কারিকা নামক একখানি পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে। পুস্তিকাখানি চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি—নামক পুস্তকে গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়।

রাগময়ী কণা—কৃষ্ণদাসের "রাগময়ী কণা" নামক একখানি পুস্তক দেখা যায়। এই পুস্তকে যে-সকল স্থানে কোনও সূত্রের ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন হইয়াছে সেই-সকল স্থানে গ্রন্থকার গদ্য লিখিয়াছেন।

সহজিয়া সম্প্রদায়—সহজিয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক লিখিত প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বের অনেকগুলি পুস্তিকা রহিয়াছে। ইহার একখানি "চৈতন্যরূপ প্রাপ্তি"। অন্যগুলির ভাষাও প্রায় উক্তরূপই।

তন্ত্রের ভাষা—প্রাচীনকালের একখানি তন্ত্রে বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া যায়।

দরবারী ভাষা—দরবারী ভাষায় উর্দ্দু ও সংস্কৃতের অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখা যায়। এই বিকৃত বাংলা গদ্য এখনও দলিলাদিতে লিখিত হয়। এগুলি বাঁধি গতের মত।

ভাষাপরিচ্ছেদ—ইহা সংস্কৃত ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদ।

মুরসিদের বারমাস—কোনও মুসলমান গ্রন্থকারের রচিত একখানি

প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার স্থানে স্থানে গদ্য রচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রজকারিকা—বৈষ্ণব সম্প্রদায়-রচিত।

একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শিশুর মুখের আড়ষ্ট ভাব ক্রমশঃ কাটিয়া আসিতেছে। গ্রন্থকার সহজ সরল মৌখিক ভাষায় নিজের বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন। কোনও স্থানে গ্রন্থকারের ভাবপ্রকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত "বৃন্দাবনলীলা" "শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমা" প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থগুলির ভাষা বেশ সরল।

এই সময়ের ভাষার রূপ প্রায় উক্ত সময়ের কথ্য ভাষারই অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। সাধুভাষা ও প্রাকৃতভাষা এই দুই কৃত্রিম বিভাগের আবির্ভাব তখনও হয় নাই বলিয়াই মনে হয়।

এই সময় বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক আলোচনা হইত বলিয়া বোধ হয় না। কঠিন কঠিন সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য বোধ হয় মধ্যে মধ্যে গদ্য গ্রন্থ রচিত হইত।

খৃষ্টানী ভাষা—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইয়ুরোপীয়গণ বাংলা গদ্যের উন্নতি করিতে সচেষ্ট হন, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও তাঁহারা তাদৃশ কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। ইঁহাদের ভাষা সাধারণতঃ 'খৃষ্টানী ভাষা' নামে পরিচিত। কেরী, মার্শম্যান, ফষ্টার প্রভৃতি ইয়ুরোপীয়গণ এই খৃষ্টানী ভাষার জন্মদাতা। ইঁহারা তৎকালীন উর্দ্দু মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহজ হইলেও ইংরেজীর অনুকরণে লিখিত হওয়ায় উহা একটু অদ্ভুত রকমের হইয়াছিল।

হালহেডের ব্যাকরণ—মিঃ হালহেড সাহেব ইয়ুরোপীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৭৭৮ অব্দে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

প্রশ্নোত্তরমালা—"বেণ্টোসাহেবের প্রশ্নোত্তরমালা" ১৭৬৫ অব্দে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ শাসন আরম্ভের ইহাই সর্ব্বপ্রথম গদ্যগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহার পর আমরা কেরী সাহেবের গ্রন্থ দেখিতে পাই।

ইতিহাস-মালা—"খৃষ্টানী ভাষা"র পুস্তক। ইহা ১৮১২ অব্দে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়।

এই খৃষ্টানী ভাষা বেশ সরল ছিল। এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, যে, লিখিত ভাষা মৌখিক ভাষারই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এইবার পণ্ডিতী ভাষার আরম্ভ।

পণ্ডিতী ভাষা বা সাধুভাষার জন্ম—ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে বাংলা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাংলা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। ইঁহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। কিন্তু ইঁহাদের ভাষা বড়ই সংস্কৃত-ঘেঁসা ও সাধারণের দুরধিগম্য সুদীর্ঘ উৎকট সমাসাবদ্ধ। ইঁহারা নিজেদের পাণ্ডিত্য দ্বারা বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতে যাইয়া যে তাহাকে কিরূপে বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন তাহা 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। কিন্তু তথাপি এই ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নতির সূত্রপাত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাংলা গদ্যের সেরূপ ধারাবাহিক আলোচনা হয় নাই। এই সময় হইতেই বাংলা গদ্যের ধারাবাহিক আলোচনা আরম্ভ হয়। এই পাণ্ডিত্যাভিমানী সংস্কৃতজ্ঞরা সিভিলিয়ানদিগের জন্য অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক লেখেন। যথা—গোলক শর্ম্মার 'হিতোপদেশ', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'পুরুষ-পরীক্ষা', ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ইত্যাদি।

প্রবোধচন্দ্রিকার স্থানে স্থানে অনুপ্রাসবাহুল্য-হেতু উহা ঢক্কানাদের ন্যায় শ্রুতিকটু ও প্রহেলিকার ন্যায় দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

শিশুবোধক—এই সময়ে দেশীয় বালকগণের বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য 'শিশুবোধক' নামক একখানি পুস্তক লিখিত হয়। সুকুমারমতি বালকদিগের জন্য উৎকট ভাষায় পুস্তক লেখা হইয়াছিল।

কিন্তু এ সময়ের সকলেই যে পণ্ডিতী ভাষায় লিখিতেন তাহা নহে। পণ্ডিতী ভাষা বা সাধুভাষা তখন কেবল ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সরল গদ্যের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি।

কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত—১৮১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণচন্দ্র-চরিত মুদ্রিত হয়। ইহা প্রাচীন কালের খাঁটী গদ্যে লিখিত।

"তোতা ইতিহাস" "বাঙ্গালা ভাষাতে" "শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্সীতে রচিত" লন্দন রাজধানীতে চাপা হইল ১৮২৫।

ডবল ষষ্ঠী—প্রাচীন গদ্যে 'দিগের' এই বিভক্তিটির পূর্ব্বে প্রায়ই একটি 'র' প্রযুক্ত হইত, যথা :—'লোকের-দিগের,' 'ভৃত্যের-দিগের'।

যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করিয়াছিলেন তাহা তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। কিন্তু অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'কামিনীকুমার'-রচক কালীকৃষ্ণ দাস 'গদ্যছন্দের' যে নমুনা দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে আলালী ভাষা তাঁহার সময়েও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

গদ্যছন্দ ও গদ্যে ভণিতা—পদ্য রচনার পূর্ব্বে 'গদ্যছন্দ' এই কথাটি ব্যবহৃত হইত। পদ্য রচনায় যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল গদ্যপুস্তকেও মধ্যে মধ্যে সেরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ভাগ

রামমোহনী যুগ

রামমোহনের ভাষা—রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে একটা নূতন যুগ আনয়ন করিলেন। একালপর্য্যন্ত বাংলা গদ্যের লিখন-পদ্ধতির তেমন কোনও নিয়ম ছিল না। কাজেই গদ্যের নিয়মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল।

রামমোহন রায় বাংলা গদ্যের লিখন-পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখনপদ্ধতিই তৎকালে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাঁহার যুগকে এক-রকম অনুবাদের যুগ বলা যাইতে পারে। তাঁহার 'বেদান্তসূত্র ভাষ্যানুবাদ' বাংলা ভাষার একখানি অমূল্য গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত রামমোহন রায় বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি আরও কতকগুলি পুস্তক লিখেন। দেশীয় লোকে যাহাতে সহজে বাংলা বুঝিতে পারে তিনি তাঁহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি যে কত সহজ বাংলা লিখিতেন তাহা পাঠ করিলে বোঝা যায়।

রামমোহনের ভাষা বেশ সহজ সরল ও সুন্দর ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের এই নব-শ্রী ফুটিয়া উঠে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির সূত্রপাত হয়।

এই শতাব্দীতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, ও ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁসা হয়—আবার এই শতাব্দীতেই খৃষ্টান মিশনারীদিগের বাংলা চর্চ্চা ও রামমোহনের আবির্ভাব, আবার এই উনবিংশ শতাব্দীতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব।

আর একটা কথা, এই শতাব্দীতে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সভা' 'বিজ্ঞান অনুসন্ধান সমিতি' প্রভৃতি স্থাপিত হয়। অনেকগুলি বাংলা মাসিক-পত্রও এই সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করে। বিজ্ঞানাদি অনেক বিষয়ের গ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয়। একটু মনোযোগ করিয়া

পর্য্যবেক্ষণ করিলে ধরিতে পারা যায় যে চারিদিকের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহা কিরূপভাবে গড়িয়া উঠিতেছে।

তৃতীয় ভাগ
বিদ্যাসাগরীয় যুগ

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যকে সলিলের মত স্বচ্ছ করিয়া তুলিলেন। তিনি যে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের কত উন্নতি করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দেশের মধ্যে বাংলা গদ্য চালাইবার জন্য তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বর্ণ-পরিচয় লিখিয়া তিনি দেশীয় বালকদের প্রভূত উপকার সাধন করেন। বাংলা গদ্য-লিখন-পদ্ধতির তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেন। জটিল ছন্দো-বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি সরল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাসাগরীয় যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাবান্ বাংলা গদ্যলেখকদিগের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের সকলেরই ভাষা সরল ও সুললিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে বাংলা গদ্যে , ; : ! ? বিরাম, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা প্রভৃতির চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ঐ-সকল চিহ্নের প্রবর্ত্তক।

চতুর্থ ভাগ
বঙ্কিমী যুগ

বঙ্কিমীযুগে দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির আবির্ভাব।

অক্ষয়বাবুদের যুগের পূর্ব্বে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকেই বাংলা ভাষাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, যাঁহাদের কিছু লিখিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহাদের সেই ক্ষমতাকে ইংরেজী সাহিত্যে নিয়োজিত করিতেন। কারণ তাঁহারা বলিতেন বাংলা 'বর্ব্বরের ভাষা'। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে বাংলা ভাষা শিশু ও মূর্খের ভাব প্রকাশের উপযোগী হইলেও সুশিক্ষিতের হৃদয়ের ভাব প্রকাশের উপযোগী নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা ভাষাকে 'সলিলের মত স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তখনও তাহা সলিলেরই মত স্বাদহীন ছিল।........আজ যে সেই ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বেদনায় বিকম্পিত, লজ্জায় সঙ্কুচিত, ঘৃণায় বিকুণ্ঠিত, ক্রোধে বিগলিত, অনুরাগে উচ্ছ্বলিত, আবেগে আন্দোলিত, দ্বিধায় বিচলিত হইয়া উঠে—আজ যে সেই ভাষা সাহিত্যের সৌন্দর্য্যবিকাশে, দর্শনের কূট বিচারে, বিজ্ঞানের সত্যপ্রচারে, ধর্ম্মের তত্ত্বপ্রকাশে সক্ষম, তাহা বহুজনের বহুচেষ্টার ফল—সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই বহুজনের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য।"

বঙ্কিমবাবু ৺ প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্যলেখক। তাহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল তাহা লৌকিক ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এমনকি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপরভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রচনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্যই' বলিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' বলিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না। শ্রোতারা কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন তাহার অর্থ লইয়া অতিশয় গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল।"

এই সমস্ত কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি পুস্তক গ্রাম্য-ভাষায় লিখিত হয়।

"বাংলা গদ্য এই দোটানার স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখন-রীতির অনুসরণ করিতে হইবে কি আলালের লিখন-রীতির অনুসরণ করিতে হইবে এই সমস্যার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বিবিধ ভাষার উপযুক্ত সমাবেশে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণতা-সম্পন্ন বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের কীর্ত্তি। সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিতমণ্ডলী যেমন বুঝেন নাই যে, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষা গুরুগম্ভীর ভাষায় বাংলার সর্ব্ববিধ ভাবের প্রকাশ অসম্ভব, ইংরেজীতে সুশিক্ষিত প্যারিচাঁদ মিত্রও তেমনি বুঝেন নাই যে কেবল প্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় সেরূপ ভাব প্রকাশ অসম্ভব।"

পঞ্চম ভাগ
আধুনিক যুগ

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের লিখন-পদ্ধতি এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহাই বিচার্য্য। অনেকে মৌখিক ভাষাকেই লিখনের ভাষা বলিয়া চালাইতে চান—অনেকে আবার তাহার বিপক্ষে।

এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত—"কয়েক বৎসর দেখিতেছি, গ্রাম্যতা ও অপভ্রংশ-পূর্ণ ভাষা পুস্তক-প্রবন্ধাদিতে ব্যবহৃত হইতেছে।........এরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইবার অযোগ্য। আপনা-আপনির মধ্যে কথা কহিতে হইলে কথার শ্রীলতা, সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্যের দিকে কেহই অধিক দৃষ্টি রাখে না। কথা ভাঙ্গিয়া হউক মুচড়াইয়া হউক যেমন করিয়া হউক, শীঘ্র ও সংক্ষেপে কহিতে পারাই সকলে অত্যাবশ্যক মনে করে। কিন্তু পুস্তকাদি লিখিয়া বাহিরের লোকের সহিত, সমাজের সহিত কথা কহিতে হইলে, লোকে ভিন্ন-প্রণালীতে কথা কহে; শব্দের সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্য, শ্রীলতা, সম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখে। অনেক বিষয়ে মানুষের আচার ঘরে একপ্রকার, বাহিরে ভিন্ন-প্রকার। মানুষের পরিচ্ছদ ঘরে আপনার লোকের কাছে এক-প্রকার, বাহিরে অপর লোকের কাছে অর্থাৎ সমাজে ভিন্ন-প্রকার। মলিন বা ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের নিকট গমন করিলে, অপরের অমর্য্যাদা করা হয়; সকল দেশের লোকেরই এইরূপ সংস্কার। ঘর হইতে বাহির হইতে হইলেই, পরিবার ছাড়িয়া সমাজে প্রবেশ করিতে হইলেই, মানুষ একটু সাজসজ্জা করিয়া থাকে—পরিচ্ছদেও করিয়া থাকে, ভাষাতেও করিয়া থাকে; নহিলে সমাজের অমর্য্যাদা হয়। অনেকে বলেন পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ঘরে বাহিরে প্রভেদ করা অন্যায়, অযৌক্তিক; কিন্তু অন্যায়ই হউক আর অযৌক্তিকই হউক, প্রভেদটা এত প্রবীণকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং এত সর্ব্ববাদীসম্মত যে উহা উঠাইয়া দিতে বলা যেমন বাতুলতা, অমান্য করা তেমনই ধৃষ্টতা এবং অশিষ্টতা। সাহিত্যে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিলে সমাজের অবমাননা করা হয়।

সাহিত্যে এরূপ ভাষা পরিহার করিবার অন্য হেতু আছে। একই শব্দ লোকে নানাস্থানে নানাপ্রকারে ভাঙ্গে। খাইলাম এই শব্দের একাধিক অপভ্রংশ আছে:—১ খেলাম, ২ খালাম; ৩ খেলুম; ৪ খেনু। এই-সকল আকারে এত প্রভেদ যে এক জেলার লোকে অনেক স্থলে অন্য জেলার অপভ্রংশ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে না পারিবারই কথা।

যাহারা করিলাম ভাজিয়া কম্নু করে এবং যাহারা করিলাম ভাজিয়া কম্ন্ করে তাহাদের পরস্পরকে বুঝিতে না পারাই সম্ভব। * * * সুতরাং তাঁহার সাহিত্য আমাদের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। এইরূপ বঙ্গের সকল জেলার লোকে যদি পুস্তকাদিতে আপন আপন অপভ্রংশাদির প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্গে জেলার সংখ্যা যত বাঙ্গালীর সাহিত্যের সংখ্যাও প্রায় তত হইবে। সাহিত্য সমস্ত সমাজের জন্য, খণ্ড সমাজের জন্য নহে; সমস্ত জাতির জন্য, স্থান-বিশেষের অধিবাসীর জন্য নহে। উহাতে গ্রাম, মৌজা, মহকুমার বা জেলা-বিশেষের প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হইলে উহার যে প্রশস্ত জাতীয় ভাব হওয়া আবশ্যক তাহা হইতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে উহার একটি সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য বা স্থানীয় ভাব জন্মিয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞান পণ্ডিত-শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া লোক-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করা যখন সাহিত্যের একটা প্রধান উদ্দেশ্য, তখন পুস্তকাদির ভাষা যতদূর সম্ভব সরল করিবার জন্য গ্রাম্য শব্দাদির প্রয়োগ হওয়াই আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যের মর্য্যাদা অমর্য্যাদার কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে যে, যে লেখক ঐরূপ শব্দাদি প্রয়োগ করেন, ঐরূপ প্রয়োগে তাঁহার নিজের মৌজা, মহকুমা, বা জেলার লোক-সাধারণের সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ প্রয়োগে অপর সমস্ত স্থানের লোক-সাধারণের যে অসুবিধা হওয়া সম্ভব; বোধ হয় উহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।"

কিন্তু শ্রীপ্রমথচৌধুরী ওরফে বীরবল মৌখিক ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং কেন করিয়াছেন তাহারও কারণ সবুজপত্রে দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও আজকাল মৌখিক ভাষাতেই লিখিতেছেন।

আমাদের বিবেচনায় বিষয় অনুসারে ভাষার উচ্চতা বা নীচতা প্রভৃতি হওয়া উচিত। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ যে ভাষায় তাঁহার হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখিয়াছেন সে ভাষায় 'মহাভারত' লেখেন নাই। তবে সকল দেশের সকল জীবন্ত ভাষাতেই দেখা যায় যে লিখিত ভাষা চিরকাল মৌখিক ভাষারই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। আমাদের ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন সেই ভাষাতেই তাঁহারা লিখিতেন। তাহার পরেও যাঁহারা যেরূপ ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহিতেন তাঁহারা সেইরূপ ভাষাতেই লিখিতেন।

মোটের উপর লিখনের ভাষা চিরকালই মৌখিক ভাষাকে অনুসরণ করিয়াছে এবং করিবে। তথাপি মিলি মিলি করিয়াও লিখনের ভাষা ও কথনের ভাষা এক হইবে না। 'লেখ্যভাষা কোনিকসেক্‌সনের এসিমটটের মত ক্রমাগত কথ্যের নিকটবর্ত্তী হইবে কিন্তু কিছুতেই মিলিবে না।' কারণ কথন ও লিখনের উদ্দেশ্য অনেকটা এক হইলেও বিভিন্ন।

বঙ্কিমবাবু এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"স্থূল কথা সাহিত্য কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে গ্রন্থ লিখে না। যদি একথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দ-পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখনও যশ করিব না।

তাই বলিয়া আমরা এমন বলিতেছি না যে বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষা দান, চিত্ত সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র—ইহাতে তত শব্দ-ধন নাই।

টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। কিন্তু গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষা কুলায় না। কেননা এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্রই যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ-গৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে,—তজ্জন্য ইংরাজী, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে। অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাজালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।"

(উপাসনা, কার্ত্তিক) শ্রীরাধাবল্লভ নাগ।

* * *

যবন হরিদাসের বাস্তুভিটা।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর অনুসঙ্গী বা পার্ষদ শ্রেণীভুক্ত প্রায় প্রত্যেক বৈষ্ণবেরই বাস্তুভিটা ও সমাধিস্থল নিরূপিত আছে এবং অনেকেরই বসতিস্থান, সাধনক্ষেত্র বা সমাধিভূমির উপরে পাটবাড়ী, মন্দির ও আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র যবন হরিদাসের জন্ম-ভূমির বিশেষ কোনও সংবাদ সংগ্রহে তাঁহার সঙ্গী সহচরেরা বা উত্তর-কালবর্ত্তী বৈষ্ণব ভক্তেরা চেষ্টা করেন নাই কেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমাদের কিন্তু মনে হয়, হরিদাসের মুসলমানকুলে জন্মগ্রহণই উহার একমাত্র কারণ। তিনি যখন শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্যত্বগ্রহণ করেন, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার মুসলমান মাতা-পিতা জীবিত ছিলেন, আর তজ্জন্যই বোধ হয় তাঁহার বৈষ্ণব সঙ্গীয়া, তিনি পরমপূজ্য সাধু হইলেও তাঁহার বাসগ্রামের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। এবং বৃন্দাবনদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব লেখকেরাও—'বুড়ন গ্রামেত অবতীর্ণ হরিদাস' প্রভৃতি দুই এক কথা লিখিয়াই তাঁহার জন্মস্থানের বিবরণ অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হরিদাস মুসলমান ছিলেন কি না তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কয়েকজন বৈষ্ণব-গ্রন্থকার তাঁহাকে ব্রাহ্মণবংশীয় হিন্দু বলিয়াই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন—'হরিদাস ব্রাহ্মণপিতার ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি শৈশবে মাতাপিতাহীন হওয়ায়, এক মুসলমানের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, আর সেই কারণেই শেষে বৈষ্ণব হইলেও 'যবন হরিদাস' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।' কোনও কোনও গ্রন্থে তাঁহার মাতাপিতার নাম ও তাঁহাদের মৃত্যুর কারণ পর্য্যন্তও উল্লিখিত হইয়াছে। ভগীরথবন্ধুকৃত 'চৈতন্য-সঙ্গীত' পাঠে জানা যায়—'হরিদাসের পিতার নাম সুমতি ও মাতার নাম গৌরী, সুমতি পরলোক গমন করিলে, গৌরী সহমৃতা হন আর এক মুসলমান সন্তান-নির্ব্বিশেষে তাঁহার লালন পালন করেন। সেই মুসলমান-সংসর্গ হেতু হরিদাস মুসলমান যবন হরিদাস আখ্যায় আখ্যাত।'

জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থেও প্রাগুক্ত মত স্বীকৃত হইয়াছে, তবে তাহাতে হরিদাসের মাতাপিতার নাম ভিন্নরূপ। জয়ানন্দ তাঁহার

পিতাকে "মনোহর" ও মাতাকে 'উজ্জ্বলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, শ্রীল অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় লোকের দুই নামও থাকে এবং ডাকনামও একটা পৃথক্ থাকে, এই বলিয়া উহার সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি নিজ 'শ্রীমৎ হরিদাস-ঠাকুরের জীবনচরিত' গ্রন্থে জয়ানন্দের মত উদ্ধৃত করেন নাই, বোধ হয় তাঁহার পুস্তক প্রকাশের সময়ে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' আবিষ্কৃত না হওয়াই উহার কারণ। 'শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত' গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বনগ্রামের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় যে-সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহার মর্ম্ম এইরূপ:—"হরিদাসের মুসলমান-প্রতিপালকের নাম জাহেরউদ্দীন। তাঁহার সহিত সুমতি ঠাকুরের এবং তাঁহার পত্নীর সহিত গৌরী দেবীর আত্মীয়তা ছিল। সেই আত্মীয়তার ফলে, গৌরীর মৃত্যুর পরে, তাঁহার নিরাশ্রয় শিশুপুত্রের লালন-পালন-ভার, তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহেরউদ্দীনের বংশধরগণ এখনও বুড়ন গ্রামে বসবাস করিতেছেন।" উল্লিখিত পরস্পর বিরুদ্ধ নূতন নূতন বিষয় পাঠ করিয়া, হরিদাসের হিন্দুত্বে আমাদের আরও অধিক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন প্রামাণিক ও সর্ব্বজনমান্য ভক্তিগ্রন্থে হরিদাসের জীবনকথা বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে কোনও কথাই লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ, তিনি যে নীচ যবন কুলে জাত' সেই 'কথাই বারবার উক্ত হইয়াছে, তাঁহার মুখ দিয়াও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে-সকল বৈষ্ণব গ্রন্থকার হরিদাসকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা অবশ্যই উৎকট জাত্যভিমানবশতঃ, হরিদাসকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন. শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে জাতি বিচার নাই, বৃথা জাত্যভিমানও নাই। তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই স্বমতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলের প্রতিই সমান যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই পূজ্য—হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, আর নীচ অধম চণ্ডালই হউন, বৈষ্ণব মাত্রেই সমান গৌরব ও ভক্তির পাত্র। বৈষ্ণব হইয়া যাঁহারা সেকথা না বুঝেন, জাতিভেদবিহীন নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে জাত্যভিমানের আবিলতা আনিয়া উপস্থিত করেন তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। হরিদাস যে গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন, 'হরিদাসঠাকুর' 'ব্রহ্ম হরিদাস' প্রভৃতি গৌরবাত্মক নামে অভিহিত হইয়া যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণজন্মের হেতু নহে, তাঁহার অনন্যসাধারণ ভগবন্নিষ্ঠা, অলৌকিক নাম-বিশ্বাস ও নামজপেরই অমৃতময় ফল মাত্র।

হরিদাসের জন্মভূমির সম্বন্ধে একমাত্র—'বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস'—এই শ্লোকাংশ ব্যতীত অপর কোনও বিশেষ কথাই কোনও প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত নাই। বুড়নের পরিচয় স্থলে, কোনও কোনও আধুনিক গ্রন্থকার—"শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী গ্রাম" বা "বর্ত্তমান ই,বি এস্, রেলপথের বেনাপোল বা বনগ্রাম ষ্টেসনের নিকটস্থ পল্লীবিশেষ" বলিয়াও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সংপ্রতি হরিদাসের সেই বুড়নবাস সম্বন্ধেও মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জয়ানন্দকৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের আবিষ্কার করায়, বুড়নই হরিদাসের জন্মভূমি কি না, তাহাতেই ঘোর সংশয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—'বুড়নগ্রাম হরিদাসের জন্মস্থান নহে। তিনি স্বর্ণনদীতীরবর্ত্তী 'ভাটকলাগাছী' গ্রামেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিতে গেলে, বৃন্দাবনদাসপ্রমুখ গোস্বামীদিগের কথা মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, তাহাই বা কোন্ সাহসে বলা যাইতে পারে? তবে কি জয়ানন্দের কথাই অলীক? তাহাও সম্ভবপর নহে।

এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, হয় বুড়ন ও ভাটকলাগাছীকে এক গ্রাম, না হয় বুড়নকে ভাটকলাগাছীর বা ভাট-কলাগাছীকে বুড়নের অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শেষের কথাটাই যথার্থ। বুড়ন গ্রামবিশেষের নাম হইলেও পরগণারূপেও পরিগণিত। পরগণা অনেকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় সুতরাং বুড়ন পরগণার মধ্যে ভাটকলাগাছী গ্রামের অবস্থিতি অসম্ভব নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আর বুড়নের মধ্যে ভাটকলাগাছীর অস্তিত্ব নাই। জয়ানন্দের স্বর্ণনদী এখন সোনাই আখ্যা লাভ করিয়াছে। সোনাই নদীর দক্ষিণ তীরস্থ একটি স্থান 'হরের ডাঙ্গা' নামে অভিহিত হইয়া, সেই স্বনামখ্যাত সাধুর পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। ইহা পূর্ব্বে ভাটকলাগাছীর অন্তর্বর্ত্তী ছিল।

প্রাচীন বুড়ন সাতক্ষীরা সবডিবিজনের অন্তর্গত এবং সাতক্ষীরা নগরের উত্তর-পশ্চিমে ৩,৪ মাইল দূরে, 'মাইচম্প্রার দরগার' নিকটে অবস্থিত। বুড়নগ্রাম হইতে ৪।• সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, উত্তরপশ্চিম কোণে 'হরের ডাঙ্গা' অবস্থিত এবং বনগ্রাম হইতে ৮ আট ও শান্তিপুর হইতে ১২।১৩ বার তের ক্রোশমাত্র দূরবর্ত্তী।

পূর্ব্বে এই স্থানের প্রতি তীর্থ সম্মান প্রদত্ত হইত। এখনও নাকি দুই চারিজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সেই ভাবেই 'হরের ডাঙ্গা'র প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এখনও যদি দেশের লোক বিশেষতঃ সাধুর গুণানুরাগী বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় সচেষ্ট হন তাহা হইলেই, তাঁহার যথার্থ বাস্তুভিটার উপরেই তাঁহার স্মৃতিচিহ্নাদি স্থাপিত, পাটবাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে পারে। আশা করি দেশের গৌরব বিবেচনায়, দেশের গুণী ও শিক্ষিত সমাজ অবিলম্বেই এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

(শাশ্বতী, কার্ত্তিক) শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

সম্পাদকের মন্তব্য।

কষ্টিপাথরের উদ্ধৃত প্রথম বিষয় "মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান"দের কৃতিত্বে ও নিউটনের কৃতিত্বে কতখানি প্রভেদ বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা এখানে বিজ্ঞানভূষণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা-নিধি বাহাদুরের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

লেখ বাহুল্য, fact of gravitation পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা যাহা বুঝায়, Laws of gravitation দ্বারা তাহার অনেক বেশী—science বুঝায়। আমাদের মধ্যে অনেকে এই দুই এক মনে করিয়া Newtonএর প্রাপ্য গৌরব ভাস্করাচার্য্যকে দিয়া বসেন। দুই কথার মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ তাহা "পত্রালী"তে চন্দ্রনামক পত্রে বুঝাইয়াছি। আমাদের দেশে বহু পূর্বকাল হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ জানা আছে। আর্যভট ও বরাহ সমসাময়িক ছিলেন। (500 A.D.) ইঁহাদের পূর্ব হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ স্বীকৃত হইত। কিন্তু সেট কি রকম, তাহা জানা ছিল না। অর্থাৎ Laws জানা ছিল না। বরাহ চুম্বকের আকর্ষণের সহিত উপমা করিয়াছেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে আর একটা কথা লিখি। অনেকে জানেন না, দুই জনই পৃথিবীর আবর্ত্তন —rotation of the earth—স্বীকার করিতেন, এবং খুব সম্ভব পৃথিবীর প্রদক্ষিণ—revolutionও স্বীকার করিতেন। "আমাদের

জ্যোতিষী" লিখিবার পর এই দুই theory সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের জ্ঞান আমার স্পষ্ট হইতেছে। যদি একটু জানিতে ইচ্ছা করেন, গত জুলাই মাসের Dacca Review পত্রে The days of the Hindu Calendar পড়িবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওয়াগুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

অষ্টম অধ্যায়

বিপদের মুখে।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমি আমার ভৃত্য দুইটির স্বভাব চরিত্র বুঝিতে লাগিলাম। একজন অতি অল্পেই রাগিয়া উঠে, কিন্তু কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ক্ষিপ্র, অপরটি শান্ত প্রকৃতির এবং তার একটু জ্ঞান বুদ্ধিও ছিল। বিদ্যার গর্ব্বও তার কম ছিল না। শেষোক্ত ভৃত্যটি প্রথমটিকে অপ্রিয় বচন শুনাইত এবং কলহও করিত। বৃদ্ধাটি ভালমানুষ। আমি তিনজনকেই সমভাবে দেখিতে চেষ্টা করিতাম বটে, কিন্তু বৃদ্ধার প্রতি আমার সমধিক যত্ন ছিল। বৃদ্ধাটিও আমাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করিত। আমি দেখিতাম বৃদ্ধাটি যেন আমায় কিছু বলিতে চায়। কিন্তু সঙ্গী দুটির ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করে না। একদিন আমি বৃদ্ধাকে অগ্রে রওনা হইতে বলিলাম। কিছু পরে ভৃত্যদ্বয়কে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। ভৃত্যদুইটি বোঝা বহিয়া আমার সহিত যাইতে পারিল না, পিছনে পড়িয়া রহিল। আমি তখন গিয়া পথে বৃদ্ধাকে ধরিলাম। বৃদ্ধা আমায় দেখিয়া ভীতভাবে পশ্চাতে চাহিয়া বলিল "তাহারা কি দূরে আছে?" আমি বলিলাম তাহারা সম্ভবতঃ ৬ মাইল দূরে আছে। তখন সে হাঁপ ছাড়িয়া আবার বলিল "তোমার সর্ব্বনাশ, তোমার চাকর দুটি ভয়ঙ্কর লোক, তারা তোমায় মারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে—রাগীটা খুনে ডাকাত, থামে কত পাপ যে করিয়াছে তার ঠিক নাই; শান্তটা এত বড় বদমায়েস না হইলেও, কম লোক না, ঝগড়া করিয়া সে ত একটাকে খুন করিয়াছে; দুজনেই পাকা খুনে, মানুষের প্রাণ লইতে একদণ্ডও ইতস্ততঃ করিবে না। তুমি যেই তিব্বতের সীমায় পৌছিবে, অমনি ঐ রাগীটা তোমায় মারিয়া ফেলিবে—আর তোমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইবে।" একথা শুনিয়াই ত আমার চক্ষুস্থির, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিলাম না—বরং বলিলাম "এ-সব কথা আমি বিশ্বাস করি না, ওরা খুব ভাল লোক।" বৃদ্ধা শপথ করিয়া বলিল "আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি আমার প্রাণ লইও।" আমিও বুঝিলাম বৃদ্ধা মিথ্যা বলিতেছে না। আমার ভারাক্রান্ত চিত্তে আবার মৃত্যুভয় আসিয়া জুটিল।

১২ দিনে ১০০ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা তুকজী নামক স্থানে পৌছিলাম। হর্ষমান সুবা নামে একজন গোর্খা শাসনকর্ত্তা তথায় বাস করিতেছিলেন। গয়ালামার নিকট হইতে পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম সেইজন্য শাসনকর্ত্তার অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলাম। এখানে আসিয়া পথের সংবাদ শুনিয়া আবার মন দমিয়া গেল। সকলগুলি পথই সশস্ত্রপ্রহরীদ্বারা রক্ষিত।

একদিন রাত্রে আমার ভৃত্য দুইটি প্রচুর সুরা পান করিয়া পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। যখন ঝগড়া খুব বাধিয়াছে তখন সব কথা বাহির হইয়া পড়িল, যার যত দোষ আছে তা দুজনেই উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—শেষে দুজনেই দুজনকে বলিয়া বসিল "আমি কি জানি না তুমি এই চীনে লামাকে মারিয়া ফেলিবার ফন্দীতে আছ"—দুজনেই অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে ব্যগ্র। ভয়ানক ঝগড়া, দুজনেই ক্রোধে অন্ধ, আমার নিকট দুজনে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও বড় ভয়ানক লোক; ওকে রাখিলে আমি থাকিব না।" আমি ভাবিলাম এমন সুযোগ আর হয় না, দুজনকেই বিদায় করি—বিস্তর বকসিস দিয়া দুজনকেই খুসী করিয়া বিদায় দিয়া বাঁচিলাম।

হর্ষমান সুবার গৃহে সিরাব গয়ালসান নামে একজন তিব্বতী ডাক্তার অতিথি ছিলেন। ইনি চিকিৎসাও করিতেন এবং স্থানীয় পুরোহিতদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। আমার সহিত লোকটির পরিচয় হইলে দেখিলাম যথার্থই ভদ্রলোকটি পণ্ডিত। তখন স্থির হইল আমি তাঁহাকে চীনের বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিব, তিনি আমাকে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। আমরা উভয়ে তুকজী ত্যাগ করিয়া সারেং যাত্রা করিলাম। ভদ্রলোকটির

পিতাকে "মনোহর" ও মাতাকে 'উজ্জ্বলা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ, শ্রীল অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় 'লোকের দুই নামও থাকে এবং ডাকনামও একটা পৃথক্‌ থাকে, এই বলিয়া উহার সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি নিজ 'শ্রীমৎ হরিদাস-ঠাকুরের জীবনচরিত' গ্রন্থে জয়ানন্দের মত উদ্ধৃত করেন নাই, বোধ হয় তাঁহার পুস্তক প্রকাশের সময়ে জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' আবিষ্কৃত না হওয়াই উহার কারণ। 'শ্রীমৎ হরিদাস ঠাকুরের জীবনচরিত' গ্রন্থের সমালোচনাপ্রসঙ্গে বনগ্রামের শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দত্ত মহাশয় যে-সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহার মর্ম্ম এইরূপ:—"হরিদাসের মুসলমান-প্রতিপালকের নাম জাহেরউদ্দীন। তাঁহার সহিত সুমতি ঠাকুরের এবং তাঁহার পত্নীর সহিত গৌরী দেবীর আত্মীয়তা ছিল। সেই আত্মীয়তার ফলে, গৌরীর মৃত্যুর পরে, তাঁহার নিরাশ্রয় শিশুপুত্রের লালন-পালন-ভার, তাঁহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহেরউদ্দীনের বংশধরগণ এখনও বুড়ন গ্রামে বসবাস করিতেছেন।" উল্লিখিত পরস্পর-বিরুদ্ধ নূতন নূতন বিষয় পাঠ করিয়া, হরিদাসের হিন্দুত্বে আমাদের আরও অধিক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' প্রভৃতি যে-সকল প্রাচীন প্রামাণিক ও সর্ব্বজনমান্য ভক্তিগ্রন্থে হরিদাসের জীবনকথা বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে কোনও কথাই লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। বরঞ্চ, তিনি যে নীচ যবন কুলে জাত' সেই কথাই বারবার উক্ত হইয়াছে, তাঁহার মুখ দিয়াও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে-সকল বৈষ্ণব গ্রন্থকার হরিদাসকে ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহারা অবশ্যই উৎকট জাত্যভিমানবশতঃ, হরিদাসকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছিলেন; শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্মে জাতি বিচার নাই, বৃথা জাত্যভিমানও নাই। তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলকেই স্বমতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলের প্রতিই সমান যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যিনি কৃষ্ণভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব, তিনিই পূজ্য—হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, আর নীচ অধম চণ্ডালই হউন, বৈষ্ণব মাত্রেই সমান গৌরব ও ভক্তির পাত্র। বৈষ্ণব হইয়া যাঁহারা সেকথা না বুঝেন, জাতিভেদবিহীন নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে জাত্যভিমানের আবিলতা আনিয়া উপস্থিত করেন তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। হরিদাস যে গৌরবের ভাগী হইয়াছিলেন, 'হরিদাসঠাকুর' 'ব্রহ্ম হরিদাস' প্রভৃতি গৌরবাত্মক নামে অভিহিত হইয়া যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মণজন্মের হেতু নহে, তাঁহার অনন্যসাধারণ ভগবন্নিষ্ঠা, অলৌকিক নাম-বিশ্বাস ও নামজপেরই অমৃতময় ফল মাত্র।

হরিদাসের জন্মভূমির সম্বন্ধে একমাত্র—'বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস'—এই শ্লোকাংশ ব্যতীত অপর কোনও বিশেষ কথাই কোনও প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত নাই। বুড়নের পরিচয়-স্থলে, কোনও কোনও আধুনিক গ্রন্থকার—"শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী গ্রাম" বা "বর্ত্তমান ই, বি এস্, রেলপথের বেনাপোল বা বনগ্রাম ষ্টেসনের নিকটস্থ পল্লীবিশেষ" বলিয়াও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সংপ্রতি হরিদাসের সেই বুড়নবাস সম্বন্ধেও মতানৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় জয়ানন্দকৃত 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থের আবিষ্কার করায়, বুড়নই হরিদাসের জন্মভূমি কি না, তাহাতেই ঘোর সংশয়ের আবির্ভাব হইয়াছে। চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—'বুড়নগ্রাম হরিদাসের জন্মস্থান নহে। তিনি স্বর্ণনদীতীরবর্ত্তী 'ভাটকলাগাছী' গ্রামেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।' তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস করিতে গেলে, বৃন্দাবনদাসপ্রমুখ গোস্বামীদিগের কথা মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, তাহাই বা কোন্ সাহসে বলা যাইতে পারে? তবে কি জয়ানন্দের কথাই অলীক? তাহাও সম্ভবপর নহে।

এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, হয় বুড়ন ও ভাটকলাগাছীকে এক গ্রাম, না হয় বুড়নকে ভাটকলাগাছীর বা ভাটকলাগাছীকে বুড়নের অন্তর্গত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শেষের কথাটাই যথার্থ। বুড়ন গ্রামবিশেষের নাম হইলেও পরগণারূপেও পরিগণিত। পরগণা অনেকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত হয় সুতরাং বুড়ন পরগণার মধ্যে ভাটকলাগাছী গ্রামের অবস্থিতি অসম্ভব নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আর বুড়নের মধ্যে ভাটকলাগাছীর অস্তিত্ব নাই। জয়ানন্দের স্বর্ণনদী এখন সোনাই আখ্যা লাভ করিয়াছে। সোনাই নদীর দক্ষিণ তীরস্থ একটি স্থান 'হরের ডাঙ্গা' নামে অভিহিত হইয়া, সেই স্বনামখ্যাত সাধুর পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। ইহা পূর্ব্বে ভাটকলাগাছীর অন্তর্বর্ত্তী ছিল।

প্রাচীন বুড়ন সাতক্ষীরা সবডিভিজনের অন্তর্গত এবং সাতক্ষীরা নগরের উত্তর-পশ্চিমে ৩.৪ মাইল দূরে, 'মাইচম্প্রার দরগার' নিকটে অবস্থিত। বুড়নগ্রাম হইতে ৪।০ সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, উত্তরপশ্চিম কোণে 'হরের ডাঙ্গা' অবস্থিত এবং বনগ্রাম হইতে ৮ আট ও শান্তিপুর হইতে ১২।১৩ বার তের ক্রোশমাত্র দূরবর্ত্তী।

পূর্ব্বে এই স্থানের প্রতি তীর্থ-সম্মান প্রদত্ত হইত। এখনও নাকি দুই চারিজন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সেই ভাবেই 'হরের ডাঙ্গা'র প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এখনও যদি দেশের লোক বিশেষতঃ সাধুর গুণানুরাগী বৈষ্ণবসম্প্রদায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় সচেষ্ট হন তাহা হইলেই, তাঁহার যথার্থ বাস্তুভিটার উপরেই তাঁহার স্মৃতিচিহ্নাদি স্থাপিত, পাটবাড়ী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইতে পারে। আশা করি দেশের গৌরব বিবেচনায়, দেশের গুণী ও শিক্ষিত সমাজ, অবিলম্বেই এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

(শাশ্বতী, কার্ত্তিক) শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

সম্পাদকের মন্তব্য।

কষ্টিপাথরের উদ্ধৃত প্রথম বিষয় "মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান"দের কৃতিত্বে ও নিউটনের কৃতিত্বে কতখানি প্রভেদ বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা এখানে বিজ্ঞানভূষণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুরের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

লেখা বাহুল্য, fact of gravitation পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা যাহা বুঝায়, Laws of gravitation দ্বারা তাহার অনেক বেশী—science বুঝায়। আমাদের মধ্যে অনেকে এই দুই এক মনে করিয়া Newtonএর প্রাপ্য-গৌরব ভাস্করাচার্য্যকে দিয়া বসেন। দুই কথার মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ তাহা "প্রবাসী"তে চন্দ্রনামক পত্রে বুঝাইয়াছি। আমাদের দেশে বহুপূর্বকাল হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ জানা আছে। আর্য্যভট ও বরাহ সমসাময়িক ছিলেন। (500 A.D.) ইহাঁদের পূর্ব হইতে পৃথিবীর আকর্ষণ স্বীকৃত হইত। কিন্তু সেটা কি রকম, তাহা জানা ছিল না। অর্থাৎ Laws জানা ছিল না। বরাহ চুম্বকের আকর্ষণের সহিত উপমা করিয়াছেন। ইহাঁদের সম্বন্ধে আর একটা কথা লিখি। অনেকে জানেন না, দুই জনই পৃথিবীর আবর্ত্তন —rotation of the earth—স্বীকার করিতেন, এবং খুব সম্ভব পৃথিবীর প্রদক্ষিণ—revolutionও স্বীকার করিতেন। "আমাদের

জ্যোতিষী" লিখিবার পর এই দুই theory সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের জ্ঞান আমার স্পষ্ট হইতেছে। যদি একটু জানিতে ইচ্ছা করেন, গত জুলাই মাসের Dacca Review পত্রে The days of the Hindu Calendar পড়িবেন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর

(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

অষ্টম অধ্যায়

বিপদের মুখে।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমি আমার ভৃত্য দুইটির স্বভাব চরিত্র বুঝিতে লাগিলাম। একজন অতি অল্পেই রাগিয়া উঠে, কিন্তু কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ক্ষিপ্র, অপরটি শান্ত প্রকৃতির এবং তার একটু জ্ঞান বুদ্ধিও ছিল। বিদ্যার গর্ব্বও তার কম ছিল না। শেষোক্ত ভৃত্যটি প্রথমটিকে অপ্রিয় বচন শুনাইত এবং কলহও করিত। বৃদ্ধাটি ভালমানুষ। আমি তিনজনকেই সমভাবে দেখিতে চেষ্টা করিতাম বটে, কিন্তু বৃদ্ধার প্রতি আমার সমধিক যত্ন ছিল। বৃদ্ধাটিও আমাকে যথেষ্ট সম্ভ্রম করিত। আমি দেখিতাম বৃদ্ধাটি যেন আমায় কিছু বলিতে চায়। কিন্তু সঙ্গী দুটির ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করে না। একদিন আমি বৃদ্ধাকে অগ্রে রওনা হইতে বলিলাম। কিছু পরে ভৃত্যদ্বয়কে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। ভৃত্যদুইটি বোঝা বহিয়া আমার সহিত যাইতে পারিল না, পিছনে পড়িয়া রহিল। আমি তখন গিয়া পথে বৃদ্ধাকে ধরিলাম। বৃদ্ধা আমায় দেখিয়া ভীতভাবে পশ্চাতে চাহিয়া বলিল "তাহারা কি দূরে আছে?" আমি বলিলাম তাহারা সম্ভবতঃ ৬ মাইল দূরে আছে। তখন সে হাঁপ ছাড়িয়া আবার বলিল "তোমার সর্ব্বনাশ, তোমার চাকর দুটি ভয়ঙ্কর লোক, তারা তোমায় মারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে—রাগীটা খুনে ডাকাত, গ্রামে কত পাপ যে করিয়াছে তার ঠিক নাই; শান্তটা এত বড় বদমায়েস না হইলেও, কম লোক না, ঝগড়া করিয়া সে ত একটাকে খুন করিয়াছে; দুজনেই পাকা খুনে, মানুষের প্রাণ লইতে একদণ্ডও ইতস্ততঃ করিবে না। তুমি যেই তিব্বতের সীমায় পৌছিবে, অমনি ঐ রাগীটা তোমায় মারিয়া ফেলিবে—আর তোমার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইবে।" একথা শুনিয়াই ত আমার চক্ষুস্থির, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করিলাম না—বরং বলিলাম "এ-সব কথা আমি বিশ্বাস করি না, ওরা খুব ভাল লোক।" বৃদ্ধা শপথ করিয়া বলিল "আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি আমার প্রাণ লইও।" আমিও বুঝিলাম বৃদ্ধা মিথ্যা বলিতেছে না। আমার ভারাক্রান্ত চিত্তে আবার মৃত্যুভয় আসিয়া জুটিল।

১২ দিনে ১০০ মাইল অতিক্রম করিয়া আমরা তুকজী নামক স্থানে পৌছিলাম। হর্ষমান সুবা নামে একজন গোর্খা শাসনকর্ত্তা তথায় বাস করিতেছিলেন। গয়ালামার নিকট হইতে পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম সেইজন্য শাসনকর্ত্তার অতিথিরূপে বাস করিতে লাগিলাম। এখানে আসিয়া পথের সংবাদ শুনিয়া আবার মন দমিয়া গেল। সকলগুলি পথই সশস্ত্রপ্রহরীদ্বারা রক্ষিত।

একদিন রাত্রে আমার ভৃত্য দুইটি প্রচুর সুরা পান করিয়া পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। যখন ঝগড়া খুব বাধিয়াছে তখন সব কথা বাহির হইয়া পড়িল, যার যত দোষ আছে তা দুজনেই উচ্চকণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—শেষে দুজনেই দুজনকে বলিয়া বসিল "আমি কি জানি না তুমি এই চীনে লামাকে মারিয়া ফেলিবার ফন্দীতে আছ"—দুজনেই অপরের স্কন্ধে দোষ চাপাইতে ব্যগ্র। ভয়ানক ঝগড়া, দুজনেই ক্রোধে অন্ধ, আমার নিকট দুজনে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ও বড় ভয়ানক লোক; ওকে রাখিলে আমি থাকিব না।" আমি ভাবিলাম এমন সুযোগ আর হয় না, দুজনকেই বিদায় করি—বিস্তর বকসিস দিয়া দুজনকেই খুসী করিয়া বিদায় দিয়া বাঁচিলাম।

হর্ষমান সুবার গৃহে সিরাব গয়ালসান নামে একজন তিব্বতী ডাক্তার অতিথি ছিলেন। ইনি চিকিৎসাও করিতেন এবং স্থানীয় পুরোহিতদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। আমার সহিত লোকটির পরিচয় হইলে দেখিলাম যথার্থই ভদ্রলোকটি পণ্ডিত। তখন স্থির হইল আমি তাঁহাকে চীনের বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিব, তিনি আমাকে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। আমরা উভয়ে তুকজী ত্যাগ করিয়া সারেং যাত্রা করিলাম। ভদ্রলোকটির

বাড়ী সারেং-পথে। আমরা "শত প্রস্রবণ" বা "মুক্তিনাথ" নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করিলাম। এখানে যে একসময় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন দেখিলাম। কালীগঙ্গা নদীর ধারে একরাত্রি বিশ্রাম করিলাম। পরদিন নদী পার হইবার জন্য তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া নানা চেষ্টা করিয়া অবশেষে অতি কষ্টে পার হইলাম। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে ঘোড়ায় চড়িয়া নদী পার হইতে পারিব, কিন্তু দুই পা যাইতে না যাইতে, আমার ঘোড়াটির পা কাদায় বসিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি তীরে উঠিয়া বড় বড় পাথর জলে ফেলিতে লাগিলাম। ঘোড়াটি পাথর ফেলার ছপাছপ শব্দে ভয়ে উন্মত্তবৎ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কোন প্রকারে অপর পারে গিয়া উঠিল। তখন পাথরের উপর পা দিয়া আমি ও আমার বন্ধু অনেক কষ্টে সেই খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদী পার হইলাম। বন্ধুটির ঘোড়া ভয়ে আর জলে নামিবে না, তখন তার মুখের দড়ি ধরিয়া আমরা দুজনে টানিতে টানিতে জলের উপর দিয়া আনিলাম। কি যে নাকাল হইয়া সে নদী পার হইতে হইল।

তুকজীর তলদেশে সিডার ও পাইনের বন। কিন্তু ধবলগিরির উত্তরে যখন গেলাম তখন সেখানে এক-রকম বেঁটে ভোঁতা সিডার গাছ দেখিলাম, ২০ ফুটের উচ্চ নয়। সেখানে বড় গাছ বড় দেখিলাম না, ঝোপে ঝোপে গুল্মজাতীয় গাছ। বরফের উপর দিয়া ক্রমাগত চলিয়া ১৫ মাইল পথ হাঁটিয়া কিরাং নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে তিব্বতী লোকই অধিক, চারিদিকেই মন্ত্রলেখা ধ্বজা উড়িতেছে। পরদিন দশ মাইল যাত্রার পর সারেং নগরীর দেখা পাইলাম। সারেং একটি উপত্যকা, পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১১ মাইল, উত্তর দক্ষিণে ৩ মাইল হইবে। সারেং কেল্লা, বৌদ্ধ মন্দির, বিহার সবই দেখিলাম। সারেং নগরীতে ৬০টির অধিক বাড়ী নাই।

নবম অধ্যায়

সুন্দর সারেং ও তাহার কদর্য্য অধিবাসী।

সারেং সহরে প্রবেশের পথে ২৪ ফুট উচ্চ এক পাথরের তোরণ দেখিলাম। শুনিলাম এ যুদ্ধসজ্জা নয়, নগরের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতারা এখানে বাস করেন। তোরণ অতিক্রম করিয়া দেড় মাইল দূরে প্রকৃত সারেং সহর। সেখানে ১৪।১৫ জন আমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সিরাব গয়ালসান আমাকে সেখানকার প্রধান রাজপুরুষের নিকট লইয়া গেলেন। আমি সেখানকার বৌদ্ধ-মন্দিরে আশ্রয় পাইলাম। বিশেষ সম্মানিত অতিথিদের সেখানে স্থান দেওয়া হয়। লামা ভিন্ন আর কাহারও মন্দিরে বাসের অধিকার নাই। ধর্ম্মগ্রন্থ এখানেও অনেক দেখিলাম। এ সকল গ্রন্থ কেহ পড়ে না। গ্রন্থের আদরই ধর্ম্মের আদর, এরূপ ইহাদের বিশ্বাস। সিরাব গয়ালসানের বাটী এই মন্দিরের অতি নিকটে। লোকটি বিপত্নীক, ঘরে দুটি বয়স্থা কন্যা; তাহারাই তাঁহার ঘরকন্না বিষয় আশয় কাজকর্ম দেখে। মেয়ে দুটি বড় কার্য্যকুশলা। এ স্থানের অধিবাসীরা প্রত্যহ রাত্রে নৃত্য গীত করিয়া কাটাইত, আর মধ্যে মধ্যে আমার মুখে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শুনিত। আমি কিনা তিব্বতযাত্রী, সারেং সহরে বাস করিয়া তিব্বতীদের ম্লেচ্ছ রীতিনীতি শিখিয়া লইলাম। অপরিচ্ছন্নতায় তিব্বতীরা পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য, সারেংএর লোকেরা বোধ করি অপরিচ্ছন্নতায় তাহাদেরও পরাস্ত করিয়াছে। তিব্বতীরা কচিৎ মুখে জল দেয়, কিন্তু এখানকার লোকদিগকে কদাচ জলস্পর্শ করিতে দেখি নাই। আমি এক বৎসর এখানে ছিলাম, এই সময়ের মধ্যে দুদিনও কাহাকেও মুখ হাত ধুইতে দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ; কাপড় কাচিবার নিয়ম ইহারা জানে না, কাপড় ছিঁড়িলেই তবে তাহা ছাড়িয়া ফেলে। এদের চামড়ার উপর ময়লার এক পুরু আচ্ছাদন যেন চকচক করিতেছে, বস্ত্রের অবস্থাও সেই-প্রকার। পরিচ্ছন্নতা কি বস্তু তাহা ইহারা স্বপ্নেও জানে না। যে হাতে নাক ঝাড়ে সেই হাতেই খায়। ইহাদের অপরিচ্ছন্নতা অবর্ণনীয়, তাহা স্মরণ করিলে আমার ন্যাকার আসে। এই ম্লেচ্ছ জাতির সঙ্গে কিছুদিন বাস করিয়া আমি তিব্বতবাসের উপযুক্ত হইয়া উঠিলাম। এইটুকুই আমার লাভ। এ স্থানে আমি কি কাজ করিতাম, তাহার একটি বিবরণ দিই। প্রাতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিতাম, তৎপরে তিন ঘণ্টা গম্ভীর অভিনিবেশ সহকারে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিতাম। সন্ধ্যার সময় আমার শিক্ষকের সহিত ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে

কাটাইতাম। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের এক বিশেষত্ব দেখিলাম, এখানকার প্রধান সাধু "পদ্ম স্বয়ম্ভু" তিনি একজন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, মদ্যপায়ী, মাংসাশী দেবতা। তিনি ইহাদের আদর্শ। এই স্থানের লোকেরা ইন্দ্রিয়-সুখকেই চরম বলিয়া জানে, আহার বিহার নিদ্রা ইহাদের কার্য্য,—আর মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মকথা শ্রবণ। তা যেমন সাধু, তার তেমনি ব্যাখ্যা। মধ্যে মধ্যে সিরাব গয়ালসানের সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক হইত। এই লোকটির পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনিও এই দুর্ব্বলতার জন্য জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই এবং মোগলদের ন্যায় ইনিও একটুতেই চটিয়া উঠিতেন, যদিও ক্রোধ শান্তি হইতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইত না। একদিন ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে মতভেদ হওয়াতে তিনি হঠাৎ ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া আমার গলার নিকট জামা শক্ত করিয়া ধরিয়া আর এক হাতে এক লাঠি লইয়া আমায় মারেন আর কি? আমি তাঁর কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, এই না আপনি আদর্শ বৌদ্ধ চরিত্র ব্যাখ্যা করিলেন, আপনার এ কাজটা কিন্তু আপনার আদর্শের মত হইতেছে না। হঠাৎ অপ্রতিভ হইয়া তিনি লাঠি নামাইলেন, কিন্তু তখনও দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতেছেন, আর চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। ক্রমে আমায় ছাড়িয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমাদিগের মধ্যে তখনই সদ্ভাব হইয়া গেল। সারেংএ বাসের কালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪।১৫ ঘণ্টাই আমার পাঠ ও চিন্তায় কাটিত। আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র আহার করিতাম এবং ভ্রমণ করিতাম। প্রত্যেক রবিবার পৃষ্ঠে প্রস্তরের বোঝা লইয়া পাহাড়ে দ্রুত উঠিতাম। তিব্বত-যাত্রী আমি এইরূপে দুরূহ পথ অতিক্রম করিতে অভ্যাস করিতাম। এ সময় আমার স্বাস্থ্য চমৎকার ছিল। যাহোক অতি অল্পদিনের মধ্যে এ দেশের লোকের নিকট একজন মহৎ ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইলাম। সারেং অতি চমৎকার স্থান। সারেংএ কেবল দুই ঋতু আছে—শীত ও বসন্ত। বসন্তকালে ক্ষেতগুলি হরিৎ শস্যপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে আর তখন প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়। শীতের প্রারম্ভে অস্তমান সূর্য্যের শেষ কিরণ-ছটায় চির-তুষারাবৃত পর্ব্বত-শিখরের আরক্তিম শোভা অবর্ণনীয়। প্রথমে তাহা রক্তাভ তৎপরে স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে। সারেংএর ভয়ঙ্কর ব্যাপার তুষার-ঝঞ্ঝা। তখন কাহার সাধ্য গৃহের বাহির হয়? তখন তীব্র শীতল বায়ু শরীরে বিদ্ধ হয় আর তুষার বৃষ্টি হইতে থাকে। যাহোক তুষারবর্ষণের পর বড়ই শোভা হয়। প্রকৃতি যেন নির্ম্মল শুভ্র বসন পরিয়া হাসিতে থাকে। বরফের উপর যখন চন্দ্রোদয় হয় তখন সেই জ্যোৎস্না আরও অপূর্ব্ব দেখায়। আমি এমন দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই।

অধ্যায়।

খ্যাতি ও প্রলোভন।

১৮৯৯ শালের মে মাসের প্রথমেই আমি সারেংএ আসি। প্রায় ৮ মাস পরে এখানে থাকিতে-থাকিতেই আবার নব বর্ষ ফিরিয়া আসিল। নব বর্ষের প্রথম দিনটি আমি চিরন্তন নিয়মানুসারে যাপন করিলাম। ১৯০০ সালের প্রথম দিনটি আমার প্রাণে নানা ভাবের উদয় করিল। স্মরণ করিলাম, স্বদেশ হইতে আমি আজ কত দূরে; হিমাচল-শিখরে এই আমার দ্বিতীয় নব বৎসরের উৎসব। আমার দেহ সুস্থ ও সবল, মন প্রফুল্ল, আমি তিব্বতযাত্রার জন্য সকল-প্রকারেই প্রস্তুত হইয়াছি। বর্ত্তমানে সকলই আমার অনুকূল, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে জানি না। সমুদয় সারেংবাসীদের পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া আমার অন্তরের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিলাম। বহুপূর্ব্ব হইতেই আমি এই ভোজের আয়োজন করিয়াছিলাম, এ দেশের লোকেরা যাহা ভালবাসে তাহা যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এ দেশের ইন্দ্রিয়-সুখরত সাধারণ-লোকেরা আমার আহারে বিহারে সংযম ও নিয়মনিষ্ঠা দেখিয়া আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি করিত, এই নববর্ষের বিপুল ভোজের পর আমার সমাদর খ্যাতি প্রতিপত্তির আর পরিসীমা রহিল না। আমার নিকট নানাবিধ ঔষধ ছিল, সুতরাং ঔষধ বিতরণ করিয়াও আমার প্রতিষ্ঠা কম হয় নাই। কিন্তু এই ভোজের ব্যাপারের পর এক বিষম অনর্থ উপস্থিত হইল। আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম সারেংএ আমায় বাঁধিয়া রাখিবার জন্য চারিদিকে একটি রীতিমত চক্রান্ত চলিতেছে। আমার শিক্ষক ও

বন্ধু সিরাব গয়ালসান এই চক্রান্তের আদিগুরু। যাহাতে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমি সারেংএ চিরপ্রতিষ্ঠিত হই, এই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা হইল। পিতার অভিসন্ধি বুঝিয়া মেয়েটিও তাহার রূপের ফাঁদে আমায় বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধের কৃপায় ও তাঁহার মহৎধর্ম্মের শিক্ষার বলে আমি এই প্রলোভনে জয়ী হইলাম! যদি সিরাব ও তাঁহার কন্যার জালে আবদ্ধ হইতাম তাহা হইলে আজ আমার জীবনের কি হীনাবস্থাই বা না ঘটিত। যা হোক আর ত আমার সারেং থাকা চলে না। এবার আমার তিব্বতের পথের সন্ধানে বাহির হইতে হইবে। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, স্থানীয় লোকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে নানা ভাবে পথের সন্ধান লইতে লাগিলাম এবং তখনই তাহা আমার স্মারক পুস্তকে লিখিয়া লইতাম। অবশেষে সমুদায় বিররণ-গুলি মিলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে থোরপি দিয়া তিব্বতরাজ্যে প্রবেশ করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে আবার আমায় তুকজীর নিকটবর্ত্তী মালবায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। একদিকে ইহা ভালই হইল, সারেংএর লোকেরা আমার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল না। এখন সব প্রস্তুত—কিন্তু সে সময়ে পথ যে তুষার-পাতে দুর্গম, জুন ও জুলাই মাস ছাড়া এ পথে চলা অসম্ভব। শুনিলাম সে সময়েও পথে ——থাকে, কিন্তু এ সময়ে যাত্রা করিলে পথে মৃত্যু নিশ্চিত। অতএব এখানেই কোন-প্রকারে দিনপাত করিতে লাগিলাম। মালবা গ্রামের প্রধান পুরুষ আদম নারিংএর সঙ্গে আমার সারেংএ সাক্ষাৎ হইল। আমাকে মালবা যাইতে হইবে, সুতরাং ভালই হইল। ১৮৯৯ শালের অক্টোবর মাস। নারিং তিব্বতে চামরের ব্যবসা করেন। সম্প্রতি সেখান হইতে ফিরিবার পথে সারেংএ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি আমায় বলিলেন যে তিব্বত হইতে বিস্তর ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাঁহার গৃহে গিয়া আমাকে সে-সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই নিমন্ত্রণ আমার পক্ষে ভালই হইল। নারিং ব্যবসার জন্য ভারতবর্ষে যাইতেছিলেন, মার্চ্চ মাসে মালবায় ফিরিবেন বলিলেন। মার্চ্চ মাসের ১০ই তারিখে আমি সারেং ও তাহার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। সারেংএ বাস আমার একেবারে বিফল হয় নাই। কারণ আমার চেষ্টায় প্রায় ১৫ জন লোক মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং ৩০ জন তামাক খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। আমার চিকিৎসায় যাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছিল তাহা-দিগকে আমি এই-প্রকারে আমার ঋণ শোধ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। এক বৎসর সারেংএ বাস করিয়া আমি সেখানকার সমুদায় লোকের সহিত পরিচিত হইয়া-ছিলাম। আমার বিদায় গ্রহণের সময় সকলে সাধ্যমত মাখন ফল শস্য ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপহার দিল। আমার গ্রন্থ ও সমুদায় জিনিষপত্র অশ্ব-পৃষ্ঠে চাপাইয়া ১০ই মার্চ্চ যাত্রা করিলাম। আমার শ্বেত অশ্বটির বিনিময়ে সারেংএর বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিকট হইতে প্রায় ৬০০ টাকা মূল্যের ধর্ম্মগ্রন্থ উপহার পাইয়াছিলাম। গ্রামের বাহিরে গিয়া দেখি প্রায় ১০০ জন লোক আমায় বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি তাহাদের মস্তকে দুই হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। আবার আমি তুকজীর নিকট মালবা নামক গ্রামে ফিরিয়া চলিলাম। সন্ধ্যার সময় কিমিই নামক স্থানে পৌঁছিলাম। পরদিন কালীগঙ্গার ধারে শুক নামক স্থানে পৌঁছিলাম। সেখানকার লোকেদের ধর্ম্মোপদেশ শুনাইলাম। শুকে আবার সিরাব গয়ালসানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার সারেং পরিত্যাগের সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। সারেং পরিত্যাগের তৃতীয় দিনে আমি মালবায় পৌঁছিলাম। আদম নারিংএর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তিনি সেখানে ছিলেন না। সোনাম নরবু নামে গ্রামাধিকারীর পিতা আমাকে তাঁহার দেবালয়ে থাকিতে বলিলেন, সেখানে দুইটি সুসজ্জিত গৃহ দেখিলাম। বুদ্ধের নানা মূর্ত্তি ও ধর্ম্ম-গ্রন্থে তাহা পরিপূর্ণ। তিনি আমায় সে-সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। আদম নারিংএর বাড়ীর নিকটে পীচের বাগান, অদূরে স্বচ্ছ-তোয়া কালীগঙ্গা নদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, বনের নীলিমার পশ্চাতেই শুভ্র তুষার-শৃঙ্গ। প্রাকৃতিক দৃশ্য কি সুন্দর! স্বভাবজাত সুখের প্রচুর আয়োজন! আমি এখানে ধর্ম্মালোচনায় ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। মালবায় পৌঁছিবার দুই সপ্তাহ পরে তুকজীর

এক ব্যবসায়ীর হস্তে রায় শরৎচন্দ্র দাসের নিকট হইতে মহাবোধি সোসাইটীর একখানি কাগজ পাইলাম। কাগজের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে শরৎবাবু আমায় সাবধান হইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার মারফৎ আমি শরৎবাবুকে ও অন্যান্য বন্ধুদের পত্র লিখিয়াছিলাম। আমার পত্রবাহক তুকজীর এই ব্যবসায়ী গ্রামের লোকদের নিকট আমার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক খবর দিল। পরদিন দেখিলাম আমাকে লইয়া কানাঘুষা চলিতেছে। আমি ইংরেজের দূত, শরৎবাবুর সহিত চিঠিপত্র লেখালিখি করি, আমি হয়ত ইংরেজের চর। হয়ত আমার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। অতএব আমাকে সেখানে কোনক্রমেই থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। আদম নারিংএর কানেও একথা গেল তার-পরদিন অতি গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে তিনি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিলাম সত্য গোপন করিয়া ইঁহাকে বিপন্ন করিব না। আমি নারিংএর বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম "যদি শপথ কর আমি যাহা বলিব তাহা অন্ততঃ তিন বৎসর কাহাকেও বলিবে না, তাহা হইলে সবই তোমায় খুলিয়া বলিতে পারি, আর কথা যদি না রাখ তাহা হইলে সত্য প্রকাশ হইবে না, নেপালরাজ যাহা করিবার করিবেন।" নারিং শপথ করিলেন, আমি তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিলাম এবং তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রতিজ্ঞা করাইলাম। আমার রাহাদানি দেখাইয়া তীব্বতযাত্রার কাহিনী সমুদায় বলিলাম। আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলি নাই, সত্যের জয় হইল। আদম নারিং আমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিলেন। আমি তাঁহাকে আমার সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। আমায় পথের সন্ধান অনেক বলিয়া দিলেন। জুন কি জুলাই মাসে যাত্রা করিব স্থির হইল। আদম নারিংএর নিকট সত্য প্রকাশ করিয়া ভালই হইল। তাঁহার মন প্রসন্ন হইল। কিন্তু আর তাঁহার আতিথ্য ভোগ আমার পক্ষে উচিত নয় ভাবিয়া স্থানীয় দেবালয়ে আশ্রয় লইলাম। সেখানেও, আদম নারিংএর বন্ধুতা ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলাম না, তিনি আমার সমুদায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন, আমার অনুরোধে আমার জন্য পথপ্রদর্শক ও কুলী ঠিক করিয়া দিলেন। ধবলগিরির উপত্যকায় তাহারা থামবুথং পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। মালবা হইতে সোজা গেলে তিব্বতের পশ্চিম প্রদেশ ১০ দিনের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি সে পথে যাইব না, পথে নানা স্থান ঘুরিয়া যাইব। অতএব পথে আমার ২৩ দিন দেরী হইতে পারে। সেই ভাবে প্রস্তুত হইয়া ১৯০০ শালের ২২ই জুন মালবা হইতে যাত্রা করিলাম। পান্থবিহীন, পথবিহীন দেশে তিন দিন ক্রমাগত চলিলাম। পার্ব্বত্য দেশে বহুদিন ভ্রমণ করিতেছি বটে, কিন্তু এবার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলাম তাহা অভূতপূর্ব্ব। দিনের পর দিন তুষারাচ্ছন্ন দেশে ক্রমাগত চলিতেছি—চারিদিক ধূ ধূ করিতেছে, বরফ আমার শয্যা, বরফ আমার উপাধান, সে তুষারময় পথে আর কিছুই দেখিলাম না।

শ্রীহেমলতা দেবী।

পাটনায় প্রাচীন চিত্র

খাঁ বাহাদুর খুদাবখ্‌শ বাঁকিপুরের সরকারী উকিল এবং তিনবৎসর হাইদরাবাদ রাজ্যে প্রধান জজ ছিলেন। তিনি নিজের সংগ্রহ ও পিতা হইতে প্রাপ্ত ছয় হাজার ফারসী ও আরবী হস্তলিপি, প্রায় দুই সহস্র ইংরেজী গ্রন্থ, অনেক মুদ্রিত ফারসী-আরবী বই এবং একটি সুন্দর বড় দোতলা দালান ও সংলগ্ন জমি সাধারণের নামে লিখিয়া দিয়া খুদা-বখ্‌শ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ভারতে মুসলমানগ্রন্থের এরূপ প্রকাণ্ড ও মূল্যবান্ আগার আর একটিও নাই। দিল্লীর বাদশা ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের জন্য লিখিত অতি সুন্দর সুন্দর হস্তলিপি, চিত্র ও হস্তাক্ষরের নমুনা,—কয়েকজন বিখ্যাত পারসিক কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থাবলী,—মধ্য-এসিয়া আরব ও স্পেনে লিখিত মূল্যবান্ আরবী বই—এখানে একত্র করা হইয়াছে। কতকগুলিতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, কুমার দারাশুকো প্রভৃতির হাতের লেখা, অথবা মুসলমান রাজারাণীদের মোহর আছে। এই ভাণ্ডারের তিনখানি সচিত্র হস্তলিপি হইতে মুঘল-যুগে ভারতে চিত্রবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অতি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক-খানারই অঙ্কনের বৎসর ঠিক

জানা আছে এবং তাহা হইতে মুঘল দরবারের চিত্রকরদের প্রণালী কোন্ সময় কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে; কোন্ প্রণালী আগে কোন্‌টি পরে, অথবা কোন্‌টি কোন্ বাদশাহের সময়ের তাহার সম্বন্ধে কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। প্রথম, আলীমর্দ্দান খাঁ শাহ-জাহানের সঙ্গে প্রথম দেখা করিবার দিন (১৬৪০ খৃঃ) যে "শাহনামা" মহাকাব্য তাঁহাকে উপহার দেন, সেখানি। ইহাতে শুধু চীন চিত্রকরের আঁকা মধ্য-এসিয়ার বা "বুখারার" প্রণালীর বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত। এই প্রণালী ভারত-বর্ষে আসিয়া দিল্লীর রাজ-সভায় হিন্দুচিত্রকরদের হাতে পড়িয়া হিন্দু ও সারাসেন্ কলার মিশ্রণে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইল তাহার প্রথম অবস্থা "তারিখ-ই-খানদান্-তাইমুরিয়া" নামক গ্রন্থের ছবিতে অতি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। এখানি আকবরের সভায় আঁকা; তাইমুর হইতে আকবরের রাজত্বের ২২ বৎসর পর্য্যন্ত মুঘল-ইতিহাস-সম্বলিত। প্রতি চিত্রের নীচে তাহার পরিকল্পনাকারী ও সমাপ্তকারী চিত্রীদ্বয়ের নাম। ইহাদের অনেকেই হিন্দু এবং প্রায় সকলেরই নাম "আইন-ই-আকবরীর" ১ম খণ্ডের পশ্চাতে আকবরের চিত্রকরদের নামের তালিকার মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাতে আকবরের যে কয়েকখানি প্রতিকৃতি আছে তাহা সমসাময়িক এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য। দর্শকেরা দেখিবেন যে, এই-সব ভারতীয় চিত্রকর জল ও পর্ব্বত আঁকার চীনে-প্রথা চুরি করিয়া অতি অল্প বদলাই-য়াছে; কিন্তু মুখগুলি ভারতীয়, ঐ শাহনামার মত গালফুলা শ্মশ্রুবিহীন চীনামুখ নহে। বর্ণ ও অলঙ্কারের গৌরবে এই আকবরী যুগের চিত্রগুলি অমূল্য। তৃতীয় গ্রন্থ, শাহজাহানের সময়ে রচিত তাঁহার ইতিহাস, নাম পাদিশাহনামা। এখানিতে ভারতীয় চিত্রপ্রণালী সূক্ষ্ম অলঙ্কারের ছটা, রঙের বৈচিত্র্য এবং খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি, এবং অবয়বের কোমলতায় চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; আকবরী যুগের সেই অর্দ্ধ-কর্কশ সতেজভাব নাই, কিন্তু এখনও অবনতি আরম্ভ হয় নাই।

সেই অবনতির দৃষ্টান্ত ১৬৭৬-১৭৫০ খৃষ্টাব্দের নানা সময়ে অঙ্কিত একখান ছবিসংগ্রহে ("মুরাক্কা"তে) স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বিংশ বৎসরে লক্ষ্ণৌএর জঘন্য চিত্রকলার উৎপত্তি; তাহার উপর ইউরোপীয় চিত্রের প্রভাব পড়িয়াছে, অথচ ইউরোপীয় ভাল ছবির মত প্রকৃতির অনুসরণ, রঙ্গে পরিপক্কতা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ নাই, কিন্তু মুঘলযুগের গুণগুলিও সব হারাইয়াছে। রণজিৎসিংহের জন্য অঙ্কিত চিত্রগুলিরও সেই দুর্দ্দশা, যেন ছেলেদের চোখ ভুলাইবার জন্য আঁকা, চিন্তাশীল বা পণ্ডিত লোকের জন্য নহে। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ছবি, অতি আশ্চর্য্য কঠিন বা সুন্দর ফারসী হস্তাক্ষরের নমুনা, বাদশাহ ও যুবরাজদের স্বাক্ষর প্রভৃতি এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পারস্যে, তুর্কীতে, ও মধ্য-এসিয়ায় অঙ্কিত কয়েকখানি ছবিও আছে। হস্তলিপিগুলির মধ্যে আরবী-ফারসীপাঠকদের উপাদেয় অমূল্য ৪।৫ খানি গ্রন্থ আছে। সার ওয়াল্টার স্কট ওয়েভার্লি নবেলগুলির যে প্রথম সংস্করণ বেনামী প্রকাশ করেন তাহা দেখিয়া ইংরেজীপাঠক সুখী হইবেন। ভারত-সম্বন্ধে পুরাতন সচিত্র ইংরেজী অনেক মূল্যবান্ বই এখানে আছে। ফলতঃ সব ইংরেজী বইগুলির মূল্য লক্ষ টাকার উপর হইবে; ফারসী আরবী হস্তলিপির মূল্য ৪।৫ লক্ষের কম নহে। পুস্তকাগারের বাড়ীটিও দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়; নির্ম্মাণ-ব্যয় অর্দ্ধ লক্ষের উপর। দক্ষিণের পাঠাগারটি সরকারী খরচে তৈয়ারি হয়। মধ্যে খুদাবখ্‌শ চিরনিদ্রায় শায়িত। ইনিই ভারতীয় বড্‌লী।"

স্থানীয় আর্ম্মাণী ব্যারিষ্টার মানুক সাহেব অনেক সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহার বাড়ীতে যে নিজস্ব চিত্রশালা আছে তাহা দেখিলে ভারতীয় কলাসম্বন্ধে অনেক স্থির সত্য জানা যায়, এবং এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের (জাপান, চীন, তিব্বত, পারস্য, নেপাল ও মধ্য-এসিয়ার) দৃষ্টান্তের সহিত ভারতীয় চিত্রের তুলনা করিবার সুবিধা হয়। তাঁহার বাড়ীতে আকবরী-যুগের কয়েকখানি, শাহজাহানী যুগের অনেক, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শত শত ছবি আছে। মুঘল-রাজসভায় শিক্ষিত হিন্দুচিত্রকরগণ হিন্দু বিষয় লইয়া কিরূপ প্রণালীতে ছবি আঁকিতেন (যাহাকে কুমারস্বামী "রাজপুত-আর্ট" বলেন) তাহার এত বেশী ও এত সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। কতক-

গুলি কৃষ্ণ-চরিতের ও যোগীদের বিষয়ে চিত্র দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা করে না; সেগুলি এমনি গভীর ভাবাত্মক এবং এত সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে আঁকা যে, ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রের নিকট পরাস্ত হইবে না। একখানি চিত্রে রাম লঙ্কা জয় করিয়া ঠিক মুঘল-বাদশাহের মত পোষাক পরিয়া রথ, গজ, অশ্ব ও কামান লইয়া (!) কুচ করিতেছেন; আর একখানিতে বৃন্দাবনের গোপেরা মুঘল মনসব্‌দারের মত জামা-পাগ্‌ড়ী পরিয়া ঢাল তরবার লইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে ভেট করিতে যাইতেছেন! একখানি মুর্শিদাবাদের গজদন্তে খোদা কৃষ্ণলীলা ঠিক বরাহং স্তূপের পাথরের অল্প উঁচু ছবি (Relief)র মত; একই অঙ্কন-পদ্ধতি! কিছু আধুনিক ১৪ খানি ছবিতে দূতী-সম্বাদ হইতে রাধাকৃষ্ণের মিলন পর্য্যন্ত দৃশ্যগুলি পরে পরে অতি সুন্দর-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দুইখানি ছবি,—তান্ত্রিক যোগিনী এবং যমুনার পরপারে কৃষ্ণ বসিয়া, কাছে গাভী ও মহিষ আসিতেছে, চিত্র-হিসাবে অমূল্য; অথচ আধুনিক "ইণ্ডিয়ান আর্টের" দোষ একটিও নাই। এ দুটি সর্ব্বোচ্চ কোন প্রতিভার পরিকল্পিত।

যদুনাথ সরকার।

দেশের কথা

দেশের উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইলে দেখা যায় দেশের মূর্ত্তি নিরানন্দ ও উপবাসী। আমাদের দারিদ্র্যের পরিমাণ বুঝিতে হইলে সরকারী রিপোর্ট পড়িবার আবশ্যক নাই, একবার শহরের পথে চোখ খুলিয়া পথিকদলকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই হইবে অথবা পল্লীগ্রামের কৃষক-কুলের অবস্থা দেখিলেই চলিবে।

আমাদের দেশে অর্থ-সমস্যা হইল প্রধান ও প্রথম সমস্যা। কারণ দেশের এই ভীষণ দারিদ্র্য না ঘুচিলে, দেশের লোক দুবেলা দুমুঠা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে, শীতে একখানা শীতবস্ত্র গায়ে দিতে না পারিলে, অন্য কোনো চিন্তা তাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। আগে জীবনধারণ পরে কাজ বা চিন্তা।

এই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ দেশের শাসনতন্ত্র, আমাদের হাতে না থাকা। এবং সেই জন্যই স্বাধীন দেশের ন্যায় অর্থ উপার্জ্জনের নানান পন্থা আমাদের দেশে অবরুদ্ধ। থাকার মধ্যে আছে কেরাণীগিরি, শিল্পবাণিজ্যের একান্ত অভাব, কৃষিকার্য্যও মান্ধাতার আমলের উপায়ে পরিচালিত হইতেছে। অন্যান্য স্বাধীন দেশে সামরিক বিভাগে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হয়। আমাদের সে সুবিধা নাই। আধুনিক যুগের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য এখানে কে করিবে? তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এ দেশের শিক্ষাবিস্তার সভ্যজগতের তুলনায় নগণ্য। তাহা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কোনো কোনো শিক্ষাভিমানী ও জাত্যভিমানী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিরোধী —কারণ তাহা হইলে ব্রাহ্মণের ছেলেকে "ছোটলোকের" ছেলের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসিয়া লেখাপড়া করিতে হইবে, এবং "ছোটলোকেরা" লেখাপড়া শিখিয়া "বাবু" বনিয়া যাইবে, ফলে গৃহস্থালির কাজকর্ম্মের জন্য চাকর পাওয়া যাইবে না!

আমাদের সেন্টিমেণ্ট এত প্রবল যে আমরা অনেক সময়ে প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করিয়া বসি। তাই অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যেও আমাদের মনে পড়ে না যে যদি কেবলমাত্র পুরুষকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতি-পালন করিতে না হইত, যদি নারীও পুরুষের সঙ্গে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত, তাহা হইলে জীবন-সমস্যা এমন নিদারুণ হইয়া উঠিত না। কিন্তু তা কেমন করিয়া হয়! মেয়েদের বাহিরে বার হওয়াটাই লজ্জার কথা, তাতে পরিবারস্থ সকলের মাথা হেঁট হয়! কিন্তু প্রয়োজনীয়তা সেন্টিমেণ্টের ধার ধারে না। নিকট ভবিষ্যতে অবস্থা একদিন এমন অচল হইয়া পড়িবে যে নারীকেও অন্তঃপুরের আবরণ ছিঁড়িয়া ভিড় ঠেলিয়া জীবিকা উপার্জ্জনে মন দিতে হইবে। বুদ্ধিমান যাঁরা তাঁরা পূর্ব্বাহ্নেই মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাঁদের মনে স্বাধীন ভাব জাগাইয়া তুলিয়া সেই অবশ্যম্ভাবী দিনের জন্য তাঁদের প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

আমাদের মেয়েরা পা থাকিতে হাঁটেন না, সস্তা ট্রাম থাকিতে গাড়ী ভিন্ন চড়েন না। সেই জন্য অভাবের সংসারে অভাব নিত্য বাড়িয়াই চলে। ছয় পয়সার জায়গায় বারো আনা বা একটাকা খরচ হয়। এ-সম্বন্ধে

কেহ কিছু বলিলে এই-সব লোকেরা বলেন কি করিব, মেয়েদের প্রকাশ্যে চলা দেশের নিয়ম নয়। এটা তাঁদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না যে, নিয়ম যখন মানুষে গড়িয়াছে তখন সে-নিয়ম অনিষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয় মনে হইলে মানুষে তা ভাঙিবে। দেবদর্শনের প্রণামী, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদিতেও লৌকিকতা করিতে অনর্থক অনেক খরচ হয়। এইরূপে অনেক রকমে আমরা নিজেরা নিজেদের দারিদ্র্য ডাকিয়া আনি।

শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা উন্নত হইলে দেশে প্রভূত ধনাগম হইয়া থাকে। "২৪-পরগণা বার্ত্তাবহে" প্রকাশিত মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের শিল্প-কমিশনের সাক্ষ্যে যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, শিল্পের সার্থকতার জন্য নিম্নলিখিত অনুকূল অবস্থা-সমূহের সমন্বয়ের প্রয়োজন :—

১। প্রভূত মূলধন এবং ব্যাঙ্কের কারবার। এমন হইবে যে যখন যেখানে টাকা দরকার সেইখানেই টাকা পাওয়া যাইবে।

২। টেক্নিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ।

৩। ব্যবসায় বাণিজ্যের আধুনিকতম জ্ঞান।

৪। বাহ্য প্রতিযোগিতার সহিত লড়াইয়ে যথেষ্ট সময় টিঁকিয়া থাকিবার শক্তি।

৫। সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মজুর।

৬। জলপথে স্থলপথে সুলভে মাল চালান দিবার সুব্যবস্থা।

৭। স্বদেশে এবং বিদেশে অনুকূলভাবে মালের কাটতি। এই জন্য বাণিজ্যবিষয়ক সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা ও এজেন্সী থাকিবে।

৮। এমন অনুকূল স্থানে কারখানা বসাইতে হইবে যে শিল্পদ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পদার্থ অনায়াসেই পাওয়া যায়।

৯। আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সরবরাহের সুব্যবস্থা।

১০। কাঁচা মাল ও রাসায়নিক পদার্থের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ।

১১। স্থানীয় স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া।

১২। লোকদিগের মধ্যে সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য ঐক্যবুদ্ধি জাগাইয়া তোলা।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে ১, ৪ ও ৬ নম্বর অবস্থা লাভের জন্য সরকারের সাহায্য চাই-ই চাই। সমস্ত সভ্য দেশের শিল্প-উন্নতির ইতিহাসেও ঐ ঐ দেশের গভর্ণমেণ্টের ঐ-প্রকার সাহায্যের কথা উল্লিখিত আছে। অথচ দুর্ভাগ্যবশত আমাদেরই একজন লাট-সভার প্রতিনিধি (!) শিল্প-কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান কালে বলিয়াছেন যে শিশু-শিল্পকে খাড়া করিতে আমাদের দেশে গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যের প্রয়োজন নাই! এই "মাননীয়" ভদ্রলোকটির শিল্প সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা যে নাই তা তাঁর সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এ-দেশে কত শিল্পস্থাপনার চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছে সে-সংবাদ তিনি রাখেন না। "বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী" দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

কি কারণে আমাদের দেশ এরূপ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে তাহার আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই আমাদের শিল্পের অবনতির কথা মনে আসে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেও আশানুরূপ উন্নতি যে সাধিত হইতেছে ইহা বলিতে পারা যায় না। লোকে প্রচলিত প্রথা বা জানা পথের বাহিরে যাইতে চাহে না। কাজেই পরীক্ষা-ক্ষেত্র আদিতে প্রভূত অর্থব্যয় হইলেও প্রকৃত উপকার যে বিশেষ কিছু হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আর কথা হইতেছে, এক কৃষি-কার্য্য দ্বারা কোন দেশ অর্থশালী হইতে পারে না। প্রতি বৎসর হাজার হাজার বিঘা পতিত জঙ্গলাবৃত জমি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে কিন্তু আমাদের অন্নাভাব ঘুচিতেছে না, বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। আসল কথা, দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত না হইলে কেবলমাত্র কৃষি-কার্য্যের দ্বারা দেশের অর্থকষ্ট বিদূরিত করা সম্ভবপর নহে। দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইতে হইলে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার সাধন আবশ্যক ও ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কেবল সহানুভূতি পাইলেই হইবে না, আবশ্যকমত সাহায্যপ্রাপ্তিও আবশ্যক।

দেশে কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে কারখানার প্রতিষ্ঠাতারা লাভবান তো হনই তার উপর এক-একটি বড় কারখানায় কত দরিদ্রের যে অন্নসংস্থান হয় তার সংখ্যা নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাতার লৌহকারখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কোম্পানির মূলধন ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। গত বৎসর লাভ হইয়াছে সত্তর লক্ষ টাকা। এবং কত নিরন্ন ভারতবাসীর সেখানে কুলি মজুর ও কর্ম্মচারীর কাজ করিয়া অন্নসংস্থান হইতেছে।

শিল্প-কমিশনের কাজ ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে "দর্শক" লিখিয়াছেন—

কমিশন তদন্ত-কার্য্য শেষ করিতে কিছু সময় অতিবাহিত করিবেন, তাহার পর স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সময় লাগিবে; তাহার পর গবর্ণমেণ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত জানিয়া কার্য্যারম্ভ করিবেন, তাহাও সময়সাপেক্ষ। বিশেষতঃ কল কব্জা এদেশে আনাইয়া তাহা কার্য্যোপযোগী করিতেও সময় লাগিবে! বর্ত্তমান সময়ে বিদেশ হইতে কল কব্জা আনয়ন করাও সহজসাধ্য নহে। তাহার উপর রাজসরকার ভীষণ যুদ্ধে ব্যাপৃত; তাঁহার অর্থেরও এখন যথেচ্ছ ব্যয় সম্ভবপর নহে। অথচ এদিকে যে-কোন কার্য্যই করিতে হইবে তাহাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সে অর্থাভাব কিরূপে পূরণ হইবে? জল্পনা কল্পনা ও কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বেই অভাব ভীষণ অবস্থা ধারণ করিবে। লবণ আনিতে আনিতে পান্ত ফুরাইয়া যাইবে। সুতরাং বড় ভাবে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে যাহাতে অন্ততঃ মোটা কাপড় মোটা ভাতের যোগাড় হইতে পারে,

যাহাতে দিন যাপনোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পারে, সে বিষয়ে অগ্রে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। সকল ভার রাজসরকারের উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে নিজেদেরই নাগা সাজিতে হইবে; নিজেদের দুর্ভিক্ষ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র সকলেরই আত্ম অভাব পূরণ ও আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। যাহার অর্থ সামর্থ্য আছে তিনি অর্থ সাহায্য করুন, অপরে শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করুন; আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।"

এ-বৎসর কনভোকেশনে বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড সমাগত ছাত্রমণ্ডলীকে বলিয়াছেন যে দেশে নূতন নূতন অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হইবেন। এ আশ্বাস কাজে পরিণত হইলে দেশের দারিদ্র্য অন্তত কিছু পরিমাণে ঘুচিবে।

সু।

ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা *

১৮৮৮ সালে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রণীত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল; ১৯১১ সালে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে ইহার এক নূতন সংস্করণ বাহির হয়। 'পিঠাপুরম্'এর রাজার অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ বাহির হইল।

মূলগ্রন্থে চারিটি অধ্যায়:—(১) আত্মানাত্মবিবেক, (২) নিত্যানিত্য-বিবেক (৩) দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক এবং (৪) পূর্ণাপূর্ণ-বিবেক।

পরিশিষ্ট তিনটি অধ্যায়। 'A' নামক অধ্যায়টি (পৃঃ ১৯৯—২৩১) গ্রন্থকারের Philosophy of Brahmoism হইতে গৃহীত। অপর দুইটি অধ্যায় Indian Messenger নামক পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই তিনটি অধ্যায় বাঙ্গলা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় নাই।

বাঙ্গলা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ভাষা অস্পষ্ট, ও দুর্বোধ্য। ইহার সহিত তুলনায় ইংরেজী সংস্করণ অত্যন্ত প্রাঞ্জল। উভয় গ্রন্থ পড়িয়া মনে হয়, বাঙ্গলা ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসাই যেন ইংরেজী হইতে অনূদিত।

গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমেই আলোচনা করা হইয়াছে—"আত্মার মূল লক্ষণ কি?"। গ্রন্থকারের মতে "জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ"। জ্ঞান ও ইচ্ছার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—"অগ্রে জ্ঞান, তাহার পর ইচ্ছা (Volition)।" বর্ত্তমানযুগেও যে একখানা দার্শনিক গ্রন্থে এইপ্রকার মত প্রচারিত হয়, ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। Schopenhauer, Beneke, Latze, Wundt, Paulsen, Ku'pe, Horwicz, Jodl, Fouillce Ribot, Hoffding, Sully, Spencer, Baldwin, Ladd, James, Stout, Ward, Bradley, Royce প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলে দার্শনিক জগৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে ভাব (feeling) এবং ইচ্ছা (will)কে আর অগ্রাহ্য করা যাইতেছে না। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ-কেহ ভাবের, এবং কেহ-কেহ ইচ্ছার মৌলিকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু এখন এই মত প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত যে আত্মা কেবল জ্ঞান নহে, কেবল ভাব নহে এবং কেবল ইচ্ছা নহে। জ্ঞানকে আর সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতেছে না। এখন যাঁহারা কেবল জ্ঞানকেই ভিত্তি করিয়া দর্শনশাস্ত্র রচনা করিবেন, তাঁহাদিগের পুস্তক 'প্রাচীনকাহিনী' ও 'দার্শনিক-গল্প' বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইউরোপ এবং আমেরিকার জ্ঞানবাদিগণও আর James, Bergson, Dewey, Schiller প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মত অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছেন না। Royce পূর্ব্বে আপনাকে জ্ঞানবাদী বলিতেন, লোকে এখনও তাঁহাকে জ্ঞানবাদী বলিয়া জানে, কিন্তু তিনি কেবল জ্ঞানের উপর নিজ দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই, ইচ্ছাকেও জ্ঞানের সহচররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার দর্শনের নাম Absolute Pragmatism. বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলে Joachim, Taylor, Boyce-Gibson, Henry Jones, Mellone, Stewart প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নূতন আলোকে দর্শনশাস্ত্র পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমন কি Bradleyকেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অজ্ঞাতসারে Pragmatism এবং Jamesএর will to believe প্রভৃতি মতকেও অনেক স্থলে গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

(২)

গ্রন্থকার এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন:—"যখন আত্মা কোন বিষয়কে জানে, তখন সেই আত্মা আপনাকে জানে কি না।" তাঁহার উত্তরে তিনি বলেন 'হাঁ, আত্মা এই সময়ে আপনাকেও জানে, আপনাকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে।"

তাঁহার যুক্তি এই —

"মনে করুন আপনি কল্য অন্ধকারকে জানিতেছিলেন। অদ্য স্মৃতিদ্বারা জানিলেন "আমি অন্ধকার জানিতেছিলাম।" "আমি অন্ধকার জানিতেছিলাম" ইহার অর্থ "আমি জানিতেছিলাম + অন্ধকারকে"। সুতরাং 'অমি জানিতেছিলাম' ইহা যখন আপনার স্মরণ হইতেছে, তখন ইহা আপনি জানিয়াও থাকিবেন; অর্থাৎ অন্ধকারকে জানিবার সময়ে 'আমি জানিতেছি' এই তত্ত্ব আপনার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকিবে।" (বাং পৃঃ, ইং p. 8)

Ferrierও এই-প্রকার একটি যুক্তি দিয়াছেন (Institute of Metaphysics পৃঃ ৮১), তাঁহার যুক্তি আরও পরিস্ফুট। সীতানাথ বাবু উক্ত গ্রন্থ হইতে এই যুক্তিটি লইয়াছেন কি না জানি না। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই:—

(ক)

প্রথমতঃ—"আমি অন্ধকারকে জানিতেছিলাম" ইহা একটি অখণ্ড অবিভাজ্য অবস্থা। গ্রন্থকার ইহা স্বীকার করিয়াও উক্ত অবস্থাকে কাটিয়া দুই ভাগ করিয়াছেন—কারণ "আমি জানিতেছিলাম" এই অংশ তাঁহার নিতান্ত দরকার। দরকার এইজন্য যে ইহা দ্বারা যদি কোন উপায়ে প্রমাণিত হয় যে "কোন বস্তুকে জানিবার সময় আমি আমাকে জ্ঞাতৃরূপে জানিতে পারি।" আমরা পরে দেখিব যে এই অংশ গ্রহণ করিলেও গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

* Brahmojijnasa or An Inquiry into the Philosophical Basis of Theism translated from the original Bengali with supplementary chapters by Babu Sitanath Tattvabhusan, Head Master, Kesab Academy; sometime Lecturer in Philosophy, City College, Calcutta. Printed and published by P. C. Dass, Kuntalin Press 61 Bowbazar Street, Calcutta, pp. iv+ii+255. Price Re 1-8 or 2 Shillings.

(খ)

সীতানাথবাবু বলিতেছেন—"'আমি জানিতেছিলাম' ইহা যখন আপনার স্মরণ হইতেছে, তখন ইহা আপনি জানিয়াও থাকিবেন।" শেষ "ইহা" শব্দের অর্থ "আমি জানিতেছিলাম ইহা।" সুতরাং "ইহা জানিয়াও থাকিবেন" = আপনি জানিয়াও থাকিবেন যে "আমি জানিতেছিলাম।"

এবিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই :—'আমি জানিতেছিলাম' ইহা যদি স্মৃতির উক্তি হয়, তবে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত 'সত্যসত্যই আমি (বা আপনি) জানিতেছিলাম (বা জানিতেছিলেন)'; অর্থাৎ মূল ঘটনা = আমি জানিতেছি। কিন্তু সীতানাথবাবু বলেন "স্মৃতির উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত এই :—"আমি জানিতেছিলাম যে আমি জানিতেছিলাম।" অর্থাৎ মূলঘটনা = আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি। এ-প্রকার সিদ্ধান্ত যে কি-প্রকারে হইতে পারে তাহা বুঝা যাইতেছে না। গ্রন্থকার দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনাকে এক ঘটনা বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মতে "আমি জানি" এবং "আমি জানি যে আমি জানি" এই দুইটি একই তত্ত্ব।

Jamesএর Psychology (পৃঃ ২৭৪) এবং Wardএর Psychology (Ency : Brit. ১১শ সংস্করণ। পৃঃ ৫৫০, ৫৯৯) পাঠ করিলে পাঠকগণ এই মতের সমালোচনা পাইবেন।

এখন স্মৃতির ঘটনাটিকে একবার বিশ্লেষণ করা যাউক। কল্যকার ঘটনা অর্থাৎ মূল ঘটনা = আমি অন্ধকারকে জানিতেছি (ক)।

স্মৃতিতে ইহা জাগ্রৎ হইলে আমি বলিব "আমি কল্য অন্ধকারকে জানিতেছিলাম।" কোন কথা উহ্য না রাখিয়া বলিলে বাক্যটি এই প্রকার দাঁড়াইবে :—"আমি এখন জানিতেছি যে কল্য আমি অন্ধকারকে জানিতেছিলাম" (খ)। ইহার অর্থ "আমি কল্য 'ক' ঘটনা জানিতেছিলাম।"

স্মৃতির সাহায্যে যদি আমি 'খ'-বাক্য উচ্চারণ করি তবে বলিতে হইবে 'ক'-ঘটনা সত্য অর্থাৎ মূল ঘটনা = আমি অন্ধকারকে জানিতেছি।

মূল ঘটনা ও স্মৃতির ঘটনা আরও জটিল হইতে পারে। মনে কর কল্যকার ঘটনা :—"আমি জানিতেছি যে আমি অন্ধকারকে জানিতেছি" (গ)। স্মৃতিতে এই ঘটনা জাগ্রৎ হইলে আমি বলিব "আমি এখন জানিতেছি যে "কল্য আমি জানিতেছিলাম যে আমি অন্ধকারকে জানিতেছিলাম' (ঘ)।

স্মৃতি যদি বলে 'খ', মূল ঘটনা হইবে 'ক'; স্মৃতি যদি বলে 'ঘ', মূল ঘটনা হইবে 'গ'। সীতানাথবাবু বলিতেছেন স্মৃতি যখন বলিতেছে 'খ', তখন মূল ঘটনা হইবে "গ"। তিনি 'ক' ও 'গ'এর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নাই বলিয়াই 'খ' হইতে 'গ', সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন।

তৃতীয় বক্তব্য এই :—এখানে স্মৃতির প্রকৃতি বিষয়েই ভুল করা হইয়াছে। স্মৃতির ঘটনা ও মূল ঘটনা কখনই সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে না। James স্মৃতির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন :—

It is the knowledge of an event or fact of which we have not been thinking *with the additional consciousness that we have thought or experienced it before.*

স্মৃতিতে থাকে দুইটি ঘটনা :—

(১) মূল ঘটনা।

(২) এবং অতিরিক্ত এইটুকু :—"এই মূল ঘটনাকে পূর্ব্বে অনুভব করা হইয়াছিল বা চিন্তা করা হইয়াছিল তাহার বর্ত্তমান জ্ঞান।"

স্মৃতিতে এই দ্বিতীয় অংশ দেখিয়া অনেকে মনে করেন 'মূল ঘটনাতেও জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বজ্ঞান ছিল। ইহাকেই বলে Psychologist's fallacy (Jamesএর Psychology, vol i পৃঃ ১৯৬-১৯৮)।

এ বিষয়ে আরও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মূলঘটনাটি এই :—"আমি অন্ধকারকে জানিতেছি"। এ বিষয়ে স্মৃতির সাক্ষ্য এই :— আমি (= ক) জানিতেছি যে আমি (= খ) অন্ধকারকে জানিতেছিলাম। এখানে অনেকেই এইরূপ বলিবেন :—'এখানে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে আত্মা কেবল অন্ধকারকেই জানিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি যে অন্ধকারের জ্ঞাতা তাহাও তিনি জানেন। সুতরাং জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব জানা যাইতেছে।"

আমাদিগের বক্তব্য এই :—উক্তবাক্যে দুইটি 'আমি'।

১। 'ক'-আমি অর্থাৎ 'আমি জানিতেছি' এই অংশের 'আমি'। এই 'ক'-আমি = অদ্যকার 'আমি'।

২। 'খ'-আমি অর্থাৎ 'আমি অন্ধকারকে জানিতেছিলাম' অংশের 'আমি'। এই 'খ'-আমি = কল্যকার 'আমি' = স্মৃতিতে জাগ্রত 'আমি'।

এই 'ক'-আমির জ্ঞাতব্য বিষয় :—"আমি অন্ধকারকে জানিতেছিলাম (ঙ)। এই (ঙ) ঘটনাটার মধ্যে একটি সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। এই সম্বন্ধ দুইটি বস্তুর মধ্যে; প্রথম বস্তুটি 'খ'-আমি অর্থাৎ কল্যকার 'আমি'; দ্বিতীয় বস্তুটি 'অন্ধকার'। এ-সম্বন্ধ দেখিতেছে কে? অবশ্য 'ক'-আমি অর্থাৎ অদ্যকার 'আমি'। সুতরাং অদ্যকার 'আমি' জ্ঞাতা এবং এই 'ক'-'আমি' দেখিতেছে যে 'খ'-'আমি'র সঙ্গে অন্ধকারের একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে জ্ঞাতা জানিবার সময়েই আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া জানে; এস্থলে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে 'খ'-'আমি'র সঙ্গে অন্ধকারের জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধ ছিল এবং 'ক' আমি সেই সম্বন্ধ দেখিতেছে। 'ক'-আমিও 'আমি' এবং 'খ'-আমিও 'আমি'। 'ক'-'আমি' 'খ'-'আমি'র জ্ঞাতৃত্ব জানিতেছে এই দেখিয়া লোকে মনে করে 'খ'-'আমি'ও বুঝি নিজের জ্ঞাতৃত্ব জানিতেছিল। 'খ'-আমি যেমন তখন জানিত না যে সে মূল ঘটনার জ্ঞাতা, তেমনি 'ক'-আমিও এখন জানে না যে সে স্মৃতির ঘটনার জ্ঞাতা। কোন বিষয় জানিবার সময়ে কেহই নিজেকে জ্ঞাতা বলিয়া জানিতে পারে না।

(ঘ)

সীতানাথ-বাবুর বিশ্বাস যে অনুভূতিতে আত্মজ্ঞান না থাকিলে স্মৃতির সময় আত্মজ্ঞানের কথা আসিতে পারে না। ইহাই যদি সত্য হয় তবে শিশুকে আত্মজ্ঞান লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু Psychologistগণ ইহার বিপরীত কথাই বলিতেছেন। শিশু কি-প্রকারে অল্পেঅল্পে আত্মজ্ঞান লাভ করে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যায় যে আত্মজ্ঞানের জন্য স্মৃতি নিতান্তই আবশ্যক কিন্তু স্মৃতির জন্য আত্মজ্ঞান না হইলে চলে না এমন নহে। Ward বলেন :—

Whereas it is easy to see that memory is essential to any development of self-consciousness, the converse is not at all clear and would involve us in a needless circle (Psychology, Ency. Brita.)

Edward Cairdও স্বীকার করেন না যে প্রথম হইতেই মানবের আত্মজ্ঞান থাকে। তাঁহার মতে প্রথমে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান। তাহার পর আত্মজ্ঞান।

"The consciousness of objects is prior in time to self-consciousness (Evolution of Religion, Vol i

এস্থলে "in time" ব্যবহৃত হইয়াছে। বহুস্থলে ideally এবং logically শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন (Critical Philosophy of Kant, Vol ii, p. ৩৭১ ; ৪২৫).

Bradleyও বলেন জ্ঞান থাকিলেই যে আত্মজ্ঞান থাকিবে তাহা নহে (Truth and Reality, pp. 191-195).

এখন দেখা যাউক দার্শনিকগণ জ্ঞাতার জ্ঞেয়ত্ব বিষয়ে কি বলেন।

দার্শনিকগণের মত ও যুক্তি।

Kantও বলেন জ্ঞাতৃত্বশালী আত্মাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। ইঁহারই মত E. Caird এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

If the eye cannot see itself except in so far as it may be said to see itself in all the other things it sees, how can the conscious ego know itself except as the universal principle of knowledge which is present in all things known (Critical Philosophy. Vol ii, page 26. পৃঃ ২৫-২৯ দ্রষ্টব্য).

Kantএর অনুসরণ করিয়া Schellingও বলেন 'আমি'-বস্তুকে জ্ঞেয়বস্তু করা যায় না।

"The I is a pure activity that can only be defined as that which is not an object (Watson's Schelling পৃঃ ১১০)।

"The self is not one of the possible objects of knowledge (পৃঃ ১৫৩)।

Kant এবং Schelling এ বিষয়ে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা এই :—"যাহার জন্য জ্ঞান বিষয়সমূহকে আয়ত্ত করে, তাহা কি-প্রকারে জ্ঞানের বিষয়রূপে গৃহীত হইবে ?" ইহাই অন্যভাবে এইরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে :—মনে কর Atlas (এটলাস্) নামক পুরুষ পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই Atlas কি পৃথিবীকে ধারণ করিতে পারে ? কিংবা মনে কর একজন মানুষ স্বীয় স্কন্ধে ভারবহন করিয়া থাকে। এই ব্যক্তি কি নিজেকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইতে পারে ? এই-প্রকার 'অহম্'-রূপ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যেন জ্ঞান সমুদয় বিষয় ধারণ করিতেছে, এই জ্ঞান সেই 'অহং'কে কি-প্রকারে ধারণ করিবে ?

Schopenhauer বলেন—

"The knower himself as such, cannot be known ; otherwise he would be the known of another knower (The World as Will and Idea, Vol ii পৃঃ ৪১২) অর্থাৎ জ্ঞাতা জানিবার সময় জানিতে পারে না যে 'আমি জ্ঞাতা' ; নতুবা তিনি অন্য জ্ঞাতার জ্ঞেয় হইবেন।

জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় বলিয়া কল্পনা করিলে কি হয় সেবিষয়ে Herbert এইরূপ বলিতেছেন ;—

As soon as the I is conscious of itself, that of which it is conscious has become objective. The I which is conscious is subjective. It lies outside of that of which it is conscious. To become conscious of this I, we must in some way get behind it. We must be conscious of that which is conscious. But as fast as the I gets behind itself, it is there as an I which demands the renewal of the same process. The search for the I is a process which can never be completed. (Everett's Fichte. Grigg's Phil. classics. Page 82-83).

Lotze (Microcosmus Vol i পৃঃ ২৫০ ; Metaphysics), James (Principles of Psychology Vol i পৃঃ ২৭১-২৭৫ ; ৩০৪) Ward (Psychology : Ency. Brit. ১১শ সংস্করণ: পৃঃ ৫৫০, ৫৯৯) Bradley Bosanquet (The Principle of Individuality and Value. Page 221) Ladd (Psy: Descrip. পৃঃ ৩২ ; Theory of Knowledge) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মত পোষণ করেন।

Bradley বলেন—

"জ্ঞাতা আপনাকে অনুভব করে কিন্তু আপনাকে বিষয়রূপে জানিতে পারে না এবং বিষয়-বিষয়ীর পার্থক্যকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না। পরে চিন্তা করিলে এই জ্ঞাতা বিষয়রূপে পরিণত হয় কিন্তু এ ঘটনা এক নূতন ঘটনা, ইহার জ্ঞাতাও এক নূতন জ্ঞাতা। এই নূতন জ্ঞাতাও অনুভবের বিষয়, জ্ঞেয় বিষয় নহে।"

"The subject is always felt and neither itself, nor its actual distinction from the object, can be got out and placed before it as an object." "It can become an object for reflection ; but in becoming one, it generates a new experience and a fresh-felt subject (Truth and Reality পৃঃ ১৯৬)।

অতি প্রাচীনকালে যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ হইতেও এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল - বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃঃ ২।৪।১৪) বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে ? অন্যত্র—"ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারম্ বিজানীয়াঃ (বৃঃ ৩।৪।২)—বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পারিবে না।

তবে কি জ্ঞাতাকে জানা যায় না ? ইহার উত্তরে 'হাঁ' 'না' উভয়ই বলা যাইতে পারে। এ প্রশ্নের মীমাংসা 'জানা' শব্দের উপরে নির্ভর করে।

একজন জ্ঞাতা আছেন, একটি জ্ঞেয়বস্তু আছে, এতদুভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ আছে, জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তুকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে 'সম্বন্ধ জ্ঞান'কেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে এবং জ্ঞাতা নিজ জ্ঞাতৃত্বকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে - ইহাই যদি জানার অর্থ হয়, তবে বলিব জ্ঞাতা ঠিক জ্ঞানলাভের সময়ে আপনাকে জানে না, এবং আপনি যে বিষয়ের জ্ঞাতা তাহাও জানে না।

তবে যে-নিমেষে জ্ঞাতা কোন জ্ঞান লাভ করে, ঠিক তাহার পর-নিমেষেই ঐ জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

কিন্তু এই-প্রকার 'জানা' ছাড়াও অন্য একপ্রকার জানা আছে, তাহার নাম অপরোক্ষ অনুভূতি, Bradleyএর ভাষায় Immediate Experience, Bergsonএর ভাষায় Intuition। ইহাকে যদি 'জানা' নাম দিতে আপত্তি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাতাকেও জানা যায়। নতুবা যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় বলিব "বিজ্ঞাতাকে কি-প্রকারে জানিবে।"

(৩)

এ জগৎ কি ? এবিষয়ে গ্রন্থকার দুইটি উত্তর দিয়াছেন।

(১) এ জগৎ আমার মনোবিকার, আমার অবস্থা, আমার রূপ।

(২) এ জগৎ আমার বিষয়, আমি বিষয়ী।

(ক)

সীতানাথ বাবু নিজে বলেন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গও বলেন যে তিনি একজন Absolute Idealist ("অধ্যাত্মবাদী" আমরা কিন্তু

তাহার কোন চিহ্ন দেখিতেছি না। তিনি এই গ্রন্থে খাঁটী Subjective Idealismএর মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "ইহারা মনোবিকার, ইন্দ্রিয়বোধ বা বিজ্ঞানমাত্র (বাং পুঃ পৃ ৩৯)। They are states, sensations or ideas (ইং পৃ ৩৮)। যাহা কিছু দেখি বা শুনি বা স্পর্শ করি তাহা আমারই বিজ্ঞান (পৃঃ ১৯, বাং)। সীতানাথ বাবু মনে করেন বিজ্ঞান * =Sensation। ইহার প্রকৃতি-বিষয়ে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন :—

Sensation being purely mental, a form of consciousness—it bears no impress and furnishes no proof of any extra-mental—any not-self. It implies only the self's spontaneity or activity,—its capacity of assuming various sensuous forms (p 66. বাংলাগ্রন্থে এই অংশ নাই)।

এখানে বলা হইতেছে :—

(১) বেদনা কেবলই মনোব্যাপার।

(২) ইহা আত্মার বা জ্ঞানের একটি রূপ।

(৩) ইহাতে বাহ্যবস্তুর চিহ্ন মাত্র নাই, ইহা কোনো বাহ্যবস্তু বা কোন অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না।

(৪) এই বেদনা হইতে প্রমাণিত হয় যে আত্মা আপনা-আপনিই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে এবং আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকার ধারণ করে।

এই অংশ পড়িলেই মনে হইবে যে আত্মার বাহিরে কোন বস্তু নাই। আছে কেবল আত্মা ও আত্মার অবস্থা।

সীতানাথবাবু বর্ত্তমানযুগে এই মত প্রচার করিতে যাইতেছেন কিন্তু চিন্তাশীল জ্ঞানবাদিগণ প্রায় সকলেই এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

Edward Caird স্বয়ং এই মতকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন (Evolution of Theology in the Greek Philosophy সপ্তম বক্তৃতা পৃঃ ১৭৩-১৯১; Evolution of Religion পঞ্চম বক্তৃতা পৃঃ ১১৪-১৪৩; Critical Philosophy of Kant. বহুস্থলে)। ইনি নিজের শেষ মত ব্যক্ত করেন ১৯০৩ সালে, Idealism and the Theory of Knowledge নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি পূর্ব্বোক্ত মত সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া অন্যভাবে জ্ঞানবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই মতের বিরুদ্ধে যে কত পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। পাঠকগণ Adamson's Development of Modern Philosophy (Vol i পৃ ১৮৩—২০০ বিশেষভাবে দ্রঃ) Ladd's Philosophy of Knowledge পড়িলে এবিষয়ে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।

(খ)

জগৎবিষয়ে গ্রন্থকারের দ্বিতীয় মত এই :—জগৎ বিষয় এবং আমি বিষয়ী। এ-মত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা জ্ঞানবাদের বিশেষত্ব নহে। Laurie বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া Natural Realism প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; Wardও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহাই Edward Cairdএর জ্ঞানবাদের ভিত্তি।

* সীতানাথ বাবুর বিশ্বাস বৌদ্ধদার্শনিকগণের মতে Sensation =বিজ্ঞান। ইহা সত্য নহে। ইহাদিগের পঞ্চস্কন্ধের নাম এই :— (১) রূপ (২) বেদনা=Sensation (৩) সংজ্ঞা=Perception (৪) সংস্কার (৫) বিজ্ঞান=Conceptual Knowledge.

কিন্তু সীতানাথবাবুর মতের বিশেষত্ব এই যে তিনি মনে করেন 'বিষয়ও আত্মার একটি অবস্থা। ইহাতে 'বিষয়-বিষয়ি-বাদ' মনোবিকার-বাদেই পরিণত হইল।

(৪)

জগৎ ও জ্ঞান।

সীতানাথবাবু বলেন—আমার জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিত করিয়া আমি কোন বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং জ্ঞান হইতে স্বাধীনভাবে কোন বস্তুই থাকিতে পারে না। সুতরাং জগৎ "জ্ঞানাধীন বস্তু; তখন কাজেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে যখন আমরা জগৎকে না জানি তখনও ইহা জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে। তাহা না হইলে ইহার থাকাই ঘটে না (ইং, পৃঃ ২৫; বাং ২৭)।

যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই দাঁড়ায় :—

(ক) আমার জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত না হইলে আমি কোন বস্তুকে জানিতে পারি না।

(খ) সুতরাং কোন বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।

(গ) আমি যখন জগৎকে জানি না তখনও জগৎ বর্ত্তমান থাকে।

(ঘ) জগৎ যখন আছে এবং ইহা যখন জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না তখন বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগতের আশ্রয়ের জন্য এক জ্ঞান আছে। তাহা না হইলে জগৎ থাকিতেই পারে না।

(ক)

'ক' অংশ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। রাম=রাম, নদী=নদী, পশু=পশু ইত্যাদি যে শ্রেণীর বাক্য, এই বাক্যটিও সেই শ্রেণীর। 'জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক হওয়া'র অর্থ 'জানা'; সুতরাং "আমার জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত না হইলে"=আমি না জানিলে। সুতরাং 'ক' অংশের অর্থ "আমি না জানিলে আমি জানিতে পারি না।" এই কথাটাই ভাষার আবরণে নূতন তত্ত্ব বলিয়া বোধ হইতেছিল। গ্রন্থের বহুস্থলে এইপ্রকার উক্তি আছে :—যেমন "জ্ঞানরূপ সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলে জড়কে জানা যায় না" (পৃঃ ২১)=জানা না গেলে জড়কে জানা যায় না।

(খ)

'খ' অংশ বিষয়ে বক্তব্য এই :—

'ক' অংশ হইতে 'খ' অংশ প্রমাণিত হইতে পারে না। 'ক' অংশের অর্থ কি তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। "আমি না জানিলে আমি জানিতে পারি না"—ইহাই যদি ঐ অংশের অর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ অংশ হইতে বস্তুর প্রকৃতি, অস্তিত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তই করা যায় না। সরল ভাষায় ইহার অর্থ "আমি একটা বস্তুকে জানি।" ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে আমি না জানিলে ঐ বস্তু থাকিতে পারে না। আমি না জানিলে ঐ বস্তু আমার নিকটে প্রকাশিত হয় না—ইহা ভিন্ন অন্য সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

বিষয়ের সহিত বিষয়ীর যে সম্বন্ধ তাহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নহে। কোন কোন স্থলে 'কারণ' বিষয়িরূপে এবং 'কার্য্য' বিষয়রূপে প্রকাশিত হইতে পারে কিন্তু বিষয়-বিষয়ীর যে সম্বন্ধ তাহা কার্য্য-কারণ বা আশ্রিত-আশ্রয়ের সম্বন্ধ নহে। Ward এই মত পোষণ করেন (Naturalism and Agnosticism পৃঃ ১১৭) এবং Edward Caird বলেন

The reality of that which is other than the self-conscious intelligence is seen to rest on the same base with that the self-conscious intelligence itself and the

one cannot be denied without the other. (Idealism and the Theory of Knowledge পৃঃ ৪)

আত্মা এবং অনাত্মা একই ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এক অপরে প্রতিষ্ঠিত নহে।

Green একজন জ্ঞানবাদী—লোকে বলে সীতানাথবাবু Greenএর মত অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু এই Green কি বলেন শুনুন :—

To assume, because all reality requires thought to conceive it, therefore thought is the condition of its existence, is indeed unwarranted (Works, Vol iii পৃ ১৪৫).

"জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তু ধারণা করা যায় না সুতরাং জ্ঞানই ঐ বস্তুর আশ্রয়"—এ-প্রকার কল্পনা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

আপাততঃ স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল যে বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ= কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ। ইহাতেও প্রমাণিত হয় না যে "কোন বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।" গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে "কোন বস্তু আমার জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।" যিনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন "কাগজ কলম দোয়াত প্রভৃতি সমুদয়ই আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ," ইং পুঃ পৃ ১৮-১৯ তিনি এই প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন:—"এইরূপে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছি, সমুদয়কেই জ্ঞানরূপী আত্মার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সংবদ্ধ বলিয়া জানিতেছি।"

গ্রন্থকারের যুক্তির ক্রম এই :—প্রথম সিদ্ধান্ত—আমার জ্ঞানগোচর বস্তু আমার জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত।

এই সিদ্ধান্ত হইতে "আমার জ্ঞানগোচর" এবং "আমার"—এই দুইটি অংশ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত করিলেন—

বস্তু জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত। ইহার পর 'সম্পর্কিত' শব্দের অর্থ করিলেন "আশ্রিত"। এই-প্রকার করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন:—বস্তু জ্ঞানের আশ্রিত, বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না।

(গ)

আর এ-বিষয়ে যুক্তি দেওয়াও অনাবশ্যক, কারণ গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে আমাদিগের জন্মের পূর্ব্বেও জগৎ বর্ত্তমান ছিল (বাং পুঃ ৮১; ইং পৃ ৭৯) এবং আমরা না জানিলেও এজগৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে ('গ' দ্রষ্টব্য)।

গ্রন্থকার বলিবেন, যাহাকে আমার জ্ঞান বলি, তাহা কেবল আমার জ্ঞান নহে, তাহা সেই পরমজ্ঞানের ব্যক্তিগত প্রকাশ। কিন্তু আমার জ্ঞান এবং ব্রহ্মের জ্ঞান একই জ্ঞান ইহা কেবল বলিলে চলিবে না, প্রমাণ করা আবশ্যক এতদুভয় একই। Greenও এই আপত্তিই করিয়াছেন (Works, Vol iii পৃঃ ১৪৩)।

(ঘ)

'ঘ' অংশ-বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই :—

গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে 'জগৎ আমার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত'। 'জগৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত' ইহা প্রমাণ করা ত দূরের কথা। তবুও কল্পনা করিয়া লওয়া যাউক তিনি প্রমাণ করিয়াছেন "জগৎ আমার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত।" ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি না জানিলেও জগৎ বর্ত্তমান থাকিবে—ইহা প্রমাণিত হইতে পারে না। ইহাও কল্পনা করিয়া লওয়া যাউক "আমার জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়াও জগৎ আছে।" তবে আমি জানি বা না জানি জগৎ আছেই। জগৎ যখন জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া রহিয়াছেই, তখন ইহার অস্তিত্বের জন্য একটি লোকাতীত জ্ঞানের কল্পনা কেন?

সীতানাথবাবু যাহা বলেন তাহা হইতে অনেক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

আমার জানার উপরেই যদি বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে তাহা হইলে বলিতে হইবে—আমার আত্মার যে-টুকু এখন আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছে—কেবল সেই-টুকুরই অস্তিত্ব আছে আর যাহা কিছু এখন জ্ঞানের সম্মুখে আসিতেছে না তাহার অস্তিত্বই নাই। অর্থাৎ আত্মার অধিকাংশই অস্তিত্ববিহীন (Moore, The Refutation of Idealism, Mind Oct. 1903),

"বস্তু জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত" ইহা দ্বারা যদি প্রমাণ হয় যে বস্তু জ্ঞানের অধীন, তাহা হইলে ইহাই বা প্রমাণিত হইবে না কেন যে

আত্মা বস্তুর অধীন—

কারণ গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে Self-consciousness is impossible without object-consciousness. অর্থাৎ বিষয়কে না জানিলে আত্মাকে জানা যায় না। এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হইবেই যে আত্মা বা জ্ঞান জগতের উপরে নির্ভর করে, জগৎ ছাড়া আত্মার বা জ্ঞানের স্বাধীন সত্তা নাই।

জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিত করিয়া কোন বস্তুর বিষয় ভাবা যায় না, —ইহাতে যদি প্রমাণিত হয় যে বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না এবং বস্তু জ্ঞানের অধীন, তাহা হইলে যখন বলা হইতেছে বস্তুর সহিত অসম্পর্কিত করিয়া আত্মার বিষয় জানা যায় না তখন ইহা কেন প্রমাণিত হইবে না যে আত্মা বস্তু ছাড়া থাকিতে পারে না এবং আত্মা বস্তুর অধীন।

John Cairdএর Introduction to the Philosophy of Religion নামক গ্রন্থের কথা অনেকেই জানেন। Green এই গ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছেন—"Cairdএর মতে এই জগৎ-জ্ঞানই এবং আমাদিগের জ্ঞানক্রিয়া সেই আসল জ্ঞানেরই প্রতিবিম্ব; সেই জ্ঞানই এই সীমাবিশিষ্ট জীব-প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এ মত সংস্থাপন-বিষয়ে Caird সফলকাম হয়েন নাই, সুতরাং কেহই সফলকাম হইতে পারে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইহা সংস্থাপন করা না যাইবে সে পর্য্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—আমরা আমাদিগের জ্ঞানবাদকে ব্রহ্মবাদ-রূপে প্রমাণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন, ইহা ব্রহ্মবাদ না হইয়া Subjective Idealism রূপেই থাকিয়া যাইবে। (Our idealism, though we may wish it to be 'absolute' remains merely "subjective")। পাঠকগণ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিবে "যে-জ্ঞান সবই করিতে পারে এবং সবই হইতে পারে সে জ্ঞানটা কি বস্তু?" কিন্তু ইহার প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইতেছে না; কেবল বলা হইতেছে 'বিচার করিয়া দেখ মন কিরূপে কোন্ বিষয় ধারণা করিতে পারে এবং কোন্ বিষয় ধারণা করিতে পারে না।' মানব কোন্ বিষয় ধারণা করিতে পারে বা পারে না এ বিচার করিয়া যে ঈশ্বরতত্ত্ব এবং জগৎতত্ত্ব অবধারণ করা যায় ইহা কেহ বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাস না করাই যুক্তিযুক্ত" (Works, vol iii পৃ ১৪৩)।

Green কেয়ার্ডের গ্রন্থবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, সীতানাথ বাবুর গ্রন্থবিষয়েও আমরা তাহাই বলি। এই গ্রন্থের পাঠকগণও পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিবেন—"যে জ্ঞান সবই করিতে পারে এবং সবই হইতে পারে, সে জ্ঞান বস্তুটা কি?" মানবজ্ঞান যে সেই ব্রহ্মের জ্ঞানেরই প্রতিবিম্ব ইহা Cairdও প্রমাণিত করিতে পারেন নাই, সীতানাথ

বাবুও পারেন নাই। Cairdএর গ্রন্থে Subjective Idealism আছে, কিন্তু সীতানাথ বাবুর গ্রন্থে ইহা অতিরিক্ত মাত্রায়।

(৫)

দেশকালাদি বিষয়ে সীতানাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রাচীন যুগের কথা। এ যুগের মত জানিতে হইলে Non-Euclidean Geometryর তত্ত্ব জানা আবশ্যক। প্রাচীনমত কি-প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, তাহা যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি Poincareএর Science and Method নামক গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন (The Relativity of Space পৃঃ ৯৩—১১৬)।

পরিশিষ্টে Bradley এবং Jamesএর মতামত বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অংশে সীতানাথ বাবু সত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। তিনি Bradleyকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যেন তিনি একজন খাঁটী ব্রহ্মবাদী (Spiritual Monist)। সীতানাথ বাবুর বিশ্বাস ব্র্যাডলির Absoluteকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলা যাইতে পারে। এই Absoluteকে 'সৎ' বলা যায়, কারণ Bradley ইহাকে Reality বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাকে 'চিৎ' বলা যায় না। 'চিৎ' বলিলেই Consciousness বুঝায়, কিন্তু ব্র্যাড্‌লির Absolute = Experience। এই Experience শব্দের অর্থ অনুভূতি। ব্র্যাড্‌লি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে Experience এবং Consciousness এক বস্তু নহে। 'চিৎ' মৌলিক বস্তু নহে, অনুভূতিই মৌলিক বস্তু। কেহ কেহ বলিতে পারেন চিৎ = Self-consciousness। ব্র্যাড্‌লি বলেন এই Self-consciousness এবং Consciousness এতদুভয়ও এক নহে। সুতরাং কোন অর্থেই Absoluteকে 'চিৎ' বলা যায় না। ব্র্যাড্‌লির ব্রহ্মকে আনন্দও বলা যায় না। তিনি বলেন জগতে সুখও আছে দুঃখও আছে কিন্তু সুখের পরিমাণই বেশী। সুখ দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি করিলেও কিছু সুখ অবশিষ্ট থাকে। Absolute কোন উপায়ে এই অতি অতিরিক্ত সুখটুকু উপভোগ করেন। কিন্তু ইহার মধ্যে অপর ভাবও আছে; হইতে পারে এজন্য Absolute হয়ত সুখ অনুভবও করেন না। (Appearance and Reality পৃঃ ৫৩৪)। এইপ্রকার Absoluteকে কখন আনন্দস্বরূপ বলা যায়?

সীতানাথ বাবু ব্র্যাডলির Absoluteকে এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহাতে লোকে বুঝিবে যে ব্র্যাডলির Absolute এবং God একই বস্তু। কিন্তু ইহার মতে এই দুই এক নহে। কেবল যে Truth and Reality নামক গ্রন্থেই এই মত প্রকটিত হইয়াছে তাহা নহে, Appearance and Reality নামক গ্রন্থেরও এই মত। এই God একটি সীমাবিশিষ্ট সত্ত্বা, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। কেবল ধর্ম্মজগতেই ইহার আবশ্যকতা। তোমার আমার যেমন ব্যক্তিত্ব (Personality) আছে, Godএরও তেমনি ব্যক্তিত্ব আছে। তবে কিনা God এত বড় যে তাঁহার সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

সীতানাথ বাবু Jamesএর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। লোকটা যেন নাস্তিক, পড়াশুনাটা বড়ই কম এবং overweening self-confidenceটা বড়ই বেশী। কিন্তু এই-সমুদয় কটূক্তির কোন অর্থ নাই। James নাস্তিক নহেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; তবে তাঁহার মতে Adsolute এবং ঈশ্বর এক নহে। Absoluteএর মধ্যে পাপ-তাপাদি আছে; এই পাপ-তাপাদি বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই ঈশ্বর। অর্থাৎ Absolute = God + পাপ-তাপাদি। James বলেন ঈশ্বর ও মানব একই উপাদানে গঠিত (Pluralistic U. পৃ ৩৪) এবং মানব ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ (পৃঃ ৩১৮)। জেমস্ নানাত্ববাদী, ভারতীয় ভাষায় দ্বৈতবাদী; কিন্তু এই দ্বৈতবাদ অদ্বৈতমূলক। তাঁহাকে Pluralistic Pantheist বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম (Spiritualism) দুই ভাগে বিভক্ত:—

(১) More Intitmate species

(২) Less Intimate species (যাহা খৃষ্টানাদি প্রচলিত ধর্ম্ম)।

প্রথমটি আবার দুইভাগে বিভক্ত

(ক) More Monistic (খ) More Pluralistic। এই দুইটিকেই James Pantheistic field of vision বলিয়াছেন (P. U. পৃ 30 দ্রঃ)।

Jamesএর বিভাগ এই:—

- Spiritualism
  - More Intimate
    - More Monistic
    - More Pluralistic (জেম্‌সের মত)
  - Less Intimate (খাঁটি দ্বৈত)

তাঁহার উক্তি কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

The philosophy of the absolute agrees with the pluralistic philosophy, in that both identify human substance with the divine substance (ঈশ্বর ও মানব এক উপাদানে গঠিত)। (P. U. পৃ ৩৪)।

We are indeed the internal parts of God and not external creations on any possible reading of the pan-psychic system (P. U. পৃ ৩১৮)।

The absolute is only the wider cosmic whole of which our God is but the most ideal portion. The finite God whom I contrast with it may conceivably have almost nothing outside himself; he already have triumphed over and absorbed all but the minutest fraction of the Universe; but that fraction, however small, reduces him to the status of a relative being, and in principle the universe is saved from all the irrationalities incidental to absolutism. (পৃ ১২৫—১২৬)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে James একজন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী।

Absoluteএর মধ্যে পাপ-তাপাদি আছে, কিন্তু ঈশ্বরে পাপ-তাপাদি নাই। পাপতাপাদি ঈশ্বরের বাহিরে। তাঁহার বাহিরে যখন কিছু আছে তখন ঈশ্বরকে সীমাবিশিষ্টই বলিতে হইবে। James স্বীকার করেন যে জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ; জীব ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ। Bradleyএর মতে ঈশ্বরের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু Jamesএর ঈশ্বর পারমার্থিক ভাবে সত্য।

Jamesএর মত বিষয়ে সীতানাথ বাবু একটি ভুল করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বিশ্বাস Pragmatism এবং Radical Empiricism একই জিনিষ (ইং পুঃ পৃ ২৪৭)। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। James স্বয়ং বলিয়াছেন:—

To avoid mis-understanding at least, let me say that there is no logical connexion between pragmatism,

as I understand it and a doctrine which I have recently set forth as "radical empiricism."

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অধিক মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক—আর সময়ও নাই, স্থানেরও অভাব। এই স্থানেই উপসংহার করা যাউক।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা

হিমালয়ে আরোহণ করিয়া তাহার শিখরে শিখরে ভ্রমণ অনেকেই করে; হিমালয়ের শোভা দেখিয়া আনন্দ পায়; তথাকার নির্ম্মল শীতল বায়ু সেবন করিয়া স্ফূর্ত্তি লাভ করে। কিন্তু ভ্রমণের বৃত্তান্ত সকলে লিখিতে পারে না, আনন্দের বর্ণনা সকলে করিতে পারে না, কেন আনন্দ হইল তাহাও বলিতে পারে না। কিন্তু আনন্দ লাভের কথা সকলেই বলিতে পারে; সকলেই বলিতে পারে, হিমালয় ভ্রমণ করিয়া উপকৃত হইয়াছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে জীবনচরিত * শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, আমার অন্তরাত্মার পক্ষে তাহা হিমালয়ভ্রমণের মত আনন্দদায়ক ও বলবিধায়ক হইয়াছে; যদিও মহর্ষি-চরিতের শিখরে শিখরে ভ্রমণের বৃত্তান্ত লেখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য, যদিও আমি কেমন আনন্দ পাইয়াছি, কেন আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলা আমার পক্ষে কঠিন। ইহার এক কারণ, অনভ্যাস; আর এক কারণ যোগ্যতার অভাব। তাহার উপর আবার আর এক বিঘ্ন, নানা ছোট বড় ব্যাপারের চিন্তায় মনের অতিব্যস্ততা ও অনবসর। মহর্ষির জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে মনটাকে যথেষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া যাইতে হয়। ইহা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছে। রবিবাবু যৌবনে এক সময় "সপ্তাহ" নামে একখানা খবরের কাগজ বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। তাহা বাহির হয় নাই। সেই উপলক্ষ্যে তিনি ১৮৮৭ সালে এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"মাভৈঃ মাভৈঃ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আসবে, কিন্তু 'সপ্তাহ' আর বের হবে না। অতএব বন্ধুবান্ধবেরা সকলে নিশ্চিন্ত হোন। ভেবে দেখুন কি করতে বসেছিলুম! 'সপ্তাহ' বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ কর্ত্তে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাতটা দিন করে পাই, তখন সপ্তাহে সাতটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আসত—কিন্তু সপ্তাহ নেই; দিনগুলো আমাকে লাঠি হাতে তাড়া করে বেড়াত। আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ভেবে পেতুম না।"—ছিন্নপত্র, ১১ পৃষ্ঠা।

আমি যদিও 'সপ্তাহ' বাহির করি নাই, কিন্তু দুখানা মাসিক চালাই। অথবা, সত্য কথা বলিতে গেলে, তাহারাই আমাকে চালায়। একখানা আমাকে ১৫ দিন তাড়া করে, বাকী ১৫ দিন আর-একখানা আমার পশ্চাদ্ধাবন করে। ফলে মনটা সুস্থির শান্ত হইতে পায় না।

যাদের ইস্কুলে বা আফিসে যাইতে হয় না, তারা খাদ্যের রস গ্রহণ করিবার, তাহা সম্ভোগ করিবার, অবসর পায়। কিন্তু যাহাদিগকে তাড়াতাড়ি ইস্কুলে আফিসে যাইতে হয়, তাহারা নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়া কোন-প্রকারে আহার সারিয়া লয়। অতিব্যস্ত মানুষও তেমনি সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে, তাহা সম্ভোগ করিতে, এবং অপরকে তাহার অংশ দিতে, পারে না; তাহার পড়া, কোন প্রকারে কাজ চালাইবার মত কিছু তথ্য তত্ত্ব ও খবর সংগ্রহ করিবার জন্য।

মহর্ষির জীবনচরিত আমি আদ্যোপান্ত আগ্রহ ও আনন্দের সহিত পড়িয়াছি; কোন-কোন স্থান দু-তিনবার পড়িয়াছি। কিন্তু সমগ্র জিনিষটির একটি ছবি মনের মধ্যে আঁকিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিবার মত অবসর আমি পাই নাই। অজিতবাবু যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহার কোন্‌খানটি উজ্জ্বল হইয়াছে, কোন্‌খানটি অস্পষ্ট হইয়াছে, ছবিখানির সৌন্দর্য্য কোথায়, দোষত্রুটি কি আছে না আছে, এ-সবও বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু গ্রন্থখানি হইতে নানা বিষয় জানিতে পারিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রধান একটি জিনিষ মহর্ষির স্বাদেশিকতা।

রবিবাবু "জীবনস্মৃতি"তে লিখিয়াছেন :—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থির দৃষ্টিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা ও দেশের ভাব

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান প্রেস্, এলাহাবাদ, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।"

প্রাচীন কালের কথা ছাড়িয়া দিয়া ইংরেজশাসনের যুগের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে, রামমোহন রায় এদেশে সকল বিষয়ে স্বাদেশিকতার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু তাঁহাকে শুধু স্বাদেশিকতার প্রবর্ত্তক বলিলে তাঁহাকে ছোট করিয়া দেখান হয়। অজিতবাবু সত্যই বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারায় পুরাতনের অনেক প্রাণ-হীন বালুকারাশি বাঁধ বাঁধিয়া তাহার স্রোত বন্ধ করিয়াছিল। বিশ্বের জোয়ারভাটা আর তাহাতে খেলিতেছিল না। এ-যুগে যে সে-সকল বাঁধ ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহার কারণ।......... পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে আনিবার জন্য রামমোহন রায়ের মত কেহই লড়ে নাই; আবার হিন্দু সভ্যতার সার ধন যে তাহার ব্রহ্ম জ্ঞান—সর্ব্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহা দেখাইবার জন্যও কেহই অমনতর পরিশ্রম করে নাই।" দেবেন্দ্রনাথের জীবনের চেষ্টা রামমোহনের মত এত বহুবিষয়িণী ছিল না বটে; কিন্তু যে-যে বিষয়ে তাঁহার শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, সকলগুলিতেই তাঁহার স্বাদেশিকতা পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছিল। কয়েক বৎসর হইতে আজ পর্য্যন্ত কোথাও বা স্বাদেশিকতার প্রকৃত আদর, কোথাও বা উহার হুজুক চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রকৃত স্বাদেশিকতার প্রয়োজন খুবই রহিয়াছে। এই খাঁটি স্বাদেশিকতাটি কি, এবং কি সূত্রে কেমন করিয়া উহা বাংলাদেশে আসিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত এবং দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত পড়িতে হইবে।

এই খাঁটি-স্বাদেশিকতা জানে, যে, "দেশকালের মধ্যেই দেশকালাতীতের প্রকাশ আছে।" এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে সার্ব্বজনীনতার কোনো বিরোধ নাই। রামমোহনের মত দেবেন্দ্রনাথ—

"অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বভৌমিক হইয়াও জাতীয় ভাব ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার সমাজকে তিনি হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, 'স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্ব্বজাতিকে এবং সর্ব্ব-জাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়', 'আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।'"

নবযুগের প্রবর্ত্তক রামমোহনের ভিতর হইতে যে যুগভাবটি ফুটিয়া উঠে, অজিতবাবু তাহার দুটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়টি এই:—

"জাতীয় ভাবে সার্ব্বজনীন বা সার্ব্বজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে। ধর্ম্ম যেমন দেশকালের অতীত, তেমনি দেশকালের ভিতর দিয়া ইতিহাসের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ। ধর্ম্ম স্বরূপতঃ সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু ইতিহাসের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়া ধর্ম্ম ক্রমাগতই নানা অবস্থার ভিতর দিয়া আপনার সার্ব্বভৌমিক স্বরূপটিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধর্ম্মের ভিতরে যেমন এই চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, সমাজের ভিতরেও তেমনি এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়; কারণ ধর্ম্মে ও সমাজে অবিচ্ছেদ্য যোগ। দেশকালের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বা সমাজ আকাশকুসুম মাত্র; আবার যে ধর্ম্মে বা সমাজে সার্ব্বজনীনতার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ ও প্রাণহীন।"

ধর্ম্মে দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা বুঝিতে হইলে এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে।

"তাঁহার জীবনের ইতিহাস, বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে, ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয় ভাবে সার্ব্বজনীন এবং সার্ব্বজনীনভাবে জাতীয় হওয়ার আদর্শকে সমাজে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার নানা-বিধ কর্ম্মচেষ্টার ইতিহাস।"

দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতার একটি পরিচয় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপনে পাওয়া যায়।

"ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুসমাজকে ভাঙিবার জন্য যে তুমুল আন্দোলনের সূত্রপাত হইল, যে ভয়ঙ্কর স্বজাতিবিদ্বেষ তাহাদের মনকে অধিকার করিল, তাহার ফলে দলে দলে শিক্ষিত যুবকেরা খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বালক উমেশ সরকারকে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত মিশনরীরা আশ্রয় দেওয়ায়, তাহার পিতা তাহাদিগকে ছাড়াইয়া আনিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করে; কিন্তু ডাফ সাহেব তাহাদিগকে কোনো মতে ছাড়িলেন না। এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুগণ খৃষ্টান ধর্ম্মের এই বিপ্লবের স্রোতকে বাঁধ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়া কলিকাতার ধনীদের সাহায্যে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় নামে এক স্কুল স্থাপন করেন। হিন্দুবালকেরা যাহাতে খৃষ্টানদের স্কুলে পড়িয়া তাহাদের শিক্ষায় সমাজভ্রষ্ট না হয়, সেইজন্য এই উদ্যোগ।" কেননা, "রামমোহন রায়ের মত তিনি বিশ্বাস করিতেন যে-সমাজের অভিব্যক্তির মধ্যে যে সকল রীতিনীতি, আচার ব্যবহার বহুকাল হইতে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চিত্তগত রূপ ধরা পড়িয়াছে। যদি কোন সামাজিক রীতিনীতিকে সংস্কার করিতে হয়, তবে জাতীয় সেই চিত্তটিকে আগে ভাল করিয়া বুঝিয়া পরে তাহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া সংস্কার করিতে হইবে—এক কথায়, জাতীয় ভাবে সংস্কার করিতে হইবে।"

"রামমোহনের মত দেবেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসভ্যতার ধারার মধ্যে একালের প্রয়োজন অনুসারে দেখা দিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রহ্মসমাজ, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজেরই একটি স্বাভাবিক বিশ্বজনীন বিকাশ। তিনি বলিতেছেন, 'আমরা কিছু নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি না।......চিরকাল হইতে যে ধর্ম্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।' অবশ্য এদেশের ইতিহাসের ধারায় যে ধর্ম্ম উন্নত হইয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহারি কথা এখানে তিনি বলিতেছেন। হিন্দুসমাজের পরে তাঁহার একটি গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই কোন অন্যায় আচার বা কুপ্রথা, কোন ভ্রান্ত ধর্ম্মবিশ্বাস যে চিরকাল হিন্দুজাতির নিত্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে, একথা তিনি প্রাণপণে সমস্ত অন্তরের সহিত অস্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার সমাজসংস্কারের আদর্শ ছিল—'হিন্দুপ্রথা হিন্দুরীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে,' এবং 'হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দুরীতিনীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে।'"

দেবেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কোন পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেন নাই; এ-বিষয়ে রামমোহনের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের প্রভেদ ছিল। কিন্তু আর-সমস্ত বিষয়ে তিনি স্বাজাতিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক বলিতেছেন:—

"দেবেন্দ্রনাথ স্বাজাতিকতার আন্দোলনের জন্মদাতা, একথা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। ভাষা, পোষাকপরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার সকল বিষয়েই তিনি দেশী প্রথার অনুবর্ত্তী। এই জন্যই দেশীয় সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, অনুষ্ঠান, ধর্ম্মাচরণ সমস্তকেই তিনি নবজীবন দান করিয়াছেন। কোন সাহেবের সঙ্গে পারতপক্ষে তিনি দেখাসাক্ষাৎ করিতে চাহিতেন না। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, "মিস্ মেরী কার্পেণ্টার যখন কলিকাতায় আসেন তখন দেবেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে অভিলাষের কথা শুনিয়া তিনি তাঁহার জমিদারীর নিকটস্থিত কুষ্টিয়া উপনগরে পলাইয়া যান। দেবেন্দ্রবাবু স্বভাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে অনিচ্ছুক। যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার মতের মিল হয় না। ইংরাজের মতানুমোদন করিয়া চলিলে ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজদিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। কৃষ্ণনগর কালেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যাল লব (Lobb) সাহেব কোন সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, "The proud old man does not condescend to accept the praise of Europeans." দেবেন্দ্র বাবু ইংরাজের তোষামোদ করিয়া চলিলে এতদিন তিনি মহারাজা K. C. S. I. হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না।"

স্বজাতির সম্মান মহর্ষি সর্ব্বদা চাহিতেন। অজিত বাবুর পুস্তকে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের লিখিত আখ্যানমালায় ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

"লর্ড রিপন আমাদের আপিসে গিয়া আমার সহিত কথা কহিয়াছেন ও আমার প্রশংসা হইয়াছে শুনিয়া মহর্ষির কত আনন্দ। তিনি বলিলেন, গণিতে তোমার নবাবিষ্কৃত সিদ্ধান্ত-সকল তোমার নামে মুদ্রিত হয় নাই; তাহার প্রতিকারের জন্য কেন আন্দোলন করিতেছ না। আমি বিনীতভাবে অবনত মস্তকে উত্তর দিলাম, এক ভগবানেরই সকল সত্য; সম্মানপ্রয়াসী হইলে শান্তির আশা ছাড়িতে হয় এবং ভবিষ্যতে সত্যানন্দ ছাড়িয়া মন সর্ব্বদা সম্মানের জন্য লালায়িত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। (বলিয়াই তখনই বুঝিতে পারিলাম মহর্ষির কাছে এইরূপ কথা কহা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই)। শুনিয়া মহর্ষি কহিলেন, তুমি কালীমোহন মনে করিয়া আমি বলি নাই। আমাদের জাতির সম্মানের প্রতি কেন চাহিবে না।"

কুমারী কলেট তাঁহার লিখিত রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে বলিয়াছেন,

Rammohun stands in history as the living bridge over which India marches from her unmeasured past to her incalculable future; "ইতিহাসে রামমোহন সেই জীবন্ত সেতুর মত যাহার সাহায্যে ভারতবর্ষ তাঁহার অমিত অতীত হইতে তাঁহার অপরিমেয় ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিতেছেন।" "He was the arch which spanned the gulf that yawned between ancient caste and modern humanity;" তিনি সেই খিলান যাহার দ্বারা প্রাচীন জাতিভেদ ও আধুনিক বিশ্বমানবের মধ্যস্থ গভীর বারিরাশি লঙ্ঘিত হইয়াছে।"

অজিতবাবু দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই-প্রকারের কথা বলিয়াছেন:—

"দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে বেশ বড় রকমেরই কারবার করিয়াছেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দুই সভ্যতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের সাধনার যে দুই ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সন্ধিস্থানটি তিনি নিজের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্রের মাঝখানে মরুবালুর ব্যবধান যেমন সুয়েজখালের উদ্ভাবয়িতা দূর করিয়া দিয়াছেন এবং যাতায়াতের পথকে সহজ করিয়াছেন, তেমনি এযুগে বাংলাদেশে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ ভিন্ন (অবশ্য জীবিত মহাত্মাগণ বাদে) বোধ হয় আর কারো নাম করা যায় না, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সাধনা-সমুদ্রের পরস্পরের ব্যবধান যাঁহাদের দ্বারা দূর হইয়াছে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথ শুধু কারবার করিয়াছেন বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়। তিনি এ যুগের সন্ধিস্থানটি বাহির করিয়াছেন এবং আমাদের জন্য সেখানে এক নূতন প্রতিষ্ঠাভূমি তৈরি করিয়াছেন।"

তাঁহার স্বাজাতিকতা ও স্বাদেশিকতা স্পষ্টতর করিবার জন্য অজিতবাবুর গ্রন্থখানি হইতে আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু আমি, তাঁহার "শ্রাদ্ধ-বাসরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন," অতঃপর শুধু তাহাই গ্রন্থখানি হইতে তুলিয়া দিয়া নিবৃত্ত হইতেছি।

"এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজী শিক্ষার উদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া......আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, ...অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব।"

ধর্মপ্রচারক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা কেবল দেশানুরাগের ফল নহে; তাহা মানবপ্রকৃতির এবং মানবসভ্যতাবিবর্তনের প্রণালীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল অসভ্য দেশের নিজস্ব কোন আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ধর্মনীতি সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল আকার ধারণ করে নাই, তথায় বিদেশী সভ্যতা, বিদেশী ধর্ম, বিদেশী নীতি, হয় ত শাখাপল্লবসমেত আমূল প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু তাহা করিলেও, কালক্রমে একই জিনিষ দেশ ও জাতি ভেদে নানা রূপ ধারণ করে। বিদেশী খৃষ্টীয় ধর্ম নানা দেশে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু রুশিয়া, জার্মেনী, ইতালী, ইংলণ্ড, সীরিয়া, দক্ষিণভারত, প্রভৃতির খৃষ্টধর্মের মধ্যে খুব প্রভেদ আছে।

যে-দেশ দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তায় অগ্রসর হইয়াছে, সেখানে নূতন ধর্মপ্রচার করিতে হইলে নূতনকে পুরাতনেরই বিকাশ বা বিবর্তন, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অতীতেরই অনুবৃত্তি রূপে সত্যই উপলব্ধি করিয়া সেইভাবে প্রচার করা আবশ্যক। তাহা করিলে প্রচারেও সিদ্ধি লাভ করা যায়, ফলও ভাল হয়। প্রাচীন সভ্যতা ও প্রাচীন চিন্তা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া তাহার জায়গায় নূতন বিদেশী কিছু আঁকিতে যাওয়া বৃথা। খৃষ্টধর্ম প্রচারের ইতিহাস হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংরেজ ও জার্মেনদের পূর্বপুরুষ অসভ্য টিউটনিক জাতিদের নিকট খৃষ্টধর্ম যেভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রীকদর্শনের নবোন্মেষে আলোকিত আলেক্জান্দ্রিয়ায় সে-রীতি অবলম্বিত হয় নাই। সেখানে খৃষ্টকে Logos বা জ্ঞানরূপী ব্রহ্মের আকারে উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। এ-বিষয়ে বষ্টনের ক্রিশ্চিয়ান্ রেজিষ্টার পত্র হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

When Christian missionaries came to the Teutonic peoples, they expected these barbarians utterly to abandon their crude inheritance of ideas and adopt the whole background of thought that belonged to the Christian Church. Our English forefathers dropped—or were expected to drop—the whole content of their pagan memories and substitute an historical content and explanation of the world that were entirely new to them. They were to project their life on a background of Jewish history and look back to Hebrew patriarchs and prophets and Christian apostles and martyrs. They were but children asked to put away childish things and submit to the developed system of ethical and religious history that belonged to the Mediterranean civilization. That is one way.

It was not in that way that the Christian preaching from Palestine won command of the Mediterranean world itself. The typical instance may be found in Alexandria. The missionaries found there a highly elaborated civilization, where reason had established ethical ideals and speculative conceptions of the nature of the world and its relation to a divine cause. The missionary brought and besought discipleship to Jesus as preacher of the righteousness which is service of the one only God. Only on one condition could the dominant intelligence of this seat of culture enter into the discipleship of Jesus. The condition was that Jesus must express the ideal contents of their own past. To call him Jewish Messiah meant little. It was necessary to see in him the voice of the divine reason or Logos—the author and sustainer of all the higher spirituality of the Hellenic civilization; and it was necessary to conduct this argument with the fullest use of all the resources of culture. The work was done in what we should call a theological school affiliated with a university. The work essentially was to exhibit the religion of Jesus as the inner meaning and outcome of the background of Hellenic culture. The missionaries made a rational conquest of a rich and established civilization.

The proposal of Don Romolo Murri is that Unitarianism shall meet the Catholicity that is intrenched in Rome and is intellectually stagnant in a mediæval form,—meet it in the arena of thought, analysis, interpretation, and gain a rational victory over it. It would be a victory that would carry on what is noble in Catholicism,—its passion for universality, for the spiritual unity of mankind, its passion, too, for saintly and heroic spirituality of life and soul. It is inconceivable that such a mission should proceed on the lines of Augustine's mission to Kent. The analogy must be that of the Alexandrian school. Don Romolo Murri shows the highest sagacity in advocating a theological university in Rome in the cause of Unitarianism. F. A. C.

আলোচনা

মীরাবাঈ।

গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মন্মথ-মথন সরকার ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয়দ্বয় সংলিখিত "মীরাবাঈ" শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধের যে-সকল ত্রুটী ও ভ্রম নির্দেশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা উভয়েই আমার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মীরাবাঈএর জীবন-কথা বিবৃত করিতে হইলে প্রধানতঃ "ভক্তমাল" গ্রন্থকে অবলম্বন করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। "ভক্তমাল" ভারতীয় নানাপ্রদেশের ভক্তগণের জীবনেতিহাসের সমষ্টি। অসংখ্য সাধু-ভক্তের চরিত-কথা ইহাতে সংক্ষেপে অথবা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নাভাজী ভক্তমালের আদি রচয়িতা বলিয়া শুনা যায়। এই গ্রন্থ তিনি হিন্দীভাষায় গদ্যে অথবা পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। নাভাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে (বিক্রম সম্বৎ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১৭২০ সম্বতে তিনি দেহত্যাগ করেন। নাভাজীর পর ভক্তমাল নানাভাষায় নানাপ্রকারে রচিত হইয়াছে। ভাষান্তরিত হইবার সময়ে দেশ-কাল-পাত্রভেদে মূলের সহিত ইহার পার্থক্য ঘটা কিছুই অসম্ভব নহে। অধুনা হিন্দী ভাষাতে গদ্যে এবং পদ্যে ইহার ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুবিধ সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়। একখানি প্রাচীন হিন্দী ভক্তমাল হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—

"রূপকী নিকাঈ ভূপ আকবর ভাঈ হিয়ে।
লিয়ে সঙ্গ তানসেন দেখিবে কো আয়ো হৈ।
নিরখি নিহাল ভয়ো ছবি গিরধারীলাল।
পদমুখজাল এক তব হি চঢ়ায়ো হৈ।"

যে পুঁথিখানি হইতে ইহা উদ্ধৃত করা হইল, তাহা অতিজীর্ণাবস্থায় আমার হস্তগত হইয়াছে। পুঁথিখানি হস্তলিখিত এবং বহু পুরাতন। ইহার শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—১৭৬৯ সম্বতের ফাল্গুনমাসে ইহা আর-একখানি পুঁথি হইতে নকল করা হইয়াছিল। সে পুঁথিখানি নাকি স্বয়ং নাভাজী স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন, বয়সের মর্য্যাদা যদি কিছু থাকে, তবে ইহার কথাও একেবারে উপেক্ষা করিবার নহে; বেঙ্কটেশ্বর-প্রেস-বম্বে হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ভক্তমাল গ্রন্থে আছে,—

"এবমেকদিনে দিল্লীশ্বরো ম্লেচ্ছঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
শ্রুত্বা মীরাযশো দ্রষ্টুম্ তেন সৈন্যেন সংগতঃ।"

বৃন্দাবনে আসিয়া মীরাবাঈ গোঁসাইজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার বাসনা করিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পুঁথিতে আছে,—

"বৃন্দাবন আঈ শ্রীগোঁসাইজীসে ঝিলিমিলি।
তিয়া মুখ দেখিবে কো পণ নৈ ছুটায়ো হৈ।"

গোঁসাইজীর নাম এখানে স্পষ্ট জানা গেল না। কিন্তু সংস্কৃত ভক্তমালে আছে,—

"একদা সা গতা মীরা বৃন্দাবনমনুত্তমম।
জীবগোস্বামিবৃত্তান্তম্ শুশ্রাব জনবক্ত্রতঃ।
আবাল্যব্রহ্মচর্য্যেণ স্ত্রীমুখং নৈব পশ্যতি।
ইতি জ্ঞাত্বা যযৌ মীরা তম্ দ্রষ্টুম্ ভক্তসত্তমম্।"

ইহা ব্যতীত যাবতীয় হিন্দী ভক্তমালে জীব গোস্বামীর নামই দেখিতে পাওয়া যায়। রূপগোস্বামীর কোথাও উল্লেখ নাই।

মীরাবাঈএর জন্মস্থান মেরতা গ্রাম বলিয়া ভক্তমালে উল্লেখ আছে। কিন্তু মেরতাকে ঠিক গ্রাম বলা চলে না। উহা যোধপুরের অন্তর্গত একটি পরগণা। ঐ স্থানের নামানুযায়ী এতদঞ্চলের রাঠোরগণকে "মেরতিয়া-রাঠোর" বলা হইয়া থাকে। কুড়কী ঐ মেরতার অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামটি মীরার মাতামহ দুদাজী তাঁহার জামাতা রতন সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই কুড়কী গ্রামেই মীরাবাঈএর জন্ম।

অধুনা বহুভাষায় প্রচলিত বহুবিধ ভক্তমালের মধ্যে কোন্‌টির কতখানি বিশ্বাসযোগ্য এবং কোন্‌টিই বা নহে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, তাহার কথা বোধ হয় তত অধিক বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভক্তমালের অনুযায়ী সম্রাট আকবরের সহিত মীরার যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং মীরা যে সাধু তুলসীদাসের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ইঁহাদের পত্র দুইখানির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু, ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব সন্দেহ নাই।

ফলতঃ, ভক্তমালের মুখ্যতা স্বীকার করিতে গেলে পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশগুলি আমার পক্ষ সমর্থন করিবে; কিন্তু ইতিহাসকে ধরিতে গেলে উহা বিপক্ষে দাঁড়াইবে। এ এক বিষম সমস্যা।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম।

পুস্তকপরিচয়

কর্ম্মযোগের টীকা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক চেরীপ্রেস লিমিটেড, ২৫১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৫ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট বাঁধা। মূল্য এক টাকা।

ছোটগল্পের বই। নিম্নলিখিত বারোটি গল্প এই বই-এ সংগৃহীত হইয়াছে—(১) কর্ম্মযোগের টীকা, (২) দীক্ষা, (৩) গোলাপজাম, (৪) পিয়াসী, (৫) আত্মহত্যা, (৬) আনন্দ-পর্য্যটন, (৭) ঢ্রিটেক-টিভের স্ত্রীলাভ, (৮) মুস্কিল আসান, (৯) পূজার আসর, (১০) মল্লার স্বয়ম্বর, (১১) দীর্ঘনিশ্বাস, (১২) আনন্দলাড়ু।

যাঁহারা বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা তাঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রবাবু একজন প্রধান। যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন তাঁহারা জানেন এই লেখকের গল্পগুলি কেমন উপাদেয়। ইনি লেখেন কম এবং যে কাগজে লিখিতেন তাহার প্রচার অনিয়মিত ও প্রসার অল্প হইয়া পড়াতে আজ-কালকার পাঠকেরা এমন একজন ওস্তাদ শিল্পীকে ভুলিতে বসিয়াছিল। সম্প্রতি ইঁহার "ছোট-ছোট গল্প" ও "কর্ম্মযোগের টীকা" নামে দুখানি গল্পসংগ্রহের পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বাঙালী পাঠকপাঠিকারা উপকৃত হইলেন।

সুরেন্দ্রবাবুর রচনা একেবারে তাঁহার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ধরণের। চোস্ত ভাষা, কাটা-কাটা প্রায়-ক্রিয়াপদহীন বাক্যপরম্পরা কারণ-কার্য্যপ্রণালীতে লজিকের সিলজিজ্‌মের মতো সিদ্ধান্ত করিতে-করিতে গল্পকে শেষের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলে; প্রতি বাক্য শ্লেষে বিদ্ধ, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ হাস্যরস করুণরসের মধ্যেও অনুবিদ্ধ হইয়া থাকিয়া করুণ-রসকে করুণতর করিয়া তোলে। এই ওস্তাদ শিল্পীর রচনার ভঙ্গী যেন সার্কাসের সঙের মতন; নিজের ওস্তাদী কৃতিত্ব সে রঙ্গের আবরণে ঢাকিয়া প্রকাশ করে, অনেক সময় মনে হয় শেষ সামলাইতে পারিল না বোধহয়, কিন্তু অসাধারণ দক্ষতা আছে বলিয়াই বিপদ রচনা করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবার আনন্দকৌতুক সে দর্শকদিগকে প্রচুরপরিমাণে দিতে পারে। নমুনাস্বরূপ আনন্দপর্য্যটন গল্পটি ধরা যাইতে পারে; আগাগোড়া সেটি একটি পর্যটনের বর্ণনা, পাঠক গল্প না পাইয়া হতাশ হইয়া যখন শেষ লাইন পড়িতে যাইবে অমনি একটি-লাইনে সেটি গল্পের মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে মুগ্ধ চমৎকৃত করিয়া দিবে। এমনি কারুকার্য্য তাঁহার সমস্ত গল্পেই বিদ্যমান।

ফোয়ারা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন। মূল্য এক টাকা।

রসিক ললিতবাবুর রঙ্গরসাত্মক কতকগুলি রচনা ফোয়ারারূপে বঙ্গসাহিত্যে উৎসারিত হইয়া সাহিত্যক্ষেত্র যে অনেক পরিমাণে রসাল করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই জানেন। সেই সর্ব্বজনসমাদৃত বইখানি বঙ্গসাহিত্যদুর্লভ দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করিয়া দ্বিজ হইয়া অভিনব সুবেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নকল চামড়ায় তলতলে বাঁধা, গোল কোণ, সোনালি নাম, পরিষ্কার ছাপা বইখানিকে মনোহরণ বেশে সাজাইয়াছে, ভিতরের রঙ্গরচনার আধারটি তাহার উপযুক্ত মানানসই আনন্দপ্রদ হইয়াছে। এই সংস্করণে অনেক পরিবর্দ্ধন পরিবর্জ্জন ও পরিবর্ত্তনও হইয়াছে; কতকগুলি টিপ্পনীও নূতন সংযোগ করা হইয়াছে। যে বইএর দ্বিতীয় সংস্করণ দরকার হইয়াছে তাহা যে পাঠকপাঠিকার সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

কাব্যসুধা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন। ১৪২ পৃষ্ঠা; রেশমী কাপড়ে বাঁধা। দাম এক টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত গার্হস্থ্য-সম্পর্ক কোন্ বইএ কিরূপ-ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহাই দেখানো এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে এই তিনটি সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে—(১) ননদ-ভাজ (২) বোনে-বোনে (৩) শাশুড়ী-বৌ। পরিশিষ্টে "একান্নবর্ত্তী পরিবার"-এর দোষগুণ বিচার করা হইয়াছে। ঐ-সমস্ত সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে এবং ইংরেজী সাহিত্যে ঐ শ্রেণীর চিত্র থাকিলে তাহার

সহিতও তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুন্দর আদর্শ-সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার শ্রেষ্ঠতা ও মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য লেখক ভূমিকায় সবিস্তারে লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান—(১) নায়কনায়িকার প্রণয় ছাড়াও পারিপার্শ্বিক অপর সম্পর্কের মাধুর্য্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ, (২) স্বভাব-বিরোধী দুই সম্পর্কের মধ্যে ইংরেজীনবিশ লেখকেরা কেমন প্রীতি ও সখ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এবং (৩) সেইসমস্ত চিত্র যাহাতে আমাদের অন্তঃপুরিকাদের হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া ঐ আদর্শে পারিবারিক জীবন গঠন করিতে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দ্যায়। এই পুস্তকখানি পড়িলে বঙ্কিমচন্দ্রের বহুপুস্তকে বর্ণিত যেসব পারিপার্শ্বিক চরিত্রের মাধুর্য্য নায়কনায়িকার সুখ-দুঃখের আন্দোলনে চোখে পড়ে না তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং বইগুলিকে ভালো করিয়া বুঝিবার সুবিধা হয়। এই বইখানি বিশেষ করিয়া অন্তঃপুরিকাদের পাঠের যোগ্য হইয়াছে; বঙ্কিমচন্দ্রের ছাড়া আর কোন্ কোন্ লেখক লেখিকার কোন্ কোন্ রচনায় ঐরূপ আদর্শ সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে পরিশিষ্টে তাহারও পরিচয় দেওয়াতে কোন্ কোন্ বই পড়িলে পারিবারিক আদর্শ গঠনের সাহায্য হইতে পারে তাহা জানিবার সুযোগ তাঁহারা পাইবেন। আশা করি এই সুলিখিত ও সুদৃশ্য বইখানি গৃহলক্ষ্মীদের নিকট সমাদৃত হইবে এবং সমালোচনা বিষয়ের একখানি উৎকৃষ্ট বই বলিয়া সাধারণ সাহিত্যিকদিগেরও সমাদর লাভ করিবে। মুদ্রারাক্ষস।

প্রবাসী-পুরস্কার

এ বৎসর দুটি প্রবন্ধের জন্য **নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার** নামে দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০৲ টাকা পরিমিত। বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল।

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিসের কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে উহা পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং ঐ কারখানা পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও তাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) স্ত্রীশিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; হিন্দু বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি?

প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টকে কি করিতে হইবে এবং দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে হইবে, এবং অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ তত্তৎদেশের শিল্প ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন আবশ্যকমত তাহার উল্লেখ ও বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থাদি হইতে এই-সব বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। ইংরেজি কিছু উদ্ধৃত করিলে তাহার বাংলা অনুবাদ দিতে হইবে।

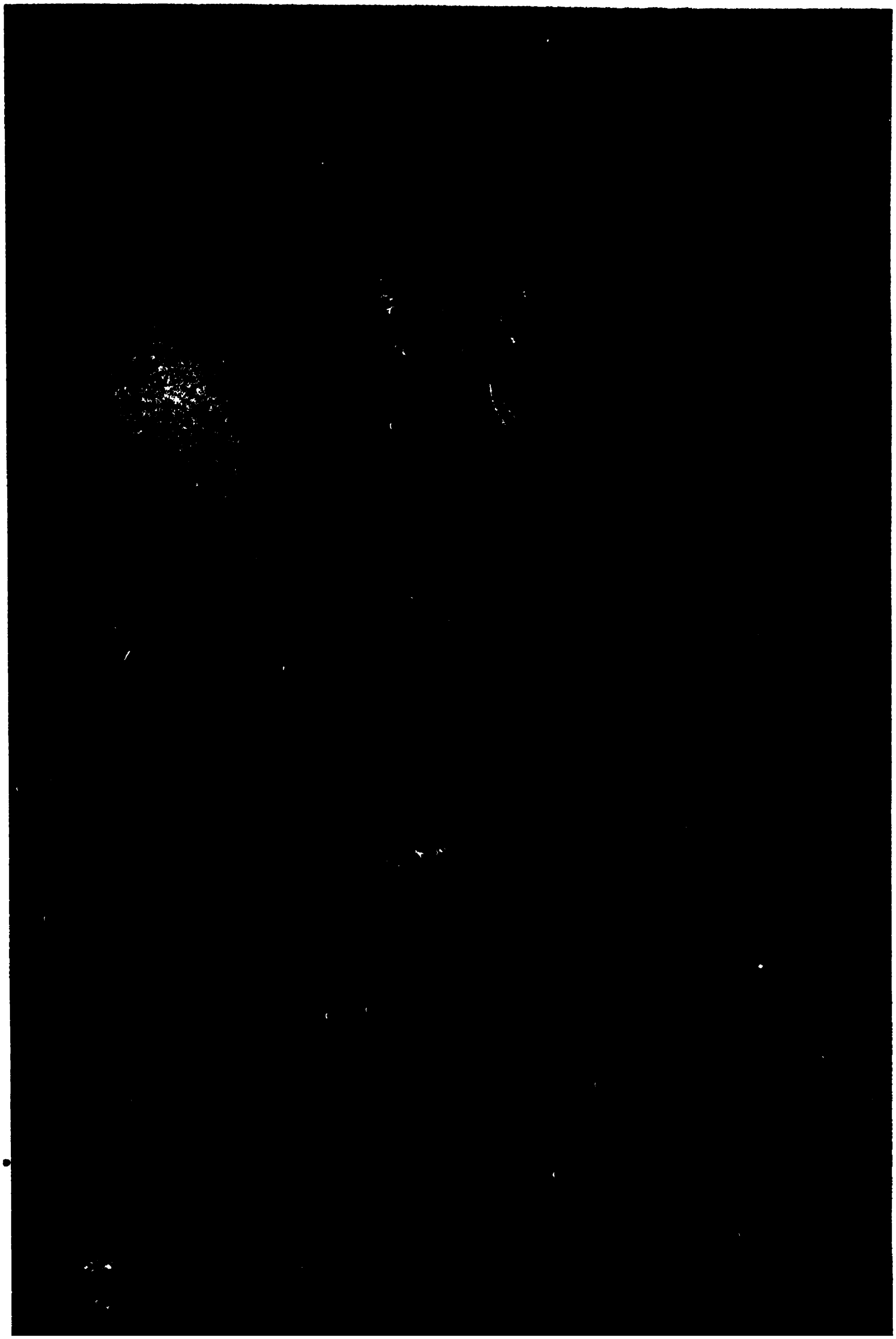
পুরস্কারের জন্য আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩২৪) তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর "প্রবাসী-পুরস্কারের জন্য" লিখিয়া দিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকাকারে বা যে-ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেৎ ডাকমাশুল পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না বা কোনটিই প্রকাশিত হইবে না।

ইচ্ছা করিলে একজন দুই বিষয়েরই প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের পূর্ব্বে অথবা আমাদের নির্ব্বাচনের পর আমাদের নির্ব্বাচিত ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা লেখক বা অপর কেহ আমাদের বিনা অনুমতিতে অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

পুনশ্চ—বর্ত্তমান বৎসরের "নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কারের" ফল আগামী চৈত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ করা যাইবে; ও কোনো রচনা পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইলে আগামী ১৩২৪ সালে প্রবাসীতে ছাপা হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক।



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩২৩

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

সার্ব্বজনিক কাজে চরিত্রবান্ লোক চাই।

অনেক লোক আছে যাহারা কথায় সাধু-চরিত্রের প্রয়োজন স্বীকার করে, কিন্তু কাজে তাহা স্বীকার করে না। তাহারা নিজের আচরণেও সাধু নয়, এবং সামাজিক ভাবে বা সার্ব্বজনিক কাজে যাহাদের সঙ্গে মিশে, তাহাদের চরিত্রের বিচার করে না, সাধু অসাধু সকলকেই সাহচর্য্যের ও সহযোগিতার সমান যোগ্য মনে করে। অনেক লোক এরকমও আছে, যাহারা চরিত্রের আবশ্যকতা কথায় কিম্বা কাজে, কোন রকমেই, স্বীকার করে না। আর এক রকমের লোক আছেন, যাঁহারা নিজে সৎ, ব্যক্তিগত আচরণে সাধু-চরিত্রকে আবশ্যক ও মূল্যবান মনে করেন, কিন্তু সামাজিক জীবনে ও সার্ব্বজনিক কাজে মুড়ি মিশরির এক দর করেন, সৎলোক ও দুর্বৃত্তলোককে তুল্যমূল্য মনে করেন। এরূপ সচ্চরিত্র লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে সামাজিক জীবনে দুশ্চরিত্র লোকদের সঙ্গে মিশিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু সার্ব্বজনিক কাজে অতি ঘৃণিত চরিত্রের লোকদের সঙ্গেও কাজ করিতে ও তাহাদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চস্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না।

বাস্তবিক কিন্তু চরিত্র জিনিষটি যেমন একক সন্ন্যাসীর চাই, তেমনি পরিবারে গৃহীর চাই, সমাজে সামাজিক মানুষের চাই, এবং সার্ব্বজনিক কাজ সভাসমিতির প্রত্যেক সভ্যের, কর্ম্মীর ও নেতার চাই। সম্পূর্ণ নিখুঁত মানুষ পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু যে দেনাপাওনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চক নয়, মিথ্যাবাদী নয়, যাহার কথার উপর নির্ভর করা যায়, যে নিজের স্বার্থের জন্য বা ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেশের মঙ্গলকে বলি দিবে না, যে মাতাল নহে বা অন্য প্রকারের নেশাখোর নহে, এবং নারীজাতির প্রতি যাহার ব্যবহার কলুষশূন্য, এমন মানুষের অভাব নাই। সার্ব্বজনিক কাজের কর্ম্মী ও নেতা এইরূপ হওয়া চাই।

দেশের মঙ্গল কথাটির মানে ভাল করিয়া বুঝিলেই ইহাও বুঝা যাইবে যে সার্ব্বজনিক কাজে চরিত্রের প্রয়োজন। যদি কোন দেশ অন্য দেশের অধীন না হয়, তাহা হইলেই কি সেই দেশের যতটা সুখ সম্পদ উন্নতি কল্যাণ হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে মনে করিতে হইবে? তাহা নয়। দেশের কাজ করিবার ভার যে রাজা বা দেশনায়ক, মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের উপর থাকে, তাহারা যদি চরিত্রহীন ও স্বার্থপর হয়, তাহা হইলে রাজস্বের টাকার অসৎ ব্যবহার হইবে, অবিচার হইবে, দেশের নারী ও পুরুষদের উপর অত্যাচার হইবে।

উন্নত দেশ বলিলে আমরা এই বুঝি, যে, সে দেশের লোকেরা নিজেই দেশের সব কাজ চালায় ও দেশ রক্ষা করে, সে দেশের সমাজে, পারিবারিক জীবনে, ও ব্যক্তিগত জীবনে পবিত্র-চরিত্রের প্রতি লোকের খুব দৃষ্টি আছে, এবং তথায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের, এবং সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির

উন্নতি হইতেছে। পরাধীন দেশের উদ্ধার বা উন্নতি-সাধন মানে তাহাকে উন্নত দেশের মত করা। কিন্তু যাহারা দেশকে উন্নত করিবে তাহারা নিজে স্বার্থত্যাগী, কষ্টসহিষ্ণু, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ, এবং পবিত্রচরিত্র না হইলে কেমন করিয়া তাহারা দেশকে উন্নত করিবে? যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে কেমন করিয়া অপরকে সিদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দিবে? "ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস, স্বদেশ উদ্ধার তার কার্য্য নয়।"

কেহ বলিতে পারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন করিব, তাহাতে আবার চরিত্র লইয়া কি হইবে? কিন্তু ফাঁকা বক্তৃতায় যে কাজ হয় না, তাহা ত সকলেই বহু বৎসর ধরিয়া দেখিতেছেন। যে-টুকু কাজ হইয়াছে, তাহা ফাঁকা বক্তৃতায় হয় নাই; বক্তৃতা ও কাগজে-লেখার পশ্চাতে যতটুকু ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, সাহস,—এককথায় চরিত্র, আছে, তাহাতেই কাজ হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে হোমরূল বা স্বরাজ লাভের জন্য পার্নেলের দ্বারা অতি সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল। টাইম্‌সের মত ধনী ও প্রভাব-শালী সংবাদপত্র জাল চিঠির সাহায্যে তাঁহাকে পিশিয়া ফেলিবার চক্রান্ত করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু যাই পার্নেলের চরিত্রহীনতা প্রমাণ হইয়া গেল, অমনি তাঁহার সমুদয় প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেল, এবং, তখনকার মত, আইরিশদের স্বরাজলাভ-চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অবশ্য, জাতীয় অধিকারলাভচেষ্টা রক্তবীজের মত, মরিয়াও মরে না। তাই আইরিশদের চেষ্টা আবার প্রবল হইয়াছে এবং সফলও হইবে। ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টে সার্ চার্ল্‌স্ ডিল্ক্ একজন অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী সভ্য ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী হইবার মত যোগ্যতা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার চরিত্রহীনতা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় সমুদয় প্রভাব লুপ্ত হইয়া যায়। পরে একটু কার্য্যকারিতা আবার হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি আর পূর্ব্বপ্রভাব লাভ করিতে পারেন নাই।

ইতিহাস ঘাঁটিয়া অসচ্চরিত্র ক্ষমতাশালী রাজনীতিবেত্তা ও কর্ম্মীর নাম খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে; কিন্তু আমরা রাজনৈতিক অধিকার, ধন, প্রভৃতিকেই ত পরমার্থ মনে করি না; এ-সব কল্যাণের উপায় মাত্র। রাজনৈতিক অধিকার বা ধনের জন্যই ত আমরা রাজনৈতিক অধিকার ও ধন চাই না। চাই এইজন্য যে আমরা তাহা হইলে নিজেদের ও অপরের পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত করিতে পারিব, দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করিতে পারিব, এবং সকল বিষয়ে মানুষনামের যোগ্য হইতে পারিব। কিন্তু চরিত্রহীন লোকদের দ্বারা দেশের অবস্থার এই আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

পৃথিবীতে, সকল দেশে না হউক, অনেক দেশে সমাজে নারীদের যে স্থান ছিল, এখন তাঁহারা তদপেক্ষা উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেশের মঙ্গল বলিলে এখন কেবল পুরুষদের সুখ, সুবিধা, যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতা, বুঝায় না। নারীদের মঙ্গল, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, যেরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধানে হয় না, তাহা প্রার্থনীয় নহে। আগে যে দেশে যে নেতার চরিত্র যেরূপই থাক্ না কেন, এখন আর এরূপ কেহ ক্ষমতা-লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না, যাহার নারীজাতির প্রতি ব্যবহার নিন্দনীয় ও ঘৃণিত। তাহার অনেক কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটা কারণ এই যে, এরূপ লোকদের দ্বারা সমাজের অর্দ্ধ অংশ নারীদের সম্মান রক্ষিত হইতে পারে না, এবং তাঁহাদের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। জননী নারীদের মঙ্গল না হইলে শিশুদের, বালকবালিকাদের, মঙ্গলও হইতে পারে না।

রঘুবংশের আদর্শ রাজা দিলীপ, আদর্শ রাজা রামচন্দ্রের যেমন বর্ণনা আছে, তেমনি শেষের দিকে রঘুকুলকলঙ্ক অগ্নিবর্ণ নৃপতির বর্ণনাও আছে। দেশের কর্ম্মীরা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন না বটে, কিন্তু তাঁহারাও লোক-পালক ও লোকসেবক বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র দিলীপ ও রামচন্দ্রের আদর্শে গঠিত হওয়া আবশ্যক, অগ্নিবর্ণের আদর্শে নহে।

ভারতবাসী কাহার প্রজা?

কখন কখন দেখা যায়, যে, কোন জেলার কাগজে লেখা হইতেছে যে অমুক ম্যাজিষ্ট্রেট খুব "প্রজাবৎসল"। ইহা পড়িলেই মনে হয়, আমরা কাহার প্রজা? ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রজা ত নহি। ভারতবর্ষের একমাত্র আইনসঙ্গত সম্রাট

আছেন পঞ্চম জর্জ; ভারতবাসীরা আইন অনুসারে তাঁহারই প্রজা। সুতরাং কেহ যদি প্রকারান্তরে কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে রাজা বা রাজস্থানীয় বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহার রাজদ্রোহিতা অপরাধ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, এবং গ্রামের চৌকিদার নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী; কিন্তু উভয়েই কর্ম্মচারী মাত্র। লর্ড মর্লী যখন ভারতসচিব ছিলেন, তখন তিনি এক বক্তৃতায় ভারতবর্ষের লোকদিগকে "equal subjects of the King", "ইংরেজদের সমশ্রেণীস্থ প্রজা" বলিয়াছিলেন। বাস্তবিক ইহাই আইনসঙ্গত কথা। আমরা ইংরেজমাত্রের বা রাজকর্ম্মচারী-মাত্রের প্রজা নহি। এখন দেশশাসকদের মধ্যে ইংরেজ বেশী বটে, কিন্তু ইহা অস্থায়ী অবস্থা। ভারতবাসীকে ইংরেজের ঠিক্ সমান করা আমাদেরই চেষ্টাসাপেক্ষ। কিন্তু এই চেষ্টা করিতে হইলে গোলামী ভাবটা ত্যাগ করা দরকার। আইনে বলিতেছে, ভারতসচিব বলিতেছেন, ইংরেজ ও ভারতবাসী উভয়েই সম্রাটের প্রজা, সমান প্রজা। কিন্তু আমরা যদি তাহা সত্ত্বেও চিন্তায়, ভাবে, কল্পনায় ও কাজে ইংরেজ-মাত্রকেই বা ইংরেজ রাজভৃত্য-মাত্রকেই রাজা বলিয়া মানি, তাহা হইলে আমাদের গোলামী ঘুচান কোনও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। আগে অন্ততঃ কল্পনাতেও খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারিলে তবে আচরণে মনুষ্যত্ব আসিবে।

"প্রভু"দিগকে শিক্ষা দেওয়া চাই।

ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট অনেক শত বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু একশত বৎসর পূর্ব্বেও তথাকার সাধারণ লোকদের পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা কার্য্যতঃ ছিল না বলিলেও চলে; ধনী ভূস্বামীরাই অনেক স্থলে সভ্য হইতেন, এবং তাঁহাদের কথা অনুসারেই অন্য সভ্যেরাও নির্ব্বাচিত হইতেন। ১৮৩২, ১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৬৬, ১৮৮৪, ১৮৮৫ সালে ভোটদান বিষয়ে পার্লেমেণ্টে যে-সকল আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তাহার ফলে ক্রমশঃ অধিক লোকে নির্ব্বাচন করিবার অধিকার পাইয়াছে। কিন্তু এখনও শ্রমজীবীরা খুব ক্ষমতাশালী হইতে পারে নাই, এবং স্ত্রীলোকদের ভোট দিবার বা সভ্য হইবার ক্ষমতাও নাই। যাহা হউক, ১৮৬৬ সালে নির্ব্বাচন সম্বন্ধীয় যে আইন পাশ হয়, তাহাতে অনেক নিরক্ষর বা প্রায় নিরক্ষর লোক ভোট দিবার অধিকার পায়। তখন রবার্ট লো (Robert Lowe, afterwards Viscount Sherbrooke) পার্লেমেণ্টের একজন বিখ্যাত সভ্য ছিলেন। তাঁহাকে লোকে "ববি" লো ডাকনাম দিয়াছিল। ১৮৬৭ সালে এডিনবরা ফিলসফিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউশনে একটি বক্তৃতায় এই "ববি" লো বলেন, যে, "আমাদের ভবিষ্যৎ প্রভুদের মনে অক্ষর চিনিবার প্রবৃত্তি জন্মান দরকার;" (it was necessary "to induce our future masters to learn their letters")। সচরাচর তাঁহার কথাগুলি, "we must educate our masters," "আমাদের প্রভুদিগকে আমাদের শিক্ষা দিতে হইবে," এই আকারে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। পার্লেমেণ্টের সভ্যেরা দেশের আইন করেন, ট্যাক্স বসান, দেশের কাজের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু তাহাদিগকে নির্ব্বাচন করেন ভোটদাতারা। এই জন্য নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত সাধারণ লোকদিগকে রবার্ট লো "আমাদের প্রভু" বলিয়াছিলেন।

আইন অনুসারে প্রভু না হইলেও, কার্য্যতঃ ইংরেজ জাতি আমাদের উপর প্রভুত্ব করিতেছে। কোন মানুষ বা কোন জাতি অপর একজন মানুষ বা জাতির ভাগ্যবিধাতা হইতে পারে না। বিধাতা আছেন একজন। তাহা হইলেও, তিনি মানুষের দ্বারাই নিজের কাজ করাইয়া লন। এইজন্য মানুষকেও ভাগ্যবিধাতা বলা হয়। এই মানবীয় ভাবে ও মানবীয় ভাষায় আমরাই প্রধানতঃ আমাদের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু অন্য জাতিরা কি করে না করে, তাহার উপরও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এই-সব জাতির মধ্যে ইংরেজদের সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক বেশী। এইজন্য তাহাদের জ্ঞানের, চিন্তার, ভাবের ও কাজের সহিত আমাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক বেশী, "ববি" লো (Bobby Lowe) যখন ইংরেজ নির্ব্বাচকদিগকে অক্ষর চিনাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন, তখনকার মত ইংরেজ জাতি এখন নিরক্ষর না হইলেও, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজেরা ভয়ঙ্কর অজ্ঞ। খুব বড় বড়

রাজনৈতিক, বড় বড় পণ্ডিতেরও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখিলে বাস্তবিক অবাক্ হইতে হয়। ইংলণ্ডের লোকেরা সব সময়েই যে জানিয়া শুনিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্যায় করে বা অবিচারের প্রশ্রয় দেয়, তাহা নহে। অধিকাংশ লোক হয় কিছু জানে না, নয় মিশনরীদের এবং ভারতফেরত রাজকর্মচারী ও বণিকদের নিকট হইতে আমাদের সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত কথা শুনিয়া আমাদের সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা মনে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীর নীতি, ধর্ম্ম, পরিবার ও সমাজের চিত্র জঘন্য না হইলে বিলাতের লোকেরা মিশনরীদিগকে এদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ টাকা দেয় না। তজ্জন্য মিশনরীরা ভারতচিত্রে খুব কালী বরাবরই ঢালিয়া আসিয়াছেন। ভারতফেরত ইংরেজদের অন্ন নির্ভর করে, ভারতবাসীদিগকে অবনত রাখার উপর, তাহারা অধিকাংশ নিজেদের কাজ, রোজগার, ও আমোদে ব্যস্ত থাকায় ভারত সম্বন্ধে ঠিক্ খবর বেশী রাখে না, এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ও আত্মমর্য্যাদাবিশিষ্ট লোকদিগের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগও তাহাদের কমই হয়। এই-সব কারণে তাহাদের নিকট হইতেও ইংরেজরা ভারতের ঠিক্ অবস্থা বুঝিতে পারে না। তা ছাড়া মানুষ যতদিন সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বিবাদে থাকিতে পায়, ততদিন আত্মসুখেই নিমগ্ন থাকে; ইচ্ছা করিয়া পরের খবর কয় জন লয়? যে নিজের কথা অপরকে শুনাইতে চায়, তাহার চেঁচাইয়া অপরের নিদ্রা ভঙ্গ করা ও আরামে ব্যাঘাত জন্মান দরকার।

ইংলণ্ডের অনেক নিরক্ষর এবং অল্পশিক্ষিত লোকও পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পাইয়া "প্রভু" হওয়ায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার যেরূপ প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, আমাদের "প্রভু" ইংরেজ জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার সেইরূপ প্রয়োজন বরাবরই রহিয়াছে। এখন তাহাদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অত্যন্ত জরুরী কাজ। দেরী করিলে চলিবে না; কেন, তাহা পরে বলিতেছি। পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া, মাসিক পত্র ও সংবাদপত্র চালাইয়া, এবং আরও নানা রকমে শিক্ষা দিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, সভ্যতা, ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, শিল্প, আচার ব্যবহার, সামাজিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, শক্তি, সকল বিষয়েই লিখিতে ও বলিতে হইবে, এবং সমস্তই সমঝাইয়া দিতে হইবে। এখানকার ও বিলাতের সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা বলিতেছেন, "এখন যুদ্ধের সময়, চেঁচাইও না; যাহাতে তর্ক-বিতর্ক হয়, এমন কোন কথা তুলিও না।" ইহা কাজের কথা নয়। তাঁহারা নিজে এ নিয়ম পালন করিতেছেন না; এমন অনেক কথা বলিতেছেন ও কাজ করিতেছেন, যাহার প্রতিবাদ করা, এবং তর্ক করা একান্ত আবশ্যক। তা ছাড়া, উপনিবেশগুলিতে এমন কথা কোন ইংরেজ বলিতেছেন না? তাহারা ত এই যুদ্ধের সময় বেশ জোর করিয়া আপনাদের দাবী জানাইতেছে, এবং যুদ্ধের পর সাম্রাজ্য কিপ্রকারে পুনর্গঠিত হওয়া চাই, সে বিষয়ে খুব আলোচনা করিতেছে। তাহাদের একটা প্রভাবশালী দল বলিতেছে, যে, যুদ্ধের পর তাহারাও সাম্রাজ্যের যুদ্ধ ও শান্তি, এবং বাণিজ্য-বিষয়ক বন্দোবস্তে ইংলণ্ডের সহিত সমানভাবে মতামত দিবার ক্ষমতা চায়, এবং ভারতবর্ষ-শাসন-কার্য্যের ভাগ চায়। এগুলা কি তর্কবিতর্কের বিষয় নহে? ভারতবর্ষের লোকদিগকে ঔপনিবেশিকেরা তাহাদের দেশে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না; অথচ তাহারা আমাদের মনিব হইতে চায়। বিশেষ করিয়া এইজন্যই বিলাতে আমাদের একখানা দৈনিক পরিচালন প্রয়োজন। ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের চির দাস রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া, সাম্রাজ্যের অংশীদার করিতে হইবে। নতুবা আমাদের দুর্গতি আরও বাড়িবে।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহি লিখিলে অল্প লোকে পড়িতে পারে। মাসিক পত্র হয় ত সেইরূপ বা তার চেয়ে কিছু বেশী লোক পড়িবে। কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী লোক পড়িবে যদি দৈনিক কাগজ চালান যায়। ইহা খুব ব্যয়সাধ্য বটে। কিন্তু স্বরাজলাভ কি তুচ্ছ ব্যাপার যে তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে না, লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে না? দৈনিক কাগজ চালাইবার ব্যবস্থা একান্ত না করিতে পারিলে, অন্ততঃ একখানা সাপ্তাহিক কাগজ চালাইতে হইবে। ইহা লণ্ডন হইতে প্রকাশ করিতে হইবে। লণ্ডনে কংগ্রেসের মুখপত্র ইণ্ডিয়া আছে বটে; কিন্তু তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক

আদর্শ ও মতের কিছু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। উঁহাকে আরও অগ্রসর করিয়া একজন যোগ্য ভারতবাসীকে উহার সম্পাদক করিতে পারিলে তবে ঠিক্ হয়। কিন্তু আমাদের মতে, একটি স্বতন্ত্র দৈনিক কাগজ লণ্ডন হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসী যোগ্য লোক-দিগকে উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা খুব শীঘ্র করা উচিত। তদ্ভিন্ন আমাদের কয়েকজন যোগ্য প্রতিনিধিকে বক্তৃতা করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদের কাগজে ও বক্তৃতায় প্রচারিত মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য আমাদের ব্যয়ে বিলাতে পাঠান ও রাখা একান্ত আবশ্যক।

বিলাতে প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার শিক্ষালয়।

বিলাতে একটি প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা প্রভৃতি শিখান হইবে। যে-সব ইংরেজ এদেশে রাজকার্য্য ও বাণিজ্য করিতে আসিবেন বা অন্যান্য প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবেন, তাঁহারা এখানে শিক্ষা পাইবেন। এজন্য ভারতবর্ষকেও টাকা দিতে হইবে। সুবিধাটা অপরে ভোগ করিবে; টাকা দিয়া পুণ্যসঞ্চয় আমরা করিতে পাইব; ইহা খুব কপালের জোর তাহাতে সন্দেহ নাই। এই শিক্ষালয়ে ভারতবর্ষীয় ভাষা-সকল শিক্ষা দিবেন ইংরেজ অধ্যাপকেরা; বাংলা শিখাইবেন মিঃ জে, ডী, এণ্ডার্সন্। ইঁহারা অযোগ্য লোক ইহা আমরা বলিতেছি না। কেবল ইহাই বলিতেছি যে নিজের বেলায় ইংরেজ যে ব্যবস্থা করেন, অন্যের বেলায় তাহা করেন না। আমাদের দেশে যে মোটা মোটা মাহিনায় ইংরেজ অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তাহার একটা কারণ এই বলা হয় যে কতকগুলি বিষয় আছে যাহা ইংরেজরাই খুব ভাল শিখাইতে পারেন,—যথা, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালীই ভাল শিখাইবে, হিন্দী হিন্দুস্থানী ভাল শিখাইবে, ইত্যাদি। সুতরাং বিলাতের প্রাচ্য শিক্ষালয়টিতে বাংলা শিখাইবার জন্য একজন বাঙালীকেই নিযুক্ত করা উচিত।

বর্ত্তমান বাংলা-অধ্যাপক মিঃ জে ডী এণ্ডার্সন অতি বৃদ্ধ, বয়স ৮০র কাছাকাছি হইয়াছে। তিনি বেশী দিন কার্য্যক্ষম থাকিবেন বলিয়া বোধ হয় না। সময় থাকিতে কোন বাঙালী একবার তাঁহার পদটি পাইবার চেষ্টা করিয়া দেখুন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনায় একমাত্র যোগ্য বাংলা-অধ্যাপক রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন চেষ্টা করুন। এণ্ডার্সন সাহেব তাঁহাকে চিনেন, এবং তাঁহার সহিত রায়সাহেবের পত্র-ব্যবহারও হয়। এই প্রকারে রায় সাহেবের আরও অধিক অর্থাগমের পথ হইলে এবং তিনি বিলাত গেলে, কলিকাতায় ক্রমে ক্রমে হয়ত আরও দু এক জন লোক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার সুযোগ পাইতে পারেন। গতবারে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রোতব্য কথা বলিতে সমর্থ কাহারও কাহারও নাম করিয়া-ছিলাম। সকল যোগ্য লোককে আমরা জানি না, এবং যাঁহাদিগকে জানি তাঁহাদের সকলের নামও সব সময়ে মনে আসে না। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছেন; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা সাক্ষাৎ ভাবে কিছু জানি না। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের যোগ্যতার কথা আমরা স্বয়ং জানি। বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য এবং তৎপরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। তিনি পালি জানেন। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার খুব দখল আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার আবেস্তার ভাষা ও ইংরেজীও জানা আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবকুমার কবিরত্নের নামও আমরা করিতে পারি। তিনি বাংলার নাড়ী নক্ষত্র ত জানেনই, অধিকন্তু ইংরেজী, ফারসী, ফরাশি, হিন্দী, সংস্কৃত পালি, প্রভৃতি জানেন, এবং তিনি স্বয়ং কবি। কিন্তু এই দুজন পণ্ডিতেরই একটা বড়-রকমের অযোগ্যতা এই আছে যে তাঁহারা কাহারও দরবার করিতে অসমর্থ।

আমাদের লিপি।

সংস্কৃত এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য আর্য্যভাষার বর্ণমালা যে বেশ বিজ্ঞানসম্মত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই লিপির এরূপ কোন কোন বিশেষত্ব আছে,

যাহাতে অক্ষরপরিচয় হইতে বিলম্ব হয়, এবং ছাপার কাজে অধিক ব্যয় হয় ও সময় লাগে। তদ্ভিন্ন ইংরেজী অক্ষরে টাইপ-রাইটার কল যেমন সহজে হয়, বাংলায় সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। বাংলা লিপিরই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্!

বাংলা স্বরগুলির নিজের সন্ন্যাসী চেহারা এক রকম; কিন্তু যখনই তাহারা সামাজিক জীবের মত ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত হয়, অমনই বেশ-পরিবর্ত্তন ঘটে। অকারের ব্যবহার আরও বিচিত্র। তিনি একা যখন থাকেন, তখন তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু যাই কোন ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হন, অমনি অদৃশ্য হইয়া যান। অন্য স্বরগুলির আ া ই ি ঈ ী, এইরূপ দুটি করিয়া রূপ আছে। আবার কেহ ব্যঞ্জনে আগে, কেহ পরে, কেহ বা আগে ও পরে, কেহ বা নীচে, এবং কেহ বা পাশে ও উপরে বিরাজ করেন। উকার গ, র, শ প্রভৃতিতে যুক্ত হইলে এবং উকার র এ যুক্ত হইলে আবার আর-একরকম চেহারা হয়।

তাহার পর ব্যঞ্জনগুলির স্বতন্ত্র চেহারা একরকম, পরস্পরের সহিত যুক্ত চেহারা আর-একরকম। বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক বুথ সাহেব আমাদিগকে এইজন্য একবার বলিয়াছিলেন, You have got a curious alphabet, one gentleman upon the shoulder of another! "তোমাদের বর্ণমালা বেশ মজার, একজন ভদ্রলোক আর একজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসে।"

এই-সব কারণে বাংলা একটু কিছু ছাপিতে হইলে ইংরেজীর চেয়ে অনেক বেশী-রকম হরফ ঢালিতে ও রাখিতে হয়, এবং উপরে নীচে নানা "কার," রেফ, ফলা প্রভৃতির জায়গা করিতে হয় বলিয়া লেড্ দিয়া পংক্তিগুলি ফাঁক ফাঁক করিয়া সাজাইয়া ছাপিতে হয়। ইংরেজীর মত ঠাসা ছাপা বাংলায় চলে না। ইহাতে প্রয়োজন না থাকিলেও অনেক বেশী কাগজ খরচ হয়।

তা ছাড়া যুক্তাক্ষর সব শেষ করিয়া চিনিতে ও লিখিতে-শিখিতে দেরী লাগে। ইহার কি কোন প্রতিকার হইতে পারে না? আমাদের মনের মধ্যে অনেক বৎসর হইতে একটা কথা রহিয়াছে। বলিয়া ফেলি।

ব্যঞ্জনে যখন হসন্ত চিহ্ন যুক্ত থাকে না, তখন তাহাতে অ যুক্ত আছে, ইহা আমরা লিখিবার, ছাপিবার ও পড়িবার সময় মানিয়া লই। তাহা মানিয়া না লইয়া, ব্যঞ্জন মাত্রই হসন্ত, এবং তাহার পর যে অক্ষর থাকিবে, তাহার সহিত উহা যুক্ত, লিখিবার, ছাপিবার, পড়িবার এই রীতি প্রচলিত করিলে স্বরের দুই চেহারা এবং ব্যঞ্জনেরও স্বতন্ত্র ও যুক্তরূপ উঠাইয়া দিয়া কেবল বার স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনের এক-একটি হরফেই বেশ কাজ চলিয়া যায়, এবং তাহাতে ছাপা ও টাইপ-রাইটারের কাজ সুসাধ্য হয়, ও অক্ষর-পরিচয়ও সহজে হয়। নীচে দৃষ্টান্ত দিতেছি।

প্রচলিত রীতি অনুসারে লিপি।

"এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান।"

প্রস্তাবিত রীতি অনুসারে লিপি।

"এই ভউমঅণডঅল দএখঅ কই সউখএর সথআন।"

প্রস্তাবিত রীতিতে কখন কখন লিখিতে জায়গা ও সময় বেশী লাগিবে, কিন্তু সব দিক্ দিয়া দেখিলে মোটের উপর সুবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেজী লিপিতে ও ছাপিতে যত জায়গা ও সময় লাগে, প্রস্তাবিত রীতিতে তদপেক্ষা বেশী জায়গা ও সময় লাগিবে না। ইংরেজী অক্ষর বড় (capital) ও ছোট (small) ভেদে দুরকম। বাংলায় এরূপ কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হইলে বাংলা ছাপা ইংরেজী অপেক্ষাও সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য হইবে। বাংলা টাইপ-রাইটার কলও ইংরেজী অপেক্ষা সস্তায় ও সহজে নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

ফিজিদ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ।

লর্ড হার্ডিং অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব ফিজি দ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ বন্ধ করা হইবে। সেই প্রতিজ্ঞা পালনের আয়োজন-স্বরূপ তিনি ১৯১৫ সালে ১৫ই অক্টোবর ভারতসচিবকে যে সরকারী পত্র লেখেন, তাহাতে লিখিত আছে:—

"It is firmly believed in this country and, it would appear, not without grave reason, that the women emigrants are too often living a life of immorality in which their persons are, by reason of pecuniary temptation or official pressure, at the free disposition of their fellow recruits and even of the subordinate managing staff."

এণ্ড্রুজ ও পিয়ার্সন সাহেব ফিজি গিয়া স্বচক্ষে সমস্ত

অবস্থা দেখিয়া যে রিপোর্ট লেখেন, তাহা আদ্যোপান্ত মডার্ণ রিভিউ কাগজে বাহির হইয়াছিল। তাহাতে, কুলিরূপে প্রেরিত ভারতীয় নারীদের দুর্গতির লর্ড হার্ডিং যে আভাস দিয়াছেন, তাহা চিত্রিত হইয়াছে। প্রতি তিন চারি জন পুরুষ কুলিতে একজন নারী কুলি, এই অনুপাতে কুলি পাঠান হইয়া থাকে। এই অবস্থায়, টাকার লোভ এবং কুলিবিভাগের কর্তৃপক্ষের জুলুম, উভয় কারণে অল্প স্ত্রীলোকই সতীত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। এরূপ অবস্থাতেও যে কোন কোন নারী অতি কষ্টে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারেন, ইহা নারী-প্রকৃতির গৌরবের বিষয়।

চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণের প্রথা ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। উভয়েই মানুষের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়, উভয়েই মানুষ পশুর মত ব্যবহৃত হয়, উভয়েই মানুষের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়। যাহারা চুক্তিবদ্ধ কুলি বা দাস খাটায় তাহারাও পশুবৎ হইয়া যায়। তাহার উপর ঘোর দুর্নীতিপূর্ণ জীবন। এই-সব কারণে ফিজিতে আত্মহত্যার সংখ্যা খুব বেশী। স্ত্রীলোকের উপর পাশব অত্যাচার খুব বেশী। স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় ঈর্ষা-বশতঃ খুনের সংখ্যাও খুব বেশী।

এই প্রথা অবিলম্বে রহিত হওয়া উচিত। লর্ড হার্ডিংএর চিঠির তারিখ হইতে প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই এই নারকীয় প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। তাহা ত হয়ই নাই, অধিকন্তু শুনা যাইতেছে যে আরও পাঁচ বৎসর নাকি এই প্রথা প্রচলিত থাকিবে বলিয়া ফিজির ইক্ষুর আবাদের মালিকদিগকে কথা দেওয়া হইয়াছে। শুনিতেছি ভারত গভর্ণমেণ্ট কথা দেন নাই। সম্ভবতঃ ভারতসচিব দিয়াছেন। এণ্ড্রুজ্ সাহেব বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাইয়াছেন। পাঁচ বৎসর কেন, আর একদিনও এই প্রথা থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। ফিজির চিনির কারখানাওয়ালাদের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে, এবং পশুর অধম জীবন যাপন করিবার জন্য সেখানে মানুষ পাঠাইতে আমরা বাধ্য নহি। ভারতবর্ষের স্বরাজ থাকিলে এই প্রথা কখনই প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত না, এবং হইলেও এতদিন কবে উন্মূলিত হইয়া যাইত।

মানুষ সম্রাটই হউন আর মজুরই হউন, শাদা কাল লাল পীত যে রঙেরই হউন, সকলেরই মনুষ্যত্বের ও স্বাধীনতার মূল্য সমান। সকল নারীরই সতীত্বের গৌরব এক; গায়ের রং, আর্থিক অবস্থা, পদমর্য্যাদা, কিছুতেই কোন প্রভেদ হইতে পারে না। লর্ড হার্ডিংএর চিঠিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে ফিজিতে প্রেরিত অধিকাংশ কুলি-স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। কোন দেশের জন্য বেশ্যা জোগান ভারতগবর্ণমেণ্টের কাজ নহে, এবং ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই ঘৃণিত কাজ করিতেছেনও না। কিন্তু ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ কুলিপ্রেরণ-প্রথা যখন পরোক্ষভাবে বেশ্যা জোগানরই সমান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তখন ইহা নির্মূল করিতে আর একদিনও দেরি করা উচিত নয়। ইংরেজ নারীর এইরূপ দুর্গতি হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কখনও এত বিলম্ব করিতেন না; ইংরেজ জাতিও অসাড় ও নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। বাস্তবিক আমাদের নারীদের এই দুর্গতির জন্য আমরাই প্রধানতঃ দায়ী।

এণ্ড্রুজ্ সাহেব দুর্ব্বল শরীর লইয়া নানা প্রদেশে বক্তৃতা করিয়া দেশকে জাগাইতেছেন। পোলাক সাহেবও এই কাজ করিতেছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি, শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক, সার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, প্রভৃতি এ বিষয়ে আন্দোলন করিতেছেন। আগ্রা, অযোধ্যা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, প্রভৃতিতে এই বিষয়ে অনেক সভা হইয়া গিয়াছে, এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশ নীরব। বঙ্গের নেতারা নিশ্চেষ্ট।

বঙ্গের নিশ্চেষ্টতা।

বাংলাদেশ কেবল যে ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণের বিরুদ্ধেই কিছু করিতেছে না, তাহা নয়; আরও যে যে বিষয় লইয়া অন্যান্য কোন কোন প্রদেশে আন্দোলন হইতেছে, সে-সব বিষয়েও বাঙালীরা চুপ করিয়া আছেন। স্বরাজ লাভের জন্য আন্দোলন মান্দ্রাজ বোম্বাইয়ের তুলনায় বাংলায় পূর্ব্বেও হয় নাই, এখন ত কিছুই হইতেছে না। পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোথাও কোথাও প্রতিবাদ-সভা হইয়াছে, বঙ্গে হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যুদ্ধবিষয়ক যে মন্ত্রণাসভা আগামী মার্চ্চ মাসে

হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষের নির্ব্বাচিত কোন প্রতিনিধি সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পারিবেন না; এই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করিয়া কোথাও কোথাও সভা হইয়াছে। বঙ্গে হয় নাই। উপনিবেশগুলির ভারতশাসক হইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। বড়লাট যুদ্ধের পর ভারতশাসন-প্রণালীর কি কি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বিলাতে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহা আলোচনা করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহা দেওয়া হয় নাই। এবিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত। এইরূপ আরও কত বিষয় আছে। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালী প্রতিনিধিদের প্রাধান্য আর দেখা যায় না। দৈনিক সংবাদপত্র-মহলে বাঙালী প্রথম শ্রেণীতে অনায়াসেই জায়গা পাইতে পারেন, এরূপ বলিবার আর জো নাই। অন্যত্রও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালী কি পিছনের সারিতে বসিয়া নিদ্রা যাইবার আয়োজন করিতেছেন? শিল্পবাণিজ্যে বাঙালীর জায়গা ত নীচে আছেই। সমাজসংস্কার বঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল। এখন বাঙালী হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখনও বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দর্শনে ও ইতিহাসে বাঙালীর নাম আছে। কিন্তু এবিষয়ে কৃতীদের আসন শূন্য হইলে তাহা গ্রহণ করিবার চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে একাগ্রভাবে হইতেছে কই? ধর্ম্মভাব জাগাইবার জন্য, সকল বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা প্রবল করিবার জন্য, জগতের জ্ঞান চিন্তা ভাব আদর্শের সহিত যোগ রাখিবার জন্য কি চেষ্টা হইতেছে, কি আয়োজন করা হইতেছে?

স্বরাজলাভের প্রযত্ন।

স্বরাজ বা হোমরুল লাভের প্রযত্নের সকলের গোড়ার কাজ, দেশবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মান যে আমরা ইহার উপযুক্ত। আমরা প্রবাসীতে এই চেষ্টা কিছু করিয়াছি। মডার্ণ রিভিউ কাগজেও করিয়াছি। সম্প্রতি Towards Home Rule নামক একটি ছোট বহি প্রকাশ করিয়াছি। উহাতে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে, ভারতবাসীদের স্বরাজলাভের বিরুদ্ধে যত-প্রকার প্রধান প্রধান আপত্তি শুনা যায়, তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

পাব্লিক সার্বিস কমিশনের রিপোর্ট।

পাব্লিক সার্বিস্ কমিশন নিযুক্ত হইবার পর আমরা ১৯১২ সালের জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিউএ লিখিয়াছিলাম—

"We shall be glad if this new Commission does not further narrow the sphere of the higher appointments open to Indians, and saddle the country with higher salaries to be paid to European officials."

এখন, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর, দেখিতেছি, আমাদের উক্ত দুটি আশঙ্কার কোনটিই অমূলক নহে। আমরা কার্য্যতঃ উচ্চ রাজপদগুলি খুব কম পাইলেও এপর্য্যন্ত আমরা কোন সরকারী আইন বা ঘোষণাপত্র অনুসারে কোন কাজের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হই নাই; কোথাও এরূপ বলা হয় নাই যে ভারতবাসীরা সামান্য অংশ পাইবে, বেশীর ভাগ কাজ ইংরেজেরা পাইবে। কোম্পানীর আমলে ১৮৩৩ সালে ভারতবর্ষশাসন সম্বন্ধে যে চার্টার অ্যাক্ট (Charter Act) বিধিবদ্ধ হয়, এবং ১৯১৬ সালে যে ভারতশাসন আইন (Government of India Act) পাস্ হয়, তাহাতে আছে :—

"Be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of His Majesty resident therein shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office or employment under the said Company."

১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন,—

"And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to offices in our service."

আইনে ও মহারাণীর 'ঘোষণায় ইহাই বলা হইয়াছে যে ভারতবাসীরা জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে সকল কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবে। কোথাও বলা হয় নাই যে তাহারা উচ্চপদগুলির কেবল সিকি অংশ বা অষ্টমাংশ বা অর্দ্ধাংশ পাইবে। কিন্তু মাননীয় বিচারপতি আবদুররহীম ব্যতীত পাব্লিক সার্বিস্ কমিশনের আর সমুদয় সভ্য বলিতেছেন যে সিবিলসার্বিসে এবং উচ্চ পুলিস বিভাগে মোটামুটি বার আনা কাজ ইংরেজেরা পাইবে, এবং সিকি কাজ দেশী লোকেরা পাইতে পারিবে। ইহাতে আমাদের খুবই আপত্তি আছে। সব বিভাগের কার্য্যে দেশী লোকদের

দাবীই প্রথম। কেবল ভারতবর্ষে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা, কাজ দেওয়া উচিত, এবং ইংরেজকেও পরীক্ষা দিতে দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রকারে যাহারা যত কাজ পায়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই।

আমাদের দ্বিতীয় আশঙ্কা এই ছিল যে কমিশন হয় ত উচ্চপদগুলির বেতন বাড়াইয়া আমাদের খরচ বাড়াইয়া দিবেন। তাহাও ঘটিয়াছে। কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে রাজকর্ম্মচারীদের বেতন বাবদে বার্ষিক ৬২,২৫,৭৬০ টাকা খরচ বাড়িবে। বলা বাহুল্য, ইহার অধিকাংশ ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পাইবে।

কমিশনের এইরূপ যে যে প্রস্তাবে ভারতবাসীদের অধিকার খর্ব্ব হইবে, বা অনাবশ্যক ব্যয় বাড়িবে, সে-সকল প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টের নামঞ্জুর করা কর্ত্তব্য।

ছোট-ছোট কোন-কোন বিষয়ে কমিশন ন্যায়সঙ্গত ও ভাল প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু প্রায়ই আবার অন্য এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে তদ্দ্বারা ভাল প্রস্তাবের সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নষ্ট হইয়াছে।

কমিশন সিবিল সার্বিসের জন্য ভারতে ও বিলাতে যুগপৎ পরীক্ষার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন; বিচার ও শাসনবিভাগ পৃথক্ করা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই; সিবিল সার্বিস পরীক্ষার বয়স ১৭-১৯ বৎসর করিয়াছেন; সিবিল সার্বিসের পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকদের শিক্ষানবিশীর কাল বৃদ্ধি করিয়া তিন বৎসর করিয়াছেন; ৪০টি সেশুন-ও-জেলা-জজিয়তী ব্যারিষ্টার ও উকীলদিগকে দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন; প্রাদেশিক সার্বিসের লোকদের জন্য ৪১টি উচ্চপদ রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; এবং বৎসরে সিবিলসার্বিসের ৯টি কাজে ভারতবর্ষে লোক নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন; তন্মধ্যে ২টি গবর্ণমেণ্ট বাছিয়া ২ জন গ্র্যাজুয়েটকে দিবেন, এবং বাকী ৭টি, মনোনীত (nominated) লোকদের পরীক্ষা করিয়া যোগ্যতমদিগকে দিবেন।

মাননীয় বিচারপতি আবদুর রহীম স্বতন্ত্র একটি রিপোর্ট লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি সাহসের সহিত অনেক সুযুক্তিপূর্ণ ন্যায্য প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রকার ন্যায়-পরায়ণতা দ্বারা তিনি ভারতবাসীদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।

ট্যাক্স বৃদ্ধির গুজব।

এইরূপ গুজব শুনা যাইতেছে যে আগামী মার্চ্চ মাসে রাজস্বসচিব সার উইলিয়ম মেয়ার ১৯১৭-১৮ সালের আয়-ব্যয়ের যে বজেট বা আনুমানিক হিসাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবেন, তাহাতে নূতন ট্যাক্স বসাইয়া বা বর্ত্তমান কোন-কোন ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করিয়া অধিক আয়ের ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতবর্ষের লোকদের আর বেশী ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা নাই। বিশেষতঃ, এখন যুদ্ধের জন্য বিস্তর লোকের আয় কমিয়া গিয়াছে; অথচ নানা প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় ব্যয় বাড়িয়াছে। ইহাতে লোকের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এখন ট্যাক্স বাড়াইলে দুর্ব্বহ হইবে। গত বৎসর রাজস্বসচিব ট্যাক্স বাড়াইয়া প্রায় ছয় কোটি টাকা আয় বাড়াইয়াছিলেন। ইহা ঠিক্ বটে যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বাড়িয়াছে ও বাড়িবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহের, ট্যাক্স বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য উপায়ও আছে। ইউরোপে অনেক দেশে আইনে স্পষ্টতঃ এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যে, যুদ্ধের জন্য যে-যে ব্যবসাতে খুব বেশী লাভ হইতেছে, সেই লাভের অধিকাংশ ন্যায়তঃ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। ভারতবর্ষেও এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। যুদ্ধ হওয়ায় পাটের কল, কয়লার খনি, চা বাগান, এবং লোহা-ইস্পাতের কারখানার মালিকদের খুব লাভ হইতেছে। তাহাদের অতিরিক্ত লাভের বেশী অংশ যে-কোন আকারে গবর্ণমেণ্টের হাতে পৌঁছা উচিত। কিন্তু এই-সকল লোকেরা ধনী ও ক্ষমতাশালী। টাকা দিতে হইলে তাহারা খুব চীৎকার করিবে ও আন্দোলন করিবে। গবর্ণমেণ্ট যদি তজ্জন্য তাহাদের উপর ট্যাক্স বাড়াইতে ভয় পান, তাহা হইলে আশা করি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, দরিদ্র ও আন্দোলনে-অসমর্থ লোকদের উপরও ট্যাক্স্ বসাইবেন না। আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে যুদ্ধের জন্য যাহাদের লাভ বাড়িয়াছে, হয় তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া গবর্ণমেণ্ট ব্যয় নির্ব্বাহ করুন; নতুবা যে আয় আছে তাহা দ্বারাই কোন-প্রকারে ব্যয় নির্ব্বাহ করুন।

সাম্রাজ্যের যুদ্ধমন্ত্রণাসভায় ভারতের "প্রতিনিধি"।

আগামী মার্চ্চ মাসে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি যুদ্ধমন্ত্রণাসভা হইবে। যুদ্ধ কেমন করিয়া চালাইলে শীঘ্র জয়লাভ হইতে পারে, কি-কি সর্ত্তে যুদ্ধ শেষ করিয়া সন্ধি করিতে সম্মত হওয়া যাইতে পারে, এবং যুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন আদি যে-সকল প্রশ্ন উঠিবে, তাহার সমাধানই বা কিরূপে হইতে পারে,—এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা এই সভায় হইবে। ইহাতে ইংলণ্ড, ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহ ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকিবেন। ভারতবর্ষেরও প্রতিনিধি থাকিবেন, ইহা ভাল কথা; কিন্তু সেই প্রতিনিধি হইবেন ভারতসচিব চেম্বারলেন সাহেব। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আগ্রা-অযোধ্যার ছোটলাট সার জেম্‌স্ মেষ্টন, সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং বিকানীরের মহারাজাকে মনোনীত করিয়াছেন। ভারতবাসীরা এরূপ বন্দোবস্তে অসন্তোষ প্রকাশ করায় বড়লাট বলিয়াছেন, যে, মন্ত্রণা-সভাটি সাম্রাজ্যের ভিন্ন-ভিন্ন অংশের গবর্ণমেণ্টগুলির সভা, সুতরাং গবর্ণমেণ্টই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছেন; উপ-নিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীরা সভার সভ্য হইবেন, এবং এক-একজনের এক-একটি ভোট থাকিবে; কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা-মত অন্যান্য মন্ত্রীদিগকেও সঙ্গে আনিতে পারিবেন, এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ-বিশেষ কোন-কোন বিষয়ে সভায় বক্তৃতা করিতে বলিতেও পারিবেন; ভারতশাসননীতির জন্য ভারতবর্ষের সচিব পার্লেমেণ্টের নিকট দায়ী, সুতরাং তিনি ভিন্ন আর কেহ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হইতে পারেন না; কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে তিন জন মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারাও যথাসম্ভব কোন-কোন বিষয়ে সভায় নিজেদের মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন। বড়-লাট সাহেবের এই যে-সব কথা, সমস্তই বুঝিলাম। কিন্তু তাঁহার যুক্তি আমাদের আপত্তির ভিত্তি পর্য্যন্ত পৌঁছিল না। উপনিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীরা তাহাদের স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয়, এবং পরোক্ষভাবে তাহাদেরই দ্বারা নির্ব্বাচিত; অন্যান্য মন্ত্রীরাও তাই। এইসব প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী নিজ-নিজ দেশের অবস্থা, স্বার্থ ও দাবী খুব ভাল করিয়া জানেন ও বুঝেন, এবং তাঁহারা পূর্ণমাত্রায় স্ব স্ব দেশের প্রতি টান রাখিয়া কথা কহিবেন। ভারতবর্ষের জন্য যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা উপরে-উপরে দেখিতে যেরূপই হউক, উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভারতসচিব ভারতবাসী নহেন, ভারতবর্ষের লোকদের দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মনোনীত হন নাই, ভারত-বর্ষের বিষয়ে খুব অজ্ঞ। এবং ভারতবর্ষের স্বার্থ ও দাবীর প্রতি তাঁহার টানের কোন পরিচয় কখন পাওয়া যায় নাই। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য যে তিন জন মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারাও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে আমাদের দ্বারা মনোনীত হন নাই। তিন জনের মধ্যে একজন ভারতসচিবেরই মত বিদেশী ও রাজকর্ম্মচারী। তিনি মুখে ভারতবাসীদের প্রতি টান দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু কাজে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বরং ঔপনিবেশিকদের যে দল ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অংশীদার হইতে না দিয়া, অধিকন্তু তাহাকে উপনিবেশগুলিরও অধীন করিতে চায়, সেই দলের দূত বা চাঁই লায়নেল কার্টিসের সহিত একমত হইয়া তাহাকে পরামর্শ দিয়াছেন। বাকী থাকেন সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও বিকানীরের মহারাজা। আশা করি তাঁহারা ভারতসচিবকে সুপরামর্শই দিবেন, এবং ভারতসচিবও তাঁহাদিগকে মন্ত্রণাসভায় মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিবেন। কিন্তু ভারতসচিব তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য নহেন; এবং তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় কিছু বলিতে পাওয়া না পাওয়া চেম্বারলেন সাহেবের অনুগ্রহ-সাপেক্ষ। তাঁহাদের ভোট না থাকায় তাঁহাদের সুযুক্তিপূর্ণ ন্যায্য কথাও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। আমাদের আপত্তি ও অসন্তোষের কারণ সংক্ষেপে বলিলাম। যাহা হউক, আমাদের স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয় দুইজন যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে পারেন, তাহা হইলে মন্দির ভাল যতটা হইতে পারে, তাহা হয়ত হইবে।

যুদ্ধমন্ত্রণা-সভায় ভারতবর্ষকে অন্ততঃ নামেও যে কিছু বলিতে দেওয়া হইবে, ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষয় মনে হইতে পারে বটে। কিন্তু যিনি বাস্তবিক প্রতিনিধি নন,

যিনি ভারতবর্ষের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিবেন না, ভারত সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান নিতান্ত কম, যাঁহার নিজের স্বার্থ ও মঙ্গল ভারতবর্ষের স্বার্থ ও মঙ্গলের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নহে, তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা বরং কোন প্রতিনিধি না-থাকিলে এক হিসাবে ভাল হইত। কারণ, এখন যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে চেম্বারলেন সাহেব যাহা বলিবেন, তাহাতে যদি ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অনিষ্ট হয়, এবং আমরা তজ্জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করি, তাহা হইলে ইংরেজরা বলিবেন, "কেন, ইহা ত তোমাদের প্রতিনিধির মত অনুসারে করা হইয়াছে?" অথচ তিনি আমাদের প্রতিনিধি মোটেই নন। সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ কিম্বা বিকানীরের মহারাজা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত কি না, তাহার আলোচনা করা অনাবশ্যক। কারণ, তাঁহারা ত আমাদের প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছেন না, এবং যুদ্ধমন্ত্রণা-সভায় তাঁহাদের কোন ভোটও থাকিবে না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ভারতসচিবকে পরমর্শ দিবার জন্য প্রেরিত হইতেছেন।

সিংহমহাশয়কে প্রদত্ত বিদায়ভোজ

উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন, I feel very proud indeed that I have been chosen as one of the representatives of the Government of India to go to the War Conference, "আমি ভারতগবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ায় বাস্তবিক খুব গৌরব বোধ করিতেছি।" তিনি যে আমাদের প্রতিনিধি তাহা তিনিও মনে করেন না; তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রতিনিধি। যাহা হউক, তিনি খুব যোগ্য লোক; যদি কোন-প্রকারে ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে।

এই ভোজ উপলক্ষে সার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বর্দ্ধমানের মহারাজা, এবং সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বক্তৃতা করেন। তন্মধ্যে গুপ্ত মহাশয়ের বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল, এবং তাহাতে অনেক সত্যকথা স্পষ্টবাদিতার সহিত বলা হইয়াছিল। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন :—

> They had sometimes heard complaints of the inadequacy of India's assistance in the war. He could not admit it. If there were any such failing, it was due, not to the people, but to the Government, and to the military policy which had crushed the martial spirit out of the people. It was to be hoped that the great lesson would not be lost on the Government or the people. If there was to be another war, the man-power of India must come to the front. He had faith in the British Government. He hoped that after the great proof of loyalty that had been afforded they would henceforth be treated with confidence, that everything would be done to start a national army and to open the commissioned ranks to India.

"কখন কখন এরূপ অভিযোগ শুনা যায় যে যুদ্ধে ভারতবর্ষ যথেষ্ট সাহায্য করে নাই। আমি তাহা স্বীকার করি না। যদি ভারতবর্ষের কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, সে দোষ ভারতবাসীর নয়, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী এবং দায়ী গবর্ণমেণ্টের সেই সামরিক নীতি যাহার দ্বারা দেশের লোকদের সামরিক তেজস্বিতা নিষ্পেষিত হইয়াছে। যদি আর একটা যুদ্ধ হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের লোকবল সম্মুখীন করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যেরূপ রাজভক্তি দেখাইয়াছে, তাহাতে, আশা করি, গবর্ণমেণ্ট অতঃপর তাহাদিগকে বিশ্বাস করিবেন, এবং জাতীয় সেনাদলগঠন করিবার জন্য ও সেনানায়কের পদ দেশের লোকদিগকে দিবার নিমিত্ত যাহা কিছু করা দরকার, তাহা গবর্ণমেণ্ট করিবেন।"

ভোজ সম্বন্ধে একটি অবান্তর কথা দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। বিলাতী রীতি অনুসারে এই ভোজের ভোজনকারীদিগকে দশটাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইয়াছিল। তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ভোজের যে বিজ্ঞাপন কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল, যে, মদ ব্যতীত ("exclusive of wines") ১০ টাকা করিয়া লাগিবে! ভোজে মদ খাওয়া হইয়াছিল কি না জানি না; সম্ভবতঃ হইয়াছিল। যাহাতে মানুষকে পশুর অধম করে, এবং যে সামাজিকরীতি পাশ্চাত্য নানাদেশে ক্রমশঃ বর্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, তাহার গোলামী অনুকরণ সেই দেশে করিবার কি আবশ্যক যে-দেশে সুরাপান ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে পাতিত্যের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যে-দেশে শৌণ্ডিক অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয়, এবং যথায় উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সুরাপান সামাজিক রীতি নহে? ভোজের বিজ্ঞাপনে এমন কোন-কোন স্বাক্ষরকারীর নাম দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম যাঁহারা অতি সাধুচরিত্র এবং নিজে সুরাপান বা অন্য কোন নেশা করেন না। তাঁহাদিগকে সমুদয়

বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিবার অনুমতি লওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাঁহাদের নাম এরূপ বিজ্ঞাপনের নীচে থাকায় বড় কুফল হয়। এইজন্য ইহা বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক, যে, কোন সাধারণ কাজে তাঁহাদের নাম ব্যবহার করিতে সম্মতি দিবার পূর্ব্বে তাঁহারা সব বৃত্তান্ত জানিয়া তবে অনুমতি দেন। তাঁহারা নিজে নিন্দা প্রশংসা গ্রাহ্য না করিতে পারেন, কিন্তু সমাজের মঙ্গলার্থ ইহা করা একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাঁহাদের নাম কেন ব্যবহৃত হইলে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলে ভাল হয়।

জাতি ভেদে সৈনিক হইবার পৃথক্ ব্যবস্থা।

পৌষের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে "ভারত-প্রবাসী সমস্ত ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার প্রস্তাব" সম্বন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার শেষ কথা ছিল এই:—

> "সশস্ত্র হওয়া সম্বন্ধে দেশীলোক এবং ইংরেজ ও ফিরিঙ্গীর বর্ত্তমান পার্থক্য আরও বাড়ান অ-বর অবাঞ্ছনীয় মনে করি। যদি এরূপ কিছু করিতেই হয়, তাহা হইলে বর' দেশী লোকদিগকেও ভলান্টীয়ার হইয়া যুদ্ধ শিখিবার অধিকার দেওয়া হউক, এবং সমর্থ বয়সের শারীরিক-যোগ্যতাবিশিষ্ট সমুদয় দেশী লোককে সৈনিক হইতে বাধ্য করা হউক।"

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে ভারতপ্রবাসী সমুদয় সমর্থ বয়সের ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাকে (European British Subjects) সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার জন্য আইন করা হইবে; এবং তাহারই প্রারম্ভিক আয়োজন-স্বরূপ এইরূপ সমুদয় পুরুষের নাম রেজিষ্টরী করা হইতেছে। ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের যুবকদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইবে, ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়সের পুরুষদিগকে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানে সামরিক কার্য্য করিতে বাধ্য করা হইবে, এবং ৪১ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের লোকদিগকে স্থানীয় (অর্থাৎ তাহাদের বাসস্থানের নিকটে) সামরিক কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করা হইবে।

ভারতবাসীদেরও স্বতন্ত্র সৈন্যদল গঠিত হইবে; কিন্তু কাহাকেও সিপাহী হইতে বাধ্য করা হইবে না, সিপাহী হওয়া না-হওয়া লোকের ইচ্ছাধীন থাকিবে। তাহার কারণ বড়লাট এই বলিয়াছেন যে সমুদয় ভারতবর্ষে সমর্থ বয়সের শারীরিক-যোগ্যতা-বিশিষ্ট যত লোক পাওয়া যাইতে পারে, সমুদয়কে যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য যুদ্ধশিক্ষক পাওয়া কঠিন, এবং অস্ত্র জোগানও কঠিন। সকলের জন্য গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধশিক্ষক ও অস্ত্র যোগাইবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ইহা সত্য কথা। তাহা হইলেও ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে "ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা"দিগকে যোদ্ধা বানান গবর্ণমেণ্ট যত দরকারী মনে করিতেছেন, ভারতবাসীদিগকে যোদ্ধা বানান তত দরকারী মনে করিতেছেন না। এরূপ মনে না করিবার কারণ যাহা তাহাতে আমরা গৌরব বোধ করিতে পারি না।

যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবাসীদিগকে সিপাহী হইবার জন্য আহ্বান করিবেন, আমরা বড়লাটের এই সঙ্কল্পের সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। যাঁহারা সিপাহী হইবেন, তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানে, বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে, সামরিক কর্ত্তব্য করিতে হইবে। আমাদের এ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব আছে। ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়সের সমস্ত যুবককে যেমন যুদ্ধ শিখিতে বাধ্য করা হইবে, ভারতবর্ষের ঐ বয়সের সমুদয় যুবককে গবর্ণমেণ্ট সেরূপ শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত সহজে শীঘ্র করিতে পারিবেন না বটে; কিন্তু ষোল বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সের সমুদয় ছাত্রকে যুদ্ধ শিখিতে বাধ্য করিতে সরকার নিশ্চয়ই পারেন, এবং তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্তও করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ইহা করুন। ইহাতে ভারতরক্ষার উপায় ভবিষ্যতে সহজে হইতে পারিবে, এবং ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল হইবে ও নিয়মানুগত্য বাড়িবে। যে-সকল দেশী লোক যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইবে, তাহাদিগকে কমিশনপ্রাপ্ত সেনানায়ক (commissioned officer) হইবার অধিকার দেওয়া হউক। বর্ত্তমানে অতি সাহসী ও রণদক্ষ দেশী সৈনিকও নিম্নতম কমিশন পায় না। আর একটি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকা দরকার। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ও এক শ্রেণীর ফিরিঙ্গীদিগকে যোদ্ধা হইতে বাধ্য করিয়া ভারতবাসীদিগকে যুদ্ধে অজ্ঞ ও নিরস্ত্র রাখিলে কিরূপ অসন্তোষ ও কুফল হইতে পারে, তাহা আমরা পৌষের কাগজে বিবিধ প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম। এসব কথা গবর্ণমেণ্ট যে জানেন না বা

বুঝেন না, তাহা নয়। কেবল অসন্তোষ বা সন্দেহ দূর করিবার জন্যই যদি গবর্ণমেণ্ট অল্পসংখ্যক দেশী লোককে সিপাহীদলে গ্রহণ করেন, এবং তদপেক্ষা বেশী লোককে শিক্ষা দিতে ও অস্ত্র জোগাইতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে তাহাতে কোন সুফল হইবে না; অধিকন্তু অসন্তোষ বাড়িবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারীদের প্রতি এইরূপ আদেশ থাকা দরকার যে তাঁহারা ভারতরক্ষার জন্য যত বড় সেনাদল প্রয়োজন, তাহার মত লোক যেন গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট-ছোট দেশ রক্ষার জন্য ৩০, ৪০, ৫০, ৬০ লক্ষ এবং তদপেক্ষা বেশী সৈন্য শিক্ষিত করা হইতেছে। অতএব ভারতবর্ষে কত লক্ষ সৈন্য চাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার মধ্যে ভারতপ্রবাসী "ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা"দের মধ্য হইতে যত পাওয়া যায়, লওয়া হউক; বাকী সংখ্যা দেশী লোক লইয়া পূর্ণ করা হউক।

আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন আছে, কিম্বা আমাদিগকে সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট এরূপ মনে না করিতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটিকে প্রধানতঃ সন্তোষ অসন্তোষ বিষয়ক মনে করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা অনেক দিন হইতে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছি এবং পূর্ব্বে-পূর্ব্বে লিখিয়াছিও যে বর্ত্তমান যুদ্ধের পর, এশিয়াতে, আরও মহাযুদ্ধ হইতে পারে, এবং তাহা চীন ও ভারতবর্ষ লইয়া হইবার সম্ভাবনা। এখন যাঁহারা ইংরেজের বন্ধু তখন তাঁহারা বন্ধু না থাকিতে পারেন। এবিষয়ে বর্ত্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণরিভিউএ একজন জাপানী অনেক কথা পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ হইতে ৫০ লক্ষ লোককে সৈনিক করিয়া সুশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আরও যে-যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, এবং কেন ভারতবর্ষ রক্ষার বন্দোবস্ত এখনই করা উচিত, তাহা ঐ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।

কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে কল্পনার আশ্রয় না লইয়া বাস্তব অবস্থা ধরিয়া বিচার করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা করিতেছেন, তাঁহারা বাস্তবিক ভারতবর্ষে সামাজিক অবস্থা আগে কিরূপ ছিল, এবং এখন কি প্রকার আছে, তাহা বিবেচনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন, আগে ভারতে কেবল চারিটি জাত ছিল এবং তাহারা প্রত্যেকে নিজের নিজের কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বাস্তবিক কিন্তু তখনও এখনকার মত বহুসংখ্যক জাত ছিল, এবং কোন জাতের লোকই সম্পূর্ণরূপে নিজের কৌলিক কাজে আবদ্ধ থাকিত না। ইহার প্রমাণ মনুসংহিতায়, মহাকাব্য, পুরাণ, নাটক প্রভৃতিতে, বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে, ইতিহাসে বিস্তর পাওয়া যায়। আর এখনকার ত কথাই নাই। ১৯০১ সালের ভারতবর্ষের সেন্সাস্ রিপোর্টে ভারতীয় জাতি সকলের একটি তালিকা আছে। তালিকাটি সাড়ে তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা ব্যাপী, এবং প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৭৫ হইতে ৮০টি নাম আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চারি হাজারের উপর জাতের নাম আছে। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু। কৌলিক বৃত্তির বিষয় বিচার করিলেও দেখা যায়, যে, শুধু বাংলা দেশ ধরিলেও কোন জাতের লোকই নিজের জাত-ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সন্তুষ্ট থাকে না।

ভারতবর্ষে এমন কোন জাতি নাই যাহা বিশুদ্ধ। সমুদয় জাতির মধ্যেই খুব রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। ইহা ভারতীয় ও ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত।

তাহার পর, শাস্ত্রে যে চারিটি আশ্রমের কথা আছে, তাহা কার্য্যতঃ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেদিন সভাবাজার রাজবাটীতে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সম্পর্কে সভা হইয়াছিল, তাহার বক্তাদের মধ্যে অনেকেরই বয়স পঞ্চাশের উপর; কিন্তু তাঁহারা কেহই বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নাই, করিবেনও না। ব্রাহ্মণ বালকেরা উপবীত পরিয়া আড়াই পা অগ্রসর হন; তাহার পর তাহাদিগকে টানিয়া লওয়া হয়। ইহাই হইল ব্রহ্মচর্য্য! তাহার পর গার্হস্থ্যটা হয় বটে; কিন্তু বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য কে কে অবলম্বন করিয়াছেন বা করিবেন, তাহা জানি না। সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সভাপতি ত কৌলিক বৃত্তিতে আবদ্ধ নন; অথবা সত্য বলিতে গেলে কৌলিক কাজটিই তিনি করেন না, আর সব করেন। অন্যান্য

বক্তারা কে কি পরিমাণে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে চলেন, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে খুব কৌতুকজনক হয়। যাহা কখন ছিল না, এবং এখনও নাই, তাহা লইয়া একটা গোলমাল করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

চারি আশ্রমের আদর্শটি বেশ সুন্দর। কিন্তু ইহা অক্ষরে অক্ষরে, অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে, অনুসৃত হইতে পারে না। তবে, ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটির অনুসরণ আমরা সকলেই করিতে পারি, এবং তাহা করাও কর্ত্তব্য। প্রথমে শিক্ষার অবস্থা। তখন ভোগবিলাস আমোদপ্রমোদের উপর ঝোঁক না দিয়া দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় ও বৰ্দ্ধনের চেষ্টা করিবার সময়। জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইবার সুযোগ তরুণবয়স্ক পুরুষ ও নারী এই সময়ে পায়। ইহাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। তাহার পর গার্হস্থ্য। এই সময়ে প্রধানতঃ পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রযত্নে ধর্ম্মপথে থাকিয়া করিতে হয়। তাহার পর নির্জ্জনে প্রধানতঃ পারমার্থিক বিষয়ের চিন্তায় কালযাপন করা কর্ত্তব্য, এবং তাহা করিতে সুস্থপ্রকৃতির লোকদের স্বভাবতঃ ইচ্ছাও হয়। তাহার পর ধার্ম্মিক লোকের মনের এমন এক অবস্থা আসিতে পারে যখন তিনি বিশ্ববাসী সকলের প্রীতির উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। অমুক পর, তাহার সাহায্য লইব না, এই অহঙ্কার আর তখন থাকে না। বাস্তবিক কোন মানুষই সম্পূর্ণ নিজের বা নিজের পরিবারের লোকদের সাহায্য ও সেবার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। আমরা প্রতিদিন যত জিনিষ ব্যবহার করি, তাহার কতগুলি নিজে প্রস্তুত করি, কতগুলিই বা পরিবারের লোকে করে? স্বদেশবাসীরাও সমস্ত নিত্যব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করেন না। অল্পাধিক পরিমাণে সব দেশেরই অবস্থা এইরূপ। শরীরের জন্য আবশ্যক জিনিষ সম্বন্ধেই যে এই কথা খাটে, তাহা নয়; আত্মার অন্ন যে ভাব চিন্তা আদর্শ আদি, তাহাও কত দেশ, কত যুগ, কত মানুষের নিকট হইতে আসিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সুতরাং জীবনের শেষ আশ্রমে মানুষের মনে এই ভাব আসা একটুও অস্বাভাবিক নহে, যে, আমরা বিশ্ববাসী সকলের কৃপার, প্রীতির ভিখারী, সকলেরই প্রেমের উপর আমাদের নির্ভর।

অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়ক সমিতি।

আসামের ও বাংলা দেশের যে-সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষার পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাঁহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের উন্নতি সাধন করিবার জন্য একটি সমিতি আছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, ইহার সম্পাদক। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইহার বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তাহা হইতে জানা যায়, যে, এই সমিতি ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়, এবং গত আট বৎসরে ইহা দ্বারা ঢাকা, মৈমনসিং, যশোর, চব্বিশ পরগণা, ত্রিপুরা, রংপুর ও নোয়াখালি জেলায় ৬০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য অর্থাভাব না হইলে সমিতি আরও অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতেন। ১৯১৬ সালের গোড়ায় সমিতির ৫০টি বিদ্যালয়ে ১৭৭৫ জন বালক ও ১৯৬টি বালিকা পড়িত। তাহার পর দশটি নূতন বিদ্যালয় খোলা হয়; তাহাতে ২৪০টি ছাত্র ও ৪টি ছাত্রী ভর্ত্তি হয়। ১৯১৬র শেষে সমিতির ষাটটি স্কুলে ১৯১৬ জন ছাত্র এবং ২৬৩ জন ছাত্রী ছিল। বৎসরের মধ্যে ১৪১ জন ছাত্র ও ৬৭ জন ছাত্রী বাড়িয়াছে। যশোরের মালিয়াট কেন্দ্রে এবং ঢাকার বেরাশ কেন্দ্রে চাষের অবস্থা ভাল হইলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়িত।

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয় যে কিরূপ সামান্য ব্যয়ে আমাদের দেশে কত বেশী ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহা একাধিক বার বলা হইয়াছে যে মাসিক দুই টাকা সাহায্য দিলে পঞ্চাশটি ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের আনুকূল্য করা যাইতে পারে। ১৯১৬ সালে যে ১০টি স্কুল খোলা হইয়াছে, তাহারা সমিতি হইতে প্রত্যেকে মাসিক দুই টাকা সাহায্য পায়, এবং তাহাতেই তাহাদের কাজ সন্তোষজনকরূপে চলিতেছে। সম্পাদক মহাশয় রিপোর্টে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

"Is it too much to expect that a thousand ladies and gentlemen in Bengal and Assam would come

forward with a monthly subscription of Rs. 2 each to enable us to open a thousand new schools for the diffusion of the blessings of education among the backward classes ?"

তিনি ১০০০ ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকের প্রত্যেকের কাছে মাসে দুটি করিয়া টাকা চাহিতেছেন। তাহা হইলে হাজারটি নূতন স্কুল খুলিতে পারিবেন, এবং তাহাতে অনেক হাজার ছাত্র ও ছাত্রী পড়িবে। ইহা মোটেই দুরাশা নহে। বাংলা দেশে এমন এক হাজার কেন, অনেক হাজার লোক আছেন, যাঁহারা অনায়াসে মাসে দুটাকা করিয়া দিতে পারেন। তাঁহারা অগ্রসর হউন। অনেক ছাত্র সিগারেটে মাসে দুটাকার বেশী খরচ করেন। তাঁহারা এই কুঅভ্যাস ত্যাগ করিয়া দেশের নিরক্ষর দরিদ্র বালকবালিকাদের জন্য অর্থ সাহায্য করুন। সম্পাদক মহাশয় বড়ই আনন্দ ও আশার কথা শুনাইয়াছেন। যাঁহারা পারেন, তাঁহারা তাঁহাকে একবারে এক বৎসরের ২৪ টাকা দিয়া ফেলুন; তাঁহাকে যেন আদায় করিবার জন্য ব্যয় ও কষ্টস্বীকার করিতে না হয়। গত বৎসর সমিতি সামান্য ৮৩৲ টাকা মাত্র চাঁদা পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ৫০০, বাবু প্রভাসচন্দ্র মিত্র ২২০, বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ ২০০, বাবু জে, এন্, রায় ১২৫, বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ ১০০, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদারের পত্নী ৬০, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ৫০, বাবু এন্ এন্ সরকার ৫০ এবং বাবু বি এল্ মিত্র ৫০ টাকা দিয়াছিলেন।

প্লেগে মৃত্যু।

খুন, ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামায় একজন মানুষ মরিলেও লোকের তাহাতে দৃষ্টি পড়ে। দুটা রেলওয়ে ট্রেনে ধাক্কা লাগিয়া মানুষ মরিলে তাহার কত বর্ণনা খবরের কাগজে বাহির হয়। জাহাজ ডুবি হইয়া তাহাতে মানুষ মরিলে লোকের প্রাণে আঘাত লাগে। যুদ্ধে যে হাজার হাজার মানুষ মরিতেছে, তাহার ত কথাই নাই। প্রথম প্রথম যুদ্ধে মৃত্যুসংখ্যার আধিক্যে মানুষ স্তম্ভিত হইত; এখন সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যে লক্ষ লক্ষ শিশু যুবা বৃদ্ধ মানুষের চোখের আড়ালে প্লেগে মরিতেছে, তাহা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। ভারতবাসীদের ইহা সহিয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টেরও ইহা সহিয়া গিয়াছে। প্লেগ নির্ম্মূল করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা গবর্ণমেণ্টও করিতেছেন না, দেশের শিক্ষিত ও সচ্ছল অবস্থার লোকেরাও করিতেছেন না। সপ্তাহে সপ্তাহে মৃত্যুর তালিকা বাহির হইতেছে; এখন আমরা তাহা আর পড়িয়াও দেখি না। বর্ত্তমান যুদ্ধে যত মানুষ মরিয়াছে, পৃথিবীর আর কোন যুদ্ধে তত মানুষ মরে নাই! কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্লেগ ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষাও বেশী লোক মারিয়াছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১৪৭৭৬ জনের প্লেগে মৃত্যু হইয়াছিল, এবং ১৮৭২৬ জন প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রতি সপ্তাহে কমবেশী এইরূপ মৃত্যু হইতেছে। বৎসরের সমুদয় সপ্তাহের অঙ্কগুলি যোগ দিলে বুঝা যায় যে কত লোক বৎসরে প্লেগে মরে। সপ্তাহে গড়ে যদি দশহাজার মরে বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা হয় ৫২০০০০। কুড়ি বৎসর হইল ভারতবর্ষে এই ভীষণ মহামারীর আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব ইহাতে যে এক কোটির উপর লোক মরিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার বিষ ইন্দুরের দ্বারা বা অন্য উপায়ে সংক্রামিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার উৎপত্তির হেতু যে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও তজ্জনিত অপরিচ্ছন্নতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি, দেশের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার, এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনে সকলকে অভ্যস্ত করা,—এই তিন উপায় অবলম্বন না করিলে প্লেগ নির্মূল হইবে না। ইহা যে নির্মূল হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডে ও ইউরোপের আরও অনেক দেশে আগে মধ্যে-মধ্যে খুব প্লেগের মড়ক হইত। এখন আর হয় না। এশিয়ায় এখনও চীন, ভারতবর্ষ, এবং আরও ২।১টা দেশে প্লেগের মড়ক হয়। এশিয়ার একটি দেশ হইতে তথাকার গবর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীদের চেষ্টায় প্লেগ দূরীভূত হইয়াছে। তাহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। তথাকার সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৯০৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বরের পর আর সেখানে কাহারও এই রোগ হয় নাই।

শিক্ষকদের বেতন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কন্‌ভোকেশ্যন বা উপাধিদান-সভায় বড়লাট বলেন যে শিক্ষাদান কার্য্য অতি মহৎ; শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপায়ে শিক্ষকতার গৌরব বৃদ্ধি করা আবশ্যক। তাহার পর ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরদের দিল্লীতে যে মন্ত্রণাসভা হয়, তাহার প্রারম্ভিক বক্তৃতাতেও বড়লাট শিক্ষকদের বেতনবৃদ্ধির প্রয়োজন বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদের বেতন বাস্তবিকই বড় কম। সরকারী কাজের আর যে কোন বিভাগেই যান, দেখিতে পাইবেন, শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীদের চেয়ে কম যোগ্যতার লোকেরা বেশী বেতন পাইতেছে।

বাংলা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর একটি সার্কুলার জারি করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কোন এম্‌-এ বা এম্‌-এস্‌সী ৫০ টাকার বেশী বেতনে, কোন বি-এ বা বি-এস্‌সী ৩৫ টাকার বেশী বেতনে, এবং কোন আই-এ বা আই-এস্‌সী পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি ২৫ টাকার বেশী বেতনে কাজে বাহাল হইতে পারিবেন না; যদিও পরে তাঁহাদের বেতন বাড়িতে পারিবে। মাননীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় এই সার্কুলারের প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন যে ইহা কি সত্য নয় যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও উন্নতির আশা এরূপ যে তাহাতে যোগ্য লোকেরা শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না? গবর্ণমেণ্ট বলেন, না। অর্থাৎ কি না গবর্ণমেণ্টের মতে ঐ বেতনে যোগ্য লোকেরা শিক্ষক হইতে ও থাকিতে পারে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে দক্ষতার সহিত কাজ করিতে পারে। অবাক্ কাণ্ড! অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় এই অনুরোধও করেন যে ডিরেক্টর সাহেবকে এই সার্কুলার পরিবর্ত্তিত করিতে বলা বাঞ্ছনীয় কিনা, তাহা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করুন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতেও রাজী হন নাই। তাহা হইলে বড়লাট সাহেব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে দুই দুই বার বক্তৃতা করিলেন, তাহার মানে কি, জানিতে ইচ্ছা হয়।

শাসন ও বিচার বিভাগে দেশের যে-সব শিক্ষিত লোক কাজ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ও শিক্ষকদের মধ্যে মোটের উপর বিদ্যাবুদ্ধির কোনই পার্থক্য নাই। হাকিমেরাও মর্ত্ত্য লোকের জীব, শিক্ষকেরাও মর্ত্ত্য লোকের জীব। লোকস্থিতির ও উন্নতির জন্য হাকিমদের চেয়ে শিক্ষকদের কাজের প্রয়োজন কম নয়, বরং বেশী। হাকিমরা মানুষকে জেলে পাঠাইয়া সমাজকে নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করেন, শিক্ষকেরা চেষ্টা করেন যাহাতে মানুষ জেলে যাইবার মত কাজই না করে। ইংরেজীতে যে একটা কথা আছে যে, যে একটা স্কুল খোলে সে একটা জেল বন্ধ করে, তাহা খুব সারগর্ভ। শিক্ষকদের অবস্থা ও পদমর্য্যাদা দেশের লোকদের ও গবর্ণমেণ্টের সভ্যতার একটি মাপকাঠি।

সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ শিক্ষালয়েই অধ্যাপক ও শিক্ষকদের বেতনের যেরূপ প্রভেদ দেখা যায়, তাহাও অযৌক্তিক। এম্‌-এ পরীক্ষায় কিছু নম্বর বেশী বা কম পাইলে তাহাতে বুদ্ধিবিদ্যায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ বুঝায় না। অথচ দেখা যায়, একজন শিক্ষক এম্‌-এ তাঁহারই সমান যোগ্য ও সমবয়স্ক একজন অধ্যাপক এম্‌-এর অর্দ্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, সিকি, বা তদপেক্ষাও কম বেতন পাইতেছেন। আমরা জানি এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে স্কুলের বালকদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া কলেজের যুবকদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা কম দায়িত্ব বা যোগ্যতার কাজ নয়। যে শিশু যত অল্প বয়সের তাহাকে শিক্ষা দেওয়া তত সহজ ও তত কম যোগ্য লোকের কাজ, এরূপ মনে করা যে কিরূপ ভ্রম, এবং এই ভ্রান্ত ধারণায় সমাজের কি যে গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

স্বদেশী প্রচেষ্টা ও বর্ত্তমান চড়া বাজার-দর।

যখন স্বদেশী আন্দোলন খুব প্রবল ছিল, তখন অনেকে এই বলিয়া দেশী জিনিষ কিনিতেন না যে উহার দাম বেশী। কিন্তু এখন তাঁহারাও তখনকার দেশী দ্রব্যের দামের চেয়ে অনেক চড়া দরে জিনিষ কিনিতেছেন। বাধ্য হইয়া লোকে যাহা করে, স্বেচ্ছায় দেশানুরাগ-বশতঃ তাহা করিলে দেশের মঙ্গল হয়।

শিল্প ও ধর্ম্ম

বসন্তের সাড়া পাইবামাত্র বনে-উপবনে গাছে-গাছে লতায়-লতায় নবীন কিসলয়মঞ্জরীর উচ্ছ্বসিত বিকাশে রেখার ভঙ্গিমা ও রঙের রঙ্গিমার যে হিল্লোল জাগিয়া উঠে, তাহা যেন বিশ্বশিল্পীর প্রাণের হিল্লোল। বিশ্বশিল্পীর সেই প্রাণের আনন্দ ঋতুতে-ঋতুতে বিশ্বচিত্রের বিচিত্র রাগে যেমন প্রকাশ পায়, কোন সৌভাগ্যবান্ দেশে যখন সেই মহাশিল্পীর সাকরেদ্ মানবশিল্পীদলের অভ্যুদয় হয়, তখন সমস্ত দেশের অন্তরে-বাহিরে, আসবাবপরিচ্ছদে, সৌধকুটীরে, সকল তুচ্ছবৃহৎ উপকরণে, শিল্পীর আনন্দ-হিল্লোল তেমনি বহিয়া যায়। তখন সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠে।

কিছুকাল হইতে যেন বাংলা দেশে শিল্পের আনন্দের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। আমাদের পায়ের শিকলি যতই কঠিন হোক এবং পিঠে দারিদ্র্যের বোঝা যতই গুরুভার হোক, ধূলিমলিন অপরিচ্ছন্ন নগরে অথবা জঙ্গলাকীর্ণ পল্লী-গ্রামে জীর্ণ দালান বা কুটীরের মধ্যে বাস করিয়াও আমাদের দেশচিত্তের একটি কোণায় কোথায় যেন বসন্তের আমেজ লাগিয়াছে। এই যে আমেজ-টুকু লাগা, ইহাই প্রাণের লক্ষণ। একটা প্রকাণ্ড ভাঙা প্রাসাদ, তাহার কক্ষে-কক্ষে দেয়াল খসিয়া পড়ে, সেখানে বাদুড়ের বাসা, স্তম্ভগুলি আর ছাদকে ধরিয়া রাখে না কারণ উন্মুক্ত নীলাকাশ ছাদের আচ্ছাদন ঘুচাইয়া দিয়াছে, সেইখানে একেবারে আঙিনা হইতে স্তম্ভ জড়াইয়া ছাদ ফুটা করিয়া মহাতেজে এক বিশালকায় বটবৃক্ষ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ও শিকড়ের পর শিকড় বিস্তার করিয়া সমস্ত প্রাসাদের ভিত্তিকে দীর্ণ করিয়া প্রাণের জয়স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এ দৃশ্য যেমন—আমাদের এই অশোভন দারিদ্র্যজীর্ণ দেশের মধ্যে শিল্পপ্রাণের আভাসটুকুও তেম্নিতর।

শিল্পের এই প্রথম আভাস সর্ব্বত্রই পাঁচমিশল জিনিসের মত দেখিতে অদ্ভুত গোচের হয়। আভাস বলিয়াই যে অমন হয় তা নয়। প্রথম অবস্থায় শিল্পের প্রাণ আপনার উপযোগী প্রচুর উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনে বলিয়াই সেই উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারে না। সৃষ্টির গোড়ায় যেমন বিক্ষিপ্ত অসংহত নীহারিকা, শিল্পসৃষ্টির আদিতে তেমনি এই নানাস্থানসমাহৃত উপকরণপুঞ্জ।

পরিহাসরসিক স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একটি গানে আছে:—"আমাদের dress হবে English কি Greek তা এখনো কর্ত্তে পারিনি ঠিক্।" সে কথা ঠিক। হিন্দুস্থানী পোষাক, নবাবী আমলের পোষাক, বোম্বাই দেশের পার্সি পোষাক, ইংরেজী পোষাক, সব পোষাকের খিচুড়ি পাকাইয়া আমরা পরি। কিন্তু ইহারি মধ্য হইতে একটা শোভন শিল্পরুচিসঙ্গত পরিচ্ছদ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবেই। মেয়েদের পোষাক কতকটা ঠিক হইয়া আসিয়াছে, তবে তাহাদের পরিচ্ছদের চতুর্দ্দিককে মণ্ডিত করিয়া আছে বিস্তর বিলাতের মায়াজাল, তাহাতে দেশীয় রূপটি ফুটবার ব্যাঘাত আছে। আমাদের দেশে রং সম্বন্ধে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই সঙ্কোচ আছে—পুরুষ গায়ের জামায় বা উত্তরীয়তে রং চড়াইতে লজ্জা পায়, পাছে পথের লোকে সৌখীন বলে এবং মেয়েরা ফিকে জোলো রংয়ের পক্ষপাতী, কারণ বিলাতের লোকেরা loud colour পছন্দ করে না। অথচ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সব রংই জোরগলায় আপনাকে ঘোষণা করে, এদেশে তো প্রকৃতিতে রংয়ের আত্মপ্রকাশে কোথাও কোন লজ্জা নাই। এখনো ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, রাজপুতানায়, কি স্ত্রী কি পুরুষ রঙীন্ পরিচ্ছদ পরিতে ভালবাসে—রং সম্বন্ধে সে-সকল স্থানে মানুষের দিব্যি বোধ আছে, সে-সকল দেশের মানুষ আমাদের মত রংকাণা নয়। তবু যাইহোক্, এই পাঁচমিশলী খিচুড়ি পোষাক পরিতে পরিতেই একদিন ঠিক পোষাকটি আমাদের দেশে বাহির হইবেই। প্রথম আভাসে ঐ রকমই হয়, ইহা লইয়া গোড়াতেই আক্ষেপ করা মিথ্যা।

এই মোটা উদাহরণটি হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অন্যান্য শিল্পের সম্বন্ধেও এই একই ব্যাপার ঘটিতেছে। কবিতা আমাদের দেশে চিরকাল ছিল বটে; কিন্তু তার পায়ে ছিল প্রায়ই পয়ারের বেড়ি আর গায়ে ছিল পদাবলীর নামাবলী। কবিতার যে স্বচ্ছন্দ উদ্দাম নৃত্য-গতি থাকিলে পর সে সমস্ত জীবনের বিচিত্র গতিটাকে নানা

ছন্দের নূপুরঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিতে পারে, সে গতি বাংলা কবিতায় প্রথম সঞ্চার করিবার চেষ্টা করেন সেই মহাকবি, যিনি শুধু কবিতার পা হইতে পয়ারের বেড়ি খসাইয়া ফেলেন নাই, তাহার গা হইতে ঐ নামাবলীটাও ফেলিয়া দিয়া হোমর-মিল্টনের মহাকাব্যের সদৃশ উজ্জ্বলতর পরিচ্ছদে কবিতাদেবীকে ভূষিত করিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিলেন। এদেশে কবিতার সেই নূতন উদ্বোধনে নকল, পাঁচমিশালী জোড়াতাড়া, খিচুড়ি—বাংলা কবিতায় ভূরি ভূরি দেখা দিয়াছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে কাব্য-সৃষ্টির চেষ্টা তখন ছিল। বাংলা কবিতার ঠিক প্রতিভাটি কি, যে পর্য্যন্ত তাহা ধরিতে পারা যায় নাই, সে পর্য্যন্ত এই পাঁচমিশালী ব্যাপার ও নকলের খেলা যে চলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আজ আর বাংলা কবিতাকে ইউরোপীয় কবিতার নকল বলিবার জো নাই, আজ সে তার স্বাধীন নিজস্ব দীপ্তিতে দীপ্যমান। তাহার মধ্যে ইউরোপীয় কাব্যের ভাবরস প্রচুর পরিমাণে আসিয়াছে ও আসিতেছে, কিন্তু সে সমস্তই আধুনিক বাংলা কবিতা স্বাধীনভাবে লইতেছে, আত্মসাৎ করিয়া আপনার রূপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিয়া লইতেছে। এই যে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি, এই যে নিজস্বত্ব, ইহাই বাংলা কবিতাকে বিশ্বমানবের সাহিত্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার দিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, অচিরে এই কবিতা ইউরোপীয় কবিতাকেও নূতন ভাবের ও নূতন রসের উপকরণ জোগাইবে, নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত এবং নূতন রণনে অনুরণিত করিবে।

যদিচ কবিতা শিল্পের মধ্যে গণ্য হয়, তবু কবিতার স্থান অন্যান্য শিল্পের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। কারণ, চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত বা নৃত্যকলা প্রভৃতি শিল্পের উপকরণের মত কবিতার উপকরণ নয়। কবিতার প্রধান উপকরণই ভাষা এবং ভাষা বলিতে বুঝায় কতগুলি চিহ্ন বা symbols, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যহিসাবে যেগুলির কোন মূল্যই নাই। এই ভাষা একএক জাতির বিশেষ জিনিষ; এক ভাষার রস অন্যভাষার ভাষী কোন মতেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেনা। এইজন্য আমরা এতকাল ধরিয়া ইংরেজী শিখিলেও, ইংরেজী ভাষার রসটা যে কি, কোন্ শব্দের কি বিশেষ রং ও গন্ধ, কোন্ বাক্যের কি বিশেষ স্বাদ ও লালিত্য, তাহা ইংরেজি সাহিত্য হইতে ঠিকমত আদায় করিতে পারি নাই। সেই কারণেই ইংরেজী সাহিত্যে আমাদের দেশীয় লোকের কোন রচনাই দীর্ঘকালের মত স্থান পাইতেও পারে নাই। তারপর ভাষায় সঙ্গীত সঞ্চার করিয়া যদিচ কবিতা হয়, তবুও কতটুকু সঙ্গীত তাহাতে সঞ্চারিত হয়? এইজন্য সাহিত্যকে ঠিক Representative artও বলা যায় না বা Presentative Artও বলা যায় না—উপন্যাস-নাট্যে ইহা Representative, লিরিক কাব্যে ইহা Presentative। ইহার ভাষা বাধা হইলেও চিন্তার বাহন বলিয়া সাহিত্যে এক হিসাবে সকল শিল্পের সমন্বয় ঘটিতেছে। ইহা যেমন চিন্তাকে প্রকাশ করে, তেমনি মনের বিচিত্র অনুভূতি ও আবেগও (moods & passions) প্রকাশ করে।

যাক্ সে কথা। বাংলা দেশে সাহিত্য-কবিতার ক্ষেত্র ছাড়াইলেই দেখা যায় যে, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য, নৃত্যকলা প্রভৃতি অন্যান্য সকল শিল্পের ব্যাপারেও এখনো ঐ আধুনিক সাহিত্যের সূত্রপাতের সময়ের মত নানা উপকরণপুঞ্জ জমিতেছে মাত্র, কোন একটা বিশিষ্টতা বাহির হইতেছে না। চিত্রশিল্পে বরং বিশিষ্টতার বেশ আভাস দেখা যাইতেছে; কিন্তু সঙ্গীত ত এখনো নীরব। থিয়েটার প্রভৃতির দ্রুত তালের তারস্বরপূর্ণ ইন্দ্রিয়বিভ্রমকারী সঙ্গীতে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ম্রিয়মাণ; অন্যদিকে ওস্তাদী সঙ্গীতের কুস্তির আখড়ার কসরতের খেলা দেখিয়া দেবী সরস্বতী দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছেন। কারণ দেবী সরস্বতী থিয়েটারের নটীও নন্, আবার কুস্তির আখড়ার মল্লও নন্।

তবু আশা হয় যে, এসকল শিল্পও পূর্ণস্বরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইবে, কারণ ছবি ও গানের দিকে আমাদের শিক্ষিত মনের নজর পড়িয়াছে। একথাও সময় সময় শোনা যায় যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিল্প শিক্ষার আয়োজন যে নাই, ইহা আমাদের শিক্ষার একটা মস্ত অসম্পূর্ণতা। শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক এখন যে-সে পোটো ছবি কিনিয়া ঘর সাজাইতে লজ্জা পান্, যে-সে গানেও যে সব সময় তাঁদের মন ভরে তাও নয়। এসমস্তই সুলক্ষণ।

বাংলাদেশে যেটুকু যেটুকু শিল্পের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, আমি তাহার একটু প্রতিলিপি মাত্র ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। তবু একথা বলিতেই হইবে যে, শিল্পের যে বড় বড় স্রোত মানুষের ইতিহাসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহিয়া গিয়াছে, যে স্রোতে মানুষের চিত্তক্ষেত্রকে শ্যামল করিয়াছে, যাহার তটে তটে কত বড় বড় কীর্ত্তি অমর হইয়া বিরাজমান, সেই-রকম স্রোত কি এযুগে এদেশে বহিল? যদিনা বহিয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি? এই আলোচনাটাই সবচেয়ে গুরুতর আলোচনা বলিয়া মনে করি। কারণ ইহা হইতেই আজিকার আলোচ্য বিষয়—শিল্পের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ তাহাতে আমরা উপনীত হইব।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শিল্পের স্রোত কোন্ যুগে বহিয়াছিল মনে করিতে গেলেই বৌদ্ধ যুগের কথাই মনে পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন ভারত হইতে গান্ধার, খোটান, তুর্কিস্থান, চীন এবং চীন হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, বৌদ্ধশিল্পও তেমনি ঐ-সকল জায়গায় নূতন নূতন রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছিল। সমস্ত এশিয়া যে এক, ইহা প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা সম্ভাবনীয় হইয়াছে। এই ধর্ম্ম নব নব জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নব নব রূপ পাইয়াছে, এবং নব নব শিল্প এই ধর্ম্মের উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছে।

একদা মহাবীর আলেকজান্দার তাঁহার বিজয়বাহিনী লইয়া যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গ্রীক সভ্যতার জয়স্তম্ভ সকল-জায়গায় প্রোথিত করিবেন ইহাই তাঁহার মনের প্রধান ভাব ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি হার মানিলেন, যুদ্ধে নয়, তাঁহার সভ্যতার গর্ব্বে। তাঁহার বিজয়ী চমূ, তাঁহার গ্রীক থিয়েটার, গ্রীক আর্ট, কিছুই এদেশের নিত্যসত্যাশ্রয়ী শান্তিনিষ্ঠ লোকদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

ক্রমশঃ গ্রীকদের বসতির জন্য যে প্রসিদ্ধ গান্ধার শিল্প ব্যাক্‌ট্রিয়া প্রদেশে দেখা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে বিশেষ ভাবে গ্রীক্ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভাবিয়াছেন, যে, ভারতশিল্পের এমন কি এশিয়ার শিল্পের যাহা কিছু লাবণ্য বা সুষমা তাহার মধ্যে ঐ গ্রীক প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আছে। তাঁহারা ভুলিয়া যান্ যে গ্রীক আদর্শ ও বৌদ্ধ আদর্শে বহু অন্তরায় —"যৈসে ধরণী আকাশ"—যেমন ধরণী আর আকাশের মধ্যে অন্তরায়। একে চায় বিচিত্র বিচ্ছিন্ন রূপের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য, অন্যে চায় সকল রূপবাসনা নিবৃত্ত করিয়া নির্ব্বাণের পরমাশান্তি। তাই গান্ধারশিল্পে গ্রীকেরা বুদ্ধদেবকে বড়জোর অ্যাপোলোর একটা অভিনব সংস্করণ করিয়া গড়িয়াছিল। গ্রীকেরাই গান্ধারশিল্পে ভারতের আদর্শকে ধরিতে গিয়াছে, অথচ সে কাজ অসম্পূর্ণ হইয়াছে। তবে গান্ধারশিল্পে ফল হইয়াছে এই যে, ভারতীয় শিল্পকে তাহা কিছুটা পরিমাণে উপকরণ জোগাইয়াছে মাত্র।

ভারত হইতে পেশবার ও গান্ধার দেশের ভিতর দিয়া চীনে যাইবার যে পথ ছিল, সেই পথে সেইকালে বহুবহু সমৃদ্ধিশালী সুসভ্য রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; আজ তাহারা বালি-চাপা পড়িয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খোটান, তুরফান প্রভৃতি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ আজ ডাক্তার ষ্টাইন্, ডাক্তার গ্রুনওয়েডেল্ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদেরা মরুবালির শতস্তর আচ্ছাদন তুলিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। এই-সকল বিলুপ্ত প্রদেশে যে শিল্প বাহির হইয়াছে তাহাও পরবর্ত্তী গান্ধার শিল্পের সমজাতীয়। কিন্তু চীনে ও জাপানে আসিলেই দেখা যায় শিল্পরচনার একটা মস্ত পরিবর্ত্তন। এশিয়ার জাতিদিগের মধ্যে চীন ও জাপানীজাতির মত শিল্পপ্রতিভা-বিশিষ্ট জাতি আর নাই।

প্রায় সকল দেশেই সভ্যতার গোড়ার অবস্থায় কি শিল্পে কি সাহিত্যে দৈত্যদানব গড়িবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অন্ধ প্রকৃতির বিচিত্র ভীষণ শক্তিগুলা আদিম অজ্ঞান মানুষের কল্পনায় ঐরূপ আকার পায়। মানুষের আদিম ধর্ম্মও তাই ভয়ের ধর্ম্ম; বিশ্বময় সে দৈত্যদানবের বিভীষিকাই দেখিতে থাকে। ব্যাবিলন, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশে এই অবস্থা। চীনের প্রথম অবস্থার শিল্পও এই দৈত্যদানবের মূর্ত্তিতে ভরা। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে শিল্পের কি আশ্চর্য্য রূপান্তরই ঘটিল! তখন হইতে কোন্ কল্পনায় চীনদেশের শিল্পীদলকে মাতাইল? নদীর খাতে পাহাড় কাটিয়া শিল্পী সেখানে কোন্ মূর্ত্তি যত্নে গড়িল?

ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি, অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি। সমস্ত জগৎ যেন ঐ মূর্ত্তির মধ্যে সমাহিত, সংহত, অখণ্ড, পরিপূর্ণ; ঐ মূর্ত্তির পায়ের নীচ দিয়া নদীর স্রোত—কালের স্রোত বহমান কিন্তু সকল অনিত্য চঞ্চলতার মধ্যে ইহা স্থির অচঞ্চল অনির্ব্বাণ। এই "কোয়াংয়িং" বা ধ্যানী বুদ্ধই চীন ও জাপানের চরম সাধনার বস্তু ছিলেন।

তবেইত আমরা দেখিতেছি যে, ধর্ম্মের উৎস হইতে শিল্প যেখানে উৎসারিত, সেখানে শিল্প এক আশ্চর্য্য অভিনব বস্তু হইয়া উঠে। তখন তাহা সভ্যতাকে সভ্যতার সঙ্গে, জাতিকে জাতির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধে। তখন তাহা সমস্ত জাতির মনটাকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়, মর্ত্ত্য তখন স্বর্গের দিকে মাথা তুলিবার অবকাশ পায়। তখন আদিম অবস্থার শিল্পও এই ধর্ম্ম-অনুপ্রাণিত শিল্পের সঙ্গে সঙ্গত হয়, প্রাচীন ধর্ম্ম নূতন ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়। চীনে যাহা হইয়াছিল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগের শেষে পৌরাণিক যুগে তাহাই হইয়াছিল। অনার্য্য দেবদেবী, অনার্য্য পূজাপদ্ধতি, অনার্য্য শিল্প সেই সময়ে একটা বড় আদর্শের আগুনে গলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া বড় বড় ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছিল। এই রূপক বা Symbolসৃষ্টির শক্তি যে কত বড় এবং কত আশ্চর্য্য তাহার প্রমাণ পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষ যেমন দিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কোন দেশ দিতে পারে নাই। প্রায় সমস্ত পুরাণগুলিতে চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি নানা শিল্পের আদর্শ, প্রকরণপদ্ধতি ও উপকরণ সম্বন্ধে বিচিত্র উল্লেখ দেখা যায়। বেদের দেবতারা শুভ্র নিরঞ্জন, বেদান্তের ব্রহ্মও অরূপ ও নির্ব্বিকল্প। আর্য্যের এই অধ্যাত্মতত্ত্ব অনার্য্য দ্রবিড়ের নৈসর্গিক শিল্প-প্রতিভার উপর কাজ করিয়া ভারতবর্ষে যে এক আশ্চর্য্য শিল্পতত্ত্ব ও শিল্প-রসবোধ (art consciousness) সৃষ্টি করিয়াছে এ বিষয়ে এখন সন্দেহ করার আর উপায় নাই। সীমাকে লোপ করিয়া অসীমে যাত্রার দিকটার শিল্পে স্থান নাই। অসীম যে-দিকে সীমারূপ পরিগ্রহ করিতেছেন সেইদিকটাতেই শিল্পের প্রকাশ। পুরাণগুলির মধ্যে এই দিকটাই উজ্জ্বল হইয়াছে। ভারতের সকল মরমী (mystic) সাধকদের মধ্যেও এই দিকেরই বাণীর প্রকাশ।

বৌদ্ধধর্ম্ম communal ধর্ম্ম বা সঙ্ঘগঠনকারী ধর্ম্ম ছিল বলিয়া তাহাতে শিল্পের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল। ধর্ম্ম communal হইলেই তাহাতে নানা আচার অনুষ্ঠান দেখা দেয়, এবং সেই-সকল আচার অনুষ্ঠান হইতেই শিল্পের উৎপত্তিও হয়। গ্রীক ও শকেরা মূর্ত্তিপূজা করিত; তাহারা বৌদ্ধ হইবার পরও চৈত্য তৈরি করিয়া মূর্ত্তিপূজা করিত। বিষ্ণু, শিব সকল দেবতারই কল্পনার মূলে নানা তত্ত্ব রহিয়াছে। ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, ফ্রিজিয়া প্রভৃতি স্থানে দেবদেবীর পূজায় নানা কুৎসিত অনুষ্ঠান ছিল; এই সূত্রে তাহা ভারতবর্ষে কতদূর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার খোঁজ লওয়া আবশ্যক। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে, ভুবনেশ্বরের শিব-মন্দিরে, কণারকের সূর্য্য-মন্দিরে যে-সকল বীভৎস চিত্র ও মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহার কারণ লইয়া অনেকেই নানা আলোচনা করিয়াছেন। সংসারটাকে হেয় ও কদর্য্য বলিয়া দেখানো বৌদ্ধভাব—সুতরাং এ সকল বীভৎস চিত্রের একটা সঙ্গত কারণ সে দিক হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই-রকমে নানা জাতির নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গতির জন্য পৌরাণিক শিল্পের মধ্যে এত বিচিত্রতা দেখা দিয়াছে। সৌর উপাসনা, বৌদ্ধ সাধনা সমস্তই বিচিত্র-ভাবে মিশিয়াছে। বৈদিক অনেক আইডিয়াও রূপান্তর লাভ করিয়াছে। যেমন ব্রহ্মার কথা। বেদে ইহার উৎপত্তি। কামনা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে ইহা বেদে আছে; সৃষ্টিকর্ত্তার মন হইতে উৎপন্ন সলিল-রাশিই মানস-সরোবর।

তবু এই ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তিই বলি, বা পৌরাণিক দেব-দেবীর মূর্ত্তিই বলি, শিল্প যখন ইহাতে একবার আবদ্ধ হইয়া যায়, তখনই শিল্পের শিল্পত্ব নষ্ট হইয়া আসে। কেননা, তখনই পুনরাবৃত্তির পালা। শিল্প তখন স্থিতিশীল (Static) অবস্থায় পৌঁছে, তাহার মধ্যে বিচিত্র গতি আর খেলে না। শিল্পী একই ধ্যানীবুদ্ধ, একই দেবদেবী গড়িয়া গড়িয়া তাহার শিল্প-প্রতিভার আর কি নূতন পরিচয় দিবে? সেই মূর্ত্তির মধ্যে তাহার কি কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিবে? শিল্পের রূপ জীবনের প্রতিরূপ বলিয়াই তাহার বৈচিত্র্যের সীমা নাই। কিন্তু তাহার সেই বৈচিত্র্যকেই বাদ দিয়া একরূপেই তাহাকে বাঁধিলে নদীকে ডোবা বানাইবার মত একটা অদ্ভুত ব্যাপার

তৈরী করা হয়। সেই কাণ্ড কি দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে ?

চীনে জাপানে এই কারণে চিত্র ভাস্কর্য্যের জায়গা দখল করিয়াছিল। কারণ মূর্ত্তিকারের চেয়ে চিত্রকরের পক্ষে শিল্পকে গতিদান করা সহজ। অনুমান করিতে পারি যে, অজন্তা গুহাশিল্পে চিত্রের যে বিচিত্র নমুনা পাওয়া যায়, জীবনের লীলা-ছবির যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তাহারও কারণ কতকটা তাই। শিল্প দীর্ঘকাল মূর্ত্তির বন্ধনে থাকিয়া সেই বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থনা করিয়াছে।

তবু এই মুক্তিও পুরা মুক্তি নয়। চীনে, জাপানে এবং ভারতবর্ষে, মূর্ত্তি হইতে চিত্রে যখন শিল্প অভিব্যক্ত হইল, তখনও তাহার ধর্ম্মের বন্ধন ঘুচে নাই। অর্থাৎ তখনও সেই শিল্প ধর্ম্মমূলক শিল্প।

লরেন্স বিন্‌ইয়ন্‌ তাঁহার "Painting in the Far East" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দশম বা একাদশ শতাব্দীর যে-সকল চীন ও জাপানদেশীয় চিত্রকরের কথা লিখিয়াছেন, তাহাদের চিত্রকে তিনি "Embodied Prayers" মূর্ত্তিমান প্রার্থনা মূর্ত্তিমান উচ্ছ্বাস বলিয়াছেন। এসিন সজু নামক একজন গুণী জাপানী চিত্রকরের একটা কল্পছবির (vision) বর্ণনা তিনি দিয়াছেন এইরূপ :—স্বর্গের অধিপতি আমিদা তাঁহার স্বর্গীয় দলবল সহ "নীতল নীল" অন্ধকারের মধ্যে উচ্ছ্বসিত একটি মেঘের শুভ্র আলোকচ্ছটার উপর আবির্ভূত হইয়াছেন ; তাঁহার সেই বিরল আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বর্গীয় বাহিনী বিচিত্র বাদিত্রসকল ঝঙ্কৃত করিতেছে এবং শূন্যে শূন্যে সুগন্ধ পুষ্পদল বিকীর্ণ করিতেছে। ছবিটার এই পরিকল্পনা।

মধ্যযুগের খৃষ্টানশিল্পও ঠিক্‌ এই জাতীয় নয় কি ?

তার মানে, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া শিল্প, বিশেষত চিত্রশিল্প, যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন শিল্প এই পৌরাণিক উপকরণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। তখন ভারতবর্ষে বুদ্ধের মূর্ত্তির জায়গায় বোধিসত্ত্বগুলি বিচিত্র আকারে দেখা দেয় দেখিয়াছি, তখন স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালের দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্বের ছবি শিল্পীর কল্পনায় সন্ধ্যাতারার মত পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়া উঠে।

কিন্তু ক্রমে এই কল্পনার বন্ধন, পুরাণের বন্ধন, ধর্ম্মের বিচিত্র বিগ্রহের বন্ধনকেও শিল্প একদিন ছাড়াইয়া উঠে। চীনদেশে ও জাপানে একসময়ে শিল্পীরা এই বন্ধনই ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই সে দেশে শিল্প এমন অত্যাশ্চর্য্য হইতে পারিয়াছে। কারণ, শিল্প চায় জীবন। শিল্প জীবনেরই একমাত্র প্রকাশক।

অত্যন্ত সহজ এই কথাটা পশ্চিম মহাদেশে যাঁহারা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাঁহারাই শিল্পকে সৌখীন করিয়া জীবনের সকল প্রয়োজন হইতে তুলিয়া লইয়া "শিল্প শিল্পেরই জন্য" (Art for Art's sake) এই মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ শিল্পের কাজই যদি হয় প্রকাশ করা, একের অনুভূতিকে সকলের মধ্যে অনুভূত করানো, তবে প্রশ্ন এই যে শিল্প কি প্রকাশ করিবে, কিসের অনুভূতিগুলিকে সে অনুভূত করাইবে ? পরিপূর্ণ জীবন ভিন্ন আর প্রকাশের দ্বিতীয় বস্তু কি থাকিতে পারে ? জীবনের বিচিত্র অনুভূতিই তো শিল্পের প্রকাশের বিষয়। এই জীবন-বস্তুকে আমরা যত বড় করিয়া যত অখণ্ড করিয়া দেখিতে পারি ও ধরিতে পারি, শিল্পও ততই বড় হইতে থাকে। জীবন যেখানে সংকীর্ণ ও খণ্ডিত, শিল্প সেখানে বৃহৎ ও উদার হইতে পারে না।

কিন্তু শিল্পকে অখণ্ড জীবনের প্রকাশই বলি আর যাই বলি, যে ব্যক্তি প্রকাশ করে তাহার দরুনই শিল্পের আসল শিল্পত্বটুকু ফোটে। নহিলে শিল্প তো কেবল অনুকরণ হইত, রূপের প্রতিরূপ মাত্র হইত। গ্রীক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটো শিল্পকে এইরূপ কেবল মাত্র অনুকরণ ভাবিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার "রিপাব্‌লিক্‌" গ্রন্থে তিনি শিল্পকে নিন্দা করিয়াছেন। প্লেটোর মতে সকল বস্তুরই একটা বাস্তবিক ভাবসত্তা, একটা ideal form আছে, সেই রূপের প্রতিরূপই মানুষ পায়। চিত্রকর আবার সেই প্রতিরূপের প্রতিরূপ তৈরি করে, সুতরাং চিত্রকর বাস্তবিক সত্তা হইতে অধিকতর দূরে সরিয়া যায়। প্লেটো মনে করিতে পারেন নাই যে শিল্পের মধ্যে শিল্পীই প্রধান, অথচ কেন প্রধান ?

বাহিরের যে জগৎটাকে আমরা দেখি, সেখানে সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ, সুন্দর কুশ্রী, ভাল মন্দ, চঞ্চল ধ্রুব সব-রকম রূপই গায়ে গায়ে ভিড় করিয়া আছে। এই বিচিত্র রূপের

অন্তর্নিহিত যে অখণ্ডরূপ, এই বেসুরার মর্ম্মগত যে সুর, এই অসমঞ্জস বস্তুগুলার ভিতরকার যে সামঞ্জস্য তাহা কে আবিষ্কার করে এবং কেই বা প্রকাশ করে? শিল্পী। শিল্পীর শিল্পের মধ্যেই আমরা বিচিত্রকে বিশ্বরূপে দেখি, অখণ্ডরূপে দেখি। বাস্তব জীবনের যে-কোন অংশকে শিল্পী যখন রেখা রং বা সুরের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চায়, তখন সেই বাস্তব অংশটুকুর মধ্যে কত জিনিসকে সে চাপা দেয়, বদলায়, নূতন করিয়া গড়ে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কারণ অংশকে সে যে সমগ্রের আলোয় তুলিয়া ধরে; অংশ তাই অংশের রূপ পরিহার করে। বাস্তব সাহিত্যিক এমিল জোলা শিল্পের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাও এই কারণে আদৌ বাস্তব বা বস্তুতন্ত্র সংজ্ঞা হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন "Art is a bit of Nature seen through the medium of a temperament." অর্থাৎ শিল্প মানবপ্রকৃতির ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির এক টুকরাকে যেমনটি দেখা যায় তাহাই। এই যে শিল্পীর মানব-প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির টুকরাটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে ও দেখায়, ইহাই তো শিল্প। এই "temperament"ই তাই শিল্পের মধ্যে প্রধান। শিল্পীই তাই শিল্পের মধ্যে প্রধান। যখন কোন ভাল ছবি দেখি, গান শুনি বা কবিতা পড়ি, তখন সেই ছবি গান ও কবিতার ভিতর দিয়া শিল্পীর মনের মধ্যেই কি আমরা প্রবেশ করি না এবং সেই মনের দরজা দিয়া আবার দেশ-কালের অনন্তবিস্তার, বিশ্বজীবনের বাধাহীন ব্যাপ্তির চির-রহস্যের মধ্যে ডুব দিয়া আসি না? এই কারণে লরেন্স বিনিয়ন লিখিয়াছেন যে, চীন ও জাপান দেশের ভাবুক শিল্পীরা বলেন যে দর্শকই তো শিল্পীর প্রধানতম শিল্প-সৃষ্টি, কারণ সেই দর্শক যদি উত্তম সমজদার হয় তবে তাহারই মধ্যে শিল্পীর শিল্পরচনা পূর্ণ সৌষ্ঠব পায়। বৈষ্ণবেরা যেমন বলেন ভক্তের মধ্যে ভগবানের সার্থকতা, এই শিল্পাচার্য্যরাও তেমনি বলেন যে রসগ্রাহী দর্শকের মধ্যেই শিল্পীর চরম সার্থকতা। কেননা শিল্প মনের সঙ্গে মনের আদানপ্রদানের একটা প্রধান উপায়; সুতরাং আমার মন যদি শিল্পীর শিল্পরচনা দেখিয়া শিল্পীর মনের মধ্যে প্রবেশ পাইল, তবেই তো শিল্প রচনার উদ্দেশ্য সফল হইল।

শিল্পের মধ্যে শিল্পীই প্রধান বলিয়াই শিল্পের উপর ধর্ম্ম এতকাল ধরিয়া আপনার জোর দখল জানাইয়া আসিয়াছে। এইখানেই তো শিল্পের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রধান যোগের জায়গা। কারণ ধর্ম্মও মানুষের জীবনের কোন একটা আংশিক দিক্ নয়; ধর্ম্ম সমস্ত জীবনের একমাত্র সার। ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ। তাহারও কাজ জীবনের সব খণ্ডগুলাকে অধ্যাত্মরসের পরম অমৃত দ্বারা অখণ্ড করিয়া দেওয়া, সব ফাঁক ভরাট করিয়া সব দ্বন্দ্বকে মিটমাট করিয়া অনন্তের হাওয়ার মধ্যে জীবনটাকে মেলিয়া ধরা। ধর্ম্ম তাই মানুষের প্রকৃতিটাকেই বদল করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইহার জন্য সকল ধর্ম্মেই কত বিধি কত নিষেধ কত নিয়ম কত অনুশাসন কত সাধনার ব্যবস্থা!

তাই পুরাকালে যখন ধর্ম্ম একরাট ছিল, মানুষের জীবনে তার বাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন সমাজ তাহার অনুশাসনে তৈরি হইয়াছিল, শিল্পও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া-ছিল। সেইজন্য পুরাকালে এমন কোন ধর্ম্ম দেখি না, যে ধর্ম্ম হইতে শিল্পের উৎসার হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম নীতিপ্রধান অথচ তাহা হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধ শিল্প জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য শিল্প হইয়াছে।

ইহার কারণ আর কিছুই নয়—ধর্ম্ম যখন মানুষের প্রকৃতিটাকে অধিকার করে, তখন সেই প্রকৃতি বিশ্বজগৎকে যে ভাবে দেখে শিল্পে তাহাই প্রকাশ পাইবে। অথচ কোন ধর্ম্মই মানুষের প্রকৃতির সবটাকে একই সময়ে দখল করিতে পারে না, মানুষের সমস্ত জীবনটাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। তা যদি পারিত, তবে ধর্ম্মে ধর্ম্মেও বিরোধ থাকিত না, ধর্ম্মে শিল্পে, ধর্ম্মে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে দর্শনে বিচিত্র দ্বন্দ্বসকলের অস্তিত্বই অর্থহীন হইত। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধশিল্প যেমনি আশ্চর্য্য হউক্, গ্রীকশিল্প তাহার চেয়ে কোন অংশেই কম আশ্চর্য্য নয়। গ্রীকেরা সকল বাহ্য রূপে রূপে ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল; সেই-সকল রূপের মধ্যে একটা সৌসামঞ্জস্য ফুটাইয়া তোলাই গ্রীকশিল্পের আদর্শ। ভারতবর্ষ বা চীনের বৌদ্ধশিল্পের শান্তি বা ধ্যানের আইডিয়ার মত অবচ্ছিন্ন (abstract) কোন আইডিয়াকে বিগ্রহদান করা গ্রীকশিল্পের আদর্শ মোটেই নয়। কিন্তু রূপ হইতেও

অরূপে যাওয়া যায়, যেমন অরূপ হইতেও রূপে আসা যায়। এই দুই প্রকরণপদ্ধতিই শিল্পজগতে বরাবর আছে। এবং এই দুই প্রণালী যে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন, কোনকালেই মিলিবার নয়, তাহাও নয়। কারণ স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, ক্রমশঃ চীনে, ও জাপানে শিল্প এই দুই প্রণালীরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছে। ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের যোগ সে দেশে পরবর্ত্তীকালে এমনি ভাবে সাধিত হইয়াছে যে কেহই কাহারও অনুবর্ত্তী হয় নাই। ধর্ম্ম শিল্পের বন্ধন হইতে যেমন মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আচার বিগ্রহাদি হইতে যেমন মুক্ত হইয়াছে, শিল্পও ধর্ম্মের বন্ধন হইতে তেমনি মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্মের ভাবের দ্বারাই সে পুরাপুরি অধিকৃত হয় নাই।

লরেন্স বিনিয়ন বলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে "Zen" বা ধ্যানীসম্প্রদায় নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখা দিয়াছিল। তাহারা ধর্ম্মের প্রথাগত ও আচারগত বন্ধন হইতে মুক্তি কামনা করিয়াছিল। তাহারা শাস্ত্র পুরোহিত, বিধি বিধান সমস্তই অস্বীকার করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া সত্যকে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। লাওৎসু—যাঁহা হইতে 'তাও' ধর্ম্মের উৎপত্তি—যাঁহার বচনাবলী উপনিষদের মন্ত্রের মত সরল অথচ গভীর-জ্ঞানপূর্ণ—তিনিই এই সম্প্রদায়ের একজন গুরু ছিলেন। ইহাদের ভাব কতকটা কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের "wise passiveness"এর ভাবের মত; অর্থাৎ নিজেকে সংযত বিরল নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় করিলেই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিগূঢ় বাণী আমাদের অন্তরের মধ্যে আপনিই প্রকাশ পাইবে, এই ভাব। একদিকে তাই ইহাদের আদর্শ সেই প্রাচীন বৌদ্ধ অনাসক্তির আদর্শ, অন্যদিকে ইহারা বিশ্বের সৌন্দর্য্যের প্রতি অণুমাত্রও উদাসীন নয়। বিশ্বের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের লোকদের অন্তরের যোগ একেবারে মর্ম্মের সঙ্গে মর্ম্মের চিত্তের সঙ্গে চিত্তের নিবিড় আনন্দময় যোগ ছিল। এই যোগের সম্পূর্ণতাতেই ছিল ইহাদের মুক্তি।

সুতরাং ইহাদের ছবিতে ধর্ম্মের বিচিত্র পৌরাণিক বিগ্রহাদির কোন স্থান রহিল না। Symbolism থাকিল না। প্রকৃতির চিরসুন্দর চিররহস্যাবৃত বন-গিরি-নদী-সমুদ্র-আকাশের নানা ছবি, মানুষের নানা প্রবৃত্তির বিচিত্র দ্বন্দ্বের ছবি। অথচ সে-সকল ছবির ভিতর দিয়া যে অধ্যাত্মমুক্তির বাণী প্রচারিত হইয়াছে, কোন বিগ্রহ-ছবির ভিতর দিয়া তাহা হইবার জো ছিল না।

অগ্রহায়ণের "সবুজপত্রে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "জাপানের পত্রে" জাপানের শিল্প সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা জাপানের শিল্পের মর্ম্মগত আদর্শটিকে যেমন ভাবে খুলিয়া দেখাইয়াছে, অমন কোন পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের বড় বড় রচনা দেখাইতে পারে নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

"মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মত আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে, যে, জিনিসের মূল্য আছে, গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী।......জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্চে।......সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখিনি। এমন সাবধানে যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা করে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে অন্য কোন জাতি শেখেনি। যা এদের ভাল লাগে, তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই যে প্রচুরতার পরিচয় এবং স্তব্ধতাই যে গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেচে। এবং এঁরা বলে সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা থেকে পেয়েচে।"

অথচ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদেই যে চীন ও জাপানীজাতি সুন্দরকে এমন শুচিতা ও সংযমের সঙ্গে পূজা করিতে শিখিয়াছে, তাহা মনে করা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ, চীন ও জাপানের শিল্পের ক্রমাভিব্যক্তি দেখিলে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় যে চীন ও জাপানীজাতির নৈসর্গিক শিল্পরসবোধ ধর্ম্মের বন্ধন কাটাইয়া কাটাইয়া ক্রমশ আপন পথে আপন সার্থকতায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর 'Zen' সম্প্রদায়ের শিল্পই চীনে ও জাপানে শিল্পের একটা নবযুগ আনিয়া দেয়। তারপর হইতে শিল্প শিল্পের রাস্তায় চলিয়াছে কিন্তু ধর্ম্মকে সে বাদ দেয় নাই; ধর্ম্মকে আপন সহচর করিয়া লইয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মের এই সাহচর্য্যই শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন; ধর্ম্মের অধীনতা বা অনুবর্ত্তিতা নয়। তখনই শিল্প ধর্ম্মময় হয়, ধর্ম্মও শিল্পরসপূর্ণ হয়। চীনে জাপানে ধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসও যদি দেখা সম্ভবপর হইত, তবে বোধ হয় দেখিতাম যে, সেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মও ক্রমশঃ তাহার সংযম নিয়ম বিধিবিধানের বাঁধন কাটাইয়া তাহার শীলাদির হিমশিলাকে বিদীর্ণ করিয়া শিল্পরসস্রোতে বিগলিত হইয়া বহিয়াছে। সেইজন্যই কবি

রবীন্দ্রনাথ জাপানের জীবনযাত্রায় ও লোকব্যবহারে যেমন একদিকে রিক্ততা বিরলতা ও মিতাচার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন, অন্যদিকে তিনি বলিতেছেন যে "এমনতর সার্ব্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই।" রসবোধের সাধনার সঙ্গে রিক্ততা ও মিতাচারের সাধনা সাধারণতঃ মেলেনা; কারণ একটা সৌন্দর্য্যের সাধনা, অন্যটা ধর্ম্মনীতির সাধনা। জাপানে এই দুই বিপরীত সাধনা যখন মিলিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক শিল্পপ্রবৃত্তি (art-instinct) ধর্ম্মনীতিকে আপনার অংশীভূত অঙ্গীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্ম সেদেশে আর শুষ্ক নীতি-প্রধান ধর্ম্ম হইয়া থাকিতে পারে নাই।

ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের এই সম্বন্ধই পাকা সম্বন্ধ; এই উদ্বাহই ঘটানো দরকার। শিল্প-গৌরীকে ধর্ম্ম-মহাদেবের কাছে পরিচর্য্যার জন্য ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সেই গৌরীও আপন বাহ্যরূপকে নিন্দা করিয়া অপর্ণা হইয়া মহাদেবের জন্য তপস্যা করিবেন; মহাদেবও আপন নিবাত-নিষ্কম্প ধ্যানযোগ ভাঙিয়া সেই তপস্বিনীকে পাইবার জন্য লালায়িত হইবেন। ধর্ম্ম শিল্পের অনুবর্ত্তী হইলে ধর্ম্ম হয় পৌত্তলিকতা—আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে যাহা হইয়াছিল। শিল্প ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইলে শিল্প আর জীবনের প্রকাশক হয় না; তখন শিল্পের ধারা পুনরাবৃত্তির শৈবালজালে অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

এইবার প্রবন্ধের গোড়ায় ফিরিয়া যাই। বাংলা দেশে যে শিল্পের নূতন অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মের সঙ্গে শিল্পের এই স্বাভাবিক সাহচর্য্যের সম্বন্ধ দাঁড়াইতেছে কি?

আমার তা মনে হয় না। আমাদের দেশে সম্প্রতি প্রথা ও আচারের বন্ধনমুক্ত যে নূতন ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে, তাহা শিল্পসাধনাকে আহ্বান করে নাই। পক্ষান্তরে শিল্প এখনো পর্য্যন্ত প্রথা ও আচারের বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন ধর্ম্মের উদার হাওয়ার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে না।

কেবল রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কাব্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। লরেন্স বিনিয়ন চীনদেশের Zen artএ "complete fusion of the artistic and religious temper" হইয়াছে বলেন, অর্থাৎ শিল্প এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ মিলন হইয়াছে বলেন। রবীন্দ্র-নাথের আধুনিক কাব্যেও তাহাই হইয়াছে। লরেন্স বিনিয়ন Zen art সম্বন্ধে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন রবীন্দ্র-নাথের "গীতাঞ্জলি" 'গীতিমাল্য' 'খেয়া' সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"What distinguishes the Zen artists of Sung and Ashikaga is that the religious idea was no longer confined to religion, conceived as something apart from and antithetical to mundane subjects, but that it had gone out to impregnate and fuse itself with life and nature, so that a white narcissus halfhidden among rocks, a bird making a branch quiver with its first song, or crimson maple leaves floating down through the misty air, or reeds trembling in a wind that comes out of boundless space, or the look of remote peaks beyond the clouds, could become, no less than forms of deity or angel, an expression of the divine idea."

যে ধারায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য এখন বহিয়া চলিয়াছে, সেই ধারায় যখন চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পও চলিতে থাকিবে, তখনই বাংলা দেশের জীবনের মধ্যে শিল্পের স্থান আর সামান্য থাকিবে না। তখন সকল শিল্পই বস্তু বা উপকরণের স্থূল ভারকে আইডিয়াতে দ্রবীভূত করিয়া দিবে, অনির্ব্বচনীয় অদর্শনীয় অশ্রবনীয়কে কলার সূক্ষ্ম আভাসে-ইঙ্গিতে বচনীয় দর্শনীয় ও শ্রবণীয় করিবে। শিল্পের সেই বড় আইডিয়াগুলি তখন বীজের মত রসগ্রাহী চিত্তের মধ্যে পড়িয়া মুহূর্ত্তমাত্রে পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। আমাদের ভক্তিপ্রবণচিত্ত চিত্র সঙ্গীত স্থাপত্য নৃত্যকলায় তখন অনুভব করিবে এক অপূর্ব্ব বিশ্বরহস্য—যাহা নানা ভাবভঙ্গিমায় অনবরত কথা বলিতেছে অথচ সে কথা বুঝা যায় না। অনুভব করিবে সেই-সকল অনুভাব, সেই-সকল সহজ বোধ (intuitions), যাহা কোথা হইতে মনের মধ্যে আসে তাহা জানি না, যাহাদের উৎপত্তি কোথায় তাহাও জানি না, অথচ যাহারা জীবনের যেন চরম বস্তু। অনুভব করিবে ক্ষণকালের জন্য জীবনের চিরকালের ভরপুর সম্পূর্ণতা,—বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মার শাশ্বত অথচ বিলুপ্ত যোগটিকে ক্ষণকালের মত উদ্ধার করিয়া দেখিবে। জ্ঞান তখন হইবে চরিতার্থ, ভক্তি হইবে

সার্থক। এইরূপে ধর্মও বাঁধা মতের বন্ধন কাটাইয়া বিশ্ব-মানবধর্ম্ম হইবার উপক্রমে যত বিচিত্র হইবে, সেই-সমস্ত বিচিত্রতা শিল্পকেও বিচিত্র করিবে। সে-সকল ধর্ম্মের কোন নাম থাকিবে না। সংজ্ঞাহীন সে-সকল ধর্ম্ম অথচ সার্ব্বজনীন সে-সকল ধর্ম্ম।

আমার মনে হয় যে অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই বড় একটি সৃষ্টির আয়োজনই চলিতেছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিক্ষার যে সামান্য আয়োজন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পশিক্ষার জন্য একটি কলাভবন যদি রচিত হয়, তবে দেখিতে দেখিতে সেখানেই একটি কলাকেন্দ্র বা school of art দাঁড়াইয়া যাইবে এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্তের সম্পূর্ণ ছাপ তাহার উপর অনায়াসে পড়িতে পারিবে। শান্তিনিকেতন আশ্রম হইতে বিদ্যায় বা জ্ঞানে বিশেষ প্রতিভাবান কোন ছাত্র বাহির না হইলেও অনেকগুলি অর্দ্ধস্ফুট মুকুল-শিল্পী সেখানে দেখা দিয়াছে। এবং একজন তাহাদের মধ্যে স্ফুটোন্মুখও হইয়াছেন। কাল্‌চারের আয়োজন যদি বরাবর সেখানে থাকে এবং তাহার পাশে যদি রীতিমত একটি কলাভবন গড়িয়া উঠে, তবেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের কাজ ঐ আশ্রমের ভিতর দিয়া সার্থক হইবে এবং এদেশে শিল্পের নব উদ্বোধন হইবে আশা করিতে পারা যায়। তখনই শিল্প ও ধর্ম্ম উভয়ের মিলনে যে কি অপূর্ব্ব একটি শোভা খুলিয়া যায় তাহা চক্ষে দেখা যাইবে। ধর্ম্মশিক্ষাও যেমন ধর্ম্মবিদ্যালয়ে বা ধর্ম্মমন্দিরে হয়না, শিল্পশিক্ষাও তেমনি শিল্পবিদ্যালয়ে হয় না—যেখানে শিল্পরসিক ও ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদের আশ্রম, সেইখানেই শিল্প ও ধর্ম্মের যথার্থ সহজ শিক্ষা হইতে পারে। কারণ, জীবন হইতেই জীবন হয়, কল হইতে জীবন হয় না।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিরোধ

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী খুব অল্পই আছে। ঐ-সব কাহিনী যেমন নগণ্য তেমনি বিরল।

উহারা রূপকের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত এবং উহাদের মধ্যে কোন গভীরতা নাই। যে কাহিনীটা সর্ব্বাপেক্ষা পরিব্যাপ্ত এবং যাহা আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি তাহা সেই কাহিনী যাহাতে আছে—ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। যেখানে উহা গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, যেমন মনুর গ্রন্থে —যেখানে স্পষ্টই দেখা যায়, উহা একটা যোড়াতাড়া মাত্র—সেই মনুতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-সংক্রান্ত মতবাদে উৎপত্তির যে ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, সেই ক্রমটি ঐ কাহিনীর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। রামায়ণে, বিবৃতির সর্ব্বশেষে, কাশ্যপের পত্নী মনু হইতে, জাত-সকল বাহির হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়! যেমন ইরান দেশের তিন শ্রেণী—হয়, প্রথম রাজা জিমা হইতে—নয়, মহা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রা হইতে পর্য্যায়-ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছিল—ইহাও কতকটা সেইরূপ।

কতকগুলি "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে যে পাঠান্তর আছে সে শুধু বাক্‌চাতুরীমাত্র অথবা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধীয় শব্দবিন্যাসমাত্র। উহার মধ্যে কোন গাম্ভীর্য্য নাই, ভাবার্থের ব্যাপকতা নাই। জীবের উৎপত্তিবিষয়ক দার্শনিক আলোচনার মধ্যে জাতকে গণনার মধ্যে আনা হয় নাই। শ্রুতিতে প্রত্যেক জাতের জন্য এক-একটা বিশেষ স্বর্গলোক নির্দ্ধারিত আছে—এই আনুসঙ্গিক কথাটি ছাড়া, জাতের আবির্ভাব সম্বন্ধে এমন কোন কার্য্যকারণমূলক যোগাযোগের উল্লেখ নাই যাহার বিশেষ কোন প্রামাণিকতা বা স্থায়িত্ব আছে।

এই-সকল ব্যাখ্যা "টুলো পণ্ডিতী" ধরণের ও পরবর্ত্তী কালের, উহা চতুর্বর্ণ-পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত; কেননা, এই পদ্ধতিটা সমগ্র ঐতিহ্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি, পূর্ব্বে অনেক-স্থানেই কাছাকাছি জাতের মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিত। কোন একটা বিশেষ অধিকার লইয়া এই

বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। পুরাকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেণীগত প্রাধান্য লইয়া যে বিরোধ হইত তাহার সহিত উক্ত জাত-গত বিবাদের কোন প্রকারেই তুলনা হইতে পারে না।

বিশেষ অধিকারাদির সীমানির্দ্দেশ, পুরোহিত ও অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার সামঞ্জস্য—এই-সমস্ত কার্য্যত গোড়া হইতেই স্থির নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বচনাদির দ্বারা এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অবশ্য একথা আমরা স্বতঃসিদ্ধভাবে সংশয় করিতে পারি না। আমরা জানি,—ব্যবহারে যাহা শিথিলভাবে ভাসমান, নিয়মের কঠোরতাই সেই ভাসমান জিনিসগুলাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে। পুরোহিত সম্প্রদায়—যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকার ও শাস্ত্রানুশীলনের অধিকার যতই সযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টা করুক না কেন, পুরাকালে বিশেষত আদিমযুগে,—ইহার বহু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মশিক্ষার অধিকারপ্রাপ্ত অধিপতিরা অনেক স্থলেই নিজেই ব্যবস্থাপক হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক বৈদিক ছন্দের রচনা ক্ষত্রিয়দের প্রতি—এমন-কি বৈশ্যদের প্রতিও আরোপিত হইয়া থাকে। বৈদিক সূক্তিতে, পুরোহিত রাখিবার জন্য অধিপতিদিগকে যে পুনঃপুনঃ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ বোধহয়, অধিপতিরা এই কর্ত্তব্য প্রায়ই লঙ্ঘন করিতেন। অনেকস্থলেই ক্ষত্রিয় সন্তানেরা এই কার্য্য সম্পাদন করিত। কোন কোন রাজার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে পৌরোহিতিক সাহিত্য সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ইহা বোধহয় "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থাদিতেও পরিলক্ষিত হয়। যে-সব গ্রন্থে ব্রাহ্মণিক মতবাদ পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে, সে-সব গ্রন্থেও, ব্যতিক্রমস্থলে, 'কোন ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকে গুরুরূপে বরণ করা যাইতে পারে এইরূপ উপদেশ আছে।

তা-ছাড়া আমরা এরূপ কতকগুলি ব্রাহ্মণবংশীয় ও রাজবংশীয় রমণী দেখিতে পাই না কি, যাহারা ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যায় ও তর্কবিদ্যায় দিগ্‌বিজয়িনী বলিয়া পৌরাণিক কাহিনীতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে?

ঐরূপ একটা দৃষ্টান্তও আছে,—ব্রাহ্মণেরা বিদেহরাজ্যের জনক রাজার জ্ঞানগরিমার কীর্ত্তন করিয়া, পরিশেষে যেন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, জনক রাজা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। এইরূপ পদোন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত বিশ্বামিত্রের কাহিনী হইতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে যে একটা দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহা বৈদিক সূক্তের মধ্যে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। রাজা সৌদাসের অনুগ্রহে কে তাঁহার পুরোহিত হইবে, বোধ হয় ইহা লইয়াই বিবাদ। সূক্তের বচনগুলা অস্পষ্ট এবং উহাদের যোগাযোগ সংশয়াত্মক। সে যাহাই হউক, গোড়ার গল্পটি, মহাকাব্যের মধ্যে, বহু পাঠান্তরে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিশ্চিত কথা এইটুকু যে, কে অলৌকিক ধেনু "সুরভি"কে অধিকার করিবে, কে সমস্ত ব্রতনিয়ম পালন করিবে ইহা লইয়াই উক্ত দুই মহর্ষির মধ্যে ভয়ানক যুঝাযুঝি হইয়াছিল। বিশেষত কুশিক রাজবংশের বংশধর বিশ্বামিত্র অতি কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া ব্রাহ্মণপদে অধিরূঢ় হন। এই ধরণের বিবরণ হইতে জাতের ইতিহাসসংক্রান্ত দলিল সংগ্রহ করা একটা মহাবিভ্রম সন্দেহ নাই। উহা হইতে এই মাত্র সূচিত হয় যে, ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিশেষ দাবী সত্ত্বেও, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণের কখনই ছিল না; বিশেষত, যে যুগের বিবরণ আমরা পাইয়াছি, সেই যুগে, ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর উচ্চাভিলাষের একটা প্রধান বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণ-পদে অধিরূঢ় না হইয়া ক্ষত্রিয় কখনই শাস্ত্র স্পর্শ করিতে পারে না, এই কথা স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণের বিশেষ-অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অতীব কঠোর পণে অর্জ্জিত এই অতীব বিরল নিয়মের ব্যতিক্রমটা নিয়মকেই দৃঢ়ীভূত করে। উহা হইতে সপ্রমাণ হয় না যে, জাতের পরিবর্ত্তনাদি শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছিল, অথবা উক্ত কাহিনী জাতের পদ্ধতি হইতেও প্রাচীন। বরং এই অনুমানই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় যে, যে নিয়মে ব্রাহ্মণই যজ্ঞানুষ্ঠানাদির বিশেষ অধিকারী হইয়াছে—(যে নিয়ম আদিম কালে অজ্ঞাত ছিল বলিলেও হয়) অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল অপেক্ষা পুরাকালে সেই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম হইত, কেননা আদিম কালে গার্হস্থ্য পদ্ধতির মধ্যে বাহিরের কোন লোককে পুরোহিত পদে বরণ করা হইত না। পিতাই পৌরোহিত্য করিতেন।

কাহিনীগুলাকে ইতিহাসের মূল্য দেওয়ায় বিপদ আছে। অতি সতর্কতার সহিত ও অতি সন্তর্পণে এই বিষয়ে হস্তার্পণ করা উচিত।

মহাকাব্য হইতে, পুরাণ হইতে কতকগুলি বিবরণ শ্রমসহকারে সংকলন করিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণের প্রতি কোন কোন রাজা কিরূপ জবর্দ্দস্তি করিতেন, কিরূপ তাহাদিগকে শাস্তি দিতেন। যথা:—বেণ রাজা পুরোহিতদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন;—পুরূরবেরা ব্রাহ্মণদের ধন হরণ করিয়াছিলেন, নহুষ সহস্র ব্রাহ্মণ দিয়া তাঁহার রথ টানাইয়াছিলেন—এইরূপ অন্যান্য কাহিনী। প্রাধান্যের জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদ উহাতে নিন্দিত হইয়াছে। এই-প্রকারের স্মৃতিসমূহ বাস্তবিকই উহাতে প্রতিভাসিত হইয়াছিল কি না, যদি কেহ সন্দেহ করে, তবে সে নিন্দনীয় হইবে কি?

এই প্রসঙ্গে সব-চেয়ে বেশি ইঙ্গিত পাওয়া যায় পরশুরামের ইতিহাস হইতে সন্দেহ নাই। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম ভৃগু-বংশীয়। একদিন রাজা অর্জ্জুন জমদগ্নির আশ্রমে সাদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের বলি একটি গাভীর বৎস হরণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেন। পিতৃঅপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়াছিল যে, এই কাহিনীর কোন কোন পাঠান্তর অনুসারে,—সমস্ত যোদ্ধৃবর্গ অন্তর্হিত হওয়ায়, পৃথিবীতে লৌকিক প্রভু আর রহিল না; ব্রাহ্মণদিগের সমাজগঠন পদ্ধতিতে, যাহার দ্বারা সমাজের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়, সেই সামাজিক সামঞ্জস্যের অপরিহার্য্য উপাদানটি বিনষ্ট হইল। এবং সামঞ্জস্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্ষত্রিয় বিধবাদের গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিয়া নূতন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করা আবশ্যক হইল। আসলে এই বিবরণের মূলকথাটি কি? ইহা হইতে কি প্রতিভাত হয়, অভিজাত বর্গ ও পুরোহিত বর্গের মধ্যে একটা ব্যাপক সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল? আমি স্বীকার করিতেছি, সিদ্ধান্তটি অন্য বিচারকেরা যত সুস্পষ্ট বলিয়া মনে করেন, আমি ততটা মনে করি না। কিন্তু ইহার ভুল দেখাইবার জন্য কষ্ট স্বীকার করা নিরর্থক। অবশ্য এই কাহিনীতে আর কিছু না হউক, অন্তত এইটুকু প্রকাশ পায় যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একটা "বন-কষাকষি" ছিল।

ব্রাহ্মণেরা যে আধিপত্য বিজয়সূত্রে অর্জ্জন করিয়াছিল, এবং যাহা শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্য্যন্ত দৃঢ়ীভূত করিতে হইয়াছিল—সে আধিপত্য কখনই বিনা বিবাদে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। সকল যুগেই, বৈদিক সূক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রাহ্মণদের সকল গ্রন্থেই, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব যেরূপ জোরালা ও অতিরঞ্জিত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, এই সম্বন্ধে সফলতা লাভ করাই তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। একথা ঠিক্ যে, অথর্ব্ববেদের কতকগুলি সূক্তি হইতে সেই যুগের আভাস পাওয়া যায় যে-যুগে অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধের অনেকগুলি উদাহরণ আছে। তাছাড়া অভিজাত-শ্রেণীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাজাদের যে আধিপত্য ও প্রতিপত্তি সর্ব্বকালেই ছিল, পুরোহিত-সম্প্রদায়ের প্রতি লোকের অন্ধ ভক্তিও সে আধিপত্য ও প্রতিপত্তিকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, "রাজকীয় (ক্ষত্র) শক্তির উপরে আর কিছুই নাই।" তাহার পরেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম-বীর্য্যের (ব্রহ্ম) সৃজনী শক্তির দ্বারা ক্ষত্রিয় উৎপাদিত হওয়ায়, স্বকীয় উৎপত্তিস্থানকে ক্ষত্রিয়ের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত; এই স্বীকারোক্তিটিতে অস্পষ্ট কিছুই নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে যোদ্ধৃবর্গের শ্রেষ্ঠতা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করা হইয়াছে; এই শ্রেষ্ঠতার দরুনই, শাক্যমুনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে এই কথাটা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই সাক্ষ্যে ততটা সংশয় করা যাইতে পারে না। "ধর্ম্মপদ" একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ, তাহাতে ব্রাহ্মণ মানবিক শ্রেষ্ঠতার মূর্ত্তিমান আদর্শ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের যুগ হইতে বৌদ্ধ যুগ পর্য্যন্ত জাতের পদ্ধতিটা পূর্ণ প্রতাপে বিরাজমান।

কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধ, কি নিয়মের ব্যতিক্রমে এক বর্ণ হইতে বর্ণান্তরে সংক্রমণ—ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় না যে, জাতটা তখন অঙ্কুরাবস্থায় ছিল। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যুঝাযুঝি, প্রভাব-বিশেষের মধ্যে যুঝাযুঝি, সকল

যুগেই ছিল। খুব বিভিন্ন সামাজিক গঠনের মধ্যেও এই যুঝাযুঝির অস্তিত্ব দেখা যায়। এই-সকল ঘটনা, জাতের অনুরূপ কোন অস্তিত্বকে বর্জ্জনও করে না—আবার উহা হইতে জাত বুঝাইয়া যায়—এরূপ মনে করিতেও দেয় না।

জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে প্রথম-দলিলের সাক্ষ্য প্রাপ্ত হই তাহা সেই নিয়ম-পদ্ধতি যাহা জাতকে নিয়মের দ্বারা বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে। পৌরোহিত্যিক সাহিত্যের খুব প্রাচীন যুগ হইতে, এমনকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বৈদিক সূক্তের নিম্ন স্তরের মধ্যেও ইহার আবির্ভাব দেখা যায়।

যে-সকল তথ্যকে এই পদ্ধতি সংহিতাবদ্ধ করিয়াছে, নূতন করিয়া গুছাইয়াছে, সেই পদ্ধতি স্বভাবতই তথ্য-সমূহের পরবর্ত্তী। যখন পদ্ধতিটির আবির্ভাব হয়, তখন জাত জিনিসটার অস্তিত্ব দাঁড়াইয়া গিয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু সে কোন্ কাল হইতে? সে কথা ঠিক্ করিয়া বলা অসম্ভব। শুধু জাত যে বিদ্যমান ছিল তাহা নহে, সমস্ত হইতেই সূচিত হয় যে, জাতের বর্ত্তমান অবস্থার মতই তখনকার জাতের অবস্থা ছিল। শাস্ত্রের বচনাদি হইতে ইহা অবশ্য সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু উহা হইতে জাতের রহস্য অনেকটা বুঝা যায়, তৎসম্বন্ধে অনেকটা আলোক পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদ বাস্তবকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, মিথ্যায় পরিণত করিয়াছে। বাষ্পীভূত অতীত ও জীবন্ত তথ্য এই উভয়ের মধ্যে একটা কৃত্রিম রফার দ্বারা এই মতবাদ, জাত-ভেদ ও শ্রেণীভেদকে এক করিয়া ফেলিয়াছে, জাতকে প্রাচীন শ্রেণীভেদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছে। জাতের আকারে পরিণত এই-সকল শ্রেণীর একটা নাম দেওয়া হইয়াছিল যাহা প্রথমে "জাতি-ভেদের" (জাত নহে) তুল্য অর্থ ছিল। এই সৌসাম্যবিশিষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গঠনবিন্যাসের মধ্যে, যেমন একদিকে বাস্তব জাত সংক্রান্ত গোলযোগ ও জটিলতার কতকটা ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ দ্বিতীয় নক্সায়, একটা বাঁধাবাঁধি কৃত্রিম নিয়ম-বিন্যাস দ্বারা উহাকে ঢাকিয়া রাখাও হইয়াছে, যেমন সঙ্কর-জাতসংক্রান্ত মতবাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

অতএব সাহিত্য এই সংকট হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করে না। সাহিত্য আমাদের জন্য না-রাখিয়াছে একটা পাকা-রকমের ঐতিহাসিক শৃঙ্খলা, না-রাখিয়াছে সুস্পষ্ট পূর্ব্বস্মৃতিপরম্পরা। যদিও আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, মনোযোগী পাঠক, হিন্দু-ঐতিহ্যসুলভ অস্পষ্টতার উদাহরণ এবং আমাদের কৌতূহল-পথে কত বাধা আছে, ও কতটা সতর্কতার সহিত এই পথে চলিতে হইবে তাহার একটা শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ যদি ইহা হইতে পাইয়া থাকেন তা হইলে অন্ততঃ কতকটা সান্ত্বনা পাইবেন।

গোড়ার উৎপত্তি-সমস্যার নিকট সাক্ষাৎভাবে উপনীত হওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চরত্ন

(টুর্গেনিভের গদ্য কবিতা)

ভিখারী

পথ দিয়া চলিয়াছিলাম। এক জরাজীর্ণ বুড়ো ভিখারী আসিয়া আমাকে থামাইল।

লাল লাল চোখ জলে টল্‌টল্ করিতেছে, ঠোঁট দুখানা নীল, গায়ের কাপড় ময়লা মোটা শতছিন্ন ন্যাকড়া, সারা অঙ্গে রক্ত পুঁজ আর ঘা। হায়, দারিদ্র্য কি বিকট রাক্ষসী-মূর্ত্তি ধরিয়া হতভাগাকে গিলিয়া ফেলিতেছে!

সে তাহার একখানা কর্কশ ময়লা বাতে-ফোলা হাত আমার সামনে পাতিয়া ধরিল। যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করিতেছে; কথা বাহির হয় না। বিড়বিড় করিয়া অতি কষ্টে বুঝাইতে চাহিল, সে দয়ার ভিখারী।

আমি দুই হাতে পকেট হাতড়াইতে সুরু করিলাম। নাই, নাই, কিছুই নাই; টাকার থলি নাই, একখানা রুমালও নাই। শূন্য হাতে আজ বাহির হইয়াছিলাম। ভিখারী তখনও আশায় দাঁড়াইয়া, তাহার বাড়ানো হাতখানা বড় দুর্ব্বল, কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

লজ্জায় দিশাহারা হইয়া আমি আগ্রহভরে তাহার সেই ময়লা কম্পমান হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভাই, আমার যে কিছুই নেই ভাই।"

ভিখারী তাহার রক্তআঁখি তুলিয়া আমার দিকে তাকাইল। তাহার নীল ঠোঁট দুখানা হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সেও তাহার ঠাণ্ডা কন্‌কনে আঙুলগুলা দিয়া আমার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল।

সে আবার অস্ফুটস্বরে বলিল "তা'তে কি ভাই?—এর জন্যেও ধন্যবাদ। ভাই এও যে একটা মহৎ দান!"

বুঝিলাম, আমিও আজ আমার ভাইএর কাছ থেকে একটি দান লাভ করিয়াছি।

• • •

কুকুর

আমরা দুটিতে ঘরে বসিয়া—আমি আর আমার কুকুর।

বাহিরে ভীষণ ঝড় গর্জ্জন করিতেছে। কুকুরটি আমার সাম্‌নে বসিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া আছে।

আমি তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। সে যেন আমাকে কি বলিতে চায়! সে যে মূক, তাহার যে ভাষা নাই, তাহার মনের কথা সে নিজে বোঝে না—কিন্তু আমি তাহার মনটি দেখিতে পাইতেছি।

আমি বুঝিতে পারিতেছি, এই মুহূর্ত্তে তাহার ও আমার মনে একটি কথাই জাগিতেছে। বুঝিতেছি, তাহাতে আর আমাতে কোনো প্রভেদ নাই। আমরা এক। দুইজনের অন্তরে সেই একটি কম্পমান শিখাই জ্বলিতেছে।

মৃত্যু তাহার হিম-শীতল বড় বড় পাখার ঝাপটে দিক কাঁপাইয়া নামিয়া আসিতেছে।

এইবার শেষ।

আমাদের দুইজনেরই মধ্যে যে কিসের অগ্নিকণা জ্বলিতেছিল, তাহা কে বুঝিবে?

না, না; এই যে আমরা দুইটিতে দুই জনের দিকে চাহিয়া আছি, আমরা ত মানুষ ও পশু নয়, আমরা দুজনেই প্রাণী।

এই যে দুই জোড়া চোখ পরস্পরের উপর স্থাপিত, ইহা ত' সমধর্ম্মীরই চোখ।

এই পশু ও মানুষের ভিতর একই প্রাণ ভয়ে অপরের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতেছে।

বাঁধাকপির ঝোল

এক বিধবা কৃষকবধূর একটিমাত্র ছেলে। কুড়ি বৎসরের তরুণ যুবক, গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারিগর। একদিন সে মরিয়া গেল।

গ্রামের মালিক এক মহিলা। বিধবার দুঃখের কথা শুনিয়া কবরের দিনেই তাহাকে দেখিতে গেলেন।

দেখিলেন সে বাড়ীতেই আছে।

কুঁড়ে-ঘরের মাঝখানে টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া ডান হাতখানা সমান তালে চালাইয়া সে ধীরে ধীরে একটা কালো বাটির তলা হইতে এক এক চামচ করিয়া পাতলা জোলো বাঁধাকপির ঝোল তুলিতেছিল আর খাইতেছিল। বাঁ হাতখানা অলসভাবে পাশে ঝুলিতেছিল।

বিধবার মুখখানি শুষ্ক ম্লান।

কিন্তু সে গির্জ্জার উপাসিকার মতো আপনাকে ঠিক খাড়া করিয়া রাখিয়াছে।

মহিলা ভাবিলেন, "হা ভগবান্, এমন দিনেও এর খাওয়া আসে! বাস্তবিক এই লোকগুলোর কি একজনেরও হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই?"

তখন তাঁহার মনে পড়িল, কয় বৎসর আগে তাঁহার ছোট নয় মাসের মেয়েটি যখন মারা যায়, দুঃখে তিনি পিটার্সবর্গের কাছের অমন সুন্দর বাগান-বাড়ীতেও যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সমস্ত গ্রীষ্মকালটাই শহরে কাটাইয়াছিলেন!

সেই স্ত্রীলোকটি তখনও ঝোল খাইতেছিল।

মহিলা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া ফেলিলেন, "টাটিআনা, বাস্তবিক! অবাক্ কাণ্ড! ছেলের জন্য তোমার কি কোন দুঃখ নেই! একি সম্ভব? তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়ে যায়নি! একি আশ্চর্য্য ব্যাপার? কি করে তুমি এখন ঝোলটা খাচ্ছ?"

বিধবা শান্তস্বরে বলিল, "আমার ভাসিয়া আর জগতে নেই," বলিতে বলিতে তাহার শুক্‌নো গাল বাহিয়া আর-একবার বেদনার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। "আমারও এইবার শেষ নিশ্চয়; আমার জীবন্ত শরীর থেকে হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ঝোলটা ত আমি নষ্ট করতে পারি না ওতে যে নুন আছে।"

মহিলা অবজ্ঞাভরে ঘাড় দোলাইয়া চলিয়া গেলেন। ফুলের জন্ম ত তাঁহার বেশী কিছু লাগিত না।

• • •

চড়াই পাখী

শিকারের শেষে বাগানের পথে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। পথের দুইধারে গাছের সারি। কুকুরটা আমার সাম্‌নে দৌড়াইয়া চলিয়াছে।

হঠাৎ তাহার গতি মৃদু হইয়া আসিল; যেন চুপিচুপি শিকারের পিছন লইয়াছে।

গাছের সারির দিকে চাহিয়া দেখি, একটা ছোট চড়াই পাখীর ছানা, ঠোঁট দুটি হল্‌দে, পাখায় নরম নরম পালক। বাসার উপর থেকে পড়িয়া গিয়াছে (ঝড়ে তখন পথের ধারের বটগাছগুলি ভয়ানক দুলিতেছে); বেচারার নড়িবার ক্ষমতা নাই, তাই অসহায়ভাবে অপূর্ণ ডানা দুখানি নাড়িতেছে।

কুকুরটা আস্তে আস্তে তাহার দিকে যাইতেছিল; হঠাৎ তখনই কাছের একটা গাছ হইতে কালো-ঠোঁটওয়ালা একটা বুড়ো চড়াই পাথরের মতন ঠিক্‌রাইয়া ঠিক তাহার নাকের সাম্‌নে আসিয়া পড়িল; তাহার পালকগুলো এলোমেলো, ভয়ে সে দিশাহারা। নিরাশায় কাতর হইয়া বেচারা কিচ্‌মিচ্‌ করিতে করিতে দুই দুই বার কুকুরটার হাঁ-করা মুখের ঝক্‌ঝকে দাঁতগুলোর সাম্‌নে গিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

ছানাটাকে বাঁচাইবার জন্য কি লাফালাফি! তাহাকে আড়াল করিয়া তাহার সাম্‌নে গিয়া পড়িতেছে... কিন্তু বেচারার ছোট শরীরটুকু ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে; তাহার গলার স্বর কর্কশ, অদ্ভুত; ভয়ে অজ্ঞান হইয়া সে নিজেকেই শত্রুর মুখে ধরিয়া দিল।

কুকুরটাকে তাহার না জানি কি ভীষণ একটা দানবই মনে হইয়াছিল। কিন্তু তবুও সে বিপদ হইতে দূরে গাছের সেই উঁচু ডালটিতে বসিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল আর-একটা শক্তি তাহাকে টানিয়া নীচে আনিয়া ফেলিল। আমার 'ট্রেজার' একেবারে চুপ, সে আরও হটিয়া আসিল। সেও সেই শক্তিকে চিনিয়াছে।

আমি পরাজিত কুকুরটাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া আনিয়া শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিলাম। সত্যই তাই, তোমরা হাসিও না। ওই ছোট বীর পাখীটির ভালবাসার শক্তি দেখিয়া আমার হৃদয় তাহার কাছে শ্রদ্ধায় নত হইল। আমার মনে হইল, মৃত্যুর চেয়ে প্রেম প্রবল, মরণ-ভীতির চেয়েও প্রবল। ইহারই শক্তিতে, এই প্রেমেরই শক্তিতে জীবনের স্থিতি ও উন্নতি ও গতি।

• • •

আমরা যুঝিয়া চলিব

কত তুচ্ছ ছোট ঘটনা এক এক সময় মানুষের সমস্ত জীবনটাকেই বদ্‌লাইয়া দেয়!

একদিন বিষণ্ণ মনে রাজপথ দিয়া চলিয়াছিলাম।

একটা গভীর দুঃখের আশঙ্কায় আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া ছিল। নিরাশায় আমি অবসন্ন। আমি মাথা তুলিলাম। আমার সাম্‌নে দুই সারি উঁচু উঁচু পপ্‌লার গাছের ভিতর দিয়া পথটি তীরের মতন সুদূরে চলিয়া গিয়াছে।

পথের ওপারে, আমার পাঁচ হাত দূরে, গ্রীষ্মকালের ঝল্‌মলে সোনালি রোদের মাঝখানে একদল চড়াই পাখী একে একে নাচিয়া চলিয়াছে। গর্ব্বভরে, অপরূপ ভঙ্গীতে আত্মনির্ভরশীলের মতন তাহারা নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে!

তাহাদের মধ্যে একজন আবার নির্ভীক হৃদয়ে মহা উৎসাহে তাহার ছোট বুকটি ফুলাইয়া একদিকে হেলিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। উদ্ধতের মতন কিচ্‌মিচ্‌ করিতেছে, যেন বলিতে চায় 'আমি কাহাকেও ভয় করি না।' বাস্তবিক সে একটি সাহসী যোদ্ধা।

এদিকে মাথার উপর আকাশে একটা বাজ উড়িতে আরম্ভ করিল; বোধ হয় ওই ক্ষুদ্র যোদ্ধারই যম।

আমি চাহিয়া দেখিলাম, দেখিয়া হাসিলাম। গা-টা ঝাড়া দিয়া ফেলিতেই যেন যত বিষাদ যত দুশ্চিন্তা উড়িয়া চলিয়া গেল। আবার নূতন করিয়া যেন আমার মধ্যে তেজ বীর্য্য, ও জীবনের উন্নতির উৎসাহ ফিরিয়া আসিল।

আমার জীবনের বাজ মাথার উপর উড়িতেছে, উড়িতে দাও।

আমরা বুঝিয়া চলিব, আর সকল ভয়কে তুড়ি দিয়া চলিয়া যাইব।

শ্রীশান্তা দেবী।

চাঁদের হার

দুঃখজিতা।

অন্নপূর্ণা, তবে করে ভিক্ষা লভিবারে
সাধ করে হইয়াছি শাশ্বত ভিখারী।
যাচিয়া লয়েছি আমি অনন্ত তৃষ্ণারে
লভিবারে তব করে চির শীত বারি।
তোমার অঞ্চল-স্নেহ লভিতে নয়ন
হয়ে' আছে যুগে যুগে অশ্রুর নিলয়,
ব্যাধিরে করেছি আমি এ দেহে গ্রহণ
তব কর-কিসলয়ে হতে নিরাময়।
সুধাবাক্য শুনিবারে করি অভিমান,
মমতা লভিতে করি বিরহ সৃজন,
শয়নে নয়নে শুধু করি নিদ্রা-ভান
জাগিয়া উঠিতে লভি' তোমার চুম্বন।
ঝরাইতে অশ্রুজল তোমার নয়নে
জনমে জনমে আমি বরি গো মরণে।

প্রাক্তনী।

কতবার স্বয়ংবর-সভা তেয়াগিয়া
এ কাঙাল-কণ্ঠে দেছ তব বর-মালা;
ঘুরিয়াছ বনে বনে আমার লাগিয়া,
কতবার সাজায়েছ মম পর্ণশালা।
কতবার রাখিয়াছ সতী-তেজোগুণে
শমনের দণ্ড হতে আমার জীবন;
কতবার সাজায়েছ অসি আর তূণে,
রথরশ্মি কতবার করেছ ধারণ।
তোমা হেরি আজি মোর মনে হয় তাই
কিছুই তোমার আজি নহেক নূতন,
হে সহধর্ম্মিণী হেথা কিছু শিখ নাই,
সবি চির-পরিচিত প্রবুদ্ধ প্রাক্তন।
কত জন্ম হতে তুমি মিলি মোর সনে
বাঁচায়ে রেখেছ মোর মানস-জীবনে!

রূপময়ী।

তুমি মোর আঁখি-তারা, তুমি মোর আলো,
তুমি মোর অন্ধ-ক্লান্ত-নেত্র-সঞ্জীবন,
এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো
তোমার স্বচ্ছতা দিয়ে নেহারি যখন।
বিশ্বেরে দেখালে তুমি ইন্দ্রধনু-সাজে,
লক্ষ কোটি শিখী যেন পাখা মেলে নাচে;
সব রস ভাব মায়া রূপ হয়ে রাজে,
সব মন্ত্রগুলি যেন ঘুরে কাছে কাছে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা দীপ খদ্যোতিকা
মাণিক্য ওষধিরশ্মি গড়েছে তোমায়,
শত জনমের মোর স্বপ্ননীহারিকা
কেন্দ্রীভূত পুঞ্জীভূত তব প্রতিমায়!
তুমি যাতে নাহি তাহা মায়া আবছায়া,
ঘনীভূত অন্ধকার, নাহি বর্ণ কায়া।

রসময়ী।

আনন্দ-মদিরা তুমি নিত্য রসায়ন,
তোমারে পিইয়া মোর চিত্ত ঢুলুঢুলু,
রসের নির্ঝর, লভি তোমার জীবন
আমার জীবন-নদী বহে কুলুকুলু।
তুমি কিগো মধুগঙ্গা এলে এ ধরায়
বিভুপাদপদ্মযুগে জনম লভিয়া;
সুধাসিন্ধু-বিমথিত মন্দার-শাখায়
তোমার অঙ্গুলিগুলি ফুটিল কি প্রিয়া?
কটু তিক্ত কষায়ের সপ্তবর্ণ-রসে
সঞ্জাত তোমার দুগ্ধহৃদয় অমল,
রক্তিম আনন্দে হাস্য অধর বরষে,
দুগ্ধ-সরোবরে যেন কোকনদ-দল!
ইহেরে করেছ প্রিয়ে স্পৃহনীয়তম,
জীবনে করেছ ঘন চুম্বনের সম।

শ্রীকালিদাস রায়।

পাপ স্বীকার

(গল্প)

আমি তখন বাইরের দিকে চেয়ে জানালার কাছটিতে খুব গম্ভীর ভাবে জড়সড় হয়ে বসে ছিলাম। মেঘলা দিনের উদাস বাতাস সারাটা আকাশময় মাতামাতি করে ফিরছিল।

বৃষ্টি,—সে অবিরাম বৃষ্টিতে দুপুরের জাঁকালো ঝাঁঝালো চেহারা সাঁঝের ছায়ায় কালো করে দিয়েছিল।

বৃষ্টি, –সারাদিন বৃষ্টি। গায়ের উপর কাপড়টা ভাল করে টেনে দিয়ে বাইরের দিকে চাইলাম, দূর থেকে কে আসছে, নয়? হাঁ তাইত, কিন্তু যাঃ —ভেবেছিলাম মিঃ দত্ত কি রায়েরা কেউ যদি আসে, বেশ গল্প করে অবসর সময়টা কাটানো যাবে এখন।

—বুড়ো মানুষ, বাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে, নুয়ে-নুয়ে পিছল পথ দিয়ে যে কষ্ট করে আসছিল, দেখে ভারী দুঃখ হল। রোজই প্রায় বুড়ী এ পথ দিয়ে যায়। কোন দিনই আলাপ না থাকলেও বেশ চিনি যে তিন কুলে কেউ নেই এক বুড়ী, এক কুড়ানো কাণা মেয়েকে নিয়ে একটা সংসার পাতিয়ে গ্রামের ধারখানিতে বসবাস করে। ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, বারোমাস ত্রিশ দিন গির্জ্জায় আসা যে কখনো দরকার তা তাদের ভুলেও মনে হয় না। এখানে আসার দরকার না হলেও এ রাস্তাটা দিয়ে যাওয়া যে তার রোজই দরকার তা বেশ জানি। কাণা মেয়েটাকে সঙ্গে করে বুড়ী বরাবর ভিক্ষে করত, মেয়েটা বড় হলে পর সে আর ভিক্ষেয় বেরোয় না। কাজ-টাজও কিছু শিখেছে বোধ হয়, মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাই বুড়ী নানা রকমের সাজি ডালা চ্যাটাই সব বিক্রীর জন্য হাটে নিয়ে যায়, একদিন কাকে বলছিল,—মংলী এসব তৈরি করে, আমি বুড়ো দেখতে পাই না কি করে করবো,—হ্যাঁ, মেয়েটাও দেখতে পায় না, মোটেই পায় না, কিন্তু ভারী চমৎকার তৈরী করে, অভ্যেস বাবু, সব অভ্যেস।"—এ কি, পথ ভুলল নাকি আজ বুড়ী? এই ঝড়জলে ভিজতে ভিজতে যে আজ গির্জ্জার ফটকে এসে দাঁড়ালো, সত্যিই ত দুয়ার নাড়ছে।—উঠে তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিলাম, জিজ্ঞেস করলাম,—কি চাই তোমার?

বুড়ী চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কি দেখতে পেলে বুঝলাম না, দেখলাম শুধু তার ছোট চোখ ঝোলানো পাতা ঠেলে বড় করবার চেষ্টায় আরো ছোট হয়ে পড়ছে। চার দিক চেয়ে বুড়ী পরম নিশ্চিন্তে সেই থানটায় বসে পড়ল। আমি বললাম—ভিজেছ যে, বুড়ো মানুষ ভিজে-কাপড়ে অসুখ করবে, কাপড় নিংড়ে ফেলো। একখানা কাপড় দিচ্ছি তাই পরো।

অগ্রাহের হাসি হেসে বুড়ী বললে,—কিচ্ছুনা বাবু, এতেই যদি অসুখ বাড়ে কমে ত কবেই মরে যেতাম, তুমিই কি গির্জ্জার বাবু?

আমি বললাম—হাঁ, আমিই এখানকার প্রচারক। কি চাই তোমার?—

—চাই না কিছু, শুধু দয়া করে বলবেন যে আমার এমন হল কি পাপে? আমি পাপ স্বীকার করতে এসেছি, সত্যি করে বলুন, কি জন্যে আমার এমন দুঃখু—

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, বুড়ী বললে—আসনখানা টেনে এনে এখানে সোজা হয়ে বসুন, আমি সবকথা বলে যাচ্ছি, শুধু দেখবেন আমার পাপ কি এত বেশী ভারী, যে, তাই জন্যে এই রোগ শোক উপোষের দুঃখু আমি সুদের জায়ে সইব? হাঁ, কি বলবো—গোড়া থেকেই বলি, সব ঠিক মনে নাই ত, তবু যা হোক শুনুন, যত বুড়ো ভাবছেন আমায় তত বুড়ো আমি নই। আমার বয়সী ঢের লোক খেটে খাচ্চে, আমার এ দশা শুধু রোগে। ব্যায়রামে ভুগে ভুগে চেহারা এই হয়েছে, শক্তি হারিয়েছি; বুড়ো নই তত বাবু, যত ভাবে সকলে। এই সেদিনকার কথা, আমি ছোটবেলা বড় দুরন্ত ছিলাম, খালি পাগলামি আর পাগলামি। কি সময়ই গেছে সে, কি অবোধ সময়, জানতাম না যে আমার বাপ মা কিছুই নেই, পরের দয়ায় খেয়ে বেঁচে আছি!

পরের দয়াটা যে কি রকম, যারা সম্পূর্ণ পরের দয়ায় নির্ভর করে চলে তারা বেশ বুঝতে পারে। যত তোমরা ভাব তত মোলায়েম নয় সেওয়া, আপনার অধিকারে সে রাজার মত হুকুম করে শুধু না, সেই বে-আইনী আইন না মানলে সে দয়ার অধিকার থেকে অতি সহজেই বঞ্চিত হতে হয়। আর সে মানুষকে বড় তাড়াতাড়ি জ্ঞানী করে

তোলে, যদিও সে মানুষ কোন দিনই বুদ্ধিমান বলে পরিচিত হতে পারে না। আমার বেশ পরিষ্কার জ্ঞান হল যে আমার বাপ মা ভাই তিনকুলে কেউ নেই। কেউ কোনো দিন জন্মের পর থেকে আপন বলে আমায় যত্ন সাহায্য করেনি,—আমি পরের বোঝা হয়েই এতটা বড় হয়ে উঠেছি। আমি তখন বেশ স্পষ্ট করেই সে দয়ার অস্তিত্বটা অনুভব করতে পারছিলাম। তত ছোট বেলায়ই, সেই সাত আট বছর বয়সেই, সে আমাকে বেশ করে জানিয়ে দিয়েছিল, আমার জন্য সকলকে কত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। রোজ দুবেলা এটা বেশ স্মরণ করিয়ে দিত যে আমার আর কোথাও জায়গা নেই, এখানেই কায়েমী রকমে গিলতে হবে। এই যে বিনা পয়সায় বিনা শ্রমে বসে বসে গিলতে পাওয়া, এ আমার ভারী —ভারী-রকম সৌভাগ্য; আমি সেজন্য তাদের কাছে যে রীতিমত কৃতজ্ঞ নয় সেটাও আমায় স্মরণ করিয়ে দিতে কখনো ভুল হত না।

যাক্, তবু সে দয়ায় বেঁচে ছিলাম। আমার পাগলামি, দুরন্তপনা হাসিখেলা সবই সে দয়ার ঠাণ্ডা প্রলেপে বেশ জমে কঠিন হয়ে গিয়েছিল।

কি বলবো বাবু যদি দেখতে, ছবির মত আমার চেহারা হয়েছিল নিরেট কঠিন। একখানা হাতও যদি কেউ কেটে নিত, তবু মুখে একটা রেখা পড়ত না, চোখ লাল বা সজল হত না; যদি সবাই কোনো কথা বা কাণ্ড নিয়ে হেসে কুটপাট হত, তবু আমার ঠোঁটের কোণ কেঁপে উঠত না, চোখ চঞ্চল হত না। শুধু হুকুমের বেড়ার মধ্যে কলের মত ঘোরা ফেরা করতাম। সে এক অদ্ভুত দিন চলে গিয়েছে।

তারপর,—হাঁ তার পর, সত্যই ত আমি আর কল নয়। একটা জ্যান্ত মানুষ, না খেলে খিদে পায়, বেশী খাটলে হাঁপিয়ে পড়ি আর সারা দিনের পরে ঘুমে ঢুলে পড়ি।—সবই যখন ছিল, আমার মন যাবে কোথা? মনও ছিল, আর-সকলের চেয়ে বেশী-রকম ছিল। কারণ আর-সবাই সারাদিনের গোলমালের মধ্যে নিজের মনকে একেবারে ভুলে থাকতো, আমার মন বাইরের আঘাতে আরো সচেতন হয়ে উঠত, ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতো, রীতিমত ক্ষ্যাপা হয়ে উঠত, কি কষ্ট করে যে তাকে থামাতাম সে আমিই জানি বাবু।

বাইরে দুরন্তপনা যত থামলো, মন আমার তত দুরন্ত হয়ে উঠল, আমাকে বেশ করে বুঝাতে লাগলো, ওরে কেউই ভাল নয়। এ সারা পৃথিবীতে কেহই ভাল নয়; ভাল বলে একটা জিনিসও এ পৃথিবীতে নেই।

বাইরে থেকে কেউ এসে দুটো ভাল কথা কইত, আমার মন তখনি বেশ বুঝতে পারতো এ পরের ওপর কিনা তাই, নিজের ঘাড়ে পড়লে এক্ষুনি এ কথা বদলে যাবে।

যাক, তবু দিন কাটছিল ক্রমে; কিন্তু ঢের উপসর্গ জুটলো, যা ভাঙতো সব আমার নাম; যা হারাত, চুরি যেত সেও আমারি কাজ। সকলকার দাবী দাওয়া মিটিয়ে কারো যদি এমন ঝঞ্ঝাট সইতে হয় তো কাঁহাতক টিকতে পারে বাবু?

দোষ?—না, হাঁ দু একখানা ভাঙতাম বৈ কি, সব্বাইয়েরই যেমন করে যায়। কিন্তু এ যে সব দোষই আমার।

চুরি করতাম না কোন দিনই, হারাত হয়ত দুএকটা। যাক্, সেও হয়েছিল, শোনই বাবু,—

একদিন হঠাৎ আড়াল থেকে শুনতে পেলাম, শুনবার মনস্থ করিনি যদিও, তবু শুনলাম, কি তর্ক হচ্ছিল, মোটের ওপর আমার বাবার শচারেক টাকা ছিল,—এই জিনিস-পত্তর, নগদে, কাগজে এক করে,—সেইটে তারা এতদিনে বেমালুম হজম করে ফেলেছে। হঠাৎ শুনে গা কেঁপে উঠল, কি ভয়ানক! এ আমি কোন দিনই আশা করিনি, যদি জানতামও তবু আমার আশা করা অন্যায়,—এরা আমার খাই-খরচায় সেটা মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই যে দয়ার অনুগ্রহের অত্যাচার, এর দাম কে দেবে? কোনই দাবী নেই জেনে সবই সয়েছিলাম, এবার দাবীর অধিকার পেয়ে মন ক্ষেপে উঠল, কি দিয়ে, কি রকমে, এ দাবীর দাওয়া মিটাব?

এক্ষুনি, আমি এক্ষুনি চাই!

হঠাৎ বিদ্রোহের সাড়া পেয়ে তারা যত দমন করবার জন্য লাগল, আমার মনও তত বেশীই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। এক দিন খানিকটা মাল নিয়ে সোজা সরে পড়লাম।

সরে পড়বো আর কোথায়?—যে দিকে দুচক্ষু যায়। পাড়াখানি ছাড়া কোথাও যে চিনি না। খানিকটা

দূরে গিয়ে মনে হল, ঐ যে চুরি! বিদ্রোহী মন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, হোক্, তবু তাঁদের চেয়ে ছোট চুরি!

তবু চুরি ত! জিনিসগুলা একটা জলার ভিতর ফেলে দিলাম; ইচ্ছা করেই এমন ভাবে ফেললাম যে কেউ কখনো না পায়। পরবার কাপড়খানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না আমার। বয়স?—হাঁ, তের চৌদ্দ খুব হবে, বেশীও হয়ত।

যাক্, সারা রাত হেঁটেছিলাম। সে যে কি যাত্রা,—অনির্দ্দেশ যাত্রা, অজ্ঞাত উদ্দেশ্য,—শুধু ভয় আর চিন্তা যে আবার ফিরতে না হয়।

সারা রাতভোর হাঁটলাম, পা ধরে গেল; কোন দিন ত এত হাঁটিনি কখনো।

তবু হাঁটলাম, ভোরে দেখলাম শুধু মাঠ। কাপড় ভিজে ছিল, সাঁতরে খাল পার হয়েছিলাম দু তিনটা। রোদ উঠতে মাথা ধরল, দুহাতে মাথা চেপে বসে পড়লাম, সারা গা থর-থর করে কাঁপছে। সেই যে বসলাম, আর পা তুলতে পারিনা, ফুলে এত বড়, আর কি বেদনা বাবু! সেই জীবনে ডাক ছেড়ে কাঁদলাম,—মা, ওমা, কোথায় তুই, আমি যে আর সইতে পারিনা, আমায় নিয়ে যা। তারপর, আর মনে নাই, যখন চোখ চাইলাম, দেখি একখানি চমৎকার সাজানো ঘরে শুয়ে আছি, এক বাবু কাছে বসে আছেন। চোখ চাইতেই জিজ্ঞেস করলেন কি চাই? থাক্, সে অনেক কথা। মোটের ওপর আমি জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, সেখানকার গ্রামের গির্জ্জার বাবু তখন প্রচার করতে রওয়ানা হয়েছিলেন, পথে আমায় পেয়ে তুলে এনে সকলকার হেলাফেলার প্রাণকে অতিরিক্ত যত্নে চিকিৎসায় বাঁচিয়ে তুললেন।

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, একি মানুষ না দেবতা!

মনে হল খৃষ্টানের জল খেলাম, জাত নষ্ট হল। হোক্, আমার আবার জাত কি? আমার জাতে কার কি আসে যায়?

কতদিন সেখানে রইলাম, শান্তিতে ছিলাম। শান্তিতে থাকবারই কথা, কিন্তু কেন জানিনা, মনে শান্তি লাগতো না।

বাবু বললেন তাই বাপ্তাইজ্ হলাম। ধর্ম্ম কি কোনো দিন জানিওনি শুনিওনি, তিনি অবসর সময়ে খানিক খানিক বলতেন, আমি চেয়ে থাকতাম, কানে কথা পৌঁছত কি না তিনিও জানতেন না আমিও জানতাম না। পড়তে শেখাবার জন্য যত্ন নিতেন, তাঁর বেশী সময় হত না,—আমি ত তাঁর কাছে পড়বার সময়টুকু ছাড়া বই আর হাতেই নিতাম না। তিনি পড়াবার সময় যে কি-রকম পড়া হত, তা দেবতাই জানে। তিনি বলতেন—তোমার মন নেই হবে কি করে? আমি বেশী করে ঘরের কাজে মন দিতাম। ঘরের কাজ করে যে এত সুখ এ আর কোনো দিনই জানিনি। তাঁকে যত্ন করে, একটু আরামে রেখে আমার বুক সুখে ভরে যেত, তৃপ্তিতে উছলে পড়তো।

কি স্বর্গের ছবি তাঁর মুখে, কি শান্ত, কি নম্র, আর কি মিষ্টি!

ছ মাসের পর একদিন দেখলাম আর দুখানা ঘর উঠছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি হবে এখানে?

তিনি বললেন—তিন বছর স্বামী হয়েছি, তাই ওদের আনাব।

প্রথমে অবাক হলাম, কাদের? কথাবার্ত্তায় জ্ঞান হল ঐ ওরা কারা!

কি যে প্রলয় হল মনে, বলতে পারিনা, ভাবতেও পারিনা সেদিনকার কথা। সারারাত কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম, কোন আশা করেছিলাম তাই ভেঙেছে বলে? না—না তা ত নয়, এমন অসম্ভব আশা আমার মনে ঠাঁই পায়নি। এখানে থাকতে পাবো না বলে?—চিরজীবন থাকলেও ইনি তাড়াতেন না জানি। তবে কেন, কেন কাঁদলাম? জানিনা কেন। শুধু জানি আমার বুক ফেটে যেতে লাগল।

পরদিন কোনো-রকমে জানালাম—আমায় কোনো মিশনে পাঠিয়ে দিন, যেখানে অনেক মেয়ে থাকে। তিনি বললেন—হাঁ আমিও ভাবছিলাম তোমায় নিয়ে কি করি? আমাদের কাছেও থাকতে পারতে, কিন্তু তা'হলে ভবিষ্যতের উন্নতির পথ থাকবে না। কোন মিশন স্কুল হলেই সুবিধে হয়, বোর্ডিংএ বেশ থাকবে। তবে তুমি দুচার দিন দেরী করে তোমার বৌদির সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

আমি স্বীকার পেলাম না, তিনি যেন কিছু দুঃখিত হলেন; তাঁর মলিন মুখের সামনে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমি তখন সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই, এখানে থাকলে আমার মনের বিপর্য্যয় কি আরো বেড়ে যাবে না? আমি কি করে থামাব আমার মনকে? ছোটবেলা থেকে শাসন করেএল, কিন্তু যেদিন চুরি করে পালালুম, সেদিন ত আর শাসন করবার সাধ্য হল না তাদের। এও যদি তেমন কিছু করি, কি উপায় হবে তখন? ঈশ্বর রক্ষা কর আমায়, বল দাও আমায়!

যাওয়ার সময় হল, কিন্তু পা যে উঠতে চায়না;—তবু যেতেই হবে।

হিন্দু ধরণে পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলাম, শুধু ফাঁকা নমস্কারে তৃপ্তি হল না। কিন্তু এ যে আরো অতৃপ্তি কুড়িয়ে নিলাম।

পায়ের উপর মাথা রাখতে পা ভিজে গেল, তিনিও স্নেহকাতর স্বরে সান্ত্বনা দিলেন, কত সৎ উপদেশ দিলেন; কিছুই কানে গেল না। কি বুঝবেন তিনি আমার ব্যথা!

এলাম সহরে; সে এক বিচিত্র ব্যাপার, নূতন দৃশ্য! আমার সবই আশ্চর্য্য ও নিখুঁত মনে হল, কিন্তু কিছুতেই সান্ত্বনা পেতাম না।

অনেক, অনেক দিন কাটলো। লেখাপড়া কিছু শিখেছিলাম বৈকি, কিছু মনে নেই তার। যাক্ সে কথা, বয়স অনেক হল, সেখানকার জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

বিয়ে করলাম না, করলে এতদিনে মস্ত গৃহস্থালি হত। মন কিছুতেই রাজি হল না।

বিদ্যে ত বর্ণ-পরিচয়, সেও পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলি, ফিরে ফিরে কতবার শিখলাম।

বেশী বয়সে বর্ণপরিচয় করতে লজ্জা হত, তাই শুধু ঘরের কাজই করতাম।

পঁচিশ উৎরে গেল।

রোজগার করব এমন বিদ্যেবুদ্ধি নেই, ক্ষমতা আছে খেটে খাবার। কর্ত্তৃপক্ষ বেজায় খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, এ আর চলেনা। চলেনা ত চলেই না, আরো ভাল করে চললো না যখন আমার টাইফয়েড জ্বর হল। বড় অনিয়মিত পরিশ্রম করতাম। পরিশ্রমে ছেলেবেলা থেকেই অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এ বড় অতিরিক্ত। তার পরে শরীরের যত্ন মোটেই নিতাম না। যেন এ পরের মাল, গুদামে পচছে, থাকলেই কি গেলেই কি?

কি জানি কেমন করে সেরে উঠলাম. হাসপাতাল থেকে ফিরে মন উড়ু-উড়ু করতে লাগল। এখানে সবাই বললে তাদের আর আমাকে দিয়ে দরকার নেই, হয় আমি বিয়ে করি নয়তো কোথাও কাজ করি।

কাজ ত ঝি-গিরি?

হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেল, কি-রকম করে এক বুড়ো আরদালীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। তখন কি ভেবে মত দিয়েছিলাম জানি না। আশা ছিল খেতে পরতে পাব। আর এ বুড়োর বাড়ী ঝি-গিরি বউ-গিরি সমানই।

বুড়ো বয়সে স্ত্রী মরে গিয়েছে, এক মেয়ে, আর কোনো সন্তান নেই। সদ্য বিধবা মেয়ে কাছেই থাকে। রোগা মেয়ে, পোয়াতি, দিন চলে না,—তাই কোন রকমে আমায় জুটিয়ে নিয়ে এল। এখানে এসে সেই ছোট-বেলার দৈত্য আমার ঘাড়ে চাপল।

এখানে তেমনি দয়ার মাহাত্ম্য দেখতে পেলাম, মন বেজায় ক্ষ্যাপা হয়ে দাঁড়াল। বুড়ো বেজায় কঞ্জুষ, খাওয়ার পরেও কষাকষি করে। পয়সা যেন গায়ের রক্ত। কত দিন কাটলো, এক শীতের উষায় বুড়ো মরলো,—আমিও প্রায় বাঁচলাম। হেসো না বাবু, সে স্বামী ছিল না, কখনো না। আর আমিও ত পবিত্র কুমারীই ছিলাম, কায় মন প্রাণে।

যাক্; সে স্বামী ছিল না ত আমার আছে। কিন্তু 'বাইরে' দশ জনের সাক্ষাতে যখন ছিল, দশ জনের সাক্ষাতে যখন সেটার দাবীও সে করত, তখন সে স্বামীর কাজ করবে না কেন?

কিন্তু একটি পয়সাও দিয়ে গেল না আমাকে। সবই ওই রোগা মেয়ের,—সে না থাকলে তার ছোট মেয়ে যা হোক, তাও না থাকলে সে যদি বিয়ে করে তবে স্বামী, তাও যদি না থাকে তা হলে সে যাকে দিতে ইচ্ছা করে দিয়ে যাবে।

এ কি-রকম হল বল দেখি বাবু?—আমি মানুষই নই? হত যদি সে গরীব, খেতে পায় না, তবে অদৃষ্টের সব কষ্টই হাসিমুখে সয়ে যেতাম। এ কি স্বার্থপর খেয়ালী বুড়ো!

শেষকালে সেবা যত্ন করে আমার হল এই? আরে দাসী রেখেও ত লোকে মাইনে দেয়। মনের ভিতর কি যে হতে লাগল কাকে বলব। সারাটা জীবন পরের দয়াতেই নির্ভর করে গেলাম, কোথাও এতটুকু কোনো অধিকার নাই?

সেই মেয়েটার একটা মেয়ে হল, বয়েস তখন আমার তিরিশ চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। দেখতে ভারী খারাপ হয়ে গেছি, দুশ্চিন্তায় রোগে কষ্টে যেন পাগলের মত।

সেই ছোট মেয়েটা আমার ঘাড়ে পড়লো, তার মার ভারী অসুখ, বাঁচে কি মরে।

তত ছোট মেয়ে, আরো রোগা মার পেটে জন্মেছে, সম্পূর্ণ মার কাছ ছাড়া হতেই অসুখে পড়ল। কি রকম বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, কি বলবো তোমায় বাবু।—মমতার কথা বলছ? সে আর কি হবে? আমার কোনো অধিকার ছিল ওখানে? দয়ার প্রত্যাশীই না শুধু আমি?

ওরা যদি মরেই যায়, আমার কি এমন ব্যথা বাজবে তাতে? সামান্য চাকরাণী বই ত নই কিছু। তোমরা ন্যায়ের খাতির, কর্ত্তব্যের খাতির কর, আমি প্রাণের খাতিরে দেখলাম, তাদের সঙ্গে আমার একটুও বাঁধন নেই।

ডাক্তার বলে গেল,—সাবধান, ঠাণ্ডা না লাগে, বুক ধরবে। আমার গ্রাহ্যই হল না, যেমন রোজ থাকে তেমনি রইল। রাত্রে বাতাসে জানালাটা খুলে গেল, চেয়ে দেখবার অবসর আমার হল না, আপনার ভাবনায় ডুবে ছিলাম, চিন্তায় মাথা গরম হয়ে কপালে ঘাম ফুটে উঠেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে একটু আরামেই ঘুম এলো। পর দিন শুনলাম, সত্যি মেয়েটার বুক ধরেছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেল, খাওয়ার আর মালিষের।

তত বেশী ভয় হল না, ভাবলাম ও সেরে যাবে। মা-ই তখন যায়-যায়, তার পিছেই খাটতাম, ওর জন্যে ভাববার তত সময়ও থাকতো না।

একদিন,—তার দু দিন পরেই এমন এক ভয়ানক সময় এলো যে মনে হলে এখনো আমার বুক কেঁপে ওঠে বাবু। মেয়েটা ও তার মাকে নিয়ে শুয়ে ছিলাম। রাত দুপুর বেজে গেছে, তিন ঘড়ির সময় ওষুধ খাওয়াবার কথা ছিল, চম্‌কে উঠে হাত বাড়িয়ে শিশিটা নিলাম। ঘুমে চোখ আচ্ছন্ন ছিল, কত আর সয় বল, হাড়-মাসের শরীর ত?

একদাগ ওষুধ ছিল জানতাম, না দেখেই ঝিনুকে ঢেলে, মেয়েটার মুখের কাছে নিলাম। ঠিক তেমনি সময়ে মেয়ের মা কি-রকম ঘড়-ঘড় শব্দ করে একটা ঝাঁকানি মেরে নিঃসাড় হয়ে পড়ল। হঠাৎ আমার হাত কেঁপে উঠল, ওষুধ মেয়েটার চোখে মুখে পড়ে গেল, মেয়েটা চিক্‌রে কেঁদে উঠলো। মেয়েকে শুইয়ে রেখে মার কাছে গিয়ে দেখি শেষ হয়ে গেছে।

আমি একা, এমন অবস্থায় কোনো দিন পড়িনি, ভয়ে আমার সারা গা কাঁপছিল, বুকের ভিতর দপ্‌দপ্‌ শব্দ হচ্ছিল। মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখি সে বিকট মুখভঙ্গি করছে। একি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে না পেরে চীৎকার করে উঠলাম। মানুষ এলো, ডাক্তারও হাজির হল। দেখলুম যে অত্যন্ত নির্দ্দয় রকমের একটা খুন, সামান্য অসাবধানের জন্য হয়নি। ভুলে মালিষের বিষ মেয়েকে খাইয়েছিলাম, কিন্তু চম্‌কে ওঠায় মুখে পড়েনি, চোখে পড়ে চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ও ঈশ্বর, এ তো আমি ভাবিনি, আমার হাত দিয়ে এই ঘটালে! কয়েক মিনিট আগেও এদের ভয়ানক জঞ্জাল মনে করেছিলাম, মরলে আমার কোনই ক্ষতি হয় না মনে করেছিলাম, এমন কি ঠাণ্ডা লাগবার জন্যেও সাবধান হইনি।

না—না, এ তো আমি কখনো ভাবিনি, আমি খুনে, আমি চোর!

পরের জিনিস নিয়েছিলাম কিন্তু লোভে নয়, রাগে—ব্যবহারও করিনি, ফেলে দিয়েছি, তবু চোর ত?



খুন হয়নি যদিও খুনের বাড়া হয়েছে; একটা জীবকে আজন্মের তরে দৃষ্টিহীন করেছি। আমি খুনে, আমি ডাকাত!

না বাবু, আমি তেমন কিছুই মনে করিনি, সে-রকম কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। মেয়েটা মরলে তার ঠাকুরদাদার পয়সা কটা আমার হাতে পড়বার সম্ভাবনা হলেও আমি তেমন আশা করিনি, সে ঈশ্বর জানেন।

ডাক্তারের পায়ে জড়িয়ে পড়লাম, মেয়ের দাদার প্রায় সব টাকা খরচ করে তাকে সারালাম। চোখ ফিরিয়ে দেবার সাধ্য ছিল না, কিন্তু এত যত্নে রাখতাম যে চোখের অভাব বুঝতে না পারে।

তারপর আমিও রোগে পড়লাম, রক্তের জোর পড়ে গিয়েছে, পঙ্গু হয়ে গেলাম।

মেয়ে আমার, মংলী আমার, সেই আমায় এখন পালছে।

গরীবের কত কষ্ট আছে বাবু, কত যে সইতে হয়, সব কথা কি কইব? সকলের বড় কথা এই যে আমি মলে মংলী আমার কোথায় দাঁড়াবে? কে তাকে আশ্রয় দেবে?

আহা, দেখতে পায় না বাছা আমার, আমার পাপে তার এই শাস্তি হল।

কি বলছিলাম,—পাপ স্বীকার করতে এসেছি,— হাঁ সবাই বলে যাজকের কাছে পাপ স্বীকার করলে প্রায়শ্চিত্ত হয়, রোগ শোকের উপশমও হতে পারে।

বল না বাবু, বিচার করেই বল না, কি পাপ হয়েছে এতে? কি এমন অপরাধ করেছি আমি যে দিন রাত ভিতরে বাইরে এমন কষ্ট পাই? কেন এমন মন জলে? কেন এমন দুঃখ দুর্দ্দশা সইতে হয়।

আমি সান্ত্বনার স্বরে কি বলতে যাচ্ছিলাম—সে হঠাৎ একবার মাথা তুলে কান ফিরিয়ে বল্লে—চুপ, চুপ!

তারপর আর কোন কথা শোনবার অপেক্ষা না করেই ছুটে বেরিয়ে পড়ল।

দূরে দেখলাম, ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে কাণা মেয়েটি কাঁপছে। ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর বাতাসে ভেসে আসছে—আইমা!

তারা যখন পরস্পর হাত-ধরাধরি করে রাস্তার মোড়ে পৌঁছল, একটা দমকা হাওয়া এসে আমার জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

সরযূ সেন

মাংসাশী গাছ

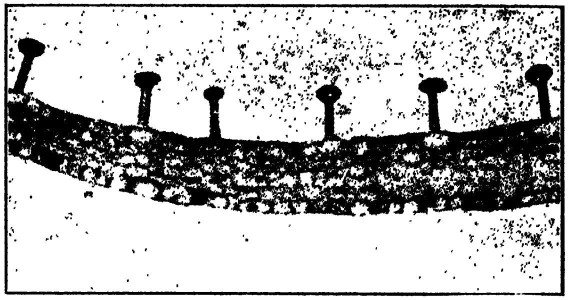
গাছেরা তাহাদের পাতা দিয়া আলো এবং বাতাস হইতে কার্ব্বনিক এ্যাসিড্ গ্যাস শোষণ করিতে পারে। প্রত্যেক পাতার কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারিতে সেই বন্দী আলোকের শক্তির দ্বারা তাহার জীবন-পোষক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে; কার্ব্বন বা অঙ্গার চিনি শ্বেতসার এবং তদ্বিধ অন্যান্য পদার্থে পরিবর্ত্তিত হইয়া গাছের পুষ্টির ও বৃদ্ধির সাহায্য করে। এইরূপে গাছ মৃত বা অজৈব পদার্থ হইতে জীবন্ত অথবা শক্তিসঞ্চারক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহা যে কেমন করিয়া ঘটে তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু পাতার মধ্যেকার সবুজ রঙের অতি সূক্ষ্ম দানাগুলি (যাহা হইতে পাতাগুলিকে সবুজ দেখায়) ঐ পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া বোধ হয়।

সুতরাং কোনো গাছ আলো বাতাস ও জল পাইলে তাহা হইতেই শক্তিপ্রদ পদার্থ অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। এইখানে গাছের সহিত জীবের পার্থক্য। কোন জীব নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে না; তাহার শরীরের প্রত্যেক খণ্ড ও প্রত্যেক নড়াচড়া গাছের পাতা, ডাঁটা, ফুল, ফল প্রভৃতি খাওয়ার ফল। অতএব দেখা যাইতেছে যে গাছই জীবের প্রাণ-ধারণের উপযোগী পদার্থের নির্ম্মাতা এবং সেই-সকল জিনিষ আত্মসাৎ করিয়া জীব শরীর পোষণ ও প্রাণ ধারণ করে।

যদিও নিজের খাদ্যসামগ্রী নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইবার শক্তি গাছের আছে, তথাপি কখনো কখনো ইহার অবস্থা এমন হয় যে, আলো, বাতাস এবং জল আবশ্যক



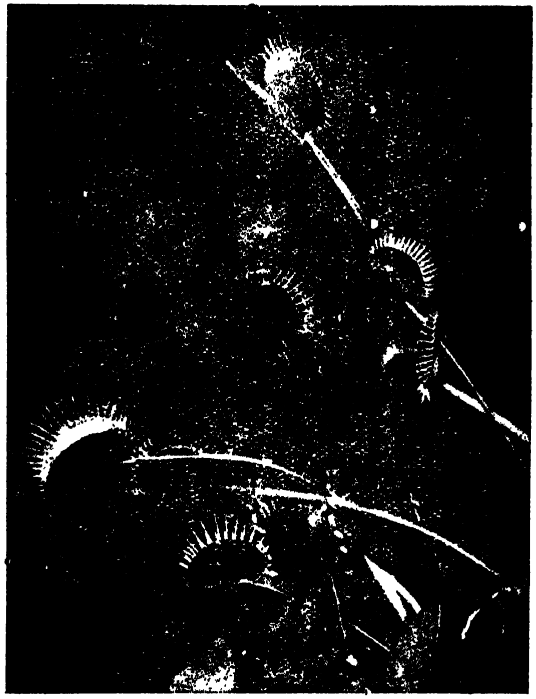
কীটমারী গাছ ফড়িং ধরিয়া খাইতেছে। ফড়িঙের ন্যায় বড় জীবও যে ইহারা ধরিয়া খায় এই ফটোগ্রাফ তাহারই সাক্ষী।



বাটারওার্ট গাছের পাতার উপরকার দুরকম গ্রন্থি—একরকম খাড় উঁচু শোঁয়ার মাথার উপর, অপর-রকম পাতার পিঠের গায়ে লাগিয়া থাকে। অণুবীক্ষণে যথেষ্ট বর্দ্ধিতাকার।



বাটারওার্ট গাছের পত্রচ্ছেদ।



ভাঁতিকল গাছের শিকার ধরিবার ফাঁদ—মুক্ত দ্বিদল পাতার মধ্যে কোনো জীব গেলেই পাতা মুদিয়া পাতার কিনারার দাঁতগুলি চাপিয়া বন্ধ হইয়া পড়ে ও বন্দী জীব তাহার মধ্যে হজম হইয়া যায়।

মত পাইলেও সেই জলে আবশ্যক-মত নাইট্রোজেন-ঘটিত ও খনিজ পদার্থ থাকে না। নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ ও খনিজ পদার্থ গাছের শরীর-পুষ্টির পক্ষে একান্ত আবশ্যক। একজন মানুষ যদি কেবল মাত্র রুটি খাইয়াই বাঁচিতে চায় তবে তাহার যেমন দশা হয়, নাইট্রোজেন ও খনিজ পদার্থের অভাবে গাছেরও পোষণ-ক্রিয়া তেমনি অসম্পূর্ণ হইতে থাকে।

গাছের দেহপুষ্টির এইরূপ অভাব পূরণ হয় গাছের ছোট ছোট কীট পতঙ্গ ধরিবার ও খাইয়া হজম করিবার শক্তির দ্বারা। গাছেরা টিশু-সংগঠনের উপযোগী



ঘটপত্রী-গাছ—এই গাছের পাতা কুলপী-বরফের ঠোঙার বা ফুল-দানির মতন, ইহার মধ্যে জারকরস জমিয়া থাকে; ছোট-খাটো জীব উহার মধ্যে পড়িলে পাতার মুখের ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায় ও বন্দী শিকারকে গাছ হজম করিয়া খাইয়া ফেলে। এ গাছ উত্তর-আমেরিকায় দেখা যায়।

যে-পদার্থ মাটি হইতে আহরণ করিতে পারে না তাহার অভাব জীব আহার করিয়া পূরণ করিয়া লয়।

উদ্ভিদের স্বভাব ও প্রকৃতি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া না জানিয়াছেন তাঁহারা গাছেরা জীবন্ত প্রাণী ধরিয়া খায় শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে-কোনো পেঁকো জলা জায়গায় গিয়া লক্ষ্য করিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন হাজারো রকমের গাছ কত রকমের ফাঁদ পাতিয়া প্রাণী-বধের কাজে লাগিয়া আছে। পেঁকো জলাজায়গায়, বিশেষ করিয়া যে-জলার পাঁকের মধ্যে গাছপালা পচিয়া জমিয়া আছে সেখানে, কীটমারী গাছ প্রচুর। গাছপালা-পচা পাঁক সর্ব্বদা এমন স্যাঁতা হইয়া থাকে যে তাহার



ঘটপত্রী গাছের পাতার খোলে বন্দী জীব।

মধ্যে অক্‌সিজেন ঢুকিবার পথ পায় না এবং তাহার মধ্যে নানা রকমের বিষাক্ত এ্যাসিড্ জমিয়া উদ্ভিজ্জাণু ও জীবাণুর অবস্থানও অসম্ভব করিয়া তুলে; অধিকন্তু সেরকম জায়গায় নাইট্রোজেন ও আবশ্যক খনিজ পদার্থের একান্ত অভাব-বশত সাধারণ গাছও সেখানে টিকিতে পারে না।

এই সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও পেঁকো জলা জায়গায় নানা-বিধ গাছ জন্মিতে দেখা যায়; তাহাদের মধ্যে কীটমারী নামক একরূপ গাছই প্রধান; এই গাছকে হিন্দীতে মুখজালী, ইংরেজীতে Sundew এবং লাটিন ও গ্রীকে



মাংসাশী গাছ—(১) সর্পফণা গাছ, ক্যালিফর্ণিয়া দেশের ; ইহার ফুলের মতন পাতার মুখ হইতে সাপের জিভের মতন লাল টকটকে একজোড় ফিতা ঝুলে ; তাহাতে মধু ক্ষরণ হয় ; রং ও মধু'র লোভে আকৃষ্ট করিয়া ইহা কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায়। (২) ঘটপত্রী গাছের পাতার মুখে ঘটাকৃতি ঢাকনি-ওয়ালা ফাঁদ ঝুলে, তাহার মধ্যে জীব ঢুকিলেই ঢাকনি চাপা দিয়া গাছ তাহাকে আহার করে। (৩) ও (৪) স্যানডিউ

Drosera বলে। এই গাছের পাতার ধারে সরু সরু শোঁয়া ও শোঁয়ার মাথায় গোল গোল চটচটে দানা থাকে, তাহা দেখিতে অনেকটা জালী বা শিশিরবিন্দুর মতন, সেইজন্ত তাহার নাম মুখজালী, Sundew, বা Drosera (গ্রীক Drosos = Dew = শিশিরবিন্দু) হইয়াছে। এই গাছের পাতার গায়ের চটচটে শোঁয়াতে ছোট পোকা-মাকড় আসিয়া পড়িলে বন্দী হইয়া যায় এবং সেই-সব প্রাণীর দেহ পচিয়া গাছের টিশু গঠনের উপযোগী যে-সমস্ত পদার্থ মাটি হইতে পাওয়া যায় না তাহার অভাব পূরণ করে। এইরূপ স্থানে ও অবস্থায় পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া জন্মিয়া প্রকৃতির নির্ব্বাচনের প্রণালীতে ঐরূপ কীটমারী গাছেদের শোঁয়ার মাথার গ্রন্থিগুলি সূক্ষ্ম-অনুভবের শক্তি, নড়াচড়া করিবার শক্তি এবং জারক রস ক্ষরণের শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

সাধারণ আতসী কাঁচ দিয়া কীটমারী গাছের একটা পাতা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে কেমন করিয়া সে নিজের পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে; কীটমারী গাছের সবুজ পাতার উপরে অসংখ্য সঞ্চরণক্ষম গ্রন্থিল লাল রঙের শোঁয়া আছে, প্রত্যেক শোঁয়ার মাথার স্ফীত গ্রন্থি রৌদ্র পাইলে চকচক করিতে থাকে যেন শিশির-বিন্দু জমিয়া আছে; সেইজন্ত ইংরেজীতে তাহাকে Sundew বা সৌর-শিশির বলে।

ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কীটমারী গাছের পাতার ধারের শোঁয়াগুলি স্পর্শ করিলে তাহারা ভিতরের দিকে বাঁকিয়া পড়ে। ধারের শোঁয়ার উপরে একটা মাছি রাখিয়া দিলে ধারের শোঁয়াগুলি বাঁকিয়া বাঁকিয়া মাছিটিকে পাতার মধ্যভাগে ঠেলিয়া দ্যায়। মাছিটি পাতার ঠিক মাঝখানে পড়িলেই সমস্ত পাতার শোঁয়া-গুলিতে সাড়া পড়িয়া যায় এবং সবগুলি ভিতর দিকে বাঁকিয়া খাঁচার আকারে মাছির চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহাকে বন্দী করে; এবং পাতাটির মধ্যস্থল খোল হইয়া বাটির মতন হয় এবং সেখানকার গ্রন্থিগুলি হতভাগ্য বন্দীর উপর চটচটে জারক হজমি রস ঢালিতে থাকে। বন্দী বলি মুক্তি পাইবার জন্য যতই ছটফট করিতে থাকে তাহার ক্ষরণ ততই হইতে থাকে, কারণ গ্রন্থিগুলি নাড়া পাইয়া যতই উত্তেজিত হয় ততই জারক রস ঢালে।

মানুষের পাকস্থলীতে খাবার জিনিষ পড়িলে পাকাশয় হইতে যে জারক রস নির্গত হয় তাহা অম্ল ও উৎপচনশীল অর্থাৎ গাঁজিয়া মাতিয়া উঠে। ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কীটমারীগাছের গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত জারক রসও অম্ল ও গাঁজিয়া মাতিয়া উঠে; জন্তুর পাকাশয়ের জারক রস খাদ্যকে যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করে, কীটমারী গাছের জারক রসও ঠিক সেইরূপ ভাবে ঐ কীটপতঙ্গকে হজম করে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে যে গাছ জীবন্ত প্রাণী ধরিয়া খাইয়া থাকে।

ইংরেজদের দেশে বাঙলাদেশের গোলপাতাওয়ালা মুখ-জালী কীটমারী গাছ ছাড়া আরও দু'রকমের Sundew গাছ আছে, তাহাদের পাতা লম্বাটে এবং খাড়া হইয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহার অন্য জাতও দেখা যায়। উত্তর-আমেরিকায় একরকম কীটমারী গাছ আছে যাহার পাতা সূতোর মতন সরু সরু, এক-ফুট সওয়া-ফুট লম্বা এবং মাটির উপর জট পাকাইয়া ছড়াইয়া থাকে; কীট পতঙ্গ সেই জালে পড়িলেই বন্দী হইয়া হজম হইয়া যায়।

আর একরকম কীটমারী গাছ বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় আছে; তাহাও জলজ; বাংলা নাম ঝাঁঝি, ইংরেজী নাম Bladderwort, লাটিন নাম Utricularia। ইহাও কীট পতঙ্গ মারিয়া আহার করিয়া বাঁচে।

আর-একজাতীয় কীটমারী গাছ আছে তাহার ইংরেজী নাম Butterwort; উহার পাতা দুধে দিলে দুধ ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া উহার ঐ নাম বা উহার শোঁয়া হইতে আঠা নির্গত হয় বলিয়া ঐ নাম তাহা বলা যায় না। উহার পাতাগুলি গোলাপের দলের মতন স্তবকে সজ্জিত; পাতার উপর-পিঠ অতি সরু সরু দুরকমের শোঁয়ায় ভরিয়া থাকে, সেই শোঁয়ার মাথায় মাথায় এক-একটি আলপিনের মাথার মতন গ্রন্থি থাকে; কিন্তু সেইসব শোঁয়া এমন সূক্ষ্ম যে শুধু-চোখে দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে দেখা যায় একরকম শোঁয়া আলপিনের মতন উঁচু ও খাড়া হইয়া আছে ও অপর রকমের শোঁয়াগুলির মাথা প্রায় পাতার পিঠের

সঙ্গে লাগিয়া আছে যেমন পিন-কুশনে আলপিন পুঁতিয়া রাখিলে দেখায় ঠিক সেইরূপ। এই উভয়বিধ গ্রন্থি হইতে আঠা-চটচটে রস নির্গত হয় এবং নাইট্রোজেন আছে এমন কোনো বস্তুর সঙ্গে ঠেকিলেই সেই রস অম্ল হইয়া গাঁজিয়া মাতিয়া উঠে। বাটারওার্টের শোঁয়াগুলি মুখজালী সানডিউ কীটমারীর শোঁয়ার মতন আপনা-আপনি নড়াচড়া করিতে পারে না; পাতার দুই পাশ কোশার মতন মোড়া বলিয়া কীট-পতঙ্গ বসিলেই ডোঙার মতন পাতার খোলের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং সেখানে অধিকসংখ্যক শোঁয়াগ্রন্থির সংস্পর্শে আসিয়া হজম হইয়া যায়। ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই গাছ কেবল আমিষাশী নয়, উহারা উদ্ভিজ্জাশীও বটে; পাতার কোশের মধ্যে পাতার টুকরা, ফুলের রেণু, ফলের বীজ দিলেও তাহা জারকরসে গলিয়া উঠে ও সেই রস পত্রস্তবকের সন্ধিস্থলে মুখাকৃতি বাটির মধ্যে গড়াইয়া পড়ে, অর্থাৎ গাছ আহার করে।

নানান দেশের জলা জায়গায় নানাবিধ জীবখোর গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে Venus' Fly-trap বা যূপপত্রী বা জাঁতিকল নামে যে কীট-মারী গাছ দেখা যায় তাহার কার্য্যই জগতের সকল কীটমারী গাছের প্রাণীহত্যা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। নাম হইতেই বুঝা যাইবে যে উহার পাতা জাঁতিকলের মতন মুদিয়া কীট-পতঙ্গকে পিষিয়া মারিয়া খাইয়া ফেলে; এই অদ্ভুত গাছের পাতা লম্বা লম্বা ডাঁটার মাথায় অল্প-বিস্তর খাড়া হইয়া থাকে এবং পাতার কিনারায় জাঁতিকলের মতন দাঁতি কাটাকাটা থাকে; পাতা দ্বিদল, আধ-খোলা বইয়ের মতন। কোনো কীট পতঙ্গ পাতার ডাঁটায় উঠিলে পাতাতে কোনো সাড়াই টের পাওয়া যায় না; পতঙ্গ ডাঁটায় বসিবার সময় বা ডানা গুটাইবার সময় ডাঁটায় যে নাড়া পড়ে তাহাতে কিম্বা ডাঁটার উপর দিয়া পাতার উল্টা-পিঠে বা পাতা ও ডাঁটার সন্ধিস্থলের কাছ পর্য্যন্ত চলা ফিরা করিলেও পাতা কোনো সাড়াই দ্যায় না; কিন্তু যেই কীট পতঙ্গ পাতার কিনারার দাঁতিগুলি ডিঙাইয়া পাতার ভিতর-পিঠে যায় অমনি পাতার দুই দল মুদিয়া জোড়া লাগিয়া যায় এবং কিনারার দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বসে। পাতার প্রত্যেক দলের ভিতর-পিঠে তিনটি তিনটি করিয়া শুঁয়া আছে, তাহাদের অনুভবের ক্ষমতা খুব বেশী; সেই শুঁয়াগুলি যেন জাঁতিকলের কজার প্রীং, তাহাতে কিছু ঠেকিলেই জাঁতিকল বন্ধ হইয়া যায়; পাতার ডাঁটায় বা উল্টা-পিঠে হাত দিলেও পাতা মুদ্রিত হয় না কিন্তু পাতার দলের ভিতর-পিঠের কোনো একটি শুঁয়ার গায়ে একটা চুল ঠেকাইলেও পাতা বন্ধ হইয়া যায়।

এক-রকম কীটমারী গাছ আছে যাহারা জলের উপর ফাঁদ পাতিয়া রাখে এবং শিকার পাইলেই তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়া খায়। আমেরিকার ক্যালিফর্ণিয়া প্রদেশে Sarracenias বা side saddle গাছ দেখিতে অনেকটা সাপের ফণার মতন, আমরা তাহাকে সর্প-ফণা নাম দিতে পারি। তাহাদের ফণাকৃতি পাতার মুখের কাছে টকটকে লাল সাপের জিবের মতন চেরা একজোড়া ফিতা ঝোলে; সেই ফিতা হইতে মধু ক্ষরিত হয়। সেই সর্পজিহ্বার উজ্জ্বল লাল রঙ আর মধুর গন্ধ কীটপতঙ্গকে প্রলোভন দেখাইয়া ডাকিয়া আনে; তাহার পাতাগুলি ফুলদানি বা কুলপি বরফের ঠোঙার মতন এবং সেই ঠোঙার মধ্যে অধিকতর মধুস্রাব হয়; নিমন্ত্রিত কীট পতঙ্গ পাতার মুখের কাছে বসিয়া পাতার ঠোঙার মধ্যে প্রচুর মধুর সন্ধান পাইয়া নীচের দিকে মরণ-যাত্রা করে। পাতার ঠোঙার মধ্যে এমন ভাবে শুঁয়া সাজানো থাকে যে কীটপতঙ্গ অনায়াসে ভিতরে যাইতে পারে কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। কোনো কোনো জাতের সর্পফণা গাছের পাতার ঠোঙার মুখের ছিদ্রের উপরে একটা করিয়া ঢাকনি থাকে এবং ঠোঙার দেয়ালের গায়ে গোল গোল স্বচ্ছ জানালা থাকে; কীট পতঙ্গ পাতার ঠোঙার মধ্যে ঢুকিলেই মুখের ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায়; ইহাতে বন্দী কীট পতঙ্গ মুখের ছিদ্রের সন্ধান না পাইয়া পাতার ঠোঙার গায়ের স্বচ্ছ জানালা দিয়া নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টায় মাথা কুটিয়া কুটিয়া অবসন্ন হইয়া পত্রপুটের তলায় পড়ে এবং সেখানে যে রস জমিয়া থাকে তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরে। তারপর গাছ তাহাকে হজম করিয়া খাইয়া ফেলে।

কালিফর্ণিয়ার Darlingtonia বা প্রিয়তমিয়া গাছও ঠিক ঐরূপে কীটপতঙ্গ শিকার করিয়া খায়। ঐ গাছ

তাহার বিচিত্র বাহারে মুগ্ধ করিয়া কীট পতঙ্গকে লুব্ধ করে বলিয়া তাহার ঐ নাম।

আমেরিকার Pitcher plant বা ঘটপত্রী গাছও পাতার বাহারে মুগ্ধ করিয়া কীটপতঙ্গকে লুব্ধ করে ও নিজের ঘটাকৃতি পাতার মধ্যে তাহাদের ভরিয়া ঢাকনি চাপা দিয়া খাইয়া শেষ করে; খাওয়া হইয়া গেলেই ঘটপত্রের মুখের ঢাকনি খুলিয়া নূতন কীটপতঙ্গকে নিমন্ত্রণ করিতে থাকে। ঘটপত্রীর মুখের কিনারায় ও ঢাকনির তলার পিঠে মধু ক্ষরিত হয়; পাতার ঠোঙার মধ্যে এক-রকম অম্ল জারক রস জমিয়া থাকে, তাহাতে মধুলোভী কীটপতঙ্গ ও এমন কি ছোট ছোট পাখী পর্য্যন্ত গিয়া পড়িলেই জীর্ণ হইয়া যায়।

চারু

পরগাছা

[পরগাছা উপন্যাস; উপন্যাস কল্পনার ফল; কাল্পনিক ব্যাপার হইলেও উপন্যাসে বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও না কোথাও কাহারো না কাহারো থাকিতে পারে, ঘটনাও কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো বর্ণনার কিয়দংশের অনুরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে; তাহা মিলাইয়া কেহ যেন ইহাকে ইতিহাস, জীবনচরিত বা ব্যক্তি-বিশেষ ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা বলিয়া ধরিয়া না লন; মিলের সঙ্গে অমিল হিসাব করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের ভ্রম ধরা পড়িবে যে যাহা সত্যের আভাস বলিয়া মনে হইতেছে তাহা কল্পনারই সৃষ্টি।]

(৫১)

রাজার বিবাহ। সমারোহ আয়োজন নিমন্ত্রিতের আর অন্ত নাই। বাড়ীর ভিতরে রাণী জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া সব তদারক করিতেছেন, চন্দনমণি চেঁচাইয়া আপনার গুরুত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, আর মণিমালা নীরব হাসিমুখে সারা দিনরাত সকল কাজ করিয়া ফিরিতেছে। বাড়ীর বাহিরে বঙ্কবিহারী তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবোলার নল মুখে চাপিয়া গম্ভীর রাজকায়দায় হুকুম চালাইতেছে, দেওয়ান দীনদয়াল ও কাঙালী কাজের চেয়ে গণ্ডগোল বেশী করিতেছে এবং কাঙালী যে আর কেউ-কেটা নয়, সে রাজার শ্বশুর ইহা সে সুযোগ পাইলেই লোককে খুব কড়া রকমে বুঝাইয়া দিতেছে; আর রাখাল নিমন্ত্রিত অভ্যাগত লোকদের বাসায় বাসায় গিয়া কাহার কি অভাব আছে, কাহার কি অসুবিধা হইতেছে, হাসিমুখে মিষ্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া ফিরিতেছে।

বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত। কিন্তু কলিকাতার সেকরারা আজ পর্য্যন্ত গহনা দিল না; বঙ্কবিহারী লোক পাঠাইয়াছে, টেলিগ্রাম করিয়াছে—কিন্তু না: লোক ফিরিতেছে, না কোনো জবাব পাওয়া যাইতেছে। বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে,—নূতন রাজরাণী বাড়ীতে আসিবে অথচ তাহাকে কোনো আভরণ দিতে পারা যাইবে না! চন্দনমণি এক-একবার রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে আসিয়া হতাশাকাতর স্বরে বলিতেছে—দিদি, কি হবে?—রাণী জগদ্ধাত্রী নিরুপায় ভাবে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাহার দিকে শুধু তাকাইয়া থাকেন।

বিবাহের দিন আসিল, কিন্তু গহনা আসিল না। গহনার জন্য বিবাহ আটক থাকিল না, বিবাহ নির্দ্দিষ্ট লগ্নেই হইয়া গেল।

বাড়ীতে নববধূকে বরণ করিয়া লইতে গিয়া মণিমালা দেখিল সোনা রূপা জহরৎ জড়োয়া গহনায় বধূর আপাদ-মস্তক ঢাকিয়া গিয়াছে—মাথার মুকুট হইতে হাতের রতনচূড় ও পায়ের চরণচাঁদ পর্য্যন্ত কোনো গহনারই অভাব নাই, বধূর গায়ে হাজার দশ পনর টাকার অলঙ্কার চাপানো আছে। মণিমালার বুঝিতে বাকি রহিল না কাঙালী এত গহনা পাইল কোথায়। বরণ করিয়া কুবেরকে চন্দনমণি ও কাত্যায়নীকে মণিমালা কোলে করিয়া উপরে তুলিল—সজীব ও নির্জীব বোঝা বহিয়া মণিমালার ত শাস্তির একশেষ!

কড়িখেলা ও মঙ্গলভাঁড় ঢাকা শেষ হইলে চন্দনমণি বলিল—দিদি, এইবার বেটা বৌকে আশীর্ব্বাদ কর। কিন্তু একখানা গহনাও দেওয়া হবে না—সব অলক্ষণ! গোড়া থেকেই যে টিকটিকি লেগেছে, এতে কি আর শুভ হয়! রাজার রাণী হয়ে এল তা আজকে একখানি গহনা অঙ্গে উঠল না!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—ঐ ত অত গহনা দেওয়া হয়েছে মামীমা, বৌএর গায়ে আর জায়গা কোথায়?

চন্দনমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ও ত ওর বাপ দিয়েছে! ছাঁ-পোষা মানুষ, তবু মেয়েকে রাজরাণী সাজিয়ে ত দিতে হয়েছে! কিন্তু শাশুড়ী ননদের কাছ থেকে ত একটু সোনার আঁচড়ও পেলে না।......তা মা মণি, দিদির গহনাগুলো এখন তুই এনে দে, গহনা গড়িয়ে এলে তুই তখন ফিরিয়ে নিস। আজকের মঙ্গল-আচারটা ত হয়ে থাক।

মণিমালা একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল। তিনি নীরবে গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিলেন, মণিমালার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিত হইলে তিনি দৃষ্টি নত করিয়া বসিলেন। তখন মণিমালা বুঝিল কলিকাতা হইতে গহনা গড়াইয়া কেন পৌঁছে নাই, এবং সেসব গহনা কেনই বা কাঙালীর বাড়ী ঘুরিয়া কাত্যায়নীর অঙ্গে চড়িয়া রাজবাড়ীতে বেনামিতে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল এই প্রবঞ্চনার চক্রান্তের মধ্যে তাহার মা সুদ্ধ আছেন। তাহাকে গহনাগুলি দিয়া মায়ের অনুতাপ হইয়াছে! কাহারো মনের ক্ষোভ সে রাখিবে না। সে অমনি দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। এবং তখনি সেই হাতীর-দাঁতের বাক্সটি আনিয়া বর ও বধূর সামনে কিংখাবের বিছানার উপর রাখিয়া সেই বাক্সর ডালা খুলিয়া ফেলিল। তারপর কাত্যায়নীর সম্মুখে হাঁটু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া তাহার গা হইতে তাহার সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিল এবং বাক্স হইতে গহনাগুলি তুলিয়া তুলিয়া একে একে সমস্ত তাহাকে পরাইয়া দিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বৌ, এই সমস্ত গহনা আমি তোমাকে যৌতুক দিলাম!

রাণী জগদ্ধাত্রী ও চন্দনমণি, বঙ্কবিহারী ও কাঙালী এই বিজয়িনীর সম্মুখে নিতান্ত নিষ্প্রভ অপ্রতিভ হইয়া গেল। সমস্ত বিবাহ-উৎসবটা অলঙ্কারের সূচিমুখের বিদ্রূপে ম্লান হইয়া উঠিল। কেবল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল মণিমালার মুখ—জয়ের আনন্দে; রাখালের মুখ—পত্নীসৌভাগ্যের গর্ব্বসুখে; আর পরিজনদের মুখ—বিস্ময় সম্ভ্রমে! চন্দনমণি দাবার চালে মাত করিতে আসিয়া হঠাৎ বোড়ের কিস্তিতে এমন ঠকিয়া গেল যে সে তখন ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিতে চাহিতেছিল।

কিন্তু চন্দনমণির সে ভাব ক্ষণিক মাত্র। সে জোর করিয়া সঙ্কুচিত মুখের উপর শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—তা দেবে বৈ কি, তা দেবে বৈ কি, তুমি হলে বড় ননদ! আগে তুমি, তবে ত কুবির! রাজার মেয়ের এই রকমই নজর হবেই ত!... ওমা বৌমা, তোমার বড় ননদকে পেন্নাম কর...

কিন্তু বিবাহের উৎসব আর কিছুতেই জমিতে পাইল না। চাকরদাসী নিমন্ত্রিত পরিজন সুবিধা পাইলেই শুধু মণিমালার দানের কথা আলোচনা করে। এই ব্যাপারটা এত বড় অসাধারণ ঠেকিয়াছিল যে সকলের মনে রাজার বিবাহ-উৎসবের উপরেও ইহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে।

সকলের ধিক্কার ও কানাঘুষার গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য বঙ্কবিহারীর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া চন্দনমণি মুখ বাঁকাইয়া বলিল—মণিটার দেমাক দেখেছ! ভাঙেন ত মচকান না, এমনি হিংসে!

বঙ্কবিহারী বলিল—ইহার মধ্যে নিশ্চয় রাখালের টিপ আছে।

চন্দনমণি পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তা যাই হোক, গহনাগুলো ত ওর খপ্পর থেকে উদ্ধার করা গেছে!

মণিমালার এই অসাধারণ ত্যাগে ফল হইল এই যে সে ও রাখাল কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের বিবাহে আপত্তি তুলিয়া সকলের যেরূপ অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিল তাহা ঘুরিয়া গেল, তাহারা এই বাড়ীর আবার সর্ব্বপ্রধান হইয়া পড়িল। যাহারা তাহাদের মাথা নত করিতে চেষ্টা করিতেছিল তাহারাও তাহাদিগের নিকট নত না হইয়া থাকিতে পারিল না, সকলেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল।

যখন এইরূপে সকল উপদ্রব নিরস্ত হইয়া গেল তখন আর রাখাল ও মণিমালার এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার আগ্রহ রহিল না; তাহারা প্রাণপণ সেবাযত্নের পরিবর্ত্তে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করিতেছিল না। রাণী জগদ্ধাত্রী যদি কখনো কিছু টাকা হাতে তুলিয়া দিতেন তাহাই রাখাল ও মণিমালা লইত; রাখাল যাহা পাইত তাহা তাহার গোসাঁইদাদাকে পাঠাইয়া দিত, আর মণিমালা যাহা পাইত তাহা দিয়া সে স্বতন্ত্র সংসার

পাত্তিবার মতন জিনিষপত্র কিনিত—সেদিন দুধ ঢালিয়া লইবার মতন একটা বাটিও তাহার নিজের ছিল না, ইহা তাহার মনে বড় বেশীরকম বাজিয়াছিল।

(৫২)

বিবাহের গোলমাল মিটিতে না-মিটিতে কুবের সাবালগ হইবার সময় আসিল। কুবের নিজে জমিদারীর ভার লইবে, কোর্ট-অব ওার্ডসের অধীনতা ঘুচিয়া যাইবে, এই সম্ভাবনার উল্লাসে সকলের মন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কোর্ট-অব-ওার্ডস তাহার অধিকার-কালের সমস্ত হিসাবের নিকাশ আখেরী প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তখন ধরা পড়িল রাজনাথ ও দীনদয়াল অনেক টাকা চুরি করিয়াছে। কাঙালীরও যোগ ছিল বোধ হয়, কিন্তু তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার মতন কোনো প্রমাণ সে রাখে নাই; যে একটু ক্ষীণ খুব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় কাঙালী মাত্র হাজার খানেক টাকা নিজের পকেটজাত করিয়াছিল।

ম্যানেজার উহাদের তিনজনকে একসঙ্গে জড়াইয়া পুলিশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাঙালী বুক ফুলাইয়া বলিয়া বেড়াইতেছে—হুঁঃ! আমি রাজার শ্বশুর! আমার কে সব করবে!

রাখাল ম্যানেজারকে ধরিয়া বসিল—ঐ তিনজনে যদি চুরির টাকা প্রত্যর্পণ করে তবে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভদ্রলোকের ছেলেকে জেল খাটাইয়া উহাদের আখের নষ্ট করিয়া ষ্টেটের লাভ কি?

অনেক বলা কহায় ম্যানেজার রাজি হইল। এবং রাজনাথ ও দীনদয়াল চুরির দৌলতে যে বিষয়সম্পত্তি করিয়াছিল তাহার সমস্ত বেচিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া জেলে যাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিল।

কাঙালী কিন্তু নুইয়া ডুব দিতে চায় না। রাখাল তাহাকে টাকাটা ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করাতে সে মাথা ঘুরাইয়া বুক ফুলাইয়া বলিল—হুঁঃ! নিয়েই যদি থাকি আমি, আমার জামাইএর টাকা নিয়েছি! তাতে কার বাবার কি! আমি রাজার শ্বশুর! আমায় অমনি জেল খাটালেই হল!!

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল—ইংরেজের আদালতের কাছে রাজাদেরই জারিজুরি খাটে না, তা আবার রাজার শ্বশুর! তুমি তোমার জামাইএর টাকা ত নাওনি, ও কোর্ট-অব-ওার্ডসের টাকা! তাদের যখন রাজাকে হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে কড়া ক্রান্তি মিলিয়ে, তখন তারা তোমাকে রেয়াৎ করবে কেন?

কাঙালী ভয় পাইয়া একটু দমিয়া গিয়া বলিল—আচ্ছা রোসো, রাজামামাকে রাজাবাবুকে রাণীমাকে একবার জিজ্ঞাসা করি, পরামর্শ করি......

রাখাল বিরক্ত হইয়া জোরে বলিয়া উঠিল—জিজ্ঞাসা করি, পরামর্শ করি, হচ্ছে হবে, নয়। টাকা দিতে হবে। তোমার চাকরী হয়েছিল আমার সুপারিশে। তুমি টাকা নিয়ে আমাকে অবিশ্বাসী করেছ; তোমার অপমানে আমার অপমান! তুমি হয়ত মনে করতে পার টাকাটা ত মেরে দিয়েছি, আসি না হয় দুদিন জেল খেটে! তা আমি হতে দেবো না—তুমি যদি টাকা না দাও আমাকে দিতে হবে, তোমাকে বাঁচাতে চাই আমার নিজের মান বাঁচাবার জন্যে।

রাখালের এই কথা শুনিয়া কাঙালী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; সাহস পাইয়া খুব জোর করিয়া বলিল—তা তোমার যা খুসী করগে—আমি কিছুতেই টাকা দিচ্ছিনে—রাজার শ্বশুর আমি! কার সাধ্য আমার কিছু করতে পারে।

রাখাল আর কোনো কথা না বলিয়া রাগে গসগস করিতে-করিতে চলিয়া গেল।

মুখে রাজার শ্বশুর বলিয়া খুব আস্ফালন করিয়া বেড়াইলেও কাঙালী অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল, যদি রাখাল টাকাটা শেষে নাই দায়, যদিই হঠাৎ পুলিশ আসিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া এত লোকের সামনে দিয়া তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিতে-টানিতে লইয়া যায়!

রাখালের বিষম চিন্তা হইল কাঙালীর চুরির টাকাটা সে কোথা হইতে কেমন করিয়া শোধ করিয়া দিবে। সে রাজার জামাই বটে, কিন্তু তাহার হাতে ত একটা পয়সাও নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট হইতে সামান্য অর্থ যখন যাহা পাইয়াছে তাহা গৌসাইগঞ্জের আত্মীয়দের যত্নের ঋণের সুদ দিতেই শেষ হইয়া গিয়াছে! মণিমালার

কাছেও ত বেশী কিছু থাকিবার কথা নয়। রাণী জগদ্ধাত্রীর কাছে চাওয়া যায়, কিন্তু কাঙালীর চুরির ঋণ তিনি শোধ করিতে যদি অস্বীকার করেন, সে বড় অপমান। তবে কি কুবেরকে বলিবে যে তোমার শ্বশুর চুরি করিয়াছে, হাজার খানেক টাকা দাও? না, তাহা বলাতে কুবেরকে অপমান করা হইবে, লজ্জা দেওয়া হইবে। তবে? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাখাল ম্যানেজারের কাছে গিয়া বলিল—সাহেব, আমি মাস পাঁচ ছয় মাইনর ওয়ার্ডকে পড়াইয়াছিলাম; তাহার জন্ম আমি ষ্টেট হইতে কিছু পাইতে পারি কি?

সাহেব আনন্দিত হইয়া বলিল—নিশ্চয়! কমিশনার সাহেব ত আড়াইশ টাকা দক্ষিণা আপনার জন্ম মঞ্জুর করিয়া গিয়াছিলেন, আপনিই লন নাই। বিল করুন, আমি আপনার টাকাটা খাজাঞ্চিকে দিতে বলিতেছি।

রাখাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল—আমি আর বিল করব না; আমার নামে হাজার টাকা খরচ লিখে কাঙালীর কাছে ষ্টেটের পাওনা হাজার টাকা শোধ করে জমা করে নিতে বললে আমি অত্যন্ত উপকৃত হব, আপনার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাকব।

ম্যানেজার অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—রাখাল বাবু, আপনি ঐ বদমায়েস কাঙালীটার জন্ম এত করছেন, সে আপনার কে?

—সে আমার সম্বন্ধীর শ্বশুর; সে আমার গ্রামের লোক; আমার সুপারিশে তার চাকরী হয়েছিল; আর তার জন্মে আমার চাকরী জুটেছিল।

কাঙালী বাঁচিয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্ম ম্যানেজারের কাছে প্রার্থনা জানাইতে, নিজের প্রত্যাখ্যাত অর্থ পুনরায় যাচিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিতে রাখালকে যে কতখানি খাটো হইয়া অপমান স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল তাহা কেহ ঠিক করিয়া অনুভব করিতে পারিল না।

কাঙালী অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—রাখালের এ ভারি অন্যায়, এ হিংসে করে আমায় অপমান করা, আমাকে লোকের কাছে চোর বানানো!—আমি টাকা নিইনি বলেই ত আমি নির্ভয়ে ছিলাম! নালিশ করত, আদালতে আমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যেত। এ ধরে ভদ্দর ঘটিয়ে একজন ভদ্র-লোককে চোর করা!

কুবের শুনিয়া বলিল—আচ্ছা! আগে আমি রাজা হই তখন দেখে নেবো!

বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি বলিল—রাখাল মুখে বলেন টাকা নিইনে, টাকা চাইনে; এদিকে কিন্তু ম্যানেজারের কাছে গিয়ে চুপিচুপি বাকী বকেয়া হিসেব করে মাইনে চুকিয়ে নেওয়া হয়েছে! ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আর কি!

নিরন্তর এই-রকম কথা শুনিয়া রাণী জগদ্ধাত্রী অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।

(৫৩)

মহা সমারোহের উৎসব-আনন্দের মধ্যে কমিশনার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি আসিয়া কুবেরকে জমিদারীর সমস্ত ভার বুঝাইয়া দিয়া রাজপদে অভিষেক করিয়া গেলেন। তাঁহারা রাখালকে বলিয়া গেলেন—আপনিই রাজাকে দেখিবেন, সুপরামর্শ দিবেন, রাজা এখনো বালক।—কুবেরকে বলিয়া বুঝাইয়া গেলেন—তুমি রাখাল-বাবুর পরামর্শ লইয়া চলিও, তোমার মঙ্গল হইবে, রাজ্যের প্রজা সুখী হইবে।

রাখাল তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইল। কুবের গোঁজ হইয়া মাথা বাঁকা করিয়া রহিল।

কুবের রাজ্যপরিচালনের অধিকার হাতে পাইয়াই বঙ্কবিহারী ও কাঙালীর পরামর্শে হুকুম দিল—সমস্ত ব্রহ্মত্র দেবত্র চাকরান লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত হোক; কাহারো কোনো অধিকার থাকে সে দলিল দস্তাবেজ দেখাইয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া যাক।

দেশময় হাহাকার পড়িয়া গেল। কত বিধবার, কত অনাথ শিশুর, অন্ন-সংস্থানের উপায় গেল; কত দেবতার মন্দিরে পূজা বন্ধ হইয়া গেল; কত দরিদ্র একেবারে নিঃস্ব সম্বলহীন হইয়া পড়িল। এই-সমস্ত জমি পাহাড়পুরের পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজারা দিয়া গিয়াছেন—কাহাকেও মাত্র মুখের কথায়, কাহাকেও মাত্র এক চিলতে কাঁস কাগজে লিখিয়া—সে কাগজ দুতিন পুরুষ আগেই হয়ত উইএ খাইয়াছে, কি গৃহ-দাহের সময় আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া

গিয়াছে। তাহাদের একমাত্র দলিল তাহারা এতদিন নির্ব্বিবাদে বিনা ওজরে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে, স্বর্গীয় মহারাজ ধনেশ্বরের আমলে কখনো কোনো আপত্তি উঠে নাই।

কুবের এমন ফাঁকা প্রমাণে ঠকিবার পাত্র নয়—তাহার এককানে বঙ্কবিহারীর, অন্যকানে কাঙালীর মন্ত্রগুঞ্জন হইতেছে; এবং তাহাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য কুবেরের অন্তঃপুরে জননী চন্দনমণি ও জায়া কাত্যায়নী মুখাইয়া আছেন—স্বামীর বা পিতার টিপ্‌টি পাইলেই হইল।

রাখাল বলিল—এ-সমস্ত বড় অন্যায় হচ্ছে কুবের! তোমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি আর গরিবদের রুজি লোপ করে অখ্যাতি আর মনুষ্য কুড়িও না! এতে সুখ নেই, মঙ্গল নেই!

কুবের মাথা নীচু করিয়া হনহন করিয়া রাখালের নিকট হইতে চলিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া কাত্যায়নীকে বলিল—হুঁঃ! সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ওঁর মতন ফকির হই আর কি! গরিবের রুজি মেরেই ত জমিদার! আর, ভারি পূর্ব্বপুরুষ দেখাতে এসেছে! এরা আমার কোথাকার কে?—

মামার শালা, পিসের ভাই,
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই।

কাত্যায়নী তাহার সুন্দর মুখখানি ঘুরাইয়া বলিল—কখ্‌খনো ওদের কথা শুনো না, ওরা চিরকাল আমাদের হিংসে করে!

কাঙালী আসিয়া আমতা-আমতা করিয়া রাখালকে বলিল—দ্যাখো রাখাল, রাজাবাবু তোমাকে বলতে পাঠালেন যে আমি রাজা, আমার রাজকার্য্যে কেউ টিকটিক করে এ আমি পছন্দ করিনে। তা তুমি……

রাখাল অবাক হইয়া কাঙালীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কাঙালী আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল।

কত লোক আসিয়া সদরে ধন্না দিয়া পড়িল, রাখালকে ধরিয়া বসিল তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে। কত বিধবা অপোগণ্ড শিশু লইয়া আসিয়া অন্দরে মণিমালার কাছে কাঁদিয়া পড়িল—এ বিপদে যদি কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে তবে সে মণিমালার পরম ধার্ম্মিক ন্যায়বান স্বামী রাখাল-বাবু!

রাখাল ও মণিমালা প্রতিকারের অক্ষমতা জানাইল। দরিদ্র ব্যথিতদের চোখের জল পড়িতে দেখিয়া গোপনে শুধু নিজেদের চোখ মুছিল। তাহারা তাহাদিগকে বঙ্কবিহারী ও রাণী জগদ্ধাত্রীকে দুঃখ জানাইতে পরামর্শ দিল।

বঙ্কবিহারী বলিল—হুঃ। স্বাধীন নৃপতি আছে—তার যা খুসী করতে পারে। এতে কাহারো কিছু বলবার নাই!

রাণী জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কুবের আমার কথা রাখবে না। আমাকে মিছে বলা।

সকলে হতাশ হইয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে ভগবানের উপর বিচারের ভার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, ফিরিল না কেবল মহিষবাথানের বেচন চক্রবর্ত্তী। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী ছাড়িয়াছে হয় ব্রহ্মত্র উদ্ধার করিবে নয় ব্রহ্মহত্যা হইয়া লোভী রাজাকে ধনের সাহত প্রাণও দিয়া আসিবে। বেচারা নিত্য কাছারীতে দরবার করিতে যায়, একদিনও রাজার সাক্ষাৎ পায় না, কর্ম্মচারীরা তাহাকে পাগল বলিয়া হাঁকাইয়া দ্যায়। তবু বেচনের উদ্যমের শৈথিল্য নাই।

একদিন রাখাল ও কুবের ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইয়া ফিরিয়া ঘোড়া হইতে যেই নামিয়াছে, অমনি কোথা হইতে বেচন চক্রবর্ত্তী লাফাইয়া আসিয়া কুবেরের রাইডিং-বুট-পরা দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিল—দোহাই মহারাজের, ব্রাহ্মণকে রক্ষা করুন। আমার পক্ষে বলবার কি আছে শুধু সেই কথাটি শুনে করে শুনুন। … …

কুবের বুটসুদ্ধ লাথি মারিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূরে ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়া গটগট করিয়া রংমহলের দিকে চলিয়া গেল। রাখাল গর্জ্জন করিয়া ডাকিয়া উঠিল—কুবের!

কুবের ফিরিয়া না তাকাইয়া টকটক করিয়া সিঁড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া গেল— প্রজা পাইক বরকন্দাজদের সামনে রাজা কুবেরকে রাখাল অপমান করিয়াছে।

চন্দনমণি বলিল—পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে! গেলেন বলে, আর দেরী নেই।

ব্রজবিহারী শাদা-শাদা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—

'কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী !

মঙ্গল অষ্টমে কার রন্ধ্রগত শনি ?'

শাস্ত্রেই আছে—

'অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ !

অতি দানে বলির্বদ্ধ, সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্ ॥'

রাণী কাত্যায়নী বলিল—

'অত বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে।'

রাণী জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া বলিলেন—রাখাল চিরকেলে গোঁয়ার! মহারাজকে জ্বালিয়েছে, এখন কুবেরকে জ্বালাতে আরম্ভ করেছে।

বৃন্দাবন গোস্বামী রাখালকে চিঠি লিখিয়াছেন যে তাহাদেরই বাড়ীর পাশে উদ্ধব গোসাঁইএর বাড়ী হাজার টাকায় বিক্রী হইয়া যাইতেছে, যদি রাখাল টাকা পাঠাইতে পারে তবে তিনি উহা রাখালের জন্য কিনিয়া রাখিতে পারেন।

মণিমালা রাখালকে বলিল—এখান থেকে চলে চল, উদ্ধব গোসাঁইএর বাড়ীটা কিনে আমরা থাকব।

রাখাল বলিল—না মণি, এখান থেকে গেলে চলবে না; কুবের দিন দিন যে-রকম হয়ে উঠছে, তাকে রক্ষা করবার, পরামর্শ দেবার, উপদেশ দেবার কেউ না থাকলে জমিদারী রসাতলে যাবে।

—কিন্তু ওরা ত তোমার উপদেশ চায় না, বিরক্ত হয়।

—ওষুধ খেতে তেতো লাগে, কিন্তু রোগ সেরে গেলে ওষুধের গুণ টের পাওয়া যায়। একটু বয়েস হলেই কুবের ভালো মন্দ বুঝতে পারবে।

মণিমালা নিরস্ত হইল। পরের উপকার করার একটা বৃহৎ ও মহৎ আবরণের অন্তরালে, খাওয়া-পরার ভাবনা না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইয়া দিবার সুযোগের প্রতি একটু মমতা বোধহয় রাখালের মনের মধ্যে এক কোণে অতি গোপনে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য সে নিজে না বুঝিয়াও বারবার এই রাজবাড়ী ছাড়িয়া যাইতে নানা-রকম ওজর তুলিতেছিল। চিরদিন যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার এই এতটুকু নিশ্চিন্ত আরাম জোর করিয়া ভাঙিতে মণিমালার ক্লেশ হইত, তাই সেও কখনো জোর বা জেদ করিতে পারিত না।

(৫৪)

বেচন চক্রবর্ত্তীকে জুতা-সুদ্ধ লাথি মারিয়া রাখালের নিকট ভর্ৎসিত হওয়ার পর কয়েক দিন কুবের আর রাখালের কাছে দেখাই দ্যায় নাই। কুবের লজ্জিত হইয়াছে ভাবিয়া রাখাল খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মণিমালা দেখিতেছিল সকলেই কেমন ভার-ভার; সকলেই যেন ফিসফিস করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে অথচ তাহা তাহার নিকটে লুকাইতে চাহিতেছে। একদিন প্রভাতে মণিমালা নিজের ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল রাণী জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া বসিয়া-বসিয়া কাঁদিতেছেন, মণিমালাকে দেখিয়া তাঁহার কান্না আরো বেশী হইয়া উঠিল; চাকরদাসীরা সকলেই ম্লানমুখে এক এক জায়গায় জড়ো হইয়া চুপিচুপি কি বলাবলি করিতেছে, মণিমালাকে দেখিয়াই চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া সরিয়া যাইতেছে; চন্দনমণির মুখে কেমন একটা টেপা হাসি পালিশকরা ইস্পাতের ছুরির সরু ফলার মতো বড় নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল; কাত্যায়নী চোখ ঘুরাইয়া সারা অঙ্গে ঢেউ তুলিয়া কৌতুকে হাততালি দিয়া-দিয়া বলিয়া-বলিয়া ফিরিতেছিল—আজকে একটা মজা হবে গো! আজকে একটা মজা হবে গো!

হানা-বাড়ীর মতো সমস্ত বাড়ীটাতে একটা কি অব্যক্ত ভয় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; পিশাচীর হাসির ন্যায় কাত্যায়নীর হাসি কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গল ফেরি করিয়া ফিরিতেছিল; সয়তানীর হাসির ন্যায় চন্দনমণির হাসি বিষের জ্বালার ঝলক বলিয়া মনে হইতেছিল।

ভীত শুষ্ক মুখে মণিমালা কাত্যায়নীকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হবে বৌ? আজকে কি হবে?

অট্টহাস্য করিয়া কাত্যায়নী বলিল—হবে হবে; সে একটা মজা হবে!

—মামী, তুমি বল না কি হয়েছে?

চন্দনমণি ক্রূর হাসি হাসিয়া রহস্য আরো নিগূঢ়তর করিয়া বলিল—কি জানি বাছা, পাগলীর মেয়ে বৌমা কি বলছে!

মণিমালা চাকরদাসীদের জিজ্ঞাসা করিল—ওরে কি হয়েছে তোরা জানিস যদি বল্।

সকলে ছলছল চোখে একবার তাহার দিকে চাহিয়া চোখ মুছিতে-মুছিতে সরিয়া গেল।

মণিমালা মাকে জিজ্ঞাসা করিল—মা, মা, তুমি বল কি হয়েছে।

তিনি শুধু বেশী করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মণিমালা বলিল—তবে যাই আমি কুবেরকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

কাত্যায়নী মুচকি হাসিয়া বলিল—সে পথে কাঁটা পড়েছে।

মণিমালা সে কথা কানে না তুলিয়া কুবেরের মহলে যাইতে গেল; আকালু খানসামা বলিল—মহারাজ কাহাকেও যাইতে দিতে মানা করিয়াছেন।

মণিমালা অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া আসিল। এই বুঝিতে-না-পারার ব্যাপার হইতে দূরে থাকিবার জন্য মণিমালা তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল; অমনি চন্দনমণি ও কাত্যায়নী হো হো হো করিয়া রাক্ষসীর মতো নিষ্ঠুর বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিল।

রাখাল কাছারীতে গিয়া বসিয়াছে, সেখানেও সকলে এমনি উদাস ভাবে একএকবার তাহার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে এবং রাখাল অন্যদিকে ফিরিলেই আমলারা আপনাদের মধ্যে কি বলাবলি করিতেছে।

রাখাল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হে? কি হয়েছে?

সকলে অপ্রতিভ হয়া বলিল—আজ্ঞে কিছু না।

রাখাল সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া কাছারী হইতে নামিয়া অন্দরে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া কাঙালী তোষাখানা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বলিল—রাখাল-ভায়া, তুমি একবার ওপরে এস।

রাখাল প্রশ্নমাত্র না করিয়া মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাঙালীকে অনুসরণ করিয়া চলিল—আজকের বাতাসে এমনি একটা অজানা রহস্য ভাসিতেছিল যে তাহার মধ্যে অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য যেন কিছু ছিল না, যা-খুসী একটা উদ্ভট কাণ্ডের বীজ যেন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবার জন্য ফাটিবার উপক্রম করিতেছে!

তোষাখানায় বিরাজ করিতেছিল বঙ্কবিহারী। রাখাল আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। কাঙালী বলিল—বস, বলছি।

রাখাল চুপ করিয়া বসিল। কাঙালীও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কেহ কোনো কথা কহে না, কেহ কাহারো দিকে চাহে না, কেহ একটু নড়িতে বা নিশ্বাসের শব্দ করিতেও যেন ভয় পাইতেছে!

হঠাৎ কাঙালী বলিয়া উঠিল—রাজাবাবু তোমাকে বলতে বললেন......

রাখাল মুখ তুলিয়া কাঙালীর দিকে চাহিল।

—তোমার ব্যবহার ইস্তক-নাগাদ তাঁর ওপরে শুধু শত্রুতা সাধাই হয়েছে।... ..

রাখাল অবাক আশ্চর্য্য!

—প্রথম দৃষ্টান্ত, তুমি রাজা-মামাকে ওয়ারেণ্ট দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিলে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, তুমি রতনপুর পরগণা ফাঁকি দিয়ে নিতে চেয়েছিলে। তৃতীয় দৃষ্টান্ত, কাত্যায়নীর সঙ্গে বিবাহে তোমরা স্ত্রীপুরুষে আপত্তি তুলেছিলে। চতুর্থ দৃষ্টান্ত, রাজা-বাহাদুরের মাতা রাণী জগদ্ধাত্রী দেবীর গহনার হক পাওনাদার কাত্যায়নী-রাণীকে বঞ্চনা করে তোমার স্ত্রী সেগুলি আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। পঞ্চম দৃষ্টান্ত, তুমি আমাকে—রাজার শ্বশুরকে—চোর বানিয়েছিলে। ষষ্ঠ দৃষ্টান্ত, তুমি শিক্ষক থাকা কালীন রাজা-বাহাদুরকে তামাক খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে প্রহার করেছ, উঠতে বসতে লেখাপড়া করাবার জন্য তিরস্কার করেছ। সপ্তম দৃষ্টান্ত, রাজা-বাহাদুর তাঁর প্রজাদের সঙ্গে যেমন খুসী ব্যবহার করবেন, তুমি তার জন্যে তাদের সামনে তাঁকে তিরস্কার ভর্ৎসনা করে প্রজাদের আস্পর্দ্ধা বৃদ্ধি করে আস্কারা দিয়েছ আর তাদের বিদ্রোহী হতে শিক্ষা দিয়েছ। অষ্টম দৃষ্টান্ত, তুমি রাজার স্বাধীনতায় বরাবর বাধা দিয়েছ।

এক নিশ্বাসে এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাঙালী একখানা কাগজ রাখালের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই দেখ, রাজা-বাহাদুরের নিজের হাতে লেখা তোমার অপরাধের

ফিরিঙ্গি। এখন রাজা-বাহাদুরের হুকুম—তুমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে তিন দিনের মধ্যে পাহাড়পুর ছেড়ে চলে যাবে। যদি না যাও, আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে, দরোয়ান দিয়ে বে-ইজ্জত করে তোমাদের বাড়ী থেকে বা'র করে দিতে হবে।

রাখাল মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে রুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলিল—কাঙালী, শেষের কথাটা তোমার মুখ থেকে না বা'র করলেও তুমি পারতে।

কাঙালী লজ্জিত হইয়া বলিল—আমি কি করব, আমি কি করব, আমার ওপরে রাজা-বাহাদুরের যেমন হুকুম!

রাখাল ঘৃণাভরে বলিল—তোমরা কজনেই ত কুবেরের মাথা খেলে। একজন বাবা, একজন মা, একজন শিক্ষক ও শ্বশুর—তোমরা রাতদিন তার কানের কাছে রাজা রাজা করে তার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছ। এর ফল তোমাদেরও ভোগ করতে হবে।

রাখাল অপমানের লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি হইতে আপনাকে লুকাইবার জন্য অন্দরে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল, আজ তাহার মণিমালাকেও মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ হইতেছিল।

(৫৫)

রাখাল গিয়া যেই ঘরে ঢুকিল অমনি কাত্যায়নী ও চন্দনমণির উচ্চ হাস্যধ্বনি আবার সমস্ত বাড়ী ভরিয়া তুলিল।

মণিমালা রাখালের লজ্জিত মুখের দিকে ক্লিষ্ট মুখে চাহিয়া বলিল—আজকে ওদের সব কি হয়েছে, আমাদের দেখছে আর টেপাটিপি করে হাসছে? মা কেবল কাঁদছেন?

রাখাল অপরাধীর মতন বলিল—আমাদের কুবের তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাইতে ওদের অত আনন্দ। যেমন আমি এর আগে তোমার কথা শুনে যাইনি, তেমনি আজ গলাধাক্কা খেয়ে বেরুতে হচ্ছে। নাও তল্পি বাঁধো। তিন দিনের মধ্যে পাহাড়পুরের এলাকা ছেড়ে যেতে হবে, নইলে দরোয়ানে বেইজ্জত করে বার করে দেবে।

এই দারুণ অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়া আকাট হইয়া মণিমালা দাঁড়াইয়া রহিল।

দাবানলের ন্যায় এই সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্যের মেয়ে পুরুষ যে যতদূর হইতে আসিতে পারিল রাখাল ও মণিমালাকে শেষ বিদায় দিতে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সকলে কাঁদিয়া আকুল—তাহারা পিতৃমাতৃহীন হইল। রাজ্য দ্বিতীয়বার রাজা ও রাণীকে একসঙ্গে হারাইল! তাহাদের মান ইজ্জতের রক্ষক, সুখদুঃখের অংশীদার, তাহাদের ভয়ত্রাতা সহায় আজ বিদায় লইতেছে! এই সমস্ত লোকের সহিত রাখাল ও মণিমালারও প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহাদের কাছে বিদায় লইতে ইহাদের চোখের জলের সঙ্গে তাহাদেরও চোখের জল মিশিতে লাগিল। সব-চেয়ে বেশী কাঁদিল ভূপাল—তাহার দিদিমাকে আর সে দেখিতে পাইবে না; সে তাহার মামা-মামীকেও যে বড় ভালোবাসে; এখানেই তাহার জন্ম, এখানেই তাহার জ্ঞানের উন্মেষ, এখানকারই স্থান গাছ পালা মানুষ তাহার পরিচিত প্রিয়; সে এই সমস্ত ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে তাহা সে জানে না। আর কষ্ট হইতেছে তাহার একমাত্র বন্ধু গৌরীপ্রসাদকে ও ম্যানেজার-সাহেবের কন্যা নেলীকে ছাড়িয়া যাইতে নেলীকে যে সে বড় ভালোবাসিত; তাহারা সমবয়সী; ভূপালের খেলিবার জুটি এ বাড়ীতে আর কেহ ছিল না, রাজার দৌহিত্র বাহিরের কাহারও সহিত মিশিতে পাইত না, কাজেই তাহার একমাত্র সঙ্গিনী সখী ছিল নেলী। নেলীও তাহাকে বড় ভালোবাসিত, ভূপাল চলিয়া যাইবে শুনিয়া সেও যে বড় কাঁদিতেছে, তাহার পোষা খরগোশটা মরিয়া গেলেও সে এমন কান্না কাঁদে নাই। সব-চেয়ে ভূপালের কষ্ট বোধ হইতেছিল, আর দুইমাস মাত্র পরে তাহার ক্লাশের পরীক্ষা—সে নূতন স্কুলে গিয়া এ পরীক্ষায় হয়ত পাশ করিতে পারিবে না, তাহাকে এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আর-এক বৎসর হয়ত পড়িয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ক্রন্দন বৃথা! এ বাড়ীতে একমাত্র তাহারই অধিকার ছিল, কিন্তু তাহার মাতামহের নাম-সই-করা এক ছত্র লেখায় তাহার অদৃষ্ট একেবারে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে, সে এখানকার কেউ নয়!

রাখাল মণিমালা ও ভূপাল রাণী জগদ্ধাত্রীর চরণে

চোখের জল ফেলিয়া নীরবে বিদায় লইল। রাণী জগদ্ধাত্রীও নীরবে অশ্রুমোচন করিতে-করিতে রাখালের হাতে হাজার টাকার নোট তুলিয়া দিলেন; এই মাত্র তাঁহার শেষ সম্বল।

তাহারা চন্দনমণি ও কাত্যায়নীর কাছেও সকল ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া মিনতি করিয়া কাঁদিয়া বিদায় লইল—তাহারা শাশুড়ী-বৌএ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বঙ্কবিহারী হাসিতে-হাসিতে বলিল—দুঃখ করিয়ো না বাবাজী, ক্ষোভ করিয়ো না মা, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট!

মণিমালা শেষকালে আকালু খানসামার নিষেধ না মানিয়া কুবেরের কাছে গেল। কুবের গম্ভীর হইয়া বসিয়া তামাক টানিতেছিল—আজ সে দিদিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল না, ব্যস্ত হইয়া গড়গড়া লুকাইল না।

কুবেরের সম্মুখে চোখের জল জোর করিয়া বন্ধ রাখিয়া অকুম্পিত সহজ স্বরে মণিমালা বলিল—শেষ বিদায়ের ক্ষণে তোমায় জানিয়ে যেতে এসেছি ভাই, ভগবান সাক্ষী, আমরা কখনো তোমার অহিত চিন্তা করিনি।

কুবের ক্রুদ্ধ হইয়া রুখিয়া বলিয়া উঠিল—করেননি? আগা-গোড়া হিংসে করে শত্রুতা করেছেন!

মণিমালা হাসিয়া বলিল—আমরা তোমার হিংসে করে শত্রুতা করলে আজকে তোমার এমন করে অপমান করবার সুযোগ পেতে হত না, ভাই!

কুবের এ কথার জবাব দিতে পারিল না, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মণিমালা জয়ী হইয়া গর্ব্বভরে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

রাখাল বা ভূপাল কুবেরের সহিত সাক্ষাৎ করিল না।

(৫৬)

যাহারা তাহাদিগকে চাহে না, নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে যাহারা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল, তাহাদের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে-করিতে মণিমালা কন্যা বিভাকে কোলে করিয়া পাল্কীতে উঠিল, রাখাল ভূপালকে লইয়া হাতীতে চড়িল। হরিহরছত্রের মেলা হইতে রাখাল এই হাতী পাল্কী ও ভূপালের চড়িবার জন্য একটি ঘোড়া কিনিয়া আনিয়াছিল; —আজ অনেক হাতী-পাল্কীর মধ্যে সেই পাল্কী সেই হাতী বাছিয়া তাহাদিগকে চিরবিদায় করিয়া দিতে পাঠানো হইয়াছে। হাতীটি দাঁতাল, পিঠে সওয়ারী চড়িলে সে মাঝে-মাঝে পিঠ ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিত। রাখাল সেই হাতীতে চড়িবার সময় হাসিয়া বলিল—বাহাদুর-গঞ্জ, এইবার তোমার পালা!

হাতী ও পাল্কী দেউড়ি পার হইয়া যাইতেই দুড়ুম দুড়ুম করিয়া দুইটা বোম ফুটিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে রাজার শত্রুরা রাজবাড়ীর হাতা ত্যাগ করিয়া গেল।

বোমের আওয়াজে সাধারণ লোকের বুক ফাটিয়া অশ্রু পড়িল। চন্দনমণি আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! এত দিনে আপদ বিদায় হল!

রাণী কাত্যায়নী চন্দনমণির দিকে চাহিয়া ক্রূর হাসি ঠোঁটের কোণে চাপিয়া রাখিয়া বলিল—আরো গোটা-কতক আপদ শিগ্গির বিদায় হবে!

চন্দনমণির মুখ শুকাইয়া গেল। উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে বৌমা, আবার কে?

কাত্যায়নী হাসিতে-হাসিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে, আছে!

পাহাড়পুর হইতে রেল-ষ্টেশন কুড়ি ক্রোশ তফাতে। কার্ত্তিক মাস। সেই ছোট বড় অসংখ্য নদীতে ঘেরা দেশের বন্যার জল এখনো শুকায় নাই; নদীগুলি এখনো কানায়-কানায় পূর্ণ থাকিয়া খরবেগে বহিতেছে—পাহাড়িয়া নদীর স্রোত বিষম; নদীর কূলের দুই ধারেও স্থানে-স্থানে জল জমিয়া আছে, কোথাও-কোথাও জল নামিয়া গিয়া কাদা হইয়াছে। এখনকার অবস্থা এমন যে ষ্টেশন পর্য্যন্ত বরাবর নৌকাতেও যাওয়া যায় না; হাতী-পাল্কীরও পথ বেশ পড়ে নাই। কোনো-মতে ছোট-ছোট সোঁতাগুলি পার হইয়া ভীমশ্রী নদীর ধারে গিয়া পড়িতে পারিলে নৌকায় যাওয়া যাইতে পারে।

রাত্রি গভীর হইয়াছে। হাতীর উপর ভূপাল ঘুমাইয়া গিয়া রাখালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রাখাল এক হাতে ভূপালকে ও একহাতে হাতীর গদির কাছি ধরিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। সম্মুখে একটা সোঁতা। পার হইতে হইবে। বেহারারা পাল্কী কাঁধে করিয়া জলে

নামিল। সোঁতায় জল বেশী ছিল, জল পাল্কীর তলায় পৌঁছিল। বেহারারা পাল্কী মাথায় করিয়া চলিল। পাল্কী টলমল করিতেছে—যদি বেহারাদের হাত ফস্কাইয়া পড়িয়া যায় তাহা হইলে মণিমালা ও বিভার জীবনলীলা এইখানেই শেষ। ক্ষুদ্র বিভা ভয় পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া মায়ের গলা ধরিয়া বলিতে লাগিল—দুগ্‌গা দুগ্‌গা মাকে বেঁচে থেকো, বাবাকে বেঁচে থেকো, দাদাকে বেঁচে থেকো!

পাল্কী সোঁতা পার হইয়া গেল। বাহাদুর-গজ কূলে দাঁড়াইয়া পিঠ ঝাড়া দিয়া আপত্তি জানাইতে লাগিল সে জলে নামিবে না। মাহুত যত গজ-বাগ দিয়া তাহার মাথায় মারে, মেট যত ফার্শা দিয়া তাহার পশ্চাতে খোঁচা মারে সে তত জোরে পিঠ ঝাড়িতে থাকে। রাখালের প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় হইতে লাগিল এখনি হয়ত সে ভূপালকে লইয়া ছিটকাইয়া গিয়া জলে পড়িবে। তারপর ক্রুদ্ধ হাতী শুঁড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জলেই চাপিয়া রাখুক বা পায়েই চাপিয়া ধরুক বা আছাড়ই মারুক ফল তাহার একই-প্রকার। রাখাল মাহুতকে বলিল—মন্নু মন্নু, আর মেরো না। ওকে ঠাণ্ডা করে আমাদের নামিয়ে দাও, আমরা হেঁটে সোঁতা পার হচ্ছি।—মাহুত বলিল—কুছ ডর নেই বাবু, আপনি চুপ করে বসে থাকেন।—আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকুন, বসিয়া থাকিতে দিলে ত! অনেক ধস্তাধস্তির পর হাতী জলে নামিল বটে, কিন্তু সম্মুখে ছিল গর্ত্ত, হাতী হুস করিয়া গিয়া তাহাতে নামিয়া পড়িল, হাতীর পিঠ পর্য্যন্ত জল! রাখাল তাড়াতাড়ি পা গুটাইয়া লইল। বাহাদুর-গজ সেখানে আবার বাহাদুরী দেখাইতে আরম্ভ করিল। রাখাল একএকবার মনে করিতে লাগিল ভূপালকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া পলাইবে। কিন্তু হাতী শুঁড় ফিরাইয়া যদি ধরিয়া ফেলে! রাখাল হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিল—মণি, কুবেরের মনস্কামনা এবার পূর্ণ হল!

হঠাৎ এই উচ্চ কথা শুনিয়া হাতী জল হইতে উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। এও ভয়ানক! তবু জলে দাঁড়াইয়া পিঠ ঝাড়া দেওয়ার চেয়ে ঢের ভালো।

এমনি করিয়া কোনো মতে সোনাখড়কে নদীর ধারে কাঁদনটোল ডিহির কাছারীতে আসিয়া পৌঁছিল। মাহুত ও বেহারারা হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমাদের কসুর মাফ হয়, মহারাজের হুকুম আমাদের এখান থেকেই ফিরতে হবে। না ফিরলে আমাদের রুজি যাবে, জান যাবে।

রাজার মেয়ে-জামাই-দৌহিত্র-দৌহিত্রীকে একটা কাছারীর সামনে অসহায় নামাইয়া দিয়া যান বাহন সমস্ত ফিরিয়া চলিয়া গেল একটা কোথাকার কে বেদখলকার ছোকরার হুকুমে। অদৃষ্ট!

মণিমালা হতাশভাবে বলিল—এ যে দ্বীপান্তরে দেওয়া! উপায় কি হবে?

রাখাল শুষ্ক মুখে বলিল—দেখি ডিহির নায়েবের যদি দয়া হয়, সে যদি যাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

এমন সময়, সেই যে তুফানি রাখালকে ঘুষ দিতে গিয়া রাখালের কাছে চাবুক খাইয়াছিল, সে আসিয়া রাখাল ও মণিমালাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। সে হাত জোড় করিয়া বিনীতভাবে রাখালকে বলিল—হুজুর, রাজকন্যাকে আমার গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে বলুন। আমি আপনাদের ছেলে, এখানকার নায়েব-তহশীলদার।

তুফানির স্ত্রীকন্যা ঘোমটা দিয়া আসিয়া মণিমালাকে "ভক্তি" করিল। মণিমালা তাহাদিগের সহিত তুফানির অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। তুফানি রাখাল ও ভূপালকে আনিয়া নিজের হাতে মোড়া পাতিয়া বসাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—হুজুর, এ রাজ্য আপনার, আমি আপনার গোলাম, আপনি অসঙ্কোচে এখানে থাকুন, আমি নৌকার জোগাড় দেখছি।

—তুফানি, শিগগির নৌকা দেখ। তোমাদের রাজা-বাহাদুরের হুকুম তিন দিনের মধ্যে তাঁর রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে, নইলে তাঁর দরোয়ান অপমান করে তাড়িয়ে দেবে।

তুফানি গর্ব্বভরে বলিল—কার সাধ্য আমার সামনে আপনার অপমান করবে? আমার তাবে একশো লাঠিয়াল পাইক আছে, তারা মরবে, আমি মরব, আমার স্ত্রীপুত্র-কন্যা মরবে, তারপর আপনাদের দেখা পাবে। আমি মহারাজের চাকর; কিন্তু আপনি আমার কাচ্চা-বাচ্চার মুখের ভাত রক্ষা করে দিয়েছিলেন।—আমাদের জান ও মালের ওপর আপনার অধিকার।

রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল—তুফানি, আমি আরো কত লোকের একটু আধটু উপকার করতে চেষ্টা করেছি; তাদের কাছ থেকে উল্টে অপকারই পেয়েছি। আর তোমাকে আমি বেত মেরেছিলাম তুফানি!

তুফানি শা হাত জোড় করিয়া বলিল—সে কথা আমি ভুলিনি হুজুর! আমি আপনার মহত্ত্ব মাহাত্ম্য মর্য্যাদা বুঝতে না পেরে নীচ কাজ করতে গিয়েছিলাম। আপনি গুরুমশায়ের মতন বেত মেরে আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আমি সেইদিন থেকে আপনার গোলাম হয়ে আছি।

রাখাল উঠিয়া তুফানিকে আলিঙ্গন করিয়া সজল নয়নে বলিল—তুমি আমার বিপদের বন্ধু, তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর তুফানি।

তুফানি রাখালের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আমি আপনার দাস।

(৫৭)

পাটের সময়। সমস্ত নৌকা বোঝাই। নৌকা আর পাওয়া যায় না। তিন চার দিন এই কাঁদনটোলা ডিহিতে রাখাল ও মণিমালা পড়িয়া আছে। তুফানি শা সপরিবারে গুরুর মতো তাহাদের সেবা করিতেছে।

অনেক কষ্টে একখানা নৌকা মিলিল। রাখালেরা আজ যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে। সদর হইতে ডিহির নায়েব-তহশীলদারের উপর পরোয়ানা লইয়া পাইক আসিল—মহারাজের বাবা ও শ্বশুর সপরিবারে বাড়ী যাইবেন, একখানা নৌকা যেন হাজির থাকে।

পাইক রাখাল ও মণিমালার জন্য নিযুক্ত নৌকা আটক করিল।

রাখাল ও মণিমালা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল—হঠাৎ বাবা ও শ্বশুর-মহাশয়দের সপরিবারে বাড়ী যাওয়াটা কি-রকম কি-রকম ঠেকিতেছে! তাহাদেরও কি আমাদের দশা হইল না কি!

তুফানি রাখালকে বলিল—আপনারা এই নৌকা নিয়ে চলে যান; এই নৌকা ফিরে এলে ওঁরা যাবেন, ততদিন আমার এখানেই একটু বিশ্রাম করবেন না হয়।

রাখাল বলিল—এতদিন রইলাম, আর একদিনের কথা বৈ ত নয়। বড় নৌকা; একসঙ্গেই সকলে যাওয়া যাবে।

পরদিন বঙ্কবিহারী ও কাঙালী ডিহিতে নামিয়াই রাখালকে দেখিয়াই খাঁৎকাইয়া উঠিল—অ্যা! তুমি এখনো যাওনি?

রাখাল হাসিয়া বলিল—না, একসঙ্গে এক নৌকোর যাত্রী হব বলে অপেক্ষা করছি।

বঙ্কবিহারী ও কাঙালী বলিল—না, ও নৌকোয় ত তোমাদের জায়গা হবে না।

রাখাল তেমনি হাসিমুখেই বলিল—জায়গা বেশ হবে। কাল ঐ নৌকো নিয়ে আমরা চলে গেলে আজকে এই ডিহিতে গড়াগড়ি দিতে হত। দয়া করে নৌকো নিয়ে যাইনি। আমরা আগে এসেছি, এ নৌকোয় আগে আমরা চড়ব। জায়গা না হয়, তোমরা পরে যেও।

রাখাল আর কাহারও দিকে না চাহিয়া স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া গিয়া নৌকায় উঠিল এবং মাঝিকে হুকুম করিল—নৌকা খুলে দাও।

গণপত মাঝি নৌকা খুলিতে ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া রাখাল নৌকার গলুইএর উপর দাঁড়াইয়া হুকুমের স্বরে বলিল—গণপত, নৌকা খোলো।

এতদিন যাহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় করিয়া আসিয়াছে তাহার আদেশ রাজার ভয়েও অবহেলা করিতে গণপতের সাহস হইল না; সে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

বঙ্কবিহারী ও কাঙালী তাহা দেখিয়া বলিল—বড় নৌকো আছে, বড় নৌকো আছে, সকলেরই বেশ জায়গা হবে; সকলেরই কুলিয়ে যাবে, কতক্ষণেরই বা মামলা!...

কাত্যায়নী তাহাদের বিষদাঁত ভাঙিয়া বিদায় করিয়াছিল। কাঙালীর ইচ্ছা ছিল বঙ্কবিহারীকে বিদায় করিয়া সদরে সে-ই রাজার শ্বশুররূপে প্রধান হইয়া থাকিবে; এবং অন্দর হইতে চন্দনমণিকে বিদায় করিয়া কাত্যায়নীর মাকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কাঙালীর অস্ত্র হইয়াছিল কন্যা কাত্যায়নী। সে যখন-তখন বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণির আচরণ লক্ষ্য করিয়া কুবেরকে বলিত—ভালো আপদ হয়েছে বুড়োবুড়িগুলো! রাতদিন কেবল ঘুরছে। আমরা দুটিতে যে একটু নিরিবিলি আমোদ আহ্লাদ করব তার জো নেই।

হঠাৎ কথাটা কাত্যায়নীর রূপমুগ্ধ যৌবনমত্ত কুবেরের মনে লাগিল।—ঠিক ত! বুড়াবুড়িগুলা বড় জ্বালাইয়াছে! দাও ওদের খেদাইয়া!

কাত্যায়নীর হিসাবে একটু ভুল হইয়াছিল। সে নিজের বাবাকে বুড়ার দলে না ফেলিলেও কুবের ফেলিল। হুকুম দিল, বঙ্কবিহারী ও কাঙালীকে সপরিবারে বাড়ী চলিয়া যাইতে হইবে—বাড়ীতে থাকিয়া তাহারা কিছু কিছু মাসহারা পাইবে। রাণী জগদ্ধাত্রীও বুড়ি হইয়াছিলেন; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারের ভয় থাকাতে তিনি রেহাই পাইয়া গেলেন। কাত্যায়নী নিজের ফাঁদে নিজে জড়াইয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বঙ্কবিহারী ও কাঙালী রাজাগিরির খোলস পিছনে খুলিয়া-রাখিয়া আপনাদের কুটিরে লুকাইতে যাইতেছে; তাহাদের দম্ভ আস্ফালন সমস্ত সমাপ্ত; চন্দন-শ্রেণি ত একেবারে চুপ।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এখন হঠাৎ চল্লেন যে?

কাঙালী বলিল—এখন রাজাবাহাদুর স্বয়ং লায়েক হয়েছেন, আর তাঁকে আগলাবার ত দরকার নেই। আমরা অনেক দিন বাড়ীঘর ছাড়া, তাই দেশে যাচ্ছি একবার।

বঙ্কবিহারী ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিল—যথার্থ, যথার্থ!

ষ্টেশনের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগিল। বঙ্কবিহারীদের সঙ্গে আহারের আয়োজন ছিল; আহার করিতে বসিয়া গেল। ভূপাল ও বিভা যে দুটি বালক বালিকা আছে, তাহাদেরও খাইতে ডাকিল না। এই বুনো জায়গায় প্রস্তুত খাদ্য কিনিতে পাওয়া যায় না; তুফানি-শার উপহার-দেওয়া সিধা রন্ধন করিবারও সময় নাই, ট্রেন অল্পক্ষণ পরেই আসিবে। তুফানি-শার দেওয়া দুধ চিঁড়ে মুড়কি কলা দিয়া ফলারের জোগাড় করিবার জন্য রাখাল ডাঙায় নামিল।

উপরে উঠিতেই কে তাহাকে ডাকিল—রাখাল-বাবু মশায়, রাখাল-বাবু মশায়।

রাখাল ফিরিয়া দেখিল এক জায়গায় নৌকার পাল দিয়া ঘিরিয়া পাহাড়পুর-কলেজের শিক্ষকেরা বসিয়া আছেন, তাঁহারা পূজার ছুটির পর বাড়ী হইতে স্কুল-কলেজের কাজে সপরিবারে ফিরিয়া যাইতেছেন।

রাখাল নিকটে গেলে তাঁহারা বলিলেন—আপনি এখানে?

রাখাল লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—পাহাড়পুরের বাস উঠিয়ে দেশে চলেছি। কুবের ভায়া রাজা হয়েছেন, আর আমাকে দরকার নেই।

—কী অন্যায়! পাহাড়পুরের যিনি প্রাণ ছিলেন তাঁকে বিদায় করে দেওয়া!

রাখাল সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল—আমাকে তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, মাপ করবেন। আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি; ট্রেনের আর বিলম্ব নেই।

শিক্ষকেরা বলিয়া উঠিলেন—আমাদের পরিবারেরা রয়েছেন, রান্না প্রস্তুত। অনেক দিন রাজবাড়ীতে আপনারা স্ত্রীপুরুষে যত্ন সমাদর করে আমাদের নিমন্ত্রণ খাইয়েছেন। আজ আমরা স্ত্রীপুরুষে এই মাঠের মাঝখানে আপনাদের নিমন্ত্রণ করছি।......ওগো তোমরা যাও, রাখাল-বাবুর স্ত্রী আর ছেলে মেয়ে নৌকোতে আছেন, নামিয়ে নিয়ে এস।

অনাত্মীয়ের সহৃদয় যত্নে রাখাল ও মণিমালা মুগ্ধ হইয়া দেশে রওনা হইল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুলনা

'নিকট' কপট ভারি; ক্ষুদ্র ব্যবধান
মনে হয় সুবিশাল প্রাচীর-সমান!
'দূরে'তে দূরত্ব কোথা? সে যে সন্নিকট;
মনের মিলন-দ্বারে সে যে পূর্ণ-ঘট!

যেখানে প্রদীপ, সেথা আছে ছায়া আলো।
কর্ম্মমাত্রে আছে ফল,—মন্দ আর ভালো।

যে মেঘেতে জল দেয় বজ্র আছে তায়।
সর্ব্ব বস্তু বিশ্বে ভরা আশা-নিরাশায়।

শ্রীমন্মথধন সরকার

ভারত-ভারতীর চরণ-প্রান্তে আর দুই-এক ডালি নৈবেদ্য

আমার হাতের এই সারস্বত নৈবেদ্য-যোগানো কার্য্যটি আমি কিছু দিনের মতো স্থগিত রাখিয়া ভ্রাতৃসৌহার্দ্দের শান্তিসমীরণে শরীর-মনের ক্লান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্বাস্থ্য উপার্জ্জন করিবার মানসে বোলপুরের শান্তিনিকেতন হইতে রাঁচির শান্তিধামে উপনীত হইলাম। দুইচারিদিন যাইতে না যাইতে—আশ্চর্য্য বিধাতার করুণা—এবারকার পূজার সামগ্রী যেন আকাশ হইতে আমার করতলে নিপতিত হইল। শ্রীমান্ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভায়া আমার বিগত মাসের প্রবন্ধে বল-সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ফরাসীস্ দপ্তর হইতে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র আমাকে অনুবাদ করিয়া দিলেন :—

"ভারতের অগণ্য পুঁথী দৃষ্টে অনুমান হয়—সমস্ত দর্শনের তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব ভারতীয় মনীষিগণ কর্ত্তৃক অগ্রত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। এ কথা কেবল-একটা ফাঁকা অনুমান নহে—ইহার প্রমাণও আছে যথেষ্ট :—গ্রীস্ দেশের মাথালো-শ্রেণীর দুই তত্ত্বজ্ঞানী—পিথাগোরাস্ এবং প্লেটো—ঐ মূল উৎস হইতেই তত্ত্বসুধা লইয়া কলস ভরিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রাচী অনাবৃত হইয়াছে ;—বাস্তবিকই প্রাচী হইতে আমরা আলোক পাইয়াছি :—লাটিন ভাষায় এই যে একটি কথা আছে 'প্রাচী হইতেই আলোকের উত্থান' এটা সত্যকথা।" Introduction Le Buddhisme par G. Delafont —Page 9। এই গ্রন্থকার আর একস্থানে বলিতেছেন :—

"খ্রীষ্টীয় মতবাদ হইতে যদি খ্রীষ্টীয় কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্যোপ-করণের অবতারণা করা যায় তবে দেখিবে—তাহার মধ্যেও ইহুদীধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মের প্রভাব বেশী সুপরিস্ফুট। দুই চারিটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে :—অগ্নি প্রজ্বালন (burning candles) কোশাকুশী (chalice) প্রভৃতি কাথলিক উপাসনামণ্ডপের সাজসজ্জা যত কিছু, সমস্তই বৈদিক ধর্ম্মের যজ্ঞীয় উপকরণ; আচার্য্য-বরণ এবং মস্তক-মুণ্ডনও (tonsure) ব্রাহ্মণধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে; বিবাহ-সংস্কার;ত সমস্ত আর্য্যধর্ম্মের মধ্যেই সমান আকারে বর্ত্তমান। তা ছাড়া পুরোহিতদিগের ব্রহ্মচর্য্যব্রত (celebacy), পাপস্বীকৃতি (confession), প্রায়শ্চিত্ত, এসমস্তের মূল উৎস বৌদ্ধধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আমরা পাইয়াছি—সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনীর মঠ, সংঘসভা, ধর্ম্মপ্রচার। Gerson da Cunha বলেন—'মহাযান সম্প্রদায়ের সহিত অনেক বিষয়ে কাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্মের সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং কাথলিক খ্রীষ্টধর্ম্ম উভয়েরই মধ্যে—সন্ন্যাসি-সন্ন্যাসিনীর মঠ তো আছেই—তা ছাড়া ভিক্ষাবৃত্তিকে ধর্ম্মের উচ্চপদে সমারূঢ় করা হইয়াছে; মস্তকমুণ্ডন, সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত, পাপস্বীকার, উভয়ের মধ্যেই সমান; বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে আমাদের মতো সবই আছে—পর্ব্বোৎসব আছে—মন্ত্রপাঠ আছে—ঘণ্টাবাদন আছে—মালাজপ আছে—সবই আছে; এমন কি—(মহাযান-পন্থী) বৌদ্ধেরা মহাপুরুষদিগের মধ্যবর্ত্তিতাতেও বিশ্বাস করে।' এইরূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইহুদী ধর্ম্মের অপেক্ষা আর্য্যধর্ম্মের নিকটে খ্রীষ্টধর্ম্ম অনেক বেশী পরিমাণে ঋণী।" ঐ ২৫ পৃষ্ঠা।

ফরাসীসেরা এ-দেশীয়দিগের ন্যায় খোলা-প্রাণের লোক, তাই উপরি-উক্ত গ্রন্থকারটি পেটে কিছু না রাখিয়া সব কথা পষ্টাপষ্টি খুলিয়া বলিয়াছেন। দুই একজন উচুদরের গ্রন্থকার বাদে ইংরাজ পুরাবৃত্ত-লেখকদিগের মধ্যে যাঁহারা ফরাসীস এবং জর্ম্মান-দিগের দেখা-দেখি ভারতীয় শাস্ত্রাদি ঘাঁট্‌কাইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে যথা-সম্ভব কতক পরিমাণে ব্যুৎপত্তিলাভও করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় অতটা স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিতে সাহসী হ'ন নাই। কিন্তু সত্যের প্রভাব এমনি অনতিক্রমণীয় যে, শেষোক্ত গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতেও সময়ে সময়ে নম্র-নৈপুণ্যের (diplomacy'র) বাঁধ ভাঙিয়া প্রকৃত সত্য কথাটা স্পষ্টাকারে বাহির হইয়া পড়ে। Rhys Davidsএর প্রণীত "Buddhism" নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লেখা আছে দেখিলাম এইরূপ :—

["ফরাসীস্] Professor Garbe in his book which I quoted in the first lecture, the just published Sankhya Philosophie, repeats his opinion expressed in the Monist of January 1894, that the Greeks did actually borrow, in other respects, from the Indian philosophers. And Professor von Shroeder, in his treatise Pythagoras und die Inder, seems to me to have quite

clearly made out his case in favour of a borrowing by Phythagoras. It is at least certain that the students of ancient philosophy will do well to study more carefully than hitherto the Indian parallels.

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের "Literary Guide" নামক ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতির মৌলিকতা এবং পৃথিবীব্যাপী প্রভাব সম্বন্ধে একজন সদ্‌বুদ্ধি-সম্পন্ন সুবিদ্বান্ স্পষ্টবক্তা বলিতেছেন—

Coming to his (Sir E. Ray Lankasterএর) recent essay; two remarks on page 16 of the *Annual*, appears to me to call for comment. In the first, he says that *the moral precepts of Christianity are to be found, scattered here and there, in the writings of Greek and oriental sages*, (the italics are mine), conveying an impression that in such writings the Higher Ethic is, as it were, hit upon in merely passing or casual remarks, without ever being insisted upon, emphasized, or amplified. This impression may possibly be due to the unfortunate fact that of some of the best Greek ethical writers, only scattered fragments have survived. There is, however, at any rate, one pre-Christian ethical literature that has come down to us *in extenso*. This is the Pitaka literature of Buddhism. As far as mere space goes, it is much more voluminous than the New Testament, and that space is not expanded upon biography or theology. Its ethic is wellknown to be as lofty as, many consider it to be loftier than, that of the New Testament. What, now, is the position of the Buddhist ethic in this literature? Well, certainly, "scattered here and there" would be about the very last epithet that any student of the Pitakas would think of applying. Not merely is it to be found throughout insisted on, emphasized, and amplified in all kinds of ways, but it is interwoven with the very structure of the system. "As a man washes foot with hand, and hand with foot, so is understanding purified by conduct and conduct by understanding." It is incorporated into the famous compendium of the system known as "the Arian Eightfold path that leads to Sorrow's Ceasing"; and unless it be practised "in the highest" (Samma=Latin Summa), there is no attainment of the goal. It will thus be seen that the suggestion implied in "scattered here and there" cannot be sustained.

The second remark is that "it is directly through the spread and impulse of the Christian religion that this moral teaching has been carried over the earth." It is evident that the history of the Buddhist propaganda, carried over the whole of Asia (and apparently further still) without the shedding of one drop of blood, is as yet unknown to most English people. I would suggest, however, a conversation on the point with, say, a Burmese or Sinhalese, brought up, not in our tradition but in his own. His tolerant and kindly, if perhaps faintly ironic, smile is a wonderful solvent of the stiffness of our European assumption that no tradition but our own is worth considering.

Edward Greenly.

অধুনাতন কালের আর-একজন সুবিদ্বান্ ইংরাজ লেখক বলিতেছেন—

"The deeper one penetrates towards the spiritual centres of ancient civilizations, the higher seem the heights to which pre-Christian saints and sages reached. Every now and then one is startled to come upon a feature which was supposed to be a landmark erected by Christianity. Just as the dogmas and rites of Christianity find their fore-runners in heathen religions, so the ethical ideals associated more or less closely with these dogmas and rites are legacies from earlier ages. Even the Beatitudes—those brightest blossoms on Christian soil—can be traced to former growths, from which, indeed, they show a certain degeneracy. Each 'Blessed' [অর্থাৎ "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth," এইসব খ্রীষ্টোক্তি-পরম্পরার মূর্দ্ধস্থানীয় Blessed শব্দগুলির প্রত্যেকে] is accompanied by its reward—a partnership which the Stoic [আমাদের দেশে Stoic না, পরন্তু গীতাশাস্ত্রের মতানুমোদিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠাতা] would have looked upon as immoral."

Adam Gowans Whyte.

জর্ম্মানদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর Paul Deussen তাঁহার প্রণীত "System of Vedanta" নামক সারবান্ গ্রন্থের গোড়া'র একস্থানে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এইরূপ :—

"The thought that the empirical view of nature is not able to lead us to a final solution of the being of things, meets us not only among the Indians but also in many forms in the philosophy of the west. More closely examined this thought is even the root of all metaphysics, so far as without it no metaphysics can come into being or exist. For if empirical or physical investigation were able to throw open to us the true

and innermost being of nature, we should only have to continue along the path in order to come at last to an understanding of all truth ; the final result would be Physics, and there would be no ground or justification for Metaphysics. If, therefore, the metaphysicians of ancient and modern times, dissatisfied with empirical knowledge, went on to metaphysics, this step is only to be explained by more or less clear consciousness that all empirical investigation and knowledge amounts in the end only to a great deception grounded in the nature of our knowing faculties, to open our eyes to which is the task of metaphysics. Thrice, so far as we know, has the knowledge reached conviction among mankind, and each time by a different way, according to conditions of time, national and individual character ; once among the Indians, again in Greek philosophy, and the third time in the modern philosophy through Kant.......These methods of the Greek and German thinkers, admirable as they are, may seem external and cold, when we compare them with the way in which the Indians reached the same concepts. Their pre-eminence will be intelligible when we consider that no people on earth took religion so seriously, none toiled on the way to salvation as they did. Their reward for this was to have got, if not the most scientific, yet the most inward and immediate expression of the deepest secret of being."

পৃথিবীর ক্রোড়স্থিত দ্বিতীয় এই যে পৃথিবী—কি না আমাদের এই ভারতভূমি, ইহার প্রতি পঠদ্দশার বালক এবং যুবকদিগের শেখা ভালবাসাও অনেক দেখিয়াছি, আর, প্রৌঢ়বয়স্ক বাগ্মীদিগের ইংরাজপছন্দ টেবিল্‌ঠোকা নাচুনে ভালবাসাও অনেক দেখিয়াছি,—পরন্তু ভারতের প্রতি প্রাণের ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাঁহার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, নিম্নে একটিবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন্।

System of Vedantএর

প্রণেতা

Dr. Paul Deussenএর প্রতি।

My dear Professor

Your book brought me a new task, a new opportunity. For in it I found, most lucidly set forth, the systematic teaching of the Vedanta, according to its greatest Master, with many rich treasures of the *Upanishads* added.

Shall we say that the great *Upanishads* are the deep, still mountain tarn, fed from the pure water of the everlasting snows, lit by clear sunshine, or, by night, mirroring the high serenity of the stars ? The Bhagavad Gita is, perhaps, the lake among the foot-hills, wherein are gathered the same waters of wisdom, after flowing through the forest of Indian history, with the fierce conflict of the children of Bharata.

Then, in the *Brahma Suttras*, we have the reservoir four square, where the sacred waters are assembled in ordered quiet and graded depth, to be distributed by careful measure for the sustenance of the sons of men.

What shall we say, then, of the Master C,(=শ)ankara ? Is he not the Guardian of the sacred waters, who, by his commentators, has hemmed about, against all impurities of Time's jealousy, first the mountain tarns of the Upanishada, then the serene forest lake of the Bhagavad Gita, and last the reservoir of the Sutras ; adding, from the generous riches of his wisdom, lovely fountains and lakelets of his own, the *Crest Jewel* (চূড়ামণি), the *Awakening* (আত্মবোধ), the *Discernment* (বিবেক) ?

And now, in this our day, when the ancient waters are somewhat clogged by time, and their old courses hidden and choked, you come as the Restorer, tracing the old, holy streams, clearing the reservoir, making the primal waters of life potable for our own people and our own day ; making them easier of access also, and this is near to both our hearts, for the children's children of those who first heard C, (=শ)ankara, in the sacred land where he lived in luminous days.

So the task is done. May the Sages look on it with favor. May the sun-lit waters flow in life-restoring streams, bringing to the world the benediction and spiritual light.

Believe me, as ever
Cordially yours
Charles Johnston.

ভারতীয় জ্ঞানসমুদ্রের এই-সকল ডুবুরী-শ্রেণীর পণ্ডিতদিগের এক-একটি কথার মূল্য সফরীশ্রেণীর পণ্ডিতগণের স্তূপাকারে গাদা করা লাখো লাখো কথার মূল্য অপেক্ষা অনন্তগুণ বেশী তাহা তো দেখিতেই পাওয়া

যাইতেছে—কিন্তু হইলে হইবে কি—আজিকের বাজারে সফরীশ্রেণীর পণ্ডিতগণের অসার অপদার্থ এবং অকিঞ্চিৎকর কথার কাটুক্তি এত বেশী যে, তাহার ভিড় ঠেলিয়া সারগর্ভ অকৃত্রিম সত্য কথা যে, পাঁচজন জ্ঞান-পিপাসু সাধু-সজ্জনের কর্ণে পৌঁছিবে, তাহার পথ একেবারেই অবরুদ্ধ।

বৎসরেক কাল ধরিয়া পুরাতত্ত্ববেত্তাগণের পুঁথি ঘাঁটা-ঘুঁটি করিয়া পুরাবৃত্ত-ঘটিত তিনটি নিগূঢ় রহস্যের যবনিকা-উদ্ঘাটনকার্য্য আমার এই দুর্ব্বল হস্তের যতদূর সাধ্যায়ত্ত তাহা আমি কথঞ্চিৎ প্রকারে করিয়া চুকিলাম। সে তিনটি রহস্য এই :—

প্রথম রহস্য।

পরাবিদ্যার দেবস্পৃহনীয় পবিত্র উৎস ভারতভূমিতে সর্ব্বপ্রথমে উন্মুক্ত হইয়াছিল। বেদ-মন্ত্র—পরাবিদ্যার সরস্বতী-নদী; বেদান্ত-শাস্ত্র বা উপনিষদ্ শাস্ত্র—পরাবিদ্যার গঙ্গা-নদী; মহাভারত-মুখ্য স্মৃতিপুরাণ—পরাবিদ্যার যমুনা-নদী; ভগবদ্গীতা—পরাবিদ্যার ত্রিবেণী-সঙ্গম।

দ্বিতীয় রহস্য।

পুরাতন গ্রীসে পরাবিদ্যার অমৃত-বারি যদি কোথা হইতেও সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তবে হইয়াছিল তাহা ভারতের পুণ্যতোয়া নদী নির্ঝর হইতে—মিসরের নক্রময়ী নীল-নদী হইতেও না—ফিনীসীয়দিগের বাণিজ্যতরীর কোটরে পুঞ্জীকৃত চর্ম্মকুম্ভ হইতেও না।

তৃতীয় রহস্য।

কলিযুগের গগনস্পর্দ্ধী গৌরব-মাহাত্ম্যের ভেরী-বাদনকারী পাশ্চাত্য জাতিদিগের চতুর্ব্বর্গ-ফলের কল্পতরু এই যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, ইহার মূলে জল সিঞ্চন করা হইয়াছিল জর্ডান হইতে তত না—যত জাহ্নবী হইতে।

দুইটি দুরূহ কার্য্য এখনো আমার হস্তে বাকি। সে দুইটি কার্য্য এই—

প্রথম কার্য্য।

অপরা-বিদ্যার স্রোতস্বতী কোন্ উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া কোথাকার জল কোথায় গড়াইয়াছে তাহার অনুসন্ধান-চেষ্টা।

কার্য্য।

পরা এবং অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে আমার যেটি মুখ্য মন্তব্য কথা—সেই কাজের কথাটি পাঠক-মহোদয়গণের সুবিবেচনায় সমর্পণ।

আপাতত আমি প্রবাসীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে মাসেক দুমাসের অবসর গ্রহণ করিয়া গন্তব্যপথের পাথেয় সংগ্রহ করিবার মানসে আমার এই প্রবন্ধ-নৌকাটিকে বন্দরে ভিড়াইয়া নেঙড় করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু এবারকার পরীক্ষায় সর্ব্ব-লোকের একটি জানা কথা আমি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ বিশেষ মতে জানিতে পারিয়াছি;—সে কথাটি এই যে, আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবেরা মনে করে এক—কাজে ঘটিয়া দাঁড়ায় আর। অতএব, যদি কোনো সময়ে দেখি যে, দৈবের কৃপায় জলের স্রোত এবং বায়ুর হিল্লোল দিব্য অনুকূল, তবে কাল ব্যয় না করিয়া তদ্দণ্ডে নৌকা ছাড়িয়া দিব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সময়ের সদ্ব্যবহার

জীবন ভালোবাস? তাহলে সময় নষ্ট কোরোনা, কারণ তাই দিয়েই জীবন তৈরি।—ফ্রাঙ্কলিন।

অল্প-বয়সীও ঘণ্টা-হিসেবে বড় হতে পারে, যদি সে সময় নষ্ট না করে' থাকে।—বেকন।

জীবনে প্রতি ঘণ্টা শত কর্ম্ম-সম্ভাবনার আশায় স্পন্দমান—তার এক মুহূর্ত্ত গত হলে সে ক্ষণের নিরূপিত কর্ম্ম আর হবার নয়; ঠাণ্ডা লোহার ওপর অসময়ের হাতুড়ির ঘা আর পড়বার নয়।—রাসকিন।

"খোওয়া গেছে! সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে স্বর্ণময় দুঘণ্টা-সময়, প্রত্যেকের ওপর ষাটটি করে' মণিময় মিনিট বসানো ছিল। পুরস্কার ঘোষণা করব না, কারণ জানি সেগুলি আর ফিরে পাবার নয়।—হোরেসমান।

শিক্ষার খুব পক্ষপাতী হয়ে যখন পড়ব তখনই আমরা খোঁজ করব সময় কি রকমে কাটাই। আর তখনই, সময়টাকে মার্জ্জিত বা শিক্ষিত হতে পারি না—এই চুতো আর শোনা যাবে না।—ম্যাথু আরনলড্।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের খবরের কাগজের আপিসের সামনে এক ব্যক্তি প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করলে—"ও বইখানার দাম কত?" দোকানের কর্ম্মচারী বল্লে—"এক ডলার।"

তার কমে হয় না?"

কর্ম্মচারী বল্লে—"আজ্ঞে না। এক ডলারই ওর দাম।"

প্রশ্নকারী আরো কিছুক্ষণ এ-বই সে-বই দেখে বেড়ালে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"মিষ্টার ফ্রাঙ্কলিন আছেন?" কর্মচারী বল্লে—"হ্যাঁ আছেন। কিন্তু তিনি বড় ব্যস্ত।" লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়, সে বল্লে—"তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।" ফ্রাঙ্কলিন এলেন, অপরিচিত ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলে—"মিষ্টার ফ্রাঙ্কলিন, ও বইখানা কত দামের কমে দিতে পারেন না বলুন তো।" ফ্রাঙ্কলিন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"সওয়া এক ডলার।" "সওয়া এক ডলার! সে কি মশাই! আপনার লোকটিত এইমাত্র এক ডলার চাইলেন।" ফ্রাঙ্কলিন বল্লেন—ঠিক কথা। কাজ ছেড়ে না আসতে হলে ঐ এক ডলারেই সন্তুষ্ট হতুম।"

লোকটি অবাক হয়ে গেল। যাহোক কথাটা যখন সে-ই পেড়েছে তখন একটা মীমাংসা করতেই হবে, তাই সে বল্লে—"যাক সে কথা। এখন বলুন দেখি ঠিক কত হলে দিতে পারেন?" ফ্রাঙ্কলিন উত্তরে বল্লেন—"দেড় ডলার।" "দেড় ডলার! কেন আপনি তো নিজেই সওয়া এক ডলার চাইলেন।" ফ্রাঙ্কলিন গম্ভীরভাবে বল্লেন—"হ্যাঁ। তখন নিলে সওয়া এক ডলারেই পেতেন, এতক্ষণ পরে নয়।"

লোকটি অগত্যা আর বাক্যব্যয় না করে' টেবিলের ওপর দেড় ডলার রেখে বই নিয়ে চলে' গেল। এবং সময়কে জ্ঞান বা অর্থ আহরণের জন্যে কেমন করে' খাটাতে হয় সে-সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা পেয়ে গেল। সময় যাঁরা নষ্ট করে তারা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

যাঁরা ছোট ছোট মিনিট, আধ ঘণ্টা সময়, অপ্রত্যাশিত ছুটির সময় বা অ-সময়নিষ্ঠ আগন্তুকের জন্যে অপেক্ষা করবার সময় সঞ্চয় করেন, এবং কাজে খাটান, তাঁরা যে সার্থকতা লাভ করেন বাস্তবিকই তা সাধারণের বিস্ময়কর।

এলিহু বারিট বলতেন—"যা-কিছু আমি করেছি বা করবার ইচ্ছা বা আশা করি তা-সব হয়েছে এবং হবে সেই ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত, সঞ্চয়ের দ্বারা—কণার পর কণা দিয়ে, চিন্তার পর চিন্তা দিয়ে এবং তথ্যের ওপর তথ্য জমিয়ে; যেমন করে' উই তার ঢিপি নির্ম্মাণ করে। এবং আমার সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রেষ্ঠ আরাধনা হয়েছে, আমার স্বদেশের যুবকদলের সম্মুখে সময়ের অমূল্য খণ্ডাংশ মুহূর্ত্তগুলির সদ্ব্যবহার কেমন করে' করতে হবে তার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।"

পার্লামেণ্টে বার্কের বক্তৃতা শুনে তাঁর এক ভাই অনেক ভেবে-চিন্তে বলেছিলেন—"আশ্চর্য্য! আমাদের বাড়ীর মধ্যে কেবল নেডই কেমন করে' সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধি এক-চেটে করে' ফেল্লে! তবে আমার মনে পড়ে বটে সে কখনো সময় নষ্ট করেনি।"

অদৃশ্য হাত থেকে অমূল্য উপহার নিয়ে দিনগুলি আমাদের কাছে আসে ছদ্মবেশে বন্ধুর মত। যদি আমরা তাদের অভ্যর্থনা না করি, যদি তাদের কাজে না লাগাই, তবে তারা নিঃশব্দে চলে' যায় চিরদিনের মত। প্রতি প্রভাত নব নব উপহারের ডালি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু যদি আমরা গত কল্য এবং তার পূর্ব্ব-দিনও সে উপহারগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে' থাকি তবে আজও তাদের গ্রহণ করতে পারব না, এবং দিনের পর দিন যেমন অতীতের গর্ভে লীন হয়ে যাবে তেমনি আমরাও ক্রমশ তাদের আদর করতে একেবারে অক্ষম হয়ে পড়ব। অর্থ নষ্ট হলে ব্যয়সংক্ষেপ এবং উদ্যমের দ্বারা তা পুনরায় লাভ করা যায়; নষ্ট জ্ঞান পাঠের দ্বারা উদ্ধার করা যায়; নষ্টস্বাস্থ্য ঔষধসেবন ও মিতাচারের দ্বারা পুনরুদ্ধার হয়; কিন্তু সময় একবার গেলে আর ফেরে না—তা চিরদিনের জন্যেই নষ্ট হয়ে যায়।

সকল পরিবারের মধ্যেই শোনা যায়—"খাবার আর কেবল পাঁচ সাত মিনিট দেরী আছে; এখন আর কিছু করবার সময় নেই।" কিন্তু আমরা অনেকেই যে-সব খণ্ড মুহূর্ত্তগুলি অবহেলায় ফেলে দিই সেইগুলির সদ্ব্যবহার করে' কত দরিদ্র জগতে অক্ষয় অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রেখে গেছেন। যে-সময় আমরা নষ্ট করেছি তা যদি কাজে লাগাতুম তাহলে আমরাও ব্যর্থ হতুম না।

অ্যাণ্ডোভারের ছাত্রনিবাসে ছেলেরা যখন প্রাতরাশের

পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পরস্পরের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে' কাটিয়ে দিত, জোসেফ তখন ঘরের কোণে গিয়ে প্রকাণ্ড অভিধানখানি উল্টে পাল্টে কথার অর্থ ও উৎপত্তি শিক্ষা করতো। আহারের আধ মিনিট বিলম্ব থাকলেও সে অন্যথা করতো না। জোসেফ কুক অভিধানখানা গিলেছেন একথা বলে' অনেকে বিদ্রূপ করে' থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের যুগে স্বচেষ্টায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর মত জ্ঞানী খুব অল্প।

ছেলেরা যখন শুয়েছে এবং যখনই এক মিনিট সময় পেয়েছেন তখনই সেগুলি কাজে লাগিয়ে মেরিঅন হারল্যাণ্ড তাঁর উপন্যাস এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। সারাজীবনে তিনি এত বাধা পেয়েছেন যে খুব অল্প লোকই সেরূপ বাধা অতিক্রম করে' সংসারের শতকর্ম্মের মধ্যে তাঁর মত কাজ করতে পারতেন। তিনি সাধারণকে অসাধারণত্বে মণ্ডিত করেছেন—যা খুব অল্পসংখ্যক নারীর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। হ্যারিএট. বীচার ষ্টো সাংসারিক নানা জরুরী কাজের মধ্যেই তাঁর অপূর্ব্ব পুস্তক "টমকাকার কুটীর" রচনা করেন। কফি সিদ্ধ হতে যত সময় লাগে, প্রতিদিন সেই দশ মিনিট সময় লিখে লিখে বহু বৎসরে লংফেলো "ইনফার্নো" অনুবাদ করেন। হিউ মিলার পাথরের মিস্ত্রীর হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যেও সময় করে' নিয়ে বৈজ্ঞানিক পুস্তক অধ্যয়ন করতেন। ফ্রান্সের ভাবীরাণীর সঙ্গিনীরূপে অবস্থানকালে মাদাম দ্য জাঁলিস অনেকগুলি চমৎকার পুস্তক রচনা করেন—রাজকুমারীর দৈনিক পাঠ বলে' দেবার জন্যে অপেক্ষা করবার অবসরে। বার্নস্ তাঁর অনেকগুলি মনোহর কবিতা রচনা করেন এক গোলাবাড়ীতে কাজ করবার সময়। "প্যারাডাইস লষ্ট"-এর কবি ব্যস্ত কর্ম্মজীবনের মধ্যে দুচার মিনিট ফাঁক পেলেই কবিতা রচনা করতেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ লেখা রচিত হয় তিনি যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে কেরাণীর কাজে নিযুক্ত। গ্যালিলিও ছিলেন অস্ত্র-চিকিৎসক; কিন্তু তাঁর অবসরকালের সদ্ব্যবহারের কল্যাণে জগৎ কত মহা আবিষ্কার লাভ করেছে! গ্ল্যাডষ্টোনের মত পণ্ডিত যদি সারাজীবন পকেটে একখানি ছোট কেতাব নিয়ে ঘোরেন পাছে কোনো অপ্রত্যাশিত অবসরমুহূর্ত্ত নষ্ট হয়ে যায়, তবে মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলিকে ব্যর্থতার অন্ধকার থেকে রক্ষা করবার জন্যে অল্পবুদ্ধি আমাদের কী-না করা উচিত? দান্তের সময়ে ইটালির প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই ব্যস্ত ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, রাষ্ট্রনীতিবিৎ, বিচারক বা সৈনিক ছিলেন। মাইকেল ফ্যারাডে দপ্তরির কাজ করতেন এবং অবসর পেলেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতেন। এক সময়ে কোনো বন্ধুকে তিনি লেখেন—"আমি চাই কেবল সময়। আমাদের বড়মানুষদের অবসর-ঘণ্টা বা দিনগুলি যদি সস্তাদরে কিনতে পারতুম!" আলেকজাণ্ডার ফন হামবল্ড দিবাভাগে ব্যবসায়কর্ম্মে এত ব্যস্ত থাকতেন যে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হত রাত্রে বা ভোরে, যখন আর-সকলে নিদ্রায় অচেতন।

প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় বাঁচিয়ে তার সদ্ব্যবহার করলে একজন অতি সাধারণ লোকও একটা কোনো বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারে। প্রতিদিন এক ঘণ্টা সময় খেটে একজন মূর্খ অশিক্ষিতও দশ বৎসরে একজন শিক্ষিত লোক হয়ে উঠতে পারে। দিনে এক ঘণ্টায় একটি ছেলে বা মেয়ে বিশ পাতা খুব মনোযোগের সহিত পড়তে পারে—তার মানে বৎসরে সাত হাজার পাতা বা আঠারখানি বড়-বড় বই পড়ে শেষ করতে পারে। প্রতিদিন এক এক ঘণ্টার সদ্ব্যবহারে মানুষ অনাহারের অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে পারে। দিন-এক-ঘণ্টা কত অখ্যাত লোককে বিখ্যাত করেছে, কত অপদার্থকে সমাজের একজন হিতকারী কর্ম্মী করে তুলেছে। দিন-এক-ঘণ্টায় এ যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে দিন দুই চার বা ছ' ঘণ্টা সময়—যে-সময় গড়ে আমরা প্রত্যেকে নষ্ট করে' থাকি—তা দিয়ে কত কাজ হ'ত!

প্রত্যেক অল্পবয়সীর এমন একটি কাজে আসক্তি থাকা দরকার অবসর-সময়ে যে-কাজে সে আপনাকে সানন্দে নিযুক্ত রাখতে পারবে। সে-কাজ তার প্রতিদিনের অর্থকরী কাজের সমজাতীয় না হলেও কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তার মন সে-কাজে থাকা চাই-ই।

অন্যে যে-সব টুকরো-টাকরা সময় ছুড়ে ফেলে দ্যায়, সেগুলিকে সংগ্রহ করে' তারই মধ্যে অনেকে শিক্ষা লাভ

করতে পারে; যেমন তুচ্ছ ব্যয়সংক্ষেপের দ্বারা একজন সম্পত্তি রেখে যায়, যে-ব্যয়সংক্ষেপ অন্য একজনের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে দিনে একঘণ্টা সময়ও বাঁচাতে পারে না? ভেরমণ্টের বিখ্যাত মুচি চার্লস ফ্রস্ট প্রতিজ্ঞা করলেন প্রতিদিন একঘণ্টা সময় পড়াশুনায় খরচ করবেন। তিনি আমেরিকার একজন বিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ হয়েছিলেন। অন্যান্য বিষয়েও প্রভূত জ্ঞানলাভ করে' যশস্বী হয়েছিলেন। জন হাণ্টার নেপোলিয়ানের ন্যায় কেবল চার ঘণ্টা ঘুমোতেন। তিনি তুলনামূলক শরীরতত্ত্বের চব্বিশ হাজারের বেশী যে-সকল নমুনা সংগ্রহ করে' রেখে গিয়েছিলেন সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করতে অধ্যাপক ওেন দশবৎসর কাল কাটান। সেই জন হাণ্টার ছুতারের কাজ করতে করতে পড়াশুনা আরম্ভ করেন।

ব্যাক্সটারের কাছে একবার কয়েকজন আগন্তুক আসেন। তাঁরা বল্লেন—"আমরা বোধ হয় আপনার সময় নষ্ট করচি।" ব্যাক্স্‌টার বল্লেন—"নিশ্চয়ই।" কৃপণ যেমন করে' অর্থ সঞ্চয় করে তিনি তেমনি আগ্রহে প্রতি মুহূর্ত্ত সঞ্চয় করতেন।

মিলটন বলতেন—"আমার সকাল কাটে, যেখানে সকাল কাটা উচিত,—অর্থাৎ বাড়ীতে। ঘুমিয়ে নয় বা গতরাত্রের অতিভোজনের চিন্তায় নয়, জাগ্রত অবস্থায় সকাল কাটে কর্ম্মের মধ্যে। শীতের সময় ঘড়ির শব্দ লোককে দিনের কাজে অথবা পূজার জন্যে আহ্বান করবার আগেই আর গ্রীষ্মে পাখীর প্রথম কাকলীর সঙ্গে-সঙ্গেই উঠি; উঠে ভালো বই পড়ি বা কাউকে দিয়ে পড়াই যতক্ষণ না মন ক্লান্ত হয় এবং ধারণা-শক্তি তার পুরো খোরাক পায়। তারপর প্রয়োজনীয় কোনো কায়িক পরিশ্রম করি যাতে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে।"

—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেক ব্যক্তি তাঁদের দৈনিক পেশার বহির্ভূত ব্যাপারে যশ অর্জ্জন করেছিলেন অবসর-মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহারের দ্বারা। স্পেনসার অবসর-সময়েই নাম কিনেছিলেন, যখন তিনি আয়র্লণ্ডের লর্ড ডেপুটির সেক্রেটারিরূপে অধিষ্ঠিত। স্যর জন লাবক ব্যাঙ্কের ব্যস্ত জীবনের মধ্যে যেটুকু অবসর পেতেন তার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক গবেষণা করে' যশস্বী হয়েছিলেন। সাদে এক মিনিট সময়ও প্রায়ই নষ্ট করতেন না, তিনি একশো বই লিখে গেছেন। হথর্নের নোটবুকে দেখা যায় তিনি কখনো সামান্য চিন্তা বা ঘটনাকেও তুচ্ছ করেননি। ফ্রাঙ্কলিন অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি আহার এবং নিদ্রার সময় যথাসাধ্য অল্প পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ করে' বাকী সময় অধ্যয়নে ক্ষেপণ করতেন। শিশুকালে তাঁর পিতা যখন আহারের টেবিলে ভগবানের কাছে দীর্ঘ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতেন তখন তিনি অধীর হয়ে উঠতেন, পিতাকে বলতেন তিনি কোনো উপায়ে সেটি সংক্ষেপ করতে পারেন না কি! তাঁর অনেক ভালো বই তিনি জাহাজের ওপর রচনা করেছেন। যারা ব্যর্থ জীবনের কৈফিয়ৎস্বরূপে বলে "সময় পাইনি" তারা র‍্যাফেলের স্বল্পপরিসর কীর্ত্তিপূর্ণ সাঁয়ত্রিশবর্ষব্যাপী জীবন অধ্যয়ন করুক।

মহাপুরুষেরা সকলেই সময় সম্বন্ধে কৃপণ ছিলেন। সিসিরো বলতেন—"অন্যে যে-সময় আমোদ-আহ্লাদে বা মানসিক এবং শারীরিক বিশ্রামে খরচ করে আমি তা দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়নে দিই।" লর্ড বেকনের যশ ইংলণ্ডের চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত থাকার সময়ে অবসরকালের কীর্ত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। শোনা যায় এক নৃপতির সহিত বাক্যালাপের সময় জার্ম্মেনির কবিকুলগুরু গ্যয়টে সহসা ক্ষমা প্রার্থনা করে' পাশের ঘরে চলে' গিয়ে "ফাউষ্ট"-এর জন্যে একটা চিন্তা লিখে রাখেন পাছে পরে তা ভুলে যান। সার হামফ্রি ডেভি নাম কিনলেন এক ঔষধের দোকানের জানালার ধারে অবকাশ-মুহূর্ত্তগুলি কাজে লাগিয়ে। কর্ম্মব্যস্ত দিনের মাঝে যে-সব চিন্তা মনে উদয় হোত, সেগুলি লেখবার জন্যে পোপ প্রায়ই রাত্রে শয্যাত্যাগ করে' কাজে বসতেন। জর্জ ষ্টিফেনসন এমন আগ্রহের সহিত মুহূর্ত্তগুলি আঁকড়ে ধরতেন যেন সেগুলি সোনার টুকরো। তিনি অবকাশকালেই আপনাকে শিক্ষিত করেছিলেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছিলেন। এঞ্জিনীয়ারের কাজ করবার সময় রাত্রে লোক বদলির অবকাশে তিনি পাটীগণিত শিক্ষা করেন। মজার্ট বৃথা এক মুহূর্ত্তও ক্ষেপণ করতেন না। কখনো কখনো তিনি একাদিক্রমে দুই রাত্রি,

এবং একদিন ধরে' রচনা করতে থাকতেন—নিদ্রার জন্যেও কাজ থামাতে চাইতেন না। মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর বিখ্যাত "মৃতের স্তুতিগান" রচনা করেন!

সীজার বলতেন—"ভীষণ যুদ্ধের সময়েও শিবির-মধ্যে আমি অন্য অনেক বিষয় ভাববার অবসর পেয়েছি।" একবার জাহাজ-ডুবি হওয়ায় সাঁতার দিয়ে তিনি তীরে অবতীর্ণ হন। সঙ্গে তাঁর ছিল Commentaries-এর পাণ্ডুলিপি। জাহাজ যখন ডোবে তখন তিনি রচনায় নিযুক্ত ছিলেন।

সামুএল বাজেট যেন কর্ম্ম করতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনীকার বলেন—"কাজ কাজ, তিনি কেবলই কাজ করতেন। প্রকৃতি যেমন শূন্যতাকে পরিহার করে তিনিও তেমনি আলস্যকে ঘৃণা করতেন। কর্ম্মহীন এক ঘণ্টা সময় তাঁর পক্ষে নরকতুল্য ছিল।" রবিবার সম্বন্ধে বাজেট লিখেছেন—"নিরানন্দ ও কষ্টকর বিশ্রাম। তা তো হবেই, কারণ আমি সেদিন সাড়ে পাঁচটার আগে উঠতুমই না!"

ডাক্তার মেসন গুড অশ্বপৃষ্ঠে লণ্ডন শহরে রোগী দেখতে যাবার সময় "লুক্রেসিয়াস" অনুবাদ করেন। ডাক্তার ডারুইন তাঁর অধিকাংশ রচনা যেখানে-সেখানে টুকরো কাগজের ওপর লিপিবদ্ধ করতেন। ওাট রসায়ন ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন অঙ্কশাস্ত্রের যন্ত্র তৈরি করার ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকার সময়। যে-উকীলের আপিসে অধ্যয়ন করতেন সেখানে যাতায়াতের অবসরে হেনরি কার্ক হোআইট গ্রীক ভাষা শেখেন। ডাক্তার বার্নি অশ্বপৃষ্ঠে ইতালীয় ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। বিচারকের কাজে সফরে ভ্রমণকালে ম্যাথু হেল তাঁর "কনটেমপ্লেশন্‌স্" রচনা করেন।

বর্ত্তমান হ'ল সেই কাঁচা মাল যার দ্বারা আমরা যা-ইচ্ছা তাই গড়তে পারি। গত নিয়ে অনুশোচনা কোরোনা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার প্রয়োজন নেই; বর্ত্তমানকে আলিঙ্গন কর, যা তোমার হাতের কাছে যা তোমার চারিদিকে তা-ই থেকে শিক্ষা নাও। এক ঘণ্টার যথার্থ মূল্য সম্পূর্ণভাবে নিরূপণ করতে পারে এমন লোক বিরল। এক জ্ঞানীর উক্তি—বিধাতা এক সময়ে একটিমাত্র মুহূর্ত্ত পাঠান, এবং দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত পাঠান না যতক্ষণ না প্রথমটি প্রত্যাহার করেন।

মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে এক সপ্তাহ সন্ধ্যায় কাজ করে জনসন "রাসেলাস" রচনা করেন। জ্ঞানী কেটো বলতেন যে জীবনে তিনি তিনটি কাজের জন্যে অনুতপ্ত—পত্নীকে একটি গোপনীয় কথা বলা, স্থলপথে যাওয়া সম্ভব হলেও একদা জলপথে ভ্রমণ, এবং একটি দিন কোনো কাজ না করে' কাটানো।

জমি জরিপ করার অবসরে লিংকন আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। শ্রীমতী সমারভিল উদ্ভিদবিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন যখন তাঁর প্রতিবেশিনীরা ব্যস্ত থাকতেন গল্পগুজবে। আশি বৎসর বয়সে তিনি তাঁর "Molecular and Microscopical Science" রচনা করেন।

মুহূর্ত্তটি নষ্ট হলে বা অবজ্ঞাত হলে সময় নষ্টের জন্যে ততটা ক্ষতি নয় যতটা শক্তিনাশের জন্যে। আলস্য আমাদের স্নায়ুর ওপর মর্চে পড়ায়, আমাদের শরীরের পেশীকে শিথিল করে। কাজে শৃঙ্খলা আছে, আলস্যে তা নেই।

ভালো কাজ অবসরের প্রত্যাশায় ফেলে রেখো না। যে-সব নরনারী কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন, দেখতে পাই তাঁরাই হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করান, অনাথনিবাস প্রতিষ্ঠা করেন, ইস্কুল কলেজ স্থাপনা করেন, নানা লোকহিতকর অনুষ্ঠানের অগ্রণী হন।

সময়ই অর্থ। অর্থ আমরা যেমন ভালোবাসি, অবহেলায় ছুড়ে ফেলে দিতে পারিনা, সময়ের ওপরও তেমনি দরদ থাকা আবশ্যক। সময় নষ্ট মানে সামর্থ্য নষ্ট, শক্তি নষ্ট; এবং ব্যভিচারে চরিত্রনাশ। সময় নষ্ট মানে সুযোগ নষ্ট—যে-সুযোগ আর কখনো ফিরবে না। সময় নষ্ট কোরো না, শ্রদ্ধার সহিত তার সদ্ব্যবহার কর, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ ওরই মধ্যে নিহিত।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চীনের তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব

(১৯১৫-১৬)

(১) "আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন!"

বিগত ৫ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যাকালে "ইণ্টার্ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের" বক্তৃতা-গৃহে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে পরিচালক রীড্ সাহেব বলিলেন—"মহাশয়, আজ এ পাড়ায় এক বাড়িতে বিবাহের ধুম। বাহিরের আওয়াজ ঘরের ভিতর বড় বেশী প্রবেশ করিতেছে। কিছু জোরে চেঁচাইয়া কথাবার্ত্তা বলিতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এই যে বাজি পোড়াইবার শব্দ শুনিতেছি উহা কি এই বিবাহ উপলক্ষ্যে না কি?" ইনি বলিলেন—"হাঁ, আপনাদের দেশেও বিবাহোৎসবে এইরূপ 'বাজি-বাজনার ব্যবস্থা আছে বুঝি!" বক্তৃতাদি হইয়া গেল। ডাক্তার উ-টিংফ্যাঙ্ সভাপতি ছিলেন। রাত্রি হইয়া আসিল।

খানিক ক্ষণ পরে রীড্-পত্নী আসিয়া বলিতে লাগিলেন—"ডাক্তার উ, মহা বিপদ। আবার বুঝি ১৯১৩ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত!" রীড্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, কি হইয়াছে?" পত্নী বলিলেন—"শুনিতে পাইতেছেন না—কামান দাগার আওয়াজ?" উ হাসিয়া বলিলেন—"মেয়েমানুষ মাত্রেই ভীরু। ভুঁই-পট্‌কা, হাওয়াই, আতসবাজির আওয়াজ শুনিয়াই আপনি কামান-দাগার ঘটা দেখিতেছেন! পাশের বাড়ীতে যে বিয়ের সমারোহ?" রীড্-পত্নী বলিলেন—"ভুঁইপট্‌কার আওয়াজ, বোমার আওয়াজ আর কামানের আওয়াজ তফাৎ করিবার মত কাণ্ডজ্ঞান আমার আছে। ওই শুনুন 'ব্‌বুম'! ওই শুনুন "ব্‌বুম"! ইহা কি ছেলেদের হাতের ভুঁইপট্‌কা?" রীড্ এবং উ আলোচনা করিতে লাগিলেন—"তাই ত, এখন শাংহাইয়ে কামান দাগাদাগি কি জন্য? কাহার উপর আক্রমণ? কোথা হইতে আক্রমণ?" রীড্-পত্নী বলিতে লাগিলেন—"আমি যখন এই গৃহে আসিতেছিলাম—তখন মনে হইল যেন আমার মাথার উপর দিয়া হুস্ করিয়া একটা কি চলিয়া গেল?" রীড্ এবং উ বলাবলি করিতে লাগিলেন—"বিদেশী মহাল্লার উপর আক্রমণ হইবে কেন? বোধ হয় নদী হইতে কেল্লার দিকে তোপ ছাড়া হইতেছে—কিন্তু কেল্লাই বা আক্রমণ করিবে কে? শুনিতেছি কয়েক দিন হইল একখানা সশস্ত্র চীনা রণতরী শাংহাইয়ের ঘাটে আসিয়াছে তাহার কাপ্তেন ও লস্করেরা ত সকলেই য়ুয়ান্-পন্থীর। তাহারা কি হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল?" রীড্-পত্নী বলিলেন—"বোধ হয় তাই। জাহাজের লোকেরা য়ুয়ানের দল ছাড়িয়া বোধ হয় বিপ্লব সুরু করিল। এই জন্য কেল্লাটাকে আগে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত। এই কেল্লায় আজকাল য়ুয়ানের অনেক সৈন্য আছে। তাহা ছাড়া গোলা বারুদ রসদ ইত্যাদি অনেক সংগৃহীত হইয়াছে।" রীড্ বলিলেন—"অসম্ভব নয়। শাংহাইয়ের বিপ্লবপন্থীরা খুব সম্ভব জাহাজের কাপ্তেনকে হাত করিয়াছে। শাংহাইয়ে আজকাল নাকি হাজার হাজার বিপ্লবপন্থী আসিয়া জুটিয়াছে।" কোন কোন কাগজে প্রকাশ যে, বিদেশী মহাল্লার প্রত্যেক বাড়ীতেই নাকি য়ুয়ানের বিপক্ষীয় সান্-পন্থী একজন করিয়া চীনা আশ্রয় লইয়াছে!"

নানা-প্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। ভৃত্য আসিয়া জানাইল উ মহাশয়ের ভবন হইতে মটরকারে সংবাদ আসিয়াছে। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে শীঘ্রই ঘরে ফিরিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছেন। বৃদ্ধ বিশেষ চিন্তিতভাবে গিয়া মোটরে বসিলেন। বৃদ্ধা রীড্-পত্নী ততোধিক বৃদ্ধা উ পত্নীর কথা পাড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—"আহা, বুড়ীর বৃদ্ধ বয়সে বড় কষ্ট। একদিনও মনে শান্তি নাই। সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন?" রীড্ বলিতে লাগিলেন—"ডাক্তার উ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছেন। য়ুয়ান্ উকে বহুবার সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। উ কোনমতেই য়ুয়ানের আধিপত্যে পদগ্রহণ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এই সেদিন পিকিঙে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হইল। য়ুয়ান এত সাধাসাধি করিলেন তথাপি উ প্রদর্শনীর পরীক্ষকমাত্রও হইতে রাজি হইলেন না। এদিকে সানের চরমপন্থিতাও উ পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ বয়স বাড়িয়াছে—গণ্ডগোলের ভিতর না যাওয়াই ইচ্ছা। কিন্তু সানের দল উকে সহজে ছাড়িবে না। মাথাগরম ছোক্‌রারা উকে কয়েকবার ভয়ও দেখাইয়াছে। তাহারা বলে—"খোলাখুলি আমাদের দলে থাকিতে ইচ্ছা না করেন,

য়ুয়ানের দলে যাইতে পারিবেন না। একবার যখন আমাদের দলে ছিলেন তখন শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দিকেই সহানুভূতি দেখাইতে হইবে।" অধিকন্তু উ পয়সাওয়ালা লোক, কাজেই সান্‌পন্থীরা উর তহবিল হইতে বিপ্লবের জন্য অর্থ-সাহায্য আশা করে।"

রীড্‌-পত্নী আবার বলিলেন—"চীনে নামজাদা বড়লোকদের বড় বিপদ। কোন এক দলের পক্ষগ্রহণ করিলেই অপর দলের হাতে মৃত্যু একপ্রকার সুনিশ্চিত। বৃদ্ধ উ মহাশয়ের যখন-তখন প্রাণসংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এ যাত্রায় বিপ্লব যদি সত্যসত্যই সুরু হয় তাহা হইলে হয় য়ুয়ানের দল, না হয় সানের দল উকে সর্ব্বদা প্রাণভয়ে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিবে। বুড়া উ সেদিন আমার নিকট অনেক দুঃখের কথা বলিতেছিলেন। আজকাল আবার সহরের ভিতরে চীনাদের বড় বড় দোকান লুটপাট ও ডাকাইতি সুরু হইয়াছে। উর ঘরে কখন্ ডাকাইতি হয় বলা যায় না। কাজেই ধনে প্রাণে সারা হইবার ভয়ে উ-পরিবার বিশেষ বিব্রত।"

হোটেলে আসিয়া শুইয়া পড়া গেল। ভাবিলাম—মজা মন্দ নয়। বিলাত হইতে যেদিন বেলজিয়াম রওনা হইবার কথা সেই দিন ইয়োরোপে রণভেরী প্রথম বাজিয়াছিল। আর একদিন দেরি হইলেই হয় ত বেলজিয়ামে কামান দাগা শুনিতাম। ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই। শেষ পর্য্যন্ত চীনে আসিয়া কামানগর্জ্জন শুনিতে হইল। কলিকাতায় রাজারাজড়ারা পদার্পণ করিলে কেল্লা হইতে তোপ পড়ে। তাহা ছাড়া কামানের আওয়াজ জীবনে আর ত কখনও শুনি নাই। লড়াইয়ের সত্যিকার কামান দাগা শাংহাইয়ে প্রথম শুনিলাম। ভেতো বাঙ্গালীর কানেও শুনাইতেছে মন্দ নয়। ববুম্, ববুম্, ববুম্—এইরূপ আওয়াজ দশবিশ মিনিট পর পর হইতে লাগিল। ঘুমাইয়া পড়িলাম—রাত্রিকালে বোধ হয় দুএকটা আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল—ভোরেও ঘুম ভাঙ্গিবার সময়ে কামান-গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া গেল। সকাল বেলা আর কোন আওয়াজ নাই। বাহির হইয়া দেখি—সমস্ত রাত্রি কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, এখনও চারিদিক ঝাপসা। কলিকাতায়ও শীতকালে অনেক দিন এইরূপ দেখা যায়।

কাগজ আসিল—বুঝিলাম বিপ্লবই বটে। সত্যিকার কামান, সত্যিকার আক্রমণ। কিন্তু চূড়ান্ত বেকুবি—নিষ্ফল প্রয়াস—অনেকটা ঠিক যেন "ঢাল নাই, তরওয়াল নাই, শান্তিরাম সিং"এর অভিনয়!

জাহাজের অধিকাংশ কর্ম্মচারিগণ সহরে এক ভোজে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে কাপ্তেন লস্করের সংখ্যা বেশী ছিল না। একখানা ছোট ষ্টীমলাঞ্চে চড়িয়া ত্রিশজন পাশ্চাত্যবেশী চীনা যুবক রণতরীতে উপস্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি নৌ-বিদ্যালয়ের ছাত্র। কয়েক জনের সঙ্গে জাহাজের কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর আলাপ ছিল। তাঁহারা যুবকগণকে জাহাজের বিভিন্ন বিভাগ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রিভলভার বাহির করিয়া যুবকেরা গোলন্দাজদিগকে বলিল—"বারুদখানার চাবি কোথায়? কামান দাগিতে হইবে ...শীঘ্র চাবি দাও। নচেৎ হস্তব্যোহসি ময়া ইত্যাদি।" বেগতিক বুঝিয়া গোলন্দাজ ছোট ছোট কামানে ব্যবহারোপযোগী বারুদ ও তোপ বাহির করিয়া দিল। কয়েক জন চতুর লস্কর বড় বড় কামানের তোপগুলি জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল। যুবকগণ কেহই কখন কামান দেখে নাই, কামান দাগা কাহাকে বলে তাহাও জানে না। বারুদ তোপ তাহাদের সম্মুখে আনা হইল। আবার গর্জ্জন করিয়া ছোকরারা হুকুম করিল—"দাগো কামান।" গোলন্দাজেরা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায়? কাহার উপর?" শান্তিরামেরা বলিল "আবার কিসের উপর? ঐ কেল্লা ও বারুদ-ফ্যাক্টরির উপর।" প্রাণের ভয়ে গোলন্দাজেরা হুকুম মানিতে বাধ্য হইল। রাত্রির মধ্যে সর্ব্বসমেত পঁচাশিটা তিন ইঞ্চি তোপ ছাড়া হইয়াছিল। একটাও কেল্লায় অথবা বারুদখানায় অথবা কোন অট্টালিকার উপর পড়ে নাই। গোলন্দাজেরা চতুর—তাহারা সতর্ক ভাবে নিশানা ঠিক করিয়াছিল। শাংহাইয়ের স্বদেশী বিদেশী কোন মহাল্লারই অনিষ্ট হইতে পারিল না। ছোকরারা মহা খুসী—কেল্লা ত আক্রমণ করা হইতেছে আর কি চাই? কেল্লার উপর গুলি গোলা পড়িতেছে কি না অতটা বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের কাহারও ছিল না।

ভোর হইতে না-হইতে কুয়াশা ভেদ করিয়া যুয়ানপক্ষীয় নিকটবর্ত্তী এক জাহাজের লোকেরা এই জাহাজের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। জাহাজটা কিছু জখম হইতেছে দেখিয়া যুবকগণ যে যেদিকে পারিল নৌকা করিয়া পলায়ন করিল। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—তাহাদিগকে পাকড়াও করিবার চেষ্টায় কোন ফল হইল না।

সেই রাত্রেই স্থলপথে কেল্লা আক্রমণ করিবার আয়োজনও নাকি করা হইয়াছিল। শাংহাইয়ের স্বদেশী মহাল্লার স্থানে স্থানে বিপ্লববাদী সান্-পন্থীরা রিভলভার ও বোমা হাতে সুযোগ খুঁজিতেছিল। দুএকটা থানাও আক্রমণের কথা ছিল। মোটের উপর সবই ফাঁসিয়া গেল। দুই তিন দিন ধরিয়া এখানে ওখানে দুএকটা মারপিট, ধর পাকড়াওয়ের হাঙ্গামা চলিল। বিদেশীয়েরা কানাঘুষা হাসাহাসি করিতে থাকিল। কেবল প্রেসিডেণ্ট যুয়ান্ দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। যুয়ানপক্ষীয়েরা ভাবিতে লাগিল—"তবে কি নির্ব্বিবাদে যুয়ান্‌কে রাজতক্ত প্রদান করা সম্ভবপর হইবে না? ছেলে-ছোক্‌রা ত এ যাত্রায় বেকুবি করিল। কিন্তু এই বেকুবির পশ্চাতে কতখানি বুদ্ধি কর্ম্ম পাণ্ডিত্য ও টাকার জোর আছে তাহা ত আন্দাজ করিতে পারিতেছি না!"

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে শাংহাইয়ের সামরিক শান্তি-রক্ষক দুই যুবকের হাতে মারা পড়েন। ইনি চীনের একজন পাকা নাবধ্যক্ষ ছিলেন। লোকের অনুমান, ইনি যুয়ান্‌পক্ষীয়দিগের প্রধান পাণ্ডা বলিয়া নিহত হইয়াছেন।

ইতিমধ্যে কয়েকজন সান্‌পক্ষীয় লোক ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের সঙ্গে রিভলভার বন্দুকও পাওয়া গিয়াছে। সকলগুলিই জাপানী-মার্কা। জাপানী ব্যবসাদারেরা পয়সা পাইলে দুনিয়ার যে-কোন বিপ্লবপন্থীকে নাকি গোলাগুলি বন্দুক বারুদ ইত্যাদি বেচিয়া থাকেন। ইংরেজ পত্রিকা-সম্পাদকগণ এইরূপ বে-আইনি ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। জাপানীরা বড় অর্থ-পিশাচ এবং নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে বলিয়া অখ্যাতি রটিতেছে।

(১২) প্রেসিডেণ্ট যুয়ান ও বিশ্বশক্তি

হবু-রাজা। যুয়ান্-শী কাইয়ের তর সহিল না। ১২ ডিসেম্বারের যুয়ান্-পক্ষীয় পিকিঙের সংবাদপত্রগুলি লাল কাগজে ছাপা হইল। পিকিঙ্ সহরটা নব্য রাজকীয় পতাকায় সুশোভিত হইল। ঢাক ঢোল সহকারে প্রচার "অযোধ্যায় রাম রাজা হবেন! অযোধ্যায় রাম রাজা হবেন!" যুয়ান্‌কে দেশের লোকেরা জবরদস্তি করিয়া রাজসিংহাসন দিতেছে। মাঞ্চু, তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, চীনা, মুসলমান, কন্‌ফিউশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ব্যবসায়ী, সকল শ্রেণীর লোকেরই নাকি ইহাই হৃদয়ের ইচ্ছা। যথারীতি ভোটও গণনা করা হইয়াছিল—একটা ভোটও যুয়ানের বিরুদ্ধে ছিল না। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জননায়কগণ সমগ্র দেশের পক্ষ হইতে যুয়ানের দরবারে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে যুয়ানের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—"চীনের চল্লিশ কোটি নরনারী সমবেত হইয়া আপনার ভগবচ্চিহ্নিত শ্রীমস্তকে রাজমুকুট দেখিতে অভিলাষী। এই কয়মাস ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত্ত আপনার সন্তানস্বরূপ চীনের আবালবৃদ্ধবনিতা হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছে।" যুয়ান্ কিছু রুক্ষভাবে জবাব দিলেন—"আমাকে আপনারা বিরক্ত করিয়া মারিলেন। আমাকে শান্তিতে তিষ্ঠিতে দিবেন না দেখিতেছি। যদি দেশের লোক রাজাই চাহেন তাহা হইলে অপর কোন ব্যক্তিকে রাজমুকুট প্রদান করুন। আমি সম্রাট হইতে অসমর্থ।" সেই দিনই চীনা ধুরন্ধরেরা আবার এক সভা আহ্বান করিলেন। আবার স্থির হইল যুয়ানকেই সম্রাট করিতে হইবে। আবার তাঁহারা করযোড়ে যুয়ান্‌কে দেশবাসীর ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। সেইদিনই যুয়ান্ মহা বিব্রতভাবে উত্তর দিলেন—"নেহাৎই আপনারা আমাকে তবে রাজা করিবেন। অগত্যা বাধ্য হইয়া দেশের লোককে খুসী করিলাম।" শ্রীমুখ হইতে এই বচন বাহির হইবামাত্র পিকিঙ্ উল্লাসে মত্ত হইল। তাহার পর ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই তারিখ চীনের সর্ব্বত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাকিল। যুয়ানের দল পিকিঙেই বেশী, কাজেই পিকিঙে উৎসবের মাত্রা বেশী। অন্যান্য সহরে অতি সামান্যমাত্র আয়োজন। সরকারী আপিস আদালত ছাড়া, আর কোন বাড়ীঘরে

আমোদপ্রমোদ পতাকার ধুম দেখা গেল না। শাংহাইয়ের স্বদেশী মহল্লায়ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিন বিশেষ কিছু বুঝা গেল না। লাল কাগজে কোন সংবাদপত্র পিকিঙ্ ছাড়া বোধ হয় আর কোথাও ছাপা হয় নাই। সর্ব্বত্রই একমাত্র সরকারী কর্ম্মচারীরা "হরির লুট" নিজে ছিটাইয়া নিজেই খাইলেন। পাড়ার লোক সে হরির লুটে যোগ দিল না। ১৫ই ডিসেম্বার তারিখে য়ুয়ান্ কাগজে কলমে রাজা হইলেন—চীনা স্বরাজকে কাগজে কলমে কবর দেওয়া হইল। নবীন সাম্রাজ্যের প্রথম বর্ষের প্রথম দিন ১৫ই ডিসেম্বার—কিন্তু রাজ্যাভিষেক-যজ্ঞ পাঁজি-পুঁথির তিথি নক্ষত্র অনুসারে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

এই দিনই জাপান-সরকার য়ুয়ানকে এক উপদেশ-পত্র পাঠাইলেন। এই উপদেশে ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও ইতালীয় গবর্মেণ্টও জাপানের পশ্চাতে ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"য়ুয়ান্, কাজটা তাড়াহুড়া করিয়া সারিওনা। আরও কিছু অপেক্ষা কর। দেশের লোকের মতিগতি কোন্ দিকে সতর্কতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা কর। আমাদের বিশ্বাস তুমি রাজসিংহাসন গ্রহণ করিলে চীনের ভিতর বড় রকমের একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে বুঝিতেছ—চীনের বাণিজ্য-সম্পদ নষ্ট হইতে থাকিবে—আর ঘটনা-চক্রে হয়ত আমরা ও আমাদের লোকজন টাকা পয়সা শিল্প ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য লাঠিসোঁটা লইয়া চীনের ভিতর হাজির হইব। বুঝিলে, কাঁচা কাজ করিও না। আমাদের বিশ্বাস তুমি তোমার বিপক্ষীয়গণের ওজন বুঝিতে পার নাই।" ঠিক এই ধরণেরই উপদেশ এই পাঁচ রাষ্ট্র প্রায় দেড় মাস পূর্ব্বেও একবার দিয়াছিলেন। এই উপদেশপ্রদান-কাণ্ডে কর্ত্তা ছিলেন জাপান—অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ জাপানী চীন-মন্ত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে য়ুয়ান-দরবারে উপস্থিত ছিলেন মাত্র। জাপানের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া ইংরেজ পত্রিকা-সম্পাদকগণ বিরক্ত—আর ইংরেজ মন্ত্রী জাপানী মন্ত্রীর এক-প্রকার হুকুম অনুসারে কর্ম্ম করিতেছেন দেখিয়া চীনের ইংরেজ-সমাজ নতশির। কি করা যায়?—ইয়োরোপে এখন মহা কুরুক্ষেত্র। জাপানকে হাতে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে এখনই এসিয়ায় একটা হুলস্থূল বাধিতে পারে। যাহা হউক, য়ুয়ান্, রাষ্ট্র-দূতগণকে সংক্ষেপে বলিলেন—"দেশের মধ্যে কোনপ্রকার অশান্তির কারণ নাই। বিপ্লববাদীরা গণ্ডগোল সুরু করিলেও আমরা নিজশক্তিতেই তাহা দমন করিতে পারিব। বিদেশীয় ধন-জনের কোন অনিষ্ট হইবে না। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। বিদেশী রাষ্ট্রের চীনে হস্তক্ষেপ আদৌ আবশ্যক হইবে না। এই-সঙ্গে আশ্বাসও দিতেছি যে, সকল-প্রকার বাধা দুর্য্যোগ বুঝিবার পূর্ব্বে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হইবে না।" য়ুয়ান্ বিদেশীর চোখ-রাঙানিতে কাবু হইলেন না। য়ুয়ানের দৃঢ়তা দেখিয়া বিধাতা-পুরুষ অলক্ষ্যে হাসিলেন।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার লড়াইয়ের দৃশ্য আমরা সেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে অনেক দেখিয়াছি। একটা দৃশ্য য়ুয়ান্-উপলক্ষ্যে মনে পড়িতেছে। রসিকপ্রবর তাঁহার "জুলিয়াস সীজার" নাটকে বিশ্বশক্তি ও মানবের দ্বন্দ্ব অতি স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। সীজার যখন শত্রুহস্তে নিহত হব-হব হইয়াছেন ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মুখে চূড়ান্ত দৃঢ়তা, গাম্ভীর্য্য ও শক্তির কথা বাহির হইতেছে। পর মুহূর্ত্তেই যিনি মারা পড়িবেন তিনি বুক ঠুকিয়া বলিতেছেন—"আমার কার্য্যপ্রণালী অটল, আমি শীঘ্র নড়ি না—আমাকে তোমরা কি fixed as the polar star বলিয়া জাননা?" ১৫ই ডিসেম্বার তারিখে য়ুয়ান্ও সেক্‌স্‌পীয়ারীয় সীজারের মত "আকাশের ধ্রুবতারার ন্যায় স্থিরপ্রতিষ্ঠ।" ভুসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বোধ হয় য়ুয়ান্ নড়িবেন না।

চারি মাস মাত্র গত হইয়াছে। আজ ২১ এপ্রিল গুডফ্রাইডে। কাল কাগজে পড়িতেছিলাম য়ুয়ান্ বিপ্লব-পন্থীদিগকে জানাইয়াছেন—"আমি চীনা-স্বরাজের সভাপতিত্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে, (১) আমার ও আমার পরিবারের জীবন ও ধনসম্পত্তি তোমরা নষ্ট বা বিপর্য্যস্ত করিবে না; এবং (২) এতদিন যাঁহারা আমার স্বপক্ষে রাষ্ট্রকর্ম্ম করিতে-ছিলেন এবং আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাঁহাদিগের জীবনের উপর কোনরূপ আক্রমণ হইবে না। তোমরা এই দুই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেই আমি তোমাদিগের নির্ব্বাচিত সভাপতির হস্তে রাষ্ট্রের ভার সমর্পণ করিব।" আজ

যুয়ান্ সভাপতির পদ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য। মাস খানেক পূর্ব্বেই—২২ মার্চ্চ তারিখে—তিনি সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেক্স্পীয়ার কল্পনায় সীজারের যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন জগতের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা ঘটিল স্বচক্ষে দেখিলাম। ইতিমধ্যে ইয়াংসি ও হোয়াংহো নদী দিয়া অনেক জল বহিয়া গিয়াছে! বিশ্বশক্তি বহুবিধ ও বিপুলা, তাহার পরিমাণ ওজন করা কোন এক ব্যক্তির বা দলের সাধ্য নয়।

(৩) চীনের সি কিয়াঙ-মাতৃক জনপদ।

আলঙ্কারিক ভাষায় বলিলাম 'হোয়াংহো এবং ইয়াংসির জল বহিয়া গিয়াছে। বস্তুত এই দুই নদীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। খাঁটি ভৌগোলিক হিসাবে বলা উচিত যে জল বহিয়া গিয়াছে সি-কিয়াঙের।

বিদেশী রাষ্ট্রের কোন প্রদেশের নাম সাধারণতঃ কোন উচ্চশিক্ষিত লোকও মনে রাখে না। ইংলণ্ডের কাউণ্টিগুলির নাম কয়জন ইয়াঙ্কি জানেন? জার্ম্মানির প্রদেশসমূহই বা কয়জন ইংরেজের জানা আছে? এমন কি নিতান্ত ক্ষুদ্র বা নগণ্য স্বাধীন রাষ্ট্রেরও সংবাদ বেশী লোক রাখে না। বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় লড়াই সুরু হইবার পূর্ব্বে তেজস্বী সার্ভিয়ার নাম পৃথিবীর কয়জনে জানিত? ঘটনাচক্রে সার্ভিয়ার নাম দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

চীন ভারতবর্ষ পারস্য ইত্যাদি দেশের প্রদেশ বা জেলা-সমূহের নামও লোকসমাজে প্রচারিত না হইবারই কথা। ভারতবর্ষের কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগর ছাড়া বোধ হয় অন্য কোনো নাম ভারতের বাহিরে পরিচিত নয়। প্রদেশ হিসাবে একমাত্র বাঙ্গালার নাম স্থানে স্থানে শুনা যায়। বার্ণার্ডি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্গের নামটা জাহির করিয়া দিয়াছেন।

ঘটনাক্রমে চীনেরও একটা প্রদেশ এখন হইতে দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ থাকিবে। তাহার নাম য়ুন্নান্। সভাপতি য়ুয়ান্ ১৩ ডিসেম্বর (১৯১৫) তারিখে, সম্রাট-পদ গ্রহণ করিতে রাজি হন। তাহার দশ দিন পরে য়ুন্-নান্ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা য়ুয়ান্কে তারে জানাইলেন—"য়ুয়ান্, আজ হইতে আমার প্রদেশ তোমার এলাকার বাহিরে জানিয়া রাখ। তোমার সাম্রাজ্যের একতিয়ার আমাদের এই য়ুন্-নান্ স্বরাজে খাটিবে না। য়ুন্-নানকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র চীনের স্বরাজ-সেবকগণকে দলবদ্ধ করিতে আজ হইতে আমরা লাগিয়া গেলাম।" স্বরাজ-সংরক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত য়ুন্-নান্ প্রদেশ এক নিমেষের মধ্যে সার্ভিয়ার মত জগদ্বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিরপেক্ষ লোকেরা ভাবিল—চীনেও তবে প্রাণ আছে? চীনারা নিতান্তই নড়নচড়নহীন জাতি নয়। ইহাদের মধ্যেও প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার লোক জন্ম গ্রহণ করে। বাহবা য়ুন্-নান্!

১৯১৫ সালের বড়দিন কয়টা (২৫।২৬ ডিসেম্বর) জগতের লোকেরা চীনের মানচিত্র হাতড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। য়ুন্-নান্ কোথায়? নামটা ত স্বয়ং হবু-সম্রাট্ য়ুয়ানেরই লাগালাগি! কেহ কোরিয়া অঞ্চলে আঙুল চালাইলেন—কেহ আসিয়া পিকিঙের নিকট ঠেকিলেন। কেহ কেহ শাংহাইয়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহারা ইয়াংসি নদীর মোহানায় য়ুন্-নানের সন্ধানে থাকিলেন। অনেকে হয়ত জানেন বিপ্লবপ্রবর্ত্তক সান্ ক্যাণ্টনের লোক। তাঁহারা ক্যাণ্টনের নিকট য়ুন্-নান্ খুঁজিতে লাগিলেন। যাহাকে গরু খোঁজা বলে সেই ধরণের খোঁজ নিশ্চয়ই হইয়াছিল—তথাপি য়ুন্-নান্ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

না হইবারই কথা। শিক্ষিত চীনারাও বোধ হয় মানচিত্রে য়ুন্-নান্ বড় শীঘ্র বাহির করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ ইহাদের মনে কখনও বোধ হয় য়ুন্-নানের নাম উঠিবার আবশ্যক হয় না। বাঙ্গালাদেশকে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা বেদবর্জ্জিত দেশ বলিয়া জানিতেন। কোন সময়ে আমরা ব্রাহ্মণবর্জ্জিত সমাজরূপে ভারতে প্রচারিত ছিলাম। ভারতবাসী বাঙ্গালীকে সংক্ষেপে "প্রাচ্য" নাম দিয়া বর্ণনা করিতেন। অনার্য্যের দেশ, দ্রাবিড়ের দেশ, অসভ্যের দেশ ইত্যাদি সংজ্ঞা বঙ্গদেশের ছিল। বাঙ্গালায় পদার্পণ করিলে নাকি আর্য্যেরা "পতিত" হইতেন। রাখালদাসের "বাঙ্গালার ইতিহাসে" দেখিতেছি যে, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" বাঙ্গালীরা নাকি "পক্ষী"-জাতীয় মনুষ্য বিবেচিত হইত! সে-সব মান্ধাতার আমলের কথা। কিন্তু য়ুন্-নান্

সত্য-সত্যই চীনাদের চিন্তায় এইরূপ "পক্ষী-জাতীয়" মনুষ্যের দেশ—বেদ-বিবর্জ্জিত দেশ—বুনো অসভ্যদের দেশ। সভ্যতর চীনাদের সংখ্যা এখানে অতি অল্প। বস্তুতঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও য়ুন্-নান্ চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিলনা—সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঞ্চুসম্রাটেরা এই জনপদকে চীনের দখলে আনিয়াছেন। কাজেই চীনারাও য়ুন্-নানের সংবাদ বেশী রাখে না।

বলিয়াছি বিগত চারিমাসে সিকিয়াঙের জল অনেকখানি বহিয়া গিয়াছে। য়ুন্-নান্ প্রদেশের অবস্থান এই সি-নদীর মাথায়। য়ুন্-নানের একমাস পর কুই-চাও প্রদেশ য়ুয়ানের বিরুদ্ধে স্বরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিল। তখনও য়ুয়ান্ নরম হইলেন না। তাহার তিন সপ্তাহ পর কোয়াংসি প্রদেশ স্বরাজের দল পুরু করিল। এইবার য়ুয়ান্ রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেন। এবং সন্ধির জন্য স্বরাজ-সংরক্ষকগণের নিকট তার করিলেন। তাহারও প্রায় দুই সপ্তাহের মধ্যে কোয়াং-টুঙ্ প্রদেশ য়ুয়ানের বিপক্ষে দাঁড়াইল। ফলতঃ দেখিতেছি সেদিন য়ুয়ান্ "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" ভাবিয়া সভাপতিত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বড়দিন হইতে গুড্-ফ্রাইডে পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে চীনের সি-কিয়াঙ্-প্রক্ষালিত জনপদ জগতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইল।

য়ুন্-নান্, কুই-চাও, কোয়াংসি এবং কোয়াং-টুঙ এই চারি প্রদেশকে চীনের সি-ধৌত বা সি-মাতৃক অঞ্চল বলা যাইতে পারে। এই জনপদের আয়তন আমাদের চারিখানা বাঙ্গালাদেশের সমান—তাহা অপেক্ষাও বেশী।

চীনাভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেক নামের অর্থ আছে। প্রদেশগুলির নামও অর্থযুক্ত! কোনটার অর্থ অমুক পাহাড়ের পূর্ব্ব, কোনটার অর্থ অমুক হ্রদের দক্ষিণ ইত্যাদি। কতকগুলির নাম কবিত্বপূর্ণ। কাজেই প্রদেশের নাম করিবামাত্র চীনারা অতি সহজেই তাহার অবস্থান বুঝিয়া লইতে পারে। কিন্তু বিদেশীদের পক্ষে বুঝা সহজ নয়।

চীনের আলোচনায় তিব্বত, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া—এই পাঁচ জনপদের নাম ভুলিয়া যাওয়া আবশ্যক। এইগুলি ছাড়িয়া দিলে চীনসাম্রাজ্যের যতখানি অবশিষ্ট থাকে তাহারেই নাম চীন। এই চীন আঠারটা প্রদেশে বিভক্ত—চীন বৃটিশশাসিত ভারত অপেক্ষা আয়তনে কিছু বড়—কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের ⅔ অংশ মাত্র।

বাষ্পপোত আবিষ্কারের যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল লোকই কৃষিকার্য্যকে জীবনধারণের প্রধান উপায় বিবেচনা করিত। জগতের প্রায় সকল দেশকেই কৃষি-প্রধান বলা চলিত। তখনকার দিনে নদ-নদীর গতি, আকৃতি ইত্যাদি অনুসারে জনগণের স্বাস্থ্য ও সম্পদ অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইত। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত সকল দেশকেই মোটের উপর "নদী-মাতৃক" বলিলে দোষ হইত না।

বর্ত্তমান কালে কৃষিকার্য্যের মূল্য নূতনভাবে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে—কারণ ব্যবসায় ও শিল্পের প্রভাবেই এক-শতাব্দী ধরিয়া মানবসমাজ পরিচালিত হইতেছে। এই প্রভাব প্রবর্ত্তন করিয়াছেন পাশ্চাত্ত্যেরা, কিন্তু এশিয়ায় এখনও কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক দেশের যুগই চলিতেছে বলা চলিতে পারে।

অধিকন্তু সকল যুগেই পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকার অবস্থান এবং নদনদীর গতি প্রবাহ হইতে প্রত্যেক দেশের প্রদেশবিভাগ সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের বাষ্প-নিয়ন্ত্রিত-এঞ্জিন-চালিত শিল্পের প্রভাবেও দুনিয়ার কুত্রাপি এই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক বিভাগ সবিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কাজেই এখনও কোন দেশের জেলা বা কাউন্টি বা প্রভিন্স বুঝিতে হইলে নদনদীর গতি অনুসরণ করাই যুক্তিসঙ্গত। আজকাল ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, আমেরিকা ইত্যাদি দেশকে সভ্যতাহিসাবে আর নদীমাতৃক বলা চলে না। কিন্তু প্রাকৃতিক হিসাবে এগুলিও চিরকালই নদীমাতৃকই থাকিবে। আর চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ও মিশর প্রাচীন কালের মত বর্ত্তমান কালেও সভ্যতাহিসাবে নদীমাতৃকই রহিয়াছে, এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের বিচারে ত আছেই।

চীনকে তিনটি নদীমাতৃক জনপদে বিভক্ত করিতেছি। চীনে নদনদীকে "হো" "কিয়াঙ" "চুয়ান্" ইত্যাদি বলে। উত্তরের অঞ্চল হোয়াং প্রক্ষালিত, মধ্যের অঞ্চল ইয়াংসি (বা ইয়াংছি) প্রক্ষালিত, আর দক্ষিণের অঞ্চল সি-প্রক্ষালিত

হোয়াংহো চীনের শতদ্রু বিপাশা, ইয়াংসিকিয়াঙ্ নর্ম্মদা গোদাবরী এবং সি-কিয়াঙ্ কাবেরী।

ভারতে আর্য্য-সভ্যতা পঞ্চনদ হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে প্রসারিত হইয়াছে। সুদূর দক্ষিণকে আর্য্যময় করিবার জন্য অগস্ত্য-যাত্রার আবশ্যক হইয়াছিল। রামায়ণের ঋষি দক্ষিণাঞ্চলটাকে বানরের দেশরূপে প্রচার করিয়াছেন। তাহারও দক্ষিণে ত রাক্ষসের মুল্লুক! চীনা-সভ্যতার ধারাও অনেকটা এই ধরণের। প্রাচীনতম চীনা-সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। উহা হোয়াং-মাতৃক দেশ। সেই অঞ্চলকেই চীনারা দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল বা গৌরব বলিয়া জানিত। সেই অঞ্চলের চারিদিকে যে-সকল জনপদ ছিল সেগুলির একটা সাধারণ নাম প্রদান করিয়া তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। সেই নাম "Land of the Barbarians" অর্থাৎ অপরিচিত ম্লেচ্ছ বা অসভ্য বর্ব্বরদিগের দেশ। এই পারিভাষিক শব্দ আমাদের "পক্ষীজাতীয় মানুষের দেশ" অথবা "বানরের দেশ" অথবা "বেদবর্জ্জিত দেশ" অথবা "রাক্ষসের দেশ" ইত্যাদি বিবরণের অনুরূপ।

প্রাচীন চীনের সভ্যতাকেন্দ্র সেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে হোয়াঙের প্রবাহ অনুসারে চীনা সমাজের প্রসার পূর্ব্বদিকে সাধিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে প্রবর্ত্তিত হয়। তখনও চীনের রাষ্ট্রকেন্দ্র বেশী পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয় নাই। হোনান নগর সেই যুগে রাজধানী ছিল—মোগল সম্রাট্ কুব্‌লা খাঁ পিকিঙ্ নগরে রাজধানী প্রথম স্থাপন করেন। সে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা। পিকিঙের বহু পশ্চিমে হোনান নগর।

এইরূপে পূর্ব্বাঞ্চলের বর্ব্বর বা পক্ষীজাতীয় মানুষ চীনা সভ্যতার অন্তর্গত হইয়াছে। সেই সঙ্গে দক্ষিণেও সভ্যতার অভিযান আসিত। ইয়াংছি পর্য্যন্ত সভ্যতার বিস্তার সাধিত হইতে অনেক শতাব্দী কাটিয়াছিল। কাজেই ইয়াংছির দক্ষিণ অঞ্চল সেদিনমাত্র চীন-মণ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছে। সি-মাতৃক সমগ্র জনপদই খাঁটি সভ্য চীনাদের আবহাওয়া বেশী দিন ভোগ করে নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব যুগের চীন-সম্রাটেরা এই দক্ষিণতম অঞ্চল সম্বন্ধে এক প্রকার অজ্ঞ ছিলেন বলা যাইতে পারে। পুরাতন পুঁথিতে এই-সকল প্রদেশ-বিষয়ক অদ্ভুত কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের পুরাণ-বর্ণিত বহু ভৌগোলিক কল্পনার পাশে চীনা মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত কল্পনাগুলি বেশ খাপ খাইবে।

কোন সময়ে হয়ত সম্রাটগণের খেয়ালে এই দক্ষিণা বর্ব্বরগণের খোঁজখবর লওয়া হইত। মাঝে মাঝে অভিযানও পাঠান হইত। কিন্তু লঙ্কায় যিনিই আসিতেন তিনিই রাজা হইয়া বসিতেন। সম্রাটের নিকট বশ্যতা স্বীকার বা খাজনা দাখিল করার কথা তাহারা ভুলিয়া যাইতেন। বহুকাল পরে হয়ত আবার এক নরপতি সেনাপতিকে আদেশ করিতেন—"দক্ষিণ অঞ্চলের বানরেরা কি করিতেছে দেখিয়া আসিবার জন্য ফৌজ পাঠাও। অনেক দিন কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।" কয়েক বৎসর পর সেনাপতি আসিয়া জানাইতেন—"হুজুর ওখানকার বুনো ডাকাইতেরা (দস্যুগণ) বিদ্রোহী হইয়াছে—চীন সম্রাটের শাসন মানিতে চাহে না।" সম্রাট্ বিদ্রোহদমনের জন্য লোক জন পাঠাইতেন। দুই তিন সম্রাটের রাজ্যকাল গত হইলে হয়ত এক দিন সংবাদ আসিত—"দক্ষিণ অঞ্চল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।" সন তারিখ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে চীনের সি-প্রক্ষালিত দক্ষিণ জনপদের সম্বন্ধ অনেকটা এইরূপই ছিল। য়ুন্-নান্ এবং কুই-চাও তাঙ-সুঙ মিঙান-মিঙ্ আমলেও (৬০০—১৬৫০ খৃঃ অঃ) চীন-সম্রাটগণের পুরাপুরি বশে আসে নাই। দুইটা বঙ্গদেশের সমান এই জনপদ মাত্র দুই শত বৎসর হইল চীনের দখলে আসিয়াছে। তবে কোয়াংটুঙ্ ও কোয়াংসিই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সুঙ্ সম্রাট্গণের অধীনে ছিল। তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুই প্রদেশ চীনের অঙ্গীভূতই আছে।

সি-ধৌত জনপদের মধ্যে একমাত্র কোয়াংটুঙ প্রদেশ সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ক্যাণ্টন নগর এই প্রদেশের বন্দর। মধ্যযুগের চীনা সভ্যতায় ক্যাণ্টনের কৃতিত্ব ও গৌরব আছে। বৌদ্ধ প্রভাবের প্রথম অবস্থা হইতে ১৯১১ সালে সানের উদ্ভব পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাসে ক্যাণ্টন প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য তিন প্রদেশ চিরকালই নগণ্য। এই অঞ্চল এতই দুর্গম যে এখানকার লোক

চীনকে কিছু দেয়ও নাই—চীন হইতে কিছু গ্রহণ করেও নাই বলা যাইতে পারে। অথচ আজ চীনের এই পনর আনা "অচীনা" অঞ্চল দুনিয়ায় চিরপ্রসিদ্ধ হইতে চলিল।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

চরৈবেতি, চরৈবেতি

"আগে চল্, আগে চল্, ভাই!"

দুঃখের নামে যে সুখ ভীত, যে সুখ বাহিরের উদার মুক্তিকে দেখিয়া ভয় পায়, যে সুখ বিশ্বের রাজপথে নিরুদ্দেশ যাত্রার নামে অন্তরে অন্তরে কাঁপিয়া উঠে, সে সুখ অতি ক্ষুদ্র সুখ। তাহাকে আরাম বল, সুখ বল, কিন্তু আনন্দ বলিতে পার না। তাহা আমাদিগকে নিরন্তর আরামের গৃহকোণের দিকে টানে, উন্মুক্ত বিশ্বের অনন্ত পথে বাহির হইতে দিতে চাহে না, তাহা ভীরু, তাহা ক্ষুদ্র ও কৃপণ; সে সুখের ভোগে প্রতিদিন আমাদের আত্মা ক্ষুদ্র ও কৃপণ হইয়া আসে।

আর যে আনন্দ দুঃখের মধ্য দিয়া প্রাপ্য, যাহা তপস্যার ধন, যে আনন্দ বিশ্বের অনন্ত পথকে দেখিয়া এক চুল কম্পিত হয় না, যাহাকে দুঃখের নিকটতম মিত্র বলা চলে, সেই বিরাট আনন্দ আমাদিগকে প্রতিদিনকার আরামের গৃহকোণ হইতে টানিয়া জগতের মুক্ত পথে বাহির করিয়া দেয়। সত্যের বিরাট স্বরূপকে দেখিয়া সে আনন্দ সহর্ষে মাথা নত করিয়া দেয় এবং সে একতিলও ভীত হয় না। বিশ্বভুবনের অনন্ত অপার পথে সে আনন্দ মহান্ নৃত্যছন্দে অগ্রসর হইয়া চলিয়া যায়।

এই আনন্দই যোগীর আরাধ্য আর ইহাই সাধকের সাধনার ধন। যুগে যুগে মহাকবিগণ এই আনন্দেরই জয়গান করিয়াছেন। সাধু ভক্তেরা এই আনন্দ লাভ করিয়া যুগযুগান্তের বন্দনা গান করিয়া গিয়াছেন। এই আনন্দেরই অন্বেষণে জগতের লক্ষ লক্ষ লোক সাধু মহাত্মাদের চরণের পিছে পিছে যাত্রা করিয়া লাভক্ষতিকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। জীবন ও মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে সমান বরণীয় হইয়াছে। ক্ষুদ্র সুখ ও আরামের দিকে ইঁহারা ফিরিয়াও চাহেন নাই। যে মানুষ সুখ ও আরাম চাহিয়াছে সে নিজের ধন মান পদগৌরবে স্ফীত হইয়া আপনাকে অসম্ভব উঁচুদরের বিজ্ঞ লোক মনে করিয়াছে। জগতের সমস্ত বৃহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ প্রয়াস এবং মহৎ পুরুষগণের সুতীব্র সমালোচনার দ্বারা সে নিজের কৃপণতম বিজ্ঞতাই প্রকটিত করিয়া সমস্ত জগতের ধূলায় ধূলার সঙ্গে কোথায় মিশিয়া গিয়াছে! আর যে-সব মহাপুরুষ জগতের মুক্ত পথে সত্যের আলোকে সকলকে ডাক দিয়া জীর্ণবস্ত্রে ধূলিলিপ্ত দেহে যাত্রা করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রতি-পদক্ষেপ যুগযুগান্তের মানব আপন হৃদয়ের মধ্যে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতের মনীষীরা বলিয়াছেন—মানব যে জগতে আসিয়াছে তাহা ক্ষুদ্র সুখের অন্বেষণে নহে, আরামের জন্য নহে; ধন, মান, পদগৌরবের জন্যও নহে। সে তীর্থযাত্রী। পরম দেবতার স্বরূপের অন্ত নাই। অনন্ত লোকে তাঁর অনন্ত স্বরূপ। এই ভুবন-লোকে তিনি ভুবনেশ্বর হইয়া আছেন; সেই ভুবনেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া, কেবল কণ্ঠে নহে—জীবন দিয়া তাঁর জয়গান করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড হইতে মানবের যাত্রা করিতে হইবে। এই জগতে আসিয়া সামন্ত বা মন্ত্রী, রাজা বা উজীর হইয়াও যে সেই জগন্নাথের চরণে সমস্ত জীবন দিয়া ভূলুণ্ঠিত প্রণাম না করিয়া যাইতে পারিল—সে অধন্য, সে কৃপার পাত্র। দীনের দীন হইয়াও যে সেই প্রণামটি করিয়া গেল সে ধন্য, সে ব্রাহ্মণ; যুগযুগান্তের সকল রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুট তাঁর চরণ-ধূলার কাছে নগণ্য।

এই তীর্থযাত্রী হইয়া যিনি আসিয়াছেন তিনি তো ক্ষুদ্র সুখ ও আরাম লইয়া আপন সঙ্কীর্ণ গৃহকোণে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। তাঁহাকে জগতের মুক্তপথে বাহির হইয়া পড়িতে হয়। নিখিল মানবের সহিত মিলিত হইয়া সকলকে ডাক দিয়া সকলের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বিরাট যাত্রা-সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তাঁহার অগ্রসর হইতে হয়। তিনি আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানেন না—বিজ্ঞ বলিয়া ঘোষণা করেন না। তিনি আপনাকে সকলের সাথী

(Comrade) বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন।

সঙ্কীর্ণ মৃত লোকাচার গ্রামধর্ম্ম জনপদধর্ম্ম বা প্রদেশ-ধর্ম্ম, জীর্ণশাস্ত্র ও সংস্কার এই-সব মহাপুরুষদের প্রবল গতির সম্মুখে লূতাতন্তুর ন্যায় কেমন করিয়া যে পলে পলে ছিন্ন হইয়া যায় তাহা তাঁহারা জানিতেই পারেন না। তাঁহাদের জলন্ত সাধনা, তাঁহাদের তীর্থযাত্রা, মৃতপ্রায় মানবকে আবার নূতন করিয়া জীবন্ত আচার, উদারধর্ম্ম ও জীবন্ত শাস্ত্র দান করিয়া যায়।

তাঁহাদের আরাম নাই, গৃহ নাই—গৃহসুখ নাই। বিধাতা তাঁহাদিগকে ভুবনের মাঝে আনিয়া বিশ্বভুবনের পথে অগ্নিময় সচল মন্ত্রে পথিকের দীক্ষা দিয়াছেন। ইঁহাদের ঘর নাই—ইঁহাদের পথই আছে। নীড়হীন সদা-উড্ডীন হোমা পক্ষীর ন্যায় আলোকই ইঁহাদের প্রাণ, অগ্নিমন্ত্রই ইঁহাদের আহার।

পাশ্চাত্য মনস্বী ও কবি ওয়াল্ট্ হুইটম্যান্ এই মুক্ত পথের (Open Road) জয়গান গাহিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। মুক্তপথের এই জয়গান কোনো দেশ বা যুগবিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা যে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের প্রাণ-সম্পত্তি।

আজিকার তিথিটি মহাতিথি হইয়া উঠিল কেন?* কেন আজিকার দিনে এই পবিত্র আশ্রম নিখিল মানবকে অকুণ্ঠিত উৎসবের আহ্বান প্রেরণ করিল? কেন সহস্র সহস্র নরনারী না জানিয়াও এই উৎসবভূমিকে কোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিল! এই তিথি কিসের তিথি? এই উৎসব কিসের উৎসব?

এই আশ্রম যিনি স্থাপনা করিলেন—কঠিন সাধনা ও পরিপূর্ণ সিদ্ধি দ্বারা এই ভূমিকে যিনি কাল ও স্থানের সীমা অতিক্রম করাইয়া বিশ্বের নিত্যধন করিলেন—আজিকার তিথি তাঁহার দীক্ষা-তিথি। সে দীক্ষা কিসের দীক্ষা? কোন্ মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা হইল? সে এই মুক্ত পথের দীক্ষা! ধনী গৃহস্থের সন্তান আজিকার এই মহনীয় দিনে কি এক অগ্নিমন্ত্র লাভ করিলেন—যাহার পর গৃহের কোনো আরাম, কোনো সুখ, কোনো ধনমান পদমর্য্যাদা তাঁহাকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, তিনি নিখিল মানবকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিয়া বিশ্বের পথে যাত্রা করিয়া চলিলেন। মাথার উপর দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতে লাগিল—বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—উপরে নীচে সর্ব্বত্র অন্ধকার—সেই বজ্রের আলোককে সম্বল করিয়া তিনি আলোকের অন্বেষণে যাত্রা করিলেন। পরম আলোককে পাইয়া ধন্য হইলেন—তীর্থ-যাত্রা সফল হইল। এই ভুবনের ভুবনেশ্বরকে সমস্ত জীবন দিয়া প্রণাম করিয়া জীবন পবিত্র করিলেন! আজি হইতে আর তো এই তিথি তাঁহার বা তাঁহার পরিবারের সম্পত্তি রহিল না। ইহা যে এখন বিশ্বের ধন। এই সাধনার ভূমিও এখন হইতে সকল জগদ্বাসীর সম্পত্তি হইয়া গেল।

আজিকার উৎসবের মধ্যে যদি মুক্ত পথের দীক্ষা ও উদার যাত্রার অগ্নিদীক্ষা না থাকিত তবে কাহার সাধ্য এই তিথিকে উৎসব করিয়া তোলে? তাহা হইলে এই ভূমিতে মেলা সমারোহ বা রাজ-আড়ম্বর সম্ভব হইত—উৎসব কখনও সম্ভব হইত না।

কিন্তু একটা কথা। যাঁহারা সাধক তাঁহারা তো অন্তরের মধ্যেই শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌কে দেখেন—বিশ্বভুবনের পথে যাত্রা করিবার তাঁহাদের কি প্রয়োজন?

এই বিশ্বের পথে সেই অন্তরস্থিত ব্রহ্মকেই তো পূর্ণ করিয়া তাঁহারা পান। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে যদি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যক্ষ না দেখিলাম—তবে আর দেখিলাম কি! তাঁহাকে কেবল বাহিরে দেখিলেও পূর্ণ দেখা হইল না—কেবল অন্তরে দেখিলেও পূর্ণ দেখা হইল না। "বাহর ভীতর সোই"—তাঁহাকে বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র চাই। এই বিশ্বে তো তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিয়াছেন। দুঃখের পর দুঃখ সহিয়া এই দুর্গম পথে যাত্রা করিয়া সাধক কোন্ আনন্দে দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেন! সে যে তাঁহাকে দেখারই আনন্দ। তিনি যে জগৎকে বেড়িয়া আছেন—

"অবোচদ্ ব্রহ্মেতি
পরিবিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভূবৎ।"
সামবেদ, ছন্দ আর্চ্চিক, ১, ২, ৩, ৪।

এই বিশ্বখানি তাঁহার কাব্য। নেমি যেমন চক্রকে

* ৭ই পৌষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষার দিন, শান্তিনিকেতনের উৎসবের দিন। সেই উপলক্ষে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

বেড়িয়া আছে তেমনি যে তিনি বিশ্বকে বেড়িয়া আছেন—তিনিই তো ব্রহ্ম। এই বিশ্ব-কাব্যে যে তিনি আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছেন। তাই তো এই কাব্যের রসের অন্ত নাই এবং সে রস জীবন্ত রস। এই বিশ্বের অপরূপ রূপ যে দেখিল, এই রস যে আস্বাদ করিল, আর সে কি স্থির থাকিতে পারে? বিশ্বভুবনকে মহোৎসবে না ডাক দিলে তাহার আর চলে না। তখন তিনি আর মৃত্যুর ভাবনা করেন না। জীবনে মৃত্যুতে শোকে বিচ্ছেদেই তো এই কাব্য করুণ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তখন ডাক দিয়া বলেন—

> "দেবস্ত পশ্য কাব্যম্ মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমানঃ।"
>
> সামবেদ ছ, আ, ৪, ১, ৪, ৩। ঋ, ১০, ৫৫, ৫।

দেখ দেখ দেবতার কাব্য—আজিকার মৃত্যু কালিকার জীবন! কি তাঁহার মহিমা! কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত জীবন-মৃত্যুর তান-লয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

এই সঙ্গীত যে না শুনিল, বিধাতার এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া আস্বাদ না করিল, সে এই জগতে আসিল কেন? এই সঙ্গীত শোনাই তো সাধনা। এই মুক্ত পথে যাত্রা কি কম সাধনা?

এই মুক্ত পথে নিস্তব্ধ যাত্রা কম সঙ্গীত নহে। বিধাতা সেই অনুচ্চারিত সঙ্গীত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া মানব যে চলিয়াছে তাহাতে যে নিঃশব্দ সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে তাহা অতি মধুর, অতি গভীর—

> "উক্থঞ্চন শস্যমানমগোররিরাচিকেত।
> ন গায়ত্রঙ্গীয়মানম্।" সাম, ছ, আ, ৩, ১, ৪, ৩। ঋ ৮, ২, ১৪।

তিনি যে কেবল উক্থ (স্তব) বা গীয়মান গায়ত্র প্রভৃতিই প্রণিধানপূর্ব্বক শোনেন তাহা নহে, প্রত্যুত অনুচ্চারিত স্তুতিও সেইরূপ অবহিত চিত্তে শ্রবণ করেন।

এই যে মুক্ত পথে যাত্রা—প্রেমে সেবায় কর্ম্মে সকলের সঙ্গে এই মহাযাত্রাই তো পূর্ণ স্তব। এমন কোন্ স্তব আমরা বাক্যে উচ্চারণ করিতে পারি? সমুদ্রে যেমন সকল নদীর অবসান—তেমনি এই সমস্ত সঙ্গীত, এই সমস্ত যাত্রাও লীন হইতেছে সেই পরম দেবতার মধ্যে। যে যেখানে যেমন করিয়াই যাত্রা করুক, যাত্রার অবসান হইবে তাঁহাতেই।

> "সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ।
> সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ।"
>
> সাম, ছ, আ, ২, ১, ৫, ৩। ঋ ৮, ৬, ৪।

গতিময় নদীসকল যেমন স্বভাবতই সমুদ্রে আনতা, সমস্ত মানব তেমনি তাঁহাতে আনত। সকল মানব-স্রোত সেই সমুদ্রের দিকেই যে যাত্রা করিয়াছে। নদী জানে না তবু অজ্ঞাতসারে সমুদ্রের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। এই বাণী কত বড় প্রবোধবাণী। যাত্রা যদি কর—জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক, দেখিবে ক্রমে তাঁহাতেই উপনীত হইতেছ!

অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর। বসিয়া বসিয়া যদি তাঁহাকে পাইতে চাও—তবে অন্তরের নানা ভ্রান্তিজাল তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে—সে বাধা, সে ভ্রান্তিজাল কাটিবে কিসে? যাত্রা কর, যাত্রা কর—যাত্রার গতিতেই, প্রাণের বেগেই সকল ভ্রম-জঞ্জাল দূর হইয়া যাইবে। যাত্রা কর, যাত্রা কর—বসিলেই পচিয়া মরিবে। ভয় কি? তিনি ছাড়া আর যে গম্য নাই—নির্ভয়ে যাত্রা কর। যে যাত্রা করিল সেই মুক্তির পথে চলিল।

কোন্ পথে যাইবে? পথ জান না? বাহির হইয়া পড়—পথই আমাদের পথ দেখাইবে। পন্থাই গুরু। পথ যে ব্রহ্মেই লইয়া যাইবে। আমরা পন্থাগুরুকে প্রণাম করি। শ্রদ্ধায় প্রণত হইয়া পথকে আশ্রয় কর।

> "যে তে পন্থা অধো দিবো যে ভি র্ব্যশ্বমৈরয়ঃ।
> উত শ্রোষন্ত নো ভুবঃ।" —সাম, ছ, আ, ২, ২, ৩, ৮।

হে দেবতা, স্বর্গের নীচ দিয়া তোমার বহু প্রশস্ত পথ চলিয়া গিয়াছে, সে পথ নিখিল-জনকে চালিত করিতেছে, সেই পথ আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। "হে পথ, তোমাকে প্রণাম করি—আমাদিগকে জড়ত্ব হইতে উদ্ধার কর। অলস গৃহ হইতে বাহির কর। আমাদিগের বধির কর্ণে গতির মন্ত্র শোনাও। আমাদের গতি দাও।"

যদি গতি পাই, মুক্তি তবে লাভ হইবেই। কত কত কাল হইতে মৃত জড়ত্বের মধ্যে ডুবিয়া আছি, আলোক নাই, প্রাণ নাই, গতি নাই, কবে দেবতা কৃপা করিয়া আলোক দিবেন—নয়ন সফল হইবে—উন্মুক্ত পথে যাত্রা

করিব—সকল পাপ ছিন্ন করিয়া মুক্তির আনন্দ সম্ভোগ করিব?

অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্দ্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যাস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্।
সামবেদ, ছ, আ ৪, ১, ৩, ৭। ঋ ১০, ৭৩, ১১।

হে দেবতা, ধ্বান্ত (অন্ধকার) দূর কর, চক্ষু পূর্ণ করিয়া দাও; পাশবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আমরা আছি, মুক্ত কর। অন্য কোনো প্রার্থনা নাই—কেবল আলোকের প্রার্থনা, আলোক পাইলেই নয়ন সফল হইবে, সকল পাশ ছিন্ন হইবে, বিশ্ব-শোভা দেখিয়া ধন্য হইব, আমরা যাত্রা করিব।

জড়তার অন্ধকারই মানবকে মৃতের ন্যায় পতিত রাখিয়াছে, এই জড়তাই সর্ব্ব পাপের মূল। এই জড়তা যদি যায়, মানব নব জীবন পাইবে—মানব পবিত্র হইবে—উজ্জ্বল হইবে—দীপ্ত হইবে। সেই যে মানবের জীবন্ত দীপ্ত যাত্রা তাহাই দেবতার চরণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তুতি। উৎসবের দিনে মানব চিরদিন সেই জীবন সেই আহ্লাদ সেই নব-প্রভাত প্রার্থনা করিয়াছে। চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া মুক্ত পথে যে দীপ্ত যাত্রা তাহাই পরিপূর্ণ সঙ্গীত। তাহাই বৃহৎ সঙ্গীত—তাহাই তো সেই অগীয়মান গায়ত্র যাহা পরম দেবতা অবহিত হইয়া শ্রবণ করেন। হে মানব, যাত্রা কর, যাত্রার বৃহৎ গান দিয়াই জগৎসবিতার স্তব করা চাই।

"দোষো আগাদ্ বৃহদ্গায়দ্যুমদ্গামন্ আথর্ব্বন।
স্তুহি দেবং সবিতারম্॥ সাম, ছ, আ ২, ২, ৪, ৩।

দোষ (রাত্রি) বিগত হইল, হে বৃহদ্গায়ক দীপ্তগমন অথর্ব-পুত্র—দেব সবিতাকে স্তব কর। হে অথর্ব-পুত্র তোমার দীপ্ত যাত্রাই বৃহৎ গান—তে যাত্রায় কি বৃহদ্গান বিশ্বাকাশতলে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! কোথায় এখন রাত্রি?—রাত্রির অন্ত হইয়া গেল! এখন তোমার যাত্রার অনন্ত সঙ্গীত, পরম দেবতার অগ্নিময় স্তবগান চলিতে থাকুক।

যে ভীরু এই মুক্ত উদার পথে দীপ্ত যাত্রায় সাহস পাইতেছে না, যে অন্ধকার গৃহকোণে ক্ষুদ্র জপ তপ লইয়া রহিল, সে কতক্ষণ জাগিয়া থাকিতে পারিবে? নিদ্রা আসিয়া তাহাকে ধরিবে—মোহ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিবে। সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিবে—এবং তাহাকেই একমাত্র জীবন মনে করিয়া জাগরণের আঘাতকেও ক্রমাগত ভয় করিতে থাকিবে, কি জানি যদি এই স্বপ্নের শেষ হয় তবে কি জীবন আর কোথাও মিলিবে? এই জীবন্ত বিশ্বজগতে যেন জীবনের এমনি দৈন্য যে স্বপ্নটুকু হারাইলেই সর্ব্বস্ব যাইবে! এমন তন্দ্রালু জড়কে সেই জাগ্রত দেবতা তো চাহেন না। তিনি চান জীবন্তকে, মুক্ত পথের যাত্রীকে।

"ইচ্ছন্তি দেবাঃ সুন্বন্তম্ ন স্বপ্নায় স্পৃহয়ন্তি। যন্তি প্রমাদমতন্দ্রাঃ।
সাম, উ, আ, ২, ৩।

দেবগণ, জাগ্রত প্রাণবানকে চাহেন—শ্রমে অকাতর জাগ্রতকে চাহেন। যাঁহারা তন্দ্রাহীন তাঁহারাই পরমানন্দকে লাভ করেন। ব্রহ্মের সাহচর্য্যই পরমানন্দ; যে তাঁহার সাহচর্য্য-বঞ্চিত তার আর আনন্দ কোথায়?

এই জন্য দিকে দিকে বিধাতার গভীর শঙ্খ ঘোষণা করিতেছে "ক্ষুদ্র জপ তপ লইয়া জড়ের মত দিন কাটাইও না। শুষ্ক মৃত নিয়ম আচার কিছুই নহে—যাত্রা কর, যাত্রা কর—জীবন্ত হও।"

"মোষু ব্রহ্মেব তন্দ্রয়ুর্ভুবো।" সাম, উ, আ, ২, ৩, ১৮

ব্রাহ্মণের ন্যায় তন্দ্রালু অলস হইও না। ঝিমাইয়া ঝিমাইয়া জড়ের ন্যায় নিয়ম পালনে ব্রাহ্মণ হয় না। যে তাঁহার অগ্নিমন্ত্র লইয়া বিশ্বের মুক্ত পথে দুঃখ শোক সহিতে সহিতে মহা যাত্রা করিয়াছে—সেই যথার্থ ব্রাহ্মণ। বিধাতা তাহাকেই চান। নিরীহ শান্ত তন্দ্রালুকে তিনি তাঁহার অগ্নিমন্ত্র কখনও দান করেন না।

জগতের মুক্ত পন্থাতে যে যাত্রা করিল তাহার কি আর সুখ আছে? আর তো তাহার নয়নে নিদ্রা নাই, মনে শান্তি নাই, জগতের সর্ব্বমানব যে তাহার আপন—সকলের সেবাই যে তার আপন কর্ম্ম। তাহার শ্রম বিপুল, উদ্যম বিরাট। আপন ক্ষুদ্র গৃহের স্বজন পরিজনের সঙ্কীর্ণ কল্যাণ-চেষ্টা মাত্রতেই তো তাহার কর্ম্মের পরিসমাপ্তি নহে—নিখিল মানবের সকল কল্যাণই তাহার পুণ্যব্রত। সকল সংসারের কল্যাণ-সাধনায় এই ব্রতের উদ্যাপন। যে দুর্ব্বল যাহার অন্তরে কোথাও ক্ষীণতা সঙ্কীর্ণতা বা ক্লৈব্য আছে সে কয় দিন এই প্রচণ্ড দুঃখ-আঘাত সহিতে পারে? তাহার মন ক্রমাগত নিজ গৃহের অন্ধকারময় আরামের কোণটুকুতে ফিরিয়া আসিতে

চায়। নিখিলের শুভ চেষ্টাকে সে তখন অসাধ্য বলিয়া অবিশ্বাস করে, আপনার সঙ্কীর্ণ কৃত্যটুকুই আপনার পরিপূর্ণ ব্রত মনে করে। মুক্তির উদার আনন্দ ফেলিয়া আরামটুকুর জন্য লুব্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু যে সত্য-সাধক সে মনে করে আমার একমাত্র সাধনা বিধাতার মুক্ত পথে অগ্রসর হওয়া ও তাঁহার কাজ করিয়া যাওয়া। সকল অভাব, সকল দুঃখ তিনিই দূর করিবেন। তাঁহারই উপর সব ভার দিয়া আমি কেবল অগ্নিমন্ত্র লইয়া তাঁহার পথে অগ্রসর হইব।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এক অপূর্ব্ব উপাখ্যান আছে। রোহিত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি পথে বাহির হইয়াছিলেন। রোহিত শ্রান্ত হইয়া ও গৃহে তাঁহার কর্ত্তব্য আছে ইহা মনে করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। সকল অভাবের পূরণকর্ত্তার কথা তাঁহার মনে ছিল না। যাহা হউক, রোহিত যখন গৃহে ফিরিতেছেন তখন দেবতা আসিয়া পথে ব্রাহ্মণরূপে তাঁহাকে দেখা দিলেন। দেখা দিয়াই বলিলেন "বাহির হও, পথে বাহির হও।" বার বার রোহিত গৃহে ফিরিতে চাহিলেন, বার বার ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন। ঋগ্বেদ-ব্রাহ্মণের সেই কয়টি মন্ত্র একেবারে অগ্নিমন্ত্র। সেই যে মহা মন্ত্র সে মন্ত্র সেই ঘটনা ছাড়াইয়া সেই যুগ ছাড়াইয়া ভারতবর্ষকে ছাড়াইয়া অনন্ত বিশ্বের আকাশে নিত্যকাল ধ্বনিত হইতেছে।

কোথাকার রোহিত, কোথাকার ক্ষুদ্র ঘটনা, কি তাঁর মুক্তি, কি তাঁর বন্ধন, কি তাঁর শ্রান্তি, কি তাঁর প্রয়োজন, আজ সে-সকলের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই। আজ বিশ্ববাসী সকল রোহিতকে সম্বোধন করিয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া ঐ অগ্নিময় মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। আজ সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঐ মন্ত্রই বার বার সকল শ্রান্ত ও অবসন্ন মানবের কর্ণে ঘোষণা করিতেছে। কোনো বিশেষ তপঃকানন হইতে নহে, কেবল ভারত হইতে নহে, বিশ্বভুবনের তাবৎ আকাশকে বিকম্পিত করিয়া সর্ব্বমানবকে সম্বোধন করিয়া আজ সেই মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে।—

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তীর্তি রোহিত শুশ্রুম।'
পাপোনৃষদ্বরোজনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা।—চরৈবেতি।"

হে রোহিত, চিরকালই শুনিয়াছি চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত হইয়াছে তাহার আর শ্রীর ইয়ত্তা থাকে না। শ্রেষ্ঠ জনও যদি শুইয়া পড়িয়া থাকে তবে সে তুচ্ছ হইয়া যায়। যে চলিতেছে স্বয়ং দেবতা তাহার সখা হইয়া তাহার সঙ্গে-সঙ্গে থাকেন—অতএব হে রোহিত, বাহির হও, বাহির হও, চলিতে থাক।

"পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।
শেরেহস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ।—চরৈবেতি"।

হে রোহিত, যে বিচরণ করে শ্রমবশতঃ তাহার দৈহিক কান্তি বিকশিত পুষ্পের ন্যায় সুষমাময়ী হইয়া উঠে—তাহার আত্মা নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে এবং সে নিত্যই বৃহত্ত্বের ফললাভ করে। যে পথ সম্মুখে নিত্য উন্মুক্ত তাহাতে যে বিচরণ করে শ্রমের দ্বারা হতবীর্য্য হইয়া তাহার সকল পাপ মরিয়া শুইয়া পড়ে। অতএব বিচরণ কর—বিচরণ কর।

"আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ।—চরৈবেতি।"

কে বলে দেবতা ভাগ্যদান করেন? মুক্ত পথে যে বাহির হয় সে আপন ভাগ্য আপন হস্তে সৃষ্টি করিয়া চলে। দুঃখ কষ্ট সকলই সে সৌভাগ্য করিয়া লয়। তাহার ভাগ্য স্পর্শ করে কাহার সাধ্য?

যে বসিয়া থাকে তাহার ভাগ্যও বসিয়া থাকে। যে উঠিয়া বসে তাহার ভাগ্যও উঠিয়া বসে। যে শুইয়া পড়িয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়িয়া থাকে। যে চলিতে আরম্ভ করে তাহার ভাগ্যও চলিতে থাকে। অতএব হে রোহিত, যাত্রা কর যাত্রা কর।

যে মূঢ় তাহারই নিত্য কলি যুগ। তাহার যুগ যে বাহির হইতে আসে। যে মুক্ত পথে যাত্রা করিয়াছে—তাহার কিসের ত্রেতা কিসের দ্বাপর কিসের কলি। সে আপন সত্য যুগ আপনি গড়িয়া লইতে থাকে।

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্।—চরৈবেতি।"

শুইয়া পড়িয়া থাকিলেই তাহার কলিযুগ লাগিয়াই থাকে। যে জাগিয়া উঠিয়া বসিল তাহার দ্বাপর। যে দাঁড়াইয়া উঠিল তাহার ত্রেতা উপস্থিত হইল। যে মুক্ত পথে যাত্রা

করিল—তাহার সত্যযুগ সঙ্গে-সঙ্গে, চলিল। অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর।

আচ্ছা, এই যে চলা, ইহাতে সত্য যুগ না হয় হইল—কিন্তু ইহাতে সত্য ফললাভ কি হইল?

এই চলাই যে পরমানন্দ! এই চলাই এমন অমৃতময়, এই চলাই এমন সফলতা, যে, ইহার অতিরিক্ত কোনো সফলতার প্রয়োজন নাই। বিধাতার রাজ্যে তাঁহার নির্দ্দেশ বহন করিয়া যে চলিয়াছে, সে-ই পরম পবিত্রতা পরম সৌন্দর্য্য পরম অমৃত লাভ করিয়াছে। তাঁহার নির্দ্দেশে ব্যোমের মুক্ত পথে সূর্য্য চলিয়াছে—গ্রহ চন্দ্র তারা চলিয়াছে—সব জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া চলিয়াছে। পৃথ্বী চলিয়াছে—পৃথ্বীর সৌন্দর্য্যের অবধি কোথায়? নদনদীর ধারা চলিয়াছে—বারিস্রোত কি স্নিগ্ধ ও পবিত্র! বায়ু চলিয়াছে—বায়ু পবিত্র সুরভিত প্রাণপ্রদ। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে পল্লব মুকুল লতা চলিয়াছে—সব সুন্দর। ঋতু চলিয়াছে—তাই তাহার অর্ঘ্যপাত্র নিত্যই বিচিত্র সুন্দর ও পরিপূর্ণ। বিধাতার মুক্ত পথে যে চলিয়াছে ফল লাভের জন্য অন্যত্র কোথাও তাহাকে যাইতে হয় না। সে নিজের মধ্যেই নিজের ফল প্রাপ্ত হয়।

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরং।
সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ ॥—চরৈবেতি।"

যে চলিতেছে সেই মধু লাভ করিতেছে, যে চলিতেছে সেই অমৃতময় ফল লাভ করিতেছে, ঐ দেখ সূর্য্যের কি দীপ্ত শ্রেষ্ঠত্ব—সে যে চলিতে চলিতে কখনও তন্দ্রাকে প্রাপ্ত হয় না। অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর।

এই যাত্রা নিজেই অমৃত-মধুর, নিজেই অমৃত-ফল। যাত্রাতেই সূর্য্য চন্দ্র তারার জ্যোতি। যাত্রাই তৃপ্তি যাত্রাই দীপ্তি।

"প্রাণস্য পন্থাঃ অমৃতঃ।"—বা, স, মাধ্য, ১৯, ২০।

প্রাণের পথ অমৃত। প্রাণ যে গতি, সে অগ্রসর হইতে চায়, চলিলেই প্রাণ কৃতার্থ হয়, এই আনন্দই পরমানন্দ। অপর কোন্ আনন্দ এই আনন্দের সমতুল্য? ইহাই অমৃত।

আজিকার এই পবিত্র দীক্ষা-তিথিতে আমরাও দীক্ষা চাহি। নহিলে কেমন করিয়া পূর্ণরূপে এই উৎসবে যোগদান করিব? প্রাণহীন আমরা পড়িয়া আছি—আমরা আজ প্রাণ চাই। প্রাণ দীক্ষা আমাদের চাই। দীর্ঘকাল, হে দেবতা, অতি দীর্ঘকাল আমরা যে প্রাণহীন হইয়া গভীর অন্ধকারে মরিয়া পড়িয়া আছি। চলিবার নামে ভীরু অন্তর কাঁপিতে থাকে। তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ মান তুচ্ছ আঁকড়িয়া এই মৃতজীবন পড়িয়া আছে। তোমার দীক্ষা-শঙ্খের নিনাদ শ্রবণের ভয়ে শ্রবণ রুদ্ধ করিয়া আছি। চিত্তের কোনো দ্বারে যেন দীক্ষার ভৈরব মন্ত্র না ধ্বনিত হইতে পারে এইজন্য সকল দ্বার সর্ব্বপ্রকারে ক্রমাগত রুদ্ধই করিতেছি। এই রোধের প্রয়াসকে, তোমার বিরাট মন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দীন আত্মার এই সদাভীত প্রয়াসকেই, জীবন মনে করিবার চেষ্টা করিতেছি। তন্দ্রালু চিত্ত এই মোহতেই আচ্ছন্ন হইয়া ঝিমাইতেছে। হে দেবতা, এই দুর্গতি হইতে উদ্ধার কর। আজিকার শুভ তিথিতে প্রাণের দীক্ষাই চাই—

"প্রাণং দীক্ষাম্ উপৈমি।"—শ, শ্রৌ, সূ, ৫, ৪, ৬।

প্রাণের নিকট দীক্ষার নিকট উপনীত হইতেছি। আজ প্রাণের দীক্ষাই দাও। হে প্রাণ-স্বরূপ, অন্য মন্ত্রে নহে—মুক্ত পথের পথিক করার প্রাণমন্ত্রে আমাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে।

"প্রাণো মে প্রাণেন দীক্ষতাম্।"—কৌশী, ব্রা, ৭, ৪।

হে প্রাণ, প্রাণ দিয়াই আমাকে দীক্ষা দাও। অন্য কিছু দিয়া দীক্ষা দিলে এই মৃত্যুর ভার যে ঠেলিয়া উঠিতে পারিব না। এই দীক্ষা যদি পাই তবে কি আর জীবনের সীমা থাকিবে? তবে কি আর শ্রান্তি অবসাদ দৈন্য থাকিবে? এই দীক্ষা যে সীমাহীন দীক্ষা! এই দীক্ষায় যে প্রাণ যে আনন্দ তাহার সীমা কোথায়?

"অপরিমিতা দীক্ষা।"—শ, শ্রৌ, সূ, ৫, ৪, ৭।

এই দীক্ষা অপরিমিত। এই দীক্ষা না পাইলে আর জীবনের আশা নাই। হে পরম-দেবতা, অদ্যকার শুভ দীক্ষা-তিথির মহোৎসবের অবসান-দণ্ডে, দীপ্ত গ্রহতারকা-মণ্ডিত অনন্ত আকাশতলে জীবনতৃষ্ণায় মুহ্যমান শুষ্ক অচল চিত্ত পাতিয়া দিলাম, বজ্রনির্ঘোষে তোমার দীক্ষামন্ত্র উচ্চারণ কর। তোমার দীক্ষাই আজ আমাদের একমাত্র

গতি। অসত্য হইতে সত্যে লইয়া চল, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল। হে রুদ্র, এই উৎসব-লগ্নে আবির্ভূত হও, দক্ষিণ মুখে আশ্বাস দিয়া বল—

"প্রাণেন জীব মা মৃথাঃ।"—অথর্ব্ব ৩, ১৩, ১৮।

"প্রাণের দ্বারা জীবনলাভ কর—মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না।" আমাদিগকে বল "দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তোমরা ধন্য হও, তোমরা ধন্য হও—মৃত্যু তোমাদিগকে কখনও পরাভূত করিতে পারিবে না, যাত্রা কর—জীবন প্রাপ্ত হইয়া যাত্রা কর—আমাতেই তোমাদের বিশ্রাম হইবে।"

হে দেবতা, আশ্রমের শুভতিথিকে এই অগ্নিদীক্ষা দ্বারা সার্থক করিয়া দাও, আশ্রমবাসী ও আশ্রমে আগত সকলকে তোমার মন্ত্র দিয়া ব্রহ্মজীবন দান কর।—আমাদের উৎসব সফল হউক।

"এষাস্য পরমা গতি এষাস্য পরমা সম্পৎ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।।"

তুমিই আমাদের পরমাগতি, তুমিই আমাদের পরমা-সম্পৎ, তুমিই আমাদের পরম ধন, তোমার আনন্দের কণা-মাত্র পাইয়াই সকল জীব জীবন লাভ করে। ওঁ শান্তিঃ।

"ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।।"

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

মরুসম্ভব পুষ্পমালা

সারা জীবনের যে-কটি নিমেষ তোমার সঙ্গ পেয়েছে প্রিয়া,
ফুল হয়ে তারা উঠেছে ফুটিয়া পুলকিত করি এ মরু হিয়া।
সেই ফুলে হবে দেবতার পূজা। যত্নে যুগল নয়ন-বারি
পাছে সে শুকায় সেই ভয়ে সদা সেচন করিছে অশ্রুবারি।
দেবতা আমার, হে প্রিয় আমার, চরণে এনেছি অর্ঘ্যথালা,
সার্থক কর দুর্লভ এই মরুসম্ভব পুষ্পমালা!

বিশ্রী।

আলোচনা

"ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।"

মাঘ মাসের "প্রবাসীতে" বাবু মহেশচন্দ্র ঘোষ আমার ইংরেজি "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"র যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি যে একখানা বইকে এত ভুল বুঝিতে পারেন ও ভুল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহা আমার ধারণা ছিল না। তাঁহাতে আমাতে মতভেদ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, কিন্তু আমাকে তাঁহার এতদূর ভুল বোঝা কিরূপে সম্ভব হইল? তিনি আমার ইংরেজির প্রাঞ্জলতার প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং আমার ভাষা ভুলের কারণ নহে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাহাতে বোধ হয় তাঁহার ভুলের কারণ এই যে তিনি আমার বইখানা ভাল করিয়া পড়েন নাই। তাঁহার সমালোচনা পড়িয়া বোধ হইল তিনি আমার পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি ও শেষ দুটি পরিশিষ্ট মাত্র পড়িয়াছেন। সমালোচনা ঐ অংশেই আবদ্ধ। আমার বোধ হয় যে তিনি বইখানার সমস্ত ভাল করিয়া পড়িলে এমন তীব্র সমালোচনা করিতে পারিতেন না। অল্পাংশ পড়াতে তাঁহার যে-সকল ভ্রম হইয়াছে, সমগ্র পড়িলে সেই-সকল ভ্রম সংশোধিত হইয়া যাইত। এই বিষয়ে একটি ছোট বস্তুর সঙ্গে একটি বড় বস্তুর তুলনা দিই। কোন কোন দার্শনিক লেখক বলিয়াছেন যে ক্যাণ্টের "Critique of Pure Reason"এর কেবল Aesthetic অংশ পড়িলে মনে হয় যেন ক্যাণ্টের মতে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু "Analytic" পড়িলে সেই ভ্রম চলিয়া যায়। আবার কেবল "Analytic" পড়িলে বোধ হয় যেন বুদ্ধি প্রজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র, কিন্তু "Dialectic" অংশ পড়িলে সেই ভ্রম চলিয়া যায়। এক স্থানে কিছু সকল কথা বলা যায় না,—সকল দিক বজায় রাখিয়া কথাও বলা যায় না। আমার ক্ষুদ্র পুস্তক সম্বন্ধে এইরূপে বলা যায়, যে, যদি প্রথম অধ্যায় পড়িয়া মনে হয় (সেরূপ মনে হইবার কারণ যদিও আমি দেখি না) যে আমি ইহাতে Subjective Idealism সমর্থন করিয়াছি, তবে দ্বিতীয় অধ্যায় পড়িলেই সেই ভ্রম চলিয়া যাইবে, কারণ তাহার প্রথম পরিচ্ছেদই Sensationalism ও Subjective Idealismএর খণ্ডন। মহেশবাবু বলিয়াছেন যে মানবজ্ঞান যে ব্রহ্ম-জ্ঞানের প্রতিবিম্ব তাহা আমি প্রমাণ করিতে পারি নাই। কিন্তু প্রমাণ করিতে পারি নাই বলিলেই ত হইল না। তাঁহার উচিত ছিল আমার "Unity and Difference" নামক তৃতীয় অধ্যায়ের যুক্তির উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করা। তিনি আমার পুস্তকের একটি ক্ষুদ্র অংশের সমালোচনায় বারো স্তম্ভ ব্যয় করিয়া অবশেষে বলিতেছেন, "সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অধিক মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক—আর সময়ও নাই, স্থানেরও অভাব। এই স্থানেই উপসংহার করা যাউক।" ইহা কি রকম বিচার?

মহেশবাবু এই বারো স্তম্ভের মধ্যেই আমার পুস্তকের অন্যান্য অংশের সমালোচনার কতক স্থান পাইতেন যদি তিনি নানা পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধারে এত স্থান না দিতেন। তাঁহার সমালোচনার এই লক্ষণটাতে আমি বিশেষরূপে আশ্চর্য্যান্বিত ও ব্যথিত হইয়াছি। আমি ত কোন দার্শনিকের দোহাই দিয়া পুস্তক লিখি নাই, কাহারো মত উদ্ধার করিয়া আমার মত সমর্থনও করি নাই। কেবল মুখবন্ধে যুক্তিপ্রণালী সম্বন্ধে হেগেলের ইংরেজ ব্যাখ্যাকারদিগের সঙ্গে আমার সাধারণ ঐক্যের কথা বলিয়াছি আর ফুটনোটগুলিতে কোন কোন দার্শনিক

লেখক ও গ্রন্থের নির্দ্দেশ (reference) দিয়াছি। এই-সকল নির্দ্দেশের অর্থ কিছু এই নহে যে ইঁহাদের সঙ্গে আমার ঐক্য আছে। কাহারো কাহারো সঙ্গে সাধারণ ঐক্য আছে, কাহারো কাহারো সঙ্গে সম্পূর্ণ অনৈক্য। প্রয়োজনমত উভয় শ্রেণীর লেখকেরই উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং আমার সমালোচনা করিতে যাইয়া এত পণ্ডিতের নামোল্লেখ ও এত বচনোদ্ধারের যে কি প্রয়োজন ছিল তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক্, ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইত না যদি ইহার সঙ্গে সঙ্গে মহেশবাবু আমাকে ধমক না দিতেন। তিনি বার বারই কতিপয় লেখকের উল্লেখ করিয়া আমাকে এইভাবে শাসন করিয়াছেন—"কি ? এত পণ্ডিতের মতের বিপক্ষে, আর এই যুগে, এরূপ মত প্রচার করিতে সাহস!" এরূপ ধমক দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত। মহেশবাবুর প্রিয় লেখকগুলি কি চিন্তাজগতে এমনই বিপ্লব আনিয়াছেন যে তাঁহাদের মতের বিপক্ষে আর কাহারো কিছু বলিবার অধিকার নাই ? আমি এই বিধি সম্পূর্ণরূপেই অগ্রাহ্য করি। নামের ছটায় কোনো দিন ভুলি নাই, কোনো দিন ভুলিবও না। যে-দিন ভুলিব সেদিন কেবল দার্শনিক আলোচনা নয়, নিজের অবলম্বিত ধর্ম্মমতও পরিত্যাগ করিব। সেই ধর্ম্মমতের বিপক্ষে ত হাজার হাজার পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ লোকই দাঁড়াইয়াছেন, তবুও কেন নির্ভীকভাবে নিজমত প্রচার করিতেছি ? মহেশবাবুর এই পণ্ডিত ও পণ্ডিতবচন দোহাইয়ে আমার বিশেষরূপে ব্যথিত হইবার কারণ এই যে যে-সকল দার্শনিকের সহিত আমার মৌলিক ঐক্য আছে বলিয়া মনে করি, যাঁহাদের কাছে দর্শনশিক্ষা বিষয়ে আমি বিশেষরূপে ঋণী, মহেশবাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তাঁহারাও আমার বিপক্ষ। আমি তাঁহাদের সঙ্গে আমার ঐক্যপ্রদর্শনের জন্য কিছুই ব্যস্ত নই। এই যুক্তিপ্রণালী আমি আদতেই পসন্দ করি না। কিন্তু মহেশবাবু যখন তাঁহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে তিনি এই বিষয়ে খুব ভুল বুঝিয়াছেন,—হয় তাঁহাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন।

মহেশবাবু তাঁহার সমালোচনায় Logic ও Psychologyতে খুব গোল করিয়াছেন, আর এই গোল করাতে আমার অনেক কথাই ভুল বুঝিয়াছেন। Logic (ইদানিন্তন অর্থে) আত্মার মৌলিক প্রকৃতির বিষয় বলে, Psychology জীবের জীবনে আত্মার ক্রমবিকাশের বিষয় বলে। যে-সকল উপকরণের মধ্যে মৌলিক, logical, অগ্রপশ্চাৎ নাই, সেই-সকল উপকরণই কালে, psychologically, অগ্রপশ্চাৎ হইয়া প্রকাশিত হয়। আমি যে-সকল ব্যাপারকে logical implicationএর অর্থে সত্য বলিয়াছি, মহেশবাবু বুঝিয়াছেন যেন আমি সেইগুলিকেই psychological manifestationএর অর্থে সত্য বলিতেছি। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা মূলে সংযুক্ত, কোনোটাই কোনোটার অগ্রপশ্চাৎ নহে। কিন্তু জীবের মানসিক জীবনে আগে জ্ঞান, তারপর ইচ্ছার প্রকাশ। আমি আমার পুস্তকের ১০৮এর পৃষ্ঠায় বলিয়াছি "Our individual volitions are dependent on sensation, memory and understanding, in a word, on knowledge. First knowledge, then volition. It is impossible for the will, *i. e.*, the mind conceived as capable of acting, to put forth a volition unless it knows, unless it understands." (বাঙ্গালা পুস্তকের ১০৯ ও ১১০এর পৃষ্ঠায় ইহার অনুবাদ আছে)। মহেশবাবু এই অংশটি উদ্ধৃত করেন নাই, এবং কোন্ সংস্রবে ও কি প্রয়োজনে এই-সকল কথা বলা হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে আমি কেবল জ্ঞানবাদী, আর কেবল জ্ঞানবাদ যে ভুল তাহা দেখাইবার জন্য ছাব্বিশ জন লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জ্ঞানকে আর সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতেছে না।" আমি কোথায় বলিলাম যে জ্ঞানই সর্ব্বেসর্ব্বা ? মহেশবাবুর সমালোচনার সর্ব্বত্রই এইরূপে বাক্যগুলির অপব্যয়,—বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া।

মহেশবাবুর সমালোচনার দ্বিতীয় অংশ, যাহাতে তিনি আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার মতের অতি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে Logic ও Psychologyর গোলমাল খুব বেশি। আমার মত এই যে বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে আত্মজ্ঞান জড়িত (logically implied), কিন্তু জীবের স্পষ্ট আত্মজ্ঞান ক্রমশঃ হয়। এই কথাটি না বুঝিয়া মহেশবাবু আমার মতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ চারিস্তম্ভ সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইংরেজ জ্ঞানবাদী ও দেশীয় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি, যাঁহাদিগের সঙ্গে আমার মৌলিক একতা আছে, তাঁহাদিগকেও আমার বিপক্ষে সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করাইয়াছেন! আমি কোনো স্থানে বলি নাই যে বিষয়কে যে-ভাবে জানা যায় বিষয়ীকেও সেই ভাবেই জানা যায়। কেবল ইহাই বলিয়াছি যে বিষয়ী যে বিষয়কে জানে সেই জানার মধ্যে আত্মজ্ঞান নিহিত আছে। বিষয়জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান ভিন্ন না হইলে ভিন্ন দুটা কথাই বা কোথা হইতে আসিবে ? কিন্তু এই ভেদের মধ্যে অভেদও আছে, বিষয়ী বিষয়কে আপনা হইতে ভিন্ন জানিতে যাইয়া উহাকে নিজ জ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়াই জানে। ভেদজ্ঞানের মধ্যে এই অভেদজ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞান জীবের মানসিক জীবনে যে ক্রমে ও যে প্রকারে বিকশিত হয়, সেই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিদেরা যাহা বলেন, তার সঙ্গে দর্শনের কোনো বিরোধ নাই। কিন্তু যে মনোবিজ্ঞানবিৎ বলেন যে মানবজীবনে প্রকাশের আগে আত্মজ্ঞান বর্ত্তমান ছিল না, তাঁহার সঙ্গেই দর্শনের বিরোধ। যাহা হউক, মহেশবাবু তাঁহার সমালোচনার এই অংশের উপসংহারে বলিয়াছেন—"এই প্রকার (অর্থাৎ বিষয়াকারে, স্মৃতির আকারে) 'জানা' ছাড়াও অন্য এক প্রকার জানা আছে, তাহার নাম অপরোক্ষ অনুভূতি, Bradleyর ভাষায় Immediate Experience, Bergsonএর ভাষায় Intuition. ইহাকে যদি 'জানা' নাম দিতে আপত্তি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাতাকেও জানা যায়।" সব গোল চুকিয়া গেল। এরূপ জ্ঞানকে "জ্ঞান" বলিতে আপত্তি থাকা দূরে থাকুক, আমি এই জ্ঞানের কথাই বলিয়াছি। আমার স্মৃতির দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা এই যে স্মৃতিতে এই জ্ঞান স্পষ্টীকৃত হয়, স্মৃতিতে যে প্রথম উৎপন্ন হয় তাহা নহে। এই বিষয়ে আমি ফুট্‌নোটে Ferrier ও শঙ্করের উল্লেখ করিয়াছি। মূলেও বলিয়াছি—"To know something and to think that we know it,—to *understand* that we know it,—are two very different things. Knowing is often a matter of direct perception, insight or introspection, while understanding is always the result of reflection, of observation. We have shown that no knowledge is possible without the knowledge of the self as the knower,—without the knowledge of the piece of knowledge as one's own. This self-consciousness, which lies at the root of all consciousness of objects, is direct knowledge." (p. 9. বাং পু, ৯ পৃ।) মহেশবাবু Caird ও Bradley হইতে আমার মতের আপাতবিরুদ্ধ যে-সকল উক্তি উদ্ধার ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাঠক এখন সে-সকলের প্রকৃত অর্থ

বুঝিতে পারিবেন। বিষয়জ্ঞান বিকাশক্রমেই আত্মজ্ঞানের অগ্রে, মূলে অগ্রে নয়।

মহেশবাবুর সমালোচনার তৃতীয় অংশের প্রথমেই একটি ভয়ানক ভুল পাইলাম। তিনি বলিয়াছেন, "এ জগৎ কি? এ বিষয়ে গ্রন্থকার দুইটি উত্তর দিয়াছেন। (১) "এ জগৎ আমার মনোবিকার, আমার অবস্থা, আমার রূপ। (২) এ জগৎ আমার বিষয়, আমি বিষয়ী।" 'এ জগৎ আমার মনোবিকার,' এই কথা আমি কোথায় বলিলাম? মহেশবাবু আমার পুস্তকের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও যে স্থান হইতে কতিপয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন সে স্থানে ত আমি বলি নাই যে জগৎ আমার মনোবিকার। যাহা আমি বলিয়াছি তাহা এই যে বর্ণ-ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ব্যাপার, যাহাদিগকে লোকে মনোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু মনে করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে মনোবিকার, ইন্দ্রিয়-বোধ বা বিজ্ঞান-মাত্র। ব্যথার দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছি যে ব্যথা যেমন আত্ম-নিরপেক্ষ ব্যাপার নহে, তেমনি রূপ-রসাদিও নহে। মহেশবাবু কি বলিতে চান যে এইগুলির কোন আত্ম-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে? যদি তিনি তাহা বলেন তবে তাঁহার সঙ্গে দার্শনিক তর্ক করা বৃথা। Sensation বা feeling যে sentient বা feeling mind ছাড়া থাকিতে পারে, এই মত কোনো দার্শনিকের আছে বলিয়া ত আমি জানি না। Sensation ও sensationএর কারণে প্রভেদ আছে। Sensationএর কারণ সম্বন্ধে উল্লিখিত স্থলে আমি কিছু বলি নাই, তাহা বলিয়াছি "Refutation of Naturalism" নামক পরিচ্ছেদে। যাহা হউক, বর্ণ-ঘ্রাণাদি ব্যাপার যদি জগৎ হইত, তবে মহেশবাবু আমার মতের যে ব্যাখ্যা ও খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিকই হইত। কিন্তু এইগুলি ত জগৎ নহে আর আমি এইগুলিকে জগৎ কোথাও বলি নাই। এইগুলি প্রকৃত অর্থে বিষয়ও নহে, বিষয়ের উপকরণমাত্র। এইগুলিকে phenomenal বিষয়মাত্র বলা যায়, noumenal বা transcendental বিষয় বলা যায় না। শেষ অর্থে, পূর্ণ অর্থে, বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ, দেশ কাল, এবং বুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব, (conceptions) অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, এই তিন-প্রকার উপকরণ আবশ্যক। এরূপ বিষয়ই প্রকৃত পক্ষে জগৎ, আর এই জগৎ আত্ম-সাপেক্ষ, অথচ ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার অধীন নহে। যাঁরা বলেন যে বিষয়জগৎ ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, তাঁরাই Subjective Idealists. আমি এই মত পোষণ করা দূরে থাক্, আমি ইহার খণ্ডনের জন্য একটি পরিচ্ছেদ লিখিয়াছি। সুতরাং মহেশবাবু Caird, Green প্রভৃতির মত নির্দ্দেশ ও উদ্ধার করিয়া এই বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই আমার উপর প্রযুজ্য নহে। এই-সকল লেখকের সহিত আমার মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই। মহেশবাবু আমার পুস্তকের যে যে স্থান নির্দ্দেশ ও আংশিকভাবে উদ্ধার করিয়াছেন সে-সকল স্থানের কিছু কিছু আমি উদ্ধৃত করি, তাহাতেই পাঠক মহেশবাবুর ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। মহেশবাবুর নির্দ্দিষ্ট ৩৮এর পৃষ্ঠায় আমি বলিয়াছি—"We have thus shown that space, the form in which matter is perceived, depends on consciousness. We shall now show that the matter of perception—colour, hardness, smell, &c., which are supposed to be things or qualities of things independent of mind, are not so, but are also dependent on consciousness. We shall show that they are mental states, sensations or ideas." আমি স্বীকার করি যে "mental states" নামটা একান্ত সমীচীন নহে। ইহা কতকটা আলঙ্কারিক। চলিত অর্থে বস্তু আর বস্তুর অবস্থার মধ্যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ থাকে না, কিন্তু আত্মা ও ইন্দ্রিয়বোধের মধ্যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ আছে। আমি এই সম্বন্ধের স্পষ্ট উল্লেখই করিয়াছি। ইন্দ্রিয়বোধ কেবল এই অর্থেই মানসিক অবস্থা যে অনুভবকারী আত্মাকে ছাড়িয়া ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব। যাহা হউক্, ইন্দ্রিয়বোধ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় এক জিনিস নহে, তাহা পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে মহেশবাবু আমার কথা ভুল করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা যদিও তাঁহার সমালোচনার চতুর্থ অংশে, তথাপি প্রসঙ্গ-ক্রমে এখানেই তাঁহার ভ্রম সংশোধন করি। তিনি আমার ইংরেজি পুস্তকের ১৮-১৯ পৃষ্ঠা নির্দ্দেশপূর্ব্বক কোটেশন চিহ্ন দিয়া লিখিয়াছেন, "কাগজ কলম দোয়াত প্রভৃতি সমুদয়ই আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ"। আমি বস্তুতঃ যাহা বলিয়াছি তাহা এই:—"What I have before me,—paper, ink, inkpot, pen, table, &c.,—are all objects of my sight, related to that form of knowledge which is called visual perception. The pen, paper and inkpot touched by me are related to my tactual sense,—are objects of my sense of touch." (বাঙ্গালা অনুবাদ বাঙ্গালা পুস্তকের ১৯এর পৃষ্ঠায় আছে)। মহেশবাবুর ব্যাখ্যা আর আমার মতে অনেক প্রভেদ। "আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ" বলিলে অস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র বুঝায়; "দর্শনের বিষয়", "স্পর্শের বিষয়" বলিলে এমন বিষয় বুঝায় যে বিষয় ইন্দ্রিয়ক্রিয়া শেষ হইলেও বর্ত্তমান থাকে। আমার উপর একটা কল্পিত মত আরোপ করিয়া তাহা খণ্ডন করা সহজ। সেই কাজের জন্য মহেশবাবুর মত পণ্ডিত লোকের প্রয়োজন নাই, মূর্খ লোকেও তাহা করিতে পারে।

মহেশবাবু তাঁহার সমালোচনার চতুর্থ অংশে গোলযোগের একশেষ করিয়াছেন। তিনি আমার ব্রহ্মবাদের যুক্তিপ্রণালী কিছু-তেই ধরিতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা ধরিবেন? যে যে স্থানে সেই যুক্তি আছে সেই সেই স্থানের কোন উক্তিই তোলেন নাই। সুতরাং তিনি যে খণ্ডন দিয়াছেন তাহা আমার যুক্তির খণ্ডন নহে। আমার যুক্তির আভাসমাত্র এই যে, যে-জ্ঞানকে আমরা দেশকালে প্রকাশিত দেখিয়া কেবল "আমাদের জ্ঞান" বলি তাহা বস্তুতঃ দেশের অতীত, কালের অতীত, অনন্ত; সসীম বস্তু অসীমকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দেশকালের সহিত আত্মার সম্বন্ধ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ নিদ্রা জাগরণ ও স্মৃতি-বিস্মৃতির পরীক্ষাদ্বারা দেখান হইয়াছে যে চিরজাগ্রত সর্ব্বজ্ঞ আত্মার আশ্রয় ব্যতীত এই সমুদয় অসম্ভব। এই যুক্তি আমার পুস্তকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে—"The Temporal and the Eternal" ও "Unity and Difference"—এই দুই অধ্যায়ে—বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মহেশবাবু যখন এই-সকল স্থল স্পর্শও করেন নাই, তখন আমিও আর এই-সকল স্থল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিলাম না। কেবল Green ও Caird সম্বন্ধে তিনি এই অংশে যাহা বলিয়াছেন তার সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। তিনি Greenএর পুস্তকাবলীর তৃতীয় খণ্ড হইতে একটি স্থান উদ্ধার করিয়া ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—"জ্ঞান ভিন্ন কোন বস্তু ধারণা করা যায় না, সুতরাং জ্ঞানই ঐ বস্তুর আশ্রয়—এ-প্রকার কল্পনা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।" Green বলিয়াছেন "thought," মহেশবাবু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "জ্ঞান"।

কেন? "Thought"এর অনুবাদ "চিন্তা," "জ্ঞান" হইবে কেন? Thought ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক ক্রিয়া, ইহার উপর যে বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে না তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, Greenএর গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড এখন আমার কাছে নাই। Green কোন্ সংশ্রবে ও কোন্ অর্থে উল্লিখিত কথা বলিয়াছেন তাহা আমি জানি না, এই জানি যে তাঁহার মত বোঝার জন্য ঐ খণ্ড তেমন প্রয়োজনীয় নয়। তাঁহার প্রধান প্রধান লেখা "Polegomena to Ethics" এবং পুস্তকাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডেই আছে, আর ঐ-সকল স্থলে তিনি অসংখ্য বার বলিয়াছেন যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া বিষয় থাকিতে পারে না। আর ব্যক্তিগত জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানেরই অনুপ্রকাশ। প্রয়োজন হইলে ও স্থান পাইলে আমি এই ভাবের অনেক কথা উদ্ধৃত করিতাম। যাহা হউক্, সমালোচনার এই অংশ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আত্মজ্ঞান ছাড়া যেমন বিষয়জ্ঞান অসম্ভব, বিষয়জ্ঞান ছাড়াও তেমনি আত্মজ্ঞান যখন অসম্ভব, তখন আমি কেন বিষয়কে আত্মার অধীন বলিলাম, আত্মাকেও কেন বিষয়ের অধীন বলিলাম না,—মহেশবাবুর এই এক আপত্তি। এই আপত্তির উত্তর অধ্যাত্মবাদের প্রত্যেক পুস্তকে আছে বলিলেই হয়, আর আমিও আমার পুস্তকে এই উত্তর দিয়াছি। আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানে ভেদ আছে বটে, এবং এই ভেদ অনুসারে বিষয় আত্মা হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু এই ভেদের উপরে একটি অভেদ আছে। বিষয়-বিষয়ীর ভেদ করে কে? আত্মাই করে। ভেদটা জ্ঞানের ভিতরকার ভেদ, সুতরাং ভেদকারী আত্মা এই ভেদের অতীত ও ভেদের আশ্রয়। বিষয়ে সেই আশ্রয়ত্ব নাই। এই তত্ত্বটি না বোঝা পর্যন্ত বিষয় ও বিষয়ীকে পরস্পর স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ হয়, বোধ হয় কেহই কাহারো আশ্রয় নয়, কিন্তু তত্ত্বটি বুঝিলে দেখা যায় প্রকৃত পক্ষে বস্তু একটিমাত্র আর সেই বস্তু অনন্ত আত্মা; অসংখ্য বিষয় ও অসংখ্য বিষয়ী তাঁহার অন্তর্গত ভেদমাত্র, স্বতন্ত্র বস্তু কিছুই নহে। আমার সমগ্র পুস্তকে এই "জ্ঞানবাদ"ই ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং Green, Caird, Royce প্রভৃতি জ্ঞানবাদীর মতও ইহাই। মূল প্রণালীও তাঁহাদের সঙ্গে আমার এক। চিন্তার নিম্নতম সোপান বিষয়বাদের অভেদ হইতে দ্বিতীয় সোপান বিষয়-বিষয়ীভেদে উঠা, আবার তাহা হইতে তৃতীয় ও উচ্চতম সোপান ভেদাভেদবাদে উঠা। ইহারই নাম Dialectical Method. যাহা হউক, আর একটি কথা বলিলেই সমালোচনার এই অংশের কথা বলা শেষ হইবে। Green সাহেব John Cairdএর Introduction to the Philosophy of Religionএর ঈশ্বর-প্রমাণে সন্তুষ্ট হন নাই, এই কথা সবিস্তার বলিয়া মহেশবাবু বলিতেছেন, "মানবজ্ঞান যে ব্রহ্মের জ্ঞানেরই প্রতিবিম্ব ইহা Cairdও প্রমাণ করিতে পারেন নাই, সীতানাথবাবুও পারেন নাই।" Cairdএর সঙ্গে আমার নাম করায় বড়ই শ্লাঘা অনুভব করিলাম, কিন্তু তুলনাটার সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। আমি John Caird-এর প্রমাণ ও Greenএর সমালোচনা উভয়ই পড়িয়াছি আর ঐ সমালোচনা সম্মুখে রাখিয়াই John Cairdএর অতিসংক্ষিপ্ততা-দোষ পরিহার করিয়া Absolute Idealismএর প্রমাণ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি? John Caird যাহা করিতে পারেন নাই সীতানাথ বাবু ত তাহা পারিবেনই না, এই ভাবিয়া যদি মহেশবাবু আমার প্রমাণ না পড়িয়া থাকেন তবে তাহা আমারই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তাঁহার উপরি-উক্ত সরাসরি বিচারটাকে কিছুতেই সুবিচার বলিতে পারিতেছি না।

মহেশবাবুর সমালোচনার পঞ্চমাংশের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। Bradleyএর মত যে ব্রহ্মবাদ, তাহা আমি তাঁহার উক্তি তুলিয়াই প্রমাণ করিয়াছি, সুতরাং মহেশবাবুর সমালোচনায় ঐ বিষয়ে আমার মত পরিবর্তিত হয় নাই। যাহা হউক, আমি Bradleyর ব্রহ্মবাদে সন্তুষ্ট নই। আমার ব্রহ্ম প্রেমময়, প্রেমব্যক্ত পুরুষ—আমি ইহা আমার পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মহেশবাবু সেই অধ্যায়ের কোন খবরই লন নাই। Jamesএর মত সম্বন্ধে মহেশবাবু যে দেড় স্তম্ভ লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তিনি James সম্বন্ধে কেন আমার মত ভুল বুঝাইলেন ও আমার কথা ভুল করিয়া উদ্ধার করিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমি ত আমার বইয়ে কোথাও Jamesকে নাস্তিক বলি নাই, অথচ মহেশবাবু বলিতেছেন, "সীতানাথ বাবু Jamesএর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। লোকটা যেন নাস্তিক, পড়াশুনাটা বড়ই কম এবং over-weening self-confidenceটা বড়ই বেশী।" Over-weening self-confidence"এর কথা আমি ত Jamesএর সম্বন্ধে বলি নাই, সাধারণভাবে Pluralism সম্বন্ধে বলিয়াছি। "পড়াশোনাটা বড়ই কম" এই কথাও আমি বলি নাই, ঐ মতাবলম্বীরা বিরুদ্ধমতের সাহিত্য ভাল জানেন না, ইহাই বলিয়াছি। এই বিষয় Bradleyও উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমাকে বাধ্য হইয়া আমার লেখা হইতে কিঞ্চিৎ তুলিতে হইতেছে; ইহা হইতেই পাঠক বুঝিবেন মহেশবাবু আমার বই কত অল্প মনোযোগের সহিত পড়িয়াছেন। আমি ২৪৭এর পৃষ্ঠায় Pluralism সম্বন্ধে বলিয়াছি—

"In still another characteristic it resembles its elder sister (The elder Empiricism), and that is its impatience in studying the literature of the opposite school. The result is an over-weening confidence in itself and an exaggerated idea of its own victory over enemies mostly the creatures of its own imagination. In going through James's *Pluralistic Universe*, one is struck with the author's superficial knowledge of the Absolutist writers he mentions and criticises. There is nowhere any attempt to systematically state or summarise the arguments of these writers, to enter into the analysis of experience given by them, and then to show its insufficiency or to expose any unwarrantable assumptions that may be involved therein. The whole criticism resolves into the suggestion of a number of difficulties which the theistic or monistic theory of the world cannot fully meet."

মহেশবাবু Jamesএর উপরি-উক্ত পুস্তকের একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া Jamesএর ঈশ্বরবিষয়ক মত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমার উক্ত পুস্তক প্রথমে পড়িবার সময়ও বোধ হইয়াছিল আর এখনও মহেশবাবুর অংশের অগ্রপশ্চাৎ মিলাইয়া ঐ পুস্তকের ঐ স্থানটা আবার পড়িয়া বোধ হইল James ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন স্থির বিশ্বাস প্রকাশ করেন নাই, কেবল Absolutistএর ব্রহ্মবিষয়ক ও লৌকিক বিশ্বাসের ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা এই দুটার উপযোগিতা সম্বন্ধে তুলনা করিয়াছেন। যাহা হউক James যদি ঈশ্বরবাদীই হন, তাহা হইলেও তাঁহার ঈশ্বর যখন সসীম, তখন সেই ঈশ্বর আমার কাছে Bradleyর Absoluteএর চেয়েও অধিক অতৃপ্তিকর। তাঁহার সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলি নাই। আমি উক্ত প্রবন্ধে সবিস্তার বলিয়াছি Wardএর ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে। সেই বিষয় যখন মহেশবাবু স্পর্শ করেন নাই তখন আমারও আর কিছু

কর্ত্তব্য নাই। আমার শেষ কথা এই যে সাময়িক পত্রিকায় তর্কবিতর্ক চালাইবার অবকাশ আমার নাই। আমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অন্যরূপ। আমার সমস্ত দার্শনিক গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার" অতি ভ্রমপূর্ণ ও ভ্রমজনক সমালোচনা বাহির হইয়াছে দেখিয়া কিছু বলিতে বাধ্য হইলাম। কেহ যদি বইখানা সমগ্ররূপে পড়িয়া ইহার অপক্ষপাতী সমালোচনা করেন, আর সেই সমালোচনা আমার মতের প্রতিকূলও হয়, তথাপি তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার থাকিবে না।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি খেদের কথা।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশের ভদ্রসমাজে চিত্রশিল্পের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছিল কম লোকে। এক্ষণে চিত্র-শিল্পের চর্চা প্রলয়ের অন্ধকার হইতে এই যে সাড়া দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই অভিনন্দনের বিষয়। সব ভাল—কেবল একটি বিষয় বড্ড আমার চক্ষে বাজে; সে বিষয়টি প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার বাধো বাধো ঠেকিতেছে;—তাহা আর কিছু না—সুন্দরী স্ত্রীর নাকে নথ বা নলক। একে তো এক্ষণকার কালের মার্জ্জিত রুচিতে নথের সজ্জাপারিপাট্য নিতান্তই একটা হাস্যকর সামগ্রী; তাহাতে আবার পুরাতন কালের কাব্যসাহিত্যাদির একটি স্থানেও নাকের গয়নার উল্লেখ নাই। সত্য কথা যদি বলিতে হয়, তবে নাকের নথ আর দাঁতের মিসি এই দুইটি অনার্য্যোচিত অলঙ্কার ডাহা বর্ব্বরতার পরিচায়ক।

চিত্রশিল্প সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) ভাবপ্রধান (idealistic) এবং (২) রূপপ্রধান (realistic)। ভাবপ্রধান চিত্রের তো কথাই নাই—রূপপ্রধান চিত্রেও নথ বা নলকের ন্যায় স্বভাব-শোভন অকৃত্রিম মুখমাধুর্য্যের রসহন্তা এমন আর কিছুই নাই, আর, সেইজন্য অধুনাতন কালের ভদ্রসমাজে নথ এবং নলকের ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। এবিষয়ে বাহুল্য বাক্যব্যয় অনাবশ্যক-বোধে আমার মনের খেদটি ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

শ্রী দ্বি—।

ব্যাকরণ-বিভীষিকা সমালোচনার একটু জের

খাঁটি সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে উভচর শব্দ হয় না; তথাপি ইহা যে চলিতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি; কিন্তু সে সময়ে তাহার একটা তেমন প্রয়োগ দেখাইতে পারি নাই, আজ তাহা দেখাইতেছি। শ্রীমদ্ভাগবতে (৩.২৫.৩৯) উভযায়ী (=উভয়গামী) শব্দ আছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—

"ইমং লোকং তথৈবামুমাত্মান মুভযায়িনম্।
আত্মানমনু যে চেহ যে রায়ঃ পশবো গৃহাঃ ॥"

লক্ষণীয় উভচর ও উভযায়ী শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ একই। অবেস্তাতে কেবল উব (=উভ) শব্দ আছে, উভয় শব্দের প্রয়োগ তাহাতে একবারে লুপ্ত হইয়াছে।

পুত্তল শব্দ লইয়াও আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু মনে হইতেছে কোনো সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রয়োগ দেখাইতে পারি নাই। আজ দুইটি প্রয়োগ দেখাইব। গায়ত্রী-তন্ত্রে (৺শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব-কৃত তন্ত্রতত্ত্ব, ১১৮ পৃ.) কুশপুত্তলী আছে :—

"কুশপত্রশতৈঃ সার্দ্ধৈর্নির্ম্মায় কুশপুত্তলীম্।
বেদোক্তবিধিনা তস্য অগ্নিদাহং সমাচরেৎ ॥"

আর দেবীভাগবতে (ঐ, ৩১৭ পৃ.) কাষ্ঠপুত্তলিকা আছে :—

"যুষ্মানহং নর্ত্তয়ামি কাষ্ঠপুত্তলিকোপমান্।"

শব্দের পুনরুক্তি-প্রসঙ্গে কোথাও যেন পড়িয়াছি মনে হইতেছে, ললিত বাবু বা অপর কোনো লেখক কোনো বাঙ্‌লা লেখা হইতে কালান্তকযম শব্দ তুলিয়াছেন। ইহা ভাগবতেরই একটি শ্লোকের মধ্যে আছে :—

এবং নির্জ্জিতং সিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতো কোপিতং গজম্।
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্ ॥ ১০.৪৩.৫

শ্রীধরস্বামী অর্থ করিয়াছেন—"অন্তকো মৃত্যুঃ, কালস্তন্নিমিত্তং, যমস্তন্নিয়ন্তা, তৈরুপমা যস্য।" অর্থাৎ অন্তক=মৃত্যু, কাল=মৃত্যুর কারণ, যম=মৃত্যুর নিয়ন্তা, ইহাদের সহিত উপমা যাহার। টীকাকার এস্থানে ঐ তিনটি শব্দেরই পৃথক্-পৃথক্ অর্থ দেখাইয়াছেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

শব্দপ্রসঙ্গ

১। বাঙ্‌লায় থাম, থামা ইত্যাদি কোথা হইতে আসিল? অবেস্তা ইহার খাঁটি উত্তর দিতে পারে। সংস্কৃত শম্ (=শান্ত হওয়া) ধাতুর স্থানে অবেস্তায় √থম্ হয়।

২। বাঙ্‌লায় বলা হয়, সাদা ফিট্, ফিট্-ফাট্, ইত্যাদি। এই ফিট্, ফাট্ শব্দের মূল কি? সংস্কৃত √শ্বিত্ (=সাদা হওয়া) ধাতুর প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে কেবল তদুৎপন্ন শ্বেত শব্দই দেখা যায়। শ্বিত্র (=শ্বেত কুষ্ঠ) শব্দও এই ধাতু হইতে হইয়াছে। সংস্কৃত √শ্বিত্=অবেস্তা √স্পিত্। প্রাকৃতে স্প=ফ, এবং ত=ট। অতএব স্পিত্=ফিট্। আবার এই স্পিত হইতেই হিন্দী ফারসী (?) সফেদ। অপর দিকে বৈদিক √শ্বিত ধাতু হইতেই Anglo-Saxon √hwit ধাতু, শ=হ, এবং ইহা হইতেই ইংরেজী √white (to make white)।

৩। বাঙ্‌লায় শব্দবিশেষ অর্থে থন্-থন্ প্রযুক্ত হয়। ইহা অনুকরণ শব্দ হইতে পারে। অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। সংস্কৃত √স্বন্=অবেস্তা √থ্বন্।

৪। দর্শন অর্থে বেদে ও অবেস্তায় √স্পশ্ আছে, এবং ক্রিয়াপদ রূপে ইহার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। লৌকিক সংস্কৃতে ইহার একটি মাত্র কৃদন্ত পদ রহিয়াছে স্পশ (=চর) আর একটি শব্দ রহিয়াছে পস্পশা (পতঞ্জলিকৃত ব্যাকরণ মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিকের নাম)। লৌকিক সংস্কৃতে √স্পশ্ নিজের সকারকে হারাইয়া √পশ্ (অর্থাৎ পশ্য—√দৃশ্-স্থানে আদিষ্ট) আকার ধারণ করিয়াছে। চর-অর্থে পূর্ব্বোক্ত স্পশ=Eng. *Spy*, অবেস্ত. স্পশন=Ger. *Spehion*.

৫। মদ্য-অর্থে হালা শব্দ সংস্কৃতেও চলিত আছে। কিন্তু ইহা মোটেই সংস্কৃত নহে, পালিপ্রকাশের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি। কেহ (বামন) ইহাকে দেশী বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার মূল কি পাওয়া যায় না? সংস্কৃত সুরা=অবেস্তা হুরা। র=ল, অতএব হুরা=হুলা; তাহার পর উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে হুলা হইতে হালা হইয়াছে মনে হয়।

৬। সংস্কৃতের উর্ব্বরা (ভূমি) শব্দটির প্রকৃত মূল কি? সংস্কৃত তরু অর্থে অবেস্তায় উর্ব্বরা (স্ত্রীং) শব্দ প্রযুক্ত হয়। তরুবরা =অরুবরা (ত লোপে)। তাহার পর উচ্চারণবৈচিত্র্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া এই অরুবরা শব্দই উর্ব্বরা হইয়াছে কি? তাহা হইলে

উর্ব্বরা শব্দের আসল অর্থ দাঁড়ায়—যে ভূমিতে তরু বহু অর্থাৎ প্রধান বা প্রচুরভাবে হয়। তরু ও দ্রু (সংস্কৃত ও অবেস্তা) একই। দ্রু=Gr. *Drus.*

৭। জাগরণ-অর্থে বৈদিক সংস্কৃত √গৃ (=অবেস্তা √গর্) লৌকিক সংস্কৃতে অভ্যস্ত হইয়া √জাগৃ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এইরূপ চতুর্থকারে স্থা-ধাতুর স্থানে তিষ্ঠ আদেশ বস্তুত স্থা-ধাতুর অভ্যস্ত আকার।

৮। বৈদিক √হূ (আহ্বান, তুলঃ- √হ্বে) হইতে হ ব ন=অবেস্তা জ্ব ব ন। ইহাতে ফারসী জ বা ন (?)।

৯। সংস্কৃত স্ব র্ (=জ্যোতিঃ, ইহা হইতে সূ র, সূ র, সূ র্য্য) অবেস্তা হ্ব র (সূর্য্য) Gr. *helios* (সূর্য্য); আবার ইহা হইতে পুনর্ব্বার সংস্কৃত হে লি (সূর্য্য)।

১০। তামাক খাইবার হুঁ কা শব্দটি কোথা হইতে আসিল? সংস্কৃতে শুষ্ক=অবেস্তা হুস্ক; স্ক=ক্ক। এইরূপে হুস্ক হইয়া দাঁড়াইল হুক্ক, হুকা। নারিকেলের শুষ্ক অস্থিটাই ত হুঁকা হয়। খুব সম্ভব এই জন্যই তাহার ঐ নাম।

১১। সংস্কৃত যু ব ন্=L. *juvenis*=(cf. Eng. *young*) অবেস্তা য়ূ ন্, য ব ন্। সংস্কৃতে প্রচলিত য ব ন (*Ionian*) শব্দ অবেস্তার য ব ন্ হইতে আসিয়াছে কি?

১২। সংস্কৃত কৃ মি=অবেস্তা কে রে মা। ককার লোপে ইহা এ রে মা হইতে পারে। Ger. *wurm* ও Eng. *worm* এই কে রে মা—এ রে মা র সহিত সম্বন্ধ।

১৩। বাঙ্‌লায় গরুর জা ব কাটা প্রসিদ্ধ আছে। জা ব কিরূপে হইল? বৈদিক √জ ভ্ (চর্ব্বণ করা, তুলঃ— √জ ম্ভ) =অবেস্তা √জব। √জম্ভ্+ক্ত=জ ব্ধ=জ ব ভ=জাব্।

১৪। ভূমি-অর্থে বৈদিক সংস্কৃত জ্ম=অবেস্তা জ়েম=ফারসী জ়মী ন=বাঙ্‌লা জমি।

১৫। সংস্কৃত ব র (বেষ্টন, তুলনীয়—বৃ ত্তি)=অবেস্তা ব র (আবেষ্টন, বেড়া)। ব র=ব ল। Lat. *vallum*, a rampart, Ger. Eng. *wall.*

১৬। সংস্কৃত গদ্=অবেস্তা জ দ্ (অনুনয় করা, প্রার্থনা করা)। ইহাতেই বাঙ্‌লায় জে দ করা আসিয়াছে।

১৭। অবেস্তা ব রে মি (ঢেউ)=সংস্কৃত উ র্মি। অবেস্তার ব রে মি=সংস্কৃত ভ্র মি। উ র্মি শব্দ ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া ধরা হয় (উণাদি সূত্র, ৪,৪৪), কিন্তু বস্তুত তাহা ভ্র মি হইতেই পূর্ব্বোক্ত রূপে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

১৮। অবেস্তা √ব দ্ (ভিজান) =সংস্কৃত √উদ্। √উদ্+ক্ত= উ ত্ত = wet।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্‌লার বানান-সমস্যা

১। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ব ঙ্গ ভা ষা য় অ ক্ষি চা র প্রসঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার আছে, নিম্নে তাহা লিখিতে চেষ্টা করিব।

২। তিনি "খাওয়া দাওয়া"র চর্চা করিয়া এই-সকল শব্দের ও য়া কিরূপে বাঙ্‌লায় প্রবেশ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। ও য়া র আকারটা কোথা হইতে আসিল, আমি প্রথমে তাহাই দেখাইব। সংস্কৃতের অনট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বাঙ্‌লায় আকারান্ত দেখা যায়। ব্যা ক র ণ - বি ভী ষি কা -সমালোচনায় এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। সং চলন বাং চলা, এইরূপ মরণ-মরা, করণ-করা, তাড়ন-তাড়া, ক্রন্দন- (কন্দন-) কাঁদা, ইত্যাদি। কিরূপে এই আকার হইল? সংস্কৃত অন্-ভাগান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে অন্-এর নকারের লোপ ও অকার-স্থানে আকার হয়। যথা— রাজন্-রাজা, ব্রহ্মন্—ব্রহ্মা, অধ্বন্—অধ্বা, যুবন্—যুবা, মঘবন্—মঘবা, ইত্যাদি। চলন, মরণ ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ-সকল অকারান্ত হইলেও বাঙ্‌লার স্বধর্ম্মে অকারান্তরূপে উচ্চারিত না হইয়া প্রায়ই নকারান্ত ভাবে উচ্চারিত হয়; চ ল ন কে আমরা চ ল ন্ উচ্চারণ করিয়া থাকি। এইজন্য ঐ-সকল শব্দ বস্তুত অকারান্ত হইলেও সংস্কৃতের অন্-ভাগান্ত শব্দের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, এবং তদনুসারেই সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্যে তাহাদের নকারের লোপ ও পূর্ব্ববর্ত্তী অকার-স্থানে আকার হইয়া যায়, এবং চলন বাঙ্‌লায় চলা মূর্ত্তি ধারণ করে। এই নিয়মেই সংস্কৃতের অনট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দসমূহের প্রতিরূপ বাঙ্‌লা আকারান্ত শব্দগুলির সমাধান করিতে পারা যায়।

৩। কিন্তু খা ও য়া হইল কিরূপে? সংস্কৃত খা দ ন প্রাকৃতে খা অ ন হয়। ইহা হইতে বাঙ্‌লায় প্রথমে খা আ পদই হয়। শ য় ন প্রাকৃতে শ অ ন (অথবা স অ ন; স য় ন পদও হইতে পারে)। তাহা হইতে বাঙ্‌লার স্বধর্ম্মে শকার-স্থিত অকারের ওকার-উচ্চারণে ও পূর্ব্বের নিয়মে শো আ। ন য় ন = ন য়্+অ ন = ন য়্+অ ন্। পালি-প্রাকৃতে অ য়্ = এ হইয়া থাকে। অতএব ন য়্ = নে, অ ন্ = (পূর্ব্বোক্ত নিয়মে) আ। এইরূপে সংস্কৃত ন য় ন বাঙ্‌লায় প্রথমে নে আ হইয়াছে। সংস্কৃত যা ন = যা+অন। এই যা অ ন হইতে পূর্ব্ব নিয়মে যা আ। দা ন = দা+অ ন। এই দা অ ন হইতে উচ্চারণের বৈলক্ষণ্যে দে অ ন হয়; যেমন সংস্কৃতে লোট্ মধ্যমপুরুষের একবচনে দা হি স্থানে দে হি হইয়া থাকে। এই দে অ ন হইতে দে আ। অতএব যোগেশবাবু যদি বাল্যকালে এতাদৃশ রূপই শিক্ষা করিয়া থাকেন, বা রাঢ়ে অদ্যাপি বহুলোকে খা আ, যা আ, দে আ, নে আ, শো আ বলে, মাঝে ওকার আনে না (৩০২ পৃঃ) তাহা হইলে সেজন্য কাহারো আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ দেখি না। শব্দের প্রকৃতি ত এই রূপকেই সমর্থন করিতেছে। আমি শৈশবে এক হাতুড়ে কবিরাজকে বা য়ু স্থানে বা উ উচ্চারণ করিতে শুনিয়া হাসিয়াছিলাম; তাহার পর প্রাকৃতের সহিত পরিচয় আরম্ভ হইলে নিজেরই অজ্ঞতা বুঝিয়া আর একবার হাসিয়াছিলাম।

৪। সংস্কৃত √ভূ ধাতু হইতে প্রাকৃত বা বাঙ্‌লায় √হু হইয়াছে। সং ভ ব তি প্রাকৃতে হ ব তি, হো তি, হো ই। সং ভ=প্রা হ। প্রাকৃতে বহুস্থলে অব্ = ও (হেমচন্দ্র, ৮,১, ১৭২)। এই নিয়মে ভ ব = হ ব = হো। এখন সং ভ ব ন = প্রা হ ব ন। হ ব্ = হো। উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্যে হ ও, এবং অ ন্ = আ। এইরূপে সংস্কৃত ভ ব ন বাঙ্‌লায় হো আ বা হ ও আ হইয়াছে। সংস্কৃত প্রা প ণ (প্র+ √আপ্) প্রাকৃতে পা ব ন (পা+আব+অন)। ইহা হইতে পা ও ন, ক্রমে পা ও আ। এইরূপে ধা ব ন হইতে ধা ও আ।

৫। অথবা সংস্কৃত ভ ব ন প্রাকৃতে হ ব ন। হ ব ন হইতে ব-লোপে (হেমচন্দ্র, ৮,১, ১৭৭) হ অ ন। প্রা প ণ হইতে পা ব ন (প=ব, প্রাকৃত-প্রকাশ, ৩,১৫) = পা অ ন। ধা ব ন = ধা অ ন। এখন যুগপৎ বাঙ্‌লায় অকারের ওকার*-উচ্চারণের ধর্ম্মে ও অন্-ভাগান্ত শব্দের ন-লোপে পূর্ব্ববর্ত্তী অ-স্থানে আকার হওয়া হেতু ঐ

---

* এই ওকার হ্রস্ব।

হ অ ন, পা অ ন, খা ব ন যথাক্রমে হ ও আ, পা ও আ, খা ও আ রূপ ধারণ করে।

৬। পূর্ব্ববঙ্গে ও আরো অন্যান্য স্থলে খা অ ন, দা অ ন বলা এখনো খুব চলিত আছে। এস্থলেও যাঁহারা অকারকে ওকার উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা খা অ ন হইতে খা ও আ করিলেন, দা অ ন হইতে দা ও আ করিলেন। আর যাঁহারা অকারকে ওকার উচ্চারণ করেন না, তাঁহাদের নিকট খা অ ন—দা অ ন যথাক্রমে খা আ—দে আ (দা—দে, যেমন দা হি—দেহি) মূর্ত্তি ধারণ করিল।

৭। অথবা হ য়া, খা য়া, দা য়া হইতেই (দ্রষ্টব্য § ৯) উচ্চারণের বৈলক্ষণ্যে হ ও য়া, খা ও য়া, দা ও য়া হইতে পারে। শেষের য়াকার-উচ্চারণই এই বৈলক্ষণ্যের কারণ।

৮। খা ও য়া-দা ও য়া র অন্তর্গত ওকারের সমাধান এইরূপেই করিতে পারা যায়। আকারের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন যকার কোথা হইতে আসিল দেখিতে হইবে—পূর্ব্ব-প্রদর্শিত আ-স্থানে য়া হইল কিরূপে?

৯। আর্ষ প্রাকৃতে একটি নিয়ম আছে ("অবর্ণো য শ্রুতিঃ", হেমচন্দ্র, ৮. ১. ১৮০ ; শুভচন্দ্র, ১. ৩. ৫ ; সিংহরাজ, ১২. ৫ ; চণ্ড, ৩. ৩৫ ; ক্রমদীশ্বর, ৮. ২. ২), ইহাতে অকার-আকার-স্থানে য-যা হইয়া যায়।* প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মে কা ক=কা অ, র জ ত=র অ অ, ন গ র=ন অ র, গ তা—গ আ হইয়া থাকে, কিন্তু উল্লিখিত বিশেষ নিয়মে ঐ সকল শব্দ যথাক্রমে কা য়, র য় য়, ন য় র, গ য়া হইবে। এইরূপ মা তা সাধারণ প্রাকৃতে মা আ, কিন্তু আর্ষ প্রাকৃতে মা য়া ; ল তা সাধারণ প্রাকৃতে ল আ, কিন্তু আর্ষ প্রাকৃতে ল য়া হইবে। এই নিয়ম অনুসরণ করিলে খা ও আ-দা ও আ হইতে খা ও য়া—দা ও য়া সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন খুলিয়া দেখিলে জানা যাইবে, শু নি য়া, ক রি য়া প্রভৃতি স্থলে সেখানে সর্ব্বত্রই শু নি আঁ (২৬ পৃ.), ক রি আঁ (১৪ পৃ.), গি আঁ (৩০ পৃ.), পু ছি আঁ (১৫ পৃ.) দি আঁ (১৮ পৃ. ইত্যাদি প্রযুক্ত হইয়াছে, কখনই ০য়া দেওয়া হয় নাই।† এইরূপ শু য়া সেখানে শু আ (১৫, ২৪ পৃ.), গো য়া ল সেখানে গো আ ল। এতাদৃশ অনেক০ প্রয়োগ রহিয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলীতে (সাহিত্য-পরিষৎ) গো আ লি (৪৮১ পৃ.), গো য়া লী (১৮০), উভয়ই দেখা যায়। পা রি য় (=পারিয়া), দে খি অ (—দেখিয়া, ২১৮) উভয়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। কাশীরাম, কৃত্তিবাস, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস-প্রভৃতির প্রচলিত সংস্করণ-সমূহে ০য়াই দেখা যায়। এই জন্যই আমরাও এইরূপই লিখিয়া আসিতেছি। বস্তুত ০আ- ০য়া লইয়া বিশেষ গোলমালের কিছুই নাই। উচ্চারণের পার্থক্যেই প্রাকৃতেও অকার ও যকারের পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

১০। বলিয়াছি ল তা সাধারণ প্রাকৃতে ল আ, কিন্তু আর্ষ প্রাকৃতে ল য়া। এতাদৃশ স্থলে যকারের উচ্চারণ শ য় ন-প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের অন্তর্গত যকারের মত সম্পূর্ণরূপে নহে, তাহা অপেক্ষা লঘুতর প্রযত্নে ঐ যকার উচ্চারিত হইয়া থাকে ("লঘু প্রযত্নতর যকার শ্রুতির্ভবতি" ‡ —হেমচন্দ্র, ৮. ১. ১০০)। এখন ল আ ও ল য়া র মধ্যে কতটুকু ভেদ আছে, পাঠকগণ অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে খা ও আ, আর খা ও য়া রূপেরও মীমাংসা হইয়া যাইবে।

১১। যোগেশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন "করা জানা শোনা খাওয়া লওয়া প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ হয়।" আমি একটু খুঁজিয়াও দেখিলাম। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কটি প্রয়োগ পাইয়াছি (দে খা, ৯৯)। কেহ যদি এদিকে লক্ষ্য রাখি প্রাচীন সাহিত্যগুলি পড়েন, তাহা হইলে সহজেই ধরিয়া ফেলিতে ০য়া বাদ কখন হইতে এইরূপ পদের প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে।

১২। ও য়া র সমাধানে যোগেশ-বাবুর সহিত আমি একমত হইতে না পারিয়া আমার বক্তব্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার মত কেন গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাহা বলিতে হইবে। তিনি দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) প্রথম—"খা পরে আ মিশিয়া খা হইয়া পড়িতে পারে। এই আশঙ্কায় মাঝে ও বসিয়া ধাতুর আ হইতে প্রত্যয়ের আ পৃথক্ রাখিয়াছে।" ইহা কেবল কল্পনা, কোনো নিয়ম বা প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। ভাষা নিজের রূপ নিজেই নিঃশব্দ ভাবে গড়িয়া ও ভাঙিয়া থাকে, তাহাতে তাহার যে রূপই দাঁড়াউক ; যে ব্যক্তি ভাষা প্রয়োগ করিবেন, তাঁহাকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে। প্রশ্ন হইতেছে ওকারটা বসিল বটে, কিন্তু কিরূপে বসিল? কোথা হইতে আসিল? একার-ঐকার-প্রভৃতি না আসিয়া ওকারই বা আসিল কেন? ইহার কোনো উত্তর দেওয়া হয় নাই।

১৩। (২) তিনি দ্বিতীয় কারণ অনুমান করিয়া ক রি বা কু—ক রি বা ক—ক রি বা—করবা—প্রভৃতির ক্রম-পরিবর্ত্তন প্রদর্শনে ও য়া দেখাইয়াছেন। সাধন-প্রণালী যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও অর্থের মিল হয় না। যোগেশ বাবু নিজেই বলিয়াছেন।—"বহু পূর্ব্বে ছিল, করিবাকু পরে করিবাক—করিবার নিমিত্ত।" ধ রি বা ক (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১২)=ধরিতে, ক রি বা ক (১৪)=করিতে, দি বা ক (১৪)=দিতে, মারিবাব=মারিতে ; এতাদৃশ প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে আছে, আর তাহারই অপর আকার ক রি বা—করবা, ধরিবা—ধরবা, মারিবা—মার্বা, যা বা, খা ব, দি বা ইত্যাদি এখনো আমাদের অঞ্চলে (মালদহের পশ্চিম অংশে) খুবই প্রচলিত আছে। খাওয়া দাওয়া যদি খাইবাক দিবাক অথবা খাবা—দিবা প্রভৃতি হইতেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে খাওয়া—দাওয়ার অর্থ খাইতে—দিতে বা খাইবার জন্য—দিবার জন্য। কিন্তু বস্তুত এই অর্থে ঐ-সকল শব্দ প্রযুক্ত হয় না।

১৪। এ স্থানে একটি প্রশ্ন করা যাউক।—এই ক রি বা ক—ক রি বা প্রভৃতি পদগুলি কোথা হইতে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছে? ক স্বার্থে, প্রাকৃতে ত অনেক স্থলেই হয়, সংস্কৃতেও কম নহে (দ্রষ্টব্য—সিংহরাজ—প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৩.৫)। থাকিল ক রি বা। আমার মনে হয় তুম্-অর্থে বৈদিক ত বৈ বা ত বে ঙ (পাণিনি, ৩. ৪. ৯), পালি ত বে (পালিপ্রকাশ, ৫§২৯), বা প্রাকৃত এ বি প্রত্যয় যোগে এই-সকল পদ হইয়া থাকিবে। পালিবার জন্য এই অর্থে প্রাকৃতে

---

* এই যকার-সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করা হইবে।

† শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় বহু বৈচিত্র্য আছে, এবং তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এখানে আজকাল-কার ক রি য়া প্রভৃতি ক রি আঁ প্রভৃতি হইয়াছে, কিন্তু আমাদের যেখানে ইকার, ইহাতে সেখানে প্রায়ই রি দেখা যায়—পা রি ব (২৫৬), পা রি লোঁ (২০৬), জা না রি অঁ (২৩৩), মা না রি বোঁ (১৩), খা রি ব (২৩৭) ; ল রি আঁ (১৭৬), বি না রি আঁ (২৩৩), কি লা রি আঁ, ভ রা রি আঁ (২৯৯) ইত্যাদি। আবার কা টা ই ল (১৩১), হা রা ই বে (১), পা ঠা-ই বোঁ (২২), পা ঠা ই য়াঁ (২৩), পে লা ই ল (২৫, ২৭), পা ই ল (৬৪), খা ই ল (৩৮), ইত্যাদি।

‡ শুভচন্দ্র (১. ৩. ৫) লিখিয়াছেন—"লঘু প্রযত্নপর যকার শ্রুতিঃ।"

পালে বি পদ হয়। সংস্কৃত কৃ বাঙ্লায় কর্। ইহার পর ভবে-প্রত্যয় করিলে ইকার-আগমে ক রি ত বে, তাহার পর সাধারণ নিয়ম-অনুসারে ত-লোপে (বিতান—বিআণ) ক রি অ বে, তাহার পর প্রাকৃত সন্ধির প্রভাবে ক রি বে। অপভ্রংশ প্রাকৃতের নিয়মে শেষের একার অনায়াসেই আকার হইতে পারে। এইরূপে ক রি বে ক রি বা হইয়া দাঁড়ায়। এখন এই-সকল পদের অপর কোনো সমাধান আছে কি না পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

১৫। এইবার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবুর উদ্ভাবিত ওা-অক্ষর বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১৬। হ ও আ, খা ও আ'র আদি ও শেষ স্বরের উচ্চারণে কোনো গোলমাল নাই, যা কিছু গোল মধ্যবর্ত্তী ওকারকে লইয়া। এখানে ওকার প্রায়ই ঠিক ওকারের যেরূপ উচ্চারণ হওয়া উচিত, সেরূপ উচ্চারিত হয় না, তাহা অপেক্ষা অনেকটা লঘুভাবে ইহার উচ্চারণ হইয়া থাকে। এখানকার ওকার যদি ঠিক ওকারেরই মত উচ্চারিত হয়, তবে তাহার ধ্বনি হইবে হ-ও-আ, খা-ও-আ। রামানন্দ বাবু ইহাই ইংরেজী হরপে দেখাইয়াছেন ha-o ā, kha-o-ā। হকার ও ওকারের মধ্যে অকারের সেরূপ ব্যবধান রক্ষা না করিয়া উভয়কে দ্রুতভাবে উচ্চারণ করিলে হও-আ, বা ইংরেজী হরপে hao-a হয়। কেহ কেহ আজকাল এরূপ উচ্চারণ করেন। কিন্তু এস্থলেও ওকারের সম্পূর্ণ উচ্চারণ হয় না। বলিয়াছি এতাদৃশ স্থলে ওকারটি অনেক লঘু ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। অবেস্তায় দুইটি ওকার আছে, একটি হ্রস্ব (short), অপরটি দীর্ঘ (long)। প্রথমটির উচ্চারণ for-এ o'র মত, আর দ্বিতীয়টির উচ্চারণ fore-এর o'র মত। অর্থাৎ ঠিক সংস্কৃত ওকারের মত। হ ও আ, খা ও আ'র ওকারটা হ্রস্ব। বোধহয় রামানন্দ বাবু ইহাই প্রকাশ করিবার জন্য ইংরেজী হরপে hawā, khawa লিখিয়াছেন। তাহা হইলে কথাটা এই দাঁড়াইল যে, হ ও আ, খা ও আ'র মধ্যবর্ত্তী বর্ণটি খাঁটি (অর্থাৎ সংস্কৃত) ওকার নহে, ওকারের সদৃশ আর-একটি ধ্বনির (অর্থাৎ হ্রস্ব ওকারের) দ্যোতক পৃথক্ বর্ণ। কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায় ওকারই প্রযুক্ত হইয়াছে;—যেমন (§৯) আর্য প্রাকৃতে ল য়া (=লতা) প্রভৃতির য়কার খাঁটি সংস্কৃত য়কার হইতে ভিন্ন হইলেও নিজের স্বতন্ত্র আকার না থাকায় তাহার স্থানে সংস্কৃত য়কারই প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে।

১৭। সংস্কৃত অ পি অবেস্তায় অ ই পি, এইরূপ অ ভি—অ ই বি, প্র তি—পঁ ই তি। প রী (=অপ্সরা cf. fairy) শব্দ বাঙ্লাতেও অনেক স্থানে প ই রী উচ্চারিত হইয়া থাকে (অবেস্তায় প ই-রি কা)। এতাদৃশ স্থানে ইকারটা epenthetic। প্রাকৃত ব্যাকরণে অবর্ণ স্থানে যে, ব-শ্রুতির কথা লিখিত হইয়াছে তাহাতে epenthesis-এর* কার্য্য হইতে পারে। প্রকৃত স্থলেও কি ওকারটা Epenthetic? অবেস্তায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা Epenthesis ও Prothesisএর anticipatory বা অপেক্ষিত স্বরকে অপেক্ষাকৃত ছোট হরপে ছাপাইয়া সাধারণ অক্ষর সমূহ হইতে ইহাকে পৃথক রাখিয়া থাকেন। তাঁহারা প ই তি শব্দ লিখিবেন পইতি (paiti)। তদনুসারে বাঙ্লাতেও ছোট-বড় হরপে ছাপিতে পারা যায়। হ ও আ এইরূপে হওআ লিখিলে চলে। অথবা অবেস্তা পড়িবার সময় গুজরাটীরা যেমন হ্রস্ব ও দীর্ঘ ওকারের পার্থক্য সাধনের জন্য হ্রস্ব ওকারের মাথার উপর একটু বিশেষ-বোধক চিহ্ন (diacritical mark) দিয়াছেন, বাঙ্লাতেও সেরূপ করা যাইতে পারে। ইংরেজী শব্দ অক্ষরান্তরে লিখিবার জন্য মারহাট্টী ভাষাতেও এইরূপ চিহ্নের প্রয়োগ দেখিয়াছি। অক্ষরের সংখ্যা বাড়ায় অসুবিধা বাড়িবে আশঙ্কা আছে। তবে বিচার করিয়া চিহ্নের ব্যবস্থা করিলে ইহারও সমাধান বোধ হয় সহজে হইতে পারে।

১৮। স্বরে বিশেষ চিহ্ন না দিলে অনেক স্থলেই গোলমালে পড়িতে হইবে। hand, hat প্রভৃতির a-র ধ্বনি প্রকাশ করিবার অন্য উপায় নাই। শ্রীযুক্ত নবকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের স্ব প্ন দ র্শ নে সে দিন এ প্রশ্নটাও পুনর্ব্বার উদিত হইয়াছে। সংস্কৃত গ তি, ম ণি প্রভৃতির অকারকে আমরা ঠিক অকার ত উচ্চারণ করিই না, (গ-তি বা gati বলা হয় না), ঠিক ওকারও উচ্চারণ করি না,—একবারে গো-তি বা goti বলি না। এখানেও হ্রস্ব ওকার উচ্চারিত হইয়া থাকে। এইরূপ কা লো কা লো চুল, ভা লো ভা লো বই বস্তুত বলা হয় না, আবার স্থানে স্থানে ঠিক কা-ল কা-ল, ভা-ল ভা-ল (Kala, bhala) উচ্চারণও না, ইহাদের উভয়েরই মধ্যবর্ত্তী হ্রস্ব ওকারের উচ্চারণ হইয়া থাকে। ওকার লিখিলেই সংস্কৃত ওকারের ধ্বনিটাই মনে আসে কেননা এইরূপ অভ্যাস আছে। গ তি প্রভৃতির অকারটা কিন্তু ওকার-ঘ্যাঁসা বা হ্রস্ব ওকার ভাবেই মনে আসে। ইহারও কারণ অভ্যাস। হয়ত কা লো প্রভৃতির ওকারও কালে হ্রস্ব ওকার বলিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এখন তাহা হয় নাই, তাই গোলমালও অনিবার্য্য। এতাদৃশ স্থানে অকার বা ওকারের উপর একটা বিশেষ চিহ্ন দিলেই ধ্বনি বা বর্ণ কাহারো সম্বন্ধে কোনো গোল হয় না। পাঠকগণ ইহা অবশ্যই বিচার করিয়া দেখিবেন। অনেক ভাষাতে এই উপায়েই ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনির প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯। বিশেষ চিহ্নের ব্যবস্থা করিলে সর্ব্বত্রই তাহা প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা হইবে না। ইংরেজী hate, happy ও harm শব্দের a'র ধ্বনিগত পার্থক্য আছে, এই পার্থক্য সূচনা করিবার জন্য hate ও harmএর aকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া যথাক্রমে a ও ā লিখিবার পদ্ধতি আছে। কিন্তু সাধারণত তাহার প্রয়োজন হয় না। আমাদের অভ্যাস বা পরিচয় থাকাতে চিহ্ন দিয়া না লিখিলেও hate ও harm শব্দে a-র ধ্বনি আমরা ঠিকই করিয়া থাকি। বাঙ্লাতেও আবশ্যক স্থলের জন্য এইরূপ কয়েকটি চিহ্ন ঠিক করিয়া লইতে পারা যায়। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে অগ্রণী করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ইহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

২০। কয়েকটি অবান্তর কথা বলিয়া ফেলিলাম। আবার ওা'র কথা বলি। রামানন্দ বাবু বলেন বাঙ্লায় হ ও আ (অন্তরূপ হ ও য়া) খা ও আ (অন্তরূপ খা ও আ) বলিয়া বস্তুত যে ধ্বনিটি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহা ইংরেজীতে লিখিলে hawa, khawa। তিনি ওা লিখিয়া এই wa'র ধ্বনিই প্রকাশ করিতে চাহেন। কয়দিন হইল তাঁহার একটা লেখায় railway কথাটি রে ল ওে লিখিত হইয়াছে। তবেই দাঁড়াইতেছে, তাঁহার মতে w=ও। কিন্তু এই ওকারটি সংস্কৃত বর্ণমালার ওকার নহে। তিনি শ্রাবণের প্রবাসীতে ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"আমি বলি "দেওা" কথাটির "ও" "w"এর মত একটি স্বর-ব্যঞ্জনের যোগ-জাত মিশ্রবর্ণ।" তাহাই যদি হয়, তবে এই ওকারের অর্থাৎ w-সদৃশ একটি স্বরব্যঞ্জনাত্মক যকারাদির ন্যায় বর্ণে আকার-ওকারাদি স্বরের সংযোগ কোনোরূপ দোষাবহ নহে; তাই ওা ওি ওু ওে প্রভৃতি লিখিতেও কোনো বাধা নাই।

---

* উচ্চারণের সৌকর্য্য বা সৌকুমার্য্যের জন্য শব্দের মধ্যে কোনো বর্ণের আগমকে Epenthesis বলে।

গোল উঠিয়াছে পূর্ব্বে রামানন্দ বাবুর ওা-স্থিত ওকারের স্বরূপ-পরিচয় না পাওয়ায়।

২১। এখন কথা হইতেছে Wকে বাঙ্‌লায় ও-চিহ্নে প্রকাশ করা সঙ্গত কিনা? V ও সংস্কৃত ব (অন্তস্থ) * সমান। ভাষান্তরে দেখিতে পাই w-এর ধ্বনিও ব দ্বারা প্রকাশ করা হয়। হিন্দীতে, রেল বে লিখিত হয়। ইংরেজীনবিশদের নিকট শুনিতে পাই, V ও w পরস্পর এতদূর সুসদৃশ যে, অনতিবহুপূর্ব্বে ঐ উভয় বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রযুক্ত হইত, পরে অভিধান ও অন্যান্য পুস্তকে ঐ-দুই-বর্ণ-যুক্ত পদ-সমূহকে পৃথক্‌-পৃথক্‌ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডে, বিশেষত লণ্ডনে, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে নাকি বহু স্থানে ঐ উভয় বর্ণের ভেদ দেখা যায় না। তাহারা weal স্থানে veal, বা veal স্থানে weal; এবং wine স্থানে vine, বা vine স্থানে wine বলিয়া থাকে। v ও w-এর মধ্যে এইরূপ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকিলেও তাহার মধ্যে যেটুকু ভেদ আছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে যে, খুবই ভাল হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এ জন্য বাঙ্‌লায় ঐ দুই ধ্বনির জন্য দুইটি বর্ণেরই প্রয়োজন। কিন্তু Railwayএর ধ্বনি রেলবে শব্দে কি প্রকাশ হয় না? Walkকে বা ক্‌ এবং wineকে বা ই ন লিখিলে কি চলে না? আমার মনে হয় ঠিক চলে, (তবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা প্রমাণ)। অতএব দেখা যায় v ও w উভয়েরই দ্যোতকরূপে ব ধরিলে সাধারণত বাধে না। কিন্তু স্থানবিশেষে বাধা আসে। যেমন wine=বা ই ন, vine=বাইন। এতাদৃশ স্থলে বাঙ্‌লায় কোনো ভেদ থাকে না, অথচ থাকা উচিত। এই ভেদ রক্ষার জন্য ব-এ কোনোরূপ একটু বিশেষ চিহ্ন দিলেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাইতে পারে।

২২। v-এর ব হইতে w'র ব-কে একটু বিশেষ চিহ্ন দিয়া যখন আর একটা বর্ণ করিতে হইতেছে, তখন তাহা না করিয়া w'র জন্য ও-বর্ণকেই ধরা হউক না কেন? উত্তরে বলিতে পারা যায়, ও পূর্ব্ব হইতেই সংস্কৃতের ওকারের ধ্বনির দ্যোতকরূপে এতকাল প্রসিদ্ধ আছে, ইহাকে আর-একটি ধ্বনির দ্যোতক বলিলে, উভয়ের গোলমাল অবশ্যম্ভাবী। যদি বলা হয়, ওকার-ধ্বনির ব্যঞ্জক ও-বর্ণে আকার-ইকারাদি স্বর-সংযোগ হয় না, আর w'এর ওকারে ঐ স্বর সংযোগ হয়, ইহাতেই ভেদ বুঝা যাইবে। তাহা হইলেও হয় না। যে স্থানে w'র ও-এ আকারাদি স্বর যোগ করিবার প্রয়োজন হইবে না, সেখানে ও-ধ্বনির ও এবং w'র ও, এই উভয়ের পার্থক্য জানিবার উপায় নাই। অতএব যে-কোনো একটু চিহ্ন দিয়া উভয়কে পৃথক্‌ করিতে হইবে। তাহাই যদি হয়, তবে wকে ব বলিয়া ধরা অপেক্ষা ও ধরায় বিশেষ কোন লাভ হইল না।

২৩। দ্বিতীয়ত, আর সব বর্ণ ছাড়িয়া wকে ও-আকারে ধরিতে যাই কেন? হয় ত ইহার সহজ উত্তর, w আর ও, এই দুইটি বর্ণের খুব সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য অবশ্যই আছে, সাদৃশ্য অনেক রূপের হয়, কিন্তু wএর প্রতিনিধি-রূপে বা তাহার স্থলে ওকে ধরিতে পারা যায়, অপর কথায় w'র ধ্বনিকে ও প্রকাশ করিতে পারে, এরূপ কোনো সাদৃশ্য আছে কি?—w আর ও এই উভয় বর্ণের ধ্বনি কি একরূপ? যে-কোনো ব্যক্তি উত্তর করিবেন "না।" অতএব w'র ব্যঞ্জকরূপে ও ধরা ঠিক নহে। সংস্কৃত বর্ণমালার মধ্যে যদি কোন বর্ণকে এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা ব-ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

২৪। তৃতীয়ত, w'র ধ্বনির ব্যঞ্জক বর্ণটি স্বর-ব্যঞ্জন এই উত্তরস্বরূপ হইবে; যেমন সংস্কৃতে য, ব। তাহা হইলেই তাহাতে প্রয়োজনানুসারে সমস্ত স্বরই যোজনা করিতে পারা যাইবে। রামানন্দ বাবু নিজেও তাহা বলিয়াছেন ("দেও।" কথাটির "ও" "w"এর মত একটি স্বরব্যঞ্জনের যোগজাত মিশ্রবর্ণ)। অতএব সংস্কৃত বর্ণমালার মধ্যে সেই ধ্বনি সূচনা করিতে পারে এরূপ যদি স্বর-ব্যঞ্জনাত্মক কোনো বর্ণ থাকে তবে তাহাই গ্রহণ করা উচিত। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণটি ব-ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না; কারণ, w'র ধ্বনিকে ব যতদূর প্রকাশ করিতে পারে, অপর কোনো বর্ণই ততদূর পারে না। বলা বাহুল্য ও স্বর-ব্যঞ্জনাত্মক বর্ণ নহে। ইহাকে সেইরূপ ভাবিয়া লইতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে তেমন যুক্তি নাই।

২৫। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"মা-র," না "মায়ের"? তাঁহার মতে উত্তর দাঁড়াইয়াছে—"মায়ের"। ইহা কতকটা ঠিক, সম্পূর্ণ ঠিক হইতেছে মা এ র। প্রাচীন বাঙ্‌লায় ঠিক এই প্রয়োগ দেখিয়াছি—

"মা এ র গর্ব্ভপাত ছল করিআঁ।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৪ পৃ.

মাতা=মা আ=মা, মা+এ র (কের)=মা এ র। এইরূপ পাদ=পা অ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ১৩২ পৃ.)=পা, পা+এর=পা এ র (ঐ; ১৩৪ পৃ.) (পুত্র=পুও=) পোত=পো অ (ঐ, ৪৪ পৃ.) পো, পো+এর=পো এর (ঐ, ৫০ পৃ. ৬১)। এইরূপ গা এ র লেখাই সঙ্গততর। ইহাও (গাত্র=গত্ত=) গাত=গাঅ=গা, এবং তাহার পর গা+এর=গাএর; গাঅ+এর হইতে নহে। যোগেশ বাবু বলিয়াছেন প্রাচীন প্রয়োগ মা য়ে র আছে; থাকিতে পারে, কিন্তু ঈদৃশ স্থলে য-শ্রুতি আছে বলিয়া মনে হয় না, তাই য়ে র অপেক্ষা এর লেখাতেই আমার পক্ষপাত বেশী।

২৬। যোগেশবাবু বাঙ্‌লায় মে য়ে, মা ই য়া প্রভৃতি শব্দের অর্থ করিতে চান মা তৃ-স দৃ শ। ইহা ঠিক। অনেক স্থলে ইহা আমি বলিয়াছি। পালির মা তু-গা ম, বৌদ্ধ সংস্কৃতের মা তৃ গ্রা ম, এবং মালদহের পশ্চিম ভাগে প্রচলিত তি রি মা ত্‌ (=স্ত্রী-মাতা) শব্দ ইহাই সমর্থন করিতেছে।

২৭। যোগেশবাবু বলিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে ইয়া-প্রত্যয়ান্ত শব্দ (যথা, "করিয়া" ইত্যাদি) ই-প্রত্যয়ান্ত ছিল; তখন ছিল "হই," "করি" ইত্যাদি অন্তরার্থে ই।" আবার মনে হয় ইহা বিপরীত, পূর্ব্বে ই য়া ছিল, পরে ই হইয়াছে। প্রাকৃত ও গাথা আলোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয়। শিক্ষা-সমুচ্চয় (২৮৯ পৃ.) আর্য্যাবলোকন সূত্র হইতে একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (দ্রষ্টব্য পালিপ্রকাশ:—প্রবেশক, ৫৫ পৃ.)

"ভস্তেহ পূজাং করিঅ।"

এখানে আনন্তর্য্য-বোধক ত্বা অথবা য প্রত্যয় স্থলে প্রাকৃতে ই য় করিয়া ক রি য় পদ হয়, তাহার পর য-লোপে অ হইয়া ক রি অ হইয়াছে। কালক্রমে আবার অকারেরও লোপে বাঙ্‌লায়, এবং, যোগেশ বাবু যেরূপ বলিয়াছেন, আসামী, মৈথিলী ও ওড়িয়াতে ই প্রত্যয় হইয়াছে।

২৮। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন "যদি প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে সেন মহাশয় ঙ্গ স্থানে ঙ দেখাইতে পারেন, সেটা নূতন আবিষ্কার হইবে।" বীরেশ্বর বাবু এখনো নীরব আছেন দেখিয়া আমার নজরে যাহা পড়িয়াছে দেখাইতেছি, আমি বাঙ্‌লা লিখিয়া থাকি:—

(১) পিঙ্গল=পিঙল

"শ্রবণে চঞ্চল, মকরকুণ্ডল
পিন্ধন পিঙল বাস।"

গোবিন্দদাস (বৈষ্ণবপদাবলী—বসুমতী, ২৫২পৃ.)

---

* প্রচলিত দেবনাগর-অনুসারে অন্তস্থ বকে আমি ব (ব), এবং বর্গীয় বকে ব (ব) লেখাই সুবিধা মনে করিয়া তাহাই করিয়া থাকি। এই প্রবন্ধের আবশ্যক স্থানে এই রীতি বুঝিতে হইবে।

(২) ভাণ্ডার—ভাণ্ডার

"সুবর্ণ চম্পকমালা দোলে উড়ে যায়।
মধুর চলনি মত্ত করিবর ভা ণ্ডা র।"
জ্ঞানদাস, ঐ ১৬৮ পৃ.।

(৩) ভাঙ্গ (ভঙ্গ)—ভাঙ

"যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভা ঙ বিলোল।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী-হিল্লোল।"
গোবিন্দদাস ঐ ২৫০ পৃঃ

(৪) ভাঙ্গল—ভাঙল

"নাহ-দরশ-সুখ বিহি কৈল বাদ।
অাঁকুরে ভা ঙ ল বিনি অপরাধ।"
বিদ্যাপতি ৪০৫ পৃ. (সাহিত্য-পরিষৎ),

মুদ্রিত পুস্তকের বানান বিকৃত কি না বিচার্য্য।

২৯। যোগেশ বাবু বলিয়াছেন স্বা মী শব্দকে "ভূভারতে কেহ সামী বলে না।" কিন্তু প্রাকৃতে বরাবরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে, এবং এইরূপ হওয়াই নিয়ম। স্বা মী, স্বা দু, স্বা গ ত, শ্যা ম, শ্যা মা প্রভৃতি শব্দ প্রাকৃতে যথাক্রমে সা মী, সা উ, সা গ ত, সা ম, সা মা প্রভৃতি হয়। বাঙ্‌লাতেও সেই উচ্চারণ আসিয়াছে এবং প্রাচীন বাঙ্‌লায় এরূপ ভাবে লিখিতও হইত দেখা যায়। সা মী শব্দ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে একাধিকবার (পৃ. ১৯, ২৪, ২৫, ৪১) প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্যা ল (বৈদিক সাহিত্যে শ্যা ল) অথবা শ্যা ল ক এইরূপেই য লোপে শা লা হইয়াছে। কোনো-কোনো স্থলে স্বা মী আবার সো আ মী উচ্চারিত হয়। এবং সাহিত্যেও ইহা ধরা পড়িয়াছে—"সো আ মী ঘরেত নাহি চিত্ত বে আ কু ল।"—সৈয়দ মর্ত্তুজার পদাবলী, গৃ হ স্থ, শ্রাবণ, ১৩২৩, ৯১৯ পৃ.।

হরিশ্চন্দ্রপুর,
৪ আশ্বিন, ১৩২৩।
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

"যবন" হরিদাস

গত মাসের প্রবাসীর কষ্টিপাথরে "যবন হরিদাস" নামে একটি প্রবন্ধের সার উদ্ধৃত হইয়াছিল। প্রবাসীতে "যবন" শব্দ ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীযুক্ত আহমদ-আলী দেওয়ান প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

আমরা কোনো জাতি বা ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করা অন্যায় মনে করি। যবন শব্দ গ্রীক Ionian শব্দজ; ঐ শব্দে ভারতের পশ্চিম দেশ হইতে আগত অনেক জাতিকে বুঝাইত—প্রধান গ্রীক ও পারসিক মুসলমান জাতি। অধিকন্তু হরিদাস "যবন হরিদাস" নামেই প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও বৈষ্ণব-বঙ্গ-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নামের সঙ্গে যবন শব্দ ব্যবহার না করিয়া উপায় নাই। হরিদাস যবন বলিয়া নিজেকে নীচ স্বীকার করিতেন, ইহাও প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে। তখনকার কালের ধারণা ঐরূপ থাকাতে ও বিনয়-বশতঃ হরিদাস ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। সেই প্রসঙ্গেই নীচ যবন বলা হইয়াছে—অন্যভাবে নিন্দা বা অবজ্ঞা করিয়া নহে।

বিশেষতঃ, ঐ প্রবন্ধ অপর স্থান হইতে উদ্ধৃত, প্রবাসীর নিজস্ব নহে।

প্রবাসীর সম্পাদক।

ভারতের স্থাপত্য

যে ভারতবর্ষের অন্তঃস্থলে বিকশিত অম্লান কমলটির মত তাজমহল বিরাজ করছে, তাকে স্থাপত্য-শিল্পের পীঠ-স্থান বল্লেও অত্যুক্তি করা হয় না।—কিন্তু, বলতে কুণ্ঠ বোধ হয় যে এখনকার সভ্যতার ভদ্রাসন প্রসিদ্ধ কলিকাতা নগরীর দিকে যখন আমরা তাকাই তখন প্রাচীন কীর্ত্তি-গুলির বিষয় স্মরণ করে যেমন উল্লাসে গৌরবে বুক ভরে ওঠে তেমনি এই আধুনিক সহরের অত্যন্ত কুশ্রী ঘরবাড়ীগুলা দেখে আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাপত্যের জন্যে কোন আশাই মনে স্থান পায় না। প্রাচীন ভারতের সংখ্যাতীত রমণীয় স্থাপত্য-রচনা—আর এখনকার এই সহরের ইটকাঠের কতকগুলি পায়রার খোপ—যেন কতক-গুলি প্যাক-বাক্স বা দেশালাইএর বাক্স উপরাউপরি সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে! আমরা কলকাতা সহরে ইষ্টক-হর্ম্ম্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখার তলায় বরফজল খেতে-খেতে ভাবি P. W. D.'র তৈয়ারী সরকারী বিল্‌ডিং-গুলি বা বেসরকারী রেলওয়ে-ষ্টেশন-ভবনগুলিই বুঝি স্থাপত্যকলার একমাত্র চরম ও পরম! আমরা গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বসে থাকি। কলকাতায় দেশী কতশত ধনী ব্যক্তি বিলাতী স্থাপত্যের বস্তাপচা ওঁচা নমুনায় বাড়ী ঘর তৈরী করাতে ঝুড়ি ঝুড়ি অর্থ ও সামর্থ্যের অপব্যবহার করচেন—আর দেশের সকল প্রাচীন আদর্শ স্থাপত্যগুলি ক্রমশই অযত্নে ও অজ্ঞাতে ধরাশায়ী হবার উপক্রম হচ্চে—এমনি আমাদের অবস্থা! আমাদের স্বদেশ-সেবক হতে হলে এটা জানতেই হবে যে, সকল শিল্পের মধ্যে স্থাপত্যই জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে প্রধান। সকল দেশে সকল কালে প্রত্যেক জাতি এই স্থাপত্যের পাথরের ভিতের উপরেই তাদের সভ্যতার বিজয়-নিশান উড়িয়ে গেছে। তাই আজ আমরা ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যগুলির মত ইউরোপীয় প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট সহরগুলি থেকে রোম ও গ্রীসের এবং পিরামিড প্রভৃতি থেকে প্রাচীন ইজিপ্টের হৃদয়ের কত না নিগূঢ় পরিচয় পাচ্চি।

সুন্দর ও সুগঠিত স্থাপত্যে যেমন মনকে প্রসারিত

করে দেয় তেমনি আবার কদর্য্য স্থাপত্যে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা ও দীনতাই আনে। যে সৌভাগ্যবান সুন্দর গৃহে বাস করেন তিনিই যে শুধু সুখী হন তা নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যকলা যাঁরা যাঁরা দেখবার সুযোগ পান তাঁরাও ধন্য হন! সম্রাট সাজাহানের ভাগ্যে তাজমহল নির্ম্মাণের দ্বারা যে আনন্দ, তাঁর সেই অমরকীর্ত্তি যুগে যুগে তার চেয়ে কত বেশী আনন্দ কত দেশের নরনারীকে দিয়ে আসচে তার কি ইয়ত্তা আছে!

আজকাল আমাদের দেশে যেমন দেশী চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের সৌভাগ্যক্রমে কিছু কিছু আদর হচ্চে; এমনি যদি কিছুমাত্র সুনজর স্থাপত্যের প্রতি না দিতে পারি তা হ'লে আমরা কিছুতেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবো না—এবং ফলে সবই বৃথা হবে। চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য—এদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ আছে। দেশের চারু-শিল্পে সমগ্রতা আনতে হ'লে এই তিনেরই সমাবেশ চাই। শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তা থাকে, তেমনি স্থাপত্যই চিত্র ও ভাস্কর্য্যের আধার, আবার চিত্র ও ভাস্কর্য্যই স্থাপত্যের বসন ও ভূষণ; এগুলি না থাকলে আভরণ-ও-অলঙ্কারহীনা সুন্দরীর ন্যায় স্থাপত্য নগ্ন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে, সে স্থাপত্যের কোনো মানে থাকে না। আমাদের ইলোরা অজন্তা বাঘগুহা প্রভৃতি প্রাচীন মঠ ও মন্দির-গুলিতে তাই স্থাপত্যকলার সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্র ও ভাস্কর্য্যের সমাবেশ দেখা যায়।—ইউরোপেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দেখা যায়, যে-কোন ধরণের চিত্র বা ভাস্কর্য্য যে-কোন স্থাপত্যের সঙ্গে জোড়া লাগাতে গেলে কখনই মিশ খায় না—জোড়ের মুখে দাগটা বিকট আকারে প্রকাশ পায় মাত্র। তাই আমরা দেখি যে দেশী চিত্র বা ভাস্কর্য্য যদি তদুপযুক্ত দেশী রীতিতে তৈরী গৃহে স্থান না পায় তাহলে ধুতিচাদরের সঙ্গে হ্যাট-কোটের মত চোখ ও মনকে শুধু পীড়াই দেয়।

স্থাপত্যকলার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের দেশের গৃহের আসবাবপত্রেরও ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটেচে। আজকাল আর সে সাধাসিধে সুরুচির পরিচায়ক তাকিয়া-খাসগেলাসে সজ্জিত গৃহ আমাদের তেমন করে সহজভাবে আহ্বান করে না—এখন ভিজিটিং কার্ড দাখিল করে অতি সঙ্কোচে ও সন্তর্পণে বিলাতি-কার্পেট ও ক্রোটন-গাছের টবে সজ্জিত অগণিত আসবাবপত্রের দোকানঘরের ন্যায় ড্রয়িংরুমে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায়। অবশ্য বৈচিত্র্যই যুগের ধর্ম্ম; কিন্তু রসবোধ সকলকালে সকল সময়েই একরূপ হওয়া উচিত—কোন্‌টা সুন্দর কোন্‌টা অসুন্দর এ বোধটা আমাদের তাই বলে লোপ পেলে তো চলবে না? একবার মনে পড়ে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে গোলদিঘিতে সন্ধ্যাভ্রমণে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল দিঘির পূর্ব্বপারে ব্যাপটিষ্ট মিশনের দেশী স্থাপত্যের রীতিতে নির্ম্মিত পদ্মাঙ্কিত একটি তেতলা বাড়ী; আবার তারই পশ্চিমে বিপরীতদিকে পাশ্চাত্যের অতি স্থূল বিরাট সিনেটহলের মোটা-মোটা গ্রথিক ধরণের থাম দিয়ে সাজান হলটি। আমরা দেখলুম দেশী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমপারে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের গুরুধ্বজা বহন করে দাঁড়িয়ে আছে, আর দেশী স্থাপত্যকলাকে বিদেশী পাশ্চাত্য মিশনারীরা সাদরে গ্রহণ করেছেন—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! আমাদের দেশী স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য বিদেশী মিশনারীর হৃদয়কে স্পর্শ করেচে, কিন্তু আমরা 'চোখে দেখেও প্রাণে কাণা' হয়ে বসে আছি। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাটি পদে-পদে স্মরণ হয় যে আমরা—'বাঙালীরা আত্মবিস্মৃত জাতি।' সমগ্র ভারতের মধ্যে আধুনিক স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে আমাদের বাঙলা-দেশই সবচেয়ে নিজেদের বেশী ভুলে বসে আছে। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিমে এখনও দেশী স্থপতির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় এবং বিশেষ নতুন কিছু না করলেও তারা বংশানুক্রমে তাদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী সমস্তই বজায় রেখে এসেচে; কিন্তু আমাদের দেশে স্থপতির নামগন্ধও শুনতে পাওয়া যায় না। যদি কখনও আমাদের দেশে কচিৎ কারও দেশীধরণের দেবালয় বা এমনি একটা কিছু তৈরী করাবার আবশ্যক হয়, তা হলে উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতের চারিধারে স্থপতিসংগ্রহের জন্যে প্রদক্ষিণ করে বেড়াতে হয়, হাতের কাছে পাওয়া যায় না—এ বড়ই দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। মাত্র শতবৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশী ভদ্রাসন যারা তৈরী করত তাদের আর চিহ্নও পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে যে-সব প্রাচীন পল্লীতে ধনী

গৃহস্থদের নাচঘর, ঠাকুরদালান, নাটমন্দির প্রভৃতিতে নানারকম খিলান ও নক্সার কাজ প্রভৃতি করা হতো তা একেবারেই লোপ পেয়ে গেল!

এইপ্রসঙ্গে আজ বলতে বড়ই আনন্দ হচ্চে যে আমাদের দেশের মহাত্মা বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ দিয়ে যে বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দিরটি তৈরী করাচ্চেন সেটি যথাসম্ভব দেশী ধরণের ও স্বদেশী কারিগর দ্বারা করানো হচ্চে। আশা করা যায়, তাঁর এই শুভ অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভবিষ্যতে আরো অনেক দেশী স্থাপত্যের সৃষ্টি হবে।

সম্প্রতি কোন বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রে রাধানগরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের যে স্মৃতিমন্দিরটি হবে তার একটি নক্সা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সেটি কোনমতেই অনুমোদন করতে পারি না। বিশেষতঃ আমরা যখন কোন স্বদেশী মহাত্মার স্মৃতি রক্ষা করতে চাই তখন এরূপ খাপছাড়া একটা তৃতীয় শ্রেণীর বিলাতি হলের মত মন্দির প্রতিষ্ঠা কখনই আমাদের কল্পনায়ও উদয় হওয়া উচিত নয়। দেশী মহাত্মার কীর্ত্তি আমাদের দেশের সকলের মনের মধ্যে যে মন্দিরটি স্বতই প্রতিষ্ঠা করচে—আমরা তারই ছাপ স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে দেখাতে চাই। অর্দ্ধশতাব্দি পূর্ব্বে ভারতবর্ষ তরুণ ইউরোপীয় সভ্যতার মাদকতায় যখন মত্ত, সেই সময়ে সুদূর ইংলণ্ডে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় নিজ ব্যয়ে বৃষ্টলে মহাত্মা রামমোহনের সমাধিটি স্বদেশী স্থপতির চারুশিল্পে শোভিত করে রেখে গেছেন—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আজ এই ভারতশিল্পের নবজাগরণের যুগে রামমোহনের জন্মভূমির সুসন্তানেরা এবিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তাও করচেন না।

এখন আমাদের দেশে স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আবিষ্কার অনেক করা হচ্চে সত্য, কিন্তু সেগুলিকে আবিষ্কারকের পুঁথির মধ্যে বদ্ধ করে বা যাদুঘরের গুদামে পচিয়ে রেখে লাভ কি? আমাদের মনে হয় যে এই-সকল সুন্দর সুন্দর প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি যদি আমাদের কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত না করলে তা'হলে এই-সকল আবিষ্কার ও মাটি খোঁড়ার প্রয়োজন কি? আমাদের জিনিসকে আমাদের মাটি থেকে ধূলো ঝেড়ে তুলতেও হবে এবং গ্রহণও করতে হবে। আমরা জোর করে একথা বলতে পারি যে আমাদের এই-সকল প্রাচীন স্থাপত্যকলার মধ্যে যাকিছু সত্য ও সুন্দর আছে তা একদিন জগতের মধ্যে নিজের স্থানটি অধিকার করে নেবেই এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে দেশকেও ধন্য করবে। তখন সৌন্দর্য্যের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবার কাহারও প্রয়োজন হবে না। অবশ্য এখনকার যুগের যাকিছু অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন তা আপনা থেকেই ঘটবে—কেউ সে কালের পরিবর্ত্তিত আবর্ত্ত-চক্রকে উল্টাদিকে ফেরাতে পারবে না। তাই আমাদের এখন সে বিষয়ে চিন্তা না করে এইসব বিবেচনা করেই নিজেদের স্থাপত্যকলাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে, তাতে যদি স্থপতিদের পাশ্চাত্য এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপনও করতে হয় তাহলে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। এককালে যেমন মোগল ও পারসিকেরা এসে আমাদের স্থাপত্য-শিল্পে একটা বিশেষ রং ধরিয়ে গিয়েছিল—আজ আবার এই বৈজ্ঞানিক যুগে ইউরোপীয় আবহাওয়ায় আবার তেমনি অবিকৃত ভাবে দেশী স্থাপত্যের মধ্যে বিশেষ একটা ছাপ যা পড়বে তা আমাদের শিরোধার্য্য করে নিতেই হবে—কিন্তু তাই বলে এরূপ সমূলে বিনাশ হ'তে দেওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। এখন আমাদের ইউরোপীয় স্থপতির শেখানো রোমক করিন্থিয়ান প্রভৃতি রীতি যথাসম্ভব ভুলে যেতে হবে—এখন আমাদের সবদিকে সামঞ্জস্য ও স্বদেশী ভাবে নবজাগরণের পালা।

স্থাপত্যের মধ্যে প্রত্যেক যুগের বৈচিত্র্যের ছাপ থাকবে বটে, কিন্তু তার মধ্যে রস-সৌন্দর্য্যটি অনন্তকাল ধরে সকল নরনারীকে সমানভাবে মুগ্ধ করবে—সে-সময় তার কালাকাল পাত্রাপাত্রের বিচার থাকবে না। স্থাপত্যের ভিতর যদি এতটুকু কৃত্রিমতার চিহ্ন থাকে তা হ'লে তা জগতে কখনই স্থায়ী হ'তে পারে না। এখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে শুধু প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে স্থাপত্যের বিচার করলে চলবে না—কেননা স্থাপত্য শুধু একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণারই জিনিস নয়, ওটি জাতীয়-সম্পদ এবং ওর বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শুধু বসবাসের সুখ-সুবিধার অনুযায়ী গৃহনির্ম্মাণ করা নয়, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে গঠন-সৌকর্য্য ও শিল্প-সুষমার ব্যঞ্জনারও প্রয়োজন আছে।

দেখা যায়, এদেশে প্রাচীনকালে স্থাপত্যকেও অন্যান্য চারুশিল্পের ন্যায় ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল। বেদ-পুরাণাদিতে এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে 'বিশ্বকর্ম্মাপ্রকাশ,' 'শিল্পশাস্ত্র,' 'জ্ঞানরত্নকোষ' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে স্থপতিদের জ্ঞাতব্য মাপ-প্রমাণাদি নানান তথ্য দেওয়া আছে। এমন কি কিরূপ জমির উপর কোন্ সময়ে কোন্ দিনে গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ করা হবে এ-সকলেরও উল্লেখ আছে। কথিত আছে, বাড়ীর জমি পূর্ব্বদিকে ঢালু হলে গৃহস্থের সৌভাগ্য, কিন্তু পশ্চিমে ঢালু হলে গৃহস্থেরই হানি। এখনকার দিনে এ-সকল খুঁটিনাটি যুক্তিতর্কে যদি না টেকে ত না মানলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু পশ্চিমের দিকে গড়িয়ে পড়া সম্বন্ধে শাস্ত্রের নিষেধ মেনে চলাই আমাদের কর্ত্তব্য বোধ হয়। ধর্ম্মের বর্ম্ম পরিধান করে আমাদের শিল্পকলা মোগল প্রভৃতির আমল থেকে বহুকাল আত্মরক্ষা করে এসেছিল। দেশের অন্তরের পরিচয় যেমন ধর্ম্মে তেমনি শিল্পেও পাওয়া যায়। তাই জাতীয়তা বজায় রাখতে হলে শুধু ধর্ম্মের দ্বারায় নয়, শিল্পকলারও সহায়তার দরকার। আমরা জাত বাঁচাতে ব্যস্ত, কিন্তু জাতীয়তাকে রক্ষা করতে পারি না। ভয় হয় কোন্‌দিন আমরা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মনুমেণ্ট তৈরী করে না বসি।

ভারতের পশ্চিম প্রদেশে রাজপুত রাজাদের আধুনিক দেশী ধরণের সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, উড়িষ্যার ও বৃন্দাবন প্রভৃতির আধুনিক দেশী স্থাপত্যগুলি দেখলে যেমন আশার উদয় হয়, তেমনি বাঙলায়ও যদি দেশী স্থাপত্যশিল্পের আদর কিছুমাত্র দেখতে পাই তা হ'লে বোঝা যাবে যে আমরা স্বদেশ-প্রেম যে কি বস্তু তা কিছু হৃদয়ঙ্গম করেচি।

সকলেই জানেন যে ভারতশিল্পের প্রবর্ত্তক মিঃ হ্যাভেল ও বিলাতের ন্যূনাধিক দেড়শত গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি ও শিল্পী মিলে যাতে দিল্লীর নতুন সহরটি ভারতীয় স্থাপত্য-রীতিতে দেশী কারিগরদের দ্বারা তৈরী করানো হয় সেই জন্যে সম্রাটের ভারত-বিভাগের প্রধান সচীবের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সেই আবেদন দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রাহ্য হয়নি। মিঃ হ্যাভেল প্রভৃতি মহোদয়গণের আশা ছিল যে মোগল-দরবার থেকে ভারতের স্থপতিরা যে সহায়তা লাভ করে এককালে তাজমহল প্রভৃতি রমণীয় প্রাসাদ-সকল তৈরী করেছিল তেমনি ভারত-সম্রাটের সাহায্যে ও উৎসাহে আবার বুঝি নতুন দিল্লীতে এই-সব স্থপতিদের বংশধরেরা কিছু কিছু কাজ দেখাতে পাবে। কিন্তু ভারতভাগ্যবিধাতারা ভারতের চেয়ে নিজেদের জ্ঞাতি-বন্ধুদের যে বেশী আত্মীয় সেটা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। যদিও দেশী স্থাপত্যকলা রাজকীয় সহায়তায় সহজেই ও শীঘ্রই পুনরুদ্ধার হতে পারতো, কিন্তু তা যখন হ'ল না তখন আমরা নিজেরাই ধৈর্য্য ও সংযমের দ্বারা আমাদের দেশী শিল্পকে জাগিয়ে তুলবো—তাতে যত সময় যত চেষ্টাই লাগুক। মিঃ হ্যাভেল তাঁর ভারতের স্থাপত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে একস্থলে লিখেচেন যে উড়িষ্যায় জাজপুরের কোন একজন সাধু সন্ন্যাসী তাঁর সমস্ত জীবনের ভিক্ষালব্ধ ধনের দ্বারা একটি বিরোঙ্গার পাথরের মন্দির মেরামত করিয়ে দিয়েছিলেন।* পশ্চিমে সনুকরাস-কা মসজিদ ও পিষহরী কা মন্দির প্রসিদ্ধ। ফতেপুর-সিক্রিতে মিস্ত্রিরা প্রাসাদ নির্ম্মাণের পর প্রত্যহ এক ঘণ্টা বেশী কাজ করে সেই প্রথম সুন্দর মন্দিরটি গড়ে তুলেছিল, আর একজন স্ত্রীলোক জাঁতা পিষে অর্থ সঞ্চয় করে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরূপ শুভ-সঙ্কল্প যদি ভারতে মজ্জাগত থাকে তা হ'লে এদেশের শিল্পকলা কখনই লোপ পাবে না, বরং উত্তরোত্তর অজ্ঞাতে বাড়তে থাকবে। আমরা আশা করি এইসকল সাধুদৃষ্টান্ত আমাদের মনে সর্ব্বদা অনুপ্রেরণা জাগিয়ে রাখবে এবং আমরা সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ভুলে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই শুভমিলন-মন্দিরটি দেশী স্থাপত্যে পুনরায় গড়ে তুলব। অবশ্য একাজে অনেক যুগ, অনেক অর্থ ও অনেকের মিলিত চেষ্টার প্রয়োজন—একদিনেই কিছু রোমনগরী তৈরী হয়নি।

এখন প্রাচীন কীর্ত্তিসকল নিয়ে বড়াই করে বেড়িয়ে কোনই ফল নেই, এখন আমাদের কার্য্যের দ্বারা সেই-সকল পূর্ব্বগৌরব রক্ষা করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েচে!

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

*Indian Architecture by E. . Havell. Page 241.

পঞ্চশস্য

প্রাচীন রোমীয় চিকিৎসাতন্ত্র—

প্লিনি, লিভি, ট্যাসিটাস্ প্রভৃতির লিখিত বিবরণে প্রাচীন রোমে প্রচলিত ঔষধপত্রের কথাও পাওয়া যায়। এই-সব ঔষধের মধ্যে মুষ্টিযোগ, তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক, ঘোক্ আছে, আবার কোথাও বা 'সমঃ সমং শময়তি' নীতির প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ছাগবিষ্ঠা এবং ছাগলোমের ভস্মে অশ্মরী আরোগ্য হয়। ছাগমাংস ঝলসাইয়া খাইলে মৃগীরোগ সারে। ছাগ-যকৃৎ দৃষ্টিক্ষীণতায় উপকারী। ছাগের যকৃৎ মধুর সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে উদরী, ও ভুষির সঙ্গে খাইলে আমাশয়, ভালো হয়। মাঠে-মারা একটা ইঁদুরের দাঁত সদ্য-হত সিংহের চামড়ায় ফুটাইয়া, চামড়াখানি বাঁ পায়ে জড়াইলে বাঁ হাতের গেঁটেবাত সারে। সলোমনের নামে মন্ত্র পড়িলেই ত্র্যাহিক জ্বর আরোগ্য হয়। সজারুর যকৃৎ পোড়াইয়া ভক্ষণ ও উহার বসা চক্ষে প্রয়োগ করিলে রাতকাণা রোগ সারে। কাঁকড়ার চক্ষু বুলাইলে চোকফুলা সারে। উত্তমরূপে 'লাঠ্যৌষধি' প্রয়োগ করিতেই নাকি অগাষ্টাস সীজারের কোমরের বাত আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল। বধিরতায় পিঁয়াজ ও রাজহাঁসের চর্ব্বি ব্যবস্থা ছিল। লোহা না ছোঁয়াইয়া মেহেদী কাষ্ঠে আংটী তৈরি করিয়া পরিলে কুঁচকী ফোলা সারে। সূর্য্যমুখী ফুলের তিনটি দানা খাইলে তৃতীয়ক ও চারিটি খাইলে চারদিন অন্তর পালাজ্বর আরোগ্য হয়। রাঁধুনী গাছ গলায় বাঁধিলে আলজিবের ব্যথা সারে। চতুর্থক জ্বরের আর একটি ঔষধ—গাছ হইতে তিনটি ধনে বাঁ হাত দিয়া তুলিয়া পীড়িত ব্যক্তির নাম স্মরণ করিবে,—আর ফিরিয়া তাকাইবে না।

গাড়ীর চাকার তেল কুক্কুরদংশনের ঔষধ।, বিছুটী গাছে শূকরের বসা মাখিয়া তাহা দিয়া চাবকাইলে বাত সারে। বাঁ হাতে নয়টি যবের দানা লইয়া ফোড়ার চারিদিকে তিন বার ঘুরাইয়া আগুনে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ফোড়ার বেদনা কমে। দাড়িম ফুলের খোসা অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার সাহায্যে তুলিয়া চোকে ঘষিলে ও দাঁতে না ছোঁয়াইয়া গিলিলে এক বৎসরের মধ্যে চক্ষুরোগ হইতে পারে না। গণ্ডমালা রোগে ব্যবস্থা এই—কেহ দেখিতে না পায় এমন ভাবে ডুমুর গাছের একটা গাঁট দাঁতে কামড়াইয়া ভাঙ্গিয়া গাঁটটা একটা চামড়ার থলিতে পুরিয়া গলায় ঝুলাও। মেহেদী গাছের পল্লব মাটীতে বা লোহায় না ছোঁয়াইয়া শরীরে ধারণ করিলে গ্রন্থিক্ষত আরোগ্য হয়। মঞ্জিষ্ঠা শরীরে কবচরূপে ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে সেদিকে তাকাইলে কামলা রোগ ভালো হয়। ঝাউ গাছের পল্লব মাটিতে বা লোহায় না ছোঁয়াইয়া ব্যবহার করিলে আন্ত্রিক-বেদনার উপশম হয়। বন-মঞ্জিষ্ঠা জলাতঙ্কের মহৌষধ। নরহত্যা করা হইয়াছে এমন কোনও অস্ত্র দিয়া একটা বুনো পশু মারিয়া তাহার মাংস খাইলে অপস্মার রোগ আরোগ্য হয়।

মানুষের কামড়ের বিষ মানুষের কর্ণমলে ভালো হয়। সর্পদংশনে মনুষ্যদন্তচূর্ণ ব্যবস্থা। শিশুর মাথার প্রথম-কাটা চুল লইয়া বাতের যায়গায় বাঁধিলে বাত সারে।, ক্ষতের চারিদিকে মানুষের হাড় দিয়া গণ্ডী দিলে ঘা আর বড় হইতে পারে না। ক্ষয় রোগে হাতীর রক্ত ও মৃগীরোগে হাতীর যকৃৎ ব্যবস্থা। কুমীরের হৃৎপিণ্ড কালো পশমে জড়াইয়া ধারণ করিলে চতুর্থক জ্বর সারে। চোরা-পশমে জড়ানো দুটি ছার-পোকা রাত্রিকালীন জ্বরে ব্যবহৃত হইত, ও লাল রংএর সূতী কাপড়ে জড়াইয়া দিবাজ্বরে প্রয়োগ করা হইত। উদরাময়ে দধি ব্যবস্থা ছিল। এই বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের সহিত ইহার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পরে মেচনিকফ ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বাদাম তৈল কুঞ্চিত চর্ম্ম মসৃণ করে ও গায়ের রং ফরসা করে। খনিজ প্রস্রবণের কাদা দিয়া প্রলেপ দিলে ব্যথা বেদনা সারে। ফোস্কা পড়াইবার জন্য রাইসরিষা ও ফোড়া পাকাইবার জন্য তিসি ব্যবহৃত হইত। যক্ষ্মা রোগীদিগকে দেবদারু ও হেমলকের হাওয়ায় রাখা হইত। আলকাতরা ও মেটে তৈল পাঁচড়ার ঔষধ বলিয়া বিশ্বাস ছিল।

আমাদের দেশের প্রাচীন গৃহিণীদের মত প্রাচীন রোমক গৃহিণীরাও মুষ্টিযোগ-প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এমন কি পরিবারের কোনো পুরুষ যুদ্ধে আহত হইয়া বাড়ী আসিলে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা চিকিৎসাদি সমস্তই তাঁহারা করিতেন, সহজে চিকিৎসক ডাকিতেন না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

*

* *

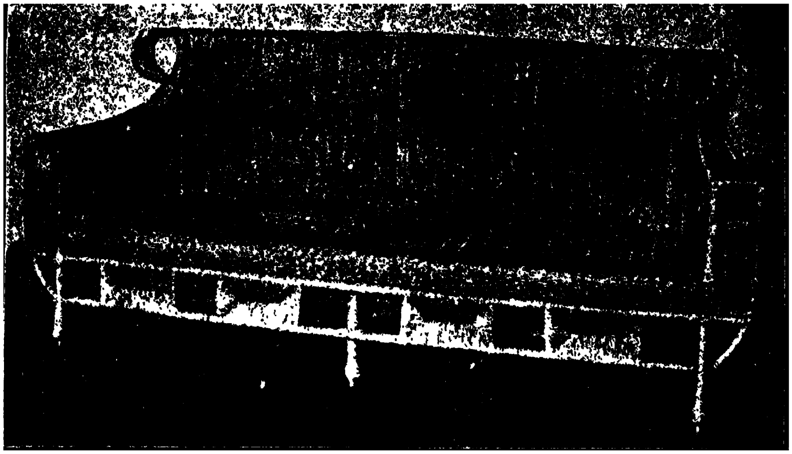
কাগজের কাজ—

কাগজ যে শুধু লেখবার কাজেই লাগে তা নয়; কাগজ আরো অনেক কাজে লাগে। কাগজ দিয়ে জিনিস মোড়ক করা আজকাল সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়েছে; ন্যাকড়ায় বাঁধা পোঁটলা বা শাল-পাতার ঠোঙায় খাবার হাতে করে' রাস্তায় চলতে লজ্জা বোধ হয়, বাধো-বাধো ঠেকে, কিন্তু তার ওপর কাগজের আবরণ চড়ালে সেটা ভদ্র হয়ে যায়। কাগজ দেবী-সরস্বতীর চরণ-শতদলের পাপড়ি, তারই ওপর সরস্বতীর চরণচিহ্ন পড়ে বলে কাগজ কি এই সম্মান লাভ করেছে? জাপানী ও চীনারা কাগজ দিয়ে সুন্দর লণ্ঠন গড়ে; জাপানীরা কাগজের রুমাল ব্যবহার করে; তারা কাগজ দিয়ে বাড়ী আর নৌকাও যে গড়ছে তার খবর ও ছবি কিছুদিন আগে প্রবাসীর পঞ্চশস্যে সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সে যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈন্যদের জন্য কাগজের অন্তর্বাস পোষাক তৈরি করবার আয়োজন চলছে। কাগজ খুব গরম আটকায়; সুতরাং শীতের সময় গায়ের উপরে জামার তলে কাগজের জামা থাকলে শরীরের তাপ বেরিয়ে যেতে পারবে না, বাইরের ঠাণ্ডাও গায়ে পৌঁছবে না। ফরাসী বিজ্ঞান-পরিষৎ একটি বড় কাগজের কলে বহু পরীক্ষার পর এমন একরকম কাগজ তৈরি করতে পেরেছেন যা কাপড়ের মতন নরম ও নমনীয়, অথচ শক্ত মজবুত জল-অবরোধক এবং স্বাস্থ্যকর (antiseptic)। এই কাগজ শণের পুরাণো দড়িদড়া কুটে তৈরি হচ্ছে। পরীক্ষায় স্থির হয়েছে বাঁশের মণ্ডে এই কাগজ খুব উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু ফ্রান্সে বাঁশ জন্মে না। ভারতবর্ষে বাঁশ প্রচুর, চাষ করলে আরো বেশী জন্মানো যায়, কিন্তু ভারতের লোকের নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা অব্যবহারে ম্লান হয়ে রয়েছে, দেশে স্বায়ত্ত অধিকার না থাকাতে দেশী লোকের উদ্যম চেষ্টা সুযোগের অভাবে স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে না। যাই হোক ফ্রান্সের নবনির্ম্মিত কাগজ দিয়ে জামার কাপড়ের নীচে অস্তর দেওয়া হচ্ছে, তাতে জামা দ্বিগুণ গরম হচ্ছে এবং কাপড়ের সঙ্গে থাকাতে কাগজ ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে বা ফেটে যাবার অথবা মুচড়ে-মুচড়ে জড়োজড়ো হয়ে থাকবার সম্ভাবনা খুব কম হয়ে যাচ্ছে। ঐ কাগজের ওপর জেলাটিন ও চর্ব্বির সঙ্গে প্রচুর উবায়ু-তেল মিশিয়ে বার্ণিশ করে তাকে বেশীরকম নরম নমনীয় ও জল-বাতাস-অবরোধক করা হয়। এই কাগজের তৈরি ভেষ্ট কুর্ত্তার ওজন হয় আড়াই আউন্স মাত্র, আর ভাঁজ করে খুব ছোট করা যায়। এই জামার ওপর পশমের খুপি লাগিয়ে তাকে আরো গরম করা চলে। এই কাগজে ছারপোকা উকুন পিশু প্রভৃতি কোনো পোকা তিষ্ঠতে পারে না—কারণ

ইউক্যালিপ্টাস তেল আর ফর্ম্মালডে-হাইড মিশিয়ে তা এণ্টিসেপ্টিক করা থাকে। আমেরিকাতেও কাগজের জামা পরা প্রচলন হয়েছে—তবে সে কাগজ এমন ভালো নয়।

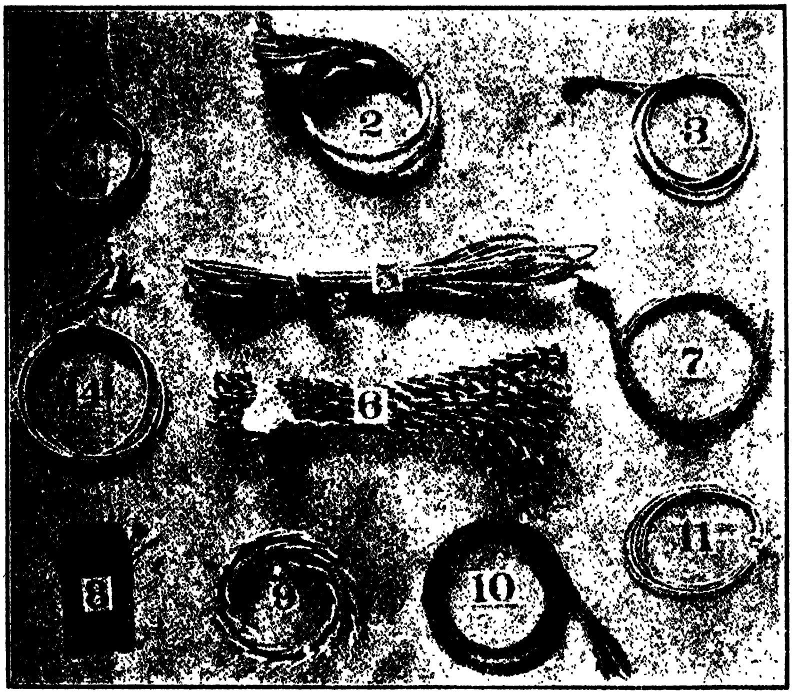
আমেরিকায় ও জাপানে কাগজের লম্বা লম্বা ফালি পাকিয়ে দড়ি করা হয়; সেই দড়ি দিয়ে দোকানীরা জিনিসের মোড়ক বাঁধে। আমেরিকায় কাগজের তা থেকে ফালি কেটে তার পর দড়ি না পাকিয়ে কলে থেকে একেবারে ফালি কাগজ তৈরি করে সেইসঙ্গেই তার এক খেই পাকাবার কলে জুড়ে দেওয়া হয় এবং কল থেকে কাগজের দড়ি পাকিয়ে বেরিয়ে আসে। কোনো কোনো দড়িতে তুলোর পাঁজ খাইয়ে খাইয়ে কাগজের ফালি পাকানো হয়—তাতে করে দড়ি সুদৃশ্য আঁশওঠা ও শক্ত হয়।

কাগজের দড়ি দিয়ে কম্বল (rug) বোনা আমেরিকায় খুব চলতি হয়েছে, যে-কোনো দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। মার্কিন দেশে ঐ রাগ্‌ তৈরির ২৫টা কারখানা হয়েছে, তাদের একটাতে রোজ ২১ টন ওজনের রাগ্‌ কম্বল তৈরি হয়। কোনো কোনো রাগ্‌ কেবল কাগজের, কোনো-কোনোটাতে তুলো বা পশম বা উভয়ই মিশাল দেওয়া হয়। বিভিন্ন রঙের সুতোর বুনোনি থেকে বা ষ্টেন্সিল করে রং লাগিয়ে কম্বলের ওপর বিবিধ নক্সা তোলা হয়।



কাগজের দড়িতে বোনা আসন।

আমেরিকায় কাঠের বা বেতের কাঠামো ফ্রেমের ওপর কাগজের দড়ি বুনে বিবিধ প্রকারের সুন্দর অথচ সস্তা আসন তৈরি করবারও অনেক কারখানা হয়েছে। লোকে যত ঐসমস্ত আসবাবের পরিচয় পাচ্ছে, ততই তার প্রচলন বেড়ে চলেছে।



কাগজের নানান্‌ রকম সুতা দড়ি টোয়াইন কাছি গুণ।

কাগজের দড়ি দিয়ে থলি থলে বোরা বোনা হচ্ছে। সেইসব বোরায় পেঁয়াজ কফি তামাক ময়দা বস্তাবন্দি করে দেশবিদেশে চালান হচ্ছে।

কাগজের দড়ি বুনে ম্যাটিং মাদুর করা হচ্ছে। নৌকা-টানা গুণ ও কাছি পর্য্যন্ত কাগজের দড়িতে হচ্ছে। কাগজের সুতোতে সেলাই করা চলেছে; রঙিন কাগজের দড়িতে ঘর সাজাবার ঝালর করা হচ্ছে। কাগজের দড়ি বুনে নকল চামড়া তৈরি হয়েছে। আরো কতকি তৈরি করবার গোপন চেষ্টা ও পরীক্ষা যে চলছে তার ইয়ত্তা নেই, অল্প দিনেই দেখতে পাব কাগজেই যা-কিছু দরকারী সব তৈরি হয়েছে।

* * *

সিঁড়ির মতন বাড়ী—

ফ্রান্সে এক মিস্ত্রি স্থপতি ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতন অনেক তলার বাড়ী নির্ম্মাণের প্রথা প্রবর্ত্তন করেছে। সে বলে যত তলা বাড়ী, তত ধাপে সরে সরে হলে সকল তলার সকল ঘরে সমান হাওয়া বাতাস পাওয়া যায়; প্রত্যেক তলার সামনে খোলা বারান্দা ও ছাদ পাওয়ারও সুবিধা হয়। শহরে এই ধরণে বাড়ী করলে সরু গলিতেও আলো বাতাসের অভাব ঘটে না। প্রথম তলা বাড়ী গেঁথে তার ওপর-তলা কয়েক ফুট ছোট করে



সিঁড়ির মতন ধাপে ধাপে তলা তোলা বাড়ী।

করতে হয়; এই রকমে থাকে থাকে বাড়ী উঁচু দিকে উঠে যাবে। ফতেপুর সিক্রিতে সম্রাট আকবরের তৈরি পঞ্চমহল এই প্রণালীর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ফ্রান্সের নবনির্ম্মিত বাড়ীর প্রত্যেক তলার বারান্দা এমন কৌশলে গঠিত যে উপর হতে রাস্তা দেখা যায় কিন্তু নীচের বারান্দার কিছু দেখা যায় না, এতে করে নীচের তলার বাসিন্দাদের আব্রু নষ্ট হয় না। বারান্দার কিনারে লোহার রেলিং, তার গায়ে গাছের সারি; রাস্তা থেকে দেখলে ল্যাহোরের শালিমার বাগের মতন ধাপে ধাপে বাগান উঠেছে বলে মনে হয়, এবং বড় সুন্দর দেখায়। এই প্রণালীতে গঠিত বাড়ীর প্রত্যেক তলায় অপর সাধারণ বাড়ীর চেয়ে এক ঘণ্টা বেশী দিনের আলো থাকে। এই প্রণালীতে বাড়ী গড়লে প্রত্যেক তলায় খানিক খানিক জায়গা ছেড়ে ছেড়ে যাওয়াতে যেমন ঘর কম হবার সম্ভাবনা, তেমনি নিরাপদে বাড়ীটিকে অনেক তলা উঁচু করা চলে বলে সেই ক্ষতি সহজেই পূরণ হয়ে যেতে পারে। মিউনিসিপালিটি সরু গলিতে বেশী উঁচু বাড়ী করতে দ্যায় না; সরু গলিতে যদি সামনাসামনি দুটো উঁচু বাড়ী ওঠে তা হলে গলি অসূর্য্যম্পশ্য ও নীচের তলার ঘরগুলো অন্ধকার স্যাঁতা হয়ে ওঠে—যেমন অবস্থা হয়ে আছে কাশীর গলির। সেইজন্যে মিউমিসিপাল নিয়ম এই যে বাড়ীর মাথা থেকে রাস্তার ওপারের সীমা পর্য্যন্ত একটা রেখা টানলে সেই রেখা ও বাড়ীর খাড়াই রেখার মধ্যের কোণ ৪০ ডিগ্রির কম যেন না হয়। ধাপে ধাপে সরিয়ে সরিয়ে বাড়ীর তলা তুললে তার শিখর থেকে রাস্তার ওপারের সীমা পর্য্যন্ত রেখা খুব ঢালু হয় এবং ৪০ ডিগ্রি কোণ পর্য্যন্ত পৌঁছাবার আগেই বাড়ী খুব উঁচু হয়ে ওঠে। ২৭ ফুট চওড়া রাস্তায় ৫০ ফুটের বেশী উঁচু বাড়ী করা নিয়ম নয়; কিন্তু ধাপে ধাপে বাড়ী করলে সেই রাস্তার ওপর দশ তলা বাড়ী স্বচ্ছন্দে করা চল্ছে, মিউনিসিপালিটির নিয়মে আটকায় না।

খাদ্য ও ঔষধ রূপে মাটির ব্যবহার—

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ঔষধ প্রস্তুত হয় উদ্ভিদ ও খনিজ দ্রব্য হতে; অতি প্রাচীন কালে বিবিধ-প্রকারের মাটি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হত; প্লিনি, ষ্ট্রাবো, ও অপরাপর গ্রীক ও রোমান লেখকদের লেখা হতে জানতে পারা যায়, ইটালী ও গ্রীস ও তৎসন্নিহিত দ্বীপ—যেমন লেমনস, সামস, কিঅস—হতে ঔষধগুণ-বিশিষ্ট মাটি সংগ্রহ করা হত; যে মাটিতে লৌহ বেশী থাকত সেই মাটিই বিশেষ ভাবে সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হত। প্রাচীনকালের নামজাদা চিকিৎসক ডায়োস্কোরাইডিস, হিপ্‌পোক্রেটিস ও গ্যালেন এরেট্রিয়া বা ইউবিয়া হতে পোড়া মাটি আনিয়ে ঔষধ করতেন।

স্পেনের বড়ঘরের মেয়েরা আজও খুব তারিফ করে উপাদেয় খাদ্য ভেবে আল্‌মাগ্রো বা এষ্ট্রেমেজ থেকে আমদানি কাদা লঙ্কা মেখে খেয়ে থাকেন। সুইডেনের উত্তরাংশে, ম্যাসিডোনিয়া ও সার্ডিনিয়ায় একরকম শাদা সূক্ষ্ম মোলায়েম মাটি ময়দায় মিশিয়ে রুটি গড়া হয়; এবং অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রীর সঙ্গে সেই মাটি হাটে বাজারে খাবারের দোকানে বিক্রয় হয়। উত্তর ইটালীর ট্রেভিজো প্রদেশে, অষ্ট্রিয়ার ষ্টিরিয়া প্রদেশে, জার্ম্মানীর কোনো কোনো প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা রুটিতে মাখমের বদলে একরকম কাদা মাখিয়ে খায় ও সেই মাটিকে বলে Stone-butter বা মাখন-মাটি।

পারস্যের নিশাপুর প্রদেশের প্রসিদ্ধ মাটি কাঁচা বা ভাজা, মসলা ও সুগন্ধ মিশিয়ে, খুব তারিফ করে খাওয়া হয়। দক্ষিণ পারস্যের জলা জায়গায় একরকম মাটি পাওয়া যায় তাতে ম্যাগ্নেসিয়াম-ক্লোরাইড ও চূনের ভাগ বেশী থাকে; তাকে সেদেশে গিল-ই-গিরাহ্ বলে, এবং তাই দিয়ে পাঁউরুটির খামির করে, আর কাঁচাও খায়।

এস্কিমোরা নানান-রকম মাটি প্রচুর খায়। চীনের মহিলারা একরকম খিচশূন্য মোলায়েম মাটি মুখে মেখে মুখচর্ম্মের বিবর্ণতা নিবারণ করে। এ রীতি বহু প্রাচীন।

ভারতবর্ষে গর্ভিণীদের মাটি খাওয়ার অভ্যাস খুব প্রাচীন; কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে গর্ভবতী সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি আননের বর্ণনায় তার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। কলিকাতায় খাওয়ার জন্য পাতখোলা বিক্রয় হয়। বৃন্দাবনের মাখম-মাটি প্রসিদ্ধ। মোরং পাহাড়ে একরকম ঘুটিং নুন-তেল মেখে ভাতের তরকারী করে লোকেরা খায়।

শ্যামদেশের স্ত্রীলোক ও শিশুরা খড়িমাটির মতন একরকম মাটি (steatite) খুব আদর করে খেয়ে থাকে। যাবাদ্বীপের সমুদ্রকিনারের লোকেরা এম্পো মাটি তক্তি বা পুলির আকারে গড়ে বিক্রয় করে ও কিনে খায় ; ঐ মাটি খেলে দেহ নাকি ছিপছিপে একহারা থাকে, কখনো মোটা হয়ে পড়তে পারে না। মালয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত টিমর দ্বীপে পোড়া মাটি খাওয়ার পর্ব্ব আছে ; রীতিমত পূজা অর্চ্চনা করে তবে মাটি খাওয়া হয়।

আফ্রিকার নিউবিয়া প্রদেশে ও পশ্চিম উপকূলের কতকাংশে মাটি খাওয়ার খুব প্রচলন। গিনী প্রদেশের কাফ্রিরা গণ্ডেপিণ্ডে কুয়াক মাটি খায়। সেনেগ্যাম্বিয়ার লোকেরা শাদা সাবানের মতন মোলায়েম খিচশূন্য মাখন-মাটি দিয়ে খাবার প্রস্তুত করে। নিউ-গিনীর ও মেলানেসিয়া দ্বীপের বাসিন্দারা সবজে রঙের সাবান-মাটি খায় ; নিউ-ক্যালিডোনিয়ার লোকেরা লোহার মর্চে'র রঙের লোহাসংযুক্ত মাটি কাঁচা বা পিষ্টকাকারে শুকিয়ে খায়।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্বত্র মাটি খাওয়ার খুব প্রচলন আছে। মেক্সিকোর কতকাংশের ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ সবাই সমান আগ্রহে মাটি খায়। পোড়া মাটির চাকতি বাজারে হাটে বিক্রয় হয়। গোয়াটিমালার লোকেরা চিনির বদলে আগ্নেয়-গিরির ছাইএর উপর উদ্গত একরকম ভুয়া মাটি খায়। আমেরিকার কলম্বিয়া হতে বলিভিয়া পর্য্যন্ত সকল দেশেই মাটিখোর লোকের বাস দেখা যায়। আমেরিকার আদিম লাল মানুষের মেয়েরা কাজ করতে করতে কাদার ডেলা গিলে গিলে খায় ; সিদ্ধ আলুতেও মাখিয়ে খায়। এই মাটি পরিষ্কার করে সুগন্ধ মিশিয়ে নানা প্রকারের বাটি কুঁজো ও পুতুল গড়ে বিক্রয় করে ; শ্বেতাঙ্গ মহিলারা খাওয়ার জন্যে সেইসব কেনে। বর্ষা কালের জন্যে ঐ মাটি সংগ্রহ করে গুলি পাকিয়ে শুকিয়ে রাখে।

মাটির সোঁদা গন্ধ ও আমিষ্ট নোন্‌তা স্বাদ লোককে মাটি খেতে প্রবৃত্তি দ্যায় ; রক্তহীনতা ও হিষ্টিরিয়া রোগে মেয়েদের রুচির বিকারও মাটি খাওয়ার একটা কারণ। অল্প অল্প মাটি খেলে অসুখ করে না ; বরং অনেক সময় ওষুধের কাজ করে। কিন্তু এক একজন লোকের—বিশেষত শিশু ও অল্প বয়সের মেয়েদের—এমন মাটি খাওয়া বাতিক থাকে যে তাদের মুখে লোহার মুখোস পরিয়ে রাখতে বা হাত বেঁধে রাখতে হয়।

*
* *

দীর্ঘজীবী প্রথম সন্তান—

আমরা পূর্ব্বে প্রবাসীতে বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও পরীক্ষালব্ধ ফল আহরণ করে দেখিয়েছিলাম যে প্রথম সন্তান তেমন বুদ্ধি-ও-শক্তি-সম্পন্ন এবং দীর্ঘজীবী হয় না, যেমন পঞ্চম সন্তান হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষণে আমেরিকার জার্ণাল অফ হেরেডিটি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে প্রথম সন্তানই অপর সন্তান অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়ে থাকে। আমেরিকার Genealogical Record Office কয়েক বৎসর ধরে দীর্ঘজীবী লোকদের তালিকা সংগ্রহ করছেন। সেই তালিকা থেকে জানা যায় যে যে-সব লোক নব্বই বৎসরেরও বেশী বেঁচেছে তারা বহুপ্রজ পিতামাতা ও খুব বৃহৎ পরিবারের প্রথম সন্তান। ১০০কে নিম্নসীমা ধরে সেই তালিকা থেকে ক্রমিক জাত সন্তানদের দীর্ঘজীবীর সংখ্যা এইরূপ পাওয়া গেছে—

১ম জাত	...	১৫২
২য়	...	৯০
৩য়	...	৮৬
৪র্থ	...	৯৪
৫ম	...	১০০
৬ষ্ঠ	...	৬১
৭ম	...	১০৬
৮ম	...	৭৯
৯ম	...	৮৫
১০ম	...	১২৫
১১শ ও তদূর্দ্ধ	...	১১৭

এই তালিকা থেকে প্রথম জাত সন্তানেরাই সব চেয়ে বেশী দীর্ঘজীবী হয় দেখা যাচ্ছে ; তারপর ১০ম, ১১শ, ৭ম ও ৫ম ; অপরেরা তেমন দীর্ঘজীবন লাভ করে না।

ডাক্তার আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল নিম্নলিখিত সংখ্যাতালিকা সংগ্রহ করেও দেখেছেন যে প্রথম সন্তানই সব চেয়ে বেশী বাঁচে।

জন্মের ক্রম	সন্তানের মোট সংখ্যা	তার মধ্যে কতজন দীর্ঘজীবী	দীর্ঘজীবীর শতকরা হার
১ম	৮০২	২১৭	২৭.০৫
২য়	৭৮৬	১১৮	১৫.০১
৩য়	৭৬৫	১০৪	১৩.৫৯
৪র্থ	৭০৫	৯৫	১৩.৪৭
৫ম	৬৩০	৮২	১৩.১
৬ষ্ঠ	৫৪২	৪০	৭.৩৮
৭ম	৪৫০	৫৩	১১.৭৭
৮ম	৩৬৯	৩০	৮.১৩
৯ম	২৭১	২২	৮.১১
১০ম	১৮১	২০	১১.০৪
১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫শ	১৮৮	২১	১১.১৭
মোট	৫৬৮৯	৮০২	১৪.০৯

কার্ল পীয়রসন দেখিয়েছেন যে প্রথম গর্ভের সন্তান অনেকে মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয় ; তারা শৈশবে বেশী মারা পড়ে ; তাদের শৈশবে স্বাস্থ্য দুর্ব্বল ও রুগ্ন থাকে। এই আপাতবিরোধী তথ্যের সমস্যা-সমাধান প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রণালী আলোচনা করলেই সহজেই হয়ে যায়। প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মাতৃদেহ সেই কর্ম্মের তেমন উপযুক্ত থাকে না ; পরে অভ্যাসের বশে উপযুক্ত হয়ে ওঠে ; এই কারণে প্রথম সন্তানকে অনেক ফাঁড়া কাটিয়ে বেঁচে উঠতে হয় এবং সেইজন্য প্রকৃতি তাকে অন্য সন্তানের চেয়ে শক্ত সমর্থ করে গড়ে ; নানা ফাঁড়া কাটিয়ে যারা বেঁচে যায় তারা খুব বেশী দিনই বাঁচে।

চারু।

দেশের কথা

জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশবাসীর মধ্যে ভেদবুদ্ধি দূর হওয়া প্রয়োজন। দেশের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ বরেণ্য সুন্দর, তার সমাদর করিলে দেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সে-সব অবহেলা করিয়া আমরা যদি কেবল দেশের মধ্যে জাত্যভিমান জাগাইয়া তুলিয়া দেশ-বাসীর মধ্যে হিংসাবিদ্বেষের বীজ বপন করি তাহাতে দেশকে অপমান করা হয়, জাতীয়তাও ক্ষুণ্ণ হয়।

সম্প্রতি ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কেহ-কেহ সভাসমিতি করিতেছেন। মজার কথা এই যে লাটসভায় যে-ভারতীয় সদস্য হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলনের জন্য বিল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন তিনিও এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দিতে ইতস্তত করেন নাই। একজন নামজাদা বিলাতফেরত ব্যারিষ্টারও যোগ দিয়াছিলেন। এইপ্রসঙ্গে "রংপুর-দিক্‌প্রকাশ" বেশ যুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছেন। তাহা এই :—

আশার বিষয় যে, এই অনৈসর্গিক জাতিভেদের প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন শিথিল হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বংশানুগত জাতি-ভেদের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই না। গুণমর্য্যাদা চিরদিন থাকিবে ও থাকা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনকই। কিন্তু কাঞ্চনের আপেক্ষিক গুরুত্ব যে শুধু পাশ্চাত্যদেশে অনুভূত হয় এবং আমাদের দেশে হয় নাই বা হয় না এরূপ বলা যায় না। কাঞ্চনকৌলিন্য এবং বংশ-কৌলিন্য দুই-ই আমাদের দেশে ওতপ্রোত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। কাঞ্চনকৌলিন্য দেশে ও বিদেশে উদ্যোগী পুরুষের দ্বারা লব্ধ হইতে পারে, কিন্তু অন্যটি এ দেশে নিম্নবংশীয়ের দ্বারা লভ্য নহে। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ-বিভাগ লুপ্ত হইয়া সমত্ব প্রাপ্ত হয়। ইয়ুরোপের অধিকাংশ রাজ্যসমূহে ক্ষত্রিয় বলিয়া এখন আর বিশিষ্ট জাতি নাই। সকলকেই ক্ষত্রিয়বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ হইতে হয়। সমাজের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈশ্যোচিত কৃষি-কর্ম্মে বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। আজকাল গৃহকর্ম্মের জন্য ভৃত্য পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। বহু মার্কিন ভদ্রপরিবার দাসোচিত কর্ম্ম স্বহস্তেই সম্পাদন করেন। ভারতেও ইয়ুরোপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। ইয়ুরোপে ধনবল এবং শ্রমবলের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। Cooperative Principle অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমবায়-নীতির অবলম্বনে এই শ্রেণীগত বিবাদের মীমাংসা সম্ভবপর হইতেছে। ভারত হইতে জাতিভেদ তিরোহিত হইলে, অমঙ্গলের কোন আশঙ্কা নাই। জাতিভেদশূন্য বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় সাধনা, বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ ক্ষুণ্ণ না হইয়া পরিপুষ্টিলাভই করিয়াছিল। আত্মার বিকাশে ব্যক্তির মঙ্গল, জাতির মঙ্গল—আত্মার ভেদাভেদ নাই। হীন ব্যক্তিকেও আত্মসাধনায় বাধা দিলে সমাজেরই অমঙ্গল হইবে।

দেশের কোথাও যদি অন্যায় থাকে তাহাকে যেমন পরিহার করিব, তেমনি বিদেশের অন্যায়কেও অশ্রদ্ধাই করিব। এবং দেশের যা-ভালো তা যেমন গ্রহণ করিব, তেমনি বিদেশের ভালো জিনিসটিকেও শ্রদ্ধার সহিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিব। মনকে সংকীর্ণ করিব না, ভিন্ন জাতের লোক বলিয়াই কাহাকেও অবজ্ঞা করিব না বা শ্রদ্ধা করিব না। যিনি শ্রদ্ধেয় তাঁকে শ্রদ্ধা করিব, তা তিনি স্বদেশেরই হউন আর বিদেশেরই হউন। দেশে যদি কোথাও জড়তা থাকে তো তাহাকে ত্যাগ করিব, কিন্তু দেশের ভাষা, দেশের পোশাক, দেশের শিল্পকলা, দেশের সঙ্গীত, দেশের যা' কিছু নিজস্ব মহামূল্য সম্পত্তি তাহা ত্যাগ করিলে চলিবে না। তাই যখন দেখি দেশী যুবকেরা বিদেশী ভাষায় চিঠি লেখেন, 'বাবা' 'মা' বলিতে তাঁদের বাধ-বাধ ঠেকে, বলেন father, mother; ইংরেজিতে কথা বলেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য, সঙ্গীত এবং চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় রাখেন না; দেশী সাহিত্যকে করুণামিশ্রিত অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন; যখন দেখি বিনা প্রয়োজনে তাঁরা বিদেশীর সাজে সজ্জিত, তখন দেশে জাতীয়তা বিস্তার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়ি। লজ্জার হইলেও একথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে বিদেশী পোশাকে সজ্জিত হইয়া আমরা দেশীয় লোকের কাছেই অনেক স্থলে বিশেষ সম্মান লাভ করি, যে-সম্মান দেশের উত্তরীয়ে সজ্জিত থাকিলে পাওয়া অসম্ভব। তবুও আমরা যেন মনে রাখি যে যে-সম্মান য়ুরোপীয় পোশাককে প্রদর্শিত হইতেছে তার জন্য নিজেকে সম্মানিত বা কৃতার্থ বোধ করা অপৌরুষেয়। কোনো-কোনো বাঙালীর মধ্যে এমন ভাবও দেখা যায় যে ধুতি পরিয়া কোনো বড় কাজ বা বড় চিন্তা সম্ভবপর নহে। মফঃস্বলের কাগজে প্রকাশ, এক হেড মাষ্টার নাকি মনে করেন যে ধুতি চাদর পরিয়া ছেলেদের শিক্ষা দিলে শিক্ষাকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না তাই—

মুগবেড়্যা গঙ্গাধর হাই স্কুলের সুযোগ্য হেড মাষ্টার মহাশয় বড়দিনের বন্ধের পূর্ব্বে এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে সমস্ত শিক্ষককে এমন কি vernacular teacher (বাঙ্গালা শিক্ষককেও) কোট প্যাণ্ট পরিয়া অধ্যাপনার কার্য্য করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহাদের কর্ম্মচ্যুতির যথেষ্ট

সম্ভাবনা। ২রা জানুয়ারী বিদ্যালয় খুলিলে সকলকে উক্ত প্রকার ধড়াচূড়া পরিধান করিতে হইবে। —"নীহার"

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পরাধীনতাবশত আমাদের দেশের মাটির উপরই সর্ব্বত্র নিজের পোশাক পরিয়া ফিরিতে পারি না। এই কলিকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ উদ্যান "ইডেনগার্ডেন" দেশবাসী সকলের নিকট কর গ্রহণ করিয়া স্থাপিত ও সংরক্ষিত। কিন্তু সেই উদ্যানের কোনো-কোনো অংশে আমরা বহুমূল্য দেশী ধুতি পাঞ্জাবি শাল আলোয়ান পরিয়াও যাইতে পারি না। চাঁদনির রোখো হ্যাটকোট পরিয়া কিন্তু যাইবার বাধা নাই।

এ মর্ম্মে কোনো লিখিত নিয়ম না থাকিলেও উদ্যান-রক্ষক বিদেশী পুলিশ প্রহরীকে এ-বিষয়ে খুব কড়া হুকুম দেওয়া আছে। আমরা কিন্তু এমনি মেষের ন্যায় নিরীহ যে এই জুলুম অবনতমস্তকে বহু বৎসর ধরিয়া মানিয়া চলিতেছি!

ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসী প্রবেশাধিকার পায় না এবং নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত অপমানিত হয় বলিয়া আমরা তুমুল আন্দোলন করি, দক্ষিণ আফ্রিকায় হুলস্থুল বাধাইয়া দিই, কিন্তু বাংলার শ্রেষ্ঠ শহর কলিকাতার শ্রেষ্ঠ সাধারণী উদ্যানের মধ্যে যে বাঙালীর এবং অন্যান্য ভারতবাসীর অপমানকর নিয়ম চলিতেছে সে-সম্বন্ধে কোনো "মাননীয়" লাট-সভার সদস্যকে কখনো একটি প্রশ্নও কর্ত্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করিতে শুনি নাই!

রেল ষ্টীমার প্রভৃতিতে ভ্রমণের সময়ও য়ুরোপীয় পোশাক পরা থাকিলে বিনা খরচে অনেক সুবিধা ভোগ করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। একবার একটি ক্ষীণজীবী বাঙালীর ছেলে মধ্যম শ্রেণীর Reserved for Europeans কামরায় ধুতি পরিয়া ভ্রমণ করিতেছিল। গাড়ীতে যখন ওঠে তখন কামরা খালি ছিল। পথে এক ষ্টেশনে এক য়ুরোপীয়-পোশাক-পরিহিত ফিরিঙ্গি আসিয়া ছেলেটিকে বলিল—"তুমি নেটিভ, তুমি কোন্ সাহসে ইউরোপীয়ানদের কামরায় উঠিয়াছ! নামিয়া যাও।" ছেলেটি সেই কৃষ্ণবর্ণ 'য়ুরোপিয়ান'টিকে বলিল—"তুমি আর আমি কেহই য়ুরোপিয়ান নই। অতএব আমাদের একত্রে যাইতে ক্ষতি কি?" তখন ফিরিঙ্গি রাগে গশগশ্ করিতে-করিতে ষ্টেসন-মাষ্টারকে ডাকিতে ছুটিল। সে চলিয়া যাইবার পর ছেলেটি হঠাৎ একটা তোরঙ্গ খুলিয়া তলদেশ হইতে একটা অতি জীর্ণ দোমড়ানো-মোচড়ানো বিবর্ণ প্যাণ্টলুন বার করিয়া কাপড় মালকোঁচা মারিয়া তাহার উপর উহা পরিতে আরম্ভ করিল। সবেমাত্র একটা পা প্রবেশ করাইয়াছে, এমন সময় ফিরিঙ্গি ও ষ্টেসন-মাষ্টারটি আসিয়া উপস্থিত। ষ্টেসন মাষ্টার প্রকৃত সাহেব। ছেলেটিকে তদবস্থ দেখিয়া এবং প্রাণপণে তাহাকে প্যাণ্টলুনে আর একটি পা প্রবিষ্ট করাইবার অক্ষম চেষ্টা করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"Hallo! what are you doing?" ছেলেটি তখন সাহেবের মুখের দিকে এবং ফিরিঙ্গির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"I am becoming an European, Sir!"

এবারকার কংগ্রেস ও মোসলেম লীগে জাতীয় ঐক্যবোধের প্রকাশ ও হিন্দুমুসলমানে মিলিয়া দেশের কাজ করিবার ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া মনে কতকটা আশার সঞ্চার হয়। "চারুমিহির" এই প্রসঙ্গে বলেন—

ভারতে যাহাতে স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান সমিতি একত্র ও একযোগে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন; এই প্রস্তাব উপলক্ষে দেশের লোক যে-প্রকার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের প্রত্যেকেই মনে করিতেছেন, বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে তাঁহারা যেরূপ রাজোচিত সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, দেশের লোকের জন্য নীর মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া তাঁহারাই এখন যেরূপ ক্ষীর ভক্ষণে অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন, দেশে স্বায়ত্তশাসনমূলক শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের সেই সুখ ও সুবিধার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তাঁহারা সেই জন্য বলিতেছেন, বর্ত্তমান যুদ্ধের সময়ে এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়া এ দেশের লোক গবর্ণমেণ্টকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা কার্য্যে বাধা উপস্থিত করিবে, এবং সেই জন্যই তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অতি আগ্রহের সহিত পরামর্শ দিতেছেন যে, ভারতবর্ষে ঐরূপ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহা প্রকাশ্যরূপে সকলকে গবর্ণমেণ্টের জানাইয়া দেওয়া উচিত।

অপর দিকে উপনিবেশের অধিবাসীগণ বৃটীশ সাম্রাজ্যময় সর্ব্বত্র তাঁহাদের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য কেবল দাবী উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তজ্জন্য পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থানে নানা ভঙ্গীতে তদুদ্দেশ্যে জনমত সৃজনের আয়োজন করিতেছেন। সম্প্রতি এ দেশে লায়নেল কার্টিস্ নামক এক শ্বেতাঙ্গ এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছেন।

এই লায়নেল কার্টিস্, কাহারা, কি উদ্দেশ্যে এ দেশে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে। সম্প্রতি বিলাতে "রাউণ্ড টেবিল" (Round Table) সম্প্রদায় নামে

একটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। সেসিল রোড্‌স্ ইত্যাদি যে-সকল লোক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বর্ণখনির লোভে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়ার জাতির স্বাধীনতা লোপে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ-সকল উপনিবেশে অবস্থান করিয়াই স্বর্ণ ও হীরকাদি আহরণ করিয়া প্রচুর ধনী হইয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, যে-সকল ইংরেজকে উপনিবেশগুলিতে অবস্থান করিতে হয়, তাঁহারা ভারতবর্ষ ইত্যাদি স্থানের সুখ সুবিধার ভাগী হইতে পারিতেছেন না। তজ্জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা যে, উপনিবেশের অধিকারীগণও খাস ইংরেজের ন্যায় এ দেশে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন।

ধূর্ত্ত উপনিবেশবাসীগণ যাহাতে আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন না করিতে পারে তৎপক্ষে আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে; অপর দিকে আমরা যাহাতে যুদ্ধান্তে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে পারি তজ্জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে আমাদের শত্রুপক্ষ আমাদেরই দেশের কোনও কোনও লোককে হস্তগত করিয়া দেশমধ্যে ভিন্ন মতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমাদের আন্দোলন যাহাতে মন্দীভূত না হয় তজ্জন্যও আমাদিগকে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে।

"মোহাম্মাদী" লিখিয়াছেন—

আজ হইতে কএকবৎসর পূর্ব্বে মুসলমানের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান করা একটা মহা পাপজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যে ২।৪ জন মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তাঁহারা সাধারণ মুসলমানের নিকট হিন্দুভাবাপন্ন, হিন্দুমন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া নিন্দিত হইতেন, কিন্তু মোসলেম লিগে নবজীবন সঞ্চারিত হওয়ার পর হইতে ক্রমে চিন্তাশীল মুসলমানগণ কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। এবৎসর লক্ষ্ণৌ সহরে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। কংগ্রেস ও লিগের উদ্দেশ্য অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা কংগ্রেসে যোগদান করেন না অথবা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি পোষণ করেন না তাঁহারা এখন সমাজে স্বার্থপর ও ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন। ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে যে কয়েকজন মুসলমান নেতৃস্থানীয় লোক মোসলেম লিগের অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সমাজচক্ষে কণ্টকস্বরূপ বিবেচিত হইতেছেন, তাঁহারা এখন সাধারণ সমাজকর্তৃক বর্জ্জিতাবস্থায় সময় কাটাইতেছেন।

গত মাসে "দেশের কথা"য় দেশের দারিদ্র্য নিবারণের একটি প্রধান উপায় বলিয়াছিলাম পুরুষ ও নারীর একত্রে অর্থ উপার্জ্জন করা। "বরিশাল-হিতৈষী"তে প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত আশাপ্রদ সংবাদে আমরা সুখী হইয়াছি—

বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ বামনার সবরেজিষ্টার। তাঁহার আফিসে একজন একষ্ট্রা মোহরারের পদ শূন্য হইলে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার-সমীপে ঐ পদটি তাঁহার স্ত্রীকে প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। মেজিষ্ট্রেট সাহেব প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সু।

চন্দ্রের উৎপত্তি

ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশ যদি খনন করিয়া পরীক্ষা করা যায় ত দেখা যায় যে এই পৃষ্ঠদেশটা স্তরে স্তরে পর্দ্দায় পর্দ্দায় নির্ম্মিত। উপরের এইরকম মাটি ভিতরে নাই। উপরের মাটিটা চাঁচিয়া ফেলিলে আর একটা জিনিষের স্তর বাহির হইয়া পড়ে, সেটা চাঁচিলে আর একটা। কতকটা বাঁধাকপির পাতার মত। এই স্তরগুলার কোনটা বালি, কোনটা পাথর, কোনটা কয়লা, ইত্যাদি। এগুলা যে সমতল, তাহাও নহে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপের ফলে কোনও স্থলে উঁচু হইয়া পাহাড় হইয়াছে, কোনও স্থলে নীচু হইয়া উপত্যকা ও সাগর হইয়াছে। কিন্তু যেখানেই খোঁড়, সর্ব্বত্রই এই স্তরের বিন্যাস দেখিতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর স্তর যেখানেই পরীক্ষা করা যায় সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সেই স্তর জলপ্লাবন দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তা সে উচ্চ পর্ব্বতের স্তরই হউক আর সমুদ্রের ভিতরকারই হউক। হিমালয়ের স্তরের মধ্যে এমন এমন প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে যাহা জল ভিন্ন অন্য কোথাও বাস করিতে পারে না। অর্থাৎ তা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে হিমালয়ের স্তরগুলা এককালে জলের মধ্যে ছিল। হিমালয়ের স্তরগুলা তৈয়ার হইয়াছে জলের পলির কার্য্যের দ্বারা। অবশ্য তৈয়ার হইবার সময় হিমালয়টা অত উচ্চ ছিল না, পরে কোনও প্রাকৃতিক উৎপাতের ফলে হিমালয় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠের এই স্তরনির্ম্মাণকার্য্য এখনই শেষ হয় নাই। এখনও গঙ্গা, নীল, মিসিসিপি ইত্যাদি বড় বড় নদীগুলি বর্ষার সময় বালু ও মৃত্তিকা বহন করিয়া আনিয়া নদীর মুখের নিকট জড় করে। বর্ষার পর জল সরিয়া গেলে দেখা যায় যে সে জায়গাটা একটু উঁচু হইয়াছে। পরবর্ত্তী বর্ষার প্লাবনে স্তর পড়িয়া আর-একটু উঁচু হয়, এইরূপ বৎসরের পর বৎসর পলি পড়িয়া একটা প্রকাণ্ড দেশ তৈয়ার হয়। আমাদের এই শস্যশ্যামলা সোনার বাংলা এইরূপেই তৈয়ার হইয়াছিল। পৃথিবীর এই ভাঙা গড়া/স্তরক্ষয় ও স্তরনির্ম্মাণকার্য্য অতি ধীরে ধীরে সম্পাদিত

হয়। সমস্ত প্রাকৃতিক ক্ষয়কারীশক্তিগুলা,—জল, ঝড়, গ্লেসিয়ার, জোয়ার ভাঁটা, সবগুলা একসঙ্গে কাজ করিলে, হিসাবে দেখা যায় যে আমেরিকা মহাদেশটাকে এক ফুট ক্ষয় করিতে ৬০০০ বৎসর লাগিবে। ৫০০০ ফুট একটা স্তরকে ক্ষয় করিতে ৩০ কোটি বৎসর লাগিবে। আমেরিকার এক একটা পাহাড়ের স্তর ৫।৭ মাইল পুরু। এই পুরু স্তর কতবার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া তৈয়ার হইয়াছে তাহার ঠিক নাই। এবং ইহার জন্য কত সময় লাগিয়াছিল তাহা ত্রৈরাশিকজ্ঞেরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। মনে রাখিবেন এই ৫ মাইল পুরু স্তর একটা নহে—এরূপ উপরি উপরি বিস্তর আছে। উপরোক্ত হিসাবে ভূপঞ্জরের এই সমুদায় স্তর নির্ম্মাণ করিতে কত কোটি কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে। ভূতত্ত্ববিদেরা এতদিন এবিষয়ে নির্ব্বাক্ ছিলেন। একটা স্তর নির্ম্মাণ করিতে ৩০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে ত কি হইয়াছে? পৃথিবী কি আজিকার? এ পৃথিবী কতদিনকার পুরাতন! এসব কাজ একদিনে হয় না—ইত্যাদি ইত্যাদি। পদার্থবিদেরা এ উত্তরে নিরস্ত হইতে পারেন নাই। পৃথিবী যে আজিকার নয় এবং এই স্তর-নির্ম্মাণ যে একদিনে হয় না তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু তবুও পৃথিবীর বয়সের ত একটা সীমা আছে, পৃথিবী কিছু অনন্ত কাল এখানে ছিল না। পৃথিবীর বয়স কত তাহা ঠিক জানা নাই, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে ১০০ কোটি বৎসরের মধ্যে হওয়াই সম্ভব। তাহার পূর্ব্বে পৃথিবী তরল ছিল। ভূতত্ত্ববিদেরা যে পৃথিবীর দেহের একখানা সূক্ষ্ম স্তর গাঁথিবার জন্য বিশ ত্রিশ কোটি বৎসর চাহিয়া বসেন, তাহার কোনও মূল্য নাই।

ভূতত্ত্ববিদেরা ইহাতে হটিবার পাত্র নহেন। তাঁহারা বলেন আমাদের গণনায় ভুল দেখাও। ভূপঞ্জর যে স্তরে স্তরে নির্ম্মিত, তাহা ঠিক। এবং এই স্তরনির্ম্মাণব্যাপার যে আজকাল অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইতেছে তাহাও ঠিক, সুতরাং এই হিসাবে মোটা স্তরগুলা তৈয়ার করিতে বিশ ত্রিশ কোটি বৎসর লাগিবেই ত। হাঁ, তোমরা যদি বল যে পূর্ব্বেকার পাহাড়ের নীচেকার মোটা মোটা স্তরগুলা যখন তৈয়ার হইয়াছিল তখন এই স্তরনির্ম্মাণব্যাপারটা খুব শীঘ্র শীঘ্র হইত, তা হইলে কোনও কথাই নাই। কিন্তু তোমাদের এমন একটা প্রাকৃতিক শক্তি দেখাইতে হইবে যাহার সাহায্যে ঐরূপ ৫।১০ মাইল পুরু স্তর শীঘ্রই তৈয়ার হয়। যতদিন তোমরা সেরূপ শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছ না, ততদিন আমরা তোমাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। পদার্থবিদ্‌গণ ইহার সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিয়া পান না অথচ নিজের গণনায় অবিশ্বাসও করিতে পারেন না। ফলে পদার্থবিদ ও ভূতত্ত্ববিদের মধ্যে পৃথিবীর বয়স লইয়া একটা মতভেদ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ভূতত্ত্ববিদ বলেন পৃথিবীর একটা স্তর নির্ম্মাণ করিতে ১৫০।২০০ কোটি বৎসর লাগিয়াছে, আর পদার্থবিদ বলেন—তাহা কিরূপে হইবে? আমাদের হিসাবে, পৃথিবীর বয়সই ১০০ কোটির ঊর্দ্ধে নহে। সম্প্রতি এই দুই বিরোধী দলের মধ্যে একটু মিলনের আশা দেখা গিয়াছে। সেটা বুঝিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সৌরজগৎ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জানিতে হইবে।

আমাদের সৌরজগতের ৭টা গ্রহ সূর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই ঘুরিবার পথ বা কক্ষটা স্থির নহে। গ্রহগুলা নিজেদের মধ্যে টানাটানি করিয়া সূর্য্যনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে একটু বিচ্যুত হয়। মাঝে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, এই কক্ষচ্যুতি কি কালে এত বেশী হইতে পারে যে তাহার ফলে দুইটা গ্রহতে ঠোকাঠুকি করিয়া, দুইটা গ্রহই বিনষ্ট হইয়া যাইবে? প্রশ্নটা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুরূহ। অনেক বড় বড় গণিতবিশারদ হার মানিয়া গিয়াছেন, কারণ সাতটা গ্রহের টানাটানির ফলে কোন্‌টা কোন্ সময়ে কোথায় আসিবে তাহা বলা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি দুঃসাধ্যকে দুঃসাধ্য বলিয়া মানিতে চায় না। ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত লাপ্লাস অনেক গণনার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন গ্রহগুলা নিজের স্থান হইতে সরিয়াছে বটে, কিন্তু খানিক দূর সরিয়া আবার ফিরিয়া আসিতেছে। কতকটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। সৌরজগতের গ্রহগুলার স্থানচ্যুতি যদি একমুখী হইত তা' হইলেই ভয়ের কারণ ছিল। কালক্রমে বিপরীতমুখী হয় বলিয়া সংঘর্ষের কোনও সম্ভাবনা নাই।

লাপ্লাসের এই অকাট্য গণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া অনেকে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে সৌরজগতের কোনও

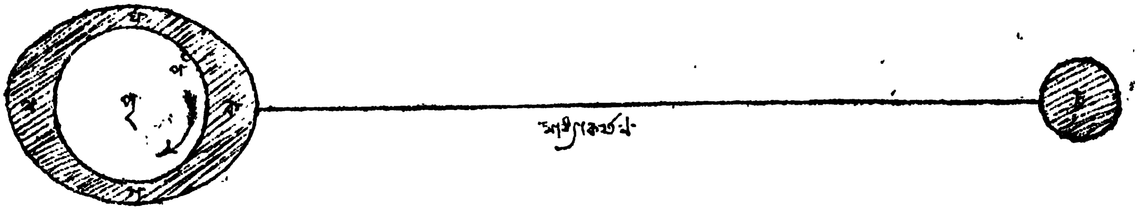
কালে ধ্বংস নাই। অনেকে ইহাতে চমৎকৃত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিধাতার এই অপূর্ব্ব কৌশলে কয়েকজন ছিদ্রান্বেষী খুঁত বাহির করিলেন। লাপ্লাসের গণনার মূল সূত্র হইতেছে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম। যদি বিশেষ গতি-বিশিষ্ট দুইটা সম্পূর্ণ কঠিন বা Perfectly Rigid বস্তু আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তা' হইলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে, একটা আর-একটার চারিদিকে বৃত্তাভাসের পথে ঘুরিতে থাকিবে। বস্তু দুইটা কিন্তু Perfectly Rigid হওয়া চাই। লাপ্লাস তাঁহার গণনায় সূর্য্যসমেত সমস্ত গ্রহগুলাকে সম্পূর্ণ কঠিন ধরিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রয়োগ করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। লাপ্লাসের অকাট্য গণিতের উপর এতদিন কেহ দন্তস্ফুট করিতে সাহসী হন নাই। সম্প্রতি লাপ্লাসের অনুমানের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। বাস্তবিকই জগতের সমস্ত বস্তু কি কঠিন? লাপ্লাসের এ অনুমানটুকু একেবারেই ঠিক নহে। পাথর, লোহা, ষ্টীল, এমনকি হীরকও সম্পূর্ণ কঠিন নহে। পৃথিবী নিজে ত নহেই। ইহার অভ্যন্তর অনেকের মতে তরল। সূর্য্য কঠিন হওয়া দূরে থাকুক তরলও নহে, বাষ্পময়। বৃহস্পতি ও শনি এখনও প্রায় তরল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লাপ্লাসের গণনার মধ্যে গোড়ায় গলদ রহিয়াছে। গোড়ায় যখন ভুল, তখন আগাতেও ভুল থাকিবে। অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহগণ যে-পথে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে তাহা স্থির নহে। সে পথ হইতে তাহারা অল্পে অল্পে বিচলিত হইতেছে। এ অল্প বিচলন দুইমুখী নহে। দুইমুখী হইলে কোনও গোলই ছিল না, বহুকাল পরে তাহারা পুনরায় স্বস্থানে ফিরিয়া আসিত; ইহা একমুখী। এই বিচলনের শেষ পরিণামে যে সৌরজগতে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে না তাহা কে বলিতে পারে?

বিচলন বা স্থানচ্যুতি যে হইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, আমাদের চন্দ্রে। চন্দ্রমহাশয় পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঘুরণের সময় ক্রমশঃ বাড়িতেছে, গড়ে প্রতি শত বৎসরে প্রায় ৬. সেকেণ্ড। সকলেই জানেন যে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণের সময় জ্যোতিষিক হিসাবে নিরূপণ করা অত্যন্তই সোজা। নিতান্ত অর্ব্বাচীনেরাও, তিনি চারশত বৎসর পূর্ব্বে বা পরে কোন্ সময় গ্রহণ হইয়াছিল বা হইবে চোখ বুজিয়া বলিতে পারে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার একটা গ্রহণের বিবরণ ও সময় পুরাতন পুঁথি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছিল। অমনি পণ্ডিতেরা গণনা আরম্ভ করিলেন। উদ্দেশ্য—পুঁথিতে উক্ত সময়ের সঙ্গে গণনার সময় মিলে কি না। গণনা মিলিল বটে, কিন্তু ঠিক মিলিল না, একটু খুঁত রহিয়া গেল। প্রায় দুই ঘণ্টার পার্থক্য। গণনার হিসাবে গ্রহণটা যে সময়ে হওয়া উচিত ছিল তাহার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে হইয়াছে। নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে একঘণ্টার হিসাব পাওয়া গেল, বাকি একঘণ্টা পার্থক্যের কোনও রকম কারণ পাওয়া গেল না। অনেকদিন জ্যোতিষী-সমাজে ইহার কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি দুইজন মনীষীর কৃপায় ইহার সদুত্তর পাওয়া গিয়াছে। একজন অভিব্যক্তিবাদের গুরু চার্লস ডারউইনের উপযুক্ত পুত্র জর্জ্জ ডারউইন ও অপর একজন স্বনামধন্য লর্ড কেলভিন।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এ-সমস্ত বিষয় গণিতের সাহায্য ব্যতীত বুঝিয়া উঠা কঠিন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যেটুকু পারা যায় দেখা যাউক। এই গভীর বৈজ্ঞানিক তথ্যের মূলে একটা অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনা রহিয়াছে। যাঁহারা কখনও সমুদ্রতীরে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সমুদ্রের জল প্রতি বার ঘণ্টায় একবার করিয়া স্ফীত হয় ও একবার নিম্নগামী হয়। সহজ ভাষায় ইহাকে জোয়ার-ভাঁটা কহে। জলের এই উত্থানপতন শুধু যে সমুদ্রে হয় তাহা নহে, ইহা নদী বহিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত নদীর ভিতর প্রবেশ করে।

এই জোয়ারভাঁটার কারণ হইতেছে চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ। তবে চন্দ্র নিকটে বলিয়া তাহার আকর্ষণটাই বেশী উপলব্ধি হয়। পৃথিবী ও তাহার জলরাশিকে মাধ্যাকর্ষণের জন্য চন্দ্র নিজের দিকে টানিতেছে। পৃথিবী কঠিন বলিয়া তাহার কিছুই হইতেছে না, কিন্তু আকর্ষণের জন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠস্থ জলটা চন্দ্রের নীচে জড় হইতেছে। ফলে ঠিক চন্দ্রের নীচেকার জলটা স্ফীত হইতেছে ও সেই-সঙ্গেই ঠিক বিপরীত দিককার জলটাও স্ফীত হইতেছে। বিপরীত দিকের জলটা কেন হইতেছে? পৃথিবী ও জল

উভয়কেই চন্দ্র টানিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর গুরুত্ব (Density) বেশী বলিয়া তাহাকে একটু বেশী জোরে টানিতেছে। ফলে পৃথিবীটা চন্দ্রের দিকে একটু আগাইয়া আসিয়া চন্দ্রের বিপরীত দিককার জলটাকে উঁচু করিতেছে।



['ক খ গ ঘ' পৃথিবীর উপরিভাগের জল। চন্দ্র 'ক' জলরাশিকে টানিয়া তাহার নীচে উঁচু করিয়াছে। পৃথিবীর গুরুত্ব জল অপেক্ষা বেশী বলিয়া পৃথিবীকে বেশী জোরে টানিতেছে ও তাহার ফলে পৃথিবী জলরাশির মধ্য হইতে চন্দ্রের দিকে একটু আগাইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য "খ" জলরাশি উঁচু হইয়াছে। 'কখ' জল উঁচু হওয়াতে 'গঘ' জলরাশি নীচু হইয়াছে। 'ক' ও 'খ' জোয়ার, 'গ' ও 'ঘ' ভাটা। পৃথিবীর উপরিভাগে 'প' চিহ্নিত স্থানটি ২৪ ঘণ্টায় একপাক ঘুরিয়া আসে। 'প' যখন 'ক'র নীচে আসিল তখন 'প'তে জোয়ার। ৬ ঘণ্টা পরে 'গ'তে আসিলে ভাটা। আবার ৬ ঘণ্টা পরে 'খ'তে পৌঁছিলে জোয়ার হইল। আবার ৬ ঘণ্টা পরে 'ঘ'তে ভাটা। এইরূপে ৬ ঘণ্টা অন্তর জোয়ার ভাটা হয়।

তা' হইলে দেখা গেল যে চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে ঠিক চন্দ্রের নীচেকার পৃথিবীর দুই পৃষ্ঠস্থ জল উঁচু হয় ও দুই পার্শ্বস্থিত জলরাশি নীচু হইয়া যায়!

চন্দ্রের টানে আবদ্ধ হইয়া জলটা স্থির হইয়া রহিয়াছে—অথচ পৃথিবীটা ঘুরিতেছে। পৃথিবীর সঙ্গে তাহার উপরিভাগের জলরাশির অনবরত ঘর্ষণ হইতেছে। ঠিক যেন চাকায় ব্রেক কসা হইতেছে। রেলগাড়ীকে থামাইবার জন্য যেমন তাহার ঘূর্ণায়মান চাকার দুই দিক হইতে দুই লৌহখণ্ড চাপিয়া ধরে এবং সেইজন্য তাহার ঘুরণটা বন্ধ হইয়া যায়, এখানে ঠিক সেইরূপ ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে চন্দ্র জলরূপী ব্রেক কসিতেছে। কাজেকাজেই উপরোক্ত রেলগাড়ীর চাকার মত পৃথিবীর ঘুরণ ক্রমেই কমিবে, প্রভেদের মধ্যে রেলগাড়ীর চাকাটা কয়েক মিনিটের মধ্যেই থামিয়া যাইবে কিন্তু পৃথিবীর ঘুরণ থামিতে কয়েক কোটী বৎসর লাগিবে। কয় কোটী বৎসর লাগিবে তাহা ঠিক বলিতে পারি না, তবে এককালে যে থামিবে তাহা নিশ্চয়। আজ পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে, কাল তাহার একবার ঘুরিতে একটু বেশী লাগিবে। পরশু আর-একটু বেশী। দুই একদিন বা দুই এক বৎসরে এই আবর্ত্তনের সময়-বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যাইবে না, কিন্তু দশবিশ হাজার বৎসরে অনেকখানি বাড়িবে। আবার আজ পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিতেছে, গতকল্য ২৪ ঘণ্টার একটু কমে ঘুরিত। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হয়ত ২৩ ঘণ্টায় একবার ঘুরিত। পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বিশ ঘণ্টায় ঘুরিত। তাহার পূর্ব্বে ১৫, ১০, ৫ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর সম্পূর্ণ আবর্ত্তন হইত। সে সময়ে, সেই বহুপূর্ব্বের অতীত যুগে ২॥০ ঘণ্টার মধ্যে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া যাইত। ইহার পূর্ব্বে পৃথিবী আরও বেগে ঘুরিত—তাহার পূর্ব্বে আরও। কিন্তু এই বেগে ঘুরণের একটা সীমা আছে। সেই যুগে যে-সময়ে ৩।৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর দিবারাত্র হইত সেই সময়ে পৃথিবীর আকার নিশ্চয়ই কঠিন ছিল না। কারণ পৃথিবী যে পূর্ব্বে গরম ও তরল ছিল এবং ক্রমশঃ শীতল ও কঠিন হইতেছে তাহার প্রচুর প্রমাণ ভূতত্ত্ববিদের নিকট পাওয়া যায়। সে সময়ে পৃথিবী বাষ্পময় না হউক তরল নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং বেশী জোরে ঘুরিলে পৃথিবী বেচারীর বিপদের আশঙ্কা আছে। গাড়ীর চাকা যখন জোরে ঘুরিতে থাকে তখন তাহার গায়ে যদি কাদা লাগিয়া থাকে ত সেটা ছিটকাইয়া বাহির হইয়া যায়—অবশ্য চাকা আস্তে ঘুরিলে কাদাটা না ছিটকাইতেও পারে। সেইরূপ তরল পৃথিবীটাও যদি বেশী জোরে ঘুরে ত তাহার কতক অংশ তাহার শরীর হইতে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। পৃথিবী তাহার উপরিভাগের তরল পদার্থগুলিকে

কিরূপ জোরে টানিতেছে তাহা যদি জানা থাকে তা হইলে সহজেই বলিতে পারা যায় যে কিরূপ বেগে ঘুরিলে তাহার শরীরের অংশ বিচ্যুত হইবে। এইরূপ মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে যে পৃথিবী তরল অবস্থায় যদি ৩ ঘণ্টায় একবার আবর্ত্তন করে তা হইলে তাহার আকৃতির একটা পরিবর্ত্তন সম্ভব। তা হইলে দাঁড়াইল এই।—পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ ক্রমশঃ কমিতেছে। আজকাল পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে, পূর্ব্বে আরও অল্পসময়ের মধ্যে ঘুরিত। এমন একসময় ছিল যেসময় ৩ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর একটা সম্পূর্ণ আবর্ত্তন হইত। সেই সময়ে পৃথিবীর শরীরের কোনও একটা অংশ বিচ্যুত হইয়াছিল।

আচ্ছা! ইতিমধ্যে চন্দ্রের কি হইতেছিল দেখা যাউক। চন্দ্র পৃথিবীর জলরাশিকে টানিয়া তাহার নীচে উন্নীত করিয়াছে। চন্দ্র যেমন এই জলরাশিকে টানিতেছে, এই জলরাশিও ঠিক সেইরূপ চন্দ্রকে টানিতেছে। গতিতত্ত্বে Action and Reaction কার্য্য ও প্রতিকার্য্য বা পাল্টা কার্য্য বলিয়া একটা কথা আছে। আপনি ঐ দেয়ালটাকে যদি হাত দিয়া চাপেন ত দেয়ালটা আপনার হাতকে সমান জোরে চাপিবে। ডাহিন করতল দিয়া বাম করতলকে চাপ দিলে দেখিবেন যে, বাম করতল ডাহিনকে সমান চাপ প্রয়োগ করিতেছে। কোন ব্যক্তিকে যদি "অর্দ্ধচন্দ্রং দত্বা" বহিষ্কৃত করিতে চান ত দেখিবেন সে-ব্যক্তি নিতান্ত নিরীহ হইলেও তাহার গ্রীবাদেশ দ্বারা আপনার হাতকে সমান জোরে ধাক্কা দিবে। সুতরাং চন্দ্রমহাশয় পৃথিবীর জলকে টানিয়া উঁচু করিয়াই নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহাকেও ঐ জলরাশি কর্ত্তৃক টান সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু সহ্য করিবেন কিরূপে? যেখানে ছিলেন সেইখানে থাকিয়া সহ্য করা যায় না। টানের জন্য পৃথিবীর ঘাড়ে আসিয়া পড়া খুবই সম্ভব। এই টানের বেগ সামলাইবার জন্য ইনি ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া পিছু হটিতেছেন অর্থাৎ পৃথিবী হইতে দূরে যাইতেছেন।

একটা রবারের সুতায় যদি ঢিল বাঁধিয়া তাহাকে ঘোরান ত দেখিবেন যে একবার বেশ ঘুরিতে আরম্ভ করিবার পর আপনার হাতটা প্রায় স্থির থাকে আর ঢিলটা ইনার্শিয়ার দরুন সমান বেগে ঘুরিতে থাকে। কিন্তু এখন যদি হাত দিয়া ঢিলটার প্রতি একটু একটু টান দেন ত দেখিবেন রবারের সুতাটা লম্বা হইবে ও ঢিলটা আরও দূরে সরিয়া যাইবে। চন্দ্রের বেলাও কতকটা এইরূপ হয়। পৃথিবীর জলটা স্ফীত হইয়া চন্দ্রকে সামনের দিকে একটু বেশী জোরে টানিতেছে বলিয়া চন্দ্রটা দূরে সরিয়া যাইতেছে। তবে উভয়ের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। আপনি যখন সুতাবাঁধা ঘূর্ণায়মান ঢিলটার উপর জোর দিতেছেন তখন ঢিলটা দূরে সরিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু সেই-সঙ্গে বেশী **জোরেও** ঘুরিতেছে। চন্দ্রের বেলা অন্যরূপ হয়—সেই চন্দ্রটা পৃথিবীস্থ স্ফীত জলরাশির টানের জন্য দূরে সরিয়া যায় বটে কিন্তু যত দূরে যায় তত **আস্তে** ঘোরে। এই তফাৎটুকুর একটু কারণ আছে। রবারের সুতাবাঁধা ঢিলটা হাত হইতে যত দূরে যাইবে সুতার টান তত বেশী হইবে। অর্থাৎ হাত ও ঢিলের মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে টান বাড়ে। চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অন্যরূপ, এখানে দূরত্ব বাড়িলে টান কমিবে। গণিতের ভাষায় Inversely as the Square of the Distance. আকর্ষণের নিয়মের এই প্রভেদটুকুর জন্য উপরোক্ত ঐ প্রভেদটুকু হয়। তা হইলে দাঁড়াইল এই।—পৃথিবীর উপরিভাগের স্ফীত জলরাশির আকর্ষণের ফলে চন্দ্র পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে ও তাহার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের সময় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব এখন ২৪০০০০ মাইল। পূর্ব্বে কোনও সময় ২০০ হাজার মাইল দূরে ছিল। চন্দ্র যখন আরও নিকটে ছিল তখন পৃথিবীতে জোয়ার-ভাঁটা খুব ভীষণ ভাবে হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জোয়ার-ভাঁটার কারণ প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণ। চন্দ্র যখন নিকটে ছিল তখন আকর্ষণটা বেশী বেশী হইত। এখন জোয়ারের সময় জল ৩০।৪০ ফুটের বেশী উচ্চে উঠে না। যে সময়ে চন্দ্রের দূরত্ব এখনকার অর্দ্ধেক ছিল সে সময়ে জোয়ারের জল অন্ততঃ ১৫০ ফুট উচ্চে উঠিত। দূরত্ব যখন এক তৃতীয়াংশ ছিল তখন জল উঠিত ৬০০ ফুট উচ্চে। তখন জোয়ারের সময় ব্যাপারটা কিরূপ হইত ভাবিয়া দেখুন।

আমাদের এখানকার উচ্চতা মাত্র ১৫০ ফুট। জোয়ারের সময়, বঙ্গদেশের মাথার উপর ৪০০ ফুট নীল জল ক্রীড়া করিত। আবার সে সময়ে দিনগুলাও ছিল ছোট ছোট। এখন জোয়ারের পর ভাঁটার জন্য ৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয়, সে সময়ে হয়ত তিন কি চার ঘণ্টার মধ্যেই ভাঁটা আসিত। সমগ্র বাঙ্‌লা দেশের উপর হইতে ঐ চার শত ফুট উঁচু জল ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়া যাইত ও তাহার স্থলে বিস্তীর্ণ বালুকাময় বেলাভূমি চারিদিকে ধূ ধূ করিত। আবার ৩ ঘণ্টার মধ্যে এই উদ্দাম জলরাশি ভীষণ বেগে ছুটিয়া আসিত। এই সময়ে পৃথিবীর উপরিভাগের ভাঙ্গা-গড়াব্যাপার খুব সমারোহের সঙ্গেই সম্পন্ন হইত। জোয়ারের সময় জল অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকা আনিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিত। সেসময়ে পলি পড়িয়া খুব বিস্তীর্ণ ভূমি খুব শীঘ্র শীঘ্রই তৈয়ারি হইত। ভূতত্ত্ববিদেরা ভূপঞ্জরের স্তর নির্ম্মাণ কার্য্যে যে একটা বেশ জোরাল প্রাকৃতিক শক্তি খুঁজেন তাহা ইহাই। অতীতকালের এই ভীষণ জোয়ার-ভাঁটা পৃথিবীর স্তর-নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিস্তর সাহায্য করিত। পৃথিবীর বয়স লইয়া ভূতত্ত্ববিদ ও পদার্থবিদের মধ্যে একটা সালিসী নিষ্পত্তি এইখানেই সম্ভব।

যাউক ভূতত্ত্বের কথা। পূর্ব্বে চন্দ্র পৃথিবীর আরও নিকটে ছিল। কত নিকটে? ১০০০ মাইল, ৫০০ মাইল, ১০ মাইল, ১ মাইল—তাহাই বা কেন? এমন এক সময়ে ছিল যে-সময়ে চন্দ্র একেবারে পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া ছিল। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণের কাল ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। এখন চন্দ্র ২৭ দিনে একবার করিয়া পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, পূর্ব্বে ২০ দিনে একবার ঘুরিত। তাহার পূর্ব্বে দশ দিনে। গণিতের হিসাবে দেখা যায় যে সময়ে চন্দ্র ও পৃথিবী একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও ছিল তখন চন্দ্রের পরিভ্রমণকাল ছিল ৩ ঘণ্টা। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের পৃথিবীর দিবারাত্র ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহা সম্ভব যে পৃথিবীর কোনও সময়ে ৩ ঘণ্টায় এক অহোরাত্র হইত ও সে-সময়ে পৃথিবীর কতকটা অংশ বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। চন্দ্রও সে-সময়ে পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া ৩ ঘণ্টায় একবার ঘুরিত। পৃথিবীর আবর্ত্তন ও চন্দ্রের পরিভ্রমণ দুইয়েরই এক সময়—৩ ঘণ্টা। তা হইলে এই দুইটা প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনওরূপ যোগ আছে। বিজ্ঞান এইখানে একটা দৃঢ় সূত্র খুঁজিয়া পাইল।

বিজ্ঞান তাহার অন্বেষী উজ্জ্বল চক্ষু অতীতের দিকে ফিরাইয়া স্পষ্টই দেখিতেছে যে এক সময়ে, বহু পূর্ব্বে প্রায় ৫০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল না। কেবল একটা প্রকাণ্ড বায়ুরাশি ছিল। এই বায়ুরাশি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে ও তাহার ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সঙ্কোচনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আবর্ত্তনের বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তরল অবস্থায় আসিবার পর কোনও সময় তাহার আবর্ত্তনকাল হইল ৩ ঘণ্টা। এই তিন ঘণ্টা আবর্ত্তনের ফলে যে কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি বা Centrifugal force সঞ্চিত হইত তাহার ফলে তরল পিণ্ডটা দ্বিধা হইয়া গেল এবং সমস্তটা ৩ ঘণ্টায় একবার করিয়া আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তরল পিণ্ডদ্বয়ের এই অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না—গণিতের ভাষায় ইহাকে Unstable Equilibrium কহে। দুইটা অংশ হয় পুনর্ব্বার মিলিত হইবে, নয় একটা আর-একটা হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। এই দুইটা জড়পিণ্ড,—একটা আর-একটার ৮০ গুণ—কোনও কারণে (ঠিক কি কারণে বলিতে পারি না) শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিল। ঐ জড়পিণ্ড দুইটার মধ্যে বড়টি আমাদের পৃথিবী ও ছোটটি চন্দ্র। দুইটা যেমন বিচ্ছিন্ন হইল অমনি তাহাদের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা আরম্ভ হইল। এ জোয়ার-ভাঁটা জলের উপর বিশ বাইশ ফুট নহে—জ্বলন্ত গলিত ধাতু ও অঙ্গার শত শত মাইল উচ্চে উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। জোয়ার-ভাঁটার ফলে পৃথিবীর ঘূরণের বেগ হ্রাস পাইতে লাগিল, চন্দ্র দূরে সরিতে আরম্ভ করিল ও তাহার পরিভ্রমণকাল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জোয়ার-ভাঁটার কোপটা চন্দ্রের ক্ষুদ্র কলেবরে খুব বেশী পরিমাণেই সহ্য করিতে হইত, ফলে তাহার আহ্নিক গতি অতি দ্রুত ভাবেই কমিতে লাগিল। ক্রমে তাহার আবর্ত্তন ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণের কাল এক হইয়া গেল। চন্দ্র তাহার একদিককার মুখ পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ২৭॥০ দিনে ঘুরিতে লাগিল। সুতরাং চন্দ্রে জোয়ার-ভাঁটা শেষ হইয়া গেল। পৃথিবীর আবর্ত্তনকাল

ইতিমধ্যে বাড়িতে বাড়িতে ২৪ ঘণ্টায় দাঁড়াইল। ইহাই চন্দ্র ও পৃথিবীর বর্ত্তমান কালের অবস্থা।

বিজ্ঞান তাহার উজ্জ্বল দীপবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া ধীর-পাদবিক্ষেপে ভবিষ্যতের অন্ধকার আলোকিত করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। কি দেখিতেছে? চন্দ্র-পৃথিবীর এই যে অবস্থা যাহাকে আমরা বর্ত্তমান বলিতেছি তাহা চিরকাল এইরূপ থাকিবে না। পৃথিবীর দিন ও মাস ক্রমে-এক হইয়া যাইবে। সে সময়ে অহোরাত্রের পরিমাণ হইবে ১৪০০ ঘণ্টা—চন্দ্র ঠিক ঐ সময়ে তাহাকে একবার প্রদক্ষিণ করিবে। অর্থাৎ চন্দ্র ও পৃথিবী পরস্পর পরস্পরের মুখবর্ত্তী হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। ঠিক যেন উভয়ে একটা অদৃশ্য দণ্ড দ্বারা বাঁধা রহিয়াছে। এই অবস্থা প্রায় ১৫০ কোটি বৎসর পরে আসিবে। কিন্তু এই অবস্থাও ইহাদের শেষ পরিণাম নহে। সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা ইহাদিগকে বিচলিত করিবে। ফলে চন্দ্রের পরিভ্রমণ-কাল ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে, চন্দ্র পুনরায় পৃথিবীর নিকটে আসিবে, এবং বহু কোটি কোটি বৎসর পরে যে স্থল হইতে চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইবে। বসুন্ধরার পৃষ্ঠ হইতে প্রাকৃতিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে দিন-কতক উচ্চে উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া চন্দ্র পুনরায় জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে, ইহাই চন্দ্রের পরিণাম। সম্ভবতঃ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহেরও ইহাই পরিণাম।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

কষ্টিপাথর

বৌদ্ধধর্ম্মের মহাসাঙ্ঘিক মত।

বুদ্ধদেব কখন্ পরিনির্বৃত হন, তাহার দিন তারিখ ঠিক নাই। লঙ্কাবাসীরা বলেন, তিনি খৃঃ পূঃ ৫৪৩ সালে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন যে, এই গণনায় ৬০ বৎসরের ভুল আছে। তাহার পরে কাণ্টন নগরে চীনদেশে একখানি কাঠের পাটা পাওয়া যায়, উহাতে কতকগুলি ফোঁটা দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দিন হইতে বছর বছর ঐ পাটা সিন্দুকের ভিতর হইতে মহাসমারোহে বাহির করিয়া মঠের ভিক্ষুরা উহাতে একটি করিয়া ফোঁটা দিতেন; ফোঁটা গণিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতেন। তাহাতে ৯৭৫টি ফোঁটা ছিল এবং ৪৮৯ খৃঃ সালে শেষ ফোঁটা দেওয়া হয়। সুতরাং ৯৭৫—৪৮৯=৪৮৬ খৃঃ পূঃ সালে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। অনেক বাদানুবাদের পর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ৪৮৩ খৃঃ পূঃ সালেই তাঁহার নির্ব্বাণ হয়।

ইহার পর একশত বৎসর বৌদ্ধদের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বড় আনন্দে ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। যে দিন বুদ্ধদেব মরেন, সেই দিনই সুভদ্র নামে এক ভিক্ষু বলিয়া বসেন, "অঃ বাঁচিলাম, কঠোর শাসন হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমরা যা খুসী করিতে পারিব।" যাহা হউক, স্থবিরেরা একত্র হইয়া রাজগৃহের নিকট সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে এক সঙ্গীতি করিয়া সব গোলযোগ মিটাইয়া দেন ও বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপকে সংঘথের করিয়া ধর্ম্মশাসনের বন্দোবস্ত করেন। তদবধি একজন করিয়া সংঘথের থাকিতেন; তিনিই বৌদ্ধদের আপীল-কোর্ট ছিলেন। কোনও গোলযোগ হইলে সকলে তাঁহার নিকটে গিয়া পড়িতেন। তিনি যাহা বলিতেন কাজ সেইরূপ হইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টের ৩৪৩ বৎসর পূর্ব্বে, সর্ব্বকামী সংঘথের ছিলেন। তাঁহার সময়ে 'দশবস্তু' লইয়া বৈশালীর বজ্জিপুত্তদের সঙ্গে দলাদলি হয়; তক্ষশিলা হইতে রেবত আসিয়া "উব্বাহিকা" করিয়া দলাদলি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈশালীওয়ালারা নাম লইল "মহাসাঙ্ঘিক"। বয়স, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তিতে মহাসাঙ্ঘিকের বিরুদ্ধ দল থেরাবাদীরা বড় ছিল। থেরাবাদীদের ইতিহাস পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাসাঙ্ঘিকদের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা কণিষ্কের সময় হইতেই বিশ্বাসযোগ্য; কারণ, তাঁহার সময়ই চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রবেশ হয়। খৃঃ পূঃ ৩৮০ হইতে খৃঃ ৭৫ পর্য্যন্ত মহাসাঙ্ঘিকদের ইতিহাস অন্ধকার।

অশোকের অনুগ্রহ পাইয়া থেরাবাদীরা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার পরই ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে মৌর্য্যরাজাদের বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। যিনি ভাঙ্গিলেন, তিনি শুঙ্গ গোত্রের একজন সামবেদী ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম পুষ্যমিত্র। তিনি বৌদ্ধদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। এ অত্যাচার হইতে মহাসাঙ্ঘিক দল অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিলেন। থেরাবাদীদের নির্য্যাতনে মহা-সাঙ্ঘিকেরা কতকটা হিন্দুদের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারাই প্রথমে বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিহারে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুঁথি-পাঁজা সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় লেখা হইত। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে "মহাবস্তু" বলিয়া মনে করিতেন। থেরাবাদীরা বিনয়ের কঠোর শাসনে বদ্ধ ছিলেন। ইহারা ত গোড়া হইতেই সে শাসনের কঠোরতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহারা দর্শনশাস্ত্রের দিকে অধিক ঢলিয়া পড়িলেন।

থেরাবাদীরা মনে করিতেন, বিনয়ের নিয়ম রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাঁহারা অনেক জন্মের পর এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, মুক্তির পথ হইতে তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হইবে না। এইরূপ অবস্থাকে তাঁহারা স্রোতাপত্তি বলিতেন অর্থাৎ স্রোতে পড়িলে যেমন মানুষ আর ফিরে না, ক্রমেই একদিকে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহারাও নির্ব্বাণের দিকে ভাসিয়া যাইবেন। আরও কিছু দিন পরে তাঁহারা এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, তাঁহাদিগকে আর একবারমাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে তাঁহারা সকৃদাগামী অবস্থা বলিতেন। আরও অগ্রসর হইলে তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, ইহার নাম অনাগামী অবস্থা; ইহার পর তাঁহারা অর্হৎ হইবেন। কিন্তু তাঁহারা মুক্তি পাইবেন না, অর্হৎ হইয়া

বসিয়া থাকিবেন। আবার নূতন বুদ্ধ আসিলে তাঁহারা সেই বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ নিবিয়া যাইবেন। তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা জন্ম-জরা-মরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তি হয় ভাবিতেন।

মহাসাঙ্ঘিকেরা মনে করিতেন, বিনয় প্রথম প্রথম কতকটা দরকার হয় বটে, চরিত্রবলে কর্ম্মবলে কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এমন স্থানে উপস্থিত হন যে, কর্ম্ম চরিত্র বিনয়ে তাঁহাদের কোনই সাহায্য হয় না, তখন জ্ঞান চাই; সে জ্ঞানলাভের উপায় স্বতন্ত্র—উপকরণ স্বতন্ত্র।

গোড়ায় কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক অপর মানুষের মত, না অলৌকিক, যেমন দেবতা? থেরাবাদীরা বলিতেন, তিনি মানুষ, মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিল, না, তিনি লোকোত্তর; তাই মহাসাঙ্ঘিকদের আর-এক নাম হইল লোকোত্তরবাদী। তাঁহারা বলিতেন, বুদ্ধদেবের কোনও আস্রব ছিল না অর্থাৎ কোনও দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল না, অজ্ঞান ছিল না, এবং জন্মমৃত্যুর তিনি অতীত ছিলেন। থেরাবাদীরা বলিত, প্রথম দুইটি কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শেষটি ঠিক হইল কেমন করিয়া? তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁহার আস্রবও ছিল। মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব কখনও একটি বৃথা কথা কহেন নাই, তিনি যাহাই বলিতেন, তাহাতেই উপদেশ পাওয়া যাইত। শোওয়া, বসা, দাঁড়ান ও পাইচারী করা এই চারিটিকে ঈর্য্যাপথ বলে। বুদ্ধদেব যে-কোন ঈর্য্যাপথেই থাকুন, তাঁহার দ্বারা কেবল লোকের উপকারই হইত। থেরাবাদী বলিতেন, এ আদৌ সত্য নহে, তিনি মানুষ ছিলেন, মানুষের মত তাঁহাকে খাওয়া-দাওয়া করিতে হইত, পাইচারী করিতে হইত, দাঁতন করিতে হইত, স্নান করিতে হইত; এই-সকলের জন্য লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে হইত, হুকুম করিতে হইত। এ-সকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিরূপে? তিনি অযথা কথা কহিতেন না, বাজে কথা কহিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার সকল কথায়ই যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড় বেশী কথা। মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেবের ঘুম ছিল না, সুতরাং স্বপ্নও ছিল না। থেরাবাদীরা বলিতেন, স্বপ্ন ছিল কি না জানি না, কিন্তু তিনি ত মানুষ, ঘুম ছিল না, সে কি কথা? মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব নিরন্তরই সমাধিমগ্ন থাকিতেন, সুতরাং কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জবাব দিতে পারিতেন ও দিতেন। থেরাবাদীরা বলিতেন, তাঁহাকেও ভাবিয়া জবাব দিতে হইত। থেরাবাদীরা বলিত, কৈ, বুদ্ধদেব ত নিজে কখন বলেন নাই, যে, তিনি লোকোত্তর, তবে তোমরা তাঁহাকে "লোকোত্তর" "লোকোত্তর" বলিয়া গোল কর কেন? তাঁহার মতে যাহা পরমার্থ, তাহাই তিনি শিখাইতেন, তিনি ত কখন বলেন নাই যে, তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিষ্যদিগকেও তাহাই উপদেশ দিতেন। মহাসাঙ্ঘিকেরা বলিতেন, সত্য, কিন্তু পড় দেখি বুদ্ধের উপদেশ, পড় দেখি তাঁহার সূত্রান্ত, দেখ দেখি, তাহাতে কত গভীর ভাব, কত গভীর উপদেশ, কত গূঢ় তত্ত্বকথা আছে। সাধারণ মানুষের সাধ্য কি সে-সব কথা কয়, সে ভাব মনে ধারণা করে, সে-সব গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে?

এই-সকল কথা হইতেই মহাসাঙ্ঘিক ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়।

(নারায়ণ, মাঘ) শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শেষরাত্রি

(গল্প)

সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। খুব জ্বর হয়েছিল, মাথায় অসহ্য বেদনা। টেবিলের বাতিটা খুব কমানো ছিল, এমন সময় শুনলুম চুড়ির টুংটাং। প্রথমে ভেবেছিলুম আমার ভাই ননী বুঝি জিনিসপত্র নাড়ছে, তারপরে দেখলুম তা নয়, সে আর-একজন। আমার মাথার ঠিক ছিল না; বললুম, কে ওখানে?

কোন জবাব এল না; মাথার কাছে আস্তে আস্তে কে এসে বসল। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, কে ও? এবার আমার অত্যন্ত কাছে নত হয়ে চুপিচুপি সে বললে, আমি—বৌ।

বুঝলুম সে আমার স্ত্রী হেমলতা। আমি আস্তে আস্তে তার হাত দুটি টেনে এনে আমার কপালের উপর রাখলুম, গভীর বিশ্বাসে, অসহায় শিশুটির মত; অনুভব করতে লাগলুম তার কোমল আঙুলগুলি, সুদীর্ঘ, সকরুণ, তার বড় বড় কালো চোখ দুটির মত, আমার চুলের মধ্যে। তার মনের সমস্ত কথা এই আঙুল কটির মধ্যে দিয়ে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল, জ্যোৎস্না যেমন অন্ধকারের মধ্যে থিতিয়ে পড়ে, সেই-রকম।

অনেকক্ষণ পরে আবার চোখ মেললুম, মাথার ওপরে সেই কাজল-চোখের সজল দৃষ্টি, প্রভাতের শুকতারাটির মত গভীর, করুণ, দীপ্তিময়;—সেই তার নীরব ভাষা যা তার শুভ্র আঙুলগুলি থেকে এতক্ষণ নিষ্যন্দিত হচ্ছিল, আমার প্রত্যেক শিরা উপশিরার মধ্যে দিয়ে;—সেই তার সীমন্তের সুদীর্ঘ সিঁদুরের রেখাটি, যেখানে তার প্রেমের চির অরুণরূপ স্নিগ্ধজ্যোতি বিকিরণ করচে, বাইরের ঐ জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রলোকের মত। তার লালপেড়ে শাড়ির ঐ বঙ্কিম রেখাটি, তার নিটোল চিবুকের মাঝখানের কৃষ্ণ তিলটি, তার মৃদু বসন-গন্ধটি, তার সমস্তটি—সে যে আমার অত্যন্ত কাছে আছে, এই অনুভূতিটুকু পর্য্যন্ত সেদিন আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। কিন্তু সব চেয়ে ভালো লাগছিল, তার ঐ সিঁদূরের উজ্জ্বল রেখাটি, যা সে কেবল আমারই জন্যে পরেচে, যা কেবল আমারই অন্তরের রঙ, আমারই একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি।

তার ঐ সিঁদুরের সুদীর্ঘ রেখাটি আমি জীবনে ভুলব না—আর ভুলব না তার চরণপল্লব দুটি, আমার হৃদয়ের রঙে রক্তিম সুকোমল। কি অসীম সঙ্কোচে সে দিন সে তার পা-দুটি ঢেকে রেখেছিল। আজ মনে পড়ে, পাশ ফিরতে গিয়ে আমার ডান হাতখানা তার পায়ের ওপর পড়ল। সে তাড়াতাড়ি উঠে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে। আস্তে আস্তে তার টুকটুকে রাঙা ঠোঁট-দুটি স্পর্শ করলে, আমার দুই পায়ের ওপর,—সূর্য্যাস্তের শেষবিদায়ের অন্তিমরেখাটি যেমন করে পাহাড়ের মাথাটি ছুঁয়ে মিলিয়ে যায়।

আমার পায়ের ওপর সে সেদিন মুখ ঢেকেছিল, নতবৃন্ত পদ্মফুলটির মত—আমি আজ আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তার সেই নিঃশব্দ চরণদুটি ঢেকে রেখেছি। তার ঘনকুন্তল যেমন করে তার পিঠটিকে ছেয়ে রাখত, তেমনি।

অনেকক্ষণ পরে সে আবার উঠে এসে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। আমি তার হাতখানি বুকের মধ্যে নিয়ে, তার সেই শুভ্র কচি আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। তার চুড়ি নিয়ে টুংটাং করতে লাগলুম। তার আরক্ত নখপ্রান্তের ওপর হাত বুলোতে লাগলুম। সে যেন আমার খেলার সামগ্রী এমনি ভাবে। সেও ত সেদিন কিছু বলেনি। সেও সেদিন আপনাকে বিছিয়ে দিয়েছিল, একখানি ছবির মত, আমার চোখের সমুখে, গভীর বিশ্বাসে, অনন্ত নির্ভরতায়।.........

তার হাতখানি বুকে ধরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে যখন উঠলুম, আগেকার চেয়ে ঢের ভালো আছি—কিন্তু শিয়রে সে নেই, আছে একখানা খোলা টেলিগ্রাম।—

'হেমমতী পরশু রাত্রে মারা গেছে।'*

---

* এই গল্পটি নাম ঠিকানা বিনাই আমাদের কাছে এসেছে। লেখক বা লেখিকা অনুগ্রহ করে' তাঁর নাম জানালে চৈত্র মাসে যাণ্মাসিক সূচীতে তাঁর নাম দেওয়া যাবে।

—প্রবাসীর সম্পাদক।

প্রবাসীর-পুরস্কার

আগামী বৎসর দুটি প্রবন্ধের জন্য **নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার** নামে দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০৲ টাকা পরিমিত। বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল।

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিসের কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে উহা পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং ঐ কারখানা পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও তাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) স্ত্রীশিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; হিন্দু বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি?

প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টকে কি করিতে হইবে এবং দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে হইবে, এবং অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ তত্তৎদেশের শিল্প ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন আবশ্যকমত তাহার উল্লেখ ও বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থাদি হইতে এই-সব বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। ইংরেজি কিছু উদ্ধৃত করিলে তাহার বাংলা অনুবাদ দিতে হইবে।

পুরস্কারের জন্য আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩২৪) তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর "প্রবাসী-পুরস্কারের

জন্য লিখিয়া দিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকাকারে বা যে-ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেৎ ডাকমাশুল পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না বা কোনটিই প্রকাশিত হইবে না।

ইচ্ছা করিলে একজন দুই বিষয়েরই প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের পূর্ব্বে, অথবা আমাদের নির্ব্বাচনের পর আমাদের নির্ব্বাচিত ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা, লেখক বা অপর কেহ আমাদের বিনা অনুমতিতে অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

পুনশ্চ—বর্ত্তমান বৎসরের "নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কারের" ফল আগামী চৈত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ করা যাইবে; ও কোনো রচনা পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইলে আগামী ১৩২৪ সালে প্রবাসীতে ছাপা হইবে।

প্রবাসীর সম্পাদক।

পুস্তক-পরিচয়

বীরভূম-বিবরণ — মহারাজকুমার শ্রীমহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, হেতমপুর রাজবাটী হইতে প্রকাশিত। রয়াল ৮ অং ২৫৬ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, ৫১ খানি চিত্রে শোভিত। মূল্য দুই টাকা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ভূমিকা লিখিয়াছেন।

বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া মহারাজকুমার বীরভূমের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য বীরভূমের পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী, প্রবাদ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বীরভূম-বিবরণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রধানত হেতমপুরের কাহিনী ও রাজবংশের লোকেদের ও কীর্ত্তিকলাপের ছবি সংগৃহীত হইয়াছে। হেতমপুর ছাড়া—(১) ভদ্রপুর, (২) সুপুর (৩) ভাণ্ডীরবন (৪) বক্রেশ্বর (৫) মঙ্গলডিহি (৬) জোফলাই (৭) কেন্দুবিল্ব ও (৮) শ্যামারূপার গড় বা ত্রিষষ্টিগড় বা ঢেকুর নামক স্থানগুলির বিবরণ আছে।

নগেন্দ্রবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"ভদ্রপুর-কাহিনীতে মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি যাহা পূর্ব্বে কোন ইতিহাসে প্রকাশিত হয় নাই।" নগেন্দ্র বাবুর ভূমিকায় বহু জ্ঞাতব্য পুরাতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। বীরভূম বহু কীর্ত্তিমান লোকের জন্মভূমি। জয়দেব, চণ্ডীদাস, লাউসেন, ইছাই ঘোষ, নন্দকুমার বীরভূমের লোক। এই বিবরণ হইতে ইঁহাদের বহু কীর্ত্তির পরিচয় প্রকাশিত হইবে। এবং এই সমস্ত বিবরণ হইতে ক্রমে বঙ্গের ইতিহাস মালমসলা সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ হইবার পথ পাইবে।

এইজন্য মহারাজকুমার বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন।

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার—দ্বিতীয় খণ্ড, সুসঙ্গ রাজবংশ, কুমার শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত, রামগোপালপুর রাজবাটী। মূল্যের উল্লেখ নাই। কাপড়ে বাঁধা সুদৃশ্য।

প্রথম খণ্ডে পরগণা ময়মনসিংহের প্রাচীন জমিদারবংশের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। এইখণ্ডে সুসঙ্গ রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণ আছে। কান্যকুব্জবাসী সোমেশ্বর পাঠক প্রথম সুসঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজবংশে বহু বীর, সাহিত্যরসিক ও কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই-সব কারণে এই প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ পাঠের যোগ্য। এইরূপে খণ্ড খণ্ড বংশ ও স্থানের বিবরণ সংগ্রহ হইতে হইতেই বঙ্গের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গঠিত হইবার সুযোগ ঘটিবে। কুমারের এই উদ্যম প্রশংসনীয়। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই বইখানি পাঠ করিয়াছি; প্রত্যেক ইতিহাসজিজ্ঞাসু পাঠক ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন।

মুদ্রারাক্ষস।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

১৬শ ভাগ
২য় খণ্ড

চৈত্র, ১৩২৩

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতরক্ষক সেনা।

স্বাধীনজাতির একটা লক্ষণ এই যে তাহারা নিজের দেশ নিজেই রক্ষা করে, এবং আত্মরক্ষা ও স্বদেশরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে পারে। জন্মভূমির রক্ষার ভার নিজের হাতে না থাকা বড় অপমানের কথা। জন্মভূমি রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা কেবল যে অপমান তাহা নয়; ইহা হইতে কাপুরুষতা আসে, এবং মনুষ্যত্ব রক্ষার সব উপায় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়। বিদেশী প্রবল জাতি দেশ আক্রমণ করিলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান যুদ্ধশিক্ষাবিহীন নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, ইহা ত সুনিশ্চিত; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও লজ্জার বিষয় এই যে, যদি দিনে দুপরে দু চার জন চোর বদমায়েস আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে আসে ও মাতা ভগিনী বধূ কন্যাদিগের অপমান করিতে চেষ্টা করে, সে অবস্থাতেও, নিরস্ত্র বলিয়া এবং আত্মরক্ষা করিতে, যুদ্ধ করিতে, অনভ্যস্ত বলিয়া, যথেষ্ট বাধা দিতে ও সমুচিত প্রতিকার করিতে আমরা সমর্থ হই না।

এইরূপ কথা আমরা অনেকবার লিখিয়াছি। এখন গবর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষক-সেনা-আইন অনুসারে ১৮ হইতে ৪১ বৎসর বয়সের সুস্থদেহ ভারতবর্ষীয় পুরুষদিগকে সৈনিক হইবার সুযোগ দিয়াছেন। এই আইন অনুসারে যাঁহারা সিপাহী হইবেন, তাঁহারা বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিবে, এবং যুদ্ধাবসানের ছয়মাস পর পর্য্যন্ত, ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে-কোন স্থানে আবশ্যক, যুদ্ধ বা সেনাদলসম্পৃক্ত কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ভারতসাম্রাজ্যের বাহিরে তাঁহাদিগকে যাইতে হইবে না। আপাততঃ তাঁহাদিগকে যুদ্ধশিক্ষা করিতে হইবে। সিপাহীদের মত বেতনাদি তাঁহারা পাইবেন।

যুদ্ধশিক্ষা করিবার, দেশরক্ষা, আত্মরক্ষা, নিজ-নিজ মাতা কন্যা বধূ দুহিতার মান ইজ্জৎ রক্ষা করিবার সামর্থ্য লাভের এই যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, সমর্থ বয়সের কোন সুস্থদেহ পুরুষের ইহা হেলায় হারান উচিত নয়। প্রত্যেকের সিপাহী হওয়া উচিত।

স্বরাজ ও আত্মরক্ষা, এই দুটি একই জিনিষের দুই পিঠ। যে স্বরাজ চায়, তাহাকে স্বদেশ রক্ষার ভারও লইতে হইবে। তুমি আমি স্বরাজ পাইয়া রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব করিব, কিন্তু দেশরক্ষা ও তোমার আমার পরিবার পরিজন রক্ষা অপরে করিবে, ইহার মত হাস্যকর কথা আর কি হইতে পারে? ইহা কল্পনা করিতেও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়।

ভারতরক্ষক-সেনা-আইনে যে-সব দোষ ত্রুটি আছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু সে-সব পরের কথা। এখন যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারাই যথাসম্ভব দেশরক্ষার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।

আমার বাড়ী যদি কেহ আক্রমণ করে, আমার মা

ভগিনী বধূ কন্যাদিগকে কেহ যদি অপমান করিতে আসে, তখন কি আমি বলিব, "ইংরেজের যেমন অস্ত্র আছে, আমার তাহা নাই; ইংরেজ যেরূপ বেতন পায়, তাহা আমি পাই না; ইংরেজ যেরূপ উচ্চ সেনানায়ক হয়, আমার তাহা হইবার অধিকার নাই;—অতএব আমি আমার মা ভগিনীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিব না।" এমন নির্বোধ কাপুরুষের কথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। মা ভগিনী বধূ কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য, পুরুষ যে, সে ইটপাথর লাঠি বঁটি দা তলোয়ার বন্দুক বর্শা, যা হাতের কাছে পায় তাই লইয়াই লড়ে। কোন অস্ত্রই যদি না থাকে, তাহা হইলেও সে লাথি ঘুষি কীল চড় মারে। তাহাও যদি না পারে, তাহা হইলে নিজের দেহটা আততায়ী ও মা ভগিনীদের মাঝখানে ফেলিয়া তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে।

আমরা বলি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী; আমরা গান করি, বন্দে মাতরম্; গান করি, বঙ্গ আমার জননী আমার। এ সব কি কল্পনা, না ভাবুকতা? কল্পনাও নহে, ভাবুকতাও নহে। জন্মভূমির ঋণ মাতৃ-ঋণেরই মত অপরিশোধ্য। জন্মভূমি আমাদের জন্য যাহা করেন, তাহা আমরা অনেক সময়, ভাবিয়া না দেখায়, বুঝিতে পারি না। বাস্তবিক কিন্তু জননীর মত জন্মভূমিরও দান অতুলনীয়। জননীকে ও জন্মভূমিকে সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল ও লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করা, দেশরক্ষা বলিতে উভয়ই বুঝায়।

অতএব, জননীকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেমন আমরা অস্ত্রের ভাল মন্দ বিচার করি না, অপরের কি সুখ সুবিধা পদমর্য্যাদা আছে তাহা ভাবিয়া দেখি না, যে উপায়ে পারি মাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করি; তেমনি দেশরক্ষার সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য আমরা যতটুকু সুযোগ পাই, যেরূপ অস্ত্র ও পদ পাই, তাহাই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ শিখিতে লাগিয়া যাই। ইহাতে কোন দ্বিধা করিবার কারণ নাই।

বিপদ্ কোথায়?

প্রশ্ন হইতে পারে, বিপদ্ কোথায় যে যুদ্ধসজ্জা করিতে বলিতেছেন? যে কোন মুহূর্ত্তে ঝড়ের মত বিপদ্ আসিয়া পড়িতে পারে। কিরূপে কোন্‌দিক হইতে বিপদ আসিতে পারে, তাহার আলোচনা মধ্যে-মধ্যে গত আড়াই বৎসর ধরিয়া করিয়াছি। গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ-রিভিউএ তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

আর যদি সদ্য-সদ্য এখন কোন বিপদ্ না-ই ঘটে, তাহা হইলেই কি প্রস্তুত হইবার আবশ্যক নাই? বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে তাহার পর কি গৃহস্থ তলোয়ার গড়াইবার জন্য কামারের বাড়ী যায়, না লড়াই শিখিবার জন্য ওস্তাদের আখড়ায় যায়? ওস্তাদের কাছে লড়াই আগেই শিখিয়া রাখিতে হয়, তলোয়ার আগেই গড়াইয়া শাণ দিয়া তাহা চালাইবার কৌশল অভ্যাস করিয়া রাখিতে হয়। আর, শত্রু যে বিদেশ হইতেই আসে বা আসিবে, তাহাও ত নয়। দেশেই দুর্বৃত্ত লোক রহিয়াছে। তাহারা কি ডাকাতি করিয়া লুণ্ঠন করিতেছে না, তাহাদের হাতে মধ্যে-মধ্যে কি মানুষ খুন জখম হইতেছে না, তাহাদের দ্বারা নারীর লাঞ্ছনা ও সর্ব্বনাশ কি হইতেছে না? যুদ্ধ শিখিলে, অস্ত্র চালাইতে জানিলে, এইসব অত্যাচারের প্রতিকার হইবে।

ছাত্রদের জন্য যুদ্ধশিখিবার ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বিদ্যালয় হইতে ছাত্র-সেনাদল গড়িবার চেষ্টা করা হউক। কলেজের ছাত্রেরা যে যে শহরে থাকে, সেখানেই তাহাদের যুদ্ধশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে ড্রিলের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাহারা কলেজে উপস্থিত হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন এইরূপ ব্যবস্থাও করা উচিত যে তাহারা যুদ্ধশিক্ষা করিবার জন্য অধ্যাপকের কোন উপদেশের সময় অনুপস্থিত থাকিলে, তাহাদিগকে উপস্থিত বলিয়া গণনা করা হইবে। সাধারণ সেনাদলের জন্য পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ নিয়ম ত করিয়াছেনই, অধিকন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কোন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সিপাহী হইয়া সৈনিককাজে ব্যাপৃত থাকার জন্য যদি যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষা দিতে না পারে, এবং যদি তাহার অধ্যাপকেরা তাহাকে এরূপ সার্টিফিকেট দেন যে সে কলেজে চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীতে পড়িয়া পরীক্ষা দিলে তাহার পাস্ হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইলে সে

পরীক্ষা না দিয়াই বি-এ, উপাধি পাইবে। জ্ঞানবত্তার সম্যক্ প্রমাণ ব্যতিরেকে জ্ঞানপরিচায়ক কোন উপাধি দেওয়া আমরা ভাল মনে করি না। ভারতরক্ষক সেনাদলের জন্য এরূপ নিয়ম করিবার প্রয়োজনও নাই; কিন্তু যুদ্ধশিক্ষার জন্য কলেজে অনুপস্থিতিকে হাজরী বলিয়া গণনা করিতে কোন দোষ নাই। এ-নিয়ম করা উচিত ও আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজসমূহের কর্ত্তৃপক্ষেরা ছাত্রসেনাদল গঠনে উদ্যোগী হইলে বড় ভাল হয়।

চরিত্র, প্রতিভা ও সামর্থ্যের মাপকাঠি।

এক-এক জন মানুষের চরিত্র, প্রতিভা ও সামর্থ্যের আমরা যখন বিচার করি, তখন আমরা এরূপ মনে করি না, যে, যাহার জমীজমা টাকাকড়ি যত বেশী, তাহার চরিত্র তত ভাল এবং তাহার প্রতিভা ও সামর্থ্য তত বেশী। কিন্তু এক একটি জাতির উৎকর্ষ অপকর্ষের আলোচনার সময় লোকে এইরূপ ভুল করিয়া থাকে। যে-সব জাতির সাম্রাজ্য রাজ্য ধনসম্পদ্ বেশী, তাহারাই বেশী পরিমাণে এই ভ্রমের অধীন হয়। এইরূপ মনে করা হয় যে সাম্রাজ্যের বা রাজ্যের বিস্তৃতি এবং ঐশ্বর্য্য, চরিত্র প্রতিভা ও সামর্থ্যের মাপকাঠি; যে জাতি যত পররাষ্ট্র দখল করিয়া ধনশালী হইয়াছে, তাহারা তত চরিত্রবান্, প্রতিভাশালী ও সমর্থ। বাস্তবিক কিন্তু সম্পত্তি যেমন ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রবত্তা, প্রতিভাশালিতা ও সমর্থ্যের পরিচায়ক না হইতে পারে, উহা তেমনি জাতিবিশেষেরও সচ্চরিত্রতা, প্রতিভাশালিতা ও সামর্থ্যের পরিচায়ক না হইতে পারে। অনেক মানুষের সম্বন্ধে যেমন শুনা যায় যে তাহারা নানাবিধ অসাধু উপায়ে ধনী হইয়াছিল, জাতির পক্ষেও তেমনি এ কথা খাটিতে পারে।

মানুষ মোটা, ওজনে ভারী, বা লম্বা হইলেই যেমন সম্মানার্হ হয় না, গুণেরই আদর করিতে হয়; তদ্রূপ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জাতির লোকসংখ্যা, বা জাতির ধন দেখিয়াই সম্মান করা যায় না, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ, প্রতিভা, পৌরুষ, মানবহিতৈষণা, প্রভৃতি অনুসারে জাতির সম্মান করিতে হয়।

যুদ্ধঋণ।

যুদ্ধব্যয়ের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডকে দান করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট দেড়শত কোটি টাকা ঋণ করিতেছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টকে এই ঋণের সুদ বৎসরে মোটামুটি ৮ কোটির উপর টাকা দিতে হইবে। সুদটা ট্যাক্স বসাইয়া ভারতবর্ষ হইতেই উঠান হইবে। যাহারা গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিবে, তাহারা এই সুদ পাইবে। ভারতবাসীরা ১৫০ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের লোকে যত বেশী পরিমাণে ঋণ দিবে, সুদের আকারে তত বেশী টাকা তাহারা পাইবে; সুতরাং আমাদের দেওয়া ট্যাক্স সেই পরিমাণে বিদেশে চলিয়া যাইবে। এইজন্য যতটা সম্ভব, দেশের টাকা দেশে রাখিবার জন্য এবং নিজ নিজ আয় বাড়াইবার জন্য, দেশের লোকে গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিলে ভাল হয়। সুদ শতকরা বার্ষিক ৫ ও ৫॥০ টাকা; সাধারণ কোম্পানীর কাগজের সুদের চেয়ে বেশী। যাহারা ধনী নহে, তাহারাও অল্প পরিমাণে গবর্ণমেণ্টকে ঋণ দিতে পারে। ডাকঘরে ৭৸০, ১৫॥০, ৩৮৸০ এবং ৭৭॥০ দিলে যথাক্রমে ১০, ২০, ৫০ ও ১০০ টাকার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে। এই ১০, ২০, ৫০, বা ১০০ টাকা পাঁচ বৎসর পরে পাওয়া যাইবে। তাহার পূর্ব্বেই যদি কেহ টাকা ফিরাইয়া লইতে চান, তাহা হইলে ৭৸০র সার্টিফিকেট দেখাইয়া এক বৎসর পরে ৮৴০, দুবৎসর পরে ৮।৴০ তিনবৎসর পরে ৮৸৵০ এবং চারি বৎসর পরে ৯।৵০ পাইবেন। ৭৸০র বেশী টাকার সার্টিফিকেটগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম আছে।

যুদ্ধের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের দান।

এখন যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রত্যহ সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয়ের কিয়দংশ নির্ব্বাহ করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে দেড়শত কোটি টাকা দান করিতেছেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের তহবিলে এত টাকা নাই, সুতরাং ঋণ করিয়া এই টাকা দিতে হইতেছে। এই দেড়শত কোটি টাকায় যুদ্ধের কেবল মাত্র কুড়িদিনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। সুতরাং ইহাতে যে ইংলণ্ডের বিশেষ সাহায্য হইবে, এমন বোধ হয়

না। অন্যদিকে, ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশ। এই ঋণ শোধ দিতে এবং ইহার সুদ দিতে ভারতবর্ষকে অতিরিক্ত ট্যাক্সের গুরুভার বহন করিতে হইবে। অন্যূন ত্রিশবৎসর আমাদিগকে বেশী করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। তাহার পরও অতিরিক্ত ট্যাক্স যে উঠিয়া যাইবে, এমন বোধ হয় না। কারণ ট্যাক্স একবার বসিলে তাহা কচিৎ উঠে; একেবারেই উঠে না, এমন অবশ্য বলা যায় না। অতিরিক্ত ট্যাক্স দিয়াই যে আমরা নিষ্কৃতি পাইব, তাহা নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্য দেশের লোক গবর্ণমেণ্টকে অর্থব্যয় করিতে বলিলে গবর্ণমেণ্ট বরাবর টাকা নাই বলিয়া ওজর করিয়া আসিতেছেন। অতঃপর ঋণশোধ ও ঋণের সুদ দেওয়া এই দুই কারণে আরও বেশী করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই ওজর করিবেন বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য দেশে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে হইবে না। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিও যথেষ্ট পরিমাণে হইবে না।

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যুদ্ধের জন্য যে কিছু করেন নাই, তাহা নহে। অবশ্য ভারতের শত্রু কতকগুলি বিলাতী কাগজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ, এবং তাহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত কতকগুলি লোক বরাবর চীৎকার করিয়া আসিতেছে যে ভারতবর্ষ কিছু করিতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজস্বমন্ত্রী, বড়লাট, সেক্রেটরী অব ষ্টেট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী এবং রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষ যাহা করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। এইজন্য আমরা ভারতবর্ষের নিন্দুকদের কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি।

আমাদের বিবেচনায় ঋণ করিয়া দেড়শত কোটি টাকা দান করা ঠিক হইতেছে না।

এই দানকে গবর্ণমেণ্ট "ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত দান বলিতেছেন, এবং আমাদের দেশেরও কোন কোন লোক ইহাকে আমাদের দান বলিয়া বড়াই করিতেছেন। উভয় পক্ষই অপ্রকৃত কথা বলিতেছেন। ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য প্রজাদের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয় না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কোন কাজই দেশবাসীদিগের মতের দ্বারা নিয়মিত হয় না। এই দান সম্বন্ধে আমাদের হাঁ বা না কিছু বলিবার অধিকার নাই, সুযোগও নাই। ইহা ভারতবর্ষের দান বটে বলিবারও জো নাই, নয় বলিবারও জো নাই; ইহা গবর্ণমেণ্টের দান। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকজন নির্ব্বাচিত দেশী সভ্য আছেন। তাঁহাদের নির্ব্বাচন-প্রণালী এরূপ যে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দেশের প্রতিনিধি বলা যায় না। তথাপি তাঁহারা যে কতক আমাদের প্রতিনিধি তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং তাঁহারা ব্যতীত সমস্ত দেশের আর কোন প্রতিনিধি নাই। ভারতগবর্ণমেণ্ট যে ১৫০ কোটি টাকা দান করিবেন, এই প্রতিনিধিরাও আগে তাহা জানিতে পারেন নাই; আগে হইতে তাঁহাদের পরামর্শ বা সম্মতিও লওয়া হয় নাই, তাঁহাদিগকে আগে হইতে জানানও হয় নাই। বিলাত হইতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতাব্যঞ্জক টেলিগ্রাম আসিবার পর জানা গেল যে এদেশ হইতে দেড়শত কোটি টাকা বিলাতে পাঠান হইবে। তাহার পর বড়লাটের সভায় আমাদের কোন কোন প্রতিনিধি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহা অবশ্য নামঞ্জুর হইয়াছে। এ-অবস্থায় কেহ যদি এই দানকে ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত দান বলিতে চান, বলুন; কিন্তু তাহা ঠিক বলা হইবে না।

ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য।

যাহাদিগকে একত্র ঘর করিতে হয়, তাহাদিগকে সুখ-দুঃখের, লাভ-লোকসানের ভাগী হইতে হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যটা একটা বড় গৃহস্থালির মত। সুতরাং ইহার কোন বিপদ ঘটিলে ইহার সমুদয় অংশীদারকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে সমবেত চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা। যদি ব্যয় হয়, তাহাও [illegible]কেই বহন করিতে হইবে, ইহাও ন্যায্য কথা। ইহা গেল মোটামুটি কথা। এখন একটু সূক্ষ্ম করিয়া ব্যাপারটি বুঝিতে হইবে।

একত্র যাহারা ঘর করে, তাহারা দুঃখ এবং সুখ উভয়েরই ভাগী হয়। ভারতবর্ষকে বিপদের বোঝা বহিতে ডাকা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যের সম্পদের অংশী ত পুরা মাত্রায় ভারতবর্ষ নহে। শিক্ষার সুযোগ, বাণিজ্যের

সুযোগ, ইচ্ছা-মত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র রোজগারের সুযোগ, সামর্থ্য অনুসারে সাম্রাজ্যের সর্ব্ববিধ উচ্চ ও নিম্ন পদ লাভের সুযোগ, রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহের অধিকার,—এই-সব যে সুখ ও সুবিধা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আছে, ভারতবর্ষ তাহার খুব অল্প অংশই পাইয়া থাকে। সুতরাং যে সুখের সম্পদের সমান ভাগী নয়, তাহাকে দুঃখের বিপদের সমান বোঝা বহিতে বলা ন্যায়সঙ্গত নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শক্তিশালী বলিয়া ইহার অন্যান্য অংশের মত ভারতবর্ষও শান্তিসুখ ভোগ করে। সুতরাং এই সুবিধার প্রতিদান তাহার করা কর্ত্তব্য। তাহা ভারতবর্ষ বরাবর করিয়া আসিতেছে।

একটা গৃহস্থালিতে অংশীদার ছাড়া অনুচর সেবক পরিচারক পরিচারিকাও থাকে। বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে শেষোক্ত লোকেরাও অবশ্য সাহায্য করে; কিন্তু অংশীদারেরা ঘর বাড়ী জমিদারী রক্ষা করিতে যে পরিমাণ দায়ী, অন্যেরা সে পরিমাণে দায়ী নহে। তাহাদিগকে ব্যয়ভার বহন করিতে বলা হয় না। আমাদের বলিতে ক্লেশ হয়, লজ্জা ও অপমান বোধ হয়, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম অংশ হইলেও, ভারতবাসীদিগকে সাম্রাজ্য-গৃহস্থালির অংশীদার মনে করা হয় না, অনুগত পরিচারকের মত মনে করা হয়। যাহারা অংশীদার, বিপদে তাহাদের কাছে যে-পরিমাণ সাহায্য আশা করা হয়, যাহারা অংশীদার নহে, অংশীদারের অধিকার সুবিধা আদি যাহাদের নাই, তাহাদের নিকট হইতে সে পরিমাণ সাহায্য আশা করা কি সঙ্গত ?

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধিকার ও দায়িত্ব, এই দুটি একটি জিনিষের দুই পিঠ। যাহার অধিকার আছে, তাহার দায়িত্ব আছে; যাহাকে সমান দায়ী করিতে চাও, তাহাকে সমান অধিকার দাও; যাহাকে যতটুকু দায়ী করিতে চাও, তাহাকে ততটুকু অধিকার দাও।

বোঝা বহিতে হইলে, যাহার যেমন শক্তি সে সেই অনুপাতে বোঝা বহিবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয় সরকারী হিসাবেই ত্রিশ টাকার বেশী নহে। কানাডা উপনিবেশের মাথা-পিছু গড় বার্ষিক আয় ১৯০৩ সালে ৬৭৫৲ টাকার উপর ছিল; এখন সম্ভবতঃ আরও বাড়িয়াছে। অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিরও আয় খুব বেশী। ইংলণ্ডের লোকদেরও তাই। তাহারা যে-পরিমাণে ও যে-অনুপাতে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, আমাদের মত দরিদ্র জাতির নিকট তাহা আশা করা যাইতে পারে না।

যুদ্ধের জন্য যে-সব জিনিস আবশ্যক হইতেছে, তাহা ইংরেজরা ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত করিতেছেন। তাহাতে কোন কোন ব্যবসায়ে শান্তির সময় অপেক্ষা খুব বেশী লাভ হইতেছে। কারিগর ও মজুরদের বেতনও খুব বাড়িয়াছে। এইরূপে ইংলণ্ড ও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যুদ্ধের জন্য যাহা দিতেছেন, তাহার কতক অংশ দেশের লোকদের সিন্দুকেই ফিরিয়া আসিতেছে। ভারতবাসীদের নিজস্ব ক'টি কারখানা আছে, যাহাতে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতেছে ? এবং, তাহাতে ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক, পরিচালক, কারিগর, মজুর, কত জন কি হারে বেতন পাইতেছে ? উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং তাহাকে বিপদের বোঝা অবশ্যই বহিতে হইবে। কিন্তু এই বোঝার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহারা ভারতবর্ষের নিন্দা করিয়া আসিতেছে, তাহাদেরও এসব কথা ভুলিলে চলিবে না।

নিন্দুকদের সন্তোষ।

ভারতবর্ষের নিন্দা যাহারা করিয়া আসিতেছিল, এখন তাহারাও বলিতেছে, ভারতবর্ষ এত দিনে নিজের কর্ত্তব্য করিল। ভাল কথা। এখন এই সন্তোষটা স্থায়ী হইলে বাঁচি।

দুঃখভাগী সুখের ভাগী হইবে কি না ?

যাহাকে সম্পদের সময় সম্পদের অংশ দেওয়া হয়, বিপদের সময় দুঃখের ও ব্যয়ের বোঝা বহিবার জন্য তাহাকেই ডাকা উচিত। ভারতবর্ষের লোকেরা এরূপ ব্যবহার পায় নাই। অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার আর অধিক আলোচনা না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য আমরা বলিতেছি, "বিপদের সময় আমরাও সাম্রাজ্যের জন্য লড়িয়াছি, অর্থ ব্যয় করিয়াছি। যখন আবার সম্পদ

ফিরিয়া আসিবে, তখন এই কথাটা যেন মনে থাকে। সাম্রাজ্যের অংশীরা তখন যেন আমাদের দাবীটা "উড়াইয়া দিবার চেষ্টা না করে।"

ইংলণ্ডকে ভারতবর্ষের অর্থদান আইন সম্বন্ধে কি বলে।

ভারত-শাসন আইনের (Government of India Actএর) ২০ ও ২২ ধারায় লিখিত আছে :—

"20 (1) The Revenues of India shall be received for and in the name of His Majesty, and shall, subject to the provisions of this Act, be applied for the purposes of the Government of India alone." "(22) Except for preventing or repelling actual invasion of His Majesty's Indian possessions or under other sudden and urgent necessity, the revenues of India shall not, without the consent of both the Houses of Parliament, be applicable to defraying the expenses of any military operations carried on beyond the external frontiers of those possessions, by His Majesty's forces charged upon those revenues."

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষের রাজস্ব কেবল ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে; এবং ভারতবর্ষ আক্রমণ নিবারণ বা আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য কিম্বা অপর কোন আকস্মিক ও জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত, ভারতের রাজস্ব ভারতের বহিঃসীমার বাহিরে কোন যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ, পার্লেমেণ্টের সম্মতি ব্যতিরেকে, প্রযুক্ত হইতে পারিবে না।

ইংলণ্ডকে যে ১৫০ কোটি টাকা দান করা হইবে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ ব্যয়ের জন্য নহে, এবং ভারতের রাজস্ব হইতে এই টাকা দিবার জন্য পার্লেমেণ্টের অনুমতিও লওয়া হয় নাই।

টাকাটা যাঁহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজ; যাঁহারা পাইবেন, তাঁহারাও ইংরেজ। পার্লেমেণ্টও ইংরেজদের। আইনও ইংরেজরাই প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং প্রয়োজন বোধ হইলে পার্লেমেণ্টের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে না। পার্লেমেণ্টের সম্মতি সম্ভবতঃ ১৪ই মার্চ্চ লওয়া হইবে।

ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।

কয়েক দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসে লর্ড কারমাইকেল পরলোকগত ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের তৈলচিত্র আবরণমুক্ত করেন। তদুপলক্ষে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন :—

Dr. Surja Kumar was probably the only Bengali who has served as an officer in the Navy. He was Surgeon in charge of the gunboat Fire Queen in 1856-57, when she cruised about the Burma coast and when she brought Sir Henry Havelock to Bengal from Madras. He was also I fancy the only Bengali who has served as an officer in a Highland Regiment. He became Surgeon to the 72nd (the Seaforths) when the European Surgeon fell at Ghazipur, and was Surgeon to Havelock's Brigade on its march to the relief of Lucknow."

"বাঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র ডাক্তার সূর্য্যকুমার রণতরী বিভাগে অফিসারের কাজ করিয়াছেন। যখন কামান-নৌকা 'ফায়ার কুঈন' ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের উপকূলে ইতস্ততঃ পাহারা দিয়া বেড়াইত এবং যখন তাহাতে করিয়া সার্ হেনরী হেভ্‌লককে মান্দ্রাজ হইতে বাংলায় আনা হয়, তখন সূর্য্যকুমার উহার সার্জ্জন ছিলেন। আমার বোধ হয় হাইল্যাণ্ড রেজিমেণ্টে অফিসারের কাজও বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই করিয়াছেন। ৭২ সংখ্যক সীফোর্থস্ রেজিমেণ্টের ইউরোপীয় সার্জ্জন যখন গাজিপুরে যুদ্ধে মারা যান, তখন সূর্য্যকুমার উহার সার্জ্জন হন, এবং হেভ্‌লকের সৈনদল যখন লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্য যাত্রা করে, তিনি তখন তাহারও সার্জ্জন ছিলেন।"

ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী সিপাহী যুদ্ধের সময় কিরূপ সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন, তাহা ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে ৭৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত আছে।

বিতর্কভীত না আর কিছু ?

এইরূপ কথা হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস, নেপালে বঙ্গনারী, প্রভৃতির লেখিকা, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা সরকার মহাশয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসমূহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িবেন। কিন্তু ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষ প্রবন্ধ পাঠ করিবার অনুমতি দেন নাই; কারণ শুনিতেছি নাকি এই যে রবিবাবুর কাব্যসমূহ একটা

তর্কবিতর্কের বিষয় (controversial topic)। ইহা সত্য কি না, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণকে জানাইলে ভাল হয়। যে কারণে যুদ্ধের সময় আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কোন-প্রকার তর্কবিতর্ক উত্থাপন করিতে বার বার নিষেধ করিতেছেন, ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তারা কি সেই কারণে তর্কভীত হইয়াছেন? তাহা ত বোধ হয় না। বিলাতের গবর্ণমেণ্ট খুব বেশী পরিমাণে, এবং আমাদের এখানকার গবর্ণমেণ্ট কতক পরিমাণে যুদ্ধ লইয়া ব্যতিব্যস্ত আছেন। কিন্তু ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তারা ত কোন যুদ্ধ করিতেছেন না।

আমরা শুনিলাম ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার যে অধিবেশনে এই বিষয়টির মীমাংসা হয়, তাহাতে অন্যান্য সভ্যের মধ্যে সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মিঃ লায়ন, এবং মিঃ হর্নেল উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ লায়ন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। বাঙালী নাইট দুজন ও মিঃ হর্নেল প্রবন্ধ পাঠের বিরুদ্ধে মত দেন। বিরোধী দলেরই জয় হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ কোন কোন সভ্য ভয়ে বিরুদ্ধ পক্ষে ভোট দিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। আশুবাবু কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া আপত্তি করেন, এবং হর্নেল তাহার সমর্থন করেন। আশুবাবু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন রবিবাবুকে সাহিত্যাচার্য্য উপাধি দেওয়া হয়। এখন তাঁহার আপত্তিটার কারণ জানিতে ইচ্ছা হয়।

ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ইন্‌ষ্টিটিউটে সাধারণতঃ যে-সকল বক্তৃতা হয়, তাহা কি সর্ব্ববাদিসম্মত? দুই আর দুয়ে চার, বক্তৃতাগুলিতে কেবল এই-প্রকারের তর্কাতীত সত্যই কি থাকে? ইন্‌ষ্টিটিউটে আর কোন বাঙালী কবি সম্বন্ধে বক্তৃতা কি কখন হয় নাই? আমাদের মনে পড়িতেছে যে হইয়াছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে, তাঁহাদের কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে কি দ্বিমত নাই? ইন্‌ষ্টিটিউটের কোন কোন বক্তৃতায় রবিবাবুর রচনার প্রতিকূল সমালোচনা কি হয় নাই? যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই-সকল সমালোচনা কি তর্কাতীত ছিল? তৎসমুদয় কি বিতর্কের বিষয় নহে? শ্রীমতী হেমলতা সরকারের প্রবন্ধ পঠিত হইবে কি না, তাহা বিচার করিবার সময় তাহা কি ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ছিল? আমরা যতটা জানি, ছিল না। কিন্তু প্রবন্ধটিতে হয় (১) প্রতিকূল সমালোচনা, নয় (২) অনুকূল ব্যাখ্যা পরিচয় ও প্রশংসা, কিম্বা, (৩) প্রতিকূল ও অনুকূল মন্তব্য উভয়ই ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই, (১) এক জন লেখক রবিবাবুর বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাহা বিতর্কের বিষয় বিবেচিত হয় না, অন্য আর একজন তদ্রূপ মন্তব্য করিলে তাহা কেন তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে? (২) অনুকূল মন্তব্য কেন তর্কের কারণ হইবে? রবিবাবুর নিন্দাটাই বুঝি তবে তর্কাতীত ও সর্ব্ববাদিসম্মত! (৩) প্রতিকূল ও অনুকূল মন্তব্যের সমাবেশ হইলেই বা কোন প্রবন্ধ কেন বিশেষ করিয়া তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে?

জগতের সমুদয় সভ্যদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষিত সমাজে রবিবাবুর কাব্যের খুব আদর। পঞ্জাবের শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক। তিনি আর্য্য-সমাজী। তিনি বাঙালীর, ব্রাহ্মসমাজের, বা রবিবাবুর গোঁড়া ইহা কেহ বলিতে পারিবেন না। তিনি এখন আমেরিকায় আছেন। তিনি তাঁহার একখানি নবপ্রকাশিত পুস্তকে লিখিয়াছেন:—

"Tagorism is becoming a cult and he is at the present moment perhaps the most popular and most widely read and most widely admired literary man in the world."

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত-ও-ভাবের অনুবর্ত্তিতা একটি ধর্ম্মমতের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি বর্ত্তমান সময়ে বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের দ্বারা অধীত, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের দ্বারা প্রশংসিত সাহিত্যিক।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের গৌরব, ভারতের গৌরব। বাংলা দেশের কতকগুলি লোক বহুকাল হইতে তাঁহার নিন্দা ও শত্রুতা করিয়া আসিতেছে। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটেও এই-সব লোকের প্রভুত্ব থাকা দেশের পক্ষে অকল্যাণের কারণ। এই সমিতি ও প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন ইহার নাম ছিল, Institute for the Higher Training of Young Men. "যুবকদের

উচ্চতর শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।" গুণের আদর করিতে না শিখিলে, যিনি শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে না শিখিলে, উচ্চতর কেন, কোন শিক্ষাই হয় না, সব তথাকথিত শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্তৃপক্ষেরা এই ক্ষেত্রে কি আপনাদের দৃষ্টান্ত দ্বারা যুবকদিগকে বর্ত্তমান সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিকে সম্মান করিতে শিখাইলেন? রবীন্দ্রনাথের নিন্দায় তাঁহার নিজের কিছু আসে যায় না। ক্ষতি দেশের।

তাঁহার নিন্দা ও শত্রুতা কতকগুলি লোকে কেন করে, তাহা আমরা ঠিক্ বুঝিতে পারি না। সমকক্ষ লোকদের মধ্যে কখন কখন একটা ঈর্ষ্যা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ সাহিত্যিক তাঁহার নিন্দুকদের মধ্যে কেহ নাই। কেহ তাঁহার কাছাকাছিও যান না। তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, এবং তজ্জন্য প্রতিকূল সমালোচনাও হইতে পারে। এইরূপ সাহিত্যিক সমালোচনায় বিষ থাকিবার কথা নয়। কিন্তু বঙ্গে তাঁহার বিরোধীরা সাহিত্যিক সমালোচনায় আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখেন না, তাহাতে অন্তর্বিধ বিষ ঢালেন। এই বিষ উদ্গারের কারণ কি? কারণ আর যাহাই হউক, পরশ্রীকাতরতা বা ক্ষুদ্রাশয়তা অন্যতম কারণ না হইলেই সুখের বিষয় হইবে। কারণ, পরশ্রীকাতরতা ও নীচাশয়তা জাতিকে অত্যন্ত ছোট, নীচ ও দুর্ব্বল করে। দেশমধ্যে এইসকল দোষের বিস্তৃতি হইলে তাহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হইবে।

অতিরিক্ত ট্যাক্স।

ইংলণ্ডকে ১৫০ কোটি টাকা দিতে হইবে বলিয়া বৎসরে ভারতের নয়কোটি টাকা ব্যয় বাড়িল। ইহার জন্য কয়েক প্রকার অতিরিক্ত ট্যাক্স বসান হইতেছে। যাহাদের আয় বার্ষিক ৫০,০০০ টাকার উপর তাহাদিগকে অতিরিক্ত ইন্‌কাম্ ট্যাক্স দিতে হইবে। বিদেশ হইতে আমদানী সুতী কাপড়ের উপর মূল্যের শতকরা ৭৷০ টাকা করিয়া শুল্ক বসিবে। রপ্তানী পাট ও পাটের জিনিসের উপর ট্যাক্স বসিবে। এই-সব করে গরীবের বিশেষ কষ্ট হইবে না। দেশী হাতের তাঁত ও কাপড়ের কলে দেশের লোকের দরকারী সব কাপড় জোগাইতে পারে না। এই কারণে যাহাদিগকে বিদেশী কাপড় কিনিতে হইবে, তাহাদের কষ্ট হইতে পারে। যাহা হউক, যদি এই কর স্থাপন হেতু দেশী কাপড়ের ব্যবসার সুবিধা হয়, তাহা হইলে এ কষ্ট সহ্য করা সার্থক হইবে। রেলে যে-সব জিনিস চালান হয়, তাহার মধ্যে কয়েকটির জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক রেলভাড়া দিতে হইবে। রাঁধিবার কোক কয়লা ও জ্বালানী কাঠ তাহার অন্তর্গত। ইহাতে গরীব লোকদের কষ্ট হইবে; এই জিনিষ দুটি আগেকার মত ভাড়ায় মালগাড়ীতে চালান করিবার বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হইত।

রাজস্বসচিব, যুদ্ধের জন্য যে-সব ব্যবসাতে বেশী লাভ হইতেছে, সেই অতিরিক্ত লাভের উপর কর স্থাপন কেন করেন নাই, তাহা বলিয়াছেন। তিনি যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। এই কর বসান উচিত ছিল। তিনি বলেন, কোন কারবারে সাধারণ লাভ কিরূপ এবং যুদ্ধের জন্য বেশী লাভই বা কিরূপ হইয়াছে, তাহা স্থির করা কঠিন। এই জন্য তিনি কর স্থাপন করেন নাই। এই কারণে মানুষকে কর হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইলে প্রথমেই নিষ্কৃতি দিতে হয় গরীব চাষীদিগকে। জমী হইতে তাহাদের মজুরী আদি বাদ দিলে বাস্তবিক কত যে তাহাদের আয় থাকে, বলা বড় কঠিন। অনেকস্থলে কিছুই থাকে না, অনেক স্থলে উল্‌টিয়া ঋণ হয়। তাহার পর ইন্‌কাম্ ট্যাক্‌স্ বসাইবার জন্য লোকের যে আয় ধরা হয়, তাহাও অনেকস্থলে আনুমানিক। যতটা সম্ভব চেষ্টা করিয়া দেখিলে যুদ্ধের জন্য অতিরিক্ত লাভের উপর কর বসাইয়া নিশ্চয়ই অনেক টাকা পাওয়া যাইত। রাজস্বসচিব আরও বলেন যে, ইহা অস্থায়ী আয়, যুদ্ধ শেষ হইলেই এই কর তুলিয়া দিতে হইত। কিন্তু অস্থায়ী হইলেও টাকা পাওয়া যাইত। এক বৎসরও যদি বেশী টাকা পাওয়া যাইত তাহাতে ক্ষতি কি ছিল? এদেশের বড় বড় কারখানা ও কারবার ইংরেজদের হাতে। তাহারা খুব ধনী লোক। তাহারাই যুদ্ধের দরুন অতিরিক্ত লাভবান হইতেছে। তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইয়া গরীবের রান্না করিবার কয়লা ও জ্বালানী কাঠকে রেহাই দিলে ভাল হইত। বিশেষতঃ যখন রাজস্বমন্ত্রী ভয় দেখাইয়াছেন যে তিনি দরকার হইলে পরে লবণের শুল্ক আরও বাড়াইবেন এবং কৃষিলব্ধ আয়ের উপরও কর বসাইবেন। গরীবের নুন এবং গরীবের

চাষের আয়ের উপরও যখন তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে, তখন মোটামোটা টাকা, এক বৎসরের জন্য হইলেও, তাঁহার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। অবশ্য ৫০০০০এর উর্দ্ধ আয়ের উপর যে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিল, তাহার দ্বারা যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত লাভের উপরও কোন কোন স্থলে ট্যাক্স বসিবে; কিন্তু সকল স্থলে নহে।

জুরীর বিচার।

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় অখিলচন্দ্র দত্তের এই প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে গৃহীত হয় যে বাংলার সব জেলায় জুরীর সাহায্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার প্রচলিত হউক। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সকল জেলার জজদের মত চাহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিলেই ভাল হইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট জজদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয় যেন গবর্ণমেণ্ট কিরূপ মত চান তাহার একটু ইঙ্গিত করা হইয়াছে :—

(১) রাজনৈতিক মোকদ্দমায় জুররদিগকে আসামী পক্ষের লোকেরা প্রাণনাশের বা অন্য কোন অনিষ্টসাধনের ভয় দেখাইতে পারে। তাহাতে বিচার-বিভ্রাট হইবার সম্ভাবনা আছে।

(২) জাতিগত বিদ্বেষের জন্য বিচারবিভ্রাট হইতে পারে।

(৩) সকল জেলায় জুরর হইবার যোগ্য লোক না মিলিতে পারে।

"পঞ্জাব ও দিল্লীতে আসিও না।"

শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর টিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি পঞ্জাবের ও দিল্লীর শাসনকর্ত্তাদের হুকুম হইয়াছে যে তাঁহারা যেন ঐ ঐ প্রদেশে না যান। গেলে তাঁহাদিগের কারাদণ্ড হইবে, ইত্যাদি। তাঁহাদিগকে তথায় যাইবার জন্য কেহ অনুরোধ করেন নাই, তাঁহাদেরও সেখানে যাইবার কোন সঙ্কল্প বা কল্পনা ছিল না। ইতিপূর্ব্বে শ্রীমতী এনি বেসাণ্টের উপর বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও মধ্যপ্রদেশে না যাইবার এইরূপ হুকুম হইয়া আছে। এই-সকল হুকুমের প্রকাশিত কারণ এই যে তাঁহারা ঐ-সব প্রদেশে গিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক কিছু করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, করেন, বা করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের কাহারও এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। এ বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির ভ্রম হইয়াছে। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র যে যে প্রদেশে, তাহার এবং তাহার বাহিরেও কোন কোন স্থানে তাঁহারা সম্প্রতি বক্তৃতাদি করিয়াছেন। কোথাও তজ্জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামা, অশান্তি, রাষ্ট্রবিপ্লব, বা অরাজকতা হয় নাই।

প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাঁহাদের কাজের উপর আমাদের কোন হাত নাই। আমাদের এমন সাধ্যও নাই যে যুক্তি দ্বারা তাঁহাদের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দি যে তাঁহারা রাজনীতিজ্ঞতার দিক্ দিয়া ভ্রম করিতেছেন। তাহা হইলেও যখনই তাঁহারা ভ্রম করিবেন, দেশের মঙ্গলের জন্য তখনই তাহা দেখাইয়া দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু নানা কারণে অনুমান করিতেছি যে ভবিষ্যতে এইরূপ হুকুম আরও অনেক প্রদেশ হইতে আরও অনেক বক্তা বা নেতার উপর জারী হইবার সম্ভাবনা। তাহার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা আবশ্যক।

সকল প্রদেশের এবং সকল দেশের মধ্যে যেমন পণ্য দ্রব্যের আদান প্রদান মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ও সভ্যতার জন্য আবশ্যক, ভাব, চিন্তা, আদর্শের আদান প্রদান মানবের উন্নতির জন্য তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন। মানুষের গতিবিধি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিলে ইহাতে ব্যাঘাত ঘটে; তা ছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত দেওয়া ত হয়ই। আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও শক্তি বাড়িলে ইহার প্রতিকার হইবে। কিন্তু আমাদিগকে আপাততঃ নিজের নিজের প্রদেশে থাকিয়াই তাহার ভাব, চিন্তা ও আদর্শের অভাব মোচন করিতে হইবে। উদ্দীপনা অনুপ্রাণনা বাহির হইতে আমদানী করিবার পথ বন্ধ হউক না। সমুদয় শক্তি, সমুদয় উৎসাহের উৎস মানুষের আত্মাতেই রহিয়াছে। আমাদিগকে আরও বেশী করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত ও আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে।

পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়-বিল প্রসঙ্গে বিহার-ওড়িশার ছোটলাট ঐ বিলের প্রতিকূল সমালোচনাটা বঙ্গদেশ হইতে আমদানী বলিয়া বক্রোক্তি করিয়াছেন। বহুকাল

বিহার-ওড়িশা বাংলার সহিত যুক্ত ছিল। নানাকারণে বিহার-ওড়িশার সার্ব্বজনিক মত এপর্য্যন্ত অন্য কোন কোন প্রদেশের মত পরিস্ফুট ও আত্মপ্রকাশ-সমর্থ হয় নাই। এক্ষেত্রে যদি আন্দোলনের কাজটা বাঙালীরাও করিয়া থাকে, তাহা মোটেই দোষের নয়। বিশেষতঃ যখন বিহার-ওড়িশাতে বহুলক্ষ বাঙালীর বাস। কিন্তু তাহা হইলেও সকল প্রদেশের প্রাদেশিক সব কাজ, সব প্রচেষ্টা, সব আন্দোলন, যাহাতে প্রদেশবাসীরাই জোরের সহিত চালাইতে পারে, সেরূপ উদ্যোগ আয়োজন করা কর্ত্তব্য। বিহারের লোকেরা বলেন, "বিহার বিহারীর জন্য; বাঙালীরা এখানে চাকরী ও ওকালতীতে ভাগ বসাইতে আসিও না।" কিন্তু সেই-সঙ্গে তাঁহারা এই কথাটাও কেন বলেন না যে "আমরা আমাদের প্রদেশের সব অভাব অভিযোগ জুলুমের কথা আমাদের প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে বলিব?" বিহারের দুটি দৈনিক কাগজ দুজন ধনী জমীদারের টাকায় চলে। বিহারের স্বাধীন মত তাহাতে ব্যক্ত হয় না।

এ বিষয়ের উল্লেখ কেবল দৃষ্টান্ত-স্বরূপ করিলাম। প্রাদেশিক সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া যে আমাদের কর্ত্তব্য, তাহা বুঝানই আমাদের উদ্দেশ্য। কোন প্রদেশের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমাদের অভিপ্রায় নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি হওয়ায় ছাত্রেরা দুই দিন পরীক্ষা দেওয়ার পর উহা স্থগিত হইয়াছে; ৩০শে মার্চ্চ আবার আরম্ভ হইবে। প্রশ্ন চুরি যাওয়ায় নানা-প্রকার অনিষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এবং উহার পরীক্ষার উপর লোকের আস্থা কমিয়া যায়, এবং লোকের ধারণা জন্মে যে, যে-সকল বৎসর প্রশ্ন চুরির কোন কথা শুনা যায় না, বুঝি বা সে-সব বৎসরও প্রশ্ন জানা পড়িয়া থাকে। এই-প্রকারে, পরীক্ষায় পাশ হওয়ার যে কোন মূল্য আছে, এ-বিশ্বাস কমিয়া যায়। ন্য চাকরীর বাজারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের য় দর পরোক্ষভাবে কমিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। অনেক ছাত্র সব বৎসরই জ্ঞান অর্জ্জনে ততটা মন দেয় না, যতটা, কি প্রশ্ন পড়িতে পারে, তাহা অনুমান করিতে চেষ্টিত হয়, বা কি প্রশ্ন পড়িয়াছে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র থাকে। ইহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বিদ্যালয়ে যাওয়া ও পরীক্ষা দেওয়া ব্যর্থ হয়। সকলের চেয়ে অনিষ্ট এই হয় যে মনের মধ্যে প্রশ্ন জানিবার এবং জ্ঞানলাভ না করিয়াও ফাঁকি দিয়া পাশ করিবার একটা অসাধু আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে। চরিত্রগঠনের ইহা এক মহা অন্তরায়। বাঞ্ছনীয় কৃতিত্ব মানুষের যাহা কিছু হইতে পারে, সিদ্ধিলাভ মানুষের দ্বারা যাহা কিছু হইতে পারে, পরিশ্রম, সংযম, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও সাধনার মূল্যে সেই কৃতিত্ব ও সিদ্ধি ক্রয় করিব,—মনুষ্যত্ব যাহার আছে, সে এইরূপ ইচ্ছাই করে। বিপরীত প্রকারের ইচ্ছা যাহারা করে, তাহাদের চরিত্র অন্তঃসারশূন্য হয়। ফাঁকি দিয়া খাঁটী কিছু এ জগতে পাইবার জো নাই। যে-যে কারণে মানুষের মন অসাধু উপায় অবলম্বন, চাতুরী, প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হয়, ও মানুষ ফাঁকি দিয়া কিছু একটা করিতে ও হইতে উৎসুক হয়, সেই-সব কারণ মানুষের মহা অনিষ্টের হেতু।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চুরি যাওয়ায় বাঙালীরা কি পরিমাণ দায়ী এবং শ্বেতকায়েরাই বা কি পরিমাণে দায়ী তাহা নির্ণীত হইবে কি না, জানি না; কিন্তু ব্যাপারটা যে গবর্ণমেন্টের কাছে ও সভ্যজগতের কাছে বাঙালীর অকর্ম্মণ্যতা ও বিশ্বাসের অযোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্রূপ করিয়া বলা হইবে, ইহারাই আবার স্বরাজ চান! আমরা কোন বাঙালী বা বাঙালীদের দোষ ঢাকিতে প্রয়াসী নহি। দোষ যত জানা পড়ে, এবং সংশোধিত হয়, ততই মঙ্গল। আমাদের কেবল ইহাই স্মরণ রাখিতে হইবে, যে, প্রশ্ন চুরি প্রভৃতি ব্যাপার কেবল মাত্র বাংলা দেশেরই একচেটিয়া দোষ নহে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। পঞ্জাবে হইয়া গিয়াছে। সেখানকার একজন ইংরেজ রেজিষ্ট্রার ঘুষ লইয়া প্রশ্নের কাগজ বিক্রী করিত। তাহা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় সে দণ্ডিত ও পদচ্যুত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক টাকা নষ্ট হইল। উত্তর লিখিবার খাতা ৬৩০০০ নষ্ট হইল। পুনর্ব্বার সমুদয় প্রশ্ন প্রস্তুত করাইবার ও ছাপাইবার জন্য বিস্তর ব্যয় হইবে। দুই দিন যাঁহারা পরীক্ষাগৃহে পাহারা দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে

যে টাকা দিতে হইবে, তাহা বৃথা খরচ হইল। সমুদয় পরীক্ষা-কেন্দ্রে প্রশ্ন পাঠাইবার ব্যয় আবার হইবে। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের ও তাহাদের অভিভাবকদের বিনা দোষে অর্থনাশ ও কষ্টভোগ হইল। অধিকাংশ ছাত্র বাড়ী বসিয়া পরীক্ষা দিতে পায় না। বাড়ী হইতে দূরে পরীক্ষা-কেন্দ্রে গিয়া বাসাখরচ করিয়া তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয়। যাতায়াতের খরচও আছে। এই-সব খরচ দুই-বার করিয়া হইবে। অনেক বিধবা মা গয়না বন্ধক দিয়া ছেলের পরীক্ষার খরচ দিয়াছিলেন। তাঁদের মত গরীব লোকদের কি কষ্ট! অনেক ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষার জন্য সুস্থ-দেহে উপস্থিত হইয়াছিল; কোন বিভ্রাট না ঘটিলে তাহারা পরীক্ষা দিয়া পাস্ হইতে পারিত। কিন্তু পুনর্ব্বার যখন পরীক্ষা হইবে, তখন তাহারা পীড়িত হইয়া পড়িতে পারে। বিনা দোষে তাহাদের এই যে শাস্তি হইবে, ইহা গভীর পরিতাপের বিষয়।

যাহাদের অসাবধানতা, অকর্ম্মণ্যতা বা দুর্বৃত্ততায় প্রশ্ন চুরি হইয়াছে, তাহারা অতি দুষ্ট লোক। তাহাদের সমুচিত শাস্তি হওয়া উচিত।

এই বিভ্রাটের মধ্যে সন্তোষের বিষয় কেবল একটি আছে যদি প্রশ্নচুরি ব্যাপারটা চাপা থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক অযোগ্য ছাত্রও পাস্ হইয়া যাইত, এবং তাহারা সম্ভবতঃ অনেক যোগ্য ছাত্র অপেক্ষাও পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিত। যাহারা প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যে অনেকে সৎ ছেলে, তাহার প্রমাণ এই যে তাহারা চুরিটা গোপন না রাখিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। যদি বাঙালীরা ও বাঙালী ছেলেরা সকলে তাহাদের নিন্দুকদের আঁকা বিকৃত ছবির অনুযায়ী অসৎ হইত, তাহা হইলে, সকলে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া ব্যাপারটা লুকাইয়া রাখিত। কিন্তু কাহারও কাহারও ধর্ম্মবুদ্ধি ইহা অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ অন্য কারণেও কথাটা প্রকাশ করিয়া থাকিবে।

প্রশ্ন চুরির তদন্ত।

অপরাধী ও তাহাদের দলভুক্ত লোক ছাড়া সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা এই যে ব্যাপারটার খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও তদন্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়-আফিসের সৎ কর্ম্মচারীরা লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া আছেন। তাঁহারাও নিশ্চয় চান যে খুব তলাইয়া অনুসন্ধান হয়। শুনিলাম সীণ্ডিকেট অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। সিণ্ডিকেটের কয়েকজন মেম্বর এবং রেজিষ্ট্রার ক্রমসাহেব কমিটির সভ্য। ক্রমসাহেবকে এই কমিটিতে কখনই রাখা উচিত হয় নাই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক কর্ম্মচারী এবং আফিসের মাথা; সাক্ষাৎ ভাবে হউক বা পরোক্ষ ভাবেই হউক, তিনি সমুদয় ভুল চুক চুরির জন্য দায়ী। কমিটির কাছে, প্রধানতঃ না হউক, অংশতঃ তাঁহার বিচার হইবে; অন্ততঃ হওয়া ত উচিত। সুতরাং তিনি বিচারকের বা অনুসন্ধানকারীর পদে বসিতে পারেন না। সীণ্ডিকেটের সভ্য ছাড়া বাহিরের যোগ্য লোককেও কমিটিতে লওয়া উচিত ছিল। নতুবা সাধারণের ধারণা এই যে ব্যাপারটা চাপা দেওয়া হইবে। আগে আগেও, এত বেশী পরিমাণে না হউক, কিয়ৎ পরিমাণে কাহারও কাহারও কাছে নিশ্চয়ই কোন কোন প্রশ্ন জানা পড়িয়াছিল। তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসের কোন কর্ম্মচারী পদচ্যুত বা অন্য-প্রকারে দণ্ডিত হয় নাই। তাহার দু একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। নিমাইচরণ মৈত্র ও মণিকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯১৪ সালে এম্ এ পরীক্ষা দেয়। ইহা প্রমাণ হয় যে তাহারা বাড়ী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরের শাদা খাতায় উত্তর লিখিয়া আনিয়া তাহা পরীক্ষার হলে লিখিত উত্তর বলিয়া চালাইয়া দিয়াছিল। এই অপরাধে তাহারা পুনর্ব্বার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। গত ১৯১৬ সালের ৭ই জুলাই সীণ্ডিকেট তাহাদের দরখাস্ত অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ১৯১৮ সালে আবার এম্-এ পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই ঘটনায় প্রমাণ হয় যে এই দুজন ছাত্র পরীক্ষার প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরের শাদা খাতাও অসৎ উপায়ে সংগ্রহ করিয়াছিল। নতুবা তাহারা বাড়ী হইতে সেই খাতায় প্রশ্নের উত্তর কেমন করিয়া লিখিয়া আনিল? গত বৎসর তিনজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম পরীক্ষক ডাক্তার গ্রীনের এক ভৃত্যকে ঘুষ দিয়া বাড়ী হইতে উত্তর-লেখা তিনখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের

খাতা গ্রীনসাহেবের পরীক্ষণীয় উত্তরের খাতার মধ্যে স্থাপিত করাইয়া তাহাদের হলে-লিখিত খাতা তিনখানা বাহির করাইয়া লয়। এই উভয় বিভ্রাটে সংসৃষ্ট ছাত্রদের কোন কোন আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে কাজ করে কি? এই দুটা ব্যাপারের ফল-স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্ম্মচারী তিরস্কৃত, দণ্ডিত বা পদচ্যুত হইয়াছিল কি? যদি বিশ্ববিদ্যালয় কোন চোর ধরিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে ব্যাপার দুটা পুলিসের হাতে কেন দেওয়া হয় নাই? দুইটাতেই চুরি ও ঘুষের পরিষ্কার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। এইজন্য পুলিসের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। তাহা না দেওয়ায় অসৎ আচরণের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। আগে আগে এইরূপ ২।১ টা কাণ্ড আপোষে চাপা দেওয়াতেই হয়ত এই বড় বিভ্রাটটা ঘটিয়াছে। এবারও যাহাতে চাপা না পড়ে, সেইজন্য আমরা বলি, এবারকার ব্যাপারটির তদন্ত পুলিশের দ্বারা হউক। কারণ, ইহার মধ্যে ঘুষ ও চুরি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কমিটি হইতে জ্রল-সাহেবকে বাদ দিয়া এবং তাহাতে সাক্ষ্য গ্রহণে ও সাক্ষ্যপরীক্ষায় অভ্যস্ত যোগ্য বাহিরের লোকই বেশীর ভাগ লইয়া তদন্ত না করাইলে সীণ্ডিকেটের নিযুক্ত কমিটির তদন্তের ফল ত কোন ক্রমেই সর্ব্বসাধারণের নিকট সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীত হইবে না।

কয়েক বৎসর আগে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন জানা পড়ে। জানা পড়িবামাত্র, প্রশ্ন নানা কেন্দ্রে প্রেরণের কাজ যে-সব কর্ম্মচারী করিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সস্পেণ্ড করা হয় এবং পরে তাহাদের দণ্ড হয়। তথাকার ইংরেজ রেজিষ্ট্রারকে ছুটি দিয়া বা অন্যত্র চাকরী লইয়া (কি উপায়ে, এখন মনে পড়িতেছে না) চলিয়া যাইবার সুযোগ দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে দেওয়া হয়। এখানে চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত জ্রলসাহেবকে কোথাও যাইতে দেওয়া উচিত নয়। শুনিতেছি তিনি নাকি ছুটি লইবেন। তাঁহার জানা উচিত যে তাহাতে লোকে তাঁহাকে অধিকতর সন্দেহ করিবে। এখানেও প্রশ্ন-প্রেরণ-কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীদিগকে সস্পেণ্ড করা উচিত ছিল, অন্ততঃ এখন করা উচিত। কেন এরূপ করা হয় নাই? শুধু তাই নয়, যাহারা আগে এই কাজে নিযুক্ত ছিল, এবং যাহাদিগকে সহজেই সন্দেহ হইবার কথা, তাহাদিগকে আবার নূতন প্রশ্নসমূহ নানা কেন্দ্রে প্রেরণের কাজে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। ইহা কিরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা? অবশ্য, কে দোষী কে নির্দোষ, তাহা আমরা জানি না, এবং কে কে প্রশ্ন বিতরণ করেন, তাহাও জানি না। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয় মনে হয়, আমরা তাহাই বলিতেছি।

প্রশ্ন নানা জায়গা হইতে বা নানা সময়ে চুরি হইতে পারে; প্রশ্নকর্ত্তাদের বাড়ী হইতে, ছাপাখানায় যাইবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিস হইতে, ছাপাখানা হইতে, ছাপাখানা হইতে, মুদ্রিত হইয়া সেনেটহাউসে আসিবার পথে, সেনেটহাউসের লোহার সিন্দুক হইতে, তথা হইতে নানা কেন্দ্রে যাইবার সময় ডাকে, ইত্যাদি। তন্মধ্যে, ছাপাখানা হইতে, ছাপাখানা হইতে সেনেটহাউসে আসিবার পথে, বা সেনেটহাউসে, এই তিন জায়গা হইতে চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

যেরূপ শুনা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ছাপাখানা হইতে চুরি যায় নাই। তাহার একটা পরোক্ষ প্রমাণ বলিতেছি। অবশ্য যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। প্রবেশিকা, আই-এ, এবং বি-এ, এই তিন পরীক্ষার প্রশ্ন জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে কেবল প্রবেশিকার প্রশ্নই কলিকাতার একটি ইংরেজপরিচালিত প্রেসে ছাপা হইয়াছিল বলিয়া শুনিতেছি। কলিকাতার প্রেস হইতে প্রশ্ন জানা গেলে শুধু প্রবেশিকারই জানা যাইত। বিলাতে ছাপা আই-এ বি-এর প্রশ্ন জানা যাইত না। অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে ছাপাখানা হইতে প্রবেশিকার এবং সেনেটহাউস হইতে আই-এ বি-এর জানা গিয়াছে। কিন্তু উৎকোচগ্রাহী ও চোরের ত ভয় আছে। তাহারা যদি এক যায়গাতেই সব মাল পায়, তাহা হইলে দু জায়গায় চেষ্টা করিতে গিয়া ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বাড়াইবে কেন? এইজন্য আমাদের মনে হয়, যে, সম্ভবতঃ কলিকাতার প্রেসটির দোষ নাই, সেনেটহাউসের বন্দোবস্তেরই দোষ; তজ্জন্য জ্রল-সাহেব দায়ী। যাহা হউক, ইহা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র; কে দায়ী ও দোষী এবং কি পরিমাণে তাহা অনুসন্ধান দ্বারা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অবস্থায় প্রশ্নপত্রগুলি রক্ষা করিবার ভার সম্পূর্ণরূপে রেজিষ্ট্রারের উপর থাকে। যদি তাঁহার অসাবধানতা বা কর্ত্তব্যে অবহেলা প্রযুক্ত প্রশ্ন বাহির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাহার দোষে হইল? রেজিষ্ট্রার কাগজগুলি প্রেস হইতে আনিবার জন্য স্বয়ং প্রেসে গিয়াছিলেন কি না? না, আর কেহ গিয়াছিল? তৎসমুদয় তাঁহাকে গণিয়া প্যাক্ করিয়া মোহর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল কি না? তাহার পর যে গাড়ীতে করিয়া কাগজগুলি আনা হইল, তাহাতে স্বয়ং রেজিষ্ট্রার ছিলেন, না কোন কোন কেরাণী ছিলেন? যদি রেজিষ্ট্রার ছিলেন না, তাহা হইলে কেন ছিলেন না? যদি কোন কোন কেরাণী ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহারা কে? আগে যে যে বিভ্রাটের কথা বলিয়াছি, তৎসংসৃষ্ট ছাত্রদের তাঁহারা কেহ আত্মীয় কি না? যখন কাগজগুলি সেনেট হাউসে পৌছিল, তখন তাহার মোড়কসমূহের উপর মোহর ঠিক ছিল কি না, অথবা আদৌ মোহর ছিল কি না? তাহা দেখিয়া লইয়া কাগজ রাখিবার কামরায় লোহার সিন্দুকে রেজিষ্ট্রার স্বয়ং তাহা রাখিয়া সিন্দুকে ও কামরায় তালা বন্ধ করিয়া নিজের নিকট চাবী রাখিয়াছিলেন কি না? যদি আর কাহারও কাহারও কাছে চাবি ছিল বা থাকে বা রেজিষ্ট্রারের অসাক্ষাতে কখন দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাঁহারা কে? এইরূপ গুজব শুনিয়াছি যে শিক্ষাবিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কাগজের কামরা দেখিতে গিয়া একটি সিন্দুকের ডালা তোলা দেখিয়াছিলেন। ইহা সত্য কি না? শুনিয়াছি গৌহাটী কেন্দ্রে প্রেরিত প্রশ্নপত্রের মোড়কের উপর কোন মোহর বা মোহরের চিহ্ন ছিল না। ইহা কি সত্য? প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্ন বিলাতে ছাপা হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, এবারেও অন্যান্য পরীক্ষার মত প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন বিলাতে ছাপিবার জন্য বিলাতে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু উহা বিলম্বে প্রেরিত হওয়ায়, পাছে ঠিক সময়ে মুদ্রিত হইয়া আসিয়া না পৌছে, এই ভয়ে তৎসমুদয় আবার কলিকাতার একটি প্রেসেও ছাপিতে দেওয়া হয়। কিছু বিলম্বে বিলাতে মুদ্রিত কাগজগুলিও আসিয়া পৌছিয়াছে। সাধারণতঃ আগষ্ট মাসে প্রশ্ন ছাপাইবার জন্য বিলাতে পাঠান হয়। এবার অক্টোবর মাসে পাঠান হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। এই বিলম্বের কারণ কি এবং কে ইহার জন্য দায়ী? এইরূপ গুজব রটিয়াছে যে কোন কোন প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নের কাগজ বিলম্বে দেওয়ায় বিলাত পাঠাইতে দেরী হয়। ইহা কি সত্য? সত্য হইলে এই প্রশ্নকর্ত্তারা কে কে? তাঁহারা ইংরেজ না দেশী লোক?

এরূপ গুজবও রটিয়াছে যে এই ব্যাপারের মূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বৃহৎ দলাদলি আছে। তাহা কি সত্য?

বঙ্গের রাজস্ব ও ব্যয়।

১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের রাজকোষে ৬,৭৭,২০,০০০ টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। এই রাজস্ব কোন্ বিভাগে কি কাজে কি পরিমাণে খরচ হইবে, তাহা জানিতে পারিলে বুঝা যাইবে গবর্ণমেণ্টের ঝোঁক কিসের উপর বেশী। দেশের লোক সর্ব্বাপেক্ষা দরকারী মনে করে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প। তাহারা দেশে শান্তিরক্ষার জন্য, মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য, অপরাধ নিবারণের জন্য, চোর বদমায়েস ধরিবার জন্য, পুলিশের আবশ্যকতা স্বীকার করে। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি প্রভৃতি বিভাগ অপেক্ষা পুলিশকে উচ্চ স্থান দেয় না। বরং মনে করে যে দেশের লোক যদি সুস্থ ও শিক্ষিত হইয়া শিল্প ও কৃষির দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পায় এবং জ্ঞান ও সদুপদেশ লাভ দ্বারা তাহাদের মন উন্নত হয়, তাহা হইলে পুলিশের প্রয়োজন কম হইবে। গবর্ণমেণ্ট কিন্তু পুলিশের জন্য যেরূপ ব্যয় করেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্পের জন্য তত করেন না; এবং পুলিশের জন্য ব্যয় যেরূপ দ্রুত বাড়িতেছে, অন্য ঐ-সব বিভাগের ব্যয় সেরূপ বাড়িতেছে না।

১৯১৭-১৮ সালে পুলিশের আনুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে বা বরাদ্দ করা হইয়াছে ১,৮৪,৬৮,০০০ টাকা। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ৯৮,১৩,০০০ টাকা। শিক্ষার জন্য ১৯১৬-১৭ সালের বরাদ্দ ৮৮,৩০,০০০ ধরা হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা সংশোধিত অনুমানে ৮২,১৮,০০০ দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ বাস্তবিক ব্যয় ধার্য্য টাকা অপেক্ষা ছয় লক্ষেরও উপর কম করা হইয়াছে বা হইবে। পুলিশের জন্য কিন্তু ১৯১৬-১৭তে আনুমানিক যত ব্যয় ধরা হইয়াছিল, সংশোধিত হিসাবে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী খরচ হইয়াছে।

অর্থাৎ ১৯১৬-১৭তে পুলিশের জন্য বরাদ্দ হয় ১,১১,-১২,০০০; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা বাড়িয়া ১,১২,২৭,০০০ দাঁড়াইয়াছে ও দাঁড়াইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শিক্ষার জন্য ১৯১৬-১৭তে প্রথমে যাহা বরাদ্দ হয়, খরচ তাহা অপেক্ষা ছয় লক্ষ টাকা কম হইয়াছে ও হইবে; কিন্তু ঐ বৎসর পুলিশের জন্য যাহা বরাদ্দ হয়, খরচ তাহা অপেক্ষা ১,১৫,০০০ বেশী হইয়াছে ও হইবে। ১৯১৭-১৮ সালের আনুমানিক বরাদ্দ ও বাস্তবিক খরচে, পুলিশের খরচ বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী এবং শিক্ষার খরচ বরাদ্দ অপেক্ষা যে কম হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? হওয়াই সম্ভব।

পাঠক ইহাও দেখিবেন যে পুলিশের বরাদ্দ ১৯১৬-১৭ অপেক্ষা ১৯১৭-১৮ সালে ২৩,২৬,০০০ বেশী হইয়াছে। শিক্ষার বরাদ্দ ১৯১৬-১৭ অপেক্ষা ১৯১৭-১৮ সালে বেশী হইয়াছে ৯,৮৩,০০০। পুলিশের বরাদ্দ বাড়িয়াছে সওয়া তেইশ লক্ষ টাকা, শিক্ষার বরাদ্দ বাড়িয়াছে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। তা ছাড়া মনে রাখিতে হইবে, যে, পুলিশের জন্য বরাদ্দ অপেক্ষা খরচ বেশী হয়, শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অপেক্ষা খরচ কম হয়।

পুলিশের ব্যয় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালে পুলিশের বাস্তবিক খরচ হইয়াছিল ১,০৯,-০৩,৭৮৩, ১৯১৬-১৭ সালের সংশোধিত আনুমানিক ব্যয় ১,১২,২৭,০০০ এবং ১৯১৭-১৮ সালের বরাদ্দ হইয়াছে ১,৩২,৩৮,০০০। ভারত-রক্ষা আইন পুলিশ-বিভাগের ব্যয়ের একটা বড় কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯১৭-১৮ সালে এই আইন প্রয়োগের জন্য বরাদ্দ ৭৫০০০ টাকা, এবং এই আইন অনুসারে অবরুদ্ধ লোকদের ও তাহাদের পরিবারবর্গের ভাতা দুইলক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। বঙ্গে অশান্তির মূল কারণ লর্ড কার্জ্জনের শাসননীতি। এই-সব ব্যয় তাঁহার নিকট হইতে আদায় হইলে তবে ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়।

কোন্ গবর্ণমেণ্ট কি পরিমাণে উন্নতিশীল, শিক্ষার জন্য ব্যয় তাহার একটা মাপকাঠি। ১৯১৪ সালে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সরকারী সমুদয় বিভাগের মোট ব্যয়ের শতভাগের ২৩৩ ভাগ শিক্ষার জন্য খরচ করা হইয়াছিল। বঙ্গের ১৯১৭-১৮ সালের আনুমানিক আয় হইবে ৬,৭৭,২০,০০০; তন্মধ্যে শিক্ষার বরাদ্দ ৯৮,১৩,০০০ টাকা। ইহা শতকরা ১৩ টাকার কিছু বেশী; কিন্তু বাস্তবিক খরচ এত করা হইবে কি না সন্দেহ। হইলেও তাহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষার ব্যয়ের হার অপেক্ষা অনেক কম হইবে।

রোগপ্রতিকার বিভাগ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত, চিকিৎসা (medical) ও স্বাস্থ্যরক্ষা (sanitation)। চিকিৎসা শাখার জন্য যাহা বরাদ্দ হয়, তাহা সরকারী ডাক্তারদের বেতন ও আফিস-খরচা, হাঁসপাতাল, দাতব্য ঔষধালয়, মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ, ইত্যাদির জন্য ব্যয় হয়। চিকিৎসা শাখার জন্য ১৯১৭-১৮ সালের বরাদ্দ ২৬,১৪,০০০ টাকা, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা শাখার জন্য বরাদ্দ ৫,৯৮,০০০; মোট ৩২,১২,০০০। মনে রাখিতে হইবে পুলিশের জন্য ঐ সালের বরাদ্দ ১,৩৪,৩৭,০০০, অর্থাৎ রোগপ্রতিকার বিভাগের চারিগুণেরও বেশী। স্বাস্থ্যরক্ষা শাখার প্রায় সমস্ত টাকা কতকগুলি মিউনিসিপালিটির জন্য ব্যয়িত হইবে; তদ্দারা গ্রামবাসী লোকদের, যাহাদের সংখ্যাই বঙ্গে বেশী, বিশেষ কোন উপকার হইবে না।

আমরা গত বৎসরের চৈত্রমাসের প্রবাসীতে শিক্ষকের কাজ, পুলিশের কাজ ও রোগপ্রতিকার বিভাগের কাজের গুরুত্বের তুলনা করিয়া যাহা লিখিয়াছিলাম, পাঠকদিগকে তাহা পুনর্ব্বার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ঐ মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে "সরকারী গৃহস্থালি" শীর্ষক প্রসঙ্গে এই-সব কথা আছে।

বঙ্গের শতকরা ৭৮ জন মানুষের নির্ভর কৃষির উপর। ১৯১৭-১৮ সালে কৃষিবিভাগের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ১২,২৬,০০০ টাকা মাত্র। ইহা পুলিশের বরাদ্দের দশমাংশেরও কম।

স্কুলকলেজের ছুটি।

প্রবেশিকা পরীক্ষা এক মাস পিছাইয়া যাওয়ায় পরীক্ষার ফলও সম্ভবতঃ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা একমাস পরে বাহির হইবে। তাহা হইলে কিন্তু কলেজগুলির কাজ জুলাইয়ে আরম্ভ না হইয়া আগষ্টে হইবে। তাহাতে ছাত্রদের ক্ষতি হইবে। এই ক্ষতি নিবারণের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি পরীক্ষকগণকে বিশেষ তাগিদ দিয়া অন্যান্য

বৎসরের মত সময়েই পরীক্ষার ফল বাহির করিতে পারেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বাহির হউক বা বিলম্বেই বাহির হউক, কলেজগুলি প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকিবে। স্কুলগুলিও মাসাধিক কাল বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে ছাত্রেরা কি করিবেন তাহা তাঁহারা এবং তাঁহাদের শিক্ষক, অভিভাবক ও অন্য গুরুজনেরা ভাবিয়া দেখুন।

ছাত্রদের কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতে ও বলিতে গেলে প্রথমেই মনে হয়, আমরা কোন একটা দেশের কাজ পড়িলে তাঁহাদিগকেই আগে ডাকি কেন? তাঁহাদিগকে ডাকিয়া যে কিছু অন্যায় করি, তাহা নয়। কিন্তু তাঁহাদিগকে ডাকিবার অধিকার কেবল তাঁহাদেরই আছে যাঁহারা স্বয়ং দেশের কাজ করেন, করিতে প্রস্তুত আছেন, ও তজ্জনিত বিপদের দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত আছেন। নতুবা আমরা বেশ আরামে থাকিব, এবং নানা-প্রকার কাজ যুবকদিগকে বাৎলাইয়া দিয়া আরামে নিদ্রা যাইব, ইহা ত হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহাদের বিষয়কর্ম্ম করিয়াও অনেক অবসর থাকে; এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের বলিতে গেলে সমস্ত দিনটাই অবসর। তাঁহারা দেশের কাজ কেন করেন না? ছাত্রদের প্রধান কাজ মানুষ হইয়া উঠা। তাহার জন্য তাঁহাদিগকে জ্ঞান লাভ করিতে হয়, এবং চরিত্রের সদ্‌গুণ-সকলকে দৃঢ় করিতে হয়। চরিত্রের বিকাশ ও দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের মানুষের সংস্পর্শে আসা এবং নানা বাধা অতিক্রম করিয়া মানুষের সেবা করা আবশ্যক। কিন্তু কেহ যে এই-প্রকার স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সেবা করে, তাহা নয়,—যদিও ইহা উচ্চ অঙ্গের স্বার্থ; প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে অপরের প্রতি যে প্রেম আছে, তাহাই তাহাকে সেবায় প্রবৃত্ত করে।

সাধারণতঃ অন্য অনেক লোকদের চেয়ে ছাত্রদের অবসর কম। তথাপি তাঁহারা যে নানা সৎকাজ করেন, ইহা তাঁহাদের প্রশংসার বিষয়, এবং তাঁহাদের নিজের মঙ্গলেরও কারণ। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেশের সব বিপদ-আপদের মুখে শুধু ছাত্রদিগকে ফেলিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী নহি। হুজুকে তাঁহাদিগকে মাতান সোজা, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য সাধনে বাধা পড়িতেছে কি না, তাহা আগে দেখা উচিত।

ছুটির সময় ছাত্রদের বেশী অবসর থাকে। এই সময়ে তাঁহারা দেশ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। দেশের স্বাস্থ্য কেন খারাপ ও কিরূপ খারাপ; দেশের গরীবেরা কেমন ঘরে থাকে, কতটুকু ঘরে কতজন থাকে; কি খায়; কি পরে; দেশের লোকদের শিক্ষার বন্দোবস্ত কি আছে; কোন্ গ্রামের কতগুলি বালকবালিকার শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে, কতগুলির নাই, ও কেন নাই; অনেক বালকবালিকা কেন লেখাপড়া শিখিতে পারে না; গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা কিরূপ; কি প্রকারে তাহার উন্নতি হইতে পারে; রোগীর চিকিৎসার কি উপায় আছে; নিঃস্ব রোগীর বিনাব্যয় চিকিৎসার কি উপায় আছে; গোচারণের কি ব্যবস্থা আছে; গ্রামের বালকবালিকাদের ও প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের খেলা ও আমোদের কি উপায় আছে; গ্রামে পাঠাগার আছে কি না; রামায়ণাদির কথকতা হয় কি না; প্রাপ্তবয়স্কা অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত আছে কি না; প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষর পুরুষদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নৈশবিদ্যালয়াদি আছে কি না; চাষের উন্নতির জন্য ভাল ভাল বীজ জোগাইবার ব্যবস্থা আছে কি না; যৌথ ঋণদান-সমিতি গ্রামে আছে কি না;—ছাত্ররা এইরূপ নানা বিষয়ের ঠিক্ খবর নিজে দেখিয়া শুনিয়া সংগ্রহ করিতে পারেন। এবং নিজেদের সাধ্যমত গ্রামের কোন কোন অভাব মোচনের চেষ্টাও করিতে পারেন।

কিন্তু দেশের বয়োবৃদ্ধ প্রধান লোকদিগকে ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। শুধু "আমরা পেছনে আছি" বলিলে চলিবে না। কারণ, দেখা যাইতেছে, অনেক সচ্চরিত্র ও সদাশয় ছেলে সৎকাজ করিতে গিয়াই ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়িয়াছে। পুলিশের এবং শাসনকর্ত্তাদের একটা থিওরী এই, যে, বিপ্লববাদী ও বিদ্রোহাকাঙ্ক্ষীরা নৈশবিদ্যালয়ে সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দিবার এবং দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন মড়ক আদিতে জনসেবা করিবার অছিলায়, তাহাদের মত প্রচার করিবার সুযোগ করিয়া লয়। ইহা কি পরিমাণে সত্য বা অসত্য বলিতে পারি না। কিন্তু যদি কোন কোন বিপ্লবপ্রয়াসী এরূপ করিয়াই থাকে,

দেশের সেবা

মানুষ যে বাঁচিয়া আছে সে হিংসার জোরে নহে প্রেমের জোরে। মানুষ বাঁচিয়া থাকে, বাড়িয়া উঠে, বড় বড় কাজ করে—সে সবই প্রীতির বলে। Struggle for existence বা জীবনসংগ্রাম নহে, mutual aid বা পরস্পরের সাহায্যই সমাজের ভিত্তি ও সমাজের উন্নতির মূল ও নিয়ামক। এই mutual aid বা পরস্পরের সাহায্যের কথাটাই টলষ্টয় তাঁহার এক উপন্যাসে মর্ত্ত্যপ্রবাসী এক স্বর্গীয় দূতের মুখে বলাইয়াছেন,—

"All men live, not by the care they take of themselves, but by the love that there is in men. I have learned that it only seems to men that they live by the care they take of themselves; but in truth they live only by love."

অর্থাৎ মানুষ আপনার প্রতি যত্ন করে বলিয়া বাঁচে এমন নয়, মানুষের মধ্যে যে প্রেম আছে তাহারই জন্য মানুষ বাঁচে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছি যে মানুষ মনে করে সে আপনাকে আপনি যে যত্ন করে তাহারই জন্য সে বাঁচে; কিন্তু বাস্তবিক তাহারা বাঁচে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমের জন্য।

এই সত্যই বর্ত্তমানযুগের সমাজতত্ত্বের প্রধান আবিষ্কার। এই প্রীতি, যাহা মানুষকে মানুষের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উন্নতির পথে লইতেছে ইহা, মানবসমাজের আদিযুগে কেবল অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার পর যুগে যুগে ইহা প্রবৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমশঃ বৃহত্তর সমাজে প্রসারিত হইয়াছে। দেশ-প্রীতি এই বিশ্বব্যাপী প্রীতির একটি পরিণতি ও পরিচয় মাত্র। আদিযুগে যাহা অপরিসর ছিল, আজ তাহা সর্ব্বব্যাপী; আদিযুগে যাহা পরিবার বা আত্মীয়ে আবদ্ধ ছিল, আজ তাহা দেশব্যাপী; আর সেই দেশ যাহা সেকালে ছিল একটি অপেক্ষাকৃত ছোট স্থান, আজ তাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়া একএক বিরাট ভূখণ্ডে পর্য্যবসিত হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহারা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী, আজ তাহারা এক লক্ষ্য লইয়া একসাথে চলিয়াছে; শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হিংসা করিয়া লোকক্ষয় করিয়াছে, আজ তাহাদের মধ্যে পরমপ্রীতি, আজ তাহারা পরম বন্ধু। পূর্ব্বে যাহা ছিল বিদেশ, আজ তাহা স্বদেশ; পূর্ব্বে যাহারা ছিল দেশের শত্রু, আজ তাহারা স্বদেশবাসী।

মানবের প্রেমের যে পরিসর দেশই কি চিরদিন তাহার সীমা থাকিবে? দেশ যতই বাড়িয়া যাক না কেন সে সীমাবদ্ধ, মানুষের ভালবাসিবার শক্তি কিন্তু অসীম। এখনি দেখিতে পাইতেছি যে সে ভালবাসা ভূগোলের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া মানুষকে বাঁধিতেছে, দেশের গণ্ডী ছাড়াইয়া গিয়া মানুষের প্রীতি বৃহত্তর সমাজ অন্বেষণ করিতেছে। এই অন্বেষণের পরিণতি কোথায় তাহার কি কোনও সন্দেহ আছে? সমুদয় মানবসমাজে যে এই প্রীতি ছড়াইয়া পড়িবে, দেশ জাতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র সমাজ যে সেই প্রকাণ্ড প্রীতির বন্যায় ভাসিয়া যাইবে, সমুদয় মানবজাতি যে এক মহাদেশ ও এক মহাসমাজ হইয়া গড়িয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যেমন আগে ছিল নিজের পরিবার, নিজের কুল-গণ-জাতি, তেমনি আজ দেশ আমাদের প্রীতির পরিণতির পথে দাঁড়াইবার একটি সাময়িক স্থান মাত্র। এ স্থান ছাড়িতে হইবে, আরও আগে চলিতে হইবে, অনেক পথ এখনো সম্মুখে আছে—এখনি ডাক উঠিয়াছে, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত—এ পথের সেই সীমা, সেই শ্রেষ্ঠ পরিণতি সমগ্র মানবে প্রীতি; ভূগোল অবহেলা করিয়া, নদী পর্ব্বত সাগর মহাসাগরের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যে সমাজ তাহাতে আপনাকে পাইতে হইবে, দেশাত্মবোধ অতিক্রম করিয়া ভগবানের অপূর্ব্ববিধানে আমাদের সেই মহাদেশে সেই মহাসমাজে আত্মবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে।

সেদিন এখনো আসে নাই, সে পরিণতি এখনো সুদূরে। এখনো আমরা দেশাত্মবোধকেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারি নাই, এত বড় সমাজকে এখনও আপনার সহিত সম্পূর্ণ এক করিয়া দেখিতে পারি না। তাহা না করিতে পারিলে জগতের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেখিতে এবং সেই জ্ঞান লইয়া জীবনকে নিয়মিত করিতে কেমন করিয়া পারিব? মুখে কথাটা বলা সহজ যে সকল মানুষ আমার ভাই, সমস্ত জগৎ আমার সমাজ'; কিন্তু সেই বুদ্ধি মনের ভিতর কার্য্যকরীরূপে জাগ্রত করা ঠিক তেমনি

কঠিন। মুখের বড় কথা অনেক সময় ছোটখাট কর্ত্তব্য করিতে আলস্যের উপর গিলটি চড়ান মাত্র। আমি আমার পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য করিতে পারি না, হয়তো তাহার কারণ আলস্য বা প্রকৃত প্রীতির অভাব বা তেমনি আর কিছু। কিন্তু আমি যদি খুব বুদ্ধিমান হই তবে লোকের কাছে দেখাইতে হইবে যে আমার অপকার্য্যের হেতু অতি মহৎ। যদি আমার মনে বিবেক কিছু উপদ্রব করে তবে তাহার চোখেও ধুলা দিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে বড় কথা দিয়া আমার নীচ কাজকে ঢাকা দেওয়াই প্রকৃষ্ট এবং সহজ উপায়। ভাইয়ের অসুখে সেবা করিব না, ভয়ে কিম্বা অনুরাগের অভাবে, কিন্তু লোকের কাছে নন্দলালের মত বলিতে হইবে

"ভাইয়ের জন্য প্রাণটা যদি বা দি

তা না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?"

দেশের সেবার নাম করিয়া অনেকে এমন ছোটখাট কর্ত্তব্যের হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন—কেবল পরকে বুঝাইবার জন্য নয়, হয়তো নিজেকেও সেইরূপ বুঝাইয়া থাকেন। তেমনি দেশের কাজ করিতে যাহারা নারাজ, দেশের প্রতি সে প্রীতি যাহাদের নাই, তাহারাও অনেক সময় দেশকে ফাঁকি দিবার জন্য মানব-সমাজের একত্বের দোহাই দিয়া থাকেন। জীবনে আমরা নিজের মনকে নানা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া অনেক সৎকার্য্য হইতে বিরত হইয়া থাকি—দেশের সেবায় বিরত থাকিয়া অনেক সময় অনেকের মনকে প্রবোধ দিবার উপায়স্বরূপ হয় মানব-সমাজের একত্ব।

ইহা যে কেবল অন্যায় তাহা নহে, ইহা অসত্য। দেশের সেবার সঙ্গে মানবসমাজের একত্ববোধের প্রকৃত কোনও বিরোধ নাই। তোমার প্রীতির পরিসর যতই হউক না কেন, তোমার কার্য্যের ক্ষেত্র সর্ব্বদাই সীমাবদ্ধ। তোমার সেবার ক্ষেত্র তোমার সমাজ, তোমার চারিপাশে যে-সকল লোক আছে ; যাহাদের সঙ্গে তোমার নিত্য ব্যবহার তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য তোমার যত বড় আদর্শই হউক না তাহার একটা অত্যাজ্য অঙ্গ। তোমার আদর্শ যত বড় হইবে সে কর্ত্তব্য তত মহৎ হইবে, তাহার অর্থ তত গভীর হইবে, তাহা পালনের গৌরব তত বৃদ্ধি পাইবে। দেশ এমন একটা সমাজ যাহার ভিতর তোমার কর্ত্তব্যের খুব বেশী ভাগ আবদ্ধ থাকিবেই। মানবসমাজের হিত যদি তোমার লক্ষ্য হয়, তবে সে হিতসাধন সম্বন্ধে তোমার আদর্শ যাহাই হউক, সে আদর্শ কার্য্যতঃ আয়ত্ত করিতে হইবে প্রধানতঃ তোমার দেশবাসীকে দিয়া। সুতরাং তুমি দেশপ্রেমিকের আদর্শ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলেও দেশের সেবা ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। দেশের সেবার সাধারণ যে আদর্শ তাহার সহিত তোমার বিরোধ থাকিতে পারে, দশ জনে যে কাজ দেশের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করে তুমি তোমার উন্নত আদর্শ লইয়া হয়তো তাহাকে অকরণীয় বিবেচনা করিতে পার, কিন্তু যদি তোমার আদর্শ কেবল মুখের কথা না হয় তবে তোমাকে তোমার আদর্শ ও বিবেচনার অনুসারে দেশবাসীর সেবা করিতেই হইবে।

বাঙ্গলার যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশসেবার একটা প্রকৃত প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সাধু আকাঙ্ক্ষা যেরূপ বিস্তৃত ও যেরূপ গভীর ভাবে ছাত্র ও যুবকসমাজে দেখা যায় তাহাতে ইহা যদি সুপথে ও সদ্বিবেচনার সহিত পরিচালিত হয় তবে ইহা হইতে পরম সুফল লাভ হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দেশের সেবা করিতে হইবে, কিন্তু কোন্ পথে যাইব, কোন্ কাজ করিব, কি সাধনা করিব, এ কথা সকলে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না, আর যাহারা কাজ করিতে আসিয়াছে তাহাদের অনেক সময় এসব কথা খুব ভাবিয়া দেখিয়া কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া লওয়ার সময়ও হয় না। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্যের একটা সুনির্দ্দিষ্ট নকসা করিয়া লইলে কাজের অনেকটা সুবিধা হয়, শক্তির অপচয় অনেকটা কমিয়া যায়।

এমন একদিন ছিল যখন দেশের সেবা বলিতে প্রধানতঃ লোকে বুঝিত দেশের জন্য যুদ্ধ করা। দেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণদান করার যে গৌরব ছিল তাহার প্রধান কারণ এই যে যখন এ আদর্শ গঠিত হয় তখন যুদ্ধ করাটাই দেশের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল। যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ হইত তখন দেশের আত্মরক্ষাই প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং দেশের রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে যে অগ্রসর হইত সেই ধন্য বিবেচিত হইত। আজ সেদিন নাই।

যদিও এখন ইউরোপে দারুণ লোকক্ষয়কর মহাসমর চলিতেছে তথাপি এ কথা অসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে আজকালকার সমাজে যুদ্ধটা একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার নহে এবং দেশের হিতকামীরা যুদ্ধ বিগ্রহ অপেক্ষা অপরাপর হিতকর বিষয়েই অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন। কাজেই যুদ্ধের গৌরব এখনো যথেষ্ট থাকিলেও অনেকটা সখের হইয়া আসিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধ এখনো জগৎ হইতে লোপ পায় নাই, এখনো সকল দেশেরই আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। যতদিন এ প্রয়োজন আছে ততদিন আমাদেরও দেশের জন্য যুদ্ধ করা গৌরবের বস্তু থাকিবে, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত থাকা দেশসেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে বাধ্য। কিন্তু ইহা দেশের সেবার একটি উপায় মাত্র, তাহার কেবলমাত্র উপায় নহে। পরিণতির সহিত মানব-সমাজ ক্রমশঃই অধিক জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সমাজের ক্রিয়া বহুমুখী হইয়াছে, সেবার ক্ষেত্রও বহু পরিমাণে বিস্তৃত ও বহুদ্বারক হইয়াছে। দেশসেবার সেই নানা পন্থার মধ্যে দেশের জন্য যুদ্ধ করা একটি মাত্র পথ।

এই কথাটি সকল সময় আমাদের মনে থাকে না যে দেশের সেবার নানা পন্থা আছে। সমাজের যত-প্রকারের প্রয়োজন আছে ঠিক তত-প্রকার সেবার উপায় আছে। সে প্রয়োজন বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক, সেই প্রয়োজন পূরণ করা দেশের সেবা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এমন কি, এক হিসাবে ইহাও বলা যাইতে পারে যে মানুষ মাত্রেই দেশের সেবক। সমাজের সেবা দেশের সেবাই জীবন। প্রত্যেক মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেকেই জীবনের বেশী ভাগ সমাজের সেবায় ব্যয় করে। মানুষ ঠিক নিজের জন্য খুব সামান্য কাজই করে, বেশীর ভাগ কাজ করে অপরের জন্য। অতি দীন-হীন যে মজুর সে রোজগারের জন্য কাজ করে, সে-কাজে পরের কোনও একটা অভাব মোচন হয়—রোজগারের টাকা সে খরচ করে বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য—ইহাদের প্রতিপালন করিয়া সে প্রকৃত-প্রস্তাবে সমাজেরই কাজ ও কর্ত্তব্য পালন করে। বাস্তবিক মানবজীবন ও মানবচরিত্র এমন ভাবে গঠিত যে সমাজের সেবা ছাড়া মানুষ বাঁচিতেই পারে না, নিজের সুখের জন্য তাহার দেশের সেবা করিতেই হইবে।

তবে না-জানিয়া সেবা ও জ্ঞানকৃত সেবায় তফাৎ আকাশপাতাল। আমরা চাই সেবার ইচ্ছায় সেবা। অজ্ঞানে সেবা সবাই করে; গৌরব শুধু তাহারই যে জানিয়া শুনিয়া সেবা করে; সেবার জন্য আত্মত্যাগ করে।

যাহারা সজ্ঞানে দেশের সেবা করে তাহাদের যে নিতান্তই একটা প্রকাণ্ড জাঁকাল রকমের কাজ করিতেই হইবে তাহা নহে। সেবার গৌরব সেবার আকাঙ্ক্ষায়, সেবার সৌকর্য্যে; সেবা-কার্য্যের পরিসর বা চাকচিক্যে নয়। বরং গৌরব তাহারই বেশী যাহার কাজে চাকচিক্য নাই জাঁকজমক নাই, যে এই সংসার-নাট্যশালার পর্দ্দার আড়ালে কাজ করে, ফুট-লাইটের সম্মুখে আসিয়া করতালি অর্জ্জন করিতে চাহে না। যে-কাজের উপর লোকের খুব নজর থাকে, যাহাতে খ্যাতি লাভ করা যায়, দেশের লোকের সম্মান অর্জ্জন করা যায়, সে-কাজের জন্য বরং লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যে-কাজ খুব নীচে, লোকচক্ষুর অগোচরে করিতে হয়, যাহাতে কর্ত্তব্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা ছাড়া অন্য কোনও পুরস্কার নাই, সে-কাজের কর্ম্মী বড় অধিক মিলে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার প্রয়োজন কম নহে, বরং অনেক সময় অধিক। মন্দিরের চূড়ার স্বর্ণকলস সকলের চোখে ঝকমক করে, কিন্তু লোকচক্ষুর অগোচরে মাটির তলে ভিত্তির মূলে যে ইটখানি আছে তাহার সৌভাগ্য কম হইলেও মন্দিরটি রক্ষার জন্য তাহার প্রয়োজন কাহারও অপেক্ষা কম নহে। অথচ সে যদি স্বর্ণ-কলসের সহিত সমান গৌরব লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে, তবে স্বর্ণকলসকে সে ভূতলশায়ী করিবে ও নিজেও ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এই কথা দেশের সেবাকাঙ্ক্ষী যুবকের বিশেষ স্মরণ রাখা আবশ্যক। দেশের কাজ যদি করিতে চাও তবে সৌখীন কাজের দিকে বেশী ঝুঁকিও না। তোমার হাতের কাছে যে ছোট কাজটি আছে তাহা লইয়াই তোমার সেবা আরম্ভ করিতে হইবে, সে-কাজ ছোট হইতে পারে কিন্তু তাহার ফলে তুমি যে উপকার করিবে তাহা

হয়তো কোনও উপকার অপেক্ষা হীন নহে। মনে রাখিও দেশ বলিয়া কোনও একটা abstract বা বস্তুনিরপেক্ষ জিনিষ নাই, দেশের মানুষ লইয়াই দেশ। সে মানুষ যেখানে আছে সেইখানেই তোমার সেবার ক্ষেত্র আছে। তুমি দেশের মানুষের যে উপকারটুকু করিবে সেটা যে অতি সামান্য বা সাধারণ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না। সামান্য হউক, সাধারণ হউক, সমাজের পক্ষে তাহার ষোল আনা প্রয়োজন আছে। তুমি যদি একজন পথভ্রান্ত পথিককে পথ বলিয়া দেও বা সাধারণের চলিবার পথ হইতে কাঁটাটি সরাইয়া ফেলিয়া দেও, তাহা হইলেও তুমি দেশের উপকার করিতেছ এরূপ মনে করিতে পার। চারিদিকে চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তোমার আশে-পাশে জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে এরূপ অসংখ্য সেবার অবসর রহিয়াছে। সেইসব কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। তাহা অপেক্ষা বড় কাজ করিতে পার করিও, কিন্তু ছোট বলিয়া কোনও সেবার কাজকে অবহেলা করিও না। সকলে যদি এই-সব ছোট কাজ ফেলিয়া বড় কাজের নিষ্ফল সন্ধানে ফিরে, তবে বড় কাজ কোনও কাজের হইবে না, ছোট কাজটিও মাটি হইবে।

অতি সামান্য অতি নগণ্য কাজ, এমন কি যে কাজকে লোকে নিতান্ত স্বার্থপরের কাজ বলিয়া মনে করে তাহাও, দেশের কাজে লাগিতে পারে। নিজের কাজ করা এবং তাহার জন্য পরের কাজ করিতে না যাওয়া স্বার্থ-পরতা হইতে পারে, কিন্তু নিজেকে একেবারে অবহেলা করিলেই যে দেশের কাজ করা হয় তাহাও নহে। দেশের জন্য মরিলে গৌরব আছে যদি মরার প্রয়োজন থাকে, কিন্তু যেখানে বাঁচাটাই বেশী দরকার সেখানে মরার কোনও গৌরব নাই। সময়ে সময়ে দেশের জন্য বাঁচারই বেশী আবশ্যক হয়। শুধু বাঁচা নয়, নিজের উন্নতি করাটাও অনেক সময়ে নিজের মঙ্গলামঙ্গল-বিষয়ে উদাসীন হওয়ার চেয়ে দেশের পক্ষে বেশী হিতকারী হইতে পারে। নেলসন বা ওয়েলিংটন কিম্বা পিট্ বা গ্ল্যাডষ্টোন ইংলণ্ডের যে পরিমাণ হিত করিয়াছেন, সেক্সপীয়ার বা মিলটন, নিউটন বা ডারউইন তাহা অপেক্ষা অল্প হিত করিয়াছেন একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। কিন্তু সেক্সপীয়ার যদি থিয়েটার ছাড়িয়া পার্লামেন্টের সদস্য হইয়া দিন রাত "দেশের কাজ" করিতেন, মিলটন যদি নৌসেনায় নাম লেখাইতেন, ডারউইন যদি চার্টিষ্টের দলে আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেন বা নিউটন যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেন তবে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের জন্য বেশী করিতেন কি? তোমার ভিতর যদি এমন কিছু থাকে যাহাতে পরিণত অবস্থায় তুমি দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তবে সেই শক্তিকে বর্দ্ধিত ও পূর্ণ পরিণত করাই তোমার পক্ষে প্রধান কর্ত্তব্য হইবে এবং সেই আত্মোন্নতির চেষ্টায় যদি তুমি দেশের আর দুই-দশটা কাজ না করিয়াও থাক তবে তাহাতে তোমার সেবার গৌরবে কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে এমন কথা বলা চলিবে না। শুধু অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষগণেরই যে আত্মোন্নতির দ্বারা দেশের সেবা করা হয় তাহা নহে, এক হিসাবে প্রত্যেকের পক্ষেই আত্মোন্নতির চেষ্টা দেশসেবার একটি অত্যাজ্য অঙ্গ। দেশের হিতের জন্য প্রত্যেকেরই সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত কার্য্য করা উচিত। তুমি অপরিণত বুদ্ধি বা অপরিণত শক্তি লইয়া যে কার্য্য করিতে পারিবে, সেই শক্তি ও বুদ্ধির সাধনা দ্বারা উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে তুমি তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান দেশকে দিতে পারিবে, তোমার সেবার মূল্য অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। প্রত্যেকে নিজ-নিজ শক্তিসাধ্যের চরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়া দেশকে সেই শক্তি ব্যবহার করিতে দিতে বাধ্য। সুতরাং একথা সত্য যে self-culture বা আত্মোন্নতিও দেশের সেবার একটি উৎকৃষ্ট পন্থা।

যেখানে নানা পথ সম্মুখে মুক্ত রহিয়াছে সেখানে বিরোধ ও সংশয় অবশ্যম্ভাবী। নিজের উন্নতি যেমন দেশের জন্য কর্ত্তব্য, আর্ত্তের সেবাও তেমনি কর্ত্তব্য। যখন এই উভয় কর্ত্তব্যে বিরোধ হয় তখন কোন্ পথ শ্রেয় বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবে? ইহার সহজ উত্তর এই যে সংশয়ের স্থলে ত্যাগের পথই শ্রেষ্ঠ। সাধারণ ভাবে একথা অত্যন্ত সত্য। যেখানে আত্মতুষ্টি ও আত্মত্যাগে বিরোধ, সেখানে ত্যাগের পথই কর্ত্তব্য হিসাবে নিরাপদ, নহিলে হয়তো বা আমরা দেখিতে পাইব যে আমরা নন্দলালের মত একটা পণ করিয়া বসিয়াছি যে

"দেশের তরে যা' ক'রেই হোক রাখিবই এ জীবন।" কিন্তু সব সময় একথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। এমন অবস্থা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে আত্মরক্ষার পথই দেশের পক্ষে শ্রেয়। রবার্টব্রুস পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া দেশের সেবায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন একথা কেহ বলিবে না।

আসল কথা এই যে দেশের কাজ বলিয়া কাজের কোনও মার্কা-মারা বিশেষ শ্রেণী নাই। প্রায় সব কাজই দেশের কাজ। কাপড়-বোনা জুতা-সেলাই মোট-বওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় দেশের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করা পর্য্যন্ত নিজের জন্য বা পরের জন্য যে-কোনও কাজ করা যায় সকল কাজই দেশের কাজ হইতে পারে। প্রভেদটা কাজের মধ্যে নাই, প্রভেদ সেই কাজের অন্তরালে কর্ম্মকর্ত্তার মনের ভিতর। যে কাজ করিতেছি তাহা যদি দেশের সেবা করিবার ইচ্ছায় এবং সেবা করিতেছি এই বুদ্ধিতে করি তবেই তাহা দেশ-সেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছেন যে নিষ্কামভাবে ধর্ম্মবুদ্ধিতে যে কার্য্য করিবে সে কার্য্য যাহাই হউক না কেন তাহাই ধর্ম্ম। আত্মীয়-বধ সামাজিক-অমঙ্গল সাধন প্রভৃতি যত প্রকার অনিষ্ট তাহা হইতে হউক না কেন তুমি যদি সে কার্য্য ধর্ম্ম করিতেছি জানিয়া কর তবে তাহাই ধর্ম্ম। সেইরূপ দেশের সেবা করিতেছি জানিয়া তুমি যে-কাজই কর না কেন, সে কাজ যত কেন স্বার্থপরের মত দেখা যাক না, তাহার দ্বারা তুমি দেশসেবার গৌরব লাভ করিবে।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে দেশ-সেবকের কাছে আমরা চাই কি? চাই—ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপ। আর চাই—ধীরবুদ্ধি, শান্তচিত্ত, রাগ-দ্বেষের একান্ত অভাব। চাই—সেই নিষ্ঠা যাহা ইবসেনের Brandএর মত All or None এই নিয়মে সমস্ত জীবনকে নিয়মিত করিতে পারে, যাহা দেশের প্রয়োজনে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারে। চাই—সেই আত্মত্যাগ যাহা অহঙ্কার একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, যাহা কোনও কার্য্যে দেশের মঙ্গল হইতে ভিন্ন করিয়া আপনার মঙ্গল কল্পনা করিতে পারে না, দেশের জন্য আশা ছাড়া নিজের জন্য কোনও ইচ্ছা করিতে পারে না। চাই—সেই আত্মবিলুপ্তি যাহাতে নিজের সুখদুঃখ রাগদ্বেষ তৃপ্তি-অতৃপ্তি অহঙ্কার-অভিমান সব দেশের পায় নিবেদন করিয়া দিয়াছে। কিন্তু শুধু ইহাতে চলিবে না—তোমার প্রবৃত্তির উৎকর্ষেই দেশসেবায় তোমার উৎকর্ষ লাভ হইবে না—বুদ্ধির উৎকর্ষও সম্পাদন করিতে হইবে। নিরন্তর চেষ্টার দ্বারা, অধ্যয়ন বিবেচনা ও গবেষণা দ্বারা দেশের মঙ্গলামঙ্গল প্রয়োজন-অপ্রয়োজন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হইবে, অপ্রমত্ত চিত্তে সমুদয় আবশ্যক অবস্থা বিচার করিয়া দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যেটা তোমার ভাল লাগে সেইটাই যে দেশের পক্ষে সত্যসত্যই ভাল একথা মনে করিও না। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ সেটা ভাল কি না, খুব ভাল করিয়া দেখ যে যে-সিদ্ধান্ত তুমি করিয়াছ তাহা কেবল বুদ্ধির ফল, তোমার রাগদ্বেষ-প্রসূত নহে। যাহা এইরূপ বিবেচনায় দেশের মঙ্গলজনকরূপে দাঁড়ায় সেই কার্য্য তোমার কর্ত্তব্য হইবে, তাহাতে তুমি মনপ্রাণ একান্তভাবে নিযুক্ত কর।

বুদ্ধি ভগবান সকলকে সমান দেন নাই। দেশের হিতাহিত অনুসন্ধানে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার প্রয়োজন, সে বিদ্যা যত্নের সহিত অনুশীলন করিতে হয়। Politics, Economics, Jurisprudence, Sociology প্রভৃতি বিদ্যা যে-কেহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে না। অথচ এ-সমুদয় বিদ্যা দেশের হিতাহিত বিবেচনার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। যদি তোমার সে অধিকার না থাকে তবেই যে তুমি দেশের সেবার কার্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে এরূপ মনে করিও না। যে-সমুদয় বড় বড় প্রশ্ন এই বিদ্যার সাহায্য ছাড়া সমাধান করা যায় না, তুমি কেবল সেই-সমুদয় কার্য্যে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে—তাহাতে তোমার অগ্রসর হওয়া অবিবেচনার কার্য্য হইবে; কিন্তু এমন শত শত ছোটখাট কাজ আছে যাহার জন্য এত বেশী বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই—সেই কাজ একান্ত নিষ্ঠার সহিত করিয়া তুমি দেশসেবার সম্পূর্ণ গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

হিন্দুশাস্ত্রে সকল বিদ্যানুশীলনে সকল কার্য্যের প্রারম্ভে

অধিকারী বিচার করা হয়। সকলেই সকল কাজ করিতে পারে না। যাহা যাহার শক্তির সাধ্য সেই অনুসারে তাহা সম্পন্ন করিয়াই সে ধর্ম্ম করিতে পারে। যেভাবে এই অধিকারী-বিচারতত্ত্ব এখন সমাজে প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত দূষণীয়, কিন্তু ইহার গোড়ার কথাটা অত্যন্ত খাঁটি। দেশের সেবা সম্বন্ধেও এই অধিকারী-ভেদ মানিতে হইবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তির অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে—অধিকার অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে গেলে কাজ ভাল হইবে না।

আর একটা প্রয়োজনীয় কথা এই যে সব কাজের মত দেশ-সেবারও একটা সাধনা চাই। সখের খেলোয়াড়ের মত দেশ-সেবা লইয়া খেলা করিলে কোনও কাজই হইবে না—দেশ-সেবায় লাগিয়া পড়িয়া-থাকিলে তবেই তুমি একটা কিছু সত্যসত্য ভাল কাজ করিতে পারিবে। তোমার কার্য্যের ক্ষেত্র নির্ণয় করিয়া তোমাকে আগে আপনাকে সেই কার্য্যের জন্য উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা লাভ করিতে হইবে, যে শক্তির প্রয়োজন তাহার সাধনা করিতে হইবে; নিজেকে আগে তৈয়ার না করিয়া কাজে হাত দিলে শুধু কাজ পণ্ড হইবে। তাই বলিতেছিলাম, দেশসেবার জন্য একটা সাধনা চাই। অভ্যাস দ্বারা শক্তি ও কর্ম্মপটুতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা তোমার বুদ্ধিকে শাণিত করিতে হইবে, ঐকান্তিক ধ্যান দ্বারা তোমার চিত্তে সর্ব্বদা সেবার প্রবৃত্তি প্রবল করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে তোমার সেবা নিষ্ফল হইবে।

এই কথাটা আমাদের দেশে সকলে স্মরণ রাখেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে এইরূপ ঐকান্তিক সাধক ও সেবক সুলভ নহে। আমাদের দেশে যে খুব তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুরাগ সত্ত্বেও দেশের সেবাকার্য্য বিশেষ ফলপ্রসূ হইতেছে না এই ঐকান্তিক সাধনার অভাবই তাহার কারণ। আমরা বেশীর ভাগ উত্তেজনার দাস, আমাদের সাধনার অভাব আমরা উত্তেজনা দিয়া পূরণ করিতে চাই। কিন্তু একটা হাউইয়ের আগুন যতই তীব্র বা প্রবল হউক না তাহার দ্বারা ভাত রাঁধা চলে না। দেশের কোনও স্থায়ী মঙ্গল করিতে হইলে সাময়িক উত্তেজনার উপর নির্ভর করা বাতুলতা; কোনও একটা ভাল কাজ করিতে গেলে দীর্ঘকাল তাহাতে তা দিতে হয়, অধীরতায় তাহা পণ্ড হয় মাত্র।

এই নিষ্ঠা, এই ঐকান্তিকতা, এই যে একটা কাজে লাগিয়া পড়িয়া-থাকিবার ক্ষমতা, ইহা আমরা পাইব কোথা হইতে? স্বদেশপ্রেম যতই প্রবল হউক না কেন আমাদের মনের ভিতর এই আগুন চিরদিন সমানভাবে জ্বালাইয়া রাখিবার সাধ্য শুধু তাহার হয় না যদি তাহার পশ্চাতে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক আস্থা ও তাঁহার ধর্ম্মনিয়মে স্থির বিশ্বাস না থাকে; যদি আমরা সত্যসত্য বিশ্বাস করি যে এই জগতের ভিতর ভগবানের ধর্ম্মরাজ্য অনুস্যূত আছে, যদি এই জ্ঞান অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক চেষ্টার ভিতর সর্ব্বদা ইহা জাগ্রত রাখিতে পারি, তবেই আমরা পাইতে পারি এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এই অটুট চেষ্টা, সুখদুঃখে সমান এই শান্তি; তবেই আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ বলিয়া সকল শাস্তি সকল দুঃখ মাথায় তুলিয়া লইতে পারি, তবেই পারি আমরা নিষ্ফলতায় না ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সফলতায় শান্ত থাকিয়া অচল অটল সংকল্প লইয়া তাঁহার কেতন বহন করিতে, ফলাফল তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহার মঙ্গল-অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে জীবনকে নিয়মিত করিতে; তবেই আমরা করিতে পারি প্রকৃত স্বদেশসেবা। ভগবানে এই বিশ্বাস, তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে এই আস্থা, যদি না থাকে তবে দেশের প্রকৃত সেবা ফলাফল অবহেলা করিয়া স্থির নিষ্ঠার সহিত কেহ চিরদিন করিতে পারে না। দেশের কাজ অনেক সময় অনেকে অন্য ভাব অন্য লক্ষ্য লইয়া করিয়া থাকেন, কিন্তু সে সেবায় এ ঐকান্তিকতা এ নিষ্ঠা কখনও থাকিতে পারে না।

মনে রাখিও যে ভগবান মাথার উপর আছেন, মনে রাখিও যে দেশের সেবায় লোকের সেবায় তুমি তাঁহার কাজ করিতেছ, মনে রাখিও তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যের তুমি এক ক্ষুদ্র সৈনিক। অধর্ম্ম করিয়া, তাঁহার মঙ্গলনিয়ম অবহেলা করিয়া ক্ষণিক সুবিধা লাভ করিতে পার, তোমার চিত্তে ক্ষণিক তৃপ্তি পাইতে পার, কিন্তু ভগবানের ধর্ম্মরাজ্যে অধর্ম্মের দ্বারা কোনও স্থায়ী ফললাভ হইতে পারে না। সুতরাং যদি প্রকৃত স্বদেশ-সেবক হইতে চাও তবে ধর্ম্ম

ছাড়িয়া কখনও অধর্ম্ম করিও না, সেবা ছাড়িয়া কখনও হিংসা করিতে যাইও না, ভালবাসা ছাড়িয়া কখনও ঘৃণা করিতে যাইও না। যদি তুমি ধর্ম্মপথে অক্ষুণ্ণ থাকিয়া থাক, যদি তোমার স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশ-সেবার ভিতর অধর্ম্মের ভেজাল না থাকে, যদি নির্ম্মল পবিত্র চিত্ত দেশের সেবায় উৎসর্গ করিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমার ভয় নাই, কোনও ত্যাগে তুমি সঙ্কুচিত হইবে না, কোনও নিষ্ফলতায় বিচলিত হইবে না, কঠিনতম দুঃখভোগে ভীত হইবে না, ভগবানের ধর্ম্মনিয়মে তুমি শেষে চরম সফলতা লাভ করিবার স্থির বিশ্বাসে শান্তচিত্তে তাঁহার আশীর্ব্বাদের প্রতীক্ষা করিতে পারিবে।

ইহাই স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশসেবকের আদর্শ। যদি আমরা দেশের প্রকৃত হিতসাধন করিতে চাই তবে এই আদর্শ আমাদের আয়ত্ত করিতে হইবে, চিত্তের এই অবস্থা আমাদের লাভ করিতে হইবে। যদি আমাদের হৃদয় এই-রূপভাবে গঠিত করিয়া তুলিতে পারি তবে আমাদের কাজের ক্ষেত্রের জন্য খুঁজিয়া ফিরিতে হইবে না।

কাজ তো চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের এ দরিদ্র অবনত দেশ, পরানুগৃহীত পরমুখাপেক্ষী এ দেশ, রোগ-শোকের লীলাভূমি এ দেশ, ইহার সেবার শত পন্থা খোলা রহিয়াছে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র আছে যাহারা দুবেলা দুমুঠা অন্ন খাইতে পায় না, দেশের সেবা যদি করিতে চাও তবে ইহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দাও; ভিক্ষার অন্ন নয়, পরিশ্রমের পুরস্কার যে অন্ন তাহা দিয়া ইহাদের অভাব দূর করিয়া মনুষ্যত্ব স্ফুরিত কর। গ্রামে গ্রামে পীড়িতের আর্ত্তনাদ। প্রত্যেকে নিজ গ্রামে পীড়িতের শুশ্রূষার আয়োজন কর, এমন ব্যবস্থা কর যাহাতে দরিদ্র রোগী চিকিৎসা পায়। এমন আয়োজন কর যাহাতে সকলে গৃহদ্বার পরিষ্কার রাখে, জঙ্গল বাড়িতে দিয়া বাসগৃহকে ভয় ও পীড়ার আশ্রয় না করে, যাহাতে লোকে সুপরিষ্কৃত পানীয় পাইতে পারে, যাহাতে পচা ডোবা দূর হয়। অন্ধ অজ্ঞতায় লোক আচ্ছন্ন—যাও তাহাদের শিক্ষা দেও, লেখাপড়া শিখাও, আর শিখাও তাহাদিগকে স্বাস্থ্যনীতি, শিখাও তাহাদিগকে বাঁচিবার ও সমৃদ্ধ হইবার উপায়। সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছ দরিদ্রকে নিপীড়িত করিয়া ধনী, ছোটলোককে পীড়িত বঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক, সমৃদ্ধ হইতেছে; দরিদ্রের বন্ধু হইয়া তাহাদের সহায়তা কর। ইহার জন্য যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা যে সহজসাধ্য একথা আমি বলিতে চাহি না, কিন্তু যদি আমরা সবাই সঙ্কল্প করি যে প্রত্যেকের যতটুকু সাধ্য করিব, তবে কার্য্য যে খুব বেশী কঠিন হইবে এরূপ মনে করি না।

আর একদিক হইতে দেখ, দেখিতে পাইবে আমাদের এ দেশ বড় দরিদ্র; ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা কর, জগতের মুখ্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় দেশকে ধনগৌরবে গৌরবান্বিত কর। দেশের ধন নানা লোকের হাত হইতে লইয়া নিজের হাতে সংগ্রহ করিয়া তুমি ধনী হইলে দেশের কোনও উপকার করা হইবে না, দেশের কয়েকটি লোক ধনী হইলে কিছু আসিয়া যায় না। আমাদের চাই দেশের ধনবৃদ্ধি—দেশের আপামরসাধারণের সমৃদ্ধি! সে সমৃদ্ধির উপায় শিল্প ও বাণিজ্য। তোমরা কি জান না ধনের কি শক্তি, কি সম্মান, জান না কি ধনীর কি আধিপত্য? দেশের জন্য কি করিবে ভাবিয়া অস্থির না হইয়া, নানা অসম্ভব কল্পনা নানা মরীচিকার সন্ধানে বৃথা সময়ক্ষেপ ও শক্তির অপব্যয় না করিয়া যদি দলে দলে তোমরা শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কর, তবে তোমরা দেশের যে উপকার করিবে তাহা অন্য কোনও-প্রকার সেবা অপেক্ষা কোনও-ক্রমে ন্যূন হইবে না। শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইবার পথে নানা বাধাবিঘ্ন আছে। বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যে অধিক সফলতা লাভ করিতে পারে নাই—এ কথা সত্য। কিন্তু যদি সত্যসত্যই এ বিষয়ে তোমার অনুরাগ থাকে, যদি শিল্পবাণিজ্যে শিক্ষানবিসী করিতে, নিম্নতম স্তরে অতি তুচ্ছ কাজ হইতে আরম্ভ করিতে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে দেখিতে পাইবে যে শিল্প-বাণিজ্যে অভ্যুদয় অতিশয় সহজসাধ্য।

আমাদের এ দেশ শুধু ধনে দরিদ্র নহে, জ্ঞানেও দরিদ্র। আমরা সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি যে ভারত-বর্ষ জ্ঞানে গরীয়ান্‌। এ কথা যে বলে সে হয় মূর্খ, না হয় অন্ধ। অতীত কালে আমাদের দেশ জ্ঞানজগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছিল সত্য; সাহিত্যে দর্শনে গণিতে বিজ্ঞানে শিল্পে ভারত অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া-

ছিল। সেই অতীতের গৌরব লইয়া আস্ফালন করিবার অবসর আমাদের তখনই হইবে যখন আমরা আমাদের বর্ত্তমানকে সে অতীত অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত করিতে পারিব। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান কি সে অতীতের যোগ্য? সভ্যসমাজে জ্ঞানের জগতে আমাদের স্থান আজ কোথায়? বাণীর মন্দিরের নিম্নতম সোপানেও যে আমাদের জাতির এখনও অধিকার হয় নাই। যে-কোনও বিদ্যার উচ্চতর স্তরে উঠিলেই তোমরা দেখিতে পাইবে যে জ্ঞানের সাম্রাজ্য আজ কত সুবিস্তৃত, কত শতসহস্র পণ্ডিত তাহার নানা ক্ষেত্রে আজ কাজ করিতেছে, নানা খনি খনন করিয়া জ্ঞানের অপূর্ব্ব মণিমাণিক্যসকল সংগ্রহ করিতেছে। এই সাম্রাজ্যে আমাদের অধিকার বিস্তার করিবার জন্য আমরা কি করিয়াছি? এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের শত লক্ষ কর্ম্মীর মধ্যে আমরা একটি কি দুইটি ক্ষুদ্র কর্ম্মী পাঠাইয়া কি তুষ্ট থাকিব? তাহাতে কি আমাদের দেশ জগতের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারিবে? এখানে তোমাদের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে, জ্ঞানের যে-কোনও শাখার অনুশীলন করিয়া যদি তোমরা জগতকে সেই বিদ্যার কোনও নূতন সন্ধান দিতে পার তবে তোমরা তোমাদের মাতৃভূমির গৌরব প্রকৃতই বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং প্রকৃত স্বদেশ-সেবক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে। কে আছ মাতৃভূমির কৃতীসন্তান, কে আছ মায়ের অনুরক্ত সেবক, এস এই ক্ষেত্রে, তোমার দেশকে জ্ঞানে মণ্ডিত করিয়া সমস্ত জগৎকে অবনত মস্তকে তামার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টিত হও, তোমাদের চেষ্টার ফলে দেশের সমূহ উন্নতি হইবে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে কি ধনের ক্ষেত্রে যে-কেহ প্রকৃত দেশ-প্রেমিক সেবক হইবে তাহার একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—সেটি এই যে, আদর্শকে কোনও মতে ক্ষুণ্ণ করিও না, ছোটখাট কোনও কাজ করিয়া পরিতৃপ্ত হইও না, সামান্য কার্য্য করিয়া মহৎ কার্য্যের সম্মান লাভ করিবার জন্য লোলুপ হইও না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় অমঙ্গলের কারণ আমাদের আদর্শের খর্ব্বতা। আমাদের কল্পনার দৌড় খুব বেশী দূর যায় না। যে-কোনও দিকেই যাই না কেন আমরা খুব উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া অগ্রসর হই না, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভের চেষ্টা করি না। দুটো চলনসই বক্তৃতা করিয়া আমরা ডিমসথেনিসের চালে চলিতে চাই। ব্যবস্থাপক সভায় একটা সামান্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পিট গ্ল্যাডষ্টোনের সম্মান লাভ করিতে চাই। বিজ্ঞানের একটা ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণা করিয়া মনে করি অন্ততঃ একটা ডারউইন কি কেলভিনের কাজ করিয়া বসিয়াছি। আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজেও খুব উচ্চশিক্ষার অভাব-বশতঃ আমরা অল্প কাজে বড় পুরস্কারলাভ করিয়াও থাকি। একটা বিলাতী কাগজে আমার প্রবন্ধের প্রশংসা বাহির হইলে আহ্লাদে দেশের লোক অস্থির হইয়া যাইবে, আমিও তাই লইয়া খুব খানিকটা হৈ চৈ করিব—যদিও সে প্রশংসা হয় তো বিলাতের একটা পঞ্চমশ্রেণীর লেখকের প্রশংসার চেয়ে কিছুই উচ্চ নহে। আমাদের আদর্শ ক্ষুদ্র বলিয়াই আমরা দেশবাসীর প্রশংসার অপেক্ষা বিলাতী যেমন-তেমন প্রশংসার জন্য লোলুপ হইয়া থাকি।

যদি আমাদের প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আমরা এরূপ অল্পে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। যে পর্য্যন্ত না এমন একটা কিছু করিতে পারি যাহাতে জগতের পণ্ডিতসমাজের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিতে পারি সে পর্য্যন্ত নিজে আত্মপ্রসাদ বা পরের প্রশংসায় সন্তোষ লাভ করিতে পারিব না, অজ্ঞ সমালোচকের অন্ধ চাটুকারিতায় মুগ্ধ হইব না, কেবল আমাদের দেশের দশজনের চেয়ে বড় হইয়াই খুসী হইব না। মনে রাখিও জ্ঞানের জগৎ আজ একটা বিশ্বব্যাপী সমাজ। এখানে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিলে চলিবে না, জ্ঞানের মহাসমুদ্র অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিতে হইবে। আমার দেশের মানদণ্ড যদি ক্ষুদ্র হয় তাই বলিয়া আমার বাণীর মন্দির আমি খাটো করিতে পারি না; আমার বিদ্যার বহর ব্যাঙের হাতের পাঁচ হাত হইল বলিয়া গর্ব্বে বুক ফুলাইতে পারি না। জ্ঞানের মন্দিরে যে ব্যক্তি ভারতের জন্য গৌরব লাভ করিতে চাহিবে তাহার সাধনা ও সিদ্ধির একমাত্র মানদণ্ড জগতের পণ্ডিতসমাজের সাধারণ মানদণ্ড; যদি আমি যাহা করিয়াছি তাহা সমস্ত জগতে সমাদৃত ও সমস্ত জগতের চক্ষে শ্রেষ্ঠ হয় তবেই আমার কাজকে বড়

কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারিব, তবেই আমি আমার মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিব—তবেই আমি দেশের একটা সেবার মত সেবা করিয়াছি বলিতে পারিব।

শুধু জ্ঞানের রাজ্যে নয়, দেশসেবার সকল ক্ষেত্রে আমাদের এই আদর্শের উচ্চতা রক্ষা করিয়া তাহার তুলনায় আমাদের কার্য্যের পরিমাণ করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কোনও ক্ষেত্রেই এই আদর্শের উচ্চতা পরিলক্ষিত হয় না। বলিতে গেলে এ পর্য্যন্ত আমরা দেশের কাজের কেবল এক ক্ষেত্রেই নিযুক্ত আছি—সে রাজনীতিক্ষেত্র। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদিগের মুখে আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে বাঙ্গালী এক্ষেত্রে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এক্ষেত্রে আমাদের করিবার যত আছে তাহার কিছুই আমরা করি নাই। রাজনীতির নানাবিভাগের মুখে—সকলটিই আমরা কেবল স্পর্শ করিয়া গিয়াছি; তেমন নিষ্ঠার সহিত, একাগ্রতার সহিত কোনও একটি বিভাগে এমন কোনও কাজ করি নাই যাহাতে বেশী আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও বোম্বাই বা মান্দ্রাজে রাজনৈতিক কর্ম্মীরা প্রকৃত কার্য্যে যতদূর অগ্রসর হইয়াছেন আমরা বাঙ্গালীরা ততদূরও যাই নাই।

আসল কথা এই যে আমাদের প্রধান দোষ যে আমরা কোনও কাজের ভিতর ডুবিয়া পড়িতে পারি না, কেবল ভাসিয়া বেড়াইতে চাই। আমাদের সে একাগ্রতা সে শ্রমপটুতা নাই যাহা ছাড়া কোনও কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। গায়ে ফুঁ দিয়া সৌখীন ভাবে কাজ করিলে কাজ সুসম্পন্ন হয় না। নেতা হইবার জন্য সখের যাত্রার দলে রাজা সাজিবার ইচ্ছায় দেশের সেবার সখ করিলে চলিবে না। কিন্তু যাহার ভিতর থাকে সেই হোমবহ্নি—যাহাতে দেশের পূজার জন্য নিজের যথাসর্ব্বস্বকে আহুতি দিতে প্রস্তুত করে, যাহার থাকে সেই পণ যাহাতে যে যে-পথে আসিতেছে তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না, যদি এ সংকল্প থাকে যে পর্ব্বতের চূড়ায় না যাইয়া ফিরিবে না, তবেই তাহার এই ব্রত ধারণের জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র, আমাদের এই দেশ প্রভূতভাবে ত্যাগী কর্ম্মপটু নিষ্ঠাবান বীর সেবকের জন্য সজল নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন, পণ করিতে হইবে মায়ের সে অশ্রু আমরাই মুছাইব; আমাদের দেশবাসী দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত—প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে তাহাদের দুঃখ আমি দূর করিব; আমাদের দেশ জগতের সভ্যসমাজে ধনে মানে জ্ঞানে অন্ত্যজ-তুল্য হইয়া রহিয়াছে; প্রতিশ্রুত হইতে হইবে যে গৌরবের শীর্ষস্থানে তাহাকে আমরাই উঠাইব। পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আমাদের দেশের দুঃখ অপরে দূর করিতে পারিবে না, এক ভগবানকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্ম সম্বল করিয়া, নিজেদের সাধ্যের সীমা পর্য্যন্ত দেশের সেবা করিব এই সংকল্প করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে; আমাদের দেশমাতৃকা আমাদিগকে নিরন্তর আহ্বান করিতেছেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

(ঢাকার ছাত্রসমাজে পঠিত।)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

পরগাছা

[পরগাছা উপন্যাস; উপন্যাস কল্পনার ফল; কাল্পনিক ব্যাপার হইলেও উপন্যাসে বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও না কোথাও কাহারো না কাহারো থাকিতে পারে, ঘটনাও কোথাও না কোথাও কখনো না কখনো বর্ণনার কিয়দংশের অনুরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে; তাহা মিলাইয়া কেহ যেন ইহাকে ইতিহাস, জীবনচরিত বা ব্যক্তিবিশেষ ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা বলিয়া ধরিয়া না লন; মিলের সঙ্গে অমিল হিসাব করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের ভ্রম ধরা পড়িবে যে যাহা সত্যের আভাস বলিয়া মনে হইতেছে তাহা কল্পনারই সৃষ্টি।]

(৫৮)

রাখাল ও মণিমালা আবার গোসাঁইগঞ্জে ফিরিয়া আসিল। সুখী হইল প্রসাদী ও বিন্দি।

বিন্দি মণিমালার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া গাহিল—

"শুন লো রাজার ঝী,
তোরে কহিতে আসিয়াছি—
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি এ কাজ করিলি কি!"

মণিমালা হাসিয়া বলিল—মরণ আরকি! বুড়ো হয়ে মরতে চললেন তবু রসরস গেল না!

খিল হাসিতে-হাসিতে গাহিল—

"শুবল মিতা হে কি কহব সে সব রঙ্গ।
এ সে যে মৃগধিনী, হেরিয়া মুখানি বাঢ়ল রস-তরঙ্গ!"

নারাণদাসী রাখাল ও মণিমালাকে দেখিয়া নথ নাড়িয়া বলিল—'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।' এমন হাড়-হাবাতে যে রাজার ইশ্বিয্যেতেও দৈন্যতা ঘুচল না। রাজবাড়ী জলিয়ে এখন এলেন আমাদের গণ্ডে পা দিতে। ঐ ত কাঙালীও এল রাজবাড়ী থেকে—কেমন গুছিয়ে এসেছে, বৌএর গায়ে বাউটি-স্থুট গহনা হয়েছে, মেয়েকে রাজরাণী করে দিলে, নিজেও বেশ দুপয়সা হাতে করে বাড়ী এসে বসল। আর এঁরা এলেন শুধু-হাতে নাচতে-নাচতে। ঝাঁটা মারো অমন ধাম্মিকপনায়, মুখে আগুন অমন পরের উপকারের। আপনি বাঁচলে তবে ত বাপের নাম!

গৌর বলিল—এল উৎপাত, এখন কেবল করবে পড় পড়। বাপ-ঠাকুদ্দারা আচ্ছা এক কুলীনের ভেজাল বাড়ীতে পুষেছিল!

নারাণদাসী নথ নাড়িয়া বৃন্দাবনকে বলিল—ফুলের সোহাগে ছোটার আদর! বুঝতাম দুপয়সা পাব-থোব নাড়ব-চাড়ব, পরের ঝক্কি ঘাড়ে নিতাম! ওদের ভিন্ন হয়ে নিজের সংসার পাততে বলো।

সুতরাং বৃন্দাবন রাখালকে বলিল—দেখ রাখাল, আমি বুড়ো হয়েছি, আর বেশীদিন বাঁচব না। আখেরে গৌরের সঙ্গে ভূপালের বনিবনাও নাও হতে পারে। আমরা থাকতে-থাকতেই তোমার ভিন্ন হওয়া ভালো। তোমায় আমি জায়গা দিচ্ছি—ফণে বাগ্দীর পড়াটায় তুমি বাড়ী কর। তখন যদি উদ্ধব-গোসাঁইএর বাড়ীটা কিনে রাখতে তাহলে আর কোনো গণ্ডগোল হত না।

রাখালকে তাহার দাদামশায় যখন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন তখন সে ক্ষুণ্ণ মনে পৃথক ঘরের পত্তন করিল। মাটির দেয়ালের উপর খড়ের চাল দেওয়া দুখানি শোবার ঘর ও ঢেঁকি বেড়ার ভিতর আঁতাকুড়ে ছাওয়া একখানি রান্নাঘর। এই কুঁড়েঘর স্বতন্ত্র নিজের হইতেছে দেখিয়া মণিমালার আনন্দ আর ধরিতেছিল না।

ঘর শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবন হঠাৎ মারা গেলেন। নারাণদাসী যথারীতি চীৎকার করিয়া কান্নাকাটির পর পাড়ায়-পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল- 'রাখাল অপ্পেয়ে এমনি ধাম্মিক যে রাজারা তাড়িয়ে দিলে তবে হাঁপ ছাড়লে; আর এতকাল যাদের খেয়ে মানুষ তাদের নাবালক ছেলেকে ফাঁকি দিয়ে জায়গা বেদখল করে বাড়ী হচ্ছে!

রাখাল নারাণদাসীকে বলিল—রাঙা-দিদিমা, গোসাঁই-দাদা আমাকে যে জায়গা দিয়ে গেছেন সেটা আমি অমনি চাইনে, তুমি আমায় বিক্রী কর।

কাঙালী এতকাল রাজসংসারে ছিল, রাজার শ্বশুর, ওরও রাজবুদ্ধি থাকা সম্ভব মনে করিয়া নারাণদাসী তাহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল।

কাঙালী বলিল—এখন বেচে দাও, তারপর গৌর সাবালগ হলে নাবালকের বিষয় কারুর দানবিক্রীর অধিকার নেই বলে হয় জায়গা নয় ক্ষতিপূরণের আরো কিছু টাকা আদায় করে নেওয়া যাবে।

নারাণদাসী খুসী হইয়া টিপসই দিয়া জমী বিক্রয় করিল।

নারাণদাসী হাতে টাকা পাইয়া স্বামীশোক কিছু ভুলিতে পারিল। তখন সে বিষয়কর্ম্মে মন দিল। গৌরকে বলিল—তোর আর ইস্কুলে যেতে হবে না! সেবক-শিষ্যি দেখে বেড়ালে তোর কড়ি খায় কে? তোর ত আর চাকরী করতে হবে না, তোর ত চরণে কড়ি!

গৌর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার সমবয়সী নিতাই শ্যাম কৃষ্ণ হলধর জগাই—তাহারা কেহই পড়ে না; গলায় তিনকণ্ঠী মালা আঁটিয়া তিলকসেবা করিয়া গয়লাবাড়ী কলুবাড়ী জেলেবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়, কত দেশ দেখে, কত কি খাইয়া মজা করিয়া বেড়ায়—গয়লাবাড়ী ক্ষীর ছানা দই, কলুবাড়ী খাঁটি তেলে ভাজা তালের বড়া, জেলেবাড়ী বাড়ের ভালো ভালো মাছ গুরুর ভোগে লাগে। তা ছাড়া যদি কোথাও অষ্টপ্রহর কি ধুলোট হয়, যদি কোথাও মচ্ছব লাগে, তবে মালসাভোগ পানোড়া ও মালপো খাইয়া জীবনের পরমায়ু অনেকখানি বাড়াইয়া লইতে পারা যায়। তাহারা গোসাঁইগোবিন্দ লোক, তাহারা প্রভুপাদ, তাহারা গুরুবংশ—তাহাদের শুধু পা

থাকিলেই হইল, বিদ্যা সাধ্য জ্ঞান বুদ্ধি আর কিছুরই দরকার নাই।

রাখাল বলিল—রাঙা-দিদি, ওকে এর মধ্যে স্কুল ছাড়িও না।

নারাণদাসী বলিয়া উঠিল—তুমি তবে ওকে মাসে-মাসে মাসহারা দিও; বসে থাকলে ত পেট চলবে না।

—কেন, ছুটির সময়ে শিষ্যসেবক দেখতে ত পারবে। গুরুর যোগ্য হতে দাও আগে, তারপর ত গুরুগিরি করবে?

নারাণদাসী ফরকিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল —গোসাঁইগোবিন্দের ছেলে গুরু হয়েই জন্মায়!

নারাণদাসী ও গৌর বলিল—এ কেবল শত্রুতা সাধা।

তাহাতে কাঙালীও প্রাণ খুলিয়া খুব জোরে সায় দিল।

(৫৯)

জমির দাম দিতে ও ঘর করিতে রাখালের পুঁজি হাজার টাকার তোড়ার পেট অনেকখানি সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

তাহার উপর বাড়ীতে কিছু খাবার হইলেই রাখাল মণিমালাকে বলে—আমার ভাগটা ভাগ করে গৌরকে আর প্রসাদীদের দিয়ে এস, আমি ওদেরই খেয়ে মানুষ! —ইহাতে মণিমালাকে প্রত্যেক জিনিসই বেশী বেশী করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

কাঙালী গ্রামের মজলিসে খুব লম্বা চওড়া গল্প করে— রাজার বাড়ীতে কি-রকম নিখুঁত-নাড়ু হইত, কি-রকম ঘিওর হইত, কি-রকম পোলাও হইত, কি-রকম কোপ্তা কোর্মা কালিয়া হইত! তাহা একদিন খাইলে দশ দিন হাতে গন্ধ থাকিত—সে স্বাদ জন্মে ভুলিবার নহে।

গ্রামের লোকে অনেকে এসবের নামও শুনে নাই; অনেকে নাম জানে, খায় নাই। কাঙালী সকলকে চুপিচুপি টিপিয়া দ্যায় রাখালের বৌ এসব খাদ্য তৈয়ার করিতে পারে,—তোমরা রাখালকে ধর।

রাখালকে বলিবামাত্র সে আহ্লাদিত হইয়া সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে—সে মনে করে লোককে খাওয়াইতে পারা সে ত ভাগ্যের কথা; সে কত লোকের খাইয়া আছে, একটুও যদি তা শোধ করিতে পারে। মণিমালা ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হয়, কিন্তু স্বামীকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না। এমনি করিয়া তাহার হাজার টাকার শেষ টাকাটিও শীঘ্রই খরচ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ভূপাল এণ্ট্রান্স পাশ করিল। পাহাড়পুরের স্কুলের শিক্ষকেরা মনে করিত ভূপাল এণ্ট্রান্সে কম্পিট করিয়া প্রথম দশজনের মধ্যে হইবে; কিন্তু খারাপ স্কুলে আসিয়া ও নানাবিধ বিক্ষেপে সে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইল। এখন কেমন করিয়া তাহার কলেজে পড়া চলিবে, তাহাদের সেই ভাবনা উপস্থিত।

মণিমালার পিসেমহাশয় শ্রীকৃষ্ণ মারা গিয়াছেন। কুবের এই সুযোগে তাঁহার তালুকটি দখল করিয়া লইয়াছে —রাজা ধনেশ্বর ভগ্নীপতি ও ভগ্নীকে ঐ তালুক মৌখিক কথায় দান করিয়াছিলেন, কোনো লেখাপড়া ছিল না। তথাপি মণিমালার পিসি হরসুন্দরী অনেক দিনের ভোগ-দখলের স্বত্ব দেখাইয়া নালিশ করিবে বলিয়া চোখ রাঙাইল, তখন কুবের তাঁহাকে মাসে পাঁচশত টাকা মাসহারা দিবে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিল। হরসুন্দরী তালুক খোয়াইয়া সেখানে থাকিতে লজ্জা বোধ করিলেন, তিনি পুত্রকন্যা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া আছেন।

মণিমালা বলিল—ভূপাল কলকাতায় পিসিমার বাড়ীতে গিয়ে থাকুক; সেখানে পিসিমা দুটি করে খেতে আর কলেজের মাইনেটা দিতে অস্বীকার করতে পারবে না।

এই খবরটা কাঙালী তাড়াতাড়ি মেয়েকে লিখিয়া পাঠাইল। কুবের হরসুন্দরীকে চিঠি লিখিল ভূপালকে ঘরে জায়গা দিলে তাঁহার মাসহারা বন্ধ হইবে।

বালক ভূপালকে একাকী কলিকাতায় পাঠাইতে গিয়া রাখাল ও মণিমালার অনেক চোখের জল পড়িল। রাধা-কান্তর চরণতুলসী তাহার পাথেয় দিয়া তাঁহাদের অন্ধের যষ্টিকে তাঁহারা বিদায় দিলেন।

ভূপাল অনেক খুঁজিয়া যখন হরসুন্দরীর বাসায় গিয়া গাড়ী হইতে নামিল তখন বেলা বারোটা; বালক ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সাড়া পাইয়াই বিন্দুদাসী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল— মামাবাবু, মা বললেন, এ বাড়ীতে ত জায়গা নেই, এখানে তোমার থাকার সুবিধে হবে না, তুমি অন্য জায়গা দেখ।

যেদিন কাহারো বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয় সেইদিন মাত্র পেট ভরিয়া খাওয়া জোটে।

রাখাল চাকরী খুঁজিতেছিল। তাহার যে বিদ্যা তাহা কোনো বিদ্বৎসভা দ্বারা যাচাই হইয়া চিহ্নিত হয় নাই; যাহারা বিদ্বান চাকর চায় তাহারা বিশ্ববিদ্যালয় টোল চতুষ্পাঠী বা নর্ম্মাল স্কুলের কোনো একটা উপাধি দেখিয়া বিচার করে। যে-সব জায়গায় উপাধির দরকার নাই, সে-সব জায়গায় পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা, অপর স্থানে কর্ম্মের প্রশংসাপত্র ইত্যাদি দেখাইবার আবশ্যক হয়। রাখালের এসব কিছুই নাই। সে এত বয়স পর্য্যন্ত কোথাও এমন কোনো কাজ করে নাই, কোনো বিশেষ কর্ম্মের এমন কোনো অভিজ্ঞতা ও তাহার জন্য প্রশংসা অর্জ্জন করে নাই, যাহার জোরে সে কাহারও অনুগ্রহ আদায় করিতে পারে। সুপারিশ করিবার মতন বন্ধু আত্মীয় মুরুব্বিরও নিতান্ত অভাব। সে মনে করিল একবার কাঙালীর শরণাপন্ন হইয়া দেখিবে।

কাঙালী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া রাজা জামাইএর নিকট হইতে পুনরাহ্বান অথবা মাসহারা পাইবার প্রত্যাশায় অনেক দিন রহিল। ক্রমে ক্রমে চিঠি লিখিয়া স্মরণ করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কুবেরের কোনো-রকম সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন সে সত্য-মিথ্যা নানা-রকম প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া ও চুরি-চামারির টাকা কিছু গচ্ছিত রাখিয়া নন্দনপুরের নটবর সামন্তের জমিদারী-সেরেস্তায় একটি মোটা মাইনের চাকরী জোগাড় করিয়াছিল।

রাখাল কাঙালীর কাছে নন্দনপুরে গেল। কাঙালী একেবারে তাড়াইয়া না দিয়া দয়া করিয়া রাখালকে তাহার অধীনে একটি মোহরেরের পদে বাহাল করিতে চাহিল—মাহিনা মাসিক পনর টাকা, তহুরির মিলিবে পাঁচ টাকা আন্দাজ, এবং লইতে জানিলে উপরি পাওনা হইবে আরো টাকা কুড়ি। যে লোক এতকাল সিংহের কাছে শশকের ন্যায় ভয়ে সম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত, সে সুযোগ পাইয়া তাহার কাছে খুব একচোট মুরুব্বিআনা করিয়া লইল; এবং রাখালকে উপরি-পাওনার প্রলোভন দেখাইতেও কুণ্ঠা বোধ করিল না। রাখালের অত্যন্ত ঘৃণা হইলেও সে এই কুড়ি টাকার চাকরিই স্বীকার করিত, কিন্তু সে দেখিল তাহার ভাবী প্রভু তাহাকে প্রথম সাক্ষাতেই তুমি বলিয়া কথা কহিল—সে ব্যক্তি এমনই দাম্ভিক যে কোনো কর্ম্মচারীকে সে আপনি বলে না, কর্ম্মচারী বলিয়া তাহার যেন কোনো মর্য্যাদা নাই, সে যেন ভদ্রলোকের সম্মান পাইবার অনধিকারী। তাহার উপর সে দেখিল নটবর অত্যন্ত বদমেজাজী, হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে কর্ম্মচারীদের অকথ্য গালাগালি দ্যায়, কাঙালীও তাহা হইতে বাদ পড়ে না। রাখাল অনাহারে মরিবে তবু এমন নীচতা স্বীকার করিবে না সঙ্কল্প করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

কুবের ও কাত্যায়নীর কাছে রাণী জগদ্ধাত্রী নিতান্ত ফাল্‌তো ও ভার হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাহারা কথায় কথায় ঝগড়া বাধাইয়া তাঁহাকে অপমান করে; তাই তিনি শ্বশুর-স্বামীর ভিটা পরকে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন—সেই বাড়ী কেনার পরই ভূপাল জোর করিয়া এক রাত্রির জন্য তাহাতে আশ্রয় লইয়াছিল। বঙ্কবিহারী সংবাদ পাইবা মাত্র ছুটাছুটি আসিয়া রাণী জগদ্ধাত্রীর অভিভাবক হইয়া বসিয়াছে, আর তাহার সঙ্গে আসিয়াছে তাহার সহধর্ম্মিণী চন্দনমণি। রাণী জগদ্ধাত্রীর মাসহারাটি আসিলেই বঙ্কবিহারী তাহার বারো আনা অংশ রাণী জগদ্ধাত্রীরই সংসার-খরচ চালাইবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে বলিয়া হস্তগত করে এবং বাকি চার আনা যাহা রাণী জগদ্ধাত্রী মনে করেন তাঁহার রহিল তাহা চন্দনমণির হেফাজতে থাকে। কুবেরের আদেশে ও বঙ্কবিহারীর হুকুমে এ বাড়ীতে রাখালের সম্পর্কীয় কাহারও প্রবেশ নিষেধ। তাহার দিদিমার জন্য ভূপালের মন-কেমন করিত; রাণী জগদ্ধাত্রীও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন; কিন্তু তিনি রাণী হইয়াও বন্দিনী; চাকর দাসী দারোয়ানেরা তাঁহার চেয়ে কুবের বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণিকে বেশী ভয় করিত, কারণ তাহারাই বেতন দিবার না-দিবার মালিক, বাহাল বরতরফের কর্ত্তা, কাজে-কাজেই তাহারা তাহাদেরই হুকুম পালন করিত। ভূপাল মাঝে-মাঝে মলিন মুখে মলিন বেশে এই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে; যদি একবার তাহার দিদিমাকে সে দেখিতে পায়, যদি তাহার দিদিমা তাহাকে দেখিতে পাইয়া একবার

নিকটে ডাকেন, যদি দিদিমার দয়ার দান কিছু-কিঞ্চিৎ মিলিয়া যায়। কোনো কোনো দিন রাণী জগদ্ধাত্রীর সহিত তাহার দেখা হইয়া যাইত, জগদ্ধাত্রী তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেন; কিন্তু ভূপালকে বাড়ীতে ডাকিতে তাঁহার সাহসে কুলাইত না। কোনো দিন চন্দনমণির শ্যেনদৃষ্টি এড়াইয়া দশ বিশ টাকা গোপনে ঝুনকিয়া দাসী কি ঘিসু খানসামার হাত দিয়া ভূপালকে দিতেন, কখনো বা নিজেই জানলা গলাইয়া দুএকখানা নোট রাস্তায় ফেলিয়া দিতেন, আর ভূপাল চোরের মতন তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিত।

ভূপালের এই উঞ্ছবৃত্তি স্বীকার করিতে কষ্ট ও অপমান বোধ হইত খুবই। কিন্তু যখন সে মনে করিত যে বাড়ীতে তাহার পিতামাতা ভগিনী পত্নী অনাহারে রহিয়াছে—তাহার সূর্য্যের সমান তেজস্বী দৃপ্ত পিতা অন্ন-চিন্তায় মুষড়িয়া পড়িতেছেন, তাহার রাজকন্যা মাতা অন্নাভাবে শীর্ণ হইতেছেন, তাহার বড় আদরের বোনটি সকল সুখ সাধে বঞ্চিত হইয়া প্রাণেও মরিতে বসিয়াছে, তাহার সোহাগের সোহাগী বাপের বাড়ী যাইতে অস্বীকার করিয়া তাহাদের সঙ্গে সকল দুঃখ হাসিমুখে সহিতেছে—তখন ভূপালের কাছে কোনো কর্ম্মই অকরণীয় থাকিত না। সে রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট হইতে সামান্য যাহা পাইত পাইবামাত্রই বাবাকে পাঠাইয়া দিত।

ভূপাল টাকা পাঠাইলে দিন পনর কুড়ি একরকমে চলিত, মাসের বাকী দশ পনর দিন কষ্টের অন্ত থাকিত না। ভূপালের এই অতিকষ্টে সংগৃহীত অর্থ হইতে মণিমালা অনেক হিসাব করিয়া মাত্র প্রাণধারণের উপযোগী যে সামান্য খাদ্য প্রস্তুত করিত তাহাই তাহার রন্ধনপটুতায় অল্প উপকরণেই বিচিত্র ও সুখাদ্য হইত। সুখাদ্য একলা খাওয়া রাখালের কোষ্ঠীতে লেখে নাই, গৌরকে তাহার মুখের গ্রাস হইতে ভাগ দিয়া আসিতে মণিমালাকে রাখাল অনুরোধ করিত—কারণ গৌরের বাবার খাইয়াই রাখালের দিদিমা, মা ও সে নিজে মানুষ! যদি রাখাল পূর্ব্বে টের পাইত যে আজ একটা সুখাদ্য কিছু প্রস্তুত হইবে, তবে বেড়াইতে বাহির হইয়া একজন দুজন লোককে ডাকিয়া লইয়া সে বাড়ী ফিরিত—হয় তাহারা এককালে ভালো অবস্থায় থাকিয়া ভালো খাইত, এখন খাইতে পায় না; অথবা তাহাদের ঊর্দ্ধতন কোনো পুরুষে কেহ রাখালের দিদিমাকে কি মাকে কি রাখালকে একটি স্নেহের কথা বলিয়া আহা করিয়াছিল! এমনি করিয়া টানাটানির সংসারে অভাব বেশী করিয়া শীঘ্র ডাকিয়া আনা হইত—মণিমালা মনে মনে বিরক্ত হইলেও স্বামীকে কিছু বলিতে পারিত না। লোকে ভাবিত—উঃ! রাজার জামাই কিনা, রাখাল বেশ দু পয়সা হাতে করিয়া গুছাইয়া আসিয়া বসিয়াছে!

যেদিন আহার জুটিবার আর কোনো সম্ভাবনা থাকিত না সেদিন মণিমালা নারাণদাসীকে গিয়া বলিত—রাঙা-দিদি, আজকে বিভাকে দুটি খেতে দিও, আমাদের রান্না হতে দেরী হবে।

সে দেরী যে কত দেরী তাহা ভগবান ছাড়া আর কেহ বলিতে পারিত না।

মণিমালা বধূর জন্যও কাতর হইতেন, কিন্তু সোহাগী কিছুতেই পরের বাড়ী খাইতে যাইতে স্বীকার করিত না। সে হাসিমুখে খুব গিন্নির ধরণে বলিত—ঠাকুরঝি ছেলেমানুষ, ওকেই খাইয়ে আসুন মা। আমার উপোষ করা খুব অভ্যেস আছে—আমি বাবার ওপর রাগ করে কতদিন উপোষ করতাম।

মণিমালা ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত—এই হাসির প্রতিমা স্নেহের পুতুল এ কি কখনো রাগ করিতে জানে?

মণিমালা চোখ মুছিয়া স্নেহ-বিগলিত কণ্ঠে বলিত—মা, তুমি দুধের মেয়ে, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন কষ্ট পাচ্ছ? তোমার বাপকে চিঠি লিখি, তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও।

একথায় সোহাগীর চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। তাহার স্বামী যে তাহাকে বলিয়াছে,—সে কলেজে বসিয়া থাকে, কিন্তু শিক্ষকের পড়ানো সে শুনিতে পায় না, সে ভাবে শুধু তাহাকেই; ভূপাল যে তাহাকে বলিয়াছে যে সে যদি পুতুল হইত তবে তাহাকে বুক-পকেটে লুকাইয়া লইয়া সে কলেজে যাইত, তাহাকে যদি পুরুষের ছদ্মবেশে কলেজে ভর্ত্তি করিতে পারিত তবে এক দণ্ড বিচ্ছেদের

দুঃখ সহিতে হইত না; তাহার স্বামী তাহাকে দেখিবার জন্ত মাঝে মাঝে কলেজ পালাইয়া বাড়ীতে ছুটিয়া আসে, এবং এখন কিসের ছুটি জিজ্ঞাসা করিলে বাবাকে যা হোক একটা সামান্ত কোনো পরবের নাম করিয়া প্রবঞ্চনা করে, সে যে তাহারই জন্ত; এমন ছুট্‌কো ছুটি একদিনেই ফুরাইয়া যায়, পরদিন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে তাহার স্বামীর মন চাহে না, সে অসুখের ভান করিয়া বাড়ীতে থাকে, আর কাজেই সমস্তদিন উপবাস করিয়া কাটাইতে হয়, সেও যে শুধু তাহারই জন্ত; সে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া তাহার স্বামী যে তাহার খাবারের অধিকাংশ পাতে প্রসাদ রাখিয়া উঠিয়া যায়; এ-সব কি সোহাগী বুঝে না? এমন স্বামীকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? শনিবারের ষ্টিমারের বাঁশী যে তাহাকে বৃন্দাবনের শ্যামের বাঁশীর মতন উতলা করিয়া তোলে—খাইতে বসিয়া বাঁশী শুনিলে আনন্দে তাহার আর খাওয়া হয় না, রন্ধন চড়াইয়া বাঁশী শুনিলে সে আর রাঁধিতে পারে না। মা ত এসব জানেন, তবে তাহাকে বাপের বাড়ী যাইতে বলিতেছেন কেমন করিয়া? সে সজল চোখে মিনতি করিয়া বলে—মা, বাবা আমাকে ত আপনাদেরই দিয়ে দিয়েছেন; আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না!

মণিমালা তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া বলে—তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমাকে কি আমি তাড়াতে পারি মা!

যেদিন সামন্ত দুটিখানি চালের জোগাড় হয়, সেদিন সোহাগী হাসিমুখে বলে—মা, আজকে ফেন ফেলে দেবেন মা; নুন দিয়ে ফেন খেতে বেশ লাগে মা! আমি বাপের বাড়ীতে খেতাম!

সেদিনকার ফেন মণিমালার অশ্রুতেই লবণাক্ত হইত।

সোহাগীর পরিবার কাপড় নাই। সে বাপের দেওয়া তোলা ভালো কাপড়গুলি আটপৌরে করিয়াছে। প্রসাদী বলিল—মা সোহাগী, অমন ভালো কাপড়গুলো পরে পুরোণো করছ কেন মা?

সোহাগী হাসিয়া বলিল—পরে' নি বড়মা, কোন্‌দিন আবার মরে যাব।

এমনি করিয়া নিজেদের দারুণ দারিদ্র্যকে ঐশ্বর্য্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখালের সংসার চলিতেছিল।

(৬২)

একদিন দুপ্রহরে ঠাকুরবাড়ীর তিনকড়ি-পূজারী দুই থালা রাধাকান্তর প্রসাদ আনিয়া মণিমালার ঘরের পিঁড়ায় দুম করিয়া নামাইল। মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—এ কার প্রসাদ তিনকড়ি?

—পেসাদী-মাসীর আর বিন্দি-বষ্টমীর। ঠাকুরবাড়ীতে পেসাদী-মাসী রাঁধুনী আর বিন্দি পাটকরণী হয়েছে যে।

—তা তাদের প্রসাদ আমার বাড়ীতে কেন?

—তারা এখানেই দিতে বলেছে।—বলিয়া তিনকড়ি চলিয়া গেল।

একটু পরেই প্রসাদী ও বিন্দি আসিল।

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল—তোদের আজ পেসাদ এল যে?

বিন্দি হাসিয়া বলিল—আমরা যে ঠাকুরের সঙ্গে স্বয়ম্বরা হয়েছি বৌ! আমি বৃন্দে, আমার সঙ্গে রাধাকান্তর ত অনেক কালের ভাব—সবাই সেটা নিয়ে কম কানাঘুষো করে কি? আর উনি প্রসাদী; উনিও রাধাকান্তরই!

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে লেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥

মণিমালা আজ আর হাসিতে পারিল না। বলিল—তোমাদের পেসাদ আমার বাড়ীতে দিয়ে গেল কেন?

বিন্দি বলিল—আমারও মা মরে গেছে, পেসাদীরও মা মাপ গেল; আমরা দুটোতে এক একটা ভিটে আগলে পড়ে থাকি, লোকের প্রাণে তা সয় না, কত কি বলে। তাই আমরা ঠিক করেছি আজ থেকে আমরা তোমাদেরই, এই বাড়ীই আমাদের বাড়ী। আমরা অনাথ, আমাদের একটু আশ্রয় দিতে হবে বৌ।

কোন্ বিধি সিরজিল স্রোতের শেয়লি।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
তুমি মোরে যদি প্রভু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

মণিমালার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। সে বুঝিল যে, যাহা সে এত যত্নে গ্রামের লোকের নিকট লুকাইয়া চলিতেছিল, এই দুটি ব্যথার

ব্যথীর কাছে সে তাহা গোপন রাখিতে পারে নাই। ইহারা দুজনে পরামর্শ করিয়া ঠাকুরের সেবার কাজ স্বীকার করিয়াছে শুধু তাহাদের অন্নকষ্ট মোচন করিবার জন্য। প্রত্যহ ইহাদের দুজনের যে "বাড়া" আসিবে তাহাতে তিন চার জনের খাওয়া অনায়াসে চলিয়া যাইবে।

বিন্দি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌ, তোর কি চোখের জল ফুরোয় না? তুই কতই কাঁদতে পারিস্!—

ওরে, চোখের জল কি সস্তা?
খাঁটি সোনা বিলিয়ে দিলি যেন রাং কি দস্তা!

মণিমালাকে আজ আর কিছুতেই হাসাইতে না পারিয়া বিন্দিও কাঁদিতে বসিয়া গেল। প্রসাদী ত আগে হইতেই চোখ মুছিতেছিল।

(৬৩)

নারাণদাসীকে আসিতে দেখিয়া মুক্তামালা তাড়াতাড়ি ঘরে উঠিয়া গিয়া চোখ মুছিল।

—নারাণদাসী আসিয়া মণিমালাকে ডাকিয়া বলিল—ওগো ও নাতবৌ, শুনেছ? তোমার মামাশ্বশুরের যে বিয়ে!

মণিমালা মুখে হাসি টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া ব্যগ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল—কোথায় রাঙা-দিদি, কবে ঠিক করলে?

—রাইপুরের অক্রূর-গোসাঁই বড় ধরে বসেছে; এই মাসেই বিয়ে হবে। বিয়েটি কিন্তু তোমাদের দিয়ে দিতে হবে বাছা! ওর বাপ নেই, আমি কোত্থেকে খরচ-পত্তর করব? তোমাদেরই ত এ কর্ত্তব্য!

—আর কিছুদিন অপেক্ষা কর রাঙা-দিদি। ভূপাল আমার মানুষ হোক, রোজগার করুক, আমাদের তখন কিছু বলতে হবে না।

—ভূপাল গৌরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবে। তোমরা গৌরের বিয়ে দিয়ে দাও।

কথাটা রাখালের কানে গেল। রাখাল সেখানে আসিয়া বলিল—গৌরকে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করলাম তাতে তুমি বাধা দিলে; স্কুল ছাড়াতে বারণ করলাম, শুনলে না; বিয়ের সব নিজে ঠিক করলে—আমরা জানলাম না কার মেয়ে, কেমন মেয়ে। কিন্তু তার বিয়ে দিয়ে দিতে হবে আমাদের। কেন? আমাদের গরজ?

শুকনা খড়ে আগুন লাগার মতন নারাণদাসী জ্বলিয়া উঠিল—গরজ নয়ই বা কেন? সাতগুষ্টিতে খেয়ে গতর বাড়িয়েছেন, বুকের ওপর চেপে বাস করছেন, এততেও গরজ হয় না? আচ্ছা, দেখে নেবো গরজ হয় কি না!

নারাণদাসী ফরফর করিয়া রাখালের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়া আপনার বাড়ীর রকে বসিয়া তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

কান্না শুনিয়া গৌর ছুটাছুটি বাড়ী আসিয়া যখন মায়ের কাছে শুনিল যে তাহারই বিবাহের নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল এই অপরাধে রাখাল তাহার মাকে তাহাদেরই দেওয়া জায়গা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, প্রজা হইয়া জমি-দারকে অপমান করিয়াছে, এবং হয় রাখালের নিকট হইতে ঐ জমির মূল্য লওয়া নয়ত চালা কাটিয়া তাহাকে উচ্ছেদ করা গৌরের মাতৃভক্তি থাকিলে একান্ত কর্ত্তব্য, তখন গৌর সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া রাখালকে অধার্ম্মিক চোর হিংসুক শত্রু বলিয়া গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল।

রাখাল ব্যথিত হইয়া বলিল—গৌর, তোমায় যে আমি মুখের গ্রাস খাইয়ে এত বড় করেছি! তুমি আমাকে গালাগালি দিয়ো না!

গৌর রাখালের প্রদত্ত খাবারকে এমন একটা দ্রব্যের সঙ্গে তুলনা করিল, এবং রাখালের খাবারে সে এমন একটা কথার আরোপ করিল যে রাখাল স্তম্ভিত হইয়া গেল।

তাহার পর গৌর তর্জ্জন করিয়া বলিল—হয় জমির দাম দেওয়া হোক, নয়ত সে জুতা মারিয়া তাহার জমি হইতে চালা কাটিয়া উঠাইয়া দিবে।

রাখাল ব্যথিত স্বরে বলিল—জুতো মারতে চাইলে যখন, তখন মারাই হল। কিন্তু গৌর, পায়ের দিকে চেয়ে দেখ, ও জুতো আমারই দেওয়া! জমির দাম চাচ্ছ? তোমার বাবা আমাকে অমনি বাস করতে দিয়েছিলেন; কারণ, তোমার বাবা আমার মায়ের মামা; তারপর, তোমার মা আপত্তি করাতে তাঁকে আমি দাম দিয়েছি, তাঁর টিপসই-করা দলিল আছে। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতে। আর তুমিই কি সেসব জানো না?—তুমি ত আর কচি খোকাটি নও।

—ওসব ফাঁকির কথা আমি শুনিনে। মাকে টাকা দিয়েছ, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করতে হয় কোরো। আমি তখন নাবালক ছিলাম; আমার বিষয় বিক্রীর অধিকার মায়ের ছিল না। আমি এখন সাবালক হয়েছি, আমার জমির দাম আমি চাই!

রাখাল ক্ষুব্ধ ও হতাশ হইয়া বলিল—দাম দেবার সঙ্গতি আমার এখন নেই। ভূপাল তোমার ঋণ শোধ করবে। আর যদি ততদিন স্বর না সয়, তোমার যা খুসী করতে পার।

মণিমালার গহনা সব পেটের দায়ে কতক বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, কতক বন্ধক পড়িয়াছিল। কেবল পুঁজি ছিল সোহাগীর আর বিভার গহনা। প্রাণ থাকিতে তাহাদের নিরাভরণ করিতে তাহারা পরিবে না বলিয়াই রাখাল ও মণিমালা সেগুলি এতদিন ছোঁয় নাই। আজ সোহাগী আপনার গা হইতে গহনাগুলি খুলিয়া শ্বশুরের সামনে রাখিয়া বলিল—বাবা, এই দিয়ে ওদের ধার শোধ করে ফেলুন।

রাখাল ও মণিমালা সজল চক্ষে সোহাগীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারা কিছু বলিবার আগেই গৌর তাড়াতাড়ি গহনাগুলি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল—মায়ের দস্তখতি দলিলটা দিও, কাল আমিও তাতে সই করে দেবো।

গৌর জমির দ্বিগুণ দামের গহনা লইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়াও রাখাল বা মণিমালা গৌরকে কিছু বলিতে পারিল না। তাহারা সোহাগীর চিবুক স্পর্শ করিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া নীরবে চোখের জল মুছিল।

প্রসাদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বাড়ী হইতে একটা বাক্স হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সোহাগীকে ডাকিয়া বলিল—বৌমা শোনো।

সোহাগী কৌতূহলী হইয়া তাহার কাছে গিয়া বসিয়া বলিল—কি বড়মা?

প্রসাদী বাক্স খুলিয়া আপনার সমস্ত অলঙ্কার দিয়া সোহাগীকে সাজাইয়া মুখচুম্বন করিল। সোহাগী লজ্জিত হইয়া প্রসাদীর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—এ কি করছ বড়মা?

প্রসাদী কৃতার্থতার সন্তোষ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিমুখে বলিল—আমার বৌমাকে আমি যতুক দিলাম। বাক্সর মধ্যে পড়ে পচছিল, আজ সোনার অঙ্গে উঠে সোনা সার্থক হল।

বিন্দি বলিল—এস বৌমা, বাকীটুকু আমি সাজিয়ে দি।

বিন্দি সোহাগীর সিঁথিতে সিঁদুর ও পায়ে আলতার হাসি উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল—এইটুকু নিয়ে তুমি সুখে থেকো!

দুঃখে সুখে আনন্দে রাখাল ও মণিমালা কাঁদিল হাসিল।

(৬৪)

ছেলে যখন রুখিয়া রাখালের সহিত ঝগড়া করিতে গেল তখন ব্যাপার কতদূর গড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য নারাণদাসী পাঁচিলে মই লাগাইয়া মইয়ের উপরে দাঁড়াইয়া পাঁচিলের উপর শুধু চোখ দুটি তুলিয়া রাখালের বাড়ীতে আড়ি পাতিয়া দেখিতেছিল। সে যখন দেখিল তাহার পুত্র সোহাগীকে একেবারে নিরাভরণ করিয়া বিজয়ীর যোগ্য লুণ্ঠন লইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন আনন্দের আতিশয্যে তাহার পা এমন কাঁপিতেছিল যে মইয়ের উপরে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। নারাণদাসী নামিতে যাইতেছে এমন সময় দেখিল প্রসাদী একটা বাক্স লইয়া আসিল। আর তাহার নামা হইল না। কৌতূহলে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর যখন দেখিল সর্ব্বনাশী প্রসাদী নিজের হাতে এক-একখানি করিয়া সমস্ত গহনা সোহাগীকে পরাইয়া দিল, তখন এক-একখানি গহনার স্বর্ণকান্তি তপ্ত আঙারের ন্যায় নারাণদাসীর অন্তর পুড়াইয়া তুলিতে লাগিল, একএকখানি গহনার রজত-আভা প্রলয়সূর্য্যের ন্যায় তাহার দৃষ্টি ঝলসাইয়া দিতে লাগিল। সে রাখালের লাভের কপাল দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া তাহাদের উপর ত রাগ করিলই, প্রসাদী ও বিন্দির উপরও তাহার চিরকালের রাগ মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল। সে মনে করিল—প্রসাদী আর বিন্দির রাখালের উপর এত যে টান, তাহারা সর্ব্বস্বই যে ইহাদের ঢালিয়া দিতেছে, তাহার নিশ্চয় একটা মস্ত-রকম হেতু আছে। পাড়ায় সেই হেতুটা প্রচার করিবার প্রচুর আনন্দে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নারাণদাসী মই হইতে নামিয়া পড়িল।

গৌর বাড়ী আসিয়া গম্ভীরভাবে ঘরে ঢুকিল।

নারাণদাসী বলিল—গৌর, কি আনলি দেখি।

গৌর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল—কি আবার আনব?

—আ মর অপ্পেয়ে, আমি কি দেখিনি? সোহাগীর গায়ের গয়না যে নিয়ে এলি।

গৌর দেখিল তাহার মা জ্যোতিষ জানে, নতুবা অমন চুপে চুপে অত সহজে যে ব্যাপারটা হইয়া গেল তাহার সন্ধান মা জানিল কিরূপে? গৌর বলিল—নিয়ে এলাম ত নিয়ে এলাম, তাতে তোমার কি? ও আমি তোমায় দেবো না।

—আরে মোলো, আমার বুদ্ধিতেই ত পেলি!

—ও আমার জমির দাম, আমি নেবো। তুমি ত একবার নিয়েছ।

এমনি করিয়া গহনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে গিয়া মায়ে পোয়ে এককথা দুকথায় মহা কলহ বাধিয়া গেল। অবশেষে গৌর এক বাঁশ লইয়া মাকে তাড়া করিয়া বলিল—বেরোও আমার বাড়ী থেকে। এ সব আমার!

"সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো!" নারাণদাসী বাড়ী ছাড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

নারাণদাসী সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় রাখালের উপর প্রসাদী ও বিন্দির টানের হেতু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মনটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া যখন রাত্রি একপ্রহরের সময় বাড়ী ফিরিল তখন দেখিল সদর দরজায় চাবি। সন্ধান লইয়া জানিল অক্রূর গোসাঁই আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে গৌর গহনা বিক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছে, কলিকাতা হইতে রাইপুরে বিবাহ করিতে যাইবে।

তখন নারাণদাসী কাঁদিয়া আসিয়া রাখালের বাড়ীতে পড়িল—পেটের ছেলে আমার এমন খোয়ার করলে! আমায় একবার বললে-না কইলে-না, অমনি একলা বিয়ে করতে চলে গেল! আমি এখন আথান্তরে পড়েছি, আমি কোথায় দাঁড়াই রাখাল?

রাখাল বলিল—রাঙা-দিদি, এ বাড়ী তোমারই। তুমি এখানেই থাক।

মণিমালা ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া গম্ভীর হইয়া শুধু বলিল—এস রাঙা-দিদি।

নারাণদাসী বলিল—লক্ষ্মীশ্বর হয়ে বাপ-বেটায় বেঁচে থাকো। তোমরা শাশুড়ী-বৌএ পাকা-চুলে সিঁদুর পর, হাতের লোহা ক্ষয় যাক! তোমাদের ভরসাই ত আমি বেশী করি।

ঘরের মধ্যে সোহাগী হাসিয়া চুপিচুপি বিভাকে বলিল—ঝিমা গালও দিতে যেমন, আশীর্ব্বাদ করতেও তেমন—একেবারে কল্পতরু!

প্রসাদী বলিল—মুখের কথা বৈ ত নয়, পয়সা ত লাগে না!

বিভা বলিল—বাবার দয়াতেই ত খেয়েছে। আমরা হলে ঝাঁটা মেরে দিতাম খেদিয়ে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হত!

বিন্দি গুনগুন করিয়া গাহিল—

পায়েও পড়ি কামড় মারি আমি যে ডালকুত্তা।
নাই দিওনা বাড়বে বড়াই, পত্তি আমার জুত্তা!

(৬৫)

রাখালের পরিবার বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং তাহাতে খরচ বাড়িতেছে আয় কমিতেছে। ভূপাল এখন এম-এ ও ল পড়ে; তাহার খরচ সংগ্রহ করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর সোহাগীর সন্তান-সম্ভাবনা হইয়াছে। সোহাগীর বাবা মারা গিয়াছে; তাহার কাছে যে সামান্য কিছু পাওয়া যাইত তাহা বন্ধ হইয়াছে। গৌর বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে এক মাস-শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, সেই গৌরের ঘরকন্নার কর্ত্রী হইয়া বসিয়াছে, নারাণদাসী সে-বাড়ীতে আর প্রবেশের অধিকার পায় নাই। গৌরকে নারাণদাসী যখন জিজ্ঞাসা করিল তাহার দিন চলিবে কেমন করিয়া, তখন গৌর মাকে বৃন্দাবনবাসের সৎপরামর্শ দিল। কাজেই নারাণদাসী এখন রাখালেরই পোষ্যের মধ্যে।

কাঙালী জমিদারী-সেরেস্তার চাকরী করিতে-করিতে অনেক টাকা চুরি করিয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছে। সে একদিন রাখালকে বলিল—রাখাল, তুমি বই লেখ, আমি নিজের খরচে ছেপে প্রকাশ করব; তার পর যা লাভ হবে তোমার আমার অদ্ধা-অদ্ধি।

রাখাল যেন অকূল সমুদ্রে অবলম্বন পাইল। কাঙালী

যে তাহাকে দুঃখের সময় সাহায্য করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহার জন্য রাখালের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। রাখালের অনেকগুলি বই লেখা ছিল; কাঙালীকে সেইগুলি দিল।

কাঙালী সেগুলি ছাপাইয়া টাইটেল-পেজের প্রুফ দেখাইয়া রাখালকে বলিল—দেখ ভাই রাখাল, আমার ইচ্ছে যে আমারও নামটা লেখকের স্থানে দিয়ে দি—তা হলে আর পৃথক লেখাপড়া কিছু করতে হবে না, যা লাভ হবে তা আমরা পুরুষানুক্রমে অদ্ধা-অদ্ধি করে পাব, আমাদের ছেলেপিলেদেরও কোনো গণ্ডগোল হবে না।

রাখাল লজ্জায় পড়িয়া অস্বীকার করিতে পারিল না; কাঙালী বইএর প্রুফ পর্য্যন্ত না দেখিয়াও লেখকের নাম লইতে চাহিতেছে দেখিয়া তাহার যেমন একটু বিরক্তি হইতেছিল, তেমনি কাঙালী নিজে উপযাচক হইয়া তাহার লেখা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া তাহার খ্যাতি-বিস্তারের ও আয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে এই কৃতজ্ঞতাও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং রাখাল ও কাঙালী দুজনের নামেই বই বাহির হইল।

বই প্রকাশ করিয়া কাঙালী বিজ্ঞাপনে লেখকের নামের স্থানে শুধু নিজের নামই প্রচার করিতে লাগিল, রাখালের নাম চাপা পড়িয়া গেল।

রাখাল মনে করিল, যাক, নাম লইয়া কি করিব, আমার বই ত দপ্তরে বাঁধা বন্ধই ছিল, কাঙালীই উদ্যোগ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে। আমার কিছু টাকা পাইলেই হইল।

দু-তিনখানা বইএর প্রথম সংস্করণ চট করিয়া বিক্রয়ও হইয়া গেল। রাখাল কাঙালীকে বলিল—কাঙালী-দা, হিসেবটা একবার দেখলে হত না?

কাঙালী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তোমায় কি আমি টাকা দিইনি?

রাখাল তুচ্ছ টাকা লইয়া হিসাব-নিকাশ করিতে চাহিতেছে এই চিন্তাতে লজ্জিত হইয়া বলিল—কৈ, বোধ হয় দাওনি।

—তুমি ভালো করে মনে করে দেখো ত?

—না, আমার ভালো-রকমই মনে আছে।

—তা হবে তবে। নানান্ ঝঞ্ঝাটে কাকে কি দিচ্ছি না-দিচ্ছি মনে থাকে না। আচ্ছা, একটু ফুরসৎ পেলেই আমার খাতা-পত্তর দেখবো।

রাখাল সেই সুসময় আসিবার প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে।

এইসময় হৃদরোগে হঠাৎ রাণী জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু হইল। অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি দেশে প্রস্থান করিল। কুবেরে আসিয়া গজভুক্ত কপিত্থের ন্যায় কলিকাতার বাড়ীটি দখল করিয়া বসিল। ভূপাল কালেভদ্রে যে দশ বিশ টাকা দিদিমার নিকট হইতে পাইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

দুঃখ বিপদ একলা আসে না। অনাহারে পরিশ্রমে ম্যালেরিয়ায় সোহাগীর শরীর জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; মাতৃত্বের গুরু বেদনা সে সহ্য করিতে পারিল না, সূতিকা-গৃহে সে সজল চক্ষে "মা, একটিবার ওকে দেখতে পেলাম না" বলিয়া মণিমালার কোলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

বিভা বিধবার মতনই ছিল, এবার সে সত্যসত্যই বিধবা হইল।

ভূপালের আর পড়া চলিল না। তাহার চাকরী না করিলেই নয়।

সে বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাইবে, সেই চিঠির মাশুল দিবার পর্য্যন্ত সঙ্গতি নাই। তাহার পঞ্জরের ন্যায় বুকের নিতান্ত নিকটের প্রসাদীর-দেওয়া সোহাগীর গহনা একএকখানি করিয়া হস্তান্তর হইয়া যাইতে লাগিল।

রাখাল বারবার তাগাদা করিয়া কাঙালীকে জেদ করিতে লাগিল তাহার বইএর হিসাব মিটাইয়া দিতে হইবে।

কাঙালী বলিল—এই যে ভাই, হিসেব ঠিক করে রেখেছি। প্রত্যেক বই হাজার কপি করে ছাপা হয়েছিল। তা থেকে আমাদের গল্পের বইখানার তুমি নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের দিয়েছ পঞ্চাশ, আমি দিয়েছি সাতষট্টি; দুশো তেরোখানা বই দপ্তরীর বাড়ীতে উইএ খেয়েছে, দপ্তরী গরিব-মানুষ কাঁদা-কাটা করছে, ওটা আমাদেরই লোকসান গেল; বিক্রী হয়েছে বাকি ৬৭০, একটাকা হিসেবে ৬৭০

টাকা। তা থেকে বুকসেলার্স কমিশন শতকরা ২৫ টাকা হিসাবে ১৬৭৸০ আর প্রকাশকের প্রাপ্য অর্দ্ধেক ৩৩৫ টাকা বাদ দিয়ে থাকে ১৬৭৸০ টাকা; আমরা দুজন গ্রন্থকার সেই টাকাটা অদ্ধা-অদ্ধি পাব—তা হলে তোমার পাওনা হল ৮৩৸০। আর আমাদের উপন্যাসখানারও ঐ-রকমই তোমার পাওনা হবে। স্কুলের বইখানার ৪০০ কপি বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; সেটা আর-একবার দেখে যদি নাই পাওয়া যায় ঐ ৬০০ বই বিক্রী ধরেই হিসেব করতে হবে। শিগগিরই করে দেবো। তোমার যদি টাকার বিশেষ দরকার থাকে আগাম কিছু নিতে পার।

এই কথাতেই রাখালের মনের সমস্ত বিরক্তি দূর হইয়া গেল। কাঙালী যে শাঁখের করাতের মতন যাইতে আসিতে তাহার পাওনা কাটিয়া কমাইয়া দিল, নষ্ট বইএর জন্য যে প্রকাশকই দায়ী এবং কাঙালী যে প্রকাশক ও গ্রন্থকার দুই রূপে দুবার নিজে লইল, এসব রাখাল আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। একজন ভদ্রলোককে মুখের উপর চোর প্রবঞ্চক বা জুয়াচোর কি কখনো সে বলিতে পারে? তাহার উপর এই দারুণ অভাবের সময় কাঙালী তাহাকে যাহা হাতে তুলিয়া দিল তাহাই পরম উপকার করিল মনে করিয়া রাখালের মন কৃতজ্ঞতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই কটি টাকায় আর কদিন চলে? আবার অভাবের বিভীষিকায় রাখাল মুষড়িয়া পড়িল।

বার বার আঘাতে রাখালের বুক ভাঙিয়া গিয়াছিল। সে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজে যে কি-রকম বঞ্চিত হইয়াছে ও ঠকিয়াছে, তাহা সে এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। সে নিজের অক্ষমতায় ও নিষ্ফলতায় স্ত্রীপুত্রকন্যার নিকট কুণ্ঠিত লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। তাহার উপর পরের মেয়ে সোহাগীকে যখন হাসিমুখে সকল দুঃখ সহ্য করিতে দেখিত তখন রাখালের অন্তর শতধা বিদীর্ণ হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিত। মণিমালা রাজার মেয়ে, তাহার হাতে পড়িয়া উহার কি দুর্দ্দশা! প্রসাদীর জীবনটাকেও ব্যর্থ করিল ত সে-ই। দুধের মেয়ে বিভা, তাহাকে চিরদুঃখিনী করিল সে-ই। ইহার উপর লোকের অকৃতজ্ঞতা, নারাণদাসীর ও গৌরের কুব্যবহার, গ্রামের লোকের কাছে হেয় হইবার আশঙ্কা, সর্ব্বোপরি দারুণ দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পীড়ন রাখালের হৃদয় একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর যখন সোহাগী তাহাদের বুকে শেল হানিয়া একবুক অতৃপ্তি লইয়া মরিয়া গেল, বিভা বিধবা হইল, শেষ আশ্রয় ও নিরাশার সম্বল রাণী জগদ্ধাত্রীও মরিয়া গেলেন, তখন সে-দুঃখ রাখালের মতন অতিবলিষ্ঠ তেজস্বী লোকের পক্ষেও অতিরিক্ত হইয়া উঠিল। বালক ভূপালের লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গেল, সে কোথায় কেমন করিয়া একটু আশ্রয় একটু অবলম্বন পাইবে তাহা ভাবিয়াও নির্ণয় করিবার কোনো উপায় দেখা যাইতেছিল না। রাখাল আর হাসে না, রাখাল কাঁদে না, রাখাল কাহারও সহিত কথা বলে না,—ভোর হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘরের কোণে বসিয়া কেবল পূজা পাঠ ধ্যান জপ করে; পাঁজি আর জ্যোতিষের বই লইয়া অদৃষ্টের সন্ধান করে; আর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া শুধু ভাবে আর ভাবে।

আহার পাইবার সম্ভাবনা যত কম হইয়া উঠিতেছিল, রাখালের পূজা আরাধনা ভগবানে নির্ভর ও আত্মসমর্পণ তত বাড়িয়া চলিয়াছিল।

সেদিন রাখাল পূজা পাঠ শেষ করিয়া আসনের উপর তখনো চুপ করিয়া ফ্যালকা-মুখো হইয়া বসিয়া ছিল। জপের মালা তখনো হাতে রহিয়াছে।

মণিমালা আসিয়া ডাকিল—অত ভাবছ কেন? খাবে এস।

রাখাল শূন্য দৃষ্টিতে মণিমালার দিকে চাহিয়া-চাহিয়া উদাস ভাবে বলিল—খাব? কি খাব? আমি ত খাবার কিছু জোগাড় করিনি কখনো!

—তুমি অত ভাবছ কেন? ভূপাল বেঁচে থাক, আমাদের দুঃখ কি?

—ভূপাল? আমার সব গেছে, ভূপালই কি বেঁচে আছে?

মণিমালার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে বুঝিল তাহার অমন জ্ঞানবান স্বামী জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছে; তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিতেছে।

মণিমালা চীৎকার করিয়া ভূপালকে ডাকিল।

ভূপাল তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল—বাবা, এই যে আমি, আমি আপনার ভূপাল!

রাখাল হতাশ ভাবে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি আমার ভূপাল নও! তুমি কাঙালী, ভূপালের মুখোস মুখে দিয়ে আমায় ঠকাতে এসেছ! আর আমি ঠকছিনে!

মণিমালা কাতর হইয়া বলিল—আমাকে ত চিনতে পারছ? আমি ত তোমার মণি!

রাখাল তেমনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল—তুমি চন্দনমণি!

বিভা আসিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল—বাবা বাবা, আমি ত তোমার বিভা!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া রাখাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হাঁ তুই বিভা, আমি তোর সর্ব্বনাশ করেছি, তোকে আর চিনতে পারব না?

—বাবা, আমার অদেষ্টে ছিল, তুমি কি করবে। উঠে খেতে এস।

—তুই যে আমাকে বিষ খাওয়াবি, তোর হাতে আমি খাব না।

দুঃখের উপরে এ এক দুর্দ্দৈব, রাখালকে খাওয়ানো দুষ্কর হইয়া উঠিল। কাহাকেও সে আর বিশ্বাস করিতে পারে না, কাহাকেও সে আর চিনিতে পারে না। সে সর্ব্বদা ঘরের এক কোণে অন্ধকারে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকে, আর হয় পূজা করে, নয় পাঁজি দেখে। বাহিরের কোনো লোকের সাড়া পাইলে বলে—আমাকে লুকোও লুকোও, ও আমাকে মারতে এসেছে—আমি বোধহয় ওর কিছু উপকার করেছিলাম!

এ দৃশ্য আর চোখে দেখা যায় না। একদিন যাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছে, রাজার ন্যায় ভয় করিয়াছে, গুরুর ন্যায় যাহার নিকট হইতে সর্ব্বদা জ্ঞান-উপদেশ পাইয়াছে, যাহাকে পরম দৃপ্ত তেজস্বী বলিষ্ঠ দেখিয়াছে, তাহাকে আজ এমন নির্জীব জ্ঞানশূন্য হীন অবস্থায় দেখিতে বুক যেন ফাটিয়া যায়। ভূপাল সোহাগীর শোকে জর্জ্জরিত হইতেছিল, তাহার উপর পিতাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আর সে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না।

মণিমালা বলিল—ভূপাল, কুবেরকে একখানা চিঠি লেখ। সে যদি কিছু এখন দ্যায় তা হলে ওঁর চিকিচ্ছে করাতে পারি।

ভূপাল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—না মা, অন্যের কাছে ভিক্ষে চাইব, কিন্তু ওর কাছে নয়।

মণিমালা তখন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরে লুকাইয়া বিভাকে দিয়া কুবেরের নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া চিঠি লেখাইল।

কিন্তু কুবের কোনো জবাবই দিল না।

আজকাল খাওয়া একরকম বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। মণিমালা আবার নিজের জবানী চিঠি লেখাইল। সেও অনেক দিন হইয়া গেল, জবাব আসে নাই।

আজ কাহারো কিছু খাওয়া জুটে নাই। বেলা তিন-প্রহরের সময় ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদী ও বিন্দির প্রসাদ আসিবে, তখন তাহাই সকলে ভাগ করিয়া খাইবে। ভূপাল দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়া বসিয়া আছে। অধর পিয়ন আসিয়া ভূপালের সামনে দুখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল।

ভূপাল চিঠি দুখানি পরম আগ্রহে তুলিয়া লইয়া দেখিল একখানি তাহার মাকে কুবের লিখিয়াছে, অপরখানি অপরিচিত হাতের লেখা, তাহার নামে।

কুবেরের চিঠি খুলিয়া ভূপাল মাকে পড়িয়া শুনাইল, কুবের লিখিয়াছে—"শ্রীচরণকমলে প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন, আপনার চিঠি পাইয়াছি। আমি জানি আপনারা ষ্টেট হইতে চল্লিশ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছেন, অতএব আমার নিকট আর কিছু আশা করিবেন না। ইতি সেবক শ্রীকুবেরচন্দ্র রায়।"

এই দারুণ দুঃখের উপর এই অপমান দেখিয়া মণিমালার হাসি আসিল।

ভূপাল বলিল—কেমন মা? আর ভিক্ষে চাইবে? আমরা সমস্ত দিন উপোষ করে একবেলা পরের দেওয়া প্রসাদ দুটি খেতে পাই, আর ওটা লিখেছে কিনা যে আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা আছে! আমার মা-বাবা কি ওদের মতন চোর! থাকত সামনে ও......

মণিমালা চোখ রাঙাইয়া বাধা দিয়া বলিল—চুপ কর্ ভূপাল, ও তোর মামা!

ভূপাল নিরস্ত হইয়া দ্বিতীয় চিঠির খাম খুলিয়া দেখিল ষাট টাকা মাহিনায় নয়াসরাই স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে নিয়োগের পত্র আসিয়াছে। ভূপাল যেন সাম্রাজ্য লাভ করিল। একদিন বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইবে বলিয়া রাজা ধনেশ্বর যাহার নাম ভূপাল রাখিয়াছিলেন, সে আজ ষাট টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টারী পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল।

সে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মা, আমার চাকরী হয়েছে!

তারপর হাসিমুখে ছুটিয়া রাখালের কাছে গিয়া বলিল—বাবা বাবা, আর আমাদের দুঃখ থাকবে না! আমার ষাট টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে!

মণিমালা, বিভা, প্রসাদী, নারাণদাসী, বিন্দি সকলে হাসিতে-হাসিতে সেখানে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

রাখাল তখন পূজার আসনে বসিয়া ফুল-তুলসীতে চন্দন মাখাইয়া নারায়ণের চরণে দিতে যাইতেছিল। ভূপালের কথায় রাখালের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অনেক দিন পরে একটু হাসির রেখা তাহারও মুখে ফুটিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া ভূপাল চাকরী পাওয়ার চেয়েও আনন্দিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণধূলি মাথায় লইল। রাখাল নারায়ণের নির্ম্মাল্য লইয়া পুত্রের মস্তকে স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য হাত বাড়াইল,—কিন্তু হাত কাঁপিতে কাঁপিতে ভূপালের মাথা হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাখালের প্রাণহীন দেহ নারায়ণের টাটের সম্মুখে পুষ্পপাত্রের উপর ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

(সমাপ্ত)

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা-পদ্ধতি

(Emile Senartএর ফরাসী হইতে)

জাতের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় সমস্যাটি অনেকবার আলোচিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন দিক্ দিয়া। এই সম্বন্ধে আলোচনার অনেকগুলি পদ্ধতি উপস্থাপিত হইয়াছে। আমি বোধ হয় এক্ষণে অসংকোচে ঐ-সকল পদ্ধতির ফর্দ্দটাকে সংক্ষিপ্ত করিতে পারি।

যে ভূমির উপর এই সমস্যাটি প্রতিষ্ঠিত সেই ভূমি সম্বন্ধে মনোযোগসহকারে যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত আলোচনা না হওয়ায় জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-সকল অতীব সাধারণ ও দ্রুত ধরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেই-সকল ব্যাখ্যা প্রথমেই আমি দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি।

খুব সম্প্রতি, জাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য যে-সকল চেষ্টা হইয়াছে, সেই-সকল চেষ্টাকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; দৃষ্টান্তের দ্বারা, সেই-সকল চেষ্টার গতি কোন্ দিকে, তাহা দেখাইতে পারিলেই আমি যথেষ্ট মনে করি। ইহা একটা সাদাসিধা কৌতূহলমাত্র নহে। এইরূপ সরাসরিভাবে আলোচনা করিবার সময় আলোচনা-ভূমি হইতে অনাবশ্যক জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ফেলিবার অবসর হইবে এবং পথে চলিতে চলিতে একটার পর একটা বাদ দিয়া সম্ভবপর সিদ্ধান্তের দিকে আমরা ক্রমশ অগ্রসর হইব।

হিন্দুরা দুই জিনিসকে—শ্রেণী ও জাত, এই দুই সংজ্ঞাকে মিলাইয়া মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছে, আমরাও তাহাদের কথা সহজে মানিয়া লইয়া ভুল পথের অনুসরণ করিয়াছি। আমি বিশেষরূপে "ইণ্ডিয়ানিষ্ট"দের লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। শব্দশাস্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি যাঁহারা তাঁহারা অন্য দিক্ ছাড়িয়া কেবল চিরাগত প্রথার দিক দিয়াই এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় একটা বিশেষ দিকে অনিবার্য্যরূপে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণিক মতবাদই

তাঁহাদের নিজস্ব আব্-হাওয়া। সাহিত্যিক কাল-তত্ত্ব হইতেই প্রায় তাঁহারা যাত্রা আরম্ভ করিয়া থাকেন।

একটা মূলসূত্র অনুসরণ করিয়া (মনে হয় যেন স্বতঃসিদ্ধ) তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই একটা নিশ্চিত তথ্য বলিয়া এই কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, সাহিত্যিক লিপি-নিদর্শনাদির পরিণাম-ফল, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ঠিক অনুরূপ, এবং সাহিত্যিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশেরও অবস্থা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেদের ব্রাহ্মণাংশ যাহা কাল-পর্য্যায়ের হিসাবে, বৈদিক সূক্তদিগের সহিত অধিকতর নৈকট্যসূত্রে আবদ্ধ, সেই ব্রাহ্মণ গ্রন্থাদিতে এমন কিছু থাকিতে পারে না যাহা সূক্তাশ্রিত বিষয়ের স্বাভাবিক অনুবন্ধ বা পরিপুষ্টি নহে। ইহা হইতেই এই উভয়-সংকট। হয়—জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বেদ সাক্ষী, নয় জাত্‌টা সেই যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে যুগে সূক্তের রচনার পর ব্রাহ্মণাংশের রচনা হয়। সূক্তের রচনার মধ্যে জাতের কোন কথা নাই,—ব্রাহ্মণাংশেই জাতের কথা আছে এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে। উহার অনুবন্ধ-স্বরূপ প্রায়ই মৌনভাবে আর একটি সিদ্ধান্ত এইরূপ জুড়িয়া দেওয়া হয় যে, সূক্তাদি হইতে যে-সকল মূল উপাদান স্পষ্ট-রূপে পাওয়া যায়, সেই-সকল উপাদানই জাতের উৎপত্তি সমর্থন করে।

আমি যতদূর জানি, কেহই এই আনুমানিক সিদ্ধান্তটিকে খণ্ডন করেন নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বেদের ভিতর যে শ্রেণী বিভাগের কথা আছে, তাহা হইতেই যাত্রা সুরু করা উচিত;—কাহারও কাহারও মতে বেদের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ ও প্রমাণসিদ্ধ জাতের কথা পাওয়া যায়, কাহারও কাহারও মতে, কেবল কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীর কথা পাওয়া যায়। বৈদিক সূক্তাদির ভিতর জাতের প্রমাণ থাকা সম্বন্ধে প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের এরূপ জলন্ত অনুরাগ ও বিশ্বাস যে, সচরাচর প্রণালী অনুসারে, জাতের উৎপত্তি যে খুব আধুনিক বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়,—এ কথা উপলব্ধি করা তাঁহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিগণ সূক্তাদির মৌনতা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে সেই পুরাকালে জাতের কথাটা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল; অতএব জাতটা পরবর্ত্তীকালে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকের এক বিষয়ে মতের ঐক্য আছে—তাঁহারা উভয়েই বলেন যে, চতুর্ব্বর্ণের সহিত বর্ণভেদপ্রথার উৎপত্তি যে-বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ তাহা আদিম ও অচ্ছেদ্য।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, কতকগুলি কাছাকাছি সাদৃশ্যমূলক যুক্তি অনুসারে, একটা ব্যাখ্যা টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। পুরোহিত-সম্প্রদায়ের দাবী ও স্বার্থ, বুদ্ধি-পূর্ব্বক ও অধ্যবসায় সহকারে যে খণ্ডাংশ বিভাগ উদ্ভাবিত করিয়াছে এবং যাহা কঠোর নিয়মের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা "ধর্ম্মশাস্ত্র"রূপ বেলাউরী-কাচের মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই-সকল রচনার মধ্যে, রেখাগুলি সাধারণত একটু ক্ষীণ ধরণের। উহাদের সৌসাম্য আমা-দিগকে মুগ্ধ করিতে পারে, কতকগুলি সাধারণ ধারণার দোহাই দিয়া আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে। কিন্তু উহাতে এমন কিছুই স্পষ্ট নাই যে আমাদিগকে ভ্রম হইতে উদ্ধার করিতে পারে।

যাঁহারা হিন্দ-য়ুরোপীয় সমস্ত শব্দকোষ কতকগুলি মূল-ধাতু হইতে বাহির করিয়াছেন, সেই বিশ্লেষণের ওস্তাদেরা এবং ভাষাতত্ত্বানুসন্ধায়ী কতকগুলি পণ্ডিত—ইঁহাদের বিশ্বাস, যে-সকল ভাষার শব্দব্যুৎপত্তিতে স্বচ্ছতা আছে, সেই-সকল ভাষার ভিতরেই মানব-ভাষার প্রথম আধো-আধো কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের বিবেচনায়, সেখানকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া মূল-উৎসে উঠিতে যে পদক্ষেপ করিতে হয় তাহা নগণ্য অথবা স্বল্পগণ্য। জাত সম্বন্ধে যে-সকল ব্যাখ্যা সমুত্থিত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি এইরূপ সহজ আশাকে প্রশ্রয় দেয়। যাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত আছেন বলিয়া মনে হয়, এই মুগ্ধ আশার আক্রমণে তাঁহারাও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন।

তাহার দৃষ্টান্ত,—M. Sherring সাক্ষাৎভাবে সমসাময়িক বর্ণভেদ-প্রথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রভূত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন (Tribes and Castes in Benares)। যখন একদিন তিনি মনে করিলেন, তাঁহার মতা-মতগুলি একত্র আনিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করিবেন, "বর্ণভেদের স্বাভাবিক ইতিহাসের" ("Natural histoty of Caste", Cal. Review) সম্বন্ধে তাঁহার যে মনোভাব, তাহা

সংক্ষেপে বিবৃত করিবেন; তখন এই সমস্যাটির অবয়বগুলি তিনি এরূপ দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করিলেন যে, তাঁহার গ্রন্থের নামের ভিতর যে অঙ্গীকারগুলি ব্যক্ত হইয়াছে তাহার এক-বর্ণও মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্ব হইতেই একটা পদ্ধতি মনোমধ্যে ধারণা করিয়া রাখায়, তাঁহার সমস্ত মন্তব্য, তাঁহার সমস্ত উপলব্ধ জ্ঞান নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছে। প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষী পুরোহিতমণ্ডলী যে-ধূর্ত্তনীতির বশবর্ত্তী হইয়া জাতের সমস্ত খণ্ডাংশগুলি নিজ হাতে তৈয়ারী করিয়াছিলেন, হিন্দু-জগৎটাকে নিজ স্বার্থের অনুকূল করিয়া গড়িয়াছিলেন, শেরিং সেই নীতির ফলটাই জাতের মধ্যে দেখাইয়াছেন মাত্র!

জেস্যুইটদিগের তুলনা ও জেস্যুইটদিগের পৌরোহিত্যিক অভিসন্ধি সাধারণত এই-সকল ব্যাখ্যায় একটু অধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। আবার খুব আধুনিক শব্দতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের এক প্রতিনিধি M. Schrœderএর লেখাতেও এইরূপ দেখিতে পাই। M. Schrœder প্রথমেই ব্রাহ্মণ্যিক পদ্ধতিটাকে বাড়াইয়া তুলিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। তিনি মনে করেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি যে চতুর্বিধ বিভাগ, তাহা কেবল শ্রেণীগত পার্থক্যের অনুরূপ। ঐ-সকল বিভাগ হইতে, এবং সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ গঠনপ্রণালী হইতে জাত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে মরণোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিজয়ী প্রতিক্রিয়ার সহিত এই পদ্ধতিটি যোগসূত্রে আবদ্ধ। তাহা হইলে, জাতের আবির্ভাব-কালটা আরও কাছাকাছি আসিয়া পড়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সনাতনপন্থী তত্ত্বজ্ঞানী শঙ্করের কাল পর্য্যন্ত নামিয়া আইসে!

আমি এই-সকল আলোচনা-পদ্ধতিকে চিরাগত প্রথাশ্রিত পদ্ধতি বলিব। ইহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে, বিনা আয়াসে পুনঃ পুনঃ সংক্রামিত হইতেছে। তাহাদিগের কতকগুলি প্রণালীর মধ্যে নিপুণতার পরিচয় থাকিলেও, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, বিশেষ ফলদায়ী বলিয়া মনে হয় না। একটা দৃষ্টান্ত। Ross এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—রাজ-পুরোহিতেরা অল্প অল্প করিয়া ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করায় তাহা হইতেই গোড়ায় পৌরোহিত্যিক জাতের অভ্যুদয় হইল। এবং আর্য্যলোকেরা সমস্ত ভারত-ভূমিতে প্রসারিত হইয়া, বহু খণ্ডাংশে পরিণত হইল,—যেন চূর্ণীকৃত হইল; স্বকীয় শক্তি ও আধিপত্য সমেত রাজবংশীয়েরা তাহার মধ্যে বিলীন হইল; শুধু তাহাদের আভিজাত্যের পদটিমাত্র রহিয়া গেল; "ক্ষত্রিয়গণ" প্রাচীন রাজাদের স্থলাভিষিক্ত হইল। তাহাদের দুর্ব্বলতা হইতেই ব্রাহ্মণ-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল। জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জীভূত এইরূপ সূক্ষ্মবুদ্ধি হইতে যে মতামত নিঃসৃত হইয়াছে, সেই-সকল মতামতের অবশ্য মূল্য আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীর ইতিহাসের প্রতিই রস সাহেবের অনুরাগ ও ঔৎসুক্য লক্ষিত হয়, জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নহে।

শ্রেণীর সহিত জাতকে মিশাইয়া একাকার করাতেই, আমার মতে, সমস্তই কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কতকগুলি হেতু আমি ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি,—কি বিস্তারে, কি প্রকৃতিগত লক্ষণে, কি স্বাভাবিক প্রবণতায়, জাতটা শ্রেণীর অনুরূপ নহে। এমন-কি যে-সকল জাত কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর সহিত যুক্ত, সেই-সকল জাতের প্রত্যেকেই স্বকীয় শাখা-জাতগুলি হইতে ভিন্ন। প্রত্যেকেই কঠোর ভাবে স্বকীয় পার্থক্য রক্ষা করে, উচ্চতর একতা সম্বন্ধে কাহারও কোন চিন্তাই নাই। শ্রেণী রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়া থাকে; জাত অনুসরণ করে,—এরূপ কতকগুলি সংকীর্ণ সংকোচ-সূচক আচরণ, কতকগুলি চিরাগত প্রথা, কতকগুলি স্থানীয় প্রভাব,—যাহার সহিত সচরাচর শ্রেণীগত স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বাগ্রে, জাত এমন-একটি অখণ্ডতা রক্ষণের প্রতি আসক্ত, যাহা খুব নীচের লোকেরাও ভয়ে ভয়ে রক্ষা করিবার জন্য সতত সচেষ্ট। শ্রেণীগত সংগ্রামের সুদূর প্রতিধ্বনিই চিরাগত প্রথার মধ্যে ধ্বনিত হইয়া থাকে। তথ্যের উপর পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া-বশত এই দুই প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকেই একটা সম-স্বার্থিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। আসলে উহাদের বিশিষ্টতা কোন অংশেই কম নহে।

পুরোহিত-তন্ত্রের বিভাগ-অনুসারে লোকেরা যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, তাহা প্রায় সার্ব্বভৌম; জাতের পদ্ধতিটা একটা অনন্যসাধারণ ব্যাপার। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষ ব্রাহ্মণ এই জাতকে

নিজের কাজে যে লাগাইয়াছেন, তাহা সম্ভব। কিন্তু জাতের পদ্ধতিকে পুরোহিততন্ত্র মাত্রেরই ভিত্তি করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যদি ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদ, শ্রেণী ও জাত সংক্রান্ত দুই বিভিন্ন ধারণাকে মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়া থাকে—সেটা গৌণকল্পের ব্যাপার। ঐতিহ্যের বিচার আলোচনা করিয়া আমরা এই কথা জানিয়াছি। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বুঝিতে গেলে, উক্ত দুই-প্রকারের ধারণাকে যত্নপূর্ব্বক পৃথক্ করা উচিত; তাহার পর অনুসন্ধান করিতে হইবে, কিরূপে ঐ দুই ধারণা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত তথ্য ও আমাদের দৃষ্টি এই দুয়ের মধ্যে, পৌরোহিত্যিক আলোচনা একটা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন করিয়াছে। যে যবনিকা নাট্যদৃশ্যকে আবৃত করিয়া রাখে, সেই যবনিকাকে নাট্যদৃশ্য বলিয়া ভ্রম না করি সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ব্রাহ্মণ্যিক ধরণে, কতকগুলি বড় বড় আদিম পর্য্যায় হইতে, পর-পর খণ্ডাংশে পরিণত অসংখ্য জাতগুলাকে বাহির করা,—মনে হইতে পারে খুব সোজা। কিন্তু এটা কেন দেখা হয় না যে, এই খণ্ডাংশ-বিভাগ যে-সকল স্বার্থ ও প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত, শ্রেণীর মর্ম্মভাবটা তাহার বিরোধী। তৃণগুচ্ছের মত শ্রেণীকে ক্রমাগত একত্র আঁটিয়া কসিয়া বাঁধা—ইহাই শ্রেণীর মর্ম্ম-ভাব।

ভৌগোলিক, ব্যবসায়িক, ধর্ম্মসাম্প্রদায়িক ইত্যাদি একীকরণের বিবিধ মূলসূত্রের বশবর্ত্তী হইয়া জাত একটা সর্ব্বসাধারণ একতা স্থাপনের প্রতি প্রায়ই হতচেতন। শ্রেণীর মর্ম্মভাবটা এই যে, শ্রেণী কোন খুঁটিনাটিকে আমল দেয় না, কোন-প্রকার সংকোচকে আমলে আনে না। পক্ষান্তরে জাতের বিশেষত্ব এই যে সাধারণ এক জাত হইতে নিঃসৃত শাখা জাতগুলির মধ্যেও উহা উচ্চ বেড়ার ব্যবধান স্থাপন করে।

এই আলোচনা-পদ্ধতিগুলি সমস্তাটিকে ঠিক্ স্থানে স্থাপন করে নাই; এই পদ্ধতিগুলি এমন একটি যথেচ্ছাপ্রণোদিত মূলসূত্র অবলম্বন করিয়াছে যাহার দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না। স্পষ্টই দেখা যায় উহা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সাহিত্যিক সাক্ষ্যের প্রতি অবথা ভক্তিপ্রযুক্ত ঐ-সকল পদ্ধতি, জাতের প্রথম উৎপত্তিকে এমন এক নিম্ন যুগে আনিয়া ফেলিয়াছে যে-যুগে ভারতের জীবন-প্রবাহ একটা নির্দ্দিষ্ট পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন-এক প্রতিষ্ঠান, যাহা হিন্দুসমাজে সর্ব্বত্র প্রচলিত, যাহার জীবনীশক্তি অবিনশ্বর বলিয়া মনে হয়, তাহা জাতীয় ক্রমবিকাশের মূলের সহিত আবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। যাহার এতটা আধিপত্য সেই প্রতিষ্ঠানটি বিলম্বে গজাইয়া উঠিলেও, অন্ততঃ গোড়া হইতেই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদাঙ্ক-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

এই-সকল আলোচনা-পদ্ধতির মধ্যে একটা সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়; এই-সকল পদ্ধতি বর্ত্তমান তথ্যের দিকে লক্ষ্যই করে না; মূল হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে যে-সকল লোক-সঙ্ঘ প্রবেশ করিয়া সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্মকে অসম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে, এই-সকল পদ্ধতি সেই-সকল লোকের জীবন-গতি ও ধারণাদি পর্য্যালোচনা করে নাই।

পক্ষান্তরে কি সমাজ-তত্ত্ব, কি নৃ-তত্ত্বঘটিত আলোচনা—এই-সমস্ত আলোচনার পূর্ব্বে উক্ত আলোচনার আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—উহাই সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

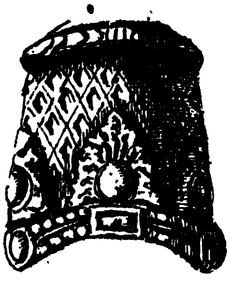
প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ

রাজ-লক্ষণ।

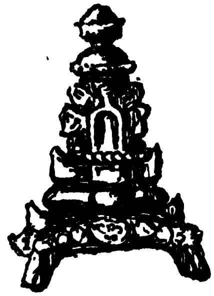
প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রে সকল বিষয়েরই খুব খুঁটিনাটি বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের শরীরের অবয়বের পরিমাণ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গী কিরূপ হইলে সুন্দর ও সুদৃশ্য হয় তাহা নির্ণয় করিয়া যেমন শিল্পশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, তেমনি রাজশক্তির তারতম্য অনুসারে রাজাদের শ্রেণীবিভাগ, মুকুটবিভাগ ও সিংহাসনবিভাগ কত রকমের হইতে পারে তাহারও বহু শাস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই-সকল শাস্ত্রের মধ্যে "মানসার" নামক শাস্ত্র প্রধান।

মানসার শাস্ত্রের মতে রাজাদিগকে নয় শ্রেণীতে ভাগ

১ম পট্ট



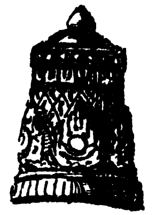
গুপ্ত, চালুক্য ও পল্লব-বংশের মুকুট



সিংহলের মুকুট



প্রাচীন চোল-রাজবংশের মুকুট



অর্ব্বাচীন চোল-রাজবংশের মুকুট

বিবিধ কিরীট-মুকুট।

করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীবিভাগ রাজাদের সৈন্যবল অনুসারে এইরূপ—

রাজসংজ্ঞা	হস্তী	অশ্ব	পদাতি	মহিষী	স্ত্রী
শ্রোত্রগ্রাহী (অস্ত্রগ্রাহী ?)	৫০	৫০০	৫০,০০০	১	৭০০
প্রাহারক	৬	৬০০	১ লক্ষ	২	৭০০
পট্টভাক্	৭	৮০০	দেড়লক্ষ	৩	১৩০০
মণ্ডলেশ	১০	১০০০	দুইলক্ষ	৪	১৫০০
পট্টধৃক	১২	১৫০০	২ বা ৩ লক্ষ	৫	২০০০
পার্ষ্ণিক	১৫	২০০০	৪ লক্ষ	৬	৩০০০
নরেন্দ্র	১০০	১০০০০	১ কোটি	১০	৫০০০০
অধিরাজ	১০ হাজার	১ কোটি	১০ কোটি	১০০ বা হাজার	১০ লক্ষ
সার্ব্বভৌম (চক্রবর্ত্তী)	১০ কোটি	১০০ কোটি	১০ কোটি	ঐ	ঐ

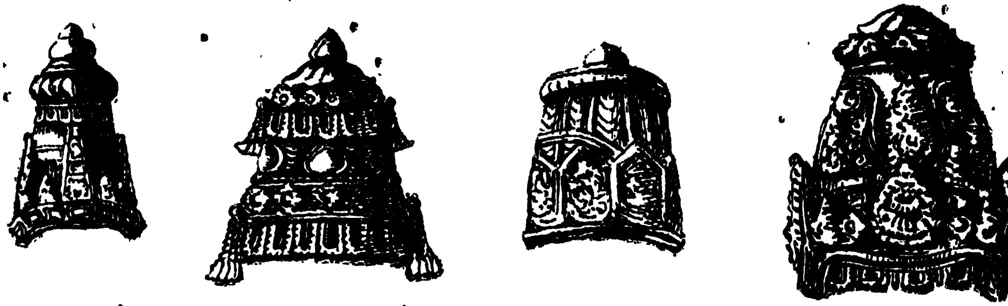
যে রাজা তাঁহার বাহুবলে চতুরুদধি-মেখলা পৃথিবীকে নিজের আয়ত্তাধীন করিতে পারেন তিনি সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তী।

যে রাজার ত্রি-শক্তি (অর্থাৎ প্রভুশক্তি বা প্রভু সম্রাটের অনুগ্রহ হইতে যে শক্তিলাভ হয়, উৎসাহ-শক্তি বা উৎসাহজনিত শক্তি এবং মন্ত্রশক্তি বা সুমন্ত্রণা হইতে লব্ধ শক্তি) আছে এবং সেই ত্রিশক্তির সাহায্যে যিনি ছয়টি প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছেন; যাঁহার 'ষড়্‌গুণ—সন্ধি' (সন্ধি করিবার কৌশল), বিগ্রহ (যুদ্ধ), যান (অভিযান বা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা), আসন (কাহারও সহিত শত্রুতা না করিয়া স্থির হইয়া থাকা, Neutrality), সংশ্রয় (আশ্রয় গ্রহণ), দ্বৈধিভাব (কূটনীতি),—আছে এবং আত্মরক্ষার উপযোগী ষড়বল অর্থাৎ অনুগত প্রজা, পরিপূর্ণ রাজকোষ, বুদ্ধিমান মন্ত্রী, পরাক্রান্ত সৈন্য, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী এবং অজেয় দুর্গ প্রস্তুত আছে; যিনি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যিনি ন্যায়বান্ ও ধার্ম্মিক এবং যিনি সূর্য্য বা চন্দ্রবংশে জাত, তিনি অধিরাজ শ্রেণীর।

যিনি দুর্ব্বল প্রতিবেশীর অধীনস্থ তিনটি প্রদেশ জয় করিয়া নিজের অধীন করিয়াছেন এবং সেই জিত রাজ্য ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে শাসন ও পালন করেন, সেই রাজার নাম নরেন্দ্র। তাঁহার অধীনে যে-সকল রাজা থাকেন তাঁহাদিগকে পার্ষ্ণিক পট্টধৃক্ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

যে রাজার মাত্র একটি প্রদেশের উপর অধিকার এবং একটি মাত্র দুর্গরক্ষিত নগর ষড়বলের দ্বারা সুরক্ষিত হয়, সেই রাজাকে পার্ষ্ণিক বলে। যাঁহার চারিটি গুণ থাকে এবং যিনি অর্দ্ধ প্রদেশের অধীশ্বর ও সেই অর্দ্ধ প্রদেশ একটি মাত্র দুর্গের দ্বারা রক্ষিত হয়, তিনি পট্টধৃক্। পট্টধৃকের অধীনে যে-সব ছোট ছোট রাজা থাকেন তাঁহাদের নাম মণ্ডলেশ্বর—ইঁহারা একএকটি উপপ্রদেশ বা জেলার অধীশ্বর। তাঁহাদেরও অধীনে যাঁহারা, তাঁহাদের নাম পট্টভাক্; তাঁহাদের কর্ত্তব্য সামাজিক রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করা এবং দেশের ধনবল বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করা; এজন্য

২য় পট্ট



মথুরার মুকুট — হয়সল-রাজবংশের মুকুট — রাজপুতানার মুকুট — যব-দ্বীপের মুকুট

বিবিধ কিরীট-মুকুট।

ইহাঁদের আর-এক নাম ধর্ম্মার্থস্যাধিপতিঃ; যিনি অর্দ্ধ জেলা বা একটি মাত্র মহকুমা বা সবডিভিজনের কর্ত্তা ও যাঁহার অধীনে একটি মাত্র দুর্গ থাকে, তিনি মণ্ডলেশ্বরের সহকারী, তাঁহারও পদবী পট্টভাক্—আধুনিক এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বা ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট। যে ব্যক্তি কতকগুলি জনপদ বা জেলার কর্ত্তা ও একটি মাত্র দুর্গের অধিকারী এবং চারিবর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের) অন্তর্গত, তাঁহার নাম প্রাহারক। যে ব্যক্তি কয়েকটি জেলার ও একটি মাত্র দুর্গ-সংরক্ষিত নগরীর প্রভু, তাঁহার পদবী শ্রোত্রগ্রাহী বা অস্ত্রগ্রাহী। এই রাজপদবীর বিভাগ তাঁহাদের রাজ্যের আয়তনের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই সকল রাজাদের প্রত্যেকেরই রাজচিহ্ন ও পদবী-চিহ্ন-স্বরূপ পৃথক পৃথক রকমের মুকুট, দণ্ড, ছত্র, চামর, সিংহাসন ইত্যাদি থাকিত। চক্রবর্ত্তী বা অধিরাজ-উপাধি-চিহ্নিত রাজাদের শিরোভূষণ মুকুটের নাম মৌলি বা কিরীট। পাষ্ণিক রাজার মুকুটের নাম শিরস্ত্র। পট্টধৃক্ ও মণ্ডলেশ্বর নামক রাজার মুকুটের নাম পট্টবন্ধ। পট্টভাক্ নামক রাজার মুকুটের নাম পট্ট। প্রাহারক ও শ্রোত্র-গ্রাহী বা অস্ত্রগ্রাহী নামক রাজকর্ম্মচারীদিগের মস্তকে কেবলমাত্র পুষ্পমাল্য ধারণের অধিকার ছিল, অন্য কোনো-রকম মুকুট নহে।

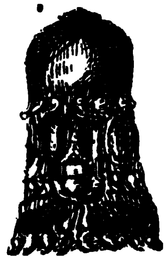
সিংহাসনের কারুকার্য্য, অলঙ্কার ও অঙ্গ-সংযোগের ভেদে তাহা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট ও তাহার শ্রেণী-তারতম্য স্থির করা হইত। যে সিংহাসনের পশ্চাদ্ভাগে একটি তোরণ ও সূর্য্য-চ্ছটা ও কল্পবৃক্ষ সংযুক্ত থাকিত তাহাতে বসিবার অধিকারী চক্রবর্ত্তী, অধিরাজ বা মহারাজ এবং নরেন্দ্র। পাষ্ণিক, পট্টধর ও পট্টভাক্ সূর্য্যচ্ছটা-ও-তোরণ-সংযুক্ত সিংহাসনে বসিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সিংহাসনে কল্পবৃক্ষ থাকিতে পারে না। প্রাহারকের সিংহাসনে তোরণ এবং সূর্য্যচ্ছটাও থাকিবে না। শ্রোত্রগ্রাহী বা অস্ত্রগ্রাহী সাধারণ চৌকিতে বসিবেন, সেই চৌকির নাম "কেবল-আসন"।

ইহার পরে মানসার শাস্ত্রে প্রত্যেক রাজার রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রজাদিগকে দুষ্ট লোক ও শত্রুর অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া ন্যায়-ধর্ম্মমতে সদয়ভাবে শাসন ও পালন করিবেন; ইহার জন্য তিনি প্রজার আয়ের সপ্তাংশ কর পাইবেন। এরূপ কর্ত্তব্যপালনের জন্য অধিরাজ বা মহারাজ কর লইবেন ষষ্ঠাংশ, এবং নরেন্দ্র লইবেন পঞ্চমাংশ; কিন্তু ইহাদিগকে দরিদ্র ও আতুরদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষার জন্য মুক্তহস্ত থাকিতে হইবে এবং গৃহে সমাগত অভ্যাগত-অতিথিদিগের সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে। পাষ্ণিক শ্রেণীর রাজা-প্রজাদের উৎপন্ন ধনের অর্দ্ধেক পাইবার অধিকারী এবং কোনো প্রজার অপরাধের জন্য তিনি তাঁহার অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর শক্তিশালী রাজাদের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা তিনগুণ বেশী অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন, কিন্তু সেই সংগৃহীত অর্থ হইতে তাঁহাকে দরিদ্র ও অক্ষমদিগের ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ করা ছাড়া শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে হইবে, ইহাই মানসার শাস্ত্রের অনুশাসন।

৩য় পট্ট



মাড়ওয়াড়ের কিরীট-মুকুট



চোল-কেশবন্ধ



পশ্চিম চালুক্য-কেশবন্ধ



দক্ষিণ-ভারতের ধম্মিল্ল

বিবিধ কেশ-বন্ধ।

শুক্রনীতি শাস্ত্রে রাজপদবীর শ্রেণীবিভাগ ভিন্ন-রকম। ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে সংগৃহীত কর হইতে যে রাজার আয় এক হইতে তিন লক্ষ কার্ষ (এক-রকম স্বর্ণমুদ্রা) হয়, তাঁহাকে সামন্ত বলে। যাঁহার আয় দশ লক্ষ কার্ষ পর্য্যন্ত, তিনি মণ্ডলিক। কুড়ি লক্ষ কার্ষ আয় থাকিলে, তিনি রাজা। পঞ্চাশ লক্ষ কার্ষ আয় হইলে, তিনি মহারাজা। যাঁহার এক কোটি কার্ষ আয়, তাঁহাকে বলে স্বরাট্। যাঁহার দশ কোটি কার্ষ আয়, তিনি সম্রাট। এবং যাঁহার পঞ্চাশ কোটি কার্ষ আয়, তাঁহার পদবী বিরাট। যে সম্রাট সপ্তদ্বীপের বা মহাদেশের অধিপতি তিনি সার্ব্বভৌম।

এই-সকল রাজা পুরুষানুক্রমে জ্যেষ্ঠাধিকারে রাজ্যের অধিকার লাভ করিলেও তাঁহাদের সিংহাসনে অভিষিক্ত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রজা-সাধারণের অভিমত ও অনুমোদনের উপর নির্ভর করিত। প্রজাদের নির্ব্বাচিত রাজা ন্যায়বান ও প্রজাহিতে-রত না হইলে প্রজারা সেই দুষ্ট রাজাকে শাস্ত্র-সম্মতিতে সিংহাসনচ্যুত, রাজ্য হইতে বিতাড়িত এবং এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারিত। কারণ প্রজাদের নিকট কর গ্রহণ করিয়া রাজা তাহাদের বেতনগ্রাহী ভৃত্যস্থানীয় হইয়া থাকেন এবং সেইজন্য রাজার কর্ত্তব্য যেজন্য তিনি বেতন গ্রহণ করিতেছেন সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করা। যে-রাজা সেই কর্ত্তব্য অবহেলা করে সেই রাজাকে দণ্ড দিবার অধিকার প্রজারা প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যে-সমস্ত সামন্ত তাহাদের কর্ত্তব্য অবহেলায়, অজ্ঞ, অথবা বার্দ্ধক্য ইত্যাদি কারণে, কর্ত্তব্য পালনে অক্ষম হওয়াতে প্রজাদের দ্বারা সিংহাসন হইতে অপসৃত হন, তাঁহাদিগকে হীন-সামন্ত বলে।

সামন্ত নামক ভূস্বামীরা নিম্নলিখিত উপবিভাগে শ্রেণীবদ্ধ—যিনি একশত গ্রামের অধিকারী তিনি নৃ-সামন্ত; যিনি দশ গ্রামের কর্ত্তা তিনি নায়ক। যিনি দশ হাজার গ্রামের অধীশ্বর তাঁহাকে স্বরাট্ বলে।

শুক্রনীতি নামক শাস্ত্রে রাজাদের সৈন্যবলের অনুপাতে তাঁহাদের অপর একপ্রকার শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে। ঐ শাস্ত্রের মতে যে রাজার পদাতিক সৈন্য যত তাহার অশ্বসাদী হইবে তাহার চতুর্থাংশ; রসদ ইত্যাদি ভারবহনের উপযুক্ত বলদের সংখ্যা হইবে পদাতিকের পঞ্চমাংশ; অশ্বের সংখ্যার অষ্টমাংশ থাকিবে উষ্ট্র; উষ্ট্র-সংখ্যার চতুর্থাংশ থাকিবে হস্তী; হস্তী-সংখ্যার অর্দ্ধেক থাকিবে রথ। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরেন্দ্রশ্রেণীর রাজার সৈন্য-সংখ্যা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—মানসার শাস্ত্রের মতে তাঁহার ১০ হাজার অশ্বসাদী থাকা আবশ্যক; তদনুসারে শুক্রনীতিসারের মতে তাঁহার সৈন্য-বিভাগ হইবে এইরূপ—

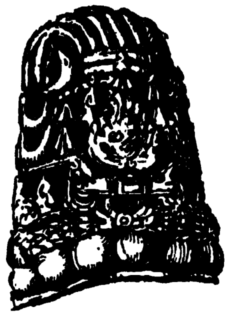
অশ্ব	১০০০০
বলদ	২০০০
উষ্ট্র	১২৫০
হস্তী	৩১২
রথ	১৫৬
কামান	৩১২

মোটের উপর শাস্ত্রনির্দ্দেশের এই উদ্দেশ্য যে পদাতিকের সংখ্যা হইবে বেশী, অশ্বসাদীর মাঝামাঝি, এবং হস্তীর সংখ্যা

৪র্থ পট্ট



ধম্মিল্ল



পহ্লব-মুকুট



চালুক্য ও হয়সল-রাজবংশের মুকুট



পহ্লব মুকুট

বিবিধ জটা-মুকুট।

ক্রমে ক্রম। এই-সকল সৈন্যবল ছাড়া যে রাজার আয় এক লক্ষ কার্ষ তাঁহার সঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ পার্ষদ থাকিবে—একশত বাছা বাছা বলিষ্ঠ জোয়ান অঙ্গরক্ষী, তিন শত বন্দুকধারী পদাতিক, আশিজন ঘোড়সওয়ার, দশটি উষ্ট্র, ছুটি হস্তী, একখানি রথ, দুখানি শকট, ষোলটি বলদ, ছুটি বড় কামান, তিনজন মন্ত্রী এবং ছয়জন কর্ম্মচারী।

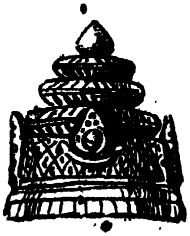
প্রজাদের উৎপন্ন আয়ের ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করিয়া রাজা রাষ্ট্রহিতের জন্য নিম্নলিখিত অনুপাতে ব্যয় করিবেন—সৈন্যসংরক্ষণের জন্য তিন, দান আধ, মন্ত্রীদের বেতন আধ, অপরাপর কর্ম্মচারীর বেতন আধ, রাজার ব্যক্তিগত ব্যয় আধ, ভাণ্ডারে সঞ্চয় এক, মোট ছয়।

শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট এই-সমস্ত ব্যবস্থা কর্ম্মক্ষেত্রে বাস্তবিক পালিত হইত কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; লোকে মনে করিতে পারে যে আমাদের নীতি- বা ধর্ম্মশাস্ত্রে যে-সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যাহা হওয়া বা করা উচিত তাহারই উপদেশ মাত্র, বাস্তবিক ঐরূপ নিয়ম সেকালে পালিত হইত তাহার সাক্ষ্য নহে। কিন্তু প্রাচীন কাব্য, পুরাণ ও ইতিহাসে বর্ণনীয় সেকালের সমাজের যে-সমস্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক বলিয়া মানিয়া লইলে ও স্পষ্ট অত্যুক্তিগুলি বাদ দিয়া লইলে নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশের সহিত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিরোধ দেখা যায় না।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সময় প্রজা-সাধারণের অনুমোদন আহ্বান করিয়াছিলেন; রামচন্দ্রকে বনবাস দিলে প্রজারা রাজা দশরথের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অত্যাচারী বেন রাজাকে তাঁহার প্রজারা রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

রাজাদের পদবীও যে তাঁহাদের রাজ্যের বিস্তার ও শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করিত, যে যাহা ইচ্ছা তাহাই ব্যবহার করিতে পারিত না, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায়। পরান্তক, রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সম্রাট-গণ বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও নিজেদের চক্রবর্ত্তী বা ত্রিভুবন-চক্রবর্ত্তী বলিতেন না। এই গর্ব্বিত উপাধি চোল রাজাদের মধ্যে প্রথম ব্যবহার করেন কুলোত্তুঙ্গ। তাঁহার সাম্রাজ্য সমস্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, কলিঙ্গ, উড়িষ্যা ও সিংহলের উত্তরাংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এবং তাহা তিন দিকে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এইরূপ, হয়সল-বংশের প্রথম-দিক্‌কার রাজারা নিজেদের চক্রবর্ত্তী বলিতেন না, বিষ্ণুবর্দ্ধন ও তাঁহার পুত্র নরসিংহের ন্যায় ক্ষমতাশালী রাজারাও নিজেদের মহামণ্ডলেশ্বর মাত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন। নরসিংহের পুত্র বল্লাল নিজেকে ভুজবল-চক্রবর্ত্তী বা প্রতাপ-চক্রবর্ত্তী বলিয়া প্রচার করেন।

৩য় পট



চোল-মুকুট



হয়সল-মুকুট



পল্লব-মুকুট



পাঞ্জারীপুরের আধুনিক টুপি

বিবিধ করণ্ড-মুকুট।

বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর পল্লব-বংশের রাজারাও নিজেদের মহারাজাধিরাজ মাত্র বলিতেন। রাষ্ট্রকুট-বংশীয়েরা সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের অধিপতি ছিলেন এবং সেইজন্য নিজেদের মহারাজাধিরাজ বলিতেন। সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তও মহারাজ এবং মহারাজাধিরাজ অপেক্ষা মহত্তর উপাধি গ্রহণ করেন নাই। ছোট ছোট প্রদেশের অধিপতিরা নিজেদের মহারাজ বা মহারাজাধিরাজ বলিতেন না।

মহারাজাধিরাজ এবং সার্ব্বভৌম নৃপতিদের যে সৈন্য-সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই কল্পনা নহে। চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ এক যুদ্ধে এক হাজার হস্তী বধ করিয়া তামিল ভাষায় পরনি নামক প্রশস্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রশস্তি হাজার হাতী বধ না করিলে কোনো রাজা পাইতে পারেন না। পরবর্ত্তীকালে যুদ্ধে বোধ হয় রথ ব্যবহৃত হইত না, কারণ রাজাদের লেখমালায় রথের উল্লেখ দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যে উষ্ট্রেরও ব্যবহার ছিল না বোধ হয়।

একজন রাজা খুব বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও, তাঁহার বিপুল সৈন্য, ধনসম্পত্তি ও অধীনস্থ রাজা থাকিলেও, মানসারের মতে তিনি আপনাকে মহারাজা বা চক্রবর্ত্তী বলিবার অধিকারী হইতেন না; এই সম্মানিত পদবী লাভ করিতে হইলে ঐ সমস্ত ছাড়া তাঁহাকে সূর্য্য বা চন্দ্রবংশীয় হইতে হইত। এইজন্য যে-কোনো রাজা প্রবল হইয়া উঠিলেই পিতৃমাতৃকুলের যে-কোনো দিক দিয়া আপনাকে সূর্য্য বা চন্দ্রের বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত। অনেক অখ্যাত বংশের লোক হঠাৎ পরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিয়া সূর্য্য বা চন্দ্র হইতে নিজের উদ্ভব দেখাইবার জন্য খুব বিস্তারিত কুলজী তৈয়ার করাইয়াছেন দেখা যায়। একজন গোয়ালা রাজা হইয়া উঠিলেই নিজেকে যদুবংশীয় বলিয়া প্রচার করে; কারণ যদুবংশীয় কৃষ্ণ এককালে গোয়ালার কাজ করিয়াছিলেন এবং যাদবেরা চন্দ্রবংশীয়। বিজয়নগরের রাজারা ইহার দৃষ্টান্ত।

শাস্ত্রের নির্দ্দেশমত রাজারা প্রজার বিত্তের ষষ্ঠাংশের বেশী কর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই শাস্ত্র-নিয়ম কোনো রাজা অমান্য করিয়া বেশী কর আদায় করিয়াছেন এমন কোনো প্রমাণ কোনো লিপি বা লেখে পাওয়া যায় না। কিন্তু রাজাদের স্ত্রীসংখ্যার অঙ্ক দেখিলেই তাহা যে নিতান্তই কল্পনা ও অত্যুক্তি তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

মুকুট-লক্ষণ।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তিলক-চিহ্ন যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি বিভিন্ন জাতি ও সামাজিক অবস্থার তারতম্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের শিরোভূষণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইতে দেখা যায়। বোম্বাই মিউজিয়মে বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন প্রদেশের এইরূপ নানা-রকমের পাগ্‌ড়ি সংগৃহীত আছে। হায়দরাবাদ রাজ্যেও বহুবিধ পাগড়ির প্রচলন দেখা যায়। কচ্ছী ও পার্শীদের মধ্যে সামাজিক অবস্থা ও ব্যবসায়-ভেদে একই জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের টুপি-পরা প্রচলন আছে। সিন্ধু-প্রদেশে যাঁহারা রাজমন্ত্রীদের বংশধর তাঁহাদের টুপি দেশের সকল-প্রকার টুপি বা পাগড়ী হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। সকল-প্রকার অনুষ্ঠানে উষ্ণীষ ধারণ করা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এইজন্য ভারতবর্ষের সকল হিন্দু-সম্প্রদায়েরই কোনো-না-কোনো-রকমের শিরোভূষণ আছে। কেবল বাঙালীর



আসিরীয় পারসিক পারসিক আসিরীয়

বিবিধ উষ্ণীষ।

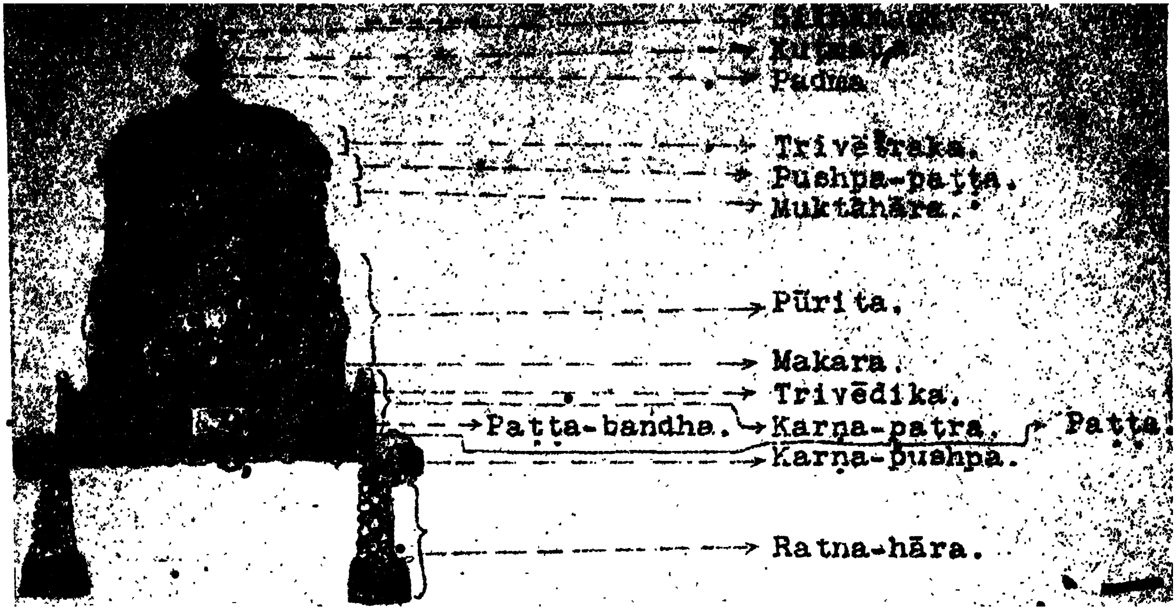
কোনো-রকম উষ্ণীষ সাধারণতঃ নাই; কিন্তু তাহার জীবনের সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, যেমন অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতিতে, তাহাকে টোপর ব্যবহার করিতে হয়। টোপর—সোলার মুকুট।

সকল দেবদেবীর প্রতিমাকেই মুকুট পরাইবার বিধি শাস্ত্রে দেখা যায়। রাজাদের রাজ্য ও শক্তির তারতম্য অনুসারে তাহাদের মুকুটের গঠন ও মুকুট নির্মাণের স্বর্ণের ওজন শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা আছে। আগমশাস্ত্রে দেবতা ও রাজাদের মৌলি বা মুকুটের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানসার ও শিল্পরত্ন নামক শাস্ত্রেও মৌলি বা মুকুটের বিশদ বিবরণ আছে। এই-সকল শাস্ত্রে মুকুটের নিম্নলিখিত নাম দেখিতে পাওয়া যায়—কিরীট-মুকুট, করণ্ড-মুকুট, জটা-মুকুট, শিরস্ত্রক, কেশবন্ধ, ধম্মিল্ল, অলক-চূড়ক, পুষ্পপট্ট, রত্নপট্ট, পত্রপট্ট ইত্যাদি। এইসকল মুকুটের মধ্যে কিরীট-মুকুট, করণ্ড-মুকুট, জটা-মুকুট এবং অলক-চূড়ক বেশী প্রচলন ছিল। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকে কিরীট-মুকুট, ব্রহ্মাকে করণ্ড-মুকুট এবং রুদ্র বা মহাদেবকে জটা-মুকুট পরাইবার বিধি আছে; দেবীদের মধ্যে দুর্গার জটা-মুকুট, লক্ষ্মীর কুন্তল-মুকুট ও সরস্বতীর কেশবন্ধ এবং অন্যান্য দেবীদের সকলেরই করণ্ড-মুকুট ধারণ করা ব্যবস্থা।

রাজাদের মধ্যে যাহাদের পদবী সার্ব্বভৌম-চক্রবর্ত্তী বা অধিরাজ, তাহারাই কিরীট-মুকুট পরিবার অধিকারী; নরেন্দ্র-উপাধিধারী রাজার মুকুটের নাম করণ্ড-মুকুট এবং পার্ষ্ণিক উপাধিধারী রাজার মুকুটের নাম শিরস্ত্রক। করণ্ড-মুকুট সকল শ্রেণীর রাজাই ধারণ করিতে পারেন। সার্ব্বভৌম এবং অধিরাজ নামক সম্রাটদের মহিষীরা কেশবন্ধ নামক মুকুট ধারণ করিবেন। অধিরাজ এবং নরেন্দ্র উপাধিধারী রাজাদের মহিষীরা যে মুকুট ধারণ করিবার অধিকারিণী তাহার নাম কুন্তল। মণ্ডলিক-পত্নীদের শিরোভূষণের নাম ধম্মিল্ল। এবং রাজা ও রাণীদের দাসদাসী বা দাসপত্নীদের যে শিরোভূষণ তাহার নাম অলক-চূড়ক। খুব সম্ভবত মাথার চুল বিভিন্ন-প্রকারে বাঁধিবার বিভিন্ন রীতিকে ধম্মিল্ল, কেশবন্ধ এবং অলক-চূড়ক বলিত। ঐ-সকল খোঁপা পুষ্পপট্ট বা ফুলের মালা ও পত্রপট্ট বা নারিকেল প্রভৃতি পত্রের গ্রথিত বা বিনানো মালা ও রত্নপট্ট বা রত্নখচিত সোনার পাত দিয়া জড়ানো থাকিত। এইরূপে বিভিন্ন পদবীর লোকের বিভিন্ন-প্রকারের শিরোভূষণ হওয়াতে লোকে দেখিবামাত্রই তাহাদের কাহার কিরূপ পদমর্য্যাদা বুঝিয়া লইবার সুবিধা পাইত। য়ুরোপেও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকারের শিরোভূষণ হয়; ইংলণ্ডের রাজা, যুবরাজ, ডিউক, আর্ল, মারকুইস, ব্যারন প্রভৃতির শিরোভূষণ স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মুকুটের পরিমাণ এইরূপ—

সাধারণত, যাহার মুকুট তাহার মুখের দৈর্ঘ্যের দুই বা তিন গুণ মুকুটের খাড়াই হওয়া নিয়ম। কিন্তু ব্রহ্মা ও



কিরীটের অবয়ব ও অঙ্গসংস্থানের নির্দ্দেশ ও নাম।

রুদ্রের মুকুট তাঁহাদের প্রতিমার মুখের পৌনে-দুই গুণ এবং শক্তিদের মুকুট তাঁহাদের প্রতিমার মুখের দুই গুণ লম্বা হওয়া বিধি। মুকুটের নীচের-মুখের প্রস্থ মুকুটধারীর মুখের লম্বের সমান হওয়া নিয়ম; মুকুট নীচে হইতে উপর দিকে ক্রমশ সরু হইয়া যায়, যেমন বাংলা দেশের টোপর। কিরীট-মুকুটের নীচের দিকের চওড়া যতখানি, চূড়া তাহার অপেক্ষা অষ্টমাংশ বা ষোড়শাংশ কম হইবে; করণ্ড-মুকুটের চূড়া তলার চওড়া অপেক্ষা অর্দ্ধেক বা তৃতীয়াংশ সরু হওয়া নিয়ম।

চক্রবর্ত্তী রাজার মুকুট তাঁহার মাথার বেড়ের সমান খাড়া হইবে। চক্রবর্ত্তী রাজার মুকুটের অপেক্ষা অধিরাজের মুকুট ষোড়শাংশ ছোট, নরেন্দ্রের মুকুট বিংশাংশ ছোট এবং পার্ষ্ণিকের মুকুট অর্দ্ধেক ছোট। চক্রবর্ত্তীর মহিষীর মুকুটের খাড়াই হইবে তাঁহার মাথার বেড়ের সমান, অধিরাজের মহিষীর মুকুট তাঁহার মাথার বেড়ের তৃতীয়াংশ কম, এবং নরেন্দ্র প্রভৃতি রাজাদের মহিষীদের মুকুটের উচ্চতা তাঁহাদের মুখের দৈর্ঘ্যের সমান হওয়া বিধি। কেশবন্ধ প্রভৃতি শিরোভূষণের উচ্চতা মুখের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক বা ত্রি-চতুর্থাংশ এবং পট্টের উচ্চতা মাথার বেড়ের তৃতীয়াংশ হইবে। পট্টধরদিগের বিশেষ শিরোভূষণের নাম পট্ট। মণ্ডলেশ্বর বা মণ্ডলিকদিগের যে পট্ট তাহা মাথার বেড়ের সিকি এবং পট্টভাক্‌দিগের পট্ট ষষ্ঠাংশ উচ্চ হইবে।

বিবিধ পদবীর রাজা ও তাঁহাদের রাণীদিগের মুকুট কাহার কতখানি স্বর্ণে প্রস্তুত হইবে তাহারও বিবরণ শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করা আছে। মুকুটের তিন শ্রেণী—উত্তম, মধ্যম, ও অধম। যে মুকুটের ওজন ১৫০০ নিষ্ক তাহা অধম মুকুট, যাহার ওজন ২০০০ নিষ্ক তাহা মধ্যম, এবং যাহার ওজন ২৫০০ নিষ্ক তাহাই উত্তম শ্রেণীর। রাজারা নূতন মুকুট ধারণ করিবার অধিকারী হইতেন চারিবার। যখন প্রথম সিংহাসনে আরোহন করিতেন তখন; এই মুকুট ধারণের অনুষ্ঠানের নাম প্রথমাভিষেক। রাজার বিবাহের পর তাঁহার মঙ্গলাভিষেক হইত। তখন তিনি এবং তাঁহার রাণী উভয়েই নূতন মুকুট ধারণ করিতে পারিতেন। যখন রাজা কোনো দেশ বা শত্রুকে জয় করিতেন তখন তাঁহার বিজয়াভিষেক হইত এবং তখনও তিনি নূতন মুকুট ধারণ করিতেন। যখন তিনি কোনও বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেন, তখন তাঁহার বীরাভিষেক হইত এবং তখনও

তাঁহার নূতন মুকুট ধারণ করিবার অধিকার জন্মিত। যে-সমস্ত রাজার এই চতুর্ব্বিধ অভিষেক হইয়াছে তাঁহাদের মুকুটের ওজন ১৫০০ হইতে ২৫০০ স্বর্ণ নিষ্ক পর্য্যন্ত সকল প্রকারেরই হইতে পারে। এই-সকল চক্রবর্ত্তী বা অধিরাজ-দিগের মহিষীদিগের মুকুট তাঁহাদিগের স্বামীর মুকুটের ওজনের অর্দ্ধেক হওয়া নিয়ম।



অষ্টমঙ্গলা সংযুক্ত পূরিত।

অধিরাজের মুকুট ১৫০০ হইতে ২০০০ নিষ্ক ওজনের পর্য্যন্ত, অধম মধ্যম বা উত্তম শ্রেণীর তিন প্রকারেরই হইতে পারিত। পার্ষ্ণিকের শিরস্ত্রক নামক মুকুটের, অধম মধ্যম ও উত্তম ভেদে, ওজন নির্দ্দিষ্ট ছিল ৪০০ বা ৮০০ বা ১২০০ নিষ্ক। উত্তম মধ্যম অধম ভেদে ত্রিবিধ মুকুটের ওজন পট্টধৃকের ৩০০ বা ৬০০ বা ৯০০ নিষ্ক, মণ্ডলিকের ২০০ বা ৪০০ বা ৬০০ নিষ্ক এবং পট্টভাকের ১০০ বা ২০০ বা ৩০০ নিষ্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল।

উপরে বিভিন্ন মুকুটের উচ্চতার যে-সকল মাপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মুকুটের ছাদের উপরে যে অলঙ্কার ও শিখামণি নামক চূড়া থাকে তাহার উচ্চতা বাদে ধরিতে হইবে।

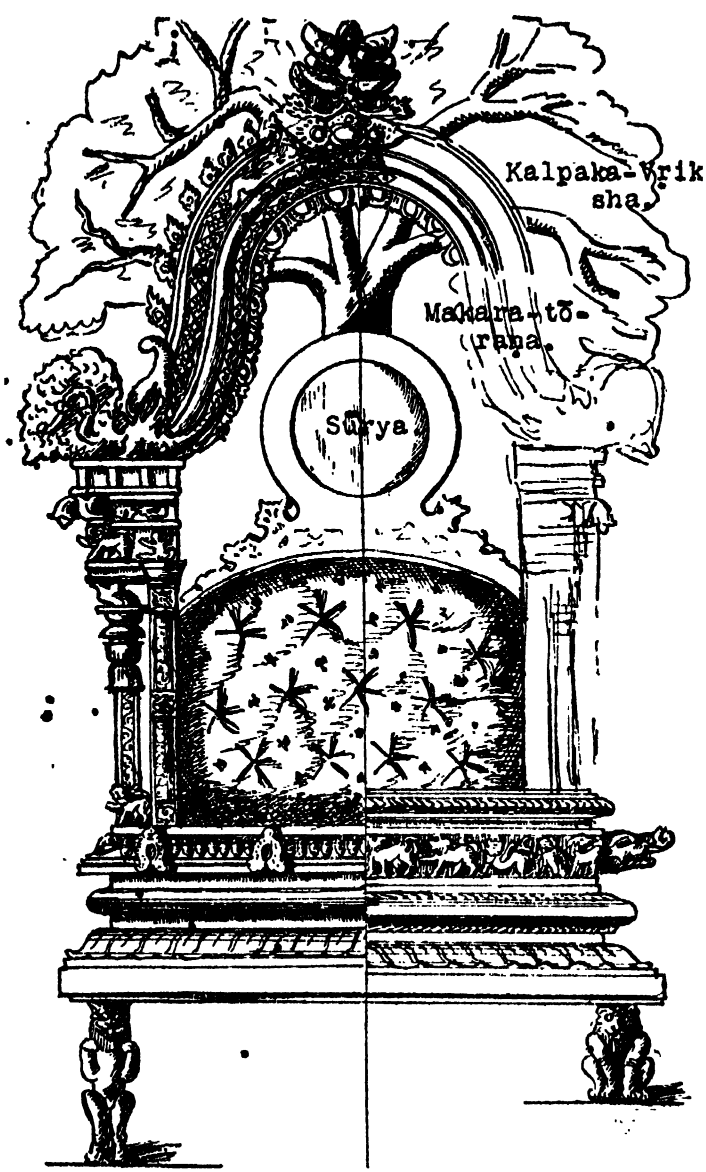
কিরীট-মুকুটের আকার বেণুকর্ণ অর্থাৎ বাঁশের পাতার কুঁড়ির মতন; কেশবন্ধ মুকুটের আকার ত্রপুষ অর্থাৎ শশার মতন; শিরস্ত্রক, জলবুদ্বুদের মতন; ধম্মিল্ল, লতার মতন; এবং অলক-চূড়ক, মাথার ব্রহ্মতালুর উপরে চূড়ার আকারে বাঁধা খোঁপা।

কিরীট-মুকুটের গায়ে যে-সমস্ত নক্সা ও কারুকার্য্য করিতে হইবে তাহারও নাম এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—পূরিত, তুঙ্গ-তার, অগ্র-পট্ট, ত্রি-বেদিক, ত্রি-বেত্রক, পদ্ম, কুট্মল এবং শিখামণি; পূরিত অলঙ্কারে মকরের মূর্ত্তি এবং মধ্যে ও উর্দ্ধে রত্নবন্ধ অর্থাৎ মণিখচিত থাকিবে। মকরের মুখ হইতে পত্রপুষ্পশোভিত মুক্তালতা বাহির হইবে। কপালের যতখানি মুকুটের মধ্যে ঢুকিয়া থাকিবে সেই-পরিমাণ স্থান চওড়া ফিতার মতন হয় বলিয়া তাহার নাম পট্টবন্ধ; পট্টবন্ধও রত্নখচিত হইবে। কিরীট-মুকুটের অপরাপর অংশ মৌলিবন্ধ, বল্লী এবং মুক্তাহার প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। কপালের উপর চন্দ্রকলা এবং দুই কানের দুই পার্শ্বে পাতার মতন দুটি কর্ণপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে। মুকুটের মুখের নীচের কিনারে মুক্তাহার প্রলম্বিত থাকিতে হইবে। কর্ণপত্রের নীচে ও মাথার সহিত কানে জোড়ের ঠিক উপরে কর্ণপুষ্প থাকিবে এবং তাহা হইতে রত্ন-মণি-মুক্তা-গ্রথিত থুপি ঝুলিবে। কিরীট মুকুট নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত গোলাকার হইবে।



সিংহলের জটা-মুকুট

উত্তরকামিকা-আগমে জটামুকুট গঠনের প্রণালী ও বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কেশজটা পাঁচটি একত্র বিনাইয়া তিন অঙ্গুলী উচ্চে এক বা তিনটি ফাঁস দিয়া জটার অগ্রভাগ চারিদিকে ঝুলাইয়া দিলে যেরূপ দেখিতে হয় এই মুকুটের আকার সেইরূপ হইবে। এই মুকুটের গায়ে কতকগুলি নক্সাকাটা রত্নখচিত চন্দ্রক সংযুক্ত করিতে হইবে; সেই-সকল চন্দ্রকের অবস্থান ও আকার ভেদে বিভিন্ন নাম আছে—মুকুটের সম্মুখের চন্দ্রকের নাম মকরকূট, তাহার গায়ে সাতটি ছিদ্র থাকিবে; দুইপাশে যে চন্দ্রক থাকে তাহার নাম পত্রকূট; পিছনের চন্দ্রককে বলে রত্নকূট এবং তাহাদের মাঝে-মাঝে যে-সকল আলঙ্কারিক চন্দ্রক থাকে তাহাদিগের নাম পুরী বা পূরিত অর্থাৎ যাহারা ফাঁক পূরণ করে। এই মুকুটের বেড়, নীচের দিকে মাথার বেড়ের সমান অবশ্য হইবেই এবং উপরের দিকে হইবে দশ অঙ্গুলী।



সিংহাসন।

বিভিন্ন আগমে ধম্মিল্ল নামক শিরোভূষণের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ইহার চূড়ার বেড় নীচের মুখের বেড়ের তৃতীয়াংশ হইবে। তিনটি অঙ্গুরীয়ের দ্বারা অধ, ঊর্দ্ধ ও মধ্যদেশ সংবদ্ধ থাকিবে এবং ইহাতে শিখামণি বা পূরিত থাকিবে না। অলকচূড়ক নামক শিরোভূষণ ধম্মিল্লেরই মতন ; কেবল তাহার গায়ে রত্নবন্ধ অর্থাৎ রত্নখচিত স্বর্ণপট্ট বেষ্টিত থাকিবে। অলক চূড়ক ক্রমশ সরু হইবে না, তাহা চোঙের মতন আগাগোড়া সমান থাকিবে।

এই-সকল মুকুট স্বর্ণ-নির্ম্মিত রত্নখচিত ক্ষুদ্রাকৃতি অষ্টমাঙ্গল্যে ভূষিত করিলে রাজা এবং রাণীর শ্রী, বৃদ্ধি এবং শুভকামনা করা হয়। অষ্ট-মাঙ্গল্য এই—সিংহ, বৃষ, হস্তী, জলকুম্ভ, ব্যজন, ধ্বজ, শঙ্খ, দীপ ; অথবা শ্রীবৎস বা দক্ষিণাবর্ত্ত কুটিল আবর্ত্ত, পূর্ণ কুম্ভ, ছত্র, চামর, দর্পণ, দীপ, শঙ্খ এবং স্বস্তিক। মুকুটের গলপট্টে অর্থাৎ মধ্যভাগের চওড়া বেড়ে পুষ্পমাল্য বিজড়িত করিবারও বিধি আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মুকুটের পরিকল্পনা ও অলঙ্কার ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবারই কথা। যাবা-দ্বীপের এবং হয়সল-রাজ-বংশের মুকুটগুলি স্বর্ণকারের শিল্পনৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। দাক্ষিণাত্যের মুকুটগুলি দ্রাবিড় মন্দিরের বিমান অর্থাৎ মন্দিরের

মহাদেবের জটামুকুটে মধ্য-চন্দ্রকের দক্ষিণপার্শ্বে চন্দ্রকলা ও বামপার্শ্বে সর্প-ফণা সংযুক্ত করিতে হইবে।

কিরীট-মুকুট বা জটা মুকুটের আকারে খোঁপা বাঁধার নাম কেশবন্ধ। এই খোঁপার গায়ে স্থানে স্থানে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ বাহিরে ঝুলাইয়া দিতে হইবে এবং সমস্তটা একটি পট্ট দ্বারা মধ্যস্থলে বাঁধা থাকিবে। যে খোঁপা অসংখ্য কুঞ্চিতালকের সমষ্টি তাহাকে কুন্তল বলে।

মধ্যগৃহের চূড়ার আকারে গ্রথিত। কিরীট-মুকুটগুলি প্রাচীন কালের আসিরিয় ও পারসিকদিগের শিরো-ভূষণের অনুরূপ। কোনো কোনো মুকুট গোল না হইয়া চৌকা হইতে এবং নীচের দিক হইতে উপর দিকে সরু হইয়া না উঠিয়া উপর দিকে চওড়া হইয়া উঠিতে দেখা যায়। এই মুকুটের চতুষ্পার্শ্বে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণ-চন্দ্রক সংযুক্ত থাকে, সকল মুকুটের মাথাতেই

চূড়া এবং শিখামণি থাকিতে দেখা যায়; যে-সকল মুকুটে কারুকার্য্যের বাহুল্য নাই, সেগুলিও সাদাসিধার মধ্যে দেখিতে বেশ সুন্দর। বাংলা দেশের টোপর এই-সকল মুকুটেরই সোলার সংস্করণ।

লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে যে এই-সকল অতি-দীর্ঘ মুকুট মানুষ সত্যসত্যই পারিত কিনা। প্রাচীন কালের তক্ষিত মূর্ত্তি যদি সেই কালের জীবন্ত লোকের প্রতিরূপ হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে ঐরূপ মুকুট তখনকার লোকে বাস্তবিক ব্যবহার করিত। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের রাজাদের যে-সকল মুকুট এখন পর্য্যন্ত অভগ্ন অবস্থায় আছে তাহারাও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দ্যায়। সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে এইরূপ মুকুটের প্রচলন ছিল। বিজয়নগরের সম্রাট কৃষ্ণদেব রায়, বেঙ্কটপতি রায় প্রভৃতির যে-সকল চিত্র আছে তাহাতে তাঁহাদের মাথায় ঐরূপ মুকুট থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের দীর্ঘ কিরীটের সম্বন্ধে Paes নামক একজন বিদেশীর সাক্ষ্য এইরূপ—And on his head he had a cap of brocade in fashion like a Galician helmet, covered with a piece of fine stuff all of fine silk. On the head they wear high caps which they call collaes (তামিল ও কানাড়ী ভাষায় কুল্লায়ি শব্দের মানে টুপি) and on these caps they wear flowers made of large pearls. বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের অনেক দিন পর পর্য্যন্ত সম্রাটের প্রাদেশিক নায়কেরা এইরূপ কুল্লায়ি পরিধান করিত এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ ভাগে ঐ-সকল নায়কের অসংখ্য শিলা-মূর্ত্তির মস্তকে এইরূপ কুল্লায়ি থাকিতে দেখা যায়।

কেশগুচ্ছ পাকাইয়া পাকাইয়া কুঞ্চিত (spiral) করিয়া কেমন করিয়া কেশবন্ধ রচিত হইত তাহার নিদর্শন এখন নীলগিরির টোডা স্ত্রীলোকদের কেশরচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। মালাবারের স্ত্রীলোকেরা এখনও ধম্মিল্ল এবং অলকচূড়ক পদ্ধতিতে খোঁপা বাঁধিয়া থাকে।

সিংহাসন-লক্ষণ।

রাজাদের চতুর্ব্বিধ অভিষেকে বসিবার জন্য সিংহাসনও চতুর্ব্বিধ আকারে নির্ম্মিত হইত। প্রথমাভিষেকের সিংহাসনের নাম প্রথমাসন; মঙ্গলাভিষেকে ব্যবহৃত সিংহাসনের নাম মঙ্গলাসন; বীরাভিষেকের সময় যে সিংহাসন ব্যবহার্য্য তাহা বীরাসন; এবং বিজয়াভিষেকে ব্যবহৃত সিংহাসন বিজয়াসন। দেবমূর্ত্তি বসাইবার জন্য এই চতুর্ব্বিধ সিংহাসনই ব্যবহৃত হয়।

সিংহাসনের গঠন, ভূষণ এবং অলঙ্কার-পরিপাট্যের তারতম্যে তাহার দশ বিভিন্ন নাম এইরূপ—পদ্মাসন, পদ্মকেশর, পদ্মভদ্র, শ্রীভদ্র, শ্রীবিশাল, শ্রীবন্ধ, শ্রীমুখ, ভদ্রাসন, পদ্মবন্ধ এবং পদবন্ধ। ইহাদের কোনো-কোনোটির খুব বিস্তারিত বিবরণ শাস্ত্রে দেওয়া আছে, কিন্তু তৎকালে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ এখন বুঝিতে না পারাতে বিবরণের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করা কঠিন হইয়াছে।

প্রথমাসনের প্রস্থ ১৫ হইতে ৩১ অঙ্গুল; এই প্রস্থের মাপ বিজোড় অঙ্গুলীর হওয়া নিয়ম, তাহাতে নয় প্রকার মাপের সিংহাসন করিতে পারা যায়,—যথা—১৫,১৭,১৯, ২১, ইত্যাদিক্রমে ৩১ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত। সিংহাসনের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দ্বিগুণ বা দেড়গুণ বা পৌনে-দুইগুণ হইবে। বীরাসনের প্রস্থ ১৭ অঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুই অঙ্গুলী বাড়িয়া বাড়িয়া ৩৫ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত হইতে পারে। বিজয়াসনের প্রস্থ ২১ হইতে দুই অঙ্গুলী ক্রমে বাড়িয়া ৩৭ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রথমাসনের ন্যায় প্রস্থের অনুপাতে স্থির করিতে হইবে।

প্রথমাসনের উচ্চতা ৯ অঙ্গুলী হইতে এক এক অঙ্গুলী ক্রমে বাড়িয়া ১৭ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ৯ প্রকারের; মঙ্গলাসনেরও ১১ হইতে ১৯ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ৯ রকমের। বীরাসনের ১৩ হইতে ২১ এবং বিজয়াসনের ১৫ হইতে ২৩ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ৯ প্রকারের।

মানসার নামক শাস্ত্রে এই-সকল বিবরণের পর সিংহাসন গঠনের অবয়বসংস্থান ও অঙ্গনির্ণয় বিবৃত হইয়াছে। সিংহাসন ভূপৃষ্ঠে অথবা উপপীঠ-পৃষ্ঠে স্থাপিত থাকিবে। পদ্মাসন নামক সিংহাসনের অবয়বের নাম ও পরিমাণ এইরূপ—

	জন্ম বা উপনায়	...	১ অংশ
তদূর্দ্ধে,	অর্দ্ধকম্প	...	½ অংশ
"	মহাপদ্ম	...	১¾ "
"	কর্ণবৃত্ত ও		
"	পদ্মক	...	১½ "
"	কঙ্কক বা গল	...	½ "
"	উপরি	...	½ "
"	কম্প-বৃত্ত-দল	...	অনুল্লেখ
"	কম্প-পদ্ম	...	"
"	কুম্ভ-বৃত্ত	...	১ অংশ
"	পদ্ম	...	½ "
"	নিম্ন-বৃত্ত	...	½ "
"	কম্প	...	½ "
"	গল	...	২ "
"	কম্প-বৃত্তক	...	১ "
"	নিম্নকম্প	...	অনুল্লেখ
"	কপোত	...	"
"	আলিঙ্গ		
"	অন্তরিত ও	...	১ অংশ
"	প্রতিবাদন		
		মোট	২২ অংশ

বৃত্তকম্পগুলি এমন ভাবে সাজাইতে হইবে যেন পরস্পরে সামঞ্জস্য ও মিল থাকে। প্রত্যেক অবয়বকে পত্র, পুষ্প এবং পশুপক্ষী ও ব্যালমূর্ত্তির দ্বারা সুসজ্জিত করিতে হইবে। দুই প্রান্তে বিপরীত মুখে দুইটি মকর-মুখ সংযুক্ত থাকিবে। কপোত নামক অবয়বে অনেকগুলি নাসিকা সংযুক্ত থাকিবে এবং নাসিকাগুলিতে কবরীবক্ত্র অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতির মুখ অঙ্কিত থাকিবে। সিংহাসনের চারকোণে পল্লব পত্র অঙ্কিত হইবে। কপোত, মহাপদ্ম প্রভৃতি অঙ্গে কেশরদলযুক্ত পদ্ম অঙ্কিত হইবে; বৃত্তকুম্ভ বা কুমুদ নামক অঙ্গকে কটক এবং পট্ট প্রভৃতি অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে। গল নামক অঙ্গ সিংহাসন-নির্ম্মাতার ইচ্ছা অনুসারে দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অসামঞ্জস্য হইয়া দেখিতে অসুন্দর না হয়; গলপ্রদেশকে প্রকৃত জীবনের ঘটনাবলীর দ্বারা এবং যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও বিদ্যাধর প্রভৃতির মূর্ত্তির দ্বারা ও বিবিধ-প্রকারের পট্ট দ্বারা পরিভূষিত করিতে হইবে। এইরূপ অলঙ্কার-ভূষিত সিংহাসনের নাম পদ্মাসন।

যদি পদ্মাসনের নীচে আর-একটি উপপীঠ থাকে তবে সেই সিংহাসনকে পদ্মকেশর বলে। উপপীঠের গঠনে ক্ষুদ্রকম্প, বৃত্তকম্প, অম্র-কম্প প্রভৃতি অঙ্গ সংযুক্ত করিতে হইবে। উপপীঠের গলদেশ নৃত্যপর মনুষ্য ও পক্ষীর প্রতিকৃতি এবং ক্ষুদ্র-শলা নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকার্য্যের দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে। এবং পঞ্জর নামক অঙ্গের নিম্নে তোরণ সংযুক্ত থাকিবে। এই সিংহাসন সকল দেবতা এবং চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের বসিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে।

পদ্ম-ভদ্র নামক সিংহাসনের অঙ্গসংস্থান এইরূপ—

	জন্ম বা উপনায়	...	১ অংশ
তদূর্দ্ধে	ক্ষেপণ	...	¼ "
"	অম্বুজ	...	১¾ "
"	নিম্ন		
"	বৃত্ত-নিম্ন	...	১ "
"	জ্ঞান-কম্প		
"	বপ্রতুঙ্গ	...	৫ "
"	হর্ম্ম্যবৃত্ত		
"	পদ্ম	...	১ "
"	বৃত্তক		
"	পদ্ম		
"	কুমুদ	...	অনুল্লেখ
"	বৃত্ত		
"	হর্ম্ম্যবৃত্ত		
"	পদ্ম	...	১ অংশ
"	কম্প		
"	কর্ণ	...	৩ "
"	কম্প		
"	পদ্ম	...	১ "
"	বৃত্ত		
"	কপোত	...	২ "

„ আলিঙ্গ
„ অন্তরিত } ... ১ অংশ
„ প্রতি (বাজ বা শরপক্ষ)
„ কম্প ...

মোট অংশ ২১

অধিরাজ-উপাধিধারী রাজারা এই পদ্ম-ভদ্র সিংহাসনে বসিবার অধিকারী।

শ্রীভদ্র নামক সিংহাসনে নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি থাকা উচিত—

জন্ম বা উপনায়	...	১ অংশ
তদূর্দ্ধে বাজন বা শরপক্ষ	...	১/২ „
„ ক্ষুদ্র-বেত্রক	...	১/৪ „
„ মহাম্বুজ	...	৫ ১/৪ „
„ নিম্ন	...	১/২ „
„ পদ্ম	...	১/২ „
„ কুমুদ	...	২ „
„ অম্বুজ	...	১/২ „
„ ঊর্দ্ধকম্প	...	১/২ „
„ গল	...	৩ „
„ কম্প-পদ্ম	...	১ „
„ কপোতক	...	২ „
„ আলিঙ্গনান্তরিত } „ প্রতিবাজন }	...	১ „

মোট অংশ ১৬

এই আসন অধিরাজ এবং নরেন্দ্রদিগের বসিবার জন্য। এই আসনেরও প্রত্যেক অঙ্গ বিবিধ কারুকার্য্যের দ্বারা পরিভূষিত করিতে হইবে।

শ্রীবিশাল নামক সিংহাসনের অঙ্গসন্নিবেশ এইরূপে করিতে হইবে—

জন্ম	...	২ অংশ
তদূর্দ্ধে পদ্ম	...	১ „
„ বৃত্ত-বেত্রক	...	১/২ „
„ অগ্রকম্প	...	১/২ „
„ বৃত্তক	...	১/২ অংশ
„ গল	...	৩ „
„ বৃদ্ধি	...	১/২ „
„ উপরিপঙ্কজ	...	১/২ „
„ বৃদ্ধি	...	১/২ „
„ দল	...	১/২ „
„ মধ্যবৃত্ত	...	১ „
„ পদ্ম	...	১/২ „
„ আবৃত বেত্রক	...	১/২ „
„ অগ্রপট্ট	...	অনুল্লেখ
„ গল	...	৩ অংশ
„ অগ্রপট্ট	...	অনুল্লেখ
„ বৃত্ত-বেত্রক	...	„
„ ঊর্দ্ধপদ্ম	...	„
„ বাজন	...	১ অংশ
„ অগ্রবৃত্ত	...	অনুল্লেখ

মোট অংশ ২২

এই আসন পার্থিক-উপাধিধারীদিগের বসিবার জন্য। ইহার ঊর্দ্ধগলপ্রদেশ পত্র পুষ্প যক্ষ ইত্যাদির প্রতিকৃতি দ্বারা এবং নিম্নগলপ্রদেশ সিংহ প্রভৃতি জন্তুর প্রতিকৃতি ও পত্রবল্লীর দ্বারা ভূষিত থাকিবে।

উপরে বর্ণিত শ্রীবিশাল নামক সিংহাসনের মধ্যে বৃত্ত-নির্গম বপ্র-মধ্য প্রভৃতি অঙ্গ সন্নিবিষ্ট করিয়া কারুকার্য্যের অল্প স্বল্প পরিবর্ত্তন করিলেই শ্রীসংজ্ঞ বা শ্রীবন্ধ নামক সিংহাসন প্রস্তুত হয়। তাহা পট্টধরদিগের ব্যবহার্য্য।

ঐ সিংহাসনে এক অংশ চওড়া একটি অগ্রপট্টিকা মধ্যকুম্ভ নামক অবয়বের অঙ্গে সংযুক্ত করিলেই তাহার নাম হইবে শ্রীমুখ। সেই আসনে মণ্ডলেশ-শ্রেণীর ভূস্বামীরা বসিতে পারেন।

ঐ সিংহাসনে যদি মূলভাগ ও অগ্রবৃত্ত এবং অম্বুজ সংযুক্ত করা না হয় তাহা হইলে তাহার নাম হয় ভদ্রাসন। পট্টভাকেরা এই আসনে বসিবার অধিকারী।

ঐ আসনে জনোপরি অঙ্গের উপরে দুই অংশ চওড়া

অম্বুজ সংযুক্ত করিলে তাহাকে পদ্ম-বন্ধ বলে এবং তাহাতে প্রাহারকেরা বসিতে পারেন।

পদবন্ধ নামক সিংহাসনের অঙ্গসংস্থান এইরূপ—

জন্ম	...	২ অংশ
তদূর্দ্ধে পদ্ম	...	৩ "
" কম্প	...	১ "
" বপ্র	...	৮ "
" পদ্ম	...	১ "
" কর্ণ বা কণ্ঠ বা বন্ধাংশ	...	৩ "
" কম্প	...	১ "
" কপোত	...	৮ "
" আলিঙ্গ	...	২ "
" বৃত্ত-বেত্রক	...	১ "
	মোট অংশ	৩০

এই সিংহাসনের কর্ণ বা কণ্ঠদেশ সিংহ ব্যাল প্রভৃতির প্রতিকৃতি এবং পুষ্প-পত্রের দ্বারা ভূষিত করিতে হয়। এই সিংহাসনে অস্ত্রগ্রাহী রাজারা বসিতে পারেন।

সিংহাসনের পশ্চাতে খিলানের মতন আকারের ঠেসান দিবার যে অংশ থাকে তাহার পারিভাষিক নাম তোরণ। এই তোরণ বৃত্তাকার, অর্দ্ধবৃত্তাকার, ত্রিভুজাকার, ধনুকাকার, বৃত্তাভাসের আকার অথবা অন্য যে-কোনো আকারের হইতে পারে। আলঙ্কারিক ভূষণের তারতম্য অনুসারে তোরণ চতুর্ব্বিধ। যে তোরণ লতা-পত্রের দ্বারা বিভূষিত হয় তাহার নাম পত্রতোরণ; যাহাতে পুষ্প খচিত থাকে তাহার নাম পুষ্পতোরণ; যাহাতে রত্নমণি খচিত করা হয় তাহার নাম রত্নতোরণ; এবং যাহাতে উপরোক্ত সর্ব্ব-প্রকারের অলঙ্কার এবং যক্ষ বিদ্যাধর প্রভৃতির মূর্ত্তি সংযুক্ত থাকে তাহাকে চিত্রতোরণ বলে। প্রত্যেক তোরণের মধ্যস্থলে গন্ধর্ব্বগায়ক তুম্বুরু ও স্বর্গগায়ক নারদ ঋষির মূর্ত্তি খোদিত করিতে হয়। তোরণের দুই পার্শ্বে নীচের দিকে দুইটি মকরমুখ সন্নিবেশিত থাকিবে এবং তাহাদের মুখ হইতেই যেন তোরণ নির্গত হইয়াছে এইরূপ ভাবে তোরণ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। মকর কিন্নর প্রভৃতির মূর্ত্তির অঙ্গে মণিরত্ন খচিত করিতে হইবে। তোরণের শীর্ষদেশের মধ্যস্থলে দুই পার্শ্বে দুই হস্তীর দ্বারা সংরক্ষিত লক্ষ্মীমূর্ত্তি সংলগ্ন করা যাইতে পারে। লক্ষ্মীর মূর্ত্তিটিকে সর্ব্বপ্রকার রত্ন ও অলঙ্কারে পরিভূষিত করিতে হইবে।

তোরণের পরিমাণ এইরূপ—

পদ বা স্তম্ভের উচ্চতা	৫ বা ৬ বা ৭ অংশ
তোরণের উচ্চতা	৩ অংশ

সিংহাসন ও তোরণের সকল অঙ্গের নাম ও পরিমাণ যে সম্পূর্ণ বা সহজবোধ্য এমন কথা বলা যায় না। পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থও কোনো শাস্ত্রে কোথাও ব্যাখ্যা করা নাই। যে-সকল শিল্পী সিংহাসন গঠন করে তাহারা পুরুষানুক্রমে শিক্ষিত ও ধারাগত আদর্শ অনুসারে গঠন করিয়া থাকে, তাহারাও কোন্ অঙ্গের কি নাম তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। প্রচলিত সিংহাসনের নমুনার সহিত শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অঙ্গসংস্থান ও পরিমাণ পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ এইরূপ বলিয়া মনে হয়—

জন্ম—সিংহাসনের ভিত্তিভূমি বা যেখান হইতে সিংহাসনের জন্ম বা উদ্ভব আরম্ভ হইয়াছে।

উপনায়—আগমন অর্থাৎ যেখান হইতে সিংহাসন উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করে।

পদ্ম, মহাপদ্ম, অম্বুজ, মহাম্বুজ—পদ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও বিকশিত অবস্থার বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ পারিভাষিক শব্দ।

কুমুদ—কুমুদপুষ্পের আকৃতি।

কর্ণবৃত্ত—কর্ণ বোধ হয় তাহাই, বাংলায় যাহাকে কন্ধা বলে। বাংলার প্রতিমার কানের কাছেই মুকুটের সঙ্গে কন্ধা চৌদানি (বৃত্তাকার মাকড়ী) সংলগ্ন করার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। অতএব কর্ণবৃত্ত সেইরূপ কোনো অলঙ্কার হওয়া সম্ভব।

কম্প—কম্পিত রেখা-বিন্যাস।

বৃত্ত, বৃত্তক প্রভৃতি—গোলাকার রেখাবিন্যাস। যে বৃত্ত একটু উঁচু করিয়া তোলা থাকে (Relief), তাহাকে উপরি-বৃত্ত, এবং যাহা গোল কৌটার মত খোদা থাকে, তাহাকেই নিম্নবৃত্ত বলে বলিয়া অনুমান হয়।

—এক নক্সার সহিত অপর নক্সার সংযোগ। এক বৃত্তের কেন্দ্র দিয়া অপর বৃত্তের পরিধি টানিয়া বৃত্ত শৃঙ্খল।

অন্তরিত—ছাড়া-ছাড়া।

আলিঙ্গান্তরিত—কোথাও সংযুক্ত কোথাও বিচ্ছিন্ন।

প্রতিবাদন—বিপরীত বা বিরুদ্ধ ভাবে সংস্থিত।

বাজ—শরপক্ষ বা শরের গায়ে সংযুক্ত পক্ষের পুঙ্খ সদৃশ রেখা অর্থাৎ গায়ে গায়ে খুব ঘেঁষাঘেঁষি কোণাকৃতি রেখা-বিন্যাস।

নিম্ন—গর্ত্ত করিয়া খোদা রেখা বা বৃত্ত প্রভৃতি।

উপরি বা ঊর্দ্ধ—রেখা বৃত্ত বা আসল নক্সাটি উঁচু করিয়া রাখিয়া তাহার পাশ খুদিয়া ফেলা (relief)।

ঊর্দ্ধকম্প—উচ্চ করিয়া খোদিত কম্পিত রেখা।

নিম্নকম্প—গর্ত্ত বা খাল করিয়া খোদিত কম্পিত রেখা। *

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবোধ

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?
ভাল কাপড় ফেলে কেন
শাদা কাপড় পর্‌লে হেন,
হাতের শাঁখা মাথার সীঁদুর কোথায় গেল চ'লে,
এমন কেন হ'লে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হ'লে মাগো এমন কেন হলে?
আদর ক'রে কোলে তুলে
বাবার কথা কওনা ভুলে,
ভরা তোমার চক্ষু দুটি সব সময়ে জলে,
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?
বল্‌ছি তোমায় এত ক'রে
কথার জবাব দাওনা মোরে,
এক দৃষ্টে চাইছ শুধু চক্ষু ছলছলে,
এমন কেন হ'লে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?
লুকিয়ে বাবার ছবিখানি
কেন দেখ নাহি জানি,
আর কেন মা কেঁদে কেঁদে ভেজাও তাহা জলে,
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?
রাতের বেলা ঘুমোও নাকো
আপন মনে কাঁদতে থাকো,
আমারে আর পাড়াও না ঘুম "ঘুম-পাড়ানি" ব'লে,
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?
বকেছে কি বাবা তোমায়
রাগ করেছ, কাঁদছ কি তাই?
চুপ্ কর মা, ক্ষমা চাইবে এসে নয়ন-জলে,
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?
বাবার দেখা অনেক দিনই
পাইনি; কোথায় গেছেন তিনি,
রাগ করে' কি? আনব খুঁজে যেথায় যান না চলে,'
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে?

মালদহ — শ্রীনন্দদুলাল দত্ত।

---

* মডার্ণ-রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাওএর লিখিত Kings Crowns and Thrones in Ancient and Medieval India, with Pen and Ink Sketches নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।

কষ্টিপাথর

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে ?

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তন স্যার আশুতোষ দ্বারাই হইয়াছে, এই তথ্য কতদূর বিচার-সহ ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা বি-এ পরীক্ষায়ও পাঠ্য ছিল—বি-এতে পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা, বত্রিশ-সিংহাসন, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ইত্যাদি গদ্য-পদ্য, সাহিত্য এবং ব্যাকরণও ছিল। তৎপর ১৮৬৯ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত পুরুষ-পরীক্ষার্থীর জন্য এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষায় বাঙ্গালা উঠিয়া গেল। এণ্ট্রেন্স সংস্কৃতের সঙ্গে ও একটা ইংরেজীতে বাঙ্গালা অনুবাদের পরীক্ষা গৃহীত হইত।

১৮৮৫ হইতে পরীক্ষা-প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে—কিন্তু বাঙ্গালা তেমনই থাকিয়া গেল। কেবল ১৮৮৬ অব্দ হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অনুবাদের সঙ্গে বাঙ্গালা রচনা লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

১৮৯১ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে তদানীন্তন ভাইস-চ্যানসেলার স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—

"I also deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worth study. * * * In laying stress upon the vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation unless knowledge is disseminated through our own vernaculars."

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবেশ অথবা পুনঃপ্রবেশ-ব্যাপারের শুভ স্বস্তিবাচন করিয়াই স্যার গুরুদাস ক্ষান্ত হইলেন না। অল্পদিন পরে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ সংস্থাপিত হইল, পরিষদের ১৩০১ সালের ১১ই ভাদ্র (১৮৯৪ অব্দের ২৬শে আগষ্ট) তারিখের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মহোদয়দ্বয়ের পত্রানুসারে পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপিত হইল যে, প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিগণের গণিত ভূগোল ও ইতিহাসের পরীক্ষা তাহাদের মাতৃভাষায় গৃহীত হউক; এফ্-এ, বি-এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নির্দ্ধারিত হউক। এই প্রস্তাব উপলক্ষে তর্কবিতর্ক হইয়া "অবশেষে স্থির হইল যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়দিগকে অনুরোধ করা হউক যে তাঁহারা এ বিষয়ের অনুকূল প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক একটি নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন। করিলে পরিষদ তৎসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন।" (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, প্রথম ভাগ—২য় সংখ্যা, ১২২ পৃষ্ঠা।)

এই কমিটী একটি স্যার্কুলার-পত্র শিক্ষানুরাগী প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেখিয়া প্রায় ২০০ জনের নিকটে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের উত্তর পাইয়া একটি রিপোর্ট পরিষদের সভাপতির নিকটে দাখিল করেন। (পরিষদ-পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ, ২য় সংখ্যার পরিশিষ্ট।) উহা পরিষদে ১৩০২ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হইলে স্থির হইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট-সমীপে পত্র লেখা হইবে—এবং সেই পত্রের মোসাবিদা করিবার ভার স্যার গুরুদাস গ্রহণ করিলেন।

১৮৯৫ অব্দের ৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সেই চিঠি (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ—৩য় সংখ্যা ৩৯৯ পৃষ্ঠা) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকটে প্রেরিত হইল।

পরবর্ত্তী বর্ষের মার্চ্চ মাসে ফেকাল্‌টি অব্ আর্টসএর অধিবেশনে স্বয়ং স্যার গুরুদাস ঐ আবেদন-পত্র পেশ করেন, এবং বহু আলোচনার পরে এতদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ-কল্পে একটি কমিটি গঠিত করা হয়, তাহাতেও স্যার গুরুদাস বলেন। স্যার আশুতোষ ঐ কমিটিতে ছিলেন। তবে তিনি যে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। উপরিউক্ত ফেকাল্টির ১২ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন—তাহাতে স্যার গুরুদাসের নাম সর্ব্বাগ্রে দৃষ্ট হয়। আবার স্যার গুরুদাসেরই প্রস্তাবে এবং স্বর্গীয় নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সমর্থনে উহা পরিগৃহীত হয়। অবশেষে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সেনেট্ সভাতে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং স্যার গুরুদাসের সমর্থনে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, এফ-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার রচনা-পরীক্ষা গৃহীত হইবে, কিন্তু উহাতে উত্তীর্ণ না হইলেও কাহারও এফ-এ, বি-এ, পাশের ব্যাঘাত হইবে না—উত্তীর্ণ হইলে সার্টিফিকেটে তাহা উল্লেখিত হইবে।

লর্ড কর্জ্জনের আমলে যে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে স্যার গুরুদাস সভ্য ছিলেন। এই কমিশন যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে আছে:—

"The vernacular languages should be introduced (as at Bombay) in combination with English as a subject for M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough and scholastic study of the subject. The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the cultivation and development of vernacular languages * * *. We hope that the inclusion of vernacular languages in the M. A. course will give an impetus to their scholarly study * * *. We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course although there need be no teaching of the subject.

ইহাতে স্যার গুরুদাসের হাত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। স্যার আশুতোষ এই কমিশনের যে-সকল অধিবেশন বাঙ্গালা প্রদেশে হয় তাহাতে "লোকেল মেম্বর" স্বরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু রিপোর্টে তাঁহার হাত ছিল না।

এই কমিশনের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ায় পেশ্ হইবার পরে ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভার্সিটিস্ এক্ট পাশ্ হয়; তার পরে ঐ রিপোর্ট এবং এক্ট অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "নিউ রেগুলেশনস্" হয়। অবশ্য স্যার আশুতোষের এই রেগুলেশনগঠনে কৃতিত্ব খুবই আছে—কিন্তু নূতন বিধানে বাঙ্গালা ভাষা যে-ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তাহাতে

স্যার আশুতোষের উদ্ভাবিত নূতন কিছু আছে বলিয়া তো দেখা যাইতেছে না। তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলার-রূপে সুদীর্ঘকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, এবং এখনও অন্ততঃ বাঙ্গালা-পাঠ্যাদিবিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব আছে। যদি তিনি বঙ্গভাষায় পূর্ব্বের মত গদ্য-পদ্য সাহিত্য ও ব্যাকরণ পাঠ্য করিতে পারিতেন, যদি দেখিতাম, প্রত্যেক কলেজে ইংরেজী এবং সংস্কৃতের ন্যায় বঙ্গভাষারও সাহিত্যাদির অধ্যাপনা হইতেছে, তবে বরং অবনতমস্তকে তাঁহার প্রশংসা-বাক্যের অনুমোদন করিতাম। বরং রীডার নিয়োগে এবং রচনা-রীতির আদর্শ বলিয়া বাঙ্গালা পুস্তক নির্ব্বাচনে তিনি যথোচিত বিচক্ষণতা ও নিরপেক্ষতা দেখাইতে না পারিয়া অপ্রশংসারই ভাজন হইয়াছেন।

(নব্যভারত, মাঘ) শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ।

* * *

কাঁটাল।

আপনারা অনেক রকম ফুল দেখিয়াছেন,—কিন্তু কাঁটালের ফুল দেখিয়াছেন কি ?

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন কোনও ফুল অফুটন্ত অবস্থায় থাকে তখন সবুজ রংয়ের একটা 'খাপ' দিয়া যেন ফুলটা আগাগোড়া মোড়া থাকে। ঐ খাপটাকে ইংরেজীতে কেলিক্স (Calyx) বলে; বাঙ্গালায় উহার অর্থ বহির্দল। ফুল ফুটিবার সময় ঐ 'খাপটি' ফাটিয়া যায়, আর তাহার মধ্য হইতে নানা বর্ণের চাকচিক্যময় ফুল বাহির হইয়া আইসে। ইহাই ফুল ফোটার মোটামুটি ইতিহাস।

ফুলের দুরকম জাতি আছে—'স্ত্রীজাতীয় ফুল' আর 'পুরুষজাতীয় ফুল'। স্ত্রীজাতীয় ফুলকে আমরা 'স্ত্রীপুষ্প' এবং পুরুষ ফুলকে 'পুংপুষ্প' বলিব। বাঙ্গলা ভাষায় যাহাকে আমরা পরাগ বা পুষ্পরেণু বলি তাহা পুংপুষ্পেই জন্মায়। ইংরেজীতে এই পরাগকে পোলেন (Pollen) বলে। স্ত্রীপুষ্পের বিশেষত্ব এই যে, ইহার বীজাধার বা ওভারি (Ovary) আর পরাগগ্রহণ-স্থান (Stigma) আছে; কিন্তু পরাগকোষ (Anther) নাই, সুতরাং পরাগও (Pollen) নাই। ওভারি শব্দের প্রকৃত অর্থ যদিও জরায়ু নয়, তথাপি উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎপণ্ডিতগণ জরায়ু শব্দ ওভারি (ovary) অর্থেই ব্যবহার করেন। যাহার মধ্যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহাই জরায়ু। ফুলের জরায়ুর আকৃতি অধিকাংশস্থলেই ঠিক খাবার জল রাখিবার "কুঁজোর" মত, তবে অত্যন্ত ছোট, এই যা প্রভেদ। কুঁজোর অগ্রভাগটা যে-রকম লম্বা আর ফাঁপা, ফুলের জরায়ুর অগ্রভাগটাও সেই-রকম লম্বা আর প্রায়-ফাঁপা এবং ঐ লম্বা প্রায়-ফাঁপা অগ্রভাগের ঊর্দ্ধপ্রান্তকেই ষ্টিগ্‌মা (Stigma) বলে।

ফুলের যৌবনকাল আগত হইলে ষ্টিগ্‌মার অগ্রভাগটি সরস হইয়া উঠে। মধুলুব্ধ রূপমুগ্ধ মধুমক্ষিকা বা অন্যান্য কীট পতঙ্গ যখন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গমনাগমন করে তখন তাহাদের অঙ্গলিপ্ত পুংপুষ্পের পরাগ, পরিপুষ্ট স্ত্রীপুষ্পের সরস ষ্টিগ্‌মার উপর লিপ্ত হইয়া যায়। পরে ঐ পরাগ নিজ দেহ বৃদ্ধি করিয়া বর্দ্ধিত দেহভাগ সেখান হইতে ষ্টিগ্‌মার ছিদ্রপথে ওভারি বা জরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয় এবং তথায় (জরায়ু-মধ্যে) পুষ্পপরাগ ও বীজকোষ পরস্পর মিলিত হইয়া সন্তানরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই ফুলের সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত জীবনীকথা। এ ছাড়া বায়ু-চালিত পরাগসহবাসে গর্ভধারণও ফুলের মধ্যে বিরল নয়।

'ডুমুর ফল' Inflorescence অর্থাৎ পুষ্পগুচ্ছ। কাঁটালও প্রথমাবস্থায় একটা Inflorescence অর্থাৎ "গুচ্ছপুষ্প"।

প্রায় সকল ফুলই সবুজরংয়ের কেলিক্স্ নামক পুষ্পাবরণটাকে ছিন্ন করিয়া আপনাপন সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত দেহ লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, কিন্তু কাঁটালের ভাগ্যে আর সে মুক্তিটুকু ঘটে না। কেলিক্স্ এখানে কাঁটালের অস্তিমদশা পর্য্যন্ত ছিন্ন হয় না। কাঁটালের বহির্ভাগে কণ্টকাবৃত বর্ম্মসদৃশ যে অংশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা "কাঁটাল" নামক গুচ্ছপুষ্পের কেলিক্স্। অভ্যন্তর-ভাগে ভীমের গদার ক্ষুদ্র সংস্করণের ন্যায় যে দণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় সেটা আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গুচ্ছপুষ্পের কাণ্ডবৃন্ত (Rachis) (বাংলা নাম ভূতী)। কাঁটালের ভিতর পাতার মত যে-সব জিনিস (বাংলা নাম চাঁপা) দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ফুলের পাপড়ি, আর কাঁটালের যে-সমস্ত কোয়া (কোষ)—যেগুলিকে আমরা পরম পরিতোষ-সহকারে ভোজন করি—তাহা কাঁটাল নামক গুচ্ছ পুষ্পের জরায়ু। এই জরায়ুর মধ্যে আমরা কাঁটালের ভবিষ্যৎ-বংশধরকে বীজরূপে দেখতে পাই। কাঁটালের গর্ভাধান মক্ষিকা দ্বারা হয় না—কাঁটালের সহজাত পরাগ-সহবাসে গর্ভাধান হয়।

(বিজ্ঞান, ডিসেম্বর) শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সাহা।

পঞ্চশস্য

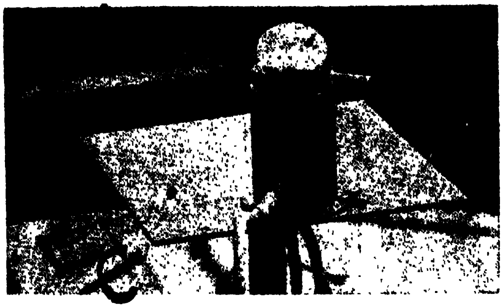
সূর্য্যের শক্তিপরীক্ষা—

পৃথিবীতে আমরা নিত্য যত শক্তিলীলা দেখিতে পাই, সে সমস্তই সূর্য্য হইতে আইসে। কিন্তু তাহার অতি অল্প অংশই আমরা কাজে লাগাইতে পারি। বৃক্ষলতা এই শক্তির কিয়দংশ নিজ নিজ শরীরে সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং অবশিষ্টাংশ মহাশূন্যে বিকীর্ণ হইয়া যায়। আজ আমরা যে পাথুরিয়া কয়লা জ্বালাইয়া কল, কারখানা, গাড়ী প্রভৃতি চালাই, তাহা শত শত বৎসর পূর্ব্বে সঞ্চিত সূর্য্যশক্তির নগণ্য অংশমাত্র। এখন আমরা পুঁজি ভাঙ্গিয়া খাইতেছি, কারণ বর্ত্তমানে পাথুরে কয়লার সৃষ্টি হইতেছে না বলিলেই হয়। ফলে একদিন নিশ্চয়ই আমরা দেউলিয়া হইয়া পড়িব, অথচ বর্ত্তমানে আমাদের চারিদিকে সূর্য্যতাপে প্রচুর শক্তি অযথা নষ্ট হইতেছে।

এই বিরাট শক্তিকে কাজে লাগানো যায় কিনা তাহাই স্থির করিবার জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আবহ-সমিতি রৌদ্রের উত্তাপ ও শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছেন। আবহের সঙ্গে সূর্য্যতাপের সম্বন্ধ স্থির করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই যন্ত্রগুলির মধ্যে রৌদ্রমান (Pyrheliometer) অন্যতম। এই রৌদ্রমান যন্ত্রটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম রৌদ্রশোষক; এই অংশটি ছাদের উপর রৌদ্রে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইস্পাতের বাক্সে আঁটা একটি ছোট কাচগোলকের মধ্যে সমান-মোটা প্লাটিনাম-তারে জড়ানো চারিটি বর্গাকৃতি অভ্রখণ্ড থাকে। চারিটি খণ্ডের মধ্যে দুটি খণ্ডের গায়ে কালো এনামেল মাখাইয়া একটি শাদা একটি কালো এমনি করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হয়। অভ্রখণ্ড-ঘেরা প্লাটিনাম-তারগুলি বিদ্যুৎ-বাহী তার দিয়া নীচে অপর একটি যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে।

শাদা জিনিষের চেয়ে কালো জিনিসের তাপশোষণ-ক্ষমতা বেশী। সুতরাং রৌদ্রে রাখিলে রৌদ্রশোষক যন্ত্রের কালো অভ্রখণ্ডগুলি শাদা খণ্ডগুলির চেয়ে বেশী উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের



রৌদ্রমানের এক অংশ, যাহা রৌদ্রে থাকিয়া রৌদ্রশক্তি শোষণ করে।

পরিবেষ্টক কালো প্লাটিনাম-তারও শাদা তারের চেয়ে বেশী উষ্ণ হয়। আবার শীতল বস্তুর চেয়ে উষ্ণ বস্তু বৈদ্যুতিক প্রবাহকে বেশী বাধা দেয়, ফলে শাদা তারগুলির ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ যত সহজে যাইতে পারে, কালো তারগুলির ভিতর দিয়া তত সহজে যাইতে পারে না। একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই বৈষম্য একটা মোটা চোঙ্গের গায়ে জড়ানো কাগজের উপর ঢেউতোলা রেখা দ্বারা লিখিত হয়। এই রেখা দেখিয়াই যন্ত্রচালক বলিয়া দিতে পারেন সেই দিবসে সূর্য্যদেব কতটুকু স্থানে কতটুকু তাপ দিলেন।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে এক বর্গগজ পরিমিত স্থানে প্রত্যহ গড়ে এক অশ্বশক্তির সমান সূর্য্যকিরণ পড়ে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে একটা শহরের একটি পাড়ার পরিমাণফল ১০,০০০ বর্গগজ, তাহা হইলে প্রত্যেক পাড়ায় প্রত্যহ ১০,০০০ অশ্বশক্তি অনর্থক নষ্ট হইতেছে। যদি এই শক্তি কাজে লাগানো যাইত, তবে প্রত্যেক পাড়ায় ১০০ ঘর গৃহস্থ থাকিলেও তাহাদের আলো, জল, পাখা, রাঁধাবাড়া ইহাতেই চলিতে পারিত।

এই যন্ত্রটি প্রায় ২ বৎসর পূর্ব্বে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট ব্যবহারে লাগান। তখন একবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের পর সকলে বলিতে থাকে যে সূর্য্যের তাপ কমিয়া গিয়াছে। সূর্য্যের পরিবর্ত্তনে পৃথিবীতে পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীতে কোনো পরিবর্ত্তনের ফলে সূর্য্যে পরিবর্ত্তন ঘটিবে একথা বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তখন রৌদ্রমান যন্ত্রও লোকের কথায় সাক্ষ্য দিল। অনুসন্ধানে ও পরীক্ষায় দেখা গেল যে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সমস্ত আকাশ একপ্রকার অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম ধূলিকণায় পূর্ণ হওয়ায় সূর্য্যের তাপ কম বোধ হইতেছিল।

এই যন্ত্রটি কৃষি-বিভাগেও কাজে লাগিতেছে। গাছ কত জল শোষণ করিতে পারে, এবং শস্য কতটা উত্তাপে পুষ্ট হইয়া পাকিয়া ওঠে, এই সমস্ত স্থির করিবার জন্যও রৌদ্রমানের সাহায্য আবশ্যক হইতেছে।

আতসী কাচে সূর্য্যতাপ কেন্দ্রীভূত করিয়া আফ্রিকায় একবার ছোট একটা এঞ্জিন চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এলাহাবাদ প্রদর্শনীতেও রৌদ্রে ভাত রাঁধিয়া দেখানো হইয়াছিল। কিন্তু এ সমস্ত শুধু বৈজ্ঞানিকের পুতুল খেলা মাত্র—ব্যবসাদারী হিসাবে (on a commercial scale) ইহা এখনো সফলতা লাভ করে নাই। ফ্রাঙ্কলিন প্রথমে আকাশের তড়িৎ দিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া দেখান যে তাহাকে দিয়া কাজ করানো যাইতে পারে। পরে ফ্যারাডের আবিষ্কারে এখন বিদ্যুৎ-সাহায্যে অনেক কাজই হইতেছে। তেমনি আশা করা যায় যে বিংশ শতাব্দীর ফ্রাঙ্কলিন-ফ্যারাডের চেষ্টায় ভবিষ্যতে সূর্য্যতাপেই সব কল কারখানা, রেল ষ্টীমার প্রভৃতি চালানো সম্ভব হইবে।



রৌদ্রমানের অপর অংশ যাহা দূরে থাকিয়া রৌদ্রশক্তি লিখিয়া নির্ণয় করে।

ডিম্বের দৃঢ়তা—

একটি টাটকা ডিম হাতের মধ্যে লম্বালম্বি ভাবে রাখিয়া খাড়া ভাবে চাপিয়া ভাঙ্গিতে পারেন এমন কেহই নাই—তা' তিনি যত জবর জোয়ানই হউন। এই দৃঢ়তা সম্প্রতি আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে। রেল-ষ্টেশনে যেমন মাপিবার দাঁড়ী থাকে তেমনি একটা দাঁড়ীর বাক্সের উপর এক খণ্ড কাঠের গায়ে একটা গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে ফেল্ট আঁটিয়া একটি ডিম খাড়া করিয়া বসানো হয়। একটি দণ্ডের (lever) গায়েও ফেল্ট আঁটিয়া তাহা দিয়া ডিমটিতে চাপ দেওয়া হয়। কত চাপ পড়িল তাহা মানদণ্ডে বুঝিতে পারা যায়। পরীক্ষক দেখিয়াছেন যে শাদা ডিমের চেয়ে বাদামী রংএর ডিম বেশী শক্ত। বাদামী ডিমগুলি গড়ে ১৫৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দুই মণ চাপে ভাঙ্গিয়াছে। আর শাদা ডিমগুলি ১২২ পাউণ্ড অর্থাৎ এক মণ ষোল সের চাপে ভাঙ্গিয়াছে। ডিমের খোলাগুলি ·০১৩ হইতে ·০১৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পুরু। এত পাতলা জিনিসের এত চাপসহতা আপাতদৃষ্টিতে



ডিম্বের দৃঢ়তা মাপিবার যন্ত্র।

অসম্ভব, কিন্তু অবস্থাবিশেষত্বের জন্যই এরূপ হয়। আমরা সকলেই দেখিতে পাই যে ছোট ছোট খিলানের উপর প্রকাণ্ড ইমারত খাড়া করা হয়। প্রকৃতি-দেবীও ভবিষ্যৎ জীবের আবাসস্থলস্বরূপ ডিম্বের দুই দিকে দুইটি খিলান প্রস্তুত করিয়া উহাকে সুদৃঢ় করেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্ত।

সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া অ-সাধারণ মানুষে পরিণত হয়—

প্রতিভাবান ব্যক্তি সাধারণ নিয়ম ছাড়া একটা খাপছাড়া ব্যাপার নয়। সকল সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেই যে শক্তি নিহিত আছে তাহার ব্যবহার করিয়া তাহারা অতি সহজে কর্ম্মদক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। একজন পণ্ডিতের মত প্রতিভা অনেকাংশে চেষ্টার দ্বারা অর্জ্জন করা যাইতে পারে।

আমাদের মনের মধ্যে দুটি কুঠরি আছে, একটির মধ্যে আমরা সজ্ঞানে যে-সব চিন্তা করি সেইগুলি নিহিত থাকে। অপরটির সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই; এবং তার মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে আপনা-আপনি অনেক চিন্তা জন্মগ্রহণ করিতেছে। যাহারা এই কুঠরির সঞ্চিত সম্পদ বেশী করিয়া গ্রহণ করিতে পারে তাহারাই কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দ্যাখায়।

প্রতিভা এমন কোনো বিত্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে না যা সাধারণের মধ্যে নাই। কিন্তু সে উন্নতি করে এইজন্য যে তাহার মনের অজ্ঞাত কুঠরির মধ্যে নিহিত শক্তি সর্ব্বদা অতি সহজে তাহার নিকট ধরা দ্যায়।

শিশুদের শিক্ষা আজকাল যে-বয়সে আরম্ভ করা হয় তার চেয়েও অল্প বয়সে যদি আরম্ভ হয়; তাহাদের সামনে যদি যথার্থ উন্নত আদর্শ স্থাপিত হয়; এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামগ্রী যদি সুনিয়ন্ত্রিত হ, তাহা হইলে আমাদের ছেলেমেয়েরা কেবল যে নীতির দিক দিয়া ই যে তা নয়; বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকশক্তিতেও তাহারা প্রতিভাবানদের পাশে দাঁড়াইতে পারিবে। জগতে যে শ্রেষ্ঠ কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার কারণ এ নয় যে জনসাধারণ তাঁহাদের দিকে বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে—জনসাধারণ কি হইতে পারে তাঁহারা তাই নির্দ্দেশ করেন।

মনের যে একটা অজানা গোপন কুঠরি আছে যেখানে আমাদের অজ্ঞাতে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে, মনস্তত্ত্ববিদেরা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই দেখান যে জাগ্রত অবস্থায় যে-সকল ব্যাপারের মীমাংসা হয় নাই কখনো কখনো স্বপ্নে সেগুলির মীমাংসা হইয়া গেছে। অঙ্কশাস্ত্রের অনেক কঠিনতত্ত্ব মীমাংসা হইল না বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার পর স্বপ্নে মীমাংসিত হইয়াছে। এবং ব্যবসায়ে হিসাবের গরমিল খাজাঞ্চি শত চেষ্টাতেও ধরিতে না পারিয়া স্বপ্নে ভুলের নির্দ্দেশ পাইয়াছে এমনও শোনা যায়।

ঔপন্যাসিক সঙ্গীতকার ও চিত্রকরদের জীবনেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। কোলরিজের কবিতা "কুবলা খাঁ" স্বপ্নের মধ্যে রচিত হয়। সঙ্গীতকার টার্টিনীর বিখ্যাত গৎ "The Devil's Sonata" স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনও স্বপ্নের মধ্যে কিছু-কিছু লাভ করিয়াছিলেন। রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন প্রণীত *Doctor Jekyll and Mr. Hyde* এবং অন্যান্য অনেকগুলি উপন্যাস ও গল্পের আদরা তিনি স্বপ্নের মধ্যে পান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর কয়েকটি গল্পের প্লট স্বপ্নের মধ্যে লাভ করিয়াছেন।

কথাটা এই দাঁড়াইতেছে যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরা জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাদের মনের অজ্ঞাত কুঠরি হইতে সেই-সব প্রেরণা (inspiration) লাভ করেন যাহা হইতে সাধারণে প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করে।

প্রতিভাবান ব্যক্তিরা যে-সময়ে কোনো একটি বিশেষ চিন্তা করিতেছেন বা মনকে বিশ্রাম দিতেছেন, অর্থাৎ কোনো চিন্তাই করিতেছেন না, এমন সময় তাঁহাদের মনের উপর কোনো বিরাট চিন্তা আসিয়া পড়িয়া যুগের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

অনেক শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—রচনার সময় মনে হইয়াছে যেন প্রধান ভাবগুলি এবং কখনো কখনো ভাষাও মনের মধ্যে আপনি উদিত হইয়াছে। মোজার্ট স্পষ্টই স্বীকার করিতেন যে তাঁর রচনাগুলি অনায়াসে স্বপ্নের মত আসিয়া উপস্থিত হইত। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সেই অজ্ঞাত শক্তিকে জীবন-দেবতা বলিয়াছেন।

মনের গোপন কুঠরিটি যেন একটি কারখানা; সেখানে প্রত্যেকের "আমি" পূর্ব্বলব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিফলকগুলি নাড়াচাড়া করিতেছে। এবং তাহার ফলে নব-নব চিন্তাধারা উদ্ভূত হইয়া অতি সহজেই আমাদিগকে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দিতেছে।

মৌমাছি পালন—

বহু বৎসর ধরিয়া ভারতীয় মৌমাছি পালন করিয়া এক লেখক পুসা হইতে প্রকাশিত "ভারতীয় কৃষি পত্রিকা"র স্বীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন মৌমাছি, বিশেষ করিয়া মৌমাছির কর্ম্মীরা স্বভাব এবং গুণে যথেষ্ট বিভিন্ন। তাহাদের মধ্যে কেহবা ভালো, কেহবা দরিদ্র, কেহবা কর্ম্মক্ষম এবং যথেষ্ট উৎপাদনক্ষম, আবার কেহবা সংগ্রহ করে কম এবং বাড়েও কম। ভালো মজুর মৌমাছি ভালো মৌচাক রচনা করে। লেখকের বাগানে একটি মৌচাক ছয় বৎসর ধরিয়া আছে; এখনো তাহাতে অবনতির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই এবং তাহা হইতে সকল চাকের চেয়ে বেশী পরিমাণে মধু পাওয়া যায়। এই-প্রকার মৌচাক হইতেই নূতন মৌমাছির উপনিবেশের জন্য রাণী সংগ্রহ করা উচিত। মৌচাকে মৌমাছি বসা বা না বসা আমাদের আয়ত্তাধীনে। মৌচাক হইতে মৌমাছি কমিয়া গিয়া যাহাতে চাকের মোমে পোকা না ধরে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মৌমাছি যদি চাকের সমস্ত অংশ ঢাকিয়া না বসে, তবে যে-অংশ অনাবৃত থাকে, সেইখানে মোমে পোকা ধরে। এই পোকা বা গুটিপোকা একপ্রকার ছোট পতঙ্গের প্রথম সংস্করণ। ইহা ডিম হইতে বাহির হইয়া মৌমাছির শূন্য কক্ষগুলির মধ্য দিয়া মোম খাইতে খাইতে অগ্রসর হয় এবং অচিরে তন্তু দ্বারা সমস্ত শূন্য অংশটি ছাইয়া ফ্যালে। একবার উহা ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে মৌমাছিরা আর বাধা দিতে পারে না—সমস্ত চাকটি তন্তু গুটিপোকা এবং ময়লায় ভরিয়া যায়। তখন মৌমাছিরা বাধ্য হইয়া সে চাক পরিত্যাগ করে। কোনো কারণে মৌমাছির সংখ্যা কমিয়া গেলে যখন সমস্ত কক্ষ আর ভরা থাকে না সেই অবসরে এই মোম-পতঙ্গ চাকের মধ্যে ঢুকিয়া ডিম পাড়িয়া আসে। মৌমাছিরা যখন ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া ব্যাড়ায়, কিংবা শীতের প্রারম্ভে যখন অনেক মৌমাছি মরিয়া যায় সেই সময়েই এরূপ ঘটে। এই সময় মৌমাছিপালককে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়; মৌমাছির সংখ্যা কমিতেছে বুঝিতে পারিলেই সেই অনুসারে চাক ভাঙিয়া ছোট করিয়া দিতে হয়।

মৌমাছির নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার উপায় সম্বন্ধে লেখক বলেন, কোনো ফাঁপা-গাছের মধ্যে মৌমাছির দল বসিয়াছে দেখিতে পাইলে গাছের সেই অংশটি করাত দিয়া কাটিয়া মৌমাছি ও চাক সমেত উঠাইয়া আনা হয়। কয়েকদিন পরে মৌমাছিরা নূতন স্থানে অভ্যস্ত হইয়া আসিলে চাকটি কাটিয়া কাঠের ফ্রেমের মধ্যে রাখা হয়। এবং তাহার মধ্যে মৌমাছিগুলাকে তাড়াইয়া আনা হয়। তার পরে যে-সব গাছে মধুর লোভে মৌমাছি আসা সম্ভব সেইরকম গাছের ডালে ঐ ফাঁপা গাছের টুকরাটা আবার টাঙাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণত শীঘ্রই মৌমাছিরা এরূপ তৈরি বাসস্থান দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে বসবাস আরম্ভ করে। এই কাজের জন্য শুকনো নারিকেল বা তাল গাছই উৎকৃষ্ট। এই গাছগুলি পনের ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা করিয়া করাত দিয়া কাটা হয়। ব্যাসের মাপ নয় হইতে বার ইঞ্চি থাকে। মাঝখানটা কুঁদিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং মোটা তক্তা দিয়া দুইদিক বন্ধ করা হয়। একদিকে কতকগুলি ছোট-ছোট ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্র দিয়া মৌমাছিরা ভিতরে যায়। তারপর উপযুক্ত স্থানে গাছের এই টুকরাগুলি সাজাইয়া রাখা হয়। একেবারে নূতন ঘরের মধ্যে মৌমাছিদের আসিতে একটু বিলম্ব ঘটে। কিন্তু যেগুলির মধ্যে একবার মৌমাছি বাসা করিয়াছে এবং যাহার মধ্যে চাকের অংশ এবং মধু ও মোমের সামান্য গন্ধ বর্ত্তমান, সেখানে মৌমাছিরা শীঘ্রই আসিয়া জুটে। মাঝে-মাঝে বাসাগুলি পরীক্ষা করিয়া দ্যাখা দরকার, কারণ কাঠবিড়ালী ও ইঁদুরের বাসাগুলা তাদেরি জন্য রাখা হইয়াছে ভাবিয়া অনেক সময় তাহার মধ্যে আসিয়া সংসার পাতে।

মৌমাছির যুদ্ধ—

জীবজগৎ একটা যুদ্ধক্ষেত্র। এখানে জোর যার মুলুক তার। দুর্ব্বলের এখানে স্থান নাই; তবে দুর্ব্বল যে কোথাও কোথাও টিকিয়া আছে তার কারণ প্রধানত তাদের প্রজনন-শক্তির প্রাচুর্য্য। পাখী পোকা মাকড় ধরিয়া অহরহ খাইতেছে, কিন্তু পোকা মাকড় হাজারে হাজারে বংশ বৃদ্ধি করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। অনেক সময় সমজাতীয় প্রাণীদের মধ্যে নিদারুণ যুদ্ধ চলিতে দ্যাখা যায়। মানুষ তার মধ্যে প্রধান, এবং কীট-পতঙ্গের মধ্যে মৌমাছি প্রধান।

লোকসংখ্যার আধিক্য, অজন্মা বা লুটতরাজের ইচ্ছা মানুষে মানুষে লড়াইয়ের প্রধান কারণ। মৌমাছিদের মধ্যে লড়াইয়ের কারণও এইগুলি। বৎসরের যে-সময়ে ফুল আর মধু থাকে না তখনই সাধারণত শক্তিমান মৌমাছির দল দুর্ব্বল দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, যে-দল যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহারা নিজেদের মধুচক্র মধুপূর্ণ থাকিলেও পরাজিত দলের মধু লুটিয়া লইতে কসুর করে না। লুটতরাজ শেষ হইলেও যুদ্ধ অনেক সময় চলিতে থাকে। মাথায় তখন লড়াইয়ের নেশা চাপিয়াছে, বিজেতাদল একটা এস্পার-ওস্পার না করিয়া ছাড়ে না।

কবিতার সহিত মধুচক্র ও মৌমাছির অতি নিকট সম্বন্ধ তা সকলেই সকলে জানে। কিন্তু মৌমাছির ব্যবহারে কবিত্ব তো নাইই, বরং স্বার্থপরতা ও বর্ব্বরজনোচিত নিষ্ঠুরতার পরিচয় আছে। আহতদের অতি নিষ্ঠুরভাবে ইহারা হত্যা করে এবং মাতব্বরেরা অকেজো অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহাদের যমালয়ে পাঠাইয়া নিদারুণ বস্তুতন্ত্রতার পরিচয় দ্যায়। পরস্পরকে ইহারা সাহায্য করে না, যদি না সমগ্র-জাতির মঙ্গলের জন্য এরূপ করা প্রয়োজন হয়। ইহাদের অভিধানে দান বা দয়ার নাম মাত্র নাই—আছে কেবল সুশৃঙ্খল কাজ এবং একাগ্রতা।

মৌমাছির যাঁরা রাণী তাঁরা সাধারণ লোকের লড়াইয়ে যোগদান করেন না। লড়াই হয় রাণীতে রাণীতে। জেত্রী ও পরাজিতার অবস্থা প্রায় সমানই হয়। কারণ আক্রান্ত মৌমাছি আক্রমণকারিণীর হুলটি টানিয়া ছিঁড়িয়া লয় এবং জেত্রী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দ্বিধাবিভক্ত দেহে ছুটিয়া পালায়।

অবশ্য আক্রমণকারিণীরা যদি সকলেই নিহত হইত তাহা হইলে মৌমাছির বংশ রক্ষা হওয়া সম্ভব হইত না। শক্তিমতী মৌমাছি দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর অনেক সময় শ্রান্ত ক্লান্ত শত্রুকে মাটির উপর চাপিয়া ধরে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে হুল বাহির করিয়া তাহার শরীরের কোমল অংশে ফুটাইয়া দ্যায়। অনেক সময় মৌমাছিরা মানুষের মত কেল্লার মধ্যে অর্থাৎ মৌচাকের মধ্যে থাকিয়া লড়াই করে। এরূপ লড়াইয়ে অল্পসংখ্যক মৌমাছি মধুচক্রের মধ্যে থাকিয়া অনেক আক্রমণ-কারীকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে।

লড়াইয়ের সময় মৌমাছিরা পাখা ও চিবুকের সাহায্যে পরস্পরকে মরণান্ত আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরে, তারপর হুল ফোটানো চলিতে থাকে। মৌমাছির দল যখন উড়িয়া শত্রুদলকে আক্রমণ করিতে চলে তখন তাহাদের দেখিতে এরোপ্লেনের দলের মত। কিন্তু শূন্যে ইহাদের অধিকক্ষণ লড়াই চলে না। কিছুক্ষণের পরই লড়াইটা মাটির উপর চলিতে থাকে। কখনো কখনো পূর্ণ একঘণ্টা কাল যুদ্ধ চলে। মৌমাছির দল যখন দ্যাখে উভয়দলের সৈন্যসংখ্যা প্রায় সমান, তখন দুইদল দুইমুখে উড়িয়া পালায়। মৌমাছিরা কতক সৈন্য হাতে রাখিয়া দ্যায়। কেল্লা যখন আক্রান্ত হইয়াছে তখন এই সৈন্যদল সহসা আক্রমণকারীদের

...রের উপর দিয়া পড়িয়া কেল্লার মধ্যেকার মৌমাছিদের কাজ সহজ ...রিয়া দ্যায়। মধুচক্র যেখানেই নির্ম্মিত হউক—পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে ...া কাঠের বাক্সের মধ্যে বা চুবড়ির মধ্যে—তাহার দেওয়ালগুলি দুর্ভেদ্য করিবার জন্য একদল মৌমাছি গাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত থাকে। মৌমাছিদের গায়ের মাপে মৌচাকের বাহিরে-আসা ভিতরে-যাওয়ার পথ নির্ম্মিত হয়।

এত সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও আক্রমণকারীর দল যদি কোনোগতিকে ফটক ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করে তাহা হইলে ভিতরের মৌমাছিরা ট্রেঞ্চ বা খাতের লড়াই সুরু করিয়া দ্যায়। সমান্তরাল মোমের সারিগুলি খাতের কাজ করে। কথাটা সহজে বিশ্বাস করা যায় না বটে, কিন্তু ইহা যথার্থ যে স্থানে স্থানে মৌমাছির শান্ত্রী দাঁড়াইয়া থাকে; এবং কোনো মৌমাছি খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া উপস্থিত হইলে শান্ত্রী তাহার নিকট আগাইয়া যায় ও মনে হয় যেন সঙ্কেত-বাক্য জিজ্ঞাসা করে। বাজে মৌমাছি বা অন্য দলের গুপ্তচর ধরা পড়িলে শান্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়া করে বা মারিয়া ফেলে। গুপ্তচর যদি কোনমতে মৌচাকের মধ্যে ঢুকিয়া মধু লুটিয়া লইতে পারিল তাহা হইলে সে অচিরে সঙ্গীদলকে লইয়া ফিরিয়া আসে। এরূপ দুএকবার যাতায়াত করিলেই মৌচাকের মৌমাছিরা ব্যাপার বুঝিতে পারে, এবং সদলবলে গিয়া সহসা শত্রুদের আস্তানা আক্রমণ করে। যে-মৌচাকের রাণী নিহত হয় সেই দল রাণীর অবর্ত্তমানে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী বুঝিতে পারিয়া রণে ভঙ্গ দ্যায়।

লড়াই চলিতে চলিতে রাত্রি আসিয়া পড়িলে যুদ্ধ স্থগিত থাকে। পরদিন আবার আরম্ভ হয়। কখনো কখনো কয়েক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিয়া থাকে। একপক্ষ সম্পূর্ণ জয়ী হইলে অপর পক্ষের সর্ব্বনাশ, কারণ তখন ছোট বড় নির্ব্বিচারে হত্যা চলিবে, কাহারো নিস্তার নাই, এমন কি ডিমগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। যে-মৌমাছি শত্রুর রাণীকে মারিয়া ফেলিতে পারে সে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

স্থ।

দেশের কথা

দেশের প্রধান কথা আজকাল এই যে দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। দেশের সকল দিক হইতেই একই সুর শোনা যাইতেছে—আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, মানুষের অধিকার চাই—সমাজে বা রাষ্ট্রে কোথাও আর হীন হইয়া দাস হইয়া গোলাম হইয়া থাকিব না—এজন্য চাই আমাদের সংস্কার, চাই আমাদের স্বরাজ! বড় লোকের বাড়ীতে আশ্রিত হইয়া থাকিয়া নিত্য পোলাও কালিয়া খাওয়ার চেয়ে নিজের কুটীরে শাক অন্ন আহারও যে উপাদেয় সেই আত্মমর্য্যাদার জ্ঞানের উন্মেষ সমস্ত দেশে দেখা দিয়াছে। ছলে বলে কৌশলে পরকে অবনত করিয়া রাখিলে শুধু যে অধীন জনের অকল্যাণ হয় তাহা নহে, যে প্রভুত্বের মোহে পরকে অবনত করে তাহার নিজেরও অবনতি ঘটে—নিজে অবনত না হইয়া পরকে অবনত করা যে যায় না, ইহাও আমরা বুঝিয়াছি। সেইজন্য সমাজের অবনত জাতিদের উন্নতির জন্য তাঁহারা নিজেরাও যেমন চেষ্টা করিতেছেন দেখিতে পাইতেছি, তেমনি যাঁহারা উন্নত তাঁহারাও চেষ্টা করিতেছেন; রাষ্ট্রে যেমন অধিকার লাভের জন্য প্রকৃতিপুঞ্জ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, তেমনি যাঁহাদের হাতে রাজশক্তি তাঁহারাও ক্রমশ সেই শক্তি সাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। দেশব্যাপী এই যে মুক্তি পাইবার আগ্রহ তাহাকে "বরিশাল-হিতৈষী" উচ্ছ্বসিত যৌবন-তরঙ্গের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন—

পুরাতন ভারতের জন-সাধারণের প্রাণে আজ পূর্ণ যৌবনোচ্ছ্বাস আবির্ভূত—আজ কানে কানে সে উচ্ছ্বাস তীরভূমি প্লাবিত করিয়া বাঁধ ভঙ্গ করিতে চাহিতেছে।

আজ সমগ্র ভারত হোমরুল পাইবার আশায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ জগৎ-জোড়া স্বাধীনতার সঙ্গীত—স্বাবলম্বন-ধ্বনি—মানুষ হইবার প্রচেষ্টা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ ভারত অন্ধ নহে, মধ্যযুগের সে ভ্রান্ত আজ নাই, আজ সমুদ্র-মেখলা হিমালয়-মণ্ডিত ভারতবর্ষ আর নাই—আজ চারিদিক হইতে তাহার অন্ধ নয়ন উন্মীলিত করিতে, রুদ্ধ কর্ণপটহ ভিন্ন করিতে প্রবল আঘাত আসিয়াছে। আজ দীনহীন কাঙ্গাল ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতেছে:—

উঠব মোরা উঠব মোরা
বিধির আদেশ-বাণী।

দেশব্যাপী এই যে যৌবনের জোয়ার ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা আর প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। তাই বঙ্গদেশের দুই ঋষি বঙ্কিম ও রবীন্দ্র দিব্যচক্ষে ভারতের ভবিষ্যৎ দেখিয়া এই যৌবনের পুরোহিত হইয়া যৌবনের মন্ত্র বঙ্গদেশ ছাপাইয়া সমগ্র ভারতে ধ্বনিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহাদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া "বরিশাল-হিতৈষী" তেজস্বী স্বরে উচ্ছ্বসিত আনন্দে প্রচার করিয়াছেন—

এই ন্যায়সঙ্গত মানবের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করা আর প্রজ্বলিত হুতাশনকে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবার প্রয়াস একই রকম। সদয়ভাবে হোমরুল প্রদত্ত হইলে দেশের সমস্ত অশান্তি অভাব অভিযোগ দূরীভূত হইবে—সেই বিশ্বাসে পঞ্চনদ হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত একই সুরে একই প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে। তাহা অমোঘ, সে প্রার্থনা উপেক্ষা করা আর শান্তির যৌবনোচ্ছ্বাস ও ঐরাবতের গঙ্গা-প্রবাহে বাধা প্রদান একই শ্রেণীর অলীক প্রয়াস। তাই রহিয়া রহিয়া মনে হইতেছে:—

এ যৌবন-জলতরঙ্গ
রোধিবে কে?
হরে মুরারে হরে মুরারে।

নিজের ঘরে নিজে কর্ত্তা হইতে চাওয়া স্বাভাবিক অধিকার। সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে কেহ চাহে না। তাই আমরাও হোম-রুল বা স্বরাজ আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। কিন্তু প্রত্যেক কাজের জন্যই যোগ্যতা দরকার। আমাদের সেই যোগ্যতা আছে কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে দ্বিমত দেখা যায়—এক, যাহাদের স্বার্থ আছে আমাদের হীন প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের স্বাধিকারে বঞ্চিত রাখিয়া আমাদের প্রভু হইয়া আধিপত্য করাতে ও দেশের ধনশোষণে, তাহারা বলে যে আমাদের যোগ্যতা এখনো হয় নাই, যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলে আমরা স্বরাজ পাইবার উপযুক্ত হইব ; আর, আমরা বলি যে আমাদের যথেষ্ট যোগ্যতালাভ হইয়াছে, যেখানে যেখানে আমরা যতটুকু স্বাধিকার ফিরিয়া পাইয়াছি তাহার সুসম্পাদনে আমরা কৃতিত্ব ও কুশলতা দেখাইয়াছি, বাকী যে-সব কাজ আমরা করিতে পাই নাই বা আমাদিগকে করিতে দেওয়া হয় নাই তাহাতে আমরা কোনো কৃতিত্ব বা কুশলতা দেখাইবার অবসর পাই নাই ; জলে না নামিয়া যেমন সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি কাজ করিতে না পাইলে তাহাতে যোগ্যতা কৃতিত্ব কুশলতাও অর্জ্জন বা প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু স্বরাজ পরিচালনার উপযুক্ত হইতে হইলে কয়েকটি জিনিসের দরকার—(১) স্ত্রীপুরুষের সমানভাবে শিক্ষা (২) সামাজিক অবস্থায় অবনত ও হীনদিগের উন্নতি (৩) সামাজিক কুসংস্কার ও কুরীতি পরিবর্জ্জন ও সুসংস্কার (৪) শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও পরিপুষ্টির দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি (৫) ধনবৃদ্ধির দ্বারা অন্নকষ্ট-সমস্যার সমাধান (৬) অন্নকষ্ট দূর করিয়া স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধি (৭) বলবৃদ্ধির ফলে সাহসবৃদ্ধি ও অন্যায় প্রতিকারের ক্ষমতালাভ (৮) সমবায় ও শৃঙ্খলা সাধন দ্বারা দুর্ব্বল অজ্ঞ অসমর্থ প্রভৃতির রক্ষা। এক্ষণে ক্রমশ দেখা যাক্ এই কয়টি বিষয়ে আমাদের দেশের গতি অগ্রসর কি না।

(১) শিক্ষা।

স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষার প্রসার যাহাতে হয় তাহার আগ্রহ ও প্রযত্ন দেশের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। —দেশের লোক বুঝিতে পারিয়াছে শিক্ষায় উন্নত হইতে পারিলে মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করে, আত্মা আনন্দিত ও মহৎ হয়, রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রবলের অত্যাচার ও অবিচার হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহার প্রতিকার করা যায়, ব্যাধি কুসংস্কার দুর্ভোগ ও অপব্যয় হইতে পরিত্রাণ লাভ ঘটে। গত একমাসের মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার বা পুরাতন বিদ্যালয়ের উন্নতির নিম্নলিখিত সংবাদগুলি পাইয়া আমরা প্রীত ও আশান্বিত হইয়াছি—

কাজলাকাঠি মধ্য ইংরেজী স্কুল।—বরিশাল জেলার বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাজলাকাঠি গ্রামে একটি মধ্যইংরাজী স্কুল, গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ৩ জন মাষ্টার ২ জন পণ্ডিত শিক্ষক দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে। স্কুলের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। বিদেশী ব্রাহ্মণ ও ভদ্র কায়স্থ ছাত্রদের খোরাক ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত আছে। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি লোকেরা, স্কুল ভালভাবে বজায় রাখিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে।—কাশীপুর-নিবাসী।

ডে-ট্রেইনিং বিদ্যালয়।—বরিশাল সহরের পশ্চিম প্রান্তে বগুড়াপল্লীতে শিক্ষাস্বাস্থ্য-বিধায়িনী সমিতির সম্পাদক প্রভৃতির উদ্যোগে "ডে-ট্রেনিং" নামক একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সর্ব্ব নিম্ন তিন ক্লাশ পর্য্যন্ত এখানে পড়ান হইবে।—কাশীপুর-নিবাসী।

করটীয়ায় নূতন স্কুল।—গত ২৬শে জানুয়ারী করটীয়া এম এ ও স্কুলের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। সকলে জমিদার মৌলবী সাজেদ আলী খান মহোদয়কে তথায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। তিনি তাঁহার পিতৃদেবের নামে একটি নূতন স্কুল স্থাপন করিয়াছেন।—ঢাকা-গেজেট।

বিদ্যালয়।—যশোহর জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত রায় রাধিকাচরণ দত্ত বাহাদুর যশোহর টাউনের উপরে একটি অনাথ-বিদ্যালয় সত্বরই স্থাপিত করিবেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি নিজের ব্যয়েই ৫০টি ছেলে রাখিবেন ও অন্যান্য বালকদিগকেও নানাপ্রকারে সাহায্য করিবেন। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে উক্ত রায় বাহাদুরের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করুন ও এই সদাশয় ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হউন।

—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

নূতন বিদ্যালয়।—কাঁথি মহকুমায় বিভিন্ন স্থানে উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে এই মহকুমাবাসীর ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অন্তরের টানটা যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। এই বেশী দিন হয় নাই, কাঁথি সহরের উপরে একটি এবং মফঃস্বলে মুগবেড়্যা, বসন্তিয়া ও বাহিরীতে এক-একটি নূতন উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুপরিচালিত হইতেছে। সেদিন হেঁড়্যা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়কেও উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। এখন আবার হলুদবাড়ী মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়কে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইতেছে। এ ছাড়া মঙ্গলামাড়ো উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সম্প্রতি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইয়াছে। এবং সায়দা ও বামুনিয়া বিদ্যালয় দুইটিকে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার আয়োজন হইতেছে। দেশে স্কুল কলেজ যত অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়,—দেশের জনসাধারণের মধ্যে যত অধিক শিক্ষা বিস্তার হয়, ততই কল্যাণের বিষয়। কাঁথি মহকুমার চারিদিকে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন যেরূপ

বাড়িতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, এই কাঁথি সহরের উপর কলেজ স্থাপনের যে একটি প্রধান অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে, সেই অভাব পূরণ হইতে অধিক কালবিলম্ব হইবে না। দেশের লোকের উচ্চ শিক্ষার প্রতি যেরূপ হৃদয়ের টান পড়িয়াছে, তাহাতে এই মহদনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থের অভাব হইবে না; কেবল চাই, অধ্যবসায় ও উৎসাহ উদ্যম।—নীহার।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখ অপরাহ্নে নলহাটী হরিপ্রসাদ উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। —বীরভূমবাসী।

শিল্প ও কৃষি স্কুল।—চট্টগ্রাম জোয়ারগঞ্জের সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত ফজলুল কাদের তথায় এক শিল্প ও কৃষি স্কুল খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। মিরেশ্বরী ও ধুম ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ের অদূরবর্ত্তী স্থানে সাহি ৪০ কানি জমি তাঁহারা কৃষিক্ষেত্রের জন্য হস্তগত করিয়াছেন। আপাততঃ তাঁহারা ৩০০০ টাকা চাঁদা তুলিয়া কার্য্যারম্ভ করিবেন। —এডুকেশন-গেজেট।

নিলফামারী মহকুমা শিক্ষাবিষয়ে বড়ই পশ্চাতে পড়িয়া আছে। এত বড় মহকুমার মধ্যে মাত্র দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ডিমলার রাণী শ্রীযুক্তা বৃন্দারাণী চৌধুরাণী মহোদয়া তাঁহার জমিদারী ডিমলা তালুকের নব-প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টি শীঘ্রই উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন। এ-বিষয়ে তাঁহার প্রজাদের খুব উৎসাহ আছে, তাঁহারা এখন হইতেই খাজনার সহিত শিক্ষাকর দিতেছেন। প্রত্যেক জমিদার যদি এইরূপ ভাবে শিক্ষাকর আদায় করিয়া প্রজাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে দেশে শিক্ষার অনেক অভাব মোচন হয়।

—রঙ্গপুর-দর্পণ।

দান।—বীরভূম জেলার হেতমপুরের জমীদার মহারাজকুমার শ্রীসদানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহোদয় সিউড়ি রিভার্স টমসন বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য এককালীন তিন সহস্র টাকা দান করিয়াছেন।—এডুকেশন-গেজেট।

দারুল উলুম মাদ্রাসা।—সরকারী মাদ্রাসা-সমূহে ইংরাজীমিশ্রিত শিক্ষায় আরবী ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া শিক্ষার পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা যেন আদর্শ মাদ্রাসায় পরিণত ও স্থায়ী হয় এই ভাবের আয়োজন হইতেছে। মোট ১৩ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মাদ্রাসা-গৃহ ও ছাত্রাবাস ইত্যাদি নির্ম্মাণ জন্য ২৫০০০ টাকার প্রয়োজন। শ্রীযুত হাজি চান্দমিঞা সদাগর নগদ ৩০০০ তিন হাজার টাকা দিয়া জমি খরিদ করিয়া দিয়াছেন ও ৮০ জন গরীব ছাত্রের মাসিক বেতন দিতেছেন। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ ধনী এ কে জামাল সি,আই ই সাহেব মাসিক ৫০ টাকা ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটী ২০ টাকা সাহায্য দিতেছেন।—জ্যোতিঃ।

মেজিয়া থানার অন্তর্গত গ্রামসমূহের মধ্যে শিক্ষার অভাব বহুদিন হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এ অঞ্চলের গ্রামের মধ্যে একমাত্র মেজিয়া ভিন্ন আর কোন গ্রামে একটিও মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় নাই। যদিও পুরুলিয়া গ্রামে অদ্য কয়েক মাস হইতে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন হইতেছিল তথাপি তাহা এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। রামচন্দ্রপুর গ্রামে একটি নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামবাসীগণ সেই বিদ্যালয়টিকে উচ্চ-প্রাথমিক শ্রেণীতে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রামচন্দ্রপুর গ্রামের স্বনামধন্য পুরুষ ভাগলপুর জেলার লোকেল ও ডিঃ বোর্ডের মেম্বর এবং অনারারি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রামানন্দ পট্টনায়ক মহাশয় স্কুলের জন্য ১২টি বেঞ্চ দান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।—বাঁকুড়া-দর্পণ।

বরাহনগর নিয়োগীপাড়া "শশিপদ ইনষ্টিটিউট" স্থিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও সংস্কারক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার নিজ জন্মভূমি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কুচিয়াকোল গ্রামে একটি "মডেল প্রাইমারী" বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইং ১৯১৩ সালে কুচিয়াকোল গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দেখিয়াছেন যে এই বিস্তৃত গ্রামে একটি আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় উত্তমরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে; তজ্জন্য গ্রামের মধ্যস্থলে ৷৩ কাটা জমি খরিদ করিয়া তাহার মধ্যে একটি ১৯×১০ ফুট এক তলা পাকা-ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আপাততঃ একটি কাঁচা-দেওয়ালী ঘরে স্কুল বসিবে; তাহারও সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে। বেঞ্চ, চেয়ার, টেবল, টানা-পাখা ইত্যাদি কতক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে, আরও কতকগুলি শীঘ্র প্রস্তুত হইবে। ফলতঃ যাহাতে অন্ততঃ ৫০।৬০ জন বালিকা বসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা যদু বাবুর এই সদুদ্দেশ্য সফল হউক।—বাঁকুড়া-দর্পণ।

বহুস্থানেই বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব আছে; স্থানীয় লোকেরা সেই অভাব তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছেন। রঙ্গপুরে যতগুলি বিদ্যালয় আছে তাহা শিক্ষার্থীর তুলনায় অল্প। দলে দলে শিক্ষার্থী ছাত্র প্রত্যাখ্যাত ও বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া "রঙ্গপুর-দর্পণ" বলিতেছেন—

শিক্ষক মহাশয়গণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, সম্ভব হইলেও শিক্ষা-বিভাগের নাগপাশের ফলে আমাদিগের পক্ষে আর ছাত্রগ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। এখন ইহারা যায় কোথায়? সুতরাং রঙ্গপুরে আর-একটী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই, আমরা ইহা কখনই স্বীকার করিতে পারি না।

এ সম্বন্ধে ময়মনসিংহের অবস্থাও এইরূপ—

এই নগরে যে তিনটী উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় আছে তাহার ছাত্র-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। প্রতি-বৎসর প্রায় তিন চারি শত ছাত্র স্থানাভাব-বশতঃ এই-সকল স্কুলে ভর্ত্তি হইতে আসিয়া ফিরিয়া যায়। তাহাদের অনেকের ভাগ্যেই ইহার পর আর শিক্ষালাভ ঘটিয়া উঠে না। এই-সকল কারণে এই নগরে আরও দুই-একটী উচ্চশ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হওয়ার আবশ্যকতা অনেকেই অনুভব করিয়া আসিতেছেন। কেহ কেহ এই নগরে অন্য একটী স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের কর্তৃত্ব ও স্বামিত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে বহু অনাবশ্যক কথা উত্থাপন করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেন নাই। কেহ কেহ এতদিন তাঁহাদের ঐ-সকল আবদার রক্ষা করিয়াই স্কুল স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু এখন শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষগণ এক অতি অদ্ভুত আপত্তি উত্থাপন করিয়া স্কুল স্থাপনে অমত প্রকাশ করিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বলিতেছেন যে, তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন এই নগরের অর্দ্ধসংখ্যক ছাত্র মাত্র তাহাদের পিতা মাতা বা স্বাভাবিক অভিভাবকের অধীনে বাস করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহাদের মতে অপর অর্দ্ধ ছাত্র স্বচ্ছন্দে অন্যত্র যাইয়া পড়িতে পারে। কাজেই

এখানে নূতন স্কুল স্থাপন না করিয়া অন্যত্র স্থাপন করিলেই চলিতে পারে এবং তাহা করিলে তাঁহারা তজ্জন্য সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের অভিজ্ঞতা ও যুক্তি তর্কের শক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই অবাক হইয়াছি। অন্য কোন্ স্থানে স্কুল স্থাপন করিলে তাঁহারা সুখী হন তাহা প্রকাশ করেন নাই। ময়মনসিংহ নগরের প্রতি তাঁহাদের এত বিদ্বেষ কেন তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। যে স্থানে স্কুল স্থাপিত হইবে সেই স্থানে ছাত্রগণের থাকিবার সুবিধা থাকা আবশ্যক এবং সেই স্থানের অধিবাসীগণের স্কুল চালাইবার শক্তি থাকা আবশ্যক, তাহা বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষগণ ভাবিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা এ দেশে শিক্ষা-বিস্তারের কথা শুনিলে চক্ষে অন্ধকার দেখেন তাঁহাদের নিকট এই বিষয়ের প্রতিকার প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভরসা করি, উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ সুবিচার করিবেন।—চারুমিহির।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য যেমন প্রচুর-সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন আবশ্যক, ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষালাভে উৎসুক ও উৎসাহিত করিবার জন্য বিবিধ প্রকারের বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যাঁহারা ইহার ব্যবস্থা করেন তাঁহারাও দেশের উপকারী বন্ধু, তাঁহারাও বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠাতাদের ন্যায় দেশবাসীর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা পাইবার অধিকারী। আমরা সংবাদ পাইয়াছি—

পুরস্কার ঘোষণা—কৃত্তিবাস ও বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার স্থান' বিষয়ে যে মহিলা-গ্রাজুয়েটের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মোক্ষদাসুন্দরী সুবর্ণপদক 'ও' সীতা-সম্বন্ধে যে মহিলা-গ্রাজুয়েটের কবিতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে নলিনীসুন্দরী সুবর্ণপদক দিবেন। বর্ত্তমান ইংরেজী বৎসরের নবেম্বর মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নামে রচনা পাঠাইতে হইবে।—এডুকেশন-গেজেট; এবং সম্মিলনী।

দ্বিজেন্দ্রলাল বৃত্তি—কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে যে অর্থভাণ্ডার খোলা হইয়াছিল, তাহা হইতে ৭৫০০ ৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করা হইতেছে। আই-এ অথবা আই-এসসি পরীক্ষায় বঙ্গভাষায় যে ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর পাইবেন ও পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কোন কলেজে পাঠ করিবেন, তাঁহাকে দুই বৎসর কাল মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে ইহা "দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ বৃত্তি" বলিয়া দেওয়া হইবে।

ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার—স্থানীয় ব্রাহ্মবালিকা মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ সরস্বতী এবার "ভারতরমণীর আধুনিক কালোপযোগিনী স্ত্রীশিক্ষা" বিষয়ে ভারত-রমণীগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার নিমিত্ত বঙ্গীয় শিক্ষা-বিভাগ-প্রদত্ত ১৯১৬ সালের ৪৫৲ টাকার একটি ব্রজমোহনদত্ত-পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইঁহার এই সাফল্য কাথির পক্ষে গৌরবেরই বিষয়।
—নীহার।

নোয়াখালী মুসলমান ছাত্র-সমিতি।—কলিকাতা-প্রবাসী নোয়াখালী জেলার যেসকল দরিদ্র মুসলমান ছাত্র অর্থ ও পুস্তকাভাবে লেখা পড়া শিক্ষা করিতে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করে সেই-সকল ছাত্রের সাহায্য-বিধানকল্পে নোয়াখালী-মুসলমান-ছাত্র-সমিতি নামে এক সমিতি খোলা হইয়াছে। এই সমিতি নোয়াখালী-সম্মিলনীর সহিত একযোগে কার্য্য করিবে। কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র লইয়া এই পর্য্যন্ত ৩০০ ছাত্র এই সমিতির সভ্য হইয়াছে। শিক্ষার পথ সুগম করার চেষ্টা, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে শিক্ষালোক প্রসারিত করার উদ্যোগ দেশোন্নতিকামী ব্যক্তি-মাত্রেরই অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করে। আশা করি, বঙ্গের ধনী-সম্প্রদায় অর্থাভাবগ্রস্ত শিক্ষালোক-বঞ্চিত ছাত্রমণ্ডলীর অভাব দূরীভূত করিয়া শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিবেন।—ত্রিপুরা-হিতৈষী। এবং ঢাকা-গেজেট।

ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ প্রস্তাব করিয়াছেন যে সরস্বতী-পূজা সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহারা যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাহা হইতে ৪৮৲ টাকা উক্ত কলেজের ছাত্র-সাহায্য-সমিতির সভাপতির হস্তে দেওয়া হইবে। ইহাতে উক্ত কলেজের কোন সচ্চরিত্র অধ্যয়নে মনোযোগী ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট ছাত্রকে মাসিক ৪৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। এই দৃষ্টান্ত অপরাপর স্থানের ছাত্রগণের অনুকরণের যোগ্য।
—বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী।

"কাশীপুর-নিবাসী" সংবাদ দিয়াছেন যে—

মহম্মদ মহসিনের স্থায়ী ফণ্ডে ১৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ও অস্থায়ী ফণ্ডে ৯০,৪০৯ টাকা জমা আছে। তিনি একজন সাধু নমস্য পুরুষ ছিলেন।

মহম্মদ-মহসিন ফণ্ড হইতে মুসলমান ছাত্রদিগকে শিক্ষা-লাভে সাহায্য করা হয়। মহম্মদ-মহসিনের ন্যায় বহু বদান্য মহাত্মার সাহায্যের জন্য বঙ্গদেশ সতৃষ্ণনয়নে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। বঙ্গজননীর সন্তানের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটাইয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন এমন বঙ্গবাসী কি নিতান্তই দুর্ল্লভ? সম্প্রতি ত সার তারকনাথ পালিত ও সার রাসবিহারী ঘোষের আবির্ভাব হইয়াছে; সেইরূপ বহুবহু সন্তানের শ্রদ্ধার দানে বঙ্গজননীর অঞ্চল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠুক—দেশের সকলবিধ দুর্ভিক্ষ ও দুর্গতি দূর হোক।

কিন্তু প্রচুর-ধনসম্পত্তিশালী ব্যক্তি বিরল, এবং তাঁহাদের মধ্যে আবার সহৃদয় বদান্য দেশহিতৈষী লোক পাওয়া প্রায় দুর্ল্লভ। সেরূপ ধনী লোক কচিৎ কদাচিৎ আবির্ভূত হইয়া দেশকে ও দেশবাসীকে ধন্য করেন। সেইজন্য সাধারণের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যোগের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক; সাধারণ লোক সর্ব্বদাই নিজেরা বিবিধ অভাবে ভুক্তভোগী, সুতরাং তাহা দূর করিবার ইচ্ছা তাহাদের স্বাভাবিক; কয়েকজন উদ্যোগী কর্ম্মী অগ্রসর হইয়া তাহাদের ডাক দিলেই তাহারা তাহাদের মুষ্টিমেয় সাহায্য লইয়া সমবেত হয়, এবং দশের লাঠি একের বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। য়ুরোপ আমেরিকার প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই এইরূপ সাধারণের সমবেত

উদ্যোগ ও সাহায্যের ফল। আমরা সামাজিক হিসাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ জাতি হইলেও কর্ম্মক্ষেত্রে বড় স্বপ্রধান ও বিচ্ছিন্ন ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে কর্ম্মক্ষেত্রেও সমবায়ের উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করিতেছি। আমরা সংবাদ পাইয়াছি—

শিক্ষার উন্নতি। শিলচর থিয়েটার হলে মণিপুরী জাতির শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতিকল্পে একটি সভা হইয়াছিল।

সভায় গৃহীত প্রধান প্রস্তাবগুলি এই—

(৩) চাঁদা সংগ্রহ করিয়া "মৈতৈ মারুপ পুংগ" (মণিপুরী সম্প্রদায় ভাণ্ডার) নামে একটি ভাণ্ডার স্থাপন করা।

(৪) মণিপুরী ছাত্রদিগের জন্য একটি হোষ্টেল নির্ম্মাণ করা।

(৫) মণিপুরী ছাত্রদিগের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান লওয়ার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা।

(৬) ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সভ্য নিযুক্ত করা।

(৭) কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্যগণকে প্রথমতঃ কেবল মণিপুরীদের শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতিমূলক কার্য্যে ব্রতী হইতে অনুরোধ করা।—ইত্যাদি।

—সুরমা।

খুলনা নমঃশূদ্র শিক্ষাসমিতির ১ম অধিবেশন—

১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নমঃশূদ্র-কুলতিলক বাবু মুকুন্দবিহারী মল্লিক এম, এ, বি, এল মহোদয়ের সভাপতিত্বে সমিতির ১ম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় খুলনা জিলার প্রত্যেক মহাকুমা ও থানা হইতে নমঃশূদ্র-সমাজের প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি যথারীতি পরিগৃহীত হইয়াছে।

১। খুলনা জিলার নমঃশূদ্রদের শিক্ষোন্নতি বিধানে নানাবিধ সদুপায় অবলম্বিত হউক।

২। নমঃশূদ্র-বহুল খুলনা জিলার জন্য একজন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট নমঃশূদ্রকে স্কুল-সব-ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করার জন্য সরকার বাহাদুরের কৃপাপ্রার্থী হওয়া।

৩। খুলনা জিলার নমঃশূদ্রদের শিক্ষোন্নতি বিধানার্থে গবর্ণমেণ্ট ও ডিঃবোর্ড হইতে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হউক।

৪। বাগেরহাটে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক একটি নমঃশূদ্র-ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হউক।

৫। হুড়কা-ঝলমলিয়া বিদ্যালয়ের জন্য কতিপয় গাছ দিতে চাহিয়াছেন বলিয়া বনকর-বিভাগকে ধন্যবাদ দেওয়া।

৬। হুড়কা-ঝলমলিয়া বিদ্যালয়টিকে শীঘ্রই মধ্য-ইংরাজীতে মঞ্জুর করা ও এককালীন প্রচুর অর্থ সাহায্য করার জন্য গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করা।

৭। নমঃশূদ্র-সমাজের হিতার্থে অনেক সৎকার্য্য করিয়াছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেওয়া।—খুলনাবাসী।

বৈশ্য কর্ম্মকার সভা।—গত ২৮শে মাঘ শনিবার বানরীপাড়া-দাওরাট গ্রামে এই সভার বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। নবদ্বীপ ঢাকা ফরিদপুর ত্রিপুরা বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলার প্রায় ৫০০ শত সভ্য উপস্থিত ছিল। কর্ম্মকার-জাতীয় বালক-বালিকাদিগের উন্নতি বিধান করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

—বরিশালহিতৈষী।

মুসলমান শিক্ষা সমিতি।

মালদহ জিলার মুসলমান শিক্ষা সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই-সমস্ত সাধু চিন্তা চেষ্টা অবশ্যই মুসলমান-সম্প্রদায়ের পক্ষে কল্যাণকর হইবে। সভাপতি মিঃ এ কে ফজলল হক ডিঃ বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটীকে আরও কিছু ট্যাক্স তুলিয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দেশবাসী জনসাধারণও কতকটা টাকা চাঁদা তুলিয়া একটা ফণ্ড সৃষ্টি করুন। পরে সেই টাকা হইতে অংশ অনুপাতে ডিঃ-বোর্ডকে সাহায্য করিয়া স্থানে স্থানে মকতব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হউন। আমরা এইরূপ সভা সমিতির একান্ত পক্ষপাতী। দেশের আপামর সাধারণ শিক্ষিত হওয়া রাজ-শক্তি এবং প্রজা-শক্তি উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল-জনক।—গৌড় দূত।

সমগ্র বঙ্গব্যাপী শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারের জন্য বঙ্গদেশের গণ্যমাণ্য কয়েকজন এক শিক্ষাসম্মিলন ও কমিশন বসাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া আমরা অতীব আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে "আমি দেখিতে চাই আমার ভারতবাসী প্রত্যেক প্রজা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।" এই আশার বাণী সার্থক করিয়া তোলা যেমন গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য, দেশবাসীরও তেমনি কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে শিক্ষার সুবিধা পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষালাভের উপকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। অতএব কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের এই সাধু উদ্যম সকলকারই সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই শিক্ষা-সম্মিলন ও কমিশনের পূর্ব্বে "হিন্দু" বিশেষণ যোগ করিয়া সম্মিলনটিকে সংকীর্ণ ও পঙ্গু করা হইয়াছে দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৌদ্ধ এই চার প্রধান সম্প্রদায়ে বঙ্গদেশবাসী বিভক্ত। "যুক্তবঙ্গ" বলিয়া ঘোষণা করিয়া সেখানে অ-হিন্দুদিগকে বিযুক্ত করিয়া কেবল হিন্দুকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া সমীচীন হয় নাই; খৃষ্টানদিগের জন্য গভর্মেণ্ট ও মিশনারীরা শিক্ষার ব্যবস্থায় ব্যয় ও বন্দোবস্ত অধিক করেন, মুসলমানরাও নিজেদের স্বতন্ত্র শিক্ষা-সম্মিলন গঠন করিয়াছেন, বৌদ্ধের সংখ্যা বঙ্গে মুষ্টিমেয় ও তাঁহারা হিন্দুপর্য্যায়ভুক্ত হইতেও পারেন—কারণ বুদ্ধদেব হিন্দুদেরও অবতার,—এই-সকল কারণেই বোধ হয় কেবল হিন্দুদেরই শিক্ষাসম্মিলন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে। নেই-মামার চেয়ে কাণা-

মামা ভালো—বৃহৎকে আয়ত্ত করিতে যদি না পারি, অংশতঃ সম্পন্ন করিতে পারিলেও মঙ্গল—ইহাই আমাদের সান্ত্বনা; কিন্তু—কোনো ক্ষেত্রেই ভেদবুদ্ধি ভালো নয়, তাহাতে সমগ্রের উন্নতিতে বাধা পড়ে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণ কল্যাণ হয় না। নিম্নে "যুক্তবঙ্গ" হিন্দু শিক্ষা-সম্মিলন ও "কমিশন" সম্বন্ধে আয়োজন ও উদ্দেশ্যের সংবাদ প্রদত্ত হইল।

যুক্তবঙ্গ হিন্দু শিক্ষা সম্মিলন ও কমিশন।

আগামী শীতঋতুর অবসানে যুক্তবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু-জনসাধারণকে লইয়া কলিকাতায় একটি শিক্ষাসম্মিলনের অধিবেশন প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। বহুদিন হইতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তারসমস্যা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে; জাতি ও সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে এ বিষয়ে সাধ্যানুরূপ চেষ্টা যত্ন চলিতেছে। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমশঃই দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুসাধারণকে উন্নত করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষাবিস্তার।

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যাঁহারা এ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রধানতঃ এই কয়েকটি সমস্যা স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে। যথা:—(১) দেশের জনসাধারণ স্ব স্ব সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রকৃতপ্রস্তাবে কি পরিমাণে আগ্রহসম্পন্ন, (২) তাহারা এ বিষয়ে আপনাদিগের সন্তানগণের শিক্ষালাভের জন্য কতদূর স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত, ও (৩) দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে তাহারা কতদূর সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারে ইত্যাদি।

আমরা আপাততঃ দুইটি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে পারি। প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষালাভকল্পে অধিক হইতে অধিকতর আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দ্বিতীয়তঃ দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে আপনাদিগের দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য প্রদানকল্পে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। এখন সর্ব্বপ্রথম এমন একটি সম্মিলনের প্রয়োজন যেখানে আমরা পরস্পর পরস্পরের অবস্থা অবগত হইয়া একটি সহজসাধ্য পন্থায় উপস্থিত হইতে পারি। দেশের জনশিক্ষার ভার হস্তে লইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে দেশের শিক্ষার অবস্থা প্রকৃতভাবে অবগত হইতে হইবে।

আমরা দুইটি বিভিন্ন উপায়ে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি—(১) কনফারেন্স বা সম্মিলন, এবং (২) কমিশন বা তথ্যসংগ্রাহক সভা। যেখানে সমগ্র হিন্দুজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিত হইবেন সেরূপ একটি সম্মিলনের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদিগের বর্ত্তমান যুগের সামাজিক ইতিহাসে এবংবিধ সম্মিলনের আয়োজন বোধ হয় ইহাই সর্ব্বপ্রথম। এরূপ একটি সম্মিলনের ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির উপর যে নৈতিক প্রভাব বিস্তৃত হইবে তাহা কখনই অস্বীকার করা চলে না। যদিও কমিশন ব্যাপারে ততদূর বাহিক আড়ম্বর ও উৎসাহ সম্ভবপর নহে, তথাপি ইহার পরিণাম অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সুফল প্রদান করিবে। প্রথমতঃ কনফারেন্স এবং কনফারেন্সের অব্যবহিত পরে কমিশনের অধিবেশন, অথবা প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ কমিশন এবং তৎপরে কনফারেন্সের অধিবেশন, হইতে পারে।

হিন্দুজাতির মধ্যে সাধারণতঃ এই কয়টি বিভিন্ন শ্রেণী পরিলক্ষিত হয়, যথা:—ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈদ্য, কায়স্থ বারুই, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকর, মোদক, নাপিত, সদ্গোপ, তম্বুলি, তাঁতি, তিলি, চাষী-কৈবর্ত্ত (মাহিষ্য), গোয়ালা, বৈষ্ণব, নমঃশূদ্র, যোগী, সুবর্ণবণিক, সাহাবর্ণিক, সূত্রধর, পোদ, রাজবংশী তেওর, বাউড়ী চামার, ডোম, হাড়ি, ভূইমালি, কাওরা, মাল এবং মুচি। এই কয়টি সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চবিংশের অধিক সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপনাদিগের সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য সমিতি সংগঠন করিয়াছেন।

দুই কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে উল্লিখিত ২৫টি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত জনসংখ্যা প্রায় ১২৫ লক্ষ হইবে। বিশাল হিন্দুজাতির মধ্যে নমঃশূদ্র, মাহিষ্য ও রাজবংশী জনসংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে ১২৫ লক্ষ বঙ্গবাসীর উল্লেখ করা হইয়াছে, এই তিনটি বিশাল সম্প্রদায় ইহারই অন্তর্ভুক্ত। ইহা একপ্রকার আশা করা যাইতে পারে যে আগামী শীত ঋতুর অবসানে প্রস্তাবিত সম্মিলনের অধিবেশন কালের পূর্ব্বেই অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সমিতি-সংগঠনের যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারিবে।

স্থূলভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদিগের প্রস্তাবিত সম্মিলনে প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন, যথা:—(১) জমিদার সম্প্রদায়, (২) ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায়, (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায় ও (৪) জনসাধারণ। যদি আমরা আমাদিগের দেশবাসীর সম্মুখে বর্ত্তমান অবস্থা বিশদভাবে ধরিয়া দেখাইতে পারি তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের প্রস্তাবিত সম্মিলনের অধিবেশন অসম্ভব হইবে না।

হিন্দুজাতির মধ্যে যে-সকল সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগের সমাজসংঘ পরিচালন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইত্যবসরে তাঁহাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। যাঁহাদিগের মধ্যে সমাজপরিচালনকল্পে কোন-প্রকার বিধিবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হয় নাই, আশা করা যায় যে তাঁহারাও অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্প্রদায়ের সহায়তায় এইরূপ সমাজ-সংস্থাপন করিবেন। শীত ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষিত লোককে বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ করা প্রয়োজন হইবে।

দেশবাসী ব্যক্তি মাত্রেই এবংবিধ সম্মিলনের সুফল সম্যক উপলব্ধি করিলে আশা করি সম্ভবপক্ষে কেহই ইহার জন্য সাধ্যানুরূপ অর্থপ্রদানে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শ্রীরাসবিহারী ঘোষ।
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। (কাসিমবাজার)
শ্রীসারদাচরণ মিত্র।
শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী। (টাকী)
শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়। (দিনাজপুর)
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

—পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান আবশ্যক দেশবাসী স্ত্রীপুরুষের মনে শিক্ষালাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা; তাহার পরই আবশ্যক শিক্ষক—বিদ্যায় প্রগাঢ়, চরিত্রে দৃঢ়, ত্যাগে সুমহান, সহৃদয়তায় উদার। বিদ্যার আলয় ও আসবাব সরঞ্জাম গৌণ সাধন, মুখ্য নহে। ভারতবর্ষের

গৌরবের দিনে জীবন্ত দশায় এই আদর্শ অনুসারেই কাজ হইত। শিক্ষাদান জীবনের ব্রত করিয়া ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া প্রগাঢ় পণ্ডিতগণ তপস্বীর ন্যায় সমাগত ছাত্রছাত্রীদিগকে জ্ঞান দান করিতেন, দ্রাবিড় কোঙ্কন মহারাষ্ট্র গুর্জ্জর দেশ হইতে ছাত্রছাত্রী তাঁহাদের জ্ঞান ও চরিত্রের যশে আকৃষ্ট হইয়া বারাণসী মিথিলা ও বঙ্গদেশের গুরুকুলে শিক্ষার্থী হইয়া সমাগত হইত; বঙ্গবাসীরাও বারাণসী ও মিথিলার জ্ঞানীদিগের শিষ্যত্ব স্বীকার করিত; প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা, পথের দুর্গমতা, স্থানের দূরত্ব এই সম্মিলনের বাধা হইতে পারিত না। শিক্ষাদানের স্থান ছিল স্নিগ্ধ-চ্ছায়াতরুমূল, অথবা অধ্যাপকের কুটীর-প্রাঙ্গণ; সেইজন্য নিয়ম ছিল বৃষ্টি হইলে অনধ্যায়, মেঘগর্জ্জন হইলে পাঠ বন্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ লইয়া বিদেশী লোকেরা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাদানের ব্যবস্থাপক ও কর্ত্তা হইয়া আমাদের দেশের সেই সুলভ অথচ প্রগাঢ় শিক্ষালাভের পথকে ব্যয়বহুল ও বাধাসঙ্কুল করিয়া তুলিতেছে; পাকা সৌধ অট্টালিকায় রাজাসনের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে তাঁহাদের মনঃপূত বিদ্যালয় হয় না। শিক্ষাকে একদিকে এইরূপ ব্যয়বহুল করিয়া অন্যদিকে শিক্ষকদের দক্ষিণার বেলা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যের ব্যবস্থা করিয়া স্বার্থপর বিদেশী শিক্ষাধুরন্ধরেরা আমাদিগকে অজ্ঞানের অন্ধকারে বিমূঢ় করিয়া রাখিবার যথাসম্ভব যত্ন করিতেছে, কারণ শিক্ষার বিস্তার হইলে আমরা আত্মনির্ভরক্ষম সচেতন হইয়া জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিব ও তখন আমাদের দেশে বিদেশীর কর্ত্তৃত্ব আমরা সহ্য করিব না। ত্যাগী শিক্ষাদানব্রত শিক্ষক আধুনিক যুগে দুর্লভ; শিক্ষাবিভাগে অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ না থাকাতে দেশের সকল শিক্ষিত চিন্তাশীল বুদ্ধিমান লোক ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে ভিড় করিতেছে; যাহাদের অপর দিকে সুবিধা হইল না তাহারাই শিক্ষকের মহৎ ব্রত অগত্যা গ্রহণ করিতেছে। হয়ত দশ বিশজন ত্যাগ ও কর্ত্তব্যের প্রেরণায় শিক্ষাদানের ব্রত অবলম্বন করেন, কিন্তু মানুষ ত্যাগ করিতে পারে বিলাসিতা, জীবনযাত্রার বাহুল্য; নিজের ও স্ত্রীপুত্রের মোটা ভাতকাপড়ও যদি তাহার না জুটে তবে তাহাকে চিন্তাকুল করিয়া তুলে, কর্ত্তব্যে তাহার ত্রুটি ঘটে।

এ সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি জানিতে পারিয়াছি,—

শিক্ষকগণের দরিদ্রতা। দেশে শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই। শিক্ষাবিস্তার করিতে হইলেই যে, উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, একথাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গুরুট্রেনিং এবং প্রাইমারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণকে গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড যে বেতন প্রদান করেন, তাহাতে তাঁহাদের পরিবার প্রতিপালন করা দূরে যাউক, আপনাদের উদরান্নের সংস্থান হয় না। বর্ত্তমান সময়ে যাবতীয় দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা জন্য লোকের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। এখন মাসিক ৫৲, ৭৲ বা ১০৲ টাকা বেতনে কেহই দুই বেলা আহারের সংস্থান করিতে পারে না। অত্র জেলার বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যারপরনাই অর্থ-কষ্টের সংবাদ আমরা ক্রমাগত প্রাপ্ত হইতেছি।—খুলনাবাসী।

নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ বিলম্বে বেতন পাইয়া থাকেন। ইহা দুঃখের বিষয়। শিক্ষকগণের বেতন দেওয়া সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হওয়া উচিত।—সুরমা।

শিক্ষা বিভাগের সার্কুলার—সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার মহোদয় এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে এম্ এ কিম্বা এম এস্ সি, বি এ, কিম্বা বি, এস, সি, এবং আই এ কিম্বা আই, এস, সি-গণের সর্ব্বোচ্চ প্রথম বেতন ৫০৲ ৩৫৲ এবং ২৫৲ টাকা হইবে। বড়লাট বাহাদুর শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে আভাস দিয়াছিলেন, এই সার্কুলার দ্বারা সেই উন্নতির কোনও আভাস পাওয়া যায় না। গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগে অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত অধিকাংশ কর্ম্মচারীদিগের তুলনায় শিক্ষকদিগের এই বেতন অল্প। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষকদিগের বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং পেনসনেরও ব্যবস্থা আছে। প্রাইভেট-স্কুলে সেরূপ কোন কিছু নাই। তথাপি প্রাইভেট স্কুলগুলিও যদি ডিরেক্টার মহোদয়ের এই সার্কুলারের অনুসরণ করেন তবে শিক্ষকদিগের উন্নতির আশা করা বৃথা হইবে। যাহা হউক আমরা আশা করি ডিরেক্টার মহোদয় এবিষয় আবার পুনর্বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।—ত্রিপুরা-হিতৈষী।

শিক্ষকের বেতন।—বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতায় আমরা জানিতে পারি যে, তিনি শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির সঙ্কল্প করিয়াছেন। শিক্ষা বিভাগের উন্নতি সাধন করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষকের দরকার, উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হইলে উপযুক্ত বেতন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; দর্শন-শাস্ত্রের জটিল সূত্রগুলির সাহায্য না লইয়াও এ কথাটা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গলার ডাইরেক্টার সাহেব সম্প্রতি একখানা সার্কুলার জারী করিয়া আদেশ করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট স্কুলে যে-সব এম, এ, ও এম্ এস্ সি পাশ করা শিক্ষক ভর্ত্তি হইবেন, তাঁহাদের প্রাথমিক বেতন ৫০৲ টাকার অধিক হইতে পারিবে না। আর বি, এ, ও বি, এস্-সিদিগের বেতন ৩৫৲ টাকার অধিক হইবে না। আই এ, ও আই, এস সি ২৫৲ টাকার অধিক পাইবেন না। মান্যবর বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ইহা লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, ঐ আদেশের আর সংশোধন হইবে না। গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে শিক্ষাবিভাগে উপযুক্ত লোকের প্রবেশ-লাভ করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইবে।

আমাদের বিশেষ আশঙ্কা, মুসলমান শিক্ষকদিগের সম্বন্ধে। গবর্ণমেণ্ট স্কুল ব্যতীত তাহাদের পক্ষে অন্যত্র প্রবেশ করা কার্য্যতঃ অসম্ভব তাহাদের সংখ্যা একে ত খুব কম, তাহার উপর এই কড়া আইনের প

শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিতে কয়জন স্বীকৃত হইবে? অথচ মুসলমান-শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, মুসলমান শিক্ষকদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করাও খুব আবশ্যক।—মোহাম্মদী।

শিক্ষকের বেতন যথোচিত না হইলে শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইবে না; তখন শিক্ষার ভার পড়িবে অশিক্ষিত মূর্খ লোকদের উপর। তাহার ফল যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। নিম্নপ্রাথমিক গুরুট্রেনিং প্রভৃতি পাঠশালার শিক্ষকগণকে অতি সামান্য বেতন দেওয়া হয়, এবং ছাত্রদত্ত বেতন যাহা পাওয়া যায় তাহা হয় শিক্ষকদের উপরি-লাভ। এ সম্বন্ধে নিম্ন-উদ্ধৃত আবেদনপত্র আমাদের সাক্ষী—

To

The Deputy Inspector of Schools, Khulna.

Sir,

অসংখ্য প্রণাম পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা এই যে, অধীনের মাসিক বেতন ১০৲ টাকা মাত্র। বিশেষতঃ এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ছাত্র অবৈতনিক, সুতরাং ছাত্রদত্ত প্রাপ্য আদৌ নাই। এই ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় এরূপ অল্প বেতনে অধীনের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া অতীব সুকঠিন। ইত্যাদি

আজ্ঞাধীন ভৃত্য—

সেখ আব্বাস্ সামাদ,

সেকেণ্ডপণ্ডিত কলারোয়া গুরুট্রেনিং স্কুল।

—খুলনাবাসী।

বেতন ভিন্ন উপরি-পাওনার লোভ থাকিলে শিক্ষক যে শীঘ্র কসাই হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদটি হইতে বুঝিতে পারিব।—

নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষকের অত্যাচার। অদ্য সাংসারিক কার্য্য উপলক্ষে বড়লিখাতে গিয়াছিলাম, রাস্তায় অজমির বালক-বিদ্যালয়। উক্ত বিদ্যালয়ে একটি ছেলের করুণ ক্রন্দন শুনিয়া বারান্দায় যাইয়া দেখিতে পাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্দ্দয় ভাবে একটি ছেলেকে বেত্রাঘাত করিতেছেন। বেত্রাঘাতের কারণ শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কারণ ছাত্রটি প্রমোশন-ফিস না আনাতে শিক্ষক এই-প্রকার ব্যবহার করিতেছেন, আরও অন্যান্য ছাত্রগণকে এই অপরাধে স্কুলের প্রাঙ্গণে সূর্য্যেরদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিতে আদেশ দিয়াছেন, স্কুলের অন্য কার্য্যে দৃষ্টি নাই কেবল প্রমোশন-ফিস নিয়া সকলেই ব্যস্ত। রাস্তায় বাহির হইয়া তথাকার দুইজন অধিবাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা বলে উক্ত শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে বেতন পর্য্যন্ত এই-প্রকারে আদায় করেন। তাহারা লেখাপড়া কিছুই জানে না, শিক্ষক যাহা বলেন তাহা পালন করে। (প্রেরিত পত্র)—সুরমা।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে এইজন্য শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। অন্নপ্রাশন উপনয়ন বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমারোহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থানের বহু অধ্যাপককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া তাঁহাদিগকে অন্নবস্ত্র তৈজস অর্থ ভূমি দান করার রীতি প্রচলিত ছিল; এখনো অধ্যাপক বিদায় অল্পস্বল্প হইয়া থাকে। ধনীদের উচিত ঐরূপ সমারোহ অনুষ্ঠানে বাইনাচ বা থিয়েটার প্রভৃতির বদলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল-প্রকার শিক্ষক অধ্যাপক ও গুরুদের আমন্ত্রণ করিয়া মধ্যে মধ্যে সাহায্য ও পরিতুষ্ট করা। এ সম্বন্ধে সম্প্রতিকার একটি দৃষ্টান্ত ধনী মাত্রেরই অনুকরণীয় বলিয়া আমরা মনে করি—

বিশ্বেশ্বরী বৃত্তি।—গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার মান্যবর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্থানীয় 'প্রসন্নচন্দ্র সারস্বত চতুষ্পাঠী'র অধ্যাপকদ্বয়কে এক বৎসরের জন্য বিশ্বেশ্বরী বৃত্তি নামক ৫০৲ টাকার একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

—এডুকেশন-গেজেট।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে স্বর্গীয় মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বোপার্জ্জিত এক লক্ষ টাকা অধ্যাপকদের সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইঁহারাই বাঙালীর গৌরব ও মুখপাত্র।

শিক্ষাবিস্তারের উপযোগিতা ও উপায় সম্বন্ধে নিম্নের প্রবন্ধটি হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।—

পাঠশালায় অবৈতনিক শিক্ষা।

বঙ্গ দেশের যে জিলায় বা যে বিভাগে বাঙ্গলা শিক্ষার অধিক প্রচার হইয়াছে, সেই জিলায় বা বিভাগে ইংরেজী শিক্ষারও বিস্তার অধিক হইয়াছে। এইজন্য আমি ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী হইয়াও পাঠশালা বৃদ্ধির পক্ষপাতী। সামান্য চাষা-ভূষার কোন সন্তানকে ভগবান যত শক্তি দিয়াছেন, পাঠশালায় প্রবেশ করিলেই তাহা প্রকাশ হইবার সম্ভব। ইহাদের মধ্যে যাহারা মেধাবী ও বুদ্ধিমান, পিতা মাতা বা আত্মীয়বর্গ তাহাদিগকে অধিকতর উন্নতির জন্য ইংরেজী স্কুলে পাঠাইতে পারেন।

বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯২ জন নিরেট মূর্খ। যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ও সুবর্ণবণিকদিগকে বাদ দেওয়া হয়, তবে দেশের অবশিষ্ট লোকের মধ্যে মূর্খের সংখ্যা শতকরা ৯৬।৯৭ হইয়া পড়ে। ইহারাই দেশের মুদী, চাষী, শিল্পী। ইহারাই লোকসংখ্যার শতকরা ৯০ জন। সুতরাং কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে-সকল শুভ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা ইহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না।

কো-অপারেটিভ সমিতি যে গ্রামবাসী মুদী, তাঁতি, চাষী, কামার, কুমার প্রভৃতির মহোপকার সাধন করিতে পারে, তাহা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের অধিকাংশের নিরক্ষরতা সমবায়-সমিতি-সমূহের অভীপ্সিত পরিমাণে প্রসার-পক্ষে কণ্টক-স্বরূপ হইয়াছে।

বাঙ্গালাদেশের সকল জিলায়ই প্রজাসত্ত্ব আইনের দশম অধ্যায় অনুসারে প্রজাদের কোন্ জোতের সামিল কোন্ জমি, এবং কোন্ জোতের খাজনা কত, জোতের উপরিস্থিত বৃক্ষাদিতে প্রজার কোন স্বত্ব

আছে কিনা, প্রজা জোত হস্তান্তর করিতে পারে কি না ইত্যাদি খসড়া ও খতিয়ান প্রস্তুত হইয়া কালেক্টরীতে দাখিল হইতেছে, এবং তদনুসারে জমিজমা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিরোধ মীমাংসা হইতেছে। প্রজাদের শতকরা ৯৬ জন মূর্খ। সুতরাং তাহাদের জোত সম্বন্ধে কি লেখা হইল, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

প্রজাস্বত্ব আইনে খাজনা আদায় করিয়া প্রত্যেকবার প্রজাকে স্বতন্ত্র দাখিলা করিবার নিয়ম রহিয়াছে। জমিদারের গোমস্তার তাহা প্রায়ই প্রদান করেন না। দাখিলা দিলেও তাহাতে জোতের বার্ষিক খাজনা এবং যে দিন যত টাকা দেওয়া হইল তাহার পরিমাণ ঠিক লেখা হইল কিনা, তাহা শতকরা ৯৬ জন প্রজাই পড়িতে ও বুঝিতে পারে না।

কৃষিবিভাগের কৃষিতত্ত্ব-সকল স্বতন্ত্র পুস্তকেই প্রচারিত হউক, আর বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকায়ই প্রকাশিত হউক, নিরক্ষর পঠনাক্ষম ব্যক্তিদের পক্ষে উভয়ই সমান। যে-প্রজার জন্য গবর্ণমেণ্ট এত অর্থ ব্যয় করেন, তাহাদের বিশেষ কোন উপকার হয় না।

বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯২ জন মূর্খ। ইংলণ্ডে ও জর্ম্মনীতে শতকরা ৯২ জন পঠনক্ষম।

বাঙ্গালাদেশে ৪॥০ সাড়ে চার কোটি লোকের বাস। ইহাদের ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ পাঠশালার ছাত্র হইবার উপযুক্ত। যদি প্রত্যেকের শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৬৲ টাকা ব্যয় আবশ্যক, তবে শুধু বাঙ্গালাদেশে ৪॥০ সাড়ে চার কোটি টাকার প্রয়োজন।

নবাব সার সলিমুল্লা বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মুসলমান বালকবালিকাদিগকে পাঠশালা-সমূহে বিনা বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য মুসলমান জমিদার ও প্রজাদের নিকট হইতে রোডসেসের ন্যায় নির্দ্ধারিত খাজনার উপর টাকার এক পয়সা কি আধ পয়সা আদায় করা হউক, এবং এই প্রকারে যে যে গ্রামের জমি জমা হইতে যত টাকা আদায় হইবে, তাহা ঐ ঐ গ্রামে অবৈতনিক পাঠশালার জন্য ব্যয় করা হউক।

স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের উত্থাপিত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট বাধা দেন এবং প্রজাদের শিক্ষার বিরুদ্ধে ইংরেজ-সম্পাদিত কাগজ-সমূহ নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন। যে পর্য্যন্ত মুদী, চাষা, তাঁতি, জেলে প্রভৃতি দেশের চৌদ্দ আনা লোক অশিক্ষিত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এই দেশের কল্যাণ নাই।

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত। (সঞ্জীবনী)

সম্প্রতি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; তাহাও আবার নামঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষাবিস্তারের আর এক উপায়—দেশে নির্ভীক তেজস্বী সংবাদপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম—

নূতন সংবাদপত্র।—কুমিল্লা হইতে 'ত্রিপুরা গেজেট' নামে একখানি ইংরেজী-বাঙ্গলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কুমিল্লার উকীল শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী ঘটক ঐ কাগজের সম্পাদক হইবেন।—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ। এবং ঢাকা-প্রকাশ।

(২) সামাজিক অবস্থায় অবনত ও হীনদিগের উন্নতি।

এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার সংবাদ প্রদানের উপলক্ষ্যে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্তের পরিচয় পাইয়াছি। অপর একটি এই—

"চামার্স এসোসিয়েসন"—মেদিনীপুরের পাঞ্জাবী জুতাব্যবসায়ী-বৃন্দ মেদিনীপুরের চামারগণকে টাকা ঋণ দিয়া একপ্রকার কৃতদাসের ন্যায় কার্য্য করাইত। তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত মাহিনা তাহারা পাইত না। ইহা দেখিয়া কয়েকজন ভদ্র মহোদয় আমাদের সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তা গ্রহণ করিয়া চামারগণকে লইয়া তাহাদিগেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান জন্য উক্ত এসোসিয়েসন গঠন করিয়াছেন। ঐ এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক যে-সমুদয় জুতা প্রস্তুত হইতেছে তাহা নাম মাত্র লাভে সাধারণকে বিক্রয় করা হয়। চামারগণকে উপযুক্ত মজুরি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও তাহাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যার্থে ব্যয়িত হয়। চামারগণের বালকগণে শিক্ষাদান জন্য কয়েকজন ভদ্রলোক পর্য্যায়ক্রমে তাহাদের শিক্ষকতা করিয়া থাকেন।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

কিন্তু সংস্কারেই যে মনের ছাঁচ শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তাহা নহে; তাহার জন্য সাধনা দরকার। বড় হইয়াছি বলিয়া খোলস বদলাইলেই বড় হওয়া যায় না, মনটাকেও বড় করিতে হয়, নতুবা সিংহচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের ন্যায় শীঘ্রই লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হয়। তাহার দৃষ্টান্ত এই—

এখানকার সমস্ত রাজবংশী কিছুদিন হইতে পৈতা গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছে। মফঃস্বলে গুজব রটিয়াছে যে শীঘ্রই ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধে যাইতে হইবে; সেই ভয়ে অনেকেই পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে।—রঙ্গপুরদর্পণ।

নারায়ণগড় সদ্গোপ সভা।

১৫ই মাঘ নারায়ণগড় পরগণার অন্তর্গত মুড়াকাঠা গ্রামে তৎপ্রদেশবাসী বহুসংখ্যক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত সদ্গোপ সম্মিলিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুযায়ী সমাজ-সংস্কার উদ্দেশ্যে এক মহতী সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। সদ্গোপ বৈশ্যবর্ণ।

নারায়ণগড় সদ্গোপ সভার প্রধান উদ্দেশ্য চারিটি।—

(১) সমাজ সংস্কার দ্বারা সদ্গোপ জাতির সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থার উন্নতি সাধন।

(২) সদ্গোপ বালকবালিকাগণের বিশেষতঃ অসমর্থ বালকগণের শিক্ষাবিধানকল্পে সাহায্যদানের ব্যবস্থা।

(৩) অসহায়া সদ্গোপ বিধবাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ-সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ।

(৪) পরস্পর সহায়তায় কো-অপারেটিভ সমিতির বিস্তার করণ।

সকল শাখা-সভার সহিত কয়েকটি স্কুল সংযুক্ত থাকিবে। সম্প্রতি যে-সকল স্কুল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বর্ত্তমান আছে সেগুলিও যাহাতে সুপরিচালিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। শিক্ষা, শিল্প ও কৃষি বাণিজ্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষার উন্নতি বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করা ও তদ্বিষয়ে কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া সভা কর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে। এক বৎসরের আবশ্যকীয় ব্যয়সংকুলান জন্য সভাস্থলেই প্রায় দুই হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি এবং তন্মধ্যে তিনশত টাকা নগদ দাম পাওয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে—

১। নারায়ণগড়-সদ্গোপ-সভা এবং তদন্তর্গত কেন্দ্র সভা ও শাখা-সভা কর্ত্তৃক স্বজাতির কল্যাণ কামনায় নির্দ্ধারিত ও প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইতে পরাঙ্মুখ হইব না।

২। সার্ব্বজনীন প্রেম প্রচারে দৃঢ়ব্রত হইব।

৩। স্বজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতি ও হিতসাধনকল্পে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিব।

৪। সমাজ মধ্যে কোন কুসংস্কার বা কুরীতি থাকিলে তাহা সংশোধন বা দূরীকরণ-বিষয়ে প্রয়াসী হইব।

৫। স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, সহানুভূতি ও সদ্ভাব সংস্থাপন জন্য প্রচেষ্ট হইব।

৬। আপন আপন পুত্রকন্যার ও আত্মীয়স্বজনের বালকবালিকার সুশিক্ষা-বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান হইব।

৭। স্বজাতীয় অসমর্থ বালকবালিকার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

৮। সমাজ মধ্যে উচ্চ-শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার এবং স্ত্রীধর্ম্ম প্রতিপালন-বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইব।

৯। শাস্ত্র-বিহিত সদাচার প্রতিপালনে সাধ্যানুযায়ী উৎসাহী হইব।

১০। আপন আপন বা আত্মীয়-স্বজনের পুত্রকন্যার বিবাহ উপলক্ষে পণ গ্রহণ করিব না।

১১। স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা প্রতিপালনে কদাচ উদাসীন হইব না।

১২। আপন আপন পারিবারিক অবস্থার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও সামঞ্জস্য বিধানে সতত প্রবৃত্ত করিব।

১৩। জাতীয় মর্য্যাদা, আত্মসম্মান ও আত্মগৌরব সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রয়াসী হইব। —মেদিনীপুর-হিতৈষী।

(৩) সামাজিক কুসংস্কার ও কুরীতি পরিবর্জ্জন ও সুসংস্কার।

এই ক্ষেত্রে আমরা একটুও অগ্রসর হইতেছি বলিয়া বোধ হয় না; বরং আমাদের অধোগতি হইতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। এসম্বন্ধে আমাদের লজ্জার কথা এইগুলি প্রচার হইয়াছে—

বুড়ার বিয়ে।—গত ২৭এ মাঘ শুক্রবার মৈমনসিংহ জেলার জামালপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত ফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে এক অপূর্ব্ব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের বয়স অনুমান ৫০ বৎসর এবং কন্যার বয়স ৯ বৎসর মাত্র।

কুমারগ্রালির শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র কুণ্ডুর ৫৬ বৎসর বয়ক্রম কালে বিগত অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়। পত্নীশোকে তিনি এতদূর মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার উপযুক্ত চারিটি পুত্র, পুত্রবধূ ও ২টী কন্যার আশ্বাস-বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে না পারিয়া গত ২৫এ মাঘ তারিখে তিনি পুনরায় তাঁহার নাতিনীর বয়সী একটি একাদশ বর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন করিয়াছেন।—রঙ্গপুর-দর্পণ।

ইহারাই আবার বালবিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা করিবার জন্য বড় বড় শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া থাকেন! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম!

অদ্য রামপুরহাট হাইস্কুলের খেলিবার মাঠ খোলা হইল। ছেলেরা অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল এবং তাঁহাদিগকে "পান, তামাক, সোডা, লিমনেড ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিল।—বীরভূমবাসী।

সম্প্রতি নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের কতিপয় ছাত্র তাহাদের "একগ্লাসের" কোন "ইয়ারের" বিবাহে এক উপহার জারি করিয়াছে। নড়াইল কলেজ-হোষ্টেলে কি "ইয়ারগণ" বোতল গেলাস পার করিতে আরম্ভ করিয়াছে? উপহারের নীচে লেখা:—

"এক গ্লাসের ইয়ারগণ,
কলেজ হোষ্টেল নড়াইল।"

এইবার উপহারের ভাষা ও ভাব দেখুন:—

*   *   *

"কাগজ, কলম   জুটলেই যদি
উপহার একটা দেওয়া যায়,
তখন একটা   উপহার দে'য়া
সেটা আর কি বিষম তায়?
"উপ" শব্দের   যোগে দেখছি
খরচটা বেশ কমছে গো।
অন্য দিকে   সংখ্যাতে খুব
বৃদ্ধিটাও বেশ জমছে গো!
অনেক সীতা   সাবিত্রী, এ
রত্নপ্রসূ বঙ্গেতে,
'উপ' শব্দ   যোগ করিয়ে
নেছেন পতির সঙ্গেতে!
তবেই দেখ,   'উপ' শব্দ
বাড়াচ্ছে বেশ সংখ্যাটা,
হাঁয়ের সঙ্গে   মিশে আবার
বাঁচিয়ে দিচ্ছে তঙ্কাটা।"

*   *   *

হিন্দুর বিবাহ একটা দায়িত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দুইটি আত্মা প্রেমবদ্ধ হইয়া সংসারের ভিতর দিয়া ভগবচ্চন্নিধানে যাত্রা করে, এই শুভ মুহূর্ত্তে একি পৈশাচিক কাণ্ড!

হে নড়াইল কলেজ-হোষ্টেলের এক গ্লাসের ইয়ারগণ, বাপ দাদা অনাহারে থাকিয়া—হাড়ের মজ্জা, বুকের রক্ত জল করিয়া তোমাদের শিক্ষার ব্যয় সংকুলান করিতে অক্ষম, আর তোমরা সেই অর্থ দ্বারা ইয়ারকিবাজ সাজিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারে কুণ্ঠা বোধ করিতেছ না, সেই অর্থ দ্বারা বাবু সাজিয়া তোমরা বঙ্গের সীতা-সাবিত্রীদের উপপতির তালিকা সংগ্রহ-পূর্ব্বক একটি নিরপরাধা বালিকার সংসারে প্রথম প্রবেশের দুয়ারে, ছাপার অক্ষরে বিন্যস্ত করিয়াছ! ধিক্ তোমাদের উচ্চ শিক্ষায়, ধিক্ তোমাদের মনুষ্যত্বে?

নড়াইল কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল বাবু একজন জবরদস্ত প্রিন্সিপাল। তাঁহার হোষ্টেলে এমন ছাত্র গজায়! আমরা আশা করি তিনি এরূপ বাঁদরামীর বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।—যশোহর।

আমাদের দেশে ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়; শুচিতা শুদ্ধাচার সংযম তাহাদের তপস্যার অঙ্গ; সেই ছাত্রগণ যদি মাদকদ্রব্য পরকে বিতরণ করে বা নিজেরা

সেবন করে বলিয়া গর্ব্ব করে তবে আমাদের চরম অধঃপতনের পথ মুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। ছাত্ররা অপরিণতবুদ্ধি, তাহাদের চেয়ে বয়স্ক যাঁহারা অভিভাবকস্থানীয় তাঁহারা ছাত্রদের নিকট হইতে তামাক কেমন করিয়াই বা লইতে পারিলেন ও কেমন করিয়াই বা তাহাদের নির্লজ্জ কুৎসিত রসিকতা সহ্য করিতে পারিলেন! এই সব দুর্নীত ছাত্রদের সাবধান হওয়া উচিত। দেশের একটি লোক কুক্রিয় হইলে দেশ সেই পরিমাণে অধঃপতিত হয়; যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, ভবিষ্যতের আশা ও অবলম্বন তাহাদের মতিগতি এরূপ দেখিলে শঙ্কিত হইয়া উঠিতে হয়, দেশের উন্নতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়।

এই সুসংস্কারের ক্ষেত্রেও একটি ক্ষীণ আশার সংবাদ আছে—

পণ-গ্রহণ প্রথা।—সঞ্জীবনী বলেন;—"সম্প্রতি মেদিনীপুর হাডিং স্কুলে পণগ্রহণের প্রতিবাদ করিবার জন্য এক জনবহুল সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় অনেকেই এই প্রথার নিন্দা ঘোষণা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই প্রথার দোষ-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমাদের দুঃখ এই যে, সকলেই এই প্রথার নিন্দা করেন বটে, কিন্তু পুত্রের বিবাহকালে আবার তাঁহারাই কন্যার পিতার ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা আদায় করিতে ছাড়েন না। অন্ততঃ এক দল লোকও যদি কথায় ও কাজে এক হইতে পারিত, তাহা হইলে এই প্রথা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পরিণামে বিলুপ্ত হইত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকদিগকে কি আমরা এই প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারি না? বিবাহের বাজারে এই-সকল শিক্ষিত যুবকগণকে লইয়া দর কষাকষি আর কতদিন চলিবে?"—কাশীপুরনিবাসী।

(৪) শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও পরিপুষ্টি। (৫) ধনবৃদ্ধি।

এই ক্ষেত্রে দুই চারিটি ক্ষীণ চেষ্টা অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা করিতেছে।—

তমলুক কৃষি-সমিতি—তমলুক মহকুমার আসনান-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ দাস বালেশ্বর চাঁদবালীর নিকট আট হাজার বিঘা জমি লইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য তিনি এই জমি সেয়ারে বিলি করিতে ইচ্ছুক হইয়া কো-অপারেটিভ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করিয়াছেন। সেয়ারের টাকা হইতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া আপাততঃ ধান চাষ করা হইবে ও অংশীদারদিগকে উৎপন্ন ধান্তের পরিমাণানুযায়ী লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাষ্পীয় লাঙ্গলের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করা হইবে ও বীজবপন, শস্য কর্ত্তন এবং ফসল ঝাড়ান প্রভৃতি কার্য্য কলের সাহায্যে করা হইবে। বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের এরূপ অনুষ্ঠান এই প্রথম। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হয় বলিয়া তথায় বিঘা-প্রতি পূর্ব্বে-যে পরিমাণ ফসল হইত, এখন তদপেক্ষা ৫।৬ গুণ অধিক ফসল জন্মিতেছে। আমাদের দেশে সেইরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে অবশ্যই শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। তমলুকের বৈজ্ঞানিক কৃষি-সমবায়-সমিতি কৃষির উন্নতি-বিধানের জন্য মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সমিতির মূলধন দুই লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সমিতির সাফল্যের উপর এ দেশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।—নীহার।

চিরুনির কারখানা।—চিরুনি নির্ম্মাণের উপকরণ প্রস্তুতের নিমিত্ত যশোহরে এক কারখানা বসিতেছে। গভর্ণমেণ্ট কারখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াছেন। আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি আসিয়াছে।—কাশীপুর-নিবাসী।

স্বদেশপ্রাণ মাননীয় মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই মহাশয় তাঁহার মাণিকতলাস্থ বাগান-বাটীতে একটি সেলুলয়েড ফ্যাক্টরী স্থাপিত করিয়াছেন। যশোহর চিরুণী-কারখানার প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন।—ঢাকা-গেজেট।

আবিষ্কার।—ত্রিপুরা জেলার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় একটি দেশালাইয়ের কল আবিষ্কার করিয়াছেন। কলটির কার্য্যপ্রণালী সহজ এবং প্রত্যহ ১০ গ্রোস দেশালাই প্রস্তুত হয়।—এডুকেশন-গেজেট।

ময়দার কল।—প্রকাশ, বগুড়াতে শীঘ্রই একটী ময়দার কল প্রতিষ্ঠিত হইবে।—রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ।

চট্টগ্রামের "জ্যোতি" পত্রে প্রকাশ—চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আবদুল রহমান দোভাষী প্রতি বৎসর এক-একখান জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গত পূর্ব্ব বৎসর আমিনা-খাতুন নামক এক জাহাজ এবং গত বৎসর জামিনা-খাতন নামক এক জাহাজ ইনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমিনা-খাতুন ৮২ টনের আর জামিনা খাতুন ১০৫ টনের ছিল। প্রথম জাহাজে দেড় হাজার এবং দ্বিতীয় জাহাজে দুই হাজার বস্তা চাউলের অধিক ধরিত না। এই দুই জাহাজ মান্দ্রাজের চেট্টিদিগের নিকট ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে। এ বৎসর আবদুল রহমান রকিয়া-খাতুন নামক ৫০০ টনের এক জাহাজ তৈয়ার করাইয়াছেন; ইহাতে বার হাজার বস্তা চাউল ধরিবে। নির্ম্মাণে নব্বই হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। গত ১০ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় রকিয়া-খাতুনের ভাসান-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। যে-সব নকল "স্বদেশী" বাবুরা টাকার থলে সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়া মুখে কেবল 'স্বদেশীর' "কাতরানি" দেখাইয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত এই আবদুল রহমানের আসমান জমিন তফাৎ। কে জানে, কতদিনে অচেতনদের চৈতন্যসঞ্চার হইবে?—বাঁকুড়া-দর্পণ।

আমাদের দেশের নৌবিদ্যা ব্রিটিশ-শাসনে 'লুপ্ত' হইয়াছে। যিনি তাহার পুনঃপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা একাকী করিতেছেন তিনি দেশের সুসন্তান, দেশবাসীর শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমিনা-খাতুন জাহাজের সচিত্র বিবরণ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতের অপর-একটি নষ্টশিল্প রঞ্জন-বিদ্যা। জার্ম্মানীর বৈজ্ঞানিক রঙের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের রংরেজ সকলেই কৃষি প্রভৃতি অপর ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারি ফলে হইতেছে—

রংএর অভাবে হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট :—ধ্যানে দেবদেবীগণের যেরূপ বর্ণ ও আকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে প্রতিমা নির্ম্মাণ ও চিত্রিত করাই হিন্দুধর্ম্মের বিধান। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণীর রং-এর আমদানী এককালীন রহিত হওয়াতে দেশে রংএর একান্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রতিমা চিত্রিত করা এক্ষণে বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি অনেক সময়ে কালী-মূর্ত্তিকে সবুজ রং দিয়া চিত্রিত করিতে হইতেছে। উপায় কি ?—স্বরাজ।

উপায় নিজের ঘরের নষ্ট শিল্প উদ্ধারের চেষ্টা করা। যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি তাহাদেরই উপর দেব-প্রতিমার সাজ এবং রংপ্রস্তুতের বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কৌতুককর বটে। ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের জিনিস, আত্মার অবস্থা; তাহাকে এতখানি পরনির্ভর করিয়া তুলিলে দুর্গতি অনিবার্য্য। প্রথমত প্রতিমাই ত বাহিরের জিনিস, তাহার উপর তাহার সজ্জাও যদি বিদেশী হয় তবে আর ধর্ম্ম বলিয়া ও আমার বলিয়া রহিল কি ?

(৬) স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধি।

এক্ষেত্রে কয়েকটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে মাত্র।

যশোহর বাঁকুড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল দত্ত মহাশয় যশোহরের সুযোগ্য সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন উদ্দেশ্যে ৪০০০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন।

বাঁকুড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিবাসীবৃন্দ ২০০০৲ টাকা চাঁদা করিয়া বা ব্যক্তিগত ভাবে কেহ দিতে স্বীকৃত হইলে কেশব বাবু সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধাজনক স্থানে একটি মধ্যইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-কল্পে ১০০০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

আমরা আশা করি গ্রামবাসীগণ এ সুযোগ কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। শিক্ষার আবশ্যকতা এখন সর্ব্বত্র তীব্রভাবে উপলব্ধি হইতেছে এবং তদনুরূপ চেষ্টাও চলিতেছে। এখন যাঁহারা হেলায় সুযোগ হারাইবেন, জীবনসংগ্রামে তাঁহাদিগকে ভীষণ হইতে ভীষণতর প্রহার সহ্য করিতে হইবে।

কেশব বাবুর এবম্বিধ আদর্শ সদিচ্ছার জন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।—যশোহর।

সদনুষ্ঠান।—বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীন কোয়ালপাড়া একটি গণ্ডগ্রাম। উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র কোলে মহাশয় কেবল ব্যবসায়ের দ্বারা নিজের সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয়া আজ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন। সেদিন তিনি নিজের গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনকল্পে ৩৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।—রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ।

সৎকার্য্য।—কলিকাতা মাণিকতলা-নিবাসী বাবু গোপীকৃষ্ণ বসু কলিকাতা মেয়ো হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।—চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ।

স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধির জন্য আবশ্যকমত লবণ খাইতে পাওয়া দরকার; কিন্তু লবণ-ব্যবসায় গভর্মেণ্ট একচেটে করিয়া দেশে লবণ তৈয়ারী একরকম বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, কেহ করিলে দণ্ডনীয় হয়, এবং তাহার ফলে বিদেশী লবণ-ব্যবসায়ীরা লাভবান হইতেছে ও দরিদ্র ভারতবাসী দুর্ম্মূল্য বলিয়া যথোচিত লবণ খাইতে পায় না। এসম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত মন্তব্যগুলি সমীচীন।

যে সকল খাদ্যসামগ্রী না হইলে সাধারণতঃ মানুষের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, লবণ সে-সকলের মধ্যে অন্যতম। এ দেশের লোক এত গরীব যে,—বহু লোক শুধু 'নুন ভাত' খাইয়াই দিন কাটায়। এমতাবস্থায় লবণ সুলভ ও সহজপ্রাপ্য না হইলে দরিদ্র লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। কয়েক বৎসর হইতে লবণের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হওয়ায় লোকের খুবই কষ্ট হইয়াছে।—২৪পরগনা-বার্ত্তাবহ।

লবণের মূল্য। লবণাম্বুবেষ্টিত ভারতবর্ষের লোকে বিদেশী লবণ ক্রয় করে, ইহা যতই বিচিত্র কথা হউক না কেন, এখন লবণের মূল্য সম্বন্ধে বাঙ্গালার জনসাধারণ বিশেষ কিছু আলোচনা করে না। তাহারা জানিয়াছে যে লবণ সরকারের একচেটিয়া ব্যবসায়, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই উহার মূল্য বাড়াইতে বা কমাইতে পারেন। রাজপুতনার সম্বর হ্রদে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হয়, গবর্ণমেণ্ট ঐ লবণ এক টাকায় ২৭ সের হিসাবে বিক্রয় করেন, কিন্তু দোকানদারগণ জনসাধারণকে টাকায় ১৭ সের করিয়া দিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট দুই শত সাড়ে বাহান্ন মণের কম পরিমাণ লবণ কাহাকেও বিক্রয় করেন না। কাজেকাজেই গৃহস্থগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লবণ ক্রয় করিতে পারে না, তাহাদিগকে লবণের জন্য দোকানদারদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট যদি কুইনিন বা ডাক-টিকিটের ন্যায় খুচরা লবণ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে দরিদ্র গৃহস্থগণের সুবিধা হয়। অসাধু ব্যবসায়ীদিগের জন্য মফস্বলের অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়েই এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কোন প্রতিকার না করিলে, লবণ সম্বন্ধে প্রতিকার করা প্রজাদের ক্ষমতার অতীত। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোনরূপ সুব্যবস্থা করিবেন না কি ?—হিতবাদী।

একটি ক্ষুদ্র অধিকার চাই।—ভারতবাসীকে সৈনিক শ্রেণীতে প্রবেশের, সাম্রাজ্যের বড় বড় কাউন্সিলে যোগ দেওয়ার এবং ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়ার কত কথাই উঠিতেছে। আমরা একটি অতি ক্ষুদ্র অধিকার যাচ্ঞা করিতেছি। আমাদের ঘরের দ্বারে সমুদ্র রহিয়াছে, সমুদ্রভরা লবণ রহিয়াছে, সেই লবণগুলি তুলিয়া লইবার অধিকার আমাদের দেওয়া হোক। লিবারপুল হইতে লবণ আনয়ন এইক্ষণ অতি কষ্টকর হইয়াছে। ষ্টীমারের অভাবে ভাড়ার হার ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এই অভাব যে সহসা দূর হইবে ভরসা নাই। পরন্তু যুদ্ধের দরুন ইংলণ্ডে শ্রমজীবীর সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে কাজের অভাবে গরীব লোকেরা কত অভাবগ্রস্ত

হইয়াছে,—তদুপরি দিন দিন সমস্ত দ্রব্যজাত দুর্মূল্য হইতেছে। এদেশের সমুদ্রোপকূলে লবণ তৈয়ারীর কারখানা খুলিবার অধিকার দিলে অনেক গরীব লোকের জীবনোপায়ের একটা পন্থা হইবে।

—জ্যোতিঃ।

কোনো অধিকার সহজে না পাইলেই যে হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহার কোনো কারণ নাই; লাগিয়া না থাকিলে অধিকৃত স্বত্ব পরের হাত হইতে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। কোনো অধিকার শীঘ্র না পাইলেই যে বুঝিতে হইবে তাহার যোগ্যতা প্রার্থীর নাই এমনও কোনো মানে যুক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্যের উত্তর দেওয়া সহজ হইবে বলিয়া অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উত্থাপন করা যাইতেছে।—

শ্রীমতী রেজিনা গুহ এম-এ-বি-এল, ওকালতী করিবার অধিকার চাহিয়া হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মান্দ্রাজ মহিলা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যাঁহারা হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের অধিকার আলোচনায় প্রচলিত হিন্দু আচারের গোঁড়ামীর নিন্দা করেন, তাঁহারা এই বিদুষী মহিলার নৈরাশ্য সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন?—যশোহর।

আমরা বলিতে চাহি যে ইংরেজের হাতে ক্ষমতা গিয়া পড়াতে যেমন ভারতবাসী যোগ্যতা সত্ত্বেও হীন হইয়া আছে, আমরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি; তেমনি পুরুষের প্রণীত ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব্ব হইয়া রহিয়াছে, নারীদের কর্ত্তব্য হইতেছে স্বার্থপর পুরুষদিগের হাত হইতে তুল্য অধিকার আদায় করিয়া লওয়া এবং সফল না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষান্ত না হওয়া।

(৭) সাহস ও অন্যায় প্রতিকারের ক্ষমতা লাভ।

বলচর্চ্চার উপায় আমাদের নাই। আমাদের শাসক-সম্প্রদায়ের এমনই ভয় যে কাহাকেও দুবেলা ডন-বৈঠক করিতে দেখিলেই তাহাদের আতঙ্ক হয় যে বুঝি বা শ্যামসনের ন্যায় তাল ঠুকিয়াই সে ব্রিটিশ-শাসনের বিরাট অট্টালিকা উল্টাইয়া ফেলিবে! অথবা লাঠিসোঁটা লইয়া ম্যাকসিম-গান হাউইটজার প্রভৃতির বিরুদ্ধতা করিবে! সেই ভয়ে তাহারা বলচর্চ্চায় বাধা দ্যায়, উৎপীড়ন করে। তাহার ফলে দেশবাসী দুর্ব্বল ও ভীরু হইতেছে। অগাধ ঐশ্বর্য্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ভৃত্য-অনুচর থাকা সত্ত্বেও আমাদের যে-কোনো প্রধান লোককে একজন সামান্য ইংরেজ অপমান করিতে সাহস পায় সেই জন্যই। এই সেদিন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে ও মান্যবর নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী মহাশয়কে রেল-গাড়ীতে দুজন ইংরেজ অপমান করিয়াছিল। তাঁহারা স্বহস্তে সেই স্পর্দ্ধার দণ্ড না দিয়া অপরের কাছে নালিশ করিয়া নিজেদের ও দেশের দুর্ব্বলতা প্রমাণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে "মোহাম্মদীর" উক্তি অতি সমীচীন ও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করি।—

চরম অভদ্রতা।—সংবাদপত্রে প্রকাশ, মান্যবর নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের পরিবারস্থ কয়েক ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ রেল-ষ্টেশনে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রস তথায় আসিয়া ঐ আরোহীদিগকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলেন, তাঁহারা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় রস সাহেব তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক নামাইয়া দিয়াছেন। ষ্টেশন মাষ্টার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তিনি উপরওয়ালাকে জানাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। এরূপ বেআইনী বল প্রয়োগের পরিবর্ত্তে আরোহীগণ যদি মিঃ রসকে দুই ধাক্কা দিয়া গাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রাজদত্ত আইনের অধিকার ও আত্মসম্মান বজায় রাখা হইত। এই শ্রেণীর ইংরাজগুলিই যত অনিষ্টের মূল। —মোহাম্মদী।

দেশের লোককে গভর্মেণ্ট যখন স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করিতেছেন, তখন অস্ত্র-আইন তুলিয়া দেওয়া গভর্মেণ্টের কর্ত্তব্য এবং দেশবাসীর তাহাই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত অনুরোধ। ইহা যদি না হয় তবে গভর্মেণ্টের কথায় কাজে সামঞ্জস্য থাকিবে না। এই অবস্থায় আমরা নিম্নলিখিত সংবাদটি পড়িয়া দুঃখিত ও আশ্চর্য্য হইয়াছি।—

ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ। বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আদেশ দিয়াছেন যে জেলার সমুদয় বন্দুক পুলিস সাহেবের আফিসে দাখিল করিতে হইবে। এই আদেশ কেন প্রদত্ত হইল, তাহার কারণ সাধারণ্যে প্রকাশ নাই।—পাবনা-বগুড়া-হিতৈষী।

(৮) সমবায় ও শৃঙ্খলা দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন।

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী:—দেশে ক্রেডিট সোসাইটীর সংখ্যা দিন-দিনই বাড়িতেছে। অন্যান্য স্থানের খবর আমরা বিশেষ জানি না—তবে চাটমোহর অঞ্চলে যে-সমস্ত সোসাইটী আছে, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা খুব প্রশংসাই শুনিতে পাইতেছি। প্রকাশ যে, এতদঞ্চলের মহাজনগণ এক্ষণে সুদের হার অনেকটা কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এতদঞ্চলের অনেক কৃষক এবার কিছু কিছু আলুর আবাদ করিয়াছে। পাবনার কৃষি-পরিদর্শক কর্ম্মচারী মহাশয় নাকি সম্প্রতি এই সমস্ত আলু পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আলুর আবাদের প্রচলন হইলে কৃষকদের অনেক সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এ বৎসরে, বিলাতি ঘাস,

চিনা বাদাম প্রভৃতির আবাদের প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছে। শুধু কয়লা কারবার না করিয়া নূতন নূতন শস্যপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিলে ক্রেডিট সোসাইটির দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

—স্বরাজ।

এইরূপে দেশের লোক সকলে সমবেত হইয়া সুশৃঙ্খলায় সর্ব্বজনহিতকর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেশের দৈন্য ও অভাব অচিরে দূর হইয়া যাইবে। দেশের সকল লোকেরই এই মহাযজ্ঞে যোগ দিবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। সহর ও মফঃসলের অনেক সংবাদপত্রের অপেক্ষা "বরিশাল-হিতৈষী" সুচিন্তিত সুলিখিত ও তেজোগর্ভ মন্তব্য লিখিয়া দেশকে উদ্বোধিত ও দেশের হিতসাধন করিবার চেষ্টা করেন দেখিয়া আমরা সমধিক প্রীত হইয়াছি। তাঁহার কথাতেই "দেশের কথা" আরম্ভ করিয়াছি ও তাঁহার কথা দিয়াই উপসংহার করি—

"জয় জয় রবে চল চল সবে,
এসেছে মধুর আহ্বান,
কে রবে পড়িয়ে অচেতন!"

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্প ও সাহিত্য

"শিল্প ও ধর্ম্ম" প্রবন্ধে আমরা শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য আছে এ কথা মানিলেও শিল্প ও সাহিত্যকে এক-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াই দেখিয়াছি। কিন্তু সে ভাবে দেখিতে গেলে শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধ ধরা পড়ে না। অথচ, এই সম্বন্ধ-বিচারের উপর সাহিত্যের প্রকৃতি বোঝা না-বোঝার সম্পূর্ণ নির্ভর আছে।

আমি সেই প্রবন্ধে বলিয়াছি যে শিল্প জীবনের প্রকাশক; সেইজন্য শিল্পের মধ্যে শিল্পীই প্রধান। এ কথাটাকে আমার সাধ্যমত সেখানে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং পুনরাবৃত্তির দরকার নাই।

কিন্তু যাঁহারা মনে করেন শিল্পের কাজ কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা, তাঁহারা 'শিল্প জীবনের প্রকাশক' এই কথাটিতে আপত্তি করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন, তবে শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের কি সম্বন্ধ থাকে? এই সৌন্দর্য্যের দোহাই মানিয়া তাঁহারা শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধ বিচার করিয়া থাকেন, এবং সাহিত্যের যে অংশ কলাসৌষ্ঠব-পূর্ণ সেই অংশকেই 'শিল্প' আখ্যা দিয়া বাকী অংশকে শিল্পের গণ্ডীর বাহিরে নিক্ষেপ করেন। তাঁহারা বলিবেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, ব্রাউনিং বা হুইট্‌ম্যানে 'Life' থাকিতে পারে, কিন্তু 'Art' যথেষ্ট নাই। সুন্দর পদার্থ দেখিয়া মনে যে-রকম রসোদ্রেক হয়, যাঁহাদের রচনায় 'আর্ট' আছে তাঁহাদের রচনা পড়িলে মনে ঠিক্ সেই-রকম রসভাব জাগে। কীট্‌স্, হাইন, বদ্‌লেয়ার, গোতিয়ে প্রভৃতির রচনায় সেই 'আর্ট' বস্তুটা আছে। হুইট্‌ম্যানের লেখায় Life থাকিলেও, তাঁহারই দেশীয় কবি পো'র কাব্যে ঢের বেশি আর্ট আছে। অস্কার ওয়াইল্‌ড্, সিমন্‌স্, প্রভৃতি এই দিক্ হইতে সাহিত্য ও শিল্পের সম্বন্ধ বিচার করিয়া থাকেন বলিয়া, শিল্প শিল্পেরই জন্য (art for art) এই মতকে তাঁহারা পোষণ ও প্রচার করিয়াছেন।

'আর্ট' এবং 'লাইফ', শিল্প এবং জীবনের মধ্যে এই একটা বড় বিচ্ছেদ-রেখা টানিবার কোন সঙ্গত কারণ আমি পাই না। কেন পাই না, তাহা গোড়ায় আলোচনা করিয়া লইলে বোধ হয় শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধটা আমার বিবেচনায় কি, তাহা প্রকাশ করিতে পারিব।

জীবন-বস্তুটাকে যতই আমরা তলাইয়া দেখিতে যাই ততই দেখি যে, জীবনের গতিতে নানা পরিবর্ত্তন, নানা বিচিত্রতা ও জটিলতা যেমন দেখা দেয় তেমনি সেগুলিকে সংযত ও বিধৃত করিয়া শৃঙ্খলা ও ছন্দও দেখা দেয়। জীবনের গতির মধ্যে কেবলই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা, কেবলই বিচিত্রতা ও জটিলতা যদি দেখা যাইত, তবে জীবনের ব্যাপারে সমস্তই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল হইত; ইহা সহজেই বুঝিতে পারি।

অতএব, জীবনের প্রকাশ যেখানেই দেখিব, সেখানে যেমন দেখিব পরিবর্ত্তন ও বিচিত্রতা, তেমনি দেখিব শৃঙ্খলা ও ছন্দ। কিন্তু সকল প্রকাশ এবং সব-রকমের প্রকাশেই এরূপ দেখিবার উপায় নাই। কারণ, প্রকাশের মধ্যে তারতম্য থাকিবেই। কোন প্রকাশে হয়ত ব্যাপ্তির (extensity) দিক্‌টা বেশি, কোন প্রকাশে হয়ত সংহতির (intensity) দিক্‌টা বেশি। মোটামুটি এই পার্থক্যের জন্য জীবন-বস্তুর প্রকাশের বিস্তর তারতম্য ঘটে। যেখানে ব্যাপ্তির দিকে ঝোঁক বেশি,

সংহতির দিকে নয়, সেখানে বিচিত্রতা ও জটিলতার সমাবেশ আছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে ছন্দিত ও সরল করিবার প্রণালী নাও দেখা যাইতে পারে। অথচ এই দুইয়ে মিলিয়াই জীবনের এবং জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণতা—প্রসারও চাই গভীরতাও চাই; বৈচিত্র্যও চাই, ছন্দও চাই। এখন প্রশ্ন এই যে, তবে সৌন্দর্য্য কোথা হইতে আসে? জীবনের সব প্রকাশেই কি সৌন্দর্য্য দেখা যায়? প্রকাশের মধ্যে যদি তারতম্য থাকে তবে সৌন্দর্য্যের মধ্যেও কি তারতম্য থাকিবে না? জীবনের প্রকাশের সম্পূর্ণতা হইলেই সৌন্দর্য্য অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়।

একটা স্থূল উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। মানুষের শরীর জিনিসটার মধ্যে অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের, প্রত্যঙ্গের সঙ্গে প্রত্যঙ্গের নানা বৈপরীত্য আছে, ইহার প্রত্যেকের বিচিত্রতা আছে; কারণ প্রত্যেকটির আকারের ও আয়তনের বিশিষ্টতা আছে। এই শরীরে যখন জীবনবেগ দেখা দেয়, তখন এই শরীরের অবলীলা-আন্দোলনের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈপরীত্যগুলা যেমন ফোটে, ছন্দও তেমনি ফোটে। আমরা তাই বলি, নৃত্যকলায় শরীরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কি? এই শারীর জীবনের সম্পূর্ণতার নয় কি? এক কথায় জীবনের নয় কি? শরীরের অঙ্গে অঙ্গে জীবনবেগ সঞ্চারিত হইয়া যখন অঙ্গের প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যগুলাকে ছন্দিত করে, তখনইনা সৌন্দর্য্য ফোটে? কুস্তিগিরের শারীর সঞ্চালনের মধ্যেও এই সৌন্দর্য্য আছে। কুস্তিও একটা মস্ত আর্ট। জীবনের প্রকাশ যেখানেই পূর্ণমাত্রায় জাগে, সেইখানেই সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়। আর্টের লক্ষ্য মুখ্যতঃ তাই জীবন, সৌন্দর্য্য নয়। অথচ সে লক্ষ্যে আর্ট যে পৌঁছিল, তাহার নিদর্শন কিন্তু সৌন্দর্য্যে।

অন্য একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। আমরা দেখিতে পাই যে, সকল দেশেই নির্ম্মলতা সৌন্দর্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নির্ম্মলস্বভাব পুরুষ বা নারী মানুষের কাছে সুন্দর। তাহা যদি না হইত, তবে বুদ্ধ বা খৃষ্ট বা saintগণ চিত্রকলার বিষয় হইতেন না। রমণীমূর্ত্তির মধ্যে মাতৃমূর্ত্তি সকল দেশেই আদরণীয় ও বরণীয় হইত না। ইহার কারণ কি এই যে, ভালোর সম্বন্ধে মানুষের একটা সামাজিক সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে; তাই মন্দকে বা অপবিত্রকে মানুষ কোন মতেই সুন্দর বলিতে পারে না,—এই কি? অবশ্য দশের মধ্যে এ সংস্কার থাকিলেও, শিল্পীর মনে থাকিবার হেতু নাই। কারণ, শিল্পীকে সংস্কারের উপরে উঠিতে হয়, স্বাধীন মন ও দৃষ্টি লইয়া জগৎটাকে দেখিতে হয়। তবুও আজ পর্য্যন্ত অপবিত্রকে সুন্দর বলিতে কোন শিল্পী পারে নাই। অবশ্য অনেক সময় সামাজিক সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যাহাকে অপবিত্র বলি তাহাকে শিল্পী অপবিত্র বলেন না। তিনি ভিতরের দিক হইতে শুচিতা অশুচিতার বিচার করেন। তবু নিরবচ্ছিন্ন অপবিত্রতাকে তিনি কোনমতেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একাসন দিতে পারেন না, এ কথা তো সত্য। কেন পারেন না? কুৎসিত কাজ বা আচরণের দ্বারা আমরা যে জীবনকেই মারি; সে-সব কাজের দ্বারা জীবন প্রসারও পায় না, গভীরতাও পায় না। অপবিত্রতা বা কলুষের দ্বারা আমরা বৃহৎ ও সমগ্র জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হই; আমাদের মন্দ ইচ্ছা বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হইয়া সকলের যোগে কাজ করিবার অবসর পায় না। এই জন্য মানুষ প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে বরণীয় জানিয়াছে, কারণ শ্রেয়ের পথেই জীবনের পূর্ণমাত্রায় বিকাশ। এবং পূর্ণমাত্রায় বিকাশেই সৌন্দর্য্য। জীবন যেখানেই অবাধিত ও স্ফূর্ত্ত, সেখানেই সৌন্দর্য্য ফুটিবেই।

গুহাবাসী আদিম অসভ্য মানব তাহার নির্ম্মিত যন্ত্রাদিতে ছবি আঁকিয়াছে; সুসভ্য গ্রীক শিল্পের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কোথায়? গ্রীকের মধ্যে অসভ্য মানবের জীবন সম্বন্ধে যে বিস্ময়, রূপ পর্য্যবেক্ষণের যে আনন্দ এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তজ্জনিত যে চাঞ্চল্য তাহা তো আছেই; আরওকিছু আছে। তাহার জীবন ঐটুকুতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। অসভ্য মানব রূপ দেখিয়াছে, রূপবৈচিত্র্য দেখে নাই। আবার রূপবৈচিত্র্য দেখিলেও সুষমা ও সুসঙ্গতি (harmony) দেখে নাই। গ্রীক তাহা দেখিয়াছিল। গ্রীকের শিল্পে তাই সৌন্দর্য্য বেশি, কারণ জীবন বেশি। আরও বৈচিত্র্য ও জটিলতা, এবং আরও শৃঙ্খলা ও ছন্দ যদি গ্রীক শিল্পে থাকিত, তবে সে শিল্প আরও বড় শিল্প হইত। শুধু

রূপরসগ্রাহ্য জীবন গ্রীককে মুগ্ধ করিয়াছে, অধ্যাত্ম অতীন্দ্রিয় জীবনের খবর সে পায় নাই। সেই দিক হইতে হিন্দুশিল্প, চীনশিল্প আরও দূরে গিয়াছে। যে দিকেরই জীবন হৌক, তাহার সরলতা ও সুষমা বৈচিত্র্য-ও-জটিলতাবিহীন হইলে চলিবে না। অন্য পক্ষে বৈচিত্র্য ও জটিলতা যথেষ্ট আছে, অথচ সুষমা ও সুসংহতি নাই, ইহাতেও জীবনের পূর্ণতার অভাব, সুতরাং সৌন্দর্য্যেরও অভাব ঘটে।

জীবনের যেখানেই সম্পূর্ণতা, সেখানেই সৌন্দর্য্য অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, একথা যদি মানি, তবে "শিল্প শিল্পের জন্য" এ মত মানিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু এই কথাটা বলিলেই চুকিয়া যায় না, কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে আরও কতগুলি সন্দেহ প্রশ্নের আকারে জাগিয়া উঠে। প্রথম প্রশ্ন—জীবন তো স্বতস্ফূর্ত্ত, তবে তাহার আবার শিল্পরূপ পরিগ্রহ করিবার সার্থকতা কি? জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ প্লেটো শিল্পকে জীবনের অনুকরণ মাত্র মনে করিয়া তাহাকে নিন্দা করিয়াছেন। বাস্তবিক, অনুকরণের সার্থকতা দেখা যায় না।

ঐ যে জীবনের সম্পূর্ণতা বা সমগ্রতার কথাটা বলা গিয়াছে, উহা কি আপাতদৃষ্টিতে সকলেরি অনুভবগম্য? জগতের দিকে তাকাইয়া আমরা কি দেখি? জীবনের রূপ বিচিত্র বটে, কিন্তু অংশে অংশে প্রতিভাত; সম্পূর্ণতা কোথাও নাই। কোনটা কাঁচা কোনটা পাকা; কোনটা তাজা কোনটা ধুসা; কোনটা সচল কোনটা অচল ও ধ্বংসমুখে পতিত। এই আংশিক জৈব টুক্‌রাগুলির সমগ্রতা কোথায়? এই ক্ষণিক জীবনের কণাগুলির সমষ্টি কোথায়? এই অসমঞ্জস বিক্ষিপ্ত রূপগুলির সম্পূর্ণ অখণ্ড রূপ কোথায়? বাহিরের প্রকৃতিতে তাহা যদি পাওয়া যাইত, তবে আর শিল্পের প্রয়োজন ছিল না। বাহিরের প্রকৃতিতে তাহা পাওয়া যায় না। কবির কল্পলোকে, শিল্পীর মনোরাজ্যে তাহা পাওয়া যায়। সেইখানে সমগ্রতা, সমষ্টি, সম্পূর্ণতা। সেইখানে জীবন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। সুতরাং সেখানেই যথার্থ সৌন্দর্য্য ফোটে। সেই সমগ্রতার আলোয় বাহিরের বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে আমরা দেখি, আর মুগ্ধ হই। সেই আলো—

That light which never was on land or sea
The consecration and the poet's dream.

যে আলো জলে কিম্বা স্থলে কখনো ছিল না,
যে কেবল পূত হইয়া আছে কবির স্বপ্নের মধ্যে।

তার্কিক এ স্থলে অন্য প্রশ্ন তুলিবেন—তবে ত এ শিল্প "বস্তুতন্ত্র" হইল না। এ তো 'আইডিয়াল' কল্পিত বস্তু হইল, মায়িক বস্তু হইল। কিন্তু শিল্পীমাত্রেই বলিবেন যে ইহাই যথার্থ বাস্তব পদার্থ, যাহাকে reality বলি তাহাই হইল। কারণ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বহির্জগৎটাকে অনুভব করি, সে অনুভূতিগুলি তখনই বাস্তব অনুভূতি হয়, যখন জগৎটা বা জীবনটা আমাদের কাছে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন প্রাতিভাসিক টুক্‌রা টুক্‌রা না হইয়া সমগ্র হয় সমষ্টি হয়, যথার্থই বিশ্ব হয়। শিল্পই এই বাস্তব অনুভূতি আনিয়া দেয়। শিল্পের মধ্যে সকল শিল্পই এই কাজ করে, বাস্তব অনুভূতি বহন করে, এমন কথা বলি না। তাহার মধ্যে অবাস্তব, মায়িক কল্পলোকাশ্রয়ী বহু জিনিস আছে। তাহাদেরও সার্থকতা আছে। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় শিল্প জীবনের সমগ্ররূপ উদ্ভাসিত করিয়া দেখায়, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

একটা প্রশ্ন ও সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করা গেল। আরও প্রশ্ন আসে। তবে কি শিল্পবস্তু উদ্দেশ্যমূলক? শিল্পের কি উদ্দেশ্য থাকিতেই হইবে? শিল্পের কাজ কি আমাদিগকে কেবলমাত্র আনন্দ দান করা নয়?

শিল্প একের অনুভূতি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার একটা প্রধান উপায়। আমার মনে যে অনুভূতি জাগিতেছে, অন্যের মনে তাহা জাগাইতে গেলে আমায় বাধ্য হইয়া (অথবা স্বভাবতই বলা ভাল) শিল্পের সাহায্য লইতে হয়। এইজন্য রংচং চাই, শব্দঝঙ্কার চাই, আভঙ্গ ইঙ্গিত চাই, ছলাকলা চাই। এটা একেবারে আদিম শিল্প প্রবৃত্তির (art-instinct) কথা। পক্ষী-পক্ষিণী মিলনকালে পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য গান গায়, পক্ষিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে তাহাদের গানের অর্থই তাই। এই যে একের অনুভূতি অন্যের মনে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা, ইহা হইতেই যত ছলাকলার উৎপত্তি। কাউণ্ট টল্‌স্টয় ইহাকে 'infection' ছোঁয়াচ বলিয়াছেন। শিল্প এই

ছোঁয়াচে জিনিস। এ ছোঁয়াচ সকলকেই ধরিলে ধরিতে পারে।

কিন্তু শিল্পের এই আদিম উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার তার চেয়ে বড় এবং সর্ব্বপ্রধান আর-একটি উদ্দেশ্য দাঁড়াইয়াছে। তাহা, জীবনের অনুভূতিকে বহন করা বা সঞ্চারিত করা। এই জায়গাটিতে উদ্দেশ্য আছেও বটে নাইও বটে। কারণ উদ্দেশ্য বলিলেই যে-রকম একটা পূর্ব্ব-হইতে-চিন্তিত সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাপার মনে হয়, শিল্প তাহা আদবেই নয়। ইহা একেবারেই স্বতস্ফূর্ত্ত, স্বতোচ্ছ্বসিত। যেমন আমরা হাসি কাঁদি, তেমনি আমরা জীবনের অনুভূতিকে শিল্পে প্রকাশ করি। জীবনে আমাদের যেমন আনন্দ, শিল্পে তেমনি আনন্দ।

অতএব, জীবনের অনুভূতি যদি শিল্পের বস্তু হয়, তবে সেই অনুভূতিকে যে ছলাকলার সাহায্যে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়, তাহা শিল্পের রূপ। বস্তুটাই আসল না রূপটাই আসল, ইহা লইয়া তর্ক আছে। দুইই পরস্পরাপেক্ষী।

জীবনে ও শিল্পে বিচ্ছেদ যদি না ভাবি, তবেই শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারিব। ম্যাথু আরনল্ড কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন "Poetry is, at bottom, a criticism of life." অর্থাৎ 'কাব্য জিনিসটা তলাইয়া দেখিতে গেলে জীবনের সমালোচনা। ম্যাথু আরনল্ড সমালোচক ছিলেন; সুতরাং সমালোচনার কথাটাই তাঁর সকলের আগে মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্য সমালোচনা নয়; কাব্য সৃষ্টি। অবশ্য সমালোচনাও যে সৃষ্টি হয় না তা বলি না। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা সমালোচনা বলিতে যে বিশ্লেষণ বুঝি তাহা পাছে কাব্যের সংজ্ঞা-নিরূপণের সময়ে মনে আসে, তাই সমালোচনা কথাটা কাব্যের সংজ্ঞার্থে ব্যবহার করিতে আপত্তি করি। জীবনকে কেবলি আবিষ্কার, জীবনের উপকরণ-বিচিত্রতাকে কেবলি প্রত্যক্ষীকরণ, ও তাহা হইতে নব নব রসসৃষ্টি—ইহাই সাহিত্য। সকল শিল্প মোটের উপর এই উদ্দেশ্য সাধন করিলেও, সাহিত্যে ইহার যত বিকাশ এবং পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকাশ এমন অন্যান্য শিল্পে নয়। ইহাই আজ আমি প্রতিপন্ন করিতে চাই। সাহিত্য সকল শিল্পের সমন্বয়ীভূত শিল্প। কেন এ কথা বলি তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করা যাক্।

কতকগুলি শিল্প আছে যাহা বাহিরের বিষয়াপেক্ষী। বাহিরের বিষয়কে শিল্পী আপনার কল্পনার ছাঁচে ফেলিয়া রূপান্তরিত করিয়া সৃষ্টি করেন। অবশ্য ইহা অনুকরণ নয়, কারণ শিল্পের কাজ সৃষ্টি, অনুকরণ কখনই নয়। আবার কোন কোন শিল্প আছে যাহার বিষয়, রূপ, সমস্তই শিল্পী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত, শিল্পী কর্ত্তৃক সৃষ্ট।

সঙ্গীত শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্প। সঙ্গীতের বিষয়, রূপ, সমস্তই সঙ্গীতশিল্পী কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। চিত্রকলা, নৃত্যকলা, প্রভৃতি কলা পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বলা বাহুল্য, জীবনের ব্যাপারে এইরূপ শ্রেণীভেদ করা শক্ত। ভেদ রেখা দেখিতে দেখিতে কখন্ যে বিলোপ পায় তাহা আগে ভাগে হিসাব করিয়া বলা যায় না। মোটের উপর বলা যায় এই যে, সঙ্গীতের কালের (time) সঙ্গে সম্বন্ধ; চিত্রকলার আকাশের (space) সঙ্গে সম্বন্ধ। সঙ্গীতের মধ্যে গতির দিক; চিত্রে স্থিতির দিক। কিন্তু এ কথাও ঠিক খাটে না, কারণ গতি ভিন্ন চিত্রও সম্পূর্ণ হয় না। জাপান ও চীনে বোধ হয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। শ্রীমৎ ওকাকুরা তাঁহার 'প্রাচ্যের আদর্শ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন "শাকাকু পঞ্চম শতাব্দীতে চিত্রশিল্পের ষড়ঙ্গ বা ছয়টি সূত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; বাহিরের প্রকৃতিকে চিত্রিত করাকে তিনি খুব নিম্নস্থান দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম সূত্র এই, "বস্তুর ছন্দের ভিতর দিয়া আত্মার প্রাণ-গতি' '(The life-movement of the spirit through the rhythm of things')—ইহাই চিত্র-শিল্পের প্রধান অঙ্গ। কারণ শাকাকুর মতে শিল্পমাত্রেই বিশ্বের একটা বিশাল মনোভাব বই আর কিছুই নয়; এবং বস্তুরাজ্যের মধ্যে যে-সকল ছন্দোময় নিয়ম আছে তাহাদের ভিতর দিয়া তাহা চলিতে চায়।" ইহার চেয়ে বড় শিল্প-সূত্র কোন দেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। একদিকে বস্তুরাজ্য, অন্যদিকে মনোরাজ্য—বস্তু-রাজ্যে ছন্দ, এবং মনোরাজ্যে প্রাণ-গতি, এই দুয়ের যোগে শিল্প। সেই মনও সংকীর্ণ মন নয়; সে বিশ্ব-মন। বস্তুরাজ্যও অসংহত বিক্ষিপ্ত বস্তুরাজ্য নয়, ছন্দিত নিয়মিত বস্তুরাজ্য। সুতরাং চিত্র ও সঙ্গীতের মধ্যে স্থান ও কালের হিসাবে

ভেদ থাকিলেও গতিতত্ত্ব উভয়েই আছে। যে চিত্রে life-movement নাই, তাহা চিত্রই নয়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রেণীভেদ কড়াকড় রকম দাঁড় করানো চলে না; তবু ভেদ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। গানে যে 'life-movement' প্রকাশ পায়, যে জীবনগতি প্রকাশ পায়, ছবিতে ঠিক্ সেই পরিমাণে জীবন-গতি প্রকাশ পায় না। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এক জায়গায় গান এবং ছবির মধ্যে এই ভেদ দেখাইয়াছেন যে, গান সীমা হইতে অসীমে যাওয়া এবং ছবি অসীম হইতে সীমায় আসা। দুয়ের গতি দুই ভিন্ন রকমের গতি। এই জগতের মধ্যেও বোধহয় স্থান এবং কালের (space and time) সম্বন্ধটা ছবি ও গানের সম্বন্ধেরই মত।

সাহিত্যে এই গানও আছে, ছবিও আছে। সাহিত্য "ছবি ও গান" একাধারে। গীতিকাব্যে ও অন্যান্য কাব্যে গানের ভাগ বেশি; গল্পে-উপন্যাসে ছবির অংশ বেশি; নাট্যে ছবি ও গান পূর্ণসম্মিলিত।

অন্যান্য সকল শিল্পের চেয়ে বোধহয় গানের শক্তি সকলের চেয়ে বেশি। গানে কথা নাই, কথার দরকারও নাই। "মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন" গান যে-লোকে উড়িয়া যায়, সে-লোকে আমরা ইন্দ্রিয়গম্য ধরিবার-ছুঁইবার-মত কিছুই পাই না; কোন স্পষ্ট হৃদয়াবেগও বুঝি না; অথচ আমাদের ভিতরকার গভীর, গভীরতম সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম চিন্তাবগুলি, moodগুলি, কেমন করিয়া যেন নাড়া পায়। আর কিছুতেই যেন তাহাদের সেই গোপন দরজায় ঘা দিতে পারিত না, এই মনে হয়। কেন যে এমন হয় তাহা গানের মোহিনী মায়া যাঁহারা জীবনে বারম্বার উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না। একটা কারণ বোধহয় "rhythm of things" বস্তুরাজ্যের তরঙ্গিত ছন্দের দোলের ভিতর দিয়া "life-movement" জীবনগতি গানে যত ব্যক্ত হয় এমন আর কিছুতে নয়। সুরের একদিকে আবেগের কম্পনমালা; অন্যদিকে তাল এবং লয়ের যথাযথ পরিমাণ। আর কানে এবং মনে সেই দুয়ের আন্দোলে কখনো অতৃপ্তি, কখনো বিরহ, কখনো অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, কখনো সুগভীর অবসাদ—নানা মনোভাব ও অনুভাব—এমনি আপনি উঠিয়া আসে যে মনে হয় যে সত্যসত্যই বাহিরের জগৎ এবং মনোজগৎ এক সুরে বাঁধা বীণার তারের মত—একের আঘাতে বাজিয়া উঠে। এটা যে একটা কল্পনা মাত্র নয়, এটা যে সত্য, তাহা জীবনের গতি দেখিলেই আমরা বুঝি। গতি মাত্রেই ছন্দিত গতি। দিন এবং রাত্রি, দক্ষিণায়ন উত্তরায়ন, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নিশ্বাস প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের দ্বিধান্দোলন, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি—সর্ব্বত্রই ছন্দ একেবারে সু-নির্দ্দিষ্ট। এই বিশ্বছন্দকে বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবার বহুপূর্ব্বে মানুষ আপনার ভিতর হইতে এই ছন্দতত্ত্বকে বাহির করিয়াছে। ছন্দে কথা বলিলে কি ফল হয়, আর বিনা ছন্দে বলিলে কি ফল হয় তাহা সে পরখ করিয়া লইয়াছে। মানুষের কাব্যে এই ছন্দ সবচেয়ে বড় জিনিষ হইয়াছে। কাব্য মানেই গান—শুধু অর্থযুক্ত গান, এই যা তফাৎ।

সেইজন্য কাব্যে এমন সকল হৃদয়াবেগ (moods and emotions) জাগ্রৎ হয়, যাহা গানেও সব সময়ে হয় না। লিরিক জিনিসটা বিশেষভাবে গাহিবার জিনিস; সুতরাং লিরিক কবিতা গান করিয়াই পড়া উচিত। প্রাচীন গ্রীসে লিরিক কবিতা গীত হইত। কবি ইয়েট্‌স্ দেখাইয়াছেন যে এখনো কবিতা এবং ছন্দোময় গদ্যও সুর করিয়া পড়া চলে। গল্পও সুর করিয়া পড়া চলে। গান করিয়া পড়িলেই তবে আমরা তাহাদের যথার্থ রসগ্রহণে সমর্থ হই। আমার মনে হয় প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সমস্ত গীতিকবিতা (যাহাদের মধ্যে গানই প্রাণ) গানের জিনিস হওয়া উচিত। তাহার ঠিক সুরটি পাইলেই তবেই তাহা যে-সকল হৃদয়াবেগ যে-সকল চিন্তাব জাগাইতে চায় তাহা জাগাইতে পারে। ইংরেজি সাহিত্যে শেলি, মূর, বার্ণস্, রসেটি, টেনিসন, সুইনবর্ণ প্রভৃতির অনেক কবিতা; এবং অনুবাদ পড়িয়া বুঝা যায় যে, জর্ম্মান সাহিত্যে হাইনে, ফরাসী সাহিত্যে ভিক্তর হুগো, গোতিয়ে, বদ্‌লেয়ার প্রভৃতির কবিতাও গানের জিনিস। আমাদের দেশে মধ্য-যুগীয় সকল কাব্য-সাহিত্যই দোঁহা-জাতীয় ছিল। নানকের সবই গান, কবীরেরও তাই। বৈষ্ণব কবিতাও গান। এখনও বাংলার শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ

কবিতাই গান। আর তাঁহার যে-সব কবিতা ঠিক গান নয়, তাহাও গীতের যোগ্য। সুফী সাহিত্যেও সবই প্রায় গান। এই সমস্ত লিরিক কাব্যে সুরটাই লক্ষ্য, কথা উপলক্ষ্য। কথা সুরকে আচ্ছন্ন করে না, সুরকে অনুসরণ করিয়া সুরের সাহায্যে কতগুলি হৃদয়াবেগকে জাগায়।

শেলি যখন Ode To The West Wind লিখিয়াছিলেন তখন তাঁর মর্ম্মগত কথাটি ছিল এই :—

"Make me thy lyre, even as the forest is"

অরণ্য যেমন তোমার বীণা, তেমনি হে দুর্দ্দম পবন, আমাকে তোমার বীণা কর।

শেলির অধিকাংশ কবিতাই গেয়। বার্ণস্ যখন গাহিয়াছেন :—

Oh my luve's like the melodie
That's sweetly played in tune.

আমার প্রেম সেই গান যাহা সুরে বড় মধুর বাজে। —তখন তিনি জানিতেন যে তাঁর কবিতাগুলি গানেরই জিনিস।

টেনিসনের কবিতার প্রাণও যে সঙ্গীত, তার প্রমাণ তাঁর idyllগুলিকেও তিনি গান দিয়া গাঁথিয়াছেন। "The Brook" খুব স্পষ্ট একটা উদাহরণ। The Princess, Maud প্রভৃতি কাব্যও গানে-গল্পে গাঁথা। অল্প-বয়সী ভাই-বোনের মত তাহাদের পরস্পরের চেহারার পার্থক্য বুঝা যায় না।

সুইনবর্ণের কবিতা সম্বন্ধে নিন্দা এই যে ছন্দের ঝঙ্কারে তাঁহার বলিবার কথা যদি কিছু থাকে তাহা আচ্ছন্নপ্রায় হইয়া যায়। অমন ছন্দের বৈচিত্র্য ত আর কাহারও দেখা যায় না।

ব্রাউনিংএর কবিতায় গানের অভাব, ব্রাউনিং সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই। সাধারণতঃ তাই বটে, যদিচ গান না থাকিলেই যে কোন কবিতা কবিতা-হিসাবে হীন হইবে তাহার কোন মানে নাই। ইহার পরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, যে কবির কবিতায় শুধু গান বা শুধু ছবির রস না ফুটিয়া দুয়ের সম্মিলনে নাট্যরস ফোটে, তিনি সকলের চেয়ে বড় কবি। ব্রাউনিংএর কবিতায় এই নাট্যরস প্রচুর পরিমাণে জমিয়াছে। তবু বিশুদ্ধ গানের কবিতা ব্রাউনিংএ যে নাই তাহা বলিতে পারি না। Abt Vogler একটা মস্ত উদাহরণ।

"Would that the structure brave, the manifold music I build,
Bidding my organ obey, calling its keys to their work—"

ইত্যাদি যখন পড়া যায়, তখন মনে হয় অ্যাব্‌ট্ ভোগ্‌লার যেন অরগেনে বসিয়া গিয়া বাজাইতে সুরু করিয়াছেন এবং সেই অশ্রুত বাজনা কবিতাটির ভিতর হইতে সুগম্ভীর ছন্দে ধ্বনিত হইয়া বাহির হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে—

সমুদ্রমন্দ্রের ছন্দ—

"হে আ | দি জননি সিন্ধু, | বসুন্ধ | রা সন্তা | ন তোমার | একমাত্র | কন্যা | তব কোলে | তাই তন্দ্রা | নাহি আর | চক্ষে | তব তাই | বক্ষ | জুড়ি সদা শঙ্কা | সদা আশা | সদা আন্দো | লন তাই | উঠে বে | দ মন্ত্র | সম ভাষা | নিরন্ত | র প্রশান্ত | অম্ব | রে মহেন্দ্র | মন্দির পানে | অন্ত | রের অনন্ত | প্রার্থনা | ।" ইত্যাদি।

ঐ কবিতায় ভাল করিয়া যুক্তাক্ষরগুলির উপর ঝোঁক দিয়া দিয়া পড়িলে সমুদ্রতরঙ্গের ধ্বনির অনুকার পরিষ্কার টের পাওয়া যায়। যেমন মাইকেলের :—

যাদঃ। পতি রোধঃ। যথা চলো। র্ম্মি-আঘাতে।

এই একটি পংক্তিতে বিসর্গের সাহায্যে এবং 'চলোর্ম্মি"র 'ও'কারে ঝোঁক পড়ার জন্য সমুদ্রতরঙ্গের তটে আঘাত করিবার অনুকৃতি-সুর বাজিতেছে। মাইকেলের ছন্দেরও বিচিত্র দোল আছে। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর বাংলার কোন কবিরই অত ছন্দবৈচিত্র্য নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঝড়ের রোল :—

বীণাতন্ত্রে | হান হান | খরতর | ঝঙ্কা | র ঝঞ্ঝ | না...।
তোল | উচ্চসুর।—

সেই বর্ষশেষের কবিতাটি পড়িলে পুরাপুরি ঝড়ের সঙ্গীতরস আদায় করা যায়।

আবার বর্ষার সুর :—

ঐ। আসে ঐ। অতি ভৈ। রব হরষে.......।
জলসি। ঞ্চিত। ক্ষিতি সৌ। রভ রভসে.....।

ঘন গৌ। রবে। নব যৌ। বন বরষা......।
শ্যাম গম্। ভীর সরসা......।

এ কবিতা মেঘগর্জ্জনের গুম্‌গুম্ আওয়াজের এবং ঝম্‌ঝম্ বারিপাতের সঙ্গে সুর মিলাইয়া পড়িলে তবে ইহার ছন্দের দোল ঠিকমত গলায় আদায় করা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের বিচিত্র দোল। "Life-movement" বা জীবনগতির অনেক ছন্দই তাঁহার জীবনকাব্যে আন্দোলিত দেখিতে পাই। বাস্তবিক গীতিকাব্যে গানটাই আসল প্রাণ। কারণ গানই যে জীবনের নাড়ী; জীবনের সমস্ত স্পন্দন ঐ গানে যত প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নয়। সুতরাং ঠিকমত ছন্দ পড়া একটা অত্যন্ত দুরূহ কাজ, ইহা আমরা অনেক সময় মনে রাখি না। কারণ কবিতা-পাঠের কালে শুধু তাল ও লয় পাইলেই হইল না; ভাবের ওঠানাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বরের ওঠানাবা—কোথাও বেশি জোর, কোথাও মৃদু জোর, কোথাও স্পর্শমাত্রায় কেবল ছুঁইয়া যাওয়া, কোথাও স্বল্পযতি কোথাও দীর্ঘ বিরতি—এ সমস্ত আয়ত্ত করিলে তবে কবিতা ঠিক পড়া যায়। কবিতা ঠিকমত পড়া হয় না বলিয়া কবিতার রসমাধুর্য্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়, ইহা আমার বিশ্বাস।

শুধু কবিতার ছন্দেই যে "Life immense in passion, pulse and power" আবেগ শক্তি এবং চঞ্চল নর্ত্তনপূর্ণ জীবনের সমস্ত আন্দোলন ধরা পড়ে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। পয়ার ত্রিপদীতে যখন কুলায় না তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দের দরকার হয়। মাইকেলের তাহাই দরকার হইয়াছিল। সেও একটা 'structure brave' এবং 'manifold music'। একটা সাহসপূর্ণ গীতের গড়ন, বিচিত্র সঙ্গীত বটে। তাহার ছন্দের দোল বিচিত্র, বিরামযতির সংস্থান বিচিত্র বলিয়া নানা মনোভাব (moods) তাহা জাগ্রত করিতে তিলমাত্র ক্লেশ পায় না। কখনো করুণা, কখনো ব্যাকুলতা, কখনো বেদনা, কখনো রুদ্রতা! এপিক মাত্রের গানই এই বড় গান। মিল্টনের এই বড় ছন্দ, সম্ভবতঃ হোমারের ছন্দেও এই বিচিত্র বৃহৎ দোল আছে। ইহার যে হার্ম্মনি তাহা সমুদ্রতরঙ্গরাজির নানা ধ্বনির হার্ম্মনি বা সুরসঙ্গতির মত। কখনো তরল, কখনো গভীর? কখনো নূপুরনিক্কণের মত, কখনো বজ্রহুঙ্কারের মত।

অবশ্য মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, শোনা যায়। পৌরাণিক কাহিনীগত এপিকের যুগ গেলেও আসল এপিকের যুগ কখনই যায় নাই এবং কখনই যাইতে পারে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। গীতিকাব্য একলার গান; মহাকাব্য বা এপিক অনেকের গান, সমাজের গান, জাতির গান। সে এপিক সব সময়েই লিখিত হইবে। ইংলণ্ডে পিউরিট্যান্ যুগে মহাকবি মিল্টন যেমন লিখিয়াছেন, ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে দান্তে যেমন লিখিয়াছিলেন, তেমনি এযুগেও কাব্যে না হোক্ গদ্যে বা উপন্যাসে মধ্যে-মধ্যে সে-রকম এপিক লেখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। হুইট্‌ম্যানের Leaves of Grass এক হিসাবে নব্য আমেরিকার এপিক বলিতে পারি। ডষ্টয়ভস্কির 'The Idiot' বা "The Possessed" এক হিসাবে রুশদেশের এপিক, ইহাও বোধ হয় বলিতে পারা যায়। এখনও এপিক হয় নাই, এপিকের সম্ভাবনা আছে।

গান গেল, এবার ছবির দিকটা সাহিত্যে কি ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখা উচিত। গানের সঙ্গে ছবির এই একটি বড় তফাৎ যে, গানে কোন symbol বা বিগ্রহের সাহায্যে জীবন-গতিকে বুঝাইতে হয় না। ঠিক বীণার তারে ঘা দিলে যেমন সঙ্গীত বাজে, তেমনি আমাদের স্নায়ুতন্তুতে ঘা দিয়া গান জীবনের স্পন্দন জাগায়। ছবিকে বিগ্রহের সাহায্য লইতেই হয়; কারণ ছবি নিজেই বিগ্রহ। তাই তাহার রস আবার ভিন্ন। কিন্তু বিগ্রহ বলিলেই হইল না—ছবিকে আলো-ছায়ার সম্পাতে শুধু রেখা টানিয়া শুধু রং দিয়া ঐ 'life-movement' জীবনগতিকেই প্রকাশ করিতে হয়।

ওখানে গানের বেলায় যেমন সুর মনোভাবকে প্রকাশ করে, এখানে ছবির বেলায় তেমনি রং করে, রেখা করে। ক্রমাগতই চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর তাই নব নব বিগ্রহ গড়িতেছে। আধুনিককালে Impressionism, Futurism প্রভৃতি যে-সকল কলারীতি দেখা দিয়াছে, তাহারা কলার নূতন নূতন দিক্ খুলিয়া দিয়াছে ও বাঁধা প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ফরাসী এক শ্রেণীর

Impressionismএ বলে যে কোন একটি ঘটনা, যেমন ধরা যাউক্, কাহারও জন্ম বা মৃত্যু চিত্রিত করিতে হইলে অঙ্কিত দৃশ্যের ভিতরকার শুধু একটা বিশেষ রংয়ের উপর দর্শকের সমস্ত দৃষ্টি ও মনোযোগকে শিল্পী নিবদ্ধ করাইতে চেষ্টা করিবে। সেই রংয়েই সমস্ত ঘটনার রূপটি ফুটিবে। পূর্ব্বতন কোন শিল্পী হয়ত সেই ঘটনার নানা খুঁটিনাটির কথা ভাবিত, সেই ঘটনার অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে অনুধ্যান করিত। এই-সকল নূতন চিত্ররীতি সাহিত্যে যথেষ্ট পরিমাণে আসিয়াছে। গল্পে উপন্যাসে বিশেষ ভাবে আসিয়াছে বলিতে পারি। একটা ঘটনা বা চরিত্রকে ফুটাইতে গেলেই ছবি আঁকার বিদ্যা আয়ত্ত করিতে হয়। এ বিষয়ে চিত্রকলার রীতিরও যেমন বদল হইতেছে, সাহিত্য-চিত্রের রীতিরও তেমনি বদল হইতেছে। স্কট্ যে ভাবে উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র আঁকিয়াছিলেন এখনকার ঔপন্যাসিক সে ভাবে আর আঁকে না। সে ঠিক ঐ আলোটি ফেলার কায়দা নানা-রকম করিয়া আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে কতক ব্যক্ত করে; কতক আভাসে (Suggestion) রাখে। টুরগেনিভ কি বাল্জাক, কি ফ্লবেয়ারের চিত্রশিল্পের সঙ্গে আর স্কট-ডিকেন্সের এই রকমের বিস্তর প্রভেদ। Pere Goriotতে বাল্জাক শুধু গোরিয়োর পিতৃত্বের উপর এমনি আলো ফেলিয়াছেন যে সমস্ত উপন্যাসের সব বিচিত্রতার settingএ গোরিয়ো একান্ত নিবিড়ভাবে দেখা দিয়াছে। হথর্ণের Scarlet Letterএ ঐ লাল 'A' অক্ষরটির উপর যত আলো নিক্ষেপ। ডষ্টয়ভস্কির উপন্যাসের ছবি জটিল; সেখানে অনেক চিত্রের জটলা। তবু কালিমাময় অপরিচ্ছন্ন সহরের উপর স্নিগ্ধ মেঘালোক পড়িলে অতিতুচ্ছ জিনিসও যেমন মহিমান্বিত হয়, ডষ্টয়ভস্কির উপন্যাসে তাহাই হইয়াছে। "The Idiot"এ প্রিন্স মুস্কিনের বিশাল আত্মবিস্মৃত উদারতার আলোয় তাহার সঙ্গী যত আসামী, যত জালিয়াত, যত বদ্মায়েস—সকলেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যেন। ছবিতে যেমন Portrait আঁকা আছে, আবার ঘটনার ছবি আঁকাও আছে, তেমনি কোন কোন উপন্যাসে Portrait বা একটিমাত্র ছবির রস পাওয়া যায়। যেমন অ্যানাটোল ফ্রাঁসের The Crime Of Sylvestre Bonnardএ শুধু একটি বুড়া প্রোফেসরের ছবি। Gogolএর The Dead Souls উপন্যাসে Chichikovএর একটিমাত্র ছবি। Turgenevএর On the Eveএ শুধু একটি স্ত্রীলোক Elena'র ছবি—আর সবাই কতকটা ছায়ার মত। আবার কোন কোন উপন্যাসে বিচিত্র ছবির মিশ্ররস উপভোগ করা যায়। ডষ্টয়ভস্কির উপন্যাসাবলীতে সেই বৈচিত্র্যের রস যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অথচ সে বৈচিত্র্যের ছবি পূর্ব্বেকার উপন্যাসের বৈচিত্র্য নয়।

নাটকে শুধু ছবি নয়, গানও আসে। কারণ নাটকে নানাবিষয়ের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত উপন্যাসের চেয়ে বেশি করিয়া দেখান হয়। উপন্যাসে যে এ জিনিস একেবারে নাই তাহা বলি না। তবে নাটকে এই ঘাত-প্রতিঘাত থাকিতেই হইবে, নহিলে নাটকই হয় না—বিচিত্র চরিত্রের, বিচিত্র স্বার্থের, বিচিত্র ঘটনার ভিতরকার শক্তিগুলার, পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাত। নাটকে তাই চিত্র যেমন চাই, ছন্দও তেমনি চাই। শুনা যায়, বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা Wagner বলিয়াছেন যে, সবচেয়ে বড় শিল্প গান এবং নাট্যের মিশ্রণে উৎপন্ন হইবে। আমার মনে হয় সে কথার মধ্যে কতকটা সত্য আছে। নাটকে আরম্ভে, বিচিত্রতা, বৈপরীত্য ও জটিলতা; এবং পরিণামে বা climaxএ শান্তি ও ছন্দ। নাটক তাই জীবনের গতির শ্রেষ্ঠ রূপ। সুতরাং নাটকেই আমরা সব শিল্পের একত্র সমাবেশ দেখি। নাটকের মধ্যে গানও নাট্যবেশে ও নাট্যরূপে দেখা দেয়; অর্থাৎ নানা হৃদয়াবেগের সংঘাত-সঙ্গীত বাজে। বিখ্যাত ওয়াগ্নারের গানই তাহার উদাহরণ। সে গানের মধ্যে নাট্যরস যথেষ্ট। যেমন গানের স্থান তেমনি চিত্রের স্থান নাটকে দেখিতে পাই। গানের সঙ্গে নৃত্যকলার যোগও নাটকে ঘটিয়াছে। এবং স্থাপত্য শিল্পে (architecture) স্তম্ভের সঙ্গে স্তম্ভের, খিলানের সঙ্গে প্রাচীরের, এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের সংঘাতে যে বিচিত্র হর্ম্মনি বা পূর্ণ সৌষ্ঠব দেখা দেয়, নাটকের গঠনেও ঠিক সেইরূপ দেখা যায়। তাহার একটা গঠনগত পূর্ণাঙ্গ ঐক্য (Structural organic unity) আছে। বোধ হয় এই কারণেই সকল সাহিত্যই আজকাল প্রধানতঃ নাটকের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশে এত ব্যস্ত। লিরিকও

হইতেছে ড্রামাটিক লিরিক বা লিরিক্যাল ড্রামা। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে উপন্যাসকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইত, আজকাল তাহা নাটককে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। যেমন ইবসেন, হাউপট্‌ম্যান্ প্রভৃতির social drama গুলি। মানুষের সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম রসোপলব্ধি পূর্ব্বে বিগ্রহের আকারে চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে অভিব্যক্ত হইত, অধুনা তাহা মেটারলিঙ্ক ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির symbolical dramaতে প্রকাশ পাইতেছে। এমন কি, আমাদের এক ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত নানা-ব্যক্তিত্বের যে ঘাতপ্রতিঘাত, জীবনতত্ত্বের পরস্পরের মধ্যে যে বিচিত্র দ্বন্দ্ব, তাহাও সাহিত্যে নাট্যাকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ একরকমের অভিনব Soul Drama বাংলা সাহিত্যে শ্রীমতী সরযূবালা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। নাটকের রূপ দিনদিনই বিচিত্রতর হইতেছে। ভবিষ্যতে কত বিচিত্র যে হইবে তাহা কে বলিতে পারে!

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

সাথী

(ব্রেট হার্টের গল্প হইতে)

গাড়োয়ানকে নিয়ে আমরা ছিলাম আটজন। জজ-বাহাদুর কবিতা আওড়াচ্ছিলেন। উঁচুনীচু রাস্তায় গাড়ীর ভীষণ ঝাঁকরানি লেগে সেটা যখন তাঁর মুখেই রয়ে গেল, তখন থেকে এই ছ-মাইল রাস্তা আমরা আর কেউ কথাটি কইনি। তাঁর পাশে গাড়ীর মধ্যে ঝুলনো চামড়ার ফিতের ভিতর দিয়ে হাত চালিয়ে যে লম্বা লোকটি ঘুমচ্ছিল তাকে দেখে মনে হয়, সে গলায় দড়ি দেবার পর তাকে কেটে নামাতে একটু বেশী দেরী হয়ে গিয়েছে, এমনিই তার জড়ের মত অবস্থা। পেছনদিকের আসনের ফরাশী মহিলাটি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও তাঁর কায়দা ঠিক দুরস্ত, রুমাল দিয়ে তাঁর কপাল আর মুখের আধখানা যেমন ঢাকা ছিল তেমনিই আছে, একচুলও নড়চড় হয়নি। ভার্জ্জিনিয়া থেকে যে মহিলাটি তাঁর স্বামীর সঙ্গে চলেছেন, অনেকক্ষণ হল তাঁকে রেশমের ফিতে, ওড়না, আর শালের একটি পুঁটলি ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না, মানুষ বলে চিনবার উপায় কিছু নেই। আর কোনো শব্দ নেই, কেবল ডাকগাড়ীর ঘড়ঘড়ানি আর গাড়ীর ছাতে বৃষ্টি পড়ার শব্দ। হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে গাড়ীখানা থেমে গেল, অস্পষ্ট গলার আওয়াজও যেন শোনা গেল। গাড়োয়ান খুব ব্যস্ত হয়ে রাস্তার কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলছে; সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না, শুধু "সাঁকো ভেঙ্গে গিয়েছে", "কুড়ি-ফুট জল", "যাওয়া যাবে না", এই ধরণের এক-একটা টুকরো ঝড়ের গর্জ্জনের ভিতর দিয়ে কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। আবার সব চুপ, কেবল রাস্তায় থেকে অচেনা গলায় কে যেন চেঁচিয়ে বলে গেল "মিগ্‌লসের ওখানে একবার চেষ্টা করে দ্যাখ।"

ডাকগাড়ী আস্তে আস্তে ফিরে দাঁড়াল, বোধ হয় মিগ্‌লসের আড্ডার সন্ধানেই চলল, দেখলাম ঝড়-জলের মধ্যে এক ঘোড়-সওয়ারের চেহারা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই বোধ হয় আমাদের পথ দেখাচ্ছিল।

"মিগ্‌লস্" কে, কি জিনিষ, কোথায় থাকে? জজ-বাহাদুর ছিলেন আমাদের মুরুব্বি, জায়গাটা তাঁর ভাল রকমই চেনা, কিন্তু তাঁরও ও-নাম কিছুতেই মনে পড়ল না। "ওয়াশো" থেকে যে লোকটি আসছিল, সে বল্লে "মিগ্‌লস্" নিশ্চয়ই কোনো হোটেলওয়ালার নাম। অনেক ভেবে চিন্তে আমরা এই বুঝলাম যে সামনে বান এসে পড়াতে আমাদের এগোবার উপায় নেই, আর "মিগ্‌লস্"ই হচ্ছেন আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। একটা সরু শুঁড়ি রাস্তা, ডাকগাড়ী চলবার মত চওড়া নয় বল্লেই হয়, তারি ভিতর দিয়ে কাদায় ছপ্‌ছপ্ করতে করতে দশ মিনিট পরে আমরা একটা আট দশ ফুট উঁচু পাথরের-দেওয়াল-ঘেরা জায়গায় এসে হাজির হলাম। দেয়ালের গেটটিতে বেশ করে হুড়কো আঁটা। মিগ্‌লসের আড্ডা যে এই তা বোঝা গেল, আরও বোঝা গেল এই যে তিনি মোটেই হোটেল চালান না।

গাড়োয়ান নেমে দু চার বার গেটে ধাক্কা দিল। সেটা খুব ভাল করেই আঁটা।

"মিগ্‌লস্, ওহে ও মিগ্‌লস্!"

কোনো সাড়া নেই।

"মিগেল্‌স্! মিগ্‌ল্‌স্ গো!" গাড়োয়ানের মেজাজ ক্রমেই চড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। সহিসটাও তার সঙ্গে যোগ দিয়ে একটু মন-ভুলানো সুরে ডাক দিল "ও মিগ্‌ল্‌সি; মিগি, মিগ্!" কিন্তু মিগ্‌ল্‌সের কোনো সাড়া শব্দই মেলে না। জজ-বাহাদুর এতক্ষণ পরে জানলার খড়খড়িটা নামিয়ে গলাটা বের করে গাড়োয়ানকে পরে পরে অনেক-গুলো প্রশ্ন করলেন। সেগুলোর ঠিক ঠিক জবাব যদি পাওয়া যেত, তা হলে সব রহস্য মীমাংসা হয়ে যেত; কিন্তু গাড়োয়ানের সে-রকম কোনো মতলব দেখা গেল না, সে প্রশ্নের উত্তর দেবার বদলে চেঁচিয়ে বল্‌ল "মশয়রা যদি সারা রাত ডাকগাড়ীতেই না বসে থাকতে চান্, তা হলে সবাই মিলে উঠে একবার মিগ্‌ল্‌সকে ডাক দিলেই ভাল হয়।"

তার কথা-মত আমরা সবাই মিলে প্রথমে একতানে মিগ্‌ল্‌স্‌কে ডাক দিলাম, তারপর এক-একজন আলাদাও ডাকলাম। আমাদের পালা শেষ হবামাত্র, গাড়ীর উপর-তলার যাত্রী এক আইরিশম্যান "মেইগেল্‌স্" বলে এক হাঁক দিল। তার উচ্চারণে বিশেষ আমোদ অনুভব করে আমরা হাস্‌তে সুরু করেছি, এমন সময় গাড়োয়ান হাত তুলে বল্‌ল "চুপ!"

আমরা চুপ করলাম। দেয়ালের ওপাশ থেকে আমরা মিগ্‌ল্‌স্‌কে যে করকমে ডেকেছিলাম, সব কটাই খুব জোরে আবার শোনা গেল, এমন কি শেষে "মেইগেল্‌স্" বলতেও বাদ পড়ল না।

জজ-বাহাদুর বল্‌লেন "এমন আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি আমি আর কখনও শুনিনি।"

গাড়োয়ান উঁচু গলায় দিব্যি গেলে বলে উঠল "আচ্ছা পাজি যাহোক। ও হে মিগ্‌ল্‌স্, একবার বেরিয়ে নিজের মুখখানা দেখাওইনা! পুরুষ বেটাছেলে, তোমার এ কি কাণ্ড! আমি হলে তোমার মত আঁধারে লুকোতে যেতাম না!" গাড়োয়ান যুবা বিল এইবারে রেগে নাচ্‌তে আরম্ভ করল।

দেয়ালের আড়াল থেকে আবার সেই ডাক শোনা গেল "মিগ্‌ল্‌স্, ও মিগ্‌ল্‌স্!"

এইবার জজ-বাহাদুর আসরে নামলেন। নামটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে নিয়ে তিনি সুরু করলেন "ও মশায়, মিষ্টার মাইগেল, এমন ঝড় জলের সময়টা বিপন্ন মানুষকে যে জায়গা দিকে চাচ্ছেন না, এটা কি ভাল হচ্ছে মশায়, বলি ও—" জজ-বাহাদুরের মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, দেয়ালের ওপাশ থেকে আবার "মিগ্‌ল্‌স্" ডাক আর হাসির গররা ছুটে এসে তাঁর গলার স্বর একেবারে ডুবিয়ে ফেল্‌লে।

যুবা বিলের আর সইল না। রাস্তা থেকে একখানা মস্ত পাথর তুলে, তার একঘায়ে গেটের হুড়কার দফা নিকেষ করে, সে আর ডাকপিওনটা ভিতরে ঢুকে পড়ল। আমরাও পেছন পেছন চল্‌লাম। জনমানবের চিহ্ন নেই। ঘুটঘুটে আঁধারে আমরা এইটুকু বুঝলাম যে আমরা একটা বাগানে ঢুকেছি, গোলাপগাছগুলোর ভিজে পাতা থেকে আমাদের গায়ে একটা ছোটখাট বৃষ্টিধারা ঝরে পড়ল। একটা লম্বা ধরণের কাঠের বাড়ীও দেখা গেল।

জজ-বাহাদুর যুবা বিলকে জিগ্‌গেষ করলেন "এই মিগ্‌ল্‌স্‌কে চেন নাকি?"

"চিনিনা, চিনবার কোনো ইচ্ছেও নেই!" মিগ্‌ল্‌সের ব্যবহারটা যে পাওনিয়ার ডাকগাড়ী কোম্পানীর প্রতি অত্যন্ত অপমানজনক, এই ভেবে যুবা বিল বড়ই খাপ্পা। সে বাড়ীতে ঢুকে পড়বার জোগাড় করছে দেখে জজ-বাহাদুর ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন "আরে বাপু অচেনা লোকের বাড়ীতে—"

যুবা বিল খোঁচা দিয়ে বলে উঠল "দেখুন মশায়, আপনারা এক কাজ করুন, যতক্ষণ না কেউ বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আপনাদের আলাপ পরিচয় করে দ্যায়, ততক্ষণ ডাক-গাড়ীতে গিয়ে বসে থাকুন। অত ভদ্রতা আমার পোষায় না, আমি চল্লুম ভেতরে!" সে ধাক্কা দিয়ে ঘরের দরজা খুলে ফেল্‌ল।

একখানি লম্বা ঘর, তার চিমনির নিবু-নিবু আগুনের অস্পষ্ট আলোয় ঘরের দেয়ালের বিচিত্র-ছবি-আঁকা কাগজ দেখা যাচ্ছে, একজন কে সেই আগুনের ধারে একখানা বড় আরামকুর্সীতে বসে। ঘরে ঢুকেই সবটা একখানা ছবির মত আমাদের চোখে পড়ল।

যুবা বিল সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল "ওহে, তুমিই মিগ্‌ল্‌স্ নাকি ?" মানুষটি কথার উত্তর ত দিলই না, একবার নড়লও না। যুবা বিল তার সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাকগাড়ীর লণ্ঠনটা তুলে ধরল। একটি মানুষের মুখ দেখা গেল, সে যেন অল্প বয়সেই বুড়ো হয়ে পড়েছে, মুখের চামড়া কুঁকড়ে গিয়েছে, চোখের চাউনি তার পেঁচার মত অকারণ-গম্ভীর। আলো লাগাতে সে তার বড়-বড় চোখ দিয়ে একবার লণ্ঠনটার আর যুবা বিলের মুখের দিকে চাইল, তারপর একদৃষ্টে সেই লণ্ঠনের দিকেই চেয়ে রইল, আর কিছুই যেন সে চিন্‌তে পারল না।

যুবা বিল অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বল্‌ল "ওহে মিগ্‌ল্‌স্, তুমি কালা নাকি ? বোবা যেনও তার পরিচয় ত আগেই পেয়েছি।" এতেও কিছু সাড়াশব্দ না পেয়ে যুবা বিলের আর ধৈর্য্য রইল না, সে ঐ লোকটিকে ধরে এক ঝাঁকানি দিল।

ওমা ! সেই লোকটি তক্ষুনি কাপড়ের পুঁটলির মত চেয়ারের মধ্যে গড়িয়ে পড়ল, লম্বাতেও যেন হঠাৎ আধখানা হয়ে গেল। আমরা ত ভড়্‌কে গেলাম !

"কি আপদ, এমন কাণ্ডও ত কোথাও দেখিনি," বলে যুবা বিল একটু অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাঁড়াল।

জজ বাহাদুর এগিয়ে এলেন, আমরা সবাই ধরাধরি করে জড়পুঁটলি লোকটিকে আবার সোজা করে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। বিলকে লণ্ঠন হাতে করে বাইরে খোঁজ করতে পাঠান গেল, কারণ লোকটির অবস্থা দেখেই বুঝলাম যে কাছাকাছি নিশ্চই আরও লোকজন আছে। আমরা আগুনের চারধারে ঘিরে বসলাম। জজ-বাহাদুর এতক্ষণে বেশ সামলে উঠেছিলেন, তিনি আগুনের দিকে পিছন ফিরে ঠিক জুরীর সামনে বক্তৃতা করার ধরণে আরম্ভ করলেন, "এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এই ব্যক্তি হয় বার্দ্ধক্যের আক্রমণে এমন দশান্বিত হয়েছেন, নয়ত কোনো কারণে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি হঠাৎ লোপ পেয়েছে। ইনি সত্যিই মিগ্‌ল্‌স্ কিনা—"

কথা শেষ করা বোধহয় জজ-বাহাদুরের কপালে লেখা ছিল না। "মিগ্‌ল্‌স্ ! ও মিগি ! মিগ !" বলে আগেকার সুরেই ঠিক সেই চীৎকার শোনা গেল।

আমরা এইবার কিঞ্চিৎ ঘাব্‌ড়ে গিয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। জজ-বাহাদুর খুব চট্‌-করেই সরে দাঁড়ালেন, কারণ শব্দটা ঠিক তাঁর মাথার উপর থেকেই আসছিল। যাক্, শব্দটা যে কোথা থেকে আসছে তা শিগ্‌গিরই বোঝা গেল, দেয়ালে লট্‌কানো একটা কাঠের তাকে মস্ত বড় একটা ময়নাকে দেখা গেল। তার দিকে চাইবামাত্র সে এমনিই চুপ মেরে গেল যেন তার সাত-পুরুষেও কেউ কখনও ডাকতে জানে না। এঁরই গলার আওয়াজ আমরা রাস্তায় থাকতে শুনতে পেয়েছিলুম, চেয়ারের লোকটির এই অভদ্রতা করার মধ্যে কোনো হাত ছিল না।

যুবা বিল লণ্ঠন হাতে করে এই সময় ফিরে এল, সে কাউকে খুঁজে বের করতে পারেনি। চীৎকার-গুলোর উৎপত্তি-স্থল তাকে বলা গেল, তার বোধহয় সেটা ঠিক বিশ্বাস হল না, চেয়ারটার দিকে তখনও সে একটু সন্দিগ্ধভাবে তাকাতে লাগল। একটা টিনের ছাউনি পেয়ে ঘোড়াগুলোকে সেইখানে সে রেখে এসেছে, কিন্তু আরও একচোট ভেজাতে তার মেজাজ আরও তেরিয়া হয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকেই বল্‌ল "দশ মাইলের ভেতর আর একটা মানুষ নেই, আর এই বুড়ো বেটা তা জেনেও কিছু বলছে না।"

কিন্তু দেখা গেল যে আমরাই ঠিক আন্দাজ করে-ছিলাম। যুবা বিলের গজ্‌গজানি থামতে না থামতেই বাইরে লঘু পায়ের শব্দ শোনা গেল আর তার পরের মিনিটেই একটি তরুণী দম্‌কা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে তাতে ঠেশ্‌-দিয়ে দাঁড়াল। তার বড়-বড় কালো চোখ তারার মত ঝকঝকে, কাপড় ভিজে তার গায়ে জড়িয়ে গিয়েছে, চলা-ফেরার মধ্যে বাধার লেশমাত্র নেই। দরজায় পিঠ দিয়ে আমাদের দিকে ফিরে সে বলে উঠল "আমিই মিগ্‌ল্‌স্।"

এই নাকি মিগ্‌ল্‌স্ ! এই তরুণী যার মাথার কোঁকড়া ঢেউ-খেলানো চুল থেকে, কাঠের-জুতো-পরা গোলাপী পা দুখানি অবধি সবই লাবণ্য-মাখা ! তার মাথায় একটি ছেলেদের টুপী, তার ভেতর থেকে তার কোঁকড়া চুলের গোছা বেরিয়ে পড়ে মুখের চারধারে দুলছে। আমাদের

মুখের দিকে চেয়ে সে বেশ সপ্রতিভভাবে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

আমরা সবাই এতই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম যে কারুর মুখ দিয়ে আর কথা বেরচ্ছিল না। মিগ্‌লস্ যেন তা দেখতেই পেল না, এমন কি যুবা বিলের দুপাটি দাঁত যে কেন অকারণে বেরিয়ে পড়ল তার কারণ অনুসন্ধান করবারও তার কোনই ইচ্ছে দেখা গেল না। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল, "তোমাদের গাড়ী যখন রাস্তা পার হয়ে আসছিল, আমি তখন বাড়ীর থেকে দু মাইল দূরে। তোমরা হয়ত এখানে এসে উঠবে, আর বাড়ীতে 'কিম্' ছাড়া কেউ নেই, এই ভেবে আমি সারা পথটা ছুটে আস্‌ছি। বাবা! একেবারে বেদম হয়ে পড়েছি।"

মিগ্‌লস্ চট্ করে মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলল, টুপির যত জল সব পড়ল আমাদের গায়ে এসে। টুপি খুলতেই তার অবাধ্য চুলের গোছা মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল, চুল ঠিক করতে গিয়ে গোটা দু তিন চুলের কাঁটা মাটিতে ফেলে দিয়ে খোলা চুলেই হাস্‌তে হাস্‌তে সে যুবা বিলের পাশে বসে পড়ল।

জজ-বাহাদুর এবারও সবার আগে সাম্‌লে উঠেছিলেন, তিনি এখন খুব গম্ভীরভাবে তরুণটিকে সম্ভাষণ করতে এগোলেন। তাঁর কায়দা-দুরস্ত বচন-বিন্যাসে বাধা দিয়ে মিগ্‌লস্ বলল "আমার চুলের কাঁটাটা একটু কষ্ট করে তুলে দিন।"

প্রায় আধ ডজন হাত একসঙ্গে সেই কাঁটাটার উপরে গিয়ে পড়ল, তার সুন্দরী অধিকারিণী সেটা এক সেকেণ্ডেই ফিরে পেলেন। চুলের গোছা কাঁটা দিয়ে ভাল করে আট্‌কে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সেই আরাম-কুর্সীর কাছে ছুটে গিয়ে সেই লোকটির মুখের দিকে তাকাল। দেখতে-দেখতে পীড়িতের চোখের ভাব বদ্‌লে গেল। তার ভাবহীন মুখে যেন প্রাণের ঢেউ খেলে গেল, চাউনিতে একটা বুদ্ধির আভাস দেখা দিল। মিগ্‌লস্ জোরে হেসে উঠে আবার আমাদের দিকে ফিরে এল, ঐ হাসিতে তার মনের কথা অনেকখানি ধরা পড়ে গেল।

"এই পীড়িত ব্যক্তিটি কি—" এই পর্য্যন্ত বলে জজ-বাহাদুর একটু ইতস্তত করতে লাগলেন।

মিগ্‌লস্ চট্ করে বল্‌ল "ও জিম্।"

"তোমার বাবা?"

"না।"

"ভাই নাকি?"

"না।"

"স্বামী?"

মিগ্‌লস্ একবার আমাদের দুটি সহযাত্রীর দিকে তাকাল—তাঁরা দুজন মোটেই প্রশংসমান পুরুষদের দলে যোগ দেননি—তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বল্‌ল "না ও জিম।"

খানিকক্ষণ সব চুপ। কেউ কথা কয় না। মহিলা যাত্রী দুটি ঘেঁষাঘেঁষি করে সরে দাঁড়ালেন; "ওয়াশোর" যে ভদ্রলোক সঙ্গে গৃহিণীকে নিয়ে চলেছিলেন তিনি একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন; লম্বা লোকটি এ হেন অবস্থায় কি করা উচিত, নিঝুম হয়ে বোধ হয় তাই ভাবতে লেগে গেল; কিন্তু মিগ্‌লস্ হেসে উঠে শিগ্‌গিরই আমাদের গুমোট ভাবটা দূর করে দিল। "তোমাদের নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে, চা করে দিচ্ছি, কেউ একটু আমাকে সাহায্য করবে?" বলে সে এগিয়ে এল।

স্বেচ্ছাসেবকের অভাব মোটেই হল না। মিনিট কয়েকের মধ্যেই দেখা গেল যুবা বিল "ক্যালিবানের" মত একালের এই মিরান্দাটির জন্য কাঠ বইছে, ডাকপিওন কফি গুঁড়োতে ব্যস্ত, আমার উপর মাংস কুটবার ভার পড়েছে, আর জজবাহাদুর খোস মেজাজে সবাইকে প্রচুর পরিমাণে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। অল্পক্ষণ পরেই মিগ্‌লস্, আইরিশম্যানটি আর জজবাহাদুর মিলে টেবিল সাজিয়ে ফেললে। বাইরে তখন ঝড় গর্জ্জাচ্ছে, হুহু করে চিম্‌নি দিয়ে হাওয়া ঢুকছে, জানলার উপর বৃষ্টির জল ঝাপ্‌টা দিচ্ছে, আর মহিলা যাত্রী দুটি এককোণে ঠেসে বসে ফিস্‌ফিস্ করে কি বলাবলি করছেন, কিন্তু এততেও আমাদের ফূর্ত্তি খুবই জমে উঠল। আগুনটা কাঠকুটো দিয়ে বেশ করে উস্কে দেওয়াতে ঘরখানা পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছিল, কাঠের দেয়াল মাসিক-কাগজের ছবি দিয়ে সুনিপুন মেয়েলী হাতে সাজানো। আস্‌বাবপত্র যা-কিছু সবই কেরসিন কাঠের বাক্স ভেঙ্গে গড়া, আর পশুর চামড়া কি ধূসর রংএর মোটা কাপড় দিয়ে পরিপাটি করে মোড়া।

পীড়িত জিমের আরামকুর্সীখানা একটা ময়দার পিপের অভিনব রূপান্তর। ঘরে দু চারটা যা জিনিষপত্র রয়েছে সব তাতেই বেশ সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

রান্না চমৎকার হয়েছিল, খাওয়াটা তোফা হল। গল্পটা যা জমল, সে আরও তোফা, তার জন্য বেশীর ভাগ প্রশংসা নিশ্চয়ই মিগ্‌লসের প্রাপ্য। সে গল্প জমাবার কায়দাটা জানত, যা কিছু প্রশ্ন করবার সব সে একলাই করল, কিন্তু তাও এমন সরলভাবে যে সে যে নিজের কোনো কথা লুকতে চায় তা মোটেই মনে হল না। আমাদের নিজেদের ঘরের কথা, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কি করতে, রাস্তাটা কেমন, ঝড় বৃষ্টিরই বা কি অবস্থা—সব বিষয়েই কথা হল, কেবল আমাদের আশ্রয়দাত্রী আর জিমের কথা ছাড়া। মিগ্‌লসের কথার ধরণ যে বিশেষ ব্যাকরণ-শুদ্ধ কিম্বা কায়দা-দুরস্ত হচ্ছিল তা মোটেই নয়, এমন কি সে মাঝে মাঝে এমন দু চারটা অলঙ্কার ব্যবহার করছিল যা চিরদিনই পুরুষ-জাতটার সম্পত্তি বলে গণ্য। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে তার প্রাণখোলা হাসির আর কাজল-কালো চোখের চাউনির মিলন হচ্ছিল বলে তাতে আমাদের মনে কোনো খট্‌কাই লাগছিল না।

ঘরের বাইরের দিকের দেয়ালে কে যেন জিমের ভারি শরীরখানা ঘষ্‌ছে, খেতে খেতে এমনি একটা শব্দ শোনা গেল। তারপরেই এগিয়ে এসে দরজার কপাট আঁচড়াতে লাগল, তার ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করে নিশ্বাস ফেলার শব্দ ঘর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। মিগ্‌লসের দিকে একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাবামাত্র সে বল্‌ল, "ও জোয়াকিন্‌। দেখ্‌বে ও কে?" আমরা কিছু উত্তর দেবার আগেই সে দরজাটা খুলে দিল, আর একটা মস্ত বড় "গ্রিজ্‌লী" ভালুকের বাচ্চা ঘরে ঢুকে সোজা হয়ে ভিকিরীর মত হাত পেতে দাঁড়াল। মিগ্‌লসের দিকে তার তাকানর করুণ ভঙ্গী দেখে আমার চট্‌ করে মনে পড়ে গেল যুবা বিলের কথা। মহিলা যাত্রী দুটি ভয় পেয়ে কোণে সরে দাঁড়াচ্ছেন দেখে মিগ্‌ল্‌স বল্‌ল "ও কাউকে কামড়ায় না, তুমি কাউকে কামড়াও না, না টপি?" কিছু খাবার দিয়ে ভালুকটাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে সে টেবিলে ফিরে এসে বসে বল্‌ল "তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে তোমরা যখন এলে তখন জোয়াকিন্‌ বাড়ী ছিল না।" জজ-বাহাদুর জিগ্‌গেস করলেন "ও ছিল কোথায়?" "আমার সঙ্গে, আর কোথা? ও সারাক্ষণই আমাকে চৌকি দিয়ে বেড়ায়, ঠিক যেন মানুষ।"

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে আমরা ঝড়ের গর্জ্জন শুনতে লাগলাম। বোধ হয় সবার চোখের সামনেই এক ছবি ভেসে উঠেছিল—বনের ভিতর দিয়ে মিগলস্‌ চলেছে, মাথায় তার বাদলের জল ঝরে পড়ছে, পাশে পাশে চলেছে তার ভয়াবহ ঋক্ষ রক্ষকটি। জজ-বাহাদুর "য়ুনা আর তার সিংহের" সঙ্গে তুলনা করে কি একটা স্তুতিবাক্যও যেন ঝাড়লেন, সে সেটা বেশ গম্ভীর মুখেই শুন্‌ল। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন সবাইকে যে সে কতখানি চমকে দিয়েছে, তা নিজে মোটেই জানে না, যুবা বিলের পূজাটা না দেখা কিন্তু বেশ একটু শক্ত ব্যাপার।

মিগ্‌লসের স্বজাতীয়া যে দুটি আমাদের দলে উপস্থিত ছিলেন, ঐ ভালুকটার আবির্ভাবে, গৃহস্বামিনীর উপর তাঁদের মন মোটেই বেশি প্রসন্ন হল না। তাঁরা দুজনে যে, তুষার-শীতলগাম্ভীর্য্যের গণ্ডী সৃষ্টি করলেন তাতে আমাদেরও ফুর্ত্তি জল হয়ে আসতে লাগল। মিগলস্‌ও বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরেছিল, হঠাৎ মহিলা দুটির দিকে ফিরে বলল "রাত হয়েছে, চলুন আপনাদের শোবার ঘর দেখিয়ে দি, আর তোমাদের বাপু এই ঘরেই কোনো রকমে রাত কাটাতে হবে, এই দুটো বই ত আর ঘর নেই।"

পরের হাঁড়ির খবর জানতে বিশেষ ব্যস্ত বলে বদনাম পুরুষ-জাতটার সম্বন্ধে তেমন নেই। কিন্তু সত্যের খাতিরে আমায় একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের রূপসী আশ্রয়দাত্রীটি মহিলা যাত্রী দুইটির সঙ্গে ঘরের বার হবা মাত্র আমরা সবাই মিলে ঘেঁসাঘেঁষি করে বসে, মুচকে হেসে তার অদ্ভুত সঙ্গীটির আর তার জল্পনা সুরু করে দিলাম। গল্পে মেতে গিয়ে সেই বুদ্ধিহীন জীবন্মৃত জিমেরও গায়ে যে দু চার বার ঠোকর লাগাইনি তা নয়। সে অর্থহীন দৃষ্টিতে আমাদের সাংসারিক গল্পে মত্ত দলটির দিকে চেয়ে ছিল, অনাদি অতীতের ঔদাসীন্যে যেন তার চাউনিতে আমাদের গল্প খুবই জমে উঠেছে এমন সময় দরজা খুলে মিগলস ঘরে ঢুকল।

কিন্তু একি সেই, যে এই ক-ঘণ্টা আগে আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল? তার চোখের দৃষ্টিতে সঙ্কোচ আর হাতে একখানা কম্বল নিয়ে সে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল, আগের সেই মন-ভোলান নির্ভীক সরলতা তার আর নেই। তারপর কি যেন একটা বাধা কাটিয়ে সে চট্ করে ঘরে ঢুকে, একখানা নীচু টুল টেনে নিয়ে সেই অচল লোকটির পাশে এসে বসল। কম্বলখানা নিজের গায়ে বেশ করে জড়াতে জড়াতে বল্ল "তোমাদের যদি কিছু অসুবিধে না হয় ত রাতটা আমি এইখানেই কাটাই, আর জায়গাও ত নেই কোথাও।" আমাদের উত্তরের অপেক্ষা না করে সে জিমের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে পিছন ফিরে বস্‌ল, চোখ রইল তার সেই আগুনের শিখার দিকে চেয়ে। আমরা একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলাম। বাইরে তখনও ঝড় বইছে, এক-একটা দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে পড়ে কয়লাগুলোকে উস্কে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সব যেন একটু চুপ হল, মিগল্‌স্‌ও তখুনি মাথা তুল্‌ল। হাত দিয়ে চুলের গোছা পিছনে সরাতে সরাতে সে বল্‌ল "তোমাদের ভেতর কেউ কি আমায় চেন?"

কেউ উত্তর দিল না।

"একটু ভেবে দেখ! বছর কয়েক আগে আমি মেরিস্‌ভিলে ছিলাম। সেখানের সব্বাই আমাকে চিন্‌ত, চিনবার অধিকারও সবার ছিল। জিমের কাছে আসবার আগে সেইখানেই আমার দোকান ছিল। সে প্রায় দু বছর হল, এতদিনে আমি একটু বদ্‌লে গেছি হয়ত।"

আমরা কেউই কোনো উচ্চবাচ্য না করাতে সে বোধ হয় একটু অপ্রস্তত হল। ক্ষাণিকক্ষণ চুপ করে আবার বসে রইল আগুনের দিকে চেয়ে, তারপর তাড়াতাড়ি করে বলে যেতে লাগল "যাক্, আমি ভেবেছিলাম তোমরা কেউ আমাকে চিন্‌লেও চিন্‌তে পার। তা তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। আমি বলছিলাম্ কি যে এই জিম্—জিমের হাত-খানা সে দুহাতে চেপে ধরল—আমাকে খুব ভাল করেই চিন্‌ত, টাকাও ঢেলেছিল ঢের আমার পেছনে। বোধ হয় যা কিছু ছিল সবই খুইয়েছিল। শেষে একদিন—সে আজ দু বছর হল—জিম্ আমার ঘরে এসে চেয়ারে বসে পড়ল, তারপর থেকে তার এই অবস্থা। তার আর হাত পা নাড়ার ক্ষমতাও রইল না, কি যে তার হল তা আর নিজে বুঝল না। ডাক্তার দেখে বলল, বদ অভ্যাসের জন্যেই তার এমন দশা হল, জিম্ বড় গোঁয়ার ছিল কিনা, নেশাও করত। ভাল হবার আশা ডাক্তার কিছু দিল না, বলল টিকবেও না আর বেশি দিন। ওরা ওকে সহরের হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিতে বলল, কারু ত আর কিছু কাজে লাগবে না, কেবল কচি ছেলের মত চিরকাল বোঝা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমি বললাম "না, তা আমি দেব না।" কেন বলেছিলাম জানিনা, বোধ হয় ওর চোখের চাউনি দেখেই কিম্বা চিরকালই আমার কচিছেলের সাধ ছিল সে জন্যেও হতে পারে। আমার তখন টাকাকড়িও ছিল, পশারও সবাইকার কাছে খুব। তোমাদের মত বড়-লোকেরাও আমায় দেখতে আসত। আমি সেখানকার দোকান পাট বেচে ফেলে এইখানে আমার খোকাটিকে নিয়ে চলে এলাম। জায়গাটা বেশ নিরাবিল কিনা।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে সে একটু পিছনে সরে বস্‌ল, তার আর আমাদের মধ্যে রইল সেই মনুষ্যত্বের ধ্বংসাবশেষটি। সে নিজে আঁধারে লুকিয়ে ওকেই আমাদের চোখের সামনে ধরল, সেই মূক ভাবহীন মুখই যেন তার হয়ে কথা বল্‌তে লাগল; পরমেশ্বরের দণ্ডে দণ্ডিত চলৎশক্তিহীন হয়েও সে তার সঙ্গিনীটিকে অদৃশ্য বাহুতে আগ্‌লে রইল।

আঁধার কোণ থেকে মিগ্‌ল্‌স্ আবার বল্‌তে লাগল, তখনও সে জিমের হাত শক্ত করে ধরে আছে।

"এখানে প্রথমে আমার বড় অসুবিধে হত, কিছুতেই মন টিক্‌ত না, আমোদ আহ্লাদে লোকজনের সঙ্গেই চির-কাল কাটিয়েছি। আমার কাজকর্ম করবার জন্য একটি মেয়েমানুষ খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কেউ আসতে রাজি হল না, পুরুষ চাকর রাখতে সাহস হল না। যাক্, শেষে এক-রকম করে সব গুছিয়ে নিলাম, এই বুনো জায়গায় অনেক ইণ্ডিয়ান আছে তারা আমার ফাইফরমাসগুলো খেটে দিত আর দরকারি জিনিসপত্র সব দোকানদাররা পাঠিয়েই দিত নর্থফোর্ক থেকে। ডাক্তারও মাঝে মাঝে স্যাক্রা-মেণ্টোর থেকে এসে ওকে দেখে যেতেন। এসেই বলতেন

''ঐ মিগ্‌লসের খোটাটিকে দেখি," যাবার সময় বলতেন "তুমি খাসা মানুষ মিগ্‌লস্, ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।" তখন আর আমার মনে হত না যে আমি একলা। শেষবার দরজা খুলে বেরতে বেরতে তিনি বল্লেন "মিগ্‌লস্ জান, তোমার খোকা একদিন মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠবে, তার মায়ের গৌরবের জিনিষ হবে ; কিন্তু সে এখানে নয়, সে এখানে নয়—"মুখ গম্ভীর করে তিনি বেরিয়ে গেলেন, আর যেন মনে হল যে—" মিগ্‌লসের গলার স্বর মিলিয়ে গেল, মুখখানাও আঁধারে ঢাকা পড়ে গেল।

খানিক পরে তার মুখ দেখা গেল, সে এগিয়ে বসে আবার বলতে লাগল, "এখানকার লোকজনরা বেশ ভাল ব্যবহারই করে। ছোকরারা দিনকত বাড়ীর চারিধারে খুবই ঘোরাঘুরি করত, কিন্তু দিন কয়েক পরেই কোনো সুবিধে না দেখে তাঁরা সরে পড়ল ; মেয়েরাও দয়া করে—কেউ আমাকে দেখতে আসে না। প্রথম প্রথম বড়ই একলা লাগত, একদিন বনের মধ্যে জোয়াকিনকে কুড়িয়ে পেলাম, সে তখন ছোট্ট বাচ্চা, তাকে ভিক্ষে চাইতে শেখালাম, তার খাইখরচ আমার কিছু লাগেনা আর। তারপর পোলী আছে—ঐ যে গো ঐ ময়নাটা—ওটা এত ঢংও জানে, কথাও বলে একেবারে অফুরান্, কাজেই এখন আর আমার একলা ঠেকেনা, ওরাই বিকেল বেলাটা বেশ জমিয়ে তোলে। আর জিম্,"—মিগ্‌লসের সেই পুরণো হাসি আবার ঝলকে উঠল, সে উঠে দাঁড়াল—"জিমও এত জানে! তার বুদ্ধি দেখে তোমরা অবাক হয়ে যাবে। যখন ফুল নিয়ে আসি তখন এমন করেই তাকায় যেন বেশ বুঝতে পারছে ; একলা বসে বিকেলবেলা ওকে কতদিন ঐ দেয়ালের গায়ের ছবির নীচের লেখাগুলো পড়ে শুনিয়েছি। এই শীতকালে আমি তাকে গোটা দেয়ালটাই শুনিয়েছি। জিমের মত পড়াশোনায় মজবুত লোক কমই দেখা যায়।"

সে চুপ করল। জজ-বাহাদুর জিগ্‌গেস করলেন "যার জন্যে তুমি তোমার তরুণ জীবনটি উৎসর্গ করলে তাকে তুমি বিয়ে করনা কেন?"

সে বল্‌ল "তা হলে জিমের উপর একটু অন্যায় করা হবে। তার এখন কোনো ক্ষমতা নেই বলেই কি আমি তার উপর এমন কলঙ্ক দেব? ভাল থাকলে সে ত আমাকে বিয়ে করত না। তা ছাড়া আমি এখন যা নিজের ইচ্ছেয় করছি, বিয়ে হয়ে গেলেই মনে হবে আমি যেন তা করতে বাধ্য, সে আমার ভাল লাগবে না।"

"কিন্তু দেখ তোমার এখনও অল্প বয়স, চেহারাটাও ভাল—"

মিগ্‌লস্ তাঁকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "রাত হল, এখন শুয়ে পড়াই ভাল। গুড্ নাইট্।" গায়ে কম্বলখানা বেশ করে জড়িয়ে, জিমের পায়ের তলার ছোট্ট নীচু টুলটাতে মাথা রেখে তার চেয়ারের পাশে সে শুয়ে পড়ল, আর একটিও কথা কইল না। আগুনটা আস্তে আস্তে নিবে আসতে লাগল, আমরাও সবাই চুপচাপ শুয়ে পড়লাম যে যার কম্বল মুড়ি দিয়ে। চারদিকের সব শব্দ থেমে শেষকালে রইল শুধু ঘরে এতগুলি লোকের নিশ্বাসের শব্দ আর বাইরে টিনের চালের উপর বৃষ্টির জলের ঝমঝমানি।

ভোরের দিকে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম। ঝড় জল তখন কেটে গেছে, আকাশে দু-একটি তারা ঝক্‌ঝক্ করছে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়ে কালো ঝাউ গাছের সারের মাথার উপর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে পূর্ণিমার চাঁদ। তার আলো সেই হতভাগ্যের চারিদিকে দয়াময়ের করুণার মত ঝরে পড়ছে, আর তারই পায়ের উপর যার কালো চুলের ঢেউ ছড়িয়ে গিয়ে চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবার পুরাতন মধুর কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল, সেই তরুণীর মুখেও সেই আলোই পুণ্যধারার মত এসে পড়ে তাকে যেন পবিত্রতায় অভিষেক করছিল, যুবা বিল মাঝখানে আধশোয়া ভাবে পড়ে পড়ে রুক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবাইকে চৌকী দিচ্ছিল ; তার কর্কশ মুখখানাকেও যেন একটু কবিত্ব-মণ্ডিত দেখাচ্ছিল ঐ আলোতে। তারপর কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, জেগে দেখি চারদিক রোদে ভরে গিয়েছে, যুবা বিল আমার পাশে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলছে "ওঠ না হে বাপু।"

টেবিলে সবাইকার জন্যে কফি সাজানো, কিন্তু মিগ্‌লসের দেখা নাই। গাড়ীতে ঘোড়া জোতা হয়ে গেল, তখনও আমরা বাড়ীর আশেপাশে ঘুরছি, কিন্তু সে আর ফিরল না। বুঝতেই পারলাম, সে আমাদের কাছে মামুলি ধরণের বিদায় নিতে চায় না, তাই সরে পড়েছে।

মহিলা দুটিকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমরা আবার এসে কাঠের ঘরখানায় ঢুকলাম, প্রত্যেকে খুব গম্ভীর ভাবে জিমের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করলাম, এবং হ্যাণ্ডশেকের পরে তেমনি গম্ভীর ভাবেই আবার তাকে সোজা করে বসিয়ে দিলাম। শেষবার একবার ঘরখানার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম, তারপর আস্তে আস্তে উঠলাম গিয়ে গাড়ীতে। যুবা বিলের চাবুক শপাশপ্ শব্দ করল, গাড়ীও ছাড়ল।

বড়রাস্তায় যখন পৌঁছেচি, হঠাৎ বিল রাশ ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিলে, ডাকগাড়ী থেমে গেল। দেখি পথের ধারে এক ঢিপির উপর মিগ্‌লস্ দাঁড়িয়ে, চুল এলিয়ে পড়ে বাতাসে ঢেউ খেলছে, কালো চোখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে; হাতের সাদা রুমালখানি নেড়ে নেড়ে সে আমাদের বিদায় দিচ্ছিল। আমরাও আমাদের টুপী নাড়তে লাগলাম। তারপর যুবা বিল আর মায়া বাড়াবার ভয়েই যেন ঘোড়াগুলোকে জোরে চাবুকে দিল, ঝাঁকরানি দিয়ে ডাকগাড়ী আবার এগোল, আমরাও বসে পড়লাম। নর্থফোর্ক পৌঁছবার আগে কেউ একটাও কথা বল্‌লাম না। আমাদের গাড়ী গিয়ে হাজির হল পুরানো হোটেলে। আমরা সবাই খাবার ঘরে ঢুকে পড়লাম, জজ-বাহাদুর সবার আগে আগে।

তিনি গম্ভীরভাবে নিজের সাদা টুপীটা মাথা থেকে নামিয়ে হাতে করে আমাদের দিকে ফিরে বল্‌লেন—"আপনাদের সবাইকার গেলাশ ভরা হয়েছে ত?"

গেলাস ভরাই ছিল।

"আচ্ছা তবে সবাই এবার পান করুন মিগ্‌লসের স্বাস্থ্য, পরমেশ্বর তাকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

হয়ত তিনি আশীর্ব্বাদ করেছেন। কে বলতে পারে?

শ্রীসীতা দেবী।

আলোচনা

বাঙ্গালা-বানান-সমস্যা।

পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় বানান-সমস্যা তুলিয়াছেন। সমাধান সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

১। প্রথম প্রশ্ন,—করা, চলা, প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক শব্দের অন্ত্য আকারের উৎপত্তি কি?

শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, (১) সং করণ্ বাং উচ্চারণে করন্, এবং (২) সং রাজন্ প্রথমার এক বচনে সং-তে রাজা হয়। অতএব সাদৃশ্যে করণ-করন্—করা। এইরূপ, সং ভবন—প্রাং হবন—হোঅন্—হোওন্—হোআ বা হওআ; সং প্রাপণ—প্রাং পাবন—পাওন্—পাওআ।

২। এই যুক্তিতে দোষ পড়িতেছে। সং করণ বাং উচ্চারণে করন্ এই অংশ অবশ্য ঠিক। সং-তে রাজন্ শব্দে রাজা, ইহাও ঠিক। কিন্তু বাং ভাষা, রাজন্—রাজা, বিচার কিংবা স্মরণ করিয়া রাজা শব্দ গ্রহণ করিয়াছে কি? বোধ হয়, এত বিচার করে নাই। কারণ হইতে সেকালের লোকের সংস্কৃতভাষা-জ্ঞান সমধিক ছিল, স্বীকার করিতে হয়; সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ঐক্যসাধনের প্রয়াসও স্বীকার করিতে হয়। তা ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষায় রাজন্ শব্দ ছিল কি? সুতরাং সাদৃশ্যে 'করন্' হইতে 'করা' করিবার যুক্তি ছিল না।

৩। এই প্রসঙ্গে বাং ভাষার একটা তত্ত্ব উল্লেখ করিতেছি। সং ভাষা হইতে বাং ভাষা বহু শব্দ লইয়াছে, লইতেছে। সং-তে প্রথমার এক বচনে যেরূপ, বাং ভাষা সেইরূপ লইয়াছে। সং-তের অনুস্বার বিসর্গ থাকিলে তাহা ত্যাগ করিয়া লইয়াছে। যথা, বাং-তে 'সখি' নহে 'সখা,' 'মাতৃ' নহে 'মাতা,' 'মনস্' নহে 'মন' (মনঃ—বিসর্গ ত্যাগে), 'দিশ' নহে 'দিক্,' 'চন্দ্রমস্' নহে 'চন্দ্রমা,' 'ধনিন্' নহে 'ধনী', 'শ্রীমৎ' নহে 'শ্রীমান্', 'আত্মন্' নহে 'আত্মা', 'রাজন্' নহে 'রাজা', ইত্যাদি। 'রাজন্'কে 'রাজনে'র নহে; 'রাজা'কে 'রাজা'র। বাংভাষা 'রাজা' শব্দের উৎপত্তি বিচার করে নাই, 'রাজা' শব্দ পাইয়াছে লইয়াছে। এই যুক্তিতে 'শাস্ত্রী-মহাশয়', 'পিতা-ঠাকুর', 'মন-মোহন', ইত্যাদি বানান নির্দোষ। সম্বোধনে, 'হে হরে', 'হে সখে', 'হে গুরো', 'হে পিতঃ', 'হে বধু', 'হে রাজন্', 'হে বিদ্বন্', ইত্যাদি ইদানী চলিত হইতেছে। কিন্তু 'হে হরি', 'হে সখা', 'হে রাজা', ইত্যাদি লিখিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। কয়েকটি শব্দ গৌরবে সং-তের বহু বচনের রূপে চলিত আছে। যথা, মহান্ত, শ্রীমন্ত, বিদ্যাবন্ত, ইত্যাদি। বন্ত, মন্ত প্রত্যয়-সরূপও হইয়াছে। আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে তাহা দেখাইয়াছি। এইরূপ, গৌরবে, 'পাপিষ্ঠ,' 'বলিষ্ঠ,' 'জ্যেষ্ঠ,' 'কনিষ্ঠ', ইত্যাদি। গ্রাম্যজনও 'গরিষ্ঠ ভোজন" বলে।

৪। এই অনুমান ঠিক হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিচার যুক্তিহীন

হইয়া পড়ে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমার নিকট অন্তরূপ বোধ হয়। দেখিতেছি 'বঙ্গভাষায় অতিচার' প্রসঙ্গে আমার উত্তর স্পষ্ট হয় নাই। আমার ব্যাকরণে স্পষ্ট আছে। 'প্রবাসী'তে পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা হয় নাই। এখানে আবার জানাইতেছি। বা০-তে কৃ ধাতু নাই, কর্ ধাতু। ইহা হইতে ক্রিয়াবাচক 'করিবা' (কর্+ইবা)। প্রাচীন বা০তে ইবা-প্রত্যয়ান্ত রূপ একমাত্র রূপ পাওয়া যায়। ইহার উত্তর, নিমিত্তার্থে ক বিভক্তি যোগে 'করিবাক', হেত্বর্থে তে বিভক্তি যোগে 'করিবাতে', সম্বন্ধে র বিভক্তি-যোগে 'করিবার'। 'করিবা' দ্বারা, 'করিবা' হইতে, 'করিবা' হেতু, প্রভৃতি প্রয়োগ প্রাচীন বা০তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই এই প্রয়োগ অশুদ্ধ হইত না। অদ্যাপি বঙ্গের বহুজন 'করিবাতে' লেখে, আমরা সবাই 'করিবা'র লিখি ও বলি। ওড়িয়াতে অদ্যাপি ইবা একমাত্র প্রত্যয়। মৈথিলীতেও অদ্যাপি ঐবা। দুই একটা উদাহরণ দি-ই। ও০ করিবাকু, মৈ০ করৈবাক=বা০ করিবার নিমিত্ত। ও০ দেখিবাকু, মৈ০ দেখৈবাক=বা০ দেখিবার নিমিত্ত। প্রাচীন বা০তে 'করিবাক' পদ ছিল। নূতন বা০ তে ক বিভক্তি অপ্রচলিত হইয়াছে। 'করিবা-তে', 'করিবা-র' পদ আছে। ইদানী 'করা-তে', 'করা-র' পদও চলিত হইতেছে। এখন কথা হইতেছে, পূর্বরূপ 'করিবা' হইতে 'করা', না অন্য কোন শব্দ হইতে 'করা'। এস্থলে শব্দের বিবর্তন স্বীকার করিতে পারা যায় না কি? আমি মনে করি, 'করিবা' হইতে 'করা' উৎপন্ন হইয়াছে। 'করিবা'র পদ কথিত ভাষায় 'কর্‌বার'। ব লুপ্ত হইলে 'করা'-র হয়।

৬। এই ব, ব না, ব়? যদি ব (বর্গীয়) হয়, তাহা হইলে লোপের সম্ভাবনা ছিল না। যদি ব় (অন্তস্থ) হয়, তাহা হইলে লোপের সম্ভাবনা ছিল। 'করিব' ক্রিয়াপদের ব অন্তস্থ ব। ইহা আমার ব্যাকরণে দেখাইয়াছি। শাস্ত্রী-মহাশয় পালি ও সেকালের প্রাকৃত হইতে প্রমাণ দিতে পারিবেন। 'করিব' ক্রিয়াপদের ইব বিভক্তির স০ মূল তব্য প্রত্যয়। স০ 'কর্তব্য' হইতে 'করিব' মনে করি। ইব বিভক্তি দ্বারা ভবিষ্যৎ কাল বুঝায়। ইব হইতে ইবা। ইবা দ্বারাও ভবিষ্যৎ-কাল বুঝায়। যথা, 'পরশু যাইবার দিন হইয়াছে,' অর্থাৎ ভবিষ্য পরশু গমনের দিন। 'কাজ করিবার আছে',—ভবিষ্যৎ। 'কাজ করিবার ছিল'—এখানেও ভবিষ্যৎ সূচিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের ও অন্য দুই-এক স্থানের, 'তুমি করিবা'—স্পষ্ট ভবিষ্যৎ। ইহার অর্থ, তোমার কর্তব্য। 'করা' রূপে ভবিষ্যৎকাল প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যথা, কাজ করার লোক নাই, করার মতন করা হইলে কথা উঠিত না।

৭। 'করাতে', 'করার' পদে কিন্তু ভূতকাল বুঝায়। করা কাজ, শোনা কথা, জানা পথ, প্রভৃতি উদাহরণে 'করা', 'শোনা', 'জানা', ভূতকাল-জ্ঞাপক বিশেষণ হইয়াছে। স০-তে যেখানে কৃত, শ্রুত, জ্ঞাত, সেখানে এই-সকল বিশেষণ বসে। এই রূপ, কাজ করা হইবে,—'করা' বিশেষণ। এই 'করা'ও কি প্রাচীন 'করিবা' হইতে? বোধ হয় না। এস্থলে কর্ ধাতু+আ। স০ কৃত=হিন্দী কিয়া, বা০ করা, ও০ কলা। এই রূপ, স০ গত=হি০ গয়া, বা০ গেল (প্রাচীন, গেলা), ও০ গলা। অতএব বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়াবাচক 'করা', এবং ভূতক্রিয়াবাচক 'করা', এক মূল হইতে আসে নাই।

৮। যদি 'করিবা' হইতে 'করা' স্বীকার করি, তাহা হইলে 'খাইবা' হইতে খাবা—খাওয়া, 'শুইবা' হইতে শোবা—শোওয়া। অর্থাৎ বা স্থানে ওয়া। এই বা, ব়া না হইয়া যায় না। খাইবার বেলা, খাবার বেলা, খাওয়ার বেলা, তিনই বলিতে পারা যায়, অর্থান্তর হয় না। এইরূপ, দি-ইবা—দিবা দি-ওয়া—দেওয়া।

৯। যদি ইহাই ঠিক, তাহা হইলে খা-আ, যা-আ, দে-আ, নে-আ, শোআ, হ-আ, ল-আ, কোথা হইতে আসিল? আমার অনুমানে সেই বা (ব়া) হইতে আসিয়াছে। কোথাও ব লোপে আ আছে, কোথাও বা স্থানে ওয়া হইয়াছে। আমি বলি, এই যে ওয়া, ইহা শহুরে হিন্দুস্থানী লোকের সহিত সংসর্গে হইয়াছে। আমার মনে হয়, বঙ্গের গ্রামে কান পাতিয়া শুনিলে ওয়া শোনা যাইবে না, যাইবে আ। একটা প্রমাণ দিই। গ্রামে কেহ কোথাও 'খাওয়ান' শুনিতে পান কি? আমি কূপ-মণ্ডুক, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি ভাষার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে 'খাওয়ান্' শুনিতে পাওয়া যাইবে না, যাইবে 'খা-আন্', কোথাও বা 'খ-অন্'। স০ 'খাদন' হইতে 'খা-অন্' মনে হইতে পারে। কিন্তু সেটা আকস্মিক। কারণ, অন, আনা প্রত্যয়ান্ত বহু বহু বা০ শব্দ আছে যাহার সহিত স০ মূলের ঐক্য নাই। যেমন, ঝাড়ন, কামড়ানা, আঁকড়ানা, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, স০ অন প্রত্যয় মূল; কিন্তু এই মূল ধরিয়া বা০ ভাষা নিজের ধাতুতে প্রত্যয়টা জুড়িয়া দিয়াছে। এই রূপ, দেআনা, নেআনা, শোআনা, ধোআনা। এসকল স্থলে, দেওয়ানা, নেওয়ানা, শোওয়ানা, ধোওয়ানা, যে ভুল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। 'দি' ধাতু আন্ত (স০ ণিজন্ত) করিলে 'দেআ' ধাতু হয়। 'দেআ' ধাতুর উত্তর অন কিংবা অনা প্রত্যয়। অথচ কেহ কেহ 'শোওয়ান', 'ধোওয়ান' লেখেন। আমি মনে করি, ভুল লেখেন। ওয়া, ওয়ালা (বাস্তবিক ব়া, ব়ালা) বাঙ্গালা বলিতে পারি না। বাঙ্গালায় হয়, বা, না হয় আ, হইবার কথা। এইটুকু স্বীকার করিলে আজিকালির 'হওয়া', 'যাওয়া', 'কাপড়-ওয়ালা,' প্রভৃতি বহু বাঙ্গালা শব্দের ওয়া অনাবশ্যক হইবে। ওয়া-বাহুল্য হ্রাস করিতে পারা যায় কি না, তাহাই আমার বিবেচ্য ছিল।

১০। কত কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় দুই ব্ এক হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। মনে হইয়াছে, এবং কিছু প্রমাণও পাইয়াছি, আট শত বৎসর পূর্বে দুই ব-এর উচ্চারণ পৃথক ছিল। অথচ মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' শোধন করিয়াছেন, তাহাতে দুই ব পাই না। সব গানের ভাষা কিংবা বানানও এক নহে। কোন গানে যে শব্দে ণ, অন্য গানে সে শব্দে ন। এমন কি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ণ-এর বাহুল্য দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। ইহার যে শব্দে ণ আছে, 'বৌদ্ধগানে' হয়ত সে শব্দে নাই। চণ্ডীদাসের অন্য পদাবলীতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বানান দূরে থাক, ভাষাই পাই না। হাজার বছরের (?) বাঙ্গালা শূন্য-পুরাণে ব দূরে থাক, ণ পাই না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইয়াছে সেকালের বাঙ্গালা ভাষার বহু ভেদ ছিল। এই ছাপা-খানা ও ছাপা বহির দিনেও যোজনান্তে ভাখা লুপ্ত হয় নাই। দেআ, দেওয়া; হআ, হওয়া; প্রভৃতি দ্বিরূপ শব্দের মধ্যে কোন্‌টা ভাষা আর কোন্‌টা ভাখা, তাহা বলিবার জো নাই। তবে বাঙ্গালার গতিক দেখিলে দেআ, হআ, লআ, প্রভৃতি ঠিক মনে হয়।

১১। অন্তস্থ ব-কারের উচ্চারণ পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে যে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি। ভাষায় ধ্বনিটা আছে, ধ্বনির দ্যোতক হারাইয়া গিয়াছে। কেবল বাঙ্গালা ও ওড়িয়া ভাষায় দুই ব-এর উচ্চারণ এক হইয়া পড়িয়াছে। এ বিষয় আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। ওড়িয়াতেও সব শব্দে এক হয় নাই; ব ফলার ব সংস্কৃতের তুল্য উচ্চারিত হয়। হিন্দী মরাঠী ও দাক্ষিণাত্য ভাষায়, উর্দুতে, এমন কি মৈথিলী ও আসামীতেও দুই ব নইলে চলে না। ইদানী ইংরাজী শব্দের প্রচলন-হেতু অন্তস্থ ব আবশ্যক হইতেছে। এখন কথা হইতেছে, সে ব-এর কি মূর্ত্তি হইলে ভাল হয়। শাস্ত্রী-মহাশয় পেট-কাটা ব (ৰ)-কে বর্গীয় ব বুঝিতে বলিয়াছেন। তাহা হইলে সামান্য ব অন্তস্থ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহা ঘোর পরিবর্তন হইবে। কারণ আমরা ব-এর উচ্চারণ বর্গীয় করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। যে শব্দ যে অর্থে বলিয়া আসিতেছি, যে অক্ষর দ্বারা যে বর্ণ বা ধ্বনি বুঝিয়া আসিতেছি, তাহার অন্যথা হইলে ভাষা ও লিখন ওলট-পালট হইয়া পড়ে। সেটা ভাষার উন্নতি নহে, অবনতি। নাগরী ব বাঙ্গালা কোণিয়া অক্ষরের সহিত মানায় না। এই কারণে আমি আসামী ৱ অক্ষর লইয়াছি। এই অক্ষর যে ভাল, তাহা নহে। ইহার প্রধান দোষ, ইহা দ্বারা ৱ-ফলা প্রকাশ করিতে গেলে ৱ টা র-এর মতন দেখায়। অসংযুক্ত আকারেও র ভ্রম ঘটিতে পারে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে অন্তস্থ ব-এর আকারে উ কিংবা ও অক্ষরের সহিত সাদৃশ্য রাখা কর্তব্য হইবে। প্রথমে বর্তমান র-অক্ষরের প্রতি মায়া কাটাইয়া উহার রূপান্তর কর্তব্য। কিন্তু কে এ সব করে? ইচ্ছা করিলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ করিতে পারেন।

১২। এক এক অক্ষর দ্বারা এক এক ধ্বনি বুঝি বলিয়াই নব্য লেখকদিগের "কালো ভালো মতো করানো জানানো" প্রভৃতি বানানে অ-কার স্থানে ও-কার যোগ দ্বারা বিবাদ সৃষ্টি হইতেছে। অবশ্য তাঁহারা ভাষার উন্নতিপ্রয়াসী। কিন্তু তাহাদিগের উন্নতি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারি নাই। 'গৌরবে বুক ভরে ওঠে,' 'জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে প্রধান,' ইত্যাদির 'ভরে' 'গড়ে' বানানে উন্নতি বুঝিতে পারিতেছি না। বানান ও লিখনটা ভাষার কি বিবেচ্য নহে? দানযোগ্য অর্থে 'দেয়' শব্দ আছে বলিয়া 'দ্যায়' পদ সৃষ্টি করিতে হইবে? শাস্ত্রী মহাশয়ও 'য্যা'য' বানান করিয়াছেন! বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ঙ্গ স্থানে ঙ লেখায় ভাষার অবনতি মনে করি। শাস্ত্রী মহাশয় 'বাঙলা' বানান করিয়া থাকেন। কেন করেন, যদি অন্ততঃ তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে আমরা দশজন গতানুগতিক ন্যায়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি। জানিতে চাই, কেবল 'বাঙ্গালা' কিংবা 'বাঙ্গলা' শব্দ বুঝাইবার সময় ঙ্গ স্থানে ঙ দিতে হইবে, কি যেখানে ভাষায় ঙ পাইব সেখানেই ঙ লিখিব? বীরেশ্বর বাবু বলিয়াছিলেন, আমরা ঙ্গ উচ্চারণ না করিয়া ঙ করি। এ কথা মানি না। যদি বা মানি, তাহা হইলে যাবতীয় শব্দের বানান ধ্বনি-সংবাদী করা উচিত হইবে না কি? শুধু ঙ্গ উপরে আক্রোশ, এবং ঙ প্রতি আদর কেন? প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলী হইতে শাস্ত্রীমহাশয় যে কয়েকটি প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতে আমার আপত্তি দৃঢ় হইয়াছে। 'পিঙ্গল' স্থানে 'পিঙল,' কিংবা 'ভাঙ্গ' স্থানে 'ভাঙ' দ্বারা বুঝিতেছি ঙ দ্বারা এই অক্ষর যে ধ্বনির দ্যোতক সেই ধ্বনি করা হইত। বৈষ্ণব-পদাবলীতে 'শাঙণ' (শ্রাবণ) শব্দ পাইয়াছি। 'সঙরণ' শব্দ অদ্যাপি প্রচলিত আছে। 'পিঙল' ও 'ভাঙ' শব্দের ঙ অবিকল সেই ঙ। ঙ অক্ষরের নাম উঙ, ঞ অক্ষরের নাম ইঞ। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মোঞি, কাহাঞি, প্রভৃতি শব্দে ঞ না লিখিয়া ঞি আছে। চন্দ্রবিন্দু-যোগ লিপিকরের কিংবা গায়কের বোধ হয়। যথা,

কথা নিঅঁ বাশী এড়ি মিছাঞ দোষসি বুঢ়ী
হৃদয়ত ভয় না মানসী।

এখানে 'মিছাঞ' বানানে ঞ অক্ষরের প্রকৃত ধ্বনি পাইতেছি। ঙ অক্ষরেরও এইরূপ বিশেষ ধ্বনি আছে। কয়েকমাস পূর্বে প্রবাসীতে অনেক প্রমাণ তুলিয়াছি।

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়্যাঁ পড়ি যাওঁ ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞি'র মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ ।
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ ।
মেদিনী বিদায় দেউ পসিআঁ লুকাওঁ । (৮১ পৃঃ)

এস্থলে যাঙ, পাঙ, লুকাঙ লিখিলেও চলিত । বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বানান অনেকটা ধ্বনি-সংবাদী । বহু স্থানে, 'ভাগ্যে' স্থানে 'ভ্যাগে' আছে । এই সাদৃশ্যে বরং 'বাঁগালা', 'বাঁগালী', লেখা চলে ।

১৩ । এখন দুই একটা ক্ষুদ্র কথায় ক্ষুদ্র আলোচনা করি । শাস্ত্রীমহাশয় 'মা-র' পদ স্বীকার করেন না । কিন্তু 'মায়ের' না বলিয়া 'মা-এর' বলিতে চান । প্রথম প্রথম আমিও 'ক-এক,' 'গা-এর', 'পাঁ-এর' প্রভৃতি শুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম । তার পর নানা শব্দ দেখিয়া য়ের হইবার একটু সূত্র পাইয়াছি । সূত্রটা এই,—শব্দের ব্যঞ্জন লুপ্ত হইলে যখন অ থাকে, তখন এর না হইয়া য়ের হয় । বস্তুতঃ এর হয়; অ স্থানে য় হওয়াতে য়ের মনে হয় । যথা, পাদ—পাঅ—পায়, পায়ের ; পোত—পোঅ—পোয়, পোয়ের ; গাত্র—গাত—গাঅ—গায়, গায়ের ; মাতা—মাআ—মায়, মায়ের ; কত—কঅ—কয়, কয়েক । ই য় সজাতীয় । এই হেতু, ভ্রাতৃ—ভাই, ভায়ের ; সখী—সই, সয়ের ; বানান চলিত আছে । 'বিশা শত' হইতে 'বিশা শয়' (অর্থাৎ ১২০) শব্দ আছে । শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'মা-এর' আছে বটে, কিন্তু কবিকঙ্কণ, রণীমোহনের চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বহু গ্রন্থে 'মায়ের' আছে, 'মা-এর' নাই ।

১৪ । সং 'কৃত্বা' স্থানে 'করিআ' । এইরূপে ইআ, এবং পরে ইয়া-র উৎপত্তি বটে । কিন্তু কি কারণে জানি না, শেষের আ বা য়া লুপ্ত হইয়াছিল । এ বিষয় আমার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিস্তার করা গিয়াছে । শাস্ত্রীমহাশয় সংস্কৃত, পালি, সংস্কৃত-প্রাকৃত প্রভৃতি বহু ভাষা মন্থন করিয়াছেন । তাঁহার সহিত যুক্তি-তর্ক করিবার যোগ্যতা আমার নাই । বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও কোষ কেহ করিলেন না দেখিয়া অযোগ্যকে করিতে হইয়াছে । এই কারণে নানা প্রশ্ন মনে আসে । একটা করি । 'প্রাকৃত' ভাষা বলিলে কোন্ সময়ের কোন্ অঞ্চলের কোন্ শ্রেণীর ভাষা বুঝায় ? বর্ত্তমান বাঙ্গালা ওড়িয়া হিন্দী মরাঠী প্রভৃতি ভাষার প্রত্যেকের একাধিক প্রাকৃত আছে । বাঙ্গালায় সংস্কৃত আছে, প্রাকৃতও আছে ; প্রাকৃত একটা নহে, অনেক । সম্প্রতি যে 'চলতি' (? চলিত ?) ভাষা চালাইবার নিমিত্ত কেহ কেহ মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালার একটা প্রাকৃত । এইরূপ, সেকালেও ত ছিল । সেকালের কোন্ প্রাকৃত রূপান্তরিত হইয়া ক্রমশঃ বাঙ্গালা হইয়াছে, কেহ তাহা প্রকাশ করিলে অনেক সংশয় দূর হইত । কোন্ 'প্রাকৃত' হইতে মৈথিলী, কোন্টা হইতে আসামী, কোন্টা হইতে দক্ষিণ বঙ্গের, কোন্টা হইতে উত্তর বঙ্গের, কোন্টা হইতে পূর্ব্ববঙ্গের, কোন্টা হইতে পশ্চিমবঙ্গের, কোন্টা হইতে ওড়িয়া ভাষার বিবর্ত্তন হইয়াছে, কে জানে । বোধ হয়, একালের তুল্য সেকালেও বহু 'প্রাকৃত' ছিল । 'স্বামী' শব্দ যদি 'সামী' উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে গ্রাম্য নারীর 'শোয়ামি,' এবং পৌর মহিলার 'স্যামি' শব্দের কারণ কি ? ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত শত বৎসরের "ময়নামতীর গানে" 'শ্যামী' রূপ আছে । সে পুথীর লিপিকর কুমিল্লা অঞ্চলের জনৈক মুসলমান । আমি যে প্রশ্ন করিলাম তাহার উত্তর পাইতে বিলম্ব হইতে পারে । তথাপি পাইবার আশায় রহিলাম । আশা করি, শাস্ত্রীমহাশয় কিংবা অন্য কেহ প্রার্থনা পূরণ করিবেন ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় ।

দিব'র দীঘি-প্রসঙ্গ ।

১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসের প্রবাসী পত্রিকায় "মহীপাল প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে "কৈবর্ত্ত-রাজ দিব্য ও ভীমের কীর্ত্তি ধীবর দীঘি বা দিবর দীঘি" নামে উল্লিখিত হইয়াছে । ঐ দীঘির প্রকৃত নাম দিব'র দীঘি । ব্যুক্ত "ও"-কার যোগ করিলে যেরূপ উচ্চারণ হয় সেইরূপে উচ্চারিত হয় । আমরা নিজে যাইয়া দিব'র দীঘির সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছি । দীঘির পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের রাজবংশী, বৈরাগী, মাহিষ্য, সাঁওতাল, ওঁরাও, মুশলমান ও অন্যান্য বহুলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছি, সকলেই একবাক্যে দিব'র দীঘি বলিয়াছে । শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ধীবর দীঘি কোথায় পাইলেন বুঝিলাম না । আমরা দিব'র দীঘির অনুসন্ধানে দিব'র দীঘির নিকটস্থ, বাঁকরোল কাছারীতে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলাম । ঐ কাছারীর যশোহর-জেলা-নিবাসী জনৈক আমীন প্রথমে দিব'র দীঘি বলিলেন । পরে আমরা দীঘির প্রকৃত উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করায় আমীনটি শুদ্ধ করিয়া ধীবর দীঘি বলিলেন । ইহাতেই আমরা বুঝিলাম তথাকথিত শিক্ষিতগণ দিব'র শব্দের মূলতত্ত্ব না বুঝিয়া ধীবর বলিয়া নিজ নিজ অনভিজ্ঞতা-দোষের সংশোধন করেন । অশিক্ষিত জনসাধারণের উচ্চারণই প্রকৃত সত্য বহন করিতেছে । দিব্য নামক রাজার খনিত দীঘির নাম দিব্যর—দিব'র দীঘি । এই দীঘিই দিব্যের নাম প্রায় সহস্র বৎসর ঘোষণা করিতেছে । বঙ্গদেশে খননকর্ত্তার নামে বহু দীঘি বর্ত্তমান আছে । যেমন রামপালের দীঘি, বল্লালের দীঘি, রামসাগর, কৃষ্ণসাগর, প্রাণসাগর, মহীপাল দীঘি প্রভৃতি ।

কথ্য ভাষায় অল্পাক্ষর-বিশিষ্ট শব্দের শেষে "র" যোগে ষষ্ঠী বিভক্তির কার্য্য হয় । এবং "র"র পূর্ব্বে ওকার উচ্চারিত হয় । যথা প্রসন্নোর মা, নন্দোর বাড়ী, ভুতোর মা ইত্যাদি ।

অতি প্রাচীন বঙ্গভাষায় কেবল "র" দ্বারাই ষষ্ঠীর কার্য্য হইত । যে যে স্থানে পারিপার্শ্বিক কারণে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই সেই সেই স্থানে অদ্যাপি কেবল "র" যোগে ষষ্ঠীর কার্য্য হইয়া থাকে । বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্তে সুরমা উপত্যকায় এখনও "র" দ্বারা ষষ্ঠীর কার্য্য হয়, যথা—রামর বইন, গাছর জমির, রামর বাড়ী ইত্যাদি । অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কার্য্যবিবরণীতে "আমাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাষার সাক্ষ্য" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । সুতরাং আমরা দিব্য নামক রাজার দীঘিকে দিব্যর দীঘিরূপে প্রাপ্ত হইতে পারি । উহারই অপেক্ষাকৃত কোমল উচ্চারণে দিবর দীঘি হইয়াছে । এই দিবর দীঘির সহিত ধীবর

শব্দের কোনও সম্বন্ধ নাই; দিবয়কে ধীবর নামে নির্দ্দেশ তথাকথিত শিক্ষিতগণের ভ্রান্তি মাত্র।

একদিকে দিব্যোর নামানুসারে এই দীঘির নামকরণ হইয়াছে, অপর দিকে সম্ভবতঃ দীঘির নামে একটি তরফের নামকরণ হইয়াছে। উহাকে তরফ দিবর বলে। এই তরফ দিবর মৌজা ঐ দীঘিরই পার্শ্বে অবস্থিত। উহা সৈদাবাদ (মুর্শিদাবাদ)-নিবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের জমীদারী-ভুক্ত। দীঘির ও গ্রামের কি নাম তাহা তাঁহাদের সেরেস্তা দেখিলেই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা উক্ত জমিদার মহাশয়দিগের প্রদত্ত প্রজার চেক দাখিলায় দিবর নামই দেখিয়াছি। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি উক্ত জমীদার বাবুদের দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কোঁচকুইল্লার কাছারীতে আমাদের উক্তির সত্যতার অনুসন্ধান করিতে পারেন, অথবা দিবর দীঘির পার্শ্বস্থ দিবর গ্রামের প্রজাগণের চেক দাখিলা পরীক্ষা করিতে পারেন।

দিবর দীঘি যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহাদিগকে এই বিশাল দীঘির ধারণা করান অসম্ভব। এই দীঘি একটি স্বাভাবিক হ্রদের ন্যায় অতি বৃহৎ। পাহাড়গুলি পাহাড়েরই তুল্য। মধ্যস্থলে সুবিশাল প্রস্তর-স্তম্ভ। এই স্তম্ভ তলদেশস্থ বেদী হইতে ২২½ হাত উচ্চ। ৬½ হাত বেড়ে। মূলদেশ হইতে ২০ হাত পরিমিত সম-অষ্টভুজাকার। ইহার উপরে চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ হাত বাড়ান দুই থাক সমচতুষ্কোণ। তদুপরি একটি প্রশস্তমুখ গেলাসের গঠন। তারপর একটি প্রকাণ্ড কদমার ন্যায় বিট-তোলা বর্ত্তুল। তাহার উপরে একটি সুগঠিত গুম্বজ। গুম্বজের উপরে পতাকা বাঁধিবার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দুই থাক সমচতুষ্কোণের মধ্যে রেলিং দেওয়া ছিল। এক্ষণে কেবল ছিদ্র মাত্র দৃষ্ট হয়। গৌড়-রাজমালা পুস্তকের ফটো দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। দিব্যোর এই কীর্ত্তিস্তম্ভ আজিও সগৌরবে দণ্ডায়মান আছে।

এই স্থানেই কৈবর্ত্তরাজ দিব্যোর রাজধানী ছিল। দীঘির পশ্চিম পার্শ্বে রাজবাড়ী ছিল জনশ্রুতিতে এইমাত্র পাওয়া যায়। ঐ পার্শ্বে প্রাচীন ইষ্টকেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। দিবর দীঘির পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বাগরাজের একটি ছোট পুকুর আছে। উহার পঙ্করাশি শস্য-ক্ষেত্রে দিবার সময় দুইটি কষ্টিপাথরের প্রায় দুই হাত দীর্ঘ বাসুদেব-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। একটি বেলে পাথরের গরুড়বাহন বিষ্ণুমূর্ত্তিও উত্তোলিত হইয়াছিল। ঐ-সকল মূর্ত্তি বাঁকরোল কাছারীর নিকটস্থ একটি বকুলবৃক্ষতলে ও বটতরুমূলে স্থাপিত আছে। উহা প্রায় অবিকৃত ও অভগ্ন অবস্থায়ই আছে। কেবল নাক কান অল্প অল্প চটিয়া গিয়াছে। ঐ বাগরাজের পুকুরের পাড়ে ইষ্টকস্তূপের মধ্যে বহুসংখ্যক কাল পাথরের স্লিপার পাওয়া গিয়াছে। ঐগুলি বড় বড় দরজার চৌকাঠ। জোড়াই করিবার খাঁজ কাটা আছে। কতকগুলি চতুষ্কোণ খণ্ড প্রস্তরস্তম্ভ, স্তম্ভের নিম্নস্থ নকাসী-করা প্রস্তর-নির্ম্মিত পাদপীঠ পাওয়া গিয়াছে। এগুলিও বাঁকরোল কাছারীতে আছে। ইহাতে ধারণা হয় কৈবর্ত্ত-রাজ দিব্যোর রাজধানী এখানেই ছিল। তাঁহার রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ প্রস্তরস্তম্ভ ও প্রস্তর-স্লিপার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার সাধের দেবমূর্ত্তি আজ অযত্নে গড়াগড়ি যাইতেছে। যে স্থানে এগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার নাম বাগরাজ। উহার অর্থ শ্রেষ্ঠ উদ্যান বা নন্দন কানন; যেমন বর্দ্ধমানের মহারাজের গোলাপবাগ। অস্মরণীয় কাল হইতে দিবর দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে বারুণী-স্নান উপলক্ষে এ মেলা বসিয়া থাকে। ঐ স্মৃতিও পুরাকালীয় হিন্দুরাজার নিদর্শন। পশ্চিম পাড়ের রাজপ্রাসাদ হইতে বাগরাজে জলপথে আসিবার জন্য দিবর দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে ঐ দীঘির জলার সহিত মিশাইয়া আর একটি দীঘি খনিত হইয়াছিল। উহা এক্ষণে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই জলশূন্য অঞ্চলে অসংখ্য মুদ্রা ব্যয়ে কৃত্রিম সাগরের সৃষ্টি করা হইয়াছে। একটি খাড়ির সঙ্গে এই দীঘির সংযোগ বিধান করিয়া দীঘির নিকটে একটি পোর্ট বা বন্দর সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

দীঘি হইতে বাঁকরোল কাছারী পর্য্যন্ত ৫ মাইল স্থানে একটি প্রকাণ্ড পণ্যবীথিকাপূর্ণ ঐশ্বর্য্যশালী নগরী ছিল। ঐ স্থানে ইতস্ততঃ অসংখ্য পুষ্করিণী রহিয়াছে। একটি রাস্তার উভয় পার্শ্ব খনন করিলে অসংখ্য প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থানের মধ্যে একটি স্থানের নাম শ্রীমস্তলা। এখানে একটি প্রাচীন কালীর আসন আছে। বাৎসরিক পূজা অদ্যাপি হইয়া থাকে। প্রাচীন মহানগরী ধ্বংস হইয়া একটি সামান্য বাজার ও বড় রকমের একটি হাট আছে। বাজারের একপার্শ্বে একটি অতি পুরাতন তেঁতুল-গাছ আছে। গাছটির বেড় ১০।১১ হাত হইবে। তিন দিকে বল্কল-সংযুক্ত বেষ্টন আছে। একদিকের বল্কল ও কাঠ নাই: গাছটি এখন মুমূর্ষু। এই গাছটি পুরাকালের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছে। মনে হয় কৈবর্ত্ত-রাজ দিব্য রুদ্রক ও ভীমের সময়ে এই স্থান একটি মহৈশ্বর্য্যপূর্ণ মহানগরী ছিল। রামপাল সহ মহাসমরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

দিব্যোর কীর্ত্তিস্তম্ভ ও দীঘি যাঁহারা দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উত্তর-বঙ্গ রেলপথের হিলি ষ্টেসন হইতে নামিয়া যাইতে পারেন। হিলি হইতে বালুরঘাট সব ডিভিসন, ১৬ মাইল বাঁধা রাস্তা। বালুরঘাট হইতে সাপাহার-হাট ১৪ মাইল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় যাইতে হয়। সাপাহার-হাট হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দিবর দীঘি। আক্কেলপুর ষ্টেশন হইতেও যাওয়া যায়।

দীঘির মধ্যে নামিয়া স্তম্ভদর্শন করিতে হইলে নৌকার প্রয়োজন। কিন্তু ঐ স্থানে নৌকা পাওয়া যায় না, কলাগাছও নাই। স্থানীয় লোকের সোলা-নির্ম্মিত একপ্রকার ভুর (ভেলক) পাওয়া যায়। এক টাকা পারিতোষিক দিলেই ঐ ভুর পাওয়া যায়।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি দিবর দীঘিতে উপস্থিত হইয়া দীঘির ফটো তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু দীঘির প্রকৃত নাম নির্ণয়ে বিশেষ অনুসন্ধানের পরিচয় দেন নাই। ৩য় সাহিত্য সম্মিলনে চুঁচুড়াতে যখন বায়স্কোপযোগে গৌড় দেশের প্রাচীন কীর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল তখন প্রদর্শক মহাশয় সর্ব্বজন-সমক্ষে ঐ দীঘিকে ধীবর দীঘি বলিয়াছিলেন। বোধ হয় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির নাম নির্দ্দেশেই ঐ নাম কথিত হইয়াছিল।

আমরা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সুযোগ্য নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্র ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, প্রবাসীর সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহাশয়দিগের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা যেন দীঘিটির প্রকৃত নাম ব্যবহার করেন। তাঁহারা যদি ঐরূপ ভ্রান্তিপূর্ণ নাম ব্যবহার করেন তাহা হইলে বঙ্গের বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত জাতির সম্মান হানি করা হয়। কারণ একদিকে গৌড়-রাজমালায় ঐ কীর্ত্তিস্তম্ভকে কৈবর্ত্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাস্তম্ভ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে যদি ঐ দীঘিকে ধীবর দীঘি বলা হয় তাহা হইলে প্রকারান্তরে বিশুদ্ধ কৈবর্ত্তজাতিকে ধীবর বলা হয়। দিনাজপুর জেলায় ধীবর কৈবর্ত্তের অস্তিত্বই নাই।

হাবাসপুর—ফরিদপুর, শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

(প্রত্যুত্তর ও সমালোচনা)

(১)

শ্রদ্ধের সীতানাথবাবু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সমালোচনাকে তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমি কি এমন ভাষা ব্যবহার করিয়াছি যাহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিতে পারে? তিনি আমার বিষয়ে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন এবং এই ভুল-বিশ্বাস লইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে লোকেও আমাকে ভুল বুঝিতে পারে, এইজন্য ২।১ কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে।

(ক)

১ তিনি আমার বিষয়ে বলিয়াছেন "তিনি (=সমালোচক) বারংবারই কতিপয় লেখকের উল্লেখ করিয়া আমাকে এই ভাবে শাসন করিয়াছেন—'কি? এত পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধে, আর এই যুগে এরূপ মত প্রচার করিতে সাহস?' এরূপ ধমক দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষে অনুপযুক্ত।"

বলা বাহুল্য কোটেশানের অভ্যন্তরস্থ কথাগুলি আমার নহে। আমি কোনস্থানেই ইহা বলি নাই। কেবল এই কথাগুলিই যে বলি নাই তাহা নহে, কোন কথাতেও উক্ত ভাব প্রকাশ করি নাই। উক্ত অংশের ভাষা এবং ভাব উভয়ই সীতানাথবাবুর।

সীতানাথবাবুকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তিনি সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ এবং আমি কনিষ্ঠ। তাঁহার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করা বা তাঁহাকে ধমক দেওয়া আমি অপরাধ মনে করি। দার্শনিকদিগের মত ও যুক্তি যে উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা সীতানাথবাবুকে ধমক দিবার জন্য নহে। আমার যুক্তি আমি যদি Kantএর মত লোকের গ্রন্থে পাই, তবে সে যুক্তি তাঁহার নামে প্রচার করাই কি ভাল নয়? আর আলোচ্য বিষয়টা যদি অতিগুরুতর হয়, তাহা হইলে চিন্তাশীল লোকদিগের যুক্তির সহিত নিজের যুক্তি মিলাইয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে। সীতানাথবাবু ইহাও ত ভাবিতে পারিতেন যে তাঁহার দুর্গ এতই দৃঢ় যে ইহা ভগ্ন করিবার জন্য অনেক গোলাগুলি ধার করিয়া আনিতে হইয়াছে।

(খ)

আমি বলিয়াছিলাম সীতানাথবাবু Jamesএর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সীতানাথবাবু বলেন তিনি Jamesকে ওসব কথা বলেন নাই; তিনি সাধারণ ভাবে Pluralism সম্বন্ধে উহা বলিয়াছেন। আমরা অন্যপ্রকার বুঝিয়াছি। তিনি "Radical Emperigism"এর নাম করিয়া সেই-সঙ্গে Jamesএর উল্লেখ করেন। এই Empericism-বিষয়েই তিনি overweening self-confidence কথাটা ব্যবহার করেন। Jamesএর Pragmatismএর ব্যাখ্যাতা অনেক, শিষ্যও কম নহে কিন্তু তাঁহার Radical Empericismএর ব্যাখ্যাতা এবং সমর্থক এখনও দেখা যাইতেছে না। Radical Empiricism বলিলে Jamesকেই বুঝায়। সুতরাং overweening self-confidence কথাটা Jamesএর মস্তকেই পতিত হইল। আমরা এই-প্রকারই বুঝিয়াছি।

সীতানাথবাবু Jamesকে লক্ষ্য করিয়া "author's superficial knowledge of the Absolutist writers" এবং 'James's ignorance of Absolutism' (পৃ ২৫৩) এই দুইটি কথা প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিজ মত সমর্থনের জন্য Bradleyএর মত উদ্ধৃত করিয়াছেন—ইহাতে "limits of his knowledge" (পৃ ২৫৪) এই কথাগুলি আছে। এই-সমুদয় দেখিয়া কি সমালোচক বলিতে পারে না যে "পড়াশুনাটা বড়ই কম"?

তৃতীয় কথাটা James "যেন নাস্তিক।" প্রতিবাদে সীতানাথবাবু বলিয়াছেন—"আমি ত আমার বইয়ে কোথাও Jamesকে নাস্তিক বলি নাই।" আমিও কখন বলি নাই সীতানাথ বাবু Jamesকে নাস্তিক বলিয়াছেন। আমার ভাষা "যেন নাস্তিক।" Jamesএর মত বিষয়ে সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন "If there is a god at all ইত্যাদি "(পৃ ২৫১)।

সীতানাথবাবু লোককে বলিতেছেন Jamesএর মত এই—"ঈশ্বর যদি একান্তই থাকে ইত্যাদি।" ইহার অর্থ কি ইহা নহে 'James যেন নাস্তিক'? প্রতিবাদেও ত তিনি বলিয়াছেন।"James ঈশ্বর সম্বন্ধে স্থির মত প্রকাশ করেন নাই"; আরও বলিয়াছেন "James যদি ঈশ্বরবাদীই হন" ইত্যাদি। সুতরাং আমার অভিযোগ অমূলক নহে।

(২)

ব্যক্তিগত বিষয় ছাড়িয়া এখন মূল বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

(ক)

সীতানাথবাবু বলিয়াছেন আমি Logic এবং Psychology-বিষয়ে অনেক গোলমাল করিয়াছি। এ বিষয়ে আমার ভুল হইয়াছে বলিয়া ত মনে হইতেছে না। "জীবের মানসিক জীবনে অগ্রে জ্ঞান, পরে ইচ্ছার প্রকাশ"—এই কথা সীতানাথবাবু প্রতিবাদেও বলিয়াছেন। কিন্তু সমালোচনায় এ মতও প্রত্যাদিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টি সমালোচনার অবান্তর বিষয়। মুখ্য বিষয় এই—"জ্ঞান আত্মার মূল লক্ষণ কি না।"

(খ)

আমি সীতানাথবাবুর মত খণ্ডন করিবার জন্য Greenএর একটি যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সীতানাথবাবু ইহার প্রতিবাদে লিখিয়াছেন "Green বলিয়াছেন "thought", মহেশ বাবু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'জ্ঞান'। কেন? Thoughtএর অনুবাদ 'চিন্তা', জ্ঞান হইবে কেন? Thought ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক ক্রিয়া"; তিনি আরও লিখিয়াছেন—"Greenএর গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড এখন আমার কাছে নাই। Green কোন্ সংশ্রবে এবং কোন্ অর্থে উল্লিখিত কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি জানি না, এই জানি যে তাঁহার মত বোঝার জন্য ঐ খণ্ড তেমন প্রয়োজনীয় নয়।"

পুস্তকখানা না দেখিয়া প্রতিবাদ করাটা ঠিক হয় নাই। দুই একদিন অপেক্ষাও করিতে পারিতেন, মফঃস্বলেও হয়ত এমন বন্ধু আছেন, যাঁহাকে লিখিলে তিনি পুস্তকখানা পাঠাইয়াও দিতে পারিতেন। গ্রন্থখানা পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন যে সমালোচনায় অনুবাদে ভুল হয় নাই। আরও পুস্তকখানা না পড়িয়াও সীতানাথবাবুর মত একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিতে পারিতেন যে ও-অংশে Thought অর্থ জ্ঞানই। এইপ্রকার Hegelian ভাষার অন্য অর্থ হয় না।

যাহা হউক সকলের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল। সমালোচনায় যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে এ অংশ ঠিক তাহার পূর্ব্বেই।

"What Hegel had to teach was, not that thought is the *prius* of things, but that thought is things and things are thought. The only effectual answer

to such criticism as we have supposed to be called forth by Dr. Caird's way of putting his case lies in an appeal not to those processes of the discursive understanding which are what the reader inevitably takes to constitute thought but to things." ইহার পরেই আমার উদ্ধৃত অংশ :—

To assume, because all reality requires thought to conceive it, that therefore the thought is the condition of its existence, is, indeed unwarrantable. (Works, vol iii, p. 145).

ইহাতেই বুঝা যাইবে যে এস্থলে ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক ক্রিয়ার অর্থে Thought শব্দটা ব্যবহৃত হয় নাই।

Greenএর মত বুঝিবার পক্ষে তাঁহার গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড তেমন প্রয়োজনীয় নয় এই কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমরা কি বলিব New Testamentএর Apocryphaর ন্যায় এ খণ্ডও গ্রীনদর্শনের Apocrypha? একজন দার্শনিকের মতামত জানিব অথচ তাঁহার সমুদয় দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িব না ইহা কি একটা কাজের কথা? Lotzeএর গ্রন্থ পড়িবার পর Green হেগেলের মত হইতে কতটুকু সরিয়া পড়িয়াছিলেন, Dr. Cairdএর মতের সহিত তাঁহার মতের কোথায় ও কতটুকু পার্থক্য—ইত্যাদি বিষয় জানা কি আবশ্যক নহে? এসব জানিতে হইলে তৃতীয় খণ্ড পড়া নিতান্তই দরকার।

(গ)

"আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান" নামক অংশের বিস্তীর্ণ সমালোচনা করা হইয়াছিল, ইহা সীতানাথবাবু পছন্দ করেন নাই। বিস্তীর্ণ সমালোচনার কারণ এই যে গ্রন্থকার মনে করেন এই অংশে যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে সেই সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তিমূল (the basis of our knowledge of God ইং, বাং পৃ ৭)।

সীতানাথবাবু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে কোন বস্তুকে জানিবার জন্য আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া জানে। আমরা যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি যে 'কোন বস্তু জানিবার সময় জ্ঞাতা আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে জানে না।' আপনাকে অনুভব করা এবং আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে জানা এই দুইটি এক কথা নহে, তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক। আত্মা যখন কোন বিষয়কে জানে, সেই সময়ে সে আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে জানে না, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। উপসংহারে বলিয়াছিলাম—

"তবে কি জ্ঞাতাকে জানা যায় না? ইহার উত্তরে 'হাঁ' 'না' উভয়ই বলা যাইতে পারে। এ প্রশ্নের মীমাংসা 'জানা' শব্দের উপর নির্ভর করে।

"একজন জ্ঞাতা আছেন, একটি জ্ঞেয় বস্তু আছে, এতদুভয়ের মধ্যে একটি সম্বন্ধ, জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তুকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে, এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে 'সম্বন্ধজ্ঞান'কেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে এবং জ্ঞাতা নিজ জ্ঞাতৃত্বকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে—ইহাই যদি জানার অর্থ হয়, তবে বলিব জ্ঞাতা ঠিক জ্ঞানলাভের সময় আপনাকে জানে না এবং আপনি যে বিষয়ের জ্ঞাতা তাহাও জানে না। (ক)

তবে যে-নিমেষে জ্ঞাতা কোন জ্ঞান লাভ করে, ঠিক তাহার পর নিমেষেই ঐ জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়।

কিন্তু এইপ্রকার 'জানা' ছাড়াও অন্য একপ্রকার জানা আছে, তাহার নাম অপরোক্ষ অনুভূতি, Bradleyএর ভাষায় Immediate Experience, Bergsonএর ভাষায় Intuition। ইহাকে যদি 'জানা' নাম দিতে আপত্তি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাতাকেও জানা যায়। নতুবা যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় বলিব 'বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?'" (খ)

সীতানাথবাবু (খ)-চিহ্নিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন "সব গোলমাল চুকিয়া গেল। এরূপ জ্ঞানকে 'জ্ঞান' বলিতে আপত্তি থাকা দূরে থাক, আমি এই জ্ঞানের কথাই বলিয়াছি। আমার স্মৃতির দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা এই যে স্মৃতিতে এই জ্ঞান স্পষ্টীকৃত হয়, স্মৃতিতে যে প্রথম উৎপন্ন হয় তাহা নহে। এই বিষয়ে আমি ফুটনোটে Ferrier ও শঙ্করের উল্লেখ করিয়াছি।"

এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই :—

গোলমাল চুকিয়া যাওয়া দূরে থাক্, বাড়িয়াই গেল। (১) 'ক'-অংশে 'জানার' যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, সেই অর্থ গ্রহণ করিয়াই সীতানাথবাবু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বাদানুবাদ করিয়াছেন। (২) প্রতিবাদ পড়িয়া মনে হইতেছে সীতানাথবাবু সমালোচনাটা মনোযোগের সহিত পড়েন নাই। সমালোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, মৌলিক ঘটনার জ্ঞান এবং স্মৃতির জ্ঞান এক নহে। স্মৃতিতে একটুকু বেশী থাকে। সেই বেশী অংশ এই—'আমি ইহা জানিতেছিলাম।' প্রতিবাদেও সীতানাথবাবু বলিয়াছেন মৌলিক জ্ঞান এবং স্মৃতির জ্ঞান একই জাতীয় জ্ঞান ;—পার্থক্য এই—প্রথমটি অস্পষ্ট, স্মৃতির জ্ঞান স্পষ্ট। (৩) অপরোক্ষ অনুভূতি ও Immediate Experience বিষয়ে আমি যাহা বলিয়াছি, সীতানাথবাবু মনে করেন, তিনিও তাহাই বলিয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষও উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশের একস্থল এই—knowing is often a matter of direct perception, insight or introspection (জানাটা অনেক স্থলেই সাক্ষাৎ-দৃষ্টি-ঘটিত, সাক্ষাৎ অনুভব বা আত্মজ্ঞানের ফল)।"

কিন্তু ইহার পরেই ভাবের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আত্মা আপনাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানে (=অনুভব করে) সীতানাথবাবু যদি কেবল এইটুকু বলিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে গোলমাল কমিয়া যাইত। কিন্তু ইহার পরেই বলিতেছেন—

No knowledge is possible without the knowledge of the self as the knower,—without the knowledge of the piece of knowledge as one's own, অর্থাৎ আপনাকে জ্ঞাতা বলিয়া না জানিলে, প্রত্যেক জ্ঞানকে 'আমার জ্ঞান' বলিয়া না জানিলে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না' পৃ ৯।

গ্রন্থের বহুস্থলে এইপ্রকার ভাব রহিয়াছে—

We could not know anything without knowledge 'I know' 'the knowledge is mine' অর্থাৎ 'আমি জানি এবং 'এ জ্ঞান আমার' ইহা না জানিয়া আমি কোন বস্তুই জানিতে পারি না। পৃ ১১ ; ইং ১০।

অপর একস্থলে বলিয়াছেন "আত্মা যে আপনাকে জানে সে কিরূপে জানে? জ্ঞাতারূপে। আত্মা যে-কোন বিষয়ই জানুক, প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে আপনাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাতারূপে জানে। ইহার আত্মজ্ঞান যে-কোন বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে প্রকাশিত হউক, এই আত্মজ্ঞানের আকার 'আমি জ্ঞাতা'। আত্মা আপনাকে জ্ঞাতারূপেই জ্ঞাত হয়। (পৃ ১৩, বাং)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সীতানাথবাবু প্রতিবাদে প্রথমে বলিলেন আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে জানা যায়, কিন্তু তাহার পরই একটা

নূতন সিদ্ধান্ত করিলেন—সিদ্ধান্তটি এই—"জ্ঞানলাভের সময় আত্মা আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে জানে"। পাঠকগণ দেখিবেন সমালোচনা হইতে উদ্ধৃত (ক)-চিহ্নিত অংশে 'জানা'র যে অর্থ করা হইয়াছে, সীতানাথবাবুর উদ্দেশ্য সেইপ্রকার সিদ্ধান্ত করা। গ্রন্থ হইতে অদ্য যে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল—তাহা দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু 'আত্মা আপনাকে জানে কি না', 'আত্মা আপনাকে অনুভব করে কি না' ইহা প্রশ্নই নয়। প্রশ্ন এই—'এই জ্ঞাতা বিষয়কে জানিবার সময় আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে জানে কিনা'।

সীতানাথবাবু এই প্রশ্নদ্বয়ের পার্থক্যই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 'আত্মাকে জানা' এবং 'জানিবার সময়ে আত্মাকে জ্ঞাতৃরূপে জানা' এক কথা নহে।

(৪)

সমালোচনায় আমরা বলিয়াছিলাম যে সীতানাথবাবু এই গ্রন্থে খাঁটি Subjective Idealism প্রচার করিয়াছেন এবং এই গ্রন্থের মতে 'এ জগৎ আমার মনোবিকার, আমার অবস্থা, আমার রূপ'।

ইহার প্রতিবাদে সীতানাথবাবু প্রথমটা অস্বীকার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টি আংশিক ভাবে প্রত্যাহার করিয়াছেন। এখন তিনি বলিতেছেন—

"আমি স্বীকার করি যে mental states নামটা একান্ত সমীচীন নহে। ইহা কতকটা আলঙ্কারিক।"

তিনি যে ভাবে মত প্রত্যাহার করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ নহে। তাঁহার নিকট হইতে আরও স্পষ্টবাদিতা আশা করিতে পারি।

সত্যসত্যই যদি এই মত প্রত্যাহৃত হয় অর্থাৎ এখন যদি সীতানাথবাবু স্বীকার করেন যে জগৎ মনের অবস্থা নহে, তাহা হইলে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ (৪২ পৃষ্ঠা), তৃতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ (১৮ পৃঃ) এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিতে হয় এবং গ্রন্থের অপরাপর স্থানেও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে।

"এ জগৎ আমার মনোবিকার"—এ বিষয়ে তিনি বলেন "আমি এই কথা কোথায় বলিলাম?" ভাষাটা সীতানাথবাবুর তাহা আমি বলি নাই। সমালোচনায় উক্ত অংশ কোটেসানের মধ্যে দেওয়া হয় নাই। তিনি গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন—উক্ত বাক্য তাহারই সার।

প্রথম কথা এই—তিনি গ্রন্থে বিস্তৃতি, বর্ণ, ঘ্রাণাদিকে 'বিজ্ঞানে' (=বেদনায়) পরিণত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ—বলিয়াছেন এই বর্ণ ঘ্রাণাদি আমার মনোবিকার। ইহাতে সকলেই সিদ্ধান্ত করিবেন যে সীতানাথবাবুর মতে 'এ জগৎ আমার মনোবিকার।'

গ্রন্থ হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমেই তিনি লিখিলেন—

"এখন জড়জগৎ এবং আত্মার সহিত জড়জগতের সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করা যাক।" (১)

ইহার পর ইহার ব্যাখ্যা এইপ্রকারে আরম্ভ করিলেন :—

"এই যে কাগজ, কালি, দোয়াত, কলম, টেবল্ প্রভৃতি দেখিতেছি, এ-সমস্ত বস্তুর দর্শন আমার দর্শন, দৃষ্টরূপগুলি আমার দৃষ্টিরূপ জ্ঞানের সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা দেখিতেছি তাহা আমারই দৃষ্টির বিষয়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই যে কলম, কাগজ, টেবল্ স্পর্শ করিতেছি, এই স্পর্শ আমারই স্পর্শ, স্পৃষ্ট বস্তুগুলি আমার স্পর্শজ্ঞানের সহিত সংবদ্ধ রহিয়াছে, আমার স্পর্শজ্ঞানের বিষয়রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।" (২)

ইহার পরেই সিদ্ধান্ত করিতেছেন—এইরূপে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি সমুদয়কেই জ্ঞানের সহিত, জ্ঞানরূপী আত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত সংবদ্ধ বলিয়া জানিতেছি। (৬)

প্রথম অংশে জড়জগতের ব্যাখ্যার কথা বলা হইল। (২)-অংশে দেওয়া হইল ইহার ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যায় কি জড়জগৎকে জ্ঞানাদি ব্যাপারে পরিণত করা হয় নাই?

অন্যএকস্থলে এইকথা বলিয়াছেন—

"সম্মুখস্থ টেবল্টাকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। টেবল্টা বিস্তৃতি, বর্ণ, মসৃণতা, কঠিনতা প্রভৃতি গুণাক্রান্ত। আমরা দেখাইয়াছি যে এ সমস্তই বিজ্ঞান।" (পৃঃ ৬২; ইং 62.)। (৩)

এখানেও জড়বস্তুকে বর্ণাদি গুণে পরিণত করা হইল এবং বলা হইল এই-সমুদয় জড়ীয় গুণ = 'বিজ্ঞান' (sensation)।

অন্যএকস্থলে এইপ্রকার আছে—জড়জ্ঞানের উপকরণ যে বর্ণ, কঠিনতা প্রভৃতি গুণ......ইহারা মনোবিকার, ইন্দ্রিয়বোধ বা বিজ্ঞান মাত্র—পৃঃ ৩৯। The matter of perception—colour, hardness, smell, etc......are mental states, sensations or ideas (p. 38)। (৪)

এস্থলে বলা হইল—বর্ণ কঠিনতা প্রভৃতি গুণ দ্বারাই জড়জগৎ গঠিত; এবং এই-সমুদয় গুণ মনোবিকার, অর্থাৎ লোকে যাহাকে জড়জগৎ বলে তাহা মনোবিকার।

"That something is hard, means that its contact gives rise to a great deal of muscular sensation. The 'something' spoken of is itself.........constituted by extension, tactual sensations and such other properties as can exist only in relation to experience (p. 56) অর্থাৎ "কোন বস্তু কঠিন, ইহার অর্থ এই যে ইহার সংযোগে অধিক পরিমাণে মাংসপেশিক বোধ উৎপন্ন হয়। এই যে 'কোন বস্তু'র কথা বলা হইল......ইহাও বিস্তৃতি স্পর্শবোধ প্রভৃতি মনোবিকার-লক্ষণাক্রান্ত বিষয়মাত্র।" পৃঃ ৫৮। (৫)

এখানেও বলা হইল জড়বস্তু কঠিনতাদির গুণ দ্বারাই গঠিত এবং এই-সমুদয় গুণ মনোবিকার মাত্র অর্থাৎ জড়জগৎ মনোবিকারমাত্র।

'প্রকৃতিবাদ খণ্ডন' নামক পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন যে যাহাদিগকে আমরা জড়ীয় গুণ বলি, তাহারা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র বটে (What we call qualities of matter are really mere sensations), কিন্তু তাহাদের আধার ও কারণরূপী একটী অচেতন বস্তু আছে" পৃঃ ৬১; ইং ৫৮। (৬)

সীতানাথবাবু নিজে স্বীকার করেন—"যাহাদিগকে আমরা জড়ীয় গুণ বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র (mere sensation)"। এই কথাটাই প্রতিবাদীদিগের দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইতেছেন।

প্রকৃতবাদিগণের পূর্ব্বোক্ত অংশের উত্তরে সীতানাথবাবু বলিতেছেন—

"প্রকৃতবাদের অনুমিত জড় বস্তুর আধারত্ব সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে জড়ীয় গুণসমূহকে যখন বিজ্ঞান (sensation) বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন কোন অচেতন বস্তুকে ইহাদের আধার বলা একান্তই অসঙ্গত।" পৃঃ ৬১। (৭)

অন্যস্থলে বলিয়াছেন—

"বর্ণ স্পর্শাদি, যাহাদিগকে আমরা জড়ীয় গুণ বলি, ইহারাও বিজ্ঞানমাত্র।" পৃঃ ৪১। (৮)

অন্যান্য জড়ীয়গুণ—ঘ্রাণ, আস্বাদ, শব্দ, স্পর্শ, ইহারা যে বিজ্ঞানমাত্র, তাহা বুঝা তাদৃশ কঠিন নহে।" পৃঃ ৫১। (৯)।

"অন্যান্য জড়ীয় গুণের ন্যায়, ইহারাও (কঠিনতা, কোমলতা ইত্যাদি) জ্ঞান-সাপেক্ষ মনোবিকার মাত্র।" পৃঃ ৫৯। (১০)

"আমাদের জড়ীয় গুণের আলোচনা শেষ হইল। পাঠক দেখিলেন, যাহাদিগকে লোক জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র গুণ বলিয়া মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে-সকল জ্ঞানাশ্রিত বিজ্ঞান বা মনোবিকার মাত্র। সুতরাং—আমরা যাহাকে জড়জগৎ বলি তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া প্রকৃতপক্ষে আমরা আত্মার বাহিরে যাই না, অর্থাৎ জগতের বাহিরে যাই না, আমরা আত্মা ও আত্মার আশ্রিত বিষয়সমূহকেই প্রত্যক্ষ করি।" পৃঃ ৫৯; ইং ৫৭। (১১)

এখানে বলা হইল জড়ীয় গুণসমূহ মনোবিকার মাত্র এবং লোকে এই-সমুদায়কেই জড়জগৎ বলে। সুতরাং জড়জগৎ মনোবিকার মাত্র।

এই-সমুদয় উদ্ধৃতস্থল হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সীতানাথবাবুর মতে এই জগৎ মনোবিকার। অথচ প্রতিবাদে সীতানাথবাবু বলিতেছেন—

বর্ণ ঘ্রাণাদি ব্যাপার যদি জগৎ হইত, তবে মহেশবাবু আমার মতের যে ব্যাখ্যা ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা ঠিকই হইত। কিন্তু এগুলি ত জগৎ নহে আর আমি এগুলিকে জগৎ কোথাও বলিও নাই।"

সীতানাথবাবু পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন এবং প্রতিবাদে যাহা বলিতেছেন—এতদুভয়ের কোন সামঞ্জস্য দেখিতেছি না।

জড়ীয় গুণ বা জড়জগৎকে বেদনা বা মনোবিকারে পরিণত করা হইল। এখন প্রশ্ন—এই বেদনা, এই মনোবিকার কাহার? সীতানাথবাবুই বলিতেছেন—

"কোন আত্মা অনুভব করিতেছে না, অথচ একটা ব্যথা আছে একটা বিজ্ঞান (sensation) আছে, এই কথা অর্থহীন অসম্ভব কথা। ফলতঃ বিজ্ঞান বা feeling কথাটা কোন স্বাধীন স্বতন্ত্র বস্তুর পরিচায়ক নহে। সুবিধার জন্য আমাদিগকে বিজ্ঞান বা feeling কথাটা ব্যবহার করিতে হয় বটে, কিন্তু কেবল বিজ্ঞান বা mere feeling বলিয়া কোন বস্তু নাই, খাঁটি বস্তুটা (concrete reality) হচ্ছে আমি বোধ করি বা I feel। একটা বিজ্ঞান = আমি একবার বোধ করি; দুটা বিজ্ঞান = আমি দুবার বোধ করি; একটা বিজ্ঞান-শৃঙ্খল = আমি ক্রমাগত বোধ করি।" পৃঃ ৪০—৪১; ইং ৩৯।

সুতরাং আমরা দুইটি বস্তু পাইতেছি—(১) এ জগৎ মনোবিকার; (২) এ জগৎ আমার মনোবিকার।

মনোবিকার যে আমার—তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিভিন্নস্থলে বলা হইয়াছে। (ঘ)-নামক অংশে উদ্ধৃত (১)-চিহ্নিত অংশে জড়জগতের ব্যাখ্যার কথা বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইল (২)-চিহ্নিত অংশে। এই শেষোক্তস্থলে বলা হইল এ-সমস্ত বস্তুর দর্শন, আমার দর্শন, দৃষ্টরূপগুলি আমার দৃষ্টিরূপ জ্ঞানের সহিত সংবদ্ধ। এই স্পর্শ আমারই স্পর্শ, ইত্যাদি। সুতরাং এ অংশের সিদ্ধান্ত এই,—এই জগৎ আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ, ইত্যাদি।

বাঙ্গালা গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠা হইতে ৫৯ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত (ইং ৩৯-৫৭) অংশে গ্রন্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঘ্রাণাদি ব্যক্তি-বিশেষেরই মনোবিকার অর্থাৎ আমারই মনোবিকার।

প্রতিবাদে সীতানাথবাবু লিখিয়াছেন—"মহেশবাবুর ব্যাখ্যা ও আমার মতে অনেক প্রভেদ। 'আমারই দর্শন' 'আমারই স্পর্শ' বলিলে অস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র বুঝায়; 'দর্শনের বিষয়' 'স্পর্শের বিষয়' বলিলে এমন বিষয় বুঝায়, যে-বিষয় ইন্দ্রিয়ক্রিয়া শেষ হইলেও বর্ত্তমান থাকে।"

সীতানাথবাবুর দর্শনে পূর্ব্বোক্ত অর্থে জগৎকে দর্শনের বিষয় বা স্পর্শের বিষয় বলা যাইতে পারে না। সীতানাথবাবুও যে ইহা বুঝেন নাই তাহা নহে। জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় নামক পরিচ্ছেদে প্রতিপক্ষদিগের যুক্তি খণ্ডন করিবার সময় তিনি এই কথা লিখিয়াছেন:—

"আপাততঃ কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে চক্ষুরাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমূহ যে আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, অথবা আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইলে যে ইহারা বর্ত্তমান থাকে তাহারও কোন প্রমাণ নাই।" পৃঃ ৮২; ইং ৮০।

এখানে ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, আমরা সমগ্র জগৎ-বিষয়েই সেই কথা বলিতে পারি।

সীতানাথবাবু প্রতিবাদে এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহাতে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র প্রকৃত অর্থ বুঝা অসম্ভব হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

এগুলি (বর্ণঘ্রাণাদি ব্যাপার) ত জগৎ নহে, আর আমি এগুলিকে জগৎ কোথায়ও বলি নাই। এগুলি প্রকৃতপক্ষে বিষয়ও নহে, বিষয়ের উপকরণ মাত্র। এগুলিকে phenomenal বিষয়মাত্র বলা যায়। noumenal বা transcendental বিষয় বলা যায় না। শেষ অর্থে, পূর্ণ অর্থে, বিষয়ের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধ, দেশকাল, এবং বুদ্ধির ভিন্ন-ভিন্ন তত্ত্ব, (conceptions) অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকাশ, এই তিন-প্রকার উপকরণ আবশ্যক। এরূপ বিষয়ই প্রকৃতপক্ষে জগৎ, আর এই জগৎ আত্মসাপেক্ষ, অথচ ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার অধীন নহে।"

আমাদিগের বক্তব্য এই:—

গ্রন্থের কোন স্থলেই phenomenal বিষয় এবং noumenal বিষয়ের কথা বলা হয় নাই। সীতানাথবাবু noumenal বিষয় বলিয়া যদি কোন বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেনই, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বিবৃত হয় নাই। বিষয়টি এত গুরুতর অথচ গ্রন্থকার এবিষয়ে একবারেই নীরব। তিনি যখন নীরব, তখন এবিষয়ে আমরাও নীরব রহিলাম।

তবে গ্রন্থে আমরা এইপ্রকার পাইতেছি:—

(১) "বর্ণ অর্থ—যাহা দেখা যায়, একটা দৃষ্ট বিষয়; ইহাকে ভাবিতে গেলেও একটা দৃষ্ট বিষয় বলিয়াই ভাবিতে হইবে। কঠিনতা, মসৃণতাও তেমনি জানা বিষয়—স্পৃষ্ট বিষয়, ইহাদিগকে ভাবিতে গেলেও স্পৃষ্ট বিষয় বলিয়াই ভাবিতে হইবে। তেমনি বিস্তৃতিও দর্শন ও স্পর্শের সহিত জানা একটা বিষয়; ইহাকেও কেবল জানা বলিয়াই ভাবা যায়" (বাং পৃঃ ২২)।

(২) বর্ণ একটা দৃষ্ট বা দৃষ্টিগোচর বিষয়; ইহা দৃষ্টরূপেই জ্ঞানের সমক্ষে প্রকাশিত হয় এবং আমরা যখন ইহাকে না দেখি তখনও কোন-না-কোন আত্মার দৃষ্ট বিষয়রূপেই ইহাকে ভাবিতে পারি। পৃঃ ৪১ বাং।

(৩) স্পর্শের বিষয়—উষ্ণতা, শীতলতা, মসৃণতা, কর্কশতা, কোমলতা, কঠিনতা এই সমস্ত। দর্শনের বিষয়—শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি বর্ণ। পৃঃ ৪৫,৪৬।

(৪) সুস্থ চক্ষুর কাছে যাহা সাদা পাণ্ডু, পীড়িত চক্ষুর কাছে তাহাই হরিদ্রা।......এই উভয় শ্রেণীর বর্ণেরই মূল প্রকৃতি এক—জানা হওয়া, উভয়ই জ্ঞানের বিষয়। পৃঃ ৫০।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থে বর্ণ প্রভৃতিকে বিষয়ই বলা হইয়াছে। প্রতিবাদে বলিতেছেন এগুলি phenomenal অর্থে বিষয়-মাত্র। কিন্তু গ্রন্থের অন্য এক সংস্করণ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠকগণ কি-প্রকারে জানিবেন যে এ-সমুদয় পূর্ণ অর্থে বিষয় নহে?

এস্থলে কেহ-কেহ বলিতে পারেন "এই মনোবিকার আমারও মনোবিকার, তোমারও মনোবিকার এবং প্রত্যেকেরই মনোবিকার"—এ-প্রকার কি হইতে পারে না? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সীতানাথবাবুর গ্রন্থ হইতে ২।১টা অংশ উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

বিজ্ঞানের উৎপত্তি-বিষয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় এই-প্রকার আছে :—

"আত্মা স্বয়ংই বিজ্ঞানোৎপত্তির যথেষ্ট কারণ নয় কি? আত্মা ক্রমাগত ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞানসমন্বিত হইতেছে। ভিন্ন-ভিন্ন বিজ্ঞান অনুভব করিতেছে। ব্যাপারটা ত এই ; ইহার জন্য একটা অজ্ঞেয় অভাবনীয় অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কি আবশ্যক?......আত্মা নিজের কর্ত্তৃত্বে নিজে বিজ্ঞান-সমন্বিত হইতেছে, ইহা বিশ্বাস করিলেই ত হয়, আবার একটি অতিরিক্ত কর্ত্তা ভাবিবার প্রয়োজন কি?" বাং পৃঃ ৬৭-৬৮।

ইহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইংরাজী সংস্করণে নিম্নলিখিত অংশ বেশী দেওয়া হইয়াছে ; বাঙ্গলা গ্রন্থে এ অংশ নাই।

It is the idea that in sensation the self is purely passive which makes people imagine a not-self as causing sensation in it. (পৃঃ ৬৫)। অর্থাৎ লোকে ভাবে বেদনা-ব্যাপারে আত্মা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়,—এইজন্য তাহারা কল্পনা করিয়া লয় যে একটা অনাত্মবস্তু এই বেদনা উৎপাদন করিতেছে।

ইহার পরেই বেদনার প্রকৃতি-বিষয়ে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

Sensation being purely mental—a form of consciousness—it bears no impress and furnishes no proof, of anything extramental—any not-self. It implies only the self's spontaneity or activity—its capability of assuming various sensuous forms" ইং পৃঃ ৬৬। (বাঙ্গালা পুস্তকে এ অংশও নাই)। এই অংশে বলা হইতেছে :—

(১) বেদনা কেবলই মনোব্যাপার।

(২) ইহা আত্মার বা জ্ঞানের একটি রূপ।

(৩) ইহাতে বাহ্যবস্তুর চিহ্নমাত্র নাই, ইহা কোন বাহ্যবস্তু বা কোন অনাত্মবস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করে না।

(৪) এই বেদনা হইতে প্রমাণিত হয় যে আত্মা আপনা-আপনিই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে এবং আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর আকার ধারণ করে।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :—

"এই জ্ঞানবস্তুর দুই দিক্, একদিক্ জ্ঞাতা এবং জ্ঞাতারূপে জ্ঞাত, আর একদিক কেবলই জানা। প্রথম দিক্‌কে বিষয়ী, দ্বিতীয় দিক্‌কে বিষয় বলা যায়।...এই যে জ্ঞানের দুই দিক্, কেহ ইচ্ছা করিলে এই দুই দিকের একদিক্‌কে আত্মা, অপর দিক্‌কে অনাত্মা বলিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আত্মা ও অনাত্মা একই জ্ঞানবস্তুর দুইটী অচ্ছেদ্য দিক্ মাত্র ; আসল খাঁটি বস্তু—জ্ঞান, আমরা ইহাকে অনেক স্থলে কেবল আত্মাই বলিয়াছি। ইহাকে আত্মা বলিলেই যথেষ্ট হয়, কেননা আত্মা বলিলেই বিষয়িত্ব ও বিষয়ত্ব উভয়ই বুঝায়।" পৃ ৭৭ ; ইং ৭৪—৭৫।

উদ্ধৃত অংশসমূহ হইতে আমরা বুঝিতেছি যে Not-self অর্থাৎ অনাত্মা বলিয়া কিছু নাই। 'অনাত্মা' কথাটা যদি ব্যবহারই করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে ইহা আত্মারই একটি দিক্।

এই যে মত ব্যাখ্যা করা হইল ইহাকেই আমরা Subjective Idealism বলিয়াছি। সীতানাথবাবু বলেন "যাঁরা বলেন বিষয়—জগৎ ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, তাঁরাই Subjective Idealist, আমি এই মত পোষণ করা দূরে থাক্, আমি ইহা খণ্ডনের জন্য একটী পরিচ্ছেদ লিখিয়াছি।" ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই :—গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমরা ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়া ছাড়া বেশী কিছুই পাই নাই। বেদনা-ব্যাপারে আত্মা ক্রিয়াশীল, আত্মাই নিজের বেদনা নিজে উৎপাদন করে। সুতরাং সীতানাথবাবুর ব্যাখ্যা অনুসারেই তাঁহার মত Subjective Idealism. আর সীতানাথবাবু যে বলিয়াছেন তিনি Subjective Idealism খণ্ডন করিবার জন্য এক পরিচ্ছেদ লিখিয়াছেন—তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে তিনি যাহার নাম দিয়াছেন Subjective Idealism, তাহা আমাদের Subjective Idealism নহে। তবে এসমুদয় অবান্তর কথা। মূল কথা এই—সীতানাথবাবু জড়জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া মনোবিকার বা বেদনা ছাড়া কিছুই পান নাই এবং তাঁহার মতে এই বেদনা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার, ইহাতে বাহ্য বস্তুর চিহ্ন মাত্রও নাই।

এখানে বলা যাইতে পারে যে যাঁহারা সমুদয় বস্তুকেই মনোবিকারে পরিণত করেন, তাঁহাদের মতও Subjective Idealism, তবে নামে কিছু এসে যায় না। রসুনকে রসুনই বল, কিংবা চামেলী বা বেলীই বল, রসুনের রসুনত্ব ঘুচিবার নয়।

এখন পূর্ব্বের প্রশ্ন ধরা যাউক। ইহা কি হইতে পারে না যে এ জগৎ আমারও মনোবিকার, তোমারও মনোবিকার এবং প্রত্যেকেরই মনোবিকার?

আমাদের প্রথম বক্তব্য এই :—

জ্ঞান-ব্যাপারটা কেবল মনোবিকার নহে। বেদনা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞানাদি হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। তবে যথাযথ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহারা অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিতেছে 'ঐ দেখ তোমার আত্মার অতিরিক্ত বস্তু।' ইহাকেই বলে Transubjective Reference. সীতানাথবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন sensation বা feeling কোন feeling mind ছাড়া থাকিতে পারে কি না। এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবার পূর্ব্বে তিনি যদি জিজ্ঞাসা করিতেন—"এ জগৎটা কি কেবলই মনোবিকার নহে?' তাহা হইলে ঐ প্রশ্ন করা আর আবশ্যক হইত না।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই :—

জ্ঞান-ব্যাপারটি যদি কেবলই মনোবিকার হইত তাহা হইলে এই মনোবিকারকে মনোবিকার বলিয়াই বুঝা যাইত না। অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কিত হয় বলিয়াই আত্মা জ্ঞান লাভ করে,—বিষয়জ্ঞান লাভ করে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করে। Edward Caird পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে আমরা বস্তুকে মনোবিকারে পরিণত করিতে পারি না "we must repel the Berkeleian tendency to dissolve objects into mere ideas" (Evo. Theo. vol I, p. 190).

আমরা কেবল নিজের মনের অবস্থাকেই জানি এই মতকে কেয়ার্ড paradox of subjective Idealism বলিয়াছেন (p. 192)। এ-প্রকার বলিবার কারণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"It is......irrational to take thoughts as mere states of the subject without reference to reality ; for it is in such objective reference that all their meaning lies. Indeed apart from such reference, we could not apprehend them even as states of the subject" (p. 188, vol. i.).

মানুষ যদি কেবল নিজের মনের বিকারেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে তাহার সঙ্গে amœba (এমিবা) প্রভৃতি জীবের কি পার্থক্য থাকিত? amœba (এমিবা) জানে না যে আমি আছি, ব

এই আমার অবস্থা। বিকারবাদ মানুষকে এই 'এমিবা'তেই পরিণত করে।

E. Caird এর ভাষায় বলা যাইতে পারে—

If the object be reduced to a state of the subject, the subject ceases *ipso facto* to be an ego; and a self which knows nothing but its own states is an absurdity, a cross between a sensitive subject which does not know but merely feels and a self-conscious subject which can be conscious of itself only as it is conscious of objects (Critical Phil. Vol. I., p. 420: and Evolution of Theology, Vol. I. See p. 189).

Dr. Caird ও একজন খাঁটি জ্ঞানবাদী, তাঁহারও মত এই:—

If we start with mere sensation, it is as much a problem how we get *into* ourselves, as how we get *out* of ourselves (words N and A. vol ii. p. 289)

Dr. Caird এ বিষয়ে কি যুক্তি দিয়াছেন তাহা পাঠকগণ উক্ত গ্রন্থের ঐ পৃষ্ঠাতেই পাইবেন।

তৃতীয় বক্তব্য এই:—

কল্পনা করিয়া লওয়া যাউক বিকারবাদীর পক্ষে নিজের অবস্থা জানা সম্ভব। সে কেবল নিজের অবস্থার বিষয়েই জানিতে পারে। নিজ ছাড়া অন্য বস্তু আছে, ইহা তাহার পক্ষে জানা সম্ভব নহে। আর জানিবেই বা কি করিয়া? নিজের অবস্থা ছাড়া আর ত কিছু নাই। এখন প্রশ্ন এই, তাহার নিকটে জগতের নরনারী আছে কি না? বলিতেই হইবে জগতের নরনারী বলিয়া কিছু নাই। বিকারবাদে জড়জগতের যে গতি, জগতের নরনারীরও সেই গতি। জগতের সমুদয় আত্মা শারীরক। সুতরাং বাহ্য জগতের অঙ্গরূপেই ইঁহারা আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। বাহ্য জগৎ যখন আমার মনোবিকার তখন জগতের নরনারীও আমার মনোবিকারে পরিণত হইল।

শুনিতে পাই অপর লোকেও চিন্তা করে এবং জ্ঞাতসারেই চিন্তা করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইঁহারা আমারই মনোবিকার এবং আমারই জ্ঞানের বিষয়, অথচ আমি এসব চিন্তার বিষয় কিছুই জানি না। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল যে, যে মনোবিকার (-নরনারীগণ) আমার জ্ঞানের বিষয়, সেই মনোবিকারের মধ্যে কি ঘটিতেছে, তাহা আমার জ্ঞানের অতীত? এ মনোবিকার ত অদ্ভুত মনোবিকার! Reil বলেন—If the brain of my fellow man is only a idea in my mind, how then is it possible that sometimes my idea in another's head is diseased and compels my fellow man to all sorts of insane statements? Even relativism, with its constantly vibrating correlation of subject and object cannot avoid the conclusion that at least the last subject to which he relates the brain as object, must be a brainless subject (Science and Metaphysics, p. 50).

এ স্থলে বলা আবশ্যক Edward Card এর জ্ঞানবাদ-বিষয়ে এ সমালোচনা প্রযোজ্য নহে। তিনি জগৎকে মনোবিকারে পরিণত করেন নাই; তিনি দার্শনিকভাবেই স্বীকার করেন যে প্রত্যেক বস্তুরই প্রকৃত সত্তা আছে। A thorough-going idealism will not fear to admit the reality of that which is other than mind and even, in a sense, diametrically opposed to it. (Evolution of Theology., vol ii, p 27)। তাঁহার মতে জড়বস্তুও কেবল মনোব্যাপার নহে। ইহারও প্রকৃত সত্তা আছে। তিনি ইহাও বলেন যে জড়জগতের যদি প্রকৃত সত্তা অস্বীকার কর, তাহা হইলে সমুদয় জগতের অস্তিত্বই অস্বীকার করিতে হইবে। The denial of the reality of the material world will inevitably lead to the denial of any world at all (Idealism, p. 4).

চতুর্থ বক্তব্য এই:—

বিকারবাদিগণের মুখে দুইটি কথা শুনিতেছি—(১) আত্মা, (২) আত্মার বিকার।

আমি ছাড়া যখন দ্বিতীয় আত্মাই নাই, তখন এ মনোবিকার আত্মার ছাড়া আর কাহার?

অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে কেবল দুইটি জিনিষ:—

(১) একটি তন্তুকোষ

(২) ইহার অভ্যন্তরস্থ একটি কৃমিকীট।

পঞ্চম বক্তব্য এই: -

অতি স্থূল জড়বাদ এবং এই বিকারবাদ একই জিনিষ। লোকে বলে জড়বস্তু হ্রস্ব বা দীর্ঘ; বিকারবাদী বলেন, তোমরা যাহাকে জড় বলিতেছ, তাহা আমারই আত্মার অবস্থা; সুতরাং আমার আত্মার অবস্থাই হ্রস্ব বা দীর্ঘ। লোকে বলে জড় বস্তু লাল, কাল বা সাদা; বিকারবাদী বলেন আমার একটা অবস্থাই লাল, কাল বা সাদা। লোকে বলে জড়বস্তু কঠিন তরল বা বায়বীয়; এই বিকারবাদী বলেন আমার আত্মার একটা অবস্থাই কঠিন, তরল বা বায়বীয়। লোকে বলে জড়বস্তু কটু, তিক্ত, কষায়; বিকারবাদী বলেন আমার একটা অবস্থাই কটু, তিক্ত, -বা কষায়। যাহা পূর্ব্বে জড়ের গুণ বলিয়া পরিচিত হইত, এখন তাহা আত্মার অবস্থা-রূপে পরিণত হইল। যাহার অবস্থা হ্রস্ব বা দীর্ঘ; লাল, কাল বা সাদা; মিষ্ট কটু তিক্ত বা কষায়—সে বস্তু জড়বস্তু ছাড়া আর কি? পূর্ব্বে জড় বস্তু ছিল বাহিরে; এখন আসিল ভিতরে। ইহাতে জড় বস্তুর জড়ত্ব বিনষ্ট হইল না— আত্মাই সেই জড়ত্ব গ্রহণ করিল। (Adamson's Fichte, p. 115)।

সীতানাথবাবু যে Subjective Idealismকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে। তাঁহার চেষ্টার প্রণালী এই:—

তিনি প্রথমে জড়জগৎ বিশ্লেষণ করিলেন। তাহার পর প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন এ-সমুদয় বস্তু আমারই দর্শন, আমারই স্পর্শ এবং সমুদয় আমারই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত (এই সমালোচনার, ঘ প্রকরণ, ১ ও ২-চিহ্নিত অংশ দ্রঃ)।

ইহার পর কোন-প্রকার যুক্তি না দিয়া বলিলেন—সুতরাং এই জগৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত (৩-চিহ্নিত অংশ দ্রষ্টব্য)।

'আমার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত' ইহা এক কথা, এবং 'জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত' ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা। প্রথম সিদ্ধান্ত হইতে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না।

অর্থাৎ Subjective Idealismএর তরণীতে আরোহণ করিয়া Absolute Idealismএর দেশে পৌঁছান যায় না; নৌকায় দাঁড়াইয়া কেবল-গুণ টানাই সার হয়।

(ছ)

আমরা বলিয়াছিলাম "আমার জ্ঞান ও ব্রহ্মের জ্ঞান একই জ্ঞান' গ্রন্থকার ইহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। ইহার প্রতিবাদে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "প্রমাণ করিতে পারি নাই বলিলেই ত হইল না। তাঁহার

উচিত ছিল—আমার unity and difference নামক তৃতীয় অধ্যায়ের যুক্তির উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করা।"

দেখা যাউক গ্রন্থে কি বলেন।

ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই-প্রকার যুক্তি দিয়াছেন :—

এই অসংখ্য বিচিত্রতার মধ্যে একটী আশ্চর্য্য একতা রহিয়াছে। জীবের মন বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বটে কিন্তু পরস্পরের সহিত অসংযুক্ত নহে; সমুদয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগ, এক আশ্চর্য্য একতা রহিয়াছে। সমুদায়ের মূলে একই জ্ঞান-বস্তু বর্ত্তমান, কেবল এই তত্ত্বই এই একতার একমাত্র ব্যাখ্যা। জীবাত্মা-সকল যদি পরস্পর হইতে পৃথক্ পৃথক্ হইত, তবে ইহা নিশ্চয় যে কোন আত্মা কোন আত্মাকে জানিতে পারিত না, কোন আত্মার সহিত কোন আত্মার যোগ সম্ভব হইত না। আমার ও আমার সম্মুখস্থ বন্ধুর জীবনের মূলীভূত জ্ঞানবস্তু যদি মূলে এক না হইত, তবে তিনি যে আছেন, আমি কোন-প্রকারেই জানিতাম না।......আত্মার এই যে যোগ, এই যে চিন্তা ও ভাবের বিনিময়, ইহার আর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হইতে পারে না; ইহার একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা এই যে সংযুক্ত আত্মাদ্বয়ের মূলে একই জ্ঞানবস্তু বর্ত্তমান। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগ বলিলেই এমন একটী বস্তুর অস্তিত্ব বুঝায় যাহা সংযুক্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে সাধারণ।......স্বীকার করিতে হইবে একই অনন্ত জ্ঞানবস্তু, এক অনন্ত পরমাত্মা, প্রত্যেক আত্মার প্রাণরূপে, প্রত্যেক মনের চিন্তা ও ভাবের সাধারণ কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া এই অসংখ্য বিচিত্র আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ-লীলা রচনা করিতেছেন। পৃ ১৫৪—১৫৬।

অনেকে বলিবেন এ ত বেশ যুক্তি। কিন্তু কথাটা এই—সীতানাথবাবুর দর্শনের ভিত্তি হইতে এ-প্রকার যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে না। মনে কর একজন জড়বাদী ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবেন। তাঁহাকে ইহা প্রমাণ করিতে হইলে জড়বাদের ভূমি হইতেই প্রমাণ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি যদি ব্রহ্মবাদের ভূমিতে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন, আমরা বলিব সিদ্ধান্তটি বেশ, তবে কিনা জড়বাদে কুলাইল না, ব্রহ্মবাদের আশ্রয় লইতে হইল। এই ঘটনা হইতেই কি প্রমাণিত হইল না যে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার পক্ষে জড়বাদ যথেষ্ট নহে? সীতানাথবাবুর মতের বিষয়েও ইহাই ঘটিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে বিকারবাদের মতে আব্রহ্মস্তম্ব সমুদয়ই আমার মনোবিকার। আমিই একমেবাদ্বিতীয়ম্ আত্মা, আমি ছাড়া দ্বিতীয় মানব নাই। লোকে বলিতে পারে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, রামশ্যাম, ইত্যাদি। কিন্তু বিকারবাদীকে বলিতে হইবে আমার একটি অবস্থার নাম পিতা, একটি অবস্থার নাম মাতা, একটি অবস্থার নাম ভ্রাতা, ইত্যাদি। অপরে বলিতে পারে পরম পিতা বিধাতা এ-সমুদয়কে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু বিকারবাদীর এ-প্রকার বলিবার অধিকার নাই। বিভিন্ন আত্মাই যখন নাই, তখন তাহাদিগের আবার সংযোগ কি? মস্তিষ্ক থাকিলে ত মস্তিষ্কের পীড়া; বিভিন্ন আত্মা যখন আমারই মনের অবস্থা, তখন আমিই তাহাদিগের সংযোগের হেতু, আমিই বিধৃতি হইয়া আমার সমুদয় অবস্থাকে সম্মিলিত করিয়া রাখিয়াছি। এই-সমুদয় অবস্থা আমারই অঙ্গ, এই-সমুদয় অবস্থাই আমিই।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সীতানাথবাবুর যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে না।

সীতানাথবাবুর আর একটা যুক্তি এই :—

কাল অনন্ত, ঘটনাশূন্য কাল অর্থশূন্য, সুতরাং ঘটনা-শৃঙ্খলও অনন্ত। ঘটনা জ্ঞান জ্ঞান ভিন্ন থাকিতে পারে না। অনন্ত ঘটনা-শৃঙ্খল যখন রহিয়াছে, তখন অনন্ত জ্ঞানও রহিয়াছে।

সীতানাথবাবু দেশকালের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা সমালোচনা করিবার সুযোগ নাই। ধরিয়া লওয়া গেল তাঁহার কালের ব্যাখ্যা ঠিক এবং এই কালের অনন্তত্ব হইতে ঘটনার অনন্তত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন—"ঘটনা মানসিক অবস্থা-নিচয়" পৃ ১২৫। অবস্থার অস্তিত্বের জন্য যদি কোন জ্ঞানের আবশ্যকই হয়, তবে সেজন্য অন্যত্র যাইতে হইবে কেন। স্বয়ং আমিই ত রহিয়াছি। আমার জ্ঞানেই আমার অবস্থানিচয় প্রতিষ্ঠিত এই বলিলেই ত যথেষ্ট হইল। বিকারবাদে ঈশ্বর না হইলেও চলে।

ঘটনার প্রকৃত অস্তিত্ব আছে ইহা যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় তাহাতেও প্রমাণিত হয় না যে, ইহার আশ্রয়ের জন্য জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সমালোচনার (৪)-অংশে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

বিকারবাদী ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবেন কি-প্রকারে? তাঁহার নিকটে সবই নিজের মনের ভাব মাত্র। আত্মা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবগ্রস্ত হইতেছে। ইহার একটা ভাব 'ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ,' আর একটা ভাব 'ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ', অন্য একটা ভাব 'ব্রহ্ম মঙ্গলস্বরূপ', ইত্যাদি। এ সমুদয় ভাব আত্মারই এবং এ-সমুদয় মনোবিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই-সমুদয় ভাবের আশ্রয় যদি দরকার হয়, সে আশ্রয় আত্মা নিজে। এই-সমুদয় ভাবের আশ্রয়ের জন্য যদি জ্ঞানের আবশ্যক হয়, সে জ্ঞানের জন্যও দূরে যাইতে হইবে না—সে জ্ঞান স্বয়ং আত্মারই জ্ঞান। যেদিক দিয়াই বিচার করা যাক, বিকারবাদীর পক্ষে নিজের আত্মার বাহিরে যাওয়া দরকার হয় না—এবং তাহার পক্ষে বাহিরে যাওয়া সম্ভবও নয়।

এইমতে ব্রহ্মের কোন স্থান নাই। বিকারবাদের আত্মা স্বয়ং সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। পিতা তাঁহার পিতা নহেন। তিনি পিতার পিতা; মাতা তাঁহার মাতা নহেন, তিনি মাতার মাতা; ব্রহ্ম তাঁহার স্রষ্টা নহেন, তিনি ব্রহ্মের স্রষ্টা।

ব্রহ্মের অস্তিত্বই যখন প্রমাণিত হইল না—তখন ব্রহ্মের জ্ঞান এবং আমার জ্ঞান—এই উভয় জ্ঞান যে একই জ্ঞান, ইহা প্রমাণিত হইবে কি-প্রকারে?

তৃতীয় অধ্যায়ে এবিষয়ে আর এমন কোন যুক্তি নাই—যাহা এখানে এই উপলক্ষে আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা সমালোচনায় বলিয়াছিলাম সীতানাথবাবু প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে আমাদিগের জ্ঞান এবং ব্রহ্মের জ্ঞান একই জ্ঞান—বর্ত্তমান আলোচনাতেও আমরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছি।

(জ)

আর এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে—এ জ্ঞানের অর্থ কি? সীতানাথবাবু স্পষ্ট করিয়া কোনস্থলে ইহা ব্যাখ্যা করেন নাই। পরোক্ষভাবে ২।১টি স্থলে ইহার ব্যাখ্যা আছে। একস্থলে আছে—

Our individual volitions are dependent on sensation, memory and understanding, in a word, on knowledge. (p. 108.) অর্থাৎ "আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা এমন একটি কার্য্য যাহা বিজ্ঞান, স্মৃতি ও বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে অর্থাৎ এক কথায় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে" পৃঃ ১১০।

ইহার ঠিক পরেই "জ্ঞানের আবির্ভাব" অর্থ বিজ্ঞান, স্মৃতি ও বুদ্ধির আবির্ভাব করা হইয়াছে।

গ্রন্থকারের মতে—"জ্ঞান নিত্যবস্তু, এমন কাল ছিল না যখন জ্ঞান ছিল না, এমন কাল আসে না যখন জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এমন কাল আসিবে না, যখন জ্ঞান থাকিবে না।" পৃঃ ১১৫। আমরা জানিতে চাই এই যে sensation (বেদনা), memory (স্মৃতি) এবং understanding (বুদ্ধি) প্রভৃতিকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, এস্থলে কি এই জ্ঞানেরই

নিতান্ত ঘোষণা করা হইল? গ্রন্থকারের মতে এই জ্ঞানই কি ব্রহ্ম? এই বেদনা, স্মৃতি এবং বুদ্ধিই কি আমাদের উপাস্য?

(ঝ)

সীতানাথবাবু Bradleyর বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই:—

Bradleyর মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর এক নহে। সীতানাথবাবু Bradleyর ঈশ্বরবাদের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—এই তাঁহার ব্রহ্মবাদ।

প্রতিবাদে আরও অনেক অবান্তর কথা আছে। তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলে সম্পাদক-মহাশয় আর ক্ষমা করিবেন না। তিনি দয়া করিয়া অনেকটা স্থান দিয়াছেন; অধিক স্থান ভিক্ষা করিতে আর সাহসী নই।

মহেশচন্দ্র ঘোষ।

হারামণি

(অজ্ঞাত কবির গান)

বন্ধু এবার খেলবে হোরি বঁধু তোরি আঙিনায়,
ওরে তোর দুয়ারেই ফুল ফুটেছে
আর কোথায়ও ফুল যে নাই।
ওরে আগে যে তার খবর এসেছে,
ওরে ফুলের ফুলের গন্ধে যে তার ধারা লেগেছে,
এবার পিচকারী সেই গন্ধেতে চলে,
তুই ধুর না হলে বন্ধু যে তোর যাবে রে চলে,
ওরে আয় না রে ভাই খেলবি হেথায়,
আর যে এবার সময় নাই॥

সংগ্রাহক—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

চিত্র-পরিচয়

"বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যরসিক" নামক মুখপাতের ছবিখানি বুঝিবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নবপ্রকাশিত Stray Birds নামক পুস্তকের এই দুটি লাইন সাহায্য করিবে—

"By plucking her petals you do not gather the beauty of the flower."—Stray Birds, p. 41.

আমাদের দেশের সাহিত্য-কুঞ্জবনে জনকতক এই-রকমের সাহিত্য-রসিক সমালোচকের ভীষণ উপদ্রব হইতেছে, ইহাই এই ছবিখানির ইঙ্গিত।

শ্রদ্ধা-হোম

(কবিগুরু-প্রশস্তি, গৌড়ী-গায়ত্রী ছন্দ)

জয় কবি! জয় জগৎ-প্রিয়!
বরেণ্য হে বন্দনীয়!
অগম শ্রুতির শ্রোত্রিয়! জয়! জয়!

প্রাণ-প্রণবের দ্রষ্টা নব!
গান সে অসপত্ন তব,—
অমৃত-সমুদ্ভব, জয়! জয়!

যুবন্ প্রাণের গাও আরতি,—
যে প্রাণ বনে বনস্পতি,
নবীন সবনের ব্রতী! জয়! জয়!

বাক্ তব বিশ্বম্ভরা সে,—
নৃত্যে মাতায় বিশ্ব-রাসে,—
চিত্তে-দোলায় উল্লাসে, জয়! জয়!

পাবনী বাগ্‌দেবীর কবি!
পাবীরবীর গায়ন রবি!
পুণ্য পাবকচ্ছবি! জয়! জয়!

জয় কবি! জয় হৃদয়-জেতা!
দিগ্বিজয়ীদিগের নেতা!
চিৎ-রসায়ন প্রচেতা! জয়! জয়!

শ্রদ্ধা-হোমের লও আহুতি,—
মানস-হবি এই আকুতি;
কবি! সবিতা-দ্যুতি! জয়! জয়!

প্রাণের কাঙাল, মানের নহ,
মান ঠেলে পায় কুলির সহ
অসম্মানের ভাগ লহ, জয়! জয়!

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে
অস্ফুট বোলে দেশ বলে—'জয়! জয়!'

তোমার সুব্রহ্মণ্যা বাণী
তারার ফুলের মাল্যখানি
কণ্ঠে কবি দ্যান্ আনি, জয়! জয়!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুস্তক-পরিচয়

সাবিত্রী—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমথুরানাথ সেন গুপ্ত, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

অল্প দিনের মধ্যেই এই বইখানির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে। হইবারই কথা। ছন্দোময় কবিত্বপূর্ণ চলতি কথায় সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের মনোরম উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে; একরঙে বইএর লেখা ও অন্য রঙে তার বর্ডার ছাপা; অনেকগুলি রঙিন ছবি আছে; মলাটটিও রঙিন ও সুন্দর; অথচ দাম মাত্র ছয় আনা। পরিচিত জিনিসের বহুল প্রশংসা অনাবশ্যক। এই সুন্দর সুলিখিত বইখানি ছেলে মেয়ে ও বধূদের উপহার দিবার যোগ্য এবং তাহারা ইহা পাইলে বাহ্য সৌষ্ঠব দেখিয়া খুসী হইবে, পড়িয়া বাংলা গদ্যের ছন্দ ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া প্রীত হইবে, ও সাবিত্রী-চরিত্রের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজেদের চরিত্রও উন্নত করিতে পারিবে।

নবিকাহিনী—কাজি ইমদাদুল হক প্রণীত। প্রকাশক ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী ঢাকা ও কলিকাতা। ডুবল ক্রাউন অষ্টাংশিত অর্থাৎ প্রবাসীর আকারের ১৭২ পৃষ্ঠা। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে নূতন পাইকা টাইপে খুব বেশী মার্জ্জিন রাখিয়া অতি পরিষ্কার ছাপা; সুদৃশ্য বাঁধানো। মূল্যের উল্লেখ নাই।

এখানি নবিকাহিনীর প্রথম ভাগ। ইহাতে হজরত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া হজরত ঈসা পর্য্যন্ত বারো জন নবির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে হজরত মোহাম্মদের জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইবে। হজরত আদম হইতে হজরত ঈসা পর্য্যন্ত যে বারো জন নবির কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাঁহারা য়িহুদী ও খ্রীষ্টপন্থীদিগেরও প্রফেট; বাইবেলে তাঁহাদের জীবনকাহিনী বর্ণিত আছে; বাইবেলের আখ্যায়িকার সহিত মুসলমানী শাস্ত্রের আখ্যায়িকা মিলাইয়া যাঁহারা পড়িতে চান এই বইখানি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। যাঁহারা সেরূপ গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চাহেন না, তাঁহারা মুসলমানদিগের নবিদিগের কাহিনী পাঠ করিয়া হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বকালের ইতিহাস ও অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়া প্রীত হইবেন। যাঁহারা সেরূপ ভাবে পাঠ করিবেন না, তাঁহারা কেবল গল্প হিসাবেও পড়িয়া অনেক নূতন কথা ও উপদেশ জানিতে পারিবেন। বর্ণনার ভাষা একটু আরবী-ফারসী-সংস্কৃত-ঘেঁষা ভারী হইলেও বিশেষ কঠিন নহে; সুতরাং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ইহা পড়িয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবে—আসলে ইহা সেই উদ্দেশ্যেই লেখা। আজকাল যেরকম ভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানবজাতি ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে প্রত্যেক জাতির উচিত অপর সকল জাতির ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও ভাবের ধারার সহিত সশ্রদ্ধভাবে সুপরিচিত হওয়া; তাহাতে হৃদয় উদার হয়, চিন্তা প্রসারিত হয়, প্রীতি ও মৈত্রী সুদৃঢ় হয়। আমরা আশা করি, এই পুস্তক ত মুসলমান-সমাজে সমাদৃত হইবেই, অমুসলমান সমাজেও ইহার প্রচলন হইবে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদিগকে ইহা পড়িতে দেওয়া হইবে। তাহা হইলে তাহারা প্রতিবেশী মুসলমানদের ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বকালের বিশেষ-এক দেশের ভাবের ধারার সঙ্গে পরিচিত হইবে। হৃদয় ও চিন্তার সম্প্রসারণ করিতে শিখিবে। আমরা এই বইখানি পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

ধর্ম্মের কাহিনী—মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক নূর লাইব্রেরী, ১২।১ সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা। চার আনা।

এই পুস্তিকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—

১। পূর্ব্বাভাষ ২। খোদাভক্তি ৩। নামাজ ৪। সত্য-মিথ্যা ৫। স্বার্থ ৬। দয়া ৭। দান-খয়রাত ৮। অতিথি-সেবা ৯। সুদ ১০। অন্ত্যজ কথা ১১। উপসংহার।

এই বইলিখিবার উদ্দেশ্য লেখক এইরূপ "নিবেদন" করিয়াছেন—

"মানুষের সাংসারিক জীবনে ধর্ম্মকে পদে পদে অবহেলিত ও উপেক্ষিত হইতে দেখিয়া অন্তরে যে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছি, চিত্তে যে তীব্র ধিক্কার জাগিয়া রহিয়াছে, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ তাহারি অভিব্যক্তি। আমরা কিরূপে ধর্ম্মকে সংসার-মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া জীবন যাপন করিতেছি, ইহাতে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের সংসারময় সার্ব্বজনীন নিত্য-অনুষ্ঠিত অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ইহা ধর্ম্মের একটি স্বাভাবিক আর্ত্তনাদ।"

আমরা বিষয়মত্ত হইয়া পরমেশ্বর খোদার কথা ভুলিয়া থাকি, নামাজ উপাসনায় সন্ধ্যাবন্দনায় শুধু মুখের কথা মন্ত্র আওড়াই, মনের আকুতি আল্লার চরণে জানাইতে জানি না; সত্য ও ন্যায় ত্যাগ করিয়া আমরা কিরূপে মিথ্যা ও স্বার্থের দাসত্ব করি; দয়া মনে স্থান পায় না বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দান দাক্ষিণ্য অতিথি-সেবা আমরা অনাবশ্যক অপব্যয় বলিয়া মনে করি; হিন্দু মুসলমান উভয়ের শাস্ত্রেই সুদ আদায় করা অধর্ম্ম, কিন্তু সমাজে সেরূপ অধার্ম্মিক কসাইএর অভাব নাই;—ইত্যাদি কথা প্রাণের আবেগের সহিত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া উপসংহারে এমাম হোসেন, এব্রাহিম আদহাম ও বুদ্ধদেব প্রভৃতির ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া লেখক বলিতেছেন—

"তবে ছিঁড়িয়া ফেল ভাই—এই তুচ্ছ জড়ের বন্ধন, এই ভোগের লালসা-ডোর। এই জড়দেহ জয় কর, ইহার দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল, ইহার উর্দ্ধে আরোহণ কর। মহত্ব তোমাকে মহিমান্বিত করুক, প্রেম ও কল্যাণ তোমার মাথার উপরে আনন্দবারি বর্ষণ করুক, ও ক্ষমা তোমার সমস্ত অণু পরমাণুতে প্রাণদায়িনী স্নিগ্ধতা পুরিয়া দিক্।—ধর্ম্ম তোমাকে জ্যোতিষ্মান করুক, তুমি নিশা অবসানে শিশিরস্নিগ্ধ পদ্মের মত ফুল্লনয়নে করুণাময় খোদাতালার পানে বিকশিত হইয়া উঠ।"

লেখক "নামাজ" সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহা সকলের প্রণিধানযোগ্য বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম—

"লোকে জানে না, ভাবে না, ধারণা করেনা প্রতিক্ষণে কত স্নেহে কি অসীম করুণায় তিনি (খোদা) আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। সে করুণা স্মরণ করিয়া কেহ আকুল হইয়া অধীর হইয়া তাঁহার বন্দনা করে না; তাঁহার ধ্যান ধারণা ও আরাধনা জীবনের নিত্য সত্য মহা-কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করে না, আল্লার আরাধনা মানুষের নিকট তুচ্ছ ঘটনা। অধিকাংশ লোকে তাহা গ্রাহ্য করে না, যাহারা করে তাহারা নিতান্ত তুচ্ছ করিয়া পালন করে।

দেখিতে পাই মৌলবী, মুন্সী, খোন্দকার, সেখ, মণ্ডল ও পরামাণিক নামাজ পড়েন, সে কেবল মন্ত্র উচ্চারণ মাত্র। তাহাতে প্রাণের যোগ কোথায়ও নাই। সে নামাজপড়া পালন-কারী, রক্ষাকারী, অপার করুণার আধার খোদাতায়ালাকে ভক্তি করিয়া—ভালবাসিয়া নহে, তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া নহে, কৃতজ্ঞতার আকুল উচ্ছ্বাস জানাইবার জন্য নহে,—পরন্তু একটা ভঙ্গী বজায় রাখার জন্য, একটা অভ্যাসের টানে পড়িয়া।

আমরা নামাজে খাড়া হই, বিড়বিড় করি, মাথা ঠোকাই আর উঠাই, উঠাই আর ঠোকাই—দুই মিনিটে নামাজ শেষ। যেমন স্নান করার জন্য তৈল লইলেও চলে, না লইলেও চলে, লইলেও দুই তিন থাবা তৈল মাথায় পিঠে দিয়া পুকুরের দিকে দৌড়াই, তেমনি হড়বড় করিয়া কোনরূপে নামাজটা শেষ করিয়াই সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়ি।"

—মুদ্রারাক্ষস।

প্রবাসীর-পুরস্কার

আগামী বৎসর দুটি প্রবন্ধের জন্য নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার নামে দুইটি পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০৲ টাকা পরিমিত। বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল।

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মধ্যে কোন্ কোন্ জিনিসের কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে উহা পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার সাফল্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং ঐ কারখানা পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও তাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(২) স্ত্রীশিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; হিন্দু বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের লোকের কর্ত্তব্য কি?

প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টকে কি করিতে হইবে এবং দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে হইবে, এবং অন্যান্য দেশের গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ তত্তৎদেশের শিল্প ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন আবশ্যকমত তাহার উল্লেখ ও বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্ কোন্ গ্রন্থাদি হইতে এই-সব বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। ইংরেজি কিছু উদ্ধৃত করিলে তাহার বাংলা অনুবাদ দিতে হইবে।

পুরস্কারের জন্য আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩২৪) তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নামে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধের উপর "প্রবাসী-পুরস্কারের জন্য" লিখিয়া দিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকাকারে বা যে-ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে। অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেত ডাকমাশুল পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম ঠিকানা লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না এবং কোনটিই প্রকাশিত হইবে না।

ইচ্ছা করিলে একজন দুই বিষয়েরই প্রবন্ধ পাঠাইতে পারেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুরস্কার ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের পূর্ব্বে, অথবা আমাদের নির্ব্বাচনের পর আমাদের নির্ব্বাচিত ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা, লেখক বা অপর কেহ আমাদের বিনা অনুমতিতে অন্যত্র প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক

বিজ্ঞাপন

নৃত্যগোপাল-প্রবাসী-পুরস্কার

এই বৎসরে "বঙ্গে শিল্পের উন্নতি" ও "বঙ্গে কৃষির উন্নতি" সম্বন্ধে দুটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫০৲ টাকা করিয়া পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। "বঙ্গে শিল্পের উন্নতি" বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ পুরস্কার লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। **"বঙ্গে কৃষির উন্নতি" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্রের লিখিত প্রবন্ধ ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।** এই প্রবন্ধ আগামী ১৩২৪ সালের প্রবাসীতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আগামী বৎসরের উপন্যাস

আগামী বৎসরে প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দুই তার" নামক উপন্যাস ও শ্রীমতী শান্তা দেবীর অনুবাদিত বিদেশী উপন্যাস "স্মৃতি-সৌরভ" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

—প্রবাসীর-সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।